সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

কলিকাতা

২।১ নং রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

কলিকাতা

২।১ নং রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আমরা হয় ত অল্পদিন হইল সেই সক
উদাহরণ দিয়া আমার মন্তব্যটী বিশদ ক
মহিলাদের মধ্যে কয়েক বৎসর মাত্র "ইহুদী মাক্
কর্ণাভরণের চলন হইয়াছে; কিন্তু ঠিক এই প্রকারে
প্রাচীন পিত্তলযুগে (Bronze Epoch) প্রচলিত ছিল, দেখিতে
আমরা "কলার্" বা "মাফ্‌লার্" প্রভৃতি বাঁধিবার জন্য "সেফ্‌টি
করি; আজকাল আবার ইহা দ্বারা ওড়না বা বারাণসী চেলী প্রভৃতি
চলন হইয়াছে; কিন্তু মেক্সিকো ও মধ্য-আমেরিকার প্রাচীন এজ্‌টেক্
মধ্যে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

অন্য পক্ষে, শিল্পকলাকুশল জাতির মধ্যে বর্ব্বরতা বা অসভ্যতার বি
নিদর্শন পাওয়া যায়। শৌর্য্যদৃপ্ত রোমের মহিমা ও সভ্যতা যখন পৃথিবীর জাতি
সমূহের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং অগষ্টস্-নির্ম্মিত শিল্পের ললামভূত
প্যানৃথিয়নের (Pantheon) সৌন্দর্য্য যখন সভ্যতা-গর্ব্বিত জাতির মধ্যে স্বপ্ন-
জালের রচনা করিতেছিল, তখন রোমে বর্ব্বরতার বীভৎস মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ত্রস্ত
হই। তখন দেখি, গ্রীক্-সভ্যতায় অনুপ্রাণিত রোম্যান্ জাতি আমোদ অনুভব
করিবার জন্য তাহাদের "সার্কাস্" (Circus) বা "এম্‌ফিথিয়েটারে"র (Amphi-
theatre) বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বন্য হিংস্র জন্তু দ্বারা আক্রান্ত স্বশ্রেণীস্থ জীবের নিষ্ফ
আত্মরক্ষা চেষ্টা সন্দর্শন করিতেছে। ইহাতে কিন্তু শিল্পের কোনও অপরাধ নাই

শিল্পের শৈশব, যৌবন ও বার্দ্ধক্য থাকিলেও, তাহার একটা বিশে
আছে। ইহার সাদৃশ্য অনেকটা স্রোতস্বতীর ঐকতানিক প্রবাহের
নিদাঘ বা শীতকালে জলের গভীরতার হ্রাস হইলেও যেমন
একই দিকে ধাবিত হয়, তেমনই জাতিবিশেষের শিল্প সম্ব
প্রযোজ্য। এ স্থলে ইহাও বলিয়া রাখি যে, কোনও কোন
কোনও একতানতা বা চরম লক্ষ্য দৃষ্ট হয় না। কো
কোনও কারণে প্রবাহের বেগ রুদ্ধ হইলে দেখা যা
সাধিত হইতেছে। তেমনই কোনও কোনও
বিভিন্ন পথে চলিয়াছে। আধুনিক ভারতীয়

প্রাচীন আসীরীয় বা গ্রীক্‌দিগের স্থাপ
যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে তাহা
হইতেছিল। ভারতের প্রাচীন ও মধ্যয

গ্রীস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ইহারা
সমস্ত মনঃপ্রাণ অর্পণ করিয়াছিল বলিয়াই
রণ। শৌর্য্যদৃপ্ত জাতির যাহা ঘটিয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও
জিগীষা-প্রণোদিত যে চিরাভ্যস্ত চাঞ্চল্যভাব দেখি,
স্থাপত্যশিল্পের বিকাশে বা ইহার মৌলিকত্ব ও একতানত্বরক্ষায়
না। যে জাতির আদর্শ—সাম্রাজ্যসংস্থাপন ও পরস্বাপহরণ,
সে কখন শিল্পচর্চ্চা করিবে ?- বা তাহার বিশুদ্ধিরক্ষায় অবহিত
? আত্মসম্মান লোপ করিয়া ইহা তাহার বসনে ভূষিত করিয়া শিল্প-
ক ইহারা দ্বারদেশে দ্বাররক্ষয়িত্রীরূপে স্থাপিত করে। আমরা এই কারণেই
রোম্যান্ স্থাপত্যে ইট্রাস্কান্ (Etruscan) ও গ্রীক্ প্রভাবের বিচিত্র সংমিশ্রণ
দেখিতে পাই। ইহাতে রোম্যানেরা অপমান বোধ করিতেন না; কেন না,
অভীষ্টসাধনের সুবিধা হইলেই তাঁহারা তৃপ্ত হইতেন। রোম্যানেরা সমস্ত ইটালী
ও ভূমধ্যসাগরের অন্তর্গত দ্বীপগুলি জয় এবং এসিয়ায় সাম্রাজ্যবিস্তার করিয়া
সাহিত্য, শিল্প ও অধ্যাত্মবিষয়ে গ্রীসের অধীনতা স্বীকার করিলেন। এ
অধীনতা-স্বীকারে, গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়, তাহার
প্রমাণ পাওয়া যায় না; ইহা হইতে সূচিত হয় যে, এ বিষয়গুলির চর্চ্চা তাহার
অভীষ্টের সাধন অপেক্ষা বহুনিম্নস্তরে অবস্থিত।

স্থাপত্যশিল্প এক হিসাবে কঠিন হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ততটা কঠিন নহে;
ইহার পারিভাষিক ব্যাপার আয়ত্ত করা সামান্য সময়সাপেক্ষ, কিন্তু ইহার অন্ত-
র্নিহিত প্রাণকে আয়ত্ত করিতে হইলে বিশিষ্ট শিক্ষার প্রয়োজন। সে শিক্ষা
চতুষ্পাঠীতে, বা স্থপতির শিল্পবিদ্যালয়েও মিলিবে না। তুলি, পেন্-
সিলের ভাণ্ডার শেষ করিলেও হয় ত সে বিদ্যায় পৌঁছিবে না। ক্রিষ্টোফার
যাহা সহজে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, শতসহস্র বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্প,
বাস্তুতত্ত্ব, বা ভিট্রুভিয়াস (Vitruvius) পাঠ করিলেও "তুমি
সেই" থাকিবে; গ্রীক্ বা রোম্যান্দিগের সমগ্র "অর্ডার"-
বা তাহার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ কর, কিংবা বিশ্ব-
বেদীভদ্র, মঞ্চভদ্র,প্রস্তার, উপপীঠ ও অধিষ্ঠান
প্রাণের সন্ধান পাইবে না। ইহার আইন-
সত্য, কিন্তু ইহার বিশেষত্ব কোথায়,
ই বিধি-ব্যবস্থার দিকে অবহিত হইয়াই ত

হিন্দুস্থাপত্যের অত্যন্ত অনিষ্ট হইয়াছিল।—
কিন্তু এ হিসাবে আমাদের দেশই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত
পক্ষীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিলে শিক্ষা দিয়া
বলাইয়া লওয়া যায় বটে, কিন্তু পক্ষীর যে কলসঙ্গীতে
মুখরিত হয়, ইহার সহিত তাহার তুলনা হয় কি? যতই
বলুক না, বিশ্ব-ছন্দের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। কৃত্রিম অকৃত্রিমে
ইউরোপে আইনকানুনের এই নাগপাশ ছিন্ন করিবার জন্য কত চেষ্টা
গিয়াছে। বাস্তবিক যে মানুষের জীবনের চরম উদ্দেশ্য—সংস্কারবর্জ্জিত
সে কি প্রকারে Convention-এর আদেশ নতমস্তকে বহন করিবে?
চিত্ত যে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে! এই বিদ্রোহের ফলে ইউরোপে স্থা
এক নূতন ধারার প্রবাহ বহিতে থাকে। এই নূতন প্রবাহে সমস্ত ই
ভাসিয়াছিল। সমাজে যেমনটি হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহা হইয়াছিল। সমাজ নূতনের প্রখর আলোক সহজে সহ্য করিতে পারে না। এই পেচক-ভাব সমাজ-সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় হইলেও, এক হিসাবে বিশেষ অনিষ্টের সৃষ্টি করে। পূর্ব্বোক্ত স্থাপত্যের নূতন ধারা প্রথম প্রথম রুদ্ধপ্রবাহ হইলেও, পরে ইহার প্রবল-স্রোতে অনেক ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল। সমাজ বিদ্রূপ করিয়া ইহার নাম রাখিলেন—"গথিক্ ষ্টাইল্" (Gothic style) বা বর্ব্বর-রীতি।

বিধি-ব্যবস্থা-নিয়ন্ত্রিত ভারতবর্ষেও এ বিদ্রোহের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণ-ভারতের মহীশূর রাজ্যে হৈসল-বংশীয় বিষ্ণুবর্দ্ধন রাজার সময়ে জকনাচার্য্য এই বিদ্রোহের সূচনা করেন। ইহার ফলে মন্দির বিমা- শ্রী ফিরিয়া গেল; আয়ত, বা চতুরস্রাকার বিমানের পত্তন তারকাকারে পরিণত হইল।

এই নব আকৃতিতে ছায়ালোকের এমন সুন্দর মিলন হইল যে, নরপতি ও তাঁহার মহিষী বিশেষ প্রীত হইয়া এই নব-রীতির প্রবর্ত্তন করিলেন। জকনাচার্য্য শুদ্ধ আকৃতির পরিবর্ত্তন করিয়াই তৃপ্ত হইলেন না; তিনি গৃহভিত্তিতে নব পদ্ধ-তিতে আলোক আসিবার সুচারু বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন; স্তম্ভগাত্র ও মন্দির-শীর্ষে নানা কারুকার্য্যের উদ্ভাবনা করিলেন। বিদ্রোহী জকনাচার্য্য অমর হইয়া-ছেন। মহীশূর-ভ্রমণকালে দেখিয়াছি যে, কত শত বৎসর পরেও স্থানীয় লোকে ভক্তিভরে একটি মূর্ত্তি দেখাইয়া বলে,—ইহা রাজশিল্পী জকনাচার্য্যের মূর্ত্তি। *

* এই মূর্ত্তিটি মহীশূরস্থ বেলুড়ের প্রসন্নচন্দ্র কেশবেরের মন্দিরে দেখিয়াছি।

...শের হিন্দুরাজ্যে। ইহা পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরবর্ত্তী।

...আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ অবগত ...গুলির স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও ইহারা পরস্পর-সম্বদ্ধ; এই ...টির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, পদার্থটির অস্তিত্বের সম্ভাবনারও ...তির শিল্প সম্বন্ধেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। শিল্প-রচনা করিবার সময় ... হইবে যে, ব্যষ্টিভাবে ইহার মূল্য কতটুকু; কেবল স্বতন্ত্র ভাবে দেখিলে ...না; ইহাও দেখিতে হইবে যে, সমষ্টির সহিত ইহার কি সম্বন্ধ, এবং ...হিসাবে ইহার সার্থকতা কতটুকু। এই ব্যষ্টি ও সমষ্টির ভাবে শিল্পকে না ...লে ইহা নিতান্ত বিসদৃশ, অসংলগ্ন ও সৌন্দর্য্যবিহীন হইয়া পড়ে। সৌন্দর্য্যের ...তত্ত্ব এই ব্যষ্টি-সমষ্টির মধ্যে নিহিত। বাস্তবিক, আমরা দৃষ্টির সীমা আরও একটু বিস্তৃত করিলে দেখি যে, এই বিশ্ব প্রপঞ্চে শুদ্ধ স্বতন্ত্রতার কোনও মূল্য নাই। সঙ্ঘ বা সমষ্টির অংশীভূত ভাবে যে স্বতন্ত্রতা দেখা যায়, কেবল তাহারই একমাত্র সার্থকতা। এই মূল সত্যটি শুদ্ধ যে জৈবিক জগতেই প্রযোজ্য, তাহা নহে; নৈতিক জগতেও ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত।

একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিতে গিয়া যদি বায়ু ও আলোক চলাচলের বিশেষ বন্দোবস্ত না করিয়া "ডোরিক্" বা "আয়োনিক্" স্তম্ভ দ্বারা বহির্ভিত্তি শোভিত করা যায়, কিংবা আমেদাবাদস্থ সিদি সায়েদের মস্‌জিদ্-গাত্রস্থ সৌন্দর্য্যের ললামভূত tracery window দ্বারা বায়ু ও আলোক চলাচলের বন্দোবস্ত করা যায়, ... হইলে শিল্প-দেবতা ত অন্তর্হিত হইবেনই, গৃহটির সার্থকতাও লুপ্ত হইবে।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স্‌দেশস্থ সাধারণ কল্পিত সৌধগুলি নিরীক্ষণ করিলে আমরা স্থাপত্য-অসঙ্গতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। তখন বাহিরের চাকচিক্য ভিতরের শান্তি, সুবিধা, আরাম প্রভৃতি ভাবগুলির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল। সৌধগুলির বাহিরের সৌন্দর্য্য ও চাকচিক্য দেখিয়া ভিতরের বাসস্থলীগুলির দুর্দ্দশা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

স্থাপত্যের অঙ্গগুলি কি, ইহা লইয়া বিশেষ মতভেদ আছে। অলঙ্কার-সম্পাদন যে ইহার অঙ্গীভূত, তাহা অনেকে স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, প্রয়োজনীয়তা ও নির্ম্মাণ-কৌশল দেখাইতে পারিলেই যথেষ্ট হইল। তাঁহারা বলেন,—যাহাতে সৌধগুলি স্বল্পব্যয়সাধ্য ও বহুকালস্থায়ী হয়, সেই বিষয়ে স্থপতির লক্ষ্য

থাকা উচিত। এ মত সম্বন্ধে আমাদের ব
বলিয়া ইহাকে স্থাপত্য-শিল্পের চরম লক্ষ্য বলিয়া
সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন মিশর-দেশবাসীরা 'পিরামিড
সে জাতি এখন বিলুপ্ত হইলেও পিরামিড্‌গুলি এখনও তঁ
দিতেছে। কিন্তু ইহাতে শিল্প কোথায়? শুদ্ধ স্থায়িত্ব
দেখিলে চলিবে না। আর একটি জিনিস আছে যাহা ইহার প্রাণস্বরূ
করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ভাস্কর্য্য দ্বারা স্থাপত্যের উ
আংশিকভাবে সাধিত হয়। ইহার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষীয়েরা বলেন যে,—কে
সৌধের অংশগুলির সামঞ্জস্য-রক্ষা বা যথাবিহিত বিন্যাস-সম্পাদন ক
স্থাপত্যের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সিদ্ধ হয়। একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে
ইহা অযৌক্তিক।

যদি প্রশ্ন করা যায় যে, মানবের লক্ষ্য কি, তাহা হইলে, এমন এক বিষয়ের সন্ধান করিতে হইবে, যাহাতে ইহার বিশেষত্ব, এবং যাহা মানবেতর জীবের মধ্যে মিলিবে না। তেমনই, স্থাপত্যের লক্ষ্য কি বলিলে, এমন এক বস্তুর অন্বেষণ করিতে হইবে, যাহা ইহা ভিন্ন অন্য বিষয়ের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। অংশ বা অবয়বগুলির সঙ্গতিরক্ষা বা সুচারু-বিন্যাসই যদি স্থাপত্যের চরম লক্ষ্য হইল, তাহা হইলে সঙ্গীত, চিত্র, কাব্য প্রভৃতি হইতে ইহার বিশেষত্ব কোথায়? রস্কিন্ (Ruskin) যথার্থই বলিয়াছেন যে, "Proportion is a principle, not of architecture but of existence."। বাস্তবিক, সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চেই ত আমরা সামঞ্জস্য বা সঙ্গতির পরিচয় পাই। স্থাপত্যের যদি ইহাই একমাত্র লক্ষ্য হইল, তাহা হইলে, ইহার উদ্দেশ্য অতিশয় নগণ্য হইয়া পড়ে, এবং ইহাতে কোনও বিশেষত্ব থাকে না। যদি কোণার্কের সূর্য্যমন্দিরের, বা ভুবনেশ্বরস্থ লিঙ্গরাজ বিমানের ভিত্তিগাত্রস্থ বহির্বর্দ্ধিতাংশগুলি (projection) নিরীক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিব যে, ইহাদের স্থাপন-বিন্যাসের কেমন সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে; মহীশূরস্থ হালেবিডের মন্দিরের তারকাকৃতি কোণ-গুলিতে কেমন সঙ্গতি দৃষ্ট হয়! তাহা বলিয়া এই সকল মন্দিরের স্থাপত্য-শিল্পের চরম সার্থকতা কি পূর্ব্বোক্ত জ্যামিতিক সামঞ্জস্যবিধানের মধ্যে নিবদ্ধ? ইহা যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। আমি তাঁহাদিগকে কোণার্কের মন্দিরগাত্রস্থ ভাস্কর্য্যগুলির দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে বলি। তাঁহারা যদি ইহার Frieze, বা panel, বা niche, বা তাহার অঙ্গীভূত চাল-

...বের রথচক্রের কারুকার্য্য দেখেন, তাহা হইলে ... বিশেষত্ব কোথায়। তেমনই যদি হালেবিড্ মন্দি- ...র্ণিস্ ও তন্নিম্নস্থ মূর্ত্তিগুলি দেখেন, তাহা হইলে বুঝিবেন, ...ও সার্থকতা কোথায়।

...একটি বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক। আমাদের ভারতবর্ষের স্থপতিরা ...ারের প্রাচুর্য্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে গিয়া ইহার নির্ম্মাণকৌশল ...বয়বগুলির সুচারু সন্নিবেশসাধনে ততটা মনোযোগী ছিলেন না। এই ...ণ আমরা বিমানগাত্রের প্রত্যেক অংশে ভাস্কর্য্যের বাহুল্য দেখি। এই ...ক্ষ্য করিয়াই Ferguson ইহাকে over-decorated ugliness ...লিয়া শ্লেষ করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্লেষ করিবার পূর্ব্বে একটি বিষয় ...াবিয়া দেখা উচিত। এই যে ভাস্কর্য্য-প্রাচুর্য্য, ইহা দেব-চরণে পুষ্পাঞ্জলি-সদৃশ নহে কি? যে দেশে দেবতার শৃঙ্গার-বেশের ব্যবস্থা আছে, যেখানে দেবতাকে পুষ্পে, অলঙ্কারে, অঙ্গরাগে ও বেশভূষায় আপাদমস্তক শোভিত করা হয়, সে দেশের বিমানগাত্রের প্রত্যেক অংশে যে ভাস্কর্য্যের প্রাচুর্য্য থাকিবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি? ভক্তের হৃদয়ে আনন্দ, বিস্ময় ও তৎসহচর ভক্তির উত্তেজনা যাহাতে হয়, তাহাও আর এক উদ্দেশ্য। এমন কথা যেন কেহ মনে না করেন যে, এই ভাস্কর্য্য-বিন্যাসের-কোনও নিয়ম নাই; যেখানে সেখানে যেমন তেমন ভাবে কারুকার্য্য করিলেই হইল। একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, ইহার মধ্যে একটি রীতি, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও সংযম বর্ত্তমান।

এই অলঙ্কার-প্রাচুর্য্যের কথা বলিতে গিয়া একটি বিষয় মনে আসিতেছে। ইউরোপের মধ্যযুগের গথিক রীতির প্রথম স্তরের অনুশীলন করিলেও আমরা ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই না। বেঁয়ো, রাইম্স্, রুঁয়ে, প্যারি (নতরদেম্) প্রভৃতির ক্যাথিড্রেল্গুলি নিরীক্ষণ করিলে আমরা দেখি যে, যে পর্য্যন্ত চক্ষু যায়, কারুকার্য্যের জটিলতা ও প্রাচুর্য্য সেই পর্য্যন্ত; তাহার উচ্চে ইহার জটিলতার হ্রাস করিয়া কারুকার্য্যকে সরল ও সহজসাধ্য করা হইয়াছে। ভক্তের হৃদয়ে আনন্দ ও বিস্ময়ের উদ্রেক করা ভিন্ন ইহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে।

রং ফলান স্থাপত্যের অঙ্গীভূত কি না, এ বিষয়ে বিশেষ মতভেদ আছে। বর্ণ দ্বারা সৌধগুলির যে সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও হ্রাস হইতে পারে, সে বিষয় বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। মনে কর, কোনও বাটীর কর্ণিস্ হরিদ্রা-বর্ণে রঞ্জিত করা হইল, এবং ভিত্তিগুলি সুধাধবল করা হইল; পার্শ্ববর্ত্তী আর

একখানি বাটীর ভিত্তিগুলি হরিদ্রা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া কর্ণিস্ সুধাধবল করা হইল। দুইখানি বাটী একই পরিপার্শ্বিক দৃশ্যের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত থাকিলেও, দর্শকের মনের উপর একই প্রকার প্রভাব বিস্তার করিবে না; প্রথমখানি এমনই বিসদৃশ বোধ হইবে যে, চক্ষু কখনই ইহার দিকে ফিরিতে চাহিবে না। চক্ষে যেন একপ্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে। আর একটি উদারণ দিতেছি। এক ঘর হইতে আর এক ঘরে যাইবার দ্বার হরিত বর্ণে রঞ্জিত করা হইল, এবং বাটীর বহির্মুখী জানালাগুলি শ্বেত, পীত, বা লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইল; আর একখানি বাটীর বহির্মুখী জানালাগুলি হরিত বর্ণে রঞ্জিত করিয়া মধ্যের দ্বারগুলি পীত বর্ণে রঞ্জিত করা হইল। প্রথমোক্ত অট্টালিকার দিকে চাহিলে মনে নিশ্চয়ই বিদ্রোহের সূচনা হইবে, এবং দ্বিতীয়োক্তটিতে শান্ত ও সংযত ভাবের উদ্রেক হইবে। এই কারণেই বহির্দ্দেশে গৃহভিত্তির উপর উজ্জ্বল পীতবর্ণ অপেক্ষা শ্বেত পীতের মিশ্রণ অধিকতর মনোজ্ঞ।

পৃথিবীস্থ যাবতীয় দেশের স্থাপত্যের আলোচনা করিলে দেখা যায়, বহু প্রাচীন যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বর্ণকে স্থাপত্যের অংশস্থানীয় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। প্রাচীন মিশর, আসীরীয়া, কল্‌ডিয়া প্রভৃতি দেশে রং ফলাইয়া সৌধশিল্পের উৎকর্ষ-প্রকাশের চেষ্টা দেখা যায়। গ্রীক্ ও রোমান্-দিগের মধ্যেও এ প্রথা ছিল; এথেন্স্ ও ডেল্‌ফিতে যে সকল প্রাচীন গৃহের ধ্বংসাবশেষ ভূগর্ভ হইতে বাহির করা হইয়াছে, তাহাতে এখনও কতদিনের পুরাতন বর্ণের উজ্জ্বলতা দৃষ্ট হয়।

ভারতবর্ষের স্থাপত্যের আলোচনা করিলে আমরা দেখি যে, অনেক স্থলে মন্দিরবিমানাদির শোভাবৃদ্ধি বিষয়ে বর্ণসম্পদের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। উড়িষ্যার মন্দিরগুলির মধ্যে অনেকের গাত্র রক্তবর্ণে রঞ্জিত দেখা যায়। দক্ষিণ-ভারতে ভ্রমণকালে হিন্দু ও জৈন স্থাপত্যের অনুশীলন করিবার সময় আমি বর্ণের বিচিত্র সমাবেশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। শুক্রনীতির চতুর্থ অধ্যায়ে চিত্রিত প্রাসাদের উল্লেখ পাইয়াছি। বরাহমিহির-রচিত বৃহৎ-সংহিতায় বজ্রলেপ নামক সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দৃষ্ট হয়।

অনেকের ধারণা যে, কল্পনাপ্রবণতাই বুঝি স্থাপত্যের উৎকর্ষবিধানের একমাত্র সহায়ক। কল্পনাবর্জ্জিত হইলে ত স্থপতি হওয়াই যায় না, কিন্তু

তাহা বলিয়া ইহাকে একমাত্র নিয়ন্তা করিলে বিষম বিপদে পড়িতে হয়। কিরূপ উপকরণ মিলিবে, এবং কি উদ্দেশ্যে কোন স্থানে ইহার নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তাহা বিশদরূপে ভাবিয়া অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। কোন সৌধের শুদ্ধচিত্র অঙ্কিত করিলে বিশেষ সার্থকতা নাই। এ সৌধ মানস ও আদর্শরাজ্যে হয় ত স্বপ্নজালের রচনা করিতে পারে, কিন্তু বাস্তবরাজ্যে ইহার স্থান কোথায়? বাস করিবার বাটী যেরূপ হইবে, কোনও সভাসমিতির জন্য সাধারণ ব্যবহার-যোগ্য গৃহ সেরূপ কখনই হইবে না। আবার পূজার্চ্চনার স্থান যেরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করিতে হইবে, সভাগৃহের সেইরূপ নির্ম্মাণ করিলে চলিবে না; কিন্তু উভয়েই সাধারণের জন্য কল্পিত। মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে দেশ, কাল ও পাত্র হিসাবে যেমন মানবীয় বিধিব্যবস্থার প্রচলন আছে, সেইরূপ দেশ-কাল-পাত্র-বিচার স্থাপত্যকে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্ত্তিত করে। আর কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। আমাদের কলিকাতাস্থ নাট্যশালাগুলির আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। স্থূলতঃ দেখিতে গেলে কলিকাতা, লণ্ডন্, বা প্রাচীন এথেন্স্, বা রোমের নাট্যশালাগুলির মধ্যে একই সূক্ষ্মনিয়ম ওতঃপ্রোতঃ ভাবে কার্য্য করে; ইহাদের প্রত্যেক থিয়েটারেই দর্শকদিগের দেখিবার ও শুনিবার জন্য উপযোগী স্থান ও আসনের ব্যবস্থা, নট বা নটীদিগের সজ্জাগৃহের বন্দোবস্ত, অভিনয় দেখিবার জন্য উচ্চ মঞ্চ বা বেদীর নির্ম্মাণ, বাদক প্রভৃতির জন্য স্বতন্ত্র স্থানের ব্যবস্থা, ইত্যাদি। যদিও পূর্ব্বোক্ত মৌলিক ব্যবস্থাগুলি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি উহাদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ রহিয়াছে। প্রাচীন এথেন্সের নাট্যশালা ও আধুনিক নাট্যশালার মধ্যে যে প্রভেদ লক্ষিত হয়, তাহার কারণ চিন্তা করিলে আমরা দেখি যে, প্রাচীন কালে দিবসে অভিনয় হইত, এবং দৃশ্যপট দিবসেই প্রদর্শিত হইত, সুতরাং দিবসে দৃশ্যপট দেখিবার জন্য যে বন্দোবস্ত হওয়া উচিত, রাত্রে সে বন্দোবস্ত কখনই উপযোগী হইতে পারে না। এই জন্যই স্থাপত্যেরও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

জাতীয় বা স্থানীয় আচার ব্যবহার যে স্থাপত্যের উপর বিশেষ কার্য্যকারী, তাহা এই নাট্যশালা হইতেই বেশ বুঝা যাইবে। রোম্যান্‌দিগের নাট্যশালার কল্পনা গ্রীক্‌দিগের নিকট হইতে গৃহীত হইলেও, উভয়ের মধ্যে বেশ পার্থক্য লক্ষিত হয়। যেখানে গ্রীক্‌দিগের গায়কের স্থান ছিল, সেখানে রোম্যান্‌দিগের সেনেটাররা বসিতেন; এই কারণে রোম্যান্‌দিগের নাট্যমঞ্চে গায়কদিগের স্থান সংকুলান করিতে হইত বলিয়া, ইহা আরও বর্দ্ধিয়াতন ও উচ্চ করিয়া নির্ম্মিত

হইত; দর্শকদিগের বসিবার স্থানগুলির মধ্যেও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। স্বাস্থ্য হিসাবে যাহাই হউক, কলিকাতার থিয়েটারগুলিতে আমদের জাতীয় আচার ব্যবহারের উপযোগী করিবার চেষ্টা লক্ষিত হয়।

পঞ্চভূতাত্মক দেহের আশ্রয়ে যেমন ভাব বা রসের অভিব্যক্তি, তেমনই প্রস্তর, কাষ্ঠ প্রভৃতি উপকরণের সাহায্যেই স্থাপত্যের বিকাশ; এই দেহের আশ্রয়েই যেমন শান্ত, রৌদ্র, বীভৎস প্রভৃতি নানারসের প্রকাশ, তেমনই উপাদানের বা উপকরণের বিচিত্র সমাবেশ বা বিন্যাসেই স্থাপত্যের বিশিষ্টতা। দাক্ষিণাত্যের কোনও মন্দিরের গোপুরম্ বা দ্বারপ্রাসাদ দর্শন করিলে তাহার অঙ্গীভূত প্রস্তরসমূহের নিটোল কাঠিন্য বা প্রস্তরাত্মকত্ব দর্শকের চিত্তে ঔৎসুক্যের সহিত যেন একটা ত্রাস বা আতঙ্কের সঞ্চার করে। দেবায়তন হইলেও, দর্শকের চিত্তে একটা জড়ত্বের প্রবাহ অবিশ্রান্তগতিতে বহিতে থাকে। ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু মহিমান্বিত তাজের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করিলে সে দৃষ্টি ফিরিতে চাহে না। হৃদয়ে অনন্ত ভাবনার দ্বার খুলিয়া যায়। এখানে জড়পিণ্ডের মধ্যেও বাহিরের অমূর্ত্ত চৈতন্যের একটা তরঙ্গ বহিতে থাকে; ইহাও উপলব্ধি করিয়াছি।

স্থাপত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা বিষয়ে উপকরণের যথেষ্ট প্রভাব। ইহাও ভাব-রাজ্যের কথা; ঐতিহাসিকের চক্ষে দেখিলেও উপকরণের প্রভাবকে নগণ্য মনে করিলে চলিবে না। পূর্ব্বে বর্ত্তমানের কথাটাই বলিয়া রাখা ভাল; তাহার পর অতীতের কথা কহিব। বর্ত্তমানকে লৌহের যুগ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আমাদের বাসভবনগুলিকে ইষ্টকাবৃত লৌহের খাঁচা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। এই খাঁচাগুলিতে Institute of British Architect-এর ছাপ থাকিলেও, আমাদের চিত্তে ভাবনার দ্বার খুলিয়া দেয় না; এই সকল একান্ত উন্নতশীর্ষ সৌধগুলি বহিরায়তনে প্রসারের সুবিধা না দেখিয়া উচ্চে অভ্রস্পর্শী হইয়া তালপত্রের সিপাহীর ন্যায় আমাদের নগরীর প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত। এখনকার সৌধগুলি যদি ভবিষ্যদ্বংশীয়ের নিকট আদর্শ বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতের চিন্তা বড় আশাপ্রদ নহে।

অতীতের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করিলে আমরা স্থাপত্যের উপর উপকরণের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করি। প্রাচীন মিশরদেশীয় স্থাপত্যের অনুশীলন করিলে আমরা প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাসাদে অধিকতর প্রাচীন কালে ব্যবহৃত মৃত্তিকা ও বংশদণ্ডের নিদর্শন বেশ সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে পারি। মিশরদেশীয়

নাইলনদীর উপত্যকায় মৃত্তিকা ও বংশজাতীয় দ্রব্যের মিশ্রণে যে আদিম গৃহের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার গঠন-কৌশল বহুপরবর্ত্তী গ্রাণাইট্-প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাসাদে বর্ত্তমান দেখি। এসিয়ার পশ্চিমাংশস্থ প্রাচীন আসীরীয় ও বাবিলনীয় স্থাপত্যে মৃত্তিকা ও ইষ্টকের প্রভাব প্রকৃষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। গ্রীসীয় প্রস্তর-স্থাপত্যের মধ্যেও পূর্ব্বতন যুগে ব্যবহৃত কাষ্ঠের গঠন-বৈচিত্র্য বেশ পরিস্ফুট। "বাইজান্টাইন্" (Byzantine) যুগেও কাচ ও মোজেয়িকের (Mosaics) প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

ভাঙ্গন।

১

বিনোদবাবু ওকালতী পাশ করিলে, সকলেই মনে করিয়াছিল যে, তিনি জন্মভূমি ঢাকাতেই 'প্র্যাক্‌টিস্' করিবেন, কিন্তু হঠাৎ কলিকাতা পুলিস কোর্টে ভর্ত্তি হওয়াতে আত্মীয় স্বজনের মুখ শুকাইয়া গেল। একটা বিশেষ কারণ এই যে, বিনোদের স্ত্রী (চন্দ্রমুখী) বাঙ্গাল্‌দেশের মেয়ে। কেহ কেহ বলিত যে, তাহাকে বিনোদবাবু পছন্দ করেন নাই। প্রমাণস্বরূপ, চারি বৎসর হইল, বিনোদ বাবুর বিবাহ হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুইবারমাত্র তিনি দেশে আসিয়াছিলেন, এবং যে কয় দিন ছিলেন, তাহার মধ্যে দুই ঘণ্টার বেশী স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করেন নাই। অবশ্য, কথোপকথন না করিবার একটা প্রধান কারণ এই যে, বিনোদ বাবু সুশিক্ষিত লোক, ভাষাতত্ত্ববিৎ, এবং কলিকাতায় থাকিয়া তাঁহার ভাষা খুব 'দোরস্ত' হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও কথোপকথনের বদলে একটু আদর, কিংবা একটা চুম্বন, কিংবা অন্ততঃ একবার সস্নেহ কটাক্ষ দেখিতে পাইলে অনেকের সন্দেহ দূর হইয়া যাইত। এটা খুব স্বাভাবিক কারণ। চন্দ্রমুখী খুব সুন্দরী, এবং বিশ্বসৃষ্টির গৌরবরক্ষার্থও পুরুষ মানুষ সুন্দরী স্ত্রীর নিকট ঐ সকল হাবভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাহার কোনও বিশেষ প্রমাণ কেহ পায় নাই। চন্দ্রমুখীকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সে চুপি চুপি বলিত, 'আমাকে উনি ভালবাসেন না।' চন্দ্রমুখী লিখিতে জানে, পড়িতে জানে। তবে হাসে কম, কাঁদে বেশী। কাঁদিবার একটা কারণ, তাহার পিতামাতা নাই। তাহাদের বাটী পদ্মার পারে কোনও স্থানে। সেখানে

তাহার বড় ভাই স্কুলমাষ্টারী করিত। আর একটা কারণ, তাহাদের পদ্মার তীরের বাটী 'ভাঙ্গনে' ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; এবং যাহা কিছু জমী ছিল, তাহার সঙ্গে তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং চন্দ্রমুখীর অগ্রজ নলিনীকান্ত বড় গরীব। চন্দ্রমুখী কেবল সেই 'ভাঙ্গনে'র কথা ভাবিত, কাঁদিত, এবং ভাইকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিত। চন্দ্রমুখী অনেকটা সেকালের মেয়েদের মত। কিন্তু তাহার স্বভাবতঃ একটা অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তাহার বলে চন্দ্রমুখী বুঝিতে পারিত যে, পদ্মার ন্যায় সমাজও ভাঙ্গিতেছিল। মধ্যে মধ্যে তাহার ভয় হইত যে, তাহার সঙ্গে তাহার অদৃষ্টও ভাঙ্গিবে। তখন সে কি মনে করিয়া একবার হাসিত। যে স্নেহটুকু সে পিত্রালয়ে পাইয়াছিল, তাহার এক কণাও চন্দ্রমুখী শ্বশুরালয়ে দেখিতে পাইত না। দেশের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, এবং স্বামীর সঙ্গে তাহার যেটুকু বিশেষ বন্ধন, সে তাহার কূল কিনারা লক্ষ্য করিতে না পারিয়া হয় ত মধ্যে মধ্যে দিশাহারা হইয়া কাঁদিত। সকলে বলিত যে, চন্দ্রমুখী বুদ্ধিমতী হইলেও তাহার একটু পাগলের ছিট ছিল।

বিনোদ বাবুর বৃদ্ধ পিতা ঢাকার এক জন প্রসিদ্ধ মহাজন। তিনি একমাত্র পুত্র এবং পুত্রবধূ যাহাতে সুখে থাকে, তাহার ভার গৃহিণীর উপর ন্যস্ত করিয়া দোকানে দিনরাত্রি কাটাইতেন। গৃহিণী সেই ভার ভগবানের উপর ন্যস্ত করিয়া হরিনামের মালা জপ করিতেন। কিন্তু বিনোদ কলিকাতায় ওকালতী আরম্ভ করিলে তাঁহার একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। কলিকাতায় ছেলেপুলে বেয়াড়া হইয়া যায়। তাঁহারা ব্রাহ্মণ-বংশ, কুলীন ও নামজাদা হিন্দু। যদি বিনোদ সাহেব হইয়া যায়, কিংবা কোনও প্রকারে জাতিতে জলাঞ্জলি দেয়, কিংবা আর একটা জাতির কন্যাকে বিবাহ করিয়া ফেলে, তবে কুলে একটা ভয়ানক কলঙ্ক ঘটিবে। এই ভয় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হওয়াতে তিনি কর্ত্তাকে দোকান হইতে বাটীতে আনয়ন করিয়া অনেক বুঝাইলেন, এবং হরিনামের মালা শিকায় তুলিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা অশ্রু পরিত্যাগ করিলেন। কর্ত্তা শেষজীবনে এই একটা ঘোর জঞ্জাল দেখিয়া নরহরি উকীলকে ডাকাইলেন, এবং তাঁহার দ্বারা পুত্রকে সুদীর্ঘ পত্র লিখাইলেন। তাহার 'মজমুন্' এই যে, ভূমণ্ডলে জীবজন্তু সকলেই তাহাদের জাতিগত বিশিষ্টতা রাখে। কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, ভল্লুক, বানর, সকলেই এই নিয়ম পালন করে। জাতি রাখিয়াও সমাজ সুখে ও স্বাধীনভাবে, স্ত্রী ও পুরুষ লইয়া, সৃষ্টির সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে। ঋষিরা জ্ঞানী হইয়াও জাতি ভাঙ্গিবার পরামর্শ দেন নাই, ইহাতে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝা যায়। এ সব বুঝি-

যাও যদি বিনোদবাবু জাতিগত বিশিষ্টতা না রক্ষা করেন, তবে তাঁহার পিতা তাঁহার সঞ্চিত সম্পত্তি হিন্দুধর্ম্মের সেবায় রাখিয়া যাইবেন। আর যদি বিনোদবাবু তাঁহার পিতার কথা পালন করেন, তবে ইহলোক পরলোকে তিনি সুখী ও কৃতার্থ হইবেন।

২

বিনোদ বাবু পিতার পত্র পাইয়া আশ্চর্য্য হইলেন না, বরং আনন্দিত হইলেন। বহুদিন হইতে 'জাতিগত বিশিষ্টতা' এবং 'ব্যক্তিগত চরিত্র' লইয়া তিনি যথাসাধ্য আন্দোলন করিতেছিলেন। প্রত্যেক জাতির মধ্যে চরিত্র এক দিকে ফুটিয়া উঠে, এবং তাহা ফোটা নিতান্ত দরকার, এবং তাহার সম্যক্ বিকাশ যে ক্রমোন্নতির পথে একটা মস্ত সহায়, তাহা তাঁহার ধারণা ছিল। একটা জাতির চরিত্র তাহার নিজস্ব স্বরূপ রেখাবিশেষের উপর সম্পূর্ণভাবে বিকাশ না পাইলে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া অন্য জাতির চরিত্ররেখার সহিত মিশাইয়া অর্দ্ধপথে একটা বিশ্বজনীন ভাবের সৃষ্টি যে সম্ভবপর, এ সম্বন্ধে তাঁহার খুব সন্দেহ ছিল। ইহাতে এমন একটা বর্ণসঙ্করত্বের উৎপত্তি হয় যে, তাহার ফলে একতা না হইয়া দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়। বিনোদবাবুর আরও একটা ধারণা ছিল যে, এক একটা রেখা ধরিয়া এক এক জাতি অগ্রসর হইবে, ভগবান ইহারই বিধানে তাহাদের দেশ, মতি, গতি, এবং আহারের ও বিহারের বিধান করিয়া দিয়াছেন। যদি বানরকুল জাতি ভাঙ্গিয়া ব্যাঘ্রধর্ম্ম গ্রহণ করে, কিংবা ব্যাঘ্র জাতি ভাঙ্গিয়া সর্প হয়, তবে আহার জুটা দূরে থাকুক, শরীর-সংগঠনের পক্ষেও একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারে। বিশ্বব্যাপ্ত এই 'ডিমক্রাটিক্' বর্ণাশ্রমের উপযোগী সরঞ্জাম বিধাতা ক্রমাগত সৃষ্টি করিতেছেন। ইহার প্রত্যেকের গণ্ডী অতিক্রম করা অসম্ভব নয়, তবে অতিক্রম করিলেই বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। বিপ্লব যে হয় না, তাহা নয়। স্বাভাবিক পথে যখন জাতিগত চরিত্রবিকাশ সম্পূর্ণ হয়, তখন হয় ত একটা জাতির ধ্বংস হইতে পারে। কিন্তু তাহাও ক্ষণিক। ইহার মধ্যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিষম সমস্যা থাকিয়া যায়। কোন অংশের ধ্বংস হয়, এবং কোন অংশ থাকিয়া যায়, কিংবা পুনরুত্থিত হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু ব্যক্তিগত চরিত্র জাতীয় বিশিষ্টতার মধ্যেই ফুটিয়া উঠে। আকাশে মেশামিশি হইলে চরিত্রের অবলম্বন থাকে না, এবং তাহাতে ক্রমবিকাশের পথ রুদ্ধ হয়।

সেই জন্য পিতার পত্র পাইয়া বিনোদ বাবুর মুখ প্রফুল্ল হইল। তাঁহার পিতার

ব্যক্তিগত জাতীয় চরিত্র যে খুব উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়াছিল, তাহা বিনোদবাবু পত্র দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন। এই চরিত্রবলটুকু বিনোদবাবু যে পান নাই, তাহাও নহে। তবে সেটুকু তখনও প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু একটা অভ্যাস পিতার নিকট হইতে বিনোদ বাবু সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা আহারের চেষ্টা। সকালে এক বাটী দুগ্ধ, তাহার সঙ্গে একরাশি বাদাম, এবং বেলা এগারটার সময় অন্ততঃ চব্বিশ রকম ব্যঞ্জনে সুশোভিত প্রকাণ্ড একথাল ভাত, এবং তাহার সহিত পায়স, আবার বেলা চারিটার সময় অন্ততঃ চব্বিশখানা লুচী ও তাহার সঙ্গে পুষ্টিকর আলুর দম ও মিষ্টান্ন, এবং সন্ধ্যার সময় দুই তিন পেয়ালা চা ও একমুঠা ছোলা ভাজা, এবং রাত্রি দশটার সময় পোলাও কালিয়া প্রভৃতি, এবং নিদ্রাকালেও স্বপ্নে নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য চর্ব্বণ কিংবা লেহন, ইহা বিনোদ বাবুর বাল্যকালাবধি অভ্যস্ত। অথচ তিনি বলিতেন যে, ভারতবর্ষের দুর্দ্দশা দেখিয়া আহার এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিনোদলাল যে পর্য্যাপ্ত আহার নিজে ভালবাসিতেন,তাহা নহে, দশ জন বন্ধু বান্ধবকেও ডাকিয়া জোর করিয়া খাওয়াইতেন, এবং কেহ এই প্রকার ভোজন করিয়া ক্রমশঃ হৃষ্ট পুষ্ট হইলে, তাহাকে এবং তাহার স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিতেন, এবং পর্ব্বপার্ব্বণের সময় একথালা জলখাবার ও এক যোড়া ফরাসডাঙ্গার ধুতী এবং এক যোড়া বারাণসী শাটী পাঠাইয়া দিতেন। কাজেই বিনোদবাবুর বন্ধু বান্ধবের অভাব ছিল না।

বিনোদবাবুর স্বীয় স্ত্রী চন্দ্রমুখীর উপর আক্রোশের প্রধান কারণ এই যে, সে শীর্ণা, এবং খাইতে পারে না, কাজেই বায়ুগ্রস্তা। বায়ুগ্রস্ত লোককে বিনোদবাবু একটু ভয় করিতেন, এবং দেখিলে শিহরিয়া উঠিতেন। বায়ুর প্রাবল্য হইলে 'জাতীয় বিশিষ্টতা' ও 'ব্যক্তিগত চরিত্র' যে ফুটিয়া উঠে না, সে ধারণাটুকু বিনোদবাবুর স্বভাবতঃই হইয়াছিল, এবং বায়ুগ্রস্ত লোকের সহবাসে তাহার সঙ্গীও যে তদ্ভাব ধারণ করে, তাহাও বিনোদবাবুর মতে বিজ্ঞানসম্মত। এই তথ্যটুকু যাহারা জানিত না, তাহারাই মনে করিত যে, বিনোদ বাবু স্ত্রীকে ভালবাসেন না। বাস্তবিক, বিনোদ বাবু মধ্যে মধ্যে সে চেষ্টার ক্রটী করেন নাই, কিন্তু সফল না হইবার কারণ তাঁহারই ব্যক্তিগত চরিত্র। তিনি বিদেশে থাকিয়া অনেক সময় মনে করিতেন যে; স্ত্রীকে খুব ভালবাসেন, কিন্তু নিকটে গেলে তাঁহার মতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত। পিতার পত্র পাইয়া বিনোদ বাবু ভাবিলেন, 'আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মের ক্রটী হইতেছে। যখন

একটা লোকের চিরজীবনের ভার লইয়াছি, তখন তাহার চরিত্রটুকু ফোটানই আমার কর্ত্তব্য।'

৩

মনে মনে এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বিনোদ বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, এবং সন্ধ্যাকালে চা খাইবার সময় বন্ধুবর হৃষীকেশ মোক্তারকে ডাকিলেন, এবং উভয়ে বিনোদবাবুর পিতার পত্রখানি লইয়া তুমুল আন্দোলন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য বন্ধুগণও আসিয়া জুটিল। হৃষীকেশ বাবু বলিলেন, 'তাঁহাকে (অর্থাৎ বিনোদ বাবুর স্ত্রীকে) এখনই লইয়া আসুন। পরিবার-শূন্য বাটী লড়াইয়ের ট্রেঞ্চের মত'। কেহ কেহ ভাবিল, 'বাঙ্গাল্ দেশের মেয়ে আসিয়া যদি বাটীর খরচ কমাইয়া দেয়, তবে মহা উৎপাতের কথা'। কিন্তু বিনোদবাবু বলিতে বাধ্য হইলেন যে, সে রকম সম্ভাবনা খুব কম; কারণ, তাঁহার স্ত্রী খরচপত্রে কখনই হাত দেয় না, এবং বাটী যদি লুটপাট হইয়া যায়, তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ করিবে না। তখন সকলে বলিল, 'তবে ত সতীলক্ষ্মী! এমন স্ত্রীকে যে বিদেশে ফেলিয়া রাখে, সে ঘোর পাষণ্ড।'

সকলের মতের ঐক্য হইলে বিনোদ বাবু বলিলেন, 'তবে তাহাই ঠিক হইয়া গেল।'

কিছুদিন পরে —নং গ্রে ষ্ট্রীটে বিনোদ বাবুর বাটীতে (বলা বাহুল্য যে বিনোদ বাবু সে বাটী ইতিমধ্যে কিনিয়া ফেলিয়াছেন) তাঁহার স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে মালতী পিসী ও এক জন চাকরাণী।

বাটীতে নামিয়াই চন্দ্রমুখী স্বামীকে প্রণাম করিল। পিসী বলিলেন, 'বাবা, আশীর্ব্বাদ কর'। বিনোদ বাবু আশীর্ব্বাদ কি করিয়া করে, তাহা ঠিক জানিতেন না, অতএব বলিলেন, 'আশীর্ব্বাদ!' এবং আকাশ ও পাতাল লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ হস্ত ঘুরাইয়া দিলেন।

গাড়ীতে রাত্রিজাগরণে চন্দ্রমুখী অবসন্ন হইয়া সারাদিন ঘুমাইয়া ছিল। বিকালে নিদ্রাভঙ্গের পর একটা মহারোল শুনিতে পাইয়া মনে করিল যে, পদ্মায় 'ভাঙ্গন' আরম্ভ হইয়াছে। ঝিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে হাসিয়া বলিল, 'এ যে কলকেতা সহর। সারাদিন এই রকম একটা অনাছিষ্টি গোলমাল রোজ হয়। দিন কতক শুন্‌তে শুন্‌তে সয়ে যাবে এখনি'।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে দশ বিশ পেয়ালা চা তৈয়ারী করিয়া চন্দ্রমুখী বাহিরের আড্ডায় পাঠাইয়া দিল। ঝিকে বলিল, 'আমি তৈয়ারী করিয়াছি, এ কথা যেন ওঁরা না জানিতে পান।'

কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রমুখী ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাড়ীতে জলখাবার তৈয়ারী হয়?'

ঝি। অতগুলো লোকের জলখাবার বাড়ীতে করা কি সহজ? চার সঙ্গে বাবু ছোলাভাজা খান।

চন্দ্রমুখী। তিনি সন্ধ্যার সময় বাটীর মধ্যে আসেন?

ঝি। একবার সাতটা আটটার সময় আসেন। কাপড় চোপড় ছেড়ে গড়ের মাঠের দিকে যান।

চন্দ্রমুখী তাহার পূর্ব্বে বাদাম, পেস্তা ও ছোলা ভাজিয়া, ক্ষীরের সঙ্গে মিশাইয়া, মিছরী দিয়া, বিশ ত্রিশখানা বরফী তৈয়ারী করিল, এবং সেইগুলি বিনোদ বাবুর কাপড় বদলাইবার ঘরে আর্সির সম্মুখে একটা থালে রাখিয়া, ছাতের উপর গিয়া বসিয়া রহিল।

বিনোদবাবু যথাসময়ে ঘরে প্রবেশ করিয়া চুল ফিরাইবার সময় এক থাল বরফী দেখিতে পাইলেন। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহার একখানা গলাধঃকরণ করিলেন। মনে হইল, খুব উপাদেয়। সবগুলি ক্রমে ক্রমে আহার করিয়া খুব হৃষ্ট হইলেন, এবং শরীর সবল বোধ হওয়াতে বাহিরে গিয়া বলিলেন, 'আজ আমি হাঁটিয়া গড়ের মাঠে যাইব'।

বিনোদবাবুর অভ্যাসের পরিবর্ত্তন দেখিয়া বন্ধুগণ বিস্মিত হইল। হৃষীকেশ আর এক জন বন্ধুর দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিল, 'বুঝতে পেরেছ?'

সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'নিশ্চয়'।

বিনোদবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'ও সব কিছু নয়। তোমরা ঠিক্ বুঝিতে পার নাই। তোমাদের জাতিগত বিশিষ্টতার দরুণ মধ্যে মধ্যে খুব ভুল হয়। তাহার কারণ যে, তোমরা ব্যক্তিগত চরিত্রের দিকে লক্ষ্য কর না।'

বিনোদবাবু বেড়াইতে গেলেন। রাত্রি দশটার সময় বাটী ফিরিয়া আবার আহারে বসিলেন। দেখিলেন যে, অন্য দিন অপেক্ষা আজ আহারের সরঞ্জামটা অনেক বেশী। তাহার কারণ তিনি যে বুঝেন নাই, তাহা নয়, কিন্তু সে সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিয়া সময় নষ্ট করা বাহুল্য বিবেচনা করিয়া তিনি আহারে মনোযোগী হইলেন।

এমন সময় পাখা হস্তে ঢাকাই শাড়ীর অবগুণ্ঠনে আবৃতা চন্দ্রমুখী নিকটে আসিয়া ক্ষীণ কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাতাস করিব?'

বিনোদবাবুর প্রথমে মনে হইল, যেন গোটাকতক মশা উড়িতেছিল। কিন্তু

পরে বোধ হইল যে, স্ত্রীর আগমনে তাঁহার ক্ষুধার বেগ কমিয়া যাইতেছে। তিনি মনে ভাবিলেন যে, সত্য কথা বলাই 'ব্যক্তিগত চরিত্র-বিকাশে'র পক্ষে প্রধান সহায়। অতএব তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'কোনও দরকার দেখছিনে। গোটা-কতক মশা আছে বটে, কিন্তু খাওয়ার সময় আমার নিশ্চিন্ত হইয়া খাওয়াই অভ্যাস। এটা অনেকে জানে না। সেই জন্য ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হয়।'

চন্দ্রমুখী অবগুণ্ঠনের আড়াল হইতে স্বামীর গম্ভীর মুখ দেখিয়া চলিয়া গেল।

৪

বিনোদবাবু মনে করিয়াছিলেন যে, রাত্রিকালে স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম দেখার সময় কথোপকথনটা একটা দুরূহ ঘটনা হইয়া পড়িবে। সেই জন্য তিনি আহার করিয়াই অন্যদিনকার মত শয্যাগত হন নাই! বাহিরে গিয়া একবার গেটের 'ফষ্ট্' এবং আর একবার ভূদেববাবুর 'সামাজিক প্রবন্ধ' প্রভৃতি পুস্তক লইয়া ওলট্ পালট্ করিতে করিতে রাত্রি বারটা বাজিয়া গেল। শয়নগৃহে প্রবেশ করিবার সময় মনে করিয়াছিলেন, চন্দ্রমুখীকে নিদ্রাগতা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু তাহা না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তদন্ত করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, চন্দ্রমুখী তাহার অনেক পূর্ব্বেই পিসীর সঙ্গে মহাভারত পড়িতে পড়িতে পার্শ্বের ঘরের মেজের উপর মাদুর পাতিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়াছে।

বিনোদবাবুর অহঙ্কারে একটু আঘাত লাগিয়াছিল, কিন্তু 'ব্যক্তিগত চরিত্র' বজায় রাখিবার জন্য তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। অন্য দিন হইলে সেই নিদ্রাতেই প্রভাত হইয়া যাইত, কিন্তু আজ রাত্রি দুইটার সময় তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সেই নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে বিনোদবাবুর চরিত্রেও একটা ক্ষুদ্র ভাঙ্গনের রেখা দেখা দিয়াছিল। বোধ হয়, তিনি নীরবে ও নিঃশব্দে ঘরের কপাট খুলিয়া চন্দ্রমুখীর ঘরে তাকাইয়া দেখিলেন যে, সে বারান্দায় উঠিয়া গিয়াছে। সেখানে রেলিং ধরিয়া কলিকাতার গভীর রাত্রির জনশূন্য রাস্তার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। চৈত্র মাস। মধুমাসের নৈশবায়ু তাহার অবগুণ্ঠন ও কেশগুচ্ছের খানিকটা মধ্যে মধ্যে অপসৃত করিয়া সুন্দর মুখের অর্দ্ধভাগ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছিল। বিনোদবাবু 'ইলেক্‌ট্রিক্ লাইটে' তাহা দেখিতে পাইয়া একবার স্তম্ভিত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, 'এমন সময় হঠাৎ কথা কহিয়া ভয় দেখানো উচিত নয়।' আবার ভাবিলেন, 'এটা উচিত হচ্ছে না।' খানিকটা অগ্রসর হইলেন। বোধ হইল, যেন চন্দ্রমুখীর মুখ ঈষৎ কম্পিত হইল। তাহাতে বিনোদবাবুর একটু লজ্জা হইল। বোধ হইল যে, তাঁহার হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত

হইতেছে, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, মাথা ঘুরিতেছে। এমতাবস্থায় 'ন্যায়সঙ্গত কথোপকথন অসম্ভব', এবং তাঁহার 'হার্ট ফেল্ হইতে পারে', এই প্রকার বিবেচনা করিয়া তিনি আবার শয্যায় আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

বেলা সাতটার সময় নিদ্রাভঙ্গের পর বিনোদবাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, হৃষীকেশবাবু ও আরও দুই তিন জন বন্ধু অভ্যস্ত চা-পানের জন্য বসিয়া আছেন, এবং তাঁহার দৈনিক বাদাম ও গরম দুগ্ধের পেয়ালার সঙ্গে আরও দুই এক রকম টাট্‌কা জলখাবার প্রস্তুত। তিনি হাত মুখ ধুইয়া সেইগুলি খাইতে বসিয়া গেলেন।

হৃষীকেশবাবু বন্ধু বিপিনের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, 'আজ বিনোদবাবুর চোখ্ একটু ঢুলু-ঢুলু না? আজ্ অন্যদিনকার চেয়ে চেহারা-খানা একটু করুণ্ রকম দেখাচ্ছে না?' বিপিনবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'বোধ হয়'। এই কথাতে বিনোদবাবু চটিয়া গেলেন—'তোমরা আসল কথা না জানিয়াই একটা যাহা তাহা অনুমান কর, ইহা জাতিগত বিশিষ্টতার দোষ।' ইহা বলিয়াই বিনোদলালের বোধ হইল যে, ইহা খুব বীরত্বের কথা, এবং কর্ম্ম-যোগের পরাকাষ্ঠা, এবং দত্তজার 'গীতা'র টীকার সঙ্গে খুব মিলিয়া গিয়াছে।

হৃষীকেশ ও বিপিনবাবুদিগের 'ফরেন্ পলিসী' অনেকটা চাণক্যবৎ। বিপিনের স্ত্রীর সঙ্গে বিনোদের স্ত্রীর প্রথম হইতেই খুব মেশামিশি না হইলে পাছে বাটীর খরচের 'বজেট্ এষ্টিমেটে' কোনও তারতম্য হয়, এ সম্বন্ধে তাহাদিগের আতঙ্ক পূর্ব্বাপর জাগরূক ছিল। অতএব উভয়ের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের চেষ্টায় হৃষীকেশ বলিল, 'আমার স্ত্রী আজ আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।'

বিনোদবাবু। খুব সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু জানেন বোধ হয়, সে বাঙ্গাল, একগুঁয়ে মেয়ে। এখনো সভ্যতা শেখে নাই।

হৃষীকেশ। সে জন্য আপনাকে ভাব্‌তে হবে না। আমার স্ত্রী তাকে দু-দিনে সব শিখিয়ে দেবে।

বিনোদবাবু। কথাটা যত দূর সোজা মনে কচ্ছেন্, তা নয়। বাঙ্গালদের একটা জাতীয় বিশিষ্টতা আছে, এবং ব্যক্তিগত চরিত্র সেই দিক দিয়া ফুটিয়া ওঠে। তারা কারও কাছে শিখ্‌তে চায় না। নিজের মনে যদি ভাল হ'তে চায়, তবেই সম্ভব, নয় ত বাধা পেলে আরও বিপদ। পদ্মার ভাঙ্গনের কথা শুনেছেন ত? সেই রকম।

হৃষীকেশ। আমার স্ত্রী নিতান্ত 'ব্যাচারী' লোক। সে ওস্তাদী কর্ত্তে

চায় না। তবে আমার বিশ্বাস, সে বশীভূত কর্ত্তে পারে। কি বল বিপিন? (কটাক্ষপাত।)

বিপিন। ঠিক।

বিনোদ। আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখুন।

৫

হৃষীকেশ বাবুর স্ত্রী বিমলা একটা বাদামী রঙ্গের রেশমী জ্যাকেট ও একখানা ক্ষীণ সবুজ বর্ণের পার্শী সাড়ী পরিধান করিয়া এলোচুলে চন্দ্রমুখীর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, একটা চেয়ারে আরোহণ করিয়া চন্দ্রমুখী উড়িষ্যা-দেশের ছোট ছোট জগন্নাথের পট লইয়া দেয়ালে কাঁটা দিয়া ঠুকিতেছে। সুসজ্জিত সুরম্য ঘরের মধ্যে এই রকম বেমানান কদাকার পটের বিস্তার দেখিয়া বিমলা বিস্মিত হইয়া কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া পড়িল।

গৃহস্থিত বড় আর্শির মধ্যে চন্দ্রমুখী তাহাকে দেখিতে পাইয়া ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল, 'এস না?'

বিমলা অগ্রসর হইয়া বলিল, 'আমি কে—বল ত?'

চন্দ্রমুখী। দূতী।

দূতী বিমলা বলিল, 'আচ্ছা। দেখছি, শ্রীমতী একবার চেয়ার ছেড়ে নাম।'

পরিশ্রান্তা চন্দ্রমুখী কোচের উপর বসিলে বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, 'এ সব ব্যাপার কি? এমন সুন্দর ঘর নষ্ট কচ্ছ কেন?'

চন্দ্রমুখী। সুন্দর ঘরে সকলই আছে, কেবল ঠাকুর দেবতা নাই, তাই তাদের দেয়ালে ঠুকে দিচ্ছি।

ইহা বলিয়া চন্দ্রমুখী যতগুলি পট সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা দেখাইল। জগন্নাথ দেব, গোষ্ঠের শ্রীকৃষ্ণ, নদীয়ার নিতাই, পূর্ব্বযুগের ধ্রুব ও প্রহ্লাদ, শ্রীরামচন্দ্র, এই রকম বত্রিশখানা পট। চন্দ্রমুখী বলিল, 'আমি সবগুলি এই ঘরে রাখব।

বিমলা। এ সব দেখ্‌লে উনি যে ব্যস্ত হয়ে পালাবেন।

চন্দ্রমুখী। আমাদের দেশে স্বামী স্ত্রীর ঘরে বড় একটা আসে না। বাহিরে থাকে। আমরা পট নিয়ে ঘরে থাকি। এতে ভূতের দৌরাত্ম্য হয় না।

বিমলা। আমাদের দেশে আমরা স্বামীকে ভুলিয়ে ভাঙ্গিয়ে ঘরে নিয়ে আসি। গান করি, কাব্য হাতে নিয়ে চেয়ারে বসে থাকি, ভাল ভাল খাবার তৈরী ক'রে ডাকি, নিতান্ত পক্ষে দরকার হ'লে খুকীকে ধ'রে মারি, তার কান্না শুনলে নিশ্চয় একবার আসে।

চন্দ্রমুখী। এ সব বাঁদর ভুলান নয়? পশু ও পাখীদের মধ্যে পুরুষগুলোই স্ত্রীগুলোকে ভুলায়। পুরুষদের শরীরের বাহার বেশী, যেমন কোকিল, ময়ূর, হরিণ ও বাঘ। মানুষের মধ্যে একটু তফাৎ। যাকে তারা বিবাহ করে নাই, তাদের ভোলাবার জন্য নিয়মটা ঠিক পালন করে। কিন্তু বিবাহ হয়ে গেলে ভোলাবার ভারটা স্ত্রীর ঘাড়ে পড়ে। এর মানে কি?

বিমলা। মানে, স্বামীকে সংসারের মস্ত ভার নিতে হয়। তার ওপর স্ত্রীকে তোলাবার ভার ঘাড়ে নিতে গেলে সঙ্গীন হয়ে পড়ে।

চন্দ্রমুখী। অন্যের বেলা সে বোঝাটা খুব হাল্‌কা হয়।

বিমলা। স্ত্রীলোকদের স্বামীর অধীনতাই ভাল! অধীনতার গোড়ায় ভক্তি। ভক্তিতে ভগবান পর্য্যন্ত বশীভূত হন।

চন্দ্রমুখী। স্ত্রী যত অধীন হয়, স্বামী ততই নির্ব্বিঘ্নে স'রে পড়ে, দূরে থাকে।

বিমলা। তবে তার চরিত্র ভাল নয়।

চন্দ্রমুখী। চরিত্র ভাল কিসে হয়? ভুলিয়ে রেখে কি চরিত্র ভাল করা যায়? কচি ছেলেকেও ত ভুলিয়ে রাখা যায় না।

বিমলা। তবে দেয়ালে পট ঠুকুলেই কি চরিত্র ভাল হয়?

চন্দ্রমুখী। এটাকে তোমাদের দেশে 'সাকার উপাসনা' বলে। এতে চরিত্র ভাল হয় না, কিন্তু মর্‌বার রাস্তাটা সহজ হয়। আমার বোধ হয়, সকলের চেয়ে যে বড় দেবতা, তিনি বড় দুঃখী। তিনি জগৎকে প্রাণপণে ভালবাস্‌ছেন, অথচ কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে না। পটগুলো দেখ্‌লে তাঁর দুঃখের কথা মনে পড়ে, আর মাঝে মাঝে বোধ হয় যে, তাঁর কাছে যাওয়ার একটাই রাস্তা, সেটা 'মরণ'।

বিমলা। তবে স্বামী আসে কেন?

'সেই মরণের রাস্তাটা দেখিয়ে দেবার জন্য। ভালবাস্‌লে সে রাস্তায় তাঁর হাত ধরে, সুখে ও শান্তিতে যাওয়া যায়। ভাল না বাস্‌লে জ্বলে পুড়ে যেতে হয়। এর কোনও চারা নেই, নিয়ম নেই, কূলকিনারা নেই। কোথায় কি রকম হবে, তার কোনও নির্দ্দেশ নেই। ভাই! আমাদের দেশে পদ্মা এই রকম। তার তটে এক সময় অনেক রাজধানী ছিল, অনেক আনন্দময় স্ত্রী পুরুষ ছিল, অনেক ঈশ্বরভক্ত ছিল। কিন্তু পদ্মা

ভেঙ্গে চুরমার করেছে। তার কূলে সে সুরম্য সুদৃশ্য জিনিস কিছুই রাখে না। কেবল শ্মশানের বালি তার কাছে থাক্‌তে পায়। সে খাঁটী জিনিসটুকু চায়, কিন্তু পায় না। বাঁদর-ভুলান ভালবাসা সে দুচক্ষে দেখ্‌তে পারে না। আমাদের বাঙ্গালদেশের মেয়ে পদ্মার মতন। তোমরাও সেই রকম ছিলে, কিন্তু সভ্যতার মধ্যে চেপে রেখে দিয়েছে, পুরাণো কথা ভুলে গিয়েছ। এককালে দুটো দেশই সমুদ্র ছিল। তখন আমাদের কেবল শাঁখা ও সিঁদুর পেলেই জন্ম সার্থক হ'ত। এখন আমরা মানুষ হয়েছি বলে' স্তূপাকার অপদার্থের মধ্যে স্বাধীনতা খুঁজে বেড়াই।'

ইহা বলিয়া চন্দ্রমুখী বিমলার হাতে এক জোড়া সুন্দর শাঁখা পরাইয়া দিল, এবং মাথায় একটু সিন্দুর দিয়া সজলনয়নে বলিল 'ভাই, তুমি স্বামী-সোহাগিনী হও।'

৬

হৃষীকেশ বাবু রাত্রিকালে বাটী ফিরিয়া স্ত্রীর নিকট চন্দ্রমুখীর খবর পাইবার প্রত্যাশায় প্রফুল্লমুখে শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু অন্যদিনের ন্যায় বিমলা স্বামীর প্রতীক্ষায় চেয়ারের উপর 'নভেল' লইয়া বসিয়া ছিল না। কেবল খুকী শয্যার এক পার্শ্বে শুইয়া নাক ডাকাইতেছিল। ঘরের নির্ব্বাণোন্মুখ ল্যাম্পের বাতি হৃষীকেশ বাবু একটু সতেজ করিয়া দেখিলেন যে, বিমলা ছাতের উপর বালিশে মাথা দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছে।

হৃষীকেশ বাবু নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'কি আশ্চর্য্য! আজ বিছানা পর্য্যন্ত পাড়া হয় নাই? তোমার কি অসুখ করেছে?'

বিমলা গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, 'তুমি শুয়ে থাকগে; আমি কতকগুলো কথা ভাবছি।'

হৃষীকেশ। আমাকে বল না কেন?

বিমলা। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? কাল থেকে খরচপত্র তুমিই করিও, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা আমাকে যেন দিও না। আমার সময় হয়ে এসেছে।

হৃষীকেশ। এ সব কথা আজ তোমার মুখে নূতন শুন্‌ছি। বোধ হয়, ও বাড়ীর বৌ তোমাকে শিখিয়েছে।

বিমলা। আমি তার কাছে মন্ত্র নিয়েছি, আর তোমাদের যত বন্ধু বান্ধব আছে, তাদের বাড়ীতেও প্রচার করে দিয়েছি। তোমরা যে কি ভয়ানক

লোক, তা এত দিন জানতুম না। 'নেক্‌টাই' পরে' দেশহিতৈষিতা প্রচার ক'রে বেড়াও, কিন্তু বাস্তবিক কেউ কাহাকেও ভালবাস না। আমাদের ঘরের মধ্যে অধীন রেখে বাইরে স্বাধীনতা দিতে চাও। এমন স্বাধীনতার মুখে ছাই।

হৃষীকেশ। বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে, তুমি ও বাড়ীর বৌএর সঙ্গে মিশে বিগ্‌ড়ে গিয়েছ, আর চারি দিকে বিদ্রোহের সূত্রপাত করে বেড়াচ্ছ। তোমাকে আমি ঘরেও যেমন স্বাধীনতা দিয়েছি, বাহিরেও তেমনই। আর কি চাও?

বিমলা। দুই স্বাধীনতারই মুখে আগুন। কেবল মরণ চাই। আমি যা খুসী করব, আর তুমি যা খুসী ক'রে বেড়াবে, এর নাম স্বাধীনতা নয়। তুমি যা চাও, আমি তা ক'রব, আর আমি যা চাই, তুমি তা ক'রবে, ইহারই নাম স্বাধীনতা। এইটুকুর মধ্যে স্বামী ও স্ত্রী, রাজা ও প্রজা, মা ও সন্তানের বন্ধন। সেটুকু না হ'লে সব ভেঙ্গে ফেলা ভাল। সেটুকুর নাম ভালবাসা।

হৃষীকেশ। তুমি ঘোর 'সোশ্যালিষ্ট' হয়ে পড়্‌লে দেখ্‌ছি। বাঙ্গালদের সঙ্গে মিশ্‌তে দেওয়াই আমার অন্যায় হয়েছে। এখন বুঝতে পাচ্ছি, স্ত্রী-স্বাধীনতার মধ্যেও বিপদ আছে। আমি যে তোমাকে ভালবাসি না, তা তোমাকে কে বল্‌লে?

বিমলা। তোমার কথাতেই বুঝতে পাচ্ছি। এতদিন মোহের আঁধারে পড়েছিলুম, তুমি মিষ্টি কথায় ভুলাতে, এখন তোমার চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়ছে।

হৃষীকেশ বাবু বিনোদ বাবুর 'ব্যক্তিগত চরিত্রের' কথা ভাবিলেন, এবং নিজের কথা ভাবিলেন, এবং শেষ একটা উপায় অবলম্বন করিয়া বিমলার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'ক্ষমা কর।'

ইহাতে বিমলা আরও চটিয়া গেল, এবং স্বামীর হাত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। 'ও মিথ্যে হাত, মিথ্যে হাত! তোমার ভালবাসা মৌখিক। তুমি অপরাধী, তা নিজেই স্বীকার কচ্ছ'।' ইহা বলিয়া বিমলা অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিল।

হৃষীকেশ বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, 'বিমলা! কেঁদ না। এ সংসারটাই মিথ্যে, তা আমি কি করব?'

বিমলা। সংসারটাকে সত্য কর, নয় ত পুরুষ কিসের? সত্য কথা কও। সত্য ব্যবহার কর। সত্যের জন্য প্রাণ দাও। ভাল না বাস্‌তে পার, দরকার নাই। অনেক পুণ্য করলে তবে স্বামীর ভালবাসা পায়। কিন্তু মৌখিক ভালবেস না, সত্যের অপলাপ করিও না। যুগে যুগে তোমরা মিথ্যা স্বামী

দেখিয়েছ, তাই আমরা নির্জ্জনে বসে' ভগবানের কঙ্কালখানা পটের মধ্য দিয়ে পূজা করেছি। তোমাদের মধ্যে তাঁর সত্যভাব না ফুটলে তোমাদের পূজা করব কি ক'রে? যখন বাহিরে যাই, তখনও তাঁকে পাইনে। তোমাদের মত তোমাদের সমাজও প্রবঞ্চক। সকলে প্রলোভন দিয়ে ভুলাতে চায়, আদর্শটুকু নষ্ট করতে চায়। তার মধ্যে স্বাধীন হয়ে বেড়িয়ে লাভ কি? জ্ঞানলাভ? তা তোমাকে দিয়েই ত শিখেছি, তোমার মত আরও দশ জনের কাছে গিয়ে আবার নূতন ক'রে শিখে লাভ কি? বরং এমন সমাজকে পুড়িয়ে ছারখার করা ভাল।

হৃষীকেশ। বিমলা! তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। আমি তোমাকে আসল কথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিইগে চল।

বিমলা। (চক্ষু মুছিয়া) আসল কথা অনেক দিন বুঝেছি। তবে মায়া একটা এমন জিনিস যে, বুঝলেও বুঝতে দেয় না, হয় ত শিগ্‌গির একেবারেই বুঝব। তুমি শোওগে। থিয়েটার দেখে রাত্রি জেগে শরীর খারাপ ক'রো না।

৭

সকালবেলা চা খাইবার সময় বন্ধুবর্গ একত্রিত। সম্মুখে রাশীকৃত জলখাবার। সকলেই খুব খুসী। কিন্তু বিনোদ বাবু যেন একই বিমর্ষ,—একটু উৎকণ্ঠিত। গত নিশাকালেও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয় নাই। তিনি হৃষীকেশ বাবুর অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হয় নাই, তাহা তাঁহার চক্ষু দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। অপর্য্যাপ্ত আহার পাইয়াও, অনেক বন্ধু বান্ধবের মধ্যে থাকিয়াও, অযচ্ছল খরচপত্র করিয়াও মানব-জীবনে একটা অভাব থাকিয়া যায়, এবং বিবাহ হইলে সেই অভাবটার দিকে লক্ষ্য হয়, এবং জীবন অশান্তিময় হইয়া পড়ে, এই রকম তাঁহার বোধ হইতেছিল। 'জাতিগত বিশিষ্টতা' এবং 'ব্যক্তিগত চরিত্রে'র ফলে কখন কোথায় কি রকম ভাবে অবস্থা দাঁড়ায়, ক্রমে তাহা বিনোদ বাবুর নিকট দুরূহ হইয়া পড়িতেছিল।

হৃষীকেশ বাবু ম্লানমুখে প্রবেশ করিলে, বিনোদ বাবু অনেকটা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্ত্রীর পূর্ব্বদিনের দৌত্য সফল হয় নাই। তিনি সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'খবরটা কি?'

হৃষীকেশ। খুব খারাপ। লাভের মধ্যে আমার স্ত্রী পর্য্যন্ত 'সোস্যালিষ্টদে'র মত বিগড়ে উঠেছে।

বিনোদ বাবু বলিলেন, 'ঠিক তাই। আমার স্ত্রীও প্রায় ঐ রকম

কি বক্‌ছিল। আমার একে বৃদ্ধ বয়স, তাতে আফিং খাই, বুঝতে না পেরে বাইরের ঘরে এসে ঘুমিয়ে পড়লুম।'

নবকুমার বাবু বলিলেন, 'কি আশ্চর্য্য! হয় ত আমার স্ত্রী সেই জন্য আজ বাপের বাড়ী চলে' গেছে।'

বিপিন। বৃদ্ধ বয়সে ভালবাসা একটা বিড়ম্বনামাত্র। যাঁরা টেনিসন প্রভৃতির মত অমর কবি, তাঁরা হয় ত 'টিথোনাসে'র কথা মনে করিয়া মধ্যে মধ্যে ভালবাসাকে জাগ্রত করিতে পারেন। কিন্তু আমরা গেরস্ত মানুষ, কখন চক্ষু বুজে ফেল্‌ব, তার ত ঠিক নেই, এর মধ্যে একটা বিপ্লব বাধ্‌লে রুসিয়ার সম্রাটের মত স'রে পড়তে হবে।

নবকুমার। বরং সম্রাট প্রজাদের ভালবাস্‌লে টিঁকে যেতে পারেন, কিন্তু রমণীর প্রেম বিষম জিনিস। ভগবানের প্রেমই এত দিনে বুঝতে পারি নাই, তাই তাঁকে নমস্কার ক'রে একটু দূরে থাকি; কারণ, তাঁর কৃপাদৃষ্টি হ'লেই ভবধাম ছাড়তে হবে, সেটা নিশ্চয়। পঞ্চ পাণ্ডবের স্বর্গারোহণে এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেই তা প্রকাশ।

বিনোদ। তোমরা যা বল্‌ছ, তা আমার মনে লাগছে না। 'ব্যক্তিগত চরিত্র' খুব ফুটে না উঠ্‌লে ক্রমবিকাশ হবে কি ক'রে? স্ত্রীলোকের প্রেম থাক্‌বেই, নচেৎ তাদের ভ্রূণে জাতিগত বিশিষ্টতা, বল ও বীর্য্যের বিকাশ কি ক'রে হবে? তবে চরিত্রবলই আসল বল। বংশবৃদ্ধিতে সেটার স্ফুরণ না হ'লে জাতির উন্নতি হয় না। এই জন্য প্রেমের সঙ্গে ও চরিত্রের সঙ্গে বিশেষ একটা সম্বন্ধ আছে। একটার মধ্যে আর একটা অনুপ্রাণিত হয়ে বংশপরম্পরা প্রকাশ পায়। আমাদের এখন যেমন চরিত্র, হয় ত স্ত্রীলোকেরা তা চায় না, এই জন্য তারা বিদ্রোহী হয়ে পড়বে, সেটা কিছু আশ্চর্য্য নয়। শুধু জ্ঞান হইলে চলে না। জ্ঞানে বংশ-বিস্তার হয় না। প্রেম তাকে বশ ক'রে সৃষ্টিবিকাশের মধ্যে নিয়ে যায়।

হৃষীকেশ। তবে আপনি 'ব্যক্তিগত চরিত্র'টুকু ফুটিয়ে ফেলুন। আমাদের দ্বারা তা হবে না। এত লেখাপড়া শিখেও যে স্ত্রী পুরুষ কাঙ্গালীর মত প্রেমের ঝুলি হাতে ক'রে ঘুরে' বেড়াবে, সেটা বিষম দৃশ্য।

বিনোদ বাবু বলিলেন, 'আমারও সেই রকম বোধ হচ্ছিল, কিন্তু মনে করেছিলুম যে, শিক্ষা পেলে স্ত্রীলোকেরা সেটুকু আপনিই বুঝে নেবে। আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে যে, প্রেম একটা বিদ্রোহী জিনিস। কিন্তু চরিত্রবল সেটাকে অধীন করে নিতে কতক্ষণ?'

বিপিন। আপনি একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন না কেন?

বিনোদ বাবু জলখাবারগুলি ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, দেখা যাবে। আজকে পুলিস-কোর্টে একটা স্ত্রীচুরীর মোকদ্দমায় নিযুক্ত হয়েছি, সেটাকে 'ডিফেণ্ড' ক'রে এসে বৈকালে দেখা যাবে।

নবকুমার। আজকে বৃহস্পতিবার, বারবেলাটা কেটে গেলে যা হয় ক'রবেন। হঠাৎ কিছু গুরুতর হ'লে আমাদের জলখাবারটা বন্ধ হয়ে যাবে।

বিনোদ বাবু হাসিয়া বলিলেন, 'সে ভয় নাই। ভগবান চিরকাল আমাদের আহারটা যোগাচ্ছেন, হঠাৎ বন্ধ করার কোনও কারণ নেই।'

বিনোদ বাবু গম্ভীরভাবে কাছারী চলিয়া গেলেন। তিনি যাইবার পরেই আকাশে একটা কালো মেঘ দেখা দিল। ক্রমে খুব ঝড় উঠিল, এবং মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিল। কলিকাতার বড় বড় গাছ পড়িয়া গেল।

বেলা পাঁচটার সময় বিনোদ বাবু বাটীতে আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার ভাল ভাল ছবিগুলি কে ঘর হইতে টানিয়া বারান্দায় ফেলিয়া দিয়াছে। তাঁহার বাক্স ভাঙ্গিয়া পুরাতন প্রণয়িনীর খানকতক প্রেমপত্রিকা কালি মাখাইয়া কে দেয়ালে সাঁটিয়া দিয়াছে। যে আর্শিখানার সম্মুখে তিনি প্রত্যহ তাঁহার সুন্দর মুখ বারংবার দেখিয়া কালো চুলগুলি ঘন ঘন ফিরাইতেন, তাহা কে ভাঙ্গিয়া খান্-খান্ করিয়াছে। ভাল মখমল-মণ্ডিত সোফা ও কোচগুলি কে ওলট্-পালট্ করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। গৃহ শ্রীহীন, যেন শ্মশানে অগ্নি জ্বলিতেছে।

বিনোদ বাবু পিসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ সব ব্যাপার কি?'

পিসী হরিনামের মালা জপিতে জপিতে সভয়ে বলিলেন, 'বাবা, কিছু মনে করিও না, বৌমার একটু পাগলের ছিট্ আছে। তুমি তার সঙ্গে দুটো কথা কহিও, সে একলা পড়ে থাকে।'

বিনোদ বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'আচ্ছা।' তখনও আকাশে ঘোর মেঘ। বিদ্যুৎ হাসিতেছিল। বিনোদ বাবুর জাতিগত শোণিত উত্তপ্ত হইয়া তীব্রবেগে বহিল।

৮

ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়াছিল।

বিনোদ বাবুর প্রথমে ইচ্ছা হইল, চন্দ্রমুখীকে ডাকিবেন। কিন্তু 'ব্যক্তিগত চরিত্র'-উন্মেষের ফলে তিনি বুঝিলেন যে, তাহা হইলে একটা খুন খারাপী

সকলকে বলিলেন, 'আমার শরীর খারাপ, আজ রাত্তিরে খাব না।' আবার বাটীর মধ্যে ফিরিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া 'গীতা'র পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

ক্রমে সেটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার সাধের সংসার যে ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, সেই দুরন্ত স্ত্রীর উপর তাঁহার বড় রাগ হইল। তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাওয়াই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর বোধ হইল। তিনি সংসার ছাড়িতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

আবার মুষলধারে বৃষ্টি পড়িল; আবার ঝড় বহিল। বিনোদ বাবুর ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি মনে করিলেন, প্রথমে হৃষীকেশ বাবুর বাটীতে গিয়া তাঁহাকে সব বুঝাইয়া দিবেন, এবং ঢাকায় তাঁহার পিতাকে পত্র লিখিবেন যে, তাঁহার সন্তান সংসার ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিয়াছে। বিনোদের চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিল। তখন দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া বিনোদ বাবু কেবল একখানা চাদর গায়ে দিয়া ও একগাছি ছড়ি লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

সে গৃহের সকল দুয়ারই কে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল; কেবল একটি দুয়ার উন্মুক্ত ছিল। সেটা চন্দ্রমুখীর পান সাজিবার ঘর।

ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বিনোদ বাবু সেই দিক দিয়া বাহির হইলেন, কিন্তু হঠাৎ বাধা প'ড়িল।

সম্মুখে মুক্তকেশে সন্ন্যাসিনীর বেশে চন্দ্রমুখী দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। সে কখন সে সাজে সজ্জিত হইয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। তাহার নিজের একখানা গেরুয়া রঙ্গের পট্টবস্ত্র ছিল। আজ সেখানা খুব সাহস করিয়া পরিধান করিয়াছিল।

স্বামীর বৈরাগ্য দেখিয়া গৌরবান্বিতা সতী তাহার কোমল বাহুলতার পবিত্র বন্ধনে স্বামীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিল।

বিনোদ বলিল, 'ছাড়,—আমি তোমার মুখ দেখ্‌ব না।'

চন্দ্রমুখী। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাচ্ছ নাকি? দেখ বঁধু হে! স্বামী হে! দেবতা হে! সংসারের মায়া ছেড়ে যাচ্ছ, কিন্তু চন্দ্রাবলীর প্রেমপত্রিকা-গুলোর মায়া এড়াতে না পেরে সেগুলি বাক্সে বন্ধ ক'রে রেখেছিলে? হে নিষ্ঠুর! জান নাকি স্ত্রী চিন্ময়ী? স্বামীর মনের প্রত্যেক ভাব এসে' তার মনে

আনন্দ পাও? তুমি কোন দেবতা, নাথ? জীবনে তোমার সহচরী হ'ব বলে সাধ করে' এসেছিলেম; মরণে তোমার সঙ্গে সহমরণে যাব, আমার সঙ্কল্প। তুমি জীবন ও মরণের মধ্যে একটা নূতন রাস্তা করে' আমাকে পথের মধ্যে ছেড়ে পালাবে, তা কি কখনও হয়?

সতী স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিনোদ বুঝিতে পারিল যে, একটা জীবনের ভার তাহার বুকের মধ্যে। বিনোদের পূর্ব্বে যে চরিত্রবল ফুটে নাই, আজ তাহা ফুটিয়া উঠিল। সমাজ ও দেশের যত বল সেই সূত্রের মধ্যে কেন্দ্রীভূত!

তখনও প্রবল বাত্যা বহিতেছিল। বিনোদের বোধ হইল, যেন সংসার ভাঙ্গিতেছে, কিন্তু সেই ভাঙ্গনের মধ্যেও একটা ব্যক্তিগত-চরিত্র-বল এবং 'জাতিগত বিশিষ্টতা' অনাহত ধ্বনির ন্যায় আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিশৃঙ্খল সমাজ সেটার ধ্বংস করিতে পারে না; 'সভ্যতা' সেটাকে লুপ্ত করিতে পারে না। তাহার মধ্যে 'সহমরণে'র অটুট বন্ধন শিরায় শিরায় ও মাংসপেশীতে ব্যাপ্ত। দেশের সেইটুকু বিশেষত্ব।

চন্দ্রমুখী পরিশ্রান্ত হইয়া বিনোদের কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিদ্রার ঘোরে সে পদ্মার ভাঙ্গনের স্বপ্ন দেখিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গ পবিত্র করিয়া তাহার অবিশ্রান্ত কলকলধ্বনি নদীবক্ষ বাহিয়া গঙ্গাসঙ্গমে মিশিতেছে। তাহার কূলে একটা নূতন জাতি পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি অবলম্বন করিয়া তপস্যানিরত—জীর্ণ, এবং শীর্ণ। যে পল্লীটুকু তাহাদের পূর্ব্বজীবনের ইতিহাস লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল, আজ সেটুকু ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহাদের চরিত্র-বল ফুটাইয়া দিতেছে। বালুকা-সৈকতে উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল সেই নূতন জাতির উন্মেষ দেখিয়া প্রফুল্ল। ভাঙ্গনের মধ্যেও একটা নূতন আশা ও উদ্যম প্রদীপ্ত!

বিনোদ বাতায়নের মধ্য দিয়া ঈষৎ-মেঘমুক্ত আকাশের নীলাভ অংশগুলি দেখিতেছিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

সিংহাসন।

সিংহাসন পদার্থটি শিক্ষিত অশিক্ষিত জনের নিকট সমান সুপরিচিত। পিতামহী-কথিত গল্প হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চাঙ্গের সাহিত্য পর্য্যন্ত উহার নাম-কীর্ত্তনের অভাব নাই। কিন্তু উহার আকৃতি বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞানে আমরা নিতান্তই নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছি। কারণ, ইহা রাজ-ভোগ্য বস্তু। বর্ত্তমান সময়ে লক্ষণান্বিত-সিংহাসনোপবিষ্ট রাজার দর্শন আমাদের পক্ষে দুর্লভ হইয়াছে। সুতরাং একমাত্র শাস্ত্রবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া আমাদিগকে উহার স্বরূপনির্ণয়ের চেষ্টা করিতে হইবে।*

যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে আসন-যুক্তি প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, আসন সাধারণতঃ দুই প্রকার; এক সাধারণ ও অপর অসাধারণ সংজ্ঞায় অভিহিত। তন্মধ্যে সিংহাসন 'বিশেষ' বলিয়া ও অন্য 'আসন' সামান্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

যুগভেদে ও সূর্য্যাদিগ্রহের দশাবিশেষে জাত নৃপতিদিগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সিংহাসনের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। সত্যযুগের সিংহাসনে পঞ্চ সোপান, ত্রেতাযুগে চারি সোপান, দ্বাপরে তিন সোপান ও কলিযুগে দুই সোপান নির্ম্মাণের ব্যবস্থা দেখা যায়। সিংহাসনের চরণগুলি সিংহান্বিত হইবার উপদেশ আছে। চরণের সংখ্যা সত্যাদি যুগক্রমে চল্লিশ, ত্রিশ, বিশ, এবং ষোড়শ হইবার ব্যবস্থা আছে। সূর্য্যাদি অষ্টগ্রহের দশায় জাত ভূপতিদিগের ভোগ্য সিংহাসন যথাক্রমে—পদ্ম, শঙ্খ, গজ, হংস, সিংহ, ভৃঙ্গ, মৃগ ও হয়, এই অষ্ট নামে অভিহিত হইয়াছে।

সমস্ত সিংহাসনেরই রাজপাত্র নামক সোপান, অর্থাৎ ভিত্তি, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে রাজার স্বহস্তপরিমাণে অষ্ট-হস্ত-মিত হওয়া আবশ্যক। উহার উচ্চতা এক পুরুষ পরিমিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

উক্ত সোপানের মধ্যে তদর্দ্ধপরিমিত রাজাসন, অর্থাৎ সিংহাসন স্থাপিত হইবে। কলিযুগে রাজাসন অর্দ্ধোন্নত বলিয়া কথিত হইয়াছে।

পদ্ম-সিংহাসন।

অষ্ট প্রকার সিংহাসনের মধ্যে পদ্ম-সংজ্ঞক আসন গাম্ভারী কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত, এবং পদ্মমালার দ্বারা চিত্রিত হইবে। উহার অবয়বগুলি পদ্মরাগ-মণি-নিধানের দ্বারা সুশোভিত, এবং বিশুদ্ধ স্বর্ণের দ্বারা আবৃত হইবে। উহার পাদাগ্রে পদ্মকলিকা হইতে বিনির্গত আটটি পুত্রিকা (পুতুল) অষ্ট দিকে নিহিত হইবে। এই পুত্রিকাগুলি রাজার দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত, এবং পদ্মরাগমণি দ্বারা চিত্রিত হওয়া আবশ্যক। এতদুপরি নিহিত রাজাসনে চারিটি ও বারটি পুত্রিকা স্থাপিত হইবে, এবং মাঝে মাঝে নবরত্নে খচিত হইবে। রক্তবস্ত্রাবৃত এই আসন পদ্ম-সিংহাসন নামে অভিহিত হইয়াছে।

শঙ্খ-সিংহাসন।

শঙ্খ-সিংহাসন দেবদারু কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত, এবং শঙ্খচিত্রাবলির দ্বারা সুশোভিত হইবে। এই সিংহাসনের পাদাগ্রে শঙ্খনাভি, এবং স্থানে স্থানে বিশুদ্ধ স্ফটিকে নির্ম্মিত সাতাশটি পুত্রিকা বিন্যস্ত হওয়া আবশ্যক। শুক্লবস্ত্রের দ্বারা উহার আবরণ করিতে হয়। শাস্ত্রে এইরূপ বিহিত হইয়াছে।

গজ-সিংহাসন।

গজ-সিংহাসন পনস কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত, এবং হস্তি-প্রতিকৃতিসমূহের দ্বারা সুশোভিত হইবে। প্রবাল, বৈদূর্য্যমণি ও সুবর্ণ দ্বারা উহার শোভা-সম্পাদন আবশ্যক। উহার পদাগ্রে নিহিত হস্তীর মস্তক ও পুচ্ছের প্রতিকৃতি হইতে সমুত্থিত মাণিক্যনির্ম্মিত এক একটি পুত্রিকা রচনা করিবার ব্যবস্থা আছে। রক্তবস্ত্র প্রভৃতি উহার ভূষণ-রূপে বিহিত হইয়াছে।

হংস-সিংহাসন।

হংস-সিংহাসন শাল কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত, এবং হংসের প্রতিকৃতি-শ্রেণীর দ্বারা সুশোভিত হইবে। পুষ্পরাগমণি, স্বর্ণ ও কুরুবিন্দ, এতত্রিতয়ের দ্বারা উহার শোভা-সম্পাদন করিতে হয়। উহার পাদাগ্রে হংসের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিতে হয়, এবং ইহাতে গোমেদমণি-নির্ম্মিত একবিংশতিসংখ্যক পুত্রিকা স্থাপিত করিতে হয়। পীতবর্ণ বস্ত্র ইহার ভূষণ-রূপে বিহিত হইয়াছে।

সিংহ-সিংহাসন।

সিংহ-সিংহাসন চন্দন কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত, এবং সিংহের প্রতিকৃতি-শ্রেণীর দ্বারা সুশোভিত হইবে। উহার অবয়বগুলি বিশুদ্ধ হীরকের দ্বারা চিত্রিত করিতে হয়, এবং উহার চরণ-নিহিত সিংহ-চিহ্নগুলি বিশুদ্ধ

সংখ্যক পুত্রিকা-স্থাপনের ব্যবস্থা আছে। মুক্তা, শুক্তি ও অন্যান্য নির্ম্মল পদার্থের দ্বারা উহার অলঙ্করণ করিতে হয়। মুক্তার দ্বারা ইহার আবরণ বিহিত হইয়াছে।

ভৃঙ্গ-সিংহাসন।

ভৃঙ্গ সিংহাসন বিশুদ্ধ চম্পক কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত, এবং ভ্রমরের প্রতিকৃতি-সমূহের দ্বারা সুশোভিত হইবে। উহাতে বিশুদ্ধ মরকত মণি যুক্ত করিতে হয়। উহার পাদাগ্রে পদ্মকোষের আকৃতি ও দ্বাবিংশতি পুত্রিকা-বিধানের ব্যবস্থা আছে। নীল বস্ত্রাদি উহার ভূষণ-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মৃগ-সিংহাসন।

মৃগ-সিংহাসনের উপাদান নিম্ব কাষ্ঠ। মৃগের প্রতিকৃতি-শ্রেণীর দ্বারা উহার শোভা সম্পাদন বিহিত হইয়াছে। ইন্দ্রনীল মণি, মহানীলমণি ও স্বর্ণ, এই তিন বস্তু দ্বারা উহাকে চিত্রিত করিতে হয়। উহার পাদাগ্রে মৃগের মস্তকচিহ্ন-স্থাপন এবং চত্বারিংশৎসংখ্যক পুত্রিকা বিন্যস্ত করিতে হয়। উহা নীলবস্ত্রাদিযুক্ত হইয়া থাকে।

হয়-সিংহাসন।

এই সিংহাসন বকুল কাষ্ঠের উপাদানে নির্ম্মিত, এবং হয়-প্রতিকৃতি-নিচয়ের দ্বারা সুশোভিত হইবে। উহাতে সর্ব্বপ্রকার বস্ত্রালঙ্কারের দ্বারা শোভিত পঞ্চসপ্ততিসংখ্যক পুত্রিকা বিন্যস্ত করিতে হয়। উহার চরণাগ্রে অশ্বমস্তক-চিহ্ন বিহিত, এবং বিচিত্র বস্ত্রাদি উহার ভূষণরূপে কথিত হইয়াছে।

এই অষ্ট প্রকার মহা-সিংহাসন ভোজদেব কর্ত্তৃক কথিত, এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণের সম্মত।

সিংহাসনের এতাদৃশ নির্ম্মাণপদ্ধতি সত্ত্বেও অমরসিংহ সুবর্ণময় রাজাসনকেই সিংহাসন নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার রহস্য কি? তবে কি তাঁহার সময়ে কেবল সুবর্ণের দ্বারাই সিংহাসন প্রস্তুত হইত? অত্রত্য অল্পাক্ষর অমর-কারিকাংশ বড়ই সমস্যাপূর্ণ। উহা হইতে এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, রাজ-ভোগ্য আসনের নাম ভদ্রাসন। (নৃপাসনং যত্তদ্ ভদ্রাসনং সিংহাসনন্তু তৎ হৈমং।) যদি ঐ আসন সুবর্ণময় হয়, তবে উহা সিংহাসন নামে সমাখ্যাত হইয়া থাকে। সুতরাং ভদ্রাসন ও সিংহাসন, এই উভয়ের আকারগত কোনও প্রভেদ নাই; কেবল উপাদানের পার্থক্যানুসারেই নামান্তর বিবেচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কাদম্বরী-পাঠে জানা যায় যে, রাজকুমার চন্দ্রাপীড় কাঞ্চনময় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। (কাঞ্চনময়ং শশীব মেরুশৃঙ্গং চন্দ্রাপীড়ঃ সিংহাসন

মারুরোহি।) অতএব, কবি বাণভট্টের সময়েও সিংহাসন সুবর্ণের দ্বারাই নির্ম্মিত হইত, এমন অনুমান করা যায়। এই উক্তি হইতেও আকার সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে যুক্তিকল্পতরুতে সিংহাসনের পাদদেশে সিংহচিহ্ন-স্থাপনের যে ব্যবস্থা আছে, উক্ত-চিহ্নানুসারেই "সিংহাসন" এই যোগরূঢ় সংজ্ঞা সিদ্ধ হইয়াছে, বলা যাইতে পারে।

কবি বিশাখদত্ত মুদ্রারাক্ষস নাটকে সিংহাসনকে "সিংহাঙ্কাসন" অর্থাৎ সিংহচিহ্নিতাসন নামেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"সিংহাঙ্কাসনধারণাচ্চ সুচিরং সংজাতমূর্চ্ছামিব
ক্ষিপ্রং চন্দনবারিণা সকুসুমঃ সেকোঽস্যদুনুস্থাম্ ॥"

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

দীনের গান।

আমার মেটে ঘরই শ্রীবৃন্দাবন।
ডাক্‌ছে শালিক, ডাক্‌ছে শ্যামা,
হরি কর্‌বেন আগমন।
আমার ঘরের মেঝে ধুয়ে পুঁছে
বৌ দিতেছে আলিপন;
হরি এসে' পিঁড়েয় বসে
রাখ্‌বেন তাঁহার শ্রীচরণ।
আমার ছেলে মেয়ে শুদ্ধ হ'য়ে
কর্‌ছে পুষ্প-আহরণ;
দুখীর হরি—দয়াল হরি
দিবেন আজি দরশন।
তাঁর রাঙ্গা পায়ে কি বা দিয়ে
করি পূজার আয়োজন;
আমার শোক তাপ, পুণ্য পাপ,
কর্‌বো তাঁরে সমর্পণ।

উদ্ভিদ-জীবনের অবস্থাত্রয়।

প্রাণী সকল যেরূপ সুষুপ্তি, বিরাম ও জাগরণ, এই তিন অবস্থার অধীন, উদ্ভিদগণও অবিকল সেই অবস্থাত্রয়ের অধীন থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। প্রণিধান করিলে বুঝা যায় যে, উদ্ভিদমাত্রই কখনও নিদ্রাভিভূত, কখনও বা জাগ্রত, আবার কখনও বা জাগ্রত থাকিয়াও নিঃস্পন্দভাবে অবস্থান করে। শেষোক্ত অবস্থাই জীব বা উদ্ভিদের স্বপ্নাবস্থা।

জাগরণকালে উদ্ভিদ পর্য্যাপ্ত আহার করে, বৃদ্ধি পায়, এবং ফুল ফল প্রসব করে। এ সময়ে আহার্য্যের অভাব বা অনটন হইলে, উদ্ভিদ অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হয়, অগত্যা ফুল-ফল-ধারণে, বা পত্র মুকুল উদ্ভূত করিতে অল্লাধিক অসমর্থ হয়। বৃদ্ধি বা ফল-ফুল, এ সকলই পানাহারের অবশ্যম্ভাবী ফলমাত্র। উদ্ভিদ-দেহে যে সকল পদার্থ আহরিত হয়, তাহাই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া ফল, ফুল, পত্র ও শাখা প্রভৃতি নানা আকারে উদ্ভিদ-শরীরে প্রকাশ পায়। সেই সকল আহরিত সামগ্রীর মধ্যে যে সামর্থ্য বা শক্তি নিহিত থাকে, তাহা উদ্ভিদ শরীরের অভ্যন্তর দিয়া প্রকাশিত হয়। উক্ত শক্তি অগ্নি ভিন্ন আর কিছুই নহে। দুই খণ্ড কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ই অগ্নির আধার, কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি বিদ্যমান, কেবল ঘর্ষণের অপেক্ষা। সেইরূপ, উদ্ভিদের অবয়বে এবং উদ্ভিদ-খাদ্যে অগ্নি বিদ্যমান। কেবল উভয়ের একত্র সম্মিলনের ফলে অগ্নি, বা শক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহার উত্তরসাধক সূর্য্যের কিরণ-সম্পাত না হইলে পৃথিবীর কোনও বস্তুরই জড়তা দূর হয় না। যাহা হউক, জাগরণাবস্থায় উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় কোনও দ্রব্যের অভাব না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য থাকিলে, উদ্যানস্বামী সমুচিত প্রতিদান পাইয়া থাকেন। উক্ত অবস্থা দীর্ঘকাল থাকে না। সাধারণতঃ বসন্তকালই পূর্ণ জাগরণের অবস্থা। জাগরণের দিন সমাগতপ্রায় হইলেই ইহারা তাহা বুঝিতে পারে; সুতরাং ইহাদিগকে জাগরিত করিবার জন্য কাহাকেও প্রয়াস পাইতে হয় না। এই সময়ে ইহাদিগের কার্য্য-তৎপরতা পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—কৈশিকমূল (Hair-root)

হইতে পত্রমূল (Stomata) পর্য্যন্ত সকলেই তৎপর, সকলেই ব্যস্ত। নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যেই উদ্ভিদকে কাজ শেষ করিয়া লইতে হয়। যেন মহাকাল বেত্র-হস্তে দণ্ডায়মান,—প্রাণী ও উদ্ভিদ-জগৎকে তিনি কাজ করাইয়া লইতেছেন!

কঠোর শ্রমের পর বিরামের প্রয়োজন, ইহা প্রকৃতির অপর বিধান। যে যন্ত্রবলে উদ্ভিদে এত ক্ষিপ্রতা, এত কার্য্যশীলতার আবির্ভাব হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার বেগ হ্রাস হইয়া আইসে। উদ্ভিদ স্থিরভাব ধারণ করে। উদ্ভিদের এই অবস্থা—বিরামকাল।

ওষধি বা ঋতুজীবী উদ্ভিদ—যথা ঋতুবাহার Season flowers) পুষ্প ও ফল প্রদান করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করে। ইহাই তাহাদিগের স্বভাব, ইহাই তাহাদিগের বিশেষত্ব। দীর্ঘজীবী হইয়া বিভিন্ন ঋতুর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যাহাদিগকে চলিতে হয়, তাহারা সুষুপ্তি প্রভৃতির সম্পূর্ণ অধীন। বিরামকালে ইহারা নিঃস্পন্দভাবে অবস্থান করে, এবং যাহা কিছু আহার করে, তাহা কেবল জীবন-ধারণের জন্য, সুতরাং নামমাত্র। বিরামটা কার্য্য কি কারণ, তাহা বলা বড় কঠিন। তবে দেখিতে পাই, বিরামকালে খাদ্য-আহরণ ও পরিশোষণ যেরূপ মন্থরতা প্রাপ্ত হয়, পরিপাক-ক্রিয়াও সেইরূপ স্থিরপ্রায় হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, কোনও ক্রিয়াই একেবারে স্থগিত হয় না। তাহা হইলেই তাহার মৃত্যু সংঘটিত হইল। বিরামকালে কোনও উদ্ভিদকে উৎপীড়িত করা উচিত নহে। অনেকে উদ্ভিদকে অসময়ে জাগরিত করিয়া ফল-ফুল-প্রদানে বাধ্য করিয়া পীড়া দেন। উক্ত পীড়ন ঔদ্যানিক ভাষায় Forcing নামে পরিচিত। পীড়ন হইলেও, সকল ঔদ্যানিক—সৌখীনও ব্যবসায়ী নির্ব্বিশেষে—তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন;—ইহা নিত্য ঘটনা। বিরামকালে উদ্ভিদের কোনও পাট, তদ্বির, বা পরিচর্য্যার প্রয়োজন হয় না; পারিপার্শ্বিক কোনও কারণে তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন না হয়, কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিলেই চলে।

উদ্ভিদের বিরামকালে উদ্যানকলা প্রদর্শন করিতে হইলে প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্ব করিতে হয়। এ সময়ে উদ্ভিদ-শরীরের সমস্ত ক্রিয়া ধীরভাব ধারণ করে বলিয়া মূলগণ অধিক রসশোষণ করিতে পারে না; পত্রগণ অধিক বায়ু আহরণ করিতে পারে না; ফলতঃ উদ্ভিদমধ্যে পরিপাক-ক্রিয়ার ক্ষিপ্রতা থাকে না। ইহাও দেখা যায়, বিরামকালে উদ্ভিদরস ঘন হইয়া যায়। কিন্তু বসন্তকালের সূত্রপাত হইতেই উদ্ভিদে যেই ক্রিয়াশীলতার আবির্ভাব হয়, অমনই উদ্ভিদের রস তরল ও লঘু হইয়া ক্ষিপ্রগতিতে প্রবাহিত হইতে থাকে। শীতকাল বিরামের

কাল।—এ সময়ে সকল বৃক্ষলতাদির ন্যায় খেজুর গাছও বিরাম লাভ করে। খেজুর রসও তখন ঘন হয়। কিন্তু অন্য সময়ে উহার রস পরিমাণে অধিক হয়, রসের তারল্য বৃদ্ধি পায়, মিষ্টতা অল্প হয়। পান্থপাদপ হইতে শীতকালে রস নির্গত করিলে দেখা যায়, তাহা অতিশয় ঘন আঠার ন্যায়, সুতরাং অপেয়। কিন্তু অপর ঋতুতে দেখিয়াছি, উহার রস তরল, সাধারণ জলের মত, এবং সুপেয়। ইহাই বিরামকাল। বিরামকালে উদ্ভিদ-শরীরের ক্রিয়াশীলতার হ্রাস হেতু পত্রনিচয় কোনও কাজ করে না, শাখা প্রশাখাদি হইতে পত্রপুঞ্জে রস ধাবিত হয় না, পত্রও বায়ুমণ্ডল হইতে বাষ্প গ্রহণ করে না। ক্রমে পত্রাবয়বে উদ্ভিদ-পোষণীয় যাহা কিছু থাকে, তাহা উদ্ভিদ শাখা পল্লবাদিতে সঙ্কুচিত করিয়া লয়। এইরূপে উদ্ভিদ ও পত্রের পরস্পর সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয়; পত্রদল বৃক্ষচ্যুত হইয়া ভূতলে স্থান পায়। উদ্ভিদের পত্রচ্যুতির ইহাই কারণ। পত্র ও উদ্ভিদে যতক্ষণ সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণ উভয়ের মধ্যে দৃঢ় বন্ধন থাকে। উভয়ে ছাড়াছাড়ি হয় না। এ অবস্থায় কোনও গাছ হইতে একটী পত্র ছিঁড়িলে ছিন্নস্থান হইতে রস নির্গত হয়; কিন্তু যে গাছের পাতা পাকিয়া গিয়াছে, কিংবা যে পত্রের বৃক্ষচ্যুত হইবার সময় সমাগত হইয়াছে, তাহা ছিঁড়িয়া লইলে রস নির্গত হয় না। বসন্তকালে গাছের পাতা ঈষৎ বায়ুর সঞ্চারে দিনরাত্রি খসিয়া পড়ে। সে সকল পত্রের বোঁটায় আদৌ আঠা বা রস থাকে না।

রাত্রিকালই বিধিনির্দ্দিষ্ট সুষুপ্তির সময়। সারাদিনের জীবন-সংগ্রামের পর, জীব ও উদ্ভিদ, উভয়েই নিদ্রার আশ্রয়ে কিছুক্ষণের জন্য দুঃখক্লেশশূন্য হয়; দিবসের স্মৃতি বিস্মৃত হয়। এইরূপে যে যত নিশ্চিন্তমনে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইতে পারে, সে তত অধিক শক্তি লাভ করিয়া পরদিনের জীবনসংগ্রামে নবোৎসাহে ও নবোদ্যমে প্রবেশ করিতে পারে। ইহা স্বাভাবিক নিদ্রা, অধিককালব্যাপী নহে।

ক্লান্তির পরেই বিরাম। তাহার পর নিদ্রা। শরীর স্নিগ্ধ ও উত্তেজনাহীন না হইলে নিদ্রাকর্ষণ হইতে পারে না। জাগরণজনিত ক্লান্তির কথা বলিয়াছি, বিরামের কথাও বলিয়াছি। বিরামের কাল অতীত হইয়া গেলে সুষুপ্তির কাল আইসে। আরামকাল অপেক্ষা সুষুপ্তিকালে জীবনীশক্তি অন্তর্নিবিষ্টভাবে দেহমধ্যে অবস্থান করে। মানুষের দীর্ঘকাল নিদ্রা হয় না। আমার মনে হয়, আমরা অতি বুভুক্ষু জীব বলিয়া তিন চারি মাস কাল একাদিক্রমে ঘুমাইতে পারি না। উদরেও এত স্থান নাই যে, দীর্ঘকালের আহার উদরস্থ করিয়া নিদ্রা যাইতে

পারি। উদ্ভিদগণ জাগরণাবস্থার পর বিরামকাল পায়। সুষুপ্তিকাল উহারই অন্তর্বর্ত্তী। এরূপ না হইলে বিরামের পর একবার জাগরিত হইয়া পুনরায় নিদ্রিত হইত। নির্দ্দিষ্টকাল অতীত হইলে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। সুতরাং জীব উদ্ভিদও নিজ নিজ অসাড়তা বর্জ্জন করিয়া সজীব ভাব ধারণ করে।

পৌষ মাঘ মাসে আমড়াগাছের সমুদয় পাতা ঝরিয়া যায়। এ জন্য কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। তখন কাণ্ডটী নিষ্পত্র ও শাখা-প্রশাখা-সার হইয়া জাগরণ-কালের প্রতীক্ষা করে। কিন্তু এ সময়ে উদ্ভিদের নিদ্রার আবেশ থাকে; পরন্তু জাগরণের অল্প সাড়া আসিয়া পঁহুছে। ঋতুপরিবর্ত্তনের ঈষৎ আমেজ পাওয়া যায়; দুই-একটা কোকিলের কুহুও শুনিতে পাওয়া যায়। এ সকলও যদি না হয়, একটা জিনিসের মধ্যে বেশ পরিবর্ত্তন দেখা যায়—তাহা রৌদ্রের বর্ণ,—সূর্য্যের বিষুব-রেখায় আগমন হেতু উত্তাপবৃদ্ধি। এই সকল প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনই পৃথিবীর জাগরণের হেতু। জাগরণ ও নিদ্রাভঙ্গের মধ্যবর্ত্তী অবসরকে স্বপ্নাবস্থা কিংবা তন্দ্রাবস্থা বলিলে ক্ষতি কি? স্বপ্নাবস্থায় চৈতন্য জাগ্রত থাকে, কিন্তু ক্রিয়াশক্তি তখনও অসাড় থাকে। এ সময়ে গাছের পাতাগুলি স্বতঃই খসিয়া পড়ে। উদ্ভিদের এমন সামর্থ্য থাকে না যে, তাহাদিগকে ধরিয়া রাখে। পত্রগণেরও এমন শক্তি থাকে না যে, স্ব স্ব স্থানে থাকিতে পারে।

এই অবস্থা অতীত হইলেই পৃথিবীর জাগরণ আইসে। সকল জীব জাগে, সকল উদ্ভিদ জাগে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

ভাস-বিরচিত 'কর্ণভারম্'।

ব্যাস-বাল্মীকি-বিরচিত মহাভারত রামায়ণ, উত্তরকালের কবিগণের দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্যের প্রধান উপজীব্য ছিল। মহাকবি ভাস যেমন রামায়ণ হইতে মূল সংগ্রহ করিয়া "প্রতিমা" ও "অভিষেক" নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন, তেমনই মহাভারতোক্ত নানা বিষয় স্মরণ করিয়া "পঞ্চরাত্র" নামক তৃতীয়াঙ্ক

নাটক ও "মধ্যম-ব্যায়োগ", "দূতবাক্য, দূতঘটোৎকচ", "কর্ণভার" ও "উরুভঙ্গ" নামক পাঁচখানি একাঙ্ক নাটকেরও রচনা করিয়াছেন। এই আটখানি ব্যতীত মহাকবি-ভাস-রচিত আরও পাঁচখানি রূপক প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, এই ত্রয়োদশ নাটকের আবিষ্কর্ত্তা ও প্রচারক ত্রিবাঙ্কুরের পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী। তিনি বহু গবেষণার ফলে, পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তির বলে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, এই নাটক-চক্রের প্রণেতা মহাকবি ভাস। এই নাটক-সমূহের ভাব, ভাষা, রচনা-ভঙ্গী, এবং তাহাতে স্পষ্টভাবে ও আকার-ইঙ্গিতে উল্লিখিত নানা-বিষয়ক ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করিলে, এগুলি যে গুপ্ত-যুগের কবি কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকে উল্লিখিতনামা মহাকবি ভাসের লেখনীপ্রসূত, তদ্বিষয়ে সংশয়ের কারণ থাকিতে পারে না। প্রথিত-নামা সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য মনীষিগণও তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও দক্ষিণাপথের ভট্টনাথ-স্বামী নামক এক জন পণ্ডিত বিগত খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যার "Indian Antiquary"—নামক পত্রিকায় এই নাটকচক্রের রচয়িতা ভাসকে "ভাসাভাস"-রূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য কতকগুলি নিরর্থক যুক্তির অবতারণা করিয়া, ভাস-নাটক-চক্রের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এ স্থলে আমরা সে সম্বন্ধে কোনও বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভাস-রচিত "কর্ণভারম্" নামক একাঙ্ক নাটকখানির আলোচনা করিব।

মহাভারতের বনপর্ব্বের ২৯৯—৩০৯ম অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়গুলি স্মরণ করিয়া মহাকবি ভাস এই ক্ষুদ্র নাটকখানির রচনা করিয়াছেন। ভারতীয় যুদ্ধের পূর্ব্বে, ব্রাহ্মণ-বেশে ভিক্ষার্থ আগত দেবরাজ ইন্দ্রকে, পরমদাতা মহাবীর কর্ণ, স্বজনক তপনদেব কর্ত্তৃক পূর্ব্ব হইতে নিবারিত হইয়াও, নিজ কর্ণ হইতে নির্মুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ-প্রার্থিত কুণ্ডলদ্বয় ও নিজ "শরীরজ" কবচ প্রদান করিয়াছিলেন।—এই কথাই এই নাটকের প্রধান কথা।

যদি নাটকাবলীর নমস্কার বা নান্দী-শ্লোক হইতে কবির ইষ্ট-দেবতা নির্দ্দিষ্ট করা ঠিক হয়,—তাহা হইলে মহাকবি ভাসকে পরম-বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে। নাটক-চক্রের নমস্কার-শ্লোকে ভাস "কেশব", "নারায়ণ", "উপেন্দ্র", "দামোদর", "বল-হস্ত" [বলরামের হস্ত] "শ্রীমার" প্রভৃতি বৈষ্ণবী দেবতার প্রতি ভক্তি-ভাব-প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। "কর্ণভার"-নাটকের আদ্য শ্লোকেও তিনি "শ্রীধরের" [বিষ্ণু] উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা

অন্যত্র ["ভারতবর্ষে"র—১৩২১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন-সংখ্যায়] নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম যে, ভাস-নাটক-চক্রে সর্ব্বসমেত বিষ্ণুর সাতটি অবতারের কথা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—যথা, নারায়ণ [কৃত-যুগের অবতার], বরাহ, নৃসিংহ, মোহিনী, বামন, রাম ও দামোদর। দৈত্যবল-হন্তা, করজ-কুলিশ-পালী দ্বারা দৈত্যপতির [হিরণ্যকশিপুর] বক্ষো-বিদারণকারী, দৃষ্টিপাতে নর-নারীর, দনুজ-সুপর্ণের, এমন কি, পাতাল-লোকেরও ভ্রান্তির উৎপাদক—সেই নর-সিংহরূপী ["নর-মৃগপতি-বর্ষ্মা"] শ্রীধর [বিষ্ণু] জগতের মঙ্গলবিধান করুন—ইহাই কর্ণভার-নাটকের নমস্কার-শ্লোকের তাৎপর্য্য।

কিরূপে কুন্তিভোজ নামক নরপতির নন্দিনী পৃথা [বা কুন্তী] অতিথিরূপী ব্রাহ্মণকে সৎকার দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া, ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত মন্ত্র দ্বারা দেবতামাত্রকে আত্মবশে আনয়ন করিতে সমর্থ হইবার বর লাভ করিয়াছিলেন, কিরূপে সেই মন্ত্রগ্রামের বলাবল পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি আদিত্যমণ্ডলের দিকে দৃষ্টি-পাতপূর্ব্বক মণ্ডলস্থিত দিব্যদর্শন, কবচাবৃত-তনু ও কুণ্ডল-বিভূষিত দেবতাকে ["তস্যা দৃষ্টিরভূদ্দিব্যা সাপশ্যদ্দিব্যদর্শনম্। আমুক্তকবচং দেবং কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতম্॥" বনপর্ব্ব; ৩০৫।৬] আহ্বান করিয়া তাঁহা হইতে কন্যাবস্থায়ই "কবচী" ও "কুণ্ডলী" পুত্র কর্ণকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, আবার কিরূপে সেই জাত-মাত্র গর্ভ মঞ্জূষায় [পেটিকায়] নিহিত ও অশ্বনদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া, পরে চর্ম্মন্বতী ও যমুনা নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া, অবশেষে গঙ্গা-নদী দিয়া "সূত-বিষয়" চম্পানগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এবং কিরূপে ধৃতরাষ্ট্রের মিত্র অধিরথ-নামক সূত অপুত্রা রাধা-নাম্নী ভার্য্যার সহিত জাহ্নবীতে স্নানার্থ যাইয়া, সেই মঞ্জুষা-স্থিত, হেমবর্ম্মধর, কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ড শিশুকে প্রাপ্ত হইয়া, ["অনপত্যস্য পুত্রোঽয়ং দেবৈর্দত্তো ধ্রুবং মম।"] তাহাকে দেব-দত্ত মনে করিয়া লালনপালন করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত কথা মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে অধিরথের পালিত পুত্র কর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, সূত তাঁহাকে দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য হস্তিনাপুরে ["বারণ-সাহ্বয়"-পুরে] প্রেরণ করেন, সেখানে তিনি দ্রোণ, কৃপ ও পরশুরামের নিকট অস্ত্রগ্রাম শিক্ষা করিয়া যশোলাভ করেন, এবং ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনের সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পণ্ডুতনয়গণের বিপ্রিয়াচরণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, এবং ফাল্গুনীর [অর্জ্জুনের] সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নিত্যই আশান্বিত থাকেন। প্রথম সাক্ষাৎকার হইতেই কর্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পরের বিজয় স্পর্দ্ধা

করিতেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরও তাঁহাকে কুণ্ডলী ও বর্ম্ম-সমন্বিত দেখিয়া তাঁহাকে সমরে অবধ্য মনে করিয়া পরিতপ্ত হইতেন।

কর্ণের জনক তপন-দেব পূর্ব্ব হইতেই জানিয়াছিলেন যে, পাণ্ডুপুত্রদিগের হিত-সাধনে রত হইয়া, ব্রাহ্মণবেশে কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া, কর্ণের "সহজ" [জন্ম-সিদ্ধ] কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ ভিক্ষা করিবেন। পিতা পুত্রের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে জানিতেন। কর্ণ কখনও নিজে যাচ্ঞা করিতে জানিতেন না—দান করাই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। ব্রাহ্মণকে প্রযাচিত বস্তু প্রত্যাখ্যান করা তাঁহার শীল-বিরুদ্ধ কার্য্য ছিল। বিশেষতঃ, যখন তিনি মধ্যাহ্নে স্নানান্তে সলিলোত্থিত হইয়া অঞ্জলিবদ্ধ-হস্তে দিবাকরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই দেবতার স্তব করিতেন, তখন কর্ণের কিছুই দ্বিজাতিকে অদেয় থাকিত না, এবং ব্রাহ্মণগণও বিত্তলাভের আকাঙ্ক্ষায় সেই সময়েই কর্ণের সমীপে অর্থিরূপে উপস্থিত হইতেন। দেবরাজ ইন্দ্রও কবচ-কুণ্ডলের জন্য সেই সময়েই উপস্থিত হইবেন, সূর্য্যদেব তাহাও জানিতেন। সেই জন্য তিনি পুত্র-স্নেহপরবশ হইয়া রাত্রিযোগে স্বপ্নে কর্ণকে দর্শন দিয়া তাঁহাকে সাবধান করিবার জন্য বলিয়া দিয়াছিলেন,—"তোমার দানশক্তি পরিজ্ঞাত হইয়াই শক্র [পাণ্ডুতনয়-দিগের হিতকামনায়] তোমার নিকট কুণ্ডল ও কবচ ভিক্ষা করিয়া তোমাকে হীনশক্তি করিতে চাহিবেন; কিন্তু তুমি অমৃতোত্থ এই দুই বস্তু ব্যতীত, অন্য যাহা কিছু—রত্ন, স্ত্রী, ধেনু, বিত্ত ইত্যাদি শক্রকে দিতে চাহিও। মনে রাখিও—

"যদি দাস্যসি কর্ণ ত্বং সহজে কুণ্ডলে শুভে।
আয়ুষঃ প্রক্ষয়ং গত্বা মৃত্যোর্বশমুপৈষ্যসি॥
কবচেন সমাযুক্তঃ কুণ্ডলাভ্যাং চ মানদ।
অবধ্যস্ত্বং রণেঽরীণামিতি বিদ্ধি বচো মম॥" [বনপর্ব্ব ; ২৯৯। ১৮। ১৯]

"যদি তুমি তোমার জন্মলব্ধ এই শুভ কুণ্ডলদ্বয় প্রদান কর, তাহা হইলে তোমার আয়ুঃক্ষয় হইবে, এবং তুমি মৃত্যুর বশগামী হইবে।—আর, হে মানদ, যদি তুমি কবচ-কুণ্ডল-যুক্ত থাকিতে পার, তাহা হইলে তুমি রণক্ষেত্রে অরির অবধ্য থাকিবে।" কর্ণ উপদেশকারী দেবতাকে সূর্য্য বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন, এবং তাঁহাকে অনুনয়বচনে বলিলেন যে, তিনি যেন তাঁহাকে স্বব্রত হইতে ভ্রংশিত না করেন। "নাস্ত্যদেয়ং কথঞ্চন"—ইহাই যাঁহার চরিত্রের মূলসূত্র, দ্বিজশ্রেষ্ঠে আত্মপ্রাণ দান করিবার

জন্যও যিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন, যিনি যশোযুক্ত লোক-সম্মত মরণকেই উপযুক্ত মরণ মনে করিতেন, যিনি সংগ্রামে নিজ দেহ বলি দিয়া সুদুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়া শক্রজয়পূর্ব্বক যশোভাজন হইতে চাহিতেন, সেই কর্ণ কি কখনও ব্রাহ্মণবেশে আগত হইলে বল-বৃত্র-হন্তা শক্রকে "শরীরজ" কবচ ও কুণ্ডল প্রদান করিতে বিমুখ হইতে পারেন? নিরুপায় দেখিয়া তপন দেব কর্ণকে পুনরায় বলিলেন—

ন তু ত্বামর্জ্জুনং শক্তঃ কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতম্।
বিজেতুং যুধি যদ্যস্ত স্বয়মিন্দ্রঃ সখা ভবেৎ ॥
তস্মান্ন দেয়ে শক্রায় ত্বয়ৈতে কুণ্ডলে শুভে।
সংগ্রামে যদি নির্জ্জেতুং কর্ণ কাময়সেঽর্জ্জুনম্।" [বনপর্ব্ব ; ৩০০।১৭।১৮]

"যুদ্ধে স্বয়ং ইন্দ্রও যদি অর্জ্জুনের সখা হন, তথাপি তুমি যদি কুণ্ডলযুক্ত থাক, তাহা হইলে, অর্জ্জুন তোমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব, হে কর্ণ, যদি সংগ্রামে অর্জ্জুনকে নির্জ্জিত করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, শক্রকে এই কুণ্ডলদ্বয় দান করিও না।" কিন্তু কর্ণ কখনও মৃত্যুকে ভয় করিতেন না—দ্বিজাতিকে জীবনদান করিতেও কখনও তিনি পরাঙ্মুখ হইবেন না। জামদগ্ন্য [পরশুরাম] ও দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন বলিয়া অর্জ্জুনকে সহজেই রণে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবেন, এইরূপ আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া, তিনি সূর্য্যদেবকে প্রসন্ন করিলেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে বহু অনুনয়ের পর অনুজ্ঞা লইলেন যে, প্রয়োজন হইলে তিনি বজ্রীকে আত্ম-প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিবেন। অবশেষে তপন দেব তাঁহাকে বলিয়া গেলেন যে, তিনি যেন কুণ্ডল ও কবচের বিনিময়ে ইন্দ্র হইতে শক্র-বিনাশসমর্থ অমোঘ শক্তি চাহিয়া লন; সেই শক্তি দ্বারাই তিনি রণে রিপুকে নাশ করিতে সমর্থ হইবেন। যথাসময়ে ব্রাহ্মণ-ছদ্মে শক্র "রাধেয়" কর্ণের নিকট ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন। "আধিরথি" কর্ণ ছদ্মী দেবরাজের মনোভাব না জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে প্রথমতঃ প্রমদা, গ্রাম, গোকুল প্রভৃতি প্রদান করিতে চাহিলেন। কিন্তু দেবরাজ সে সমস্ত কিছুই লইতে না চাহিয়া, "এই সমস্ত বস্তু অন্য অর্থীকে দিও"—এই বলিয়াই তৎক্ষণাৎ এইরূপ ভিক্ষা করিলেন—

"যদেতৎ সহজং বর্ম্ম কুণ্ডলে চ তবানঘ।

"যদি তুমি সত্যব্রত হও, তাহা হইলে, হে অনঘ, তোমার এই সহজ বর্ম্ম ও কুণ্ডলদ্বয় গাত্র হইতে উৎকরণ করিয়া আমাকে প্রদান কর।" কর্ণ প্রথমতঃ এই দুই বস্তু প্রদান করিতে একটু অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন,—পাকশাসন অন্য কিছুই লইতে চাহিলেন না। কর্ণ ভিক্ষার্থীকে দেবরাজ বলিয়া চিনিতে পারিয়া, এই দুই বস্তুর পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট অমোঘ শক্তি চাহিলেন। শক্তি-অস্ত্র প্রদান করিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে ইহাও বলিয়া গেলেন যে, এই শক্তির প্রয়োগ দ্বারা তিনি যে বিশিষ্ট রিপুর বিনাশসাধন করিতে চাহেন, তিনি নারায়ণ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইবেন। তাহা সত্ত্বেও কর্ণ কেবল এক রিপু-বধের জন্য ইন্দ্র হইতে অমোঘ শক্তি গ্রহণ করিয়া, স্বগাত্র হইতে ছিন্ন করিয়া "সহজ" কবচ ও কর্ণ হইতে উন্মোচন করিয়া অমৃতোত্থ কুণ্ডলদ্বয় ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন।

এই মহাভারতীয় কথা অবলম্বন করিয়া মহাকবি ভাস "কর্ণভার" নাটকের রচনা করিয়াছেন। তাহাতে সূত কর্ণের দান-শীলতা ও গুরুভক্তির পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্য দ্বারা লোকচরিত্রে শিক্ষদান কবির প্রধান কার্য্য। ভাসের নাটকচক্রে এই কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অভিনয়ের উপযোগী করিবার জন্য কবি উপরি-উল্লিখিত ভারতীয় কথার কোন্ অংশে কতটুকু অনৈক্য ও বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিত নাটকীয় কথাবস্তু হইতেই অনুমিত হইতে পারিবে।

কথাবস্তু।

যুদ্ধকাল উপস্থিত। উভয় পক্ষের রাজসিংহগণ গজারূঢ়, হয়ারূঢ় ও স্যন্দনস্থ হইয়া সিংহনাদ করিতেছেন। দুর্য্যোধনও সমরাঙ্গনে যাইবার জন্য প্রস্তুত। তিনি ভটমুখে অঙ্গরাজ কর্ণকে সন্নদ্ধ হইয়া আসিবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন। অঙ্গেশ্বর সমর-পরিচ্ছদ-পরিধৃত হইয়া, মদ্রাধিপতি শল্যকে রথ-সারথি-রূপে লইয়া, যুদ্ধের জন্যই অগ্রসর হইতেছিলেন। পূর্ব্বপরীক্ষিতপরাক্রম কর্ণের মনে কেন এই যুদ্ধের পূর্ব্বে অভূতপূর্ব্ব হৃদয়পরিতাপ অনুভূত হইতেছিল, তাহার কারণ বুঝিতে পারা যাইতেছিল না। নিদাঘ-সময়ে স্বভাব-রুচিমান সূর্য্যদেব মেঘাবরুদ্ধ হইলে যেরূপ পরিদৃষ্ট হন, সমরাগ্রযায়ী অত্যুগ্রদীপ্তিমান কর্ণও পরিতাপ-তপ্ত হইয়া তদ্রূপই লক্ষিত হইতেছিলেন। মহাযুদ্ধে কত যোধের, কত অশ্বের, কত বারণের, কত রথের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অন্যোন্য-প্রযুক্ত অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। কর্ণের মনে সর্ব্বদাই বিশ্বাস ছিল যে,

তাঁহার শরপথের লক্ষ্যীভূত হইলে শত্রু নরপতিগণ সজীবশেষ প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবেন না; যুদ্ধে তিনি যেন ক্রুদ্ধ যমরাজের ন্যায় বিক্রমশালী—কুরুদিগের হিতেচ্ছু হইয়া তিনি আত্মপরাক্রমের কত পরিচয় দিবেন। কিন্তু অমিতশক্তিশালী কর্ণের মনেও আজ কি এক বিধুরতা উপস্থিত। তাঁহার স্মরণ হইল, তিনি কুন্তীগর্ভজাত—কিন্তু সূত-পত্নী রাধার প্রতিপালিত বলিয়া বিশ্রুত। আজ কুরুদিগের প্রিয়েচ্ছু হইয়া তিনি যাঁহাদের বিরুদ্ধে সমর-প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, সেই যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব তাঁহারই সহোদর—কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মাতা কুন্তীও তাঁহাকে ভ্রাতৃবর্গের সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিষয়ই তাঁহার মানসিক কষ্টের কারণ। কর্ণ আজ রথ-চালক মদ্ররাজ শাল্যের নিকট ভৃগুবংশকেতু ক্ষত্রান্তক পরশুরাম হইতে তিনি কিরূপ নিরর্থ অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন যে, একদা তিনি জামদগ্ন্য-সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। পরশুরাম আশীর্ব্বচনের পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কো ভবান্ কিমর্থমিহাগতঃ?"—"তুমি কে? কেনই বা এখানে আসিয়াছ?" কর্ণ উত্তর করিলেন যে, অখিল অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য তিনি তৎসমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। জামদগ্ন্য ক্ষত্রিয়বংশ্যগণের সহিত পূর্ব্ববিরোধ আছে বলিয়া, কখনও ক্ষত্রিয়কে অস্ত্রোপদেশ করিতেন না; কেবল ব্রাহ্মণকেই অস্ত্র শিক্ষা দিতেন। কিন্তু কর্ণ,

"নাহং ক্ষত্রিয় ইত্যস্ত্রোপদেশং গ্রহীতুমারব্ধঃ।"

"আমি ক্ষত্রিয় নহি", এই বলিয়া অস্ত্রোপদেশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কতিপয় দিবস অতিক্রান্ত হইলে, একদিন কর্ণ ফল-মূল-সমিৎ-কুশ-কুসুমাহরণের জন্য গুরুর সহিত বনভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। বন-ভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়া গুরুদেব পরশুরাম শিষ্য কর্ণের অঙ্কে মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রিত হইলেন। কর্ণ শল্যকে এই সময়ের একটি ঘটনা বলিতে লাগিলেন—

"কুন্তে বজ্রমুখেন মাম কৃমিণা দৈবাগ্নযোরুদ্বরে
নিদ্রাচ্ছেদভয়াদসহ্যত গুরোর্ধৈর্য্যাৎ তদা বেদনা।
উত্থায় ক্ষতজাপ্লুতঃ স সহসা রোষানলোদ্দীপিতো
মুক্ত! মাং চ শশাপ কাল-বিফলাস্ত্রাণি তে সন্ত্বিতি।"

"দৈবাৎ আমার উরুযুগল বজ্রমুখ-নামক কৃমি-কর্ত্তৃক কর্ত্তিত হইল। গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হইবে, এই ভয়ে ধৈর্য্যসহকারে আমি তখন বেদনা সহ্য করিলাম। রুধিরাপ্লুত হইয়া তিনি [গুরুদেব] সহসা উত্থিত হইলেন, এবং রোষানলে উদ্দীপিত হইয়া আমাকে [ক্ষত্রিয় বলিয়া] চিনিতে পারিয়া শাপ দিলেন—'তোমার সমস্ত অস্ত্র কাল-বিফল হইবে'।" কর্ণ শল্যকে বলিলেন যে, আজ তাঁহার অস্ত্রপরীক্ষার দিন উপস্থিত! বাস্তবিকই অদ্য কর্ণের অস্ত্রগ্রাম নির্বীর্য্য লক্ষিত হইতেছিল। দীনভাবাপন্ন তুরঙ্গগণ বিবশাঙ্গ হইয়া মুহুর্মুহু স্খলিত হইতেছে—মদবারিগন্ধী গজগণও রণক্ষেত্র হইতে নিবর্ত্তিত হইতেছে—শঙ্খদুন্দুভি সকলও নিঃশব্দ। সারথি শল্যের হৃদয়ে যেন বিষাদ-শল্য প্রবেশ করিল। কিন্তু মহাবীর কর্ণ—

"হতোঽপি লভতে স্বর্গং জিত্বা তু লভতে যশঃ।
উভে বহুমতে লোকে নাস্তি নিষ্ফলতা রণে।"

"রণে নিষ্ফলতা নাই; কারণ, [যোদ্ধা] হত হইলেও স্বর্গ লাভ করেন—জয়ী হইলে যশোলাভ করেন—লোকে এই উভয় বস্তুই বহুমত।"—এই বলিয়া শল্যকে অশ্বস্ত করিলেন। কাম্বোজ-কুল-জাত, সুপর্ণ-সমান-বেগ অশ্বকুলের পরাক্রম স্মরণ করিয়া কর্ণ ভাবিলেন যে, তাহাদের সাহায্যে গোব্রাহ্মণের, পতিব্রতার, রণে অপরাঙ্মুখ যোধপুরুষের ও প্রাপ্তকাল নিজের অক্ষয়ের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। তিনি তখন প্রসন্ন হইয়া শল্যকে এই বলিয়া সাহস দিলেন যে, তিনি পাণ্ডবগণের অসহ্য সমরমুখে প্রবেশ করিয়া "প্রথিতগুণগণাঢ্য" ধর্ম্মরাজকে বন্ধ করিয়া, নিজ শরবর-বেগে অর্জ্জুনকে নিপাতিত করিবেন। যেখানে অর্জ্জুন অবস্থিত আছেন, সেইখানে রথচালনার জন্য তিনি শল্যকে আদেশ করিলেন। উভয়ে রথারোহণ করিবেন, এমন সময়ে এক বিঘ্ন উপস্থিত। এক বিপ্র ধীর-মধুর-স্বরে দূর হইতে বলিলেন—

"ভো কন্ন মহত্তরং ভিক্খং যাচেমি।"

"হে কর্ণ, মহত্তর ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতেছি।" অতি প্রভাবশালী দ্বিজবরের এই আহ্বান শুনিয়া কর্ণের অশ্বগণও যেন অবশাঙ্গ অবস্থায় উৎকর্ণ হইয়া স্তিমিত-নয়নে "বলিত-গ্রীবার্পিতানন" হইয়া, যাইতে যাইতে চিত্রার্পিতাঙ্গের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল। কর্ণ স্বয়ং বিপ্রকে আহ্বানপূর্ব্বক অতিথিজ্ঞানে তাঁহাকে "ভগবন্" বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"যাতঃ কৃতার্থগণনামহমদ্য লোকে রাজেন্দ্রমৌলিমণি-রঞ্জিতপাদপদ্মঃ।
বিপ্রেন্দ্র-পাদরজসা তু পবিত্র-মৌলিঃ কর্ণো ভবন্তমহমেষ নমস্করোমি।"

"আমার যে পাদপদ্ম রাজেন্দ্রগণের মস্তক-মণি-[রশ্মিতে] রঞ্জিত হয়, কিন্তু অদ্য যাহার নিজ মস্তক বিপেন্দ্রের পাদরজঃস্পর্শে পবিত্র হইল, সুতরাং সে আমি অদ্য কৃতার্থগণের সঙ্গে গণনীয় হইলাম, সেই আমি—কর্ণ আপনাকে প্রণাম করিতেছি।" ব্রাহ্মণরূপী প্রত্যভিবাদনে কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া প্রথমতঃ মনে মনে ভাবিতেছেন—

"যদি দীর্ঘায়ু ভবেতি বক্ষ্যে দীর্ঘায়ুর্ভবিষ্যতি। যদি ন বক্ষ্যে, মূঢ় ইতি মাং পরিভবতি। তস্মাদুভয়ং পরিহৃত্য কিন্নু খলু বক্ষ্যামি। ভবতু—দৃষ্টম্।"

যদি দীর্ঘায়ুঃ হও বলি—[কর্ণ] দীর্ঘায়ু হইবেন; যদি কিছুই না বলি, তাহা হইলে মূঢ় বলিয়া আমাকে পরাভূত করিবেন। এই উভয় কল্প পরিহার করিয়া কি বলি? হউক, ঠিক করিয়াছি।" এইরূপ ভাবিয়া তিনি কর্ণকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—

"ভো কন্ন সুয্যো বিঅ, চন্দে বিঅ, হিমবন্তে বিঅ, সাগলে বিঅ, চিঠ্ঠতু দে জসো।"

"হে কর্ণ, সূর্য্যের ন্যায়, চন্দ্রের ন্যায়, হিমালয়ের ন্যায়, সাগরের ন্যায় তোমার যশঃ [অটল] থাকুক।" কর্ণও প্রাণ অপেক্ষা যশকেই অধিকতর মূল্যবান মনে করিতেন। তিনি একবার বিপ্রকে এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কেন তিনি তাঁহাকে "দীর্ঘায়ুর্ভব" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন না? কিন্তু তিনি পুনরায় ভাবিলেন যে, নশ্বর দেহ হত হইলেও প্রজাপালন-গুণ-প্রণীত যশঃ অবিনশ্বরভাবে চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। সেই জন্য তিনি ব্রাহ্মণের যশোবিষয়ক আশীর্ব্বাদকেই শোভন মনে করিয়া বলিলেন—

"ধর্ম্মো হি যত্নৈঃ পুরুষেণ সাধ্যো
ভুজঙ্গজিহ্বাচপলা নৃপশ্রিয়ঃ।
তস্মাৎ প্রজাপালনমাত্রবুদ্ধ্যা
হতেষু দেহেষু গুণা ধরন্তে।"

"সর্ব্বপ্রযত্নে পুরুষের ধর্ম্মসাধন করা বিধেয়; কারণ, রাজলক্ষ্মী সর্পজিহ্বার ন্যায় চঞ্চলা। অতএব, প্রজাপালন-রূপ ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে যে, হত হইলেও গুণ [চিরকাল] বর্ত্তমান থাকে।"

কর্ণ অতিথিরূপী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি ইচ্ছা করেন; এবং তিনি নিজে অতিথিকে কি দিতে পারেন? বিপ্র কেবল বলিলেন যে, তিনি একটি মহত্তর ভিক্ষা যাচ্ঞা করেন। কর্ণ তাহাই দিতে চাহিয়া স্বকীয় বিভবের বর্ণনা করিলেন। তাঁহার তরুণ ধেনু সকল অমৃততুল্য ক্ষীরধারা বর্ষণ করে; সেই

পবিত্র অর্থিজনপ্রার্থনীয় ধেনুকুলের শৃঙ্গগুলি কনকালঙ্কৃত করিয়া তিনি অতিথিকে দিতে চাহিলেন। কিন্তু অতিথি মুহূর্ত্তে ক্ষীরপান করিয়া নিঃশেষিত করিবেন বলিয়া গো-সহস্র গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তাহার পর কর্ণ রাজশ্রীর প্রধান সাধন, সূর্য্যাশ্ব-সপ্তক-সমান, পবনবেগ-সঙ্কলনশীল, যুদ্ধ-পরীক্ষিতবল, কাম্বোজ-দেশ-জাত বহু সহস্র বাজিকুল দান করিতে চাহিলেন। কিন্তু অতিথি মুহূর্ত্তে সেই অশ্ব সকলে আরোহণ করিয়া ফেলিবেন, তাহাদের দ্বারা প্রয়োজনানন্তর সাধিত হইবে না বলিয়া, সেগুলি লইতে স্বীকার করিলেন না। তৎপরে কর্ণ পর্ব্বতাকার, মেঘ-গম্ভীর-ঘোষ, কপোলস্রাবি-মদলেখা-সমন্বিত, সমরে রিপু-বিমর্দ্দনশীল বারণ-বৃন্দ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিতে চাহিলেন;—কিন্তু অতিথি ব্রাহ্মণ মুহূর্ত্তে গজকুলেও আরোহণ করিয়া ফেলিবেন বলিয়া তাহাও লইতে ইচ্ছা করিলেন না। কর্ণ অপর্য্যাপ্ত কনক দিতে চাহিলে, ব্রাহ্মণ-বেশী শক্র প্রথমতঃ তাহা লইবার ভান করিয়াও পরে তাহা লইতে অস্বীকার করিলেন। কর্ণ জয় করিয়া পৃথিবী দান করিতে চাহিলেন; ব্রাহ্মণ পৃথিবী লইয়া কি করিবেন? দান-শূর কর্ণ পূর্ব্বার্জ্জিত নিজ-পুণ্যফল পর্য্যন্ত বিপ্রকে দিতে চাহিয়া বলিলেন—"তেন হি অগ্নিষ্টোমফলং দদামি।"—"তাহা হইলে আমার অগ্নিষ্টোমফল দিতে পারি।" ব্রাহ্মণ তাহাও লইতে চাহিলেন না। "তেন হি মচ্ছিরো দদামি"—"তাহা হইলে আমার নিজ মস্তক [কাটিয়া] দিতে পারি", কর্ণ এরূপও বলিলেন। ব্রাহ্মণ "অবিহা! অবিহা!" বলিয়া তাহা লইতে অস্বীকার করিলেন। এবার কর্ণের কিঞ্চিৎ মতিভ্রম ঘটিল। তিনি অর্থীকে প্রসন্ন হইতে অনুরোধ করিয়া, অদেয় বস্তুও দান করিতে উদ্যোগী হইলেন। তিনি বলিলেন—

"অঙ্গৈঃ সহৈব জনিতং মম দেহরক্ষা
দেবাসুরৈরপি ন ভেদ্যমিদং সহাস্ত্রৈঃ।
দেয়ং তথাপি কবচং সহ কুণ্ডলাভ্যাং
প্রীত্যা ময়া ভগবতো রুচিতং যদি স্যাৎ॥"

"যদি ভগবান অতিথির রুচি হয়, তাহা হইলে আমি দেহের রক্ষারূপে আমার অঙ্গের সহিত উৎপন্ন হইলেও, এবং সশস্ত্র দেবাসুর কর্ত্তৃক তাহা অভেদ্য হইলেও, প্রীতির সহিত আমার এই কবচ সকুণ্ডল দান করিতে পারি।" শক্র সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "দেহি দেহি!"—"তাহাই দাও, তাহাই দাও।" কর্ণ ব্রাহ্মণের আবেগ দেখিয়া ভাবিলেন যে, হয়ত ইহা কপট-বুদ্ধি কৃষ্ণেরই চক্রান্ত,—

তথাপি যাহা দান করিবেন বলিয়া একবার মুখে উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহার জন্য আর অনুশোচনা করিলেন না; প্রতিজ্ঞাত দেয় বস্তুদ্বয় দিতে চাহিলেন। মদ্ররাজ শল্য তাহা দিতে বারণ করিলেন, কিন্তু যাঁহার আদর্শ—

"শিক্ষা ক্ষয়ং গচ্ছতি কালপর্য্যয়াৎ
সুবদ্ধমূলা নিপতন্তি পাদপাঃ।
জলং জলস্থানগতং চ শুষ্যতি
হুতং চ দত্তং চ তথৈব তিষ্ঠতি॥"

"কালক্রমে শিক্ষা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, উত্তমরূপে বদ্ধমূল বৃক্ষ সকলও নিপতিত হয়, জল জলস্থানে [সমুদ্রে] যাইয়াও শুষ্ক হয়; কিন্তু হোম ও দান সেইরূপে ["তথৈব"] [অক্ষয় হইয়া] বর্ত্তমান থাকে।" যাহাতে অর্জ্জুন জয়লাভ করিতে পারেন, দেবতারা তজ্জন্য যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাই ইন্দ্র দ্বারা অনুষ্ঠিত হইল। দূর হইতে কর্ণ ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ লক্ষ্য করিবার জন্য ইন্দ্র ঐরাবতে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। শল্য অঙ্গরাজকে বলিলেন যে, তিনি শক্র কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইলেন। কর্ণের বিপরীত উত্তর; তিনি বলিলেন, যে, শক্রই তাঁহার দ্বারা বঞ্চিত হইলেন; কারণ, যে ইন্দ্র দ্বিজগণ কর্ত্তৃক বহুযজ্ঞে আহুতিদানে তর্পিত, যাঁহার সহায় মহাপরাক্রমশালী অর্জ্জুন, এবং যিনি দানব-বিক্রমনাশী, সেই মহাবীর পাকশাসন অদ্য তাঁহার নিকট হইতে প্রার্থিত বস্তু লাভ করিয়া 'কৃতার্থ' হইলেন। কুণ্ডল-কবচ গ্রহণ করিয়া পুরন্দর অনুতপ্ত হইয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক ব্রাহ্মণবেশী দূত দ্বারা কর্ণসমীপে একটি অস্ত্র পাঠাইয়া দিলেন। অস্ত্রের মাহাত্ম্য এই যে, পাণ্ডবগণের মধ্যে এক-পুরুষ-বধে ইহা অমোঘ—অস্ত্রের নাম "বিমলা শক্তি"। কর্ণ প্রথমতঃ দানের প্রতিগ্রহ করিতে চাহিলেন না। পরে ব্রাহ্মণবচন অনতিক্রমণীয় মনে করিয়া অস্ত্র লইতে স্বীকার করিলেন। দূত বলিয়া গেলেন যে, স্মরণমাত্রই অস্ত্র কর্ণের সমীপে উপস্থিত হইবে। দেবরাজের দূত চলিয়া গেলেন। আজ কৃষ্ণের নয়—অর্জ্জুনের শঙ্খধ্বনি প্রলয়সাগরনিনাদ-তুল্য শ্রুত হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠিরের পরাজয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া পার্থ যথাবল যুদ্ধ করিবেন। অঙ্গেশ্বর কর্ণও মদ্রাধিপতি শল্যকে, যেখানে অর্জ্জুন অবস্থিত, সেইখানে রথচালন করিবার আদেশ দিলেন।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস।

[কলিকাতার চৈতন্য লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত অনরেবল এফ. জে. মোনাহান কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ]

ধর্ম্মপাল, কান্যকুব্জবিজয় ও রাষ্ট্রীয় প্রতিপত্তি ;—যুদ্ধবিগ্রহ ও তাহার ফলাফল ;—ধর্ম্মপালের রাজত্বকাল ও সমসাময়িক কান্যকুব্জ ;—দেবপাল ও তাঁহার প্রতিপত্তি ;—দেবপালের সহিত জয়পালের সম্বন্ধ ;—বাদলস্তম্ভের গুর্জ্জররাজ ও দ্রাবিড়রাজ নিরূপণ ;—কলচুরি রাজবংশের শাসনলিপি ;—শাসনোক্ত কৃষ্ণরাজ ভোজ ও কাম্বোজ ;—ভাগলপুর-তাম্রশাসন ও ধর্ম্মমঙ্গল ;—প্রথম বিগ্রহপাল ;—নারায়ণপাল ;—রাজ্যপাল ;—দ্বিতীয় গোপাল ;—দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ;—প্রতীহার রাজগণের আলোচনা, রাষ্ট্রকূটরাজগণের আলোচনা ;—প্রতীহার-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ;—পালরাজগণের অধিকারভূমি, উত্তর বাঙ্গালায় কাম্বোজ-আক্রমণ ;—মহীপাল,—পালরাজগণের রাজত্বকাল।

গোপাল পরলোকে গমন করিলে, ধর্ম্মপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত গৌড়রাজমালায় ধর্ম্মপালের রাজ্যপ্রাপ্তির কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন শাসন-প্রদত্ত প্রমাণের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশদ আলোচনা আছে; তাহার স্থূল ও মূল কথা এই যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষে অথবা নবম শতাব্দীর প্রথমে তিনি রাজ্যলাভ করেন। ধর্ম্মপালের রাজত্বকালের বিশিষ্ট ঘটনা—কান্যকুব্জ-বিজয়।

ধর্ম্মপাল।

কেবল বাঙ্গালার পাল-রাজবংশের শাসনলিপি নহে, পরন্তু দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট-রাজবংশের শাসনলিপি ও পশ্চিম-ভারতের প্রতীহার-রাজবংশের শাসনলিপি,—বহুসংখ্যক রাজকীয় শাসনলিপি,—সমস্বরে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিয়াছে যে,—ধর্ম্মপাল কান্যকুব্জ-রাজ ইন্দ্রায়ুধকে রাজ্যচ্যুত করিয়া চক্রায়ুধকে তদীয় সিংহাসনে স্থাপিত করেন, এবং এই চক্রায়ুধ তদবধি ধর্ম্মপালের অধীন মিত্র-নৃপতিরূপে বিরাজ করিয়াছিলেন।

কান্যকুব্জ-বিজয় ও রাষ্ট্রীয় প্রতিপত্তি।

খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের একটি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও মধ্য-ভারতের বহু বিভিন্ন জাতিকে ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক চক্রায়ুধের কান্যকুব্জাধিপতি-নির্ব্বাচনে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে হইয়াছিল; তাহা হইতে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,—ধর্ম্মপাল শুধু কান্যকুব্জ নহে

বর্ত্তমান পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ, সিন্ধু, মালব ও রাজপুতানার কিয়দংশও বিধ্বস্ত ও পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ অনুমান বড় দুঃসাহসিক অনুমান। আমরা বরং সঙ্গতরূপে শুধু এই পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারি যে,—কান্যকুব্জ-বিজয়ের সময় উত্তর ভারতে ধর্ম্মপালের প্রতিপত্তি অতিমাত্র প্রবল ছিল।

যুদ্ধবিগ্রহ ও তাহার ফলাফল।

কান্যকুব্জের সিংহাসনে চক্রায়ুধ প্রতিষ্ঠাপিত হইবার পর, বৎসের উত্তরাধিকারী প্রতীহার-রাজ দ্বিতীয় নাগভটের সহিত ধর্ম্মপাল-সহায় চক্রায়ুধের বিরোধ উপস্থিত হয়। গোয়ালিয়রে প্রাপ্ত একখানি প্রতীহার-শিলালিপিতে, চক্রায়ুধ ও ধর্ম্মপাল, উভয়েই নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। ধর্ম্মপাল তৎপরে সহায়তা-লাভের নিমিত্ত রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন বলিয়া প্রতিভাত হয়। গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে,—চক্রায়ুধ ও ধর্ম্মপাল, উভয়ই গোবিন্দের নিকট নত হইয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপারে কেবল প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূট-লেখের প্রমাণের উপর নির্ভর করা নিরাপদ নহে; কিন্তু, পাল-রাজগণের শাসনলিপিতে এই সকল বিষয়ের উল্লেখ না থাকায়, তাহা যে পাল-প্রতিপত্তির গৌরববৃদ্ধি করে নাই—ইহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে। রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায় দুইখানি রাষ্ট্রকূট-শাসনলিপি হইতে অনুমান করিয়াছেন যে,—রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দ প্রতীহার-রাজ দ্বিতীয় নাগভটকে পরাভূত করিয়া, কান্যকুব্জ হইতে বিতাড়িত করেন, এবং তাহার পর ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ নিরুপদ্রবে আপন আপন রাজ্য ভোগ করেন, এবং প্রবলপরাক্রান্ত প্রতীহার-রাজ মিহির-ভোজের সময় পর্য্যন্ত প্রতীহার-রাজগণ কখনও স্থায়িভাবে কান্যকুব্জ অধিকার করেন নাই।

পক্ষান্তরে, ভিন্সেণ্ট স্মিথ এইরূপ অনুমানের পক্ষপাতী যে,—নাগভট তাঁহার রাজধানী কান্যকুব্জে আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং বহু পুরুষপরম্পরা ধরিয়া এই কান্যকুব্জই প্রতীহারের রাজধানী ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধরূপে কিছুই বলা যাইতে পারে না;—মিহির-ভোজের রাজত্বকালের পূর্ব্বে কান্যকুব্জ যে কখনও প্রতীহারের রাজধানীরূপে অধিকৃত ছিল, তৎসম্বন্ধে অব্দ সংবলিত কোনও প্রতীহার-ভূমিদানপাত্র (শাসন) সেখানে প্রাপ্ত হওয়া

ধর্ম্মপালের রাজত্বকাল ও সমসাময়িক কান্যকুব্জ।

লামা তারানাথ লিখিয়া গিয়াছেন,—ধর্ম্মপাল ৬৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু তারানাথের কথা প্রত্যাখ্যান করিবার পক্ষে তিনি যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা সুস্পষ্ট নহে। যোধপুর রাজ্যে দৌলতপুরে মিহির-ভোজের একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে;—তাহা কান্যকুব্জে ৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা হইতে নিশ্চিতরূপে এরূপ প্রমাণ হয় না যে, প্রতীহার নৃপতিগণ কান্যকুব্জে তাঁহাদের স্থায়ী রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।—কান্যকুব্জ তাঁহাদের সাময়িক-অধিকার-ভুক্ত হওয়াও অসম্ভব নহে। ধর্ম্মপাল ৬৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন—তারানাথের এই উক্তি যদি আমরা গ্রহণ করি, এবং ৮০০ খ্রীষ্টাব্দকে যদি ধর্ম্মপালের রাজ্য-প্রাপ্তির কাল বলিয়া গণনা করি, তাহা হইলে, উপরি-উল্লিখিত অব্দ ধর্ম্মপালের রাজত্বকালের ভিতরই পড়িবে। ধর্ম্মপালের রাজত্বকালের পরিমাণ সম্বন্ধে তারানাথের প্রমাণকে পরিত্যাগ করিলেও, ধর্ম্মপাল যে ন্যূনকল্পে ৩২ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা খালিমপুর-তাম্রশাসনেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ, এই তাম্রশাসন তাঁহার রাজত্বকালের দ্বাত্রিংশৎ বর্ষের অব্দ-সংবলিত। তাঁহার উত্তরাধিকারী দেবপাল যে অন্যূন ৩৩ বৎসর কাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণও আমরা মুদ্গগিরি (মুঙ্গের) শাসনলিপিতে প্রাপ্ত হই। অতএব, আমরা যদি ৮০০ খ্রীষ্টাব্দকে ধর্ম্মপালের সিংহাসনারোহণের আনুমানিক কাল বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে, যে ৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জ নিঃসন্দিগ্ধরূপে মিহির-ভোজের অধিকারে ছিল, তাহা ধর্ম্মপালের অথবা দেবপালের রাজত্বকালের ভিতরই পড়িবে।—কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই অধিকারকাল যে কত দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল, তাহা আমাদিগের বিদিত নহে।

প্রথম পাল-নৃপতিগণের রাজত্বকাল সম্বন্ধে এবং তাঁহাদিগের সহিত প্রতীহার-রাজগণের যুদ্ধ বিগ্রহের ফলাফল সম্বন্ধে এখনও অনেক সংশয়ের অবকাশ আছে। কিন্তু ধর্ম্মপাল যে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে সিংহাসনে আধিরোহণ করেন, এবং তাহার অল্পকাল পরেই কান্যকুব্জ বিজয় করিয়া তদ্দেশে কিয়ৎকালের নিমিত্ত আপনার সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং পরে প্রতীহার রাজগণের সহিত বাঙ্গালার পালরাজগণের ও তাঁহাদিগের মিত্রশক্তি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট-রাজগণের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহ হয়,—ইহা একরূপ সুস্পষ্ট-

রূপেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই যুদ্ধ বিগ্রহে বহু ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, এবং অবসরকালে শান্তিও দেখা দিয়াছে; কিন্তু এই যুদ্ধ বিগ্রহের ফলেই অবশেষে প্রতীহার-রাজগণ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে কান্যকুব্জে আপনাদিগকে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং সম্ভবতঃ মগধ ও তীরভুক্তি (ত্রিহুত) প্রদেশ জয় করেন। ধর্ম্মপাল বৌদ্ধধর্ম্মের জনৈক সংস্কারক ছিলেন বলিয়া প্রতিভাত হয়। তাঁহার রাজত্বকালে, এবং তাঁহারই উৎসাহে, সুবিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত হরিভদ্র মহাযানী বৌদ্ধগণের প্রধানতম ধর্ম্মগ্রন্থ প্রজ্ঞাপারমিতার ভাষ্য প্রণয়ণ করেন।

ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূট-রাজকুমারী রণ্ণাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন;—রাষ্ট্রকূট-রাজগণের সহিত তাঁহার রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের বিচার করিয়া দেখিলে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে লিখিত আছে,—পল্লীগ্রামের গোপালকগণের মুখে, ক্রীড়ারত শিশুগণের কণ্ঠে, এবং পিঞ্জরাবদ্ধ শুকপক্ষিগণের কণ্ঠে তিনি আপনার প্রশংসাগীতি শ্রবণ করিয়া সবিনয়ে মস্তক অবনত করিয়া একদিকে মুখ ফিরাইয়া লইতেন।—ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি,—ধর্ম্মপাল লোকহিতৈষী ও লোকপ্রিয় নরপাল ছিলেন।

ধর্ম্মপাল স্বর্গারোহণ করিলে, তাঁহার পুত্র দেবপাল রাজ্যলাভ করেন। তাঁহার রাজত্বকালের ত্রয়স্ত্রিংশৎ রাজ্যাব্দ-সংবলিত মুদ্গগিরির (মুঙ্গের) শাসনলিপি হইতে, এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পৌত্র নারায়ণ পালের রাজত্বকালের সপ্তদশ রাজ্যাব্দ-সংবলিত নারায়ণপাল-প্রদত্ত মুদ্গগিরির অপর একখানি শাসনলিপি হইতে, এবং দেবপালের মন্ত্রী দর্ভপাণির প্রপৌত্র ও নারায়ণ পালের প্রধানামাত্য গুরব মিশ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাদলস্তম্ভ নামে সুপরিচিত স্তম্ভের ক্ষোদিত লিপি হইতে, দেবপালের রাজত্বের বিবরণ আমরা কিয়ৎপরিমণে অবগত হইতে পারি। এতৎসমুদয়ে দেবপাল সমরপ্রিয় নৃপতি-রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। দেবপালের মুদ্গগিরিশাসনে তাঁহার রণকুঞ্জরগণের বিন্ধ্য-পর্ব্বতভেদ উল্লিখিত হইয়াছে, এবং তাঁহার সমরাশ্বগণের কাম্বোজ-দেশ-প্রবেশ কথিত হইয়াছে। নারায়ণ পালের মুদ্গগিরিতাম্রশাসনে লিখিত আছে—জয়পাল তদীয় ভ্রাতা দেবপালের আজ্ঞায় দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইলে, উৎকলপতি দূর হইতে তাঁহার নাম শুনিয়াই স্বীয় রাজধানী হইতে পলায়ন করিলেন, কিন্তু প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর তাঁহার

দেবপাল ও তাঁহার প্রতিপত্তি।

আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মিত্রতার সহিত নিরুপদ্রবে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

দেবপালের সহিত জয়পালের কি সম্বন্ধ, এবং ধর্ম্মপালের সহিতই বা তাঁহাদিগের কি সম্বন্ধ, শাসনলিপিতে তাহা সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত না থাকায়, তাহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ চলিয়াছে। এক সময় দেবপাল ও জয়পালকে ধর্ম্মপালাত্মজ বাকপালের পুত্র বলিয়াই কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিতেন। মুদ্গগিরি-তাম্রশাসনে দেবপাল ধর্ম্মপালকেই আপনার পিতা বলিয়া সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, দেবপাল ধর্ম্মপালের পুত্র, এবং জয়পাল বাক্‌পালের পুত্র ও দেবপালের পিতৃব্যপুত্র। রমাপ্রসাদ চন্দ ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের মতে, দেবপাল ও জয়পাল উভয়েই ধর্ম্মপালের পুত্র, এবং তন্মধ্যে দেবপালই জ্যেষ্ঠ। বিলাতের ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত "ছান্দোগ্য-পরিশিষ্ট" নামক হস্তলিখিত পুঁথি দ্বারা প্রথমোক্ত মতই সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া প্রতিভাত হয়। উক্ত গ্রন্থে জয়পাল কর্ত্তৃক তদীয় পিতা বাক্‌পালের শ্রাদ্ধ কার্য্যের উল্লেখ আছে। নারায়ণপালের তাম্রশাসনে, যে শব্দ দ্বারা জয়পাল ও দেবপালের সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে, তাহা 'সহোদর ভ্রাতা' ও 'পিতৃব্যপুত্র ভ্রাতা'—উভয় অর্থেরই সূচনা করে কি না, জানি না; সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত যোগ্যতর ব্যক্তিগণ সে প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন।

দেবপালের সহিত জয়পালের সম্বন্ধ।

দেবপাল উৎকল-কুল উন্মূলিত করিয়াছিলেন, এবং হূণ, দ্রাবিড় ও গুর্জ্জর রাজগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিতরূপে কোনও তথ্যই অবগত নহি। বাদল-স্তম্ভ-লিপিতে যে দ্রাবিড়-রাজের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রমাপ্রসাদ চন্দ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই তাহা জনৈক রাষ্ট্রকূট-নৃপতির প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন;—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, উহা তৃতীয় গোবিন্দের উত্তরাধিকারী প্রথম অমোঘবর্ষকেই লক্ষ্য করিতেছে। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালার পালরাজগণ-বিষয়ক ইংরেজী পুস্তকের ৫৭ পৃষ্ঠায়, দেবপালের সহিত রাষ্ট্রকূটগণের সম্বন্ধ-প্রমাণার্থ তিনি অমোঘবর্ষের নীলগুণ্ড-শিলালিপি হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন; তাহাতেই লিখিত রহিয়াছে—তিনি অঙ্গ-বঙ্গ-মগধেশ্বর

বাদলস্তম্ভের গুর্জ্জর-রাজ ও দ্রাবিড়-রাজ নিরূপণ।

কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যত দূর বুঝিতে পারা যায়, ইহারই ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন,—অমোঘবর্ষ দেবপালকে আপন বশ্যতা স্বীকার করাইয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ উদ্ধৃত বাক্যই, পুনরায় দেবপালের পরবর্ত্তী নৃপতি প্রথম বিগ্রহপাল ও নারায়ণপালের সহিত (দেবপালের সহিত নহে) অমোঘবর্ষের সম্বন্ধের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শাসনোল্লিখিত গুর্জ্জর-রাজকে তিনি মিহির-ভোজের পূর্ব্বাধিকারী প্রথম রামভদ্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন; কারণ, গুর্জ্জর-শাসনাবলীতে এই রামভদ্রের কোনও বিজয়বার্ত্তার উল্লেখ নাই। পক্ষান্তরে, রমাপ্রসাদ চন্দ—স্বয়ং মিহিরভোজকেই গুর্জ্জর-রাজ বলিয়া, এবং রাষ্ট্রকূট-রাজবংশীয় প্রথম অমোঘবর্ষের পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণকেই দ্রাবিড়-রাজ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি রাষ্টকূট-রাজ তৃতীয় কৃষ্ণের একখানি তাম্রশাসনের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন,—উহাতে দ্বিতীয় কৃষ্ণ, "গৌড়গণের বিনয়ব্রতের শিক্ষাগুরু", এবং "অঙ্গ কলিঙ্গ ও মগধকে আজ্ঞাবহনকারী করিয়াছিলেন" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। যদি এই উদ্ধৃত বাক্য প্রকৃতপ্রস্তাবে দেবপালের সহিত দ্বিতীয় কৃষ্ণের বিরোধকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে, এই বিরোধ-বর্ণনার সহিত বাদলস্তম্ভের লিখিত গুরবমিশ্রের বর্ণনার আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

রমাপ্রসাদ চন্দ, তাঁহার মত-সমর্থনের নিমিত্ত, চেদিরাজ্যের কলচুরি-রাজ-বংশের দুইখানি শাসনলিপি হইতে বাক্যোদ্ধার করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দে কোকুয়াল (কোক্কল্ল) নামক এক ব্যক্তি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে বর্ত্তমান মধ্যপ্রদেশ নামে সুপরিচিত ভূভাগের কিয়দংশে এই রাজবংশ শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। এই রাজবংশ হৈহয়-রাজবংশ নামেও পরিচিত, এবং জেজাকভুক্তির চান্দেল্ল-রাজগণের ইতিহাসের সহিত বিশেষরূপ সংস্পৃষ্ট। যমুনা ও নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী যে স্থান অধুনা বুন্দেলখণ্ড নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহাই তদানীন্তন জেজাকভুক্তি। এই চান্দেল্ল, রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নান্নুক চান্দেল্ল এক প্রতীহার মহাসামন্তকে পরাজিত করিয়া জেজাকভুক্তির দক্ষিণাংশের অধিস্বামী হয়েন, এবং লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। প্রাচীন ত্রিপুরী ও বর্ত্তমান জব্বলপুরের সন্নিকটে তেবর নামক স্থানে প্রাপ্ত কলচুরি-রাজ কর্ণের ১০৪২ খৃষ্টাব্দের একখানি তাম্র-

কলচুরি-রাজবংশের শাসনলিপি।

শাসনে কোক্কল্ল সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে,—তাঁহার ভুজ ভোজকে, বল্লভরাজকে ও চিত্রকূটপতি শ্রীহর্ষকে অভয় প্রদান করিয়াছিল, এবং বিলহরিতে প্রাপ্ত শিলালিপিতে লিখিত আছে যে,—তিনি [কোক্কল্ল] সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া, দক্ষিণে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণরাজকে, এবং উত্তরে শ্রীনিধি ভোজদেবকে, দুই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-স্তম্ভ-রূপে স্থাপন করিয়াছিলেন।

শাসনোক্ত কৃষ্ণরাজ, ভোজ ও কাম্বোজ।

ত্রিপুরী তাম্রশাসনের বল্লভরাজ ও বিলহরি-শিলালিপির কৃষ্ণরাজ যে একই ব্যক্তি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই কৃষ্ণরাজই রাষ্ট্রকূট-রাজবংশের দ্বিতীয় কৃষ্ণ। তিনি বল্লভ অথবা কৃষ্ণবল্লভ নামেও পরিচিত ছিলেন, এবং তিনি কোক্কল্লের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। প্রথমোক্ত তাম্রশাসনের শ্রীহর্ষই হর্ষ চান্দেল্ল; তিনিই দশম শতাব্দের প্রথমভাগে, এবং সম্ভবতঃ নবম শতাব্দের শেষভাগেও, জেজাকভুক্তির অধিপতি ছিলেন। উভয়-শাসনোক্ত ভোজকে রমাপ্রসাদ চন্দ গুর্জ্জর-প্রতীহার-রাজ মিহির-ভোজ বা প্রথম ভোজ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এই লেখদ্বয়ের নিহিতার্থ এইরূপ যে,—প্রতীহার-রাজ মিহির-ভোজ, কলচুরি-রাজ কোক্কল্ল, রাষ্ট্রকূট-রাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ, এবং জেজাকভুক্তির হর্ষ চান্দেল্ল, গৌড়াধিপ দেবপালের দুরাকাঙ্ক্ষার গতিরোধ করিবার নিমিত্ত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিতে চাহেন,—শাসনোক্ত ভোজই কান্যকুব্জের দ্বিতীয় ভোজ, এবং পিতৃদেব প্রথম ভোজের সিংহাসন লইয়া দ্বিতীয় ভোজের সহিত তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহীপালের বিরোধে, কোক্কল্ল দ্বিতীয় ভোজকে যে সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন, শাসনদ্বয়ে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। ধর্ম্মপাল ও দেবপালের রাজ্যপ্রাপ্তিকালের অব্দ, এবং রাজত্বকালের পরিমাণ সম্বন্ধে কোনরূপ সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান না থাকায়, এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তই প্রকৃত, অথবা রমাপ্রসাদ চন্দের সিদ্ধান্তই প্রকৃত, তাহা বলা অসম্ভব। ইহার পর যদি অপর কোনও নূতন প্রমাণ উপস্থাপিত হয়, তাহার সহিত মিলাইয়া, এই উভয় উপন্যস্ত সিদ্ধান্তই বিচার করিয়া দেখা চলিবে। কিন্তু রমাপ্রসাদ চন্দের উপন্যস্ত সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে ইহা উল্লিখিত হইতে পারে, দেবপালের ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী বিগ্রহপাল বা শূরপাল কোক্কলের দুহিতার, অথবা দৌহিত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, শাসনাবলীতে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবপালের সহিত রাষ্ট্রকূট-রাজের, এবং কলচুরি-রাজের বিরোধান্তে সন্ধি সংস্থাপিত হইবার পর এরূপ বিবাহ-বন্ধন ব্যাপার সম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিতে চাহেন যে,—দেবপালের মুদ্গগিরি তাম্রশাসনে উল্লিখিত কাম্বোজগণ এবং উল্লিখিত বাদল-স্তম্ভলিপির হূণগণ এক। সংস্কৃত সাহিত্যে, যত দূর জানি, তিব্বত ও হিমালয় প্রদেশের মোঙ্গলীয় পরিবারভুক্ত জাতির সম্বন্ধেই কাম্বোজ অভিধা প্রযুক্ত হইয়াছে। এবং সাধারণের বিশ্বাস,—রাখালদাস ও তাহা স্বীকার করেন যে, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে উত্তর দিক হইতে কতকগুলি মোঙ্গলীয় জাতি আসিয়া উত্তর বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া তথায় এক রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিল, এতৎপ্রদেশের কোচ, মেচ ও পলিয়াগণ বর্ত্তমানে তাহাদিগেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই বিশ্বাসের প্রধান হেতু,—দিনাজপুর স্তম্ভলিপি; তাহাতেই লিখিত আছে যে, 'কাম্বোজান্বয়জ' নয়পাল কর্ত্তৃক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মুদ্গগিরির তাম্রশাসনে উল্লিখিত যুদ্ধবিগ্রহ দেবপালের সৈন্যের সহিত তিব্বত ও ভুটান-বাসিগণের, অথবা মোঙ্গলীয় পরিবারের হিমালয়স্থিত বা তৎপাদদেশস্থিত জাতিসমূহের যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে, এবং তাহাতে উল্লিখিত সমরতুরঙ্গম, বর্ত্তমানের ন্যায় তদানীন্তন কালেও যে ভুটান ও তিব্বত হইতে অশ্ব আনীত হইত, তাহারই প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে,—এইরূপ অনুমান করাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া প্রতিভাত হয়।

ভাগলপুর-তাম্রশাসন ও ধর্ম্মমঙ্গল।

ভাগলপুর-তাম্রশাসনে যে প্রাগ্‌জ্যোতিষের উল্লেখ আছে, তাহাই কামরূপ রাজ্যের রাজধানী-রূপে বর্ত্তমান গৌহাটীর অবস্থানভূমিতে বিদ্যমান ছিল, এবং এই কামরূপের সহিত দেবপালের রাজনীতিক সম্পর্ক, সম্ভবতঃ, বাঙ্গালার পূর্ব্বোত্তর প্রদেশের পার্ব্বত্য-জাতিসংসৃষ্ট সামরিক কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্থাপিত হইয়া থাকিবে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধর্ম্মমঙ্গল নামক এক শাস্ত্রগ্রন্থের আবিষ্কার করিয়াছেন।—এই গ্রন্থের খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর ও সপ্তদশ শতাব্দীর দুইটি ভিন্ন ভিন্ন পাঠ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে; ইহাতে লিখিত আছে যে,—দেবপালের নিমিত্ত তাঁহার শ্যালীপুত্র, মেদিনীপুর জেলার ময়নার অধীশ্বর লাউসেন, কামরূপ ও কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গল কতকাংশে স্পষ্টতঃই পৌরাণিক হইলেও, এবং কোনও তাম্রশাসনাদিতে লাউসেনের উল্লেখ না থাকিলেও, উহা ভাগলপুর-তাম্রশাসনের বর্ণিত দেবপালের সফল উড়িষ্যাভিযান ও প্রাগ্‌জ্যোতিষের উল্লেখের সমর্থন করিতেছে—এরূপ বিবেচনা করিলেও করা যাইতে পারে। উৎকল ও কলিঙ্গ—উড়িষ্যারই প্রতিশব্দ; উড়িষ্যায় যে দেবপালের সমসময়ে রাষ্ট্রবিপ্লবের ঝঞ্ঝা বহিয়া যাইতেছিল, মহামহোপাধ্যায়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন। উড়িষ্যার সোমবংশী বংশের সামন্তগণ ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচার করিতেছিলেন, এবং ব্রাহ্মণগণও তাঁহাদিগকে উন্মূলিত করিয়া কেশরী রাজবংশকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাল-রাজগণের আক্রমণের পক্ষে ইহা শুভ অবসরে পরিণত হইয়া থাকিতে পারে।

বাদল-স্তম্ভলিপির হূণরাজ যে কে, তাহা নির্ণীত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে যে সকল হূণ আক্রমণকারী আসিয়া রাজপুতানা ও মধ্য-ভারতে স্থায়ী হইয়াছিল, তাহাদিগেরই বংশধর বিভিন্ন জাতি তৎকালে হূণ নামে পরিচিত ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বুদ্ধগয়ার নিকট ঘোসরাঁবায় যে কৌতূহলোদ্দীপক প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়—জালালাবাদের (বর্ত্তমান আফগানিস্থানের) সন্নিকটবাসী জনৈক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ পেশবার-স্থিত কণিষ্ক বিহারে বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রে সুশিক্ষিত হয়েন, এবং দেবপালের প্রসাদচ্ছায়ায় ঘোষরাঁবায় বাস করিতেন ; পরে নালন্দার মহা বিহারের শ্রমণ কর্ত্তৃক তিনি সঙ্ঘস্থবির নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

দেবপালের মৃত্যুর পর, প্রথম বিগ্রহপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বিগ্রহপাল প্রথম শূরপাল নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি জয়পালের পুত্র। জয়পাল, দেবপালের সহোদর, অথবা পিতৃব্যপুত্র ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বিগ্রহপাল বা শূরপাল কলচুরি-রাজকুমারী লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।—লজ্জা দেবী চেদি রাজ্যের কালচুরি বা হৈহয়-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কোকলের নন্দিনী হওয়া অসম্ভব নহে।

প্রথম বিগ্রহপাল।

প্রথম বিগ্রহপালের পর তাঁহার পুত্র নারায়ণপাল রাজ্য গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাশ্রয়ী সন্ন্যাসি-মঠের ভাণ্ডদেব কর্ত্তৃক নারায়ণপালের রাজত্বের সপ্তম বর্ষে গয়াতে মঠ-প্রতিষ্ঠার কথা, গয়ার একখানি শিলালিপিতে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার গ্রন্থমধ্যে এই লেখখানি নূতন করিয়া সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ধর্ম্মমিত্র কর্ত্তৃক রাজা নারায়ণপালের রাজত্বের নবম বর্ষে একটি মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার বিষয় কলিকাতা চিত্রশালার একখানি ক্ষুদ্র শিলালিপিতে লিখিত আছে।—উহাও সম্ভবতঃ গয়াতে বা তাহারই সান্নিধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। তাহার পর রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষে স্বয়ং নারায়ণপাল কর্ত্তৃক প্রদত্ত তাম্রশাসন,—

নারায়ণপাল।

ইহার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি ; ইহাতে ত্রিহুতের অধীন কলসপোতের মন্দিরে তীরভুক্তি বা ত্রিহুতের একখানি গ্রাম-দানের কথা সন্নিবিষ্ট আছে।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষপাদে, অথবা দশম শতাব্দীর প্রথমে পাদে কান্য-কুব্জের প্রতীহার-রাজগণ পশ্চিম হইতে বাঙ্গালায় পাল-রাজগণের অধিকার-সঙ্কোচ করিতে থাকেন, এবং গয়া ও তৎসন্নিকৃষ্ট স্থানে প্রাপ্ত শাসনাদিতে প্রমাণিত হয় যে, কান্যকুব্জাধিপতি মহেন্দ্রপাল বা মহেন্দ্রায়ুধের রাজত্বকালে মগধের কিয়দংশ তাঁহার অধিকৃত ছিল। –স্তরাং নারায়ণপালের রাজত্বকালের লেখমালা বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। নারায়ণপাল-সংক্রান্ত, গয়াতে প্রাপ্ত যে দুইখানি শিলালিপির কথা বলিয়াছি, তাহাতে প্রমাণিত হইতেছে—তাঁহার রাজত্বকালের সপ্তদশ বর্ষে নিশ্চিতই মুঙ্গের, এবং সম্ভবতঃ ত্রিহুতের কিয়ংদশ তাঁহার অধিকৃত ছিল। দিনাজপুর জেলার পূর্ব্ব-প্রান্তে মঙ্গলবারীহাটের সন্নিকটে বাদল-স্তম্ভ নামে সুপরিচিত স্তম্ভের উৎকীর্ণ লিপিতে প্রমাণিত হয়,—নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী গুরব মিশ্র কর্ত্তৃক উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই গুরব মিশ্রের পিতা কেদার মিশ্র নারায়ণপালের পিতা শূরপালের, বা প্রথম বিগ্রহপালের প্রধান অমাত্য ছিলেন, এবং তাঁহার বৃদ্ধপিতামহ দর্ভপাণি দেবপালের মন্ত্রিত্ব করিতেন, এবং এই দর্ভপাণির পিতা গর্গ ধর্ম্মপালের মন্ত্রী ছিলেন।—এইরূপে পালরাজগণের মন্ত্রিত্ব পদ চারি পুরুষ ধরিয়া একই বংশের অধিকৃত ছিল।

রাজ্যপাল।

নারায়ণপালের উত্তরাধিকারী তদীয় পুত্র রাজ্যপাল তুঙ্গ-উপাধিধারী রাষ্ট্রকূট-রাজের কন্যা ভাগ্যদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করিয়াছেন,—এই তুঙ্গ সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূট-রাজবংশের দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র জগত্তুঙ্গ। রাজ্যপালের সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছুই বিদিত নাই।

দ্বিতীয় গোপাল।

রাজ্যপালের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় গোপাল রাজ্যাধিকার করেন। দুইখানি শাসনলিপি হইতে তাঁহার সম্বন্ধে তথ্যলাভ করা যায়। পাটনার নিকটস্থ, প্রাচীন নালন্দার অবস্থানভূমি 'বরগাঁও'এ প্রাপ্ত লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়—গোপালের রাজত্বের প্রথম বর্ষে অনুল্লিখিতনামা এক জন দাতা পুরুষ সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত বাগীশ্বরী শ্রীমূর্ত্তিকে সুবর্ণপত্র দ্বারা মণ্ডিত করিয়া দিয়াছিলেন। বুদ্ধ-গয়ার মহাবোধি-মন্দি-রের ভগ্নস্তূপমধ্যে অপর যে শিলালিপিখানি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে

কোনও অব্দের উল্লেখ না থাকিলেও, গোপালের রাজত্বকালে শক্রসেন নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক একটি বুদ্ধমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বিগ্রহপাল।

পালবংশের তৎপরবর্ত্তী নৃপতি গোপালের পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল। 'বিলাতের যাদুঘরে, বিগ্রহপাল নামক জনৈক ভূপতির রাজ্যাব্দের ষড়বিংশবর্ষে লিখিত একখানি পুঁথি সংরক্ষিত আছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবতঃ লিপিতত্ত্বগত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অনুমান করেন যে, এই বিগ্রহপালই দ্বিতীয় বিগ্রহপাল। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, তিনি অন্যূন ২৬ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে অপর কোনও তথ্য আমরা অবগত নহি। তাঁহার পর, তাঁহার পুত্র মহীপাল রাজ্যলাভ করেন। দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসনে বর্ণিত আছে—তিনি তাঁহার সকল শত্রুকে নির্জ্জিত করিয়া তাঁহার বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন।

প্রতীহার রাজগণের আলোচনা।

গুর্জ্জররাজ মিহির-ভোজ বা প্রথম ভোজ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দের মধ্যভাগে কান্যকুব্জ বিজয় করিয়াছিলেন, তাহা আলোচিত হইয়াছে। যদি লামা তারানাথের বর্ণনা-অনুসারে ধর্ম্মপালের রাজত্বকাল ৬৪ বৎসর বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে, গৌড়াধিপতি ধর্ম্মপালের রাজত্বকালেই উল্লিখিত কান্যকুব্জ-বিজয় সংঘটিত হইয়া থাকিবে। প্রথম ভোজের পর, তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রপাল বা মহেন্দ্রায়ুধ সিংহাসনে আরোহণ করেন।—৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ ও ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ যে তাঁহারই রাজত্বকালের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহা ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। মহেন্দ্রপালের পর হইতে পরীহার-রাজবংশের সকল নৃপতির নামের শেষাংশ 'পাল', এবং তাঁহাদের অনেক নাম গৌড়ীয় পাল-রাজবংশের অনেক নামের সহিত অভিন্ন দেখা যায়,—সুতরাং কোনটি যে প্রতীহার-রাজবংশের, এবং কোনটি যে বাঙ্গালার পালরাজবংশের, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। নিশ্চয়ই ৮৯৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই প্রথম ভোজের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। মহেন্দ্রপাল যে মগধের কিয়দংশ আপন অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে।--এ বিষয়ে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। ভোজের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ভোজ, এবং দ্বিতীয় ভোজের পর তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহীপাল নৃপতি-পদ লাভ করেন। কান্যকুব্জ-রাজ মহীপালের রাজত্ব কাল ৯১৪ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। অতএব, দ্বিতীয় ভোজের রাজত্বকাল ৯০৭ হইতে ৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই পূর্ণ

হইয়া গিয়া থাকিবে। ইত্যবসরে, বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত জেজাক-ভুক্তির চান্দেল্ল রাজা, এবং বর্ত্তমান মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরের নিকটস্থ কিয়দংশ ভূভাগে চেদির হৈহয় বা কলচুরি-রাজবংশ প্রভাবশালী হইয়া উঠিতেছিল। ৮৩১ খৃষ্টাব্দে, অথবা ঐরূপ সময়ে, ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে, চান্দেল্ল-রাজবংশের আদিপুরুষ নান্নুক চান্দেল্ল, সম্ভবতঃ প্রথম ভোজের মিত্র-রাজ পরীহারের মহাসামন্তকে পরাভূত করিয়া, জেজাকভুক্তির দক্ষিণাংশের অধিস্বামী হয়েন। নান্নুকের পরবর্ত্তী হর্ষ, এবং চেদির কলচুরি-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কোক্কল—প্রথম ভোজ অথবা দ্বিতীয় ভোজের সমসাময়িক, তৎসম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। তাঁহারা যে প্রথম অমোঘবর্ষের উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রকূট-রাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের সমসাময়িক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রাষ্ট্রকূট-রাজগণের আলোচনা।

এক্ষণে রাষ্ট্রকূট-রাজবংশ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে, দেখিতে পাই—গৌড়পতির সাহত দ্বিতীয় কৃষ্ণের যে যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছিল, রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় কৃষ্ণের শাসনে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। লিপিতত্ত্বগত প্রমাণে দ্বিতীয় কৃষ্ণের রাজ্যের ব্যাপ্তিকাল ৯০২ হইতে ৯১১ খৃষ্টাব্দ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। তাঁহার উত্তরাধিকারী তৃতীয় ইন্দ্র ৯১৬ খৃষ্টাব্দ পরীহার-রাজ মহীপালের রাজত্বকালে গুর্জ্জর রাজ্য আক্রমণ করেন, এবং যমুনা অতিক্রম করিয়া কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন। এইরূপ অধিকার করিতে, সম্ভবতঃ তাঁহাকে জেজাকভুক্তি-রাজ হর্ষ চান্দেল্লর অধিকৃত প্রদেশের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। এই হর্ষ যে পরীহার-রাজ মহীপালের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে তদীয় নষ্ট রাজ্যের পুনরুদ্ধারে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা হর্ষ-পুত্র যশোবর্ম্মার ৯৫৪ খৃষ্টাব্দের একখানি তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে।

সন্ধিবদ্ধ পরীহার-রাজ্য ও চান্দেল্ল-রাজ্যের সহিত রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্রের যে শক্তি-পরীক্ষার অভিনয় হইয়াছিল, তাহাতে গৌড়পতি আদৌ কিছু করিয়াছিলেন কি না, এবং করিয়া থাকিলেই বা কি করিয়াছিলেন, তাহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় না।

ক্রমশঃ।

শ্রীবিমলাচরণ মৈত্রেয়।

পুরাতন ও নূতন।

পুরাতন-বিদায়।

তুমি যে যাও চলে', দিয়ে গেলে কি ?
পিছনে ফিরে ফিরে নায়িয়া আঁখিনীরে,
চলিলে ধীরে ধীরে আনত-আঁখি !
কেবলি ফেলে গেলে করুণ দিঠি—
যেমন বনমাঝে গোপনে ফুল রাজে
বিতরি' মৃদু বাস সাঁঝেতে ফুটি'।
যেমন নীড়-হারা চকিত পাখী
ভ্রমে সে দিশা-হারা বিলাপি' ডাকি',
তুমি কি সেই মত ভ্রমিবে অবিরত,
কিবা, আছে গো নিয়মিত নবীন শাখী ?
ভেব না তোমারে সে ভুলাবে নব-বেশে
নবীন সখা এসে পরায়ে রাখী !
বিদায় যত বাজে ! মিলন নব মাঝে
তেমন কিবা আছে শুধাতে আঁখি !

নূতন-বন্দন।

রাজ-শিরোপা পরিয়া শিরসে
কত দূর হতে আসিছ তুমি,
কত গিরি বন করিয়া লঙ্ঘন,
দ্রুতগামী-যানে করি আরোহণ,
সিন্ধু-সমীর করিয়া সেবন
ক্লান্ত চরণে আসিছ ভ্রমি ?
সোনার রূপার কাঠীর কথন,
উপকথা যথা করেছি শ্রবণ,
তোমারই মাঝারে করি দরশন,
সে ঐন্দ্রজালিক নিশ্চিত তুমি !
কত অকুশল কত সে কুশল
তোমারই মাঝারে রয়েছ ঘুমি',
কত দূর হ'তে আসিছ তুমি ?
কভু তোমার সোনার কাঠীর পরশে
সুখ শারদ-কনক-রৌদ্র-নিকষে
কোথা হৃদয়-কুটীর আঁধারে গভীর
হয় নিমগন ও কর চুমি',
কত দূর হ'তে আসিছ তুমি ?
সব্যসাচী হে দু' করে সন্ধান,
ক্ষরে দুঁহু করে ক্ষুরধার বাণ,
স্বর্ণ-বিশিখে কাহারে সম্মান
কর লুটাইয়ে চরণ চুমি!
কারে নিশিত শায়কে লুটাও ভূমি !
কত দূর হ'তে আসিছ তুমি ?
সর্ব্বগ তুমি, কোথা নাহি যাও!
দ্বারে দ্বারে দ্বারে আঘাতি' দাঁড়াও,
চির-অনলস নিশি দিশি ধাও,
লয়ে দুঁহু করে গরল, অমি',
কত দূর হ'তে আসিছ তুমি ?
মহাকাল-হৃদি-কমলোত্থিত
চির-পুষ্পিত—নিত্য পূজিত,
নীরব মুখর রহস্যান্বিত,
নব-রস-যুত ভূষিত তুমি !
কত দূর হ'তে আসিছ তুমি ?
অন্তর-তারে ঝঙ্কারি' ধাও,
হৃদয়-বীণা নীরবে বাজাও—
দীপক ভঁয়রো মেঘমল্লারে,
ঝরে ঝর-ধারা ধরণী চুমি',
এস বন্দিত, তোমারে নমি।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

সংগ্রহ।

সভাপতির অভিভাষণ।

[সাহিত্য-সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত সার মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কর্ত্তৃক পঠিত।]

মাননীয় সুধীবৃন্দ—

পুত্র যে বয়সে উপনীত হইলে, নীতিশাস্ত্রকার তাহার সহিত মিত্রবৎ আচরণের উপদেশ দিয়াছেন, সাহিত্য-সভা সেই বয়সে উপনীত হইয়াছে। * * আপনারা এতদিন ইহাকে যে পথে পরিচালিত করিয়াছেন, ইহা সেই পথেই চলিয়া শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করিয়াছে। সেই পাথেয় সম্বল করিয়া ইহা দৃঢ়তা ও একাগ্রতার সহিত কর্ত্তব্যসাধনে অগ্রসর হইবে। প্রথম যৌবনের প্রবল আবেগে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া কর্ত্তব্যবিচ্যুত হইলে, আপনারা সদুপদেশদানে ইহাকে সংযত করিবেন, পথনির্ণয়ে অশক্ত হইলে পথনির্দ্দেশ করিবেন। ইহা যেন কথনও আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত না হয়। * * * *

বর্ত্তমান মহাসমর।

অধুনা এক বিষম চিন্তা সমগ্র বঙ্গদেশের—শুধু বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের চিত্ত অধিকার করিয়াছে। তাহা বর্ত্তমান ভীষণ সমর। ইউরোপে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া এক্ষণে সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর এই কুরুক্ষেত্রের বিষয় চিন্তা করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। আমাদের মহামহিমান্বিত সম্রাট্ এই ভীষণ যুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষে—ধর্ম্মের পক্ষে—অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। পৃথিবী শান্তির সুখময় ক্রোড়ে সুষুপ্ত ছিল। আততায়ী সেই অবসরে গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া বৈশ্বানর সমস্ত গ্রাস করিতেছে। শ্রাবণের ধারার ন্যায় নরশোণিত বর্ষিত হইয়াও সে অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিতে পারিতেছে না! যে আততায়ীর উৎকট রাজ্যলিপ্সা এই মহা অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে তাহার সেই বাসনা চিরদিনের জন্য প্রশমিত হয়, আর জগতের শান্তিভঙ্গ করিতে না পারে, তজ্জন্য সকলকেই বদ্ধপরিকর হইয়া কার্য্য করিতে হইবে।

ভারতের পক্ষে এই যুদ্ধ অবিমিশ্র দুঃখের কারণ নহে। এই যুদ্ধে ভারতবাসী তাহার অকৃত্রিম রাজভক্তির পরিচয় দিবার অপূর্ব্ব অবসর পাইয়াছে।

"প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহসে দুর্জ্জয়,
কার্য্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ।"—

কবির এই উক্তিকে অসার প্রতিপন্ন করিয়া দলে দলে বঙ্গীয় যুবক পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের রাজার কার্য্যে, দেশের কার্য্যে, জগতের কার্য্যে, প্রাণ দিবার জন্য ছুটিয়াছে। প্রাণের মায়া উপেক্ষা করিয়া রণক্ষেত্রে অজস্র গোলাবৃষ্টির মধ্যে বঙ্গীয় সেবকসেনা আহত সৈনিককে বহন করিয়া নিরাপৎ স্থানে লইয়া আসিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। এ দৃশ্যে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, আমাদের হৃদয়ে কত আশা জাগিয়া উঠিতেছে।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা, আমাদের সম্রাট্ এই যুদ্ধে জয় লাভ করুন। অন্যায়ের গর্ব্বোন্নত মস্তক ন্যায়ের চরণতলে লুণ্ঠিত হউক।

সাহিত্যের দিক্ হইতেও যুদ্ধের সম্বন্ধে ভাবিবার অনেক কথা আছে। এই যুদ্ধে পাশ্চাত্য জগতে এক ভীষণ আলোড়নের সূত্রপাত হইয়াছে—কেবল বাহ্য জগতের আলোড়ন নহে, অন্তর্জগতেরও আলোড়ন। যুদ্ধের অবসানে ইউরোপীয় সমাজকে কি ভাবে ও কি আদর্শে গঠিত করিতে হইবে, ইহাই এখন পাশ্চাত্য মনীষিমণ্ডলীর চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগৎ বুঝিয়াছে, বাহ্য উন্নতি—Material civilization হৃদয়ে লালসার উৎকট বহ্নির সৃষ্টি করে। সে লালসাকে সংযত না করিলে, তাহা

পাশ্চাত্য জগতে ভাব-বিপ্লব।

"হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"

এই লালসায় মানুষকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করে—মানুষ পাগল হইয়া যায়, পশুর ন্যায় আচরণ করে। কোটী কোটী নরনারী হৃদয়ের শোণিতপাত করিয়া কত যুগ ধরিয়া যে ধনসঞ্চয় করিয়াছে, তাহারাই আবার সেই প্রাণসম ধনকে মুহূর্ত্তের মধ্যে সমুদ্রের অতলজলে ডুবাইয়া, অথবা জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ছারখার করিয়া, আনন্দে অট্টহাস্যে করতালি দিয়া নৃত্য করিতেছে! যাহাতে এই পৈশাচিক কার্য্য অতি সত্বর সম্পাদিত হয়, তাহার জন্য কত অর্থব্যয়ে কত উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে! কোটী কোটী মুদ্রা প্রত্যহ ধূমে পরিণত হইয়া আকাশে মিলাইয়া যাইতেছে! যাহারা দেশের লোকবৃদ্ধির জন্য কত চিন্তা করিয়া কত উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহারাই আবার কিরূপে সহজে সত্বরে লোকহত্যা করিয়া দেশকে শ্মশান করিতে পারা যায়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে! ইহাকে উন্মাদ না বলিয়া কি বলিব? আক্ষেপের বিষয় এই যে, ইহাঁদেরই নিকট আমরা সভ্যতা শিক্ষা করিতে যাই, ইহাঁদেরই আদর্শে আমাদের সমাজগঠন করিতে উদ্যত হই!

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এক্ষণে বুঝিয়াছেন যে, তাঁহাদের সভ্যতা প্রকৃত মনুষ্যত্ব-বিকাশের সম্পূর্ণ অনুকূল নহে; তাহাতে পশুত্বের বিনাশ সাধিত না হইয়া বরং তাহার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। একখানি সূক্ষ্ম আবরণের মত তাহা পশুত্বকে ঢাকিয়া রাখে মাত্র। সেই আবরণ ছিন্ন হইলে আমরা তাহার প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠি! হিন্দু সভ্যতা মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ সাধন করিয়া তাহাকে দেবত্বে পরিণত করিতে চায়—পাশ্চাত্য সভ্যতায় আমরা তাহার বিপরীত ফল ফলিতেই দেখি। হিন্দু সভ্যতার সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতার ইহাই প্রভেদ। পাশ্চাত্য সমাজে এই ভাব-বিপ্লবের ফলে, ক্রমে পাশ্চাত্য সাহিত্যেরও আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা।

হৃদয়ে দেবত্ব-বিকাশের প্রতিকূল সমস্ত প্রভাব হইতেই হিন্দু শাস্ত্রকারগণ সমাজকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য-সভ্যতানুরাগী কেহ কেহ হিন্দুসমাজকে 'শুচিবায়ুগ্রস্ত' বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। ইহা হিন্দু সমাজের পক্ষে গৌরব কি অগৌরবের কথা, বলিতে পারি না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণ অনেক রোগকে স্পর্শাক্রামক বলিয়া আমাদিগকে সাবধান করিয়া দেন। স্পর্শাক্রামক বলিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে যে কেহ স্পর্শ করে, সেই যে আক্রান্ত হয়, তাহা নহে। কিন্তু কাহার শক্তি কত, তাহা ত সহজে জানিতে পারা যায় না; তাই চিকিৎসকের সাধারণ নিষেধই

হিন্দু সভ্যতা।

মানিয়া চলিতে হয়। যিনি সংসারের পিচ্ছিল পথে চলিতে গেলে পদে পদে স্খলিতচরণ হন, হিন্দু-শাস্ত্র তাঁহাকে বিশেষভাবে সাবধান ও সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—কার্য্যের অনুরোধে আজকাল অনেককে অনেক অসভ্যদেশে অল্পবিস্তর কাল বাস করিতে হয়। সেই সকল দেশে নৈতিক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত জাতিদিগের সহিত মিশিয়া তাঁহাদের অনেকেরই পরিণাম কিরূপ হইয়া থাকে, তাহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই বুঝিবেন, হিন্দু এত শুচিবায়ুগ্রস্ত কেন! চৈতন্যদেবের এক ভক্ত স্ত্রী-লোকের নিকট হইতে ভিক্ষা লইয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার মুখদর্শন করেন নাই। বুদ্ধদেব ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের সৃষ্টির বিরোধী ছিলেন। এ সমস্ত বিধিনিষেধেরই মুখ্য উদ্দেশ্য—দুর্ব্বল মনুষ্যকে নৈতিক ব্যাধির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ করা।

অনেকে মনে করেন, প্রাচীন হিন্দুরা বুঝি একেবারে বাহ্য উন্নতির প্রতি বীতরাগ ছিলেন। তাহা নয়। হিন্দুরা রাজ্যশাসন করিতেন—ধন উপার্জ্জন করিতেন; হিন্দু নৃপতি ও ধনিগণ ভোগবিলাসেও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। কিন্তু এ সকলেরও একটি সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। উৎকট লালসার বিকট পরিণামের কথা হিন্দুশাস্ত্র নানারূপে তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদ্রিক্ত করিয়া দিত। হিন্দুর ভোগবিলাস তাঁহার পোষাকের মত ছিল—ইচ্ছা করিলেই তিনি তাহা উন্মুক্ত করিয়া দিতে পারিতেন—এখনকার মত তাহা রক্তের সহিত মিশিয়া যাইতে পারিত না।

হিন্দুর সাহিত্য এই উচ্চ আদর্শেই গঠিত হইয়াছে। হিন্দু নৃপতি এক দিকে যেমন ভোগী ছিলেন, বীর ছিলেন, অপর দিকে তেমনই সর্ব্বস্ব দান করিয়া মৃৎপাত্রে আহার করিতেও ক্লেশ-বোধ করিতেন না। বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিণামে, ইউরোপে আমাদের এই আদর্শ, অন্ততঃ আংশিক-ভাবেও অবলম্বিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। অথচ আমরা তাহা ত্যাগ করিয়া বিজাতীয় আদর্শে সমাজ-গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছি!

প্রাচীন আদর্শ ত্যাগের ফল।

কিন্তু যেখানেই আমার প্রাচীন আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতেছি, সেইখানেই অনর্থের সৃষ্টি হইতেছে। গুরুশিষ্য সম্বন্ধের কথাই বলি। গুরুর দোষ আবৃত করে বলিয়া শিষ্যের ছাত্র নাম হইয়াছে। গুরুর নিকট শিষ্য—

"শরীরঞ্চৈব বাচঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়মনাংসি চ।
নিয়ম্য প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠেৎ বীক্ষ্যমাণো গুরোর্মুখম্।"

স্বয়ং গুরুনিন্দা করা দূরে থাকুক—

"গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দাবাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং চ ততোঽন্যতঃ॥"

আর এখন গুরু-নিন্দার ত কথাই নাই, গুরু-প্রহার পর্য্যন্ত আমাদের দেশের ছাত্রদিগের গৌরবের কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে! কেহ তাহাদের নিন্দা করিলে ইউরোপের ছাত্রদিগের উদাহরণ দিয়া সেই কার্য্যের সমর্থন করা হয়!

আমাদের দেশে কেহ কেহ স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধও পাশ্চাত্য আদর্শে গঠন করিতে চাহেন।

স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ।

আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে—স্ত্রী কেবল ভোগের সামগ্রী নহেন; তিনি ধর্ম্মকার্য্যের সহায়। স্বামী ও স্ত্রীর এক হৃদয়, এক মন।

"সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ, সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা, সমু দেষ্ট্রী দধাতু নৌ॥"

[বিশ্বদেবগণ আমাদের হৃদয়কে মিলিত করুন। জলদেবতারা মিলিত করুন। বায়ু মিলিত করুন। বিধাতা মিলিত করুন। ফলদাত্রী সরস্বতী মিলিত করুন।]

"অন্নপাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা।
বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে॥"

[হে বধূ, মণিতুল্য অন্নরূপ ফাঁদ দিয়া, রত্নতুল্য প্রাণরূপ সূত্র দিয়া, সত্যরূপ গ্রন্থি দিয়া (আমার হৃদয় ও মনের সহিত) তোমার হৃদয় ও মন এক সঙ্গেই বন্ধন করি।]

"যদেতৎ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব॥"

[তোমার এই যে হৃদয়, তাহাই আমার হৃদয়, এবং আমার এই যে হৃদয়, ইহাই তোমার হৃদয়।]

কিন্তু এই হৃদয়ের মিলনে এখন অনেকে সন্তুষ্ট নহেন। পাতিব্রত্য তাঁহাদের নিকট "অখড্ডিম্ব"। তাঁহাদের আদর্শ—স্বামী স্ত্রী স্ব-স্ব-প্রধান হইবে; পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগিতা করিবে; একই পদলাভের জন্য পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে ভোট সংগ্রহ করিয়া বেড়াইবে! ইহার ফলে ইউরোপে নারী তাঁহার স্বভাবসুলভ গুণরাজি হারাইতেছেন, তাঁহার সুকুমার বৃত্তি সকল বিনষ্ট হইতেছে। মাতৃত্বের গৌরব এখন আর তাঁহার আকাঙ্ক্ষণীয় নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই বিষম ভাববিপর্য্যয়ে বিচলিত হইয়াছেন; আর আমরা সমাজে সেই বিপ্লব আনিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি!

আর কত কথা বলিব! আমার এ সকল কথা নূতন নহে। ইতঃপূর্ব্বে বহু যোগ্যতর ব্যক্তি এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। নিজের ক্ষুদ্রশক্তি অনুসারে সাহিত্য-সভায় উপর্য্যুপরি গত কয়েকটি অধিবেশনে আমি আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে এই বিজাতীয় আদর্শের সৃষ্টির প্রয়াসের আলোচনা করিয়াছি। সুখের বিষয়, সে আলোচনায় কিছু ফল ফলিয়াছে। কারণ, বিরুদ্ধ পক্ষ আমার মস্তকে তিরস্কারের পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছেন। বাস্তবিকই আমি তাহা পুষ্পবৃষ্টি বলিয়া মনে করি। এক মহাপুরুষ বিপক্ষ কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়াও বলিয়াছিলেন—Strike but hear—প্রহার কর, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার কথাগুলি শ্রবণ কর। আমারও সেই উক্তি। আমি স্তুতিতে কখনও আত্মবিস্মৃত হই নাই, নিন্দাতেও বিচলিত হইয়া কর্ত্তব্যচ্যুত হইব না। আমার করযোড়ে প্রার্থনা—সাহিত্যকে বিজাতীয় আদর্শে পঙ্কিল করিয়া তুলিও না। আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখ। দেশ-কাল পাত্র-ভেদে যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহা করিতে হইবে; প্রাচীন গবাক্ষ ভাঙ্গিয়া তাহার পরিবর্ত্তে বড় বড় জানালা বসাও, ক্ষতি নাই; কিন্তু দোহাই তোমাদের, ঠাকুরদালান ভাঙ্গিয়া সেখানে বাবুর্চ্চী খানার প্রতিষ্ঠা করিও না। অর্থোপার্জ্জন কর, গাড়ী জুড়ী হাঁকাও দেখিয়া আমরা সুখী হইব; কিন্তু বৎসরান্তে একবার মহামায়াকে বাড়ীতে আনিও, দরিদ্র ইতর ভদ্র প্রতিবেশীদিগকে পরিতোষসহকারে আহার করাইও। হিন্দুর বিশিষ্টতা হারাইও না। বৈশিষ্ট্য হারাইলে জাতির জাতীয়ত্ব থাকে না। যদি জাতীয়ত্বই নষ্ট হইল, তাহা হইলে রহিল কি?

এই আদর্শহীনতার প্রসঙ্গে আমি এই স্থানে আমার নমস্য পূজনীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত সম্প্রদায়ের নিকট করযোড়ে একটি নিবেদন করিব। হিন্দুর শিক্ষা ও সভ্যতার ধারা তাঁহারাই এখন বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হিন্দু সমাজের আদর্শ ছিলেন। এখনও প্রাচীন হিন্দু আদর্শ অন্বেষণ করিতে হইলে, আমরা তাঁহাদের গৃহেই গমন করিয়া থাকি। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, তাঁহাদের অনেকের গৃহে এখন আর সে আদর্শ দৃষ্টিগোচর হয় না। এক জন লোকচরিত্রাভিজ্ঞ ইংরাজ রাজনীতিক বলিয়াছিলেন, "টাকা দিয়া প্রত্যেক লোককেই কিনিতে পারা যায়।" ইংলণ্ডের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের দেশে প্রাচীন কালে টাকা দিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কিনিতে পারা যাইত না। এখন তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়দিগের সরল সাধু জীবন এবং অনন্যসাধারণ জ্ঞানস্পৃহা তাঁহাদিগকে জগতের বরণীয় করিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে জীবন-সংগ্রাম দিন দিন গুরুতর হইয়া উঠিতেছে বটে, কিন্তু সেই পরিমাণে তাঁহাদিগকে আরও অধিক সাবধান ও সতর্ক হইতে হইবে। তাঁহারা আমাদিগের গুরু। কিছু অনন্যসাধারণ গুণ না থাকিলে জগতের মস্তক স্বতঃই তাঁহাদের চরণতলে লুণ্ঠিত হইবে কেন? দেশ-কালের প্রভাব অতিক্রম করা বড় কঠিন, সন্দেহ নাই; কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহারা যে সমস্ত গুণ লাভ করিয়াছেন, তাহার বলে ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে তত কঠিন নহে। বড় দুঃখে এই কথাগুলি বলিলাম; আশা করি, পূজনীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতমণ্ডলী আমাকে ক্ষমা করিবেন।

ব্রাহ্মণপণ্ডিত-মণ্ডলীর প্রতি নিবেদন।

সাহিত্যে ভাবের কথা বলিলাম, এইবার ভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। এ সম্বন্ধে স্বপক্ষে বিপক্ষে বলিবার সমস্ত কথাই বলা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি আর এ বিষয়ে বাহুল্য করিব না। সে দিন কোনও এক সংবাদপত্রে দেখিলাম, সম্পাদক মহাশয় এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজকাল বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরীক্ষকদিগের মধ্যে, সাধু ভাষা ও প্রাদেশিক ভাষার পক্ষপাতী, উভয় সম্প্রদায়েরই লোক আছেন। পরীক্ষার্থী কোন্ ভাষায় তাহার উত্তর লিখিবে? যে সকল পরীক্ষক প্রাদেশিক ভাষার পক্ষপাতী, তাঁহারাও বঙ্গদেশের সমস্ত প্রদেশের ভাষার সংবাদ রাখেন না। এরূপ স্থলে যদি তাঁহারা কলিকাতার মৌখিক ভাষাকেই আদর্শ করিয়া ছাত্রদিগকে নম্বর দেন, তাহা হইলে, মফঃস্বলের ছাত্রগণের ত সর্ব্বনাশ! style বা রচনাপদ্ধতির প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ দৃষ্টি আছে। styleএর জন্য কিছু নম্বর স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হয়। অতএব যদি কেহ লেখে—

সাহিত্যের ভাষা।

"ইউরোপীয় সভ্যতা আজ পর্য্যন্ত আমাদের গ্রামের বুকের ভিতর তার শিং ঢুকিয়ে দেয় নি। অর্থাৎ রেলের রাস্তা সে গ্রামকে দূর থেকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে।"

কিংবা—

"মানুষে বর্ত্তমানকেই সব চাইতে অগ্রাহ্য করে। যা'দের চোখ কান বোজা আর মন পঙ্গু, তাঁরা এই নব সাহিত্যকে নবীন ব'লে নিন্দা ক'রবেন। তবে এর মধ্যে আরামের কথা এই যে বর্ত্তমানের কোনও ইতিহাস নেই, সুতরাং এখন থেকে বঙ্গ-সরস্বতীর ঘাড় থেকে ভূত নেমে যাবে।"

কিংবা—

"দিগন্ত থেকে দেখ্‌তে পাই মেঘগুলো নানা ভঙ্গীতে আকাশে উঠে চলেছে, যেন সৃষ্টিকর্ত্তার আঙ্গিনার আকার ফোয়ারার মুখ খুলে গেচে। বস্তু প্রায় কিছুই নেই কেবল আকৃতি, কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই। নানা রকমের আকার;—কেবল সোজা লাইন নেই। সোজা লাইনটা মানুষের হাতের কাজের। তার ঘরের দেওয়ালে, তার কারখানাঘরের চিম্‌নিতে মানুষের জয়স্তম্ভ একেবারে সোজা খাড়া।"

—তাহা হইলে পরীক্ষকমহাশয়গণ কিরূপ নম্বর দিবেন? কলিকাতার 'সৌরসেনী', 'পৈশাচী', কিংবা কিছুদিন পূর্ব্বে 'নায়ক' পত্রে বিহারের মধ্য-বাঙ্গালা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হইতে বাঙ্গালা ও উর্দ্দু 'জবান'-মিশ্রিত যে অপূর্ব্ব ভাষার নমুনা প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই 'বিহারী বোর্দ্দি', আর চলিত সাধু ভাষা সমান আসন পাইবে কি?

সমস্যার কথা বটে! আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে এ সমস্যার মীমাংসা করিতে অনুরোধ করি।

যাহা হউক, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি এখন প্রত্যেক বাঙ্গালীর পরম শ্লাঘার বিষয় হইয়াছে। এ সময় গৃহবিচ্ছেদ ভাল নহে। তাহাতে উন্নতির ব্যাঘাত হইতে পারে। উন্নতির জন্য কি প্রয়োজন, তাহা স্থিরচিত্তে বিচারপূর্ব্বক একযোগে সেই অভাব মোচনের চেষ্টা করিতে হইবে। প্রচলিত সাহিত্যের ভাষা যদি তাহাকে প্রকৃতই 'পঙ্গু' করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। কিন্তু কোনও পক্ষেরই কেবল নির্ব্বন্ধের বশবর্ত্তী হইয়া কোনও কাজ করিলে চলিবে না। বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

* * * * *

বাহুল্যভয়ে এইখানেই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। আমি ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া কোনও কথাই লিখি নাই। যাহা উচিত মনে করিয়াছি, যথাজ্ঞান যথাশক্তি তাহাই বলিয়াছি। নিজের পাণ্ডিত্যখ্যাপন আমার উদ্দেশ্য নহে; কারণ, এই অভিরূপভূয়িষ্ঠ পরিষদে আমার পক্ষে সে চেষ্টা ধৃষ্টতামাত্র। তবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য আপনাদের ন্যায় আমারও প্রাণের জিনিস। তাহার উন্নতির জন্য ভগবান্ আমাকে যতটুকু শক্তি দিয়াছেন, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার নিয়োগ করিয়া থাকি। এই নীরস অভিভাষণও সেই উদ্দেশ্যেই রচিত। আপনাদের প্রীতিকর হইলে, শ্রম সার্থক মনে করিয়া কৃতার্থ হইব। অপ্রীতিকর হইলে তিরস্কার করিবেন; তাহাও—

"বহুমানে লব শির পাতি।"

বাঙ্গালা সাহিত্য।

[স্বর্গীয় রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে অনূদিত।]

২

গ্রন্থকারগণের মধ্যে অতঃপর মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথাই প্রথম বিবেচ্য। তিনি বিস্তর কবিতা ও নাটকের প্রণেতা। বোধ হয়, আর কোনও লেখকের

দোষ গুণ সম্বন্ধে এত মতভেদ দৃষ্ট হয় না। কোনও কোনও ভাববিহ্বল সমালোচক তাঁহাকে কালিদাসের সহিত তুলনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন; আবার কেহ কেহ তাঁহাকে অতি নিকৃষ্ট লেখক বলিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। আমরা উক্ত দুই শ্রেণীর সমালোচকগণের মধ্যে কোনও শ্রেণীর সমালোচকের সহিত একমত হইতে পারি না। তাঁহার রচনায় বিশিষ্ট গুণ আছে, স্বীকার করি; কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা মহাকবিদিগের মধ্যে তাঁহাকে আসন প্রদান করিতে প্রস্তুত নহি। বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি নূতন পরিবর্ত্তন ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে অনেক কটু সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার ন্যায্য স্থান বোধ হয় সকলের উপরে।

তাঁহার কাব্যগ্রন্থ—'মেঘনাদবধ', 'তিলোত্তমাসম্ভব', 'বীরাঙ্গনা', এবং 'ব্রজাঙ্গনা'। প্রথমোক্ত দুইখানি যে শ্রেণীর কাব্য, তাহা য়ুরোপে 'এপিক্' নামে ও ভারতবর্ষে 'মহাকাব্য' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দুইখানিই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ রচনা এই প্রথম। দুইখানির মধ্যে 'তিলোত্তমা' প্রথমে রচিত; কিন্তু 'মেঘনাদবধ'ই দত্তসাহেবের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যে রামায়ণ হইতে ভারতীয় বহু কবি রসসঞ্চয় করিয়া কৃতী হইয়াছেন, গ্রন্থের বিষয়টি সেই 'রামায়ণ' হইতেই গৃহীত—রাবণের সহিত রামের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রাবণের পুত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ও যোদ্ধা মেঘনাদ রামানুজ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক নিহত হন। আখ্যানবস্তুটি এই। কিন্তু দত্ত সাহেব বাল্মীকির নিকট গল্পটি অপেক্ষা অন্যান্য বিষয়ে অধিকতর ঋণী আছেন। তথাপি কাব্যখানি প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার নিজস্ব। দৃশ্যাবলী, পাত্রপাত্রীগণের চরিত্র-চিত্র, ঘটনাসংস্থান, এবং অবান্তর ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি অনেক অংশে দত্ত সাহেবের নিজের সৃষ্টি। উহাদের উদ্ভাবনে ও ক্রমপরিণতিতে দত্ত সাহেব উচ্চ অঙ্গের কলাকুশলতা প্রদর্শিত করিয়াছেন। আমাদের যেটুকু স্থান আছে, তাহাতে বিস্তারিতভাবে কাব্যখানির সমালোচনা করা অসম্ভব। সুতরাং আমরা কবির কলাকুশলতার যথাযোগ্য বর্ণনা করিতে, বা পাঠকগণকে তাহার উপযুক্ত পরিচয় প্রদান করিতে অক্ষম। কেবল বাল্মীকি নহে, হোমর ও মিল্টনের নিকটও তিনি অনেক বিষয়ে ঋণী। কিন্তু যে সকল ভাব তিনি উক্ত কবিগণের নিকট সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পরিপাক করিয়া তিনি তাঁহার নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন, এবং সমগ্রভাবে বিবেচনা

করিলে,- এই কাব্যগ্রন্থখানি আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ গ্রন্থ, সন্দেহ নাই। পাত্রপাত্রীগণের কল্পনা অতি সুপরিস্ফুট, এবং পাঠকের চিত্তমুগ্ধকর। ঘটনা-পরম্পরা যদিও অনেক স্থলে অতিলৌকিক, তথাপি অতি নিপুণ ও সহজ ভাবে সমাবিষ্ট হইয়াছে। রূপকাদি অলঙ্কার-গুলি কোথাও মধুর, কোথাও করুণ, কোথাও বা রুদ্র-রসাশ্রিত। কল্পনার ক্রীড়া অনুক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল। ভাষা অত্যন্ত কবিত্বসম্পন্ন, এবং শব্দচয়ন এরূপ সুন্দর যে, পরিস্ফুট ভাবগুলির সঙ্গে সঙ্গে তদনুকূল অন্যান্য ভাবও অনুরণিত হইতে থাকে। কবিতার চরণগুলি প্রচলিত সংস্কৃত প্রথা অনুসারে সকল স্থানে দুইটি দুইটি পংক্তিতে সমাপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু মিল্টনের কবিতার ন্যায় যতি বা বিরামের স্থানগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সন্নিবিষ্ট হওয়ায়, আমাদের মতে, পদগুলি অতি সুললিত ও সুখশ্রাব্য হইয়াছে, এবং আবেগময়-ভাবপ্রকাশের অধিকতর উপযোগী হইয়াছে।

কিন্তু দত্ত সাহেবের রচনা একবারে নির্দ্দোষ নহে। উহাতে বিশ্রামের অভাব পরিলক্ষিত হয়। যেখানে ফুৎকারও অনাবশ্যক, সেখানে প্রবল ঝটিকা ভীষণ নিনাদে গর্জ্জন করে। যেখানে কোনও প্রয়োজন নাই, সেই স্থানে মেঘাড়ম্বর ও অজস্র বারিপাতে বন্যার সৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়; সমুদ্র অকারণ ক্রোধে স্ফীত হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে, এবং সকলের অনর্থক বিরক্তির উৎপাদন করে। দত্ত সাহেবের ন্যায় মার্জ্জিতরুচি ও প্রতিভাবান লেখকের এরূপ বাগাড়ম্বর শোভা পায় না। একই রূপক ও শব্দঘটার বারংবার পুনরাবৃত্তিও তাঁহার একটি প্রধান দোষ, এবং পাঠকের পক্ষে বড়ই বিরক্তিজনক। অপরের ভাব আত্মসাৎ করা দোষটিও যে একবারে নাই, তাহা বলা যায় না। হোমর ও ভার্জিল হইতে স্থানে স্থানে চুরী আছে, এবং মিল্টন ও কালিদাস হইতেও ঐরূপ চুরী লক্ষিত হয়।

তাহার পর, ব্যাকরণের মর্য্যাদাও সকল স্থানে রক্ষিত হয় নাই। ইংরাজী পদ্ধতির অনুকরণে 'স্তুতিলা', 'স্বনিলা', 'নির্ঘোষিলা' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের ঘন ঘন প্রয়োগেও আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে। আমরা মেঘনাদবধ হইতে কোনও অংশ উদ্ধৃত করিলাম না; কারণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পৃথকভাবে দেখিলে কাব্যখানির দোষগুণ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ হইবে না। সমগ্র কাব্য-খানি সুন্দর, কিন্তু যেমন একখানি ইষ্টক দেখিয়া অট্টালিকার ধারণা হয় না, সেই-রূপ এক একটি ক্ষুদ্র অংশ পাঠ দ্বারা কাব্যখানির সৌন্দর্য্য বিচার করা অসম্ভব।

দত্ত সাহেবের অপর গ্রন্থাবলীর মধ্যে তিলোত্তমাসম্ভব সর্ব্বপ্রথমে লিখিত। ইহাও 'মেঘনাদবধে'র ন্যায় 'এপিক' বা মহাকাব্য হইলেও, উহা অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। বিষয়টি তিলোত্তমার জন্ম। তিলোত্তমা ব্রহ্মার সুন্দরতম সৃষ্টি। আর্য্যদেবতাগণকে সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দুই প্রবল পরাক্রান্ত অসুর ভ্রাতা স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করায়, উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটাইবার জন্যই তিলোত্তমার সৃষ্টি।

'তিলোত্তমা'র পর আমরা সানন্দে 'বীরাঙ্গনা' নামক আর একখানি কাব্যের বিষয় উল্লেখ করিব। মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবার স্পর্দ্ধা না থাকিলেও, এই কাব্যখানি 'তিলোত্তমা' অপেক্ষা অধিকতর পরিপক্কতার পরিচায়ক। কতিপয় বীরাঙ্গনার স্বামীর প্রতি পদ্যে লিখিত পত্রের আকারে ইহা পর্য্যায়ক্রমে রচিত। 'মেঘনাদবধে'র পরই ইহা রচিত হয়, এবং ইহাতেও 'মেঘনাদবধে'র ন্যায় সুন্দর রূপকাদি অলঙ্কার, ভাষার চমৎকারিত্ব, পদের লালিত্য ও শ্রুতিমধুরতা আছে। 'ব্রজাঙ্গনা' একখানি ক্ষুদ্র অসমাপ্ত কাব্য। ইহা মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ইহাতে রাধার বিরহবেদনা বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে পূর্ব্বে এত কবিতা রচিত হইয়াছে যে, নূতনত্ব সৃষ্টি একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু দত্ত সাহেব ইহাতেও অনেক নূতন ও সুন্দর ভাব সন্নিবিশিষ্ট করিয়াছেন, এবং অমিত্রাক্ষরের ন্যায় মিত্রাক্ষর ছন্দেও অনুরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, তাঁহার মিত্রাক্ষর ছন্দের রচনা বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাঁহার সনেটগুলির আমরা বিশেষ প্রশংসা করি না, কিন্তু সেগুলিও অপ্রসিদ্ধতর গ্রন্থকারের যশোলাভের কারণ হইতে পারিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সনেটগুলি য়ুরোপে রচিত হয়। একটি ভার্সেলে লিখিত হয়। কতকগুলি দান্তে, আচার্য্য গোল্ড্‌ষ্টুকার, টেনিসন, ভিক্টর হুগো ও ইতালীকে সম্বোধন করিয়া লিখিত। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, সনেটগুলি বহু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রক্ষিপ্তভাবে রচিত।

নাট্যকার-রূপে দত্ত সাহেব তেমন কৃতিত্বলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার লিখিত নাট্যগ্রন্থ—'শর্ম্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী' ও 'কৃষ্ণকুমারী'। প্রথমোক্ত নাটকখানি জনসাধারণের বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় উহার মধ্যে কোনখানিই তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। এ পর্য্যন্ত কোনও বাঙ্গালী লেখক নাটক-প্রণয়নে যথার্থ ক্ষমতা দেখাইতে পারেন নাই। এমন কি, আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাট্যকার বাবু দীনবন্ধু মিত্রও মনুষ্য-হৃদয়ের উচ্চতর

ভাবগুলি চিত্রিত করিতে গিয়া একবারে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। দত্ত সাহেব যখনই নাটক লিখিতে বসেন, তখনই তাঁহার অবিসংবাদিত কবি-প্রতিভা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। তাঁহার প্রহসনগুলি কিন্তু ভাল। তন্মধ্যে একখানি—'একেই কি বলে সভ্যতা ?' বাঙ্গালাভাষায় অদ্বিতীয় গ্রন্থ। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি নিজগুণপ্রাচুর্য্য ব্যতীত অন্য কারণেও সমালোচনার যোগ্য।

আজি কালি বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র বহু পুস্তক প্রসব করিতেছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে অধিকাংশই কোনও খ্যাতনামা লেখকের অনুকরণমাত্র। বিদ্যাসাগর, টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম, দীনবন্ধু ও এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'-প্রণেতার অনুকারী অনেক হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয়, 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অনুকরণে যত পুস্তক রচিত হইয়াছে, তত আর কোনও গ্রন্থের আদর্শে রচিত হয় নাই। উক্ত গ্রন্থখানি একটি বিশেষ অভিপ্রায়ে লিখিত প্রহসন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, অতিরিক্ত মদ্যপান ও তদানুষঙ্গিক দোষগুলি ব্যঙ্গসহকারে প্রকটিত করা। বটতলার ছাপাখানা ও পুস্তকের দোকানগুলিতে মদ্যপানের দোষ সম্বন্ধে এক আনা বা দুই আনা মূল্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকের রীতিমত বন্যা উপস্থিত হইয়াছে। একটু বৃহৎ আকারের প্রহসনও বিস্তর প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'বুঝ্‌লে কি না' নামক গ্রন্থখানি জনসাধারণ কর্ত্তৃক যথেষ্ট আদৃত হইয়াছে, এবং অনেকবার ভদ্রমহোদয়গণের বাটীতে অভিনীত হইয়াছে। উক্ত সমুদায় গ্রন্থই 'একেই কি বলে সভ্যতা'র নকলমাত্র। সুতরাং এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি কেবল বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুইখানি প্রহসনের অন্যতম বলিয়াই নহে, উহার অনুকরণে এতগুলি পুস্তক রচিত হইয়াছে বলিয়াও, উহার গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে।

এই প্রশংসনীয় ক্ষুদ্র পুস্তকখানির অংশবিশেষ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করিলে, ইহার সৌন্দর্য্য সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে না। কারণ, ইংরাজী-শব্দসঙ্কুল উদ্ভট ভাষা এবং তর্কসভাদিতে ব্যবহৃত কৃত্রিম বাগাড়ম্বরেই উহার অর্দ্ধেক রস নিহিত আছে। নর্ত্তকী ও সুরাপানের আমোদে মত্ত 'জ্ঞান-তরঙ্গিণী' নামক এক বৈজ্ঞানিক তর্কসভার গৃহে ইহার প্রধান দৃশ্য স্থাপিত। ইহাতে যেরূপ চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা অতীব ঘৃণার্হ। প্রধান কথা এই যে, অঙ্কিত চিত্রগুলি সত্যের অনুরূপ কি না। বাঙ্গালার লজ্জার কথা হইলেও, আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, চিত্রগুলি বাস্তবানুরূপ। সুরাপানে উত্তেজিত যে সমাজ-সংস্কারকের চেষ্টা ইংরাজী-বচন-সংবলিত দীর্ঘ বক্তৃতামাত্রেই

পর্য্যবসিত হয়, তাঁহাদিগকে য়ুরোপীয়গণ প্রায়ই যথার্থ সভ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে গণ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু তাহা করা উচিত নহে। সুরাপান, নিম্নশ্রেণীর ফিরিঙ্গীর বেশভূষা-পরিধান ও বর্ব্বরোচিত ইংরাজী-ভাষার ব্যবহার যাঁহারা সভ্যতার চিহ্ন বলিয়া মনে করেন, ইঁহারাই যে সেই সকল অর্দ্ধশিক্ষিত বাবুদের প্রতিনিধিস্বরূপ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইঁহারাই দলে দলে সরকারী অফিসসমূহে বিচরণ করেন, এবং উচ্চ কর্ম্মচারীদিগকে চাকুরীর আবেদনপত্র দ্বারা উদ্ব্যস্ত করিয়া থাকেন, সন্ধ্যাকালে কলিকাতার রাজপথসমূহে জনতাবৃদ্ধি করেন, মদ্যের বিপণীগুলি পোষণ করেন, এবং যখন টাউনহলে বাবু কেশবচন্দ্র সেন বক্তৃতা করেন, তখন তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর অধিকাংশ আসন অধিকৃত করেন। যথার্থ শিক্ষালাভ তাঁহাদের কিছুমাত্র হয় নাই। ইঁহারা কোনও ইংরাজীস্কুলে কয়েক বৎসর মাত্র যৎসামান্য ইংরাজী শিক্ষা করেন, এবং হীনাবস্থা হইলে অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালেই উমেদারী আরম্ভ করেন। ধনবান হইলে ইঁহারা অসঙ্কোচে উক্ত বয়সেই গর্হিত আমোদ প্রমোদে ব্যাপৃত হন। এই শ্রেণীর লোকে দেশ প্লাবিত হইয়াছে, এবং দত্তসাহেবের চিত্রটি বাস্তবানুরূপ বটে, কিন্তু যথার্থ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সহিত ইঁহাদিগকে একশ্রেণীভুক্ত করা উচিত নহে—তাঁহাদের সংখ্যা (ইংরাজী শিক্ষার সম্বন্ধে যাহাই বলা হউক না কেন) তুলনায় অতি অল্প।

এইবার আমরা দীনবন্ধু মিত্রের বিষয় কিছু বলিব। ইনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালী নাট্যকার। একমাত্র উৎকৃষ্ট নাট্যগ্রন্থকার বলিলেও বলা যায়। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচখানি নাটক লিখিয়াছেন; তন্মধ্যে দুইখানি প্রহসন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'নীলদর্পণে'র নাম বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত অন্য সকল গ্রন্থ অপেক্ষা য়ুরোপীয় জনসাধারণের নিকট অধিকতর পরিচিত। নীলবিপ্লব-সংক্রান্ত বলিয়াই উহা এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—নতুবা অন্য কোনও কারণে উহা এত প্রসিদ্ধি লাভ করিত না। যে বিচারালয় পক্ষপাতিতা ও চিত্তচাঞ্চল্য পরিহারপূর্ব্বক বিচার করিতে অসমর্থ বলিয়া স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়া শীঘ্রই বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই বিচারালয় কর্ত্তৃক লং সাহেব যখন দোষী বলিয়া দণ্ডিত হইলেন, তখন য়ুরোপীয় জনসাধারণের চিত্ত অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। উক্ত সময়ে 'নীলদর্পণ' একখানি অশ্লীল ও ইতরোচিত নিন্দাবাদে পূর্ণ গুণহীন গ্রন্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। আমরা উক্ত মতের সম্পূর্ণরূপে

অনুমোদন করি না, কিন্তু কাব্য হিসাবে আমরা এ গ্রন্থখানিকে অতি নিকৃষ্ট আসনের যোগ্য বিবেচনা করি। ইহার মূল্য যাহা কিছু ছিল, তাহা রাজনীতি-ঘটিত, কাব্য বলিয়া নহে। আমরা এক্ষণে কাব্যকলার বিষয় লিখিতে বসিয়াছি,—রাজনীতির বিষয় নহে; সুতরাং এ পুস্তকের বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিব না।

দীনবন্ধু বাবুর অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে 'লীলাবতী'ই জনসাধারণের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু যদিও আমরা ইহার অনেক সদ্গুণ আছে বলিয়া স্বীকার করি, তথাপি আমাদের বিবেচনায় 'নবীন-তপস্বিনী' অধিকতর প্রশংসার যোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থের অধিকতর দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু গুণের আধিক্যে তাহা আবৃত হইয়া গিয়াছে। সেক্ষপীয়রের Merry Wives of Windsor নামক নাটক হইতে ভাবটি লইয়া ইহা রচিত। গল্পটি একটি সুপরিচিত হিন্দু উপকথা। তাহার উপর এক জন হিন্দু ফল্‌ষ্টাফের প্রেমলীলার অলঙ্কার চড়ান। ফলষ্টাফ-স্থানীয় পাত্রটির নাম জলধর। সে এক জন রাজমন্ত্রী। তাহার দেহভার ও উদরের পরিধি কিঞ্চিৎ অসুবিধাজনক হইলেও, তাহার যৌবনসুলভ প্রেমপ্রবণতা কিছুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। তাহার ভালবাসার পাত্রী মালতী, কালীকান্ত নামক জনৈক সদাগরের যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রী। মালতীর মল্লিকানাম্নী এক দূরসম্পর্কীয়া ভগ্নী আছেন। তাঁহার মন অতি পবিত্র হইলেও রসনাটি কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ, এবং উহার ধার পরীক্ষা করিতে তিনি কখনই বিমুখ নহেন। মালতীর প্রতি জলধরের অনুরাগ ও প্রেম-নিবেদনের কথা শুনিয়া, তিনি তাহাকে মালতী দ্বারা কয়েকটি কার্য্য শিক্ষা প্রদান করেন, তাহাই নাটকখানির বিষয়ীভূত। প্রথমতঃ, মালতীর সহিত সাক্ষাতের ছলে জলধরের নিজস্ত্রীর সহিত মিলন সংঘটন করা হইল। মালতী-ভ্রমে জলধর তাহার নিকট নিজস্ত্রীর নিন্দা ও মালতীর প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল; কিছুক্ষণ পরেই কালীকান্ত আসিয়া পড়ায় জলধর পলায়ন করিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই স্ত্রীর নিকট সম্মার্জ্জনীর প্রহার সহ্য করিতে হইল। আর একটু হইলেই ক্রুদ্ধ কালীকান্তের নিকট মালতীবেশ-ধারী দণ্ডিত হইত, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মপরিচয় দান করিয়া সে অব্যাহতি পাইল।

দ্বিতীয় দৃশ্য, সদাগরের বাটী। সেইখানে জলধরের আশা পূর্ণ হইবে বলিয়া সে আশ্বাস পাইয়াছে। এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে জলধর

নিজ প্রভু ভগ্নস্বাস্থ্য রাজাকে অনুরোধ করিয়া কালীকান্তকে আরবদেশে হোঁদলকুৎকুঁতে নামক কাল্পনিক জন্তুর মাংস সংগ্রহ করিবার জন্য পাঠাইয়াছে। উক্ত জন্তুর মাংসই রাজার রোগের অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া রাজাকে সে বুঝাইয়াছে। মল্লিকার পরামর্শে সদাগর আরবদেশে না গিয়া নিজবাটীর সন্নিকটে এক স্থানে লুক্কায়িত থাকে, এবং পূর্ব্বমন্ত্রণা অনুসারে যে সময়ে জলধর রমণীদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই সময়ে বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। কালীকান্তের হঠাৎ প্রত্যাবর্ত্তনে জলধর লুকাইবার উৎকৃষ্টতর স্থান না পাইয়া, অগত্যা একটি কদাকার মুখস পরিয়া একটা আলকাতরার পিপার মধ্যে প্রবেশ করে, এবং তৎপরে একটা তুলার গাদায় লুক্কায়িত থাকে। তাহার ফল সহজেই অনুমেয়। অবশেষে তাহাকে পলায়নের পরামর্শ দেওয়া হয়, এবং মল্লিকা তাহাকে একটি খিড়কীদ্বার দিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। উক্ত দ্বারের সম্মুখে আরবদেশীয় জন্তুর জন্য নির্ম্মিত একটি প্রকাণ্ড লৌহপিঞ্জর স্থাপিত ছিল। জলধর অন্ধকারে পিঞ্জরমধ্যে বেগে প্রবিষ্ট হয়, এবং মল্লিকা উহার দ্বারটি বন্ধ করিয়া দেয়। প্রাতঃকালে পিঞ্জরাবদ্ধ জলধরকে রাজসভায় লইয়া যাওয়া হয়। পথে অদ্ভুত জন্তু দেখিবার জন্য চারি দিকে লোকের ভিড় হইল। কেহ উহাকে ঢিল মারিতে লাগিল। পাছে লোকে চিনিতে পারে, এই ভয়ে ভীত হইয়া জলধর বন্যপশুর ন্যায় তীব্র চীৎকার ও লম্ফ ঝম্প করিতে লাগিল। অবশেষে সকলে রাজার নিকট উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে কালীকান্তও দেখা দিল, এবং সমস্ত ঘটনা যথাসময়ে বিবৃত হইল।

উপরি-উক্ত ঘটনাগুলি নাটকখানির হাস্যরসের আশ্রয়ীভূত। ইহা ব্যতীত আর একটি গম্ভীররসাশ্রিত গল্প এই নাটকে স্থান পাইয়াছে। দুইটি গল্পের পরস্পর সন্নিবেশ তেমন দৃঢ় নহে। শেষোক্ত গল্পটি রাজা ও রাণীকে লইয়া। বহু বৎসর পূর্ব্বে রাণীকে রাজা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পরিত্যাগ করেন। অনেকের ধারণা, তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে। সকলের বিশ্বাস, তিনি জীবিত নাই। এক্ষণে সকলে রাজাকে রাজ্যরক্ষার জন্য পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে, কিন্তু তাঁহার মন রাণীর জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। অবশেষে রাজা এক ভিক্ষুক-রমণীর বেশে রাণীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে ঋষিবেশধারী সুন্দর যুবাপুরুষকে পুত্র বলিয়া জানিতে পারিলেন। রাজা যে সুন্দরীকে দ্বিতীয়পত্নী-রূপে গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, ঋষিবেশী পুত্র তাহাকে ভালবাসেন, এবং অবশেষে উভয়ের বিবাহ হইল।

এই গম্ভীর রসের গল্পট আদৌ প্রশংসাযোগ্য নহে। কিন্তু অপর গল্পটি অতি হাস্যোদ্দীপকভাবে রচিত হইয়াছে। জলধরের চরিত্রটি যদিও মূলতঃ সেক্ষ-পীয়রের ফল্‌ষ্টাফ্‌ হইতে গৃহীত, তথাপি উহা সুসঙ্গত ও সজীব হইয়াছে, এবং কৌতুকপ্রিয়া অশেষকৌশলসম্পন্না চতুরা মল্লিকা দীনবন্ধুবাবুর অঙ্কিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্ত্রী-চরিত্র। জলধরের কুৎসিতা ও সন্দিগ্ধচিত্তা স্ত্রীর চিত্রও অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। তাহার স্থূলকায় বৃদ্ধ স্বামীকে দেশশুদ্ধ সমস্ত যুবতী পাইবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত, এবং ছলচাতুরীর দ্বারা বশীভূত করিবার চেষ্টায় আছে, এই দৃঢ় বিশ্বাস পাঠকের কৌতুক উৎপাদন করে।

ক্রমশঃ।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। চৈত্র।—অনুবাদের নানা ফুলে সাজি সাজাইয়া 'ভারতী'র পূজার ব্যবস্থা হইতেছে। 'তাঁতাজিলের মৃত্যু' মেটারলিঙ্কের অনুবাদ। 'সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা' La Mazalierreর অনুবাদ। 'ছন্নছাড়া' Margaurite Audouxএর উপন্যাসের অনুবাদ। তা ছাড়া, (১) 'আমাদের শরীরের যুদ্ধের কথা', (২) 'কাশ্মীরী বাগ', (৩) 'বর্ত্তমান যুদ্ধে লিপ্ত দেশ' ও (৪) 'গ্রীক আর্টের কথা'ও এক প্রকার অনুবাদ—সঙ্কলন। নিজের মালঞ্চে ফুল যখন দুর্লভ, তখন বাসিফুল ও ঘেঁটু ফুল না কুড়াইয়া, বিদেশের বাগান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া সাজি সাজাইলে লাভ আছে। ইহার মধ্যে শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী 'আমাদের শরীরের যুদ্ধের কথা'য় বিষয়টিকে আত্মসাৎ করিয়া সাধারণের বোধগম্য ভাষায় জলের মত বুঝাইয়া দিয়াছেন। সহজ ভাষাও যে বিশুদ্ধ করিয়া লেখা যায়, এবং সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য গুরুচণ্ডালীর আশ্রয় না লইলেও চলে, চল্‌তী ও ব্যাকরণবর্জ্জিত ভাষার শ্রীমতী রেজীনা গুহ 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় লেখক তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার 'কাশ্মীরী বাগ' ইংরাজি হইতে সঙ্কলিত।' কিন্তু শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'গ্রীক আর্টের কথা'য় এরূপ কোনও উল্লেখ নাই। হেমেন্দ্রকুমার কি সরে-জমীনে অনুশীলন করিয়া মস্তিষ্ক হইতে 'কথা'গুলি সংগ্রহ করিয়াছেন? তিনি নিজে কোটালের মত চোর ধরিয়া বেড়ান। কে কোথায় কোন রচনায় একানে কোটেশন দিয়া, অথবা না দিয়া, না বলিয়া, বেমালুম পরের দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছে, তিনি তাহা ধরিয়া দেন। তিনি কিন্তু নিজে যে থানকে থান 'গ্রীক আর্টের কথা'র আমদানী করিয়াছেন, তাহার কোথাও ত কোটেসন বা কোনও উল্লেখ দেখিলাম না। তথ্যগুলি কি তাঁহার নিজস্ব? শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর 'মাসকাবারী ও মন্তব্য' বেশ হইতেছে। সচরাচর এরূপ সন্দর্ভ যেরূপ অন্তঃসারশূন্য হয়, 'মাসকাবারী' সেরূপ নহে। অনেক বিষয়ে মতভেদ সত্ত্বেও আমরা 'মাসকাবারী' উপভোগ করিয়াছি। 'আনন্দ-মঠ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত' আমরা উদ্ধৃত করিলাম।—'রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ সম্বন্ধে কথাচ্ছলে যে সব মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রকাশ করিয়াছেন। আনন্দমঠ সম্বন্ধে রবিবাবুর

সমালোচনা সংক্ষেপে এই :—(১) "বঙ্কিমবাবু যেখানে individualএর চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেইখানে তিনি চমৎকার সফল হইয়াছেন, তাঁহার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু যেখানে মানুষের সমষ্টি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, সেইখানেই সমস্তটা একটা পিণ্ডবৎ তাল পাকাইয়া গিয়াছে, কোনও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিবার চেষ্টা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না।...আনন্দমঠে সমস্ত 'আনন্দ'গুলিই যেন একরকমেরই। একটা প্রকাণ্ড ideaয় যে বিচিত্র মানবপ্রকৃতিকে revolutionএর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়াছে, তাহাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য, তাহাদের বিচিত্র কর্ম্মপ্রবাহ, বিচিত্র ভাবপ্রবাহ, নানা শক্তির উন্মেষ, যে একটা প্রকাণ্ড ideaর আবর্ত্তে পড়িয়া একটা দিকে চলিয়াছে, বঙ্কিমবাবু তাহা দেখাইলেন কই! কেন তিনি তাঁহার 'আনন্দ'গুলিতে স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য দিলেন না?" (২) "জঙ্গলের মধ্যে এই ছায়াবাজির কোথাও একটু সমাজের সহিত নাড়ীর সংযোগ দেখিতে পাই না।...কত অত্যাচার, উৎপীড়ন, কত বেদনা, কত নিষ্ফলপ্রয়াসের ভিতর দিয়া এই বিপ্লববীজ অঙ্কুরিত হইল, তাহার আভাসমাত্রও পাইলাম না।" রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার এই শেষ অংশটুকুর উদাহরণ Turgenev-এর Fathers and Children বা On the eve প্রভৃতি স্বদেশপ্রেমমূলক উপন্যাসে পাওয়া যায়। উহাদের সঙ্গে আনন্দমঠের যদি তুলনা করা যায়, তবেই রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার সমীচীনতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। কারণ, উপন্যাসে ব্যক্তির সমষ্টিগত রূপ নয়, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যগত চেহারা ফুটাইয়া তোলাই দরকার। কিন্তু উপন্যাস হিসাবে আনন্দমঠের শ্রেষ্ঠতা নয়, তাহার শ্রেষ্ঠতার অন্য কারণ। আনন্দমঠ সম্বন্ধে রবিবাবুর এই সমালোচনা বহুকাল পূর্ব্বেকার—আনন্দমঠ যখন প্রকাশিত হয়, তখন চন্দ্রনাথবাবুর সহিত পত্রব্যবহারে এই সমালোচনা তিনি করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের পরেও তাঁহার এই মত অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে কি না, বিপিনবাবুর লেখা হইতে তাহা ঠিক জানা যাইতেছে না। কারণ, স্বদেশী-আন্দোলনে আনন্দমঠের 'বন্দে মাতরম্' বাঙালীর প্রাণে একটা নূতন প্রেরণা আনিয়াছে। এ তো উপন্যাস নয়, এ যে স্বদেশ-প্রেমের অপূর্ব্ব ভাগবত। বিপ্লবচেষ্টাকে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ভূমিকায় নিন্দা করিয়াছেন; সুতরাং আনন্দমঠ পড়িয়া বাঙালীর মধ্যে যদি বিপ্লবচেষ্টা দেখা দিয়া থাকে, তবে তাহা স্বয়ং লেখক কর্ত্তৃক নিন্দিত। আনন্দমঠের মধ্যে যে intensity, যে আবেগতন্ময়তা আছে, তাহা লিরিকের উপযুক্ত। নাটক যদি লিরিক্যাল হয়, তবে এ উপন্যাসকে লিরিক্যাল উপন্যাস বলায় কোনো হানি হয় নাই।' অবশেষে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'—বিনামার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আর্ট-বাগীশের 'পোড়ারমুখী'। আমরা ভাতে পোড়া প্রথমে খাই। ইঁহারা শেষে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। —ইংলণ্ডের এক জন বড় কবি—বোধ হয় সুইনবরণ—মোপাঁসার বড় ভক্ত ছিলেন। তিনি একবার মোপাঁসাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। মোপাঁসা তাঁহাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেন। কবি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া দেখিলেন, যথাসময়ে টেবিলে একটি শিশুর 'রোষ্ট' আসিয়া উপস্থিত। টেবিলের উপর একটা আস্ত খোকা-সিদ্ধ। হাত, পা, মাথা সব মজুত। কবির ত চক্ষুঃস্থির। মোপাঁসা বলিলেন, অনেক মাংস খাওয়া গিয়াছে; মানুষ ত খাইবার উপায় নাই। তাই আফ্রিকা হইতে এই দুর্ল্লভ বানরটাকে অনেক মূল্য দিয়া আনাইয়াছিলাম। এটা মানুষের খুব কাছাকাছি। তুমি আমার অতিথি, তোমার সম্মানার্থ আজ এটাকে রোষ্ট করিয়া রাখিয়াছি।

এস!' এই বলিয়া মোপাঁসা ছুরী দিয়া সেই মানবশিশুবৎ বানরের শব কাটিয়া নিজের প্লেটে তুলিয়া লইলেন, কবির পাতেও পরিবেষণ করিলেন। মোপাঁসা বেশ খাইতে লাগিলেন। কিন্তু এই বীভৎস ব্যাপার দেখিয়া কবির যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বলিবার নয়। 'ভারতী'র নৈবেদ্যে এই 'রিয়ালিষ্টিক' গল্পটি দেখিয়া আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া উঠিয়াছে। বহুকাল পরে 'ভারতী'র ভোজে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বশেষে 'পোড়ারমুখী'র পাল্লায় পড়িলাম। গল্পটির প্রথমে 'কমলের দুঃখে'র 'রিয়ালিজম্', শেষে বিলাতী প্লটের বোট্‌কা গন্ধ! ভাগ্যে বাঙ্গালায় থিয়েটার ছিল, তাই গল্পটি তরিয়া গিয়াছে। আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য, সমগ্র দেশের শ্রদ্ধাভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কর্ত্তৃক পূজিত, সার ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের গুরুমা 'ভারতী'র উপযুক্ত নৈবেদ্য বটে! 'রিয়ালিজম্' কালীঘাটে চিত্তরঞ্জনের ঠাকুরঘরে নারায়ণের সেবা করিতেছিল। সেখান হইতে সটান্ হুকিয়া ষ্ট্রীটে কুচ্ করিয়াছে. 'ভারতী'র মন্দিরে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। মকর ও কামিনী এখন সভ্য-সমাজে অনেক মহিলারও পরিচয়-সৌভাগ্য লাভ করিবে। ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

প্রবাসী।—চৈত্র।—'বস্তুতান্ত্রিক কাব্যরসিক' নামক চিত্রখানি দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। চিত্রের নীচে লেখা আছে, 'চিত্রকর শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে।' ছবিখানির দানে 'সৌজন্য' থাকিতে পারে, আঁকার সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। চিত্রকরের বিরুদ্ধ পক্ষকে ভ্যাঙ্গচাইবার প্রকৃতির ও সুরুচির আমরা প্রশংসা করিতে বাধ্য, কিন্তু যে চিত্রপ্রতিভার অভিব্যক্তি দেখিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিয়াছি, তাহাকে দূর হইতে নমস্কার করিতে হানি কি? হাস্যরসের সম্ভাবনাটুকু রক্তাক্ত রুদ্ররসের উষ্ণ নিশ্বাসে শুকাইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে হয় ত খুব গভীর ও জটিল ভাবের হেঁয়ালি আছে। কিন্তু গগনের হেঁয়ালি ভাঙ্গিতে পারিলাম না। শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'দেশের সেবা' উল্লেখযোগ্য। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাচীন ভারতের রাজা মুকুট ও সিংহাসনের লক্ষণ' নামক উপাদেয় প্রবন্ধটি 'মডার্ণ রিভিউ পত্রিকা'য় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাওএর লিখিত Kings Crowns and Thrones in ancient and Medieval India with pen and Ink Sketches নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে রচিত;—বিবিধ মৌলিক তথ্যে পূর্ণ। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা দেশের নানা সংবাদপত্র হইতে চয়ন করিয়া 'দেশের কথা'র যে ডালি সাজাইয়াছেন, আমরা তাহা পড়িয়া উপকৃত হইয়াছি। মাসিকপত্রে দেশের বাণীকে ইহার পূর্ব্বে কেহ কেহ স্থান দিয়াছেন সত্য, কিন্তু আর কেহ এমন গুছাইয়া বলিয়াছেন, এবং এরূপ যুক্তিযুক্ত মন্তব্যে সমর্থন করিয়া পাঠকের মনে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, এমন ত মনে পড়ে না। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'শ্রদ্ধা-হোম' নামক 'কবিগুরু' প্রশস্তি—গৌড়ীগায়ত্রী ছন্দ' আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু মানুষের সকল চেষ্টা সফল হয় না। 'চিদ্রসায়ন প্রচেতা', 'বাক্ তব বিশ্বম্ভর", 'পাবীরবীর গায়ন কবি' প্রভৃতি যেমন কটুকটে, তেমনই কঠিন। তাহার উপর ছন্দে গৌড়ীর প্রভাব। সায়ণের প্রতীক্ষা ভিন্ন উপায় নাই। 'প্রবাসী' বাদ-প্রতিবাদে পূর্ণ, এবং নানা তথ্যের ও বিবিধ আলোচনার আধার। সুতরাং একটু গুরু-গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। স্বদেশের প্রসঙ্গে 'প্রবাসী'র অবধান প্রশংসনীয়। সংবাদপত্রে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হয়, 'প্রবাসী' মাসিকপত্রে মন্তব্য সহ তাহার সমাহার করিতেছেন। ইহাতে কল্যাণের আশা করা যায়।

উপাসনা। চৈত্র।—'বহ্নক্কার জন্মকথা' উল্লেখযোগ্য। 'চুম্বকে' শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে প্রকাশিত, শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত কর্ত্তৃক লিখিত 'ভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা'র আলোচনায় যাহা লিখিয়াছেন, আমরা বাঙ্গালা ভাষার লেখকদিগকে তাহা পড়িতে বলি। শ্রীরাধাবল্লভ নাগের 'পাগ্‌লা'কে কেন ছাড়া হইল, বলিতে পারি না। শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লীবাণী' নামক কবিতায় দুই একটি মিষ্ট চরণ আছে। মামুলী পল্লীবর্ণনার প্রতিধ্বনি। তবে ইহাতে কাব্যের অপরিহার্য্য উপাদান 'পুলক ভরা ব্যাকুল প্রাণে' আছে। হাত পাকিবার পূর্ব্বেই যাঁহারা মাসিকের বারোয়ারীতে হাজির হন ভবিষ্যৎ তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিবে। শ্রীগঙ্গানারায়ণ মৈত্র নামক আর এক জন কবি 'কর্ম্ম-অলস' নামক কবিতায় লিখিয়াছেন,—'ওগো, "সুপ্তি" আমার প্রভাতে ভেঙ্গেছে' ইত্যাদি। সুপ্তি—সুপ্তি? ইনি 'যষ্টি'তে ও 'মুষ্টি'তে মিলাইয়াছেন! মিলিটারী মিল বটে। 'ওগো', 'এসো', 'প্রভু' 'পাতকী' প্রভৃতির ছড়াছড়ি করিয়াছেন। এত কাঁদুনীর অর্থ কি, কবি কাহাকে কেন এত ডাকিয়া মরিতেছেন, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে কবি অত্যন্ত বিনয়ী, এই কবিতায় আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন,—'ওগো, করমবিহীন দিবস আমার নীরবে যেতেছে চলিয়া।' না, তাঁহার 'দিবস' নিশ্চয়ই 'করমবিহীন' নয়। শুধু দিবস কেন, কান্নাটি যে বহু দিবস ও রজনীর কর্ম্মফল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রতিভা। চৈত্র।—শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'বার্ণার্ড শ' তাঁহার পূর্ব্ব প্রবন্ধের পরিশিষ্ট। বিভিন্ন সমাজের চিন্তা, গতি ও বিবর্ত্তের বিবরণ জানা উচিত। যাহা প্রচলিত রীতি বা নীতির বিরুদ্ধ, যদি কোনও সমাজে তাহাই আলোচনার বস্তু হয়, তাহা হইলে, তাহার পরিচয়-লাভ করিলে, অন্য কোনও সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এমন কূপমণ্ডূকতার শঙ্কা প্রতিবাদের যোগ্য নহে। আমরা জগতের কথা দূরে থাকুক, ভারতের চিন্তা-বিবর্ত্তেরও কোনও সংবাদ রাখি না। উমেশ বাবুর মত কৃতবিদ্য ও চিন্তাশীল লেখকগণ বাঙ্গালীকে ইংরেজী সাহিত্যের ও প্রতীচ্য চিন্তার পরিচয় দিলে আমরা উপকৃত হইব। বার্ণার্ড শ বিবাহের উপযোগিতা বা আবশ্যকতা, বা যৌক্তিকতা স্বীকার করেন না, এ কথা শুনিয়া যে পশুজীবন যাপন করিতে চাহিবে, কোনও সমাজই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। 'যবদ্বীপের হিন্দু অধিবাসিগণ এবং তাঁহাদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য' আমেরিকা-প্রবাসী শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিত কর্ত্তৃক লিখিত, এবং পানামা প্যাসিফিক প্রদর্শনীতে পঠিত ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ। প্রবন্ধটি আমরা সকলকে পড়িতে বলি। লেখক বলেন, যবদ্বীপের বর্ত্তমান অধিবাসীরা প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশীদের বংশধর। এখনও যবদ্বীপে হিন্দু অধিবাসী আছে। ওলন্দাজের শাসনে তাহারা মুহ্যমান হইয়া আছে। তাহাদের জন্য হিন্দুর কিছু করা উচিত। পঞ্জাবের হিন্দুসভার গত অধিবেশনে মনীষী সত্যচরণ শাস্ত্রীও এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। 'কিছু' করা উচিত বটে, কিন্তু প্রথমে সেই 'কিছু'র নির্দ্ধারণ আবশ্যক। নিজের দেশেই যাহারা পঙ্গু ও স্থবির হইয়া আছে, নিজের জন্যই যাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া কিছু করিতে পারে না, তাহারা সাগর-পারের জ্ঞাতিদের জন্য কিছু করিবার কামনা করিলেও, কাজে কিছু করিতে পারিবে কি না, সে বিষয়ে স্বতঃই সংশয় উপস্থিত হয়। আমাদের এ সংশয় মিথ্যা হউক। নবজাগ্রত ভারতের চোখে এখনও ঘুমের ঘোর লাগিয়া আছে। সেই ঘোর কাটিলে আমরা আত্মশক্তির সাক্ষাৎ পাইব, এবং তাহার উদ্বোধন করিয়া কর্ম্মজগতে সাফল্য লাভ করিব, ইহাই নব-ভারতের নূতন আশা। সে আশা কি পূর্ণ হইবে না? শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতীর 'রক্তমোক্ষণ' উল্লেখযোগ্য। সম্পাদকের 'আইসলণ্ডের সাগা সাহিত্য' পড়িয়া বাঙ্গালী পাঠক উপকৃত হইবেন।

সাহিত্য, ২১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

বেরাল-ছানা।

১

যদি কখনও দেওঘর দেখিয়া থাকেন, তবে সম্ভবতঃ আপনার দুই ও তিন নম্বরের বাটী মনে আছে? অম্বিকা বাবুর। মনে না থাকে, ক্ষতি নাই। বাটী দুইটী পরস্পরের সহিত সংলগ্ন। এমন কি, এক বাটীরই দুই অংশ। মধ্যে একটা দেওয়াল। প্রত্যেকের ভাড়া চল্লিশ টাকা। অথচ এমন অসুবিধা যে, এক অংশে জোরে কথা কহিলে আর এক অংশে শুনা যায়. ফুলের বাগান দুই বাটীরই এক। সম্মুখে খোলা মাঠের মত খানিকটা জমী।

প্রতি বৎসরেই দেখা যায় যে, ২ নম্বর ভাড়া হইলে ৩ নম্বরে শীঘ্র কেহ আসিতে চাহে না। এই জন্য অম্বিকা বাবু দুই ভাগেরই ভাড়াটিয়া না পাইলে বাটী ছাড়িয়া দিতে নারাজ হইতেন। এবার ডিসেম্বর মাস কাটিয়া গেল। মোটে এক জন ভাড়াটিয়া জুটিল।

নাম—প্রোফেসার জীবনচন্দ্র মিত্র এম্. এস্. সি.; কাজেই প্রোফেসারকে ২ নম্বর বাটী ছাড়িয়া দিতে হইল। ৩ নম্বর খালি পড়িয়া ছিল। এতাদৃশ মধুর নির্জ্জনতা ভাগ্যে ঘটিবে, তা জীবনচন্দ্র নিজেই মনে করেন নাই। প্রথম কারণ, তাঁহার বিবাহ হয় নাই। তাহারও যদি কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে, বলিতে হইবে যে, স্ত্রীলোকদের গোলমাল তিনি অত্যন্ত ভয় করিতেন। দ্বিতীয় কারণ, তিনি ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে একখানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন, এবং তাহার জন্য তিনি—কলেজ হইতে এক বৎসরের ছুটী লইয়া অবিরত পার্ব্বতীয় প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। গ্রন্থখানি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং তল্লাটটা নির্জ্জন হওয়াতে, এবং স্ত্রীলোকদের গোলমাল না থাকাতে তাঁহার খুব সুবিধা হইয়া গেল। এমন কি, তিনি গ্রন্থের উপসংহার দুই চারি দিনের মধ্যে আরম্ভ করিবেন, এই রকম ভরসার উৎপত্তি হইল।

জীবনচন্দ্রের সঙ্গে কেবল তাঁহার "খোকা" অভিধেয় একটি দশ বৎসরের ভাগিনেয় আসিয়াছিল। খোকার ম্যালেরিয়া থাকাতে সে সকালে বৈকালে

'অল্‌স্‌টর' পরিধান করিয়া ও মাথায় 'কম্ফর্টর' বাঁধিয়া এক জোড়া পুরাতন চটী জুতার সাহায্যে ফুলের বাগানে ও মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইত, এবং অনিমেষনয়নে তাহার ন্যায় রুগ্ন পান্থদিগের প্রতি চাহিয়া থাকিত। জীবনচন্দ্র তাহাকে বড় ভালবাসিতেন, এবং তাহার ভাব গতিক দেখিয়া বুদ্ধদেবের জীবনচরিত লইয়া আহারের পর এক ঘণ্টা কাল পড়াইতেন। পরিচারকবর্গের মধ্যে কেবল এক জন বৃদ্ধ কাশীর পাচক ব্রাহ্মণ ও খর্ব্বকায় এক জন ভৃত্য ছিল।

অনেক সময় জীবনচন্দ্রের ইচ্ছা হইত যে, খোকার জন্য ভাল করিয়া সোনা মুগের দাইল ও অল্প চিনি দিয়া সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া দেন। কিন্তু দুই তিন বার চেষ্টা করিয়াও তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সুতরাং বৃদ্ধব্রাহ্মণের অভ্যস্ত একই রকমের তরকারী এবং ছোট মাছের ঝোল, এবং একই রকমের জাল দেওয়া দুগ্ধ দুই বেলা নিঃসহায়ভাবে চলিত। প্রোফেসার জীবনচন্দ্রের জ্ঞানও যেমন অসামান্য, ক্ষুধাও যে তাহা অপেক্ষা কম অসামান্য, তাহা বলিতে পারা যায় না। সুতরাং মধ্যে মধ্যে তিনি তাঁহার সঞ্চিত বিস্কুটগুলি খোকার সহিত ভাগ করিয়া খাইতেন, এবং দরকার হইলে চা'র সহিত দুই চারি মুঠা ছোলাভাজা পার করিয়া দিতেন।

কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। জানুয়ারী মাস শেষ হইতে না হইতে ৩ নম্বরের ভাড়াটিয়া জুটিয়া গেল। জীবনচন্দ্র সত্রাসে সমস্ত কপাট বন্ধ করিয়া কেবল বাহিরে যাইবার একটি দ্বার উন্মুক্ত রাখিলেন। খোকা ফুলের বাগানের একটা নিভৃত কোণে দাঁড়াইয়া ভাড়াটিয়া পরিবারের মধ্যে কোনও রুগ্ন ছেলেপুলে আছে কি না, তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিল। যত দূর জানা গেল, ভাড়াটিয়াদের মধ্যে স্ত্রীলোকের পাল ছিল না। হয় ত এক জন স্ত্রীলোক থাকিতে পারে, কিন্তু সে বড় বাহিরে আসিত না। তবে কাশীর শব্দ শুনিয়া বুঝা যাইত যে, বাটীতে এক জন বৃদ্ধ লোক আসিয়াছিল। ক্রমে চাকর ও ব্রাহ্মণ ও খোকা সকলে মিলিয়া দেখিতে পাইল যে, তিনি হ্যাট কোট পরিধান করিয়া, এবং দুই জন দরওয়ান সঙ্গে লইয়া, এবং লাল মেরুণোর গাউন পরিধৃতা একটি বয়ঃস্থা বালিকার হাত ধরিয়া, খুব প্রাতঃকালে এবং খুব সন্ধ্যাকালে হাওয়া খাইয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিতেন। বোধ হয়, তাঁরা খুব বড়লোক।

সৌভাগ্যের বিষয়, তাহাদের মধ্যে কেহ ২ নম্বরের দিকে আসিত না; এমন কি, তাহাদের চাকর ব্রাহ্মণ (বোধ হয় তাহাদের সঙ্গে এক জন বাবুর্চ্চীও ছিল, অনুমানে যত দূর জানা সম্ভব) ২ নম্বরের অধিবাসীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে

চাহিত না। সুতরাং জীবনচন্দ্রের প্রথমবারের আতঙ্ক খুব কমিয়া গেল। তবে একটা উৎপাত ছিল। প্রায় সমস্ত দিনই পার্শ্বের বাটীতে (৩ নম্বরে) ঘোর ঠুক্‌-ঠাক্‌ এবং নানাবিধ শব্দ অবিরত চলিত। হয় ত গৃহমার্জ্জনের শব্দ, কিংবা দৌড়া-দৌড়ির শব্দ, কিংবা বাসনের শব্দ, কিংবা জলখাবার তৈরীর শব্দ, কিংবা মধ্যে মধ্যে একটা গুণ্‌গুণ্‌ শব্দ, কিংবা দুই একবার সরল ও মধুর হাস্য। ইহাদের বিরাম ছিল না। এগুলি জীবনচন্দ্র নির্ব্বিবাদে সহিয়া থাকিতেন। কিন্তু একটা শব্দ তাঁহার অসহ্য হইয়া পড়িল, তাহা অনবরত একটা বেরাল-ছানার 'মিউ' 'মিউ' শব্দ।

বোধ হইত, তাহার ক্ষুধা না থাকিলেও কেহ জোর করিয়া খাওয়াইত, এবং বোধ হয়, তাহার পক্ষে সেটা কষ্টকর হওয়াতে সে তীব্রস্বরে ডাকিত।

২

'তাই ত, বড় মুস্কিলে পড়া গেল। এর চেয়ে কল্‌কেতার ট্রামের আওয়াজ বরং ছিল ভাল। বেরাল-ছানার এ রকম ভীষণ তীক্ষ্ণ আওয়াজে শীঘ্রই এ যায়গা ছেড়ে দিতে হবে।'

প্রোফেসার জীবনচন্দ্র এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার 'ভূতত্ত্ব' গ্রন্থের উপসংহার আরম্ভ করিলেন। খোকা তার 'বুদ্ধদেবের জীবনচরিত' লইয়া বসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে খোকা বলিল, 'মামা বাবু! সেই বেরাল-ছানাটা ডাক্‌ছে।'

প্রোফেসার। ওটা জুটলো কোথা থেকে?

খোকা। ঐ বাড়ীতে মেম সাহেবের মত যে মেয়েটা থাকে, তার।

প্রোফেসার। বেরালটা অত চেঁচায় কেন?

খোকা ৩ নম্বরের বাটীর ইতিহাস এত দূর সংগ্রহ করিয়াছিল যে, কাহাকে বলিবে, ঠিক পাইত না। সে হঠাৎ মামাবাবুর প্রশ্ন শুনিয়া প্রাণপণে তাহার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

'মেয়েটা যখন তখন বেরাল-ছানার গাল টিপে খাবার খাওয়ায়, সে খেতে না পেরে ত্রাহিস্বরে চেঁচায়।'

প্রোফেসার। ভয়ানক অত্যাচার!

খোকা। শুধু তাই নয়, সেটাকে হারিয়ে যাবার ভয়ে কিংবা ঠাণ্ডা লাগ্‌বার ভয়ে বালিশের সঙ্গে দড়ি বেঁধে দিয়ে চেপে রাখে, তাই সে সহ্য কর্ত্তে পারে না।

প্রোফেসার। জীবের স্বাধীনতার উপর নৃশংসভাবে হস্তক্ষেপ—নিষ্ঠুর অত্যাচার! ভারতবর্ষ এই ক'রে মাটী হয়ে গেল।

খোকা। বুদ্ধদেব বোধ হয় এই জন্য পালিয়ে গিয়েছিলেন ?

জীবনচন্দ্র খোকার সমালোচনা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, বুদ্ধদেবের জীবন-চরিত সে খানিকটা পড়িয়াছে ; অতএব বলিতে বাধ্য হইলেন—'অনেকটা বটে।'

তাহার মন্তব্য মাতুলের মনোমত হইয়াছে দেখিয়া খোকা আরও একটু মন্তব্য প্রকাশ করিল, 'মামাবাবু! আর একটা কারণ আছে। মেয়েটার মা নেই। মা না থাকলে ছেলে পুলে নিষ্ঠুর হয়।'

এ মন্তব্যটা বৃদ্ধলোকের মত হইয়াছে মনে করিয়া খোকার মুখ ভয়ে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। জীবনচন্দ্রের পৃথিবীতে মা ছাড়া আর স্নেহের কিছুই ছিল না, সুতরাং কথাটা শুনিয়া তাঁহার মনে অতিশয় করুণার সঞ্চার হইল, এবং খোকার সমালোচনা খুব গভীর হইয়াছে দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'খুব সত্য কথা।'

খোকা স্বীয় বুদ্ধির প্রাধান্য অনুভব করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

প্রোফেসার। এখন এটাকে থামানো যায় কি ক'রে ?

খোকা। আমি ওদের বাড়ীতে গিয়ে বল্‌ব যে, বেরাল-ছানার আওয়াজে আমাদের পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়।

প্রোফেসার। আমাদের সে কথা বল্‌বার কোনও অধিকার নাই। তুমি এটা শিখে রাখ। যদি কেউ ইচ্ছে ক'রে কারো অনিষ্ট করে, অথচ তার কাজে তার নিজের আনন্দ হয়, তবে তার বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়ানোর কোনও দাবী দাওয়া নাই। তুমি যদি আজ জ্বরে প'ড়ে কাতর হয়ে ডাক, তবে তারা কখনো বল্‌বে না,—'ওগো! তোমাদের ছেলের শব্দে আমাদের বিরক্তি বোধ হচ্ছে'। আমাদের উঠে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নাই।

খোকা লজ্জিত হইয়া রহিল।

৩

তখন রাত্রি। শীতকালের দীর্ঘ নীরব রাত্রি। জীবনচন্দ্র একাকী নিজের ঘরে গিয়া গ্রন্থের 'উপসংহার' লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পার্শ্বের বাটীতে মাঝে মাঝে শব্দ হইতে লাগিল—'মিউ মিউ!'

প্রোফেসার জীবনচন্দ্র সহিয়া গেলেন। মেয়েটির মা নাই। মা না থাকিলে মাতৃস্নেহের স্মৃতি নিশ্চয় মনের মধ্যে জাগিতে থাকে। সেই স্মৃতিটুকু দিয়া স্নেহধারা নিশ্চয় কোনও জীবের উপর বর্ষিত হয়। এটা খুব স্বাভাবিক। জীবনচন্দ্র 'উপসংহারে' লিখিতে লাগিলেন—'ভূতত্ত্বেও আমরা প্রকৃতীদেবীর অসাধারণ পুত্রবাৎসল্য দেখিতে পাই। বোধ হয়, যেন যুগযুগান্তের সন্তানগণকে লইয়া

আনন্দময়ী ভূগর্ভের স্তরে স্তরে অধিষ্ঠিতা। যখন মানবীরূপে প্রকৃতি ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূতা হন, তখন এই বিচিত্রভাব অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। ক্রমিক আবর্ত্তনে বন্য পশু গৃহপালিত হইয়া পড়ে, বনের পাখী পিঞ্জরাবদ্ধ হয়, বনের ফুল উদ্যানের শোভা বর্দ্ধন করে—'

এমন সময় খুব নিকটে একটা শব্দ হইল—'মিউ!' খুব নিকটে! এমন কি, জীবন বাবুর চেয়ারের পশ্চাদ্ভাগে। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে, একটা অতিশয় ক্ষুদ্র শুভ্র লোমশ হৃষ্ট পুষ্ট নধর ও সুন্দর বিড়ালশিশু তাঁহার পশ্চাতে। সে ধীরে ধীরে তাঁহার টেবলের উপর উঠিয়া পড়িল। ক্রমে তাঁহার ভূতত্ত্বের 'উপসংহারে'র উপর বসিল! জীবনচন্দ্র সভয়ে ডাকিলেন, 'খোকা!'

খোকারও অবিলম্বে প্রবেশ।

জীবনচন্দ্র। কি সর্ব্বনাশ! সেই বেরাল-ছানাটাই বোধ হয় কোনও রকম ক'রে এখানে এসে পড়েছে!

খোকা বাক্যব্যয় না করিয়া তাহাকে কোলে লইল।

বলা বাহুল্য যে, বিড়ালশাবক কোনও প্রকারে নির্জ্জন নিশীথে গৃহত্যাগ করিয়া বুদ্ধদেবের ন্যায় পলাইবার যোগাড় করিয়াছিল, কিন্তু একটা সংসারারণ্য ছাড়িয়া যে অন্য একটাতে আসিয়া পড়িবে, এ রকম সে ভাবে নাই। এবং বলা বাহুল্য যে, এই নূতন সংসার দেখিয়া সে মোটেই ভীত হয় নাই, বরং খোকার দক্ষ হস্তে পড়িয়া সে গোটাকতক ক্ষুদ্র মৎস্য উদরস্থ করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণলোচনে বশ মানিয়া গেল। এ রকম ক্ষিপ্রভাবে অবস্থার পরিবর্ত্তন জীবনচন্দ্র কোনও জৈবিক ইতিহাসে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। তিনি স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন—

'বেরালটা আর চ্যাঁচাচ্ছে না'!

খোকা। বোধ হয় চুনোমাছ খেতে ভালবাসে। আমি ত আর জোর ক'রে খাওয়াই নি! এত রাত্তিরে আমি একে হিমে বের'তে দেব না।

প্রোফেসার জীবনচন্দ্র আপাততঃ প্রতিবাদ করা শ্রেয় বিবেচনা করিলেন না। সকলকেই স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। সবলে বিড়াল-শিশুকে তাহার প্রভুর নিকট এত রাত্রিতে পাঠাইয়া দেওয়ার বিশেষ কোনও প্রয়োজন তিনি দেখিতে পাইলেন না। বিশেষতঃ তাহার পলায়ন যে ও বাটীতে লক্ষিত হইয়াছিল, তাহার কোনও কোলাহল কিংবা সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বোধ হয়, সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তিনি খোকাকে বলিলেন, 'আচ্ছা, সকালে ফিরিয়ে দিও। ওর গলার সঙ্গে একটা কি চক্-চক্ কচ্ছে না?'

খোকা। ওটা পিতলের চেন। দেখুন—একটা লকেট!' খোকা লকেটের মুখ খুলিয়া দেখিল যে, তাহার মধ্যে খুব ছোট একখানি 'ফটো', তার নীচে আরও ছোট অক্ষরে লেখা—'সরলা বসু'।

খোকা। এ সেই মেয়েটার 'ফটো'।

জীবনচন্দ্র তাচ্ছীল্যভাবে সেটাকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন। 'একটা কাজ আমাদের ভাল হয় নাই। যদি এ চেন ও লকেট্‌টা সোনার হয়, তবে?'

খোকা। আমরা ত আর চুরী করে নেব না! কাল্‌ সকালে চেন-শুদ্ধো বেরাল-ছানা ফিরিয়ে দেব।

জীবনচন্দ্র মনে মনে তর্ক করিয়া দেখিলেন যে, ইহাতে অন্যায় কিছুই নাই। এত রাত্রিতে কোনও জিনিস কুড়াইয়া পাইলে তাহার মালিককে অনুসন্ধান করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া একরকম অসম্ভব। বিশেষতঃ, বিড়ালশাবকের তীব্র-স্বরের নিবৃত্তি তাঁহার পক্ষে অশেষ শান্তির কারণ হইয়া পড়িয়াছিল।

আবার তিনি 'উপসংহার' লিখিতে বসিলেন। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। অন্য রাত্রির ন্যায় এ রাত্রি তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইল না। বিড়াল-শিশু স্বাধীন। তিনিও তাহার স্বাধীনতার আশ্রয়ে ক্রমে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

প্রাতঃকালে বেলা আট্‌টার সময় খোকা অলষ্টর পরিধান করিয়া চা খাইতে বসিয়াছে। আগন্তুক বিড়াল-শিশু পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া তাহা দেখিতেছে। জীবনচন্দ্র প্লেটে ছোলাভাজা লইয়া চর্ব্বণ করিতেছেন। বিড়াল-শিশু নিস্তব্ধ। তাহার উপর আজ কোনও দৌরাত্ম্য নাই। সে ইচ্ছা করিলে চলিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু যাইবার ইচ্ছা নাই। বোধ হয়, সে আর একটা অভিনব সংসারের দৃশ্য লক্ষ্য করিতেছিল।

বিড়াল-শিশুর পক্ষে আজ নূতন কি? বোধ হয়, তাহার পুরাতন জীবনের সঙ্গে অদ্যকার জীবন একটু ভিন্ন। এ ঘরবাড়ী নূতন। ইহার অধিবাসী নূতন। এখানে বালিকা নাই, বৃদ্ধ নাই, অত্যাচার নাই। এখানে যুবা, বালক, ও করুণা তাহাকে ঘিরিয়া। সে তাহাদের ভাবগতিক দেখিতেছিল; কখনও নেত্র বিস্ফারিত করিয়া অতিশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া জীবনচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিতেছিল। কখনও পণ্ডিতের ন্যায় সকল ভাবগুলি গ্রহণ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিতেছিল।

বিড়াল-শিশুর ভাবের সঙ্গে জীবনচন্দ্রের ভাবেরও বোধ হয় একটু সম্বন্ধ ছিল। জীবনবাবু ভাবিতেছিলেন যে, বিড়ালের আজ তত স্ফূর্ত্তি নাই। উদ্যম

নাই। তাহার জীবনে যেন কিসের একটা অভাব। হয় ত তাহার পূর্ব্বের যত্ন ও আদর মনে করিয়াই অভাব বোধ হইতেছে। যে দুটি কোমল শুভ্র করতল তাহার ক্ষুদ্র কোমল দেহ বেষ্টন করিয়া থাকিত, আজ তাহার অভাব। যে মাতৃ-স্নেহটুকু সেই করতল বাহিয়া তাহাকে দুগ্ধ পান করাইত, তাহার অভাব। ক্রমে জীবনচন্দ্রের মনে করুণা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি সাদরে বিড়ালশিশুকে কোলে লইয়া চা খাইতে লাগিলেন।

এমন সময় বাতায়নের সম্মুখে একটি বালিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। বিড়াল-শিশু জীবনের কোলে ঈষৎ কম্পিত হইয়া ডাকিল—'মিউ!'

এই যে 'মিউ', ইহার মধ্যে বিষম সমস্যা। জীবনের সমস্যা।

বালিকা বলিল, 'খোকাবাবু, আমার বেরাল-ছানা ছেড়ে দাও।'

খোকা। আমি ওকে আনি নাই, মামা বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন। ও আপনি এসেছে।

জীবন। তোমারই নাম সরলা—নাম সরলা—না?

[জীবনচন্দ্র বিড়াল-শিশুর গলদেশের লকেট একবার খুলিয়া আবার বন্ধ করিলেন।] 'এ বেরালটা বোধ হয় রাস্তা ভুলে এসেছিল। আমরা রাত্তিরে খেতে দিয়েছি। কোনও কষ্ট হয় নি। তবে এখানে তেমন যত্ন আদর হয় নি, তার জন্য কিছু মনে করিও না। তোমার বেরাল তুমি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পার।'

ইহা বলিয়া জীবনচন্দ্র প্রথমে একটু ধীরভাবে, এবং তাহার পর একটু চঞ্চল-ভাবে বিড়ালশিশুকে লইয়া বাতায়ন পার করিতে দিবার চেষ্টা করিলেন। সরলা বাতায়নের পার্শ্বে আসিয়া বিড়াল-শিশুর পশ্চাদ্ভাগের পা দুখানি ধরিয়া আকর্ষণ করিল।

৪

কিন্তু বিড়ালশিশু সরলার নিকট গেল না। সে জীবনবাবুর হস্তে তাহার নখর বিদ্ধ করিয়া প্রাণপণে তাঁহাকে ধরিয়া থাকিল। ক্রমে সরলা তাহাকে যতই টানিতে লাগিল, নখরও তত গভীরভাবে বিদ্ধ হইতে লাগিল। অবশেষে জীবনবাবুর হাত ফুটিয়া শোণিত বাহির হইল। সরলা তাহা দেখিয়া ভয় পাইয়া বিড়াল-শিশুকে ছাড়িয়া দিল।

বিড়াল স্বাধীনতা পাইয়া আবার ডাকিল, 'মিউ!'

সরলা। কি নরাধম বেড়াল-ছানা! আপনি ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিন, আমি গলা টিপে মেরে ফেল্‌ব।

জীবনচন্দ্র বুঝিলেন যে, সরলার 'নরাধম' শব্দের অর্থ 'অকৃতজ্ঞ', এবং বুঝাইয়া বলিলেন, 'একটা হত্যাকাণ্ড করবার দরকার নেই। বরং ভুলিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর।'

সরলা তাহার অঞ্চল হইতে খানকতক ক্ষুদ্র গজা বাহির করিয়া বিড়াল-শিশুকে দেখাইল, 'এই নে—খা!'

কিন্তু বেরাল-ছানা সম্পূর্ণভাবে লোভ সংবরণ করিয়া জীবন বাবুর কোলে মুখ লুকাইল।

জীবন। এটা একটা মহা জঞ্জাল। তুমি আপাততঃ চেন ও লকেটটা নিয়ে যাও, আমি পরে একে কোনও রকমে রেখে আস্‌ব।

কিন্তু সরলা বলিল, 'না! ও যখন আমাকে চায় না, তখন আমিও ওকে চাই নে।'

জীবনচন্দ্র বুঝিলেন যে, সরলার ঘোর অভিমান হইয়াছে। হইবারই কথা। শিশু সন্তান অকৃতজ্ঞ হইলে কাহার না অভিমান হয়? জীবনচন্দ্রের বোধ হইল যে, সরলার নয়নকোণে দুই এক বিন্দু অশ্রু ঝরিতেছিল।

নিরুপায় হইয়া জীবনচন্দ্র বলিলেন, 'এই বেরালছানা লইয়া একটা আপদে পড়েছি। আমি ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে একখানা বই লিখ্‌ছি, বোধ হয়, তা জান না। সব শেষ হয়েছে, কেবল উপসংহার লিখ্‌তে এই দু নম্বরের বাড়ীতে দিন কতক থাক্‌ব—মনে করেছিলেম। কিন্তু এটার শব্দে আমার উপসংহারটা প্রায় নষ্ট হয়ে এসেছে। মনে করেছিলেম, আজ কালের মধ্যে চলে যাব, কিন্তু বিধাতার বিধান, বেরাল-ছানাটাই এসে উপস্থিত হয়েছে, এখন যেতে চায় না। আমি নিষ্ঠুরতার পক্ষপাতী নই। নয় ত, ছুঁড়ে ফেলে' দিলে বিপদ চুকে যেত।'

সরলা বিড়াল-শিশুর অবস্থা, নিজের অবস্থা ও ভূতত্ত্বের কথা, মুহূর্ত্তের মধ্যে মনে মনে আলোচনা করিয়া হাসিয়া ফেলিল, এবং হাসিয়াই আবার লজ্জিত হইল, এবং লজ্জিত হইয়া বলিল, 'আপনি ওটাকে দিন দুই রাখুন, এখন টানাটানি কর্‌লে মরে যাবে।'

জীবন। তা ভিন্ন আর উপায় নাই। ওটা খায় কি?

সরলা। কিছুই খায় না, তবে খেয়াল বেশী। কখনও গজা খেতে চায়, কখনও অল্প একটু দুধ ও তার সঙ্গে ভাত, কখন একটু মাছের ঝোল।

জীবন। কাঁটা বেছে দিতে হয়?

সরলা। নিশ্চয়! তা না হলে অতটুকু ছেলে খাবে কি ক'রে?

কথাটা বলিয়াই সরলার কপোল রক্তবর্ণ হইল। জীবনের 'কাঁটা বাছা'র আদর-টুকু সরলার ভাল লাগিয়াছিল। সরলার 'ছেলে'র সাধটুকু জীবনের কি ভাল লাগে নাই? উভয়ের অন্তরের ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে উভয়ের জীবনের ব্যবধান কমিয়া গেল।

জীবন। তবে আমি ওকে তোমার মত ভালবাস্‌তে পারব কি না সন্দেহ।

সরলা। কোনও দরকার নেই! আমি ত এত ভালবেসেছিলেম, কিন্তু ওর মায়া দয়া কৈ। স্বচ্ছন্দে আমাকে ছেড়ে আসে।

জীবন। আমার বল্‌বার মানে যে, আমার ভূতত্ত্ব লিখ্‌তেই সময় কেটে যায়। তবে খোকা ওর অনেকটা যত্ন করবে। মায়া দয়ার কথা বুঝ্‌তে পারা বড় শক্ত। ভূতত্ত্ব না পড়্‌লে ঠিক বুঝা যায় না। এই যে পৃথিবী, এ সকলকেই খেতে দেয়, অথচ একে যত্ন কেউ করে না। এর মধ্যে মস্ত একটা দয়া মায়ার স্থান আছে। এর বুক খুঁড়ে আমরা জল খাই, একে চাষ করে' আমরা শস্য নিই, এর মাটী নিয়ে আমরা ঘর তৈরী করি, এর নদনদী পাহাড় বন ও উপবন দিয়ে আমরা সংসার গড়াই, কিন্তু পৃথিবী যে রোজ জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তাহার জন্য আমাদের মনে কি একটু মায়া হয়? আমরা বলে' থাকি, জন্মভূমি আমাদের জননী, কিন্তু জন্মভূমিকে আমরা যত্নে কোথায় রাখি! ভূমি জীর্ণ শীর্ণ অনাথার মত কঙ্কালসার হয়ে পড়্‌ছে। তার উপর মায়া কৈ? তার একটা নদী, একটা বন, এমন কি, একটা গাছ গেলেও এক সময় তার সন্তানদের প্রাণে লাগ্‌ত। এখন তাকে খুঁড়ে, বেঁধে, আগুনে পুড়িয়ে, কেটে কুটে একাকার ও ছারখার করছি। আগে আমরা জননীকে কত যত্ন করেছি। কুটীর বেঁধে, হরিণশিশু নিয়ে, স্বভাবজাত ফল মূলের সাহায্যে জীবনধারণ ক'রে, জল, আকাশ, বায়ু, ও বন উপবনের মধ্যে তাঁর শোভা দেখেছি। তাঁরই কাছে বিশ্বের জ্ঞান লাভ করেছি। আমরা কি অকৃতজ্ঞ নরাধম নয়?

জীবনের কথা সরলার বড় মধুর বোধ হইতেছিল।

'এ সব কথা আপনার ভূতত্ত্বের মধ্যে আছে?'

জীবন। নিশ্চয়। শীঘ্রই বেরুবে। কেবল ছাপ্‌বার দেরী। উপসংহারটা হয়ে আস্‌ছিল, সেই সময় এই বেরাল-ছানার উপদ্রব। যাই হোক্, তুমি তাতে কিছু মনে করো না। এই বেরাল-ছানা আমাকে একটা নূতন শিক্ষা দিয়েছে, সেটা আমি আগে জান্‌তাম না।

সরলা। কি?

জীবন। সেটা উপসংহারে প্রকাশ করব।

৫

সরলা বাড়ী ফিরিয়া গেল। সরলার পিতা বৃদ্ধ রামচরণ বসু একাকী বসিয়া আর্নেষ্ট্ হেকেলের ইভল্যুশন অফ্ ম্যান্' (মানবের ক্রমবিকাশ) নামক গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন।

সরলা। পিতার গলা জড়াইয়া ধরিল, বলিল, 'বাবা, আমার বেরাল-ছানা ও বাড়ীর জীবনবাবুকে দিয়েছি।"

বসুজা মহাশয় অবাক হইয়া বলিলেন, 'সে কি?' তাঁহার অবাক হইবার কারণ ছিল। প্রথমতঃ, জীবন বাবু কে, তাহা তিনি জানিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, সরলার জীবনের যত সাধ ও ভালবাসা ঐ বেরালছানাকে জড়াইয়া। সুতরাং পৃথিবী দ্বিধা হইলেও বসুজা মহাশয় এত আশ্চর্য্য হইতেন না।

সরলা তাহা কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়া সলজ্জে বলিল, 'একেবারে দিইনি, আপততঃ দু দিনের জন্য দিয়েছি। বেরালটা ২ নম্বর বাড়ীতে চলে গিয়েছিল, এখন আস্‌তে চায় না, তাই আমি বলেছি, 'থাক্'।

বসুজা। জীবনবাবু কে?

সরলা। তিনি কলেজের প্রোফেসার, খুব লেখাপড়া জানেন, 'ভূতত্ত্ব' লিখ্‌ছেন। ছাপা হলে তাঁর একখানা বই আমি কিন্‌ব।

বসুজা মহাশয় সরলার মধ্যে আজ একটু নূতন ভাব দেখিতে পাইলেন। ঠিক সে ভাবটা কি রকম, তাহা হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু নূতন কোনও লক্ষণ দেখিলেই বসুজা মহাশয় ভয় পাইতেন। সরলার মাতার বুক বড় দুর্ব্বল ছিল। ডাক্তার বলিত, কোনও রকম 'ইমোশন্' হইলে প্রাণের ভয়। বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া সরলার মাতা 'হার্ট ফেল্' হইয়া মারা গিয়ছিলেন। সেই অবধি কোনও রকম ভাবের আধিক্য দেখিলে বসুজা মহাশয় চিন্তান্বিত হইয়া পড়িতেন। সরলার বিবাহের সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিলে বসুজা মহাশয় বলিতেন, 'না, আরও বড় হউক্, সংসারের একটু বুঝিতে না পারিলে বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। জগৎ এখন এক রকম ধর্ম্মবিহীন। স্বামীতাহার দায়িত্ব বুঝে না।'

বসুজা মহাশয়ের হঠাৎ মনে হইল, তাঁহার জীবনবাবুর সহিত আলাপ করা উচিত। তিনি ধুতি ও চাদর পরিধান করিয়া ২ নম্বর বাটীতে চলিয়া গেলেন। জীবনচন্দ্র বৃক্ষের নীচে বসিয়া তাঁহার উপসংহার লিখিতেছিলেন। বৃদ্ধকে দেখিয়া নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, 'আসুন।'

বসুজা। আমার আসাতে আপনার বিরক্ত হইবার কথা, কিন্তু আমার এতদিন না আসাই অন্যায় হয়েছিল। আমি ৩ নং বাড়ীতে থাকি।

জীবন। বরং আমি নিতান্ত অনুগৃহীত হয়েছি। আমি বরাবরই আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌ব—মনে করেছিলেম, কিন্তু সময় পাই নাই। একখানা বই লিখ্‌ছি।

বসুজা। কলিকাতায় জীবন মিত্তিরের নাম খুব শুন্‌তে পাই। আপনি এক জন প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্। কিন্তু এত কম বয়স, তা জান্‌তেম না।

জীবনচন্দ্রের সুন্দর, সরল, জ্ঞানপূর্ণ, সংযত যৌবনের মুখখানি লক্ষ্য করিয়া বসুজা মহাশয় অতিশয় প্রীত হইলেন।

'আমিও এক সময় বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলাম, বোধ হয় জানেন। অধ্যাপকের জীবন অতিশয় দায়িত্বের, অতিশয় চিন্তা ও সঙ্কল্পের, অতিশয় প্রেমের এবং আত্মোৎসর্গের ;—তাহাই আমাদিগের গৌরব।'

জীবন। আপনার 'ক্রম-বিকাশ-বাদ' আমি খুব মন দিয়া পড়িয়াছি। আপনি ক্রমবিকাশের মধ্যে ভক্তির কোনও কথা বলেন নাই কেন?

বসুজা। আমার বোধ হয়, জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে ভক্তির হ্রাস দেখা যায়। যখন আধুনিক সামাজিক জীবনের দিকে তাকাই, তখন ভক্তির অধঃপতনই দেখি। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, গুরুভক্তি, সকলেরই যেন ক্রমে অভাব দেখিতেছি। স্নেহ, দয়া ও ক্ষমা প্রভৃতি ক্রমে লয় পাইতেছে। তাই আমার মনে হয় যে, বিকাশের একটা দ্বৈতভাব আছে। একবার এটা, একবার ওটা ফুটিয়া উঠে। দুটো এক সঙ্গে হয় না। ধর্ম্মজগতের দিকে তাকাইলে তাহা অনেকটা বুঝা যায়।

জীবন। কিন্তু আমি দেখ্‌ছি যে, মূলে যখন একটা, তখন ভক্তের স্বতঃই জ্ঞান এসে পড়বে। জ্ঞান ভক্তি অন্বেষণ করে, ভক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করে, যেন অসীম পথে মাঝে মাঝে এক ভাই অন্যকে হারায়, কিন্তু ভেবে দেখ্‌লে দুটোরই সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ হয় বলে' বোধ হয়। ভূতত্ত্বের এক একটা ঘোর অগ্ন্যুৎপাতে দেখা যায়, যেন পৃথিবীর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে জ্ঞানাগ্নির বিকাশ হয়; আবার সেটা শীতল হয়ে মাতৃকোলে হিমালয়ের মত মস্তকে তুষার ধারণ করিয়া বসে। তাহা বিগলিত হয়ে স্নেহধারা প্রবাহিত হয়। জননী যখন সন্তান প্রসব করে, তখন সে ভবিষ্যতের ভক্তি ও জ্ঞানপিণ্ড ছাড়া আর কি? ভক্তি না পাইলে, স্নেহ না পাইলে মানব আত্মহত্যা করে। যত জ্ঞান বাড়ে, তখন জ্ঞান যাঁহার,

তাঁহারই ভক্তিরসে সে আপ্লুত হয়। তখন সংসারের দিকে তাহার করুণা ও মমতা ছুটে। মায়াই জ্ঞান ও ভক্তির প্রমাণ।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৃক্ষতলে বসিয়া বসুজা মহাশয়ের সহিত জীবনের অনেক কথোপকথন হইল। জীবনচন্দ্রের জীর্ণ বাসের মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের মত মুখখানি দেখিয়া বসুজার মনে হইল, জীবনের হাতে সরলাকে দিয়া তিনি সুখে মরিতে পারিবেন।

৬

আজ সকাল হইতে খোকা ৩ নং বাটীতে সরলার নিকট বসিয়া বুদ্ধদেব-চরিত পড়িতেছিল। সরলা তাহা শুনিতে শুনিতে নানাবিধ জলখাবার তৈয়ারী করিতেছিল।

হঠাৎ-বুদ্ধদেবের কথা মনে হওয়াতে সরলা বলিল, 'এই খাবারগুলো তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাও।'

খোকা। মামাবাবু কেবল আমাকেই খেতে বল্‌বেন। তিনি কেবল ছোলা ভাজা খেয়ে থাকেন।

সরলার মনে দুঃখ হইল।

জীবন বাবু সেই সময় বিড়াল-শিশুকে লইয়া সরলার রান্নাঘরে উপস্থিত হইলেন। সরলার কোনও মতলব ছিল না; তথাপি বস্ত্রের কোণ ঈষৎ টানিয়া অবগুণ্ঠিতা হইল। কেন?

জীবন বাবু বিড়াল-শিশুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দেখ, তোমার পুরাণো বাড়ী দেখ, এমন সুন্দর বাড়ী ছাড়্‌তে তোমার সাধ হ'ল কেন?'

খোকা। মামাবাবু! আমি এইমাত্র পড়ছিলেম যে, পরের দুঃখ দেখে বুদ্ধদেব তাঁর বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিলেন।

জীবন। তার সঙ্গে আর এটার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ আছে, তা ঠিক বুঝা যায় না। বেরাল-ছানা আমার দুঃখ কি তোমার দুঃখ জানিত, তা কি ক'রে বল্‌ব! সরলা! তুমি কি কচ্ছ?'

সরলা। ছোলা ভাজ ছি।

জীবন। তুমি তোমার বেরাল-ছানাকে একবার কোলে কর, আমি গোটা কতক ছোলা ভাজি। তবে আমি ঠিক ভাজতে জানি না।

সরলা। আমি আর ওকে কোলে কর্‌ব না।

জীবন। তুমি সেদিন বলেছিলে—ও তোমার ছোট ছেলে। আমাকে

দুদিনের জন্য ভার দিয়েছিলে। আমি যথাসাধ্য ওকে যত্ন করেছি, কিন্তু—কিন্তু বোধ হয় ওর মায়াটা তোমারই উপর বেশী।

সরলার পূর্ব্বস্মৃতির সঙ্গে স্নেহের পূর্ণ উচ্ছ্বাস উঠিয়া তাহার লজ্জা ভাঙ্গিয়া দিল। সরলা দৃষ্টি অবনত করিয়া মধুরস্বরে বলিল, 'দাও।'

জীবনচন্দ্র সেই অবসরে সরলার অপূর্ব্ব সুন্দর মুখশ্রীর মধ্যে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের অটুট কেমল মাতৃস্নেহ সম্পূর্ণভাবে দেখিতে পাইলেন।

আর সেই 'দাও' কথাটা জীবনের জীবনে কি রকম লাগিয়াছিল?

জীবনচন্দ্র ভাবিলেন, ভূতত্ত্বের মধ্যেও এই বিরাট অধিকার-ব্যঞ্জক বিশ্বজননীর মহাব্যাহৃতিবাণী বিশ্বপিতার দিকে অবিরাম-ধারায় ছুটিতেছে। জীবন ভাবিল, 'কি দিব, সরলা? এই বিড়াল-শিশুর ন্যায় বিশ্বগোলকও তোমার নিকট ছার! আমার এই সামান্য হৃদয়টুকু দিয়া কি তোমার অসীম প্রেমের ঋণ শোধ দিতে পারি? তুমি আজন্ম এই প্রেম লালন পালন করিয়া বিশ্বরূপে প্রকটিত কর, আমি তাহার মধ্যে সুখদুঃখের সমভাব দেখিয়া আনন্দময় হই।

আজ বিড়াল-শিশুর যেটুকু অভাব ছিল, তাহার পূরণ হইয়া গিয়াছিল, বোধ হয়। সে একটা সমবাদী সুরে 'মিউ' ধ্বনি করিয়া সরলার কোলে ছুটিয়া গেল।

সরলা বলিল, 'আজ এর মনটা ভাল আছে।'

জীবন। আমারও মনটার ভার কমে গেল। এখন তুমি আমাকে ছোলা ভাজিতে শেখাও।

সরলা খুব সাবধানে জীবনচন্দ্রকে ছোলা ভাজার বিজ্ঞান বুঝাইয়া দিল। জীবনচন্দ্র অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া সেই প্রক্রিয়াগুলি দেখিতে লাগিলেন।

ছোলাভাজা শেষ হইলে জীবন এক মুঠা লইয়া খাইলেন। ক্রমে ছোলাভাজাগুলি নিঃশেষিত হইতে চলিল। জীবন বাবু বলিলেন, 'এমন সুন্দর কখনও খাই নাই।'

সরলা সাদরে বলিল, 'আমি দুটো খেয়ে দেখ্‌ব।'

জীবন। সর্ব্বনাশ! আমিই যে সব নিঃশেষ ক'রে ফেলেছি।

সরলা। তা হোক। থালে যা আছে, তাই আমার পক্ষে অনেক।

জীবনচন্দ্র একটা হাতে লইয়া বলিলেন, 'এইটুকু—আগে খেয়ে দেখ।'

সরলার তাহা লইতে গিয়া হাত হইতে পড়িয়া গেল। জীবনচন্দ্র আবার একটা লইয়া বলিলেন, 'এবার তোমাকে খাইয়ে দেব, তুমি বড় অসাবধান।'

সরলা বলিল, 'না, আগে আমার হাতে দাও, আমার ছেলেকে খাওয়াই। তার পরে যা থাক্‌বে, আমি খাব।'

জীবন। আমি সেগুলি খাইয়ে দেব।

সরলা অতি ধীরে বলিল, 'আচ্ছা।'

বিনোদ ভাবিল, 'ভূতত্ত্বের উপসংহারে বুঝাইতে হইবে যে, সন্তানের মায়াটাই পূর্ব্বে। স্বামী কেবল জ্ঞাতা। মায়া জিনিসটা অজ্ঞেয়। জ্ঞানই আনন্দ।'

খোকা তখন দ্বারে বসিয়া অতিশয় মনোযোগসহকারে বুদ্ধদেবচরিত পাঠ করিতেছিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস।

২

ভট্ট কলঙ্কদেবের কর্ণাটক-শব্দানুশাসন নামক গ্রন্থে তৃতীয় ইন্দ্রের মিত্র সামন্ত নরসিংহ কর্ত্তৃক পলায়নপর মহীপালের পশ্চাদ্ধাবন, এবং গঙ্গার সঙ্গমক্ষেত্রে স্বীয় অশ্বস্নানের বিষয় বর্ণিত আছে; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাই উদ্ধৃত করিয়া অনুমান করিয়াছেন,—তৎকালে গুর্জ্জর-প্রতীহার সাম্রাজ্য সুদূর ভাগীরথী পর্য্যন্ত, এবং ভাগীরথীর সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি দিনাজপুর-প্রস্তরলিপির উপর নির্ভর করিয়া ইহাও ধরিয়া লইয়াছেন যে,—নারায়ণপালের মৃত্যু হইতে গৌড়পতি প্রথম মহীপালের সিংহাসনারোহণ পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর-বাঙ্গালা প্রদেশ মোঙ্গলীয়-বংশোদ্ভব নরপালগণের শাসনাধীন ছিল।

প্রতীহার-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি।

ইহা প্রকৃত হইলে, কেবল মধ্য বাঙ্গালা, এবং হয় ত পূর্ব্ব-বাঙ্গালার কতক অংশ বাঙ্গালার পালরাজগণের অধিকারভুক্ত থাকিবার কথা। কিন্তু পালরাজবংশের দ্বিতীয় গোপালের রাজ্য যে মগধের কিয়দংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং সম্ভবতঃ নালন্দা ও গয়াও তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেরূপ প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেন—রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় ইন্দ্র কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ-রাজ মহীপাল পরীহার যখন পরাজিত ও বিতাড়িত হয়েন, সেই সময় গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় গোপাল মগধরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া থাকিবেন। কিন্তু মহীপাল পরী-

পালরাজগণের অধিকারভূমি।

হার যখন হর্ষ চান্দেল্লর সহায়তায় কান্যকুব্জের পুনরুদ্ধার সাধন করেন, মগধ হয় ত তৎকালে গৌড়রাজবংশের কর-বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এই উপন্যস্ত সিদ্ধান্ত একটা দুর্ব্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত বলিয়া বোধ হয়।

শব্দানুশাসনে যে গঙ্গা-সঙ্গমের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা গঙ্গার সাগর-সঙ্গমের, বা তাহার যমুনা-সঙ্গমের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে, তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই। তাহার অর্থ যাহাই হউক, তাহার ভিতর যে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের অধিকার আছে, তাহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ৯৫৪ খৃষ্টাব্দের, যশোবর্ম্মা চান্দেল্লর যে শিলালিপির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে যশোবর্ম্মা গৌড়জন-গণকে লতার ন্যায় ছেদন করিবার অসিরূপে, এবং মৈথিলগণের (অর্থাৎ ত্রিহুতের অধিবাসিগণের) শক্তিনিধনকারী রূপে, বর্ণিত হইয়াছেন। ১০০২ খৃষ্টাব্দের আর একখানি চান্দেল্ল-শিলালিপিতে যশোবর্ম্মার উত্তরাধিকারী বঙ্গদেব কর্ত্তৃক অঙ্গ (বর্ত্তমান দক্ষিণ পূর্ব্ব বিহার প্রদেশ) এবং রাঢ় (অর্থাৎ পশ্চিম বাঙ্গালা) আক্রমণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যে সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, কান্যকুব্জের পরীহার-রাজগণের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে জেজাকভুক্তির যে চান্দেল্লরাজবংশ প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারাই রাষ্ট্রকুটগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার নিমিত্ত পরী-হাররাজের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়াছিলেন, এবং গৌড়ের পালরাজবংশ তাঁহাদিগের চিরাচরিত নীতি অবলম্বন করিয়া, পরীহার-রাজের প্রতিকূলে রাষ্ট্রকূটগণের সহিত মৈত্রীবদ্ধ হওয়ায়, চান্দেল্ল-রাজের সঙ্গে তাঁহাদের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। যশোবর্ম্মা চান্দেল্লর প্রস্তরলিপিতে "মিথিলেশ্বর" উল্লেখ দেখিয়া এরূপ মনে হয় যে, তাঁহার রাজত্বকালে ত্রিহুত গৌড়ের পালরাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল, অথবা তাহা তাঁহাদিগের মিত্ররাজগণের বা সামন্ত-নৃপতি-গণের শাসনাধীন ছিল।

তাহার পর, উত্তর-বাঙ্গালায় কাম্বোজাক্রমণের কথা। দিনাজপুর জেলায় বাণগড়ের ভগ্নস্তূপের ভিতর যে প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাই,—কাম্বোজবংশ-সম্ভূত জনৈক নৃপতি একটি শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই শিলালেখে প্রতিষ্ঠার অব্দ-কাল সংখ্যার সাঙ্কেতিক সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছে।—তাহার অর্থ সম্ভবতঃ ৮৮৮ সংখ্যা; ইহাকে শকাব্দ বলিয়া অনুমান করিয়া লইলে, ৯৬৬ খৃষ্টাব্দ

উত্তর-বাঙ্গালায় কাম্বোজ-আক্রমণ।

পাইতেছি। যে মোঙ্গলীয় জাতির আক্রমণের ফলে, কাম্বোজ-রাজবংশের—এই মন্দির-প্রতিষ্ঠাতার উদ্ভব-বংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা যে নিশ্চিতই ইহার পূর্ব্বে ঘটিয়া থাকিবে, ইহাও স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। বাদল-স্তম্ভলিপিতে দৃষ্ট হয়, উহা নারায়ণপালের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহা হইতেই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—উত্তর-বাঙ্গালার সমগ্র ভূভাগই নারায়ণপালের অবিসংবাদিত অধিকারে ছিল, এবং বাণগড়-মন্দিরলিপি হইতে তিনি ইহাও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের শেষভাগে সমগ্র উত্তর-বাঙ্গালা প্রদেশ মোঙ্গলীয় রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। এই সিদ্ধান্তদ্বয়ের কোনটিই প্রমাণের দ্বারা কিয়ৎপরিমাণেও নিশ্চয়রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মঙ্গলবাড়ী হাটের নিকট বাদল-স্তম্ভের অবস্থানভূমি, এবং কাম্বোজান্বয়জ নৃপতির মন্দির-লিপির বাণগড়,—উভয়ই দিনাজপুর জেলায়, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাদিগের ব্যবধান অতি দীর্ঘ—প্রায় ২৫ মাইল; বাদল-স্তম্ভ দিনাজপুর জেলার পূর্ব্ব-সীমান্তের সন্নিকটে, এবং বাণগড় ঐ জেলার প্রায় কেন্দ্রস্থলে গঙ্গারামপুর থানার এলাকায়, পুনর্ভবা নদীর তীরে। সুতরাং বাদলস্তম্ভ-প্রতিষ্ঠার সময়, বাণগড়ে কাম্বোজ-রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত থাকা একেবারে অসম্ভব নাও হইতে পারে। পক্ষান্তরে, এই কাম্বোজ-রাজগণের রাজ্য যে কত-দূর বিস্তৃত ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হই নাই। মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা কাম্বোজরাজের গৌড়পতি আখ্যা হইতে, গৌড়ে তাঁহার অধিকাব বহুবিস্তৃত ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইলেও, সমগ্র উত্তর-বাঙ্গালায় যে তিনি শাসনদণ্ড পরি-চালন করিতেন,—এরূপ প্রমাণিত হয় না। সামরিক হিসাবে, বাণগড়ের অবস্থান-ক্ষেত্র বিশেষরূপ সুবিধাজনক ছিল বলিয়াই প্রতিভাত হয়। পরবর্ত্তিকালে, মুসলমানগণ যখন ধীরে ধীরে বঙ্গ-বিজয় করেন, তাহারই প্রথম আমলে এই স্থানে মুসলমানগণের একটী সীমান্ত-ঘাঁটী স্থাপিত হইয়াছিল। বাণগড়-মন্দির-লিপি সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে,—উত্তর-বাঙ্গালায় এক কাম্বোজ-রাজবংশ ছিল, এবং বাণগড় তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল, উহা তাহাই প্রমাণিত করিতেছে; এবং সম্ভবতঃ তিব্বত বা ভুটান হইতে মোঙ্গলীয় বংশের এক বা একাধিক জাতি আসিয়া যে উত্তর-বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিল, উহাতে তাহারও ইঙ্গিত প্রাপ্ত হই।—লিপির নির্দ্ধারিত অব্দকাল যদি ভ্রমাত্মক না হয়, তাহা হইলে, এ আক্রমণ নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীয় প্রথমভাগে সং-ঘটিত হইয়া থাকিবে। এই সকল আক্রমণকারী যে এতদ্দেশেই স্থায়ী হইয়া

পড়িয়াছিল, এবং হিন্দুধর্ম্মকেই আপনাদের ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল,—তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ আক্রমণ যে ঘটিয়া থাকিবে,—তাহা বিস্ময়কর নহে, এবং সে আক্রমণ সম্বন্ধে কোনও নিশ্চিত তথ্য যে আমাদিগের জ্ঞানগোচর হয় নাই—তাহাও বিস্ময়কর নহে। ভিন্সেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন,—হিন্দু লেখকগণ বর্ব্বর জাতির আক্রমণ-বর্ণনে বিশেষ অনুৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং রাজসভার যে সকল লেখক শাসন বা প্রশস্তির রচনা করিতেন, তাঁহারা যে এবংবিধ ঘটনা বিশদরূপে বর্ণনা করিবেন না—ইহাও স্বাভাবিক।

মহীপাল।

গৌড়পতি মহীপালের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে,—তিনি অনধিকারী কর্ত্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে,—তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় পাল-বংশের ভাগ্যলক্ষ্মী অধঃপতিত ছিল; কিন্তু এই অবনতির হেতু কি, তাহা আমরা ঠিক অবগত নহি। পশ্চিম দিক হইতে পরীহার ও চান্দেলগণের আক্রমণ, এবং উত্তর দিক হইতে মোঙ্গলীয় জাতিসমূহের আক্রমণ—এই উভয় আক্রমণের ফলে পাল বংশের অধঃপতন সংঘটিত হওয়া বিশেষ সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিব্বত ও ভুটান হইতে আক্রমণের পক্ষে বাঙ্গালা অবারিত ছিল। দৃষ্টান্তস্থলে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভুটানবাসিগণ কর্ত্তৃক কুচবিহার-আক্রমণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ, ভুটানীগণ কুচবিহার স্বাধিকারে লইয়া কয়েক বৎসর কাল তাহার শাসনকার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন; কিন্তু কুচবিহারের মহারাজ ইংরাজের শরণাপন্ন হওয়ায়, তাঁহাদিগের সহায়তায় ভুটানীগণ পরাজিত হইয়াছিলেন। ভুটানীগণ তখন তিব্বতের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন, এবং তিব্বতের মধ্যবর্ত্তিতায় ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এক সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হইল,—কুচবিহার ইংরাজ-রাজের করদ-মিত্র-রাজ্য-রূপে কুচবিহারের মহারাজের হস্তে প্রত্যর্পিত হইল, এবং ভুটান-পর্ব্বতমালার সানুদেশে-স্থিত বিস্তৃত সমতল প্রদেশ ভুটানের অধিকারে রহিয়া গেল। অবশেষে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে, শেষ ভুটান-যুদ্ধে ব্রিটিশ রাজ তাহাও স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছেন, এবং তাহা এক্ষণে জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম দুয়ার (Western Duars) নামে পরিচিত।

পালরাজগণের রাজত্ব-কাল।

বাঙ্গালার প্রথম পালরাজগণের রাজত্ব-কাল নিঃসন্দিগ্ধরূপে নিরূপিত হইবার উপায় না থাকিলেও, তাহাদিগের পৌর্ব্বাপর্য্যাদি-প্রদর্শনের নিমিত্ত নিম্নে অঙ্ক-সংবলিত নাম-তালিকা প্রদত্ত হইল; তাহাতে বৎস হইতে আরম্ভ করিয়া গুর্জ্জর, প্রতীহার, বা

পরীহার রাজগণের, তৃতীয় গোবিন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া রাষ্টকূট-রাজগণের এবং ধর্ম্মপাল হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালার পালরাজগণের নাম ও তাঁহাদের শাসন-প্রশস্তির লিপি-প্রমাণ-গত অব্দাদি, এবং তাঁহাদিগের রাজ্যপ্রাপ্তির আনুমানিক কাল (কারণ, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রমাণের অভাবে অনুমান ব্যতীত উপায়ান্তর নাই) লিপিবদ্ধ হইল।

লামা তারানাথ লিখিয়াছেন,—ধর্ম্মপাল ৬৪ বৎসর এবং দেবপাল ৪৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। নারায়ণপাল যে অন্যূন ১৭ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রাজত্বের সপ্তদশবর্ষে সম্পাদিত তাম্রশাসন হইতে প্রাপ্ত হই। নিম্নের তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলেই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে—তারানাথের উক্তি-অনুসারে যদি আমরা ধর্ম্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকালের ব্যাপ্তি নির্দ্ধারিত করিয়া ৮০০ খৃষ্টাব্দকে ধর্ম্মপালের রাজ্যাভিষেক-কাল বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে, সম্ভবতঃ গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের রাজত্বকালেই মিহির ভোজ কর্ত্তৃক পরিচালিত প্রতীহারগণ কান্যকুব্জ বিজয় করিয়া থাকিবে ;—দেবপাল যদি প্রতীহারগণের সহিত কোনও যুদ্ধ করিয়া থাকেন, তবে তাহা মিহির ভোজের সহিত, অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারী মহেন্দ্রপাল, বা দ্বিতীয় ভোজের সহিত করিয়া থাকিবেন ; কদাচ রাজভট্টের সহিত করেন নাই ;—যদি ও রাখালদাস সেইরূপই অনুমান করিয়াছেন ; এবং সম্ভবতঃ ৯১৬ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র কর্ত্তৃক কান্যকুব্জের মহীপাল পরীহারের যে পরাজয় ও নির্ব্বাসন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা গৌড়ের প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপালের, অথবা নারায়ণ পালের রাজত্বকালে ঘটিয়া থাকিবে। এরূপ হইলেও, গৌড়পতি প্রথম মহীপালের রাজ্যাভিষেক-কাল খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষের দিকে আসিয়া পড়িবে ; এবং তাঁহার ও নারায়ণ পালের ভিতর তিনটি রাজত্ব-কালের ব্যবধান থাকায়, দিনাজপুর জেলার ৯৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-কর্ত্তা কাম্বোজ-রাজবংশকে তিনি উত্তর-বাঙ্গালা হইতে উৎখাত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া যে সিদ্ধান্ত উপন্যস্ত হইয়াছে, তাহার সহিতও অসামঞ্জস্য ঘটিবে না।

অন্য দিক দিয়া দেখিতে গেলে, ক্রমান্বয়ে পিতাপুত্ররূপী দুইটি পাল-নৃপতির পক্ষে যথাক্রমে ৬৪ বৎসর ও ৪৮ বৎসর রাজত্ব করা, একেবারে অঘটন না হইলেও, কিয়ৎপরিমাণে অসম্ভব ; এবং এই অসম্ভাব্যতা বিবেচনা করিয়াই হয় ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তারানাথের উক্তি অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

তারানাথের উক্তি ছাড়িয়া দিলেও, ধর্ম্মপাল যে, অন্ততঃ ৩২ বৎসর কাল, এবং দেবপাল ৩৩ বৎসর কাল রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা শাসনাবলীর দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব, নিম্নের তালিকায় প্রদত্ত বাঙ্গালার পাল-রাজগণের বিকল্পিত অব্দ গ্রহণ করিয়া রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় অনুমান করিতে পারা যায় যে,—গৌড়পতি দেবপাল পরীহার-রাজ রামভদ্রের, এবং নারায়ণপাল প্রথম ভোজের সমসাময়িক ছিলেন। ইহার সহিত, যদি পূর্ব্বে উল্লিখিত, বিলাতের যাদুঘরে সংরক্ষিত পুঁথির বর্ণনানুযায়ী গৌড়পতি দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকাল ২৬ বৎসর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও, গৌড়েশ্বর প্রথম মহীপালের খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের শেষ দিকে গৌড়ের সিংহাসনে অধিরোহণই সম্ভব বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

পাল-রাজগণের নাম	রাজ্য-প্রাপ্তির আনুমানিক কাল—খৃষ্টাব্দ	প্রতীহার বা পরীহার রাজগণের নাম	লিপিপ্রমাণ-মূলক কাল—খৃষ্টাব্দ	রাষ্ট্রকূট রাজগণের নাম	লিপিপ্রমাণ-মূলক কাল—খৃষ্টাব্দ
ধর্ম্মপাল	৮০০	বৎস	...	তৃতীয় গোবিন্দ	৭৯৪-৮১৩
দেবপাল	৮৬৪ বা ৮৪০	নাগভট্ট রামভদ্র	...	প্রথম অমোঘবর্ষ	৮১৭-৮৭৭
প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপাল	৯১২ বা ৮৮০	মিহির ভোজ বা প্রথম ভোজ	৮৪৩	দ্বিতীয় কৃষ্ণ বা কৃষ্ণবল্লভ	৯০২-৯১১
নারায়ণ পাল	...	মহেন্দ্রপাল বা মহেন্দ্রায়ুধ	৮৯৩-৯০৭	তৃতীয় ইন্দ্র	৯১৪-৯১৬
রাজ্যপাল	৯৩০ বা ৯০০				
দ্বিতীয় গোপাল	...	দ্বিতীয় ভোজ	৯০৭-৯১৪		
দ্বিতীয় বিগ্রহপাল	৯৪০	মহীপাল	৯১৭		
প্রথম মহীপাল	৯৭০				

শ্রীবিমলাচরণ মৈত্রেয়। *

---

* কলিকাতার চৈতন্য লাইব্রেরীতে শ্রীযুত অনারেবল এফ্. জে. মোনাহান কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

বঙ্গ-সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি। *

"সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি"র আলোচনার পূর্ব্বে উহার উৎপত্তির কাহিনী একটু স্মরণ করিতে হইবে। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের অনুসন্ধানের ফলে ইহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় অষ্টম কি নবম শতাব্দীতেও বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন ছিল। সে বাঙ্গালা এখনকার বাঙ্গালা অপেক্ষা অবশ্য অনেক স্বতন্ত্র, সে বাঙ্গালা এখনকার বাঙ্গালী অতি কষ্টেই বুঝিতে পারে। "চসারে"র ইংরাজী হইতে এখনকার ইংরাজীর যতটা পার্থক্য, তৎসাময়িক কানুর গীত হইতে আমাদের ভক্তকবি রামপ্রসাদ বা নীলকণ্ঠের গীতে প্রায় ততটাই প্রভেদ। এই কানুর গীত এবং অপরাপর "সহজ-মতা"বলম্বী সাধকগণের সঙ্গীত বাস্তবিক আমাদের এই বাঙ্গলা ভাষার বেদীস্বরূপ। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যেরাও খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে অনেক দোঁহা গীতিকা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সিদ্ধাচার্য্য-গণের সঙ্গীতসমূহ সে সময়ের লেখা ও সেকালের লোকের লিখিত টীকার সহিত পাওয়া গিয়াছে। কাজেই বলিতে হয় যে, সহস্র বৎসরের পূর্ব্বেকার প্রচলিত বঙ্গভাষার প্রকৃত নমুনা বা নিদর্শন আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। উহাতে পার্শী কথার লেশ নাই, বড় বড় সমাস-বহুল সংস্কৃত শব্দাদি একেবারেই নাই। হাজার বছর আগে আমরা ঘরে বাহিরে কোন্ ভাষা ব্যবহার করিতাম, তাহারই আভাস বা পরিচয় আমরা পাইয়াছি। ইহার পরে গোবিন্দচন্দ্রের গীত। সে গীতের প্রচুর পরিবর্ত্তন ঘটিলেও, উহা সেই মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বের লেখা। তখন লোকে কি ভাবে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাইত, তাহার একটা ছবি এই গোবিন্দচন্দ্রের গীতে লক্ষ্য করা যায়। অতঃপর মুসলমান-আক্রমণের সময়ে রমাই পণ্ডিতের "শূন্যপুরাণ" প্রণীত হয়। উহাতে "নিরঞ্জনের উষ্মা" নামে যে ছড়া আছে, তাহাতে মুসলমান-আক্রমণের বর্ণনা প্রস্ফুট হইয়া আছে। খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী হইতে এই মুসলমান-আক্রমণের সময়, অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার যতখানি পুষ্টি বা বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল, তাহাতে আমার বোধ হয়, বৈদেশিক প্রভাব একেবারেই ছিল না; কিন্তু তাহার উপাদান-বিভাগে সহজ-ধর্ম্মমত, নাথপন্থীদিগের ধর্ম্মমত ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক মত বিশেষ-ভাবেই বিবৃত রহিয়াছে। এই সব দেখিলে ইহা একরূপ নিঃসন্দেহেই সিদ্ধান্ত

---

* বাঁকীপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

করা যায় যে, জনমণ্ডলীর মধ্যে ধর্ম্মমত প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই প্রথমতঃ বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি হয়। বৌদ্ধেরা—বিশেষতঃ "সহজিয়া" সম্প্রদায় দেশের আপামর সাধারণকে ধর্ম্মের কথা বা বৃত্তান্ত শুনাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন; সে ব্যস্ততা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের রচিত দোঁহা ও গীতিকায় এখনও স্পষ্ট বোধগম্য হয়। ধর্ম্মমত-প্রচারার্থই যখন আমাদের এ ভাষার উৎপত্তি, তখন বুঝিতে হইবে,—আমাদের বাঙ্গালা ভাষা মূলতঃ ও মুখ্যতঃ সম্যকরূপেই Democratic বা লোকমতানুগামী। এই সময়ের বাঙ্গালাতে রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ নাই; পুরাণসমূহের উল্লেখ নাই; আছে কেবল বৌদ্ধ সন্ন্যাসের মত, নাথপন্থী যোগিগণের মত, এবং সহজ-ধর্ম্মমূলক সাধারণ নীতিকথার আবৃত্তি।

ইহার পর মুসলমান-বিজয়। পাঠানগণ এ দেশে আসিলে বাঙ্গালার বৌদ্ধসমাজে যে কি ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এখন আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। পাঠানগণ প্রথমেই বৌদ্ধ বিহার, মন্দির প্রভৃতি নষ্ট করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের ধরিয়া জোর করিয়া মুসলমান করিতে লাগিলেন। অনেকের অনুমান যে, বস্তুতঃ বাঙ্গালার বৌদ্ধগণই হিন্দুদিগের প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া, বক্তিয়ার খিলিজি ও তাঁহার অনুচর পাঠানগণকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। রমাই পণ্ডিতের "শূন্যপুরাণ" পাঠ করিলে এ অনুমান যেন কতকটা দৃঢ়ই হয়। কিন্তু পাঠানদিগের আক্রমণের পর পরিণামে বাঙ্গালার হিন্দুগণই একটু জাগিয়া উঠিলেন। আদিশূরের আমোল হইতে লক্ষ্মণসেনের সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় নবাগত কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারের জন্য তেমন বিশেষ কোনও চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা রাজার আশ্রয়ে থাকিতেন, অনবরত যাগ-যজ্ঞ করিতেন, এবং নিজ নিজ জাতিগত শুদ্ধিরক্ষার জন্য সততই সচেষ্ট ও সাবধান রহিতেন। কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের অধঃপতনান্তে ও পাঠানগণের অভ্যুদয়ের সময়ে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ বুঝিলেন—আর পূর্ব্ববৎ উদাসীন থাকিলে চলিবে না; নিজেদের চিরাচরিত ধর্ম্ম ও কর্ম্মপদ্ধতির বহুল প্রচার লোক-সমাজে না করিলে নয়। পূর্ব্বগামী সিদ্ধাচার্য্যগণ, নাথ-পন্থের যোগিগণ, এবং 'সহজিয়া'গণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়া নিজেদের ধর্ম্মমত বাঙ্গলার লোক-সমাজে প্রচার করিতেন, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ তখন সেই পন্থা অবলম্বন করিলেন; এবং ফলে সঙ্গে সঙ্গে 'মনসার গান', 'মঙ্গলচণ্ডীর গান', 'শিবায়ন' প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-

মতের অনুগামী করিয়া লিখিত হইতে লাগিল। সিদ্ধাচার্য্যেরা যে বাঙ্গালা রচিয়াছিলেন, তাহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্র বা অলঙ্কারের কোনও প্রাধান্যই ছিল না। ব্রাহ্মণগণই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ-মহাভারত লিখিবার সময়ে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ মান্য করিয়া পুরাণাদির আদর্শানুসারেই রচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর খাঁটী বাঙ্গালীয়ানা কৃত্তিবাসের রামায়ণে, কাশীদাসের মহাভারতে ও মুকুন্দরামের চণ্ডীতে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ভাষায়অনেক সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করিল; সংস্কৃত ভাব, সংস্কৃত অলঙ্কার, সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্টতা বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকট হইল। এই সময় হইতেই বঙ্গভাষা সংস্কৃত সাহিত্যের নিকট হইতে অজস্র ঋণ করিলেন।

অপর পক্ষে, মুসলমানগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের শাসন-পদ্ধতি এ দেশে প্রচলিত হইয়াছিল, আরবী-পার্শীরও পঠন-পাঠন সুরু হইয়া গিয়াছিল। ফলে, এই ব্রাহ্মণপুষ্ট, নবোন্মেষিত অভিনব বঙ্গসাহিত্যে ফার্শী ও আরবী ভাষার প্রচুর প্রাধান্যও প্রতিষ্ঠিত হইল। কেবল ইহাই নহে, যে সময়ে বঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি ও উন্নতি হইতেছিল, সে সময় পঞ্জাবে ও যুক্তপ্রদেশ বা পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দী ও ব্রজভাষারও উন্মেষ ঘটিতেছিল। বৈজু বাওরা হইতে তুলসীদাস, শ্যামদাস, বিহারীদাস প্রভৃতি বড় বড় হিন্দী কবিরা মহাকাব্য-প্রণয়ণে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা রামলীলা ও ব্রজলীলার বর্ণনা করিতেছিলেন; এবং সে সকলের মাধুরীছটায় ও সুধাস্বাদে উত্তর-ভারত পরিপূর্ণ ও পরম প্রমত্ত হইয়া উঠিল। সে সাহিত্য-সম্পদের সমাদর মোগল-পাঠান বাদশাহগণ পর্য্যন্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন;—আলাউদ্দীন হইতে আকবর পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরগণ হিন্দী কবি ও কাব্যের যথেষ্ট আদর-মর্য্যাদা করিতেন; হিন্দী ভাষা তাই ভারতের সর্ব্বত্রই সম্মানিত ও সমাদৃত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই আদরের প্রবাহ-বেগ আসিয়া এ দেশেও আমাদের ভাষার অঙ্গে তরঙ্গ তুলিয়াছিল। তৎকালিক বাঙ্গালা ভাষাও তাই হিন্দীর কাছে অনেকটা ঋণী। শুধু ঋণীই নহে,—সুরদাস ও শ্যামদাসের অনেক গান বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত হইয়া নরোত্তম দাস ও গোবিন্দ দাসের পদাবলী-রূপে আমাদের সাহিত্যের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল,—এই হিন্দী ভাষাও বিশ্ব-সাহিত্যের আদিজননী সংস্কৃত ভাষারই বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিত, এবং ক্রমশঃ সংস্কৃত-শব্দ-বহুল হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই, তখনকার হিন্দীর সঙ্গে তখনকার বঙ্গভাষার বেশ একটু ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সৃষ্টি হইয়াছিল। ক্রিয়াপদের কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনেই হিন্দী দোঁহা

ও চৌপদী বা 'চৌপায়ী' বাঙ্গলায় পরিণত হইয়া যাইত। কৃত্তিবাসের রামায়ণে আমরা তুলসীদাসের অনেক পদ দেখিতে পাই; এবং ঘনরামের "ধর্ম্মমঙ্গলে"র বহু স্থল নরহরি কবির যুদ্ধ-বর্ণনার আকারান্তরমাত্র।

✓ইহার পর, পতিতপাবন মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের যুগ। এই সময় বঙ্গভাষা ভাদ্রের ভরা ভাগীরথীর মত দুই কূল পরিপ্লাবিত করিয়া, থরস্রোতে হেলিয়া দুলিয়া, নাচিতে নাচিতে, অনন্তের অভিমুখে একাগ্রভাবে ছুটিয়া গিয়াছে। ভাষার সে শব্দ-সম্পৎ, সে ভাব-গাম্ভীর্য্য, সে বর্ণনা-বৈচিত্র্য, সে সুমধুর ও অনাবিল রস-বিলাস সত্যই যেন বর্ষার প্রবীণা নদীর ন্যায়। তাহাতে তরল সলিলের কল্লোল কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতেছে! ভাষার সেই তেজ, তেমন গৌরব, তদ্রূপ গরিমা ও মহিমা অদ্যাপি আর কোনও কবিসম্প্রদায় ঘটাইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন,—"কাব্য ও নাটকই চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রাণ, অলঙ্কারের রস ও ভাবই তাহার দেবতা। নয় রস, বিয়াল্লিশ ভাব, ও আটটি সাত্ত্বিক ভাব লইয়াই বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের কীর্ত্তন। পদকর্ত্তারা দেখিতেন—এই এই ভাবের গান আছে, এই এই ভাবের গান নাই; যাহা নাই, তাহা নূতন করিয়া রচিয়া তাঁহারা কীর্ত্তনে জুড়িয়া দিতেন। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, এক গানে এক জন যে ভাব দিয়াছে, আর এক জন তাহাতে অন্য ভাব লাগাইল,—এইরূপে নানা ভাবে, নানা রসে সঙ্কীর্ত্তনের গান হইতে লাগিল; তাহার পর অনেক গান, অনেক পদ জমিয়া গেল; সেই পদ ও গান সংগ্রহ করিয়া 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইল।" ইহা গেল শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্মের একটি দিক। ইহার আরও একটি দিক আছে;—শাস্ত্রী মহাশয়, কেন জানি না, সে দিকের কোনও সন্ধান বা পরিচয় দেন নাই; তাহা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের পরিচয়ের দিক। জয়ানন্দের "চৈতন্যমঙ্গল", কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্য-চরিতামৃত" ও "চৈতন্য-ভাগবত" প্রভৃতি গ্রন্থনিচয় এই পরিচয়ের দিকটি পূর্ণ করিয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি এক একখানি মহাকাব্য। ভাবে, রসে এবং সেই সময়ের তুলনায় এ সকলের ভাষায় এগুলি অপূর্ব্ব, অনুপম—অতুল! এই সকল পুস্তকের সাহায্যে লোক-সমাজে চৈতন্য-ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল; এবং এতদ্দ্বারা, আমার বিশ্বাস, এ বিশ্ব-জগতেই দিব্য চৈতন্য সঞ্চারিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় এই সব গ্রন্থের প্রভাবে তৎকালে বিধর্ম্ম বা অধর্ম্মের ধ্বংস বা সঙ্কোচ ঘটিয়াছিল।

ধর্ম্ম-প্রচারের গ্রন্থ বলিয়াই এই সকল গ্রন্থের প্রায় সকলগুলিরই ভাষা সজীব, সতেজ, এবং অত্যন্ত প্রসাদ-গুণ-বিশিষ্ট। বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাঙ্গালা ভাষাকে সত্য সত্যই এইরূপে এক প্রাণশক্তি-প্রভাবে উদ্বুদ্ধ ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। সে ভাষার তড়িৎ-স্পন্দনে বাঙ্গলার আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলেই নব ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছে। এই অবসরেই বাঙ্গালা ভাষা একটা অপরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, শৌর্য্যে ও মাধুর্য্যে তাহা একটা নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি প্রাপ্ত হইল।

এইখানে প্রসঙ্গতঃ বৈষ্ণব সাহিত্যেরই একাংশ—যাহা পদাবলী সাহিত্য নামে পরিচিত, তৎসম্পর্কে আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অতি সামান্যভাবেই যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখমাত্র করিয়া যাইব। মহাকবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ব্যতীত অপরাপর যাবতীয় পদকর্ত্তাই শ্রীচৈতন্য প্রভুর সমসাময়িক বা তৎপরবর্ত্তী। উৎকল কবি সদানন্দ মহাপ্রভুকে "হরিনাম মূর্ত্তি" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন;—বস্তুতঃ, এমন ভাবে এক কথায় প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের যথার্থ ও যোগ্য পরিচয় আর কেহই প্রদান করিতে পারেন নাই। যে ভাব অম্লান দিব্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া গৌরাঙ্গ-রূপে এ ধরণী ধন্য করিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই ভাব চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির অপরূপ পদাবলীতে সর্ব্বপ্রথমে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া, পরে শ্রীচৈতন্যের চরণস্পর্শে প্রমত্তবেগে, উদ্দাম তরঙ্গ-ভঙ্গ বিস্তার-পূর্ব্বক সেই অনন্ত, অপার মহাপারাবারের ক্রোড়ে গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। বৈষ্ণব পদাবলী এ বিশ্ব-সংসারে প্রকৃত কবিত্ব-ভাণ্ডারের এক অবিনশ্বর ও চিরন্তন অমূল্য সম্পৎ। বঙ্গভাষা অন্যবিধ সাহিত্য-ঐশ্বর্য্যে বিশ্বের অপরাপর সাহিত্যের নিকটে নানা ভাবেই নতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত বটে; কিন্তু, প্রকৃত কবিত্ব-বৈভবে অর্থাৎ—ঐশ্বরিক প্রেমের তন্ময় বর্ণন-নৈপুণ্যে ও অনাবিল ও বিচিত্র রস-বিন্যাসে এ সাহিত্য অখিল সংসারের অনুপম মুকুটমণিরূপে চিরদিন গণ্য হইবার যোগ্য।)

অতঃপর, বঙ্গভাষার সৌখীন যুগ আসিল। রাজ-সভায় ইহার আদর হইল। পার্শীনবীশ ও সংস্কৃতজ্ঞ সুধী ব্রাহ্মণগণ এই ভাষাকে সংস্কৃত ও সম্মার্জ্জিত করিতে উদ্যত হইলেন; ভাষাসুন্দরীও যেন কতকটা বিলাসিনীর বেশ ধারণ করিল। এই সৌখীন সাহিত্যের যুগে ভারতচন্দ্রই মহাকবি। ইনিই বাঙ্গালাভাষাকে প্রথম চাঁচিয়া ছুলিয়া, মাজিয়া ঘষিয়া, অপূর্ব্ব সামগ্রীতে পরিণত করিলেন। শ্লীলতার অভাব সত্ত্বেও, বিশেষ ভাবে

ভাষার হিসাবে, ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" ও "বিদ্যাসুন্দর" এই সুমার্জ্জিত সাহিত্য-শ্রীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভারতচন্দ্র কবিতা লিখিতে যাইয়া, ভাষার উপরে যে কারিগরি ফলাইয়াছেন,—যে অপূর্ব্ব ভাস্করশিল্পের, কলা-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন, সত্য সত্যই তাহা বিচিত্র, বিস্ময়াবহ ও অনুপম। ভারতের সেই 'মাজা-ঘষা' ভাষাই আজিও আমাদের আদর্শ,—এখনও কবিকুলে কিংবা সাহিত্যিক-সমাজে তাহাই সুপ্রচলিত। কিন্তু এ সময়ে আরও একটি ব্যাপার ঘটিল। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য্যদের মত সরল, সোজা ভাষায় সঙ্গীত রচনা করিয়া, ভাষাকে আর একটা বিরাট বৈভব দিয়া গেলেন। দেড় শত বৎসর পরেও, রামপ্রসাদের গান এখনও বাঙ্গালীর নিকটে পুরাতন হয় নাই। এখনও সে ভাষা বাঙ্গালীর অব্যবহার্য্য নহে। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ বাঙ্গলাভাষাকে রাজপ্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত দুর্লভ মুক্তাফলের মত, নির্ব্বিচারে ছড়াইয়া দিলেন। উঁহাদের প্রভাবে কালক্রমে পাঁচালীওয়ালা, কবিওয়ালা, নিধুবাবু ও দাশুরায়, হরুঠাকুর ও মধু কান বাঙ্গালাভাষাকে লইয়া যথার্থই যেন "হরির লুট" খেলিয়া গেলেন। ভাষার এতটা প্রচার, এতটা বিস্তৃতি, এতটা গৌরব, এতটা সমাদর বাঙ্গালায় আর কখনও হইয়াছিল কি না, সন্দেহ। শ্রীহট্ট হইতে মালদহ পর্য্যন্ত রামপ্রসাদের মালসী গীতের স্রোত বহিয়া চলিল। হরুঠাকুরের কবিগান সকলেই উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। বলিয়া রাখা উচিত যে গোড়াতেও যাহা ছিল, গত ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা-সময়েও বঙ্গভাষার সেই ভঙ্গী অব্যাহত রহিল। গোড়ায় ধর্ম্ম-প্রচার উপলক্ষে সংযম-সন্ন্যাস শিখাইবার জন্য বাঙ্গালাভাষার বিকাশ,—শেষে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের সময়ে, হরুঠাকুর ও দাশুরায়ের যুগেও বাঙ্গালা ভাষা ধর্ম্মপ্রচারার্থ, লোক-শিক্ষা-কল্পেই নিয়োজিত হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" শক্তি-সাধনা-প্রচারের পুস্তকমাত্র; উহা কাব্যও বটে, পুরাণও বটে। রামপ্রসাদের গান সিদ্ধাচার্য্যদেরই সঙ্গীতের মত; কেবল সংযম-সন্ন্যাস, সাধনা ও যোগ ও ভক্তি শিখাইবার উদ্দেশ্যেই, কবির স্বাভাবিক স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত ভাবাবেশে বিরচিত।

অষ্টম শতাব্দী হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত—এই এক হাজার বৎসর বাঙ্গালা ভাষার মূল প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে নাই; এই হাজার বৎসর ব্যাপিয়া বাঙ্গালার ভাষার পুষ্টি ও বিস্তৃতি বঙ্গ-সাহিত্যের অভ্যুদয় ও প্রচার, লোক-শিক্ষার জন্যই হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে কখনও বা বৌদ্ধ স্বীয় মত

ব্যক্ত করিয়াছেন; কখনও বা ব্রাহ্মণ পুরাণ-কথার প্রচার করিয়াছেন; কখনও বা তান্ত্রিক মাতৃপূজার নিগূঢ় তত্ত্ব বাঙ্গালীকে শুনাইয়াছেন; কখনও বা বৈষ্ণব নিগূঢ় প্রেম ও আদি রসে—মাধুরী-বিলাসে বিমুগ্ধ ও তন্ময় হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলার আলাপন করিয়াছেন! সকল সময়েই শ্রোতা—এই বাঙ্গালার আপামর সাধারণ; উপভোগী—বাঙ্গলার বিদ্বজ্জনবৃন্দ—রসিক-সুজন। তবে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিব যে, যুগে যুগে যেমন লোকরুচির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তেমনই বাঙ্গালা ভাষার গতি ও প্রকৃতিও অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু মুখ্যতঃ, মূলে এই হাজার বৎসরের মধ্যেও বাঙ্গালা ভাষার ধাতুগত বা স্বভাবসিদ্ধ কোনরূপ বৈষম্য বা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই।

এই বারে ইংরেজী যুগের কথা বলিব। ইংরেজ এ দেশে শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত করিবার পর বিচারালয় হইতে, সরকারী দপ্তর হইতে পার্শী ও উর্দ্দু ভাষা তুলিয়া দিলেন;—বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ভাষাই প্রচলিত করিলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ইহাও সঙ্কল্প করিলেন যে, এ দেশের ইংরাজ শাসক-সম্প্রদায়কে বাঙ্গলা শিখাইতে হইবে। তাই, 'ফোর্ট উইলিয়মে' একটি কলেজ স্থাপিত হইল, এবং সেই কলেজে নবাগত যুবক ইংরাজদিগকে বাঙ্গলা ও সংস্কৃত শিখাইবার জন্য মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রভৃতি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ নিযুক্ত হইলে। "ফোর্ট উইলিয়মে"র পণ্ডিতগণই ইংরাজি যুগের আধুনিক বাঙ্গলার বনিয়াদ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। পণ্ডিত ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই ভাষাকে আরও সহজ, প্রাঞ্জল ও সুমার্জ্জিত করিয়া, তাহাকে ইস্কুল-পাঠ্য ভাষায় পরিণত করিয়াছেন। ইংরাজের শিক্ষা-বিভাগের কল্যাণে বিদ্যাসাগর-লিখিত পাঠ্যপুস্তকগুলি শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া মানভূম সিংহভূম পর্য্যন্ত পঠিত ও পাঠিত হইতে লাগিল, এবং তাহার ফলে, পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় যে প্রাদেশিকতাটুকু ছিল, তাহা একেবারেই লুপ্ত হইয়া গেল। পূর্ব্বে, পূর্ব্ববঙ্গের কবিগণের লিখিত কাব্য-পুস্তকে তৎপ্রদেশের প্রাদেশিকতা স্থানে স্থানে লক্ষিত হইত; রাঢ়ের মকুন্দরাম ও ঘনরাম প্রভৃতির কথাতেও রাঢ়ের প্রাদেশিকতা প্রস্ফুট ছিল। কিন্তু ইংরাজ-রাজত্বের কল্যাণে এই বৈষম্যটুকু একেবারেই বর্জ্জিত ও তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের ভাষাকে যে ছাঁচ দিয়া গেলেন, তাহা বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই অসঙ্কোচে ও নির্ব্বিরোধে গৃহীত হইল, এবং সেই সূত্রে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির একটা অখণ্ড ঐক্যের পথ উন্মুক্ত হইয়া গেল।

—আবার এই ইংরাজী আমলেই আমাদের ভাষায় অনুকরণের যুগ দেখা দিল। ইংরাজীনবীশ বাঙ্গালীরা কেবল ইংরাজী ভাষারই চর্চ্চা করিয়া ভাবিলেন—ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আমাদিগকে সাহিত্যে নাই; অতএব, ইংরাজের অনুকরণে আমাদের একটা অভিনব সাহিত্য রচিতে হইবে। কিন্তু কবি ঈশ্বর গুপ্ত নিজে ইংরাজীনবীশ হইলেও, এ শ্রেণীর লোক ছিলেন না। তিনি বঙ্গভাষার পারম্পর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, বাঙ্গালার সেই পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদীই বজায় রাখিয়া, বাঙ্গালায় কিছু কিছু ইংরেজী ভাবের আমদানী করিয়াছিলেন। আসলে কিন্তু এ সম্পর্কে ইংরেজিয়ানা-প্রবর্ত্তনের যুগাবতার ছিলেন—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মাইকেল বহু ভাষাবিদ্ প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মিল্টনের 'Paradise Lost'এর অনুকরণে "মেঘনাদবধ" রচনা করিলেন। "মেঘনাদবধে"র ভাষা ঠিক বাঙ্গালা নহে, উহা বিভক্তি-বর্জ্জিত সংস্কৃত। উহার রস-অলঙ্কার প্রায় সবই সংস্কৃত হইতে সংগৃহীত, উহার শব্দ-সম্পদ সংস্কৃতের ভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত; কিন্তু উহার ভাব-ভঙ্গী, লিখন-বিন্যাস সবই ইংরাজীর অনুকরণ। এ পক্ষে মাইকেলের শিষ্য ও মাইকেলের পথাবলম্বী হইলেও, কবি হেমচন্দ্র মাইকেলের মত অতটা সাহেবিয়ানায় সাফল্য লাভ করেন নাই। তিনি মেঘনাদের পরিচয়-প্রসঙ্গে বাঙ্গলার পুরাতন সাহিত্যকে বিদ্রূপ করিয়া এ দেশকে পয়ার-প্লাবিত বাঙ্গালা দেশ বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু, "বৃত্রসংহার" কাব্যে তিনিও আগাগোড়া অমিত্রাক্ষর বজায় রাখিতে পারেন নাই। এই সময় হইতেই ইংরাজির অনুকরণ প্রবলবেগে চলিতে লাগিল। মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, এই একই শ্রেণীর কবি।

বাঙ্গলায় গদ্যেও এমনই একটা ওলট্-পালট্ হইল। পূর্ব্বে মুসলমানের যুগে বাঙ্গালায় গদ্য-সাহিত্য ছিল না। ইংরাজ যুগেই গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের কাদম্বরীর অনুবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথের নভেলে পর্য্যন্ত সেই গদ্যের পর্য্যবসান ঘটিয়াছে। এই গদ্য সাহিত্যের সম্রাট্ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। তিনিই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীকে গদ্য লিখিতে শিখাইয়াছেন। তাঁহার গদ্যই এখনও বাঙ্গালার আদর্শ। সেই আদর্শ অনুসারেই আজ বাঙ্গলার সমাচারপত্রসমূহ লিখিত হইতেছে, কতই না নব নব বিচিত্র পুস্তকাদি প্রণীত হইতেছে। বাঙ্গলার গদ্য আজ একটা বিশিষ্ট আকার ও প্রকার লাভ করিয়াছে। কিন্তু এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরাজের আমলে বাঙ্গালার বৈচিত্র্য ও অতি-প্রসার

সাধিত হইলেও, এই গদ্য-সাহিত্যের আরম্ভ হইতেই বঙ্গসাহিত্যের ধাতুগত প্রকৃতিটি যেন একটু বিশেষভাবেই ব্যাহত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা বা বাঙ্গালা সাহিত্য এখন আর কোনও নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য, বা ধর্ম্মপ্রচারের জন্য নিয়োজিত নহে। এখন ইহা Secalar,—বিশেষ ভাবেই যেন বিষয়ীর সাহিত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা এক হিসাবে এখন সম্পূর্ণ সখের সামগ্রী। কাজেই এখন ইহার লক্ষ্য কেবল আত্ম-তৃপ্তি, বা চিত্ত-বিনোদন। ইহা এখন বিচিত্র কলা-কৌশলে পর্য্যবসিত হইয়াছে, সত্য; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর ইহার কোনও স্থির উদ্দেশ্য বা বাঁধা-ধরা লক্ষ্য নাই। যে প্রণালীর মধ্য দিয়া রামায়ণ মহাভারত ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে প্রণালীর মধ্য দিয়া "অন্নদামঙ্গল" প্রভৃতি রচিত হইয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্যের সে পুরাতন প্রণালী এখন আর নাই। তাই বাঙ্গালা সাহিত্য এখন কেবল আত্ম-তৃপ্তি বা মনস্তুষ্টির একটা উপায়-বিশেষ হইয়া পড়িয়াছে। এখন ইহা বিশেষ প্রতিভান্বিত কবি বা লেখক ব্যতীত সাধারণ সাহিত্যিকের পক্ষে সাধারণতঃ য়ুরোপীয় ভাব ও সিদ্ধান্তসমূহ আমদানী করিবার অন্যতম পন্থা মাত্র। এই কারণেই, বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য এখন অনেকাংশে বিশেষত্ববর্জ্জিত। এ ভাষায় যাহার যেমন ইচ্ছা, আজ সে তেমনই লিখিয়া যাইতেছে। ইহা যেন এখন অনেকটা না-ওয়ারিস নাবালকদের মত একান্তই উচ্ছৃঙ্খল ও যথেচ্ছাচারী।

কিন্তু তা' বলিয়া ইহা যে অবিমিশ্র দুর্লক্ষণ বা সাহিত্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর, তাহা অনেকে স্বীকার নাও করিতে পারেন। ভাষার গতি আজ যতই কেন বিচিত্র বা অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল হউক না, এক হিসাবে তদ্রূপ শত দোষ থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহাই যে ভাষার অদম্য প্রাণ-শক্তির পরিচায়ক, এবং ইহাতে যে উদ্দাম ও অনিবার্য্য যৌবনোচ্ছ্বাসেরই প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে, এ সম্বন্ধে সকলকেই আজ একমত হইতে হইবে। সাহিত্যের এই বর্ত্তমান অবস্থা ভাল না মন্দ, বিবেচক যোগ্য জন তাহার বিচার করুন। আমি আজ এ ক্ষেত্রে শুধু বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রকৃত প্রকৃতিটির নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

ইংরাজের রাজ্যে আমাদের দেশে প্রথমতঃ মুদ্রা-যন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে অতি সস্তায় কাগজও বিকাইতে আরম্ভ করে। এই দুইটার প্রভাবে বাঙ্গালায় আজ অজস্র পুস্তক প্রণীত হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বে যখন মুদ্রা-যন্ত্র ছিল না, এত কাগজের প্রচলন ছিল না; যখন বাঙ্গালার সাহিত্য ধর্ম্মপ্রধান

ছিল, কীর্ত্তন ও পাঁচালী উহার প্রধান অঙ্গ ছিল, তখন বাঙ্গালা-সাহিত্যের ব্যাপ্তি বা প্রসার যেন এখন অপেক্ষা এক হিসাবে একটু অধিকই ছিল। ভাল ভাল গায়কে এক একটা মজলিসে দশ হাজার শ্রোতার সম্মুখে এক একটা পালা গান করিত; গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, পর্ব্বাহে উৎসবে কীর্ত্তন ও পাঁচালী গীত হইত, এই গানের সাহায্যে তখন বাঙ্গালার জনসাধারণ নূতন নূতন কাব্যের, নূতন নূতন পালার, নূতন নূতন কীর্ত্তনের ও পদের সর্ব্বদাই পরিচয় পাইত। ভাল গান, ভাল পদ, ভাল পালা, তখন বাঙ্গালার বহু নরনারীর কণ্ঠস্থ ছিল। সে হিসাবে, এ দেশে "মেঘনাদবধ", "ব্রজাঙ্গনা", "কুরুক্ষেত্র", "বৃত্রসংহার", কিংবা বিশ্ব-বিখ্যাত "গীতাঞ্জলি"রও তাদৃশ সম্প্রসার বা সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠা অদ্যাপি হয় নাই। এখন পুস্তকের বাহুল্য সত্বেও বাঙ্গালার জনসাধারণ আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের তেমন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় পাইতেছে না। এই পরিচয়ের অভাবে বঙ্গীয় সমাজে আধুনিক সাহিত্যের তেমন প্রভাব নাই। একে ত এ সাহিত্য ইংরাজির অনুকরণে গঠিত হইতেছে বলিয়া, বাঙ্গালী জাতির স্বভাবের অনুকূল নহে; তাহার উপর অপরিচয় হেতু জনসাধারণ ইহাকে এখনও নিজের বলিয়া গ্রহণ করে নাই। রামপ্রসাদের গান, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও বলরাম দাসের পদ, কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রভৃতি যেরূপ অনায়াসে ও যে ভাবে বাঙ্গালীর মর্ম্মে যাইয়া মিলিয়া যায়, বা আঘাত করে, সে ভাবে "মেঘনাদবধ" ও "ব্রজাঙ্গনা"র পদ, কিংবা জগন্মান্য কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান বাঙ্গালীর প্রাণকে স্পর্শ অথবা আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। কারণ, এ সব আধুনিক-সাহিত্য-উপভোগের প্রধান ও প্রথম অবলম্বনই হইল—ঐ ইংরাজী-শিক্ষা। যাহারা ইংরাজী জানে না, ইংরাজি সাহিত্যের পরিচয় রাখে না, তাহারা এ সাহিত্যের মহিমা ও তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গমই করিতে পারে না। ইহার উপর, কোনও কোনও শিক্ষাভিমানী আধুনিক বাঙ্গালী সম্পাদকের আসনে সমাসীন হইয়া, বাঙ্গালা ভাষাটাকে এমন ভাবে গড়িয়া তুলিতেছেন, ইংরাজি Idium বা Epigram'গুলি এমন "নিছক" সাহেবী "ঢঙ্গে" ভাষায় আমদানী করিতেছেন যে, এখনকার সেসব বাঙ্গালা গদ্য বা পদ্য বুঝিতে হইলে, আগে তাহাকে ইংরাজিতে তর্জ্জমা করিয়া, তবে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। এ অধিকার, এ ক্ষমতা, বা এরূপ ধৈর্য্য ও প্রবৃত্তি বাঙ্গালার শতকরা বোধ হয় সতর জনেরই নাই। সুতরাং, এ সাহিত্যের যথার্থ আস্বাদনে বাঙ্গালার প্রায় চৌদ্দ আনা নর-নারীই বঞ্চিত।—কি দুর্দ্দৈব!

সুরসিক ইন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের স্তূপ রাশি,—একেবারেই শূন্য-গর্ভ, এবং রমণীর কক্ষেই শোভা পায়! কথাটার মধ্যে ব্যঙ্গ বা অত্যুক্তি আছে বটে, কিন্তু ইহা সত্য, তাহা বোধ করি অনেকেই অস্বীকার করিবেন না।

ঘরের আলমারীতে সুন্দর সুন্দর "মোরাক্কো" বা সিল্কে বাঁধা বইগুলি তাকে তাকে সাজানো আছে; তাহা দেখিতে ভাল, দেখাইতেও ভাল। কিন্তু তাহা দ্বারা নরনারীর অন্তর্ভাবের, রুচির, অথবা স্বভাবের কোনও কল্যাণই সাধিত হয় না; বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের প্রবাহ-ভঙ্গীরও কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। পূর্ব্বে বলিয়াছি—আমাদের এই বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্যের স্রষ্টা হয় রামমোহন, নয় বিদ্যাসাগর; এবং ইহার পোষ্টা, বা সংস্কারক, পরিচালক বা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু ইঁহারা যে ভাষা চালাইয়া গিয়াছেন, আজও তাহা বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের ভাষা হয় নাই। রাজ-দ্বারে, বিচারালয়ে যে বাঙ্গালার প্রচলন আছে, তাহা বঙ্কিমের বাঙ্গালা নহে; লেখাপড়া, হাটখোলা, বা ব্যবসায়-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যে ভাষা চলিতেছে; তাহাও বঙ্কিমী—বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা নহে; আমরা ঘরে পুত্র-পরিবারের সঙ্গে যে বাঙ্গলায় কথা কহি, সভায় বৈঠকখানায় বা বন্ধু-বান্ধবের সহিত যে বাঙ্গালায় আলাপ করি, সে বাঙ্গালাও বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমের নহে। কাজেই, বলিতে হয়—এখনও আমাদের এ বাঙ্গালা গদ্য বা পদ্য-সাহিত্য আমাদের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় তেমন কোনও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই। কখনও তাহা পারিবে কি না, অথবা আদৌ তাহা সর্ব্বাংশে বাঞ্ছনীয় বা আবশ্যক কি না, তদ্বিষয়েও সাহিত্যিক-সম্প্রদায়ের মধ্যেই ঘোরতর মতদ্বৈধ আছে। এ সম্পর্কে আমার স্বীয় সিদ্ধান্ত বা বিশ্বাস এই প্রবন্ধেই যথাস্থানে যথাকালে বিবৃত করিব।

✓ কিন্তু পূর্ব্বে যে সাহিত্য প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ সেই পুরাতন বাঙ্গালা ভাষা—সর্ব্বথাই ধর্ম্মপ্রাণ ছিল। সে সাহিত্যের দ্বারা এ জাতির চরিত্র গঠিত হইয়াছে; তদ্দ্বারা এ জাতির মানসিক গতিটাই স্বধর্ম্মের একটা স্বতন্ত্র প্রণালীতে চালিত ও প্রবাহিত হইয়াছে। বলিতে কি, আজিও সেই সাহিত্যেরই প্রভাব আমাদের জাতীয় চরিত্রে প্রবল ভাবে ক্রিয়া করিতেছে।

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল।*

—এই পদটি শুনিবামাত্রই এখনও বাঙ্গালী তেমনই করিয়া শিহরিয়া, চমকিয়া

উঠে। তাই, এখনও রামায়ণ-গান শুনিতে গিয়া বাঙ্গালীর অশ্রু ঝরে, এবং আজিও কীর্ত্তনের কালে, মৃদঙ্গের প্রমত্ত তালে বাঙ্গালীর চিত্ত আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। এই ধর্ম্মের বেদী হইতে নামিয়া আসিয়া, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালী কবি ভাল কাজ করিয়াছেন, না মন্দ কাজ করিয়াছেন, তাহার বিচার করিবার এখনও সময় হয় নাই। তবে সম্ভবতঃ সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন যে, ঐ আদর্শ বা ঐ পদবী পরিহার করিবার ফলে আজ বাঙ্গালা সাহিত্য অনেকপরিমাণে স্ব-ধর্ম্মভ্রষ্ট, অসামাজিক, এবং শুধু ইংরাজি-শিক্ষিতগণেরই সাম্প্রদায়িক সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বস্তুতঃ, সাহিত্যের স্থায়িত্ব, তাহার ব্যাপ্তি ও প্রভাবের উপরেই নির্ভর করে। যে ভাষা ও সাহিত্য যত অধিক ব্যাপ্ত, সে ভাষা ও সাহিত্য ততই দীর্ঘকালস্থায়ী হয়, এবং তাহার প্রভাবও সেই অনুপাতে প্রগাঢ় হইয়া থাকে। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণের আবিষ্কার হইতে জানা গিয়াছে যে, জাপান হইতে সুদূর মিশর পর্য্যন্ত, মাদাগাস্কার হইতে অষ্ট্রেলিয়ার কোণ পর্য্যন্ত কোনও এক বিস্মৃত অতীত যুগে মাতামহী সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বিশেষভাবে বিস্তীর্ণ ছিল। মঙ্গোলিয়ার উর্গা নগরে গোবি-মরুভূমির ভূগর্ভমগ্ন কত বিস্মৃত লোকালয়ের ভগ্নাবশেষের স্তর-বিন্যাসে আজ সংস্কৃত পুঁথি-পত্রের অসংখ্য নিদর্শন—বহুবিধ চিহ্নরাশি আবিষ্কৃত হইতেছে। বালি, লম্বক, সুমাত্রা, জাবা প্রভৃতি স্থানসমূহে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের এই অতি-প্রসার হেতু, উহার সহিত ধর্ম্মের ও ধর্ম্মভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্য এখনও উহা ভারতবর্ষে এতটা সজীব ও সমাদৃত রহিয়াছে। য়ুরোপের উপস্থিত এই মহাসমরের গতি দেখিয়া ফরাসী লেখক জীন বেঞ্জামিন বলিয়াছেন যে, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আধুনিক য়ুরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই যে সব সখের সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা আর কোনও মতেই স্থায়ী হইতে পারিবে না। কারণ, সে সাহিত্য সমাজের প্রাণের কথা, মর্ম্মের নিগূঢ় ব্যথা অকপটে প্রকাশ করে নাই। সে সাহিত্য সম্যক্‌রূপেই সখ্—সোহাগের পোষাকী সাহিত্য। সখ-সোহাগ যতদিন থাকে, ততদিন এ সখের সাহিত্যও টিকে; কিন্তু সুখ-সম্ভোগ-স্বস্তি, এই সব ক্ষণভঙ্গুর সখ্-সোহাগের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া যায়;—সমাজে একটা বিপ্লব বা ওলট্-পালট্ ঘটিলেই, সে সাহিত্য মিলাইয়া বা তলাইয়া যাইবেই। শুনিতেছি, আজকাল য়ুরোপের বহু প্রাজ্ঞ ও মনীষী নাকি এ কথাটার সত্যতা নতশিরে স্বীকার করিয়াছেন।

দেখা যাক্, এ যুদ্ধের অবসানে, য়ুরোপের খৃষ্টান সমাজ নূতন ভাবে সংগঠিত হইলে উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সে সমাজের উপরে কতখানি আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে। বাঙ্গালায় ইংরাজি যুগের এই আধুনিক সাহিত্য ইংলণ্ডের উনবিংশ শতাব্দীর Secular Literature—' (ব্যবসাদারী সাহিত্যের) উপর প্রতিষ্ঠিত;—Shelley, Byron, Keats, Browning, Wosdsworth ও Tennyson,—ইঁহাদের ভাব ও ভাষা সংস্কৃত আবরণে ঢাকিয়া বহুলপরিমাণে বাঙ্গালায় আমদানী করা হইয়াছে। যদি মূল না টিঁকে, তবে যাহা নকল, তাহা হাজার মনোমোহন হইলেও টিঁকিবে কি? বিবেচ্য বিষয় বলিয়াই প্রসঙ্গতঃ এ কথাটার এতটা আলোচনা করিতে আমি বাধ্য হইলাম।

ক্রমশঃ।

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী।

বাঙ্গালা সাহিত্য।

২

'লীলাবতী' অপেক্ষাকৃত উচ্চযশঃকামী গ্রন্থ। ইহার আখ্যানবস্তু বাস্তবাতিগ, জটিল, এবং উহার সংগঠনে চিত্তবিভ্রমকারিণী কল্পনার আতিশয্য লক্ষিত হয়। এই গ্রন্থখানি সবিস্তারে সমালোচনা করিবার আমাদের স্থান নাই। আমরা কেবল এইটুকু অভিমত প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম যে, যেমন 'নবীনতপস্বিনী'তে দীনবন্ধুবাবু সর্ব্বোৎকৃষ্ট হাস্যরসিক বলিয়া আপনাকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সেই-রূপ 'লীলাবতী'তে বাঙ্গালা লেখকগণের মধ্যে তিনি যে রসিকতায় অদ্বিতীয়, তাহা প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়ে টেকচাঁদ বা হুতোম তাঁহার নিকটবর্ত্তীও হইতে পারেন নাই। 'নীলদর্পণ' এক্ষণে তাহার পূর্ব্বাধিকৃত উচ্চাসন হইতে বিচ্যুত হওয়ায়, 'লীলাবতী'ই পাঠক-সমাজে গ্রন্থকারের সকল পুস্তক অপেক্ষা অধিকতর প্রসার লাভ করিয়াছে,—কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, গ্রন্থকার এই গম্ভীর রসের নাটক অপেক্ষা হাস্যরসপ্রধান নাটক ও প্রহসনাদিতেই অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

দীনবন্ধুবাবুর দুইখানি প্রহসনের সমালোচনাই এক্ষণে অবশিষ্ট আছে। 'বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়ো' নামক প্রহসনে একটি সচরাচর দৃষ্ট ব্যক্তিকের সুনিপুণ ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। রাজীব মুখুয্যে নামক এক বৃদ্ধ বিবাহের জন্য

অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। 'পেঁচোর মা' নামক এক কদাকারা কৃষ্ণকায়া ডোম-রমণীকে বিবাহ করিবার পরামর্শ দিয়া লোকে তাহাকে ক্ষেপায়! কয়েক জন স্কুলের ছাত্র বৃদ্ধকে প্রবঞ্চনা করিবার সঙ্কল্প করিল। এক জন কৃত্রিম ঘটক বৃদ্ধের নিকট প্রেরিত হইল। বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইয়া গেল; বিবাহ হইবে, স্থির হইল। বালকগণের মধ্যে এক জন সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্ট বালককে কন্যার বেশভূষায় সজ্জিত করা হইল, এবং কতিপয় প্রতিবাসী কন্যার পুরুষ ও স্ত্রী-বন্ধুরূপে সজ্জিত হইল। কৃত্রিম বিবাহ হইয়া গেল, এবং রাজীব বালকগণের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিয়া রজনী যাপন করিল। পরদিন প্রাতে যখন দেখিল, পার্শ্বস্থ কন্যা 'পেঁচোর মা' ভিন্ন আর কেহই নহে, এবং সে একটি শূকর-সন্তানকে পোষ্যপুত্র বলিয়া বৃদ্ধের কোলে দিতে চাহিল, তখন বৃদ্ধের মনের আতঙ্ক সহজেই অনুমেয়।

অপর প্রহসন—'সধবার একাদশী' নিপুণতরভাবে লিখিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উহা এরূপ অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট যে, আমরা উহার কোনও অংশও উদ্ধৃত করিতে, বা উহার সম্যক্-বিশ্লেষণপূর্ব্বক বিস্তৃত সমালোচনা করিতে অক্ষম। বিশেষতঃ, গ্রন্থকারের রসিকতাতেই তাঁহার রচনার মনোহারিত্ব প্রধানতঃ নিহিত থাকায়, তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া দেখান একবারে অসম্ভব। কারণ, যে সকল বাঙ্গালা শব্দ ও ভাবের সাদৃশ্যের উপর উক্ত রসিকতার ভিত্তি স্থাপিত, তাহা বিদেশীয়গণের বোধগম্য নহে।

৩

অন্যান্য কতিপয় লেখকের বিষয় এখনও বলা হয় নাই, কিন্তু স্থানাভাববশতঃ আমাদিগকে এ প্রস্তাব সংক্ষেপে সমাপ্ত করিতে হইতেছে। রঙ্গলাল বাবু কবি বলিয়া স্বদেশীয়গণের নিকট উচ্চ যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য যে, তিনি এরূপ যশোলাভের উপযুক্ত কার্য্য অতি অল্পই করিয়াছেন। তাঁহার 'পদ্মিনী', 'কর্ম্মদেবী' এবং 'শূরসুন্দরী' নামক তিনটি কবিতা টডের 'রাজস্থান' হইতে সংগৃহীত তিনটি রাজপুত-রমণীর গল্প পদ্যাকারে লিখিত। 'পদ্মিনী'খানিই বোধ হয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই লেখক ভারতচন্দ্রের পথাবলম্বন-কারিগণের শ্রেণীভুক্ত, যদিও ভারতচন্দ্রের মত তাঁহার রচনায় অশ্লীলতার গন্ধ নাই। বাস্তবিক, তাঁহার লেখার যাহা কিছু গুণ, তাহা প্রধানতঃ কতকগুলি দোষের অভাবমাত্র।

বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও তাদৃশ যশস্বী হইতে পারেন নাই, তথাপি

রঙ্গলাল অপেক্ষা অনেক উচ্চদরের কবি। তাঁহার 'ইন্দ্রের সুধাপান' ড্রাইডেনের Alexander's Feastএর একটি সজীব অনুকরণ।

উপন্যাসলেখকগণের মধ্যে 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়ে'র লেখক বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বিষয় এই পত্রে ইতঃপূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর লেখকগণের মধ্যে এক জন মাত্র লেখকের কথা এ স্থলে বলা প্রয়োজন বোধ হয়। তিনি বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' এবং 'মৃণালিনী' সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদৃত বাঙ্গালা গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। বোধ হয়, অন্তরূপ সমালোচনা অপেক্ষা উক্ত তিনখানি উপন্যাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম ও অনায়াসে বর্ণনীয় 'কপালকুণ্ডলা'র উপাখ্যানভাগ সংক্ষেপে বিবৃত করিলেই ভাল হইবে।

নবকুমার নামক এক ব্রাহ্মণযুবক গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে হিজলীর নিকটস্থ বিজন সাগরতীরে সঙ্গিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। ঐ স্থানের একমাত্র অধিবাসী এক জন 'কাপালিক'। কাপালিকগণ এক অদ্ভুত সম্প্রদায়। তাহারা প্রচণ্ড ও ভীষণ তান্ত্রিক প্রণালীতে পূজা করে। শ্মশানঘাট তাহাদের মন্দির, এবং তাহাদের অনুষ্ঠানগুলি অতি বীভৎস ও পৈশাচিক। কাপালিকের নিকট যুবকটি আহার ও আশ্রয় পাইলেন। তাঁহার প্রয়োজনাদির ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার বিকটদর্শন আশ্রয়দাতা প্রত্যাগমনের আশ্বাস দিয়া নরকপালের পানপাত্র লইয়া অন্যত্র যাত্রা করিলেন। দিনের পর দিন গত হইল, কিন্তু কাপালিক ফিরিলেন না। অবশেষে নবকুমার বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া যে পথহীন অরণ্যে কাপালিকের গুহা অবস্থিত, তাহার মধ্য দিয়া নিজেই নির্গমনের পথ আবিষ্কার করিয়া কোনও লোকালয়ে গমন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। তিনি একবারে পথহারা হইলেন, এবং তাহার পর যে ঘটনা ঘটিল, তাহা পুস্তকখানি হইতেই নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; কারণ, উহার বর্ণনা দেশীয় পাঠকগণের নিকট বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে।

"কিছু দূর আসিয়া আশ্রম কোন্ পথে রাখিয়া আসিয়াছেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। গম্ভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণপথে প্রবেশ করিল; তিনি বুঝিলেন যে এ সাগরগর্জ্জন। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র। উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায় ততদূর

পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গ-প্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ—নীলজলমণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানে সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখনও এমত প্রচণ্ড বায়ুবহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত স্বর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছে। অতি দূরে কোন ইউরোপীয় বণিক্‌জাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ-বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতেছিল।

"কতক্ষণ যে নবকুমার তীরে বসিয়া অনন্যমনে জলধিশোভা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তদ্বিষয়ে তৎকালে তিনি পরিমাণবোধ-রহিত। পরে একেবারে প্রদোষতিমির আসিয়া কাল জলের উপর বসিল। তখন নবকুমারের চেতনা হইল যে আশ্রম-সন্ধান করিয়া লইতে হইবে। * * * গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদিবারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার,—অবেণীসংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার। * * অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ-রূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ, অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল।"

যে যুবতীর এইরূপ অনতিস্পষ্ট অথচ গম্ভীর বর্ণনা করা হইয়াছে—তিনি কপালকুণ্ডলা। সেকালে যে সকল পোর্ত্তুগীজ জলদস্যুপোত দাসসংগ্রহের জন্য বাঙ্গালাদেশের সাগরতীরস্থ গ্রামসমূহ লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত, তাহারই মধ্যে ঝটিকাতে ভগ্ন একখানি পোত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করা হয়। কাপালিক কি অভিপ্রায়ে তাঁহাকে নিজ আশ্রমে রাখিয়া লালনপালন করিয়াছিলেন, তাহা কপালকুণ্ডলা জানিতেন না। কাপালিকের নিকট তিনি কালী দেবীকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছিলেন,, কিন্তু কাপালিক সুযোগ পাইলেই কালীর নিকট যে সকল নরবলি দিতেন, তাহা দেখিয়া কপালকুণ্ডলার অন্তরাত্মা ভয় ও ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইত। দুই জনে কাপালিকের গুহায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং

শীঘ্রই বুঝা গেল যে, নবকুমারকে বলি দেওয়া হইবে। অসীমশক্তিধর কাপালিক তাঁহাকে দারুস্তম্ভে বন্ধন করিয়া তদ্দণ্ডেই বলি দিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, কিন্তু কপালকুণ্ডলা বলিদানের খড়্গ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কাপালিক খড়্গান্বেষণে গমন করিলে তদবসরে কপালকুণ্ডলা নবকুমারের বন্ধন ছেদন করিয়া তাঁহার সহিত পলায়ন করিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহারা এক দেবমন্দিরে উপস্থিত হন। নবকুমার কপালকুণ্ডলার প্রতি গভীর প্রেমাসক্ত হন, এবং কপালকুণ্ডলা বিবাহ কি বস্তু তাহা অবগত না থাকায়, নবকুমারকে বিবাহ করিতে কোনও আপত্তি করিলেন না। মন্দিরের পূজারী তাঁহাদের অনুরোধে উভয়ের বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত করেন। পূজারী তাঁহাদিগকে মেদিনীপুরে যাইবার পথও দেখাইয়া দিলেন। মেদিনীপুর হইতে উভয়ে নবকুমারের বাসস্থান সপ্তগ্রামে অনায়াসে উপনীত হইলেন।

এই বিবাহ নবকুমারের প্রথম বিবাহ নহে। তিনি পূর্ব্বে আর একবার বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন কন্যাটি নিতান্ত শিশু। পিতার সহিত মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হওয়ায় কন্যাটি পিতার সহিত দেশত্যাগ করিয়া যায়, এবং বিবাহের পর স্বামী ও স্ত্রীর আর পরস্পর সাক্ষাৎ হয় নাই। নবকুমারের সপ্তগ্রামে ফিরিবার পথে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। এক জন ধনাঢ্যা ও অতিসম্ভ্রান্ত পদবীর মুসলমান রমণী নবকুমারের নিকট কিঞ্চিৎ উপকার প্রাপ্ত হন, এবং নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন যে, নবকুমারই তাঁহার স্বামী। ইনি নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী—এক্ষণে লুৎফ্-উন্নিসা নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহার রূপ ও বচনমাধুরী আগ্রায় সম্রাটের সভায় বারাঙ্গনাগণের মধ্যে তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছে, এবং অতুল প্রভাব ও অজস্র ধনের অধিকারিণী করিয়াছে। তাঁহার পিতা আকবর বাদশাহের প্রিয়পাত্র হইয়া উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি নবকুমারের নিকট যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ কপালকুণ্ডলাকে কয়েকখানি মহামূল্য অলঙ্কার দান করিলেন। নির্ব্বোধ বালিকা উহার মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে না পারিয়া পথে প্রথম ভিক্ষুককে উহা অর্পণ করিলেন। লুৎফ্-উন্নিসা সম্রাট্‌তনয় সেলিমকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে এক ষড়যন্ত্রের সহায়তা করিবার জন্য উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন; সম্প্রতি তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। তাঁহার দুষ্কর্ম্মের শাস্তি এক্ষণে অসম্ভাবিতরূপে দেখা দিল। যে রমণী ইতঃপূর্ব্বে গর্ব্ব করিতেন যে, তাঁহার প্রস্তরনির্ম্মিত

হৃদয় বাদশাহ বা তাঁহার পারিষদবর্গের মধ্যে কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই, তিনি এক্ষণে তাঁহার পূর্ব্বস্বামী—এই সৌম্যমূর্ত্তি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পথিকের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি দেখিলেন, সেলিম রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার নিকট বঙ্গদেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। সপ্তগ্রামে আসিয়া তিনি একখানি বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং নবকুমারের ভালবাসা পাইবার জন্য জাল পাতিলেন। যখন তিনি দেখিলেন, কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের প্রেম তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধনের অলঙ্ঘ্য অন্তরায়স্বরূপ বিদ্যমান, তখন সেই প্রেম বিনষ্ট করিবার জন্য এক দুঃসাহসিক উপায় অবলম্বন করিলেন।

কপালকুণ্ডলা এক্ষণে বৎসরাধিককাল নবকুমারের বাটীতে বাস করিতেছেন। তান্ত্রিক-অর্থযুক্ত কপালকুণ্ডলা নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া এক্ষণে তাঁহার নাম মৃন্ময়ী রাখা হইয়াছে। তাঁহার বনচারিণীর মত স্বভাবও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু এ পরিবর্ত্তনে তিনি সুখী হন নাই। নবকুমার তাঁহাকে সতৃষ্ণ অন্তরে ভালবাসেন, কিন্তু সে ভালবাসার প্রতিদান পান নাই। মহাদেবী কালীই তাঁহার সমস্ত অন্তর অধিকার করিয়া আছেন, এবং তাঁহার পূজাতেই তিনি উন্মত্তবৎ নিযুক্ত থাকেন। তিনি নবকুমারের জন্য আবশ্যক হইলে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহাকে ভালবাসেন না, এবং অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকা তাঁহার অসহ্য। নবকুমারের আদেশ অবজ্ঞা করিয়া তিনি একদিন রাত্রিকালে গোপনে বহির্গত হইয়া এক সখীর জন্য পতিপ্রেমলাভের ঔষধ সংগ্রহ করিবার জন্য জঙ্গলে গমন করেন। একটী পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষের নিকট গিয়া তিনি দুই জনের কথোপকথন শুনিতে পাইলেন, এবং তাঁহার বোধ হইল, তাঁহারই সম্বন্ধে কথা হইতেছে। তাহাদের মধ্যে এক জন (দেখিয়া বোধ হইল ব্রাহ্মণ যুবক) তাঁহাকে দেখিতে পাইল। তখন তিনি ভয়ে পলায়ন করিলেন। পলাইতে পলাইতে দেখিলেন, এক জন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে। বাটী পঁহুছিয়া দ্বার রুদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই তিনি চিনিতে পারিলেন, ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বপরিচিত বিশালকায় কাপালিক।

কাপালিক নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার পলায়নের পর তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিল, কিন্তু পথিমধ্যে পড়িয়া যাওয়ায় তাহার বাহু ভগ্ন হইয়া যায়। সে যখন অক্ষম অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া ছিল, তখন কালী তাহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া কপালকুণ্ডলাকে তাঁহার নিকট বলিদান দিবার আদেশ করিলেন। যখন তাহার

হস্তপদ পুনরায় কার্য্যক্ষম হইল, তখন সে দিবারাত্রি কপালকুণ্ডলার অন্বেষণ করিতে লাগিল, এবং অবশেষে তাঁহার সন্ধান পাইল। কিন্তু বলিদানের বেদিকার নিকট লইয়া যাইবার জন্য অপরের সাহায্য আবশ্যক। সুযোগ অন্বেষণ করিতে করিতে স্বীয় কার্য্যোদ্ধারের জন্য ব্রাহ্মণ যুবকের বেশধারিণী লুৎফ্‌উন্নিসার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, এবং তাঁহার সহিত কথোপকথনের সময়েই কপালকুণ্ডলা আসিয়া পরামর্শের বিঘ্ন উৎপাদন করে। দুই জনের মধ্যে মতের ঐক্য হইল না। লুৎফ্‌উন্নিসার অভিপ্রায়, কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটান, কিন্তু কোনরূপ হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইতে তিনি সম্মত হইলেন না। কাপালিকের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লক্ষ্য করিয়া লুৎফ্‌উন্নিসা স্থির করিলেন, কপালকুণ্ডলাকে সকল কথা বলিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিবেন, এবং এইরূপে তাঁহার মনে কৃতজ্ঞতা উৎপাদন করিয়া নিজকার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করিবেন। তদনুসারে পরদিন পথে কপালকুণ্ডলা একখানি পত্র কুড়াইয়া পাইলেন। তাহাতে ব্রাহ্মণবেশধারী তাঁহাকে পুনরায় বনে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছে, এবং দেখা হইলে অনেক গুরুতর রহস্য-উদ্ঘাটনের অঙ্গীকার করিয়াছে। অন্য কোনও হিন্দু কুলবধূ এরূপ অনুরোধ রক্ষা করিত না, কিন্তু কপালকুণ্ডলা করিলেন, এবং তাহাও অপরের অজ্ঞাতসারে নহে।

পূর্ব্বরাত্রে যখন কপালকুণ্ডলা বাটী হইতে বহির্গত হন, তখন নবকুমার দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে এ পর্য্যন্ত কোনও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই—যদিও সহজেই এরূপ সন্দেহ উদ্দীপ্ত হইতে পারিত। পরদিন রাত্রিতে তিনি সতর্ক ছিলেন, এবং দেখিলেন, কপালকুণ্ডলা পুনরায় বাটী হইতে নির্গত হইলেন। নবকুমারের উদ্বেগবৃদ্ধির আর একটি কারণ ঘটিল ; লুৎফুন্নিসার পত্রখানি অলক্ষিতভাবে গৃহতলে পড়িয়া গিয়াছিল। নবকুমার সেখানি তুলিয়া লইয়া পাঠ করিলেন, এবং কপালকুণ্ডলার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। গৃহ হইতে বাহির হইতে না হইতে দেখিলেন, কাপালিক সম্মুখে দণ্ডায়মান। লুৎফ্‌উন্নিসার নিকট বিফলমনোরথ হইয়া দুর্দ্দান্ত কাপালিক এক্ষণে নবকুমারের মনে সন্দেহ উদ্দীপিত করিয়া তাঁহারই সহায়তা-লাভে সচেষ্ট হইল। সে নবকুমারকে নিজের ভূপতিত হওয়া ও স্বপ্নে কালীদর্শন, এবং ভবানীর আদেশের কথা বিবৃত করিল, এবং কপালকুণ্ডলা নষ্টচরিত্রা ও অবিশ্বাসিনী হইয়াছে, এই কথা সদর্পে ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে বলিদান করিবার জন্য সহায়তা প্রার্থনা করিল। নবকুমার এতদ্বিষয়ে প্রমাণ চাহিলে, কাপালিক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ইত্যবসরে লুৎফুউন্নিসার সহিত কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ হইয়াছে। তিনি কপালকুণ্ডলাকে কাপালিকের কথা ও তাহার ভীষণ অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইলেন, এবং নিজের পরিচয় ও জীবনকথা ও উদ্দেশ্যও জ্ঞাপন করিলেন; এবং কপালকুণ্ডলা যদি তাঁহার স্বামীকে কোনও কথা না বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া যান, তবে তিনি তাঁহাকে বিস্তর ধন দান করিবেন, এবং কোনও দূরদেশে সুখে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কপালকুণ্ডলা এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিতেন; কারণ, স্বামীর প্রতি তাঁহার যথার্থ অনুরাগ ছিল না। কিন্তু যখন ভবানীর আদেশের কথা একবার তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তখন সে আদেশপালন ভিন্ন অন্য অভিলাষ তাঁহার মনে স্থান পাইল না। তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, এবং অদূরে কাপালিক ও নবকুমারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কারণ, তাঁহারা প্রথম হইতেই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। কাপালিক নবকুমারকে সুরাপান করাইয়া উন্মত্তপ্রায় করিয়াছিল। সুতরাং নবকুমার কাপালিকের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সকলেই বলিদানের স্থানে উপস্থিত হইলেন। স্থানটি শ্মশানভূমি। গৃধ্রশ্রেণী, অর্দ্ধদগ্ধ নরদেহাবলি, এবং ইতস্ততঃ বিকীর্ণ কপাল ও অস্থির স্তূপ প্রভৃতি শ্মশানের যাবতীয় বীভৎস দৃশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর তান্ত্রিকমতে পূজার সমস্ত আয়োজন হইল। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বলিদানের পূর্ব্বে স্নান করাইবার জন্য নদীতীরে লইয়া গেলেন। সে স্থানে কপালকুণ্ডলা তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহভঞ্জন করিলেন। তখন নবকুমার তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কপালকুণ্ডলা ভবানীর ইচ্ছা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। পরস্পরে বাদানুবাদ চলিতেছে, এবং নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বলপূর্ব্বক ফিরাইবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিয়াছেন, এমন সময়ে কপালকুণ্ডলার পদতলস্থ তীরভূমি ভগ্ন হইল, এবং তিনি নিম্নস্থ গভীর নদীতে পতিত হইলেন। নবকুমারও তৎক্ষণাৎ নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। উভয়েই কিয়ৎক্ষণ অদৃশ্য হইলেন। অবশেষে কাপালিক নবকুমারকে টানিয়া কূলে উঠাইলেন, কিন্তু কপালকুণ্ডলাকে আর দেখা গেল না, এবং তাঁহার বিষয় আর শুনাও গেল না। এই স্থানেই গল্প শেষ হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালী পাঠকগণ বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন; কারণ, তাঁহারা পরিশেষে সকলের মিলন ও চিরকাল সুখে বাস, এইরূপ চিরপ্রথানুযায়ী উপসংহারেরই পক্ষপাতী।

'মৃণালিনী' সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থ, এবং অনেকে এইখানিকেই বঙ্কিমবাবুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার্হ পুস্তক বলিয়া বিবেচনা করেন।

কিন্তু এই স্থানেই বাঙ্গালা সাহিত্যের এই অসম্পূর্ণ বিবরণ শেষ করিতে হইল। এই সাহিত্য অনেক বিষয়ে নিস্তেজ, নিকৃষ্টভাবাপন্ন ও মূল্যহীন হইলেও, ইহার মধ্যে এমন বস্তু আছে, যাহা হইতে ভবিষ্যৎ উন্নতির যথেষ্ট আশা করা যাইতে পারে। ইহার প্রকৃতি প্রধানতঃ অনুকরণপ্রবণ, কিন্তু গ্রীস্ ভিন্ন অপর কোন্ দেশের সাহিত্য তরুণ বয়সে আত্মনির্ভরতা ও মৌলিকতা দেখাইয়াছে? সৌন্দর্য্য এবং সত্যের আকর সেই পবিত্র দেশ (গ্রীস্) হইতে কণ্ঠধ্বনি উত্থিত হইয়া য়ুরোপের পশ্চিমাঞ্চলস্থ জড়ভাবাপন্ন মনুষ্যসমাজকে পুনঃ পুনঃ উদ্বোধিত করিয়াছে। ল্যাটিন কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভা-সম্পন্ন ও প্রকৃতিপ্রণোদিত কবি হরেস্ গ্রীস দেশ হইতে শিক্ষিত কোনও নূতন আকারের কবিতা প্রচারিত করিতে পারিলে, তাহাকেই মৌলিকতার চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তৎকালে 'অনুকারী' শব্দ কেবল ল্যাটিন গ্রন্থকার-গণের অনুকরণকারীর প্রতিই প্রযুক্ত হইত। কোনও গ্রন্থকে অত্যুৎকৃষ্ট আখ্যা দিলে, তাহা গ্রীক গ্রন্থের অনুকরণ বলিয়া বুঝা যাইত। রোমরাজ্যের পতনের পর য়ুরোপ যে মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল, সেই নিদ্রা হইতে পুনরুত্থানের পর য়ুরোপ প্রথমে গ্রীক ও ল্যাটিন গ্রন্থকারগণের অনুকরণ ও অনুবাদেই আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে। দান্তে কি অনুকরণলেশশূন্য ছিলেন? ইহা আপাততঃ অসম্ভব বোধ হইতে পারে যে, এ দেশের লোক য়ুরোপীয় ভাবসমূহ কখনও যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। এরূপ মনে হইতে পারে যে, আমরা শত চেষ্টায় কেবল এইটুকুমাত্র সামান্য লাভ করিতে পারি যে, উক্ত ভাব সকল আমাদের বোধগম্য হইয়াছে বলিয়া বৃথা ভাণ করিয়া উহার বাহ্যিক চাকচিক্যমাত্র গাত্রে লেপন করিতে সমর্থ হইব। কিন্তু সকল বস্তুই একদিনে লাভ করা যায় না। এককালে ইহাও তুল্যরূপে অসম্ভব বোধ হইতে পারিত যে, ল্যাটিন ধর্ম্মমণ্ডলীর মধ্যে যে সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি অবশিষ্ট ছিল, তাহা হইতে, এবং পুরাকালের ইতিবৃত্তের অনুশীলন হইতে পাশ্চাত্য কেল্‌টিক ও টিউটনিক জাতিগণের মধ্যে এক্ষণে পরিদৃশ্যমান জ্ঞানবিটপী শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হইবে। আপাততঃ বোধ হইতে পারে বটে যে, বাঙ্গালী জাতি কর্ম্মক্ষেত্রেও যেমন, চিন্তাক্ষেত্রেও তেমনই—যথার্থ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে স্বভাবতঃ অক্ষম। কিন্তু য়ুরোপে জ্ঞানচর্চ্চার পুনরুজ্জীবন কোমল ও নমনীয়স্বভাব

ইটালীয়ানদিগের দ্বারাই আরব্ধ হইয়াছিল। অতএব, এরূপ কল্পনা অসঙ্গত নহে যে, বাঙ্গালী জাতি—যাহাদিগকে 'স্পেক্টেটর্' এসিয়াখণ্ডের ইটালীয়ান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—এক্ষণে য়ুরোপীয় ভাবসমূহ এ দেশে রোপিত করিয়া, এবং ভবিষ্যতে উত্তর ভারতবর্ষের অধিকতর কার্য্যক্ষম এবং উদ্ভাবনী-শক্তি-সম্পন্ন জাতিগণ যাহাতে উহা সহজে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়, তাহার পথ প্রশস্ত করিয়া একটি মহৎ কার্য্য সাধিত করিতেছে।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ। *

প্রেম?

আরবী ইরাকের মরুভূমি শস্যশ্যাম করিয়া টাইগ্রীসের আবিল প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বদিকে নদীর কূলে সৌধের পর সৌধ নদীকূলের দৃশ্য সুন্দর করিয়াছে। এই আমারা সহর তুর্কীর রাজ্যচ্যুত সুলতান আবদুল হামিদের কীর্ত্তি—তিনিই এই বাণিজ্যকেন্দ্রে সুন্দর সহররচনা করেন। চৈত্রের অপরাহ্নে রবিকরে সহর উজ্জ্বল। নদীবক্ষে নৌকার পর নৌকা;—কেহ স্থির, কেহ গতায়াত করিতেছে। কূলে ঘাটের কাছে উজ্জ্বল-বর্ণরঞ্জিত রেশমী-কাপড় পরা ইহুদী রমণীরা প্রবাহসঙ্গশীতল সমীরণ সেবন করিতে আসিয়াছে;—কেহ অবগুণ্ঠিতা, কেহ অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা, কেহ অনবগুণ্ঠিতা। রাজ-পথে কাবা-পরা, মাথায় রুমাল দেওয়া আরবরা গতায়াত করিতেছে। আরব রমণীরা বোরকা নামক কাল ঢাকায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া যাইতেছে। লোক গর্দ্দভের পৃষ্ঠে মশক চাপাইয়া জল লইয়া যাইতেছে। আর মধ্যে

---

* মূল ইংরাজী প্রস্তাবটি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ১০৪ সংখ্যক 'কলিকাতা রিবিউ' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেকালে উক্ত ত্রৈমাসিকের প্রবন্ধলেখকগণের নাম মুদ্রিত হইত না। বলা বাহুল্য, অনূদিত প্রবন্ধটির নিম্নেও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাক্ষর ছিল না। সেই জন্যই বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে স্বরচিত গ্রন্থাদিরও আলোচনা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। বহু বৎসর পরে, 'কলিকাতা রিবিউ' পত্রের প্রকাশকগণ "Selections from the Calcutta Review" নাম দিয়া, পুরাতন কলিকাতা রিবিউয়ের নির্ব্বাচিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রণের সঙ্কল্প করেন। সেই সময়ে তাঁহারা যে 'অনুষ্ঠানপত্র' বাহির করেন, তাহাতে আফিসের কাগজপত্র দেখিয়া প্রবন্ধগুলির রচয়িতৃগণের নাম নির্দ্ধারিত করিয়া প্রকাশিত করেন। আমরা এই অনুষ্ঠান-পত্র হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, এই প্রবন্ধটি স্বর্গীয় সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহা-শয়েরই রচিত।—অনুবাদক।

মধ্যে অশ্বারোহী ইংরাজ সৈনিকের গতায়াত—সৈনিকদলের নিয়মিত পাদক্ষেপে গমন। প্রহরীদিগের সঙ্গীণ অপরাহ্নের রবিকরে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। নদীর ধারে পত্রবহুল দাড়িম্ব গাছগুলা লাল ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। সমস্ত সহরে যেমন গরমের গুমট, তেমনই একটা অস্বাভাবিক গুমটের ভাব—এমন কি, কফি-খানাগুলাতেও লোকের কোলাহল নাই, লোক নীরবে বসিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্রে কফি পান করিতেছে। কেন না, সহর এখন একটা বিরাট স্কন্ধাবার। তুর্কের সঙ্গে ইংরাজের যুদ্ধ চলিতেছে। ইরাকের এই ভাগ রাজধানী হইতে বহুদূরে—তাই নগরগুলি অকারণে নষ্ট করিতে অনিচ্ছুক তুর্কীরা বসোরা ও আমারা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল—প্রথম বড় যুদ্ধ হইয়াছিল কুট-এল-আমারায়। তথায় ইংরাজের প্রথম পরাজয়, তুর্ক-করে ইংরাজ বাহিনীর আত্মসমর্পণ। এখনও যুদ্ধ চলিতেছে। আমারায় নদীর দুই ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাঁসপাতাল—আহত সৈনিকে পূর্ণ। আমারায় সম্পূর্ণ সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত।

নদীর পশ্চিমপারে একটা হাঁসপাতাল-তাঁবুতে শুইয়া তেজা সিং ভাবিতেছিল। তেজা সিং শিখ যুবক। বৃদ্ধ পিতার অমতে যৌবনসুলভ-চাপল্য-চালিত হইয়া সেনাদলে নাম লিখাইয়া স্থবেদার হইয়া যুদ্ধে আসিয়াছিল। একবার যুদ্ধে আহত হইয়া সে আমারায় হাঁসপাতালে আসিয়াছিল; সেইবারই হাঁসপাতালে পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছিল। কিন্তু সামরিক নিয়মে সে দেশে ফিরিতে পারে নাই। ফিরিতে তাহার ইচ্ছাও ছিল না। কারণ, পিতা ব্যতীত সংসারে তাহার আর কোনও আকর্ষণ ছিল না। সে যে তাঁহার অমতে চলিয়া আসিয়াছিল, সে জন্য তখন তাহার মনে অনুশোচনার উদয় হইয়াছিল। আবার আহত হইয়া সে হাঁসপাতালে আসিয়াছে—যুদ্ধে তাহার সাহসের জন্য সে প্রশংসিত হইয়াছে। কিন্তু সে প্রশংসার আনন্দে সে উৎফুল্ল হইতে পারে নাই—পিতার মৃত্যুশোক তাহার পক্ষে বিষম বেদনার কারণ হইয়াছিল। এবারও তাহার ক্ষত শুষ্ক হইয়াছে—কিন্তু বেদনা যাইতেছে না। তাই ডাক্তার পরদিন আবার পরীক্ষা করিয়া অস্ত্রোপচার করিবেন। তাহাতে যদি সে আরোগ্যলাভ করে, তবে সে সৈনিকের কাযে যাইবে, নহিলে তাহাকে অক্ষম বলিয়া দেশে ফিরিয়া পাঠান হইবে। সে জন্যও তাহার ভাবনা ছিল না। সৈনিকের কাযে তাহার যেমন আর কোনও আকর্ষণ ছিল না—কর্ম্মচ্যুত হইতেও তাহার তেমনই কোনও ভাবনা ছিল না; কেন না, সে নিঃস্ব নহে—দারিদ্র্যের তাড়নায় সৈনিক হইয়া আইসে নাই,

যৌবনচাপল্যপ্রণোদিত হইয়া যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছিল। অথচ গৃহেও আর কোনও আকর্ষণ নাই। সে যখন মনে করিত, শূন্য গৃহ তাহার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে—তাঁহাকে যাইয়া সংসার পাতিতে হইবে, তখন তাহার মনে যুগপৎ আশঙ্কার ও অবসাদের উদয় হইত। এই যে অবস্থা—যখন জীবনে আকর্ষণ থাকে না, অথচ মৃত্যুর আহ্বানও আইসে না—যখন কাযে মন বসে না, অথচ কায করিতে হয়—যখন জীবনের কোনও লক্ষ্য থাকে না, অথচ লক্ষ্যহীন ভাবে জীবনযাপন করিতে হয়—যখন স্নেহপ্রেমভালবাসার কোনও অবলম্বন থাকে না, অথচ মানবহৃদয় সে অবলম্বনের সন্ধান না করিয়া পারে না—সে অবস্থা বড়ই কষ্টকর। এই অবস্থায় তেজা সিং পীড়িত হইতেছিল। সে সাধারণ সিপাহীর মত নিরক্ষর ছিল না; সে আপনার মাতৃভাষা ও উর্দ্দু ভালই জানিত; ইংরাজীতেও অজ্ঞ ছিল না; পূর্ব্ববার হাঁসপাতালে থাকিবার সময় সে আরবী ভাষা শিখিবার চেষ্টা করিয়াছে, এবং তাহার পর আরবদের সঙ্গে কথা কহিয়া বর্ণপরিচয় পুস্তকে লব্ধ বিদ্যার বিস্তারসাধন করিয়াছে। গতবার সে যখন হাঁসপাতালে আসিয়াছিল, তখন গ্রীষ্মকাল নহে—সে এত কষ্ট অনুভব করে নাই। এবার ইরাকের দারুণ গ্রীষ্মে সে তাঁবুতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতেছিল।

তেজা সিং বাহিরে চাহিয়া দেখিল—দূরে ফিকা সবুজ খেজুর বাগানের পশ্চাতে সূর্য্য ডুবিয়া যাইতেছে—আকাশের খানিকটা রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। সে উঠিয়া বাহিরে গেল; তাহার পর ধীরে ধীরে নদীর কূলে আসিয়া কূল ধরিয় সহরের বিপরীত দিকে চলিল। কিন্তু সে অধিক দূর যাইতে পারিল না—শ্রান্তি অনুভব করিল। সেই স্থানে একটা ছোট বাগান ছিল—কমলালেবুর গাছ ও দাড়িম্বের গাছ ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। সে একটা গাছের তলে বসিয়া পড়িল। তাহার কাছেই একটা ছোট ঘাট—বোরকায় দেহ আবৃত করিয়া আরব-রমণীরা দীর্ঘগল ধাতুপাত্র ভরিয়া জল হইয়া যাইতেছে—দুই এক জন গুরুভার মশকও পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া লইতেছে। তেজা সিং দেখিতে লাগিল। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় দুই জন রমণী ঘাটে জল লইতে আসিল—প্রথমা বৃদ্ধা, দ্বিতীয়া কিশোরী। বৃদ্ধা বোরকার অবগুণ্ঠনভাগ নামাইয়া জল লইয়া যাইবার সময় তেজা সিংকে দেখিতে পাইয়া ব্যস্তভাবে বোরকা তুলিয়া মুখ ঢাকিয়া চলিয়া গেল। জরা যাহার বর্ম্ম, তাহাকে এমন শঙ্কিতা দেখিয়া তেজা সিং হাসিল। কিশোরী তাহাকে দেখে নাই। সে তন্বী, তাহার অঙ্গের বর্ণ গৌর,

পরিধান একটি লাল কাপড়ের পীরাণ ও একটি লাল ডোরাকাটা কাপড়ের ঘাঘরা; বোর্‌কা দক্ষিণ স্কন্ধে রক্ষিত; হস্তপদ অলঙ্কারশূন্য—কেবল দক্ষিণ নাসারন্ধ্রের আবরণে একটি নাকছাবি বিদ্ধ; ঘনকৃষ্ণ কেশ স্কন্ধের উপর কর্ত্তিত; মস্তকে একখানি রঙ্গীণ রুমাল। তাহার যেন ব্যস্ততা ছিল না—সে পাত্রে জল ভরিয়া নদীকূলে বসিয়া রহিল—তাহার পর অঞ্জলি ভরিয়া জল লইয়া মুখ ধৌত করিল; তাহার পর উঠিয়া গান করিতে করিতে ফিরিয়া চলিল—

ঘিরিয়া তোমার দু'খানি চরণ
    রুনু রুনু-রুনু নূপুর বাজে;
চলেছ ছড়ায়ে হাসির কিরণ,
    আমিনা, মানস-ভুবান সাজে!
কুসুম-কলিকা আননে তোমার
    ফুটিয়া উঠিছে মধুর গান;
জান না এখন ভাবনার ভার—
    হাসিখেলাভরা সরল প্রাণ।
আসিবে প্রণয়—পরশে তাহার
    মিলাবে অধরে মধুর হাসি,
থেমে যা'বে গান, ও মুখে তোমার,
    কাঁপিবে হৃদয়—সুখের রাশি।

তেজা সিং গানের ভাষা বুঝিতে পারিল না; কারণ, কুর্দ কিশোরী কুর্দ গান গাহিতেছিল—আরবী নহে। কিন্তু তাহার সরল সুরের তরল মাধুরী যেন সেই সান্ধ্য শোভায় নূতন মাধুরী দান করিতেছিল। কিশোরী বামস্কন্ধে জলপাত্র লইয়া যাইতেছিল; তাহার দক্ষিণস্কন্ধস্থিত বোরকা সরিয়া পড়িয়া গেল। সে পাত্রটি নামাইয়া বোরকা তুলিয়া লইবে বলিয়া পাত্রটি নামাইতে না নামাইতে তেজা সিং যাইয়া সেটি তুলিয়া দিয়া বলিল,—"এই যে তোমার বোর্‌কা।" কিশোরী হাসিয়া সেটি লইয়া বলিল, "আল্লা তোমার মঙ্গল করুন।" তাহার পর তাহার খাকী রঙ্গের সৈনিকের পোষাক দেখাইয়া বলিল, "তুমি ত ফিরিঙ্গীর সৈনিক—আরবী শিখিলে কোথায়?"

তেজা সিং বলিল, "এখানেই; কিন্তু তুমিও ত আরব নহ।"

কিশোরী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন করিয়া বুঝিলে?"

"আরব-রমণী বোর্কা স্কন্ধে লইয়া যায় না—মেঘে চন্দ্রের মত বোর্কায় আপনার সৌন্দর্য্য ঢাকিয়া রাখে।"

"তাহা বটে—আমি কুর্দ; তবে বাল্যাবধি এই স্থানে থাকিয়া আরবী শিখিয়াছি। তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?"

"হিন্দুস্থান।"

"সে কোথায় ?—সাগরের পারে ?"

"তাহাই বটে—কিন্তু ফিরিঙ্গীর দেশের মত দূর নহে।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। সন্ধ্যা হইলেই প্রহরী পথে পরিচয় চাহিবে, এবং সঙ্কেত-বাক্য বলিতে না পারিলেই কিশোরী বিপন্না হইবে বুঝিয়া, তেজা সিং বলিল, "সন্ধ্যা হইল, তুমি বাড়ী যাও।" তাহার পর কিশোরী দুই পদ অগ্রসর হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি প্রত্যহ এই ঘাটে জল লইতে আস ?"

কিশোরী হাসিয়া বলিল, "হাঁ। কিন্তু প্রত্যহ আমার বোরকা পড়িয়া যায় না—পড়িয়া গেলেও প্রত্যহ হিন্দুস্থানের কোনও অপরিচিত লোক কুড়াইয়া দেয় না।"

কিশোরী চলিয়া গেল। যে দেশে দশ বৎসর বয়স হইলেই মেয়েরা বোর্কার আবরণে অঙ্গ আবৃত করে, সে দেশে এই কুর্দ কিশোরীকে এমন সরল ও সরস ভাবে স্বচ্ছন্দে আলাপ করিতে দেখিয়া তেজা সিং বিস্মিত হইল—তাহাকে ঘনশ্যাম লক্ষ পত্রের মধ্যে একটি আনার-কলি (দাড়িম্বের ফুল) বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে তাহার মনে যে অন্য কোনও অনুভূতির উদ্ভব হইয়াছে—এমন সে বুঝিতে পারিল না। তবে সে রাত্রিতে বহু আহতের কাতরতাব্যঞ্জক আর্ত্তনাদের মধ্যে বিনিদ্র তেজা সিং তাহার নয়নসমক্ষে যেন কিশোরীর সন্ধ্যালোকরঞ্জিত হাস্যোজ্জ্বল মুখচ্ছবি দেখিতে লাগিল।

২

পরদিন অস্ত্রোপচারের পর যখন তেজা সিং সংজ্ঞালাভ করিল, তখন অপরাহ্ন। সে চক্ষু মেলিতেই উজ্জ্বল আলোক তাহার পক্ষে কষ্টকর বোধ হইল। সে ডাক্তারকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অস্ত্রোপচার শেষ হইয়াছে ?" ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিলেন, তাহার পক্ষে চারি পাঁচ দিন শয্যাত্যাগ নিষিদ্ধ। আপনার দৌর্ব্বল্যে সে-ও বুঝিল, সে ইচ্ছা করিলেও উঠিতে পারিবে না। ডাক্তার তাহাকে একটু বলকারক ঔষধ ও পথ্য দিয়া বলিলেন, "ঘুমাইবার চেষ্টা কর।" তেজা সিংহের রক্তস্রাবদুর্ব্বল, জ্ঞানহারী

ঔষধে কাতর দেহ অবসন্ন হইয়াই ছিল—তাহার তন্দ্রাবেশ আসিতেছিল। সেই তন্দ্রায় সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—সুদূর ভারতবর্ষে তাহার সেই গৃহ—তাহার মাতার মৃত্যুশয্যা—আর টাইগ্রীসের তীরে সন্ধ্যালোকসমুজ্জ্বল সেই কুর্দ-কিশোরী। কোনও স্বপ্নের সহিত কোনটার সম্বন্ধ ছিল না—যেন বায়স্কোপের চিত্রমালার মধ্যে এক একখানি চিত্র বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যাইতেছে।

তাহার পর দিনে দিনে তাহার দেহের দৌর্ব্বল্য প্রশমিত হইতে লাগিল। সে কিছুতেই সেই কিশোরীর স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছিল না; পরন্তু কালের স্পর্শে তাহা নিষ্প্রভ না হইয়া দিন দিন সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বলই হইতে লাগিল। দীর্ঘ দিন—দীর্ঘতর রাত্রি—রোগশয্যার কোনও কায নাই; দেহের কোনরূপ কাযের অভাবে মনের কায যেন বাড়িয়া উঠিয়াছিল—অনিচ্ছাতেও মনে চিন্তা আসিত; আর সেই চিন্তার কেন্দ্রে কুর্দ কিশোরী দেখা দিত। সে আপনিই মনে করিত—সে কি ভূতাবিষ্ট হইল! কোথায় সে ভারতের শিখ—আর কে এই একান্ত অপরিচিতা কুর্দ কিশোরী? ঘটনাক্রমে এক দিন বিদেশে তাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছে—সম্ভবতঃ জীবনে আর দেখা হইবে না—হইলেই বা কি? কিন্তু হয় ত আর কখনও দেখা হইবে না, এই আশঙ্কার উত্তেজনাতেই যেন আবার তাহাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। প্রতিদিন দিন যত শেষ হইয়া আসিত, তেজা সিং তত চঞ্চল হইত—শয্যায় পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া ভাবিত—এখন হয় ত সে ঘাটে জল লইতে আসিতেছে। সে মানস-নয়নে দেখিতে পাইত, কিশোরী প্রান্তর পার হইয়া শূন্য পাত্রটি বামকরে ঝুলাইয়া দোলাইতে দোলাইতে হরিণীর মত লঘুগতিতে খেজুর বনের মধ্য দিয়া ঘাটের কাছে আসিতেছে—তাহার পর পাত্রে জল ভরিয়া সেটি স্কন্ধে লইয়া তীরের মত সুগঠিত সরল দেহে সেই পথে ফিরিয়া যাইতেছে—অস্তগমনোন্মুখ রবির কর তাহার মুখের রক্তাভা গাঢ়তর করিয়াছে। ঘাটে যাইবার ও ফিরিবার পথে সে কি একবার তেজা সিংহের সন্ধানে আপনার উজ্জ্বল চক্ষুর চঞ্চল দৃষ্টি চারি দিকে চালিত করিয়াছে? —তাহাকে দেখিতে না পাইয়া সে কি হৃদয়ের এক প্রান্তে একটু হতাশাদংশন-বেদনা অনুভব করিয়াছে—তাহার একটি দীর্ঘশ্বাস কি কমলার ফুলের গন্ধে আমোদিত সান্ধ্য সমীরণে মিশাইয়া গিয়াছে? তেজা সিং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিত। সে প্রত্যহই ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিত, "আমি একটু বেড়াইতে পারি কি? আর ত এমন করিয়া শুইয়া থাকিতে পারি না!"

অষ্টম দিন ডাক্তার তেজাকে বেড়াইবার অনুমতি দিলেন। দিনান্ত-দিবাকর পশ্চিম দিক্‌চক্রবালের মেঘে বর্ণের বৈচিত্র্য বিকাশ করিবার পূর্ব্বেই সে উঠিয়া তাঁবুর বাহিরে আসিল। তখনও তপ্ত ভূমি হইতে অগ্নিশ্বাস উঠিতেছে—তখনও রাজপথের ধূলি হইতে রবিকর প্রতিফলিত হইয়া চক্ষুকে পীড়িত করিতেছে। দুর্ব্বলদেহ তেজা সিং নদীর দিকে অগ্রসর হইল—তাহার চরণ কম্পিত হইতেছিল। তাহার এক জন পরিচিত সৈনিক জিজ্ঞাসা করিল, "এত রৌদ্রে কোথায় যাও ?" সে উত্তর দিল না।

পথে দুইবার বিশ্রামার্থ বসিয়া তেজা সিং সেই বাগানে আসিল; সেই গাছতলায় বসিল। এতক্ষণ তাহার কেবল আশঙ্কা হইতেছিল, তাহার যাইতে বিলম্ব হইতেছে, কিশোরী হয় ত আসিয়া জল লইয়া চলিয়া যাইবে। এখন তাহার মনে হইতে লাগিল—অপরাহ্ণ কি এত দীর্ঘ, যেন আর শেষ হয় না! সাত দিনে অনেক ফুল ঝরিয়া তরুতলে ধূলির উপর পড়িয়া ছিল। তেজা সিং অন্যমনস্কভাবে এক একটি তুলিয়া নখে ছিন্ন করিতে লাগিল—আর প্রান্তরের পথে চাহিতে লাগিল। গ্রাম হইতে কত রমণী আসিয়া জল লইয়া গেল—সবই আরব, বোরকায় ঢাকা—কিন্তু সে কিশোরী আসিল না। তেজা সিং আপনাকে আপনি বুঝাইতে লাগিল, হয় ত তাহার আজ জল লইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যুক্তিতে মনের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। তাহার পর সে ভাবিল, হয় ত সাত দিন আসিয়া আসিয়া সে হতাশ হইয়া মনে করিয়াছে, হিন্দুস্থানবাসী অপরিচিত সৈনিক আর আসিবে না। এই কথা মনে করিতেই তেজা সিং হৃদয়ে বেদনার চাঞ্চল্য অনুভব করিল। কিন্তু সেই সময় সে দূরে খেজুর-বাগানের পারে কিশোরীকে দেখিতে পাইল। সে দূরে তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল—বোধ হয়, নিতান্ত অপ্রত্যাশিত স্থানে শত কিশোরীর মধ্যেও তাহার বাসনাতৃষিত নয়ন তাহাকে চিনিতে পারিত। তেজা সিং আপনার বক্ষের স্পন্দন-শব্দ শুনিতে পাইতে লাগিল।

কিশোরী তেজা সিংহের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল; জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ত সাত দিন আইস নাই!"

তেজা সিং বলিল, "কেন, তুমি কি আমাকে খুঁজিয়াছিলে ?"

"হাঁ।"

"কেন ?"

"তুমি আসিবে জানিয়া ?"

"কেমন করিয়া জানিলে? আমি ত বলি নাই যে, আসিব।"

"তুমি বল নাই; কিন্তু তোমার কথার আওয়াজ তাহা গোপন রাখিতে পারে নাই। তুমি যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি প্রত্যহ এই ঘাটে জল লইতে আসি কি না—তাহাতেই আমি বুঝিয়াছিলাম, তুমি আসিবে।"

"কিন্তু আমি ত আসি নাই।"

"নিশ্চয় কোন কারণে আসিতে পার নাই। আসিবার হুকুম পাও নাই বুঝি?"

"কিন্তু আমি আসি—ইহা কি তোমার ইচ্ছা!"

কিশোরী বলিল, "হাঁ।"

তেজা সিং জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

কিশোরী একটু ভাবিল, তাহার পর অত্যন্ত সরলভাবে উত্তর দিল, "তাহা ত বলিতে পারি না।" বলিয়াই সে আবার তেজা সিংহের দিকে চাহিল—তাহার নয়ন বিস্ময়ে বিস্ফারিত ও শঙ্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "এ কি! তোমার মুখে যে রক্ত নাই! তোমার কি হইয়াছে?"

তেজা সিং অঙ্গাবরণ-বস্ত্র সরাইয়া ঔষধলিপ্ত, বস্ত্রাবৃত বাম বাহু দেখাইল।

কিশোরীর নয়নে বেদনার ভাব ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু সে প্রথমেই বলিল, "এই জন্য আসিতে পার নাই।" যেন তাহার অনুপস্থিতির এই কারণ জানিয়া সে স্বস্তি পাইল। তাহার পর সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

তেজা সিং তাহার আঘাতের বিবরণ বিবৃত করিল। সে দুইবার যুদ্ধে আহত হইয়াছে জানিয়া কিশোরী বলিল, "হিন্দুস্থানের লোক ত খুব যোদ্ধা! কিন্তু তোমরা ইংরাজের সঙ্গে পার নাই—না?"

"না।"

"এবার তুর্কীও কি পারিবে না?"

তেজা সিং বলিল, "তাহাই ত বোধ হয়।"

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "কত দিনে তুমি সারিয়া উঠিবে?"

তেজা সিং বলিল, "ডাক্তারও তাহা বলিতে পারে না।"

তেজা সিং বুঝাইয়া বলিল, "প্রথমবার অস্ত্র করিয়াও সে আরোগ্য লাভ না করায় আবার অস্ত্র করিতে হইয়াছে—সারিবে কি না, বলা যায় না।"

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "যদি না সারে?"

তেজা সিং বলিল, "তাহা হইলে আমাকে দেশে ফিরিয়া পাঠাইবে।"

তাহার মনে হইল, সে কিশোরীর নয়নে শঙ্কার ভাব লক্ষ্য করিল।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "দেশে যাইতে তোমার খুব আনন্দ হইবে?"

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া তেজা সিং বলিল, "না।"

"কেন?"

"দেশে আমার কেহ নাই।"

"কেহ নাই?"

"না।"

"তবে যাইবে কেন?"

"নহিলে কোথায় যাইব?"

কিশোরী একটু ভাবিয়া বলিল, "তাহাই বটে। যাইবার স্থান না থাকিলেও একটা স্থানে যাইতে ও থাকিতেই হয়। তাহাই বটে—।"

সে যেন আপনার মনে এই সব কথা বলিতেছিল। তেজা সিং তাহার দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে বলিল, "আমারও তাহাই।"

তেজা সিং জিজ্ঞাসা করিল, "কেন—তোমার কি কেহ নাই?"

"না"—বলিয়া কিশোরী বলিল, "সে অনেক কথা; আজ আর বলিবার সময় নাই।"

তেজা সিং চাহিয়া দেখিল, সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে।

কিশোরী জল লইয়া চলিয়া গেল; যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কালও বেড়াইতে আসিবে?"

"হাঁ।"

তেজা সিং চাহিয়া দেখিল, কিশোরী সেই খেজুর-বাগানের মধ্য দিয়া, মাঠ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে হাঁসপাতাল-তাম্বুতে ফিরিয়া গেল। এত দিন তাহার কোনও বিষয়ে কৌতূহল ছিল না—আকর্ষণ ছিল না, এখন সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছিল; তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, কিশোরী একটি রহস্য—সে রহস্য ভেদ করিতে পারিলে সে জীবনে আনন্দের সন্ধান পাইতে পারিবে। বালু-তলে বারি আছে জানিলে তৃষ্ণার্ত্ত যেমন আবেগে বালু খনন করিতে ব্যাকুল হয়, সে কিশোরী রহস্য ভেদ করিতে তেমনই ব্যাকুল হইল।

৩

দুই সপ্তাহ তেজা সিং হাঁসপাতালে চিকিৎসিত হইল। সাধারণ নিয়মে তাহার পরই তাহাকে অন্য হাঁসপাতালে পাঠাইতে হইবে। এই পক্ষকাল সে প্রতি দিন অপরাহ্নে ঘাটের কাছে বাগানে যাইয়া বসিত; আদিলাও প্রতিদিন জল লইতে আসিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে গল্প করিত। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বাড়িতেছিল। উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। কিশোর কিশোরীর আকর্ষণ নয়ন হইতে মনে পঁহুছিতে বিলম্ব হয় না, তাহার পর মনের সেই আকর্ষণ হয় মোহে স্বপ্নে শেষ হইয়া যায়, নহে ত চিরজীবনের বন্ধনে পরিণতি লাভ করে। তেজা সিংহের দুর্ব্বল দেহে স্বাস্থ্য যত ফিরিয়া আসিতেছিল, সে ততই বাসনার প্রাবল্য অনুভব করিতেছিল—আকর্ষণ ততই দৃঢ়—ভালবাসা ততই গাঢ় হইতেছিল। আদিলার কথায়, চাহনিতে, ব্যবহারে সে তাহারও হৃদয়ে সেই আকর্ষণের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়া যে আনন্দ অনুভব করিত, তাহা বলাই বাহুল্য। এক এক বার সে মনে করিত, সে ভাল করিতেছে না; তাহাকে ত কয় দিন পরেই আবার যুদ্ধে যাইতে হইবে—নহিলে অন্যত্র যাইতে হইবে। তবে পক্ষকালের এ স্বপ্ন লইয়া সে কি করিবে—কেন সে এ স্বপ্ন দেখিতেছে? কিন্তু ইচ্ছা করিলেও সে আপনাকে নিবৃত্ত করিতে পারিত না। সে ভবিষ্যতের জন্য বর্ত্তমানকে ত্যাগ করিতে পারিত না—

আজ আমি আছি, আছে বিচিত্র এ ধরা,
কে জানে নিয়তি কাল লইবে কোথায়?

বর্ত্তমান যদি সুখের পাত্র পূর্ণ করিয়া তাহার মুখে ধরে, পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে দোষ কি? তাহার নিয়তি যদি দুই জনকে দুই দিকে লইয়া যায়—আদিলা তাহাকে ভুলিবে; সে তাহার স্মৃতি সম্বল করিয়া দীর্ঘ জীবনপথ পর্য্যটন করিবে। এ সব যৌবনের স্বপ্ন—যুবকের যুক্তি। কিন্তু এই সময়ই তাহার আপনার কার্য্যের বন্ধন তাহার কাছে পীড়াদায়ক মনে হইত। যদি সে সৈনিকদল ছাড়িয়া যাইতে পারিত! আদিলারও কেহ নাই—মাতৃহীনা আদিলার পিতা এই যুদ্ধেই তুর্কপক্ষে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিয়াছেন—সে এক দূর-সম্পর্কীয়া আত্মীয়ার গলগ্রহ হইয়া উদয়াস্ত গৃহকার্য্য করিয়া ও তিরস্কার সহ্য করিয়া দিন কাটাইতেছে। সে সব দুঃখ হাসিয়া উড়াইয়া দেয় বটে; কিন্তু সে দুঃখিনী। সেও ত সংসারে সকলবন্ধনবিহীন, যদি সে মুক্তি পাইত, তবে—

কে বলিবে ? তাহার ধর্ম্ম উদার বক্ষে মুসলমানকন্যাকে স্থান দিতে কাতর নহে। কিন্তু আজ সে কথা মনে করিয়া লাভ কি ?

এইরূপে দেখিতে দেখিতে এক পক্ষ কাটিয়া গেল। এক পক্ষ যে এত অল্প সময়, তেজা সিং বা আদিলা কেহই পূর্ব্বে তাহা জানিত না। কিন্তু পক্ষকাল যত শেষ হইয়া আসিতেছিল, তেজা সিং ততই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতেছিল। এমন কি, সে তাহার দুশ্চিন্তাভাব আদিলার কাছেও গোপন রাখিতে পারে নাই। প্রেম প্রেমিকের নয়নে তাহার মনের ভাব ধরিতে পারে। আদিলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত—"তুমি কি ভাব ?" সে সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু আদিলার কাছে ধরা পড়িত। শেষে এক দিন আদিলা অভিমানভরে বলিল, "তুমি যখন আমার কাছে সত্য কথা বল না, তখন আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কহিব না। কুর্দ্দ বাতাসের স্বাধীনতা, সূর্য্যের সপ্রকাশভাব, পাহাড়ের অটলতা, আর প্রণয়ে দৃঢ়তা ভালবাসে।" তখন তেজা সিং বলিল, এই বার তাহাকে অন্যত্র যাইতে হইবে।

আদিলা হাসিয়া বলিল, "ইহাই তোমার ভাবনা ? কুর্দ্দরা ইহাতে ভাবে না ; মেঘ যেমন এক স্থানে থাকিতে পারে না—মানুষও তেমনই এক স্থানে থাকিতে পারে না। কুর্দ্দরমণী তাহার স্বামী বিদেশে গেলেও কাঁদে না ; সে বিষয়ে একটা গান আছে, আমার দেশে মেয়েরা সদা সর্ব্বদা সে গান গাহিয়া থাকে।"

তেজা সিং বলিল, "যে দিন এই দাড়িমের বাগানে দাড়িমের ফুলের মত তোমাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম, সে দিন তুমি কি সেই গান গায়িতেছিলে ?"

"সে ত আমার মনে নাই" বলিয়া আদিলা গাহিল—

স্বামী। "গিরি পারে বহু দূরে—বহু দূরে যেতে চাই ;
যা'ব কি যা'ব না আমি, প্রিয়া মোর, বল তাই।
স্ত্রী। সহায় হবেন বিধি যদি তুমি দূরে যাও—
দাঁড়ায়ে দেখিব আমি, তুমি ফিরে ফিরে চাও।
র'ব চেয়ে দাঁড়াইয়া রৌদ্রদীপ্ত নভতলে—
তুমি মিশে যাবে দূরে—সুদূরে পথিকদলে।
আমি কি কাঁদিব শুধু গৃহকায ছাড়ি মম ?
কি হ'বে বরষি অশ্রু অসহায় শিশুসম ?
পারসী, খ্রীষ্টান, তুর্ক—তা'রা কাঁদে, ভয় পায় ;
আমারে চুমিয়া তুমি যাও যেথা মন চায়।"

তাহার পর সে আরবী ভাষায় তাহার স্বদেশের গানের অর্থ তেজা সিংহকে বুঝাইয়া দিয়া হাসিয়া বলিল, "বুঝি পারসী, খৃষ্টান, তুর্ক, ইহাদের মত হিন্দুস্থানীরাও কাঁদে ?"

তেজা সিং বলিল, "কিন্তু তোমার ত গৃহকার্য্য নাই !"

আদিলা হাসিয়া গাছের গাত্রে লুটাইয়া পড়িল—যেন বসন্তপবনে কুসুমিতা লতা লুটাইয়া গেল—তাহার পর বলিল, "আমার গৃহকায নাই ! তুমি হইলে এক দিন সে কায করিতে পারিতে না ; এই দাজলার * জলে ডুবিয়া মরিতে। কাযের উপর আবার তিরস্কার—হাতে হাতে পুরস্কার আছে।"

আদিলার সরল হাসির প্রবাহে তেজা সিংহের সঙ্কোচের বাঁধ ভাসিয়া গেল। সে বলিল, "কিন্তু সে ত আর যে তোমাকে 'চুমিয়া' বিদেশে যাইবে, তাহার গৃহকায নহে।"

আদিলার কর্ণমূল পর্য্যন্ত লজ্জায় রক্তাভ হইয়া উঠিল ; সে তাহার সরল ও উজ্জ্বল দৃষ্টি মৃত্তিকাসংলগ্ন করিল। তাহার পরই সে আবার হাসিয়া বলিল, "কিন্তু যে আমাকে কায আর তিরস্কার অকাতরে দেয়—সে, যে দিন তিন জনের কায আমাকে দিয়া করাইতে হয়, সে দিন আদর করিয়া চুমা খায়।"

তেজা সিং হাসিয়া বলিল, "সেই চুমায় তোমার আশা মিটে ত ?"

"গ্রীষ্মের রৌদ্রে যেমন মরুভূমির আশা মিটে।"

এমনই ভাবে যখন দিন কাটিতেছিল, তখন ডাক্তার যখন বলিলেন, তিনি আরও সাত দিন তেজা সিংকে তাঁহার হাঁসপাতালে রাখিবেন, তখন সে যে আনন্দিত হইল, তাহা বলাই বাহুল্য। যে জীবনে গৃহে সুখ পায় নাই, সে যদি পান্থশালায় সুখের সন্ধান পাইয়া থাকে, তবে সে কি সেই পান্থশালায় যত দিন পারে থাকিতে চাহে না ? এই যে সাত দিন—এ ত সাত যুগের সমান। জীবনে কত সময় এক দিন সারা জীবনের অপেক্ষা অধিক মূল্যবান বোধ হয়।

দেখিতে দেখিতে সে সাত দিনও কাটিয়া গেল। যে দিন প্রাতে ডাক্তার তাহার সম্বন্ধে শেষ মত ব্যক্ত করিবেন, তাহার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় আদিলার কাছে বিদায় লইবার সময় তেজা সিং তাহাকে সে কথা বলিল। আদিলা আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "যে আল্লা সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি

---

* আরবরা টাইগ্রীসকে দাজলা বলে। পারসী ও কুর্দ 'তীর' (বাণ) হইতে য়ুরোপীয়রা টাইগ্রীস করিয়াছে।

তোমার মঙ্গল করুন।” তাহার পর সে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি কাল আসিতে পারিবে না ?”

“কাল পারিব। আদিলা, আমি চলিয়া গেলেও কি তুমি আমাকে মনে রাখিবে ?”

“রাখিব। যে মরুভূমিতে বাস করে, সে কি প্রস্রবণকে ভুলিতে পারে ?”

বলিষ্ঠ তেজা সিংহের যৌবনাবেগ তাহার বিচার-বিবেচনার শক্তিকে পরাভূত করিতেছিল। তাহার মনে প্রবল বাসনা জন্মিতেছিল—সব ভুলিয়া জীবন-মরণ বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ সব ভুলিয়া এই প্রেমের প্রবাহে ভাসিয়া যায়; আজ একবার আদিলাকে বক্ষে ধরিয়া তাহার অধরে আপনার অধরের তৃষ্ণা মিটাইয়া লয়। কিন্তু সে আপনাকে নিবৃত্তি করিল। কাল প্রাতে তাহাকে বিদায় লইতে হইবে—মধ্যে এক রাত্রির ব্যবধান—আদিলাহারা অন্ধকার রজনীর ব্যবধান। আজ স্বার্থপরের মত আদিলার জীবনের সুখ নষ্ট করিবার অধিকার তাহার নাই। সে প্রবল চেষ্টায় আপনাকে সংযত করিয়া বিদায় লইল।

সে রাত্রিতে তেজা সিং ঘুমাইতে পারিল না।

৪

পরদিন প্রাতে ডাক্তার বিশেষ যত্নসহকারে তেজা সিংহের আহত বাহু পরীক্ষা করিলেন; তাহার পর বলিলেন, “তোমার অস্ত্রের ক্ষত মিলাইয়া গিয়াছে; কিন্তু বাহুর দৌর্ব্বল্য যায় নাই—এ দৌর্ব্বল্য আর যাইবে না।” তাহার পর তিনি বলিলেন, “তুমি দুঃখিত হইও না—আঘাতযন্ত্রণা যেমন ধীরভাবে সহ্য করিয়াছ, এ সংবাদও তেমনই ধীরভাবে সহ্য করিও—তোমাকে সৈনিকের কায ছাড়িয়া দেশে যাইতে হইবে।”

দুঃখিত! এ যে তাহার পরম আনন্দের সংবাদ—এ যে তাহার মুক্তির বার্ত্তা! সে তাহার লক্ষ্যহীন জীবনে যে নূতন লক্ষ্যের সন্ধান পাইয়াছে, এ যে সেই লক্ষ্যের সন্ধানপথের সহায়। সে যে এ সংবাদ পাইবার আশাও করিতে পারে নাই; ইহা এমনই অতর্কিত—অপ্রত্যাশিত।

তখনও বেলা দশটা বাজে নাই। অপরাহ্নের যে অনেক বিলম্ব! তেজা সিং আদিলাকে এ সংবাদ না দিয়া স্থির হইতে পারিতেছিল না। অপরাহ্ন পর্য্যন্ত বিলম্ব তাহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হইতেছিল।

সে দিন তেজা সিং অন্য দিন হইতে অধিক বেলা থাকিতে নদীর কূলে সেই

বাগানে গেল। কিন্তু তাহাকে অন্য দিনের মত অপেক্ষা করিতে হইল না। আদিলাও বুঝি সংবাদের জন্য চঞ্চল হইয়া বিলম্ব সহ্য করিতে পারে নাই।

তেজা সিং বলিল, "আদিলা, আমাকে সেনাদলে যাইতে হইবে না।"

আদিলার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কিন্তু তেজা সিং যখন বলিল, "কিন্তু আমাকে দেশে পাঠাইয়া দিতেছে।" তখন অকালজলদোদয়ে দিনের আলোক যেমন নিবিয়া যায়, আদিলার মুখের আনন্দালোক তেমনই নিবিয়া গেল। সে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "আল্লা তোমার মঙ্গল করুন।" তাহার স্বরে বেদনা বাজিয়া উঠিল। তেজা সিংহের মনে হইল, সে আদিলার নয়নে অশ্রু দেখিতে পাইল। তাহার পুনরাগতস্বাস্থ্যসবল দেহের যৌবন তাহাকে চুম্বনে সে অশ্রু মুছাইয়া দিতে প্ররোচিত করিল। কিন্তু তাহার যুক্তি তাহাকে নিবারিত করিল। তবে আজ সে জীবনের ভবিষ্যৎ নক্সা ছকিয়া আনিয়াছিল—যদি আদিলা সম্মত হয়। সে ত মুক্ত—এখন সে জীবনে নূতন পথ রচিতে পারে।

তেজা সিং আদিলাকে সেই কথা বলিবে, এমন সময় আদিলা বলিল, "কিন্তু দেশেও তোমার কোনও আকর্ষণ নাই?"

"না।"

"তবুও সেই তোমার দেশ—সেই তোমার পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতিপূত তীর্থ। হে চিরপরিচিত অপরিচিত, আরবের এই মরুভূমিতে কয় দিন যাহার সঙ্গে তোমার দেখা হইয়াছে, তাহাকে ভুলিতে তোমার কয় দিন লাগিবে?"

"মৃত্যু ব্যতীত কেহ তাহাকে ভুলাইতে পারিবে না।"

উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। কথা তখন নিষ্প্রয়োজন—উভয়ে উভয়ের মনের ভাব বুঝিয়াছিল। বাসনা ও বেদনা উভয়কেই সমভাবে পীড়িত করিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে তেজা সিং বলিল, "কিন্তু আমি ইরাকে থাকিতে পারি।"

মরুমধ্যে তৃষ্ণাশুষ্ককণ্ঠ পথিক সহসা স্বচ্ছ সলিলের প্রবাহ দেখিলে যেমন আনন্দিত হয়, আদিলা তেমনই আনন্দিতা হইল; জিজ্ঞাসা করিল "পার?"

"পারি—যদি আদিলাকে পাই।"

আদিলার মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইল। কিন্তু সে পরক্ষণেই বলিল, "আদিলা আপনি আপনাকে দিয়াছে; কিন্তু তবুও তুমি তাহাকে পাইবে না—তুমি ত মুসলমান নহ।"

এমন সরল উত্তর তেজা সিং পাইবার আশা করে নাই। তাহার আশা বর্দ্ধিত হইল। তখন সে বুঝাইতে লাগিল, তাহার ধর্ম্মে সে আদিলাকে দীক্ষিতা করিবে।

আদিলা বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তাহা হইতে পারে না।"

তেজা সিং বলিল "কেন, আদিলা ?"

"যে যুদ্ধে বাবার মৃত্যু হয়, সেই যুদ্ধে যাইবার সময় তিনি আমাকে বলিয়া গিয়াছিলেন, 'বিপদে সম্পদে সুখে দুঃখে আমি যেন কখন আল্লাকে না ভুলি'।"

তেজা সিংহের আশা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। ভগবান এক; দেশ-ভেদে ধর্ম্মভেদে তিনি ভিন্ন ভিন্ন নামে উপাসিত। এই সব কথা সে আদিলাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। আদিলা মুগ্ধ হইয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিল—কেন না, তেজা সিংহের কথা তাহার ভাল লাগিত; কিন্তু সে কিছুই বুঝিল না। তেজা সিংহের কথা শেষ হইলে সে বলিল, "আমি এ সব বুঝি না; কিন্তু তুমি বুঝ। যদি সকলেই এক আল্লার উপাসক, তবে তুমি কেন কুদের্র আল্লার ভজনা কর না ?"

তেজা সিং এতক্ষণ যাহা বলিয়াছে, তাহার পর এ কথার আর উত্তর নাই। সে নির্ব্বাক হইল। স্ত্রীবুদ্ধির সরলতার নিকট তাহার যুক্তি তর্ক পরাভব মানিল। কিন্তু পুরুষ পরাভূত হইলেও পরাভব মানিতে চাহে না। আত্মাভিমান তাহাকে প্রাধান্যলাভে প্রয়াসী করে বলিয়াই সে মনে করে, স্ত্রীলোক পুরুষের ইচ্ছার অনুসরণ করিবে, পুরুষ স্ত্রীলোকের ইচ্ছার অনুসরণ করিবে না। প্রকৃতির বিধানে পুরুষ সবল বলিয়া সে আপনার প্রাধান্য তাহার অধিকার বলিয়া মনে করিয়াছে—জগতে সকল জাতির মধ্যে ইহা লক্ষিত হয়। তাই তেজা সিং বুঝাইতে লাগিল, দেশে তাহার বাড়ী আছে; তাহারা সুখে তথায় বাস করিতে পারিবে। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলে তাহার পক্ষে তথায় বাস করা অসুবিধাজনক হইবে।

কিন্তু মরুভূমির কুটীরবাসিনী আদিলা এ সব বৈষয়িক ব্যাপার বুঝিল না। সে বুঝিয়াছিল, ধর্ম্ম আর প্রেম। উন্মুক্তগগনচারী বিহগদম্পতী কি আশ্রয়তরুর কথা ভাবিয়া পরস্পরকে ভালবাসে—পরস্পরের সন্নিহিত হয় ? তবে তাহার প্রেমিক এত ভাবনা ভাবিতেছে কেন ? এই ভাবনায় তাহার সরল হৃদয়ে ব্যথা বাজিল।

তর্কে তাহাকে পরাভূত করিতে অসমর্থ হইয়া তেজা সিং আদিলাকে বলিল,

সামরিক নিয়মে তাহাকে স্বদেশে যাইতে হইবে। তিন মাসের মধ্যে সে ফিরিয়া আসিবে। এই তিন মাস আদিলা যেন ভাবিয়া দেখে – বুঝিয়া দেখে, সে তাহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে কি না।

আদিলা বলিল, "আমি তোমার পথ চাহিয়া থাকিব—কেন না, ধর্ম্ম আমাকে তোমার নিকট হইতে দূরে রাখিলেও প্রেম আমাকে তোমার কাছে আনিয়াছে। কিন্তু, বন্ধু, তুমিও ভাবিয়া দেখিও—ধর্ম্মের যে ব্যবধান তুমি কেবল কথার ব্যবধান বলিয়া বুঝাইয়াছ, তাহা অতিক্রম করিতে পার কি না।"

তেজা সিং তাহার গৃহ চিনিতে চাহিলে আদিলা বলিল, "গৃহ চিনিয়া কি হইবে? যে নদীকূলে আমি প্রথম তোমার দেখা পাইয়াছি, সেই নদীকূলেই আমি তোমার পথ চাহিয়া থাকিব।"

ইংরাজের সামরিক ব্যবস্থা একটা বিরাট যন্ত্র—সহসা কোনও অতর্কিত কারণে তাহার কোনও অংশ ভাঙ্গিয়া না গেলে সে কলের সব কায নিয়ন্ত্রিত ভাবেই চলিতে থাকে – কখন কোনও নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। ডাক্তার তেজা সিংকে সৈনিক-কার্য্যের অনুপযুক্ত স্থির করিবামাত্র তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যবস্থা আপনা-আপনি হইয়াছিল। দুই দিন পরেই তাহাকে হাঁসপাতাল হইতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তেজা সিং আরবের ইরাকে আপনার হৃদয় রাখিয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া গেল।

৫

ভারতবর্ষে যাইয়া তেজা সিং কেবল আমারায় ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিল। চুম্বকাকৃষ্ট লৌহ কি স্থির থাকিতে পারে? যুদ্ধের জন্য লোকের স্বচ্ছন্দ গতায়াত-ব্যবস্থা বন্ধ হইয়াছিল—সব জাহাজ সরকারী বন্দোবস্তে সরকার লইয়াছিলেন; তাই দরখাস্ত করিয়া ভারত হইতে আবার ইরাকে আসিতে তেজা সিংহের বিলম্ব হইল। নহিলে তিন মাস কেন, দুই মাস না যাইতেই সে আবার আমারায় উপনীত হইত। দেশে আসিয়া সে যেন তিষ্ঠিতে পারিতেছিল না। শূন্য গৃহের বিষণ্ণ ভাব যেন তাহার কাছে 'মুখচাপা'র মত বোধ হইতেছিল। আর সে কেবল সেই ভাব দূর করিয়া সেই শ্মশানে উদ্যান-প্রতিষ্ঠার—আদিলাকে কেন্দ্র করিয়া সেই কেন্দ্র হইতে সেই নিরানন্দ গৃহে আনন্দালোক বিকীর্ণ করিবার স্বপ্ন দেখিতেছিল। সেই গৃহ আবার গৃহিণীর ব্যবস্থায় সুন্দর সংসারের মন্দির—আবার শিশুর কণ্ঠস্বরে ঝঙ্কৃত হইতে পারে। সে—সেই গৃহের—সেই সংসারের অধিকারী, যে সুখ কখনও পাইবে না মনে করিয়াছিল, সেই সুখ পাইবে।

জমীজমার লাভের অংশ আদায় করিয়া গৃহসংস্কার সম্পন্ন করিয়া সে কেবল ইরাকে ফিরিতে ব্যস্ত হইতে লাগিল। আত্মীয় কুটুম্ব প্রতিবেশী সকলেই তাহার পিতৃবিয়োগে ও সৈনিককার্য্যপরিত্যাগের কারণে তাহার সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সকলেই তাহাকে আপনার গৃহে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন—সকলেই তাহাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে উপদেশ দিতে লাগিলেন—কারণ, বিবাহ না করিলে মানুষ সংসারে নিতান্তই স্রোতের শৈবালের মত ভাসিয়া বেড়ায়। কেহ কেহ তাহার বিবাহের সম্বন্ধও দেখিতে লাগিলেন। তেজা সিং তাঁহাদিগকে বলিল, তাহাকে আবশ্যক কাযে আর একবার ইরাকে যাইতে হইবে—সে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া সংসার পাতান সম্বন্ধে তাঁহাদের সদুপদেশ শিরোধার্য্য করিবে—এখন নহে।

সে কি জন্য ইরাকে যাইতে চাহে, কত দিনের জন্য যাইতে চাহে, ইত্যাদি নানা প্রশ্নের ও অনেক লেখালিখির পর দ্বিতীয় মাসের শেষে তাহার যাইবার আদেশ আসিল। সে সেই ছাড় লইয়া পঞ্জাব হইতে করাচী বন্দরে উপনীত হইল, এবং তথায় জাহাজের জন্য সপ্তাহ কাল অপেক্ষা করিয়া জাহাজ পাইল।

তৃতীয় মাসের মধ্যভাগেই সে বসোরায় উপনীত হইয়া আবার আমারায় যাত্রা করিল। যখন জাহাজের উপর হইতে সে আমারার সৌধশ্রেণী দেখিতে পাইল, তখন কি আনন্দে—কি আশায়—কি আকাঙ্ক্ষায়—কি আশঙ্কায় তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল! আদিলা যে তাহার আগমনপ্রতীক্ষা করিয়া আছে, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র ছিল না; কিন্তু তবুও মনে হইতেছিল, যদি সে আর তাহাকে দেখিতে না পায়?

মধ্যাহ্নের পরই তেজা সিং সেই বাগানে উপস্থিত হইল। গাছে আর ফুল নাই—কিন্তু গাছ ফলে পূর্ণ; এই ফলেই ফুলের পরিণতি। তাহার আশাও এমনই সাফল্যে পরিণতি লাভ করিবে ত? তাহার হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা উত্তর দিল—করিবে; কিন্তু কোথায় ক্ষীণ স্বরে আশঙ্কার অমঙ্গল-বাণীও শ্রুত হইল, কে বলিতে পারে? একবার তাহার মনে হইল, সে বলিয়াছিল, তিন মাসে সে ফিরিয়া আসিবে—এখনও তিন মাস পূর্ণ হয় নাই, এখনও সময় হয় নাই বলিয়া হয় ত আদিলা আসিবে না। কিন্তু তখনই সে আদিলার বিদায়কথা স্মরণ করিল—"নদীকূলেই আমি তোমার পথ চাহিয়া থাকিব।"

ক্রমে তাহার নিকট অতি দীর্ঘ প্রতীয়মান দিনও শেষ হইয়া আসিল; যেন পৃথিবী দগ্ধ করিয়া আপনার দিনের কায সারিয়া সূর্য্য পশ্চিম-দিগন্তে মেঘের মধ্যে

অনলজ্বালা রাখিয়া নিষ্প্রভ হইয়া অন্তর্ধানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। গ্রাম হইতে দুই চারি জন করিয়া আরব-রমণী ঘাটে জল লইতে আসিতে লাগিল। তাহারা জল লইয়াই চলিয়া যাইতে লাগিল। শেষে সূর্য্য যখন অস্ত গিয়াছে, কিন্তু দিনের শেষ আলো নিবিয়া যায় নাই, তখন তেজা সিং বাগানের পরপারে তাহার ঈপ্সিতাকে দেখিতে পাইল—আদিলা আসিতেছে।

তেজা সিং অগ্রসর হইয়া বলিল, "দেখ, আমি আসিয়াছি।"

আদিলার মুখে ও চক্ষুতে আনন্দ বিকশিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "মেঘ কি চাতকের পিপাসা না মিটাইয়া থাকিতে পারে?"

-"না। মধুমক্ষিকাই ফুলকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না।"

উভয়ে এক বৃক্ষতলে বসিল। তেজা সিং ভারতবর্ষ হইতে আদিলার জন্ত অলঙ্কার আনিয়াছিল; তাহা আদিলাকে পরাইয়া দিল। আদিলা কোনরূপ সঙ্কোচ প্রকাশ করিল না; কেবল বলিল, "তুমি ত অনেক টাকা খরচ করিয়াছ?"

তেজা সিং বলিল, "কিন্তু আমার যাহা কিছু, সবই ত আমি তোমাকে দিতে চাহি।"

কথায় কথায় সন্ধ্যা হইল। প্রকৃতির হিসাবে ভুল হয় না, জমা খরচ মিলিয়া যায়। তাই ইরাকে রৌদ্রতপ্ত দিবসের দুঃসহ তাপ সন্ধ্যা হইতে না হইতে দূর হইয়া যায়, সান্ধ্য সমীরণে শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল হয়। সেই স্নিগ্ধ সমীরণে বাগানে গাছের পাতা কাঁপিতে লাগিল—আকাশে চন্দ্রের আলোক। তেজা সিং ও আদিলা নদীর কূল ধরিয়া কিছু দূর গেল। সহসা আকাশের দিকে চাহিয়া আদিলা বলিল, "অনেকটা রাত্রি হইয়াছে।" সে হাসিয়া বলিল, "আজ অনেকটা তিরস্কার পুরস্কার মিলিবে। কিন্তু সে জন্য আমার আর ভয় হয় না।" সে নিতান্ত বিশ্বাসভরা প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তেজা সিংহের দিকে চাহিল। তাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সেও মুক্তির দ্বারে পৌছিয়াছে। সেও তেজা সিংহের মত প্রেমের, সংসারের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

তেজা সিং সঙ্গে চলিল। জল লইয়া আদিলা প্রান্তর পার হইয়া গ্রামে গেল। তাহার গৃহদ্বার হইতে তেজা সিং বিদায় লইল।

কিন্তু তাহার পর তেজা সিং যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি স্থির করিলে?" তখন আদিলা বলিল, "আমি ত আর নূতন কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না; তুমি কি স্থির করিলে?" তেজা সিং এবার সংসারের

যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহা তাহার স্বদেশে; তাই সে প্রতিদিনই আদিলাকে বুঝাইত—মনে করিত, বুঝাইয়া তাহার মতপরিবর্ত্তন করাইতে পারিবে। কিন্তু তাহার হিসাবেই ভুল হইয়াছিল। যে স্থানে বিশ্বাসে ও যুক্তিতে বিরোধ জন্মে, তথায় বিশ্বাস যদি সরল ও দৃঢ় হয়, তবে যুক্তির পরাভব অনিবার্য্য। কেন না, বিশ্বাস হৃদয়ের—যুক্তি মস্তিষ্কের। তেজা সিংহের যুক্তি কিছুতেই আদিলার বিশ্বাসকে পরাভূত বা বিচলিত করিতে পারিল না। তেজা সিংহের প্রেম প্রবল না হইলে সে আদিলার এই অবিচলিত ভাবে বিরক্ত হইত। কিন্তু তাহার প্রেম সে বিরক্তির পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

এমনই ভাবে এক মাস কাটিয়া গেল। অপরিচিত হিন্দুস্থানবাসীর সহিত আদিলার ঘনিষ্ঠতা গোপন ছিল না। সে ঘনিষ্ঠতা বিবাহে পর্য্যবসিত হওয়াই স্বাভাবিক—তাহাতে বিলম্বহেতু গ্রামের লোক তাহা লইয়া অপ্রিয় আলোচনা করিতে লাগিল—আদিলার আশ্রয়-গৃহে তাহার পক্ষে বাস আরও কষ্টকর হইয়া উঠিল। শেষে একদিন তেজা সিংহের যুক্তির উত্তরে সে বলিল, "তুমি আমাকে এ যন্ত্রণা না দিয়া আমাকে মারিয়া ফেল। আমি সুখে মরিব। তুমিই বলিয়াছ, দুই ধর্ম্মে ব্যবধান কথার ছলনা—তোমার প্রেম কি তোমাকে সে ব্যবধান-টুকুও অতিক্রম করাইতে পারিল না?" তাহার কণ্ঠস্বরে তিরস্কারের ও অভিমানের ঝঙ্কার ছিল। কিন্তু কথা শেষ না হইতেই সে ঝঙ্কার বেদনায় ও করুণায় কোমল হইয়া অনুনয়ে পরিণত হইল। তাহার দুই চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রু ঝরিতে লাগিল! তেজা সিংহের প্রেমে তাহার অচল বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছিল—বেদনায় তাহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

আদিলার অশ্রুর প্রবাহে তেজা সিংহের সব দ্বিধা ভাসিয়া গেল। সত্যই ধর্ম্মের ব্যবধান কথার ছলনা—সে ইচ্ছা করিয়া আপনার জীবন মরুভূমি করিবে না, আদিলার পক্ষে সংসার বেদনায় কণ্টকাকীর্ণ করিতে পারিবে না। আদিলার সরল বিশ্বাসেরই জয় হইল।

৬

তেজা সিংহের সহিত পরদিন আদিলার বিবাহ হইবে। সে দিন অপরাহ্নে তাহারা আবার সেই বাগানে মিলিত হইয়াছে। দুই জনে কত কথা হইতেছে—বিবাহের পর তাহারা ভারতবর্ষে যাইবে; ভাল লাগে, তথায় থাকিবে; নহিলে ইরাকে ফিরিয়া আসিবে—তেজা সিং জমীজমার ব্যবস্থা করিয়া আসিবে। আজ তাহাদের উভয়েরই হৃদয় আনন্দে পূর্ণ। তেজা সিং স্বধর্ম্মত্যাগের কথাও যেন

ভুলিয়া গিয়াছে—চিরাগত সংস্কার ত্যাগ করিতে তাহার হৃদয়ে যে বেদনা বাজিয়াছিল প্রেমের ভেষজে—সুখের আশায় তাহা দূর হইয়াছে। সে আজ সুখী। আর আদিলা? তাহার সুখের সীমা নাই।

কথায় কথায় আদিলা জিজ্ঞাসা করিল, "হিন্দস্থানে তোমাকে কি বলে?"

তেজা সিং বলিল, "শিখ।"

"শিখ!"—এমন বিকৃত কণ্ঠে আদিলা সে কথা উচ্চারিত করিল যে, তেজা সিংহের মনে হইল, দূরে আততায়ীর ছুরিকাহত কাহারও কণ্ঠ হইতে সে স্বর উঠিয়াছে। সে চাহিয়া দেখিল, আদিলার মুখে যেন মৃত্যুর পাণ্ডুরবর্ণ ব্যাপ্ত—সে মুখ রক্তলেশশূন্য। সে এই পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই আদিলা দুই করে মুখ আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ কাঁদিয়া সে যেন প্রকৃতিস্থ হইল। সে অশ্রুসিক্তনয়নে তেজা সিংহের দিকে চাহিয়া বলিল, "বন্ধু, অভাগিনীর সুখের স্বপ্ন শেষ হইয়াছে। ঐ যে সূর্য্য ডুবিতেছে—উহা কাল আবার উঠিয়া পৃথিবীর অন্ধকার ঘুচাইবে; কিন্তু আমার জীবনের এ অন্ধকাররাত্রি আর প্রভাত হইবে না।"

শঙ্কাকম্পিতকণ্ঠে তেজা সিং জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে, আদিলা?"

"শিখ সৈনিকের অস্ত্রে পিতার জীবনান্ত হইয়াছিল শুনিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—সেই দিন হইতে শিখ আমার শত্রু।"

"কিন্তু আমার ত কোন অপরাধ নাই—আমি ত তোমার জন্য আমার শিখ-ধর্ম্মও ত্যাগ করিয়াছি।"

"কিন্তু তুমি শিখ।"

"আমার প্রেমও কি তোমার প্রতিজ্ঞা পরাভূত করিতে পারিবে না?"

"না।"

তেজা সিংহের মনে হইল, যেন সহসা কে তাহার বক্ষে শাণিত অস্ত্র বিদ্ধ করিয়া বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিল। সে যাতনাব্যঞ্জকস্বরে বলিল, "আদিলা! আদিলা! কিন্তু আমি যে তোমার জন্য আমার ধর্ম্ম পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছি?"

আদিলা কাতরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "আর আমি যে আমার সর্ব্বস্ব তোমাকেও ত্যাগ করিতেছি। আমার মত দুঃখ কাহার?"

বাসনার প্রবল উত্তেজনায় তেজা সিং সব ভুলিয়া গেল—সে আপনার দৃঢ় বাহুপাশে আদিলাকে বদ্ধ করিয়া নিবিড় আলিঙ্গনে বক্ষে ধরিয়া অজস্র চুম্বনে তাহার মুখ প্লাবিত করিয়া দিল। আদিলা তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি

করিল না—তাহার কোমল, তপ্ত দেহ যেন সে আলিঙ্গনে এলাইয়া পড়িল। সে মনে করিল—এই মুহূর্ত্তেই তাহার জীবনের সার্থকতা—এই মুহূর্ত্তের স্মৃতি সম্বল করিয়াই তাহাকে বেদনাভার বহিয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইবে। অজস্র চুম্বনে যখন তেজা সিংহের প্রবল উত্তেজনা আপনাকে ব্যয়িত করিল, তখন আদিলা আপনাকে তাহার শিথিল আলিঙ্গন হইতে মুক্ত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে কাতর ভাবে তেজা সিংহের দিকে চাহিয়া বলিল, "বন্ধু, তুমি মুক্ত—জীবনে তুমি সুখী হও। যদি পার, মরুভূমির এই তুচ্ছ কণ্টককে কখনও কখনও স্মরণ করিও। সে তোমাকে কখনও ভুলিবে না—কুর্দ্দ রমণী কখনও দুইবার ভালবাসে না।"

সন্ধ্যার অন্ধকারে সে বাগান পার হইয়া চলিয়া গেল।

পরদিন তেজা সিং গ্রামে সন্ধান লইয়া জানিল, প্রত্যূষেই আদিলা কুর্দ্দস্থানে তাহার কোন আত্মীয়ের সন্ধানে চলিয়া গিয়াছে।

* * * * * *

ইহার তিন মাস পরে একদিন অমৃতসহরের শিখ মন্দিরের দ্বারী প্রভাতে দেখিল, মন্দিরদ্বারে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পড়িয়া আছে। বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া তেজা সিং আত্মহত্যা করিয়াছে।

আর তাহারও পাঁচ মাস পরে—যখন ইরাকের দাড়িম্ব-কানন আবার রক্ত কুসুমে ভরিয়া গিয়াছে, তখন—তেজা সিংহের নাম লিখিত একখানি কাগজ অঙ্গাবরণ হইতে বাহির করিয়া এক বিদেশিনী অমৃতসহরে তাহার সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছিল। অনেকেই তাহার ভাষা বুঝিতে পারে নাই—সে কাহাকেও আত্মপরিচয় দেয় নাই। আদিলার প্রেম কি তাহার প্রতিজ্ঞাকে পরাভূত করিয়াছিল?

১১, টাইগ্রীস ফ্রণ্ট,
আমারা,
২রা বৈশাখ, ১৩২৪।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

নদীয়ার পুরা-কাহিনী—বেৎনা। *

বেৎনা একটি গ্রামের নাম। গ্রামটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। ব্রাহ্মণ, সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু ও বহু মুসলমানের এখানে বাস ছিল। গ্রামটী অতি প্রাচীনও বটে। পূর্ব্বে এই গ্রামে বহু তিলীজাতীয় লোকের বাস ছিল। বেৎনায় বাস

* বাঁকিপুরের দশম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

হেতু তাঁহারা সমাজে বেৎনাই তিলী নামে খ্যাত। এক্ষণে বেৎনায় আর এক ঘরও তিলী নাই; ম্যালেরিয়া বা মহামারীতে অপর জাতির সংখ্যাও কমিয়া গিয়াছে।

গ্রামের দক্ষিণে কুঠীর মাঠ নামে একটি মাঠ আছে। একটি নীল-কুঠীর ভগ্নাবশেষও তথায় দৃষ্ট হয়। এই কুঠী কোম্পানীর আমলে ইংরেজ নীলকরগণ স্থাপন করেন। কুঠীর মাঠ ভেদ করিয়া একটি জলপ্রবাহ পূর্ব্বমুখে গিয়া হাঁস-খালীর নিকট চূর্ণী নদীতে মিলিয়াছে। অপর মুখ কয়েকটী গ্রামের প্রান্ত দিয়া বহিয়া পশ্চিমে কৃষ্ণনগরের দক্ষিণাংশে অঞ্জনা নাম্নী ক্ষুদ্র নদীতে পড়িয়াছে। অঞ্জনা এক্ষণে স্থিরসলিলা—বিল্ রূপে পরিণত। উক্ত জল প্রবাহও এক্ষণে ভরাট হইয়া গিয়াছে। কেবল বর্ষাকালে তাহার খাদে জল জমিয়া দুই এক মাস মনে পূর্ব্বভাব জাগরূক করে। লোকে এখন ইহাকে ঝোর (নির্ঝর) বলে।

উল্লিখিত জলপ্রবাহের উভয় কূলে পুরাকালে যে কোনও সমৃদ্ধিশালী নগর বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে তাহার প্রচুর প্রমাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখন এখানে কোনও স্তূপ বা প্রস্তর বা প্রস্তরস্তম্ভ দেখা যায় না। নগরটী কতকাল হইল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, ধ্বংসের পর কত মাস, কত বর্ষ, কত শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, কত স্থানে কত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এখন কেবল লোক-বসবাসের নিদর্শনস্বরূপ নির্ঝরের উভয় দিকের মাঠ বহুদূর পর্য্যন্ত পুরাতন 'খোলা খপরায়' সমাচ্ছন্ন। লাঙ্গলের মুখে নানা মৃৎপাত্র, কুম্ভকারের সরঞ্জাম ও অপর গৃহসামগ্রীর ভগ্নাংশ মৃত্তিকামধ্য হইতে উঠিতে দেখা গিয়াছে। ঝোরের দক্ষিণাংশের পাহাড় উচ্চ। বর্ষার জল-স্রোতে ঐ পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়ায় কূপের চিহ্নস্বরূপ উপরি উপরি তিন চারিখানি পাট্ সাজান দেখা গিয়াছে।

ঝোরের উত্তরাংশের মাঠে কৃষকেরা ধান্ নিড়াইবার সময় অনেকে অনেক জিনিস পাইয়াছে। এক জন বড় মটরের আকারের একটি গোলাকার পদার্থ পায়। সে তাহা বাড়ী আনিয়া ধুইয়া দেখে যে, সেটি খাঁটী উজ্জ্বল সোনা—মধ্যে ছিদ্র আছে। সেটী যে নথের ঠোশ্, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্বেত, কৃষ্ণ, গাঢ়-হরিৎ ও ফিকে লোহিতবর্ণের 'তস্‌বীহ-দানা'র * ন্যায় গোলাকার ও লম্বাকৃতি প্রস্তরখণ্ডও অনেক পাওয়া গিয়াছে। আমরা এইরূপ ৫টী পাথর সংগ্রহ

* মুসলমানদিগের জপমালার নাম 'তস্‌বীহ্-দানা'।

করিয়াছি। ঠিক এই ধরণের কতকগুলি পাথর, বর্দ্ধমানের সাহিত্য-সম্মিলনে জনৈক ভদ্রলোক প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেগুলি তিনি কোনও প্রাচীন ধ্বংস-স্তূপ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন।

আর এক জন কৃষক একটি বাদামের আকারের ছোট পাথর পায়। ইহার বর্ণ কমলালেবুর রঙ্গের ন্যায় সুন্দর, এবং ইহার ঔজ্জ্বল্যও আছে। এটীর উপর ফারসী অক্ষরে 'শাহ্ মকবুল আলী' নাম ক্ষোদিত আছে। বাদশাহ ব্যতীত মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে যাঁহারা পরম ধার্ম্মিক, তাঁহারাই শাহ উপাধি পাইয়া থাকেন। সুতরাং এই প্রস্তরখানি যে কোনও মুসলমান সাধু পুরুষের আংটীর পাথর, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই প্রস্তরখানিও আমার নিকট আছে।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, এখানে প্রাচীন কালে একটি বৃহৎ নগর ছিল। কালের গতিতে সে নগরের 'নাম নকৃশা' সকলই ঘুচিয়া গিয়াছে; এখন অতি বৃদ্ধেরাও তাহার অস্তিত্বের কথা বলিতে পারে না। কেহ পিতা পিতামহের মুখে তাহার গল্পও শুনে নাই। ফলতঃ সেই প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরটী যে মুসলমানপ্রধান ছিল, তাহা উক্ত আংটীর পাথর, এবং 'তস্‌বীহ্ দানা'গুলিতেই প্রমাণিত হইতেছে। তদ্ভিন্ন লোকে 'আল্লামাওলা' ও 'মঞ্জিলওলা' নামে ঝোরের দুই পার্শ্বে দুইটী স্থানের নির্দ্দেশ করে। 'আল্লামা' আরবী শব্দ,—অর্থ, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন অতি বিদ্বান্ ব্যক্তি। বোধ হয় কোনও শাস্ত্রজ্ঞ মুসলমান সাধুর বাস হেতু ঐ স্থানের নাম 'আল্লামাওলা' হইয়া থাকিবে। 'আল্লামাওলা'কে লোকে এখন 'আল্লামিঞা-ওলা' বলে। 'মঞ্জিলওলা' সমাধি বা গোরস্থান। এই দুইটী স্থানও মুসলমান-প্রাধান্যের বিশেষ পোষকতা করিতেছে।

যখন মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলিজী নদীয়া জয় করিতে আগমন করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে বহু মুসলমান আসিয়াছিলেন। বখ্‌তিয়ার নদীয়া জয় করিবার পর, স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন তাঁহার সঙ্গী মুসলমানগণ শস্য-শ্যামল বঙ্গরাজ্যে অবস্থান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন; এবং বখ্‌তিয়ারের নির্দ্দেশানুসারে স্থানে স্থানে নগরপত্তন করিয়া, তাঁহারা বসবাস করিয়াছিলেন। এই বেৎনা গ্রামে কুঠীর মাঠের ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরটি তাহাদের অন্যতম হইতে পারে। কৃষ্ণনগরের তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, দে-পাড়া গ্রামের নিকট, নিজামপুর ও বামনপুকুরের নিকট মিঞাপুর গ্রাম দুইটিও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত। নিজামপুর

এখন উৎসন্ন—এই গ্রামের নীচেও পূর্ব্বে জলপ্রবাহ ছিল। জলপ্রবাহের ধারে জঙ্গলের মধ্যে সেই প্রাচীন যুগের একটি বৃহৎ পাকা মস্‌জিদ জীর্ণাবস্থায় ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জমীদার বিপ্রদাস পাল চৌধুরী তাহা ভূমিসাৎ করায়, মুসলমানেরা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিঞাপুরকে হিন্দুরা মায়াপুর বা যাহাই বলুন না কেন, উহা বখ্‌তিয়ারের আমলে স্থাপিত মিঞাপুর ব্যতীত আর কিছুই নহে। এখানে পূর্ব্বে ৩৬০ ঘর মিঞার বসতি ছিল, ইহা আমরা অতিবৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি।

বেৎনা গ্রামের এক মাইলের মধ্যে ইটাবেড়িয়া নামক গ্রামের একটি মাঠে, খননকালে পুরাতন ইট বাহির হইয়াছিল। এক জন কৃষক কতকগুলি ইট তুলিয়া ব্যবহার করিয়াছিল, ইহা আমরা শুনিয়াছি। ইহারই নিকট কুলবেড়িয়া গ্রামের মাঠের কয়েক বিঘা আবাদের ক্ষেতে গৌড়ের ন্যায় পুরাতন ইট ছড়ান আছে, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এই স্থানের চারি দিকে কতকগুলি পুকুরও ছিল; তাহার চিহ্ন এখনও আছে। আমাদের দৃঢ় ধারণা, এই সকল স্থান খনন করিলে, অনেক ঐতিহাসিক সম্পদ আবিষ্কৃত হইতে পারে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের শুভ দৃষ্টি কি সে দিকে পড়িবে না?

বেৎনা গ্রাম কৃষ্ণনগরের পূর্ব্বে তিন মাইলের মধ্যে অবস্থিত। যদি কেহ এ স্থান দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কৃষ্ণনগর—হাঁসখালী রোডের ধারে দক্ষিণপাড়া গ্রামে গেলেই সহজে বেৎনায় পঁহুছিতে পারিবেন।

শান্তিপুর, নদীয়া। মোজাম্মেল হক্‌।

মৌর্য্য-চন্দ্রগুপ্ত।

মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারতীয় সাম্রাজ্য মেঘের প্রাসাদের ন্যায় অচিরকালমধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। গ্রীক লেখক জষ্টিন লিখিয়াছেন, চন্দ্রগুপ্ত (Sandrachotus *) আলেকজণ্ডারের ভারত-পরিত্যাগের পর গ্রীক-বিজিত

---

* অন্ধকার গুহায় আলোক পতিত হইলে তদভ্যন্তরস্থ সমস্ত বস্তু মুহূর্ত্তমধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। তদ্রূপ, গ্রীক সান্দ্রাকোতস্‌ ও ভারতীয় চন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন প্রতিপন্ন হওয়াতে, অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতীয় ঘটনা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের সময় অবলম্বন করিয়া তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও

অংশের অধীনতা-পাশ উন্মোচন করিয়া দেন, কিন্তু অবিলম্বেই এই সকল স্থানের অধিবাসীদের সে স্বাধীনতা দাসত্বে পরিণত করেন। কারণ, তিনি যে সকল ভারতীয়কে বৈদেশিক পরাধীনতা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার নিজের আধিপত্যের অধীন হয়। নীচকুলে এই নরপতির অভ্যুদয় হইয়াছিল, দেবগণের কৃপায় তিনি রাজ্যলাভ করেন। কারণ, তিনি ঔদ্ধত্যবশতঃ আলেকজাণ্ডারের সাতিশয় বিরক্তিভাজন হন। আলেকজাণ্ডার তাঁহাকে বধ করিবার আদেশ দেন। [কি সূত্রে চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারের নিকট ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা জষ্টিন লিপিবদ্ধ করেন নাই। আমরা প্লুটার্কের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, আলেকজাণ্ডার শতদ্রুতীরে আপন ভারতজয়ব্যোম সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কল্প করিলে নবীন যুবক চন্দ্রগুপ্ত (Sandrachotus) তাঁহার সমীপে উপনীত হইয়া বলেন, অগ্রবর্ত্তী দেশে অতি সহজেই আপনার বিজয়পতাকা উড্ডীন হইতে পারিবে। কারণ, এই দেশের অধিপতি দুশ্চরিত্র, এবং অন্ত্যজ জন্মের জন্য প্রজাকুলের সাতিশয় অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র। আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনুমান এই যে, নবীন যুবক যে ভাষায় এই মত পরিব্যক্ত করেন, তাহাই আলেকজণ্ডারের প্রবল বিরক্তির কারণ হইয়াছিল।] চন্দ্রগুপ্তের বধের জন্য আদেশ প্রদত্ত হইলে, তিনি পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করেন। এই পলায়নকালে একদিন তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ শয়ন করেন। তৎকালে একটী বৃহদাকার ব্যাঘ্র সে স্থানে উপস্থিত হয়, এবং তাঁহার শরীরের ঘর্ম্ম লেহন করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাঁহাকে কোনও প্রকার আঘাত না করিয়াই চলিয়া যায়। এই অদ্ভুত ব্যাপারে তাঁহার হৃদয়ে দুরাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। তিনি দস্যুদল সংগ্রহ করিয়া ভারতীয়দিগকে সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারসাধন জন্য প্রবুদ্ধ করেন। অতঃপর আলেকজাণ্ডারের সেনাপতিদের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। চন্দ্রগুপ্ত একটি বৃহৎ বলশালী হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অগ্রবর্ত্তী হন, এবং খ্যাতিলাভ করেন। এই ভাবে ক্ষমতা লাভ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক অধিপতি সেলুকাসের সমসময়ে রাজত্ব করেন। গ্রীক-লিখিত বিবরণে চন্দ্রগুপ্তের যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে, তাহা প্রদত্ত হইল।

চন্দ্রগুপ্ত মগধের অধিপতি ছিলেন; তিনি ভূপ্রথিত সম্রাট, তাঁহার কীর্ত্তি-

---

পরবর্ত্তী অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার দুরত্ব পরিমাণসাধ্য হইয়াছে, এবং গ্রীক বিবরণের সহিত ভারতীয় বিবরণের সামঞ্জস্যবিধানের উপায় হইয়াছে। বস্তুতঃ, চন্দ্রগুপ্তের গ্রীক-লিখিত সময় অবলম্বন করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলী অনেক রাজার ও ঘটনার কালনির্ণয় করিয়াছেন।

কলাপ ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার প্রথম জীবনের ঘটনাবলী বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা এই বিবরণ বিশদ করিবার জন্য তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নন্দ-বংশের বিবরণের উল্লেখ করিতেছি। মহারাজ নন্দ শূদ্রা রাণীর গর্ভজাত ছিলেন। তিনি পরাক্রমশালী অধিপতি ছিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুরতা ও দুরাকাঙ্ক্ষাই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। মহারাজ নন্দ শূদ্রা রাণীর গর্ভজাত বলিয়া আর্য্যশাস্ত্রানুসারে নিজেও শূদ্র ছিলেন, ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রথমা রাণীর গর্ভে আট পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই আট পুত্র ও মহারাজ নন্দ 'নব নন্দ' নামে খ্যাত হন। মহারাজ নন্দের দ্বিতীয়া রাণী মুরা শূদ্র অপেক্ষাও অধম কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার গর্ভে চন্দ্রগুপ্ত নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। পুরাণশাস্ত্রে রাণী মুরার নাম নাই, চন্দ্রগুপ্ত যে মহারাজ নন্দের পুত্র ছিলেন, তৎসম্বন্ধেও কোনও উল্লেখ নাই। মুদ্রারাক্ষস নামক নাটকে চন্দ্রগুপ্তকে নন্দবংশজাত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি যে নন্দের পুত্র, তৎসম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই। পুরাণশাস্ত্রে ও মুদ্রারাক্ষসে ঐরূপ নির্দ্দেশ না থাকিলেও, আমরা বিষ্ণুপুরাণের টীকার উপর নির্ভর করিতেছি। বিষ্ণুপুরাণে চন্দ্রগুপ্তকে মৌর্য্য-বংশের প্রথম-পুরুষরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই অংশের টীকায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, চন্দ্রগুপ্তের মাতার নাম হইতে তদীয় বংশের মৌর্য্য নামকরণ হইয়াছিল; তাঁহার মাতার নাম মুরা, তিনি মহারাজ নন্দের অন্যতম মহিষী ছিলেন।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের উদ্ভব যে রূপেই হইয়া থাকুক, ইহা নিশ্চিত যে, তিনি চাণক্য কৌটিল্য নামক ব্রাহ্মণের সাহায্যে নন্দ-বংশের ধ্বংসসাধন করিয়া রাজপদ লাভ করেন। এই রাজ্যলাভকালে উত্তর-ভারতের জনৈক রাজা তাঁহাদিগের সহায়তা করেন। মিত্রদ্বয় তাঁহাকে রাজ্যের কিয়দংশ প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কার্য্যউদ্ধারের পর সন্ধি ভঙ্গ করিলেন, এবং সমস্ত দাবীর নিরসন জন্য রাজাকে হত্যা করেন। ইহাতে নিহত রাজার পুত্র মলয়কেতু কুপিত হইয়া প্রতিশোধ লইবার মানসে গ্রীক ও অন্যান্য সৈন্যের সহায়তায় বিপুলবিক্রমে মগধ রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু শত্রুর কৌশলে সম্মিলিত সেনার মধ্যে ঈর্ষা ও কলহ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। তখন মলয়কেতু ভগ্নচিত্তে হীনতাস্বীকারপূর্ব্বক প্রস্থান করেন।

প্রাগুক্ত বিবরণ পাঠ করিলে, আমাদের মনে দুইটী প্রশ্ন উপস্থিত হয়।

প্রথম, কি জন্য চন্দ্রগুপ্ত সুদূর পঞ্জাবে আলেকজাণ্ডারের নিকট উপস্থিত হইয়া স্ববংশের ধ্বংসসাধন করিয়া মগধ রাজ্য হস্তগত করিবার জন্য তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন? দ্বিতীয়, কি জন্য চাণক্য কৌটিল্য ব্রাহ্মণকুলসুলভ তপশ্চরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজনীতিক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া নন্দবংশের ধ্বংসসাধন জন্য চন্দ্রগুপ্তের সহায়তা করিয়াছিলেন?

আমরা এই দুই প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। কিন্তু এতৎসম্বন্ধীয় উত্তর ইতিহাসসম্মত প্রামাণিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর নহে। জনপ্রবাদমূলক গ্রন্থলিখিত বিবরণের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। আমরা বৃহৎকথা, দক্ষিণাপথের একখানি অমুদ্রিত পুঁথি * এবং মহাবংশে লিখিত বিবরণ অবলম্বনে আমাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিব। এই তিন গ্রন্থের বিবরণে অনেক অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলেও, বৃহৎকথা ও দক্ষিণাপথের পুঁথির বিবরণ মূলতঃ এক। মহাবংশ-ধৃত চাণক্যের বিবরণ মূলতঃ ঐ দুই গ্রন্থের অনুগামী, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের বিবরণের মূলকথা অন্যরূপ। আমরা পরস্পরবিরোধী বৃত্তান্ত সকলের সামঞ্জস্যবিধান করিয়া এইরূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারি যে, চন্দ্রগুপ্ত মহারাজ নন্দের দ্বিতীয়া রাণীর পুত্র ছিলেন; বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের উৎপীড়ন সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদের ধ্বংসসাধন জন্য কৃতসংকল্প হন, এবং চাণক্য অতিশয় অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া তাহার প্রতিশোধ লইবার মানসে তদীয় উত্তরসাধকরূপে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন। চাণক্যের অবমাননা ও লাঞ্ছনার কারণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি অসাধারণ ধীশক্তিশালী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের অভাব ছিল। একদা চাণক্য রাজপ্রসাদ-আকাঙ্ক্ষায় রাজসভায় গমন করিয়া উচ্চ আসনে উপবেশন করেন। এই সময় রাজা তথায় প্রবেশ পূর্ব্বক গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ তাঁহাকে কদাকার দেখিয়া অপ্রীত হন, এবং তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। অতঃপর তিনি চাণক্যকে কটুবাক্যে তিরস্কার করিয়া রাজসভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। চাণক্য এই ভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠেন, এবং মস্তকস্থিত শিখার বন্ধন উন্মোচন করিয়া শপথ করেন,—"উদ্ধত ও মূর্খ নন্দবংশের ধ্বংস করিব, আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত এই শিখা আর বন্ধন করিব না।"

অসাধারণ কূটনীতিবিশারদ চাণক্যের এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার

* Hindu Theatre নামক পুস্তকে ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকট সাধনায় নন্দবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। চন্দ্রগুপ্ত মগধ সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়া মৌর্য্য উপাধি গ্রহণ করেন। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকারের মতে, চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরা হইতে মৌর্য্য উপাধি নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বোক্ত হস্তলিখিত পুঁথিতে মুরা ও চন্দ্রগুপ্তের কথা অন্য আকারে প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা এখানে সে বিবরণ প্রদান করিতেছি।

মহারাজ নন্দের দুই মহিষী ছিলেন। প্রথমা মহিষীর নাম ছিল সুনন্দা, দ্বিতীয়ার নাম ছিল মুরা। মুরা শূদ্রকুলজাতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দেহকান্তি মনোহর ও চরিত্র মধুর ছিল। একদা মহারাজ নন্দ মহিষীদ্বয় সহ মিলিত হইয়া এক জন সাধু সন্ন্যাসীর সেবা করেন। মহারাজ নন্দ সাধুর পদ-প্রক্ষালন করিয়া সেই জল মহিষীদ্বয়ের গাত্রে ছিটাইয়া দেন। ইহার নয় ফোঁটা প্রথমা রাণীর কপালে, এবং এক ফোঁটা দ্বিতীয়া রাণীর কপালে পতিত হয়। মুরা এই জলবিন্দু অতি শ্রদ্ধাসহকারে দেহে লিপ্ত করেন। তাঁহার ব্যবহারে সন্ন্যাসী প্রীত হন। অতঃপর মুরার গর্ভে এক গুণবান পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ঐ পুত্র মৌর্য্য নামে খ্যাত হন। প্রথমা মহিষী একটী মাংসপিণ্ড প্রসব করেন। প্রধান মন্ত্রী রাক্ষস ঐ মাংসপিণ্ড নয় খণ্ডে বিভক্ত করিয়া একটি তৈলপাত্রে রাখিয়া দেন; এবং তাহা হইতে নয় পুত্র উদ্ভূত হয়। রাজা বৃদ্ধ বয়সে এই নয় পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তৎকালে মৌর্য্য সৈনাপত্য প্রাপ্ত হন। মৌর্য্যের শত পুত্র ছিল। তাঁহার এক পুত্রের নাম চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্ত অসাধারণ গুণশালী ছিলেন। এই কারণ নব-নন্দ ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগকে হত্যা করেন, কেবল চন্দ্রগুপ্তের প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই। এমন সময়ে সিংহল দেশের রাজার নিকট হইতে একটি পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ আগত হয়। এই সিংহ মোমে নির্ম্মিত ছিল। কিন্তু নির্ম্মাণকৌশলে তাহাকে জীবন্ত বলিয়া বোধ হইতেছিল। সিংহলদেশীয় রাজা লিখিয়াছিলেন,—যদি আপনার কোনও পারিষদ পিঞ্জরের মুখ না খুলিয়া সিংহকে দৌড় করাইতে পারেন, তবে তাঁহাকে আমি তীক্ষ্ণধী বলিয়া স্বীকার করিব। নব-নন্দ স্থূলবুদ্ধি-বশতঃ এই লিপির মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে অসমর্থ হইলেন। তখন আসন্নমৃত্যু চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন,—আমার জীবন রক্ষা করিলে এই কাজ করিতে পারি। নব-নন্দ সম্মত হইলে তিনি একটি লৌহশলাকা উত্তপ্ত করিয়া, তদ্দ্বারা সিংহের গাত্র স্পর্শ করিলেন। অচিরে মোমনির্ম্মিত সিংহ গলিয়া গেল।

নবনন্দ তাঁহাকে প্রাণদান করিলেন। অতঃপর চন্দ্রগুপ্ত একদিন এক জন ব্রাহ্মণের দর্শনলাভ করেন। ব্রাহ্মণ তৎকালে বলপূর্ব্বক কুশস্তম্বের উচ্ছেদ করিতেছিলেন, কারণ কুশাগ্রে তাঁহার পদতল ক্ষত হইয়াছিল। এই সময় হইতে উভয়ের মধ্যে সৌহৃদ্য জন্মে। এই ব্রাহ্মণের নাম ছিল বিষ্ণুগুপ্ত। তাঁহার পিতার নাম ছিল চাণক। এ জন্য তিনি চাণক্য নামে পরিচিত ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যের মধ্যে সৌহৃদ্য স্থাপিত হইবার পর, চাণক্য নবনন্দের হস্তে পূর্ব্ববর্ণিতরূপ দারুণ লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করেন। ইহার ফলে তাঁহাদের সৌহৃদ্য প্রগাঢ় হয়। দুই জনে সাধনা করিয়া নন্দবংশের ধ্বংস-সাধন করেন।

বিষ্ণুপুরাণের টীকার সহিত উক্ত বিবরণের অনৈক্য থাকিলেও, মহারাজ নন্দের দ্বিতীয়া মহিষী মুরা হইতে মৌর্য্য-বংশের উদ্ভব লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মহাবংশে অন্যরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

কপিলবাস্তুর শাক্য-রাজ্য শত্রুর আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, কতিপয় শাক্য সামন্ত হিমালয়ের কোনও বিজন প্রদেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তথায় অবস্থান-পূর্ব্বক তাঁহারা এক সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করিয়া এক নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। দূর হইতে শাক্য জাতির এই নবনির্ম্মিত রাজ্য বিচিত্র ময়ূরসদৃশ মনোভিরাম ছিল বলিয়া লোকে ইহাকে ময়ূর-নগর নামে অভিহিত করে। ময়ূরনগরবাসী শাক্য জাতি মোরিয়া বা মৌর্য্য নামে সমগ্র জম্বুদ্বীপে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। কিন্তু কালক্রমে মৌর্য্য জাতির ভাগ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা হইলেন। কোনও এক প্রবল পরাক্রমশালী নরপতি ময়ূরনগরের সমৃদ্ধির বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অগণিত সেনা সহ উক্ত রাজ্য আক্রমণ করিলেন, এবং সেই যুদ্ধে বহুসংখ্যক মৌর্য্য নিহত হইলেন। এই সময় মৌর্য্য রাজমহিষী গর্ভবতী ছিলেন। গর্ভস্থ সন্তানের রক্ষার নিমিত্ত তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কৌশলক্রমে তাঁহারা ময়ূরনগর হইতে পলায়নপূর্ব্বক পুষ্পপুরে (পাটলিপুত্রে) আগমন করিলেন, এবং তথায় অবস্থান করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে রাজমহিষী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। পাছে মৌর্য্যরাজ-বংশধর জীবিত আছে জানিয়া বিপক্ষদল পুত্রের প্রাণসংহার করে, এই আশঙ্কায় মহিষী পুত্রকে একটি পাত্রে রক্ষাপূর্ব্বক জনৈক রাখালের গোশালার দ্বারে গোপনে রাখিয়া দিলেন। শিশুর রোদন শ্রবণ করিয়া রাখাল উক্ত স্থানে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহার সুন্দর রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া স্নেহরসে আপ্লুত হইল। সে

শিশুকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিল, এবং যথাসময়ে বালকের নাম চন্দ্রগুপ্ত রাখিল। * চন্দ্রগুপ্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া চাণক্যের দৃষ্টিপথে পতিত হন। তৎকালে তিনি নন্দবংশের ধ্বংসসাধনে ব্রতী ছিলেন, এবং তজ্জন্য এক জন উপযুক্ত রাজকুমারের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইলেন। তাঁহার ললাটে রাজটীকা প্রদত্ত হইল।

এই সকল বিভিন্ন বিবরণের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণের টীকাই গ্রাহ্য। একাধিক বিবরণে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশজাত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। কোনও বিবরণেই আলেকজাণ্ডারের সহিত চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাতের বিবরণ বা আভাস প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু ইহার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। চন্দ্রগুপ্তকে নন্দবংশ-জাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেই, তাঁহার মগধরাজ্য-জয় জন্য আলেকজাণ্ডারকে উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ, চন্দ্রগুপ্ত বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের নির্য্যাতন-মানসেই ঐরূপ করেন।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সাহায্যে রাজপদ লাভ করিয়া প্রবলপ্রতাপে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি মগধ সাম্রাজ্যের সঙ্গে বিপুল সৈন্য-বলেরও অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে এই সৈন্যবল সমধিক বৃদ্ধি পায়। চন্দ্রগুপ্তের ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, নয় হাজার হস্তী, ছয় লক্ষ পদাতিক ও এবং বহুসংখ্যক রথ ছিল। এই বিপুল সৈন্যের সাহায্যে চন্দ্র-গুপ্ত নর্ম্মদার তীরদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উত্তর-ভারতে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করেন; দেশের পর দেশ তাঁহার করায়ত্ত,—পদানত হয়। ঐতিহাসিক কালে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম সার্ব্বভৌম সম্রাট্। তাঁহার বিজয়িনী শক্তির মহিমায় বঙ্গ-উপসাগর হইতে আরব সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল ভূখণ্ড এক সূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল।

যে সময় চন্দ্রগুপ্ত তদীয় অকৃত্রিম সুহৃৎ চাণক্য কৌটিল্যের সহায়তায় ভারত-সাম্রাজ্য গঠন জন্য মহাসাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ধীরে ধীরে এক জন গ্রীক-বীর পশ্চিম ও মধ্য-এসিয়ায় এক অভিনব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া শক্তিসঞ্চয় করেন, এবং ভারতবর্ষস্থ নষ্ট গ্রীক অধিকার উদ্ধারসাধন জন্য প্রস্তুত হন।

এই বীরপুরুষের নাম সিলুকাস নিকাটর। নিকাটর শব্দের অর্থ—বিজেতা। মহাবীর আলেকজাণ্ডার পরলোকগত হইলে, তাঁহার সুবিশাল সাম্রা-

---

* চারুবাবুর 'অশোক' হইতে গৃহীত।

জ্যের অধিকার লইয়া গ্রীক সেনাপতিবৃন্দের মধ্যে ঘোর আত্মদ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময় এসিয়ায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য দুই জন গ্রীকবীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিলেন। এক জনের নাম এণ্টিগোনাস; অপর জনের নাম সেলুকাস। উভয় পক্ষের বহু ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর অবশেষে সৌভাগ্যলক্ষ্মী এণ্টিগোনাসের প্রতি প্রসন্ন হন। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীর সমস্ত ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। কিন্তু সেলুকাস কতিপয় বৎসরের মধ্যেই পুনর্ব্বার শক্তিশালী হইয়া উঠেন, এবং অচিরে ব্যবিলনে আধিপত্য স্থাপন করেন। সেলুকাস নিকাটর সিরিয়ার নরপতি বলিয়া বিদিত ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমগ্র পশ্চিম ও মধ্য এসিয়ায় তাঁহার বিজয়-লব্ধ আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। তদীয় রাজ্যের পূর্ব্ব দিকে ভারত-সীমা বিস্তৃত ছিল। এই কারণ তিনি স্বভাবতঃই ভারতবর্ষের অধিকারলাভে লোলুপ ছিলেন। তিনি ৩০৫ খৃঃ পূঃ অব্দে বিপুল বাহিনী সহ সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হন। তিনি স্বীয় প্রভু আলেকজাণ্ডারের ন্যায় যুদ্ধের পর যুদ্ধে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া, বিজয়গৌরবে দ্রুতগতিতে ভারতবক্ষ বিমর্দ্দিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার মহাবীর্য্যশালী চন্দ্রগুপ্তের অলোকসামান্য বাহুবলে গ্রীক সৈন্যের পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছিল। সে কণ্টকে আহত হইয়া তাহারা বলশূন্য হইয়া পড়ে। গ্রীক নায়ক সেলুকাস অকীর্ত্তিকর সন্ধি স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করেন। এই সন্ধি অনুসারে গ্রীকরাজ-দুহিতা চন্দ্রগুপ্তের সহিত পরিণীতা হন। বর্ত্তমান হিরাট, কাবুল, কান্দাহার প্রভৃতি স্থান তাঁহার হস্তগত হয়। চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য ও রাজদুহিতার বিনিময়ে গ্রীক অধিপতিকে পাঁচ শত রণহস্তী উপঢৌকন দেন। এই সময় হইতে মেগাস্থিনিস গ্রীকদূত-রূপে চন্দ্রগুপ্তের সভায় অবস্থিতি করেন। সেলুকাসের ভারত হইতে প্রস্থানের পর চন্দ্রগুপ্ত ছয় বৎসর জীবিত ছিলেন। সেলুকাসের ভারত-অভিযানের পূর্ব্বে তিনি বার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ফলতঃ, তাঁহার রাজত্ব অষ্টাদশ বৎসর কাল স্থায়ী ছিল। এই সময়ের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত প্রবল উৎসাহ, অটল অধ্যবসায়, ধীরতা ও রণকৌশলের বলে পঞ্জাব ও সিন্ধু দেশ হইতে গ্রীক সৈন্যের উচ্ছেদসাধন করেন; সেলুকাসের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন, এবং বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড স্বাধিকার-ভুক্ত করেন। চন্দ্রগুপ্ত আপন অলোকসামান্য অবদানে পৃথিবীর রাজন্যকুলে বরেণ্য হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমরত্ব লাভ করিয়াছে। এরূপ সুবিশাল সাম্রাজ্যের শাসন সংরক্ষণ

জন্য যে তীক্ষ্ণ রাজনীতিজ্ঞতা, কঠোর তেজস্বিতা ও বিপুল শ্রমশক্তি আবশ্যক; চন্দ্রগুপ্ত সেই সকল সম্পদের অধিকারী ছিলেন।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে চন্দ্রগুপ্তের শাসনবিবরণ মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা'য় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহার দরবারে অবস্থিত গ্রীকরাজদূত মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণে আমরা চন্দ্রগুপ্তের মানসিক সম্পদ ও রাজবৈভবের চিত্র দেখিতে পাইতেছি।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

বিক্রমপুর। এই সংখ্যার প্রথমেই লর্ড রণাল্ডশের একখানি ছবি আছে! 'মঙ্গলাচরণ' একটি পদ্য। ইহার বিশেষত্ব এই যে, প্রসিদ্ধ যোগী শ্রীসোহহং স্বামী ইহার রচয়িতা। সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীর মনেও দেশের ছবি জাগিয়া আছে! 'তত্তস্ত কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ঃ' দেশের পক্ষেও খাটে। শ্রীসোহহং স্বামীর 'স্মার্ত্তের বৈধব্যবিধান' আমরা বাঙ্গালীকে মন দিয়া পড়িতে বলি। সোহহং স্বামী স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছেন। পায়রার খোপে ভাম ঢুকিলে যেমন হয়, সেইরূপ অনেক ঝট্‌-পট্‌ শব্দ শুনিতে পাইব। শ্রীমুকুলচন্দ্র দের 'জাপানের কথা' অত্যন্ত উপভোগ্য! ইনি 'কথ্য ভাষা'র চরমে উঠিয়াছেন। 'মিঃ হারার প্রকাণ্ড হাবেলীর ভেতর আমরা ডেরা-ডাণ্ডা ফেলে গ্যট্‌ হয়ে বসে গেছি।' তাহার পরেই—'এ একটা কাটের "প্রবন্দসৌধছবি" অথচ রঙ্গীন রঙ্গমহল।' আবার, বিস্তর দাসদাসী—সবাই তটস্থ, এক পায়ে আটপহর খাঁড়া।' 'খাঁড়া' বোধ হয় 'খাড়া'। 'কিছু চাইতে হয় না, আবশ্যকীয় আসবাব পত্র আপনি এসে হাজির।' এখন প্রশ্ন এই যে, 'দরকারী'কে নির্ব্বাসিত করিয়া, 'আবশ্যক'কে ধরিয়া আনিয়া, তাহার ঘাড়ে একটা 'ঈয়'-রূপ সঙ্গীন চড়াইয়া দিবার কারণ কি? সংস্কৃত 'আবশ্যক'কে জব্দ করিবার হেতু কি? 'এক ঢিলে দুই পাখী মারা'ই কি ইহার উদ্দেশ্য? মুকুল-চন্দ্রের রচনায় অনেক নূতন শব্দ আছে—'মনটা বিলক্ষণ "তরতাজা" হ'য়ে উঠেছে।' 'চার' থাকিতে 'চারি' কেন? মুকুলচন্দ্র জাপানের ছবি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'ছবিটাকে দুচারি "আঁচর" কেটে দিব্যি ফুটিয়ে তোলে। আর আমাদের কলিকাতার ছবি—জাপানের তুলনায় নেহাৎ ছেলেখেলা জড়ভরত গোছের।' অবনীন্দ্রনাথের ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির ছবিগুলিই ইহার লক্ষ্য! গুরু-মারা বিদ্যা বটে। মুকুল লিখিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ 'এমনই দয়া করে কাছে টেনে নিয়েছেন, তাই গুরুদেবকে পাওয়ার মত পেয়েছি। আমার জীবন ধন্য হয়ে গেছে।' এখন মাথাটা ঠিক থাকিলে হয়। শ্রীকুলচন্দ্র দে 'স্বাগত' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বন্দনা করিয়াছেন; নমুনা—'ধন্য পেলব পল্লীবাট!' সুকুমার, সুকোমল 'পেলব' শব্দটি মাঠে নয়, বাটে মারা গেল। কালিদাস শিরীষের বিশেষণে 'পেলব' ব্যবহার করিয়াছিলেন—

'পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ।'

এক দিন প্রমথ চৌধুরী [এখন সবুজ পত্রের চাষী] বলিয়াছিলেন, সেকালে সংস্কৃত শব্দের অর্থে যে shadeর প্রভেদ ছিল, এখন আমরা তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি। কোমল ও পেলব, উভয় শব্দই এখন কোমল অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কালিদাস যদি লিখিতেন, 'পদং সহেত ভ্রমরস্য কোমলং', তাহা হইলেও ছন্দ থাকিত। কালিদাসের রচনায় অপ্রচলিত শব্দ নাই বলিলেও চলে। অথচ তিনি পেলব অপেক্ষা অধিক প্রচলিত ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট কোমল শব্দ পরিত্যাগ করিয়া শিরীষের বিশেষণে 'পেলব' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। হয় ত যাহা কোমলতম, তাহাই পেলব। শিরীষ এত সুকুমার যে, 'কোমলে' তাহার কোমলতা ব্যক্ত হয় না। হয় ত তাই তিনি পেলব ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পেলব আজ 'বাটে'র বিশেষণে ব্যবহৃত হইল। 'অপরং বা কি ভবিষ্যতি!' শুনিয়াছি, এক কিশোরী 'সীতার বনবাস' পড়িয়া স্বামীকে 'অঞ্জনাহৃদয়নন্দন' বলিয়া চিঠি লিখিয়াছিল। তার পর 'মুক্তাখচিত মুক্ত মাঠ।' 'মুক্তা'র সঙ্গে 'মুক্ত'র বেশ অনুপ্রাস হইয়া গিয়াছে। কবি কল্পনার মাঠে মুক্তা ছড়াইয়া দিয়াছেন, মালা ছিঁড়িয়া কি না, বলিতে পারি না। 'মুঞ্জি উঠিল বাণীর কুঞ্জ'—মুঞ্জি কি, তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না। তিনি রবি বাবুর একটি বিশেষণ দিয়াছেন,—'গীরথ!' অর্থাৎ, গীঃ অর্থাৎ বাণীই যাঁর রথ। ইহা অপ্রস্তুত-প্রশংসা। বাক্যই রবিবাবুর রথ নয়। তিনি অনেক ভাবের চৌঘুড়ী হাঁকাইয়াছেন। তার পর 'সর্ব্ব শেষের'র বাহারটুকু পাঠককে উপহার দি—'কানাড়ার ডাকে নাহি দিলে কান।' এই অনুপ্রাস-সৃষ্টির বাহাদুরী কাহার? কবির? না, কানাড়ার ডাকার? 'মনের বাঘ' গল্পটির নাম অন্বর্থ হইয়াছে। 'খেওয়া ঘাটে' শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর একটি কবিতা। রবি বাবু বলেন, 'খেয়া'। ইনি বলিতেছেন, 'খেওয়া'। সমগ্র কবিতার মধ্যে ইহাতেই নূতনত্ব দেখিলাম। শ্রীনিবারণচন্দ্র মজুমদারের 'লতাকস্তুরী' নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। লেখক বলেন,—'লতাকস্তুরীর চাষও পাট অপেক্ষা কম মূল্যবান হইবে বলিয়া মনে হয় না।' ঠিক পাটের মতই ইহার চাষ করিতে হয়। অভিজ্ঞগণ পরীক্ষা করুন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন 'কালবৈশাখী'তে প্রশ্ন করিয়াছেন, 'কি সুরে আজ সুরু করি পাগলা হাওয়ার গান?' প্রশ্নের উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই তিনি উপযোগী সুরটি জমাইয়া তুলিয়াছেন। শ্রীপদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের 'কাছাড়ের বিক্রমপুর' সুখপাঠ্য। কাছাড়ে একটি বিক্রমপুর আছে। লেখক সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত 'গোধূলির তারা'য় লিখিয়াছেন, কোনও বিরহিণী নারী

'নিতি সাঁঝে জ্বালি দীপ পথ চেয়ে রয়
দয়িত আসিবে কবে?'

সন্ধ্যা-তারাটি সেই দীপ! ছায়াপথ দিয়া বাইক চড়িয়া দয়িত আসেন কি না, তাহা অপ্রকাশ। sublimeকে ridiculous করিলে মন্দ কবিতা হয় না!

উদ্বোধন। বৈশাখ।—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মাইতির 'সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়' প্রবন্ধ পাঁচ ফুলের সাজি। ইহার মূল বক্তব্য খুঁজিয়া পাইলাম না। শ্রীপ্রিয়ংবদা দেবীর 'বৈকালী' কালীর চরণে নিবেদিত। প্রত্যাবর্ত্তন? এ ধরণের কবিতা প্রিয়ংবদা বোধ হয় পূর্ব্বে লেখেন নাই। 'শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ'

প্রবন্ধে স্বামীজীর অনেকগুলি গল্প আছে। 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের মেমোরিয়াল' প্রবন্ধে 'মেমোরিয়াল' ও লর্ড কারমাইকেলের পত্র মুদ্রিত হইয়াছে। লর্ড কারমাইকেলের পত্র হইতে আমরা একটু উদ্ধৃত করিলাম—

'বিগত ডিসেম্বরের দরবারে মিশন সম্বন্ধে আমার কয়েকটি কথা যে কোনরূপে তাহার সঙ্কোচ-জনিত ক্ষতির কারণ হইয়াছে, ইহা শুনিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম। মিশন ও মিশনের সভ্যগণের উপর অভিযোগ আনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না; * * আমি জানি, মিশনের কাজ সম্পূর্ণরূপে রাজনীতিক-অভিপ্রায়-শূন্য, এবং ইহার জনসমাজের সেবাকার্য্য সম্বন্ধে আমি ভাল ছাড়া আর কিছুই শুনি নাই।

'প্রকৃত রামকৃষ্ণ মিশনের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহার সহিত আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে।'"

সন্দেশ। বৈশাখ।—'সন্দেশ' পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল। চারি কোটী বাঙ্গালীর বাসভূমি বাঙ্গালায় শিশুপাঠ্য সাহিত্যে 'সন্দেশ' ভিন্ন আর কোনও মাসিক নাই। 'সন্দেশ' আমাদের 'সবে ধন নীলমণি'। সন্দেশ চিরজীবী হউক। এই সংখ্যায় দেখিতেছি, শ্রীসুকুমার রায় 'সন্দেশে'র সম্পাদক হইয়াছেন। আশা করি, তাঁহার চেষ্টায় 'সন্দেশ' আরও উৎকর্ষ লাভ করিবে। এই সংখ্যার প্রথমেই যে ছবিখানি আছে, তাহার কল্পনা ও ছাপা, দুই-ই সুন্দর। স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের 'গ্রীষ্মের গান' শিশুদের উপযোগী। 'এক বছরের রাজা' নামক গল্পটি চলনসই। শ্রীকুলদারঞ্জন রায় মার্কণ্ডের পুরাণ হইতে 'অবীক্ষিতে'র গল্পটি শিশু পাঠকদের উপহার দিয়াছেন। শ্রীসুবিনয় রায়ের 'নুনের কথা' বেশ হইয়াছে। 'গ্যালিলিও' উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'কাঁকড়া' পড়িয়া 'সন্দেশে'র পাঠকগণ আনন্দের সহিত শিক্ষা লাভ করিবে। অল্পবয়স্ক পাঠকদের জন্য উপেন্দ্র বাবু সহজ ভাষায় গল্পের মত চিত্তাকর্ষক করিয়া বৈজ্ঞানিক বিষয় লিখিতে পারিতেন। এ বিষয়ে তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালীর উত্তরপুরুষের জন্য তিনি সাহিত্যে যাহা করিয়া গিয়াছেন, সে জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। শিশু সাহিত্যের সমৃদ্ধিবিধানেই তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাহাদের জন্য লেখা, তাহাদের জন্য আঁকাই তাঁহার ব্রত ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে শিশু-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। রায়-পরিবারের অনেকেই তাঁহার পথের পথিক হইয়াছেন। আশার কথা বটে। 'চীনে পট্‌কা' নামক গল্পটি পড়িয়া ছেলে মেয়েরা খুব হাসিবে। 'ঘোড়ার জন্ম' আর একটি উপাদেয় বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ। আশা করি, বাঙ্গালা দেশে 'সন্দেশ' উপযুক্ত সমাদর লাভ করিবে।

উপাসনা। বৈশাখ।—এই সংখ্যার উপাসনার শীর্ষে ছাপা হইয়াছে,—'Under the distinguished patronage of the Hon'ble Maharaja Sir Manindra Chandra Nandy K. C. I. E.'—মহারাজের নাম যখন ছাপা হইল, তখন 'উপাসনা' যেন তাঁহার নামের উপযুক্ত হয়। শ্রীনলিনীকুমার চক্রবর্ত্তীর 'নববর্ষ' নামক কবিতাটি কোন গুণে 'উপাসনা'র সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিল? নববর্ষ 'দ্যুলোকের রাণী এসেছে ভূলোকে'—এ তত্ত্ব অবশ্য নূতন। মলাটে আছে,—'সম্পাদক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্. এ. প্রেমর্চাদ রায়চাঁদ স্কলার!' শুধু রায়চাঁদ হইলে কোনও কথা ছিল না, কিন্তু প্রেমচাঁদ এমন কবিতা-কাণা হইতে পারে, তাহা জানিতাম না। 'প্রাপ্তিমাত্রেণ' উপাসনার কবিতা ছাপা হয়। সম্পাদক

এক জন সমালোচক, সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে সমীক্ষা ও পরীক্ষা করিয়া বেড়ান। নিজের কাগজে কাণা খোঁড়া হাবা বোবা কবিতার হাট বসাইতে তাঁহার লজ্জা হয় না? শ্রীবিনয়কুমার সরকারের 'ইংলিস্থানের মহাপশ্চিম প্রদেশ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'তারি' অত্যন্ত কাঁচা রচনা। 'সমাজ প্রসঙ্গে' শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজে সদাচারের সমর্থন করিয়াছেন। হিন্দুরা তাঁহার সমর্থন করিবে। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'অমূল্য জীবন' নামক কবিতাটির ভাব নূতন। ষষ্ঠ ও শেষ চরণে যতিভঙ্গ হইয়াছে। 'বসুন্ধরার জীবনকথা' চলিতেছে। 'কালী'দাস রায়ের 'কবির জাতি' ও 'চাতক' 'পাকা ঘুঁটী কাঁচাইবার' উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'সিদ্ধেশ্বর মাষ্টার' একটি চলনসই গল্প। 'বিশ্ববাণী' প্রবন্ধে নব্য বাঙ্গালীর উচ্ছ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত 'কোটেশনে'র প্রতি বড় নির্দ্দয়! 'নান্য পন্থা' হইতে দুইটি বিসর্গ কোথায় ফেলিয়া দিয়াছেন! তার পর, 'মা হিংস নীতি'! রবীন্দ্রনাথ জাপানীদিগকে বলিয়াছিলেন, 'তোমরা ইউরোপের সভ্যতায় মজিও না।' 'আজ ইউরোপ ভাল করিয়াই প্রমাণ করিতেছে,—' তাহাদের এত সাধের সভ্যতা পূর্ণমাত্রায় বিফল হইয়াছে।' কলিক তার 'অক্সফোর্ড মিশন' নামক খৃষ্টান-মণ্ডলী হইতে প্রকাশিত 'এপিফেনী' নামক পত্রে এক জন লেখক 'রবি বাবুর এই বক্তৃতা পড়িয়া' 'কয়েকটি সারালো ও ধারালো কথার অবতারণা করিয়াছেন।' অতুল বাবু তাঁহার সারসংগ্রহ ও সমর্থন করিয়াছেন। 'এপিফেনী'র লেখক বলিতেছেন,—

'মানিলাম ইয়ুরোপীয় সভ্যতা বিফল হইয়াছে; মানিলাম ইয়ুরোপীয়রা দেশপ্রেমের নাম দিয়া পিশাচ-লীলা করিতেছে * * মানুষের কায়িক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চরমব্যবস্থা করিয়াও বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় ও মার্কিন সভ্যতা যে আসলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে, তা আমরা একশোবার স্বীকার করিতেছি। সভ্যতার বিফলতা বুঝিতে যদি এই ধরি যে, মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ অনুসারে জীবন-ধারণ হইতেছে না; জাতিতে জাতিতে সদ্ভাবে থাকিয়া মহামানবের চরমবিকাশের সহায়তা হইতেছে না; জাতির মধ্যে শ্রেণী, দল ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরে পরস্পরের সুখ-সুবিধার মুখ চাহিতেছে না; তাহা হইলে অস্বীকার করা যায় না যে বর্ত্তমান প্রতীচ্য সভ্যতা বিফল হইয়াছে। * * * কবি রবীন্দ্রনাথ ভাববাজ্যের এক জন নায়ক, তাঁর উক্তির তলে তলে যদি এই ইঙ্গিত থাকে যে (সম্ভবতঃ তাই-ই) ভারতীয় বা এসিয়ার যে কোন প্রাচীন সভ্যতা সার্থক হইয়াছে, আর ইউরোপীয় সভ্যতা নিরর্থক ও বিফল হইয়াছে, তাহা হইলে আমাদের একটু ঝগড়া করিতে হয়। আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে গোটাকতক কথা শুনাইব। (ক) যুদ্ধ কি ভারতবর্ষের স্বর্ণযুগেও হয় নাই? (খ) কুরুক্ষেত্র সমরটা কি একটা পৈশাচিক কাণ্ড নয়? * * বর্ত্তমান যুদ্ধে যে ঘোর নির্দ্দয়তা, নৃশংসতা ও পশুত্বের অভিনয় কবি দেখিতেছেন, তাহা কি তাঁহারই দেশের সত্যযুগের যুদ্ধে ঘটে নাই? তার পর আধুনিক ভারতসভ্যতা—প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যত যুদ্ধ, যত দ্বন্দ্ব, বিপ্লব এক ভারতে হইয়াছে এমন বোধ হয় সমগ্র ইয়ুরোপেও হয় নাই। ব্রাহ্মণ সভ্যতাকে নাকি জগতের সব সভ্যতার সেরা বলিয়া গর্ব্ব করা হয়—আজ ৪০০০ বছর ধরিয়া এই সভ্যতার একচ্ছত্র আধিপত্যের ফলেও আজ ভারতবর্ষে ৫ কোটীর অধিক অস্পৃশ্য পারিয়া জাত বর্ত্তমান। জাপানের প্রাচীন সভ্যতাও কি এই ভাবে বিফল হয় নাই? বিগত যুগে জাপানের আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা, দুর্দ্দশা,

জাতিতে জাতিতে বিরোধ, ঈর্ষ্যা, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কাটাকাটি মারামারি, প্রবল বর্ণের দ্বারা হীনবর্ণের [উপর] অত্যাচার, সমাজের অত্যাচার, ধর্ম্মের অত্যাচার প্রভৃতি, এ সব কি আধুনিক জাপ অস্বীকার করিতে পারেন? যদি সে সভ্যতা বিফলই না হইবে, তবে জাপান পশ্চিমের কাছে সভ্যতা ধার করিলেন কেন? * * শুধু জাপানে কেন? গ্রীস্, রোম, মীশর, আসীরিয়া, ইয়ুরোপ আমেরিকা সর্ব্বত্রই সেই এক কথা—এক কাহিনী। কোথাও সভ্যতা সফল হয় নাই।

'সভ্যতা কোনো যুগে কোনো দেশবাসীকে দেবতা করিয়া তুলে নাই। মানুষের পশুভাব স্বার্থের চেষ্টা, সব সভ্য জাতিতেই দেখা যায়; কাজেই যুদ্ধ অনিবার্য্য। যুদ্ধ হইলেই তাতে নির্দ্দয়তা, মিথ্যাচার, নৃশংসতা, প্রবঞ্চনা, সবই ঘটিয়া থাকে। শুধু ইয়ুরোপ সে অপরাধে অপরাধী নহে। তার পরের কথা এই, বর্ত্তমান যুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ কি শুধু পশুত্বেরই চরম অভিনয় দেখিতে পাইলেন? মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব আছে, তার কি কোনো বিকাশ তিনি এ ক্ষেত্রে দেখিতে পাইতেছেন না? এই মহাসমর যে একটী অগ্নি-পরীক্ষার মত, ইহার ভিতর দিয়া ইয়ুরোপের শুভ-বুদ্ধি ক্রমশঃ যে ভ্রান্তি ত্যাগ করিয়া সত্যের দিকে যাইতেছে, তাহা দেখিলেন না? এক দল যেমন এক দলের টুঁটী ছিঁড়িতেছে, তেমনি এক দল যে প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া আহত ও আর্ত্তের সেবা করিতেছে; * * রবীন্দ্রনাথ যদি একবার সমর-ক্ষেত্রের সীমানায় বেড়াইতে যাইতেন, তাহা হইলে মানুষের মধ্যে দেবতারও সাক্ষাৎ আবির্ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতেন।'

দেখা যাক্, রবীন্দ্রনাথ বা তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায় 'এপিফেনী'র কি উত্তর দেন। 'আলোচনী'র 'বাংলার ভাবী সাহিত্য' উল্লেখযোগ্য।

অর্ঘ্য। বৈশাখ।—স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'নবেল' নামক প্রবন্ধে তাঁহার বিশ্লেষণী প্রতিভার পরিচয় আছে। শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'পরাজয়' নামক গল্পটি সুলিখিত। এই সংখ্যায় সাহিত্যগুরু স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি চিঠি ছাপা হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু সহবাস-সম্মতি আইনের আন্দোলনের সময়ে ঠাকুরদাস বাবুকে এই চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন।—

'নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

'আপনার পত্র পাইয়া বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছি। আপনি আমার নিকট সুপরিচিত এবং আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ।

'বিবাহিতাদিগের সম্মতির বয়ঃক্রম সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইতেছে, আমি ইহাকে কতকটা বৃথাড়ম্বর মনে করি। আমি যত দূর জানি, এ দেশীয়া বালিকারা দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বে সচরাচর ঋতুমতী হয় না। এবং হরি মাইতির ন্যায় পাষণ্ড বড় বিরল। সুতরাং এ বিষয়ের কোন আইনের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। তবে, ইহাও বক্তব্য, যে দ্বাদশ বৎসরের সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে বালিকাদিগের স্বামিসংসর্গ অবিধেয়, এবং ইহা আমাদিগের দেশের প্রাচীন রীতিবিরুদ্ধ। তাহার নিষেধ জন্য, যদি কোন আইন হয়, তাহাতে আমি ক্ষতি দেখি না। ঈদৃশ রাজনিয়ম প্রাচ্য দেশাচার বিরুদ্ধ হইবে না, কাজেই তাহাতে কোন আপত্তি উত্থাপিত করাও আমার মত নহে। এক্ষণে আইনমতে সম্মতিদানের [বয়স?] দশ বৎসর; দশ বৎসরের স্থানে বার বৎসর হয়, ইহা আমার অনভিমত নহে। কিন্তু বার বৎসরের অধিক হওয়া কোনক্রমে উচিত নহে।

'বাল্যবিবাহের আমি পক্ষপাতী। কিন্তু বাল্যবিবাহ অর্থে বাল্যকালে বয়সের অনুচিত সংসর্গ বুঝি না। তাহার পক্ষপাতী নহি।

'কোন কোন বালিকা দ্বাদশ বৎসর পরিপূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ঋতুমতী হইয়া থাকে। তাহাদের সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রোক্তি যে লঙ্ঘিত হইবে না, এমন কথা বলা যায় না। "ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ" ইত্যাদি মনুবাক্য ইহার উদাহরণ। কিন্তু এই সকল বিধি অনেক সময়েই রক্ষিত হয় না, দেখা যায়। রক্ষা করিতে গেলে কোন বধূই আর বাপের বাড়ী যাইতে পারে না। যে সকল শাস্ত্রোক্তি এক্ষণে সমাজগৃহীত নয়, তাহার জন্য গণ্ডগোল করা বৃথা।

'আমার মতে আইন হইবার প্রয়োজন নাই। হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। ইতি

তাং ২৯ আশ্বিন। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

আয়ুঃ।

যে যতকাল বাঁচে, তাহাই তাহার আয়ুঃ। আয়ুঃ চেতনেরও আছে; অচেতনেরও আছে। যেমন মানুষের মোটামুটি একটা আয়ুষ্কাল আছে, একখণ্ড লৌহেরও তেমনই আছে। লৌহখণ্ড কালক্রমে খণ্ড খণ্ড হইয়া গুঁড়া হইয়া যায়। ঐরূপ হইবার কারণ আছে। মানুষেরও মৃত্যু ঘটিবার কারণ আছে।

আমরা এই প্রবন্ধে অচেতনের আয়ুঃ সম্বন্ধে আলোচনা করিব না। চেতন-পদার্থের মধ্যেও উদ্ভিদের আয়ুঃ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিব না। কেবল জন্তু সম্বন্ধে, বিশেষতঃ মানব জাতি সম্বন্ধে, সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। আয়ুঃ কিসের উপর নির্ভর করে? শেষই বা হয় কেন? এই দুইটী বিষয়ই সংক্ষেপে বিবেচনা করা যাউক।

প্রথমেই দেখা যাইতেছে, ব্যক্তির ও জাতির আয়ুঃ সম্পূর্ণ পৃথক। রাম ৬০ বৎসর বাঁচিয়াছে, শ্যাম ৭০ বৎসর বাঁচিবে; কিন্তু মানবজাতি কোনও বিশেষজ্ঞের মতে এক লক্ষ বৎসরের কম বাঁচিয়া নাই। সুতরাং এই প্রভেদ, ব্যক্তির আয়ুঃ এবং জাতির আয়ুষ্কালের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়।

তাহার পর, অতিনিম্নশ্রেণীস্থ জীব হইতে সর্ব্বোচ্চজাতীয় জীবের দেহ-গঠন একবার দেখিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে, মৃত্যুর (সুতরাং আয়ুর) স্বরূপ বুঝা যাইতে পারে।

সমস্ত জীবকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এককোষ জীব, এবং বহুকোষ জীব। এককোষ জীব একটীমাত্র কোষ দ্বারা গঠিত; বহুকোষ জীব বহুকোষ দ্বারা গঠিত। ম্যালেরিয়া জ্বরের কীটাণু, রক্তকীটাণু, শুক্রকীটাণু প্রভৃতি অত্যন্ত ক্ষুদ্র জীবের দেহে একটীমাত্র কোষ; কিন্তু কেঁচো, পিপীলিকা, সর্প, পক্ষী, মানুষ—ইহাদিগের দেহে বহু কোষ, এবং বহুবিধ কোষ দেখা যায়।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, এককোষ জীব প্রাথমিক; তাহা হইতে বহু-কোষ জীব উৎপন্ন হইয়াছে। এককোষ জীবের ঐ একটীমাত্র কোষ দ্বিখণ্ডিত হইয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; তাহাতে দুইটী জীব উৎপন্ন হয়। উহারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণাবয়ব হইলে, প্রত্যেকে দ্বি-খণ্ডিত হইয়া পৃথক পৃথক চারিটী জীব হয়। এইরূপে এককোষ-জীবের বংশরক্ষা হয়।

এককোষ জীবের দেহকোষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীববস্তুর দানাতে পূর্ণ। ঐ দানাগুলি প্রধানতঃ অম্লজান, উদজান, যবক্ষারজান ও অঙ্গার দ্বারা গঠিত। তৎসহ তরলপদার্থ মিশ্রিত থাকে। তাহাতে উহা প্রায় স্বচ্ছ, পিচ্ছিল পদার্থে পরিণত হয়। ইহাই প্রাথমিক জীববস্তু। ইহার সরল-গঠন কালে বিবর্ত্তনবশে জটিল হইয়া উঠে।

ঐ এককোষ খণ্ডিত হইয়া বহুকোষ হইলে যখন উহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না, তখন বহুকোষ জীব হয়। যেমন কেঁচো। কিন্তু এইরূপ হইতে কোষস্থ জীব-বস্তুও অন্য প্রকার হইয়া উঠে। জীব যতই উন্নত হইতেছে, ততই তাহার কোষগুলিও জটিল ও নানাবিধ হইতেছে। এককোষ জীবের জীববস্তু বিবর্ত্তনবশতঃ ক্রমে মাংস, মাংস-পেশী, স্নায়ু, মজ্জা, উপাস্থি, অস্থি প্রভৃতি রূপে পরিণত হয়। মাংস, অস্থি ইত্যাদিও কোষ-সমষ্টি, কিন্তু সে কোষ এককোষ জীবের কোষ হইতে কত বিভিন্ন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এককোষ জীবের জীবকোষ বহুধা বিভক্ত হইয়া, এবং বহুবিধ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া, বহুকোষ জীবের শারীরিক জটিলতার উৎপাদন করিয়াছে। তথাপি, বহুকোষ জীবের দেহস্থ সমস্ত কোষই যে জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে। শুক্রকোষ, রক্ত মধ্যে যে সকল শ্বেতবর্ণ এবং লালবর্ণ জীব ভাসিতেছে, তাহারা এখনও এক-কোষ; এবং এককোষ জীবের কোষের ন্যায় সরলই আছে, জটিলতা প্রাপ্ত হয় নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এককোষ জীবের দেহ-কোষটী দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটী জীব, উহারা দ্বিখণ্ডিত হইয়া চারিটী জীব উৎপন্ন হয়। এই ভাবে পুরুষপরম্পরায় উহাদিগের বংশবৃদ্ধি হয়। ফাটিল, পৃথক হইল, অপর জীব হইল; মরিল কৈ? মরিল কে? তাহার মৃতদেহ কৈ? এই অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ বলেন যে, এককোষ জীবের মৃত্যু নাই। জীবদেহ যতকাল একটীমাত্র কোষে গঠিত হইত, ততকাল জীব-শ্রেণীতে মৃত্যু প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু যে অবধি এককোষ জীব বিবর্ত্তনবশে বহুকোষ এবং বহুবিধ-কোষযুক্ত হইয়া উঠিল, সেই অবধি জীব-শ্রেণীতে মৃত্যুও আসিয়া উপস্থিত হইল।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, স্বাভাবিক মৃত্যু এককোষ জীবের নাই। তবে, অন্যে বধ করিলে সকল জীবই মরে। সে পৃথক কথা।

এক্ষণে আর একটী কথা বিবেচনা করা আবশ্যক। যে একটী কোষ ফাটিয়া

দুইটী জীব হইল, তাহার কোনও অংশই নিষ্ফল হইল না। সমস্ত অংশ দ্বারাই পরবংশীয় দুইটী জীব গঠিত হইল। আবার, ঐ দুই জীবের দেহকোষেরও কোনও অংশ নিষ্ফল হইল না। উহাদিগেরও প্রত্যেক অংশই পরবংশীয় চারিটী জীব উৎপন্ন করিল। কিন্তু বহুকোষ জীবের তাহা হয় না। মানুষের কথা বিবেচনা করুন। মানবদেহের কি প্রত্যেক কোষের প্রত্যেক অংশ দ্বারাই পরবংশ গঠিত হয়? না, তাহা নহে। মানবের পরবংশ শুক্র-শোণিত দ্বারা গঠিত হয়। উহারা মানবদেহের একটী বিশেষ স্থান হইতে উৎপন্ন হয়। উহারা ব্যতীত মানবদেহের অন্য কোনও স্থানের কোষ দ্বারা পরবংশ গঠিত হয় না। হস্ত, পদ, নাসিকা, জিহ্বা ইত্যাদির কোষ হইতে কখনই মানবের পরবংশ গঠিত হয় না। সুতরাং এককোষ ও বহুকোষ জীবের মধ্যে এই একটী গুরুতর প্রভেদ স্মরণ রাখা আবশ্যক। এককোষ জীবের দেহ-কোষের প্রত্যেক অংশই পরবংশ গঠিত করে; কিন্তু বহুকোষ জীবের দেহস্থ কোনও একটী বিশেষ কোষ হইতে পরবংশ গঠিত হয়; অন্যান্য সমস্ত কোষই পরবংশ-গঠনে অসমর্থ।

যদি আমরা পরবংশ-গঠনকারী কোষকে, অর্থাৎ যে কোষ হইতে বংশরক্ষা হয়, তাহাকে বংশরক্ষক কোষ বলি; এবং দেহের যে সমস্ত (অন্যান্য) কোষ বংশরক্ষা করে না, কেবল বর্ত্তমান পুরুষের (১) দেহ রক্ষা করে, তাহাদিগকে যদি দেহরক্ষক কোষ বলি;—তবে দেখা যাইতেছে যে, যাহাদিগের (২) দেহ-কোষের সমস্ত অংশই বংশরক্ষক কোষ, তাহাদিগের মধ্যে মৃত্যু নাই; কিন্তু যাহাদিগের (৩) বংশরক্ষক কোষ ও দেহরক্ষক কোষ পৃথক, তাহাদিগের দেহ মরে। কিন্তু তাহাদিগেরও বংশরক্ষক কোষ মরে না; কারণ, তদ্দ্বারা অপত্য নির্ম্মিত হয়। তাহাদিগের বংশরক্ষক কোষ যথাস্থানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অপত্যরূপে পরিণত হয়। অতএব কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, এককোষ জীবের সমস্ত অংশই বংশ রক্ষা করে, দেহরক্ষক কোষ পৃথক নাই; সুতরাং মৃত্যুও নাই। বহুকোষ জীবের বংশরক্ষক কোষ ও দেহরক্ষক কোষ পৃথক হইয়া যাওয়ায়, দেহরক্ষক কোষ চিরকাল দেহরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং দেহ মরে; কিন্তু তাহাদিগেরও বংশরক্ষক কোষ মরে না। বহুকোষ জীবের দেহে মৃত্যু আসিয়াছে, কিন্তু

(১) Individual.

(২) যেমন এক-কোষ জীবের।

(৩) যেমন বহু-কোষ জীবের।

বংশে মৃত্যু আসে নাই, নির্ব্বংশ কেহই হয় না। বিবর্ত্তনবাদ অনুসারে কোনও না-কোনও আকারে সকল জীবই বর্ত্তমান আছে। যাহারা মরিয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহারা সেই আকারে বিলুপ্ত হইয়াছে, অন্য আকারে তাহাদিগের পরবর্ত্তী বংশধরগণ জীবিতই আছে। বংশরক্ষক কোষের ধারা অনন্ত; ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মে লীন হওয়া পর্য্যন্ত এ ধারার শেষ নাই। সুতরাং বুঝা গেল, দেহ মরে, বংশ মরে না। এই হিসাবে দেহকে বংশরক্ষক কোষের অস্থায়ী আধারমাত্র বলা যায় (৪)। দেহের কর্ম্মই যেন বংশরক্ষক কোষের আধার হওয়া। বংশরক্ষা কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়া গেলেই উহার জীবিত থাকাও অনাবশ্যক হইয়া উঠে। পিপীলিকার পুংজাতীয়গণ বংশরক্ষার কার্য্য-অন্তেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কিন্তু স্ত্রীজাতীয়গণকে ডিম্ব প্রসব করিতে হইবে, সুতরাং তাহারা তখন মরে না। ধান গাছ, যব গাছ, কলাই প্রভৃতি ফলোৎপন্ন হইলেই মরিয়া যায়। সকল জীবেরই বংশরক্ষাই প্রধান কার্য্য। এই কার্য্যের সহিত আয়ুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু বংশরক্ষা করিতে শরীররক্ষাও প্রায় সকল স্থলেই আবশ্যক; সুতরাং আহারের অভাব সদ্ভাবের সহিতও আয়ুষ্কালের গুরুতর সম্বন্ধ আছে।

এক্ষণে বিভিন্ন জীবের আয়ুষ্কাল বিবেচনা করা যাউক। কথায় বলে :—

"২২ বল্‌দা, ১৩ ছাগ্‌লা,
দশের (১০) ঊর্দ্ধ না যায় হেংলা (৫)
নরা গজা বিশে শ' (১২০)
কাক ১০০, শকুনি ৫০০।"

অর্থাৎ, ঐ সকল প্রাণীর ঐ সকল আয়ুষ্কাল। ইহা অভ্রান্ত সত্য নহে, কিন্তু মোটের উপর একরূপ ঠিক। নিম্নের তালিকায় নানা জন্তুর ঊর্দ্ধসংখ্যার আয়ুঃ লিখিত হইল; স্ত্রী-পুং-ভেদে আয়ুর যে প্রভেদ হয়, তাহাও প্রদর্শিত হইল।

	পুংজাতীয়	স্ত্রীজাতীয়
১। পিপীলিকা মৌ-মাছি (৬)	বংশরক্ষান্তে মৃত্যু। কয়েক সপ্তাহমাত্র	তিন হইতে ৫।৬ বৎসর

(৪) The bodies of the higher animals which die may from this point of view be regarded as something temporary and non-essential, destined merely to carry for a time and nourish the unicellular eggs.

—*Ray Lankester.*

(৫) কুকুর।

(৬) ইহারা গ্রীষ্মকালে জন্মিলে আরও অল্পায়ুঃ হয়।

	পুংজাতীয়	স্ত্রীজাতীয়
২। মাছি, মশা ইত্যাদি	বংশরক্ষান্তে মৃত্যু।	এক সপ্তাহ
৩। ছারপোকা ইং (অনাহারেও ৬ মাস হইতে ৬ বৎসর জীবিত থাকিতে পারে।)	ঐ ৬ মাস হইতে ৬ বৎসর	পুরুষ অপেক্ষা দীর্ঘকাল।
৪। আর্সোলা, পঙ্গপাল ইত্যাদি	বংশরক্ষান্তে মৃত্যু। দুই মাস হইতে ১ বৎসর	ঐ
৫। রুই (উই)	১ দিন	৪।৫ বৎসর
৬। প্রজাপতি ইত্যাদি	এক সপ্তাহ হইতে ৩।৪ সপ্তাহ	
৭। গোবরে পোকা ইত্যাদি কঠিন পোকা।	দুই সপ্তাহ হইতে ১ মাস	
১০। শম্বূক	১।২।৩।৪ বৎসর। পুংজাতীয়গণ স্ত্রীজাতীয়গণ হইতে দীর্ঘায়ু।	
১১। ছুঁচো	৬ বৎসর	৬ বৎসর
১২। পায়রা	১০ "	১০ "
১৩। দৈয়াল	১৩ "	১৩ "
১৭। মুর্গী, চিংড়িমাছ, শূকর	২০ "	২০ "
১৮। কোকিল	৩২ "	৩২ "
১৯। বিড়াল, ভেক	৪০ "	৪০ "
২০। ঘোড়া	৪৫।৫০	৫০।৬০
২১। টিয়াপাখী, বন্যহংস, বাজ, মানব (৭)	১০০	১০০
২২। একপ্রকার পুঁটীমাছ	২০০	২০০
২৩। এক-জাতীয় হংস (Swan)	৩০০	৩০০
২৪। বট, অশ্বত্থ	৪০০।৫০০।৬০০ বৎসর	

(৭) ১২০।

১।২।৩।১১ হইতে ২০ নম্বরের স্ত্রীগণ অপেক্ষাকৃত একটু অধিক দীর্ঘায়ুঃ। ১০ নম্বরের পুংগণ দীর্ঘায়ুঃ।

এই তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, আয়ুঃ আকৃতির উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে না। শূকর ভেক অপেক্ষা কত বড় জন্তু; কিন্তু শূকরের আয়ুঃ ২০ বৎসর, ভেকের আয়ুঃ ৪০ বৎসর। ঘোড়া বাজ হইতে অনেক বড়, তথাপি ঘোড়ার আয়ুঃ বাজের অর্দ্ধেক। সুতরাং দেহের আয়তনের উপর আয়ুঃ নির্ভর করিতেছে না। তথাপি একটী কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। কোনও জন্তুর দেহ বড় হইলে তাহার যৌবনকালপ্রাপ্তির বিলম্ব হয়; সুতরাং পরবংশ উৎপন্ন করিতেও বিলম্ব হয়; সুতরাং পরবংশকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করিতে আরও বিলম্ব হয়। তৎপরে ঐ জন্তুর স্বাভাবিক মৃত্যুর সময় আগত হয়। এই নিমিত্ত ঐ বৃহৎকায় জন্তু দীর্ঘায়ুঃ হওয়া সম্ভব। পরবংশ-গঠন ও রক্ষা করাই সকল জীবেরই কর্ম্ম। সুতরাং ঐ সকল জীব দীর্ঘায়ুঃ না হইলে জীবনের স্বাভাবিক উদ্দেশ্য উত্তমরূপে সিদ্ধ হয় না। হস্তীর কথা স্মরণ করুন। হস্তী বৃহৎকায়; উহার পূর্ণযৌবন সমাগত হইতে ৩০।৪০ বৎসর আবশ্যক। মশার পূর্ণ যৌবন সমাগত হইতে ২।৩ দিন মাত্র আবশ্যক। সুতরাং তাহার অপত্য-উৎপাদন করিয়া জীবন শেষ হইতে এক সপ্তাহই প্রচুর। কিন্তু হস্তীর ৩০।৪০ বৎসর পরে কিংবা ৫০ বৎসর পরে অপত্য-উৎপাদনের সময় হয়। সুতরাং তাহার জীবন দীর্ঘায়ুঃ হওয়াই প্রয়োজন। কিন্তু কেবল আয়তনের দ্বারা আয়ুঃ নিয়মিত হয় না। তাহা শূকর ও ভেকের দৃষ্টান্ত হইতেই প্রতীয়মান হইয়াছে। Swan ক্ষুদ্র একজাতীয় হংস ৩০০ বৎসর বাঁচিতে পারে; কিন্তু অতি বৃহৎ হস্তীও তদ্রূপ দীর্ঘায়ুঃ নহে। সুতরাং প্রথম কথা বুঝিলাম, দৈহিক আয়তনের সহিত আয়ুর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই।

[পূর্ব্বে কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করিতেন যে, পূর্ণ যৌবনকালের সহিত জীবিত-কালের সম্বন্ধ $\frac{১}{৫}$; কেহ বা $\frac{১}{৮}$ মনে করিতেন। মানব ২০ বৎসরে যৌবন পায়, সুতরাং ১০০ বৎসর বাঁচে; ($\frac{১}{৫}$)। কিন্তু এরূপ অনুপাত স্থির করিলে দুই চারিটী জীবের সহিত মিলিতে পারে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা মিথ্যা হইবে।]

উপরের তালিকা এবং অন্যান্য দৃষ্টান্ত হইতে আর একটী কথা জানা যায়। শারীরক্রিয়ার ক্ষিপ্রতা, বেগ, অথবা চঞ্চলতার উপরেও আয়ুঃ প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে না। হৃৎপিণ্ড দ্রুতবেগে চলুক, অথবা ধীরগতিতে চলুক; শ্বাস-যন্ত্র দ্রুতবেগে, অথবা ধীরে কর্ম্ম করুক; পাকস্থলী দ্রুত অথবা মন্দগতিতে পরিপাক

কার্য্য করুক; তাহাতে আয়ুঃ হ্রস্বও হয় না, দীর্ঘও হয় না। অন্ততঃ সাক্ষাৎ-স্বরূপে হয় না। সকল পাখীরই শারীরক্রিয়া মৎস্য অপেক্ষা অধিক চঞ্চল। তথাপি টিয়া পাখী ১০০ বৎসর, এবং চিংড়ি মাছ ২০ বৎসর মাত্র বাঁচে। শারীরক্রিয়ার চঞ্চলতাবশতঃ শরীর শীঘ্র ধ্বংস হওয়া সম্ভব; এই হেতু টিয়া পাখীর আয়ুঃ অল্প হওয়া, এবং চিংড়িমাছের (টিয়া অপেক্ষা) অধিক হওয়া আবশ্যক; কারণ, চিংড়ির দৈহিক ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। চিংড়ি অপেক্ষা টিয়া ৫ গুণ অধিক দীর্ঘায়ুঃ। ছারপোকার দৈহিক ক্রিয়া কত ধীর, এবং দৈয়াল পায়রা প্রভৃতির কত চঞ্চল! তথাপি ছারপোকা ৬ মাস হইতে ৬ বৎসর বাঁচে, কিন্তু দৈয়াল পায়রা ১০।১২, এবং ১৩।১৪ বৎসর বাঁচে। স্মুতরাং, দৈহিক ক্রিয়ার চাঞ্চল্যবশতঃ দেহ শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং দৈহিক ক্রিয়ার মৃদুতা ও ধীরতাবশতঃ শীঘ্র দেহ-ক্ষয় হয়, এ কথা সত্য নহে; অর্থাৎ, চঞ্চলতা অল্পায়ুর এবং ধীরতা দীর্ঘায়ুর সহিত সম্বদ্ধ নহে।

তাহার পর, উপরের তালিকা-দৃষ্টে ইহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, স্ত্রীগণ, পুংগণ অপেক্ষা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দীর্ঘায়ুঃ। মানবেরও তাহাই। ইহা হইতে এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে না যে, পুরুষ অনেক সময় বিপদে পতিত হয়, নারী-গণ সেরূপ বিপন্ন হয় না, সেই জন্যই পুরুষ অপেক্ষাকৃত অল্পায়ুঃ,নারীগণ দীর্ঘায়ুঃ। না, তাহা নহে। অনেক জাতি ও সমাজের মধ্যে নারীগণই দৈনিক পরিশ্রমাদি অধিক করে, বিপদে অধিক পতিত হয়, নরগণ তদ্রূপ হয় না। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত পার্ব্বত্য জাতি, হিন্দুসমাজের প'লে, ডোম, চণ্ডাল, ননিয়া, দোসাদ প্রভৃতি অত্যন্ত নীচ জাতি, বৃটিশ কলম্বিয়ার সিমিল্‌কামিন জাতি, টেরা ভেল-কিউল্যার আগান জাতি, ট্যাস্‌ম্যানিয়ান্ জাতি, গায়েনার ইণ্ডিয়ান জাতি, পূর্ব্ব-আফ্রিকান্ জাতি—এই সকল জাতির মধ্যে স্ত্রীগণ কঠিন পরিশ্রমের কর্ম্ম এবং বিপদজনক কর্ম্ম প্রায় সমস্তই করে। তথাপি তাহারা পুংগণ অপেক্ষা অনেক-স্থলেই দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে। পুংগণ অপেক্ষা স্ত্রীগণ জৈবিক হিসাবে পরবংশ-প্রতিপালনের নিমিত্ত অধিক প্রয়োজনীয়। এ হিসাবে পিপীলিকারও যাহা, মানুষেরও তাহাই; অর্থাৎ, স্ত্রীগণ অধিকতর দীর্ঘায়ুঃ।

এক্ষণে কল্পনা করুন, বহুকোষ জীবসমাজেও মৃত্যু প্রবেশ লাভ করে নাই। তাহা হইলে, ঐ জীবের সমাজ টিকিতে পারে কি না? মানুষের কথা বিবেচনা করুন। নানা কারণে লোকে আঘাত প্রাপ্ত হইবে; ভগ্নাঙ্গ হইবে; অক্ষম

হইবে। কেহ বা জন্মাবধি বিকলাঙ্গ হইবে। এই সকল ব্যক্তি অমর হইলে সমাজ তাহাদিগের দ্বারা কালক্রমে এমন ভারগ্রস্ত হইবে যে, সুস্থ এবং কর্ম্মিগণ তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে ও তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে এরূপ বিব্রত হইয়া পড়িবে যে, সমাজের উন্নতি দূরে থাকুক, সমাজের অস্তিত্বই সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিবে। লোকবৃদ্ধি হেতু বাসের স্থানাভাব, বহুবিধ পীড়া, আহারের অপ্রাচুর্য্য ইত্যাদি নানা কারণে সমাজের কত দূর দুর্দ্দশা হইবে, তাহা কল্পনা করাও অসম্ভব। স্থানের নিতান্ত অভাব, আর স্থান নাই, তথাপি লোকবৃদ্ধি হইতেছে! মৃত্যু ত নাই-ই। তখন উপায় কি? এইরূপে দেখা যাইতেছে, অমর জীবের জগতে স্থান হইতে পারে না; উন্নতি ত দূরের কথা। সুতরাং সমাজস্থিতি ও ক্রমোন্নতির নিমিত্ত মৃত্যু অত্যাবশ্যক। হইয়াছেও তাহাই। জীবের ক্রমোন্নতিবশতঃই এককোষ জীব বহুকোষে পরিণত হইয়াছে; আর তখনই মৃত্যুও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মৃত্যু জীববিবর্ত্তনের ফল। (৮)

যদি তাহাই হয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রীগণের আয়ুঃ পুংগণের অপেক্ষা অধিক হওয়াও দুর্ব্বোধ হইতেছে না। জীবস্থিতি এবং জীবের উন্নতির নিমিত্ত পিতা অপেক্ষা মাতার আবশ্যকতা অধিক। সুতরাং পুংগণ অপেক্ষা স্ত্রীগণ দীর্ঘায়ুঃ হওয়াই স্বাভাবিক।

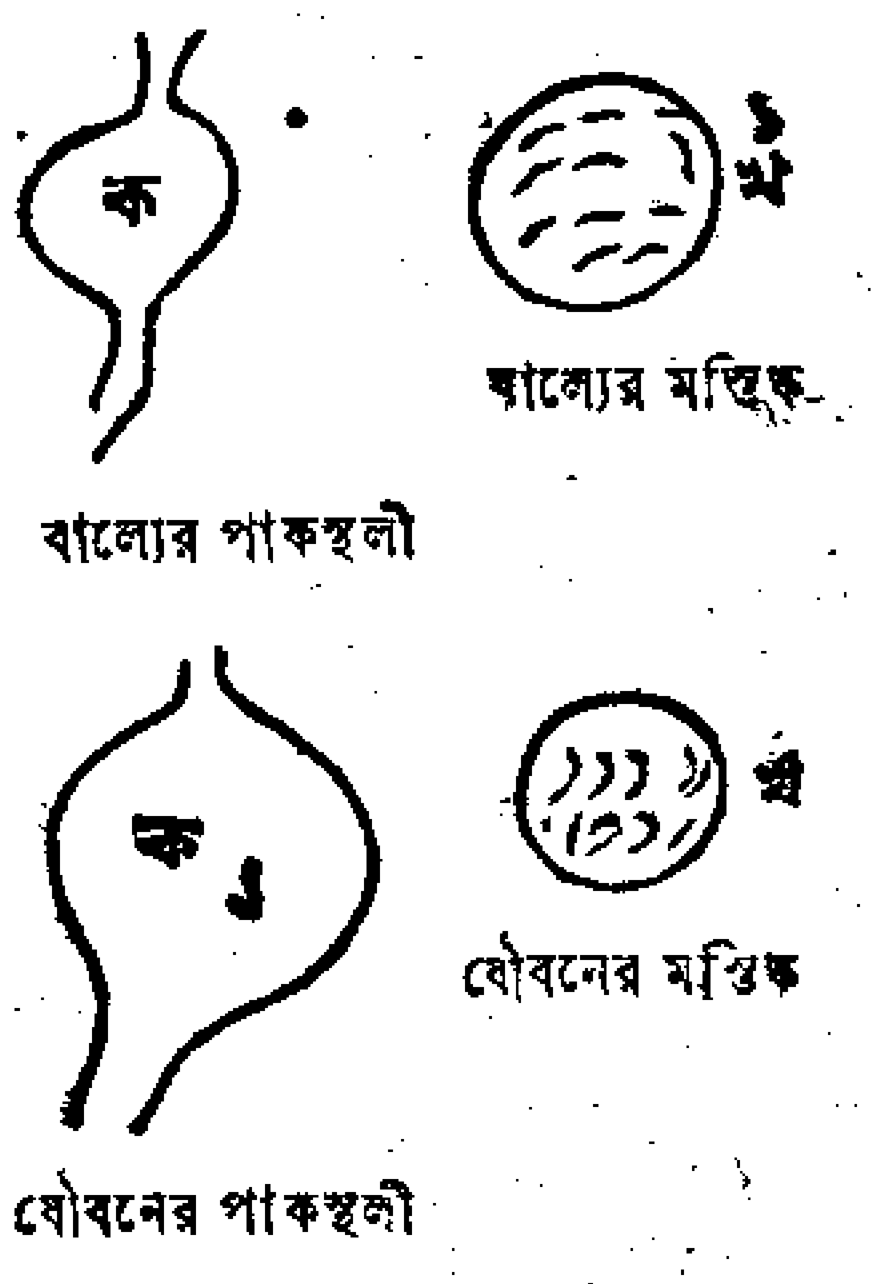
এককোষ জীবের দেহের গঠন অতি সরল। কিন্তু বহুকোষ জীবের দেহ-গঠনে, ক্রমেই জটিলতার বৃদ্ধি দেখা যায়। কেঁচো অপেক্ষা মানুষের দেহ-গঠন জটিলতর। এই জটিলতার নিমিত্ত অনেক সময় দেহের বিভিন্ন যন্ত্র-মধ্যে ক্রিয়া-সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে না। তাহাতেই মৃত্যুর বীজ বহুকোষ জীবের দেহমধ্যে প্রবেশ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। সকলেই জানেন, একটী সরল যন্ত্র সহজে বিগ্‌ড়াইয়া যায় না; কিন্তু যে যন্ত্রের বহু অংশ, এবং যে সকলের গঠনও অত্যন্ত জটিল, উহা সহজেই বিগ্‌ড়াইয়া যায়। দেহেরও তাহাই হয়। জটিল দেহের কোনও অংশ যদি কিঞ্চিৎ বিকল হইল, তবেই সমস্ত দেহের ক্রিয়া-সামঞ্জস্য রক্ষিত হইল না। তাহাতে নানাবিধ পীড়া ও দুর্ব্বলতা আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে; তাহাতে দেহ-যন্ত্র বিকল হইতে হইতে অবশেষে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। জটিলতা বিবর্ত্তনের ফল; মৃত্যুও তাহাই।

---

(৮) Death has been a phenomenon of adaptation which has appeared in the course of ages in consequence of the evolution of species.

—*Dastre's Life and Death, p. 337.*

বাল্যে দেহের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকলের আয়তনের মধ্যে যে অনুপাত দৃষ্ট হয়, বয়োবৃদ্ধিসহকারে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কোনও ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের আয়তনের ও পাকস্থলীর আয়তনের যে পরিমাণ বাল্যে দেখা যায়, যৌবনে সে পরিমাণের প্রভেদ হইতে পারে, হয়ও। সুতরাং বাল্যে হৃৎপিণ্ড হইতে যে পরিমাণ রক্ত পাকস্থলীতে যাইত, যৌবনে তাহারও প্রভেদ হইয়া পড়ে। এ নিমিত্ত পরিপাক কার্য্যও সমান থাকে না। এইরূপে দেহের বিভিন্ন যন্ত্রের এবং তাহাদিগের ক্রিয়ার মধ্যে একটা অমিল ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। বাল্যে, হৃৎপিণ্ডের, পাকস্থলীর ও মূত্রকোষের ক্রিয়ার মধ্যে যে ভাবে শক্তি-সামঞ্জস্য রক্ষিত হইত, ঐ যন্ত্রত্রয়ের আয়তন অসমঞ্জসভাবে বর্দ্ধিত হওয়ায়, উহাদিগের উপকরণ বিভিন্ন ভাবে পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, উহাদিগের ক্রিয়া সম্বন্ধেও যৌবনে অথবা বৃদ্ধ বয়সে সামঞ্জস্য-রক্ষা হয় না। এই সকল কারণে দেহের তাপ, পরিপাকশক্তি, মূত্রনির্গম প্রভৃতি বাল্য অপেক্ষা যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে বিভিন্ন হইয়া যায়। এ কারণেও দুর্ব্বলতা, পীড়া, এবং অবশেষে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। দেহের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে আয়তনের ও ক্রিয়ার একটা সামঞ্জস্য-রক্ষা হইলেই দেহ সুস্থ থাকে, নচেৎ রুগ্ন হয়; তাহাতেই মৃত্যু প্রবেশ করিবার পথ প্রাপ্ত হয় (১)। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথা বিশদ করা যাইতে পারে।



পার্শ্বে বাল্যের পাকস্থলীর ও মস্তিষ্কের, এবং যৌবনের ঐ দুই যন্ত্রের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিলাম, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ক১ ক-এর প্রায় আড়াই গুণ বাড়িয়াছে; কিন্তু খ অপেক্ষা খ১ দেড় গুণও বাড়ে নাই। ইহাতে বুঝা গেল যে, আহার বাল্য অপেক্ষা যৌবনে অনেক বাড়িয়া গেলেও, মস্তিষ্কের ক্রিয়া সেই অনুপাতে বাড়ে নাই। সুতরাং বাল্যের ক্রিয়া-সামঞ্জস্যও যৌবনে রক্ষিত হয় নাই। ইহার ফলে যদি ঐ মস্তিষ্কের অধিকারী ব্যক্তি নির্ব্বোধ হয়, তবে তাহার নানারূপ বিপদ উপস্থিত হইতে পারে; তাহা হইতেও মৃত্যু ঘটিতে পারে।

(১) General life is the harmony of the elementary lives.—*Dastre.*

নির্ব্বোধ না হইলেও তাহার দেহযন্ত্রের নাশ হইতে পারে। পাকস্থলী বয়সানুরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় দেহ পুষ্ট হইতেছে। কিন্তু মস্তিষ্ক বয়সানুরূপ বর্দ্ধিত না হওয়ায় মস্তিষ্ক-যন্ত্রের আপেক্ষিক দুর্ব্বলতা ঘটিতেছে। মস্তিষ্কের আপেক্ষিক দুর্ব্বলতা ঘটিলে কি হয়? রক্তের মধ্যে যে সকল শ্বেতবর্ণ রক্তকীট আছে, তাহা রক্ত সহ মস্তিষ্কেও চলাচল করে; মস্তিষ্কের কোষ সকল দুর্ব্বল; সুতরাং ঐ সকল রক্তকীট উহাদিগকে খাইয়া ফেলে, অথবা অন্য প্রকারে নষ্ট করে। ইহাতে মস্তিষ্ক পদার্থ ধ্বংসমুখে পতিত হয়। সুতরাং পরিণামে মৃত্যু নিশ্চিত হইয়া উঠে (১০)। কেবল মস্তিষ্কেরই এইরূপ হয়, তাহা নহে। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে নানা সময়ে নানা কারণে শরীরের নানা অংশে দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হইবেই। তখনই ফ্যাগোসাইট প্রভৃতি রক্তকীট (যাহারা এককোষ জীব, সুতরাং অমর, তাহারা) আমাদিগের দেহযন্ত্র সকল ন্যূনাধিক নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়। রক্তকীট সকল একরূপ নহে; কেহ অন্য পীড়ার বীজকে দেহে প্রবেশ করিতে দেয় না, অথবা প্রবেশ করিলে তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিবার ও নষ্ট করিবার চেষ্টা করে। কেহ বা দেহরক্ষক রস প্রস্তুত করিয়া পীড়া দমন করে। যাহারা এমন সুহৃৎ, তাহাদিগেরই কেহ কেহ দেহযন্ত্র সকলকে দুর্ব্বল পাইলে খাইয়া ফেলিতে ত্রুটী করে না। যে কারণেই হউক, দেহযন্ত্রকে দুর্ব্বল পাইলেই উহাদিগের ফলাহার উপস্থিত হইল। সুতরাং উহাদিগের অনিষ্টজনক ক্রিয়ার রোধ করিতে না পারিলে, মৃত্যু নিশ্চিত; পারিলে নিশ্চিত নহে। এ সম্বন্ধে পরে আরও বিশদ করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব। বহুকোষ জীবকেও কি অমর অথবা অত্যন্ত দীর্ঘায়ুঃ করা যায়? এ প্রশ্নের আশাপ্রদ উত্তর দিবার পূর্ব্বে আরও কয়েকটী বিষয় সংক্ষেপে বলা আবশ্যক হইবে।

শ্রীশশধর রায়।

---

(১০) The * * * Phagocytes, macrophages which exist every where around the higher anatomical elements would destroy and devour them as soon as their vitality diminishes * * * In the brain, for example, * * * the phagocytes * * * would disorganise the higher elements in capable of defending themselves.—*Dastre's Life and Death, p. 327-8.*

পদ্মাবতীর পুণ্যপুরী।

পীতাম্বর পালিত পীরোজপুরের পল্লী-পাঠশালায় পড়াইতেন। পীতাম্বর-পুত্র পরেশ, পরেশের প্রসূতি-পতির পরলোক-প্রাপ্তির পূর্ব্বেই পরপারে পঁহুছিয়াছেন। পরেশের পরিবারে পিতৃস্বসা ও পত্নী পদ্মাবতী। পদ্মাবতী প্রচুরপরিমাণে পিতৃধন পাইলেন। পরেশ পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে পতিপরায়ণা পরমসুন্দরী পরহিতৈষিণী পদ্মাকে পত্নীরূপে পাইয়াছেন। পদ্মাবতী প্রতিদিন পরমানন্দে পতিপদ-পূজা—পরিজন-পরিচর্য্যায় প্রবৃত্তা। পশুপালনেও পদ্মা পরম প্রীতা। পথের পথিকও পদ্মার প্রিয়পাত্র। পদ্মার পবিত্র প্রকৃতিতে পরিজনেরা, পরিচারিকারা, প্রতিবেশিনীরা পর্য্যন্ত পরিতুষ্ট। পর পর পদ্মার পাঁচটী পুত্র;—প্রভাত, প্রভাস, প্রকাশ, প্রসাদ, প্রতাপ। পদ্মাবতী পুত্র পাঁচটীর পালন পক্ষে প্রচুর পরিশ্রমেও প্রীতি পাইতেন। পদ্মার প্রতিপালনে পুত্রদের প্রকৃতিও প্রীতিপ্রদ। পুত্রগণের পাঠ ও প্রকৃতির প্রতি পদ্মার প্রখর পর্য্যবেক্ষণ। পরেশের ও পদ্মাবতীর প্রাণপণ পরিশ্রমে পুত্র পাঁচটী প্রায়ই পারিতোষিক পাইতেন। পর পর পাঁচটী পুত্রই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত; প্রথম পুত্র প্রভাত প্রেসিডেন্সীর প্রফেসার; প্রভাস প্লীডার; প্রকাশ প্রসিদ্ধ পত্রিকার পরিচালক; প্রসাদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় প্রথম; প্রতাপ প্রেসিডেন্সীতে পড়িতেছে।

পদ্মাবতী পুত্র পাঁচটীর পরিণয়-প্রস্তাব পতির পদপ্রান্তে পঁহুছাইলেন। পরেশনাথ পত্নীর প্রস্তাবে প্রীতিপ্রকাশপূর্ব্বক পুত্রগণের পরিণয়-প্রস্তাব-পত্রিকা পাঁচ দিকে পাঠাইলেন। পদ্মার পুত্র পাঁচটী পণ্ডিতপ্রবর, পয়সাও প্রচুর, পরেশের প্রকৃতি পবিত্র ও প্রশান্ত; পরের পয়সার প্রতি স্পৃহাপরিশূন্য। প্রসিদ্ধ পরিবারের পরমসুন্দরী পুত্রী পাইবারই প্রত্যাশা। পরেশের প্রত্যাশা পরিপূর্ণ। পাঁচটী পরমসুন্দরী পুত্রবধূ পাইলেন;—প্রতিভা, প্রতিমা, প্রমীলা, প্রণীতা, প্রণতা। পাঁচটী পুত্রবধূতে পরেশের প্রাসাদ পরিশোভিত। পদ্মাবতী পুত্রবধূ-পরিদর্শনে পরম পরিতুষ্টা। পুত্রবধূ পাঁচটী প্রতিক্ষণেই পদ্মার প্রযত্ন পাইতেন। প্রতিভাময়ী পদ্মাবতী পরেশ, পরেশ-পুত্রগণ, পুত্রবধূগণ প্রাতরুত্থানের পর প্রভাতে ও প্রদোষে পূজাহ্নিক, প্রণবজপ ও প্রণামের পর পুরাণ পড়িতেন। পরে পদ্মাবতী পারিবারিক পরিশ্রমে প্রয়াস পাইতেন। পরেশের পরিবারের

পুণ্যপ্রকৃতি ও পবিত্রভাব-প্রদর্শনে প্রত্যেক প্রতিবেশী পরিতৃপ্ত ও প্রসন্ন। পরমেশ্বর পুণ্যক্ষণে পরেশ পদ্মাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। পাপ পরেশের প্রাঙ্গণ স্পর্শিতে পারে না। পবিত্রতা প্রহৃষ্টচিত্তে পরেশের পুরীতে প্রবদ্ধ। পরমেশ্বরের প্রসাদে পুত্রে পৌত্রে পরেশের পুরী পরিপূর্ণ।

পরশ্ব পরেশের প্রাসাদে পার্ব্বতী-পূজা। পানুর পিসীর পরমানন্দ; পাড়ায় প্রচার—পানুর পিসী পেটুক; পূজা-প্রাঙ্গণে পানুর পিসী পাতা পাতিয়াছেন; প্রবীণা পাচিকা প্যারী পরিবেশনে পটু। প্যারী-প্রদত্ত পানতুয়া পানুর পিসীর পাতে পড়িতেই, পানু পিসীর পাতের পানতুয়া পেটে পুরিয়া পলাইল। পিসীমাকে পানুর পিণ্ড-প্রস্তুতে প্রবৃত্তা-পরিদর্শনে, প্যারী পুনরায় পনরটী পানতুয়া-প্রদানে পরিত্রাণ পাইল।

পূজা-পুরীর প্রত্যেক প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে প্রতিহারী পরিদৃশ্যমান। পরিচারক, পরিচারিকা; পাচক, পাচিকা; প্রতিবাসী, পুরবাসী, পরিজন, পুরজন প্রভৃতিতে পূজা-পুরী পরিশোভিত। প্রত্যেকেই প্রফুল্ল, প্রতি প্রাণেই প্রীতি প্রকাশ পাইতেছে। পরমার্থপ্রদায়িনী পার্ব্বতীর পদার্পণে পরেশ-পুরী পবিত্র। পদ্মার প্রাণ প্রমোদ-প্রাচুর্য্যে পরিপ্লুত। পদ্মাবতী পুত্রপ্রতিম প্রজাপুঞ্জকে পরিধেয়-প্রদান-পুরঃসর পরমান্ন, পূজার প্রসাদ পাওয়াইলেন। পরাহ্নে পতি-পুত্র-পৌত্র-পরিজন প্রভৃতিতে পরিবৃতা পদ্মাবতী পূজা-প্রকোষ্ঠে পশিলেন। প্রাণ পুরিয়া প্রতিমা-প্রদর্শন, পাদোদকপানপূর্ব্বক প্রগাঢ় প্রেমভক্তিপূর্ণ প্রাণে পার্ব্বতীর পদপ্রান্তে পড়িলেন। পরেশনাথের, পদ্মাবতীর পূর্ব্ব পুণ্যে প্রমদা প্রসন্না, পরলোকের পথও প্রশস্ত।

শ্রীমতী—

বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা। *

সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা ও দয়ালু আল্লাহ-তায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি।

[কোরাণ।]

* * * আমরা তোমারই অর্চ্চনা করি, এবং তোমারই নিকট সাহায্য-ভিক্ষা করি; হে বিশ্বপতি প্রভো! আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর। আমিণ!

[কোরাণ,—সুরা, ফাতেহা।]

* বাঁকীপুরের দশম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত।

কলিকাতা সহর এখন বাঙ্গালা দেশের রাজধানী। সুতরাং বাঙ্গালা দেশের—বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমে কলিকাতার মুসলমান সমাজ, এবং তাহাদের মাতৃভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

সাধারণতঃ কলিকাতা সহরে এখন পাঁচ শ্রেণীর মুসলমান দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

(১) যাঁহারা ভারতবর্ষের বাহিরের লোক, কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় বাস করিতেছেন, এবং কর্ম্ম শেষ হইলে আপনার মাতৃভূমির ক্রোড়ে ফিরিয়া যাইবেন। ইঁহারা নিজেকে কলিকাতার লোক বলিয়া জনসমাজে পরিচিত করিতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মাতৃভাষা আরবী ও পার্শী।

(২) যাঁহারা কলিকাতার, এবং বাঙ্গালা দেশের অধিবাসী নহেন, কর্ম্মের জন্য ভারতের অপরাপর প্রদেশ হইতে এখানে আসিয়া অস্থায়িভাবে বাস করিতেছেন, এবং কর্ম্ম শেষ হইলে, স্ব স্ব প্রদেশে ফিরিয়া যাইবেন, অথবা কলিকাতাতেই আজীবন অবস্থান করিবেন। ইঁহারা নিজেকে বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করেন না, এবং স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ইঁহাদের মাতৃভাষা উর্দ্দু, হিন্দী, গুজরাথী, তেলেগু, তামীল, উড়িয়া প্রভৃতি। ইঁহাদের মধ্যে হিন্দী-ভাষা-ভাষীর সংখ্যাই অধিক।

(৩) যাঁহারা বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানের বাসিন্দা, কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন, এবং কর্ম্মের শেষে স্ব স্ব জন্মস্থানে ফিরিয়া যাইবেন, এবং নিজেকে খাঁটী বাঙ্গালী বলিয়া জন-সমাজে পরিচিত করিতে সর্ব্বদাই ইচ্ছুক। এমন কি, নিজেকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত করিতে পারিলে, শ্লাঘা বোধ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা।

(৪) কলিকাতা-সহর-পত্তনের পূর্ব্বে, সহর-পত্তনের সময়, এবং তাহার কিঞ্চিৎ পরেও যাঁহারা বর্ত্তমান কলিকাতা ও পঞ্চান্ন গ্রামের মধ্যস্থিত শিবাদহ বা শিবুদহ, আজ্ঞির বাগান, শুঁড়া, হাতীবাগান, লিচুবাগান, কোমেদান বাগান, মেহদিবাগ, তালতলা, সুতানূটী, গোবিন্দপুর, ধাপধাড়া, মলঙ্গা, ফার্সিবাগান, বালিগঞ্জ, কেসিয়াবাগান, গোবরা, শরিফপুর, পেয়ারাবাগান, লডিকপুর, চাঁপাতলা, শান্‌কিভাঙ্গা, স্থর্ত্তিবাগান, হরিণবাড়ী প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেন; এবং বাঙ্গালা ভাষাকে স্বীয় মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, বরং শ্লাঘা বোধ করিতেন, এবং বর্ত্তমান সময় সেই সকল মুসলমানদিগের

যে সকল বংশধরেরা কলিকাতায় বাস করিতেছেন, এবং বাঙ্গালা ভাষাকে স্বীয় মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

(৫) কলিকাতার আদিম বাঙ্গালী মুসলমান অধিবাসীদিগের যে সকল বংশধরেরা আজিও কলিকাতায় বাস করিতেছেন, এবং বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল বাঙ্গালী মুসলমান কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, এবং আজীবন কলিকাতাতেই বাস করিয়াছিলেন, আর তাঁহাদের যে সকল বংশধর আজিও কলিকাতায় বাস করিতেছেন। বাঙ্গালা দেশ ব্যতীত ভারতের অপরাপর প্রদেশ হইতে যে সকল মুসলমান কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, কলিকাতাতেই বাস করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের যে সকল বংশধরেরা কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন। ভারতবর্ষের বাহিরের যে সকল মুসলমান কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া স্থায়িভাবে কলিকাতার অধিবাসী হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের যে সকল বংশধর আজিও কলিকাতায় বাস করিতেছেন।

বর্ত্তমান সময় কলিকাতার মোট অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় এগার লক্ষ, তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় চারি লক্ষ। এই চারি লক্ষ মুসলমানের মধ্যে উক্ত প্রথম শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রায় শতকরা এক জন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রায় শতকরা দশ জন। তৃতীয় শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রায় শতকরা ২৫ জন। চতুর্থ শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রায় শতকরা ৫ জন; এবং শেষোক্ত পঞ্চম শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রায় শতকরা ৫৯ জন। এই শেষোক্ত পঞ্চম শ্রেণীর মুসলমানেরা আপনাদিগকে 'ক্যাল্‌কেশিয়ান' মুসলমান বলিয়া বাক্য ও ব্যবহারের দ্বারা পরিচিত করিয়া থাকেন।

কিন্তু শেষোক্ত পঞ্চম শ্রেণীর 'ক্যাল্‌কেশিয়ান' মুসলমানদিগের সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিতে হইলে, উহাদিগকে পুনরায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। সুতরাং আলোচনার সুবিধার জন্য, আমি প্রথমে উহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া, আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

এই দুই শাখা-শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা প্রথম শাখা-শ্রেণীর অন্তর্গত, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব মাতৃভাষা ভুলিয়া একপ্রকার ভাঙ্গা উর্দ্দূকে আপনাদের মাতৃভাষারূপে গড়িয়া লইয়াছেন। আর যাঁহারা দ্বিতীয় শাখা-শ্রেণীর অন্তর্গত, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব মাতৃভাষাকে, সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া, অর্থহীন একপ্রকার নূতন ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং সেই ভাষাকে তাঁহারা তাঁহাদের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌ,এই উভয় স্থানের উর্দ্দূ ভাষাই এখন উর্দ্দূ-ভাষা-ভাষীদিগের আদর্শ। এক দল দিল্লীর উর্দ্দূকে বিশুদ্ধ উর্দ্দূ বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন; আর এক দল তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, "দিল্লীর উর্দ্দূ অতি জঘন্য—লক্ষ্ণৌএর উর্দ্দূ খাঁটী ও বিশুদ্ধ।" কিন্তু এতদুভয় দলের কোনও দল'ই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম শ্রেণীর প্রথম শাখা-শ্রেণীস্থ 'ক্যাল্‌কেশিয়ান' মুসলমানদিগের ভাঙ্গা উর্দ্দূকে পছন্দ করেন না। পরন্তু ইঁহারাও এখন ইংরাজী ও স্বরচিত ভাঙ্গা উর্দ্দূ ব্যতীত অপর কোনও ভাষা জানেন না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "প্রায় শতকরা ৫৯ জন 'ক্যাল্‌কেশিয়ান' মুসলমান, পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর্গত।" এই ৫৯ জনের মধ্যে, উল্লিখিত প্রথম শাখা-শ্রেণীস্থ মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ১০ জন, এবং অবশিষ্ট ৪৯ জন মুসলমান, পঞ্চম শ্রেণীস্থ দ্বিতীয় শাখা-শ্রেণীর অন্তর্গত। এই দ্বিতীয় শাখা-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ৪৯ জন মুসলমানই যে আপনাদের পূর্ব্ব মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া, এক অর্থহীন অভিনব ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক্ষণে আপনাদের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাঁহাদের সেই অভিনব ভাষার দুই চারিটী শব্দ প্রমাণ-স্বরূপ উপস্থিত করিতেছি। যথা—"আইস্থা", "গেইস্থা", "খাইস্থা", "বোলেহে", "খেলেহে", "জাহে", "কা", "কাহে", "কা-বে", "হাঁয্", "হাঁজী", "হামার", "পিইস্-হ্যায়" "সুইস্-হ্যায়", "সেইস্-হ্যায়", "গ্যায়োতানি", "খায়ো-সনি", "বোলো-সনি", "তানিসা", "এনে-আও", "এনে-জী" প্রভৃতি।

দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর মুসলমানদিগকে, উর্দ্দূ অথবা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার কোনও চেষ্টাই কেহ করেন না। বরং এই দুর্ব্বোধ্য ভাষাকেও এখন স্বার্থের খাতিরে উর্দ্দূ ভাষা বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে। তবে সুখের বিষয় এই যে, ইঁহারা আপনাদের আনন্দে আপনারাই মগ্ন রহিয়াছেন। কাহারও কোনও আচার ব্যবহার ও কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোনও চেষ্টাই ইঁহারা করেন না। কাহারও উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিবার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা ইঁহাদের নাই। কিন্তু ইঁহাদের উপরের স্তরে যাঁহারা, সেই প্রথম শাখা-শ্রেণীর মুষ্টিমেয় মুসলমানগণ, আপনাদিগকে ত বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করেনই না, অধিকন্তু বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে দলে টানিয়া লইয়া, তাঁহাদের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত।

উক্ত শতকরা ৪৯ জনকে বাদ দিলে, কলিকাতার মুসলমানদিগের মধ্যে খাঁটী উর্দ্দূ-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা শতকরা ২০ জনের অধিক নহে। এই ২০ জনের

মধ্যে দশ জনের ভাষা ভাঙ্গা-উর্দ্দূ, এবং ১০ জনের ভাষা খাঁটী উর্দ্দূ। পরন্তু কলিকাতায় খাঁটী বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা শতকরা প্রায় ২৫ জন। সুতরাং এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালী মুসলমানেরা বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতার উপর স্বীয় অধিকার হারান নাই।

কলিকাতার মুসলমানদিগের মধ্যে,আমি যে পরিমাণ বাঙ্গালী মুসলমানদিগের কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি, ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় খাঁটী বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যা তাহা অপেক্ষা আরও অধিক ছিল। দুঃখের বিষয়, সে সময়ের কলিকাতার বাঙ্গালী মুসলমানদিগের অনেকের বংশ এখন লোপ পাইয়াছে, এবং অনেকের বংশধরেরা এখন মূর্খতা প্রযুক্ত আপনাদের বাঙ্গালীত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

অধিকদিনের কথা বলিব না। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে, খাস কলিকাতার মুসলমানদিগের কি ভাষা ছিল, আমি নিম্নে তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। তখন আমাদের বাসা শিয়ালদহ হাজীপাড়ায় ছিল। আমার পূজনীয় পিতৃদেব ৬০।৬৫ বৎসর ঐ স্থানে বাস করিতেছেন। প্রত্যহ প্রাতে আমাদের বাসায় একটি ছোট রকমের মজলিস্ বসিত, এবং বেলা প্রায় ৯।১০ টার সময় মজলিস ভাঙ্গিত। পাড়ার যে সকল লোক সেই মজলিসে সমবেত হইতেন, তাঁহাদের কাহারও বয়স ৬০ বৎসরের কম ছিল না। সমবেত মহাত্মাদিগের মধ্যে মওলানা আব্দল খালেক মরহুম (১), হাজীআব্দল রাজ্জাক মরহুম (২), ৺বাবু গিরীশচন্দ্র কর, বাবু হরিদাস দত্ত, মুন্সী বেলায়েৎ হোসেন ওরফে

(১) মওলানা আব্দল খালেক, নদীয়া জেলার জুনিয়াদহ গ্রামের বিখ্যাত কাজী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে ইনি গ্রাম্য-পাঠশালায় বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া আরবী ও পার্শী ভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েন। কিছুদিন কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া, পরে দিল্লী গমন করেন, এবং সেখানে মওলানা উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। অনেক দিন তিনি দিল্লীর 'কোতবখানা'র অধ্যক্ষ ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর তিনি কলিকাতায় আইসেন, এবং কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হয়েন। কিছুদিন এই পদে কার্য্য করিয়া, চাকরীতে ইস্তফা দেন, এবং 'রাদ্' নামক একখানি পার্শী বাঙ্গালা মাসিকপত্র বাহির করেন। 'রাদ্' ৩ বৎসরের পর ১৮৮৪ সালে বন্ধ হয়। ১৮৮৫ সালে তিনি পুনরায় 'মোহাম্মাদী' নামক বাঙ্গালা-উর্দ্দূ ভাষায় এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ১৮৯০ সালে মোহাম্মাদী বন্ধ হয়। আমরা পৃথক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

(২) হাজী আব্দল রাজ্জাক, মওলানা আব্দল খালেক মরহুমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ইনি মুসলমানী ধর্ম্মপুস্তক বিক্রয়ের ব্যবসায় করিতেন।

কালীদাস, মুনশী মতিয়ার রহমান মরহুম ওরফে শ্যাম বাবু (৩), মুনশী শরাফৎ হোসেন মরহুম ওরফে শরীফ বাবু (৪), মুনশী গোলাম রহমান মরহুম (৫), মুনশী মিন্‌হাজদ্দিন মরহুম (৬), মুনশী ইম্‌তিরাজ আলী মরহুম (৭), শেখ

---

(৩) শিয়ালদহ ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে খালের ধারে যে প্রকাণ্ড জামে-মস্‌জিদ্‌ আজিও বর্ত্তমান আছে, উক্ত মস্‌জিদ্‌ ১১৭৩ বঙ্গাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতায় কোনও পাকা মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মিত হয় নাই, এবং এরূপ প্রকাণ্ড মস্‌জিদ্‌ কলিকাতায় দ্বিতীয় ছিল না, এবং নাই। মুনশী কেতাবদ্দিন নামক এক ব্যক্তি এই মস্‌জিদ্‌ প্রতিষ্ঠিত করেন। মুনশী মতিয়ার রহমান উক্ত কেতাবদ্দিনের পৌত্র ছিলেন। শিয়ালদহ ষ্টেশন-গৃহ ও আফিসাদি যে জমীর উপর স্থাপিত হইয়াছে, ঐ সমস্ত জমী উক্ত মসজিদের 'ওয়াকফ' সম্পত্তি ছিল। মতিয়ার রহমানের বাবুগিরির ফলে এই সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল। কলিকাতার মধ্যে ১৪০ বিঘা জমী উক্ত মসজিদের নামে 'ওয়াকফ' করা ছিল।

(৪) কলিকাতার যে অংশে এখন 'গ্যাস-হাউস' বর্ত্তমান, ঠিক ঐ স্থানে শরিফবাবুদিগের ভিটা ছিল। তাঁহাদের বাহাদুরী কাষ্ঠের গোলা ও জমীদারী ছিল। পঞ্চ মকারের সাধনায় শরীফবাবুর যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হয়। শরীফবাবু বলিতেন, তাঁহার প্রপিতামহের সময় হইতে তাঁহারা কলিকাতার অধিবাসী। শরীফবাবুর পিতা মরহুমের সময় হইতে তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়, এবং শরীফবাবু তাহার ধ্বংসসাধন করেন। গ্যাস-ঘর প্রস্তুতের সময় তাঁহারা সে ভিটা বিক্রয় করেন, এবং পূর্ব্বোক্ত মসজিদের অনতিদূরে একখণ্ড জমীর উপর, বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে থাকেন। আমি সে বাড়ী দেখিয়াছি। তত বড় সুন্দর বাড়ী এখন আর বড় একটা দেখা যায় না। এখন সে বাড়ী নাই।

(৫) মুনশী গোলাম রহমান পূর্ব্বোক্ত কেতাবদ্দিনের পৌত্র ছিলেন। তিনি পুলিসের দারোগাগিরি করিয়া পেন্সিয়ান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দারোগা বকাউল্লার সহকারী ছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁহারই জন্য দারোগা বকাউল্লার এত নামডাক হইয়াছিল। কারণ, তিনি সর্ব্বদাই আত্মগোপন করিয়া চলিতেন, এবং দারোগা বকাউল্লা সেই সুযোগে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

(৬) মুনশী মিন্‌হাজদ্দিন শিয়ালদহ ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে মোক্তারী করিতেন। তিনি এক জন প্রতিভাশালী মোক্তার ছিলেন। তিনিও কলিকাতায় অনেক ভূসম্পত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বংশধরেরা মোকদ্দমা-মামলায় সমস্ত উড়াইয়া দিয়া এখন পথের ভিখারী হইয়াছেন।

(৭) মুনশী ইম্‌তিয়াজ আলী পূর্ব্বে কি করিতেন, জানি না। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তিনি পূর্ব্ব-বঙ্গ রেল-আফিসের কেরাণী ছিলেন।

আহমদ্ ওরফে আমু ওস্তাগার মরহুম (৮) ও মুনশী মণিরউদ্দিন আহমদ্ মরহুম (৯) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মজলিসে গল্প-গুজব ও কথাবার্ত্তা বাঙ্গালা ভাষাতেই হইত। দেশের, দশের ও সমাজের কথা হইত। সমাজ-শাসনের পরামর্শ চলিত। কদাচারী ও পাপ-কার্য্যে রত ব্যক্তিদিগকে (হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে) শাসন করিবার ব্যবস্থা হইত। পাড়া প্রতিবেশীদিগের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করিয়া, তৎপ্রতীকারের জন্য সু-পথ অবলম্বন করা হইত। পাড়ার মামলা-মোকদ্দমা বড় একটা আদালতে যাইতে পারিত না। ইহা ব্যতীত দুধ, ঘি, মাছ, মাংস, তরি-তরকারী, পোলাও-কোর্ম্মা প্রভৃতি খাদ্যাখাদ্যের কথাও হইত। এক রবিবারে বড় বড় মৎস্যের গল্প, পোলাও-কোর্ম্মার কথা হইতেছিল। হরিবাবু বলিয়াছিলেন, "আমা-দের বাঙ্গালীরা আপনাদের ন্যায়, উত্তম খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে জানেন না। সুখাদ্য ও মুখরোচক খাদ্য আপনাদের বাড়ীতেই প্রস্তুত হয়, এবং আপনাদের মুসলমানেরাই এ কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী।"

আমার বেশ মনে আছে, হরিবাবুর এই কথা শুনিয়া, মুনশী মণিরদ্দিন ও আমু ওস্তাগার বিশেষ অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "হরিবাবু! আপনার দেখিতেছি বুদ্ধিলোপ পাইয়াছে—মতিভ্রম হইয়াছে!"

হরিবাবু তাঁহাদের ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া ও তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনিয়া অবাক—হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, এবং কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া, মৃদুস্বরে বলিলেন, "মহাশয়! আমি কি অপরাধ করিলাম? আমি ত কোনও অন্যায় কথা আপনা-দিগকে বলি নাই?"

তখন ওস্তাগার সাহেব বলিলেন, "ইহা অপেক্ষা যদি আরও কিছু অন্যায় বলিবার ইচ্ছা থাকে, বলুন। আপনি বাকীই বা রাখিয়াছেন কি? আপনি যদি আমার গণ্ডদেশে দুইটী চপেটাঘাত করিতেন, আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা সহ্য করিতাম; কিন্তু ইহা অসহ্য।"

তখন দত্তমহাশয় অতি সঙ্কুচিতভাবে বলিলেন, "যদি অপরাধ হইয়া থাকে,

---

(৮) শেখ আহমদ ওরফে আমু ওস্তাগার কলিকাতা কেল্লার দর্জ্জিখানার প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন।

(৯) মুনশী মণিরউদ্দিন আহমদ পুলিসের জমাদার ছিলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তিনি পেন্সিয়ান ভোগ করিতেন। জমাদারী কার্য্যে তিনি বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন।

তাহা আমার জ্ঞানকৃত নহে। আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিয়া দিন, আমার অপরাধ কি ?"

ইহা শুনিয়া মওলানা আব্দুল খালেক সাহেব বলিয়াছিলেন, "হরিবাবু! আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না, হিন্দু ও মুসলমানকে যে আপনি পৃথক করিয়া ফেলিতেছেন। বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক অধিবাসী—সে হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, অথবা খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম হউক—সে বাঙ্গালী। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা দেশে পাঁচটী ধর্ম্মসম্প্রদায় বাস করিতেছেন,—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্ম। দেশের মঙ্গলামঙ্গল এই পাঁচটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মঙ্গলামঙ্গলের উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু পাঁচটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় যতদিন কলহ বিরোধ ত্যাগ না করিবে, যতদিন পরস্পর একতাসূত্রে আবদ্ধ না হইবে, ততদিন কাহারও মঙ্গল হইবে না। কারণ, একের ধর্ম্মবিশ্বাস অপরের ধর্ম্মবিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত।

"তবে একতার এক উপায় আছে। সে উপায় এই যে, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্ম, এই পাঁচটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া বিশ্বাস করাইয়া দিতে হইবে যে, তাহারা যে যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউক না কেন, তাহারা সকলেই বাঙ্গালী। ধর্ম্মের হিসাবে তাহারা হিন্দু, মুসলমান, কিংবা অপর কোনও ধর্ম্মাবলম্বী নামে অভিহিত হউক না কেন, কিন্তু দেশ হিসাবে তাহারা সকলেই বাঙ্গালী। এখন হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতির মধ্যে এই বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইতেছে। কিন্তু এই সময় যদি হিন্দুকে বাঙ্গালী বলিয়া মুসলমান হইতে পৃথক করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যৎফল বড়ই বিষময় হইবে।

"বাঙ্গালী বলিয়া কোনও ধর্ম্ম নাই। আমি ইসলামপন্থী, আমিও যেমন বাঙ্গালী, আপনি হিন্দুপন্থী, আপনিও সেই প্রকার বাঙ্গালী। বাঙ্গালা দেশে জন্মিয়াছি, বাঙ্গালা দেশে বাস করিতেছি, বাঙ্গালা ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকি, এবং বাঙ্গালার জল, বায়ু ও স্বভাব আমাদের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন; সুতরাং আমরা বাঙ্গালী। আমাদের বাঙ্গালী নাম গৌরব ও শ্লাঘার বিষয়।

"ওস্তাগর সাহেবের অসন্তোষের কারণ এই যে, অদ্য আপনি একা এই যে বাঙ্গালী নামটী কেবল হিন্দুর অধিকারে আনিতেছেন, কল্য আপনার অনুকরণে আর দশ জন ঐরূপ চেষ্টা করিবে। তাহা হইলে বিশ বৎসরের পর দেখিবেন, হিন্দু-মুসলমানের একতা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

"হিন্দু মুসলমানকে ছাড়িয়া, এবং মুসলমান হিন্দুকে ছাড়িয়া কি এক মুহূর্ত্তও

এ দেশে বাস করিতে পারিবে? এ দেশের হিন্দুরাই যদি বাঙ্গালী হইবার চেষ্টা করে, এবং মুসলমানদিগকে উপেক্ষা করে, তাহা হইলে উপেক্ষিত মুসলমান হয় ত বাঙ্গালীত্ব অস্বীকার করিয়া বসিবে। বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য-বশতঃ যদি কখনও এরূপ দুঃসময় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে জানিবেন, বাঙ্গালা দেশ ছারেখারে যাইবে। ওস্তাগর সাহেব বড়ই দূরদর্শী, তাই ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া, অঙ্কুরেই ইহার মূলোচ্ছেদে যত্নবান হইয়াছেন।"

মওলানা সাহেবের এই প্রকার উপদেশপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া দত্তমহাশয় নিজের ত্রুটী বুঝিতে পারিয়া, আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী।

স্থাপত্য-শিল্প।

২

আধুনিক স্থাপত্যের আলোচনা করিলে আমরা উপকরণের প্রভাব সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদের বাসভবনগুলিকে ইষ্টকাবৃত লৌহের খাঁচাস্বরূপ বলা হইয়াছে; লৌহের চলন না থাকিলে এগুলির আকৃতি ও সংস্থান কখনই এরূপের হইত না। আমি লৌহের ব্যবহারের বিপক্ষে মত ব্যক্ত করিতেছি, এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসকে যেন কেহ মনে স্থান না দেন; লৌহের অপব্যবহারের কথাই বলিতেছি। সম্প্রতি আবার Reinforced concrete বা লৌহ দ্বারা দৃঢ়ীকৃত concrete বা concrete blocksএর বহুল প্রচার হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত অপব্যবহারের মাত্রা বাড়িয়াছে; ইহাতে নির্ম্মাণ-কৌশল ও উদ্ভাবনীশক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আমরা আমাদের স্থাপত্যের লক্ষ্য হইতে দূরে যাইয়া পড়িতেছি। শুদ্ধ প্রস্তরে গৃহভিত্তিনির্ম্মাণ ব্যয়সাধ্য বলিয়া কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইষ্টক ও প্রস্তরের মিশ্রণে ভিত্তিনির্ম্মাণের চলন হইয়াছিল; ইহাতে স্থাপত্যের বিশুদ্ধি, সৌন্দর্য্য ও উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইত; কিন্তু Reinforced concreteএর ব্যবহার ও ব্যয়সঙ্কোচের ব্যপদেশে সে সামান্য আশা সুদূরপরাহত হইয়াছে। প্রস্তরের ব্যবহারে ও মিশ্রণে গৃহাধিষ্ঠান, গৃহভিত্তি, খিলান, দ্বারদেশ ও জানালা প্রভৃতি যেরূপ

মনোহর ভাবে বিন্যস্ত ও নির্ম্মিত হওয়া সম্ভব, শুদ্ধ ইষ্টক বা Reinforced concrete দ্বারা সেরূপ আশা করা সম্ভব নহে। আমরা সহজেই কল্পনাচক্ষে দেখিয়া বুঝিতে পারি যে, ভিত্তিপার্শ্বোদ্গত সমশীর্ষক প্রস্তরের সাহায্যে কিরূপ সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইতে পারে। এ যুগে ঐরূপ একটা ভিত্তিগাত্র হইতে বহিঃবর্দ্ধিত সমোচ্চ রেখার কল্পনা, ব্যয়বাহুল্য ও অপ্রয়োজনীয়তারূপ দুইটী রাক্ষসীর তীব্রকটাক্ষে আতঙ্কে কাঁপিতে থাকে, কিংবা হয় ত তাহাদের মৃদু ভর্ৎসনায় লজ্জানতনয়নে ও করুণ-কোমল-মুখে স্থপতির কর্ম্মক্ষেত্র রুক্ষ-রিক্ততায় আচ্ছন্ন করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হয়। এই কারণেই আধুনিক অনেক অভ্রস্পর্শী সৌধে বাহুল্য হিসাবে আমরা string course প্রভৃতি বহিঃ-বর্দ্ধিত অংশের ব্যবস্থা দেখি না।

এ স্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা উচিত মনে করি। স্থাপত্যের ইতিহাস অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে, পূর্ব্বযুগে প্রচলিত রীতি বা styleর প্রতি অনুরাগাতিশয্যবশতঃ পরবর্ত্তী যুগের স্থপতিরা উপকরণের প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য নানা উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তিপ্রণালী অনুধাবন করিলে, ইহাতে বিশেষ সারবত্তা দেখি না। তাঁহাদের মতে যে রীতি এত কাল ধরিয়া লোকলোচনের তৃপ্তি ও মনে অনন্ত আনন্দের উত্তেজনা করিত, তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্যের সনাতন ভাব বর্ত্তমান; ইহা কখনও উপকরণ বা উপা-দানের প্রভাবে অম্বিত হইতে পারে না; এ সৌন্দর্য্যের শাশ্বতী ধারা দেশ, কাল, উপাদান প্রভৃতির দ্বারা কখনই অবরুদ্ধ বা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালী দেশে ও ষোড়শ শতাব্দীতে য়ুরোপে যে রেণাসাঁস্ রীতির (Renaissance) প্রবর্ত্তনা দেখি, তাহার আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, সৌন্দর্য্যের আধার হিসাবে প্রাচীন রীতির মধ্যে সনাতনত্বের বীজ যে নিহিত রহিয়াছে, তাহা স্বতঃসিদ্ধরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

একই ভূমি হইতে একই রস গ্রহণ করিয়া যেমন নানাপ্রকার মহীরুহের উদ্ভব হয়, তেমনই একই রীতি বা পদ্ধতি বা একই রীতির মূল সত্যগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশে তাহাদের স্থানীয় রীতির বা আচার-ব্যবহার দ্বারা ভিন্ন প্রকারে অণুপ্রাণিত হইয়া এক জটিল ও যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়। এই কারণেই এক ইটালীর মধ্যেই রোম্যাণেস্ক্ রীতির কত প্রভেদ! লম্বার্ডির রোম্যাণেস্ক (Romanesque) রীতির সহিত টাস্কেনির রোম্যাণেস্কের মিল নাই; এবং এই কারণেই ফ্রান্স, ইটালী ও জর্ম্মাণীর রোম্যাণেস্কের মধ্যে কত প্রভেদ

দৃষ্ট হয়। এই স্থানে আর একটী কথা বলিয়া রাখি; একটা নূতন রীতি বা পদ্ধতির আবির্ভাবকাল হইতে গড়িয়া উঠিয়া পরিণত ও পরিপক্ব হইতে অনেক সময়ের প্রয়োজন; দুই এক বৎসরে ইহা অসম্ভব; সময় সময় অনেক শতাব্দী কাটিয়া যায়। এই রোম্যাণেস্কের কথাই ধরা যাউক। ইহার অভ্যুদয়কাল আট শত বৎসর ব্যাপিয়া বর্ত্তমান; আট শত বৎসর অল্প সময় নহে; ইহাতে কত রাজ্যের আবির্ভাব ও তিরোধান হয়; কত রাষ্ট্রবিপ্লব, জাতিসমূহের কত কত নূতন ভাবের উন্মেষ ও তাহার সাধনায় কত শোণিতপাত, কত সংগ্রাম, কত জয়-পরাজয়ের পরিচয় পাই। সমাজ যে কতবার আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। সমাজরূপী জগন্নাথ অনেকবার নবকলেবর গ্রহণ করেন; এই কলেবরের মধ্যে পুরাতনের প্রাণস্পন্দন থাকিলেও, দেহপঞ্জরের এত পরিবর্ত্তন হয় যে, অনেক সময় চিনিবার উপায় থাকে না। সুতরাং একই দেশে মূল রীতিটী বিবর্ত্তিত হইয়া যে কত প্রকারের কলেবর ধারণ করে, তাহা কে বলিবে? এই জন্য অনেক সময় দৃষ্টিবিভ্রম উপস্থিত হয়, এবং রীতিটির শ্রেণীবিভাগ ও গোত্রনির্ণয় করিতে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হয়। পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে আমাদেরই এই উদ্দেশ্যহীন সমাজে এত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে যে, আমাদের পিতামহেরা যদি পুনরায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্র দেখিতে আইসেন, ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিবে; তাঁহারা আমাদিগকে ও আমাদের সমাজকে চিনিতে পারিবেন না; আমাদের বাসভূমিগুলিতে প্রবেশ করিলে তাঁহাদের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইবে।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হইতে বুঝা গেল যে, সময়ক্রমে মূল রীতিগুলি কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। সুতরাং রোম্যাণেস্কের ন্যায় যে রীতির অভ্যুদয়কাল আট শত বৎসর, তাহার জীবনের সমস্ত স্তরের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকিলেও, সে সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। যদি কোনও অশীতিবৎসরবয়স্ক বৃদ্ধের সম্মুখে তাঁহার মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত প্রতিবৎসরের এক একখানি প্রতিকৃতি তাঁহারই সম্মুখে স্থাপিত করা যায়, অন্যে পরে কা কথা, তাঁহারই বিস্ময় উদ্রিক্ত করিবে। কিন্তু এক জন প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ বোধ হয় চিত্রগুলির মধ্যে একটা সাধারণ লক্ষণ ধরিয়া তাহাদের মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিতে সমর্থ হইবেন।

যেমন সঙ্গীতের এক একটী তানে বা মূর্চ্ছনায় শ্রোতার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া

উঠে, কিংবা চিত্রের রেখাসম্পাত বা ছায়ালোকের বিচিত্র মিলনে দর্শকের হৃদয় আবিষ্ট বা আন্দোলিত হয়, তেমনই স্থপতির সৃষ্ট বিষয়ের আকৃতিগত সৌন্দর্য্যে মানুষের অন্তরে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের তরঙ্গ বহিতে থাকে। আমার এখনও মনে পড়ে যে, যখন বহুদূর হইতে সূর্য্যকিরণস্নাত তাজ আমার নয়নগোচর হইল, তখন কোন কল্পনারাজ্যের স্বপ্নে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম। কোণার্কের সূর্য্যমন্দিরের নিকটে যাইয়া ও মহীশূরস্থ হালেবিডের মন্দির দেখিয়াও এই প্রকার বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছিলাম; অবশ্য, সর্ব্বস্থানে মন একই প্রকার চিন্তায় পূর্ণ হয় নাই। যে সৌধের আকৃতিগত সম্পৎ যত অধিক, স্থাপত্যহিসাবে তাহার উৎকর্ষও তত অধিক; কিন্তু এই আকৃতিগত সৌন্দর্য্য-বিধানের একটা নিয়ম আছে; যে সৌধের যাহা উদ্দেশ্য, তাহার আকৃতি তদনুযায়ী করা উচিত। কোনও ব্যাঙ্ক বা বস্ত্রের দোকানকে আগরার নিকটবর্ত্তী সিকন্দ্রাস্থিত আকবরের সমাধি-মন্দির বা অজন্তার বৌদ্ধবিহারানুযায়ী নির্ম্মাণ করিলে সৌন্দর্য্যবিধানের আশা নিশ্চয়ই সুদূরপরাহত হইবে।

গ্রীকমন্দির পার্থিননের (Parthenon) সম্মুখ শীর্ষ পেডিমেণ্ট্ (pediment) দ্বারা শোভিত বলিয়া তোমার সোমেশ্বরের মন্দিরশীর্ষে, বা গাজি-সাহেবের দরগায় পেডিমেণ্ট্ সন্নিবেশিত করিয়া দিলে, কিংবা হুমায়ুনের সমাধি-হর্ম্ম্যের গম্বুজ বা মিনারের সন্নিকটে পেডিমেণ্ট্ জাতীয় কোনও অলঙ্কারের সমাবেশ করিলে, সভ্যসমাজে তোমাকে বাতুলতার অভিযোগে নিন্দিত হইতে হইবে। বাস্তবিক যখন কলিকাতাস্থ কোনও অফিসের * সম্মুখে বহু উচ্চে স্থাপিত গ্রীক্ ক্যারিয়াটাইডিস্ (Caryatides) মূর্ত্তিগুলি ও তাহার পার্শ্বে ইটার্নাইট্ টালির বারাণ্ডা নিরীক্ষণ করি, তখন আমার চক্ষে এমন যন্ত্রণা উপস্থিত হয় যে, মূর্ত্তিগুলিকে ভূমিসাৎ করিতে ইচ্ছা করে। পারসীকদিগের সাহায্যকারিণী কেরিয়াবাসিনীদিগের উচ্ছেদসাধন করিয়া যখন তাহাদিগকে বন্দিনীস্বরূপে এথেন্স্ নগরে আনয়ন করা হয়, তাহার কিছু পরে পারসীকবিজয় চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এথেন্স্ নগরীস্থ এক্রোপলিসের (Acropolis) উপর ইরেক্‌থিয়ন্ (Erechtheion) নির্ম্মিত হইলে, তাহার তিনটী দ্বারদেশের অন্যতমের স্তম্ভের উপর কেরিয়াবাসিনী রমণীর মূর্ত্তি স্থাপিত করা হয়; এই স্থানে নিশ্চয়ই মূর্ত্তিগুলির সার্থকতা বিদ্যমান; কিন্তু কলিকাতাস্থ সঙ্কীর্ণ পথের উপর নির্ম্মিত ও বহু উচ্চে স্থাপিত, সুতরাং সাধারণ লোকচক্ষুর অগোচর কেরিয়া-রমণীর মূর্ত্তি-

* Oriental Life Insurance Companyর অফিস।

সংবলিত অট্টালিকায় যে কোনও সঙ্গতি বা সার্থকতা আছে, তাহা ত বুদ্ধির অগম্য। ব্যাঙ্ক, বিশ্ববিদ্যালয়, বিপণী, বা বিহারের যেথানে সেথানে এ মূর্ত্তিগুলি বিন্যস্ত হইলে, স্থাপত্যশিল্পশ্রী নিতান্তই সঙ্কোচ বোধ করিবেন।

লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি না থাকিলে, স্থাপত্যের বিকাশ কথনই সম্ভবপর নহে; লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতেই স্থাপত্যের এই দুর্দ্দশা। এতৎসম্বন্ধে একবার মস্‌জিদের গঠনপ্রণালীর আলোচনা করা যাউক। ইসলাম ধর্ম্মে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পরমেশ্বরের উপাসনা যেথানে সেথানে অনুষ্ঠিত হইতে পারে; এই জন্য মুসলমানদিগকে উপযুক্ত স্থানাভাবে অশ্বযানের চালেও উপাসনা করিতে দেখিয়াছি। পথে, ঘাটে, কান্তারে, শৈলে, সর্ব্বস্থানেই, কিংবা মস্‌জিদের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে বা সমষ্টিভাবে ইঁহাদিগকে উপাসনা করিতে দেখা যায়। তাঁহাদের দেবতার জন্য কোনও বিগ্রহ বা মূর্ত্তির আবশ্যকতা নাই, কেন না, ইনি যে বিশ্বদেবতা; এমন কি,তাঁহার উপাসনার জন্য কোনও পুরোহিত বা মধ্যস্থ ব্যক্তিরও প্রয়োজন নাই। ইসলাম ধর্ম্মকে ধর্ম্মরাজ্যের সাধারণ-তন্ত্র হিসাবে দেখা যাইতে পারে; সুতরাং এ ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী স্থানের বা মস্‌জিদের নির্ম্মাণকল্পনায় কোনও জটিলতা সম্ভবপর নহে। মস্‌জিদটি এমন ভাবে নির্ম্মিত করিতে হইবে যে, উপাসনার সময় উপাসকদিগের দৃষ্টি পশ্চিম দিকে বা মক্কার দিকে নিবদ্ধ হয়; সম্মুখে একটী অঙ্গনের প্রয়োজন, এবং তাহাতে একটী জলাধার থাকা চাই; কেন না, হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধদেহে, সমাহিতমনে উপাসনায় যোগদান করিতে হয়। ইসলামধর্ম্মে জাতিবিচার নাই; যদিও কোনও কোনও উপাসককে নির্জ্জনে মস্‌জিদের একান্তে উপাসনা করিতে দেখা যায়, তথাপি যাঁহার যেথানে ইচ্ছা, উপাসনা করিতে পারেন। এক সঙ্গে উপাসনা করিতে হইলেই মধ্যস্থলে আসিতে হয়; এ স্থান যেন বিশ্বদেবতার দরবার; এবং এই ভাবটি বুঝাইবার জন্যই মধ্যস্থলে বড় গম্বুজের ব্যবস্থা; পার্শ্বের গম্বুজগুলি সাধারণতঃ ক্ষুদ্রায়তন; কিংবা হয়ত পার্শ্বে গম্বুজই দৃষ্ট হয় না। যথা—দিল্লীর "পুরাণা কিল্লা"স্থিত শেরশাহ-নির্ম্মিত মস্‌জিদ, বিজাপুরস্থ জামে মস্‌জিদ, কিংবা পারস্যের অন্তর্গত ইস্পাহানস্থ মেস্‌জিদ-ই-সার মস্‌জিদ। প্রথমোক্ত শ্রেণীর মস্‌জিদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ কুলবর্গায় দৃষ্ট হয়। কোনও কোনও মস্‌জিদে মধ্যস্থ সর্ব্বোচ্চ গম্বুজের আয়তনে পার্শ্বেও আর দুইটী সমায়তন গম্বুজের ব্যবস্থা থাকে; যেমন মালবরাজ্যের অন্তর্গত মাণ্ডুস্থ জামে মস্‌জিদ; বোধ হয়, বলিতে হইবে না যে, এই শ্রেণীস্থ মস্‌জিদগুলি পূর্ব্বোক্ত শ্রেণী হইতে বিবর্ত্তিত।

এইবার হিন্দুস্থাপত্যের বিষয় আলোচনা করা যাউক। হিন্দুমন্দিরে যে বিগ্রহ স্থাপিত হয়, তাহার জন্য স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠের ব্যবস্থা; তাহার নাম গর্ভগৃহ, বা বিমান। এই প্রকোষ্ঠে পুরোহিত ভিন্ন যাহার তাহার যাইবার ব্যবস্থা নাই; স্নাত ও শুচি হইলে যাওয়া যায়; তাহাও সকলের পক্ষে নহে। দাক্ষিণাত্যে আবার পুরোহিত ভিন্ন ব্রাহ্মণ, দণ্ডী, সন্ন্যাসী, যিনিই হউন, কাহারও গর্ভগৃহে প্রবেশাধিকার নাই; বাহির হইতে পূজার্চ্চনা বা প্রণাম করিবার ব্যবস্থা; আমাদের দেশে যদিও উচ্চবর্ণের যজমানেরা শুচি ও স্নাত হইয়া বিমানমধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, তথাপি দেবস্থান ও সাধারণগম্য স্থানের মধ্যে একটা বিশেষ ব্যবধান দৃষ্ট হয়। এই ব্যবধানের ভাব হইতেই স্বতন্ত্র গৃহের ব্যবস্থা। এই স্বতন্ত্র গৃহ বা গর্ভগৃহের সহিত গ্রীকস্থাপত্যের adytumএর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

দেবস্থান ও সাধারণ স্থানের মধ্যে যে ব্যবধানের কথা বলিলাম, ইহাতেই হিন্দুস্থাপত্যের বিশিষ্টতা, এবং ইহাতেই তাহার মূলতত্ত্ব নিহিত; অর্থাৎ, হিন্দু-স্থাপত্যে যত প্রকার প্রকোষ্ঠ বা তদানুসঙ্গিক গৃহের ব্যবস্থা করা হউক না, গর্ভগৃহের বিন্যাস করিতেই হইবে; অন্য কিছু নির্ম্মিত হউক, বা নাই হউক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। এই জন্য অনেক মন্দির প্রকোষ্ঠৈকমাত্রক। বহুদূরে যাইতে হইবে না, উদাহরণস্বরূপ আমাদের বঙ্গদেশস্থ একপ্রকোষ্ঠযুক্ত শিবমন্দিরগুলির কথা বলা যাইতে পারে। যাঁহারা দক্ষিণেশ্বরস্থ রাণী রাসমণির মন্দির দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রশস্ত অঙ্গনের পশ্চিমদিকৃস্থিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন শিবমন্দিরগুলি দেখিয়াছেন; এইগুলিতে গর্ভগৃহ ভিন্ন আর কিছুরই ব্যবস্থা নাই; রৌদ্র, বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আশ্রয়স্থানের বন্দোবস্ত করিতে হইলে, একপ্রকোষ্ঠযুক্ত মন্দিরের সম্মুখে একটী বারাণ্ডা সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। যথা—কালীঘাটস্থ কালীর মন্দির, শান্তিপুরের শ্যামচাঁদের মন্দির, ইত্যাদি। এই বারাণ্ডাটির সহিত দাক্ষিণাত্যস্থ মন্দিরের "অন্তরালে"র সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে; ক্রমে ক্রমে বিবর্ত্তিত হইয়া সম্মুখস্থ বারাণ্ডাটি প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইলে, ইহা "প্রদক্ষিণা" নাম ধারণ করে। এখানে বলিয়া রাখি যে, পূর্ব্বে যাহা বলিলাম, তাহা হিন্দু-স্থাপত্যে স্থূলতঃ প্রযোজ্য; কেন না, অনেক প্রকারের অন্তরাল, প্রদক্ষিণা প্রভৃতির প্রচলন দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে; সে কথা ক্রমে ক্রমে বলিব।

হিন্দুর দেবতার ভোগরাগ শৃঙ্গারের নিয়ম আছে; সুতরাং তাহার জন্য স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠের প্রয়োজন; এই জন্যই ভোগমন্দির, নাটমন্দির প্রভৃতির ব্যবস্থা।

আমার বক্তব্য এই যে, স্থাপত্য-শিল্প বুঝিতে হইলে, ইহার চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের প্রতি হতশ্রদ্ধ হইলে চলিবে না। মানবজীবনে ও মানবরচিত শিল্পে একই নিয়ম প্রযোজ্য; অর্থাৎ, মানবজীবনে যে কারণে সংস্কার প্রভৃতির উদ্ভব, মানবরচিত স্থাপত্য, সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই, সংস্কার সেই কারণেই প্রচলিত। যেখানেই সংস্কার, সেখানেই দেখিবে যে, মানব-মন চরম লক্ষ্যের জ্ঞান বা প্রয়োজনীয়তা হইতে বহুদূরে আসিয়া পঁহুছিয়াছে।

আধুনিক স্থাপত্যের আলোচনা করিলে সংস্কারের প্রভাব বেশ বুঝা যায়। এই সংস্কারের কারণ অনেকগুলি; মানবের অনুকরণপ্রিয়তা তন্মধ্যে নগণ্য নহে। গ্রীকস্থাপত্যের অন্যতম অংশ ডোরিক গঠনপ্রণালীর প্রস্তারে (entablature) ত্রিরেখ (Triglyphs) প্রভৃতির যে ব্যবস্থা আছে, আমাদের বঙ্গদেশস্থ কোনও "চৌচাল" মন্দিরে তাহার পুনরাবৃত্তি দেখিলে বিকৃত অনুকরণপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়; দুঃখের বিষয়, আমাদের বঙ্গদেশস্থ কত মন্দির যে এই বিকৃত রুচির পরিচয় দিতেছে, তাহা বলা অসাধ্য। মস্‌জিদে এই বিকৃতরুচির প্রভাব অধিকতর প্রবল। প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনও পুরাতন মস্‌জিদ ভাঙ্গিয়া নূতন মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিবার সময় স্থানীয় মুসলমানদিগের সহিত এক বিরোধ উপস্থিত হইলে কোনও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বিদেশীয় গঠনরীতি ও বিশিষ্টতা নিরীক্ষণ করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছিলাম যে, পুরাতন মস্‌জিদটি অতিশয় প্রাচীন নহে; বাস্তবিক মন্দির অপেক্ষা মস্‌জিদে বিদেশীয় রীতির অনুকরণপ্রিয়তা অধিকতর লক্ষিত হয়। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে চিদম্বরমস্থ মন্দিরের ধ্বজস্তম্ভের উপর "করুগেটেড্" লৌহের আবরণ দেখিয়া, ও গর্ভগৃহটি বিকৃতরুচিতে সংস্কৃত দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। অনুকরণপ্রিয়তার আর এক কদর্য্য উদাহরণ দেখিয়াছি, মহীশূরস্থ হালেবিডের মন্দির-সংরক্ষণ ব্যাপারে। দ্বাদশ শতাব্দীতে হৈসল নৃপতি কর্তৃক নির্ম্মিত মন্দিরে ইংরাজী "প্যানেল" (panel) ক্ষোদিত দেখিয়া আমি এত দূর বিচলিত হইয়াছিলাম যে, ব্যাঙ্গালোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিভাগীয় কর্ত্তার নিকট এ সম্বন্ধে অভিযোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এ বিষয়ে আমাদের ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যথেষ্ট উদাহরণ মিলিবে।

ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত ইউরোপের স্থাপত্যে যে বিশেষ উন্নতি হইল না বলিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিব যে, রোমক স্থাপত্যের অনুকরণস্পৃহা য়ুরোপের মনীষিবৃন্দকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়াছিল। দেশ, কালের উপযোগিতা ও আদর্শ এবং স্থাপত্যের ঐকতানিক ধারাকে অগ্রাহ্য করিয়া রোমক রীতির প্রচলন-মানসে তাঁহারা যে বিষম ভ্রম করিয়াছিলেন, তাহা বুঝাইতে হইবে না। ইহার পূর্ব্বেই দান্তে, বোকেসিও ও পেত্রার্ক প্রাচীন গ্রীসীয় ও রোমক সাহিত্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ইতালীয় পণ্ডিতদিগের মনে মধ্যযুগের সাহিত্য ও শিল্প হইতে বিদ্রোহের সূচনা করিতেছিলেন। এই সময়েই (১৫২১ অব্দে) পণ্ডিতেরা ভিট্রুভিয়াস্ (Vitruvius) প্রণীত স্থাপত্যসম্বন্ধীয় গ্রন্থ ইতালীয় ভাষায় অনূদিত করিলেন; ইরাস্মাস্ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা দেশবাসীর সম্মুখে গ্রীক্ সাহিত্য ও সভ্যতার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিলেন; মধ্যযুগের রীতিনীতি, সাহিত্যদর্শনের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধার হ্রাস হইল; মধ্যযুগের স্থাপত্যরীতি আর লোকের চিত্তাকর্ষক রহিল না। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে লুপ্তপ্রায় স্থাপত্য আবার নবজীবনে সঞ্জীবিত হইয়া নবকলেবর ধারণ করিল। ইহাতে মানব-মনের মৌলিকত্বের লোপ হইল, এবং বৈচিত্র্যের পরিবর্ত্তে একত্বের প্রচলন হইল। আমি এই নব-রোম্যান্ বা নব-গ্রীসীয় পদ্ধতির একেবারে নিন্দা করিতেছি না; কেন না, এ সময় অনেকগুলি সুন্দর সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু স্থাপত্যের যাহা প্রাণ—মৌলিকত্ব, সার্থকতা, প্রয়োজনীয়তা ও বিন্যাসবৈচিত্র্য—তাহার তিরোধান দেখি। একটা সামান্য উদাহরণ দিয়া আমার মন্তব্যটিকে বিশদ করিবার চেষ্টা করিব।

মহাবলিপুরের রথসংজ্ঞক মন্দিরগুলির আদর্শ কখনও বিংশ শতাব্দীতে প্রযোজ্য হইতে পারে না; এবং এ চেষ্টা কখনও লোকের চিত্তাকর্ষক হইবে না। এগুলির আয়তন বাড়াইয়া কমাইয়া, বায়ু চলাচলের ও লোকসঙ্কুলানের ভিন্ন বন্দোবস্ত করিয়া বহির্দৃশ্যের পরিবর্ত্তন না করিলে, কখনও এ সময়ে চলিতে পারে না। পুরাপ্রিয়তাকে স্থাপত্যের নিয়ন্তা করিলে উহার মর্ম্মস্থলে আঘাত করা হয়; কিন্তু পুরাতত্ত্ব-জ্ঞানকে আমরা অনেক স্থলে ইহার নিয়ন্তা করিতে পারি। এই পুরাতত্ত্ব-জ্ঞানসহায়ে আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি যে, কোন্ কারণের জন্য কোন্ বিশেষ স্থাপত্য অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই; এই জ্ঞানের সাহায্যে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, যে নির্ম্মাণ-রীতি বা

স্থাপনবিন্যাস প্রিয়দর্শী অশোকের সময় চলিত, তাহা বিংশ শতাব্দীর কথা দূরে যাউক, দশম শতাব্দীতে চলিতে পারে না; বা, যে এক্রোপলিসের নির্ম্মাণ পেরিক্লিসের সময় সম্ভবপর ছিল, তাহা এ যুগে নিতান্ত বিসদৃশ হইবে; কেন না, পেরিক্লিসের সমসাময়িক গ্রীক সভ্যতা ও সমাজের মূলতত্ত্বগুলি বিংশ শতাব্দীতে প্রযোজ্য নহে।

আগ্রাদুর্গস্থ যে অট্টালিকা যোধাবাই-মহল বলিয়া কথিত, তাহা ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতেশ্বর আকবরের মহিষী যোধাবাইএর তৃপ্তিসাধন করিত বটে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে আমাদের ন্যায় সামান্যাবস্থ পরিবারের মহিলারা তথায় বাস করিতে চাহিবেন না, কেন না, তাঁহাদের বাসোপযোগী যথেষ্ট বায়ু ও আলোক, বা অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধানের বন্দোবস্ত নাই।

পূর্ব্বে স্থাপত্যবিষয়ে সংস্কারের প্রভাবের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা গিয়াছে। এই বিষয়ের চিন্তা করিতে গিয়া ইহার অংশীভূত আর একটী কথার উল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে করি। ইহার প্রতি অনুরাগ অনেকের পক্ষে সংস্কারস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোনও অট্টালিকানির্ম্মাণে ইহার অংশ সকলের পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তাহাদের বিন্যাস-সাধন বা symmetry-রক্ষাকে লক্ষ্য করিয়াই আমি পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিলাম। এখনকার দিনে কিন্তু symmetryর, বা পরস্পরের মধ্যে বিন্যাস-সামঞ্জস্যের দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আর স্থাপত্যকে, বিশেষতঃ বাসগৃহসম্বন্ধীয় স্থাপত্যকে বাঁধা চলে না; এ কথায় হয় ত অনেকে বিস্মিত হইবেন; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে নিশ্চিতই বুঝিবেন যে, "তে হি নো দিবসা গতাঃ"। ইহা সর্ব্বাংশে ভাল কি মন্দ, সে বিচারের স্থল ইহা নহে; কিন্তু কথাটা এই যে, যে সামাজিক বন্ধন একপরিবারস্থ সকলকে যে প্রীতি ও সখ্যের ভাবে বাঁধিত, এখন তাহার তিরোধান হইয়াছে। এখন বাঁধনটি জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সামাজিক সম্পর্ক যদি জটিল হয়, তাহা হইলে যে স্থাপত্য তাহারই প্রতিবিম্বস্বরূপ, তাহা কখনই সরল সহজ হইতে পারে না। কথাটা আর একটু প্রণিধান করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বে আমরা সকলের সম্মুখেই আমাদের বেশভূষা পরিবর্ত্তন করিতে দ্বিধা বোধ করিতাম না; এখনও বনিয়াদী ঘরের ব্যবস্থা এই যে, ভৃত্যেরাই প্রভুর পরিধেয় বস্ত্রাদি পরাইয়া দেয়। পূর্ব্বে ভৃত্যের গতায়াত সর্ব্বত্র সম্ভবপর ছিল; সুতরাং Dressing room বলিলে যাহা বুঝায়, তাহার প্রয়োজনীয়তা ছিল না; কিন্তু বর্ত্তমান সমাজে আমরা ক্রমশঃ দেখিতেছি যে, বিশ্বাসী ভৃত্য দূরে

যাউক, আত্মজ পুত্র পর্য্যন্ত পিতার বেশভূষা-পরিবর্ত্তনের সময় সম্মুখে যাইতে পারে না; Dressing roomই বল, আর যাহাই বল, একটী ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠের প্রয়োজনীয়তা বেশ পরিস্ফুট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃহৎ প্রকোষ্ঠের নিকট একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের স্থাপনা করিতে হইলে গৃহবিন্যাস ব্যাপারটি দুরূহ ও জটিল হইয়া পড়ে। বৃহদায়তন প্রকোষ্ঠে বায়ু ও আলোক চলাচলের যে প্রকার দ্বার ও জানালার বন্দোবস্ত করা উচিত, ক্ষুদ্রায়তন Dressing room কিংবা Bath roomএ সে প্রকার কখনই সম্ভবপর নহে; সুতরাং পুরাতন আমলের বাটীতে symmetry বা অংশ সকলের সামঞ্জস্য যেরূপ অনায়াসলব্ধ, এখনকার সমাজে তাহা অসম্ভব।

সেকালের বাটীর প্রকোষ্ঠগুলি প্রায়শঃ একই আয়তনে নির্ম্মিত হইবার কারণ যে, সে সময়কার সামাজিক জীবনে জটিলতা ছিল না; তখনকার সময়ে স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে একাত্মতা ছিল।

Symmetryর ছাঁচে ঢালা বাটীগুলি প্রাণহীনতার পরিচায়ক; ইহার কঠোর শাসনে জীবনীশক্তির হ্রাস হয়, এবং যে মৌলিকতা স্থাপত্যের উদ্দেশ্য, তাহা সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে; কিন্তু এক এক জনের এমনই রোগ যে, symmetryর ব্যত্যয় দেখিলে তাহারা বিশ্ব অন্ধকারময় দেখে, তাহাদের স্ফূর্ত্তির লোপ হয়। ফরাসী সম্রাট চতুর্দ্দশ লুইএর মতে, কোনও অট্টালিকায় সামঞ্জস্য রক্ষিত হইলেই তাহার সার্থকতা সিদ্ধ হইত। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই রাজমতটি সাদরে গৃহীত হইয়াছিল, এবং স্থাপত্যের ধারা এই মতটিকে আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইত। ইহার ফল বড় বিসদৃশ হইয়াছিল। রাজশিল্পী ম্যানসার্ড (Mansard) কর্ত্তৃক কল্পিত ও চতুর্দ্দশ লুই কর্ত্তৃক প্রশংসিত Chateau de clagny নিরীক্ষণ করিলে বুঝা যায় যে, symmetry সম্যকরূপে বজায় রাখিতে গিয়া অট্টালিকাটি কিরূপ অসঙ্গত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার দক্ষিণপার্শ্ব বামপার্শ্বের অনুরূপ; কিন্তু এই সাদৃশ্যবোধ যে কিরূপ অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত, তাহা যাঁহারা প্রকোষ্ঠগুলির উদ্দেশ্য অবগত আছেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে না। বামপার্শ্বটি রাজকীয় আবাসস্থল-রূপে কল্পিত, এবং দক্ষিণ পার্শ্বের অংশগুলি মন্ত্রণাগৃহ, দরবার প্রভৃতির জন্য নির্ম্মিত। শয়ন ও বেশ-পরিবর্ত্তনের ক্ষুদ্রায়তন প্রকোষ্ঠগুলির বহির্দৃশ্য বৃহদায়তন মন্ত্রণাগৃহের অনুরূপ, এবং Bath room রাজকীয় উপাসনামন্দিরের সদৃশ। স্থাপত্যে এইরূপ symmetryর যাঁহারা অনুমোদন করেন, তাঁহারা যে নিতান্ত ভ্রান্ত, পূর্ব্বোক্ত প্রাসাদটিই প্রকৃষ্টরূপে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে।

স্থাপত্যের প্রকৃত সৌন্দর্য্য অংশসমূহের সামঞ্জস্যবিধানের মধ্যে নিহিত নহে; কোনও সৌধের অঙ্গসংস্থানের সমতুল্যতা বা balancingর সংরক্ষণ করিলে স্থাপত্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এক পার্শ্বে এক প্রকারের বহির্দৃশ্যের ব্যবস্থা আছে বলিয়াই তাহার বিপরীত দিকে যে ঠিক সেই প্রকারের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই; কিন্তু এমনটি করিতে হইবে যে, সমষ্টি-ভাবে দেখিলে যেন অঙ্গসংস্থানের মধ্যে একটা সমতুল্যতা রক্ষিত হয়। বিষয়টি আর একটু বুঝিবার চেষ্টা করিব।

গম্বুজ বা শেখরকে অঙ্গসমষ্টির ঠিক মধ্যস্থলে কল্পিত করিতে হইবে, এমন ব্যবস্থা কখনই সর্ব্বসময়ে ও সকল অবস্থায় বাঞ্ছনীয় নহে; আর সকল সময় সম্ভব-পরও নহে। গির্জ্জাগুলির উচ্চ ঘণ্টাঘর বা belfry এক পার্শ্বে নির্ম্মিত হইয়া থাকে, এবং তাহার পার্শ্বে ক্রমনিম্ন ছাদযুক্ত প্রকোষ্ঠের ব্যবস্থা; এই প্রকোষ্ঠের শেষ দিকের ভিত্তির দুই ধারে দুইটী সামান্য উচ্চ শেখরের ব্যবস্থা; ইহার মধ্যে symmetry নাই; কিন্তু অঙ্গসংস্থানের মধ্যে একটা মনোহর সাম্য বা শৃঙ্খলা লক্ষিত হয়; তাহাতে বোধ হয়, যেন ওজন করিয়া অঙ্গগুলিকে যথাস্থানে সন্নি-বেশিত করা হইয়াছে। আর একটী উদাহরণ দেওয়া যাউক। অনেকেই পুরীধামে জগন্নাথের মন্দির দেখিয়াছেন; বিমানের উপরিস্থ শেখর এক পার্শ্বে নির্ম্মিত না হইয়া যদি ঠিক মধ্যস্থলে, অর্থাৎ, জগমোহন ও নাটমন্দিরের শীর্ষে কল্পিত হইত, তাহা হইলে symmetry-দর্শনেচ্ছা চরিতার্থ হইত বটে, কিন্তু স্থাপত্যশ্রী দূরে পলাইতেন।

স্থিতিবিজ্ঞানে (statics) আমরা যে সাম্যের কথা পাঠ করিয়াছি, তাহার তুলনা স্থাপত্য বিষয়ে প্রযোজ্য; বলগুলি কোনও নির্দ্দিষ্ট আপেক্ষিক অবস্থায় থাকিয়া প্রযুক্ত হইলে যে সাম্য-ব্যাপার সংঘটিত হয়, ইহাদের মধ্যে একটী বলের অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিলে যেমন সেই সাম্যের লোপ হয়, তেমনই কোনও সৌধ বা প্রাসাদের অঙ্গসংস্থানের বিপর্য্যয় ঘটিলে স্থাপত্যঘটিত সাম্যের তিরোধান হইবে; এ কথার প্রমাণ দর্শকের চক্ষে।

Symmetryর কথা উঠিলে যাঁহারা গ্রীক স্থাপত্যের কথা তুলিয়া আপনাদের মত পরিপুষ্ট করিবার চেষ্টা করেন, আমি তাঁহাদিগকে খ্রীঃ-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে নির্ম্মিত এথেন্সের অন্তর্গত "ইরেক্থিয়নে"র কল্পনা চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। ইহার নির্ম্মাণে অঙ্গসমূহের সামঞ্জস্যবিধানকে স্থাপত্যশিল্পের অঙ্গহিসাবে গণ্য করা হয় নাই। এই মন্দির বা মন্দিরসঙ্ঘের নির্ম্মাণ ও বিন্যাসে

যেরূপ রীতির অনুসরণ করা হইয়াছে, তাহা দেখিলে বিস্মিত ও আনন্দিত হইতে হয়। বিস্ময়ের কারণ এই যে, অত প্রাচীন কালেও গ্রীক্ স্থপতিরা অঙ্গসমূহের সংস্থানে সমতুল্যতা ও সঙ্গতি দ্বারা যে শিল্পের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা এত সুন্দররূপে বুঝিতেন; আর আনন্দের কারণ এই যে, বহির্দৃশ্য দর্শনেন্দ্রিয়ের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া চিত্তে অনন্ত চিন্তার দ্বার খুলিয়া দেয়।

যে ইরেক্‌থিয়নের কথা বলিলাম, তাহা গ্রীক্‌জাতির অতিশয় প্রিয়; ইহাতে তাহাদের ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র উভয়বিধ সাধনা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখা হইয়াছে। শুদ্ধ পারসীক বিজয়ের স্মৃতি উদ্রিক্ত করিবার জন্য ইহার কল্পনা হয় নাই। ইহাতে মিনার্‌ভা (Minerva) এবং নেপচুন্ (Neptune) উভয় দেবতার পূজার জন্য মন্দির রহিয়াছে; সুতরাং গ্রীক্‌জাতির অতিশয় প্রিয় ইরেক্‌থিয়ন হইতে তাঁহাদের স্থাপত্যসম্বন্ধীয় মত সপ্রমাণ করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, রোম্যানেরা symmetryর বিশেষ আদর করিতেন; তাঁহাদের এই অনুরাগ স্তম্ভ ও ত্রিরেখ (Triglyphs) বিন্যাসের মধ্যে বিশেষ অভিব্যক্ত। যাঁহারা রোম্যান্‌দিগের প্রাচীন ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে না যে, ব্যবস্থাপক বা বিধিনিষেধের প্রবর্ত্তক বলিয়া রোম্যান্‌দের বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। যে জাতি বিধিনিষেধের বিধানে বা ব্যবস্থাপ্রণয়নে শক্তি ব্যয়িত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যে স্থাপত্যেও বিধি-নিষেধের প্রবর্ত্তক হিসাবে symmetryর প্রচলন করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

আলোচনা।

মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত।

গত মাসের সাহিত্যে শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের "মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত" শীর্ষক যে সন্দর্ভটী প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। গুপ্তমহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রবন্ধের 'শেষাংশটী "ইতিহাসসম্মত প্রামাণিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত' নহে। সুতরাং উক্ত "জনপ্রবাদমূলক" অংশের সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করা অসঙ্গত। কিন্তু প্রথমাংশে ঐতিহাসিক প্রামাণ্য গ্রন্থের যথেষ্ট ব্যবহার দৃষ্ট হয়; যথা, জষ্টিনসের Historiae

Philippicæ XV. 4 ; প্লুটার্কের Vita Alexandri, ch. 62 ; বিষ্ণুপুরাণ ; তস্য টীকা, শ্রীধরস্বামী বিরচিত ; বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস নামক নাটক।

রামপ্রাণ বাবু লিখিয়াছেন, "আমরা প্লুটার্কের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, আলেকজাণ্ডার শতদ্রুতীরে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কল্প করিলে নবীন যুবক চন্দ্রগুপ্ত (Sandrachotus) তাঁহার সমীপে উপনীত হইয়া বলেন, অগ্রবর্ত্তী দেশে অতি সহজেই আপনার বিজয়পতাকা উড্ডীন হইতে পারিবে।"

কিন্তু প্লুটার্ক লিখিয়াছেন,—"He [Alexander] also erected altars for the gods which the kings of the Prasii even to the present day hold in veneration, crossing the river to offer sacrifices upon them in the Hellenic fashion. Androkottos himself, who was then but a youth, saw Alexander himself, and afterwards used to declare that Alexander could easily have taken possession of the whole country * * * *"

—*McCrindle's translation.*

আধুনিক ঐতিহাসিকেরা অনুমান করিয়া থাকেন যে, শতদ্রু নদীর সন্নিকটেই উক্ত দেবমন্দিরসমূহের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। Androkottos যৌবনারম্ভে আলেকজাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু সে ঘটনাটী যে ঐ স্থলে এবং ঐ সময়ে, অর্থাৎ শতদ্রুতীরে এবং আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্ত্তন-সঙ্কল্পের পরে ঘটিয়াছিল, তাহার কোনও নির্দ্দেশ নাই। প্লুটার্ক জানাইতে চাহেন যে, তাঁহাদের বীররাজা আলেকজাণ্ডারের প্রতি আমাদের প্রভূত পরাক্রমশালী রাজা Androkottosএর যথেষ্ট ভীতি ও ভক্তি ছিল। অথবা, এরূপ অর্থও অসমীচীন নহে যে, আলেকজাণ্ডারের নির্ম্মিত দেবতাগণই প্রাচ্য নৃপতিদিগের পূজ্য ছিলেন ; এবং স্বয়ং Androkottos (যিনি গ্রীক্‌দিগের নিকট সর্ব্বপ্রধান ভারতীয় রাজা বলিয়া পরিগণিত) যবনরাজ আলেকজাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন,—কোথায়, কি সূত্রে এবং কোন্ সময়ে, তাহা জানা নাই ; তবে তখন Androkottos পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হন নাই। উপরন্তু, পরে (অর্থাৎ এই সাক্ষাতের পরে) Androkottos বলিতেন যে, আলেকজাণ্ডার অতি সহজেই সমগ্র দেশ জয় করিতে পারিতেন।

গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "মহারাজ নন্দের দ্বিতীয়া রাণী মুরা শূদ্র অপেক্ষাও অধম কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" ইহার অর্থ বোধগম্য হইল না ; শূদ্র অপেক্ষা অধম কুল যে কি, তাহা আমার অবিদিত। তবে জনশ্রুতি এই যে, মুরা জাতিতে ক্ষৌরকারিণী ছিলেন। ক্ষৌরকারিণী কি অপরাপর শূদ্রাণী অপেক্ষা অধমা? তা ছাড়া, এ জনশ্রুতি কত দিনের পুরাতন? মুদ্রারাক্ষসে মুরার নামগন্ধও নাই ; থাকিলেও বিশেষ আসিয়া যাইত না ; কারণ, উহা একটী নাটকমাত্র। যদি নাটক পুরাতন হইলেই বিশ্বাসযোগ্য হয়, তাহা হইলে দেখিতেছি, কিছু দিন পরে স্বর্গীয় ডি, এল, রায় মহাশয়ের "চন্দ্রগুপ্ত" নামক নাটকটীও ইতিহাস-লেখকের কাজে আসিবে!

রামপ্রাণ বাবু বলিতেছেন, "বিষ্ণুপুরাণে চন্দ্রগুপ্তকে মৌর্য্যবংশের প্রথম-পুরুষরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।" ইহা আমাদের পক্ষে নূতন সংবাদ। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—

"নবনন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নান্ উদ্ধরিষ্যতি
তেষামভাবে জগতীম্ মৌর্য্যা ভোক্ষ্যন্তি বৈ কলৌ।"

ভার্গবতেও ঐরূপ।

মৎস্য, বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

"উদ্ধরিষ্যতি তান্ সর্ব্বান্ কৌটিল্যো বৈ দ্বিরষ্টভিঃ
ভুক্ত্বা মহীম্ বর্ষশতম্ ততো মৌর্য্যান্ গমিষ্যতি।"

পুনরপি গুপ্ত মহাশয়ের মতে, "এই অংশের [অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণের এই অংশের] টীকায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, চন্দ্রগুপ্তের মাতার নাম হইতে তদীয় বংশের মৌর্য্য নামকরণ হইয়াছিল; তাঁহার মাতার নাম মুরা, তিনি মহারাজ নন্দের অন্যতম মহিষী ছিলেন।" শ্রীধরস্বামীর টীকা এইরূপ:—"নন্দস্যৈব মুরাসংজ্ঞস্য পত্ন্যন্তরস্য পুত্রং চন্দ্রগুপ্তং মৌর্য্যাণাং প্রথমম্।" অর্থাৎ, "বিষ্ণুপুরাণোল্লিখিত মৌর্য্যগণের প্রথম-পুরুষ চন্দ্রগুপ্তের মাতার নাম মুরা; ইনি নন্দরাজারই অন্যতমা মহিষী।" ইহাতে "মুরা" হইতে "মৌর্য্য" শব্দের নিষ্পত্তির স্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই; যদিও গুপ্ত মহাশয় বলিতেছেন,—"চন্দ্রগুপ্ত মগধ সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়া মৌর্য্য উপাধি গ্রহণ করেন। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকারের মতে, চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরা হইতে মৌর্য্য উপাধি নিষ্পন্ন হইয়াছে।" এ সকল নূতন তথ্য কোথা হইতে আবিষ্কৃত হইল? অবশ্য, শ্রীধরস্বামী যে ক্ষেত্রে এবং যেরূপ ভাবে টীকাটি লিখিয়াছেন, তাহা হইতে অনুমিত হইতে পারে যে, "মৌর্য্য" নামটীর উদ্ভব নির্দ্দেশ করাই তাঁহার গৌণ উদ্দেশ্য; এবং সেই উদ্দেশ্যেই চন্দ্রগুপ্তের মাতার নাম "মুরা", এ কথাটি, দৃশ্যতঃ সামান্য হইলেও, বস্তুতঃ প্রামাণ্য বলিয়া—লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এ অনুমান সত্য কি না, কে স্থির করিবে?

শেষ কথা, সংস্কৃত-ব্যাকরণানুসারে "মুরা" হইতে "মৌর্য্য" পদ নিষ্পন্ন করা যায় না; কারণ, "স্ত্রীভ্যো ঢক্", অর্থাৎ, স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর ঢক্ হয়। যথা, মুরার অপত্য মৌরেয়, মৌর্য্য নহে। যদি চন্দ্রগুপ্তের মাতা সত্যই নন্দরাজার শূদ্রা (অথবা তদপেক্ষা অধমা) স্ত্রী হইতেন, তাহা হইলে চন্দ্রগুপ্ত কি মাতার নাম হইতে স্বীয় বংশের নামকরণ করিতেন? পুরাণগ্রন্থে মৌর্য্যেরা নন্দবংশ হইতে পৃথক্ ভাবেই বর্ণিত। এই দুই বংশের রক্তসম্পর্ক কিরূপে কল্পিত হইল, তাহা ইতিহাসবেত্তার অনুসন্ধানের বিষয়। মুদ্রারাক্ষসেই এই কল্পনার সূত্রপাত দেখা যায়।

শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দেব।

মধু-গয়া।

[ভ্রমণবৃত্তান্তের নক্সা।]

৺গয়াধাম যে শ্রাদ্ধপ্রক্রিয়ার একটা প্রশস্ত স্থান, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং বিখ্যাত। অনেকে এই মহাপুণ্যধামে শ্রাদ্ধ করিয়া কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন, ইহা

স্মরণ করিয়া-আমরা সেই মানসে একটা দল বাঁধিলাম। তারিখ ২৫এ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ।

দলের মধ্যে অনেকেরই শ্রাদ্ধ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সকলের সে রকম অর্থ-সম্বল নাই। অতএব আমরা চাঁদা করিয়া একটা 'কোপারেটিভ ফণ্ড' তুলিলাম। চাঁদা করিয়া এবং দল বাঁধিয়া কোনও বৃহৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিশেষ সুবিধা আছে। হয় ত কার্য্যসিদ্ধি নিশ্চয়, নচেৎ সকলে মিলিয়া রসাতলে যায়। এবংবিধ কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই।

এ দলের বিশেষত্ব ছিল। স্ত্রী ও পুরুষ একত্র দল বাঁধিয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে স্ত্রীলোক শ্রাদ্ধ কিংবা গীতা-পাঠ প্রভৃতি শুভকর্ম্মের অধিকারিণী নহেন। কিন্তু অনেকে বলিলেন যে, শ্রাদ্ধ না করিলেও, শ্রাদ্ধস্থলে বসিয়া যজ্ঞ দেখিবার, কিংবা যজ্ঞের সরঞ্জাম যোগাইয়া দিবার কোনও বাধা নাই। অতএব তাঁহাদের অনুরোধে আমরা স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্গে লইলাম। যখন প্রথমে তাহাদিগকে বাটীতে বর্জ্জন করিয়া আসিবার কথা হইয়াছিল, তখন তাহাদিগের মুখ ম্লান হইয়াছিল, চক্ষু ছল-ছল করিয়াছিল, এবং তদ্দৃষ্টে অনেক সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে করুণ রসের সঞ্চার হইয়াছিল। একেই আমরা দীনহীন জাতি, কখন্ রাস্তাঘাটে কোন্ 'চিলে ছোঁ মারিয়া' লইয়া যায়, তাহা কেহ বলিতে পারে না; এমতাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগকে ছাড়িয়া কোথাও যাওয়া যেমন অর্ব্বাচীনের কাজ, স্ত্রীলোকদেরও আমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া তথৈব চ। 'শ্রাদ্ধ-সমিতি'র সন্তুষ্টি-সাধনের জন্য কতকগুলি লোক—কেহ বা গীতবাদ্য, কেহ বা চিত্রকলা ও কাব্য প্রভৃতির শ্রাদ্ধসঙ্কল্পে প্রণোদিত হইয়া ছুটিয়া গিয়াছিলেন।

সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, আমাদিগের মধ্যে নানাপ্রকারের লোক ছিল। কাহারও নেক্‌টাই ও হ্যাট্-কোট্, কাহারও গেরুয়া রঙ্গের বস্ত্র ও পিরিহান্, কাহারও গর্ণেটের কোট্ এবং সোনার চেন, কাহারও এণ্ডির কোট্ ও পেণ্টেলুন, কাহারও মস্তক অনাবৃত, কিন্তু মোজা ও বুটজুতা দ্বারা চরণযুগল সুরক্ষিত, কাহারও মুক্ত পদযুগল, কিন্তু কম্ফর্টরের দ্বারা মস্তক এবং গলদেশ সম্পূর্ণ আবৃত, এবং কাহারও কেবলমাত্র ফরাসডাঙ্গার ধুতি এবং 'পঞ্জাবী-আস্তীন'। কেশের পারিপাট্য সম্বন্ধে যত্নবান যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও সম্মুখের চুল লম্বা ও পশ্চাতের ছোট, এবং কাহারও পশ্চাতে বিলম্বিত গুচ্ছ, সম্মুখে সমতলক্ষেত্র। কাহারও শ্মশ্রু সুরক্ষিত, এবং কাহারও শ্মশ্রু একেবারে মুণ্ডিত।

দলের মধ্যে যাঁহাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাঁহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়াই ভাল ; কারণ, এই প্রবন্ধটা উপন্যাস নহে। উপন্যাস হইলে চরিত্র ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়িত। একটা প্রবন্ধ কিংবা ভ্রমণবৃত্তান্তে অত দূর চেষ্টা করা অসম্ভব। বিশেষতঃ যাহারা কর্ম্মে দড়, তাহাদের চরিত্রও দৃঢ়। এহেন চরিত্রকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া মনের মত করিয়া লওয়া অসম্ভব ; কারণ, তেমন চরিত্র নিতান্ত পাকা বাঁশ কিংবা শুষ্ক এবং পুরাতন শাল্মলী তরুবরস্বরূপ। শ্রাদ্ধ-সমিতির মধ্যে কোনও দলপতি ছিল না। শুভকর্ম্মে কোনও দলপতি থাকা ইতিহাস-বিরুদ্ধ ; বরং অশুভকর্ম্মে, যেমন চুরী, ডাকাতী, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতিতে দলপতি থাকে। তবে বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যে :—

১। হারাধন গাঙ্গুলী—ইনি খুব হিন্দু, এবং গীতা প্রভৃতি পাঠ করেন। সন্ধ্যা-আহ্নিক প্রভৃতিতে খুব মনোযোগী। একটা রেলওয়ে আপিসের বড় বাবু। ইনি কাহার শ্রাদ্ধ করিবেন, তাহা ব্যক্ত করেন নাই। বয়স কম, এবং বিপত্নীক বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছিল যে, পরলোকগতা স্ত্রীর শ্রাদ্ধ করিতেই তিনি আসিয়াছিলেন। ইঁহার সঙ্গে এক 'সুট' হ্যাট, কোট, এবং নেক্‌টাই ছিল, তাহা মধ্যে মধ্যে পরিধান করিতেন। দাড়ি, গোঁফ, সব কামান'।—

২। শ্যামচাঁদ বসু উকীল। ইনি 'পলিটিক্‌স'-বিশারদ। খাদ্য এবং অখাদ্য, ন্যায় এবং অন্যায়, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে, তাহা তিনি স্বীকার করেন না। 'ক্রমবিকাশ'-(ইভল্যুশন)-বাদী। ইঁহার তিনটি কন্যার মধ্যে কাহারও এখনও বিবাহ হয় নাই। কারণ, তিনি পণের বিরোধী, এবং সমাজের শ্রাদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প। গোঁফ আছে।

৩। ধনকুবের হারাধন ঘোষ। বিখ্যাত 'ঘোষ কোম্পানী' (কন্‌ট্রাকটর্‌স এবং জেনারল অর্ডর সপ্লাইয়রস্‌) ইঁহারই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। দোকানদারী সম্বন্ধে ইঁহার মত বিজ্ঞতা খুব কম লোকের ছিল। 'পলিটিকল ইকনমী'তে এক জন ওস্তাদ। ৺পিতৃদেবের পিণ্ড দিতে আসিয়াছিলেন। খুব সাদাসিধা লোক, এবং হরিভক্ত। লম্বা দাড়ী ও কেশ। বয়স প্রায় পঞ্চাশ, ছেলেপুলে নাই।

৪। খগেন্দ্র ডাক্তার। ইনি সম্প্রতি মেডিক্যাল কলেজ হইতে বাহির হইয়াছেন। পসার হয় নাই। খাঁটী সাহেব, এবং ডাক্তারীতেও যেমন ব্যুৎপত্তি, বঙ্গভাষাতেও তেমনই। ইনি রোগীদিগের শ্রাদ্ধ করেন।

৫। বিরিঞ্চি বাঁড়ুয্যে। নিষ্ঠাবান হিন্দু ও গরীব লোক। সংসারে কেহ নাই। অতএব মিষ্টান্নের প্রয়াসী হইয়া আত্মশ্রাদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন।

৬। সাতকড়ি মিত্র, বি, এ। হারাধান বাবুর ভাগিনেয়। নব্য ছোকরা, পাঞ্জাবী আস্তীন্। কাব্যশীল। সকলেরই প্রিয়, এবং 'ঘরের ছেলে'র মত।

৭। গদাধর ভট্ট, এবং তদীয় শ্যালক। ইহারা গান গাহে ও তবলা বাজায়। তানসেন প্রভৃতির শ্রাদ্ধের জন্য ব্যস্ত। ইহারা বিষ্ণুপুরের লোক। বৈষ্ণব।

২

আমরা পুরুষবর্গের মধ্যে কেবল সপ্তরথীর নাম করিলাম মাত্র। ইহা ছাড়াও যাহারা জুটিয়াছিল, তাহাদের যথাসময়ে ও যথাস্থানে উল্লেখ করিলেই চলিবে। অতঃপর যে সকল স্ত্রীলোক শ্রাদ্ধসমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও উল্লেখ করা উচিত।

১। দুর্গা ঠাকুরাণী। ইনি হারাধন গাঙ্গুলীর মাতা। ধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী, সেকালের লোক। বিধবা।

২। মিস্ নিস্তারিণী বসু। শ্যামচাঁদ উকীলের কন্যা। ইহার অনেক স্থান হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসিতেছিল। লিখিতে পড়িতে খুব হুঁসিয়ার, এবং ছবি টানিতে ও গান গায়িতে জানেন। বিনম্রা, লজ্জাশীলা, সুশ্রী, এবং কোমলচরিত্রা। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা।

৩। হারাধন ঘোষের স্ত্রী গরবিনী ঘোষ। খুব গর্ব্বিতা, এবং প্রশস্তদেহা। সঙ্গে অনেক টাকা, এবং একরাশি গহনা। শ্রাদ্ধসমিতির সেক্রেটরী।

৪। খগেন্দ্র ডাক্তারের স্ত্রী, বিমলা। অল্প দিন বিবাহিতা। ঠাকুর দেবতার উপর, এবং পতির উপর স্ত্রীলোকের কি করিয়া ভক্তি হইতে পারে, এই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন।

৫। গদাধর ভট্টের শ্যালকের স্ত্রী মালতী। একটা বেয়াকুফ্ স্ত্রীলোক।

৬। ঝি।

এতগুলি পুরুষের ও স্ত্রীলোকের পরিচয় দিবার বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য যে, নানা রকমের লোক হইয়াও ইহাদের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব একতা সঞ্চারিত হইয়াছিল। পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সহানুভূতি। সকলেই পরস্পরের সুখসাধনের জন্য ব্যগ্র। সকলেই একটা দল। সকলেরই পাঁচ রকম কথাবার্ত্তা, গলার সাতটা সুর, মুখের সাতটা ভাব, অঙ্গের সাতটা ভাবভঙ্গী লইয়া যেন একটা বৃহৎ গান, কিংবা একটা বৃহৎ কাব্য, কিংবা একটা সুদৃশ্য চিত্র দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। একটা গূঢ় কল্পনায় যেন সকলে বিভোর, একটা ভাবে যেন সকলেই অনুপ্রাণিত।

সেই ভাবটুকু, গানটুকু, কিংবা কাব্যটুকু একটা বিরাট শ্রাদ্ধের উপর সংস্থাপিত। বুকের ব্যথা, দুঃখের কথা ও দুরাশা প্রভৃতি অন্তরে গোপন করিয়া আজ সকলেই মধু-গয়ার যাত্রী।

পাছে হাবড়া ষ্টেশনে রেলে চড়িতে গোলমাল হয়, সেই জন্য বড় বাবু হারাধন গাঙ্গুলী তাঁহার সুপরিচিত বালি ষ্টেশনে সকলকে পূর্ব্বেই নৌকারোহণ করাইয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে শিবাকুলের তীব্র ও উদাস কণ্ঠধ্বনি অতিক্রম করিয়া তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে রেলগাড়ীতে আরোহণ করিলেন।

স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীলোকের গাড়ীতে গেল, এবং পুরুষগণ তাহারই পার্শ্বের গাড়ীতে (ইণ্টরমিডিয়েট কম্পার্টমেণ্টে) বসিয়া পড়িল।

সকলেই 'গয়া-অণ্ডাল' প্যাসেঞ্জার ধরিয়া প্রথমতঃ লুপলাইন এবং তাহার পর 'দক্ষিণ বিহার' রেলপথ বাহিয়া যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

প্রাতঃকালে আমরা একটা ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, সেটার নাম পাকুড়। হারাধন গাঙ্গুলী বুঝাইয়া দিলেন যে, আমরা বিহারাঞ্চলের সাঁওতাল-পরগণার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন বাঙ্গালা দেশ দূরে পড়িয়াছে। ইহাতে আমাদের মনে কেমন একটা মায়ার সঞ্চার হইল। এমন সময় এক জন লোক একটা ব্যাগ হাতে করিয়া আমাদের পার্শ্বের কামরায় উঠিয়া পড়িল। সাতকড়ি জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়ের নিবাস ?'

আগন্তক। মহেশপুর। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ?

সাতকড়ি। গয়াতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তে। এদেশের বাসিন্দা ও সমাজ কি প্রকার ? ভাষা কি ?

আগন্তক। এ দেশে দু রকম জাতি বাস করে। বাঙ্গালী ও সাঁওতাল। সাঁওতাল জাতি পূর্ব্বে নিজের ভাষা নিয়ে থাক্‌ত, ক্রমে বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশে তাদের ভাষা একটু বদ্‌লে আস্‌ছিল। এখন এ দেশ বিহারের অন্তর্গত হওয়াতে সেটার সঙ্গে আমরা হিন্দুস্থানী ভাষা মিশিয়ে ফেল্‌ছি। তিন্‌টে ভাষা মিশে এখন একটা সুন্দর ভাষার উৎপত্তি হচ্ছে। এই ভাষাটা পূর্ব্বদিকে বীরভূমের হেতমপুর হ'তে আরম্ভ ক'রে উত্তরে মালদহের প্রান্ত, দক্ষিণে হাজারিবাগ, ও পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার চকাই পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এগুলি সাঁওতাল পরগণার সীমার মধ্যে। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা সাঁওতাল ছিল। আমার পিতার নাম বোঙ্গা মাঝি। আমার নাম 'হরকালী'। কর্ত্তারা রেখে-ছিলেন। আমি পাকুড়ের জমীদার পাঁড়েদের এক জন নায়েব সর্দ্দার। এবার

আমার যে ছেলে হবে, তার নাম গনৌরি মাঝি থাক্‌বে। এ নামটা পুরা হিন্দুস্থানী। সে আমাকে 'বাবুজী' বলে ডাক্‌বে, ও তার মাতাকে ডাক্‌বে 'হো মাতারি', ও ভ্রাতাকে ডাকিবে 'ভইয়া হো!'

সাতকড়ি। কি সুন্দর পরিণাম! এতে একটা মস্ত সুবিধা দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় কাব্যের ছন্দ মেলাবার জন্য কথা ভাব্‌তে হয়, এদের কাছে নূতন কথা শিখ্‌লে সেটার অভাব দূর হবে।

খগেন্দ্র ডাক্তার কথাটা টুকিয়া লইলেন। 'আচ্ছা, তোমাদের আচার ব্যবহারের কোনও দুর্দ্দমনীয় ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইয়াছে?'

আগন্তুক (হাসিয়া) 'হয়েছে বৈ কি। আমরা ছাতুর সঙ্গে মাগুর মাছের ঝোল খাই। আমাদের স্ত্রীলোকেরা মাথায় ঘোমটা দেয় না, হোলীর সময় হাতে বাঁশী নিয়ে নাচে, তখন আমরা মাদল বাজাই। তারা যখন গান করে, তখন কখনও বাঙ্গালা ভাষায়, কখনও হিন্দীতে, কখনও তার সঙ্গে সাঁওতালী মিশিয়ে দেয়।

সাতকড়ি। কি সুন্দর! কি বিশ্বজনীন! কি বিরাট!

শ্যামচাঁদ বাবু বলিলেন, 'ইহার মধ্যে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। হার্বার্ট্‌ স্পেন্সর্‌ বল্‌ছেন যে, 'হেটেরোজেনেটি' অর্থাৎ, রকমারির বিকাশই ক্রমোন্নতির চিহ্ন। মানবের সৃষ্টির অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই, ইহারা সকল রকম সৃষ্টি মিশাইয়া নানা রকম 'টাইপ্‌' বের করবে, এবং তাই নিয়ে দ্বন্দ্ব সংগ্রাম, আনন্দ আহ্লাদ করে' শিঙ্গে ফুঁকে দেবে।'

৩

আগন্তুক শ্যামচাঁদ বাবুর কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় কুতুহলী হইয়া পড়িল। 'মহাশয়ের কথাগুলো যদিও আমি ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, তবুও শুনতে ভাল লাগ্‌ছে'।

শ্যামচাঁদ। এতেই বুঝ্‌তে পারা যায় যে, আপনি ক্রমোন্নতির পথে যাচ্ছেন। যাইাতক লোকে বল্‌বে যে, 'আমরা ও সব বুঝি', তৎক্ষণাৎ বুঝতে হবে যে, তারা গোল্লায় গিয়েছে। আপনি যে বুঝতে চাচ্ছেন, এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ দি। এই যে 'ইভল্যুশন' অর্থাৎ 'ক্রমবিকাশ' ও 'ক্রমোন্নতি', এটা ঠিক বুঝিয়ে ওঠা যায় না। মনে করুন, এটা একটা গোলার মত জিনিস, অনাদিকাল কেবল রূপ বদলাচ্ছে। বড় বড় লোকে বলে যে, এটা একটা আদর্শের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু সে আদর্শ কি, তা কেউ ঠিক বল্‌তে পারে না। কেউ জ্ঞানের আদর্শ দিচ্ছে

দেখায় যে, এর ভেতর হ'তে এমন জীব বেরুবে যে, তাহারা মহাজ্ঞানী হয়ে সকলকে জ্ঞানে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে। কেউ ভক্তির আদর্শ দিয়ে দেখায় যে, সকলে খুব ঈশ্বরভক্ত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে সখ্যতায় আবদ্ধ হয়ে যাবে—এক হয়ে পড়্‌বে—পরস্পরের দুঃখ সমান ভাবে বেঁটে নিয়ে সকলেই সুখী হবে। কেউ কর্ম্মের আদর্শ দিয়ে দেখায় যে, সকলে বেশ বুঝে', জেনে শুনে, কর্ত্তব্যজ্ঞানে পরস্পরের হিতের জন্য কর্ম্ম কর্‌বে। সকলেই কর্ম্মযোগী, ভক্তিযোগী, জ্ঞানযোগী প্রভৃতি যোগী ঋষির মত এই সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ কর্‌বে। জীব দুঃখ পাবে না, সংসারে পাপের লেশমাত্র থাক্‌বে না। সংসার নন্দনকাননের মত হয়ে যাবে। কেউ কারু নয়, অথচ সকলেই সকলের জন্য। ভেদাভেদ থাক্‌বে না। যাহার যা খুসী তা কর্‌তে পারবে, কিন্তু তাতে কেউ মনে কষ্ট পাবে না। আরও ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলি। কোনও বর্ণাশ্রম কিংবা জাতিবিচার থাক্‌বে না। সকলে সকলের সঙ্গে, এমন কি, পশুপক্ষীদের নিয়ে, একই রকম খাবার খাবে, যখন যা জুটে উঠে। এতে যদি ব্যারাম হয়ে পড়ে, সকলে অষুধ দিয়ে সারিয়ে দেবে। ডাক্তারের পয়সা লাগ্‌বে না। সমস্ত জগৎ নিয়ে মানুষের মধ্যে একই সমাজ হবে, তার নাম 'কমিউন্'। কারও নিজের নিজস্ব অর্থ সম্পত্তি থাক্‌বে না। যখন যার দরকার হবে, সমাজ তাকে যোগাবে। এমন কাজ কেউ কর্‌বে না, যাতে অর্থের অসদ্ব্যবহার হয়। এটা প্রথমে আশ্চর্য্য ব'লে বোধ হ'তে পারে, কিন্তু ভেবে দেখ্‌লে তা নয়। আপনার ছেলেও যা, আমারও ছেলে তাই। সকলেরই সমান দাবী। কিন্তু সকলেই নিজের শক্তি অনুসারে খাট্‌বে, কেউ বসে থাকবে না। এতে বুঝতে পাচ্ছেন যে, তমোগুণটা উড়ে যাবে ও রাজসিক গুণের সমন্বয় হয়ে সাত্ত্বিকে দাঁড়াবে।

"পছন্দ সম্বন্ধে কেউ কাকে বাধা দেবে না। যার যাকে মনে ধরে, সেই রকম স্ত্রী বেছে নেবে। তার গহনা সম্বন্ধে (স্ত্রীধন) আপনার সন্দেহ হতে পারে, যে 'সেটা কার হবে?' কিন্তু আগেই বলেছি যে, সম্পত্তির উপর সমাজের সকলেরই সমান দাবী, সুতরাং গহনার জন্য কেউ লালায়িত হবে না। রাস্তায় ফেলে দিলেও চোরে চুরী করবে না, সাধারণের খাজনায় গিয়ে পৌঁছবে। দ্বন্দ্ব বিসংবাদ থাকবে না।

"এখন আপনার আপত্তি হ'তে পারে, সকলে যদি সুন্দরী নিয়ে টানাটানি করে, তবে কালোগুলো যাবে কোথায়? ঐটে মস্ত ভুল। যে রকম সমাজের কথা বলছি, সে রকম অবস্থায় উপস্থিত হ'লে চেহারা সকলেরই এক রকম হয়ে

দাঁড়াবে। দেখুন, বানরগুলোর দিকে তাকিয়ে। সব চেহারাই এক রকম। সেই রকম বাঘ, ভালুক ও হরিণ। এদের মধ্যে সৌন্দর্য্যের বিশেষ কোনও তারতম্য নাই, কাজেই প্রাণের জ্বালাও নাই, পণের ডাকহাঁকও নাই, আর পাশ-করা বর কন্যারও দর বেশী নাই। মানুষ এমন স্তরে পৌঁছবে যে, যতদূর সম্ভব, সকলে পরস্পরের সঙ্গে মিশে একই আদর্শের সৌন্দর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হবে। পাছে কোনও দর কসিতে গোলমাল হয়, এজন্য গোঁফ দাড়ী সকলে কামিয়ে ফেল্‌বে। এক রকম ভাষায় কথা কবে, এক রকম্ সুরে গান কর্‌বে, এক রকম ভাবে নাক ডেকে ঘুমুবে, এক রকম ক'রে সকলের উপর ছেলে স্কুলে পড়্‌বে, একই রকম কবিতা লিখ্‌বে, কোনটার মধ্যেই তফাৎ থাক্‌বে না। তখন একদিন ভগবান্ নিজের সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি ধ'রে করযোড়ে প্রকাশ হয়ে বল্‌বেন্ 'বস্, তোমরা ক্রমবিকাশের চরমে উপস্থিত হয়েছ, এখন আমার সঙ্গে মিশে যাও।' তার পরেই একটা প্রলয়। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হার মেনে অন্ধকারে লীন হবেন। আমি খুব সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেম।''

বিরিঞ্চি বাঁড়ুয্যে। সাংখ্য বলেন, পুরুষ প্রকৃতি উভয়েই অনাদি, ও আত্মা বহু। জীব কখনও ভগবানের সঙ্গে একেবারে মিশ্‌তে পারে না, তা হলে সৃষ্টি থাকে না।

খগেন্দ্র ডাক্তার। 'ফিভার মিক্‌শ্চরের' মত থাকে। আমরা স্পিরিট ক্লোরোফর্মের সঙ্গে নানা রকম অষুধ মিশিয়ে দিই, যেমন সিরাপ টলু, ক্যাসক্যারা প্রভৃতি। তাতে হাঁপানীও সারে, দেহও বেশ লঘু হয়।

হারাধন ঘোষ। দেখ শ্যামচাঁদ! তুমি 'কমিউনিষ্টিক আইডিয়াল্' এখানে ছড়িও না। আমার দোকানে কোন্ দিন ডাকাতী হয়ে যাবে। (আগন্তুকের দিকে সন্দিগ্ধভাবে দৃষ্টিপাত।)

আগন্তুক। আমাকে সন্দেহ করবেন্ না। আমি যদিও সাঁওতাল, কিন্তু সত্য কি, তা জানি। এই যে কমিউনিজম্ ও ক্রমবিকাশের কথা বল্‌ছেন, তা আমার মনে লাগ্‌ছে। এক সময় আমাদের সমাজও ঐ রকম ছিল। কিন্তু এখন বিগ্‌ড়ে যাচ্ছে। তবে জগতের উন্নতি হচ্ছে কেমন ক'রে?

শ্যামচাঁদ। একটা সমাজ ধ'রে উন্নতি হবে না। সকলকে মিশে ফর্সা ও জ্ঞানী সাঁওতাল হতে হবে।

৪

ক্রমে 'ট্রেণ' জামালপুর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে অতিশয়

জনতা। অনেক লোক ব্যগ্রভাবে গাড়ীতে আরোহণ করিতে উদ্যত হইল। তাহাদের মধ্যে একটি বৃদ্ধ লোক দুইটি স্ত্রীলোক লইয়া কাতরভাবে স্ত্রীলোকদের কামরায় প্রবেশ করিলেন। সেক্রেটরী গরবিনী ঘোষ চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'এটা মেয়েদের গাড়ী। পুরুষ কেউ এ'স না।'

বৃদ্ধ। আমি বুড়ো মানুষ, বসে পড়েছি মা, এখন যাই কোথায়! আমার নাম শ্রীকণ্ঠ ভটচায্‌, প্লেগের ভয়ে গয়াতে পলাচ্ছি। সেখানে আমার ছোট ভাই খুব বড় এক জন উকীল। এটি আমার শালী। বিধবা। আর ঐটি বিধবার মেয়ে, এখনও বিয়ে হয় নাই।

গোলমাল শুনিয়া সাতকড়ি সেই কামরায় প্রবেশ করিয়া গরবিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মামী! ব্যাপারখানা কি?' কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে 'ট্রেণ' গন্তব্যপথে ধাবিত হইল।

শ্যামচাঁদ বাবু পার্শ্বের গাড়ী হইতে গলদেশ বাড়াইয়া বলিলেন, 'ছাতু! গোলমাল ক'রো না, বুড়ো মানুষকে বস্‌তে দাও। যে ভিড়, এতে 'ফিমেল কম্পার্টমেণ্ট' বজায় রাখা শক্ত হবে। বরং অমন ধারা লোক দিয়ে গাড়ী ভর্ত্তি করা ভাল।'

বিমলা। ছাতুবাবু! তুমি দোরের পাশে বসে থাক। যেন অন্য ষ্টেশনে লোক ঢোকে না।

গরবিনী। (ভাগিনেয় সাতকড়ির প্রতি) বিপদে পড়া গেল। আমাদের গাড়ী 'রিজার্ভ' করা উচিত ছিল।

সাতকড়ি মাতুলানীর কথার কোনও উত্তর দিল না।

বিমলা। আহা! এরা দয়ার পাত্র! যার স্বামী নেই, সে ত দয়ার পাত্রী, আর যার স্ত্রী নেই, সে আরও দয়ার পাত্র। (বৃদ্ধের বিধবা শ্যালীর দিকে তাকাইয়া) আপনি এই দিকে আসুন, পতির উপর স্ত্রীলোকের কি ক'রে ভক্তি হতে পারে, সেই সম্বন্ধে আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছি। আপনার নাম?

বিধবা। আমার নাম মল্লিকা।

মল্লিকা প্রীতিপূর্ব্বক বিমলার নিকট উঠিয়া গেল। মল্লিকার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। খুব সুন্দরী। মল্লিকার কন্যা গোলাপ (যাহার বিবাহ হয় নাই) তাহার প্রায় তের, কিংবা তাহা হইতেও বেশী বয়স। সে যথার্থই একটি অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী গোলাপ!

সাতকড়ি চিন্তাপন্ন হইয়া তাহার রূপ দেখিতেছিল। সে মনে করিল,

'ক্রমবিকাশ হ'লে বোধ হয় সকলেরই এমনি রূপ হবে, তখন আর রূপের লালসা থাকবে না।'

এই রকম ভাবিয়া এবং নানাপ্রকার সরস কাব্য মনে গড়িয়া সে ক্রমাগত চক্ষু বুজিয়া ঢুলিতে লাগিল।

গরবিনী ঘোষের পূর্ব্ব হইতেই প্লেগের কথা শুনিয়া একটা আতঙ্ক হইয়াছিল। তিনি তাঁহার বিরাট স্থূল দেহ কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া গোলাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদের বাড়ীতে ইঁদুর মরেনি ত?'

গোলাপ। না। কিন্তু আমাদের বাড়ীর পাশে মরেছিল।

গরবিনী ক্রমেই ভীতা হইয়া পড়িতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসিলেন, 'প্লেগ হ'লে কি রকম হয়?'

গোলাপ। নেশার মত হয়। জ্বর হয়। গিল্‌টি বেরোয়। বিকার হয়। এই ত শুনেছি।

গরবিনীর বোধ হইল যে হয় ত গোলাপের সম্মুখে বসিয়া থাকাতে সাতকড়ির নেশার মত হইয়াছে। আবার ভাবিলেন, 'এক জনের কাছে আর এক জন বস্‌লেই কি প্লেগ হয়?'

সাতকড়ি তখন সম্পূর্ণভাবে কাব্য-জগতে গিয়াছিল, এবং মধ্যে মধ্যে গোলাপের রূপ মানসে ছন্দোবদ্ধ করিতেছিল; পুনরপি চক্ষু-মুদ্রিত করিয়া বিভোর হইয়া পড়িতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে পাঞ্জাবী আস্তীন গুটাইয়া তাহার সবল, সুন্দর, দৃঢ়, মাংসপেশীসম্পন্ন বাহুদ্বয় উপরিস্থ 'বংকে' প্রসারিত করিয়া মায়াময় সংসারের 'বাস্তব' ভাবটুকু গ্রহণ করিতেছিল।

গরবিনী। আচ্ছা তোমরা এতদিন প্লেগের মধ্যে ছিলে, ভয় হয় নাই?

গোলাপ। আমরা 'টীকে' নিয়েছিলুম।

সর্ব্বনাশ! তবে ত সত্ত প্লেগের বিষ শরীরে? এবং সাতকড়ির শরীরে সেটা নিশ্চয় সংক্রামিত হইতেছে মনে করিয়া গরবিনী ঘোষ ডাকিলেন, 'ছাতু!'

সাতকড়ি। অ্যাঁ?

গরবিনী। এ দিকে স'রে আয়। দেখছিস্‌নে,—ওরা টীকে নিয়েছে?

সাতকড়ি। (আশ্চর্য্য হইয়া) বল্‌ছ কি মামী! একদিন হয় ত আমাদের লড়াইয়ে যেতে হবে, হয় তুর্কীস্থান কিংবা পারস্যদেশ পার হ'তে হবে। হয় ত যত রকম টীকে আছে, প্লেগের, বসন্তের, ওলাউঠার, শেয়াল-কুকুরে কামড়াবার, সব রকম নিয়ে যেতে হবে। আমি কি ও সব গ্রাহ্য করি?

গরবিনী ঘোষ সত্রাসে মুখব্যাদান করিলেন।

মিস্ নিস্তারিণী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'ঠিক ত! পুরুষ মানুষের ভয় করিলে চলিবে কেন?'

ইহাতে গরবিনী ঘোষ একটু চটিয়া গেলেন। তাঁহার মনে মনে কল্পনা ছিল যে, নিস্তারিণীর সহিত সাতকড়ির বিবাহ দিয়া সার্থক হইবেন। নিস্তারিণীর বীরত্বের উচ্ছ্বাসে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'তোমার বিয়ে হলে স্বামীকে যেতে দেও কি না দেখা যাবে।'

ইহাতে নিস্তারিণী ও সাতকড়ি উভয়েই লজ্জিত হইল। গোলাপ উঠিয়া তাহার মাতার নিকট গিয়া বসিল।

বৃদ্ধ শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য একমনে হরিনাম করিতেছিলেন।

৫

গয়াধামে উপস্থিত হইয়া সকলেরই হারাধন ঘোষের 'ফ্যামিলী-পাণ্ডা'দের বাটীতে উঠিবার কথা ছিল। শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার শ্যালী মল্লিকা ঠাকুরাণী বলিলেন যে, তাহা কখনই হইতে পারে না। শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের অগ্রজ নীলকণ্ঠ বাবু উকীলের খুব বড় তেতালা বাটী খালি ছিল, সেখানে যাইতে তাঁহারা সকলকে অনুরোধ করিলেন। গয়ালী ঠাকুরও আপত্তি করিলেন না। বিদেশে এক জন সহায় থাকা ও পরামর্শ দিবার লোক থাকা নিতান্ত দরকার; বিশেষতঃ, নীলকণ্ঠ বাবুর মত লোকের নিতান্ত দরকার। সকলে শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যকে শ্রাদ্ধের পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন।

তাই সকলে গাড়ী করিয়া বড় বাটীতে উঠিলেন, এবং নীলকণ্ঠ বাবু তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। ক্রমে প্রকাশ পাইল যে, নীলকণ্ঠ বাবু শ্যামচাঁদ উকীলের সঙ্গে 'রিপন কলেজে'র আইনের ('ল') ক্লাসে একত্র পাঠ করিতেন, এবং শ্যামচাঁদের অনুপস্থিতিকালে নীলকণ্ঠ; এবং নীলকণ্ঠের অনুপস্থিতিকালে শ্যামচাঁদ 'রোল কল্' হইলে 'উপস্থিত' লিখাইয়া দিতেন। তাহা মনে পড়িয়া উভয়ের পুরাতন স্মৃতি জাগরূক হইল, এবং পরস্পরের গলদেশে বাহুবেষ্টন করিয়া উভয়ে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিলেন। আহা! বাল্যকালের প্রণয় কি মধুর!

কাজেই, নীলকণ্ঠ বাবুর স্ত্রী শ্যামচাঁদের কন্যা নিস্তারিণীকে ধরিয়া লইয়া গেলেন, এবং মল্লিকা ঠাকুরাণী খগেন্দ্র ডাক্তারের স্ত্রী বিমলাকে লইয়া গেল।

সুতরাং শ্যামচাঁদ বাবু ও খগেন ডাক্তার নীলকণ্ঠ বাবুর বাটীতেই বিশ্রাম লাভ

করিতে গেলেন। হারাধন বাবু সস্ত্রীক ভাগিনেয় সাতকড়ির সহিত বড় বাটীর ত্রিতল অধিকার করিলেন। ঝি তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল।

হারাধন গাঙ্গুলী তাঁহার মাতা দুর্গাঠাকুরাণীর সহিত দ্বিতলে গিয়া উঠিলেন।

গায়ক গদাধর ভট্ট, এবং বাদক তদীয় শ্যালক, এবং সেই শ্যালকের স্ত্রী মালতী বৈষ্ণবী নিম্নতলে গীতবাদ্যের আয়োজন করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পরেই গদাধর ভট্ট কীর্ত্তন আরম্ভ করিল, এবং তদীয় শ্যালক খোল লইয়া চাঁটী দিতে লাগিল, এবং মালতী চক্ষু মুদিয়া করতাল লইয়া বসিয়া গেল। নিম্নতলস্থ গৃহ একটা 'ট্রেঞ্চের' মত, এবং বিকট মশার উপদ্রব। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মধুর শ্যামনাম পাড়া মাতাইয়া তুলিল। এক জন হিন্দুস্থানী চৌবে (কানাইলাল ঢেঁড়ীর শিষ্য) ইস্রার হস্তে সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি লেগে যেতে পারি কি?'

মালতী খুব খুসী হইয়া বলিল, 'লাগ!' গদাধর মাথা দোলাইয়া অনুমোদন করিল।

চৌবেজী লাগিয়া গেলেন। সুরও লাগিয়া গেল। কীর্ত্তন বড় মধুর, এবং ইস্রার-সহযোগে তাহা মধুরতর হইয়া সকলকে বিভোর করিয়া তুলিল। চৌবেজীর পরিবার ও বন্ধুবান্ধব আসিয়া আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া পড়িল। এক জন বলিল, 'বাঙ্গালীরা প্রেমের সর্দ্দার, 'গজব্' করিয়া দেয়।'

চৌবেজী অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিতে লাগিলেন, 'আহা! ইঁহাদের নিতাই আমাদের বৃন্দাবন দ্বিতীয় বার বসাইয়াছিলেন। প্রেমের প্রচার বাঙ্গালীই আবার করিবে।'

গান শেষ হইলে চৌবেজীর পরিবার প্রকাণ্ড থালা পরিপূর্ণ করিয়া লুচী এবং মিষ্টান্ন লইয়া আসিল। বিরিঞ্চি বাঁড়ুয্যে বাহিরে বসিয়া ক্ষুধা সম্বন্ধে নীরবে আলোচনা করিতেছিল। সে গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, 'গরীবের মা বাপ ভগবান্, গোলোকের হরি।' ইহা বলিয়া সে লুচী ও মিষ্টান্নের শ্রাদ্ধে মনোযোগী হইল।

আর মালতী? সেও বড় কম নয়। সে খইচুর তৈয়ারী করিয়াছিল, সেগুলি লইয়া চৌবেজীর দলের সম্মান রক্ষা করিল। মালতী পরিবেশন করিল, চৌবেজীর দল খাইল, চৌবেজীর স্ত্রী ও কন্যা পরিবেশন করিয়া গদাধর ভট্টের দলকে খাওয়াইল। বিরিঞ্চি বাঁড়ুয্যে বলিলেন যে, 'যদিও আত্মা বহু, কিন্তু মুক্তিকালে পরস্পরের সহিত মিশিয়া থাকে।'

চৌবেজী। এই দৈবীপ্রকৃতির ভাবই সাংখ্যের মুক্তিপথ। ইহাঁতেই পরমপুরুষকে বুঝিয়া লইতে হইবে। আমরা সকলে বৃন্দাবনে গিয়া পুনর্ব্বার ইহার বিচার করিব।

ইহা বলিয়া চৌবেজী বারখানা লুচী গলাধঃকরণ করিলেন।

অতিশয় বৈষ্ণবী-ভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িল, এবং অনেকে বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত করিতে বসিয়া গেলেন।

এমন সময় সাতকড়ি দ্বিতল হইতে নিম্নে আসিয়া চৌবেজীর সহিত আলাপ করিল, এবং তাঁহার 'পাহলওয়ানি' শরীর দেখিয়া একদিন 'কুস্তি' লড়িবার প্রস্তাব করিল; তাহাতে উভয়ের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হইয়া পড়িল। চৌবেজী বলিলেন, 'আপনারা কিছুদিন এখানে থাকুন। এখানে আপনাদের মত ওস্তাদ বাঙ্গালী নাই।'

সাতকড়ি। কথাটা ঠিক। ওস্তাদী দেখাইবার স্থান সবই বাঙ্গালার বাহিরে। প্রেমের ওস্তাদ যাঁরা, তাঁহারা জগন্নাথধাম কিংবা বৃন্দাবনে যান; শ্রাদ্ধের ওস্তাদ গয়াতে আসেন; গানের ওস্তাদ পশ্চিমে চলিয়া যান। কেবল যাঁহারা কাব্যে ওস্তাদ, কিংবা দোকানদারীতে, তাঁহারাই কলিকাতায় থাকেন। আমার একটি বন্ধু চাকুরীর চেষ্টায় বিহারে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শুনিতে পাইলেন যে, এখানে এখন চাকুরী করা চলিবে না, তবে শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মে বাধা নাই। তিনি সেই জন্য যজমানী কার্য্যে রত হইয়া গিয়াছেন।

চৌবেজী বলিলেন, 'নিশ্চয়! যাহারা শিক্ষা দিতে আসে, তাহাদের সকলেই ভালবাসে, কিন্তু ঠকাইয়া পয়সা কামাইতে গেলে চক্ষুঃশূল হইয়া পড়িবে নিশ্চয়। আসুন, আমরা পরস্পরকে শিক্ষা দিই।'

৬

যদিও গয়াধামে মশকের অতিশয় দৌরাত্ম্য, তবুও আহার অধিকপরিমাণে হওয়াতে, এবং নূতন রক্তকণিকার উৎপত্তি হওয়াতে, কেহই সে সম্বন্ধে আপত্তি করে নাই। বিশেষতঃ গদাধরের গান, এবং তদীয় শ্যালকের বাজনা, এবং মালতী বৈষ্ণবীর খঞ্জনীর প্রভাব কর্ণে লাগিয়া থাকাতে নিদ্রা সহজেই চক্ষু ও নাসিকা প্রভৃতি সুরম্য স্থান সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছিল। তীর্থস্থানে সুনিদ্রা স্বতঃই পুণ্যসংস্পর্শে হইয়া থাকে। কেহই স্বপ্ন দেখে নাই, তবে প্রাতঃকালে শুনিতে পাওয়া গেল যে, সাতকড়ি একবার প্লেগের ভয়ে ডরাইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে কথা কাহাকেও প্রকাশ করিয়া বিরক্ত করে নাই।

পরদিন প্রাতঃকালের উল্লেখযোগ্য বিষয়।—

১। সাতকড়ির সহিত চৌবেজীর মল্লযুদ্ধ। এবং সাতকড়ির জয়, তজ্জনিত বাঙ্গালীর গৌরববর্দ্ধন।

২। ধনকুবের হারাধন ঘোষের পিতৃপিণ্ডদান ও কাঙ্গালী ভোজনের যোগাড়।

৩। সাতকড়ির সহিত মিস্ নিস্তারিণীর বিবাহের আয়োজন।

৪। হারাধন গাঙ্গুলীর সহিত গোলাপবালার বিবাহের ঘটকালী।

উপরি-উক্ত কয়েকটি ঘটনা একদিনে কি প্রকারে উপস্থিত হইল, তৎসম্বন্ধে পাঠকবর্গের কৌতূহলনিবৃত্তি করা উচিত।

হারাধন গাঙ্গুলী গোলাপবালাকে দেখিবামাত্র যে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার অভিলাষী হইয়াছিলেন, এ কথা শ্রাদ্ধসমিতির মধ্যে প্রথমে প্রকাশ পায় নাই। বেলা নয়টার সময় হারাধনের মুখমণ্ডল ম্লান দেখিয়া তদীয় মাতৃদেবী দুর্গাঠাকুরাণী কোনও প্রকারে সন্তানের মনের কথা বাহির করিয়া শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের নিকট বিরিঞ্চি বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠাইয়াছিলেন। ঘটক মহাশয়ের প্রস্তাব শুনিয়া শ্রীকণ্ঠ তদীয় শ্যালিকা মল্লিকার (গোলাপের মাতা) সহিত অনেকক্ষণ কথোপকথন করিয়া, এবং ভ্রাতা নীলকণ্ঠ উকীলের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া, অবশেষে ব্যক্ত করিলেন যে, 'দোজ্ বরে' বিবাহ দিবার যদিও সকলের ইচ্ছা নহে, তথাপি কন্যার 'অলঙ্কার বাবত্' পাঁচ হাজার টাকা নগদ গণিয়া দিলে কাহারও আপত্তি থাকিবে না।

বলা বাহুল্য যে, এ কথা শুনিয়া দুর্গাঠাকুরাণীর চক্ষুঃস্থির হইয়া পড়িল। তিনি চীৎকার করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন, এবং তারস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

সাতকড়ি চৌবেজীর মল্লযুদ্ধে জয়ী হইয়া সগৌরবে ত্রিতলে মাতুলের নিকট যাইতেছিল। দ্বিতলে ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া সে বীরসুলভচিত্তে হারাধন গাঙ্গুলীর গৃহে প্রবেশ করিল। হারাধন তখন হতাশ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সাতকড়ি ধূলিলুণ্ঠিতা এবং শোকাভিভূতা দুর্গাঠাকুরাণীর হাত ধরিয়া উঠাইল। দুর্গাঠাকুরাণী বাধা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেও?'

সাতকড়ি। আমি ছাতু।

দুর্গা। বাবা ছাতু! তুই ত আমার ছেলের মত। তোরা থাক্‌তে আমার হারাধনের বিয়ে হবে না, প্রাণে কি তা সয়?

সাতকড়ির বীরহৃদয় করুণায় ভরিয়া গেল।

'তোমার কোনও ভাবনা নাই। হারুদাদার বিয়ে আমি দিব। যত টাকা লাগে।'

দুর্গা। দেখ বাবা, তীর্থস্থানে কোনও কথা দিও না। যদি না পার?

তাহার পর দুর্গাঠাকুরাণী গোলাপের কথা ও তাহার মাতা মল্লিকার দাবীর কথা প্রকাশ করিলেন।

সাতকড়ি হাসিয়া বলিল, 'তার জন্য ভাবনা কি? এখনি তার কিনারা কচ্ছি।'

ইহা বলিয়াই সাতকড়ি এক লম্ফে ত্রিতলে গিয়া উপস্থিত। গৃহে প্রবেশ করিয়া সাতকড়ি ডাকিল, 'মা!' [সাতকড়ি তাহার মাতুলানী গরবিনী ঘোষকে আদর করিয়া 'মা' বলিয়া ডাকিত।]

সেক্রেটরী গরবিনী ঘোষের আজি কত আনন্দ! তিনি সাতকড়ির মস্তকের আঘ্রাণ লইয়া বলিলেন, 'বাবা, তুই আজ বাঙ্গালীর নাম রেখেছিস্। এখন আমার কথাটা রেখে নিস্তারিণীকে বিবাহ ক'রে ফেল্।'

সাতকড়ি মাতুলানীর হাত ধরিয়া বলিল, 'মা, আমি তোমার কথা রাখ্‌ব, যদি তুমি আমার কথা রাখ। সে কথাটা খুব ছোট। হারুদাদা গোলাপকে বিয়ে কর্ত্তে চায়, কিন্তু দশ হাজার টাকা চাই। সে টাকা তুমি দাও। এক জন মলিন মুখ ক'রে ব'সে থাকবে, আর আমি বর সেজে যাব, এ কখনও হতে পারে না। আমার এ কথাটা যদি না রাখ, তবে আমি আজই মেসোপোটেমিয়ায় চলে' যাব।'

দশ হাজার টাকা ধনকুবের হারাধন ঘোষের সহধর্ম্মিণী গরবিনী ঘোষের নিকট তুচ্ছ সামগ্রী। তাঁর ভয় ছিল যে, ছাতু পাছে 'প্লেগ রোগী' গোলাপের জন্য একটা গোলমাল উপস্থিত করে, এবং চটিয়া যুদ্ধে চলিয়া যায়। সুতরাং তিনি সহাস্যমুখে, অম্লানবদনে, পাঁচ হাজার টাকার নোট তৎক্ষণাৎ গণিয়া দিলেন।

সাতকড়ি মাতুলানীর চরণধূলি লইয়া দ্বিতলে ফিরিয়া আসিল, এবং হারাধন গাঙ্গুলীর হাত ধরিয়া বলিল, 'হারু দাদা, আজ তোমার সুখেই আমার আনন্দ।'

দুর্গাঠাকুরাণী এখন সত্য সত্যই কাঁদিয়া বলিলেন, 'বাবা, মানুষের মধ্যে দেবতা থাকে ত তুমি। আমরা ব্রাহ্মণ হয়েও ছার!'

ত্রিতলে হারাধন ঘোষ পিতৃপিণ্ডদান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখ প্রফুল্ল। গরবিনী তাঁহাকে সব কথা বলিল।

হারাধন ঘোষ হাসিলেন। 'এ পাঁচ হাজার টাকা ব্রাহ্মণকে দান করিয়া আমরা আজ সার্থক। আরও পাঁচ হাজার টাকার দুআনি আমি নিয়ে এসেছি। কাঙ্গালীদের কন্যা সন্ধ্যাকালে দান করিব। তুমি বিয়ের আয়োজন কর।'

৭

সাতকড়ির অসাধারণ বীরোচিত বদান্যতা রাষ্ট্র হইয়া পড়াতে গয়াধামের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে 'সাধু! সাধু!' বাক্য উচ্চারিত হইতেছিল। চৌবেজী ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, 'এই রকম বীরপুরুষের নিকট কুস্তিতে পরাজিত হওয়া গৌরবের ও স্পর্দ্ধার বিষয়।'

আজ ত্রিবিধ মহা সমারোহ। ছাতুর বিবাহ, হারাধন গাঙ্গুলীর বিবাহ, এবং হারাধন ঘোষের পিতৃপিণ্ডদানসম্পর্কীয় কাঙ্গালী ভোজন। অনেকের ইচ্ছা ছিল যে, এত বড় তিনটি ব্যাপার তিন দিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইলে ভাল হইত। কিন্তু পঞ্জিকায় অদ্যই এ মাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শুভদিন। সুতরাং আর কোনও উপায় নাই।

এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিবার নিমিত্ত শ্রাদ্ধসমিতির মেম্বরগণ উকীল নীলকণ্ঠ বাবুর বাটীতে একত্র হইলেন। পাড়ার অনেক ভদ্রলোকও আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথম প্রস্তাব—'উভয় বিবাহ এক সময়ে কি করিয়া সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে?'

অনেকে বলিলেন যে, এক বাটীতে দুইটী বিবাহ একত্র দেওয়া এক রকম অসম্ভব। কারণ, প্রথমতঃ স্থানাভাব। যদি দুই বাটীতে, অর্থাৎ নীলকণ্ঠ বাবুর 'বসতবাটী' ও 'ভাড়াটীয়া' বাটীতে, কার্য্য সম্পন্ন করা হয়, তবে এক সময় বিবাহক্রিয়া ঘটিতে পারে না; কারণ, উভয় পক্ষই শ্রাদ্ধসমিতিভুক্ত। দলে বিভাগ উপস্থিত হওয়া কাহারও অভিপ্রেত নহে।

শ্যাম উকীল উঠিয়া বলিলেন, 'এ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা সংক্ষেপে বলি। ঠিক হিন্দুমতে আমার বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা নাই। ভট্টাচার্য্য মন্ত্র উচ্চারণ করুন, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু স্ত্রীআচার প্রভৃতির প্রথা আমি অনুমোদন করি না।'

এক জন আগন্তুক ভদ্রলোক চটিয়া বলিলেন, 'ইহার কারণ আপনাকে বলিতে হইবে, নচেৎ এ বাটীতে কেহ জলগ্রহণ করিবে না।'

একটা ঘোর কলহ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া নীলকণ্ঠ বাবু বলিলেন, 'ঘোষজা মহাশয়ের মত কি?'

হারাধন ঘোষ। আমি বৈষ্ণব-প্রকৃতির লোক, আপনারা যাহা সাব্যস্ত করিবেন, তাহাতেই আমি রাজি।

খগেন ডাক্তার উঠিয়া বলিলেন, 'চটাচটির কোনও দরকার নাই। আধুনিক প্যাথলজির মতে একটা নূতন ব্যাধির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার নাম 'ফাইলেরিয়া'। এই ব্যায়রামটার 'জার্মস্' ম্যালেরিয়ার মত মশকদংশন দ্বারাই আমাদের শরীরে সঞ্চারিত হয়। তাহার ফলে 'মৃত্যুবৎ' অর্থাৎ, পা ফুলিয়া অমাবস্যা পূর্ণিমায় জ্বর হয়। আজ পূর্ণিমা, সুতরাং অধিক রাত্রি জাগরণ করিলে গয়াধামের মশক নিশ্চয় স্বধর্ম্মবশবর্ত্তী হইয়া সকলকে, বিশেষতঃ উভয় পক্ষের আত্মীয় কুটুম্বকে আক্রমণ করিবে। অতএব সকলকে পূর্ব্বেই সাবধান করিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।'

বিরিঞ্চি বাঁড়ুয্যে বলিলেন, 'সাংখ্যমতে আত্মা বহু, কিন্তু বেদান্তমতে পরমাত্মা একই, সুতরাং বহু আত্মার দুঃখ পরমাত্মাতেই বর্ত্তে। যদি বিবাহপ্রথার পরিবর্ত্তনে আপনারা এ বাটীতে জলগ্রহণ না করেন, তবে তাহারও সুন্দর উপায় আছে। পাতঞ্জলের মতে, আপনারা গাঙ্গুলী মহাশয়ের বিবাহে লুচী কালিয়া প্রভৃতি ভাড়াটিয়া বাটীতে বসিয়া আহার করুন, এবং তথায় জলগ্রহণ এবং আচমনাদি শেষ করিয়া এ বাটীতে আসিবেন, এবং জৈমিনিদর্শন অনুসারে এখানে সন্দেশ ও রসগোল্লা প্রভৃতির সহযোগে উদরের অবশিষ্ট ভাগ পূরণ করিয়া রাত্রি বারটার সময় বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন। ন্যায়দর্শন মতে ইহাতে কোনও আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না, এবং ধর্ম্মও নির্ভীকভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে পারে।'

অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হইয়া গেল ঃ—

১। হারাধন গাঙ্গুলীর সহিত গোলাপবালার বিবাহ গোধূলিলগ্নে ভাড়াটিয়া বাটীতেই হইবে। সেখানে হিন্দুমতে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া বর কন্যা রাত্রি নয়টার সময় বাসরঘরে চলিয়া গেলে, গোঁড়া হিন্দুবর্গ লুচী তরকারী প্রভৃতি আহার করিবেন, এবং সেই সময়টুকু বর ও কন্যা স্ত্রীলোকবেষ্টিত হইয়া বাসরঘরে বিশ্রাম করিবে। বাহিরে পিণ্ডদানের কাঙ্গালীভোজন হইবে।

২। রাত্রি দশটার সময় পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে সমগ্র শ্রাদ্ধসমিতি ও নূতন বর কন্যা, বরযাত্রী সমভিব্যাহারে বাজনা বাজাইয়া এবং কাঙ্গালীগণকে স্বীয় দলভুক্ত করিয়া পুনরায় নীলকণ্ঠ বাবুর বাটীতে আসিবেন।

৩। সেখানে হিন্দু, ব্রাহ্ম ও বৈষ্ণব মতের সামঞ্জস্য করিয়া একটা মতে

সাতকড়ি বাবুর সহিত মিস্ নিস্তারিণী বসুর বিবাহ হইয়া গেলে, গোঁড়া হিন্দুবর্গ কেবল সন্দেশ আহার করিয়া বাটী চলিয়া যাইবেন, এবং সেখানে গিয়া জলপান করিবেন। নব্যদল (অর্থাৎ 'রিফর্ম্মড্' ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব প্রভৃতি) যাহার যেমন ইচ্ছা, 'করি', 'কট্‌লেট্', 'চপ্' প্রভৃতি আহার করিয়া, সোডা, লেমোনেড্ ইত্যাদি ইত্যাদি পান করিবেন, এবং দম্পতীযুগল[দ্বয়]-কে আশীর্ব্বাদ করিয়া বাটী ফিরিবেন।

৪। তাহার পর নীলকণ্ঠ বাবুর বাটীতে একটা 'কোপারেটিভ্ বাসরঘর' হইবে, অর্থাৎ একই বাসরে উভয় বর, এবং উভয় কন্যা বিরাজ করিবেন, এবং উভয় পক্ষের স্ত্রীলোক সকলে মিলিয়া গান এবং বাক্যালাপ, হাস্য এবং পরিহাস করিয়া, এবং সুখ দুঃখের কথা কহিয়া, রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কাটাইবেন।

৫। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর মশার দৌরাত্ম্য হইলে সকলে চলিয়া যাইবে, এবং বাটী নিস্তব্ধ হইয়া পড়িবে। কেবল মধ্যে মধ্যে নৈশবায়ু বহিবে, এবং চন্দ্রালোক বাতায়ন দিয়া প্রবেশ করিবে, এবং নিদ্রাদেবী নবদম্পতীর সম্ভাষণের অপেক্ষা করিবে।

৮

উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্ববাদিসম্মত হইলে সভা ভঙ্গ হইল, এবং বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল।

গদাধর এবং তদীয় শ্যালক, এবং সেই শ্যালকের স্ত্রী খোল খরতাল প্রভৃতি লইয়া কাঙ্গালী বিদায়ের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। দানাপুর, পাটনা এবং নানা স্থান হইতে ব্যাণ্ড ও রসনচৌকি আসিয়া নীলকণ্ঠ বাবুর বহির্বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বেই নানা স্থান হইতে গাড়ী ও এক্কার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে এক শত ঘোড়ার গাড়ী ও দেড় শত এক্কা আসিয়া জুটিল। ধনকুবের হারাধন ঘোষের ইচ্ছামতে গয়ার কাঙ্গালীগণ এক্কা করিয়া আনীত হইলে, সকলে সারি সারি রাস্তার দুই পার্শ্বে এক মাইল ধরিয়া বসিয়া গেল। পুলিসের দারোগা বলদেব বাবুর সুবন্দোবস্তে কোলাহলের লেশমাত্র ছিল না, কেবল প্রতীক্ষা ও আনন্দ! আনন্দ ও প্রতীক্ষা!

গদাধর ভট্টাচার্য্য ও তদীয় শ্যালক ও শ্যালকের স্ত্রী কাঙ্গালীগণের অভ্যর্থনার ভার লইলেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ভাড়াটিয়া বাটীতে বিবাহের আয়োজন হইয়া গিয়াছিল।

গোধূলি লগ্নে সুচারুভাবে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল, এবং হারাধন গাঙ্গুলী সস্ত্রীক বাসরঘরে বিশ্রাম লাভ করিলেন। গোঁড়া হিন্দুবর্গ লুচী প্রভৃতি লইয়া যথাস্থানে অবস্থিত হইলে, বাহিরে কাঙ্গালীভোজন আরম্ভ হইল।

এমন সময় একটা মহা কোলাহল উত্থিত হইল। প্রায় পঞ্চ শত সাঁওতাল, পুরুষ এবং স্ত্রী, কেহ ধনুর্ব্বাণ এবং কেহ মাদল হস্তে ষ্টেশন হইতে আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের দলপতি চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এখানে সাতু বাবু আছেন ?'

লম্ফ দিয়া সাতু বাহিরে আসিয়া বলিল, 'হাঁ।'

দলপতি আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত হরকালী মাঝি। পাঠকবর্গের মনে থাকিতে পারে যে, ইহারই নিকট শ্যামচাঁদ বাবু রেলের গাড়ীর উপর 'ক্রম-বিকাশ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। হরকালী সাতুর বিবাহের সংবাদ পাইয়া রাতারাতি দলবল সমেত গয়াতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

তুমুল কাণ্ড! সাঁওতালগণ মাদল বাজাইয়া নৃত্যগীতে রত হইল। সেই তালে কাঙ্গালীগণ ভোজন আরম্ভ করিল। সাড়া পাইয়া ব্যাণ্ড ও রসনচৌকির দল উন্মত্ত হইয়া তাহাদের সহিত মিশিয়া গেল, এবং গদাধর ভট্টাচার্য্য সেই সুযোগে গয়ালীদিগকে লইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন জুড়িয়া দিলেন। ঘোর কোলাহলে সান্ধ্য-গগন সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ ধনকুবের হারাধন ঘোষ অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন, 'আলো জ্বেলে দে', 'দুআনি আন্'।

অমনই সহস্র আলোক জ্বলিয়া উঠিল। হারাধন ঘোষ বলিলেন, 'এবার দুআনি ছড়াইয়া দে।'

সরদার হরকালী মাঝি মালসাট্ মারিয়া সম্মুখে উপস্থিত। 'হজুর! এ স্থলে দুআনি ছড়াইয়া দিলে একতান বাদ্যের বাধা পড়িবে।'

হারাধন। হরকালী! এটা শ্রাদ্ধের দান। সুতরাং সকলে মিলে লেগে যাও।

হরকালী 'তথাস্তু' বলিয়া সেই পাঁচ সহস্র টাকার দুআনি পথে ওতপ্রোত-ভাবে বিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল।

এই সংবাদ সহরে রাষ্ট্র হওয়াতে প্রায় দুই সহস্র লোক একত্র হইয়া সেই দুআনি কুড়াইতে লাগিল। কেহ কাহারও স্কন্ধে, কেহ পৃষ্ঠে, কেহ দৌড়িয়া, কেহ স্থিরভাবে বসিয়া, কেহ চিৎপাৎ হইয়া, সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রজতখণ্ড-সংগ্রহার্থ নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিল।

এ হেন গণ্ডগোল ইতিহাসে বিরল। গ্রীকসম্রাট আলেকজন্দর পুরু-রাজ-সৈন্যকে পরাস্ত করিবার কালে অনেকটা এই রকম ঘটনা ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহা যুদ্ধস্থলে, দানস্থলে নহে।

ইত্যবসরে সুযোগ পাইয়া বালকের দল সেই বিরাট শ্রাদ্ধ ও শুভবিবাহের পালা ছন্দোবদ্ধ করিয়া কবিতার কাগজ 'প্রেস' হইতে ছাপাইয়া আনিয়াছিল; তাহা বিলাইতে লাগিল।

কবিতাগুলির বিশেষত্ব এই যে, তাহা বাঙ্গালা, হিন্দী ও সাঁওতালী ভাষা মিশ্রিত। সকলে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, 'অতি সুন্দর কবিতা! অতি সুন্দর প্রাদেশিক একতা! অতি সুন্দর ভবিষ্যৎ-সমাজ-বোধ!' বাস্তবিক যে উভয় প্রদেশ এক কালে মিশিয়া একই আচার ব্যবহার এবং একই ভাষা অবলম্বন করিবে, সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না।

তখন শ্রাদ্ধসমিতির সেক্রেটরী গরবিনী ঘোষ সদলে দ্বিতলের বারান্দার উপর দাঁড়াইলেন। তৎক্ষণাৎ সমাজ নিস্তব্ধ।

'আপনাদিগের অনুমতি হইলে এখন অন্য বিবাহটি আরম্ভ হইতে পারে।'

মহা নির্ঘোষের সহিত সকলে বলিল, 'নিশ্চয়।'

শুভক্ষণে শ্রাদ্ধসমিতির স্ত্রী ও পুরুষ দলবল সহিত ধীরে ধীরে নীলকণ্ঠ বাবুর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে পূর্ণিমার আলোকোদ্ভাসিত ও বহু পুষ্প এবং পত্রে শোভিত বিস্তীর্ণ বারান্দায় কন্যাপক্ষের সকলে প্রফুল্লমুখে বরপক্ষীয় লোকের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

৯

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, এবারকার বিবাহটা ঠিক হিন্দুমতে নহে। সুতরাং সকলেরই পরিচ্ছদ কিঞ্চিৎ নব্য ধরণের। এমন কি, হারাধন গাঙ্গুলী বিবাহের পরেই পট্টবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় হ্যাট, কোট এবং 'টাই' প্রভৃতি সুন্দর ভাবে পরিধান করিয়াছিলেন। কন্যাপক্ষীয় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের মধ্যে যাঁহারা 'ডোমিসাইল্‌ড্‌' বাঙ্গালী, তাঁহারা একপ্রকার টুপী মস্তকে পরিধান করিয়া আসিয়াছিলেন, সেগুলি 'ডোমিসাইল ক্যাপ্‌' বলিয়া আখ্যাত। বিশেষত্ব ইহাই যে, সেগুলি ঝাড়িলে সূক্ষ্ম শক্তুচূর্ণ বাহির হয়।

শ্যামচাঁদ বাবু সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, 'আমি এ পক্ষের কন্যাকর্ত্তা, তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই, আমার বাল্যবন্ধু নীলকণ্ঠ বাবুর স্ত্রী আমার পরিবর্ত্তে কন্যাদানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। (সকলে—'সাধু')।

'সুতরাং কন্যাদানের পূর্ব্বে আমি গোটাকতক কথা বলিতে ইচ্ছা করি। এই গয়াধামে আমরা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আসিয়াছিলাম, কিন্তু সকলের প্রীতি অতিশয় বর্দ্ধিত হওয়াতে শেষে তীর্থফল বিবাহে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সকলে (অতি সুখের বিষয়)।

'আধুনিক সমাজে আমরা যাহারই অনুষ্ঠান করি না কেন, তাহা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের পিণ্ডদান ছাড়া আর কিছুই নহে। পূর্ব্বে বিবাহের পূর্ব্বে 'নান্দীমুখ' নামক একটা সুন্দর প্রথা ছিল; এখন তাহার বিশেষ দরকার হয় না, কারণ, বিবাহের পূর্ব্বে দান, পণ ইত্যাদি যত রকম শুভকর্ম্ম, সকলই নান্দীমুখের ছাঁচে ঢালা। এটা বোধ হয় বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। (সকলে—'মোটেই না।')

'কিন্তু অদ্যকার বিবাহে আমরা সকলেই গৌরবান্বিত। কারণ, আমাদিগের শ্রাদ্ধসমিতির মাননীয়া সেক্রেটরী সর্ব্বলোকপ্রশংসিতা শ্রীমতী গরবিনী ঘোষ এ বিবাহে পণ প্রভৃতি লওয়া দূরে থাকুক, কন্যাকে নিজেই বহুমূল্য অলঙ্কারে বিভূষিতা করিয়াছেন, এবং গয়াধামে একটা চিরস্থায়ী শ্রাদ্ধসমিতির প্রতিষ্ঠার্থ বিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। (সকলে সহর্ষে 'বিরাট দান, সাধু সদ্ব্যয়!')

ইহা ছাড়া, যাহারা ভবিষ্যতে এখানে শ্রাদ্ধ করিতে আসিয়া বিবাহ করিয়া যাইবেন, কিংবা বিবাহ করিতে আসিয়া শ্রাদ্ধ সারিয়া যাইবেন, তাঁহাদের জন্য সেক্রেটরী মহোদয়া একটা বিশ্রামাগার নির্ম্মাণ করিয়া দিতে প্রস্তুত। এটা বুদ্ধগয়াতে শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে।' (সকলে উচ্চৈঃস্বরে—'ধন্যবাদ!')

সেক্রেটরী গরবিনী ঘোষ স্বীয় প্রশংসাবাদে লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, 'এখন কন্যাকে সভাস্থ করিতে চাহি।'

সকলে বলিলেন, 'নিশ্চয়।'

বর এবং কন্যা সভাস্থ হইলে খগেন্দ্র ডাক্তারের স্ত্রী বিমলা তাঁহার পতিভক্তি-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সুমিষ্টস্বরে পাঠ করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, পতির প্রতি স্ত্রীলোকের ভক্তিসঞ্চার করিতে হইলে, প্রথমতঃ পতিকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, এবং মাৎসর্য্য প্রভৃতি ষড়রিপু একেবারে গর্জ্জনপূর্ব্বক বর্জ্জন করিতে হইবে, এবং যতদিন তাহা না হয়, পত্নী সজলনয়নে পতির ব্যভিচার সমালোচন করিবেন। তাহাতেও যদি ফল না দর্শে, তবে পত্রিকা প্রকাশ করিয়া আন্দোলন করিবেন।

দৃষ্টান্তচ্ছলে, যে সকল সভ্যজাতি এখন জগতের শীর্ষস্থলে দণ্ডায়মান, তাঁহারা

যে স্ত্রীলোকের তাড়নাতেই উচ্চসোপানে আরূঢ় হইয়াছেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ইতিহাস দিতেছে। অপিচ, কোনও জাতি যদি বীর্য্যাগ্রগণ্য হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন, তবে প্রথমে তাহাদের স্ত্রীবর্গকে যথাযোগ্য শিক্ষা প্রদান করিয়া পুরুষের আক্রমণ হইতে রক্ষাই কর্ত্তব্য। কারণ, জীবতত্ত্ববিশারদ মনীষিগণ বলিয়াছেন যে, যতদিন দুর্ব্বল স্ত্রীলোকের উপর আক্রমণ ও তাহাদিগের সহিত লড়াই ঝগড়া করিবার প্রবৃত্তি পুরুষের থাকে, ততদিন সমাজে পুরুষদিগের বীরত্ব বহির্মুখ না হইয়া অন্তর্মুখ থাকিয়া যায়।

ধনকুবের হারাধন ঘোষ এবং অনেক নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক সেই বক্তৃতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া পড়িলেন। ঘোষ মহাশয়ের মধ্যে চক্ষু উলটিয়া যাইতেছিল। তাহা দেখিয়া খগেন্দ্র ডাক্তার কানে কানে বলিলেন, 'যদি বলেন ত এক ডোস্ শেরী এনে দি।'

হারাধন ঘোষ। 'বোধ হয় সোডা খেলেই সেরে যাবে।'

তাহার কিয়ৎক্ষণ পরেই পুরোহিতবর্গের মন্ত্রোচ্চারণ ও স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গলাচরণ এক সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়া বিবাহক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

যাঁহারা হিন্দুমতে ও বাটীতে লুচী তরকারীর শ্রাদ্ধ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এ বাটীতে জাতিরক্ষার্থ কেবল 'কেক্' ভক্ষণ ও কিঞ্চিৎ 'শেরী' পান করিলেন। যাঁহারা খুব 'গোঁড়া', তাঁহারা 'কেক্' স্পর্শ করেন নাই। যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা 'গোঁড়া', তাঁহারা মুখনিঃসৃত বারি পান করিতেছিলেন।

তাঁহাদিগকে বিরিঞ্চি বাঁড়ুয্যে আসিয়া বলিলেন, 'আপনারাই যথার্থ হিন্দু, এবং এই যজ্ঞের দেবতাবৃন্দ। শ্রীযুক্ত হারাধন ঘোষের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আমি আপনাদিগের শ্রীচরণে পঞ্চাশটি করিয়া টাকা সম্মানার্থ সমর্পণ করিতেছি।'

সকলে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'সাধু!' তাহার পর যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহার তালিকা হইয়া গেল, এবং পুলিস্ হইতে আরম্ভ করিয়া টাউন-চৌকিদার পর্য্যন্ত পূর্ণহস্তে এবং সহাস্যমুখে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। যাঁহারা এ পর্য্যন্ত আহারের চেষ্টায় অপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা আহারে বসিয়া গেলেন। কেহ টেবিলে, কেহ কার্পেটের উপর, কেহ বাহিরে দাঁড়াইয়া, যাঁহার যাহা খুসী, আহার করিতে লাগিলেন।

কেবল দুইটী লোক অপর্য্যাপ্ত রকম আহার করিয়া চিৎপাৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা 'বিরিঞ্চি বন্দ্যোপাধ্যায়' ও 'চৌবেজী'। যখন সকলে

ক্রমে চলিয়া গেল, দীপ ক্রমে নিভিতে লাগিল, এবং গৃহপ্রাঙ্গণ ক্রমে নিস্তব্ধ হইল, তখনও তাঁহারা উত্থানশক্তিরহিত। চৌবেজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, 'এখন উপায় কি?'

বিরিঞ্চি। কলিতে হরিনাম ছাড়া কোনও উপায় নাই। বিপদে, আপদে, সম্পদে, পদে পদে, সেই নাম।

চৌবেজী ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, তাঁহার অবস্থা এত শোচনীয় যে, সমস্ত হরিনামটা তাঁহার সাধ্যাতীত।

বিরিঞ্চি। তবে তুমি বল 'হ', এবং আমি বলি, 'রি।'

এই প্রস্তাবটি খানিকটা সম্ভব বোধ হওয়াতে চৌবেজী ডাকিলেন, 'হ—', এবং বিরিঞ্চি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, 'রি—'।

হরিনাম শুনিয়া গদাধর ও তদীয় শ্যালক এবং শ্যালকের স্ত্রী মালতী খোল ও খঞ্জনী লইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে বসিয়া গেল। কিন্তু অপরিমিত আহারের ফলে কেহ তাহাতে যোগ দিতে না পারায়, সকলের চক্ষে বারিধারা বহিল।

বিরিঞ্চি বলিলেন, 'তবুও তোরা থামিস্ নে। এক বৃক্ষে জীব ও পরমাত্মা বাস করে। জীব গেলেই পরমাত্মারও চিহ্ন থাক্‌বে না'—

তাই চৌবেজী বলিলেন,—'হ', এবং বিরিঞ্চি পুনর্ব্বার বলিল, 'রি'। ইহাতে সকলের ভাব লাগিয়া গেল, এবং ভাব লাগিয়া যাওয়াতে একটা ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইল। সেই ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া অনেকের পিতৃপুরুষদিগের কথা মনে পড়িল, এবং তাহারাও কাঁদিতে আরম্ভ করিল। অন্দরমহলে স্ত্রীলোকেরা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারাও স্ত্রীস্বভাবসুলভ আকস্মিক দুঃখের বশবর্ত্তী হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই ক্রন্দনে যোগ দিয়া গৃহ মাতাইয়া তুলিল।

সেক্রেটরী গরবিনী ঘোষ ভয়ানক চটিয়া বাহিরে আসিলেন। 'তোদের ব্যাপারখানা কি বল্ ত?'

গদাধর। বর কন্যা কোথায়?

সেক্রেটরী। ঘুমিয়ে পড়েছে।

গদাধরের শ্যালক বলিল, 'তবে খোল বাজাও। আমাদের ঘুমাইবার পালা নাই।'

সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'হরিবোল!' পূর্ণিমার শেষযামের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সেই অপূর্ব্ব ধ্বনি পাড়া প্রতিধ্বনিত করিল। কেহ কেহ মনে করিল যে, ইহসংসার হইতে কেহ সরিয়া পড়িয়াছে। নিধিরাম।

হেড্‌ মাষ্টার।

১

রামযাদু প্রামাণিকের সাংসারিক অবস্থা কোনও দিনই স্বচ্ছল ছিল না। সে ট্যাংরামারীর 'হালি' বড়লোক; 'পেটো' মহাজন হলধর হালদারের আড়তে গুদাম-সরকারী করিয়া অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত; কিন্তু সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় আড়তের টিনমণ্ডিত দোকানঘরে 'পেঁউ'-কাঠের পায়াভাঙ্গা জলচৌকীখানির উপর বসিয়া অন্য পাঁচ জন দোকানদারকে সে যে সকল গল্প শুনাইত, তাহা কর্ণগোচর হইলে কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত না যে, সে সেই আড়তের আট টাকা বেতনের গুদাম-সরকার। তাহার গল্পে প্রত্যহ যে কত 'রাজা উজীর' মারা পড়িত, তাহার সংখ্যা হয় না। তাহার গল্পগুলি হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইত যে, সে জমীদারের ম্যানেজারী হইতে লোক্যাল বোর্ডের 'পাউণ্ড-কিপারী' পর্য্যন্ত সকল চাকরীর রসাস্বাদন করিয়া, এবং কোনও চাকরীতেই স্বাধীনতা নাই দেখিয়া, অবশেষে এই গুদাম-সরকারী কার্য্য গ্রহণ করিয়াছে। তাহার উপযুক্ত পুত্র নদেরচাঁদ কলিকাতায় শ্রীমানীদের গদীতে চাকরী করিয়া 'শালিয়ানা' হাজার বার শ' টাকা উপার্জ্জন করে, কিন্তু যত দিন শরীরে সামর্থ্য আছে, তত দিন সে কি জন্য পুত্রের মুখাপেক্ষী হইবে? কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, নদেরচাঁদের পিতৃভক্তি তেমন প্রশংসনীয় ছিল না। শ্রীমানীদের গদীতে সামান্য একটী চাকরী পাইয়াই সে পিতার সহিত বিবাদ করিয়া পল্লীগ্রামের পৈত্রিক গৃহ ত্যাগ করে, এবং হাটখোলা অঞ্চলে একখানি খোলার ঘর ভাড়া করিয়া সপরিবারে সেখানে বাস করিতে থাকে। রামযাদু একবার শ্রীক্ষেত্রে যাইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া নদেরচাঁদের নিকট কিঞ্চিৎ পাথেয় চাহিয়াছিল; কিন্তু নদেরচাঁদ টাকা কড়ি না পাঠাইয়া বৃদ্ধ পিতাকে ডাকযোগে যে উপদেশ পাঠাইয়াছিল, তাহার ভাবার্থ এই যে, কুব্জ ব্যক্তির 'চিৎ' হইয়া শুইবার সখ কোনরূপেই সমর্থনযোগ্য নহে। বৃদ্ধ বয়সে মানুষের অনেক ব্যয়সাধ্য সখ হয় বটে, কিন্তু হাতে পয়সা না থাকিলে, তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। এ সকল ঘরের কথা আড়তের মজলিসে প্রকাশ করা সঙ্গত নহে বুঝিয়া, রামযাদু তাহার বন্ধুগণকে উল্টা বুঝিতে দিত। এবং সকলে তাহার কথাগুলি বিনা প্রতিবাদে শুনিয়া যাইত দেখিয়া সে সোৎসাহে ঘন ঘন তামাক খাইত।

রামযাদুর ছোট ছেলে গোবর্দ্ধনকে সকলে বলিত, 'গোবরে পদ্মফুল'। রামযাদুর ইচ্ছা ছিল, গোবরা পাঠশালে লিখিয়া হাতটা একটু পাকাইতে পারিলেই তাহাকে হলধর হালদারের ভূষিমালের কারবারে একটা মুহুরী-গিরিতে ভর্ত্তি করিয়া দিবে। গোবরা যেরূপ বুদ্ধিমান ও হিসাবী, তাহাতে সে কিছু দিনেই গোমস্তাগিরির 'লায়েক' হইবে। কিন্তু তাহার এ আশাও পূর্ণ হইল না। গোবর্দ্ধন পাঠশালায় পড়িতে পড়িতে এবং তাহার হাতের লেখা না থাকিতেই তাহার দাদার এক বন্ধুর সহিত কলিকাতায় পলায়ন করিল। নদেরচাঁদের মনিব ছেলেটি বুদ্ধিমান দেখিয়া নদেরচাঁদকে বলিলেন, "ওকে ইংরিজী ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দাও, কেতাবের দাম আর ইস্কুলের 'ব্যাতোন' না হয় আমিই দেব।" নদেরচাঁদ প্রভুবাক্য লঙ্ঘন করিতে পারিল না। গোবর্দ্ধন দাদার বাসায় থাকিয়া ক্রমে এণ্ট্রেন্স ও এল, এ পাশ করিল; তাহার পরই ছেলে 'লায়েক' হইয়াছে দেখিয়া রামযাদু তাহার বিবাহ দিয়া ফেলিল।

কিন্তু বিস্তর আশা করিয়া এ বিবাহেও রামযাদুকে ঠকিতে হইল। ব্যাপার-খানা করুণরসাত্মক, এবং উপভোগ্য।

২

তখন পল্লীঅঞ্চলেও পাশ-করা ছেলেদের নীলাম আরম্ভ হইয়াছে। রামযাদু যে সমাজের লোক, সে সমাজেও মেয়ের বাপেরা পাশ-করা 'হাভাতে'দের হাতে কন্যা সম্প্রদান করিয়া কৃতার্থ হওয়া সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিত। সুতরাং অনেকগুলি কন্যাদায়-গ্রস্ত উমেদার রামযাদুর গৃহে ঘটক পাঠাইতে আরম্ভ করিল। রামযাদু যখন বুঝিল, চারে মাছ আসিয়াছে, তখন সে গম্ভীর হইয়া বসিল; এবং ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিল। কিন্তু রামযাদুর হাঁক্ শুনিয়া ট্যাংরা পুঁটীর দল টোপে দুই একটা 'ঠোকর' মারিয়াই পলাইতে লাগিল। কেহই সাহস করিয়া বঁড়শী গিলিল না। শেষে চারে একটি প্রকাণ্ড কাত্‌লার আবির্ভাব হইল। তিনি ভূষিমালের কারবার করিয়া হঠাৎ ফাঁফিয়া উঠিয়াছেন; তাঁহার নাম জগমোহন দে। ট্যাংরামারীর পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী দেবনারায়ণপুরে দে মহাশয়ের নিবাস। কাতলামারী, রুইতনপুর, চিংড়ীখালী, হেঁড়েলদহ প্রভৃতি নানা স্থানে তাঁহার গোলাবাড়ী; তেজারতী, লগ্নীকারবারেও তাঁহার বিস্তর টাকা খাটে। ট্যাংরামারীর বিশ্বাসদের বাড়ীতে তাঁহার এক ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল; ভাগিনেয়ের চূড়াকরণ উপলক্ষে তিনি ট্যাংরামারীতে পদার্পণ করিয়া একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে রামযাদু প্রামাণিকের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

রামযাদু পরমসমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া তাহার চালাঘরের বারান্দায় একখানি কম্বলের উপর বসিতে দিল। দে মহাশয়ের ভগিনীপতি জনার্দ্দন বিশ্বাসও উকীল হইয়া তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। রামযাদু হুঁকায় জল পুরিয়া এক কল্‌কে তামাক দিয়া কুটুম্বদ্বয়ের অভ্যর্থনা করিল। অন্যান্য কথার পর জনার্দ্দন কাজের কথা পাড়িলেন, হুঁকায় 'সুখটান' দিয়া বলিলেন, "রামদা, তুমি নাকি গোবর্দ্ধনের জন্য মেয়ে খুঁজ্‌চো ?"

রামযাদু মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল, "ইয়ে—কি বলে—তা একটি ভাল মতন পাত্রী ত খুঁজ্‌তেই হয়! আর আমার 'গোবদ্ধন' ত শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে একুশ বছরে পড়েছে; পাশও দু'টো করেছে। আমাদের নদেরচাঁদের মনিব—ঐ যে কি বলে—নামটা তাঁর আবার মনে থাকে না—অরাতিবিমদ্দন বাবু বলেছেন, আমার 'গোবদ্ধন' নেকাপড়ায় যে রকম দিগ্‌গজ হয়ে উঠছে, তাতে 'সম্পূর্ণ' ভরসা হয় বি,এ পাশ করলেই নাটসাহেব তাকে হাকিমী চাকরী না দিয়ে ছাড়বে না। ছোঁড়া বি, এটা পাশ কল্লে রাজা নিধিরাম পালের নাত্‌নীর সঙ্গেই বিয়ের সম্বন্ধটা করে ফেল্‌তে পারতাম, কিন্তু ততদিন আর সবুর করতে পারচি নে; বুড়ো হয়েছি, কবে মরে টরে যাব, ছোঁড়ার বিয়েটা দিয়ে 'সাদ-আল্লাদ'টা মিটিয়ে নিই।"

জনার্দ্দন হুঁকাটি রামযাদুর হাতে দিয়া বলিলেন, "এ ত বেশ ভাল কথা, আমাদের দে মহাশয়ের একটি মেয়ে আছে; দেখ্‌তে শুন্‌তে বেশ, আর দেবেন থোবেনও ভাল; এ 'প্রেস্তাবে' তোমার মত কি? দে মশায় এ 'গের্দো'র ভেতর কত বড় লোক, তা কারও ত 'অছাপি' নেই।"

রামযাদু এই প্রস্তাব শুনিয়া মানসিক উৎসাহ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া হুঁকায় এমন একটি উৎকট দম্ দিল যে, কলিকার আগুন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! ইহাতে সে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া হাঁকিল, "ওরে! ও বদ্দিনাথ, ভাল করে এক কল্‌কে তামাক সেজে আন্‌তো। ব্যাটা এখন পর্য্যন্ত তামাক সাজ্‌তে শিখ্‌লি নে! না পারিস্ গরু চরাতে, না পারিস্ তামাক সাজ্‌তে!"

গালি খাইয়া পাকাটীর ন্যায় হাত পা বিশিষ্ট একটি ঢকাকার বিশাল উদর রঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হইল। ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া তাহার দেহটি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই বালকটির নামই বদ্দিনাথ; সে বাগ্দীর ছেলে, বাপ নাই, মা রামযাদুর 'গোয়ালকাড়ুনী', আর বদ্দিনাথ তাহার রাখাল। সে রামযাদুর বাড়ী তিন বেলা খাইয়া তাহার গাই দুটিকে মাঠে চরাইয়া আনিত।

বদ্দিনাথের বয়স দশ এগার, কিন্তু বেলে-জমীর বাব্‌লা গাছের মত তাহার বয়স অনুমান করিবার উপায় ছিল না। একখানি প্রকাণ্ড পিষ্টকাকার প্লীহায় তাহার উদরটি পূর্ণ; উদরে চক্রাকার কয়েকটি শুষ্ক ক্ষতচিহ্ন, প্লীহা-দমনের জন্য 'দেশী 'বেলেস্তারা' দেওয়া হইয়াছিল, তাহারই চিহ্ন। বেচারা যতদিন বাঁচিবে, এ চিহ্ন মিলাইবার নহে। এতদ্ভিন্ন তাহার বুকের নীচে দেশী চিতার আটার একটি লম্বা দাগ, বুকের 'কড়া' নামিয়া ছেলেকে কাহিল করিতেছে শুনিয়া তাহার মা গ্রাম্য কবিরাজের নিকট গিয়া 'বদ্দিনাথ'কে এই ভাবে 'দাগিয়া' আনিয়াছে। এই সকল গ্রাম্য 'গোবৈদ্যে'র চিকিৎসাই এইরূপ; তাহারা কেবল গরু দাগে না, রোগ তাড়াইবার জন্য গোরুর রাখালকেও দাগিয়া চিকিৎসা-নৈপুণ্য প্রদর্শন করে! বদ্দিনাথের দু'হাতে দু গাছি রূপার বালা, এবং গলায় রূপার হাঁসুলি। ক্রমাগত জ্বরে ভুগিয়া তাহার মাথার চুল বার আনা রকম উঠিয়া গিয়াছে; যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা কদম্বকেশরের ন্যায় কণ্টকিত। কটিদেশে ধড়া, তাহার সহিত কোনও কালে 'ক্ষারে'র সাক্ষাৎ হয় নাই।

এবংবিধ বদ্দিনাথ রামযাদুর সম্মুখে আসিয়া কলিকাটি গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে ফুৎকার দান করিয়া বলিল, "ইস্, টানের 'চোটে' যে গুলে আগুন ধরে গিয়েচে, আজাই! তামুক কুতায়? আমাদের দা-কাটা তামুক সাজ্‌লে ইনারা সাম্‌লাতে পারবে? সে যে বড্ডা তলব!"

বদ্দিনাথের মা রামযাদুকে 'খুড়োমশাই' বলিয়া ডাকিত, সেই সুবাদে বদ্দিনাথ তাহাকে 'আজাই' (মাতামহ) বলিত। ভদ্রলোকের সম্মুখে বাগ্দীর ছেলের এতখানি ঘনিষ্ঠতা-প্রকাশে আজাই ভয়ঙ্কর চটিয়া গেল; মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "বেটার বাবাকেলে আজাই! যা, কুটুম্বিতে করতে হবে না, কলুঙ্গার মধ্যে ভাঁড়ে অম্বুরী তামাক আছে, সেজে আন্। নীমে বেণের দোকানের ভাল অম্বুরী, তোদের দৌরাত্মিতে ভাল তামাক লুকিয়ে না রাখ্‌লে কি থাক্‌বে না।"

বদ্দিনাথ এই প্রকার অপবাদে ক্ষুব্ধ হইয়া আজামশায়ের উক্তির প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু রামযাদুর রক্ত-চক্ষুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার মুখে কথা ফুটিল না, সে তাড়াতাড়ি কলিকা লইয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিল, এবং নীমে বেণের দোকানের আতর দেওয়া 'অম্বুরী' তামাক সাজিয়া আনিয়া কলিকাটি রামযাদুর হস্তে প্রদান করিল। জনার্দ্দন গম্ভীরভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামযাদু পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে কোনও রায় প্রকাশ না করায় দে মহাশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন; রামযাদুকে বলিলেন, "আপনার কাছে একটু আশ্বাস পেলে—"

রামযাদু মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল, "তা মেয়েটি একবার দেখে যদি অপছন্দ না হয়, তা হ'লে কথাকথন হলেই ভাল হয় না কি?"

জনার্দ্দন বিশ্বাস তৎক্ষণাৎ হুঁকা ছাড়িয়া হাঁই তুলিলেন, এবং উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া তুড়ি দিয়া বলিলেন, "সে মেয়ে কি আবার দেখ্‌তে হয়? চেনা বামুনকে পৈতে দেখিয়ে ফলারে বস্‌তে হবে? দে মশায়ের মেয়ে সাক্ষাৎ পরী, এ রকম ব্যাটার বৌ, এ রকম বেয়াই পাওয়া—বিস্তর তপিস্তের ফল।"

রামযাদু সে তামাক ছিলিমটা দগ্ধ করিয়াও কি জবাব দিবে—তাহা স্থির করিতে পারিল না, কিন্তু জবাব একটা না দিলেও ত নয়! শেষে সে বলিল, "একবার গোবর্দ্ধনের 'গব্বধারিণী'র মতটা জেনে আসি।"

রামযাদু উঠিয়া মিনিট পাঁচেক পরে বাড়ীর ভিতর হইতে ঘুরিয়া আসিল, তাহার পর মুখে গাম্ভীর্য্যের বোঝা নামাইয়া বলিল, "গিন্নী বল্‌ছিলেন, বৌমাকে বাঁউড়িসুদ্ধ গহনা, আর গোবর্দ্ধনকে নগদ হাজার টাকা যৌতুক দিতে রাজী হ'লে তিনি বিবেচনা করে উত্তর দেবেন। ছেলের 'গব্বধারিণী' যা বল্‌ছেন—তার উপর আর আমার কথা কি? আম্মি ত বলে—এক পা জলে, এক পা ডাঙ্গায়! যা দেবেন, আপনার মেয়ে জামাইয়েরই থাকবে। চক্ষু বুঁজ্‌লে সবই অন্ধকার! হরি হে, তুমিই সত্য।"

রামযাদুর দাবীর পরিমাণ শুনিয়া দে মহাশয় হঠাৎ গরম হইয়া উঠিলেন, তিনি এত বড় ধনী মহাজন, আর একটা সামান্য আড়তের ওজন-সরকার তাঁহার সম্মুখে এতদূর গোস্তাকী করিতে সাহস করিল? তিনি চোখ্‌ মুখ লাল করিয়া ফস্‌ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "এত যে টাকা কড়ি গহনা চাচ্ছো, এ সকল রাখ্‌বে কোথায়? সম্বলের মধ্যে ঐ ত দুখান কুঁড়ে ঘর! এত টাকা খরচ করে' আমাদের সমাজে কে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, বল্‌তে পার?"

রামযাদু অত্যন্ত কোপন প্রকৃতির লোক, সে দরিদ্র বটে, কিন্তু ধনাঢ্য দে মশায়ের নিকট সে ত ভিক্ষা চাহিতে যায় নাই, তবে তাহার বাড়ীতে আসিয়া এ ভাবে তাহাকে অপমান করিবার কারণ কি? রামযাদু রাগ করিয়া বলিল, "কিন্‌বেন মিছরী, দাম দেবেন মুড়ীর? আমার ছেলে অবিক্রি পড়ে নেই, ফাঁকি দিয়ে কাজ সারতে চান ত একটা গরু ধরে সাতপাক ঘুরিয়ে দেন গিয়ে। আমার দু'পাশ করা ছেলের সঙ্গে হবে টবে না।"

দে মহাশয় সবেগে উঠিয়া তাঁহার কুটুম্বকে বলিলেন, "ওঠ হে বিশ্বেস! এ দেখ্‌চি আস্ত কশাই, এ স্থানে মেয়ের বিয়ে দিয়ে সুখ হবে না। দু'তিন

হাজার টাকা খরচ করতে হয় ত যার ঘরে ভাত আছে, তার ঘরেই মেয়ের বিয়ে দেব। দেখা যাবে, কে কত টাকা ঘুঁস দিয়ে এ রকম কশাইয়ের ঘরে মেয়ে দেয়!”

দে মহাশয় জনার্দ্দন বিশ্বাসের সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। রামযাদু প্রামাণিক হুঁকাটি হাতে লইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “এক ছিলিম অম্বুরী তামাকই মাটী! টাকার গরমে মাটীতে যেন পা পড়ে না! উঃ! ড্যামাক্ দেখ! বড় নোক আছেন, উনিই আছেন। বড় নোক বলে যেচে ওঁর মেয়ে আন্‌তে হবে! কত বেটা নগদ দু'হাজার টাকা গণে দিয়ে, গোবর্দ্ধনের হাঁটু ধরে মেয়ে গতাতে পথ পাবে না।”

৩

বিবাহ-সম্বন্ধে বাঙ্গলাদেশ অত্যন্ত উদার! এ দেশে কাণা, খোঁড়া, বুড়া, কাহারও বিবাহ হইতে বাকী থাকে না; গোবর্দ্ধন ত সোনারচাঁদ, দুই পাশ করা ছেলে! প্রাণকৃষ্ণপুরের নকুড় বিশ্বাসের কন্যা সৌদামিনীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু রামযাদুর আশা পূর্ণ হইল না; নকুড় বিশ্বাস চতুর, রামযাদুকে নগদ দুই হাজার টাকা দিবে লোভ দেখাইয়া গোবর্দ্ধনের সহিত কন্যার বিবাহ দিল, কিন্তু একটি পয়সা দিল না। বিবাহের মজলিসে রাম-যাদুকে নগদ দুই হাজার টাকা দেওয়ার কথা ছিল; কিন্তু সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ও আগন্তুক লোকজনের সহিত বকাবকি করিয়া বিবাহের লগ্নের দশ মিনিট পূর্ব্বে নকুড়ের হঠাৎ মূর্চ্ছা হইল! বাড়ীতে গণ্ডগোল, কাঁদাকাটি পড়িয়া গেল। অনেকে নকুড়ের মাথায় জল ঢালিয়া তাহার চেতনা-সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। রামযাদু টাকাগুলি বুঝিয়া না পাইলে ছাঁদলাতলায় বর লইয়া যাইতে দিবে না বলিয়া বাঁকিয়া বসিল; কিন্তু গ্রামের পাঁচ জন মাতব্বর লোক তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না, জোর করিয়া সাত পাক ঘুরাইয়া দিল। মুক্তকচ্ছ রামযাদু অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া ‘আমার টাকা! টাকা কোথায়?’ বলিয়া চারি দিকে দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। নকুড় একখানি ঘরে মাদুরের উপর চক্ষু বুজিয়া পড়িয়াছিল, হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি শুনিয়া সে বুঝিল, তাহার শ্যালক ফ্যালারাম নির্ব্বিঘ্নে কন্যা সম্প্রদান শেষ করিয়াছে। নকুড় তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিল, এবং তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ঢুলীদের ধমক দিয়া বলিল, “খুব জোরে জোরে বাজা!” তাহার গলার আওয়াজ শুনিয়া রামযাদু দ্রুতপদে তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, “বেয়াই, আমার

টাকা?" নকুড় হাসিয়া বলিল, "ব্যস্ত কেন? টাকা সিন্দুকে আছে। কাল সকালেই পাবে। এত রাত্রে টাকা নিয়ে রাখ্‌বে কোথায়?"

কিন্তু পরদিন সকালে নকুড়কে আর কেহ বাড়ীতে দেখিতে পাইল না। 'যঃ পলায়তি সঃ জীবতি' এই নীতিবাক্যের অনুসরণ করিয়া সে পলাইয়া বাঁচিল। রামযাদু টাকার অভাবে ম্রিয়মাণ হইয়া বৈবাহিককে গালি দিতে দিতে পুত্র, পুত্রবধূ সহ বাড়ী ফিরিল। তাহার পর এক বৎসর সে সৌদামিনীকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইল না। ইহাতে নকুড়ের স্ত্রী কন্যাবিরহে আকুল হইয়া কখন কখন অশ্রুবর্ষণ করিত, কখনও বা বৈবাহিককে অভিসম্পাত দিয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিত; কিন্তু তাহাতে নকুড়ের আহার নিদ্রা প্রভৃতি দৈনন্দিন কার্য্যের ব্যাঘাত হইত না। ফাঁকি দিয়া মেয়ের বিবাহ দিয়া সে বেশ নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

কেবল কন্যার বিবাহ নহে, ফাঁকি দিয়া সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহেও নকুড় বিশ্বাসের অসামান্য দক্ষতা ছিল। কলিকাতার দরমাহাটার পেটো মহাজন 'নগরবাসী লোকনাথ সা' নামক ফারমের কর্তা বিশ্বনাথ সার দালাল-রূপে মফঃস্বলে পাট কিনিতে কিনিতে একবার কয়েক হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়া সে বেশ গুছাইয়া লইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বেও সে দুই তিন বার ছোলা, গম, ভূষিমাল প্রভৃতি ক্রয়ের ভার লইয়া কলিকাতার কোনও কোনও মহাজনকে প্রতারিত করিয়াছিল। শেষবার মহাজনেরা টাকা আদায়ের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে, নকুড় বিশ্বাস হঠাৎ একদিন গেরুয়া পরিয়া ঝুলি ও চিম্‌টা লইয়া তীর্থযাত্রা করে। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অল্প কিছু ছিল, কিন্তু সমস্তই তাহার স্ত্রীর সহোদরের নামে বেনামীতে ছিল। অগত্যা মহাজনের টাকাগুলি তাহার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিল না; নানা তীর্থ-দর্শনে পরস্বাপহরণ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, নকুড় কন্যাদায় হইতে উদ্ধার-লাভের জন্য রামযাদুর শরণাপন্ন হইল। তাহার হরিনামের ঝোলা, গলায় তিন কণ্ঠী তুলসী কাঠের মালা, ফোঁটা তিলকের ছটা, এবং মস্তকে জাজ্বল্যমান টীকি ও স্কন্ধে 'রাধাকৃষ্ণ চরণ ভরসা'-ঙ্কিত নামাবলীর ঘটা দেখিয়া রামযাদু তাহার অঙ্গীকারে বিশ্বাস করিল; এবং নগদ দুই হাজার টাকা মাত্র লইয়া গোবর্দ্ধনের সহিত সৌদামিনীর বিবাহের সম্বন্ধ পাকা করিয়া ফেলিল। রামযাদুর বিশ্বাস ছিল, নকুড় বিশ্বাস অনেক টাকার মানুষ; পুত্রের বিবাহ দিয়া বৈবাহিকের নিকট এক কপর্দ্দকও পাইবে না, ইহা সে কল্পনাও করে নাই। কিন্তু তাহাকেও সে ফাঁকি দিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভ করিল।

৪

বৎসরের পর বৎসর জলের মত কাটিতে লাগিল, কিন্তু বৈবাহিকদ্বয়ের মনান্তর ঘুচিল না। কেহ কাহারও তত্ত্বতল্লাস লইত না। বিবাহের পর হইতে সৌদামিনী শ্বশুরবাড়ীতেই রহিয়া গেল। শ্রীমান্ গোবর্দ্ধন দুই বারের চেষ্টায় বি, এ পাশ করিয়া, গবর্মেণ্টের আফিসে চাকরী লইবার আশায়, কিছু দিন মুরুব্বীদের বাড়ী ঘুরাঘুরি করিয়া, দুই জোড়া জুতা ছিঁড়িয়া ফেলিল! কিন্তু লাটসাহেব তাহাকে হাকিমী কার্য্যে নিযুক্ত করা দূরের কথা,সে কোনও সরকারী আফিসে ত্রিশ টাকা বেতনের কেরাণীগিরিও জুটাইতে পারিল না। তখন সে হতাশ হইয়া বাড়ী আসিয়া বসিল, এবং গৃহধর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। ইতিমধ্যে ট্যাংরামারীর অদূরবর্ত্তী নিত্যানন্দপুরের এণ্ট্রেন্স স্কুলের হেড-মাষ্টারের পদ খালি হইলে, রামযাদুর মনিব হলধর হালদারের সুপারিশে স্কুলের সেক্রেটারী পরেশনাথ বাবু গোবর্দ্ধনকে সেই পদে নিযুক্ত করিলেন। পরেশ বাবু মহকুমার উকীল, হলধর তাঁহার একজন প্রধান মক্কেল। তিনি ধনাঢ্য মক্কেলের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া, অনেক যোগ্যতর প্রার্থীর দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলেন। গোবর্দ্ধন হেড্মাষ্টার হইয়া নিত্যানন্দপুরে বাসা ভাড়া করিল, এবং শিশুপুত্র সহ সৌদামিনীকে বাসায় আনিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

গুদাম-সরকারের পুত্র হঠাৎ এণ্ট্রেন্স স্কুলের হেড্মাষ্টার হইয়া পৃথিবীটাকে 'মধুপর্কের বাটী'র মত অত্যন্ত ক্ষুদ্র দেখিতে লাগিল। বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক তাহার প্রভুত্বে জ্বালাতন হইয়া উঠিল। সামান্য কারণে বা অকারণে সে তাহার পিতার সমবয়স্ক বৃদ্ধ শিক্ষকগণকেও অবমানিত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিত। গ্রাম্য ভদ্রলোকদের সহিতও তাহার সদ্ভাব ছিল না; কিন্তু যাহারা চেষ্টা করিলে তাহার অপকার করিতে পারে, সে তাহাদের সহিত হামেসা দেখা সাক্ষাৎ করিত, তাহাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিত। স্থানীয় সবডিবিজনাল অফিসার মহেন্দ্রবাবু স্কুল-কমিটীর প্রেসিডেণ্ট। গোবর্দ্ধন মধ্যে মধ্যে চোগা চাপ্কান আঁটিয়া তাঁহার বাঙ্গলায় হাজিরা দিত; এবং হাকিম সাহেবের ছেলেদের পড়াশুনায় উৎসাহবর্দ্ধন করিত। স্কুলের সম্পাদকের ছোট ছেলেটি প্রথম শ্রেণীর গর্দ্দভ, কিন্তু সে হেড্মাষ্টারের কৃপায় প্রতি বৎসর বার্ষিক পরীক্ষায় অধিকাংশ বিষয়ে 'রসগোল্লা' লাভ করিয়াও উচ্চতর শ্রেণীতে 'প্রমোশন' পাইতে লাগিল। বৎসরান্তে স্কুলের ছাত্রগণকে পুরস্কার বিতরণ

করা হইত। গোবর্দ্ধন কোন-না-কোনও উপলক্ষে স্কুলের সম্পাদক ও স্কুল-কমিটীর প্রেসিডেণ্টের পুত্রকে পুরস্কার দেওয়াইতে লাগিল। একবার সে দেখিল, প্রেসিডেণ্টের পুত্রটিকে কোনও উপায়েই 'প্রাইজ্' দেওয়ান যায় না, তখন সে পুরস্কার-বিতরণ-সভায় "আলেকজান্দার ও দস্যু"র অভিনয় জুড়িয়া দিল, এবং প্রেসিডেণ্টের পুত্রকে দিয়া আলেকজান্দারের ভূমিকা অভিনয় করাইয়া তাহাকে একটি পুরস্কার দিল!

ইতিমধ্যে বঙ্গদেশীয় বিদ্যালয়সমূহে 'ইম্পীরিয়াল গ্রাণ্ট' মঞ্জুর হইলে নিত্যানন্দপুর স্কুলের হেড্মাষ্টারের বেতন এক শত টাকা হইল। পঁচাত্তর টাকা বেতনে এক জন সহকারী হেড্মাষ্টার নিযুক্ত করাও স্থির হইল। গবর্মেণ্টের সাহায্যের পরিমাণও অনেক বাড়িয়া গেল। গ্রামের লোক বলিতে লাগিল, "এক শত টাকা বেতনে ভাল এম, এ, পাওয়া যাইবে। এক জন বহুদর্শী এম, একে হেড্মাষ্টারী দিয়া, গোবর্দ্ধনকে সহকারী হেড্মাষ্টারের পদ দেওয়া হউক।" গোবর্দ্ধন তখন পঞ্চান্ন টাকা বেতন পাইত, তাহার ন্যায় এক জন 'বাজে' ও অল্পদিন পূর্ব্বে পাশকরা বি,এ,র পক্ষে পঁচাত্তর টাকা মাসিক বেতন নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু স্কুল-কমিটীর মিটিংএ প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না। হাকিম প্রেসিডেণ্ট মত প্রকাশ করিলেন, গোবর্দ্ধন বাবু অতি উপযুক্ত হেড্মাষ্টার, তাঁহাকেই এক শত টাকা বেতন দেওয়া হউক, এক জন ভাল গ্রাজুয়েটকে সহকারী হেড্মাষ্টার নিযুক্ত করা হউক। হাকিমের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে কমিটীর অধিকাংশ মেম্বরেরই সাহস হইল না; তাঁহার প্রস্তাব মঞ্জুর হইল; পঞ্চান্ন টাকা মূল্যের গোবর্দ্ধন মাসিক এক শত টাকা বেতনের পদটি লাভ করিয়া আঙ্গুল ফুলিয়া তালগাছ হইল; এবং পূর্ব্বে সে যাহাদিগকে দেখিয়া নমস্কার করিত, তাহাদিগকে কীট পতঙ্গের মত দেখিতে লাগিল! তাহাদের সম্মুখে তামাক খাইয়া নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হইল না।

যামিনীভূষণ বাবু গোবর্দ্ধনের বি, এ পাশ করিবার পূর্ব্ব বৎসর ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম বিভাগে বি, এ পাশ করিয়াছিলেন; দৈনিক 'বেঙ্গলী'তে চাকরী খালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া তিনি নিত্যানন্দপুর স্কুলের সহকারী হেড্মাষ্টারের পদের জন্য আবেদন করিলে, ৩২৬ খানি দরখাস্তের মধ্যে তাঁহারই দরখাস্ত মঞ্জুর হইল। যামিনীভূষণ সহকারী হেডমাষ্টার নিযুক্ত হইবার পর তিন মাস না যাইতেই গোবর্দ্ধন নানাভাবে তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাঁহার প্রধান অপরাধ, তিনি ইংরাজী সাহিত্যে গোবর্দ্ধন অপেক্ষা সুপণ্ডিত,

বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তাঁহার অধ্যাপনার পক্ষপাতী, এবং ছাত্রবিশেষের প্রতি গোবর্দ্ধনের ন্যায় তাঁহার অন্যায় পক্ষপাত ছিল না।—ইংরাজী ভাষায় তেমন দখল না থাকায় হেড্ মাষ্টার গোবর্দ্ধন প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের অনেক ভুল শিক্ষা দিত, যামিনীভূষণ কৌশলে সেই ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতেন, ছেলেদের নিকট হেড্ মাষ্টারকে অপদস্থ হইতে না হয়, সে বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু গোবর্দ্ধন মনে করিত, যামিনী ক্রমাগত তাহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

যোগ্যতর কর্ম্মচারী নিম্নতর পদে থাকিলে উচ্চতর কর্ম্মচারীর মনে শান্তি থাকে না, সর্ব্বদা আশঙ্কা হয়, যোগ্যতর তাঁবেদারটি হয় ত তাহার চাকরীটি আত্মসাৎ করিবে। গোবর্দ্ধনেরও সেই আশঙ্কা প্রবল হইল। বিশেষতঃ এই সময় তাহার মুরুব্বী—স্কুলকমিটীর প্রেসিডেণ্ট ডেপুটী বাবু অন্য মহকুমায় বদলী হওয়ায় অবলম্বনদণ্ডহীন 'ম্যাড়া'র ন্যায় সে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল। বিপদের উপর বিপদ! সেই বৎসর যে কয়েকটি ছাত্র প্রবেশিকায় 'ফেল' হইল, 'ক্রশ্ লিষ্ট' আনাইয়া দেখা গেল,—তাহারা সকলেই ইংরাজীতে ফেল! গ্রামের লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, "নাঃ, এ হেড্ মাষ্টার দিয়া আর কাজ চলিবে না, লোকটা ইংরাজী ভাষায় একেবারে 'মা', নূতন হেড্ মাষ্টার না আনিলে স্কুলটি মাটী হইবে।" স্কুলের সম্পাদক বলিলেন, "ভদ্রলোক এতদিন আছে, কি ক'রে তাড়াই?" স্কুলের নূতন প্রেসিডেণ্ট বলিলেন, "এক শ' টাকায় অনেক ভাল লোক মিলিবে, হেড্ মাষ্টার ইংরাজীতে কাঁচা হইলে তাহাকে রাখায় স্কুলের ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই।"

গোবর্দ্ধনের মুখ শুকাইল। সে ভদ্রসমাজে অপদস্থ হইয়া ঘরে আসিয়া স্ত্রীকে ঠেঙ্গাইতে আরম্ভ করিল। তাহার মেজাজ যেদিন বেশী গরম থাকিত, সেদিন পত্নী-নির্য্যাতন কার্য্য অধিক উৎসাহে চলিত। ইতিমধ্যে একদিন সৌদামিনীর পিতা নকুড় বিশ্বাস কন্যার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া তাহার নেক্‌লেসের জন্য সোনা কিনিবার অজুহাতে দুই শত টাকা ফাঁকি দিয়া লইয়া গেল। গোবর্দ্ধন সে কথা জানিতে পারিয়া সৌদামিনীকে এমন পয়জার পেটা করিল যে, তিন দিন সে শয্যাত্যাগ করিতে পারিল না। গ্রামের ভদ্রলোকেরা তাহার এই বীরত্বকাহিনী শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিলেন।

গোবর্দ্ধন যখন দেখিল, এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছেলেদের ইংরাজী

সাহিত্যের 'ক্রশ্‌লিষ্টের' জন্য তাহাকেই দায়ী করা হইতেছে, তখন সে অপরাধটা সহকারী হেড্‌মাষ্টার যামিনীভূষণের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা করিল। সে বলিল, দ্বিতীয় শ্রেণীতেই ছেলেরা ইংরাজী শেখে, এণ্ট্রেন্স-ক্লাসে উঠিয়া তাহারা নূতন কিছু শিখিবার বিশেষ সময় পায় না। সুতরাং দ্বিতীয় শ্রেণীতে যদি তাহারা ইংরাজী না শিখিয়া থাকে, তবে সে জন্য তাহাকে দায়ী করা অন্যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছেলেরা আদৌ ইংরাজী শেখে না, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বুদ্ধিমান গোবর্দ্ধন এক কৌশল অবলম্বন করিল। যামিনীভূষণ দ্বিতীয় শ্রেণীতে ও চতুর্থ শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন। বার্ষিক পরীক্ষার সময় উক্ত দুই শ্রেণীর ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষা-ভার গোবর্দ্ধন নিজের হাতে রাখিল। পরীক্ষার পর দেখা গেল, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছত্রিশ জনের মধ্যে ছয় জন ও চতুর্থ শ্রেণীতে চুয়াল্লিশ জনের মধ্যে সাত জন মাত্র ইংরাজী সাহিত্যে পাশ করিয়াছে, আর সব ফেল! সুতরাং প্রতিপন্ন হইল, যামিনীভূষণ ইংরাজীতে অত্যন্ত অ-লায়েক। তিনি স্কুলে থাকিতে স্কুলের মঙ্গল নাই। কেবল তাহাই নহে, গোবর্দ্ধন সার্কুলার জারি করিল, যে সকল ছাত্র বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে পাশ করিতে পারে নাই, তাহারা 'প্রমোশ্যন' পাইবে না।

এবার ছেলেদের বাপদাদারা ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহারা ছেলেদের একটি বৎসর এ ভাবে নষ্ট করিতে দিতে রাজী হইল না। কিন্তু হেড্‌মাষ্টারেরও ধনুর্ভঙ্গ পণ! অনেক ছেলে বলিল, তাহারা খুব ভাল শিখিয়াছে, তবু হেড্‌-মাষ্টার অন্যায় করিয়া ফেল করিয়াছে। তাহাদের কাগজ পুনর্ব্বার পরীক্ষা করা হউক।

ছেলেদের এই প্রার্থনা গোবর্দ্ধন হেড্‌মাষ্টার তৎক্ষণাৎ না-মঞ্জুর করিল। কিন্তু এই দলে স্কুলের সম্পাদকের ছোট ছেলেটিও ছিল। সেক্রেটারী হেড্‌মাষ্টারের নিকট তাহার উত্তরের কাগজ চাহিয়া লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, হেড্‌মাষ্টার তাহাতে পূর্ণসংখ্যা এক শতের মধ্যে ২৩ নম্বর দিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ৬০ নম্বর পাইতে পারে। সম্পাদক মহাশয় এই কথা বলিতেই গোবর্দ্ধন তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। সম্পাদক কাগজগুলি পুনঃ-পরীক্ষার প্রস্তাব করিলে সে তাহাতে সম্মত হইল না। অবশেষে অনেকের নিকট তাড়া খাইয়া সে কাগজগুলি ছাড়িয়া দিলে পুনঃপরীক্ষায় দেখা গেল, বিস্তর ছেলে অন্যায়রূপে ফেল হইয়াছে।

এই সকল গুপ্তকথা ব্যক্ত হওয়ায় নিত্যানন্দপুরের জনসাধারণ গোবর্দ্ধনকে

স্কুল হইতে তাড়াইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। কেহ কেহ সম্পাদকের সহিত দেখা করিল। সম্পাদক মহাশয় গোবর্দ্ধনের ব্যবহারে অবমানিত হইয়াছিলেন, তিনি ভদ্রলোকদের যথাবিহিত উপদেশ দানে আপ্যায়িত করিলেন। তখন স্কুলকমিটীর নিকট জনসাধারণের এক প্রকাণ্ড দরখাস্ত পেশ হইল। তাহারা অভিযোগ করিল, বর্ত্তমান হেড্‌মাষ্টার গোবর্দ্ধন প্রামাণিক ইংরাজীতে অত্যন্ত কাঁচা, কয়েকটি গুরুতর কারণে সে হেড্‌মাষ্টারের পদে নিযুক্ত থাকিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য; এক শত টাকা বেতনে ভাল এম, এ পাওয়া যায়, অতএব গোবর্দ্ধনকে পদচ্যুত করিয়া উপযুক্ত হেড্‌মাষ্টার নিযুক্ত করা হউক। কমিটী যদি এ আবেদন গ্রাহ্য না করে,—তাহা হইলে কমিটীকে সাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং সাধারণের প্রতিনিধি হইতে পারেন—এরূপ লোক নির্ব্বাচিত করিয়া নূতন কমিটী গঠন করা আবশ্যক হইবে।

কিন্তু তাহা আর আবশ্যক হইল না, স্কুলকমিটীর অধিকাংশ সভ্য গোবর্দ্ধনের প্রভুত্বে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন; কমিটীর মিটিংএ স্থির হইল, হেড্‌মাষ্টার গোবর্দ্ধন প্রামাণিককে পদত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক, সে পদত্যাগে সম্মত না হইলে তাহাকে 'সস্‌পেণ্ড' করিয়া অভিযোগগুলি সত্য কি না, তাহার অনুসন্ধান হউক।

গোবর্দ্ধন দেখিল, আর চাকরী থাকে না। সে কমিটীকে জানাইল, সে পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু তাহাকে এক মাস সময় দেওয়া হউক।

কমিটীর কোনও কোনও সভ্য বলিলেন, "বেচারা ত যাইবেই, মরণকালে রোগী দুগ্ধ পান করিতে চাহিলে তাহা দেওয়াই কর্ত্তব্য। উহাকে এক মাস সময় দেওয়া হউক।" কিন্তু সম্পাদক মহাশয় ও তাঁহার দলস্থ কয়েক জন সভ্য এ প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন। সম্পাদক মহাশয়ের আশঙ্কা হইল,—গোবর্দ্ধন সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার পুত্রেরই 'প্রমোশ্যন' বন্ধ করিবে। এতদ্ভিন্ন নানারূপে স্কুলের অনিষ্ট-চেষ্টা করিবে। অতএব তাহাকে সময় না দেওয়াই উচিত।

গোবর্দ্ধনের ইস্তফানামা মঞ্জুর হইল, কিন্তু সে আর একদিনও চাকরীতে থাকিতে পাইল না। শেষ দিন গোবর্দ্ধন সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "আজ আমি স্কুলে হাজিরা দিয়াছি, আজিকার মাহিনাটা পাইব না?"

সম্পাদক মহাশয় দয়া করিয়া সে দিনেরও বেতন মঞ্জুর করিয়া গোবর্দ্ধনকে বিদায় করিলেন। গোবর্দ্ধন কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ না করিয়া রাত্রিযোগে সপরিবারে নৌকায় উঠিয়া নিত্যানন্দপুর ত্যাগ করিল। সে স্ত্রীকে বাড়ী রাখিয়া

কলিকাতায় গিয়া নূতন চাকরীর চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বিড়ালের ভাগ্যে আর 'শিকা' ছিঁড়িল না; এক শত টাকা বেতনের হেড্‌মাষ্টারী কোথাও জুটিল না। বছরখানেক পরে আলিপুর দুয়ার অঞ্চলে বহু কষ্টে ৬০৲ টাকা বেতনের একটি মাষ্টারী জুটিলে সে পত্রযোগে নিত্যানন্দপুরে প্রচার করিল—দারজিলিংএ দেড় শত টাকা বেতনের চাকরী পাইয়াছে। গুণের আদর সর্ব্বত্র, কেবল ভেড়ার শিংএ পড়িয়া হীরার ধার ভাঙ্গিয়াছে। নিত্যানন্দপুরের সব লোক মূর্খ ও অভদ্র, তাহারা গোবর্দ্ধন পরামাণিকের কদর বুঝিতে পারিল না!

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। জ্যৈষ্ঠ।—শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্ন শাস্ত্রীর উপাধিতে যে কবিত্ব আছে, তাঁহার 'ব্যাকুলতা'য় সে কবিত্ব নাই। যাহা মনে জাগে, তাহাই কবিত্ব নয়, কাব্যরত্ন শাস্ত্রীরাও যদি তাহা না বুঝেন, তাহা হইলে আমরা নাচার। 'উদ্বোধন', এই শ্রেণীর মামুলী রচনা যেমন হইয়া থাকে, তেমনই। উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না, পড়িলে ঘুম আসে, অথচ ঘুম হয় না; বিরক্তি ভিন্ন ইহাতে অন্য কোনও ভাবের উদ্রেক হয় না। 'ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজের অভিব্যক্তি' প্রবন্ধে লেখকের নাম নাই। সাম্প্রদায়িক প্রবন্ধ। শ্রীশঙ্করনাথ পণ্ডিতের 'ধর্ম্ম' পড়িয়া স্কুলের ছেলেদের essay লেখা মনে পড়ে। দুই পৃষ্ঠায় 'ধর্ম্মে'র স্বরূপনির্ণয় সহজও নয়, সম্ভবও নয়। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকা' একটি 'কবিতা'। কবিতা, বা কবিত্ব-রচনার চেষ্টা কিরূপ সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে, ইহা হইতে তাহা বুঝা যায়। ক্ষিতীন্দ্রনাথ দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনায় চিরজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও এ 'হাওয়া' অতিক্রম করিতে পারিলেন না! কবির বংশের সকলেই কবি নয়, এবং 'ডাকা' দূরে থাক, ডাকাডাকি—হাঁকাহাঁকি করিলেও সকলের রচনায় মানসী দেখা দেন না, ইহাতে এই সত্যটি সুপ্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাসের 'লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়' উল্লেখযোগ্য। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাণাডের স্মৃতিকথা' ও 'গীতারহস্য' চলিতেছে। প্রথমটি উপভোগ্য; কিন্তু দ্বিতীয়টির ভাষা জটিল হইতেছে, সব আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

নারায়ণ। জ্যৈষ্ঠ।—শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরীর 'পর-আহারী বাবা' একটি গাথা—'নারায়ণে'র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। আখ্যানটি চিত্তাকর্ষক; কিন্তু ইহার ফেনায় সাবান পরাজিত হইয়াছে। তাহার পর সম্পাদকের 'বাঙ্গলার কথা'। প্রাদেশিক সম্মিলনের ভবানীপুরের অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাই 'বাঙ্গলার কথা'। এই কথা লইয়া নানা কথার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে অনেক কাজের কথা ও তদপেক্ষা অনেক অধিক বাজে কথা আছে। দুই শ্রেণীর কথার কোনও কথাই মৌলিক চিন্তার ফল নহে।—এ সকল কথার অনেক কথার—অধিকাংশ কথার বীজ 'সন্ধ্যা' ও 'বন্দে মাতরম্' বপন

করিয়াছিল। তাহার পরেও অনেকে দেশকালপাত্রবিবেচনায় ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এই সকল কথার আবৃত্তি করিয়া আসিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন কোথাও কবিতা, কোথাও উদ্দীপনা, কোথাও মুরুব্বিয়ানার রসান দিয়া সেই 'বাঙ্গলার কথা' ব্যক্ত করিয়াছেন। 'সন্ধ্যা'র যুগের অনেক কথার বীজ অনেকের রচনায় অঙ্কুরিত হইয়াছে। তাহা 'যুগে'র কথা—'ব্যক্তিবিশেষে'র কথা নহে। আগে যুগধর্ম্ম যুগের কথার বীজ ছড়াইয়া দেন। পরে যুগপ্রবর্ত্তক আসিয়া সেই বীজের ফসল ঘরে তুলিয়া জাতিকে চিন্তার—জীবনের—মুক্তির অন্ন দেন। সে কথা কাহার, রবীন্দ্রনাথের না চিত্তরঞ্জনের, তাহা লইয়া কলিকাতা হাইকোর্টের দেওয়ানী বিভাগে মামলা দায়ের করিবার কোনও কারণ দেখি না।—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সহিত এ যুগে কাহারও তুলনা হয় না, হইতে পারে না। তিনি যুগধর্ম্মের বীজ লইয়া সেকালে তাঁহার ক্ষেতে যে চাষ করিয়াছিলেন, তাহার ফসলেও আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি। কিন্তু তিনিও যুগ প্রবর্ত্তক নহেন। চিত্তরঞ্জনও যুগপ্রবর্ত্তক নহেন। যুগের কথা অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, বিপিনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বলিয়া গিয়াছেন বলিয়া চিত্তরঞ্জন বলিবেন না?—চিত্তরঞ্জন সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারেন নাই; দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার উপায়ও নাই। তবে 'বাঙ্গালীর মহাসভা'য় চিত্তরঞ্জন যে বাঙ্গালা ভাষায় 'বাঙ্গলা'র কথা বলিয়াছেন, এ জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ করি। বাঙ্গালী বাঙ্গালায় আপনার কথার আলোচনা করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। যাহা স্বাভাবিক ও কর্ত্তব্য, তাহা অবশ্য ধন্যবাদের বিষয় নহে। কিন্তু যে দেশে যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই উপেক্ষিত হয়, এবং যাহা স্বাভাবিক, তাহাই অস্বাভাবিকের অত্যাচারে বিড়ম্বিত হয়, সে দেশে ইহাকেও 'সৎসাহসে'র পর্য্যায়ে ফেলিয়া প্রশংসা করিতে হয়! চিত্তরঞ্জন সে প্রশংসার অধিকারী।—চিত্তরঞ্জনের 'বাঙ্গলার কথা'ও শুধু কথা। এত কথা না কহিয়া চিত্তরঞ্জন একটা কথার আধখানাকে কাজে পরিণত করুন না।—তিনি অনেকগুলি পুরাতন কথা একত্র সঙ্কলিত করিয়া, পাঁচ ফুলের সাজি সাজাইয়া, বাঙ্গালীকে উপহার দিয়াছেন। ইহার ফলে যদি বাঙ্গালীর কর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগরিত হয়, তাহা হইলে আমরা ধন্য হইব। কিন্তু কে কর্ম্মের বীজ বপন করিবে? 'কথা'র চাষে আর আশা হয় না। শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'তিনুর মা' নামক আখ্যানটি চলনসই। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের 'সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যে' ভাষার ও ভাবাভিব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এত অধিক যে, আমরা লেখকের বক্তব্য বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বিরহে পাগল' উপভোগ্য।

উদ্বোধন। জ্যৈষ্ঠ।—'আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ' চলিতেছে।—নিবেদিতা লিখিয়াছেন,—'তাঁহার [স্বামীজীর] বিশ্বাস ছিল যে, উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই যে লোকে নেতৃত্বের সনন্দ প্রাপ্ত হয়, এই ধারণাটীকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিতে হইবে। সম্যক্ অনুশীলন দ্বারা সুমার্জ্জিত যে কাণ্ডজ্ঞানকে লোকে প্রতিভা আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে, তাহার উদ্ভব ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের মধ্যে যেমন সম্ভবপর, সামান্য দোকানদার বা হলচালনাকারী কৃষকের মধ্যেও ঠিক তেমনি সম্ভবপর। যদি সাহস ক্ষত্রিয়েরই একচেটিয়া সম্পত্তি হইত, তাহা হইলে তাঁতিয়া ভীল কোথায় থাকিত? তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, বিধাতা সমগ্র ভারতবর্ষকেই গলাইবার পাত্রে প্রক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; তাহার ফলে কোন্ নব

নব আকারের শক্তি ও সমৃদ্ধির সৃষ্টি হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতে বলা মানবের ক্ষমতাতীত।' বাঙ্গালী পল্টনে স্বামীজীর এই উক্তি সপ্রমাণ হইতেছে। অন্যত্র—'ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় মাসিকপত্রগুলি অনেক সময় একাধারে এক প্রকার জঙ্গম স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বলিলেই চলে। তাহাদের প্রভাব অদ্ভুত। উহারা এক দিকে যেমন ভাব ছড়াইয়া দেয়, অপর দিকে তেমনি লোকের মনোভাব ব্যক্ত করিবার যন্ত্রস্বরূপ হয়। স্বামীজী উহাদের এই শিক্ষাসংক্রান্ত উপকারিতা যেন সহজসংস্কার-প্রভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণপরিচালিত মাসিকপত্রগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এত আগ্রহান্বিত ছিলেন। কোন সাময়িক পত্রের একই সংখ্যায় হয় ত এক পৃষ্ঠায় উচ্চতম অতীন্দ্রিয় তত্ত্বসমূহ আলোচিত হইয়াছে, আবার অপর এক পৃষ্ঠায় অপেক্ষাকৃত কাঁচা হাতের লেখা নানা ঐহিক বিষয়ের কল্পনা জল্পনা স্থান পাইয়াছে। ইহা হইতে ভারতীয় যুগসন্ধিকালের (Transition) সাধারণ লোকের মনের গতি কোন্ দিকে, তাহারও একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।' মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণের 'বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন' অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু উপাদেয়; উচ্চ চিন্তায় পূর্ণ। শ্রীরমণীকান্ত বসুর 'শঙ্করদেব' উল্লেখযোগ্য। 'প্রাদেশিক সম্মিলনে বাঙ্গালার কথা' নামক প্রবন্ধে 'ভারতের সাধনা'র লেখক যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমাদের পরাধীন দেশে সে বিষয়ের যথেচ্ছ ও স্বাধীন আলোচনার যখন অবকাশ নাই, তখন এ বিড়ম্বনা কেন? যথা;—'১ম, দেশের কাজ দেশের লোকই করিবে; রাজাকে দিয়া উহা করাইবার জন্য আর্জ্জি পেশ করা দেশের কাজ নহে।' কেন? রাজা ত প্রজার সমবায়-শক্তি। ব্যষ্টিতে যে কাজ সাধ্য নয়, তাহা ত সমষ্টিতেই করিতে হয়। রাজা ত সেই সমষ্টি-শক্তির কেন্দ্র ও আধার। বিশ্বামিত্র নিজে যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদিগের সংহার করিয়া 'আত্মশক্তি' সার্থক না করিয়া রাজা দশরথের শরণাপন্ন হইলেন কেন? দেশের লোক প্রত্যেকে দেশের কাজ করিবে, না সমবেতভাবে করিবে? প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে দেশের সকল কাজ করিতে পারে না; অতএব, সমবেত ভাবেই করিতে হয়। সমবেত হইলেই একটা কেন্দ্র চাই। প্রজাশক্তির সেই কেন্দ্রই রাজা। এই বুদ্ধিতেই ভারতবর্ষে রাজাকে কেন্দ্র করিয়া প্রজাশক্তির বিকাশ হইয়াছিল। এ দেশে রাজা বিদেশী। পদে পদে প্রজার আর্জ্জি বিফল হয়। তাই অভিমানে এই ভাবটার উৎপত্তি হইয়াছে। চিত্তরঞ্জনের অভিভাষণ রাজনীতিক চালাকী; তাহাতে ভাষার চাতুরী শোভা পায়। 'ভারতের সাধনা'র সাধকে ইহা অপেক্ষা স্পষ্টোক্তি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহা যখন সম্ভব নয়, তখন 'মৌনং হি শোভনম্'। তাহার পর, '২য়, আমাদের একটা বিশিষ্ট জাতিত্ব আছে; সেই জাতিত্ব বজায় রাখিয়া ইংরাজের সহিত মিলিত হইতে হইবে।' ইহাও 'অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা'। আমাদের 'একটা বিশিষ্ট জাতিত্ব' যদি থাকে, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। সেই 'বিশিষ্ট জাতিত্ব' অক্ষুণ্ণ রাখা জাতীয় প্রচেষ্টার কর্ত্তব্য হইতে পারে; 'তাহা বজায়' রাখিয়া বিশ্বে আমরা কি করিব, ইহাই জাতির চিন্তার বিষয়ীভূত হইতে পারে, কোন জাতিবিশেষের সহিত মিলিব, তাহা জাতির চিন্তার বস্তু নহে।' স্বার্থের বিচারেই তাহা নির্ণীত হইতে পারে। আমাদের জাতিগত কর্ত্তব্যের আলোচনায় কিন্তু সর্ব্বপ্রথমেই ইহা বলিয়া দিতে হয়, 'বুড়ী ছুঁইয়া' রাখিতে হয়।

বিক্রমপুর। জ্যৈষ্ঠ।—শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্তর 'ভোলানাথ' অস্পষ্ট। কাউপার দেখিলে শিহরিয়া উঠিতেন। স্বচ্ছতা বাঙ্গালা কবিতা হইতে যেন নির্ব্বাসিত হইয়াছে। শ্রীসোঽহম্ স্বামীর 'যুগচতুষ্টয়' বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। স্বামীজী বলিতেছেন,—'বর্ত্তমান সময় কলি ও সত্যের সন্ধিস্বরূপ উষাকাল।' ভারতে নব যুগের অভিব্যক্তি ও নব-জীবনের সঞ্চার দেখাইয়া ইনি স্বীয় উক্তির যাথার্থ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ক্ষুদ্র পত্রে 'কাউন্ট মন্টিক্রিষ্ট'র তর্জ্জমা কেন? 'রত্নগিরি'ই কি যথেষ্ট নহে? 'বিক্রমপুরের গ্রাম্যবিবরণ' ও 'বিক্রমপুরের কৃষি ও উদ্ভিদ' উল্লেখযোগ্য। এইরূপ রচনাই প্রাদেশিক পত্রের উপযোগী। শ্রীমুকুলচন্দ্র দের 'জাপানের কথা'—দ্বিতীয় স্তবকে দেখিতেছি,—(১) 'দু'এক দিনের মধ্যে তাঁকে এঁকে দিব করে বলেছি।' (২) 'তা বলে আবরুথাবরু ভাবে নয়।' (৩) 'আজ সারাদিন খড় সুন্দর সোণালী রোদ করেছে।' (৪) 'আর একটু বাদেই চায়ে যেতে হবে।' 'দিব করে বলেছি', 'আবরুথাবরু', 'রোদ করেছে' ভিন্ন প্রদেশের পাঠক বুঝিবে না। 'চায়ে যেতে হবে' বিক্রমপুরবাসীও বুঝিতে পারিবে না। ভাষায় প্রাদেশিকতার প্রবর্ত্তন করিলে কিরূপ বিভ্রাট অবশ্যম্ভাবী, এই ক্ষুদ্র রচনায় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

সুবর্ণবণিক সমাচার। জ্যৈষ্ঠ।—শ্রীসন্তোষকুমার সরকারের 'অভিনয়' অভিনয়ই বটে। কথায় বলে, মানুষের দশ দশা। কবি সন্তোষকুমার তাহা সংক্ষিপ্ত করিয়া পাঁচ অঙ্কে—শেষ শ্লোকটিকে অঙ্কের ভিতর ধরিলে ছয় অঙ্কে—পরিণত করিয়াছেন। যে কবিতা 'সুবর্ণ-বণিক সমাচারে'র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার প্রথম দুই চরণে যতিরও দুর্ভিক্ষ!

'ভাস্বর শুকতারা সম শিশু ভূমে যায় গড়াগড়ি,
পৃথিবীর মলা মাটীর স্পর্শে—উঠে চীৎকার করি!'

বিস্ময়চিহ্নটি আমাদের নহে। কবিই এই অপূর্ব্ব ভাবটি আবিষ্কার করিয়া বিস্মিত হইয়া বিস্ময়ের চিহ্ন দিয়াছেন।—সূতিকাগারেই 'অভিনয়ে'র সূত্রপাত হইয়াছে বটে, কিন্তু 'স্বার্থ-পরতা' ও 'আকাঙ্খা' প্রভৃতি সত্ত্বেও শেষ অঙ্ক পর্য্যন্ত কোথাও জমে নাই। 'ঠাকুর উদ্ধরণ দত্ত' চলিতেছে। লেখক লিখিয়াছেন,—যে সময়ে 'আবালবৃদ্ধবনিতা সীধুপান শিখিয়াছিল, সেই অবসরে রক্তদিগ্ধ ভারতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব।' লেখক এ সম্বন্ধে একবারে নিঃসন্দেহ! অন্যত্র—'ইরাণী, ইউনানী, চীনা, তাতারী—সকল দেশের নারীর প্রতিই তান্ত্রিকের লুব্ধ দৃষ্টি ছিল।' প্রভু আজগুবী গল্প করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে ভৃত্য রামকান্তকে সাক্ষী মানিতে-ছেন,—'কেমন রে রামকান্ত!' রামকান্ত ঢুলিতে ঢুলিতে সহসা মাথা তুলিয়া বলিয়া উঠিতেছে, 'হাঁ কর্ত্তা, এত মোর আঁখির দেখা।' ইহাও সেইরূপ! প্রবন্ধটি মন্দ নয়, কিন্তু লেখক বড় অসাবধান। শ্রীবলাইচাঁদ আঢ্য 'স্মৃতিপূজা' নামক কবিতায় লিখিয়াছেন,—

'তব স্নেহ-আর্দ্র হৃদয় মন্দিরে
ও মুরতি করি স্থাপনা।'

'স্যাঁৎসেঁতে' মন্দিরে 'ও মুরতি স্থাপনা' কি এই ম্যালেরিয়ার দেশে যুক্তিসঙ্গত? শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহার 'কৃষি ও বাণিজ্য' এখনও সমাপ্ত হয় নাই। উভয়ের কোনও ক্ষেত্রেই নরেন্দ্রবাবুর

অভিজ্ঞতা নাই। বৈঠকখানায় বসিয়া তিনি এই দুই বিষয়ে কি আবিষ্কার করেন, দেখা যাক। প্রবন্ধটি এখনও শেষ হয় নাই। শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ 'সনেটের কথা' খুব টানিয়া বুনিয়াছেন। সনেট 'চোদ্দ বছরের মেয়ে রূপে গুণে অপূর্ব্ব সুন্দরী'; কেন না, চৌদ্দ চরণে সনেট সম্পূর্ণ হয়। তার পর 'মোহিত মাইকেল হেরি, হাতে তার সঁপিয়া পরাণ' একদিন বঙ্গগৃহে লইয়া আসিলেন। 'কেহ দিল, টিটকারী, কেহ কেহ বাজাল বাঁশরী।' [তার পর মাইকেল মরিলেন। সনেট বিধবা হইল।] 'অক্ষয় অক্ষয় করে' বিধবার উপর কনকাঞ্জলি বর্ষণ করিলেন। তার পর কবীন্দ্র রবীন্দ্র চৈতালীর গান শুনাইলেন, তার পর 'প্রিয়মুগ্ধ দেবেন্দ্র' 'অলকে অশোকগুচ্ছ স্নেহভরে করিল প্রদান!' অবশেষে সনেট সুন্দরী সনেট-পঞ্চাশতের কবি প্রমথ চৌধুরীর ঘাড়ে পড়িল। যথা,—

'পঞ্চাশৎ রকমের নানাবিধ করি কারিকুরী
জড়োয়ায় গড়িল মুকুট তার প্রমথ চৌধুরী!'

শোলার ফুল, ডাকের গহনা ইহার কাছে কোথায় লাগে?—বাঙ্গালা কবিতা বহুদিন পূর্ব্বে ভাবের বেড়া ভাঙ্গিয়াছে; এবার বোধ হয় যতির বেড়ী ভাঙ্গিল!—এখন সনেটের বয়স কত? সনেট-পঞ্চাশতের কবির কি দুর্ভোগ! শ্রীরসময় লাহাও 'স্মৃতি'র চর্চ্চা করিতেছেন।

'হয় ত তোমায় আমি ভালবাসিতাম—
আজো ভালবাসি!'

রসরাজ অমৃতলালের 'আজো বাঞ্ছারাম বোধ হয়' মনে পড়ে। অতীতে সন্দেহ ছিল, এখন কবি নিঃসন্দেহ। তাই 'আজো ভালবাসি!' কবিতাও বটে, patheticও বটে। কবি 'স্মৃতি'র শেষে একটি নূতন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—'প্রাণের বান্ধবে ভোলা নাহি যায়!' আগে পদ্যগন্ধি গদ্য ছিল। এখন বাঙ্গালী কবিরা গদ্যগন্ধি পদ্য লিখিতেছেন। রণজিৎ সিংহ ভারতের মানচিত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'সব্ লাল হো যাগা!' বাঙ্গালার কাব্য দেখিয়াও অনায়াসে ভবিষ্যৎবাণী করা যায়,—'সব্ গদ্য হো যাগা!' অন্যে পরে কা কথা, রসময়েরও এই দুর্দ্দশা। শ্রীগণেশচন্দ্র শীলের 'শ্রীসনাতন গোস্বামীর মহত্ব' সুখপাঠ্য। শ্রীজলধর সেনের 'হরিশ ভাণ্ডারী' ও শ্রীশিবচন্দ্র শীলের 'পুরাকথা' চলিতেছে। শ্রীহীরালাল দত্ত আদিরসে 'মানস-প্রতিমা' গড়িয়াছেন, তাহার পর আধ্যাত্মিকতার ঘামতেল দিয়া ছাড়িয়াছেন। প্রথমে 'যে জন্তুকে সম্মুখে দেখিয়াছেন', তাহাকেই 'ভরি ক্ষুদ্র বুক' ভালবাসিয়াছেন। অবশেষে দেখিলেন, 'তবু যেন কারে প্রাণ ধরিবারে চায়!' শেষে বুঝিলেন,— 'সে যে মোর হৃদীশ্বর বিশ্ববিমোহন!' তার পর তাঁহাকেই হাঁকিয়া ডাকিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়াছেন। 'সুবর্ণবণিক সমাচার' অনেক কবির সমাচার দিলেন। সুবর্ণবণিক সমাজের আগামী সম্মিলনে কবিতার উপর একটা চৌথ বসাইলে, গ্রাহকগণ ভি, পি, ফেরত দিলেও আক্ষেপ করিবার কোনও কারণ থাকিবে না। সুবর্ণবণিক সমাজেও পুরোহিতের দুর্দ্দশার অনেকের চোখ পড়িয়াছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। শ্রীদীননাথ ধর দাদামশায়ের 'মজার আমেজ' ২নং একবারে—!

'আপন' ও 'পর'।

১

শীতের মধ্যাহ্নে দেবীবর তাঁহার শয়নকক্ষে শুইয়া একখানা সংবাদপত্র পড়িতেছিলেন, বা পড়িবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পত্নী হৈমবতী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ বাইরে যা'বে না ?"

দেবীবর উত্তর দিলেন, "না।"

"কেন ?" এই প্রশ্ন হৈমবতীর মুখ দিয়া বাহির হইবার জন্য যেন বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল। কেন না, কয় দিন—কয় সপ্তাহ হইতে তিনি স্বামীর যে ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মনে এইরূপ আশঙ্কা জন্মিয়াছে যে, তিনি অদূরে একটা বিষম দুর্ঘটনার সূচনা লক্ষ্য করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না—ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।

হৈমবতী চলিয়া যাইবার পর দেবীবর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্থিরভাবে সংবাদপত্রখানা ফেলিয়া দিয়া ভাবিলেন—যদি সব কথা বলিতে পারিতাম! কিন্তু তাঁহার মনে হইল, তিনি আজ যে পথে যাইতে চাহেন, গত পঁচিশ বৎসরের ব্যবহারের প্রস্তর-প্রাচীরে সে পথ স্বহস্তে এমন করিয়া বন্ধ করিয়াছেন যে, আজ তিনিও আর সে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারেন না ; একটা আকস্মিক ঘটনার প্রলয়প্লাবন ব্যতীত সে প্রাচীর টলিবে না। কিন্তু—কিন্তু তিনি কি প্রলয়-প্লাবনেরই গর্জ্জন শুনিতে পাইতেছেন না ? সে গর্জ্জন ত আর দূরাগতও নহে ; সে যে একেবারে কাছে শুনা যাইতেছে! আর একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া—যেন আপনাকে ভুলাইবার জন্য তিনি আবার সংবাদপত্রখানি তুলিয়া লইলেন—প্রবন্ধ, প্যারা, সংবাদ, শেষে বিজ্ঞাপন পড়িতে চেষ্টা করিলেন ; কিছুই ভাল লাগিল না।

এই সময়—একটা কি জিনিস লইবার ছুতা করিয়া—প্রকৃতপক্ষে স্বামীকে লক্ষ্য করিবার জন্য—হৈমবতী আবার সেই ঘরে আসিলেন। দেবীবর বলিলেন, "দেখ, গুরুপ্রসাদকে তোমার মনে পড়ে ?"

হৈমবতী বলিলেন, "পড়ে না ? অনেক দিন তাঁ'কে এ দিকে দেখিনি।" হৈমবতী ভাবিলেন, এইবার বোধ হয়, তাঁহার সন্দেহ ঘুচাইবার উপায় হইবে—

তিনি স্বামীর কথায় তাঁহার ভাবান্তরের কারণ বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু দেবীবর আর কোনও কথা বলিলেন না—অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতে লাগিলেন।

তখন হৈমবতীই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

দেবীবর কেবল বলিলেন, "নাঃ!" তাহার পর তিনি হৈমবতীর নিকট হইতে নাতিনীকে (বড় মেয়ের মেয়ে) লইয়া একটু আদর করিলেন। শিশু কিন্তু কাঁদিবার উপক্রম করিল। তখন হৈমবতী তাহাকে লইয়া চলিয়া গেলেন—যাইবার সময় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া গেলেন।

হৈমবতীর মুখের কাতরভাব দেবীবর লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি পত্নীকে ডাকিলেন; হৈমবতী আসিলে বলিলেন, "দেখ, আমার ছেলেরা যেন কখনও কা'রও কোনও উপকার না করে; কখনও কা'রও কাছে কোনও উপকারের আশা না করে।" কূলের কাছে যে স্থানে সমুদ্রের জল অগভীর—সেই স্থানটাতেই তাহার চাঞ্চল্য অধিক—যেখানে জল গভীর, সেখানে সে চাঞ্চল্য থাকে না; তেমনই একটু ক্ষুদ্র ব্যাপারের বেদনাই যেন দেবীবরকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল—আর যে বেদনা—অসীম, অপার, অপরিমেয়—তাহার কথা তিনি যেন ভাবিতেও পারিতেছিলেন না।

স্বামীর এই কথায় হৈমবতীর আশঙ্কা আরও বাড়িল। তবুও তিনি জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না—কি হইয়াছে?

এই স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল—কাহারও প্রেমের অভাব ছিল না; কিন্তু যে সরল ব্যবহারে—স্ত্রীকে সব কথা জানাইবার যে অভ্যাসে পতিপত্নীর সম্বন্ধে নিবিড় মধুরতার সঞ্চার হয়—তাহা দেবীবরের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। সবলের যে ভালবাসা দুর্ব্বলকে সর্ব্ববিধ কষ্ট হইতে রক্ষা করিয়া—সব কষ্ট আপনি সহ্য করিয়াই আপনাকে সার্থক মনে করে—সেই ভালবাসায় দেবীবর মনে করিতেন, পত্নীকে সুখভাগ দিবেন—দুঃখ-দুশ্চিন্তার ভাগ দিবেন না। সংসার-সংগ্রামের সব ভার তিনি যেন "ফুরাইয়া" লইয়াছিলেন—জয়ের গৌরবানন্দে হৈমবতীকে মণ্ডিত করিয়া সুখী করিবেন, আপনি সুখী হইবেন। ইহাতে যে পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রচিত হয়, এবং সেই ব্যবধানে প্রেমের প্রবাহই শেষে প্রতিহত হইতে পারে, দেবীবর তাহা বুঝিতে পারেন নাই। বিবাহিত জীবনের এই পঁচিশ বৎসর তিনি এই ভুল করিয়া আসিয়াছেন—পঁচিশ বৎসরের ভুল এক দিনে সংশোধন করা যায় না। আর এই পঁচিশ বৎসর হৈমবতী এই ব্যবহারেই অভ্যস্তা। স্বামীর সব কথা স্বামী তাঁহাকে

জানিতে দেন না—ইহাতে প্রথমে তাঁহার মনে অভিমানের সঞ্চার হইত; কিন্তু ক্রমে সে ভাব কাটিয়া গিয়াছে। বিশেষ শাশুড়ীর মৃত্যু ও দেবরের চাকরী লইয়া বিদেশে গমন—এই দুইটি ঘটনায় সংসারের সব ভার তাঁহার উপর পড়ায় তিনি ক্রমে ক্রমে সংসার ও সন্তান লইয়াই মনকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিতে শিখিয়াছেন। অভ্যাসের কাছে স্বভাব পরাজয় মানিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রবল স্বামীর দুর্ব্বল পত্নী তিনি—তিনি ইহাই স্বাভাবিক মনে করিতে শিখিয়াছেন। তাহার পর—এখন দুইটি মেয়েরই বিবাহ হইয়াছে, তাহাদের সন্তান হইয়াছে—ছেলে দুইটিও বড় হইয়াছে—এখন কি আর তাঁহার মান অভিমান সাজে? তিনি আপনার গৃহিণীগর্ব্বে ভালবাসার আব্দারটুকুকে যেন লজ্জাজনক মনে করিতে চেষ্টা করিতেন। দিন কাটিয়া যাইত।

দেবীবরের সমস্ত ব্যাপারই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। যখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষার পাঠ পড়িতেছেন। তাঁহার পিতা বিশ্বম্ভর বন্দ্যোপাধ্যায় কাননগো হইতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। তিনি সেকালের ধরণের ছিলেন—উপরওয়ালা য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীদিগকে দেখিলে লম্বা সেলাম করিতেন; এমন কি, দুষ্ট লোক বলে, একবার তিনি এক জন সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলে সেক্রেটারীর কুকুর তাঁহাকে তাড়া করে;—তিনি কুকুরকে বলিয়াছিলেন, "আরে ভাই, কেঁও চিল্লাতা হায়? তুম ভি যিস্‌কো কুত্তা হায়, হাম ভি উসিকো কুত্তা হায়" এবং তাহাতেই তাঁহার পদোন্নতি হয়। সে কথা সত্য হউক আর না হউক, 'সাহেব'রা তাঁহাকে ভালবাসিতেন; আসামে কালাজ্বরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহারা দেবীবরকে একটা সবরেজেষ্টারী চাকরী দিতেও চাহিয়াছিলেন। অনেকে বলিয়াছিল, "দেবীবর, এ সুযোগ ছাড়িও না—'সাহেব' মুরুব্বী মনে করিলে, সব করিতে পারে; বি, এ, পাশ এখন রাস্তায় গড়াগড়ি যায়; চাকরী লও।" দেবীবর যখন সেই সব উপদেশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, তখন কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, "তা' ভাল; ছেলেটার ধার আছে; বি, এ, পাশ করিলে ডেপুটী হইবে—বোধ হয়, সেই চেষ্টায় আছে।" বি, এ, পাশ করিয়াও সে চাকরী না লইয়া দেবীবর যখন আইন পড়িতে লাগিলেন, তখন তাঁহার বন্ধুরা বলিল, "উহার তাক আছে—হাইকোর্টের জজ হইবে।" আসল কথা—দেবীবরের কোনও তাকই ছিল না, এবং সে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইতে (কারণ—উত্তীর্ণ হইতে তাহার কিছু অধিক দিন লাগিয়াছিল)

তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পীতাম্বর ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজপুতানার কোনও রাজদরবারে ডাক্তার হইয়া গেল। তখন লোকে বলিল, "পীতাম্বরের ধার ছিল না—কিন্তু ভার ছিল; দেবীবরের অতিরিক্ত ধারই তাহার কাল হইল।"

পিতার মৃত্যু হইতেই সংসারের সব ভার দেবীবরের হাতে আসিয়াছিল—পীতাম্বর কোনও দিন দাদাকে সে সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। পীতাম্বরের চাকরী-প্রাপ্তির তিন বৎসর পরে সে স্ত্রীপুত্রকন্যা কর্ম্মস্থানে লইয়া গিয়াছিল। চাকরীর অবস্থা বুঝিয়াই সে পরিবার লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিল; কেন না, তিন চারি বৎসরে একবার ব্যতীত সদাসর্ব্বদা তাহার পক্ষে বাড়ী আসা সম্ভব হইবে না। কিন্তু তাহার মাতার স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া সে বিরত ছিল। প্রায় দুই বৎসর রোগভোগ করিয়া তিনি যখন পরপারে যাত্রা করিলেন, তখন কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ সারিয়া কর্ম্মস্থানে যাইবার সময় সে পরিবার সঙ্গে লইয়া যায়। তাহার পর সে যখনই আসিয়াছে, যেন নিজের বাড়ী অতিথি হইয়া আসিয়াছে—অধিকার ভোগ না করিয়া আদর লাভ করিয়াছে। বাস্তবিকই দেবীবর ভ্রাতাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। বিশেষ, এক সঙ্গে থাকিলে যে সব ছোট ছোট ব্যাপার পুঞ্জীভূত হইয়া স্নেহের পথ কণ্টকাকীর্ণ করে, দূরে থাকিলে সে সব ব্যাপার ঘটিতেই পায় না। হৈমবতীও দেবরকে ও দেবরপত্নীকে বিশেষ যত্ন করিতেন—বলিতেন, আহা, চিরদিন বিদেশে থাকে! এখন পীতাম্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কলিকাতায় জ্যেষ্ঠতাতের কাছে থাকিয়া কলেজে পড়িতেছে। পীতাম্বরের এক কন্যার বিবাহ হইয়াছে—সেও মধ্যে মধ্যে কলিকাতার বাড়ীতে আসিয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস, পীতাম্বর অনেক টাকা উপার্জ্জন করে; জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, "ভালই ত, ধনাপবাদ ত অদৃষ্টের কথা। তবে কি জান—যত গর্জ্জে, তত বর্ষে না; পরের টাকা আর পরের দেনা দুই-ই লোক বেশী দেখে।" দেবীবর কোনও দিন সে সন্ধান লয়েন নাই; বরং ভ্রাতাকে বলিয়াই দিয়াছিলেন, "আমার এখানে তোর টাকা পাঠাইতে হইবে না; যেমন ভাল বুঝিস, খাটাইবার ব্যবস্থা করিস—দরকার হয়, আমাকে জিজ্ঞাসা করিস।" পীতাম্বরের জিজ্ঞাসা করিবার দরকার হয় নাই; কারণ, সে কর্ম্মস্থানেই চড়া সুদে টাকা খাটাইবার অনেক সুবিধা পাইয়াছিল, এবং সে সব সুবিধার সদ্ব্যবহার করিতে দ্বিধা করে নাই।

আর দেবীবর? দেবীবরের প্রতিভা ছিল, গৃহিণীপনা ছিল না; তিনি বড়

বড় ব্যাপারের স্বপ্ন দেখিতেন—কিছুতেই সাফল্যলাভ করিতে পারিতেন না। বিশেষ, তাঁহার স্বাভাবিক চাঞ্চল্য তাঁহাকে কিছুতেই অপেক্ষা করিতে দিত না—সাফল্যের বিলম্বে তিনি বিরক্ত হইতেন, আরব্ধ কার্য্য ছাড়িয়া আবার একটায় হাত দিতেন—কোনটারই শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে পারিতেন না। অথচ তিনি কোনও কালে কাহারও সাহায্য লইতেন না; এমন কি, পত্নী হৈমবতীকেও কিছু জানাইতেন না। জানাইলে হয় ত অনেক স্থলে তাঁহার উপকার হইত; কারণ, কুটিল ও জটিল ব্যাপারেই বুদ্ধিনিয়োগ করিয়া আমরা অনেক সময় সরল পথটাই দেখিতে পাই না; আমরা কৃত্রিম আলোকে অজস্র চেষ্টাতেও যাহা দেখিতে পাই না, মহিলাদিগের স্বাভাবিক সরল বুদ্ধির আলোকে তাহা সপ্রকাশ হয়। কিন্তু কাহারও বুদ্ধি লওয়া দেবীবরের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল।

তিনি আপনার বুদ্ধিতে অস্থির ভাবে এই এতদিন—বিংশ বর্ষেরও অধিক কাল কাজ করিয়াছেন—একটার পর একটা কাজে হাত দিয়াছেন—কোনটাতেই লাগিয়া থাকেন নাই। অসাফল্যের পর অসাফল্য—লোকসানের পর লোকসান পুঞ্জীভূত হইয়াছে—তাঁহার মৎলবের বোঝার ভার তাঁহাকে পীড়িত করিয়াছে—চিন্তার চাঞ্চল্য তাঁহাকে দুর্ব্বল করিয়াছে; কারণ, যে অগ্নি বর্ত্তিকাকে প্রদীপ্ত করে, সেই অগ্নিই তাহাকে দগ্ধ করে। এই ভাবে দীর্ঘ বিশ বৎসরে তাঁহার সকল আশার দীপ হতাশার ফুৎকারে নিভিয়া গিয়াছে। তিনি আজ অন্ধকারে—পথহারা—সঙ্গীহীন—অর্থহীন; আর কোন দিকে কোনও উপায় দেখিতে পাইতেছেন না। এ কালরাত্রি যে আর কখন পোহাইবে, তাঁহারও আর সে আশা নাই। তিনি কি করিবেন, ভাবিয়া পাইতেছেন না—আপনার আর্থিক অবস্থার কথা ভাবিলেও তিনি শিহরিয়া উঠিতেছেন; স্ত্রীপুত্রকে যে অবস্থায় উপনীত করিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া তিনি আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতেছেন। তাই আজ—এই বেদনা ব্যক্ত করিবার ব্যাকুলতায় তিনি মনে করিতেছেন, যে পত্নী তাঁহার গৃহের গৃহিণী—সংসারে সঙ্গিনী—পুত্রকন্যার জননী; যিনি বিবাহিত জীবনের এই পঁচিশ বৎসর তাঁহার সব বৈশিষ্ট্য বিনা প্রতিবাদে সহ্য করিয়া আসিয়াছেন—তাঁহাকে সুখী করিবার জন্যই প্রাণপণ করিয়া আসিয়াছেন—আজ যদি তাঁহাকেও সব কথা—সব অবস্থা বুঝাইয়া বলিতে পারিতেন। কিন্তু তাহাও তিনি পারিলেন না।

২

গুরুপ্রসাদ হাইকোর্ট হইতে ফিরিয়া কাপড় ছাড়িতেছেন, এমন সময় সরকার

কয়খানা পত্র লইয়া আসিল। কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে তিনি কয়খানা পত্র পড়িয়া সরকারকে দিয়া বলিলেন, "রামকে দিও।" রাম গুরুপ্রসাদের মুহুরী। গুরুপ্রসাদ বড় উকীল—জজীয়তীর বন্দরে তাঁহার যশের তরণী পঁহুছিতে আর বিলম্ব নাই। শেষ পত্রখানা—একখানা চেক। সেখানা লইয়া গুরুপ্রসাদ কি ভাবিলেন—তাঁহার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। তিনি ভৃত্যকে বলিলেন, "দেখ্ দেখি, সাদা জুড়ীটা আজ কেউ নিয়ে গেছে কি না।" তিনি বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বড় দাদা বাবু কোথায় যাবেন, বলেছেন।"

গুরুপ্রসাদ বলিলেন, "বলে আয়, আমি এখনই বেরোব; গাড়ী আন্তে বল।"

তিনি একটু ব্যস্ত হইয়াই হাত মুখ ধৌত করিয়া আসিলেন; মুখটা চিন্তায় অন্ধকার। তিনি ফিরিয়া আসিলেই, ভৃত্য চা লইয়া আসিল। তিনি ভৃত্যকে বলিলেন, "তোর মা'কে একবার ডাক।"

চা পান হইয়া গেল। তখনও গৃহিণী আসিতেছেন না, দেখিয়া গুরুপ্রসাদ যেন একটু অধীর হইলেন। এমন চাঞ্চল্য তাঁহার মত বিষয়ী লোকের পক্ষে একটু নূতন। কিন্তু আজ তিনি কিছুতেই অধীরতা দমন করিতে পারিতেছিলেন না।

গৃহিণী আসিয়া কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই গুরুপ্রসাদ বলিলেন, "হেমার বাড়ী কোনও খবর আছে?"

গৃহিণী বলিলেন, "কেন?"

"আমি যাচ্ছি।"

গৃহিণী চক্ষু ডাগর করিয়া বলিলেন, "কেন?"

"সে পাড়ায় কাজ আছে।"

গৃহিণীর বিশ্বাস হইল না। তিনি ভাবিলেন, কোনও একটা দুঃসংবাদ না পাইলে আদালত হইতে ফিরিয়াই স্বামী কখনও ভবানীপুর হইতে পটলডাঙ্গায় যাইতেছেন না। তিনি বলিলেন, "আমার গায়ে হাত দিয়ে বল—কোনও ভয় নেই?"

"না—গো—না"—অধীর ভাবে এই কথা বলিয়াই গুরুপ্রসাদ উঠিবার উদ্যোগ করিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "সত্যি—বল।"

"আমি দেবীবরকে দেখ্‌তে যা'ব; অমনই হেমার বাড়ী হয়ে আসব।"

"তা—ই বল; নইলে মেয়ের কি এত ভাগ্যি হ'বে যে, আমি না বল্‌তে তুমি তা'কে দেখ্‌তে যা'বে! বলে, কখনও যা' হয় নি, আজ তাই হ'বে!"

গুরুপ্রসাদ জুতা পায়ে দিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "তা' এই ত আদালত থেকে ফির্‌লে—আবার এখুনি যাওয়া কেন?"

গুরুপ্রসাদ বসিয়া বলিলেন, "মনটা বড় খারাপ হয়েছে। অনেক দিন পরে সে দিন দেবীবর এসেছিল; আমার কাছে হাজার টাকা ধার চাইতে—"

"তা'র পর?"

"তখন টাকাটা দিলাম না।"

"তা' দিলেই পারতে।"

"দিলাম না এই জন্তে যে, সে যে কাজের জন্তে চেয়েছিল, তা'তে লোকসান হ'বেই হ'বে।"

"তা' ভালই করেছ।"

"কিন্তু সে টাকাটা না পেয়ে যেভাবে ফিরে গেল, তা'তে মনে হ'ল—দূর হ'কগে ছাই; আমি টাকা দেব। তাই হাজার টাকার চেক পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সেখানা ফিরিয়ে দিয়েছে। তাই একবার তা'র কাছে যা'ব।"

গৃহিণী ঘৃণায় অধর কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আর যেতে হ'বে না। তুমি টাকা দিলে, তা' আবার ফিরিয়ে দিলেন! তোমার পক্ষে যা'ই হোক, অপরের পক্ষে বড় কম নয়—হাজার টাকা!"

গুরুপ্রসাদ হাসিলেন। গৃহিণীর মাংসল প্রকোষ্ঠের জন্য পূর্ব্বদিনই স্বর্ণকার বাইশ ভরীর চুড়ী গড়াইয়া দিয়া গিয়াছিল। তাহা দেখাইয়া তিনি বলিলেন, "তা' বটে; কিন্তু আমার দুঃসময়ে ঐ দেবীবরের সাহায্য না পেলে আজ বোধ হয়, ও চুড়ী তোমার গায়ে উঠত না—আমাকে মাষ্টারী বা কেরাণীগিরি করে' মাসে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা আন্‌তে হত। সেটা কি ভুলে গেলে?"

গৃহিণী সেটা ভুলেন নাই; কিন্তু ভুলিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহার রাগ। দুঃসময়ের—দারিদ্র্যের উপর তিনি বিস্মৃতির যবনিকা ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহেন; কারণ, সেটা অন্ধকার। তিনি কেবল বর্ত্তমানকে—সম্মানসম্ভ্রমসম্পদ-সমুজ্জ্বল এই বর্ত্তমানটাকেই সর্ব্বস্ব করিয়া অতীতকে লোকচক্ষুর—এমন কি, আপনার স্মৃতিরও অগোচর করিতে চাহেন। দেবীবর সেই অতীতের যবনিকা তুলিতে পারেন; তাই দেবীবরকে তাঁহার ভাল লাগে না।

কিন্তু এই বিষয়ে স্বামি-স্ত্রীতে বিশেষ প্রভেদ। গুরুপ্রসাদ এখন যত বড় হইয়াছেন, তাহাতে তিনি অতীতটাকে মুছিতেও পারেন; কিন্তু মুছিতে তিনি অনিচ্ছুক। বরং তিনি ছেলেদের সর্ব্বদাই আপনার দুঃসময়ের গল্প করেন। তাঁহার পিতা ষ্টেশনমাষ্টারী করিয়া মাসে কুড়ি টাকা উপার্জ্জন করিতেন—মাতৃহীন পুত্রকে শিক্ষা দিবার জন্য সব কষ্ট সহ্য করিতেন—বুঝি পেট ভরিয়া খাইতেও চাহিতেন না। বড় কষ্টে তিনি গুরুপ্রসাদকে 'মানুষ' করিয়াছিলেন। পুত্র এফ, এ, পাশ করিলে প্রধানতঃ তাহার পাঠের ব্যয়নির্ব্বাহে সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি তাহার বিবাহ দেন; বৈবাহিকও দরিদ্র; দুই জনে কোনওরূপে তাহার পাঠের ব্যয় চালাইবেন। এই অবস্থায় পুত্র বি, এ, পরীক্ষা দিবার কয় মাস পূর্ব্বে, এক দিন ষ্টেশনে লাইন পার হইবার সময় তিনি গাড়ীতে কাটা পড়েন। গুরুপ্রসাদের পক্ষে জগৎ অন্ধকার হয়। তাঁহার শ্বশুরও একা তাঁহার ভার লইতে অক্ষম। কাজেই গুরুপ্রসাদকে পাঠের আশা ত্যাগ করিয়া চাকরীর চেষ্টা করিতে হয়। সেই সময় দেবীবর তাঁহার কথা জানিতে পারেন। দেবীবর তাঁহার সহপাঠী—কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহারও পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। দেবীবর তাঁহাকে আপনার বাড়ীতে রাখিয়া তাঁহার পাঠের সব ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার প্রস্তাব করেন। গুরুপ্রসাদ সে দয়া গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। শেষে দেবীবরের মাতা তাঁহাকে ডাকিয়া বলেন, "বাবা, তুমিও দেবীর মত, পিতুর মত আমার ছেলে—আমাকে তোমার মা বলে জেনো।" গুরুপ্রসাদ দেবীবরের মাতার কাছে মাতৃস্নেহ লাভ করিয়া তাঁহারই কাছে কয় মাস থাকিয়া বি, এ, পাশ করেন। ছেলেদের কাছে সে সব কথা বলিবার সময় গুরুপ্রসাদের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত। আপনার পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া তিনি আপনার বাড়ীতে দশটি ছাত্রকে রাখিয়া তাহাদিগকে পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার গৃহিণীর তাহা ভাল লাগে না। আজ তাঁহার কথায় তাই গৃহিণী বিরক্তই হইলেন। কিন্তু গুরুপ্রসাদ বিচলিত হইলেন না।

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—গাড়ী প্রস্তুত। গুরুপ্রসাদ প্রস্থানোদ্যত হইলে গৃহিণী বলিলেন, "বেশ লোক! হেমার বাড়ী কোনও খবর আছে কি না, জিজ্ঞাসা করে' সে কথার উত্তর পর্য্যন্ত আর দেরী সইল না!"

গুরুপ্রসাদ বলিলেন, "তুমি যে সেই কথাটাই কিছুতে বল্‌লে না।"

"তা'কে বলো, রবিবারে যেন একবার আসে; বেহাইকে বলে এস, জামাইকেও পাঠান।"

"হুঁ" বলিয়া গুরুপ্রসাদ যাইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। দেবীবর যে দিন তাঁহার কাছে টাকা না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন, সেই দিনই গুরুপ্রসাদের মন অনুশোচনায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সত্য বটে, তিনি গুরুপ্রসাদের ভালর জন্যই তাঁহাকে টাকা দেন নাই; কিন্তু তিনি সে বিচার না করিলেই পারিতেন। দেবীবর যখন তাঁহাকে আশ্রয় ও সাহায্য দিয়া জীবন-সংগ্রামে সাফল্য-সম্বল-সঞ্চয়ের সুবিধা দিয়াছিলেন, তখন তিনি ত এত বিচার করেন নাই—কেবল দয়াই করিয়াছিলেন। আজ তিনি কেন তেমনই করিতে পারিলেন না? আর কে বলিতে পারে, দেবীবর যে কাজের জন্য টাকা চাহিয়াছিলেন, সে কাজে তাঁহার লোকসানই হইবে? গুরুপ্রসাদের মনে হইল, তিনি বন্ধুত্ব—কৃতজ্ঞতা এ সকলের অপেক্ষা টাকা অধিক ভালবাসিয়াছেন; তাই অনুশোচনায় তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। তিনি দেবীবরকে পত্র লিখিয়া ক্রটী স্বীকার করিয়া হাজার টাকার চেক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। দেবীবর সে পত্রের উত্তর দেন নাই—কেবল চেকখানি ফেরত পাঠাইয়াছেন। তাঁহার এই কাজে গুরুপ্রসাদ যেন লজ্জায় মরিয়া গিয়াছেন। তাই তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার জন্য বন্ধুর গৃহে চলিয়াছেন।

সন্ধ্যা হয়, এমন সময় তিনি দেবীবরের গৃহে উপনীত হইলেন—জানিলেন, দেবীবর বাড়ীতে আছেন।

ভৃত্য যাইয়া দেবীবরকে সংবাদ দিল, গুরুপ্রসাদ বাবু আসিয়াছেন, দেবীবর বলিলেন, "বল, আমি বড় ব্যস্ত; দেখা হ'বে না।"

গুরুপ্রসাদ পরিচিত গৃহে—পরিচিত পথে দেবীবরের বসিবার ঘরে যাইতেছিলেন; পথে ভৃত্য আসিয়া দেবীবরের উত্তর তাঁহার গোচর করিল। সে উত্তর গুরুপ্রসাদের পক্ষে অতর্কিত—অপ্রত্যাশিত আঘাতের মত বাজিল। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইলেন—যেন তাঁহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছিল; তাহার পর তিনি ফিরিয়া গাড়ীতে আসিয়া গাড়ী বাড়ী লইয়া যাইতে বলিলেন—কন্যার বাড়ী যাইবার কথাও ভুলিয়া গেলেন।

গাড়ীতে বসিয়া গুরুপ্রসাদ দেবীবরের ব্যবহারের কথা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই রাগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার দুঃসময়ের কথা—দেবীবরের দয়ার কথা—দেবীবরের মাতার কাছে মাতৃহীন তাঁহার মাতৃস্নেহলাভের কথা—যতই তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল, ততই তিনি আপনাকে অপরাধী মনে করিতে লাগিলেন; আর তাঁহার হৃদয়ের বেদনার

উৎস হইতে করুণার বারি উৎসারিত হইয়া দেবীবরের সকল ক্রটীর কালিমা ধৌত করিয়া দিতে লাগিল।

গৃহে ফিরিয়া তিনি স্থির হইতে পারিলেন না। মুহুরী রাম পরদিনের মোকর্দ্দমার কাগজপত্র আনিয়া দিল—তিনি সে সব মন দিয়া পড়িতে পারিলেন না। শেষে তিনি দেবীবরকে একখানি পত্র লিখিলেন, সে পত্রে তিনি ক্রটী স্বীকার করিলেন, ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; লিখিলেন—"তুমি আমাকে ছোট ভাইয়ের মত দেখিয়া আসিয়াছ—তোমার ঋণ আমি কখনও শোধ করিতে পারিব না। মা আমাকেও তাঁহার স্নেহ হইতে বঞ্চিত করেন নাই। মার কথা স্মরণ করিয়া—সেকালের কথা মনে করিয়া ছোট ভাইটির অপরাধ ক্ষমা কর। আমার এ অপরাধ তুমি ক্ষমা না করিলে আমি শান্তি পাইব না। তোমার কত টাকা দরকার, আমাকে লিখিও; আমার যাহা কিছু, তোমার জ্ঞান করিও। হয় তুমি একবার আইস; নহে ত আমাকে তোমার কাছে যাইবার অনুমতি দিও।"

পত্রখানা লিখিয়া—ডাকে পাঠাইয়া তবে গুরুপ্রসাদ একটু স্থির হইলেন—মোকর্দ্দমার কাগজপত্র দেখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক স্থৈর্য্য ফিরিয়া পাইতেছিলেন না।

রাত্রিতে আহারের সময় গৃহিণী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেহাই কি উত্তর দিলেন? মেয়ে জামাই রবিবারে আসবে ত?" তখন গুরুপ্রসাদের মনে পড়িল, তিনি জামাতার গৃহে যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি, সে পথে আসিনি।"

গৃহিণী বলিলেন, "পোড়াকপাল আমার, তাই তোমাকে আবার কাজের কথা বলি। কি মানুষ—মেয়ের বাড়ী যা'বে বলে' বাহির হ'লে, আর গেলে না!"

গুরুপ্রসাদের হৃদয়ের বেদনার—চাঞ্চল্যের স্বরূপ বুঝিবার সামর্থ্য যদি তাঁহার গৃহিণীর থাকিত, তবে তিনি এ কথা বলিতে পারিতেন না।

গৃহিণী এমনই ভাবে বকিয়া চলিলেন; গুরুপ্রসাদ বিরক্ত হইয়া সামান্য ভোজন করিয়াই উঠিলেন। গৃহিণী বলিলেন, "ও মা, কিছুই যে খেলে না! বন্ধুর বাড়ী খেয়ে এসেছ বুঝি?"

৩

পীতাম্বরের বড় মেয়ে রেণু কলিকাতায় বাপের বাড়ী আসিয়াছে; এবার

দুই তিন মাস থাকিয়া প্রসবের পর ফিরিয়া যাইবে। সে তাহার মাকে লিখিয়াছে, "তুমি আসিলে, বাবার ও আর সকলের কষ্ট হইবে; তোমার আসিয়া কাজ নাই। জ্যেঠাইমার যত্নেই আমি অস্থির—আর যত্নের দরকার নাই। জ্যেঠাইমা আমাকে লইয়াই ব্যস্ত; যেন তাঁহার আর কোনও কাজই নাই।" হৈমবতী জাকে লিখিয়াছেন, "আমার যতটুকু সাধ্য আমি যে করিব, তাহা তোমাকে বলাই বাহুল্য। তবুও তোমার মার প্রাণ; হয়ত তুমি স্থির থাকিতে পারিবে না। যদি আস, তবে কেন ঠাকুরপোকে ছুটী লইয়া আসিতে বল না? অনেক দিন তোমাদের দেখিতে পাই নাই; দেখিতে বড় ইচ্ছা করে—খোকাখুকী ত আমাদের চিনিতেই শিখিল না!"

রেণু বাপের বাড়ী আসা অবধি তাহার স্বামী অমরনাথ সপ্তাহে দুই একবার করিয়া শ্বশুরবাড়ী আসিয়া থাকে—এক সপ্তাহ না আসিলে হৈমবতী নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। অমরনাথ এটর্ণী হইবে বলিয়া কাজ শিখিতেছে—ছয় বৎসরের এখনও তিন অবশিষ্ট। ছেলেটি বেশ চালাক—বিশেষ শ্বশুর ধনবান বলিয়া শ্বশুরবাড়ীর একটু 'নেওটো'—এটাও তাহার বিষয়-বুদ্ধির পরিচায়ক, সন্দেহ নাই; কারণ, তাহার আশা আছে—সে পাশ করিয়া আফিস খুলিয়া বসিলেই শ্বশুরের সঞ্চিত অর্থ রাজপুতানার মরু হইতে কলিকাতায় আনিয়া খাটাইবার ব্যবস্থা করিবে। নহিলে তাহার পিতার যেরূপ আর্থিক অবস্থা তাহাতে তাহার পক্ষে সহসা স্বতন্ত্র আফিস খুলিলে তাহার খরচ যোগান অসম্ভবই হইবে। ভবিষ্যতে সাফল্যের চেষ্টায় সে এখন হইতেই ধনী দেখিয়া বন্ধুত্ব করে—সভা-সমিতিতে যায়, ইত্যাদি।

শনিবারে সে শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। বাড়ীর মধ্যে যে ঘরটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সেইটিই হৈমবতী রেণুর জন্য রাখিয়াছিলেন। সেই ঘরে শুইয়া অমরনাথ পত্নীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। রেণু আসিয়া শ্বশুরবাড়ীর সব সংবাদ সংগ্রহ করিল। তাহার পর অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "মার খবর কি?" সে শাশুড়ীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। রেণু হাসিয়া বলিল, "আমি লিখেছি, মার এসে কাজ নেই; জ্যেঠাইমার যত্নেই আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। আমি যেন কচিখুকী—তিনি রাত দিন আমাকে নিয়ে এখন ব্যস্ত!"

স্ত্রীর মুখচুম্বন করিয়া অমরনাথ বলিল, "তুমি বুঝি এর মধ্যেই খুব বড়—পাকা গিন্নী হয়েছ? আগে তোমার খুকু হ'ক!"

স্বামীর কথায় রেণুর পাণ্ডু গণ্ডে লজ্জার রক্তাভাসঞ্চার হইল—সে

পরিবর্ত্তনে তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইল। অমরনাথ আবার তাহাকে চুম্বন করিল।

তাহার পর অমরনাথ বলিল, "কিন্তু তাঁরা এলে ভাল হ'ত।"

রেণু বলিল, "কিচ্ছু না।"

"সে জন্যে নয়।"

"তবে?"

অমরনাথ গম্ভীর ভাবে বলিল, "অন্য কাজ আছে।"

স্বামীর ভাবান্তর দেখিয়া রেণু চিন্তিত হইল; জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

অমরনাথ যে এটর্ণীর আফিসে কাজ করিত, গুরুপ্রসাদের সব কাজ সেই আফিসে হইত। গুরুপ্রসাদ দেবীবরকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এক সপ্তাহ তাহার উত্তরের আশা করিয়া হতাশ হইয়া তিনি বন্ধুর আর্থিক অবস্থার সন্ধান লইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার এটর্ণীকে সন্ধানের ভার দিয়াছিলেন। সন্ধানে জানা গিয়াছে, লোকসানের পর লোকসানে তাঁহার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আফিসে অমরনাথ সে সব জানিতে পারিয়াছে, এবং শ্বশুরকে সে সব কথা জানান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার এই সতর্কতায় তাহার বুদ্ধিতে শ্বশুরের শ্রদ্ধা জন্মিবে, এবং তিনি বুঝিতে পারিবেন, উপযুক্ত জামাতা এখন হইতেই তাঁহার স্বার্থের প্রতি বিশেষ মনোযোগী।

অমরনাথ যখন রেণুকে সে সব কথা বলিতে লাগিল, তখন প্রথমে রেণু একটু শঙ্কিতা হইল; কিন্তু সব কথা সে ভাল বুঝিতে পারিল না। বিশেষ, অমরনাথ তখনও আইন পরিপাক করিতে না পারায়, তাহার কথায় আইনের তর্ক ও আইনের ভাষা এত অধিকপরিমাণে ব্যবহৃত হইতে লাগিল যে, শেষে রেণু তাহার কথা বুঝিবার আশা ত্যাগ করিল। তাহার দুর্ব্বল দেহে নিদ্রার শিথিল ভাব আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল—সে হাই তুলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অমরনাথ তাহা লক্ষ্য না করিয়া কেবলই বলিয়া যাইতে লাগিল। শেষে অমরনাথের কথা শেষ হইলে রেণু বলিল, "তাই ত!" অমরনাথ আর কিছু বলিল না দেখিয়া রেণু বলিল, "তা' এ'র জন্যে বাবার আসার দরকার কি?"

অমরনাথ বলিল, "তোমার যদি একটু বুদ্ধি আছে! এ কি একটা কম ব্যাপার?"

রেণু ভাবিল, স্বামী যাহা বলিলেন, তাহাই সত্য হইবে—সে কিছু বুঝে না।

যৌবনবিকাশকালে বাঙ্গালীর মেয়ে স্বামীর প্রতি যে ভালবাসা অনুভব করে, তাহা ভক্তিরই নামান্তর; নবযৌবনপুলকিত হৃদয়ে বিকশিত প্রেমপদ্ম তখন পতিকে নিবেদন করিতে পারিলেই সে কৃতার্থ—ধন্য বোধ করে, সেই জন্যই সে ব্যাকুল হয়। সে প্রেম পবিত্র ও সুন্দর; তাহাতে স্বার্থের আবিলতা বা বিচারবিবেচনার ক্রটী নাই। রেণু বলিল, "তবে কি করবে?"

অমরনাথ বলিল, "সেই কথাই ত বলছি; তা' তুমি সেদিকে কাণই দিচ্ছ না।"

স্বামী তাহার নিদ্রালস ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন বুঝিয়া রেণু লজ্জিতা হইল।

একটু ভাবিয়া অমরনাথ বলিল, "তুমি এ সব কথা লিখে দাও।"

কি সর্ব্বনাশ! সে কি লিখিবে? একে ত সে স্বামীর সব কথা বুঝিতেই পারে নাই; তাহার পর সে এ সব কথা লিখিবে কেমন করিয়া? সে ত জ্যেঠামহাশয়কে ও জ্যেঠাইমাকে কখনও পর ভাবিতে পারে নাই—তাঁহাদের অবারিত স্নেহই ত তাহাকে তাহা ভাবিতে দেয় নাই! সুতরাং এখন সে কেমন করিয়া তাঁহাদের এ সব কথা বাবাকে বা মাকে লিখিবে? তাঁহারা জানিতে পারিলে কি মনে করিবেন? বাবা কি মনে করিবেন? আর সর্ব্বোপরি তাহার মন কি বলিবে? সে তাহা পারিবে না। কিন্তু—স্বামী তাহাকে লিখিতে বলিতেছেন; তিনি বলিতেছেন, এ কথা বাবাকে জানান আবশ্যক। রেণু ভাবিতে লাগিল; কিন্তু সে কিছুতেই পিতাকে এ সব কথা লিখিতে পারিবে না। সে স্বামীকে বলিল, "এ সব বড় কথা—আমি বলি, তুমি লিখ।"

অমরনাথ বলিল, "তা' তুমি না লিখ্‌লে আমাকেই লিখ্‌তে হ'বে।"

রেণু আবার ভাবিল; জিজ্ঞাসা করিল, "লেখাটা দরকার—এখনই লেখা?"

"যত দেরী হ'বে, তত বেশী ক্ষতি হ'বার সম্ভাবনা। আর যখন জানাতেই হ'বে, তখন যত শীঘ্র জানান যায়, ততই ভাল।"

রেণুর মনে হইতে লাগিল, যেন তাহাদের সংসারের আনন্দালোকে উজ্জ্বল আকাশে দূরে সহসা দুর্ঘটনার মেঘ দেখা দিতেছে; এখনও তাহা ক্ষুদ্র—এখনও তাহাতে আলোক নির্ব্বাপিত হয় নাই; কিন্তু তাহার বক্ষে প্রলয়-ঝঞ্ঝা নিহিত আছে, সেই ঝঞ্ঝায় সে সংসার ছিন্নবিচ্ছিন্ন—চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। সেই কল্পনার দুশ্চিন্তায় যেন তাহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। শেষে সে ভাবিল, সে না হয় কিছু বুঝে না; কিন্তু তাহার দাদা? সকলেই ত তাহাকে

বিশেষ বুদ্ধিমান বলে। সে স্বামীকে বলিল, "আচ্ছা ; না হয় তুমি দাদাকে লিখিয়া দিতে বল।"

অমরনাথ স্বীকৃত হইল।

তখন রাত্রি প্রায় বারটা—কর্ম্মকেন্দ্র কলিকাতার রাজপথেও কোলাহল কমিয়া গিয়াছে ;—ধূমান্ধকার গগনে তারকার দীপ্তি, আর রাজপথে আলোকের দীপ্তি—উভয়ই ম্লান ও মলিন। কেবল যে সব শব্দ দিবাভাগে শ্রুত হয় না—সেই সব শব্দে বুঝা যাইতেছে, মানুষ যখন ঘুমাইতে যায়, তখনও জীবজগৎ সুপ্ত হয় না। কোথাও কলে শ্রমজীবীদিগের জন্য আহ্বান ধ্বনিত হইতেছে—কোথাও ষ্টীমারের বাঁশী বাজিতেছে—দূরে ট্রেণের এঞ্জিনের গর্জ্জন ; আর গৃহে—পথে সর্ব্বত্র কত জীবের জীবনকোলাহল! কত কীট, কত পতঙ্গ—এখন আহার-সন্ধানে বাহির হইয়াছে—তাহারাও জীবন-সংগ্রাম হইতে অব্যাহতি পায় না—তাহাদের মধ্যেও কত কলহ—কত কাড়াকাড়ি—জীবনধারণের জন্য কি জীবনান্ত চেষ্টা!

অমরনাথ ঘুমাইয়া পড়িল ; রেণু যে ঘুমাইয়াছে, সে বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু রেণু ঘুমায় নাই—সে ভাবিতেছিল। অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়াছিল—নিদ্রায় তাহার নয়ন মুদিয়া আসিতেছিল, তবুও সে ঘুমাইতে পারিতেছিল না। এ সময় স্বভাবতঃই মহিলাদিগের সুনিদ্রা হয় না—তাহার উপর দুশ্চিন্তায় সে যখনই ঘুমাইতেছিল, তখনই দুশ্চিন্তাসঞ্জাত বিকৃত স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল—আর যেন শান্তির আশায় চিরাশ্রয় স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইতেছিল।

ঘরের ঘড়ীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিতেছিল—একটা, দুইটা, তিনটা, চারিটা। তাহার পর রেণু কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—শ্রান্ত প্রকৃতি তাহাকে নিদ্রার শান্তি দিতেছিল।

যখন মুদিত নয়নপল্লবে স্বামীর অধরস্পর্শে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সকাল হইয়াছে ; অমরনাথ একটা জানালা খুলিয়া শার্সি বন্ধ করিয়া দিয়াছে—কাচের মধ্য দিয়া দিবালোক কক্ষ প্লাবিত করিতেছে ; তাহার ঘর ফুলদানীতে সজ্জিত গোলাপের সৌরভে পূর্ণ ; বাহিরে রাজপথে কর্ম্মকোলাহল শ্রুত হইতেছে।

অমরনাথ আবার পত্নীকে চুম্বন করিয়া বিদায় লইল ; বলিয়া গেল—যাইবার সময় তাহার দাদাকে সে কথা বলিয়া যাইবে। রেণু বসিয়া ভাবিতে

লাগিল—তবে স্বামীর গত রাত্রির কথা দুঃস্বপ্নমাত্র নহে ? যদি তাহা কেবল একটা দুঃস্বপ্ন হইত ! সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিল।

অমরনাথ বৈঠকখানায় আসিয়া দেখিল, রেণুর দাদা বেণুকর হাই তুলিতে তুলিতে সেই ঘরে প্রবেশ করিতেছে। বেণুকর গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিত—তাহার উঠিতে একটু বিলম্ব হইত। ঘরে আসিয়াই সে দেবীবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র নটবরকে বলিল, "দাও, বড়দা,—এক কাপ চা দাও।"

অমরনাথ বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "বেশ ব্যবস্থা—সব শেষে এসে সকলের আগে চা !—Last come first served !"

বেণুকর বলিল, "কলির উল্টা ব্যবস্থা।"

"এখনই এই—গিন্নী হ'লে না জানি কি করবে !"

"তখন গিন্নী সকালে তুলে দেবেন ; তাঁ'কে ত আর রাত জেগে নোট মুখস্থ করতে হ'বে না।"

চা পান করিয়া অমরনাথ দেবীবরের কাছে বিদায় লইয়া হৈমবতীকে প্রণাম করিয়া যাইবার সময় বেণুকরকে বলিল. "চল না—একট বেড়িয়ে আসবে।"

বেণুকর বলিল, "কত দূর ?"

"এই ট্রাম পর্য্যন্ত।"

হতাশভাবে "চল" বলিয়া বেণুকর উঠিল—আপনার চটী জুতা নটবরকে দিয়া তাহার অ্যালবার্ট জুতা পায়ে দিয়া, শিথিল কাপড় কষিয়া পরিয়া, গায়ের কাপড়খানা গাত্রে জড়াইয়া সে ভগিনীপতির সহগামী হইল।

পথে অমরনাথ তাহাকে দেবীবরের আর্থিক অবস্থার কথা জানাইল। কথাগুলা বেণুকরের ভাল লাগিল না—যদি এ সব কথা সত্যই হয়, তবুও সে তাহাদের কথা ; অমরনাথের সে জন্য এত মাথাব্যথা কেন ?

শেষে অমরনাথ যখন তাহাকে সে সব কথা পীতাম্বরকে জানাইতে বলিল, তখন বেণুকর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল ; বলিল—"না। আমি তা পারব না। যদি জানানই দরকার হয়—জ্যেঠামশায় জানা'বেন।"

অমরনাথ বলিল, "তিনি জানা'বেন ?"

"নিশ্চয়। কেন না—তিনিই বাবার ভাই।"

"তবে তুমি জানা'তে পারবে না ?"

"না।"

"তা' হ'লে আমাকেই জানাতে হ'বে?"

"তোমার খুসী।"

ট্রামে উঠিয়া অমরনাথ ভাবিল, ভাই বোন দুইটিরই বুদ্ধি সমান।

বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে বেণুকর ভাবিতে লাগিল, আইনের শানে কি মানুষের বুদ্ধি এমনই হয়! মানুষ আর কাহাকেও বিশ্বাস করে না? বোধ হয়, কেবলই মামলার মিথ্যায় অভ্যস্ত হইলে মানুষ এমনই হয়।

সে বাড়ী ফিরিয়া দেবীবরের কনিষ্ঠ পুত্র নীলাম্বরকে জিজ্ঞাসা করিল—"নীলু, চা কি ফুরিয়ে গেছে?"

নীলাম্বর বলিল, "হাঁ, মেজদা।"

পাশের ঘর হইতে দেবীবর বলিলেন, "বেণু, আয়—আমার কাছে এক কাপ আছে—রেণু খা'বে না।"

বেণুকর জ্যেঠা মহাশয়ের কাছে যাইয়া এক কাপ চা শেষ করিল; তাহার পর আপনার ঘরে যাইয়া একখানা পুস্তক লইয়া শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে হৈমবতী সেই ঘরে আসিয়া বলিলেন, "কি, বেণু, এখনও বিছানায়?"

বেণুকর বলিল, "কি করি, বল—জ্যেঠাইমা? বারোটার আগে কলেজ নেই। আবার এই শীতে সকাল বেলা অমর ট্রাম পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেল!"

হৈমবতী হাসিয়া বলিলেন, "সেই পরিশ্রমে বুঝি আবার শুলি?" তাহার পর তিনি বলিলেন, "আজ ত তোর কলেজ বেলায়? সেদিন ফুলুরী খেতে চাইছিলি—আজ ভেজে দেব। দেখি, রেণু যদি দু'খানা খেতে পারে; কিছু খায় না।"

"সে না খায়, আমি সব খা'ব। তাই ত ভাবি, জ্যেঠাইমা, তুমি মরে' গেলে, এমন করে' আমাকে কে খাওয়াবে?"

"আমি মরবার আগে সে ব্যবস্থা করে যা'ব; বৌমাকে সব শিখিয়ে দিয়ে যা'ব। এবার আসুক ছোটবৌ, তোদের দু' ভাইয়ের বিয়ে আমি বৈশাখ মাসেই দেব।"

"কি সর্ব্বনাশ! কিন্তু জ্যেঠাইমা ও কিছু না। তোমার মত যত্ন কেউ করতে পারবে না।"

"পাগল ছেলে!" বলিয়া হৈমবতী বেণুকরের কপালের উপর হইতে তাহার চুলগুলা সরাইয়া দিলেন।

৪

মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গিয়াছে। পীতাম্বরের গৃহের প্রাঙ্গণে একটি বালিকা একটি হরিণ-শাবককে খাবার দিতেছে; ঘাঘরাপরা দাই (ঝি) একটি শিশুকে ঘুম পাড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে এবং সে না ঘুমাইলে যে মন্দিরের কাছে বড় গাছের বাসিন্দা অবদেবতাটি তাহাকে লেজে বাঁধিয়া লইয়া যাইবেন, সে কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। শিশু সোৎসাহে বলিতেছে, সে তাহার পিতার ডাক্তারী ছুরী দিয়া তাহার লেজ কাটিয়া দিবে! এক পার্শ্বে প্রাচীরের উপর বসিয়া দুইটি ময়ূর ঝিমাইতেছে। এমন সময় দ্বারে গাড়ী থামিল—পীতাম্বর আসিয়া ভৃত্যকে গাড়ী হইতে ব্যাগ প্রভৃতি নামাইয়া লইতে বলিয়া প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন, যাইবার সময় কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কণা, হরিণ খাচ্ছে ত?"

আজ পীতাম্বরকে বড় শ্রান্ত দেখাইতেছিল—হাঁসপাতালের কাজ শেষ করিয়া তাঁহাকে মন্ত্রীর বাড়ী যাইতে হইয়াছিল; মন্ত্রীর পৃষ্ঠে পৃষ্ঠব্রণের চিকিৎসা চলিতেছে—রাজ্যের সব ডাক্তারকেই হাজিরা দিতে হয়। ক্ষতের অবস্থা বড় ভাল নহে—মন্ত্রীরও বয়স অনেক, শরীর দুর্ব্বল; কাজেই দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছে। এ সব রাজ্যে রাজার বা মন্ত্রীর মৃত্যু বড় বিষম ব্যাপার—সকলেরই এক একটা দল আছে—দলের কর্ত্তার মৃত্যু হইলেই খেলার ছকে বলের স্থান-পরিবর্ত্তন হয়; সকলেরই চাকরী লইয়া—কখনও বা প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে।

কাপড় ছাড়িয়া পীতাম্বর স্নান করিয়া আসিলেন। পাচক খাবার দিলে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল। পীতাম্বর তখন একখানা পত্র পড়িতেছিলেন। তাঁহার আগমন-বিলম্বে পত্নী কল্লোলিনী ভৃত্যকে খাবারের পাহারায় রাখিয়া স্বয়ং তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়া দেখিলেন, তিনি নিবিষ্টচিত্তে পত্র পড়িতেছেন—ভ্রূ কুঞ্চিত। কল্লোলিনী বলিলেন, "খাবার দিয়েছে।"

"হুঁ" বলিয়া পীতাম্বর আবার পত্রখানা পড়িতে লাগিলেন।

কল্লোলিনী একটু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কা'র চিঠি?"

পীতাম্বর মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "অমরের।"

কল্লোলিনী আরও ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব ভাল ত?"

"হাঁ।"

"রেণু ভাল আছে?"

"ভালই আছে।"

তখন কল্লোলিনী বলিলেন, "চল। ভাত যে জুড়িয়ে গেল; শীতকাল—জুড়ান ভাত কি আর খেতে পারবে?"

পীতাম্বর পত্র ফেলিয়া আহার করিতে গেলেন।

আহারের সময় পীতাম্বরের অন্যমনস্কভাব দেখিয়া কল্লোলিনীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, কোনও কারণে তিনি চঞ্চল হইয়াছেন। বাস্তবিক, পীতাম্বর জামাতার পত্র পাইয়া যে চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করিতেছিলেন, তাহা জয় করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার জীবনে চাঞ্চল্যের কারণ বড় ঘটে নাই—ঘটনার স্রোত একটানা বহিয়া গিয়াছে। পঠদ্দশায় তিনি যখন পিতৃহীন হয়েন, তখন সংসারের সব ভার দেবীবর লইয়াছিলেন। যদি প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়া থাকে, সে সংগ্রাম দেবীবর করিয়াছেন; যদি ঝড় বহিয়া থাকে, দেবীবর তাহা সহ্য করিয়া ভ্রাতাকে নিরাপদ করিয়াছেন। তাহার পর বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া এই চাকরী—সংসার, সন্তান, সম্পদ—সব বিষয়েই তিনি সৌভাগ্য সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। কাজেই সামান্য কারণে তিনি চঞ্চল হইয়া উঠেন; সে চাঞ্চল্য গোপন করিতে পারেন না।

স্বামীর চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া কল্লোলিনী তাহার কারণ বিচার করিতে লাগিলেন—মন্ত্রীর পীড়া? সে ত আজ পক্ষকালের কথা; পক্ষকালই ত মানুষে মরণে যুদ্ধ চলিতেছে; কিন্তু কই কোনও দিন ত তিনি স্বামীকে এত চিন্তিত দেখেন নাই? তবে?—তবে ঐ যে পত্র, উহাতেই কিছু আছে। নহিলে পীতাম্বর বার বার পত্র পড়িবেন কেন? তবে পীতাম্বর তাঁহার কাছে কোনও কথা গোপন করিয়াছেন। কৌতূহলে কল্লোলিনী আর স্থির থাকিতে পারিতেছিলেন না—সঙ্গে সঙ্গে একটু অভিমানও হইতেছিল। কেন না, তিনি সত্য সত্যই স্বামীর গৃহিণী ও সচিব—স্বামী চন্দ্রগুপ্ত হইলে তিনি চাণক্য—স্বামী প্রথম উইলিয়ম হইলে তিনি বিসমার্ক। পীতাম্বর টাকা রোজগার করিয়া খালাস, সংসারের সব বন্দোবস্ত কল্লোলিনীর; সে দিকে দৃষ্টি দিবার সময় বা ইচ্ছা পীতাম্বরের নাই। এমন কি, টাকা খাটান প্রভৃতি কাজেও পীতাম্বর পত্নীর পরামর্শ লইয়া থাকেন—কি জানি বিদেশে যদি সহসা কোনও দুর্ঘটনা ঘটে, স্ত্রীর সব জানা থাকা ভাল। এমন কি, হিসাবের খাতাও কল্লোলিনীর কাছে। এ অবস্থায় স্বামী তাঁহার নিকট হইতে কিছু গোপন করিতেছেন মনে করিয়া কল্লোলিনী কিছু কুপিতাও হইলেন। একটু ব্যস্তভাবে আহার শেষ করিয়া তিনি স্বামীর কাছে উপস্থিত হইলেন।

পীতাম্বর আজ অন্য দিনের মত বিশ্রাম করিতেছিলেন না—কতকগুলি ডাক্তারী মাসিকপত্র লইয়া পৃষ্ঠব্রণে রোগরস-চিকিৎসার ফলাফলের হিসাব দেখিতেছিলেন। একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া কল্লোলিনী বলিলেন, "অমর কি লিখেছে?"

পীতাম্বর বলিলেন, "ও সব অন্য কথা।"

"কি অন্য কথা?"

"পরে শুনো।"

পীতাম্বর পড়িতে লাগিলেন; কল্লোলিনী বসিয়া রহিলেন—তিনি কাজ লইতে জানিতেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে পীতাম্বর পাঠ শেষ করিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলেন, কল্লোলিনী বসিয়া আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ যে গড়াইলে না?"

কল্লোলিনী বলিলেন, "না। তোমার পড়া শেষ হ'ল?"

"হাঁ।"

"এখন অমরের পত্রখানা আমাকে পড়ে শুনাও।"

পীতাম্বর পত্রের কথা পত্নীকে বলিলেন।

শুনিয়া কল্লোলিনী বলিলেন, "দেখ্‌লে—মন নারায়ণ! রেণু লিখেছে, আমার যাবার দরকার নেই; তুমিও বল্‌ছ, তাই; কিন্তু আমার কেমন মন টান্‌ছে।"

পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, তুমি গিয়ে কি করবে?"

"তুমি যা'বে না?"

"না।"

"ও মা, আমার কি হ'বে! এত বড় একটা ব্যাপার শুনেও তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌বে?"

"দাদা ত আমাকে কিছু লেখেন নি।"

"শোন কথা। তিনি কি আর লিখবেন? তোমার যেমন ভাই-অন্ত প্রাণ! কই, এই যে এতখানি হয়েছে, তিনি কি এক দিন একবার তোমাকে কিছু জানিয়েছেন?"

"কোনও কালেও ত আমি জান্‌তে চাইনি।"

"তুমি যে চাওনি—সেই জন্যেই ত তাঁ'র আরও জানান উচিত ছিল।"

পীতাম্বর পত্নীর কথার কোনও উত্তর দিলেন না। কিন্তু আবাল্য তাঁহাদের

দুই ভ্রাতায় সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া তিনি ভ্রাতার ব্যবহারে কোনও ত্রুটী লক্ষ্য করিতেও পারিলেন না।

কল্লোলিনী বলিলেন, "ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি না হ'লে কি আর অমর লিখেছে।"

"সে লেখাতেই কি এত ভাবনার কারণ হ'ল?"

"হ'ল না? তা'রা আইনের সব জানে—বুঝে।"

পীতাম্বর হাসিয়া বলিলেন, "আইন কিছু অসাধারণ কাণ্ড নয়।" জিনিসটাকে লঘু করিবার চেষ্টায় তিনি বলিলেন, "যদি আইনের কথাই বল, তবে ত ভাববার কোনও কারণই নেই। থাকবার মধ্যে বাড়ী, তা' দাদা নষ্ট করলেও তাঁ'র অর্দ্ধেক ছাড়া নষ্ট করতে—দান বিক্রয় বন্ধক—কিছু করতে পারেন না।"

কল্লোলিনী বলিলেন, "শুধু কি বাড়ী? ঠাকুর কি তোমাদের কেবল ঐ বাড়ীই দিয়ে গিয়েছিলেন; আর কিছু দেন নি? আমি কি জানি নে?"

"ওগো—শোন—ছিল আর বার হাজার টাকা; তা'ও ত তোমার আইনের হিসাবে ছ' হাজার দাদার। যদি হিসেবই ধর—তবে মনে আছে ত, রেণুর বিয়েতে যে গয়না আমি আগে করিয়েছিলাম, তা' ছাড়া আর সবই ত দাদা দিয়েছেন। তা'র পর এই বার মাসে তের তত্ত্ব—ইস্তক জামাইষষ্ঠী লাগায়েত ইলিশমাছ—এ সবেও সব ধরলে কোন্ চার হাজার না গেছে। তবে ত রইল, কেবল দু' হাজার।"

তর্কে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া কল্লোলিনী ভাবের দিকে গেল—"ও সব তর্ক রাখ। দেনাকে আমার বড় ভয় গো—বড় ভয়। তুমি জান না, কত লোক দেনার জ্বালায় আত্মহত্যা করেছে।" দেনাকে যে কল্লোলিনীর বড় ভয়, সে কথা সত্য; সেই জন্যই, পাছে কোনও সুদূর ভবিষ্যতে তাঁহার ভ্রাতা দেনা করে, এবং শেষে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়, সেই ভয়ে তিনি যখনই কলিকাতায় যান, তখনই স্বামীর বাড়তি টাকা হইতে কিছু ভাইকে দিয়া আসেন!

স্ত্রীর কথা শুনিয়া পীতাম্বর হাসিয়া বলিলেন, "তা' তুমি যাই কেন বল না—এখন আমার পক্ষে যাওয়া মানেই আত্মহত্যা করা—চাকরীটি আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি টাকা এই রাজপুতানার মরুভূমিতে ছড়িয়ে দিয়ে তোমার ভয় ভাঙ্গাতে বাঙ্গালায় যাওয়া।"

বুদ্ধিমতী কল্লোলিনী বুঝিলেন, এ সময়—মন্ত্রীর এই পীড়ার সময় ছুটী চাহিলে ছুটী ত মিলিবেই না, অধিকন্তু চাকরী যাইবে। তিনি নরম হইয়া বলিলেন, "আমি কি বলছি, আজই—এখনই চল ?"

"তবে ?"

"এর পর মন্ত্রী মশায় সারলে।—ও দিকে রেণুও ভরা পোয়াতী।"

"আচ্ছা, তখনকার কথা তখন হ'বে। আমাকে এখন আবার মন্ত্রী ম'শায়ের বাড়ী যেতে হ'বে।"

কল্লোলিনী উঠিলেন; বলিলেন, "যাবার আগে, অমরের চিঠির জবাবটা দেবে না ?"

"কাল দেব" বলিয়া পীতাম্বর ধড়াচূড়া আঁটিতে উঠিলেন।

পীতাম্বর চলিয়া গেলে কল্লোলিনী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে বাসনাতৃপ্তির সম্ভাবনার আনন্দ আর আশঙ্কা আলোক ও অন্ধকারের মত খেলা করিতে লাগিল। যে বাসনা তিনি কত দিন হইতে মনে পোষণ করিয়াছেন—পুষ্ট করিয়াছেন, অথচ কোনওরূপে প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই—আজ কি অপ্রত্যাশিত ঘটনার অতর্কিত আবির্ভাবে তাহা পূর্ণ হইবে ? যে আশা তিনি দেবমন্দিরে দেবতার পূজার সময় মনে মনে দেবতাকে নিবেদন করিয়াছেন, দেবতা কি সেই আশা পূর্ণ করিবেন ? হৈমবতীর ব্যবহারে তিনি কখন কোনও দোষ দিতে পারেন নাই। কিন্তু ঐ যে হৈমবতীর স্নেহ ও যত্ন—ঐ যে দেবীবরের আওতায় পীতাম্বর, আর হৈমবতীর আওতায় কল্লোলিনী—ঐ যে তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের ও প্রাধান্যের পথে স্নেহের ও লোকাচারের প্রাচীর—আর ঐ যে বেণুর ও রেণুর মুখে কেবলই জ্যেঠামহাশয়ের ও জ্যেঠাইমার প্রশংসা—ঐ সবই তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি চাহেন স্বাতন্ত্র্য—তিনি চাহেন প্রাধান্য। হৈমবতী কোনও দিন তাঁহার পথে দাঁড়ান নাই; কিন্তু তাঁহার স্নেহ তাঁহাকে তাঁহার ঈপ্সিত অধিকার লইতে কুণ্ঠা অনুভব করায়। যে আশা জীবনে পূর্ণ হইবে না মনে করিয়া তিনি ব্যথিত হইতেন, আজ যেন সেই আশাই পূর্ণ হইবার সব আয়োজন তাঁহার সম্মুখে। এই তাঁহার সুযোগ—এ সুযোগ অবহেলা করিলে—এ জোয়ার বহিয়া যাইলে সারা জীবন কাঁদিতে হইবে। তিনি দাসীকে দিয়া মন্দিরে পূজা পাঠাইয়া দিলেন।

সেই দিন হইতে তিনি প্রতিদিন কথায় কথায় স্বামীর মনে শঙ্কাসঞ্চার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পীতাম্বর কিন্তু কিছুতেই দাদাকে দোষী করিতে পারিলেন না। তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, দেবীবর হয় ত কত কষ্টই সহ্য করিয়াছেন—তবুও তাঁহাকে কষ্ট জানিতে দেন নাই।

এমনই ভাবে তিন সপ্তাহ অতীত হইল। তিন সপ্তাহে প্রবল পত্নীর পরামর্শে ও অনুরোধে, তর্কে ও শঙ্কাপ্রকাশে পীতাম্বরও বিচলিত হইলেন। তিন সপ্তাহ পরে যখন মন্ত্রী মহাশয় আরোগ্য লাভ করিলেন, পীতাম্বর ছুটী চাহিলেন, তখন তাঁহার ছুটী ও ইনাম উভয়ই মিলিল।

কলিকাতা-যাত্রার আয়োজনকালে পীতাম্বর এক দিন অমরনাথের পত্রখানা খুঁজিতেছেন, এমন সময় কল্লোলিনী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব উল্টা-পাল্টা করে কি খুঁজছ?"

পীতাম্বর বলিলেন, "অমরের সেই পত্রখানা।"

"কেন?"

"তা'তে কি দাদার দেনার পরিমাণ কিছু আছে?"

কল্লোলিনী বলিলেন, "কেন, তুমি দিবে না কি?"

"দেখি—কত টাকা।"

কল্লোলিনী গর্জ্জিয়া বলিলেন, "বটে! মাথার ঘাম পায় ফেলে—মড়া নেড়ে, পুঁজরক্ত ঘেঁটে—ক'টা টাকাই বা করেছ যে, ছড়িয়ে দেবে? সংসারের কোনও খোঁজই ত রাখ না। এ দিকে যে আর এক মেয়ে বিয়ের যুগ্যি!"

পীতাম্বর ভাবিলেন, কলিকাতায় যাইবার আয়োজন না করিলেই ভাল করিতেন। কিন্তু তখন আর বন্দোবস্ত বাতিল করিবার উপায় নাই। কল্লোলিনী কি বলিবেন?

৫

পীতাম্বর যে দিন সপরিবারে কলিকাতায় পঁহুছিলেন, অমরনাথ সেই দিনই আসিয়া কল্লোলিনীর প্রশ্নে দেবীবরের আর্থিক দুরবস্থার বিবরণ বিবৃত করিয়া গেল। তাহার পর এক দিন এক দিন করিয়া সপ্তাহ কাটিয়া গেল। কল্লোলিনী প্রত্যহই স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "ওগো, জিজ্ঞাসা করেছিলে?" কিন্তু দেবীবর কিছুতেই দাদাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিলেন না। শেষে স্ত্রীর উত্তেজনায় ও উৎসাহে তিনি এক দিন নিভৃতে দেবীবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নিতান্ত বিব্রতভাবে তিনি বলিলেন, "দাদা, তোমার কি দেনা হয়েছে?"

দেবীবর উত্তর দিলেন, "হাঁ পিতু।" যে কথাটা তিনিও বলিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, সে কথাটা যে বলা হইয়া গেল, ইহাতে দেবীবর কতকটা চাঞ্চল্যমুক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনের অস্বস্তি কাটিল না—পীতাম্বর কি বলেন, জানিবার জন্য তিনি উৎসুক রহিলেন। তিন দিনেও যখন পীতাম্বর সে কথার উত্থাপন করিলেন না, তখন দেবীবরের মন হইতে সে ভাবটা দূর হইয়া গেল; কিন্তু পীতাম্বরের কথাটা তখন সময় সময় কাঁটার মত খচ্ খচ্ করিয়া লাগিতে লাগিল—"তোমার কি দেনা হয়েছে?"—ঐ "তোমার" কথাটাতেই ত সে সব ভাব প্রকাশ করিয়াছে—ঐ একটা কথায় সে দুই জনের মধ্যে অপরিসীম প্রভেদ বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে! তাই বটে।

এ দিকে কল্লোলিনী প্রত্যহ স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ আঁটিতে লাগিলেন—এখন কি করা কর্ত্তব্য; কেমন করিয়া পীতাম্বর তাঁহার সব দায়িত্ব এড়াইয়া সরিয়া দাঁড়াইতে পারেন। শেষে পীতাম্বর এক দিন দাদাকে বলিলেন, "বাড়ীতে বলে, নটুর আর বেণুর বিয়ে এইবার দিতে হয়। তাই ভাবছি, তেতলায় দু'টা ঘর করলে হয়।"

বাড়ীতে ঘরের অভাব ছিল না। সুতরাং ভ্রাতার কথার গূঢ় অর্থ দেবীবরের কাছে প্রতিভাত হইল। তিনি ইচ্ছা করিয়াই ভ্রাতার ঈপ্সিত কার্য্যের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার ব্যাপার যেমন অসাব্যস্ত, তা'তে এখন দু' ভাগ ঠিক না করে' তেতলায় ঘর করা কি ভাল হ'বে?"

পীতাম্বর দাদার কথায় ঠিক পথ পাইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি রকম করা যায়?"

"আমি বলি, এক জন এঞ্জিনীয়ার ডেকে বাড়ীর প্ল্যান দেখে ভাগ ঠিক করা ভাল।"

"কিন্তু আমার ত কাউকে জানা নেই।"

"আমি এঞ্জিনীয়ার চন্দ্র পালকে খবর দেব।"

ভ্রাতার সকল সঙ্কোচের অবসান করিতে পারিলেন জানিয়া দেবীবর আনন্দ অনুভব করিলেন। পীতাম্বর যে আনন্দানুভব করিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি যাইয়া কল্লোলিনীকে এ সংবাদ দিলেন। কল্লোলিনীর মুখে চক্ষুতে আনন্দের আলোক যেন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি এক গাল হাসি হাসিয়া বলিলেন, "যাই বল, আমি জানি বড়ঠাকুর দোষেগুণে মানুষ। হাজার হ'ক

পুরুষ মানুষ—বুদ্ধিমান—বুঝছেন, নিজে জড়িয়ে পড়েছেন—ভাইকে জড়াবেন কেন? তা', হ্যাঁগা—এঞ্জিনীয়ার ক'বে আসবে?"

এই অতিব্যস্তভাবে পীতাম্বর একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন; বলিলেন, "দাদা বলেছেন, তিনিই খবর দেবেন।"

"তা' বেশ, তা' বেশ।"

পর দিনই এঞ্জিনীয়ার আসিলেন, এবং ফিতা টানিয়া, নক্সা আঁকিয়া, দাম কশিয়া সপ্তাহকালমধ্যেই গোটা বাড়ীটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবার ব্যবস্থায় নক্সার উপর লাল রেখা টানিয়া দিলেন।

বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে স্রোত বহিতে আর বিলম্ব হয় না—সে বাঁধ মাটীরই হউক, আর লজ্জারই হউক। তখন স্রোতের বেগেই বাঁধের ভাঙ্গন বাড়িয়া যায় —অনেক সময় বাঁধ ভাসিয়া যায়। পীতাম্বরেরও তাহাই হইল। এঞ্জিনীয়ার চন্দ্র পাল আপনার কাজ করিয়া গেলেন। এ দিকে কল্লোলিনী সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইয়া জামাতার সহযোগে কেবলই স্বামীকে বুঝাইতে লাগিলেন—আরব্ধ কার্য্য অসম্পন্ন রাখা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে—কবে কি বিপদ ঘটে বলা যায় না; সুতরাং—বিশেষ—দেবীবর যখন অবস্থা বুঝিয়াই বিভাগের কথা বলিয়াছেন তখন—ও কাজটা একেবারে শেষ করা ভাল। তাঁহাকে ত আবার কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে—এ ত আর বাড়ীর কাছে নহে যে, আবার শীঘ্র আসিবেন; হয় ত আসিতে আবার তিন চারি বৎসর। তবে ইহার মধ্যে বেণুকরের বিবাহ আছে—সে-ই কেবল আবার আসিবার কারণ হইবে; বেণুকরের শেষ পরীক্ষার আর ত ছয় মাসও নাই। শেষে পীতাম্বর স্ত্রীর মতেই মত দিলেন।

ত্রিতলে ঘর-রচনা একটা ছলমাত্র। রেণুর শারীরিক অবস্থার অছিলায় সে কাজ বন্ধ করা চলিল; কিন্তু বিভাগের চিহ্ন পাকা করিবার জন্য মিস্ত্রী আসিল—দুই ভাগের মধ্যে দ্বারগুলা বন্ধ না করিয়া একেবারে প্রাচীর গাঁথিয়া দেওয়া হইবে।

এইবার দেবীবর বুঝিলেন, তাঁহার হিসাবে ভুল হইয়াছে। তাঁহার স্নেহই তাঁহাকে ভুল বুঝাইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, নক্সার রেখা কাটিলেই— আইনের মর্য্যাদা বাঁচাইলেই পীতাম্বর সন্তুষ্ট হইবে; কারণ, তাহা হইলেই শঙ্কার কারণ দূর হইবে। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন—স্রোত বহিয়াছে, আর সে স্রোতে সব ভাসিয়া চলিল, তখন তিনি কাতর হইলেন। তাঁহার

মনে হইতে লাগিল, সে প্রাচীর যেন তাঁহার বেদনাকাতর—দুশ্চিন্তাভারপীড়িত বক্ষের উপর উঠিতেছে ; তাঁহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে। সে দিন তিনি যেন আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না—শরীর অসুস্থ বলিয়া শয্যা লইলেন।

হৈমবতী স্বামীর অবস্থা বুঝিলেন—অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। আর এক জন তাহা বুঝিল—বুঝিয়া কাঁদিল। সে—বেণুকর। বেণুকর পিতামাতার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে—বেদনা অনুভব করিয়াছে; কিছুতেই তাঁহাদের ব্যবহারের কারণ বুঝিতে পারে নাই—তাহার সমর্থন করিতে পারে নাই। বাল্যকালাবধি যত দিনের কথা সে মনে করিতে পারিয়াছে, মনে করিয়া সে, দেবীবরের ও হৈমবতীর ব্যবহারে প্রশংসা ব্যতীত নিন্দার কিছুই পায় নাই। শৈশবে কোনও কারণে সে কাঁদিলে দেবীবর সর্ব্বকার্য্য ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে লইতেন—ভুলাইয়া শান্ত করিতেন ; তাহার সব অত্যাচার তাঁহার কাছে মিষ্ট বোধ হইত। সে যখন কলিকাতার কলেজে পড়িতে আইসে, তখন অনেক বিবেচনার পর কল্লোলিনী তাহাকে "হাতখরচে"র জন্য যে টাকা দিয়াছিলেন, এই পাঁচ বৎসরে সে তাহা খরচ করিবার অবসর পায় নাই—এমনই ভাবে দেবীবর তাহার সব প্রয়োজন পূর্ব্বেই পূর্ণ করিয়া দেন। সে কেবল স্নেহের জন্য। এখনও তাহার সামান্য অসুখে হৈমবতী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার শুশ্রূষা করেন। দেবীবরের ব্যবসায়ব্যাপারে অসাফল্য—প্রতিকূল অবস্থার সহিত দারুণ সংগ্রাম—বিপদে ধীরতা, এ সবই তাহার কাছে তাঁহার পক্ষে প্রশংসার মনে হইতে লাগিল। আর তাঁহার স্নেহশীল হৃদয়ে ভ্রাতার এই ব্যবহারের বেদনা—কতই বাজিয়াছে! তিনি কেমন করিয়া মানুষে বিশ্বাস হারাইতেছেন! সে কথা সে যতই মনে করিতে লাগিল, ততই তাহার কাছে দেবীবর প্রতিকূল অবস্থার ঝঞ্ঝাহত—দুর্ব্ব্যবহারের বজ্রাঘাতছিন্ন গিরিশৃঙ্গের মত প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। তাঁহার কথা মনে করিয়া বেণুকর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না।

তাহার পর বেণুকর আপনার দৌর্ব্বল্যের জন্য আপনাকে তিরস্কার করিল—তাহাকে দৃঢ় হইতে হইবে—সে পিতামাতার ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সেই সঙ্কল্পে সে আপনাকে বলী করিল।

বেণুকর যে ঘরে থাকিত, সেটা দেবীবরের অংশে পড়িয়াছিল। সে সে ঘর ত্যাগ করে নাই। বাড়ীর পর যখন হাঁড়ি আলাহিদা হইয়াছিল, তখনও সে

জ্যেঠাইমার ভাগেই রহিয়া গিয়াছিল। পীতাম্বর ও কল্লোলিনী মনে করিতেন, সে লজ্জায় আসিতে পারিতেছে না। তাই দুই মাস পরে—পীতাম্বর যখন আবার কর্ম্মস্থানে যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, তখন এক দিন কল্লোলিনী বলিলেন, "বেণু, তোর ঘর সাজিয়ে নে; ভজহরি পুরান চাকর, ও তোর কাছে থাকুক।"

বেণুকর বলিল, "আমি যেমন আছি, তেমনই থাকি, আর ছ' মাস বইত নয়।"

স্ত্রীর কাছে সব কথা শুনিয়া পীতাম্বর পুত্রকে বলিলেন, "তুই এ বাড়ী থাক্‌বি নে?"

বেণুকর বলিল, "না।" মনে মনে বলিল, "কখনই না।"

"তা' হ'লে আমি বাড়ী ভাড়া দিয়ে যাই?"

বেণুকর কোনও উত্তর দিল না।

পীতাম্বর পুনরায় বলিলেন, "কিন্তু দাদার যে অবস্থা, তা'তে তাঁকে বিব্রত করা ত ভাল হ'বে না।"

বেণুকর বলিল, "আর ক' মাসই বা?"

বাড়ী ভাড়া দিবার পূর্ব্বে কল্লোলিনী আর একবার পুত্রকে গৃহে আসিতে বলিলেন। বেণুকর সেই একই উত্তর দিল—না। তখন তিনি এক দিন হৈমবতীকে বলিলেন, "দিদি, উনি বলেন, বেণু যদি এসে না থাকে, তবে বাড়ী ভাড়া দিয়ে যা'বেন। তা' হ'লে বাড়ীটাই নষ্ট হ'বে। জান ত তুমি—উনি কেমন একরোখা মনিষ্যি। তুমি একবার বেণুকে বুঝিয়ে বল।"

হৈমবতী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন—বলিলেন, "আমি আজই বলব।"

সেই দিনই হৈমবতী বেণুকরকে বলিলেন, "বাবা, ছোট বৌ আজ এসেছিল; বল্লে, তুই বাড়ী না গেলে, ঠাকুরপো রাগ করে বাড়ী ভাড়া দিয়ে যা'বেন; তাই আমাকে বল্লে, তোকে বুঝিয়ে বল্‌তে।"

বেণুকর কাতর ভাবে জ্যেঠাইমার দিকে চাহিয়া বলিল, "জ্যেঠাইমা, আমি যেতে পারব না—আমি যা'ব না।"

তাহার দৃষ্টিতে হৈমবতী তাহার হৃদয়ের বেদনা দেখিলেন; তবু—উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ প্রশমিত করিয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু বাবা, বাপমার মনে কষ্ট দিবি?"

বেণুকর ম্লান হাসি হাসিল—"জ্যেঠাইমা, 'বাপমার মনে কষ্ট দিতে নেই—জ্যেঠাজ্যেঠাইয়ের মনে কষ্ট দিতে আছে?"

হৈমবতীর নয়নে অশ্রু উথলিয়া উঠিতেছিল। তিনি তবুও আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "বেণু, বাপমার সমান কি আর কেউ আছে?"

বেণুকর মনে মনে বলিল, সেই বিশ্বাস যদি অবিচলিত রাখিতে পারিতাম! প্রকাশ্যে সে বলিল, "জ্যেঠাইমা, আমি ত বাবার মার কোনও অসুবিধা করছি না; অসুবিধা যা' করছি, সে তোমার।"

হৈমবতী "অসুবিধা কি, বাবা?"—বলিতে না বলিতে সে বলিল, "অন্য অসুবিধা নয়, জ্যেঠাইমা। আমি জানি, তোমার আর দুই ছেলে যে ক'দিন দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পা'বে—সে ক'দিন আমিও পা'ব। তুমি আশীর্ব্বাদ কর—ছ' মাস পরে আমি সে ভাবনা আর ভাবব না। অসুবিধা এই যে, মা বলবেন—তুমি তাঁর ছেলেকে পর করে' নিলে—তিনি যে পর করে' দিলেন, সেটা বুঝবেন না। তা' তুমি এত দিন আমার এত অত্যাচার সহ্য করেছ যে, আজ আমার এ আব্দারটুকুও সহ্য করবে। তা আমি জানি—আর জানি বলে'ই এ আব্দার করছি।"

হৈমবতী আর কথা কহিতে পারিলেন না। বেণুকরের মস্তকে করতল সংস্থাপিত করিয়া মনে মনে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—তাঁহার নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু বেণুকরের কপালে পড়িল। তিনি চলিয়া গেলে বেণুকর সেই অশ্রু কপাল হইতে লইয়া ভক্তিভরে মস্তকে দিল।

৬

যত দিন যাইতেছিল, মানুষের উপর দেবীবর ততই বিশ্বাস হারাইতেছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই মনে করিতে চাহিতেন না যে, সংসারে স্বার্থই মানুষ পরমার্থ মনে করে—স্বার্থ ছাড়া মানুষের কাজের আর কোনও কারণ নাই। তিনি প্রাণপণ যত্নে মানুষের উদারতা, কৃতজ্ঞতা, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা—এ সকলে বিশ্বাস আঁকড়িয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। যখন তিনি ভ্রাতার ব্যবহারে সহানুভূতির চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি আর সে বিশ্বাস রাখিতে পারিলেন না—আর সে বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সহ্য করিবার শক্তিও হারাইলেন। তাঁহার পক্ষে সংগ্রাম করিবার উদ্যমের ও উৎসাহের উৎস সহসা শুষ্ক হইয়া গেল—সংসার মরুভূমি হইয়া পড়িল। এখন জীবন কেবল যাতনা—সম্বল কেবল দুর্ভাবনা।

এত দিন পাওনাদারেরা তাগাদা করিতেছিল—ওয়াদা করিয়া, সুদ আসল মিলাইয়া দলীল পাল্টাই করিয়া চলিতেছিল—দেবীবর দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু

শীঘ্রই সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। পীতাম্বর যখন বাড়ী ভাগ করিয়া লইলেন, তখন তাগাদা প্রবল হইল। যেখানে ভাই অপেক্ষা করিতে পারে না, সেখানে পাওনাদার অপেক্ষা করিবে কেন?

এ দিকে দেবীবরের বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল—হৃদয় ভাঙ্গিলে সঙ্গে সঙ্গে শরীর ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি শয্যা লইলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র নটবর চাকরীর চেষ্টা করিতেছিল। বেণুকর সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন সন্ধান করিয়া, দরখাস্ত লিখিয়া, তাহার একটা চাকরী জুটাইল। সে চাকরীর আয়ে উদরান্নের সংস্থান হয়; কিন্তু দেনা শোধ হয় না। দেবীবর ভাবিতেন। তিনি দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিলেন। হৈমবতী ডাক্তার ডাকিবার জন্য জিদ করিলে তিনি বলিতেন, আর অপব্যয়ের সময় নাই। এক দিন হৈমবতী বলিলেন, "আমি ডাক্তার ডাকাই।" দেবীবর বলিলেন, "না। ডাক্তার আমার কি করিতে পারে? পয়সা নষ্ট করো না—আরও অভাব হ'বে।" হৈমবতী বলিলেন, "আমি যা' করে পারি, খরচ চালা'ব, তুমি আপত্তি করো না।" হৈমবতী জানিতেন না যে, তিনি যে ইহার মধ্যেই কয় জন খুজরা তাগাদাদারকে পাওনা দিবার জন্য তাঁহার প্রায় সব অলঙ্কার বিক্রয় করিয়াছেন, তাহা দেবীবরের কাছে গোপন থাকে নাই। দেবীবর বলিলেন, "যদি তা'ও জান্‌তাম যে, তোমার এক গা গয়না আছে—তা' হলেও কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারতাম—খেতে পা'বে। তাও ত নেই। তুমি ত কোনও দিন সাধ করে' কিছু চেয়ে নাও নি। যখন এক এক দিন হাজার হাজার টাকা এনে সিন্দুকে রাখতে দিয়েছি, তখন যদি চেয়ে নিয়েও নিজে কিছু রাখ্‌তে! তা' কখনও কর নি; কেবল আমার সুখের জন্যেই প্রাণপণ করেছ। তা'র শোধ আমি ভাল করেই দিয়ে গেলাম!" দেবীবর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। হৈমবতী বলিলেন, "তুমি কেন ও সব কথা ভাবছ? তুমি সেরে' উঠ—আমার কিসের দুঃখ। পুরুষের টাকা জোয়ারে আসে—ভাঁটায় যায়; অনেক ত এনেছ, আবার আন্‌তে কতক্ষণ?" দেবীবর কেবল বলিলেন, "আর—কতক্ষণ?"

আজ স্বামীর এই কথায় বড় দুঃখের মধ্যেও হৈমবতী হৃদয়ে যেন স্নিগ্ধ শান্তি অনুভব করিলেন। যে স্বামী এতদিন তাঁহার ব্যবহারে এমনই ভাব প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন,যেন তিনি স্ত্রীর ভালবাসা ও ভক্তি, সেবা ও শুশ্রূষা—নিতান্ত প্রাপ্য হিসাবেই পাইয়াছেন ও লইবার বলিয়া লইয়াছেন, সে স্বামী যে তাঁহার ব্যবহারের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই অনুভূতি আজ তিনি লাভ করিলেন।

এই অনুভূতির শান্তি লইয়া তিনি সুখে মরিতে পারিবেন। আর তাঁহার কোনও দুঃখ নাই। স্বামীর ব্যবহারের কঠোরতার মধ্যে তিনি তাঁহার হৃদয়ের প্রেমামৃতের সন্ধান পাইয়াছেন। সত্য বটে, তিনি হারাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে পাইলেন; কিন্তু তাহাতে কি আইসে যায়। যে অনুভূতির এক মুহূর্ত্ত শত বৎসরের আশার ও আশঙ্কার অপেক্ষা মধুর, সে অনুভূতি তিনি লাভ করিয়াছেন। আজ তিনি সুখী। কেবল তিনি যদি স্বামীকে রাখিয়া যাইতে পারিতেন! কিন্তু এই রোগকাতর—বেদনাবিক্ষত স্বামীর শুশ্রূষা করিবার সৌভাগ্য অধিক বাঞ্ছনীয়, না স্বার্থপরের মত তাঁহাকে ফেলিয়া আপনি পলাইবার সৌভাগ্য অধিক বাঞ্ছনীয়? হৈমবতী তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

যত দিন যাইতে লাগিল, দেবীবর ততই মৃত্যুর—মুক্তির সন্নিহিত হইতে লাগিলেন। ঝড়ের ঝাপটা যেমন কাণ্ডারীহারা তরণীকে আবর্ত্তের দিকে লইয়া যায়—এক একটা পাওনার চরম পরিণতি তাঁহাকে তেমনই মৃত্যুর নিকটে লইতে লাগিল।

দেবীবর যতই মৃত্যুর সন্নিহিত হইতে লাগিলেন, ততই মৃত্যুর জন্য অধীর হইতে লাগিল; তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য্যও সময় সময় সে অধীরতা গোপন করিতে পারিত না। তাহাতে তাঁহার ব্যবহারের মাধুর্য্যও যেন সময় সময় ক্ষুণ্ণ হইত। তিনি আপনাকে সংসারের অনাবশ্যক ভার বলিয়া মনে করিতেন, এবং যত শীঘ্র তাঁহার স্বজনদিগকে সে ভার হইতে মুক্তি দিতে পারেন, ততই ভাল ভাবিতেন।

তাঁহার এই অধীরতার স্বরূপ হৈমবতীও বুঝিতে পারিতেন না; তিনিও মনে করিতেন, হতাশায় তাঁহার হৃদয় তিক্ত হইয়াছে—দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকিয়া তিনি অধীর হইয়াছেন। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি বেণুকর তাহা বুঝিত; সে যেন তাহার হৃদয়ে দেবীবরের বেদনা অনুভব করিত। সে অনুভূতি কি বেদনার! সে দেবীবরের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে তাহার শ্রদ্ধার স্নিগ্ধ ভেষজ দিতে চেষ্টা করিত; কিন্তু বুঝিত, তাহার পিতামাতার ব্যবহারে যে অনিষ্ট হইয়াছে, সে জীবন দিলেও তাহার প্রতীকার হইবে না। তবুও সে তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। এক দিকে জ্যেষ্ঠতাতের শুশ্রূষা, আর এক দিকে দুশ্চিন্তা—আবার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার পরিশ্রম—হৃদয়ে দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রবল বল ব্যতীত বেণুকর কখনই এত সহ্য করিতে পারিত না। যদি যত্নে—শুশ্রূষায় সে আর কয় মাস জ্যেষ্ঠতাতের নির্ব্বাণোন্মুখ জীবনদীপ প্রজ্বলিত রাখিতে

পারে; তবে সে পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়া আপনার চেষ্টায়—আপনার অর্জ্জনে কি সে দীপের জন্য ঘৃত সংগ্রহ করিতে পারিবে না? সে দীপ যে তাহার কাছে দেবমন্দিরে রত্নবেদীর দীপ—তাহা নিভিলে মন্দির অন্ধকার হইবে—দেবতার মুখ আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না! সে সৌভাগ্য কি সে লাভ করিতে পারিবে ?

বেণুকরের প্রতি ভাগ্য নির্দ্দয়। তাহার পরীক্ষা শেষ হইল—সাফল্যে তাহার সন্দেহ রহিল না। সেই সময়—পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বে—সে যখন মন্দিরের শত সোপান অতিক্রম করিয়া দেউলের দ্বারে পঁহুছিয়াছে, তখন দেবীবর সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইলেন। যে দিন তাঁহার বাড়ীখানি নিলামে বিকাইয়া গেল, সেই দিন—কে তাহা কিনিল, তাহা জানিতে পারিবার পূর্ব্বেই, তাঁহার ধরাদগ্ধ প্রাণ শীতল হইল—তিনি দীর্ঘকাল যে মুক্তির সন্ধান করিয়াছিলেন, মৃত্যু শেষে কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে সেই মুক্তির স্নিগ্ধ শান্তি প্রদান করিল। সব ফুরাইল। তিনি জানিতে পারিলেন না,—তাঁহার বাড়ীর ক্রেতা—গুরুপ্রসাদ।

৭

নিলামের পরদিনই গুরুপ্রসাদ যখন দেবীবরের মৃত্যু-সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না; বলিলেন, "তুমি আমাকে এমন নিষ্ঠুর দণ্ড দিলে—প্রায়শ্চিত্তের অবকাশ কিছুতেই দিলে না?"

গুরুপ্রসাদ অত্যন্ত চড়া দরে দেবীবরের বাড়ী কিনিয়াছিলেন। অমরনাথের দ্বারা পীতাম্বরও অন্য নামে নিলাম ডাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু গুরুপ্রসাদের পক্ষ হইতে একেবারেই যে দর দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে পীতাম্বরের লোক আর ডাকিতে সাহসই করেন নাই। গুরুপ্রসাদ বাস্তবিকই ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা অধিক দামে বাড়ী কিনিয়াছিলেন। তাঁহার সে কার্য্যের কারণ অনেকে বুঝিতে পারেন নাই—তাঁহার এটর্ণীও নহে। কিন্তু সেই টাকায় দেবীবরের বিরুদ্ধে সব ডিক্রী শোধ হইয়া গিয়াছিল। দেবীবরের পুত্রদ্বয় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের আর পিতৃঋণের ভাবনা ছিল না।

নিলামের পর দুই মাস কাটিয়া গেল। গুরুপ্রসাদের এটর্ণী কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে গুরুপ্রসাদ বলিলেন, "আইনতঃ অধিকার লউন।" তাহার পর এটর্ণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "অধিকারীদিগকে গৃহত্যাগের জন্য নোটিশ দিতে হইবে ত?" গুরুপ্রসাদ বলিলেন, "না।" ছয় মাস কাটিয়া গেল। এটর্ণী আবার জিজ্ঞাসা

করিলেন, "এখন কি করিবেন?" গুরুপ্রসাদ বলিলেন, "এখন থাকুক।" ইহার মধ্যে পীতাম্বরের পক্ষ হইতে অমরের প্রস্তাবে এটর্ণী গুরুপ্রসাদকে জানাইলেন, বাড়ীর ক্রেতা আছে, তিনি ইচ্ছা করিলে বিক্রয় করিতে পারেন। গুরুপ্রসাদ উত্তর দিলেন, তিনি এখন বাড়ী বেচিবেন না।

আরও তিন মাস গেল। তখন পীতাম্বর একবার কলিকাতায় আসিলেন—জামাতার গৃহে উঠিয়া গুরুপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অন্যান্য কথার পর তিনি বলিলেন, "দাদা ত বাড়ী রাখ্‌তে পারলেন না; তা' আপনি নিয়ে রেখে ভালই করেছেন। আপনার ত ওটাতে আর বিশেষ কাজ হ'বে না; ভাবছি বড় ছেলের বিয়ে দেব—ঘর কম; ওটুকু পেলে আমার ভাল হয়—আর পৈত্রিক ভিটা—।" গুরুপ্রসাদ বলিলেন, "এখন ত বেচবার কথা ভাবিনি; যদি বেচি, তোমাকে ছাড়া আর কা'কে দেব? কিন্তু পাশের জমী আর বাড়ীটাও কিনব মনে করছি—দেখি কি হয়।" পীতাম্বর প্রস্থান করিলেন।

সেই দিন গুরুপ্রসাদ আহারে বসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "পীতাম্বর এসেছিল; এখন ইচ্ছে—দাদার বাড়ীর অংশটুকু কিনবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "কথায় বলে—'ভাইয়ের বাড়া শত্রু নেই।' তা তুমি কিনেছ কি বেচবার জন্যে! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।"

গুরুপ্রসাদ হাসিলেন।

বেণুকর পাশ করিয়া চাকরী লইয়া বিদেশে গিয়াছিল—মাসে মাসে মাহিয়ানা পাইলেই আপনার নিতান্ত প্রয়োজনের মত টাকা রাখিয়া আর সব নটবরকে পাঠাইয়া দিত। সে নটবরকে বলিয়াছিল—"বড়দা, বাড়ী এখন পরের—যে কোনও দিন ভাড়ার দাবী করতে পারে—বাড়ীর দামের শতকরা বছরে ৫৲ টাকা সুদ কষে'—মাসে মাসে সেই টাকা ভাড়ার বাবদে জমিয়ে রেখো।"

নটবর তাহাই করিত। কিন্তু কেহ কখনও ভাড়া চাহিতে আসিত না।

গুরুপ্রসাদ পার্শ্বের জমী ও বাড়ী কিনিয়াছেন, অমরের কাছে সংবাদ পাইয়া পীতাম্বর তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিলেন, এইবার যদি তিনি বাড়ী বিক্রয় করেন। গুরুপ্রসাদের পুত্র সে পত্রের উত্তরে জানাইল, তাহার পিতা পীড়িত; এখন ও সব কথার আলোচনা করা অসম্ভব।

বাস্তবিকই গুরুপ্রসাদ পীড়িত হইয়াছিলেন। এক দিন একটা বড় মোকর্দ্দমা চালাইয়া বাড়ী আসিবার সময় পথে তাঁহার শ্বাসরোধানুভূতি হয়। বাড়ী ফিরিয়া তিনি ডাক্তার ডাকাইলে ডাক্তার দেখেন, হৃদয়ের অতিবিস্তৃতি হইয়াছে।

মূত্রপরীক্ষায় প্রকাশ পায়, তিনি অ্যালবুমেনোরিয়ায় ভুগিতেছেন; রোগ সারিবার নহে। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। গুরুপ্রসাদ বুঝিলেন, চিকিৎসকগণ তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্য অবস্থায় জীবনের মেয়াদ দিন কতক বাড়াইতে পারিলেও পারিতে পারেন; কিন্তু স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দিতে পারেন না। তিনি এক বিষয়ে বড় সাবধান ছিলেন—কোনও কাজ ফেলিয়া রাখিতেন না। তাহাও তাঁহার সাফল্যের অন্যতম কারণ। [ত]জেই তিনি সম্পত্তির ব্যবস্থাদি সব করিয়াই রাখিয়াছিলেন; যাহা কিছু [অব]শিষ্ট ছিল, তাহাও শেষ করিয়া অবশ্যম্ভাবীর সম্ভাবনজন্য প্রস্তুত হইলেন।

ক্রমে যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল—মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। মৃত্যুর ছায়া নিবিড় হইয়া আসিল। তখন এক দিন তিনি সকলকে ডাকিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন, "তোমাদের জন্য যে ব্যবস্থা করবার, করে' গেলাম; আর কিছু বলবার নেই। বলবার কেবল আছে একটা কথা। তোমাদের অনেক দিন বলেছি, আমার যা' কিছু দেবীবর দা' হ'তে। আমি এক দিন তা'র সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলাম। সেই অভিমান মনে নিয়ে সে চলে গেছে—আমাকে ক্ষমা করে নি—আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করবার অবকাশ দেয় নি—সে দুঃখ আমার গেল না। আমি তা'র ছেলেদের জন্যে একটা ব্যবস্থা করেছি—সে সব কাগজ বাক্সে আছে। আমি মরলে—কাচাগলায়—তা'র বাড়ী তা'র স্ত্রীর কাছে—তোমার জ্যেঠাইমার কাছে গিয়ে তাঁ'কে যেমন করে পার, আমি যা' দিলাম, লওয়াবে। আমার শ্রাদ্ধের আগেই তা' করবে; নইলে শ্রাদ্ধে আমার তৃপ্তি হ'বে না।" বলিতে বলিতে দেবীবর হাঁপাইতে লাগিলেন। গৃহিণী কাঁদিয়া বলিলেন, "ওগো, তুমি ও সব কথা বল্‌ছ কেন?" গুরুপ্রসাদ তাঁহাকে স্থির হইতে ইঙ্গিত করিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বুঝেছ?"

গুরুপ্রসাদের মৃত্যুর দুই দিন পরে তাঁহার পুত্ররা তাঁহার উইল প্রভৃতি দেখিয়া জানিল, তিনি দেবীবরের বাড়ী এবং পার্শ্বস্থ জমী ও বাড়ী দেবীবরের পুত্রদ্বয়কে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বতন্ত্র দানপত্র রেজেষ্টারী করিয়াছেন, এবং উইলে লিখিয়াছেন, পুত্ররা সেই দানপত্রানুসারে কাজ না করিলে তাঁহার উইলের ব্যবস্থা অসিদ্ধ হইবে, এবং সমস্ত সম্পত্তি একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হইবে—ইত্যাদি।

পর দিন প্রভাতেই মুহুরী রামকে ও এটর্ণীর পক্ষে অমরনাথকে সঙ্গে লইয়া গুরুপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবীবরের বাড়ী উপস্থিত হইল। রাম যাইয়া নটবরকে

বলিল, তাহারা গুরুপ্রসাদ বাবুর বাড়ী হইতে আসিয়াছে। নটবর ভাবিল, এইবার বাড়ী ছাড়িবার নোটিশ বাহির করিবে। কিন্তু রাম বলিল, "বড়বাবু গাড়ীতে আছেন—ডেকে আনি।"

কাচাগলায় গুরুপ্রসাদের পুত্র আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যেঠাইমা কোথায়?"

নটবর বুঝিতে পারিল না।

অমরনাথ বলিল, "জ্যেঠাইমার সঙ্গে দেখা করবেন।"

হৈমবতী আসিলে গুরুপ্রসাদের পুত্র দানপত্র তাঁহার পদপ্রান্তে রাখিয়া বলিল, "জ্যেঠাইমা, এ আপনাকে নিতেই হ'বে—এই বাবার অন্তিম প্রার্থনা। তিনি বলে গেছেন, যদি আপনাকে এ না লওয়াতে পারি, তবে আমার শ্রাদ্ধেও তাঁ'র তৃপ্তি হ'বে না।"

তখন রাম সব কথা বুঝাইয়া দিল।

সে দিন, অনেক দিন পরে, হৈমবতী স্বামীর সে দিনের কথার অর্থ বুঝিলেন —'কেহ যেন কাহারও উপকার না করে—কাহারও কাছে উপকারের আশা না করে।' স্বামীর কথা স্মরণ করিয়া তিনি বড় বেদনায় কাঁদিলেন।

৮

সুসংবাদ দুঃসংবাদের মত শীঘ্র প্রচারিত হয় না। কিন্তু নটবরের ও নীলাম্বরের এই সুসংবাদ জানিতে কল্লোলিনীর বিলম্ব হইল না। অমরনাথ তাঁহাদিগকে সে সংবাদ দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে—সেই পত্রে তিনি জানিলেন, বেণুকরও ছুটী লইয়া আসিতেছে। এই সংবাদে কল্লোলিনী সুখী হইলেন কি না, জানি না; কিন্তু ইহাতে তাঁহার মনে একটা মৃতকল্প আশা আবার উজ্জীবিত হইল—এইবার যদি বেণুকর বিবাহ করে—সংসারী হয়। পীতাম্বরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তিনি কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া কল্লোলিনী হৈমবতীর বাড়ীতেই উঠিলেন; তাঁহাকে বলিলেন, "দিদি, তুমি বেণুর মত করাও; আমি নটুর আর বেণুর বিয়ে দেব।" তিনি তাঁহার ছেলেকে পর করিয়া লইয়াছেন—সে জন্য কল্লোলিনী হৈমবতীকে ক্ষমা করিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু হৈমবতীর সর্ব্বদাই মনে হইত—তাঁহারই জন্য বেণুকর সন্ন্যাসী হইয়া রহিল। তিনি বলিলেন, "আমি ত কতবারই বলি। তুমিও বল।"

সেই দিন কল্লোলিনী পুত্রকে জিদ করিয়া ধরিলেন, "দেখ, বাবা, যা হ'বার— হয়ে গেছে; এখন ত ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন—এ বার তুমি সংসারী হও।"

বেণুকর বলিল, "মা, গুরুপ্রসাদ বাবুর ব্যবহারে মানুষের সম্বন্ধে মত বদলাতে ইচ্ছে হয় বটে; কিন্তু তবুও যে সংসারে মানুষের চেয়ে টাকা বড়, সে সংসারের ভার আর বাড়া'ব না; যে সংসারে মানুষ প্রাচীর তুলে' স্নেহের পথ বন্ধ করে, সে সংসার আমার সহিবে না।"

কল্লোলিনী দেখিলেন, স্বার্থ গাঁথিয়া তিনি যে প্রাচীর তুলিয়াছিলেন, পুত্র সেই দিকে চাহিয়া আছে। তিনি বলিলেন, "তুই সংসারী হ'—আমি ও প্রাচীর ভেঙ্গে দেব।"

বেণুকর একটু বিচলিতভাবে বলিল, "প্রাচীর ভেঙ্গে দেবে। কিন্তু যে ভাঙ্গা বুক নিয়ে জ্যেঠামশায় শ্মশানে শুয়েছিলেন, সে ভাঙ্গা বুক কি আর জুড়বে?" সে যেন দেবীবরের হৃদয়ের সেই বেদনা আপনার হৃদয়ে অনুভব করিতেছিল। উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ রুদ্ধ করিতে সে উঠিয়া বাহিরে গেল।

হৈমবতী বিধবার শুভ্র বসনের অঞ্চলে অশ্রু মুছিলেন।

কল্লোলিনী স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। তিনি বুঝিলেন, স্নেহ পরকে আপন করে, আর স্বার্থ আপনকে পর করে।

পারস্য-উপসাগর।
১৬ই চৈত্র, ১৩২৩। } শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

চতুর্দোল।

যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে 'চতুর্দোল' যানের বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা রাজভোগ্য নিরতিশয় মূল্যবান্ যান বলিয়া কথিত হইয়াছে। (১)

বর্ত্তমান সময়ে জাঁকজমকের বিবাহে 'চতুর্দোল' যানের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু শাস্ত্রবর্ণিত প্রাচীন যানের সহিত অধুনা দৃশ্যমান যানের সামঞ্জস্য প্রতীয়মান হয় না। শাস্ত্রে সাধারণতঃ চারি জন বাহকের দ্বারা বহনীয় যান "চতুর্দোল" নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু ভোজদেব বলেন যে, যে যান চারি জন বাহকের দ্বারা বহনীয়, অথচ যাহার দণ্ড অর্থাৎ ডাঁট চারিটি, যাহার থাম আটটি, যাহাতে ছয়টি কুম্ভ সুন্দররূপে সংস্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা অত্যুৎকৃষ্ট চতুর্দোল বলিয়া কথিত হয়।

---

(১) রাজ্ঞো যদ্দ্বিপদং যানং বিশেষাখ্যামলং [মিদং] বিদুঃ।
চতুর্ভির্বহ্যতে যত্তু চতুর্দোলং তদুচ্যতে॥

উক্ত চতুর্দোল আবার যথাক্রমে জয়, কল্যাণ, বীর ও সিংহ, এই চারি নামে পরিভাবিত, এবং যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চতুর্বিধ—নৃপতিদিগের ভোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

যে চতুর্দোলের দৈর্ঘ্য তিন হস্ত, পরিণাহ অর্থাৎ ওসার দুই হস্ত, এবং যাহা দুই হস্ত উন্নত, তাহা 'জয়' নামে অভিহিত হইয়াছে। যাহার দৈর্ঘ্য চারি হস্ত, পরিণাহ আড়াই হস্ত, এবং উন্নতি (খাড়াই) আড়াই হস্ত, তাহা 'কল্যাণ' নামে অভিহিত হইয়াছে। যাহার দৈর্ঘ্য পঞ্চ হস্ত, পরিণাহ তিন হস্ত, এবং উন্নতি তিন হস্ত, তাহা 'বীর' নামে অভিহিত হইয়াছে। যাহার দৈর্ঘ্য এবং পরিণাহ চারি হস্ত ও উন্নতি দুই হস্ত, তাহা 'সিংহ' নামে অভিহিত হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রকার চতুর্দোলই আবার সচ্ছদি (ছাদযুক্ত) ও নিশ্ছদি (ছাদরহিত), এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে এবং বর্ষাকালে যে যান ব্যবহার্য্য, তাহা 'সচ্ছদি', এবং ক্রীড়ার্থ ব্যবহার্য্য যান ও বর্ষাভিন্ন ঋতুতে ব্যবহার্য্য যান 'নিশ্ছদি' বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বজ্রবারণ কাষ্ঠের দ্বারা চতুর্দোলের দণ্ড নির্ম্মিত হইত, এবং অন্যান্য অংশগুলি চন্দনের দ্বারা ঘটিত হইত। ইহাতে লোমজ বস্ত্র ব্যবহৃত হইত, এবং ধাতুর মধ্যে স্বর্ণ ব্যবহৃত হইত। অর্থাৎ, পতাকা, আস্তরণ প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থে বস্ত্রের ব্যবহার আবশ্যক, সেইগুলি লোমজ বস্ত্র দ্বারাই রচনা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কুম্ভ প্রভৃতি শোভা-সম্পাদক অবয়বগুলি স্বর্ণের দ্বারাই নির্ম্মিত হইবার নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

অনূপাদি দেশভেদে (২) ত্রিবিধ রাজার চতুর্দোলে কুম্ভ, পদ্মকোষ, এবং পর্ব্বত, এই ত্রিবিধ চিহ্ন ব্যবহৃত হইত।

সূর্য্যাদি অষ্টগ্রহের দশাতে জাত নৃপতিদিগের চতুর্দোল যানের অগ্রদেশে যথাক্রমে দর্পণ, অর্দ্ধচন্দ্র, হংস, ময়ূর, শুক, গজ, অশ্ব ও সিংহ, ইহাদের প্রতিকৃতি চিহ্নস্বরূপ নিহিত হইত। ইহাতে নানা প্রকার মণিও খচিত হইত।

মণি-নিধানের ব্যবস্থা দণ্ডের রীতি অনুসারে কথিত হইয়াছে। (মণিনিয়মস্তু দণ্ডবৎ।) এই স্থলে দণ্ড শব্দে কি অভিহিত হইয়াছে, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। তবে আচ্ছাদনের অবলম্বন-দণ্ড বলিয়াই যেন মনে হয়। উক্ত চতুর্দোলে রক্ত, শুক্ল, পীত, কৃষ্ণ, চিত্র (নানা-বর্ণ) অরুণ, নীল ও কপিল, এই অষ্টবর্ণ পতাকা ব্যবহৃত হইত। পতাকান্বিত চতুর্দোল 'শুভযান' নামে অভিহিত হইয়াছে। রাজকেশ্বরদিগের অর্থাৎ সম্রাটদিগের চতুর্দোল যান দশটি

(২) অনূপ, জাঙ্গল ও ধন্বন্, এই তিন প্রকার দেশ।

মুক্তা-স্তবকের দ্বারা যুক্ত হইত। দিগ্‌বিজয়ার্থ প্রস্থিত নৃপতিদিগের চতুর্দোলে চামরান্বিত দশটি দণ্ড থাকিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। (৩) নৃপতিদিগের 'যাত্রা-সিদ্ধি' নামক চতুর্দোল যানে সর্ব্বোপরি চাসপক্ষীর পুচ্ছ নিহিত হইত। (৪)

এ পর্য্যন্ত চতুর্দোলের যে সমস্ত লক্ষণ কথিত হইল, তাহা কেবল 'সচ্ছদি' চতুর্দোলের পক্ষেই বুঝিতে হইবে।

'নিশ্ছদি' চতুর্দোলে স্তম্ভ থাকিবার ব্যবস্থা নাই। উহা আবার 'সধ্বজ' ও 'নির্ধ্বজ', এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে 'সধ্বজ' যানে চারিটি ধ্বজ স্বামীর হস্তমানানুসারে এক হস্ত পরিমিত হইত। এই চারিটি ধ্বজ চারি কোণে নিহিত করিতে হয়, এবং হস্তদ্বয় পরিমিত দুইটি ধ্বজ অগ্রে ও পশ্চাদ্-ভাগে স্থাপিত করিবার উপদেশ দেখা যায়।

নৃপতিদিগের চতুর্দোল যানের ধ্বজে মণি, চামর, কুম্ভ ও খড়্গ চিহ্ন নিধানের ব্যবস্থা নবদণ্ড ছত্রের রীত্যনুসারে বুঝিতে হইবে। (৫) নির্ধ্বজ চতুর্দোলের অন্য প্রকার-পরিমাণ কথিত হইয়াছে। যে চতুর্দোলের দৈর্ঘ্য ও পরিণাহ চারি হস্ত, সেই যান 'বিজয়' নামে অভিহিত হইয়াছে। উক্ত 'বিজয়' যান এক-বিতস্তি-পরিমিত বর্দ্ধিত হইলে, 'মঙ্গল' নামে, এবং দুই বিতস্তি বর্দ্ধিত হইলে, 'ভব্য' নামে অভিহিত হয়। (৬) জাঙ্গলাদি ত্রিবিধ দেশবাসী ত্রিবিধ রাজার জন্য এই তিন প্রকার যান ব্যবহারের বিধান পাওয়া যায়।

অষ্টদোল।

যে যান আট জন বাহকের দ্বারা বহনীয়, সেই যানকে পণ্ডিতগণ 'অষ্টদোল' নামে নির্দ্দেশ করেন। এই শ্রেণীর যানে দুইটি সোপান-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা দেখা যায়। ভোজরাজের মতে, অষ্টদোল যানের বাহক অষ্টসংখ্যক, ইহার দণ্ড ছয়টি,

---

(৩) মুক্তাস্তবকৈর্দশভির্যুক্তঃ স্তাত্রাজকেশানাম্।
চামরদণ্ডৈর্দশভি র্দিগ্জয়িনাং চতুর্দোলঃ॥

(৪) চাসপক্ষস্য পুচ্ছঞ্চেৎ সর্ব্বোপরি পরিন্যসেৎ।
যাত্রাসিদ্ধিরয়ং নাম্না চতুর্দোলো মহীভুজাম্॥

(৫) নবদণ্ড-ছত্রের বিবরণ ছত্র-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

(৬) আয়ামপরিণাহাভ্যাং চতুর্হস্তমিতো হি যঃ।
বিজয়ো নাম বিজ্ঞাত শ্চতুর্দোলো মহীভুজাম্॥
বিজয়ো মঙ্গলো ভব্যো বিতস্ত্যৈকৈকবৃদ্ধিতঃ।
ত্রিবিধানাং মহীন্দ্রাণাং যানত্রয়মদাহৃতম্॥

কুম্ভ দশটি, এবং স্তম্ভও দশটি বিহিত হইয়াছে। চতুর্দোল যানের মত ইহারও জয়, কল্যাণ, বীর ও সিংহ, এই চারি প্রকার শ্রেণীবিভাগ ও যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বিধ রাজার উপভোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'জয়' নামক অষ্টদোল-যানের দৈর্ঘ্য ছয় হাত, পরিণাহ চারি হাত ও উন্নতি চারি হাত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'কল্যাণ' নামক যানের দৈর্ঘ্য ও পরিণাহ পাঁচ হাত, এবং চারি হাত উন্নতি বিহিত হইয়াছে। 'বীর' নামক 'অষ্টদোলে'র দৈর্ঘ্য প্রভৃতি যথাক্রমে সাত হাত ও পাঁচ হাত বিবেচিত হইয়াছে। 'সিংহ' নামক 'অষ্টদোলে'র দৈর্ঘ্য ও পরিণাহ আট হাত পরিমিত, এবং উন্নতি ছয় হাত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই যানও 'সচ্ছদি' ও 'নিশ্ছদি', এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায়। ইহার অন্যান্য অনেক নিয়মই চতুর্দোলের মত বুঝিতে হইবে। ইহাতে মণি, চামর ও পক্ষ, অর্থাৎ পাখীর পালক, ইহাদের বিন্যাস-নিয়ম 'নিষ্পতাক' চতুর্দোলের মত। ছদিরহিত যে অষ্টদোল যানে ধ্বজ নিহিত হয় না, তাহা 'শিবিকা' নামে অভিহিত হইয়াছে।

অমরকোষে 'শিবিকা' ও 'যাপ্যযান', এই দুইটি শব্দের তুল্যার্থতা বিবেচিত হইয়াছে। টীকাকার ভানুজীদীক্ষিত বলেন যে, শিবিকা শব্দের অর্থ—পাল্কী। রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর মতে, 'শিবিকা' ও 'যাপ্যযান' শব্দ চতুর্দোলের বাচক। কিন্তু ভোজরাজ উহাকে 'অষ্টদোল' বিশেষরূপ অর্থে প্রযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং ভোজসম্মত শিবিকা এবং অমরোক্ত শিবিকা এক পদার্থ কি না, তাহা ঠিক বলা যায় না। রামায়ণে মৃত বালীর দেহবহনোপযোগী 'শিবিকা'র যে বর্ণনা দেখা যায়, তাহাও যেন ভোজবর্ণিত শিবিকা বলিয়াই মনে হয়। যথা :—

"দিব্যাং ভদ্রাসনযুতাং শিবিকাং স্যন্দনোপমাম্।
পক্ষিকর্ম্মভিরাচিত্রাং দ্রুমকর্ম্মবিভূষিতাম্॥"

ভদ্রাসন-যুক্ত, মনোরম রথের তুল্য শিবিকা আনীত হইয়াছিল। উহা পক্ষীর চিত্রের দ্বারা চিত্রিত, এবং বৃক্ষ-প্রতিকৃতি দ্বারা শোভিত ছিল। অধুনা দৃশ্যমান পাল্কীতেও বৃক্ষ প্রভৃতির চিত্র দেখা যায়। কিন্তু রথের সহিত উহার কোনরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। সুতরাং রামায়ণের সমসাময়িক শিবিকা অধুনাতন পাল্কী হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়াই মনে হয়। কারণ, ইহাতে ভদ্রাসন-সংস্থাপন সম্ভবপর হয় না।

ভোজবর্ণিত শিবিকাতে নবদণ্ড-ছত্রের রীত্যনুসারে মণি, কুম্ভ, মুখ প্রভৃতি নিধানের ব্যবস্থা দেখা যায়। (৭) দ্বাদশদোল, ষোড়শদোল, বিংশতিদোল

(৭) মণিকুম্ভমুখাদীনাং নিয়মো নবদণ্ডবৎ।

প্রভৃতি যানও নির্ম্মিত হইতে পারে। ভোজের মতে, বিংশতিদোলের পরেও, অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতিদোল প্রভৃতি যানও হইতে পারে। ব্যাস বলেন যে, বহু-বাহকাদিসমন্বিত যান বহুগুণযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। (৮)

প্রদর্শিত চতুর্দোলাদি-নির্ম্মাণ-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, অতি-পূর্ব্বকালে যান প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যবহার্য্য বস্তুতেই জাতিভেদের এবং দেশভেদের চিহ্ন-ব্যবহারের আবশ্যকতা বিবেচিত হইয়াছিল। সুতরাং যানাসন দেখিয়াই কোন্ জাতীয় রাজা, এবং কোন্ প্রদেশে তাঁহার বাস, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইত। হিন্দুর যাবতীয় বিষয়েই অদৃষ্টবাদ সম্বদ্ধ। সুতরাং গ্রহবিশেষের দশাবিশেষে জাত নৃপতিদিগের ভেদসূচক যে চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা কেবল শুভাদৃষ্ট দুরদৃষ্টেরই সম্ভাবনা বুঝা যায়। অর্থাৎ, নিয়ম প্রতিপালন করিলে শুভাদৃষ্ট, পক্ষান্তরে দুরদৃষ্ট অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

বঙ্গ-সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি।

২

আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা দিক ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভবের সঙ্গে উদ্ভূত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। রামমোহন, দ্বিজেন্দ্রনাথ, কবীন্দ্র রবীন্দ্র, চিরঞ্জীব শর্ম্মা, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় ও পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির ব্রহ্মসঙ্গীত, কাঙ্গাল হরিনাথের বাউলসঙ্গীত, মনে হয়, যেন এ বঙ্গ-ভারতীর কণ্ঠে অক্ষয় হীরক-কণ্ঠীর মত দীপ্যমান! কোনও দেশের কোনও সাহিত্যে এমন অসাম্প্রদায়িক ঈশ্বরানুভূতি বা ভগবদ্ধ্যান এমন শোভন কলানৈপুণ্যে জীবন্তরূপে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে কি না সন্দেহ।

ব্রাহ্মসমাজের সংঘাতে নব্য হিঁদুয়ানীর উদ্ভব হইয়াছে। জার্ম্মাণ 'ফিল-জফী'র বা দর্শনের মাল-মশলা দিয়া বেদান্তের সিদ্ধান্তসমূহ বিলাতী ধরণে বুঝিবার প্রয়াসে বাঙ্গলা সাহিত্যের আর একটি অঙ্গ অলঙ্কৃত হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের শেষ তিনখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য, বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ তিনখানি অপূর্ব্ব

---

(৮) এবং দ্বাদশ-ষোড়শ-বিংশতি-দোলাদিকাঃ কার্য্যাঃ।
বিংশতিদোলাৎ পরতো ভোজমতে সম্ভবেদ্ যানম্।
যানং বহুনৃযোজ্যং বহুগুণমেতজ্জগাদ বৈ ব্যাসঃ।

উপন্যাস, এই নব্য আভরণের দুই দিক্‌কার দুইটি প্রধান উপাদান। এই হিঁদুয়ানী যদি স্থায়ী হয়, এ সকল সিদ্ধান্ত যদি কোনও দিন বাঙ্গালার জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইবার সুযোগ ঘটে, তবে অবশ্যই এ সাহিত্য টিকিয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন, পুরাতন ভাবের পুরাতন সিদ্ধান্তের দূরাগত বংশীধ্বনির মত যে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাঝে মাঝে আধুনিক সাহিত্যেও শ্রুত হইতেছে, তাহার ফলে আধুনিক সাহিত্য যে একটা বৈচিত্র্য বা বিশেষত্ব পাইয়াছে, সে ভাব-সম্পৎও কতকাংশে স্থায়ী হইবে। কারণ, বাঙ্গালী যতই কেন ইংরেজী শিখুক না, বা তদ্ভাবে ভাবিত হউক্ না, তাহার স্বধর্ম্মসিদ্ধ বা মজ্জাগত বাঙ্গালীয়ানা—অকৃত্রিম স্বাদেশিকতা সে কখনও—কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। সে স্বাদেশিকতা যখনই যে ভাবে ফুটিয়া উঠিবে, তখনই সেই ভাবটি—প্রকাশ্য ভাবেই হউক আর অস্ফুটরূপেই হউক—কথঞ্চিৎ স্থায়িত্ব লাভ করিবেই।

আধুনিক সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণই হইল—Patriotism বা দেশাত্মবোধ। (ইহার সহিত জাতি-বৈরের ভাবও কতকটা বিজড়িত আছে।) রঙ্গলালের "পদ্মিনী"কাব্য দেশাত্মবোধের সর্ব্বপ্রথম শঙ্খনাদ। হেমচন্দ্রের "কবিতাবলী" তাহার উদাত্ত দুন্দুভিধ্বনি। হেমচন্দ্র এই স্বাদেশিকতা, স্বদেশ-ভক্তি, বা দেশাত্মবোধের সঞ্জীবন সুরে এক অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব, অপূর্ব্ব সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া গেলেন। আমার যাহা, তাহা আমারই উপযোগী, আমিত্বের প্রভাবেই আমার কাছে 'আমার' বলিতে যাহা কিছু, তাহাই সুন্দরশোভন,—এই ভাব লইয়াই হেমচন্দ্রের কবিতার উদ্ভব ও তাহাই উহার বিশেষত্ব। তার পর, বঙ্কিমচন্দ্রের "কমলাকান্তে"ও এই ভাবটিই সূত্রাকারে হতাশার আক্ষেপে ও উত্তেজনায় গ্রথিত হইয়াছে। সেই সুর একটু প্রণিধানপূর্ব্বক শুনিলে "ধর্ম্মতত্ত্ব" ও "কৃষ্ণচরিত্রে"ও সুস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমের শেষ তিনখানি উপন্যাসও এই ভাবেরই বিচিত্র ও অপরূপ অভিব্যঞ্জনামাত্র। এই ফোটা ফুলটি কালক্রমে ক্ষীণজন্মা কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের "রাণা প্রতাপ", "দুর্গাদাস", "মেবারপতন" প্রভৃতি নাটকাবলীতে স্বাদু ও পুষ্টিকর সুফলে পরিণত হইয়াছে। অক্ষয়চন্দ্রের "বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্ম", ইন্দ্রনাথের ব্রাহ্মণ্য-প্রতিষ্ঠার প্রয়াসমূলক বিবিধ প্রবন্ধাদি, চন্দ্রনাথের "ত্রিধারা" ও "হিন্দুত্ব", পণ্ডিতবর শশধরের "ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা", এমন কি, রবীন্দ্রনাথের "ব্রাহ্মণ", "গোরা" প্রভৃতি সকল পুস্তক, সকল নিবন্ধ, প্রবন্ধ, সন্দর্ভই—এই Patriotism, স্বাদেশিকতা, বা দেশাত্মবোধের ভিত্তির

উঁপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাবটা সমাজে যত ছড়াইয়া পড়িবে, ইহার তীব্র ও অত্যুগ্র উন্মাদনার আস্বাদ বাঙ্গলার জনসাধারণ গ্রহণ করিতে যতই উৎসুক ও আগ্রহান্বিত হইবে, ততই এবংবিধ সাহিত্যের পুষ্টি, প্রভাব ও প্রসার ঘটিবে। কিন্তু ইহা শিক্ষা ও প্রচার-সাপেক্ষ। আমাদের দেশের জনসমূহ প্রেম-ভক্তি বোঝে, সন্ন্যাস-সংযমের শ্রেষ্ঠতা নতশিরে স্বীকার করে; (কেন না, সে সকল কথা গত সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া বাঙ্গালায় সিদ্ধ মহাত্মগণ ও পণ্ডিতপরম্পরা বাঙ্গালীকে নানা ভাবেই শিখাইয়া আসিতেছেন।) কিন্তু দেশাত্মবোধ বা এই জাতিবৈরের ভাব বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষভাবেই অভিনব। এই দুইটি ভাবে বাঙ্গালীকে দীক্ষিত করিবার জন্য পদ্ধতিক্রমে তেমন কোনও প্রয়াসও হয় নাই, সুবিধাও ঘটে নাই। যত দিন তাহা না হইতেছে, বা হইতে পারিতেছে, যত দিন আধুনিক বাঙ্গলার এ সব ভাব ও রস বাঙ্গালী-সমাজের সকল স্তর ভেদ করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতিটাকে মজাইয়া মাতাইয়া না তুলিতেছে, তত দিন এ সাহিত্যকে এ দেশের জন-সাধারণ নিজস্ব বলিয়া সহজে বিশ্বাস বা গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

এইখানে আর একটা বিষয়ের প্রসঙ্গ তুলিব। মোগল-পাঠানের যুগে পূর্ব্বে এ দেশের কবিগণ সাহিত্যের পোষণকল্পে অসংখ্য কাব্য ও পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তবে, চণ্ডীদাস হইতে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার অধিকাংশ সুপরিচিত কবিগণ রাঢ় দেশের লোক হওয়াতে, বাঙ্গলার উপরে রাঢ়ের প্রাধান্যই একটু অধিকপরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তার পর, "ফোর্ট-হ্বলিয়াম্" কলেজের পণ্ডিতগণ সকলে রাঢ়ীয় ছিলেন। বিদ্যাসাগর হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার পনের আনা সুসম্পন্ন, সুখ্যাত, সুপ্রতিষ্ঠ লেখক রাঢ়ের বা কলিকাতার লোক। বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঠ্য-পুস্তক-প্রণয়নে—জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক—রাঢ়ের প্রাদেশিক শব্দই সমধিক ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহার ফলে, আজ রাঢ়ের বাঙ্গালা সমগ্র বাঙ্গালা দেশের ভাষা হইয়াছে। উহা এখন সকলের পক্ষে সুখবোধ্য,—সকলের পক্ষেই অল্পায়াস-সাধ্য হইয়াছে। জাতির সংহতি-শক্তি বাড়াইতে হইলে, জাতিকে একভাষী করিতেই হইবে। ভাষার বন্ধনেই জাতির পুষ্টি ও সংহতি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইংরেজের শিক্ষা-বিভাগের কল্যাণে, মাইকেল, বঙ্কিম, হেম, নবীন ও রবি প্রভৃতি মনস্বী ও প্রতিভাশালী কবিকুলের প্রভাবে, এবং কলিকাতা হইতে প্রচারিত সংবাদপত্রসমূহের অতি-প্রসারে যখন আমরা

এখন একটা নির্দ্দিষ্ট ভাষা পাইয়াছি, তখন সে ভাষাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ প্রভাবে বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া এখন আমাদের পক্ষে কোনক্রমেই কর্ত্তব্য হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লোক-শিক্ষার উদ্দেশ্যে, দেশের আপামর সাধারণে ধর্ম্মমত-প্রচারের জন্যই বাঙ্গলা ভাষার প্রথম উৎপত্তি। এই জন্ম-বৃত্তান্তের কারণ উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বাঙ্গালীকে নূতন কথা শুনাইতে, বাঙ্গালীকে নিখিল বিশ্বের বিচিত্র ও অগণ্য ভাব ও চিন্তার সহিত পরিচিত করাইবার জন্য, ভাইকে ভাইয়ের মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিবার উদ্দেশ্যেই আমাদের এ বাঙ্গলা লেখা। যে ভাষায় রামপ্রসাদ বাঙ্গালীকে মাতাইয়া তুলিয়াছেন, দাশুরায় বাঙ্গালীকে হাসাইতেন ও কাঁদাইতেন, ভারতচন্দ্র তাঁহার ভাষার অনায়াস স্বচ্ছন্দ গতি ও অপূর্ব্ব মাধুরীচ্ছটায় বঙ্গবাসীকে বিমুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই ভাষাই বস্তুতঃ বাঙ্গালীর যথার্থ ব্যবহার্য্য ভাষা। সুতরাং, আজ আমাদের লিখিত কোনও বিষয় খেয়ালের বশে বা জেদের জোরে দুর্ব্বোধ বা একদেশদর্শী করিয়া তুলিলে চলিবে না। বাঙ্গালা যদি রাজার ভাষা বা রাজ-দরবারের ভাষা হইত, তবু না হয় উহাকে নানা অলঙ্কার-আভরণে জটিল, ভারাক্রান্ত, দুর্বোধ, বা দুর্লভ্য করিয়া তুলিলে তত ক্ষতি ছিল না। কিন্তু আমাদের বাঙ্গলা ত আর তাহা নহে!—এ যে একেবারেই প্রজার ভাষা; অন্তর্নিহিত গুপ্ত বেদনার অভিব্যঞ্জনার ভাষা, এ যে ব্যথিতের—আর্ত্তের—আকুল সহমর্ম্মিতার করুণ আকাঙ্ক্ষার ভাষা! এই Democratic ভাষাকে আজ যদি কেহ দুর্বোধ প্রাদেশিকতায় দুষ্ট করিয়া তোলেন, তবে তিনি স্বদেশেরই প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিবেন।

"মনে পড়িল রে আমার সেই ব্রজভূমি!" স্মৃতির অদম্য আলোড়নে ও অসহ বৃশ্চিকদংশনে অধীর হইয়া, যখন এই ভাবে ও এই ভাষায় আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিব, তখন বাঙ্গালায়—বাঙ্গালী সমাজে নিম্নতম স্তর হইতে উচ্চতম স্তর পর্য্যন্ত সকল স্তরের সমুদায় লোক যদি হাহাকারে কাঁদিয়া না উঠে, তবে আমার এ রোদনের ফল কি? এই কারণেই ত বাঙ্গালা-সাহিত্য করুণরস-প্রধান। এই জন্যই, আবার বলি—এই খোসমেজাজের, খোসখেয়ালের আমাদের এই খাঁটী ও অকৃত্রিম বাঙ্গালা সাহিত্যকে কেহ সহজে পরিবর্ত্তিত বা আকারান্তরিত করিতে কিছুতেই পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের শ্রীপাদপদ্মসমুদ্ভূত হইয়া, যে প্রীতি-পীযূষ-নিষ্যন্দিনী ত্রিদিব-মন্দাকিনী আজি এই পুণ্য বঙ্গভূমি প্লাবিত করিয়া বহিয়া চলিয়াছে, আজ বঙ্গসাহিত্যের সেই করুণ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি না

রাখিয়া, যিনি ইহার এই সার্ব্বজনীন প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, উদ্ভট, অসঙ্গত ও অশোভন সৃষ্টি করিতে, এবং সেই সঙ্গে শুধু স্বীয় বাহাদুরী ফলাইয়া তুলিতে উদ্যত হইবেন, তাঁহাকে পরিণামে এক দিন ঠকিতে হইবেই হইবে। মাইকেল মধুসূদন ইংরেজী ঢঙ্গে "মেঘনাদবধ" রচনা করিলেও, সে রচনার কালে তিনি বঙ্গীয় প্রকৃত প্রকৃতিটিকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; কিছুতেই কারুণ্যপ্রধান বাঙ্গালী-প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিতে সাহসী হন নাই। "মেঘনাদবধ" কাব্য তাই করুণার উৎস।

✓বাঙ্গালা-সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির কথা একটা তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যোল আনা বলা হয় না,—বলা যায়ও না। তবে আমি যে ভাবে উহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, সেই ভাবটা আমার সামান্য সামর্থ্য অনুসারে আজ আপনাদের গোচর করিলাম। আপনারা সকলেই বিবেচক, বিদ্বান ও ভাবুক। আমার কথিত এই কয়েকটি কথায় আপনাদের চিন্তা-স্রোত যদি কোনও কিছু নূতন বা নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলেই আমার এ লেখনী-শ্রম সার্থক হইল, মনে করিব। আমরা,—অর্থাৎ এই ইংরেজী শিক্ষিত সাহিত্য-সেবিসম্প্রদায় এতকাল বাঙ্গালার জনসাধারণকে অনেকটা উপেক্ষা করিয়াই এ যাবৎ সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়াছি। আমরা যেন মনে মনে ইহা ধরিয়া লই যে, আমরা যা লিখিব, সেই সবই বাঙ্গলার জনসাধারণ বা পাঠকবর্গ পড়িতে ও বুঝিয়া লইতে বাধ্য। বাঙ্গলা ভাষা যদি বঙ্গদেশের রাজভাষা হইত, আমরা যদি সকলেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক হইতাম, তাহা হইলেও হয় ত বা আমাদের এ স্পর্দ্ধা কতকটা সাজিত। বিলাতে 'Literature'এর পঠন-পাঠন যে হিসাবে হয়, আমাদের দেশে এখনও সংস্কৃতের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা যে রীতিতে হয়, বাঙ্গালার সেই ভাবের চর্চ্চা থাকিলে আমাদের এ 'আব্‌দার' কতকটা মানাইতেও পারিত। কিন্তু, বাঙ্গালা যে চিরকালই আমাদের স্বাভাবিক ব্যথার ভাষা, বাঙ্গালা যে চিরদিনই দর্শন-শাস্ত্রের কঠিন ও জটিল তত্ত্বগুলিকে সরল করিয়া, এ সংসারের অনিত্যতা ও অবিনশ্বরতা জন-সমাজের হৃদয়ঙ্গম-যোগ্যভাবে সর্ব্বসাধারণেরই শ্রুতিগোচর করিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালার বাঙ্গালী মনে করে—এ ভাষায় যাহাই লিখিত বা উক্ত হইবে, তাহা অনায়াসে আমরা সকলেই বুঝিতে পারিব। অতএব, বাঙ্গালায় আমাদের কিছু লিখিতে হইলে, ইংরেজী হিসাবে বাঙ্গালায় একটা Literature-এর সৃষ্টি করিতে হইলে, উহাকে সর্ব্বতোভাবে Democratic (লোকমতানুগামী) করিতে হইবে; উহাকে

সকলেরই বোধশক্তির বিষয়ীভূত করিতে হইবে। যেটুকু বাঙ্গালার জনসাধারণ মাথায় করিয়া লইয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্যে আজ সেইটুকুই স্থায়িভাবে বিরাজ করিতেছে।

কেহ কেহ বলেন যে, ভাবের বৈচিত্র্য, গভীরতা ও মৌলিকতার প্রভাবেই আধুনিক সাহিত্য সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুবোধ্য হইতেছে না। এ কথাটা যদিও সর্ব্বথা অযৌক্তিক নহে, তবু একটু চিন্তা করিলে এটুকুও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইব যে, পূর্ব্বের ন্যায় এখনকার লেখকগণ রচনার কালে জনসাধারণের কথা একেবারেই চিন্তা করেন না,—তাঁহাদের এখন লক্ষ্যই থাকে—ঐ বিলাতী শিক্ষিত সম্প্রদায়। কাজেই, এ অবস্থায় সাধারণ লোকে কিছুতেই এ সব লেখার মর্ম্ম-গ্রহণ বা রসাস্বাদ করিতে সমর্থ হয় না। বৈষ্ণব সাহিত্যে ভাবের বৈচিত্র্য, মৌলিকতা, বা গভীরতা যে নিতান্তই অল্প ছিল, এ কথা কোনও মতেই মানিয়া লওয়া চলে না। তথাপি সে সকল সাহিত্যের আসল ভাব বা মর্ম্মটা যে অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোকেরাও বেশ বুঝিতে পারিত, বস্তুতঃ ইহার কারণ সন্ধান করিতে গেলেও আমরা দেখিতে পাইব যে, সে সব লেখা সাধারণের জন্য রচিত ও উদ্দিষ্ট হওয়ায়, প্রকাশের স্বাভাবিকত্বে বা কৌশলে (সে ভাবরাশি শত জটিল ও গভীর হইলেও) তাহাদের পক্ষে অধৃষ্য হয় নাই। কাজেই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হইলেই যে তাহা জন-সাধারণের অবোধ্য বা অগম্য হইবেই, এ কথাটার যাথার্থ্য সর্ব্বতোভাবে মানিয়া লওয়া কোনও মতেই চলিতে পারে না।) আজ এই কারণেই অপ্রিয় হইলেও আমি এ কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, মাইকেল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার আধুনিক সাহিত্যরথিগণ যে অভিনব ও অপূর্ব্ব সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া। সে সকল শুধু এই শিক্ষিতগণেরই রুচি-অনুযায়ী করিয়া রচিত হওয়ায়, এখনও সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মর্ম্মস্পর্শ করে নাই; এবং তাই তাহা আজিও বাঙ্গালী জনসাধারণ মাথায় করিয়া লয় নাই। যত দিন এ দেশে ইংরেজী-শিক্ষার প্রসার ততদূর সার্ব্বজনীন না হইবে, তত দিন এ সাহিত্যের সার্থকতাও সম্পূর্ণ হইবে কি না, তাহা বলা যায় না। কিন্তু সে পরিণতিটিকে কল্যাণপ্রসূ ও প্রাণময়ী করিতে হইলে, এ সাহিত্যের প্রচারে আমাদিগকে বদ্ধ-পরিকর হইতেই হইবে।

মুখ্যতঃ আমরা এই হেতু এই সাহিত্য-পরিষদের সেবায় আত্মসমর্পণ

করিয়াছি। পরিষদের সংখ্যা যত বাড়িবে, নানা দিক হইতে সাহিত্যের যত চর্চ্চা হইতে থাকিবে, ততই বাঙ্গালার জন-সাধারণের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া উঠিবে। সাহিত্য-পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা ও সাহিত্য-সম্মিলনের প্রচলন জন-সাধারণের সাহিত্য-চর্চ্চার উপায়ন্তরস্বরূপ। আমাদের এই নূতন সৃষ্ট সাহিত্য, এই হেম-বঙ্কিম, মাইকেল-নবীন, রবি ও বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সাহিত্য এখনও যে সার্ব্বজনীন ভিত্তি-ভূমির উপর সুপ্রতিষ্ঠ হয় নাই, সে কথা স্মরণে রাখিয়া, সেই লক্ষ্যেই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

সাহিত্যের সর্ব্ববিধ পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য সম্যক্‌রূপে বিদূরিত করিয়া দিয়া, আমরা আমাদের জাতীয় সাহিত্যের 'বনিয়াদ' যতই দৃঢ়তর ও সার্ব্বজনীন চিত্তভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব, ততই আমরা ধন্য ও সফলকাম হইব। আমি বিশ্বাস করি,—আমাদের এই 'বাঙ্গাল' বঙ্গের এবংবিধ প্রয়াসই এক দিন এই মেরুদণ্ডবিহীন অধঃপতিত জাতির অবারিত মুক্তি-পথ সর্ব্বথা উন্মুক্ত করিয়া দিবে, এবং কালে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি সাহিত্যের অচ্ছেদ্য বন্ধনে সংবদ্ধ হইয়া, জ্ঞানে, কর্ম্মে ও চিন্তায় আবার বিশ্বের বিস্ময়-কেন্দ্রে পরিণত হইবে।—বাঞ্ছাকল্পতরু বিধাতা আমাদের সহায় হউন। *

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস।

ও

[মহীপাল;—মহীপালের রাজ্যারোহণ-কালনির্ণয়;—মহীপালের রাজ্যের অবস্থান ও বিস্তার;—মহীপাল-রাজত্বের সমসময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতের অবস্থা;—মহীপাল ও মগধ;—মহীপাল ও বারাণসী।]

মহীপাল।

বাঙ্গালার পালরাজ-বংশে, বোধ হয়, প্রথম মহীপালই সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ নরপতি। জনশ্রুতিতে তাঁহার বহু বৃহৎ জনহিতকর কার্য্যের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহাদিগের পরিচয়-চিহ্ন এখনও বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রদেশে পড়িয়া রহিয়াছে,—যথা, দিনাজপুরে মহীপাল-দীঘি নামক প্রকাণ্ড সরোবর, এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় সাগরদীঘি নামে সুপরিচিত বিস্তৃত জলাশয়; মুর্শিদাবাদ জেলায় মহীপাল নামে পরিচিত স্থানে বহু

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বাঁকীপুরের অধিবেশনে পঠিত।

অট্টালিকার ও রাজপথের নিদর্শন তাহাকে একটি প্রাচীন নগরীর অবস্থানক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করে, এবং দিনাজপুর জেলায় মহীসন্তোষে ও বগুড়া জেলায় মহীপুরেও ঐরূপ প্রাচীন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। "ধান ভানিতে মহীপালের গীত" বলিয়া একটা বাঙ্গালা প্রবাদবাক্য এখনও প্রচলিত আছে; একই সময়ে দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতির কার্য্যে যাহারা হস্তক্ষেপ করে, অথবা এক কাজ করিতে বসিয়া অন্য বিষয় চিন্তা করে, এ কথাটা তাহাদের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, কিছুদিন পূর্ব্বেও মহীপালের গীত বাঙ্গালার বহু স্থানে গীত হইত, এবং এখনও কুচবিহারে ও তাহার সুদূরব্যবহিত ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে গীত হইয়া থাকে।

কিন্তু এই সুবিখ্যাত নৃপতির সম্বন্ধে আমরা যে নিশ্চিত ঐতিহাসিক তথ্য প্রাপ্ত হই, তাহা সামান্য ও অসম্পূর্ণ; এবং তাঁহার রাজ্যকালে বাঙ্গালার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা চিত্রিত করিতে হইলে, প্রধানতঃ অনুমানেরই আশ্রয় লইতে হইবে।

৯৮০ খৃষ্টাব্দে অথবা তৎসমীপবর্ত্তী কালে তিনি রাজ্যারোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। আমার দ্বিতীয় প্রবন্ধের শেষে, আমি ৯৭০ খৃষ্টাব্দই মহীপালের রাজ্যারোহণের আনুমানিক কাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু আমার বিবেচনায় নিম্নলিখিত কারণে উহাকে সংশোধিত করিয়া ৯৮০ খৃষ্টাব্দ করাই সঙ্গত হইবে।

মহীপালের রাজ্যারোহণ-কাল-নির্ণয়।

লামা তারানাথ বলিয়া গিয়াছেন,—মহীপাল ৫২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার রাজ্যকালের অষ্টচত্বারিংশৎ-বর্ষ-সংবলিত একখানি শাসনও আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস বৌদ্ধগ্রন্থ-প্রচার-সমিতির প্রকাশিত ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী-সংখ্যা পত্রিকায় * বৌদ্ধসংস্কারক অতীশ ওরফে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের যে চরিত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই,—অতীশ ৯৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি মহীপালের উত্তরাধিকারী নয়পাল কর্তৃক বিক্রমশিলা মহা বিহারের মহাস্থবির নিযুক্ত হয়েন, এবং তিনি ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ১০৪০ খৃষ্টাব্দে বিক্রমশিলা হইতে তিব্বতে গমন করেন, তথা হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই।

তিব্বতীয় গ্রন্থকার বুস্তানের রচিত ইতিহাস হইতে এই বিবরণ সঙ্কলিত

* Journal of the Buddhist Text Society, January, 1893.

হইয়াছে বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার তিব্বতীয় শিষ্য ও উত্তরাধিকারী ব্রোম্‌তান রচিত অতীশের জীবনচরিতও রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস পড়িয়া দেখিয়াছিলেন। এই ব্রোম্‌তানই তিব্বতের প্রথম বিরাট আচার্য্যক্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অতীশ কবে বিক্রমশিলার মহাস্থবির-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা লিখিত হয় নাই; কিন্তু পূর্ব্বাংশের সহিত অন্বিত করিয়া পাঠ করিলে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, তৎকালে অতীশের বয়স ৪৩ বৎসরের ন্যূন ছিল না, অর্থাৎ ১০২৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনি উক্ত পদে নিযুক্ত হয়েন নাই। এতদ্ব্যতীত, মহীপাল যে ১০২০ খৃষ্টাব্দেও গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন—তাহার প্রমাণ আমরা তিরুমলয়-পর্ব্বতলিপিতে প্রাপ্ত হই; এবং বারাণসীতে (সারনাথ?) প্রাপ্ত একখানি শিলালিপি হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১০২৬ খৃষ্টাব্দেও তিনি গৌড়ের সিংহাসনেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারানাথের অনুসরণ করিয়া যদি আমরা মহীপালের রাজত্বকাল ৫২ বৎসর বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে, ৯৭৪ হইতে ৯৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই তাঁহাকে সিংহাসনে আরোহণ করিতে হয়।

মহীপালের রাজ্যের অবস্থান ও বিস্তার।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দিনাজপুরের অন্তর্গত বাণগড়ের ভগ্নাবশেষমধ্যে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসনে লিখিত রহিয়াছে যে,—তিনি অনধিকারী কর্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন; ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন,—উহাতে কোনও পার্ব্বত্যজাতি কর্তৃক উত্তর-বাঙ্গালার আক্রমণ সম্বন্ধে, এবং তথায় মোঙ্গলীয় বংশোদ্ভূত কোনও রাজবংশের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ইঙ্গিত রহিয়াছে; এই শেষোক্ত বিষয়ে বাণগড়ে প্রাপ্ত একখানি মন্দিরলিপি হইতেও প্রমাণ লাভ করা যায়।

মহীপালের যে রাজ্য অনধিকারী কর্তৃক বিলুপ্ত হইয়া পরে পুনরুদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহার, এবং মহীপাল যে সকল প্রদেশে তাঁহার শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন, তাহাদের অবস্থান ও বিস্তৃতি অনুমান করিবার মত যৎসামান্য সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহীপালের যে তাম্রশাসনের কথার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে লিখিত আছে যে,—মহীপাল বিলাসপুরে বাস করিবার সময়, পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ বিষয়ের অধীন গোকলিকা মণ্ডলে অবস্থিত কুরটপল্লিকা গ্রাম কৃষ্ণাদিত্য শর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। অন্যান্য বহু তাম্রশাসনের ন্যায় এই তাম্রশাসন হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়, পালরাজগণের রাজত্বকালে চারি প্রকার ভূমি-বিভাগ প্রচলিত ছিল—ভুক্তি,

বিষয়, মণ্ডল এবং গ্রাম; কতিপয় গ্রাম লইয়া একটি মণ্ডল, কতিপয় মণ্ডল লইয়া একটি বিষয়, এবং কতিপয় বিষয় লইয়া একটি ভুক্তি গঠিত হইত। এইরূপ ভূমি-বিভাগ-ব্যবস্থা যে শুধু বাঙ্গালাতেই ছিল না, পরন্তু দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে, একাধিক শতাব্দের ব্যবধানেও যে ঐরূপ ভূমি-বিভাগ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, বহু প্রাচীন ভূমিদানপত্রে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অশোকের সাম্রাজ্যের ন্যায় কোনও সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভূভাগে একই প্রকার শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং প্রথম প্রবন্ধের উল্লিখিত, পরবর্ত্তী বিভিন্ন রাজবংশের রাজত্বকালে উহা টিঁকিয়া গিয়াছে।

আলোচ্য তাম্রশাসনের উল্লিখিত গোকলিকা মণ্ডলের, বা কুরটপল্লিকা গ্রামের, অথবা মহীপালের তৎকালীন রাজধানী বিলাসপুরের অবস্থান সম্বন্ধে এক্ষণে আমরা কিছুই অবগত নহি। ২০০ বৎসর পরবর্ত্তী-অব্দসংবলিত আর একখানি পালরাজ-প্রদত্ত তাম্রশাসন দিনাজপুর জেলাতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতেও পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ বিষয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে হর্ষের সাম্রাজ্যে পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি যে একটি মিত্ররাজ্য ছিল, ইউয়ান চুয়াঙ্গ তাঁহার ভ্রমণকাহিনীতে তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার বর্ণনা-অনুসারে বগুড়া জেলার মহাস্থান নামক স্থান পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির রাজধানীর অবস্থানভূমি বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কোনও কোনও স্থলে এই ভুক্তি—প্রদেশ বা রাজ্যের ন্যায় বিপুলায়তন হইত; যথা,—জেজ্জাকভুক্তি—চন্দেল্লগণের আদিম রাজ্য, এবং তীরভুক্তি—বর্ত্তমান ত্রিহুত। পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিও উত্তর-বাঙ্গালার এইরূপ একটি দেশবিভাগ ছিল, এবং সম্ভবতঃ বর্ত্তমান বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার সম্পূর্ণ অথবা কতকাংশ তাহার অন্তর্গত ছিল; মহীপালের রাজশক্তি যে উত্তর-বাঙ্গালায় সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাম্রশাসনেই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। দিনাজপুর জেলার যে প্রকাণ্ড সরোবর বংশপরম্পরায় মহীপালদীঘি নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে, তাহা, এবং হয় ত মহীসন্তোষের (?) এবং মহীপুরের ধ্বংসাবশেষও উহাই সপ্রমাণ করিতেছে।

বরেন্দ্রভূমির যে সকল প্রদেশে মহীপাল রাজত্ব করিতেন, তত্তাবৎই, অথবা তাহার অধিকাংশই যে তিনি তত্র-প্রতিষ্ঠিত কাম্বোজ রাজশক্তির নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ সম্ভব বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাহা হইতে এরূপ অনুমান করা যায় না যে,—কাম্বোজ রাজশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, যে তাম্রশাসনখানির উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অঙ্কের পাঠোদ্ধার করিতে পারা যায় না ; তাই, মহীপাল যে ঠিক কবে কাম্বোজদিগের হস্ত হইতে হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই ।

আমার বিবেচনায়, মহীপালের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে বাঙ্গালার ঘটনাপরম্পরার একটা ধারণা করিতে হইলে, তৎকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে কি হইতেছিল, এই স্থলে তাহার আলোচনা করিয়া দেখা সুসঙ্গত হইবে।

মহীপাল-রাজত্বের সম-সময়ে উত্তর-পশ্চিমে ভারতের অবস্থা।

মহীপালের রাজ্যপ্রাপ্তির সম-সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের শেষে, এবং একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিপুল পরিবর্ত্তন চলিতেছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ৯১৬ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্র-কূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র কান্যকুব্জরাজ মহীপাল-প্রতীহারকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া কান্যকুব্জ অধিকার করেন। জেজাকভুক্তিরাজ হর্ষ চন্দেল্লর সহায়তা-গ্রহণে মহীপাল-প্রতীহার হৃত রাজধানীর পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন ; কিন্তু প্রতীহার-রাজশক্তি রাষ্ট্রকূটের হস্তে যে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে আর কখনই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। এই কারণেই গৌড়াধিপ দ্বিতীয় গোপাল মগধরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারিয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তী কালে চন্দেল্ল রাজ-শক্তি প্রতীহার রাজশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল। ইহার পর স্বাভাবিক কারণেই চন্দেল্লগণের সহিত বাঙ্গালার পালরাজগণের বিরোধ ঘটিল ; এবং আমরা প্রাচীন চন্দ (চন্দেল্ল) রাজধানী খজুরাহোতে প্রাপ্ত দুইখানি শিলালিপিতে চন্দেল্লগণের সহিত বিহার ও বাঙ্গালার মহা সামন্তগণের যুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাই। ৯৫৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম শিলালিপিখানিতে, হর্ষের উত্তরাধিকারী যশোবর্ম্মা চন্দেল্ল লতা-সদৃশ গৌড়গণের ছেদনক্ষম অসি-রূপে, এবং মৈথিলগণের শক্তি-শিথিলকারীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন ; এবং ১০০২ খৃষ্টাব্দের অপর শিলালিপিতে, যশোবর্ম্মার উত্তরাধিকারী ধঙ্গদেব কর্ত্তৃক রাঢ়ের ও অঙ্গের রাজমহিষীগণের, এবং কাঞ্চীর রাজমহিষীর ধৃত হইবার গর্ব্বোদ্ধত উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কাঞ্চী-রাজমহিষী কোনও পল্লবরাজের, অথবা চোলরাজের পত্নী হইতে পারেন।

এই দুইখানি শিলালিপি গৌড়ীয় লিপিকর কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল, ইহা কৌতূহলের বিষয়। যেরূপ সতর্কতা অবলম্বনে এই শ্রেণীর প্রমাণ গ্রহণ করিতে

হয়, তাহাতে, যশোবর্ম্ম-পরিচালিত চন্দেল্লগণের সহিত গৌড়ের, এবং যশোবর্ম্মার উত্তরাধিকারী ধঙ্গদেবের সহিত রাঢ়ের ও অঙ্গের মহাসামন্তগণের যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল, লিপিপ্রমাণে ইহার অধিক প্রমাণিত হইতেছে বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। চন্দেল্লগণ কর্তৃক বাঙ্গালার অথবা বিহারের কোনও অংশ স্থায়িভাবে বিজিত হইবার কোনও প্রমাণই নাই।

দশম শতাব্দের শেষভাগে, কান্যকুব্জের প্রতীহার রাজগণ কার্য্যতঃ জেজাক-ভুক্তির চন্দেল্লরাজগণের অধীন-মিত্ররাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কচ্ছপঘাত (কচ্ছহওয়া)-বংশীয় মহাসামন্ত বজ্রদামন কান্যকুব্জের প্রতীহার-রাজকে পরাভূত করিয়া প্রবীণ গোপাদ্রি বা গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। এই বজ্রদামন তত্রত্য একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, তিনিও চন্দেল্লরাজের মিত্রনৃপতি হইয়াছিলেন। দশম শতাব্দের শেষ দিকে, চন্দেল্লরাজগণের ও তাঁহাদের করদ নৃপতির ও মিত্রশক্তির সহিত, উত্তরাগত মুসলমান আক্রমণকারিগণের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। গজনী-অধিপতি সবুক-তাগীনের গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে ধঙ্গ চন্দেল্ল কান্যকুব্জের প্রতীহার-রাজ রাজ্যপালের সহিত পঞ্চনদ প্রদেশের ভাতিন্দা 'রাজ্যাধীশ্বর জয়পাল-প্রবর্ত্তিত শক্তিসঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা ৯৯০ খৃষ্টাব্দের সম-সময়ে কুরম উপত্যকার নিকটে সবুক-তাগীন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ১০১৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সবুক-তাগীনের উত্তরাধিকারী সুপ্রসিদ্ধ সুলতান মামুদ কর্তৃক কান্যকুব্জ নগর অধিকৃত ও লুণ্ঠিত হইয়াছিল; রাজ্যপাল তাহাতে বিশেষ বাধা প্রদান করেন নাই। রাজ্যপাল তখন কান্যকুব্জ পরিত্যাগ করিয়া, গঙ্গার অপর পারে বারিতে চলিয়া গিয়াছিলেন। সুলতান মামুদের নিকট রাজ্যপালের এই অধীনতা-স্বীকার বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য বলিয়া চন্দেল্লরাজ কর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়াছিল, এবং সেই বৎসরেই ধঙ্গের উত্তরাধিকারী চন্দেল্লরাজ গণ্ডের ভাবী উত্তরাধিকারী বিদ্যাধর, প্রতীহার-রাজ রাজ্যপালকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিয়াছিলেন।

যে বিপুল গুর্জ্জর-প্রতীহার-সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙ্গালার পালরাজ-গণের সহিত উত্তর-ভারতের সার্ব্বভৌম-রাজশক্তি লইয়া বিরোধ করিয়া আসিয়াছিল, তাহার এইরূপ অভাবনীয় পরিণাম ঘটিল। ১০১৯ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে, সুলতান মামুদ চন্দেল্লরাজকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে এক অভিযান লইয়া অগ্রসর হইলেন, এবং ১০২০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি বারি অধিকার করিলেন, এবং তৎপরে চন্দেল্লরাজ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিলেন। ১০২৩ খৃষ্টাব্দে

সুলতান মামুদ চন্দেল্লদিগের প্রবীণ কালঞ্জর দুর্গ অধিকার করিলেন, কিন্তু উহা অধিক কাল আপন অধিকারে রক্ষা করিলেন না।

মুসলমান আক্রমণকারীর গতিরোধের নিমিত্ত গৌড়াধিপ মহীপাল উত্তরাপথের হিন্দু রাজন্য-সঙ্ঘের সহিত যোগদান করেন নাই বলিয়া রমাপ্রসাদ চন্দ আক্ষেপ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, মহীপাল সেই সঙ্ঘে যোগদান করিলে হয় ত ভারত-ইতিহাস অন্যরূপ আকার ধারণ করিত। রমাপ্রসাদ বাবু অনুমান করিয়াছেন,—কাম্বোজগণের কবল হইতে বরেন্দ্র উদ্ধার করিয়া, মহীপাল যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, অশোকের ন্যায় ধর্ম্মকর্ম্মে এবং পরহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। উত্তরাপথের হিন্দু রাজন্য-সঙ্ঘের সহিত যোগদান না করাই মহীপালের পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। চন্দেল্লগণের ও প্রতীহারগণের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইলে, তাহার বংশপরম্পরাগত শত্রুকেই সাহায্য করা হইত; এতদ্ব্যতীত ইহাও মনে রাখিতে হইবে,—মহীপাল হিন্দু ছিলেন না, বৌদ্ধ ছিলেন। সম্ভবতঃ সবুক-তাগীনের এবং সুলতান মামুদের চন্দেল্ল ও প্রতীহার-রাজগণের উপর আক্রমণ, মহীপালের রাজ-শক্তি বিস্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে বহুলপরিমাণে সহায়তা করিয়াছিল।

মহীপাল ও মগধ।

মহীপালের রাজ্যারম্ভে, নালন্দার মহাবিহার সহ, অন্ততঃ মগধের একাংশ যে তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল, তদ্বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার, তাঁহার রাজ্যকালের ষষ্ঠবর্ষে লিখিত একখানি পুঁথি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, বুদ্ধগয়ার একটি বুদ্ধ শ্রীমূর্ত্তিতে মহীপালের রাজ্যকালের একাদশ বর্ষ সংবলিত একটি শাসনলিপি ক্ষোদিত আছে; এবং নালন্দা মহাবিহারের ভগ্নাবশিষ্টের মধ্যে প্রাপ্ত একখানি পাষাণরচিত দ্বারফলকে উৎকীর্ণ লেখগর্ভে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে,—নালন্দার সুবৃহৎ মন্দির ভস্মীভূত হইয়া যাইবার পর বলাদিত্য নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক মহীপালদেবের রাজ্যকালের একাদশ বর্ষে উহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

নালন্দা এবং বুদ্ধগয়া যে গৌড়াধিপতি দ্বিতীয় গোপালের অধিকারভুক্ত ছিল, সে বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। মগধরাজ্য কান্যকুব্জের প্রতীহার-রাজ কর্ত্তৃক সাময়িক ভাবে স্বাধিকারভুক্ত হইলেও, কান্যকুব্জের মহীপাল যখন রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র কর্ত্তৃক পরাভূত হন, দ্বিতীয় গোপাল কর্ত্তৃক সেই সময়ে মগধের পুনরুদ্ধার সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ

এরূপও বলিতে চাহেন যে,—দ্বিতীয় গোপাল কর্ত্তৃক মগধের পুনরধিকার অস্থায়ী হইয়া থাকিবে, এবং যশোবর্ম্মা চন্দেল্লের সাহায্যে হয় ত মহীপাল প্রতীহার তৎপ্রদেশ পুনর্ব্বার অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ অনুমান করিবার কোনও বিশিষ্ট হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না; পরন্তু, দ্বিতীয় গোপালের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় বিগ্রহপালের এবং মহীপালের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত মগধ যে বরাবর গৌড়রাজ্যের অভিভুক্ত ছিল না, এরূপ অনুমান করিবারও কোনও কারণ নাই।

মজঃফরপুর জেলায় ইমাদপুর গ্রামের নিকট কতকগুলি ধাতুমূর্ত্তির উৎকীর্ণ লেখ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহীপালের রাজ্যকালের অষ্টচত্বারিংশৎ বর্ষে উহাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এবং মহীপাল যে ত্রিহুতের কতক অংশে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন, ঐ সকল উৎকীর্ণ লেখমালা হইতে তাহার নিশ্চিত জ্ঞান না হইলেও, তৎসম্বন্ধে অনুমান করা যাইতে পারে। এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে যে, ঐ মূর্ত্তিগুলি অন্য কোনও স্থান হইতে ইমাদপুরে আনীত হইয়া থাকিবে। গৌড়ের পালনৃপতিগণ কর্ত্তৃক ত্রিহুতের উল্লেখ নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে আছে;—তাহার সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

বারাণসীর সন্নিকটে সারনাথের ভগ্নাবশিষ্টের মধ্যে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত একটি বুদ্ধ-মূর্ত্তির পাদপীঠে ১০২৬ খৃষ্টাব্দের লিখিত একখানি শিলালিপিতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে,—গৌড়াধিপ মহীপালের রাজত্বকালে, স্থিরপাল এবং বসন্তপাল নামক দুই সহোদর সারনাথের ধর্ম্মরাজিকা ও ধর্ম্মচক্রের জীর্ণ-সংস্কার করেন, এবং অষ্টমহাস্থান-যুক্ত একটি অভিনব শৈলগন্ধকুটি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইহা হইতে অনুমান হয়,—স্থিরপাল এবং বসন্তপাল, মহীপালের অনুজ্ঞানুসারেই কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ আন্দাজে ইহাও ধরিয়া লইয়াছেন যে,—তাঁহারা পরস্পরের আত্মীয় ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ দৃষ্ট হয় না।

মহীপাল ও বারাণসী।

বৌদ্ধসাহিত্যে স্তূপের সাধারণ নাম ধর্ম্মরাজিকা। পাদপীঠলিপি সারনাথের কোন্ স্তূপের উল্লেখ করিয়াছে, তাহার নিশ্চয় নাই; তবে, কিংবদন্তী অনুসারে বুদ্ধদেব যে স্থানে তাঁহার প্রথম ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করেন, তাহারই সান্নিধ্যে সম্রাট অশোকের নির্ম্মিত প্রধান স্তূপের বিষয়ই উল্লিখিত হইয়া থাকিবে বলিয়া মনে হয়। বারাণসীর জগৎগঞ্জ মহল্লার নির্ম্মাণ কার্য্যের উপাদান-সংগ্রহের নিমিত্ত কাশীনরেশ মহারাজ চৈতসিংহের দেওয়ান জগৎসিংহ

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে স্তূপটির ধ্বংস-সাধন করেন, এবং তাহারই ফলে, উহা জগৎসিংহের স্তূপ বলিয়াই পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। মৃগদাব নামে পরিচিত সারনাথের বিপুল বৌদ্ধ বিহারের সাধারণ নাম ধর্ম্মচক্র। অষ্টমহাস্থান হয় ত বুদ্ধদেবের জীবনের আটটি প্রধান ব্যাপারের সংঘটনক্ষেত্র, এবং বৌদ্ধগণের তীর্থস্থান।

বারাণসী যে মহীপালের রাজ্যাধিকারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, তাহাও এই পাষাণ-লিপি হইতেই অনুমিত হয়; এবং চন্দেল্ল ও প্রতীহার রাজশক্তির দুর্ব্বলতার সুযোগে যে মহীপাল বারাণসী ও মিথিলা পর্য্যন্ত আপনার পরাক্রম প্রসারিত করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে যে হস্তলিখিত রামায়ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে যে, উহা তীরভুক্তির অধীশ্বর গৌড়-ধ্বজ সোমবংশীয় মহারাজাধিরাজ গাঙ্গেয়দেবের সময়ে ১০১৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল।—ইহাতে অবশ্য পূর্ব্বোল্লিখিত অনুমানকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়। কিন্তু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেন,—এই গাঙ্গেয়, চেদীবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ কর্ণের পিতা কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়; এবং ১০১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই এই গাঙ্গেয় মহীপালের নিকট হইতে তীরভুক্তি অথবা মিথিলা কাড়িয়া লইয়াছিলেন; মিথিলা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই বারাণসী তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল; এবং সার-নাথের যে শিলাশাসনের এইমাত্র উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার লিপিকার্য্য, মহীপালের আজ্ঞানুযায়ী সংস্কারাদি সম্পন্ন হইবার অন্যূন ছয় বৎসর পরে সম্পাদিত হইয়াছিল।

কলচুরি বা হৈহয়বংশীয় নৃপতি কোকল্ল কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় নবম শতাব্দের শেষ-ভাগে চেদী-রাজ্য ও তাহার রাজধানী ত্রিপুরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বর্ত্তমান মধ্যপ্রদেশের কতক অংশ লইয়াই এই চেদীরাজ্য গঠিত ছিল, এবং জব্বলপুরের নিকটে বর্ত্তমান তেবরেই রাজধানী ত্রিপুরী অবস্থিত ছিল। কোকল্ল হইতে আরম্ভ করিয়া গৌড়াধিপ প্রথম মহীপালের উত্তরাধিকারী নয়-পালের সমসাময়িক কর্ণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত, এই রাজবংশের বিশেষ তথ্য আমরা অবগত নহি। গৌড়াধিপ প্রথম মহীপালের ১০৪২ খৃষ্টাব্দের একখানি তাম্রশাসন বারাণসীতে পাওয়া গিয়াছে। আমার দ্বিতীয় প্রবন্ধেও ইহার উল্লেখ করিয়াছি—কিন্তু ভ্রমক্রমে উহা তেবরে প্রাপ্ত বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। এই তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়,—কোকল্ল জেজাকভুক্তির হর্ষ চন্দেল্লর সন্ধিবদ্ধ মিত্র ছিলেন। তাহার পর, গৌড়ের প্রথম বিগ্রহপাল বা শূরপাল যে কলচুরি-

রাজতনয়া লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা অবগত আছি; এবং শাসনাদি হইতে ইহাও অবগত হইয়াছি যে,—রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ কোকল্লের দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র জগত্তুঙ্গ কোকল্লের দুইটি পৌত্রীর সহিত পরিণীত হইয়াছিলেন; এবং জগত্তুঙ্গের পুত্র যে সুপ্রসিদ্ধ রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র প্রতীহার-রাজ প্রথম মহীপালকে পরাভূত করিয়া কান্যকুব্জ অধিকার করেন, তিনি কোকল্লের একটি প্রপৌত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব, দশম শতাব্দের প্রথম ভাগে, গৌড়ের পাল-নৃপতিগণের এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট-নৃপতিগণের ন্যায় পরাক্রমশালী রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপনের উপযুক্ত পদমর্য্যাদা যে চেদীর কলচুরি রাজবংশের বর্ত্তমান ছিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে। আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, কলচুরিগণ প্রথমতঃ চন্দেল্লগণের সহিত সন্ধিবদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু উপরি-উল্লিখিত বৈবাহিক সম্পর্ক হইতে অনুমান হয় যে, তাঁহারা পরে রাষ্ট্রকূটরাজের সহিত ও রাষ্ট্রকূটের সন্ধিবদ্ধ মিত্র ও চন্দেল্ল-প্রতীহার-রাজগণের চিরশত্রু গৌড়ের পাল-রাজের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

বারাণসী যে কর্ণের অধিকারভুক্ত ছিল, বারাণসীতে প্রাপ্ত কলচুরিরাজ কর্ণের ১০৪২ খৃষ্টাব্দের তাম্রশাসন হইতে তাহার কিঞ্চিৎ সমর্থন প্রাপ্ত হওয়া যায়;—কিন্তু তাহা নিঃসংশয় প্রমাণ নহে। এতৎসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোনও নিশ্চয় প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। ক্রমশঃ।

শ্রীবিমলাচরণ মৈত্রেয়।

আলোচনা।

রবীন্দ্র-সংবাদ।*

"রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গ" আমরা পড়িয়াছি, এবং হাসিয়াছি। এমন হাস্যরসাত্মক (?) প্রবন্ধ অনেক দিন পড়ি নাই, সেই জন্য ইহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ করি। যাঁহারা রবি বাবুকে "ঋষি" ভাবেন, তাঁহারা তাঁহার কথাগুলি ঋষিবাক্য ভাবিতে পারেন!

*   *   *   *

* 'রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গ' 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় ১৩২৩ সালের ফাল্গুন-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। নানা কারণে এতদিন ইহার পরিচয় দিতে পারি নাই। 'রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে' সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র হইতে সাহিত্যাচার্য্য চন্দ্রশেখর পর্য্যন্ত অনেকের প্রতি রবিবাবু অবিচার করিয়াছেন, তাহা দেখানই এই আলোচনার উদ্দেশ্য।—লেখক।

রবিবাবু বলিয়াছেন, 'হাঁ, ঐ দেখুন, আমি কখনও ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না যে 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম' বঙ্কিমবাবু কেন ভাল বলিতেন। কিন্তু এটা ঠিক যে, তিনি ঐ উচ্ছ্বাসগুলিকে খুব পছন্দ করিতেন। চন্দ্রশেখর বাবুও ইদানীং আমায় বলিতেন যে, তাঁহার ও লেখাটা ভাল হয় নাই, ওটার ভিতর বিশেষ কিছুই নাই।'—ইহাতে রবিবাবু এক লাঠীতে দুই সাপ মারিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর রসবোধ ছিল না, তাহা দেখাইবার জন্য তিনি উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমের লেখককেই সাক্ষিশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমের অসারত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোনও কারণই কেহ দেখাইতে পারিবেন না!

কিন্তু আমরা চন্দ্রশেখর বাবুকে 'রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গ' দেখাইয়াছি।

চন্দ্রশেখর বাবু বলিলেন, 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম-সম্বন্ধে রবিবাবুর সঙ্গে আমার কখনও কোনও কথা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গের এতদ্‌বিষয়ের কথাগুলি সর্ব্বৈব মিথ্যা। নিজের সুখ-দুঃখের কথা সাধারণে প্রকাশ না করিলেই ভাল হয়, এমন কথা অন্য কাহারও কাহারও কাছে বলিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয়, কিন্তু আমার কোনও রচনা বা পুস্তকের Literary merit সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা আমি কখনও কাহারও সহিত করি নাই।'

বলিয়া রাখা ভাল, চন্দ্রশেখর বাবু তামাতুলসী-গঙ্গাজল হাতে না লইয়াই কথাগুলি বলিয়াছেন; সুতরাং কে সত্যবাদী, কে মিথ্যাবাদী—সে মীমাংসা আমরা করিব না। তবে দেখা যাইতেছে, রবিবাবুর এই উক্তি ১৩১৮ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র গত মাঘ-সংখ্যার বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, রবিবাবু ইহা পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে চন্দ্রশেখর বাবুর পরলোকপ্রাপ্তি হইলে কোনও গোলই থাকিত না, এই নীরস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকেও সময়ের অপব্যবহার করিতে হইত না।

বিনা বিজ্ঞাপনেই যে পুস্তকের অনেকগুলি সংস্করণ বাহির হইয়াছে, তাহার Literary merit আমরা বিচার করিব না। তবে বঙ্কিমবাবু ইহার উচ্ছ্বাসগুলি খুব পছন্দ করিতেন বলিয়াই উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম ভাল বলিতেন, বলিলে, বঙ্কিম-প্রতিভার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়। দার্শনিকপ্রবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের New Essays in Criticism পুস্তকখানি পড়িলেই বুঝা যায়, উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমে 'উচ্ছ্বাস' ছাড়া আরও এমন অনেক জিনিস আছে, যাহার বলেই সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কেন, সাহিত্যসেবিমাত্রেরই ইহা আদরের বস্তু হইয়াছে। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা শ্রদ্ধাস্পদ শীল মহাশয়ের উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম-সম্বন্ধীয় উক্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। শীল মহাশয়ের মূল গ্রন্থখানি পাঠ করিলে উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানিতে পারা যাইবে। শীল মহাশয় বলিয়াছেন—

The first remarkable product of Bengali literature of the Neo-romantic type, would fill a remarkable place in the full sense of the term in the history of any literature, Western or Eastern. The *Udbhranta Prema* of Babu Chandra Sekhar Mukherji, a prose rhapsody, suggests by its very title that curse of doubt and despair, that blight of disillusion and disenchantment, that eats into the very vitals of the

Neo-romantic life and consciousness. If, omitting the direct romantic revival that had preceded in the Gotz Von Berlichingen, and other works, Goethe's Werther may be regarded as the prototype of the Neo-romantic School, the leader of the forlorn hope, the *Udbhranta Prema* may, with equal truth, be assigned a similar position in relation to that movement in Bengali literature। * * * The magic of the *Udbhranta Prema* lies in its emotional transfiguration. * * * The *Udbhranta Prema* eschews realism and socialism altogether. * * * The *Udbhranta Prema* is one of the best examples in literature of the compound style, a style which employs, as its unit, starry clusters of Associated images and feelings, "trailing clouds of glory", as they come, or rich trains of harmonious suggestion, with their many coloured fountain-play and evanescent rainbow hues. * * *

তাহার পর বিপিনবিহারী বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'আপনার বঙ্গদর্শনে চন্দ্রশেখর বাবু ত সমালোচক ছিলেন।' রবিবাবু বলিয়াছেন, 'হাঁ! সমালোচনা করিতে আমি একেবারেই রাজি ছিলাম না। শৈলেশ যখন সমালোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, আমি বলিলাম, "আমি সমালোচনা করিব না; যদি সমালোচনা প্রকাশ করা আবশ্যক বিবেচনা কর, তাহা হইলে তুমি আলাদা লোক ঠিক কর, তাঁহার স্বাক্ষর দিয়া সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।" শৈলেশের প্রস্তাবে চন্দ্রশেখর বাবু রাজি হইয়াছিলেন।'

যে কথার উত্তরে হাঁ বা না বলিলেই চলিত, তাহাতে রবিবাবু এত কথা বলিয়াছেন কেন, বুঝিলাম না। বেশী কথা বলার বেশী দোষ কি, বলিতেছি।

"তুমি আলাদা লোক ঠিক কর, তাঁহার স্বাক্ষর দিয়া সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।"—ইহাতে স্বাক্ষর শব্দটির দিকে লক্ষ্য করিলে দুইটি অর্থ পাওয়া যায়।

(১) রবিবাবু সমালোচনা করিবেন, কিন্তু তাহা আলাদা লোকের নাম দিয়া প্রকাশিত হইবে।

(২) রবিবাবু সমালোচনা করিবেন না; যিনি সমালোচনা করিবেন, তিনি নাম গোপন করিতে পাইবেন না।

কিন্তু এখানে প্রথম অর্থটি খাটে না। কারণ, রবিবাবু ত পূর্ব্বেই সমালোচনা করিতে অসম্মত হইয়াছেন। দ্বিতীয় অর্থটি বঙ্কিম-যুগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবী চন্দ্রশেখর বাবুর পক্ষে কলঙ্কের কথা। সমালোচনার নীচে নামপ্রকাশে কুণ্ঠাবোধ করেন কোন্ শ্রেণীর লেখক? যাঁহারা নিজে ত্রুটীর বোঝা বহেন, অথচ সমালোচনায় হাতী-ঘোড়া মারিতে চাহেন, কল্পিত নাম গ্রহণ করিতে সেই শ্রেণীর লেখকই বাধ্য হন। নিজের শক্তিতে যাঁহার আস্থা নাই, অথচ হাম-বড়া হইবার সাধ বেজায়, সেই রকমের লেখকই সাধারণতঃ নাম গোপন করিবার জন্য ব্যস্ত হন। যে চন্দ্রশেখরের প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে এ যুগের অনেক গ্রন্থকার কৃতার্থ হন, এবং বাজারে তাঁহাদের পুস্তকের যথেষ্ট কাটতি হয়, সেই নির্ভীক ও নিরপেক্ষ চন্দ্রশেখর কি এই শ্রেণীর সমালোচক?

শৈলেশ বাবু চন্দ্রশেখর বাবুকে বঙ্গদর্শনের সমালোচক নির্ব্বাচিত করিবার পূর্ব্বে ভাবী সমালোচক সম্বন্ধে রবিবাবু এইরূপ মত প্রকাশ করিতে পারিতেন, করিয়াও ছিলেন,—তাহাতে দোষ দেখি না। কিন্তু চন্দ্রশেখরবাবুকে সমালোচক পাইয়া বঙ্গদর্শন গৌরবান্বিত হইয়াছিল কি না, তাহা স্মরণ করিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইত কি?

যিনি কলম ধরিয়াই অমর কবি মধুসূদনের অক্ষয় কীর্ত্তি লোপ করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন, যিনি চষা মাঠের উপর দিয়া পাল্কী চড়িয়া যাইবার সময় 'রাজসিংহ' পড়িয়াই সমালোচনা করিয়াছিলেন, যিনি 'কৃষ্ণচরিত্র' ও আরও কত কি পুস্তকের সমালোচনা করিয়া মক্ষিকাবৃত্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন, আমাদের সেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হইয়া—বঙ্কিমচন্দ্রের গদীতে বসিয়া,—সমালোচনা করিতে রাজি হন নাই কেন? পরে ১৩১৮ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ যে রবীন্দ্র মুখে মুখে বঙ্কিম বাবুর 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'র সমালোচনা করিয়াছেন, আরও কত লোকের সম্বন্ধে কত কথা বলিয়াছেন, সেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনে সমালোচনার ভার লন নাই! বঙ্গদর্শন-সম্পাদনকালে রবিবাবুর এই বৈরাগ্যব্রতের কারণ কি? কে এই রহস্যদ্বার উদ্ঘাটিত করিবে? *

* * * *

'রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে' আরও অনেক কথা আছে।—শাস্ত্র সম্বন্ধে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে, সাহিত্য সম্বন্ধে—সকল রকমের তথ্যই আছে। কুচবিহারের মহারাণী ভূতের গল্প শুনিতে ভালবাসেন, তাহাও ইহাতে আছে।

* * * *

প্রথমেই তাঁহার 'অচলায়তনে'র কথা। রবিবাবু বিপিনবিহারী বাবুকে বলিয়াছেন, "আমার সমালোচকেরা গায়ত্রীমন্ত্র জপ করেন কি না জানি না, কিন্তু আমি আমার পিতৃদেবের নিকট যে গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলাম, সেই মন্ত্রসাধনে আমি কত দূর উপকৃত হইয়াছি তাহা আপনাকে কি বলিব।"

(১) রবিবাবুর সমালোচকেরা গায়ত্রীমন্ত্র জপ করেন কি না, তাহা রবিবাবু জানেন না বলিয়াই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে, তাঁহারা গায়ত্রীমন্ত্র জপ করেন না।

(২) রবিবাবু তাঁহার পিতৃদেবের নিকট যে গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সেই মন্ত্রসাধনে তিনি কত দূর উপকৃত হইয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিতে তিনি সঙ্কোচবোধ করিলেও, সমালোচক সঙ্কোচ বোধ করিবে না।

কতকগুলি গল্প বা কবিতা লেখা বা গান রচনা করা বা নোবেল প্রাইজ পাওয়া যদি গায়ত্রীমন্ত্র-সাধনের ফল হয়, তবে এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। আর যদি গায়ত্রীমন্ত্র-সাধনের ফলে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের সম্ভাবনা থাকে, তবেই ত সমস্যার উৎপত্তি হয়। এই সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যতা আমাদের নাই।

* * * *

* 'বঙ্গদর্শনে'র পাঠকবর্গ জানেন, রবিবাবু 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচনার ভার না লইলেও, দুই একবার সমালোচনা করিয়াছিলেন।—লেখক।

রবিবাবু শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কথা তুলিয়া বলিয়াছেন, "ধর্ম্মের একটা অবস্থা আসে, যখন সাধারণ লোকের বিশ্বাসগুলি আর স্বাভাবিক থাকে না, যখন সেগুলিকে জোর করিয়া তর্কে ও যুক্তিতে খাড়া করিতে চেষ্টা করা হয়, তখন মানুষ কতকটা জাগ্রত হইয়াছে, কতকটা বুঝিতে পারিয়াছে যে প্রাণহীন আচার-ব্যবহারের উপর যে আঘাত আসিয়া পড়িয়াছে, সেই আঘাত হইতে তাহাকে বাঁচাইতে হইলে যুক্তি-তর্কের আবশ্যক, তখন বুঝিতে হইবে সেই সকল মন্ত্রতন্ত্র, আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠানের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। সকল দেশেই ইতিহাসে এইটি প্রত্যক্ষ করা যায়।"

"ধর্ম্মের একটা অবস্থা আসে, যখন সাধারণ লোকের বিশ্বাসগুলি আর স্বাভাবিক থাকে না।"—কথাটা কেমন, বুঝিলাম না। ধর্ম্ম কি একটা মানুষ, না, পার্থিব কোনও জিনিস যে, তাহা এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় আসিতে পারে? একধর্ম্মাবলম্বী সাধারণ লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস স্বাভাবিক না থাকিলে অর্থাৎ শিথিল হইলে, তাহাদের ধর্ম্মভাব অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে পারে, আমরা ইহাই জানি। ধর্ম্ম অবিনশ্বর, ধর্ম্মের আদর্শ চিরকালই এক,—সেই সত্যযুগে যাহা ছিল, এখন এই কলিযুগেও তাহাই আছে। ধর্ম্মপালনে অনাস্থা জন্মিলে ধর্ম্মের অধোগতি হয়, আর সূর্য্য পূর্ব্বে উঠিয়া পশ্চিমে অস্ত যায়!—একই কথা। কতকগুলি আচার-নিয়মকে ধর্ম্ম ভাবিয়া ধর্ম্মের রূপ ও গতি নির্ণয় করিয়া সম্প্রদায়ভেদে ধর্ম্মকে ভাগাভাগি করা মানুষের স্বভাব। দোষ দিতে হয়, সে দোষ মানুষের, ধর্ম্মের নহে।

রবিবাবুর অন্যান্য কথাও খাপছাড়া। তিনি যে সকল আচার-ব্যবহারকে প্রাণহীন ভাবেন, বাস্তবিকই তাহা প্রাণহীন বটে কি না, ভাবিয়া দেখা উচিত। একটা জাতির মন্ত্র-তন্ত্রের, আচার-ব্যবহারের ও অনুষ্ঠানের দিন যতদিন পর্য্যন্ত না ফুরায়, ততদিন তাহা প্রাণহীন হয় না, এই সহজ কথাটাও তিনি বুঝেন না। কোনও পতনোন্মুখ সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য যুক্তি-তর্ক আবশ্যক হয়, আবার নবগঠিত সমাজের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যও যুক্তি-তর্ক আবশ্যক হয়। ব্রাহ্মসমাজের নেতারা বিবিধ যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়া নিজের সমাজকে পুষ্টি করিতেছেন দেখিয়া কেহ কি বলিতে পারেন, ব্রাহ্মদের আচার-ব্যবহার ও অনুষ্ঠানের দিন ফুরাইয়া আসিতেছে? সকল দেশের ইতিহাস পড়িলে মানুষের মনে কিরূপ চিন্তার উদয় হয়, জানি না; ভারতবর্ষের ইতিহাসেরই সকল কথা আমাদের জানা নাই, যেটুকু জানি, তাহাতে মনে হয়, এক সমাজের কতকগুলা লোক অপথে পথ করিয়া লইতে ব্যস্ত হইলে তাহাদিগকে যুক্তি ও তর্কের দ্বারা আসল পথটি দেখাইয়া দেওয়া উচিত। যুক্তি ও তর্কের দ্বারা বিপথগামী সকলকেই ফিরাইতে পারা যায় না, কিন্তু দশ জনের মধ্যে এক জনকে ফিরাইতে পারিলেও বুঝা যায়, সমাজের হিতের জন্যই যুক্তি ও তর্ক আবশ্যক।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁহারা আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদেরই দুই এক জনকে আমরা ফিরিয়া পাইয়াছি। যাঁহারা এক দিন হিন্দুর আচার-নিয়মকে হয় ত প্রাণহীন ভাবিয়াই হিন্দুসমাজের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই কেহ কেহ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া হিন্দুরই আচার-নিয়ম শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া হিন্দুসমাজে অনুষ্ঠিত আচার-নিয়মে চলিতেছেন। ইহাতে কি বুঝিব—হিন্দুর মন্ত্রতন্ত্র, আচার-ব্যবহার ও অনুষ্ঠান প্রাণহীন?

* * * *

তাহার পর রবিবাবু চন্দ্রনাথ বাবুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "চন্দ্রনাথ বাবু অনেক লিখিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুই রহিল না. তাঁহার লেখার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা দিনকতকের জন্যও টিকিতে পারে।"

রবিবাবু ব্যতীত অন্য কেহ চন্দ্রনাথ বাবুকে এইরূপ সার্টিফিকেট দিয়াছেন কি না, জানি না। রবিবাবুর যাহা ভাল না লাগে, তাহা টিকিয়া নাই, এইরূপ ধারণা রবিবাবুর পক্ষেই সম্ভব। "চন্দ্রনাথবাবুর 'শকুন্তলাতত্ত্ব' সমালোচনা-হিসাবে অসার।"—ইহাও রবিবাবু বলিয়াছেন।

কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবুর রচনা-সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শীল মহাশয় তাঁহার New Essays in Criticism গ্রন্থে বলিয়াছেন—

It is refreshing to turn to Babu Chandranath Bose's secret of Sakuntala and his essays on love, religion, marriage, and cognate subjects. Here * * * in the best style of art-criticism, following in the wake of Friedrich Schlegel, the profound interpreter of the grand old masters of romantic art and a distinguished leader of the fourth European movement of romantic revival, our author lights up with a fine moral and spiritual significance the conventional structure and characters of the Hindu drama.

"রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে" চন্দ্রনাথবাবুর সম্বন্ধে আরও একটি কথা আছে। এক দিন চন্দ্রনাথবাবু রবিবাবুকে লিখিয়াছিলেন, "তুমি হিন্দুর ছেলে, ও রকম লেখো কেন?" রবিবাবু উত্তর দিয়াছিলেন, "হিন্দুত্ব সম্বন্ধে আপনার মত লইতে প্রস্তুত নহি।"

এই অবিনয়ের দৃষ্টান্তটি চাপিলে চলিত না কি?

* * * *

তাহার পর বঙ্কিমচন্দ্রের কথা।

রবিবাবু বলিয়াছেন, "তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) যেখানে মানুষের সমষ্টি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, সেইখানেই সমস্তটা একটা পিণ্ডবৎ তাল পাকাইয়া গিয়াছে, কোনও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার চেষ্টা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না।"

রবিবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ত্রুটী দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন বলিয়া আমরা বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হই নাই। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের গুণের পক্ষপাতী হইলেও, তাঁহার রচনায় যে দোষ আছে, তাহাও দেখিতে চাহি। আনন্দমঠে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য নাই বলিয়াই রবিবাবুর তাহা ভাল না লাগিতে পারে; কিন্তু দেখিতে হইবে, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য দিবার মানসেই কি বঙ্কিমবাবু আনন্দমঠ লিখিয়াছিলেন? বেলতলায় আম পাওয়া যায় না, এই সরল সত্যটুকুও রবিবাবুর জানা নাই! আনন্দমঠে যে উন্নত আদর্শ ও একপ্রাণতার পরিচয় পাওয়া যায়, রবিবাবুর কোনও উপন্যাসে তাহা পাওয়া যায় কি? বিষবৃক্ষের শেষই বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠের গোড়াই আনন্দমঠ। রবিবাবু সে দিকে লক্ষ্য করেন নাই। তিনি আনন্দমঠের পূর্ব্বসূচনার দিকে—'আনন্দ'-গঠনের দিকে—লক্ষ্য করিয়াছেন, বিষয় বা উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করেন নাই। দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসের পারিপার্শ্বিক ঘটনার দিকে লক্ষ্য করিয়াই, অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায় তিনি দেবীচৌধুরাণীতেও এই দোষ দেখিয়াছেন. 'গোড়ারমুখী' প্রফুল্লর কথা ভুলিয়া দেবীচৌধুরাণীকে দেখিয়াছেন, কিন্তু বঙ্কিমবাবু দেবীচৌধুরাণীর মুখেই বলাইয়াছেন—দেবীচৌধুরাণী মরিয়াছে! বঙ্কিমবাবুর

প্রফুল্লকে চিনিতে হইলে রবিবাবুর কমলার দিকে চাহিতে হয়। কমলার ন্যায় প্রফুল্লও তাহার গৃহ, সমাজ ও হৃদয়ের আরাধ্য দেবতাকে খুঁজিয়াছে। কমলার আরাধ্য দেবতা তথাকথিত বিশ্বরূপেরই একটা রূপ, সে রূপ কমলা কখনও চোখে দেখে নাই, কল্পনায় আনিতে পারে নাই, প্রমাণকেই সত্য ও সংস্কারকেই সার ভাবিয়া আবর্জ্জনাস্তূপের মধ্যে কত অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া রমেশের সঙ্গে ঘুরিয়াছে! রূপ ও যৌবন উদ্দিষ্ট পাত্রে সমর্পণ করিয়াই কমলার তৃপ্তি। বন্ধনহীন সমাজের এক কোণে একটু স্থান পাইয়া কমলা "দেবী" সাজিয়াছে। আর প্রফুল্ল? প্রফুল্ল নরকের রাণী হওয়ার চেয়ে স্বর্গের দাসী হওয়াই ভাল, বুঝিয়া, কঠোর সাধনা করিয়াছে। এই সাধনার ফলেই লাঞ্ছিতা প্রফুল্ল "দেবী" হইয়াছে। কমলায় নারীপ্রকৃতিসুলভ চাঞ্চল্য আছে,—বর্ষার স্রোতস্বিনীর ন্যায় তাহা আবিল ও আবর্ত্তময়। প্রফুল্লতে নারীপ্রকৃতির উদ্দামগতি নাই; তাহাতে আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু সকলই সংযমের গণ্ডীর মধ্যে। যে পবিত্রতা ও শ্লীলতা নারীচরিত্রের গৌরব-পরিচায়ক, কমলার চরিত্রে তাহার নিদর্শন নাই; কিন্তু সে নিদর্শন প্রফুল্ল-চরিত্রকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে।

কৃষ্ণচরিত্র-প্রণেতার সহিত শশধর তর্কচূড়ামণির মিলন স্থায়ী হউক আর নাই হউক, দেবীচৌধুরাণী-প্রণেতার সহিত নৌকাডুবি-প্রণেতার মতভেদ হওয়াই স্বাভাবিক, তাহারই একটু আভাস দিলাম।

* * * *

রবিবাবু তাঁহার নিজের উপন্যাসের চরিত্রগুলির বিষয় চিন্তা করেন কি? তাঁহার যে কোনও উপন্যাস পড়িলেই বুঝা যায়, তাঁহার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা সকলেই যেন কলেজ-ফেরত, তাহাদের আড়ষ্ট আড়ষ্ট কথাগুলা তর্জ্জমা করা,—ঠিক যেন মুখস্থ-করা বুলি আওড়াইবার জন্যই রঙ্গমঞ্চে দাঁড়ায়। সেগুলা কি আমাদের ঘরের ছবি? চোখের বালি ও নৌকাডুবির মত ছায়া-বাজি আর কোনও বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিয়াছেন কি না, জানি না। 'ধরি ধরি ধরা নাহি যায়', অথবা 'বলি বলি বলা হ'ল না'—এই কথাই ত রবারের মত বাড়াইয়া রবিবাবু উভয় উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাকে সামাজিক বিশৃঙ্খলার ছবি ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। অধিকাংশ নায়ক-নায়িকাই কদর্য্যভাবে বিভোর। তাঁহার এই ছায়াবাজির সহিত আমাদের সমাজের নাড়ীর কোনই সংযোগ নাই, সংযোগের আশাও নাই। যিনি কেবলই বাঙ্গালার মাটীতে বিলাতী গাছের চারা রোপণ করিতেছেন, তিনিই শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কথা স্মরণ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, "আমার বরাবর মনে হইত যে আমাদের বাংলা (বাঙ্গালা) দেশে কি এমন লোক নাই, যে আমাদের ঘরের ছবিটি নিপুণহস্তে অঙ্কিত করে?"— ইহা শুনিলে কে হাসি চাপিতে পারে?

* * * *

যাহা হউক, 'রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে' একটা সুসংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সাধনার যুগ ফিরাইবার সাধ রবিবাবুর এখনও—জাপানে জাপানী রীতিতে ভোজের পর—আছে কি না, বলা যায় না, তবে ১৩১৮ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ছিল।

কিন্তু এ কোন্ সাধনা? গায়ত্রী-সাধনা, না, সাহিত্য-সাধনা; না, 'আর-কিছু'-সাধনা?

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আয়ুঃ।

২

আমরা দেখিলাম যে, মৃত্যু জীববিবর্ত্তনের ফল, এবং মৃত্যু জীবরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত না হইলে জীব বাঁচিতেই পারিত না, উন্নতও হইতে পারিত না। আমরা ইহাও দেখিলাম যে, বহুকোষ দেহ মরে, বংশরক্ষক কোষ মরে না।

দেহ মরে; কারণ, বহুকোষ দেহ বড়ই জটিলভাবে বিবর্ত্তিত। জটিল যন্ত্র শীঘ্রই বিকল হয়। ইহার সহিত আর একটি কথাও বিবেচনা করা আবশ্যক। বহুকোষ দেহ যে সকল অসংখ্য জীবকোষ দ্বারা গঠিত, সে সকল জীবকোষ জীববস্তু (১) দ্বারা নির্ম্মিত। বলিয়াছি, জীববস্তু প্রধানতঃ অম্লজান, উদজান, যবক্ষারজান ও অঙ্গার দ্বারা গঠিত। এ সকলের সংমিশ্রণ নিতান্তই অস্থায়ী। ইহারা সর্ব্বদাই বিশ্লিষ্ট হইতেছে, আবার (আহারসংযোগে) গঠিত হইতেছে। ইহারা ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং জীবকোষও ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং জীবকোষের সমষ্টি, অর্থাৎ দেহও ক্ষণস্থায়ী।

এই দিক হইতে দেখিলে, মৃত্যুকে দ্বিবিধ বলা যাইতে পারে;—কৌষিক ও দৈহিক। কতকগুলি কোষ স্বধর্ম্মবশতঃই বিকল হইয়া পীড়িত, এবং অবশেষে মৃত হইতে পারে। স্বধর্ম্ম বলিতে, কোষের ক্ষণভঙ্গুরত্ব বুঝিতে হইবে। এরূপে দেহের কোনও বিশেষ (২) স্থানের কোষগুলি মরিয়া গেলে, কৌষিক মৃত্যু বলা যায়। ইহা হইতে দৈহিক মৃত্যু আসিতেও পারে, না-ও পারে। দৈহিক মৃত্যুকেই আমরা সচরাচর মৃত্যু বলি। কতিপয় কোষ মরিয়া গেলে, সে সকল পরিত্যক্ত হইতে পারে, এবং তাহার স্থানে নূতন সুস্থ কোষ জাত হইতে পারে। (৩)

যদি এমন কোনও স্থানে কৌষিক মৃত্যু হয় যে, সে স্থান, অথবা সে অঙ্গ, জীবিত থাকিবার পক্ষে অত্যাবশ্যক, তবে জীব মরিয়া যায়। হৃৎপিণ্ড, শ্বাসযন্ত্র, মূত্রকোষ ইত্যাদি স্থানে কৌষিক মৃত্যু হইলে, এবং নূতন সুস্থ কোষ জাত না হইলে, জীব বাঁচিয়া থাকিতে পারে না; কারণ, এ সকল যন্ত্র জীবিত থাকিবার

(১) Protoplasm.

(২) দেহের কোনও স্থান অবশ হইতে পারে; কোনও একটি স্থানের কতিপয় কোষ মরিয়া পচিয়া যাইতে পারে। এ সকল কৌষিক বিকলতা।

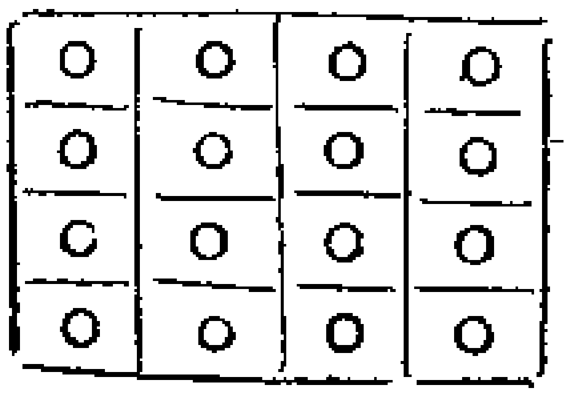
(৩) ইহা granulation দ্বারা সিদ্ধ হয়।

নিমিত্ত অত্যাবশ্যক, কিন্তু হস্তের অথবা পদের কোনও স্থানে কৌষিক মৃত্যু হইলেও জীব মরিবে না। ঐ সকল অঙ্গ ত্যাগ করিয়াও জীবিত থাকা যায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কৌষিক মৃত্যু হইতে দৈহিক মৃত্যু আসিতেও পারে, না-ও পারে।

এ স্থলে কোষ সম্বন্ধে আর একটি গুরুতর কথা স্মরণ করা আবশ্যক। কোষগুলির অস্থায়ী স্বভাববশতঃ যে বিকলতা, অর্থাৎ পীড়া এবং মৃত্যু হইতে পারে, তাহা কোষস্থ জীববস্তুর স্বধর্ম্ম। কিন্তু বাহ্য কারণেও কোষগুলি বিনষ্ট হইতে পারে, এবং তাহা হইতেও মৃত্যু আসিতে পারে। বাহ্য কারণ-বশতঃ কোষগুলির বিকলতা দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়। (১) আহারের অভাব, বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব; (২) বিষাক্ত পদার্থের সংযোগ। এই সকল কারণে কোষগুলি ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে, অথবা এককালে বিনষ্ট হইতে পারে। এই সকল বাহ্য কারণ কতক পরিমাণে নিবৃত্ত করা সম্ভব, কিন্তু সম্পূর্ণ নিবৃত্ত করা বড়ই দুঃসাধ্য। এ কারণেও (৪) মৃত্যু হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে মৃত্যুর আর একটি গুরুতর কারণ উল্লেখ করিতে হয়। যকৃতের, মূত্রকোষের, মস্তিষ্কের কোষ সকল ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এত বিকল হইতে পারে যে, মৃত্যু সে ক্ষেত্রে অনিবার্য্য হইয়া উঠে। ইহা প্রধানতঃ বার্দ্ধক্যেই হয়, অথবা ঈদৃশ ক্ষয়প্রাপ্তির নামই বার্দ্ধক্য। ইহা বিশদভাবে বুঝিতে পার্শ্বের চিত্রটি দেখিতে হইবে। বিন্দুগুলি কোষ, আর লাইনগুলি কোষসূত্র (Fibrous tissue)। বার্দ্ধক্যে কোষসূত্র শক্ত, অর্থাৎ কঠিন



হয়, এবং কোষগুলি ক্রমে সঙ্কুচিত, এবং তাহাদিগের ক্রিয়া ক্রমে মন্দীভূত হয়। (৫) বৃদ্ধ মৎস্য, ছাগ ইত্যাদির মাংস শক্ত হইয়া থাকে। বার্দ্ধক্যের বহু পূর্ব্ব হইতেই কোষসূত্রগুলিতে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ যুক্ত হইতে থাকে; উহারা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত না হইয়া কিয়দংশ কোষসূত্রে যুক্ত হয়; তন্নিমিত্ত সূত্রগুলি কঠিন হয়, এবং যেন জমিয়া (packed) যায়। তখন কোষবিন্দুগুলিও ক্রমে ছোট ও তাহাদিগের ক্রিয়া ক্রমে কম (৬) হইতে থাকে। বহুকোষ দেহের অনেকগুলি পীড়ার ইহাই প্রধান লক্ষণ। কোষ-সূত্রের কাঠিন্য ও কোষক্ষয়-(sclerosis)-বশতঃ যে সকল পীড়া হয়, তাহা

(৪) ইহাই necro-biosis.

(৫) Atrophy.

(৬) ইহাকে sclerosis বলে।

এখন পর্য্যন্ত অচিকিৎস্য। যে স্থানে এই পীড়া হয়, সে স্থানের স্বাভাবিক শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়। এ পীড়ায় মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

কতিপয় অসাধ্য পীড়ার লক্ষণ,—কোষসূত্রের কাঠিন্য এবং কোষক্ষয়। স্বাভাবিক বার্দ্ধক্যের লক্ষণও উহাই। সুতরাং বার্দ্ধক্যকে পীড়া বলিলে দোষ কি? উহা বর্ত্তমান সময়ে অসাধ্য পীড়া; উহার পরিণাম মৃত্যু। ইহাই স্বাভাবিক মৃত্যু। ইহা ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হয়।

মৃত্যু (১) বার্দ্ধক্যবশতঃ হয়; (২) অকস্মাৎ মৃত্যুও হয়; যেমন সর্পাঘাত-বশতঃ; এবং (৩) মৃত্যু অসাধ্য পীড়ার পরিণামেও হয়। এই তিন প্রকারে মৃত্যু হইয়া থাকে। দেহে অলক্ষিতে ক্যান্সারের বীজ প্রবেশ করিল; পরিণামে ক্যান্সারেই মৃত্যু হইল। এ মৃত্যুকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলা সঙ্গত নহে। সর্পাঘাত-মৃত্যু এবং ক্যান্সারের কীটাঘাত-(৭)-মৃত্যু একই শ্রেণীর। লাঠীর আঘাতে মাথা ফাটিয়া মরাও এই শ্রেণীর। কেবল বার্দ্ধক্যবশতঃ ক্রমে যে মৃত্যু হয়, তাহাই "স্বাভাবিক মৃত্যু" নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।

ক্যান্সারের বীজ, অর্থাৎ কীট (germ) দেহে প্রবেশ করিলে ঐ পীড়া হইবেই, এমন কোনও কথা নাই। কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি কীট-জ পীড়া অনেকের দেহেই প্রবেশ করে, কিন্তু সকলের ঐ সকল পীড়া হয় না। ক্যান্সারের রোগীর শুশ্রূষা করিয়া, কলেরার রোগীর পরিচর্য্যা করিয়া, কিংবা বসন্ত-রোগীকে স্পর্শ করিয়া কেহ কেহ ঐ সকল পীড়া প্রাপ্ত হয়, কেহ কেহ হয় না। যাহারা প্রাপ্ত হয় না, তাহাদিগের দেহ ঐ সকল বীজের অনুকূল নহে। আর যাহাদিগের দেহ ঐ সকল বীজের অনুকূল, তাহারাই ঐ সকল পীড়া প্রাপ্ত হয়, এবং পরিণামে মারা যাইতে পারে। এ শ্রেণীর মৃত্যু দেহের অবস্থার উপর নির্ভর করে। আমরা পীতজ্বরে, দীর্ঘকালব্যাপী নিদ্রাবিহ্বলতায় (sleeping sickness) নিশ্চয় মারা যাই; কিন্তু আফ্রিকার নিগ্রেটো জাতি নিশ্চয় মারা যাইবেই, এমন কথা নাই। ব্যক্তিগত দৈহিক অবস্থাভেদ, এবং জাতিগত দৈহিক অবস্থাভেদ, এতদুভয় কারণেই কেহ অথবা কোনও জাতি এক প্রকার পীড়া সহ্য করিতে পারে, অপরে তাহা পারে না। ম্যালেরিয়াতে আমরা যত মরি, ইংরেজগণ তদপেক্ষা অনেক অধিকপরিমাণে মারা যায়। এ শ্রেণীর মৃত্যু ব্যক্তিগত, অথবা জাতিগত দৈহিক অবস্থার উপর নির্ভর করায়, ইহাকে বংশানুক্রমের অনুগত বলা যাইতে পারে। এই সকল পীড়ায় যাহারা মরে না, তাহাদিগের দেহ বংশানুক্রমে বিশেষভাবে গড়িয়া উঠে।

(৭) এ শব্দটি ব্যবহার করা সঙ্গত হইল না; তথাপি অর্থবোধে কাঠিন্য হইবে না।

বার্দ্ধক্যবশতঃ যে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়, তাহাও বংশানুক্রমের সহিত সংসৃষ্ট; অন্ততঃ অনেক স্থলে সংসৃষ্ট, এরূপ বলা যাইতে পারে। অকস্মাৎ মৃত্যু, অল্প বয়সেই হউক, অথবা অধিক বয়সেই হউক, অকস্মাৎ মৃত্যু বাদ দিলে, স্বাভাবিক মৃত্যু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বংশানুগত। কীট-জ পীড়া, স্বকৃত-অত্যাচারজনিত পীড়া, কিংবা পিতৃমাতৃ-অত্যাচারজনিত পীড়া, অথবা বিকলতা,—এ সকল কারণে যাহাদিগের মৃত্যু হয়, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে দেখা যায় যে, অপরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্ব্বপুরুষের আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়। আমি ৮।৯ বৎসর পূর্ব্বে একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলাম; দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি। তাহাতে ৫০।৬০ জন ব্যক্তির মৃত্যুর বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। যত দূর স্মরণ হয়, তাহাতে ঐ তালিকায় অধিকাংশ ব্যক্তিই বংশানুক্রমে প্রায় এক বয়সে মারা গিয়াছিলেন; এবং এক অথবা তুল্য রোগে মৃত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বিভিন্ন জীবের আয়ুস্কাল সম্বন্ধে যে প্রবাদ-(৮)-বাক্যটী লিখিয়াছি, তাহা হইতেও বুঝা যায় যে, ভিন্ন-ভিন্ন-জাতীয় জীবের ভিন্ন ভিন্ন আয়ুঃ মোটামুটি স্থির করা সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং সেই-জাতীয় ব্যক্তিগণেরও এক একটা মোটামুটি জীবিতকাল স্থির করা সম্ভব হইয়াছে। আয়ুঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতিগত অথবা বংশগত না হইলে, কোনও জাতীয় জীবেরই আয়ুস্কাল সম্বন্ধে প্রবাদ-বাক্য-রচনা করা সম্ভব হইত না। মৃত্যু, যাহা জীববিবর্ত্তনের ফল, তাহা জাতিগত অথবা বংশগত হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বার্দ্ধক্যজনিত যে মৃত্যু, তাহাই স্বাভাবিক মৃত্যু; পীড়ায় মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নহে, উহাকে অকস্মাৎ মৃত্যু বলা যাইতে পারে। বার্দ্ধক্যজনিত মৃত্যুতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমরা সচরাচর যাহাকে পীড়া বলি, তাহার কোনও সংস্রবই থাকে না। কোনও পীড়া নাই, অথচ বৃদ্ধ ক্রমে অবসন্ন হইতেছে; ইহাতে বৃদ্ধ অনেক সময় মৃত্যুকাল উপস্থিত হওয়া নিজে অনুভব করিতে সমর্থ হয়। অবশেষে সকলকে বলিয়া কহিয়া ঘুমাইয়া পড়িবার মত দেহত্যাগ করে। এ মৃত্যু এক দিনে হয় না; পূর্ণযৌবন গত হইবার সময় হইতেই ক্রমে কৌষিক বিকলতা উপস্থিত হয়; তাহা হইতে ক্রমে শারীরক্রিয়ার ক্ষীণতা ও অবসাদ; পরে কোষ সকলের ক্রিয়াহীনতা ও কোষসূত্রের কাঠিন্য, এবং ভঙ্গপ্রবণতা উপস্থিত হয়। এইরূপে ক্রমে শ্বাসযন্ত্র, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি অত্যাবশ্যক যন্ত্র সকল অবসন্ন ও নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়; তাহাকেই আমরা মৃত্যু বলি। কিন্তু তখনও প্রকৃত-

(৮) ২২ বলদা, ১৩ ছাগলা ইত্যাদি।

পক্ষে শরীর সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয় নাই। মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া আত্মীয় স্বগণ স্থির করিলেও, চিকিৎসকগণ মত দিলেও, দেখা যায় যে, নখ, কেশ ইত্যাদি বাড়িতে ক্ষান্ত হয় নাই। কিছুক্ষণ মৃতদেহ রাখিয়া দিলে নখ বাড়িতে, এবং শ্মশ্রু গজাইতে দেখা যায়। সুতরাং শারীরক্রিয়া তখনও আছে, বলিতে হইবে। তাহার পর, সম্পূর্ণ মৃত্যু হইলেও, যদি ঐ মৃতদেহ হইতে হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া লওয়া যায়, এবং যদি উহাকে লবণাক্ত জলের মধ্যে কিছুক্ষণ রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে ঐ নিষ্ক্রিয় হৃৎপিণ্ড পুনরায় ক্রিয়া করিতে থাকে; অর্থাৎ, ঐ হৃৎপিণ্ড জীবিত দেহে থাকা কালে যেরূপ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইত, তদ্রূপই হইতে থাকে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, (দৈহিক) মৃত্যু হইলেও যান্ত্রিক মৃত্যু না হইতে পারে। যেমন কৌষিক মৃত্যু হইলেও দৈহিক মৃত্যু না হইতে পারে, তেমনই দৈহিক মৃত্যু হইলেও কৌষিক মৃত্যু (তত্তৎ কালেই) না হইতে পারে; কারণ কোনও কোনও কোষসমষ্টি তখনও ক্রিয়াবান থাকিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকাল তাহা থাকে না। কিয়ৎপরেই ঐ ক্রিয়াশক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন ষোল আনা মৃত্যু হইল, ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

তবেই বুঝিলাম,

(১) স্বাভাবিক মৃত্যু জীব-বিবর্ত্তনের ফল।

(২) মৃত্যু দেহকোষের দুর্ব্বলতা ও ক্রিয়াক্ষীণতার ফল।

(৩) মৃত্যু কোষ সকলের দীর্ঘকালব্যাপী দুর্ব্বলতার ও ক্রিয়াক্ষীণতার ফল। উহা ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হয়; এক দিনে হয় না।

(৪) প্রধান দুইটি লক্ষণ সম্বন্ধে, মৃত্যু (sclerosis নামক) পীড়ার সহিত তুলনীয়। উহা দীর্ঘকালব্যাপিনী পীড়া। সম্প্রতি অচিকিৎস্য পীড়া।

আমরা প্রথমে যে দুইটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে স্মরণ করা আবশ্যক। (১) আয়ুঃ কিসের উপর নির্ভর করে? (২) শেষই বা হয় কেন? তৎপরে আমরা আর একটি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "বহুকোষ জীবকেও কি অমর অথবা অত্যন্ত দীর্ঘায়ুঃ করা যায়?" এ প্রশ্নও এক্ষণে স্মরণ করা আবশ্যক। উপরের আলোচনা হইতে এই কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব নহে, বরং সম্ভব হইতেছে। সে উত্তর পশ্চাৎ দিবার চেষ্টা করিব। *

শ্রীশশধর রায়।

* গত আষাঢ় সংখ্যায় ১৬১ পৃষ্ঠার যে চিত্রটি 'বাল্যের মস্তিষ্ক' বলিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা যৌবনের মস্তিষ্ক; এবং যে চিত্রটি 'যৌবনের মস্তিষ্ক' লেখা হইয়াছে, তাহা বাল্যের মস্তিষ্ক।

স্থাপত্য-শিল্প।

স্থাপত্যের অভ্যুদয় ও উন্নতির অনেকগুলি কারণের মধ্যে ধর্ম্ম অতিশয় কার্য্যকারী। ধর্ম্মজগতের ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে দেখা যায় যে, এক একটি ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে শিল্পের, বিশেষতঃ স্থাপত্য-শিল্পের নূতন ধারা বহিতে থাকে। এ ধারার গঙ্গোত্রীর সন্ধান সেই বহু পুরাতন জাতিসমূহের অন্ধতমসাচ্ছন্ন ইতিহাসে মিলিলেও, কোথাকার অদৃশ্য ও অজ্ঞেয় উৎস হইতে সেই ধারার বেগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের ও তৎসহিত বৌদ্ধসাম্রাজ্যের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে না যে, ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শিল্প ও সাহিত্যের কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইহাদের মূল ও ভিত্তি প্রাচীনতর ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা ও আদর্শের উপর স্থাপিত হইলেও, ইহাকে আমরা নিতান্ত অভিনব আকারে দেখি। এই অভিনব ভাব এমনই দৃষ্টিবিভ্রম উপস্থিত করে যে, আমরা ইহার পারম্পর্য্য-ধারাকে হারাইয়া ফেলি। য়ুরোপে স্থাপত্যের উপর ধর্ম্মের প্রভাব বুঝিতে হইলে, খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করা উচিত। কন্‌স্টান্‌টাইনের সময় পর্য্যন্ত খৃঃ ধর্ম্মের তেমন প্রচার হয় নাই, কিন্তু ৩১৩ অব্দে রোমসম্রাট কন্‌স্টান্‌টাইন্ যখন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তখন হইতেই ইহার বহুলপ্রচার হইতে লাগিল, এবং ইহা রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মস্বরূপ পরিগণিত হইল। এই সময় হইতেই আমরা প্রকৃত খৃষ্টীয় স্থাপত্যের অভ্যুদয় দেখি। ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা পুরাতন রোমক স্থাপত্যের মধ্যে দেখা যাইলেও, ইহাতে অনেক নব অঙ্গের যোজনা ও সমাবেশ, এবং নানাবিধ বর্ণসৌষ্ঠবের পরিচয় পাই। প্রাচীন ব্যাসিলিকার (Basilica) গঠনপ্রণালী অনুসরণ করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দিরগুলি নির্ম্মিত হইলেও, আমরা এই সকলে atrium বা বহিরঙ্গন, অনুতপ্তদিগের জন্য narthex, শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা করিবার জন্য ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবস্থা দেখি। অনুতাপ করা খৃষ্টধর্ম্মের বিশেষ অঙ্গ; সুতরাং অনুতপ্তের জন্য উপযোগী স্থানের বন্দোবস্ত অবশ্যম্ভাবী; নানাবিধ আচারানুষ্ঠান ও শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতির জন্য choirএর প্রয়োজন; হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া শুচিভাবে উপাসনায় যোগদান করিবার জন্য জলাধারের প্রয়োজন; এই জলাধার-স্থাপনের জন্য বহিরঙ্গনের বন্দোবস্ত; এই জন্য আমরা এই সকল পুরাতন খৃষ্টীয় মন্দিরের সম্মুখভাগে atrium বা অঙ্গনের ব্যবস্থা দেখি।

প্রাচীন খৃষ্টীয় যুগে Baptistery নামক আর এক প্রকার গৃহের পরিচয় পাই; খৃঃ ধর্ম্মে অভিষেক করিবার জন্য ইহার কল্পনা হইয়াছিল; ইহাও আবার রোমক সময়কার বৃত্তাকার মন্দির ও সমাধিহর্ম্ম্যের অনুকরণে নির্ম্মিত। এই baptisteryগুলির অঙ্গসংস্থান-কল্পনায় রোম্যান্‌দিগের বৃত্তাকার মন্দির হইতে বৈসাদৃশ্য দেখা যায়; রোমক মন্দিরের স্তম্ভের সহিত খৃষ্টীয় baptistery-গুলির স্তম্ভের তুলনা চলে না; তথাপি উভয়ের মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য যথেষ্ট বর্ত্তমান। আমরা দেখিলাম যে, খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুত্থানে রোমক স্থাপত্যের বিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। শুদ্ধ যে আকারগত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহা নহে; বর্ণগৌরব ও 'মোজেয়িক' প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কার-সম্পাদনে এক নূতন রীতির অভ্যুদয়ও দৃষ্ট হয়।

খৃঃ ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে স্থাপত্যের পরিবর্ত্তন-সাধনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কালক্রমে ক্রমশঃ খৃঃ ধর্ম্মের মধ্যে দুই শাখার আবির্ভাব হইল—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য। স্থূলতঃ বলিতে গেলে, প্রাচ্যশাখার লীলাক্ষেত্র কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌ল্‌ হইতে এসিয়ামাইনর পর্য্যন্ত। এই দুইটি শাখা-স্থাপনের কারণনির্ণয় করিতে হইলে আমরা দেখি যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে মতদ্বৈধই ইহার মূলে নিহিত। প্রাচ্য-শাখান্তর্গত খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করিতেন যে, আত্মা ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত; ইহা কখনই 'ঈশ্বরপুত্র' খৃষ্ট হইতে উদ্ভূত নহে। প্রতীচ্যেরা বিশ্বাস করিতেন যে, আত্মা ঈশ্বর ও তৎসহ তৎপুত্র খৃষ্ট হইতে উদ্ভূত নহে। এই মতদ্বৈধ খৃষ্ট-ধর্ম্মেতিহাসে Filioque controversy নামে কথিত; ইহা খৃষ্টীয় ধর্ম্মজগতে এক মহা বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল; ইহার সংঘর্ষে স্থাপত্য প্রভৃতি যাবতীয় শিল্পে পরিবর্ত্তনের সূচনা হইল। বাইজাণ্টাইন (Byzantine) স্থাপত্যে আমরা এই পরিবর্ত্তনের চরম পরিণতি দেখি। খৃষ্টীয় স্থাপত্যে আমরা এইবার 'ডোম' (Dome) বা গম্বুজের প্রথম পরিচয় পাই।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শিল্পে বা সাহিত্যে যখন নূতন ধারার প্রবর্ত্তনা দেখি, তখন অনুসন্ধান করিলে ইহার সহিত পুরাতন উৎসের যোগ দেখিতে পাই; নূতনে পুরাতনে সম্বন্ধ অনেকটা অবিচ্ছেদ্য; এই বাইজাণ্টাইন্‌ স্থাপত্যের কল্পনা ও নির্ম্মাণ-প্রণালীর মধ্যে আমরা প্রাচীন রোম্যান্‌ ও খৃষ্টান্‌ স্থাপত্যের বহুল নিদর্শন প্রাপ্ত হই; কিন্তু ইহা ভেদ করিয়া ইহার নিজমূর্ত্তি, আপনার যাহা নিজস্ব, তাহা দেখাইতে যেন সর্ব্বদা উৎসুক; বাইজাণ্টাইন্‌ স্থাপত্যের যাহা নিজস্ব, তাহা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংঘর্ষ হইতে উদ্ভূত; ইহার নিজস্ব কি,

তাহা বুঝিতে হইলে আমি খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত St. Sophiaর গির্জ্জার প্রতিকৃতি নিরীক্ষণ করিতে বলি। ইহার স্থাপনবিন্যাসে আমরা রোম্যান্ ও প্রাচীন খৃষ্টান পদ্ধতির পরিচয় পাইলেও, ইহার আকৃতিসম্পৎ ইহার নিজস্ব; এবং ইহার জন্যই St. Sophia চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ইহার মধ্যস্থ গম্বুজ ও তাহার দুই পার্শ্বস্থ অর্দ্ধ-গম্বুজ অতিশয় কৌশলের সহিত স্থাপিত করা হইয়াছে। ১০৭ ফিট্ আয়তনের চতুরস্র প্রকোষ্ঠের উপরের খিলান ও pendentiveএর সাহায্যে যে বিশাল গম্বুজের নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের উদ্রেক করে; এবং এই গম্বুজের পাদদেশে যে জানালা-শ্রেণী চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, ইহাতে ভিতরে আলোক-প্রবেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও, সৌন্দর্য্যের বিকাশে বিশেষ সহায়তা করে; পূর্ব্বে যে দুইটি অর্দ্ধ-গম্বুজের কথা বলিয়াছি, ইহাতে কেমন নির্ম্মাণকৌশল দৃষ্ট হয়; মধ্যস্থ গম্বুজটির সাম্যরক্ষা ব্যাপারে (equilibrium) ইহাদের বিশেষ প্রয়োজন। ভিতরের ভিত্তিগাত্র নানা বর্ণের মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা মণ্ডিত; গৃহতল নানা আকৃতির ও বর্ণের 'মোজেয়িক' দ্বারা শোভিত। শিল্পের ললামভূত স্তম্ভশ্রেণী মনে এক অনির্ব্বচনীয় বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক করে; এই স্তম্ভনির্ম্মাণ ও তাহার বিন্যাস বাইজাণ্টাইন্ স্থাপত্যের আর এক নিজস্ব।

যুরোপে খৃষ্টান মহান্ত ও মঠধারী সাধুরা সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় বিদ্যার সহিত স্থাপত্য-শিল্পের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন; ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহারাই যুরোপে স্থাপত্য-শিল্পের ধারাকে রক্ষা করিয়াছেন, এবং ইহার অনুশীলনকে ধর্ম্মশাস্ত্রচর্চ্চার অঙ্গীভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যুরোপে খৃষ্ট-ধর্ম্মাভ্যুদয় ও তৎসহ মঠধারী সন্ন্যাসীদিগের ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে আমরা দেখি যে, এই সন্ন্যাসীরা সমস্ত জ্ঞান, বিদ্যা, শিল্প আপনাদের করায়ত্ত রাখিয়া তাহার বিশেষ উৎকর্ষসাধন করিয়াছিলেন; তাঁহারা যাহা সাধিত করিয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয়। যুরোপ ব্যাপিয়া মঠগুলির শাখা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং কেন্দ্রস্থানীয় হিসাবে পোপের অধীনস্থ হইলেও, প্রত্যেক শাখার এক বিশেষত্ব ছিল। 'বেনেডিক্টাইন্' (Benedictine Order) ও "সিষ্টার্সিয়ান্" (Cistercian Order) শাখার মধ্যে এক হিসাবে সাম্য বর্ত্তমান থাকিলেও, ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিশিষ্টতা বর্ত্তমান। এই এক একটি শাখা স্থাপত্যে নানা বৈচিত্র্যের অবতারণা করেন; সেই বৈচিত্র্যময় স্থাপত্য একই রোমাণেস্ক্ (Romanesque) বিভাগের অন্তর্গত হইলেও,

তাহাদের স্থাপনবিন্যাস ও অঙ্গযোজনার মধ্যে এত পার্থক্য দৃষ্ট হয় যে, ইহাদিগকে একই বিভাগের বিভিন্ন অঙ্গস্বরূপ পরিগণিত করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে সিষ্টার্‌সিয়ান্ শাখার কথা উল্লেখ করিয়াছি; ইহার অন্তর্গত অনেক-গুলি গির্জ্জায় সাধারণতঃ-দৃষ্ট দালান বা Aisle দৃষ্ট হয় না, এবং Transept-গুলি ক্ষুদ্রায়তনের। ক্লুনিয়াক্ শাখার (Cluniac Order) অন্তর্গত গির্জ্জা-গুলিতে দুইটি করিয়া Transept বর্ত্তমান। এই প্রকার কত প্রকারের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় স্থাপত্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের ধারা প্রবাহিত করাইয়া ইহাকে রুদ্ধবেগ ও পঙ্কিল হইতে দেন নাই।

সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত য়ুরোপের পশ্চিম খণ্ডে স্থাপত্য গ্রীক্ ও রোমক আদর্শের উপর স্থাপিত ছিল; পূর্ব্বাংশে বাইজাণ্টাইন্ স্থাপত্য এসিয়ার আদর্শের সহিত মিশ্রণব্যাপার সংঘটিত করিয়াছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সম্রাট সার্লামন্ (Charlemagne) যখন জার্ম্মানীর বা সাক্‌সনীর অধিবাসী-দিগকে খৃঃ ধর্ম্ম গ্রহণ করাইলেন, তখন হইতেই স্থাপত্যের আদর্শেরও পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে লাগিল; এই পরিবর্ত্তনের মূল উপদেষ্টা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। তাঁহারা প্রচলিত পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না; প্রচলিত পদ্ধতিদ্বয়ের, অর্থাৎ গ্রীক ও রোম্যান্ মিশ্রণে, এক নব আদর্শের সৃষ্টি করিলেন। গ্রীকস্থাপত্যের অঙ্গবিন্যাসে কোনও জটিলতা নাই; কিন্তু রোম্যান্ গৃহগুলির ছাদ যেখানে খিলান-সংবদ্ধ, সেখানে অঙ্গবিন্যাস-ব্যাপারে যথেষ্ট জটিলতা বিদ্যমান; শুদ্ধ যে স্থাপনবিষয় দুরূহ ছিল, তাহা নহে; ইহাতে উপকরণের অনেক অপব্যয় ঘটিত, এবং অনেক প্রকারের যন্ত্রেরও প্রয়োজন ছিল। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রথম প্রথম ইহা সম্ভবপর ছিল না। সুবিধা ও অন্যান্য কারণে তাঁহারা পূর্ব্ব-কথিত ব্যাসিলিকার (Basilica) স্থাপনবিন্যাস গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার ছাদকে খিলান-সংবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইলেন, এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কি প্রকারে পূর্ব্বোক্ত রোমক জটিলতা হইতে অঙ্গবিন্যাস ব্যাপারকে বিমুক্ত করা যাইতে পারে। এই উপায়ের উদ্ভাবন করিতে গিয়া তাঁহাদিগকে তিন শতাব্দী ব্যাপিয়া ধীরে ধীরে অনেকগুলি পরীক্ষা করিতে হইল; তাহার ফলে, এক বৈচিত্র্যময়, অবিচ্ছিন্ন বহিঃ-ভিত্তিহীন ও তৎস্থলে খণ্ড খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন বহিঃ-বৰ্দ্ধিত স্তম্ভ বা Buttress-যুক্ত স্থাপত্যের উদ্ভব হইল।

এ স্থলে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য; জাগতিক সমস্ত ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা দেখি যে, প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি প্রতিক্রিয়া আছে, যাহার

পরিমাণ ক্রিয়ারই সমান। পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী সম্প্রদায় অতিশয় উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত শিল্পের উৎকর্ষসাধন করিতে লাগিলেন; কিন্তু মঠধারী সন্ন্যাসী হইলে কি হয়? মানবের প্রকৃতিগত দৌর্ব্বল্য হইতে রক্ষা পাওয়া বড় কঠিন; বিশেষ সাধনের প্রয়োজন। তাঁহারা শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে করিতে ইহাকে অস্থিহীন, মজ্জাহীন, মাংসপিণ্ডস্বরূপে পরিণত করিলেন; কালক্রমে ইঁহাদের নির্ম্মিত সৌধগুলি তত সুদৃঢ় হইল না; কিন্তু তাহাদের বহিঃগাত্র ও অভ্যন্তরদেশ নানাবিধ কারুকার্য্যে শোভিত হইতে লাগিল। ইহাতে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য ও গরিমা প্রকাশের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু স্থাপত্যের যাহা প্রাণ, তাহার তিরোধানের উপক্রম হইল। এই অবস্থায় সাধু বার্ণার্ড্ (St. Bernard) স্থাপত্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখিয়া মহা চিন্তিত হইলেন, এবং প্রতিক্রিয়ামূলক আদর্শের সৃষ্টি করিলেন। তিনি স্থাপত্য-সম্বন্ধীয় অঙ্গবিন্যাসে কঠিন বিধি-নিষেধের প্রবর্ত্তনা ও নির্ম্মাণবিষয় সুদৃঢ় করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহার মতে, অনাবশ্যক অংশ সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়; তিনি স্থাপত্যকে নিয়মের কঠোর নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া এক মহদুপকার সাধিত করিলেও, স্বাভাবিকতার বিলোপসাধন করিয়া এক অনিষ্টেরও সূচনা করিলেন।

য়ুরোপে এক্ষণে বৈশ্যবৃত্তি প্রবল হইলেও, সে সময় প্রকৃত ক্ষাত্রধর্ম্মের সম্মান ছিল; এবং সকলে সেই সম্মান আকাঙ্ক্ষা করিত; সুতরাং সে কালের মঠধারী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে ক্ষাত্রধর্ম্মের যে মিশ্রণ দৃষ্ট হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই; এই মিশ্রণের ফলে এক নব শাখার অভ্যুদয় হইয়াছিল; ইঁহারা ইতিহাসে Knights Templars নামে বিখ্যাত; ইঁহাদের জীবন অদ্ভুত ও উত্তেজনাময়ী কাহিনীতে পূর্ণ বলিয়া, ইঁহারা স্থাপত্যের উপর নিজ শাখার বৈচিত্র্য মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীরা নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া তথাকার স্থাপত্য, শিল্প প্রভৃতি দেখিয়া, তাহা হইতে নানা অংশ স্ব স্ব দেশে বা শাখান্তর্গত কেন্দ্রগুলিতে প্রতিষ্ঠা করিতেন; এইরূপে বৈচিত্র্যের অবতারণা হইত; উদাহরণস্বরূপ Knights Templarsদের কথাই উল্লেখ করিতেছি; ইঁহারা জেরুসালেমস্থ Holy Sepulchreর অনুযায়ী তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত গির্জ্জাগুলি বৃত্তাকারে নির্ম্মিত করিয়াছেন।

ধর্ম্ম যে স্থাপত্য-শিল্পের বিকাশে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল, তাহা

ভারতবর্ষের মন্দিরগুলি নিরীক্ষণ করিলেই বুঝা যায়। দাক্ষিণাত্যস্থ কাঞ্চী-নগরীর কথাই ধরা যাউক। কাঞ্চী দাক্ষিণাত্যের বারাণসীস্বরূপ, ইহাতে সর্ব্বধর্ম্মের মন্দিরায়তন দৃষ্ট হয়। ভারতের দক্ষিণাংশে শৈব-বৈষ্ণবে বা স্মার্ত্ত-বৈষ্ণবে বিষম বিরোধ; শৈবসম্প্রদায়াবলম্বীরা যেমনই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন, অমনই বৈষ্ণব সম্প্রদায় তদপেক্ষা অধিকতর মনোহর ও শিল্প-শ্রীযুক্ত মন্দির স্থাপন করিবার প্রয়াস করিলেন। আধ্যাত্মিকতা হিসাবে এ বিরোধ বাঞ্ছনীয় না হইলেও, শিল্পহিসাবে ইহার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। সঙ্ঘর্ষ ও বিক্ষোভ না হইলে কোনও কিছুতেই উন্নতি হয় না; শিল্পসম্বন্ধে এই নীতি অধিকতর প্রযোজ্য। শৈবে বৈষ্ণবে বিরোধ না থাকিলে, শিবকাঞ্চী অপেক্ষা অধিকতর মনোজ্ঞ বিষ্ণুকাঞ্চীর স্থাপন কখনই সম্ভবপর হইত না। কাঞ্চীস্থ প্রাচীন 'পল্লব' স্থাপত্য অনুশীলন করিলে আমরা দেখি যে, এ বিরোধ ছিল বলিয়াই কৈলাসনাথ মন্দির অপেক্ষা বৈকুণ্ঠ পেরুমলের মন্দিরে বৈচিত্র্য ও স্থাপনবিন্যাসের প্রকৃষ্টতর পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে প্রকৃষ্টতার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বলিবেন যে, বৈষ্ণব-স্থাপত্যে রাজানুগ্রহ অধিকতর বর্ষিত হইয়াছিল বলিয়াই ইহা অধিকতর সম্পৎশালী। দাক্ষিণাত্যের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন,তাঁহারা জানেন যে, তথাকার বৈষ্ণবদিগের ইতিহাসের একটা পারম্পর্য্যধারা আছে, যাহা তাঁহাদের মতে,কলি-যুগের বহু পূর্ব্ব হইতে প্রবাহিত। এই পারম্পর্য্যধারা 'আলোয়াড়' (ভক্ত) ও আচার্য্যগণের জীবন-কাহিনীতে সুরক্ষিত। এমনটি আর ভারতের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তামিল ভাষায় লিখিত আলোয়াড়দিগের 'দিব্যপ্রবন্ধ' এখনও বৈষ্ণবদিগের মন্দিরে মন্দিরে পঠিত হয়; তাঁহাদিগের ইহার প্রতি ভক্তি অসাধারণ। আমার বোধ হয়, সংস্কৃত-ভাষানিবদ্ধ বেদাদিশাস্ত্র অপেক্ষা ইহা অল্প আদরে গৃহীত হয় না।

রামানুজ, বেদান্তবেত্ত, লোকাচার্য্য, শ্রীশৈলেশ, বেদান্তদেশিক প্রভৃতি যে সমস্ত আচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়া সমস্ত দাক্ষিণাত্যের সমাজ ও ধর্ম্ম আলোড়িত করিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত 'আলোয়াড়'দিগের বহু প্রাচীন পারম্পর্য্য-ধারাকে সার্থক ও রক্ষা করিবারই ফল। দেশস্থ রাজা শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপরই অনুগ্রহ বর্ষণ করিতেন; বৈষ্ণবসমাজ সেই অনুগ্রহকে আপন অভীষ্টসাধনে নিয়োজিত করিতে জানিতেন; রাজানুগ্রহ যদি সামাজিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত সম্মিলিত হয়, তাহা হইলে যে প্রকারের

ফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, শুদ্ধ রাজানুগ্রহে ততটা আশা করা যায় না; ইহা আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের আলোচনা করিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি। পুনশ্চ, কাঞ্চীনগরীর নিকটবর্ত্তী বেগবতী নদীর অপর পার্শ্বস্থ তিরুপরুতি কুণ্ডম্ গ্রামের জৈনমন্দিরগুলি সন্দর্শন করিবার সময় আমি কয়েকটি অনুশাসন পাঠ করিয়া বিস্মিত হই। ইহাতে চোলরাজ কুলতুঙ্গচোলের সাহায্য-কথা ক্ষোদিত রহিয়াছে; উহার সন্নিকটে বিজয়নগর রাজ্যের প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব মহারায়ের এক অনুশাসন রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত হিন্দুনরপতিদিগের অনুশাসন বিষ্ণুকাঞ্চীর বরদরাজের মন্দিরে দেখিয়াছি; অথচ দুইটির অবস্থার মধ্যে বৈষম্য দৃষ্ট হয়; রাজানুগ্রহ সত্ত্বেও একটির তেমন শ্রীবৃদ্ধি দৃষ্ট হয় না। এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, চিদম্বরমস্থ শিবমন্দিরেও শ্রীকৃষ্ণদেব মহারায়ের অনুশাসন দেখিয়াছি; ইহার অনেক অংশ তাঁহার অনুগ্রহে নির্ম্মিত ও সংস্কৃত; কিন্তু বিষ্ণুকাঞ্চীস্থ বরদরাজ মন্দির ও এ মন্দিরে কত প্রভেদ। ইহা হইতে আমরা বুঝিলাম যে, বৈষ্ণবস্থাপত্যের উন্নতি রাজানুগ্রহের উপর ততটা নির্ভর করে নাই; ইহা তখনকার ধর্ম্মানুপ্রাণিত সমাজের নিকটই অধিকতর ঋণী।

পৃথিবীস্থ সর্ব্বদেশের মধ্যে ভারতবর্ষে স্থাপত্যশিল্পের উপর ধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; এই ধর্ম্মের প্রভাববশতঃই স্থাপত্যে এত বিধিনিষেধের ও নানাবিধ আচারানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তনা; ইহাতে অনেক কৃত্রিমতার সৃষ্টি হইয়াছে, স্বীকার করিলেও, এক হিসাবে ইহাই নানাবিধ অত্যাচারের মধ্যে ইহাকে রক্ষা করিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, য়ুরোপের মধ্যযুগেও সন্ন্যাসী সম্প্রদায় স্থাপত্যশিল্পকে ধর্ম্মবিধানে নিয়ন্ত্রিত করিয়াও ইহার চর্চ্চাকে ধর্ম্মানুশীলনের অঙ্গীভূত করিয়া ইহার ধারাকে অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ভারতে ইহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রের বিধান দ্বারা মন্দিরায়তন প্রভৃতির নির্ম্মাণে সাধারণের প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত করিতেন। সংহিতাগুলি পাঠ করিলে আমরা দেখি যে, এই নির্ম্মাণব্যাপারকে ধর্ম্মাচরণের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। যে দেবতার উদ্দেশে মন্দির নির্ম্মিত হইবে, নির্ম্মাতা সেই দেবতার জন্য নির্দ্দিষ্ট লোক প্রাপ্ত হইবেন। ইহা অপেক্ষা উত্তেজক আর কি হইতে পারে? যমসংহিতায় উল্লেখ আছে—

> কৃত্বা দেবালয়ং সর্ব্বং প্রতিষ্ঠাপ্য চ দেবতাম্।
> বিধায় বিধিবচ্চিত্রং তল্লোকং বিন্দতে ধ্রুবম্।

বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতিতে এইরূপ বচনের উল্লেখ দেখা যায়; পুরাণাদিতেও

এইরূপ বিধিব্যবস্থা আছে। ব্রাহ্মণ্য সমাজ চিরকালই দেবায়তন প্রভৃতির নির্ম্মাণবিষয়ে শাস্ত্র দ্বারা এইরূপ আদিষ্ট ও উত্তেজিত হইয়া আসিয়াছেন। সময়ে সময়ে যুগাচার্য্যেরা অবতীর্ণ হইয়া বিস্মৃত ও লুপ্তপ্রায় শাস্ত্রগুলির বচন ও উপদেশ-গুলির উদ্ধারসাধন করিয়া স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষবিধানের সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্র যৎসামান্য পাঠ করিয়া দেখিয়াছি যে, তিনি কত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়সহকারে পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন ও লুপ্তপ্রায় শাস্ত্র-বচনগুলির উদ্ধারসাধন করিয়া বিক্ষুব্ধ ও আচারানুষ্ঠানবিরত হিন্দুসমাজে মঠ, দেবায়তন প্রভৃতি নির্ম্মাণের কেমন উপদেশ দিয়া গিয়াছেন; তাঁহার মঠ-প্রতিষ্ঠাদিতত্ত্বম্, বাস্তযাগতত্ত্বম্ ও জলাশয়োৎসর্গতত্ত্বম্ এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। এইরূপ নানা কারণে হিন্দুস্থাপত্যের একটা পারম্পর্য্যধারা বরাবর রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। সেই জন্য বলিতেছিলাম যে, এ দেশে যেমনটি হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই। ইহাতে অনেক আবর্জ্জনা আসিয়া জুটিয়াছে বটে, এবং কৃত্রিমতার সৃষ্টি হইয়াছেও সত্য, কিন্তু মামুদগজ্‌নী, আলাদ্দীন, মালিককাফুর প্রভৃতির এত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও যে নির্ম্মাণপ্রবৃত্তির সমূল নাশ সাধিত হয় নাই, এই শাস্ত্রীয় উপদেশ ও বিধিবিধানই তজ্জন্য প্রশংসার্হ।

জীর্ণ ও ভগ্ন দেবায়তনগুলির সংস্কারের জন্যও শাস্ত্রকারেরা আদেশ দিয়া গিয়াছেন, এবং পাছে কেহ সংস্কার দ্বারা নির্ম্মাণসদৃশ-কর্ম্মজাত পুণ্যলাভ হইবে না, এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করেন, এবং এই কারণবশতঃ মন্দিরগুলি সংস্কারা-ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এই আশঙ্কা করিয়া, শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে, মন্দির-সংস্কার ও মন্দির-নির্ম্মাণে সমান ফল, সমান পুণ্য। ইহাও সামান্য উত্তেজক নহে। এই সম্বন্ধে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বিষ্ণুসংহিতা হইতে নিম্নলিখিত বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

"কূপারামতড়াগেষু দেবতায়তনেষু চ।
পুনঃ সংস্কারকর্ত্তা চ লভতে মৌলিকং ফলম্।"

এ স্থলে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। প্রস্তরে স্থাপত্যশিল্পের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ সাধিত হয়; কিন্তু ইহা ব্যয়সাধ্য বলিয়া পাছে অনেকে নিরস্ত হন, এই আশঙ্কা করিয়া শাস্ত্রকারেরা পুণ্যের কেমন একটা মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং এই ক্রমনির্দ্ধারণ দ্বারা প্রস্তরায়তন-নির্ম্মাণে কেমন উত্তেজনা করিয়াছেন। ধর্ম্মের এই আদেশ ও উত্তেজনায় আবিষ্ট হইয়া সকলেই দেবায়তন-নির্ম্মাণে মন দিলেন। কিন্তু একটি মহদনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল। আবাসস্থানীয় স্থাপত্যে

লোকের তত মনোযোগ রহিল না। প্রাসাদ প্রভৃতিতে নির্ম্মাণের উৎকর্ষসাধনে অবশ্য তেমন শৈথিল্য দেখা যায় নাই, কিন্তু সাধারণের আবাসস্থলে দেবায়তন-সদৃশ উন্নতি দেখা যায় না; আমরা ক্রমশঃ এই সব কথার আলোচনা করিব।

এখন যেমন যে সে লোক স্থপতি হইতে পারে, প্রাচীনকালে তদ্রূপ ছিল না। স্থাপত্যশাস্ত্র আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের অঙ্গীভূত বলিয়া স্থপতির বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হইত। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিরূপ ছাপ ধারণ করিলেও, সে শিক্ষার সামান্য অংশেরও উপযুক্ত নহি। সে শিক্ষায় সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ হওয়া চাই। "বাস্তুবিদ্যা"য় কথিত আছে যে, "স্থপতিঃ স্থাপনার্হঃ স্যাৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ"। স্থপতির গুণাগুণ সম্বন্ধে বাস্তুবিদ্যা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইল; ইহা হইতে বুঝা যায় যে, স্থপতিরা অবজ্ঞার পাত্র ছিলেন না, পরন্তু বিশেষ সম্মানার্হ ছিলেন।

"ন হীনাঙ্গোঽতিরিক্তাঙ্গো ধার্ম্মিকস্তু দয়াপরঃ।
অমাৎসর্য্যোঽনসূয়শ্চ তান্ত্রিকস্ত্বভিজাতবান্॥
গণিতজ্ঞঃ পুরাণজ্ঞ আনন্দাত্মাপ্যলুব্ধকঃ।
চিত্রজ্ঞঃ সর্ব্বদেশজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
অরোগী চাপ্রমাদী চ সপ্তব্যসনবর্জ্জিতঃ।
সুনামা দৃঢ়বন্ধুশ্চ বাস্তুবিদ্যাব্ধিপারগঃ॥" (১)

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলি হইতে বুঝা গেল যে, স্থপতি হইতে হইলে ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সপ্তব্যসনবর্জ্জিত, পুরাণজ্ঞ, অলুব্ধক প্রভৃতি হওয়া চাই। সুতরাং এ বিদ্যার চর্চ্চা যে ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ, ইহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি? "বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশ" গ্রন্থে (২) উল্লেখ আছে যে, স্বয়ং শিবশম্ভু কর্ত্তৃক প্রাচীন বাস্তুশাস্ত্র কথিত হইয়াছিল।

"যদুক্তং শম্ভুনা পূর্ব্বং বাস্তুশাস্ত্রম্ পুরাতনম্।"

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হইতে বুঝা গেল যে, ভারতবর্ষ স্থাপত্য বা বাস্তুবিদ্যা ধর্ম্মশাস্ত্রের অঙ্গীভূত ছিল, এবং এই কারণেই ইহা কত শতাব্দী ধরিয়া বিজাতীয় সঙ্ঘর্ষ ও তজ্জনিত বিক্ষোভে আপনার বিশেষত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

---

(১) বাস্তুবিদ্যায়াম্ সাধনকথনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।
শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত বাস্তুবিদ্যা (Trivandrum Sanskrit Series.)
(২) বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশ, প্রথম অধ্যায় (Benares Edition.)

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। আষাঢ়।—'প্রবাসী' 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে' হিন্দুসমাজের সহৃদয়তার বিরহে অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছেন, এবং তাহাদের 'হৃদয়হীনতা'র পরিচয় ছবিতে আঁকিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। হিন্দুসমাজের 'সহৃদয়তা'র সঙ্গে সম্পাদক রামানন্দ বাবুর ত বহুকাল বিচ্ছেদ হইয়াছে, তবে দেশের এই সঙ্কটকালে সে বিরহ সহসা উছলিয়া উঠিল কেন?—মার চেয়ে যে বেথুনী, তাহাকে আমাদের দেশে 'ডাইনী' বলে। 'প্রবাসী'র হিন্দুর ভাবনা, হিন্দু-সমাজ-সংস্কারের আগ্রহ, হিন্দুদের উদ্ধার করিবার জন্য আহার-নিদ্রা-ত্যাগ দেখিয়া সেই কথাই মনে পড়ে। হিন্দুর ভাবনা হিন্দুকে ভাবিতে দিলেই ভাল হয় না? শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নির্জ্জলা একাদশী' নামক যে উদ্ভট ছবিখানি আঁকিয়াছেন, 'প্রবাসী'র সহকারী সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মল্লিনাথের মত তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চারুবাবু লিখিয়াছেন,—"এই ছবিতে চিত্রকর "আমাদের হিন্দুদের" হৃদয়হীনতার ছবি আশ্চর্য্য রকম জোরালো ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।' রকমটা আশ্চর্য্য, তাহা আমরাও অস্বীকার করিব না। কারণ, ব্যাখ্যা সঙ্গে না থাকিলে 'বিশ্বের বিস্মিত চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে বাড়ীর অপর লোকদের ব্যবহার দেখছে'—এ তথ্য আমাদের অগোচর থাকিত। 'নির্জলা একাদশী' হিন্দুসমাজে আছে, এবং তাহা 'আমাদের হিন্দুদের' হৃদয়হীনতার পরিচায়কও না হইতে পারে, এমন নয়। কিন্তু এই ছবিখানিতে যে সহৃদয়তার পরিচয় পাইতেছি, তাহাও কি নিতান্ত তুচ্ছ? একাদশীর উপবাস কঠিন ও কঠোর, এবং বহু বাল-বিধবার পক্ষে অত্যন্ত অসহ্য, তাহা স্বীকার করিয়াও জিজ্ঞাসা করা যায়, ছবিখানিতে হিন্দুদিগকে গালি দেওয়া ছাড়া আর কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল? চারুবাবুর 'আমাদের হিন্দুদের হৃদয়হীনতা' কি কোনও সত্য বস্তু? কোনও হিন্দুর মনেই কি বেদনা-বোধ নাই? সধবাদিগকেও আমরা বার-ব্রতে ও তীর্থে দুই তিন দিন নিরম্বু উপবাস করিতে দেখিয়াছি। এ উপবাস ত শাস্ত্রের আদিষ্ট নয়, না করিলে প্রত্যবায় হয় না। বিধবার 'নির্জলা একাদশী' রঘুনন্দনের সৃষ্টি। বাঙ্গালার সকল অংশেও ইহার প্রভুত্ব নাই। রঘুনন্দনের আদেশ হিন্দুরা মানিয়া লইয়াছিলেন কেন? কোনও রাজা বা রাজাদেশ ত রঘুনন্দনের পৃষ্ঠপোষক ছিল না। যাহাদিগকে সামাজিক রীতি মানিয়া চলিতে হয়, অথবা যাহারা বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ প্রভৃতির মত সিংহবিক্রমে সামাজিক রীতি পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া, বিবেকের শাসন পালন করিতে পারে না, তাহারা যে ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকে, সেই ধর্ম্মের অনুগত ও আশ্রিত সকলেই—চারুবাবুর 'আমাদের হিন্দুদের' সকলেই হৃদয়হীন, এমন সিদ্ধান্ত কি কেবল সাধারণ, স্বভাবসিদ্ধ, সহজ হিন্দুবিদ্বেষের ফল নহে? সমাজকে বুঝাইয়া সমাজের সংস্কার করিতে হয়, তাহাকে বিক্ষুব্ধ করিয়া সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না।—'একাদশীর উপবাস' ভিন্ন এ দেশে কি আর কোনও মর্ম্মান্তিক কষ্ট নাই? যাঁহারা হিন্দুসমাজ-সংস্কারের জন্য এত ব্যগ্র, এবং 'হিন্দুদের হৃদয়হীনতা' দেখিয়া এত ক্ষুব্ধ, তাঁহাদের নিজেদের কি কোনও মর্ম্মান্তিক দুঃখ নাই? 'প্রবাসী' ও 'মডারণ

রিভিউ' পড়িলে মনে হয়, ইংরেজের কঠিন শৃঙ্খলে রামানন্দ বাবুর শ্রীচরণকমল অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছে। তাঁহার এই বেদনাবোধ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। কিন্তু এই শিকলী কাটিবার জন্ত তিনি 'লেখা' ছাড়া আর কি করিয়াছেন? বেদনাবোধ থাকিলেও, অনেক সময়ে, বেদনার কারণ দূর করিবার জন্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার অপেক্ষা করিতে হয়। দুধের মেয়েকে নির্জ্জলা একাদশী করিতে দেন বলিয়া বিধবার মা-বাপমাত্রই হৃদয়হীন, এবং তাঁহাদিগের হৃদয়-হীনতা এমন হৃদয়হীনভাবে আঁকিয়া সহৃদয়তার পরিচয় না দিলেই নয়, এমন কল্পনাও ত আমরা করিয়া উঠিতে পারি না। গগন বাবুদের ভাবটাই একটু মোগলাই। যোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলির ৫নং হিন্দু, ৬নং আদিব্রাহ্ম। দুই বাড়ীতে রক্তের যোগ আছে। যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই যদি মানুষ করিতে পারিত, তাহা হইলে, গগন বাবুকে সমাজের অপেক্ষা করিয়া 'ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি' নীতি অবলম্বন করিয়া, হংসের মত উভচর হইয়া হিন্দুধর্ম্মের স্থলে ও ব্রাহ্মধর্ম্মের জলে বিহার করিতে হইত না। ইহা লইয়া কোনও কাগজে একখানা ছবি দিলে ভাল দেখায় কি? মাসে দুই দিন দুই রাত্রি নির্জ্জলা উপবাস বালবিধবার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর; অত্যন্ত শোচনীয়; রক্তমাংসের শরীর লইয়া তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু তাহা কি এতই সাংঘাতিক? কোনও কোনও সমাজে অনেক মেয়ের বিবাহই হয় না। যদি কোনও হিন্দু একখানি ছবি আঁকে,—বাইশ বছরের 'থুব্ড়ো' মেয়ের চোখে ঘুম নাই, পাশের ঘরে মা তিন মাসের খুকীকে ঠাণ্ডা করিতেছেন, আর 'বিশ্বের বিস্মিত চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে' বাপ-মার 'ব্যবহার দেখ্‌ছে',—তাহা হইলে কি রকম হয়? হৃদয়হীনতা সকল সমাজেই থাকে, সকল সমাজেই আছে। হৃদয়হীন হইয়া কাহাকেও—সমাজকেও সহৃদয় করা যায় না। সহৃদয়তার সমাজকে সহৃদয় করিতে হয়। গগনবাবুর সামর্থ্য আছে। দেখিতেছি, বেদনাবোধও আছে। 'নির্জ্জলা একাদশী' তুলিবার জন্ত বিদ্যাসাগরের পথে চেষ্টা করুন না। স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশে তাঁহার জীবিতকালে বিধবার বিবাহ হয় নাই। দেবেন্দ্রবাবু স্বয়ং ব্রহ্মচর্য্যের পক্ষপাতী ছিলেন।—তিনি কি হৃদয়হীন ছিলেন? সর্ব্বশেষে প্রশ্ন এই, একখানি ছবিতে সমাজ চিরাচরিত প্রথা পরিত্যাগ করিবে, রামানন্দ বাবু, গগন বাবু ও চারুবাবু কি তাহা বিশ্বাস করেন? না, হিন্দুদিগকে গালি দিয়া যে সুখ, তাহারই জন্ত এতখানি কালী খরচ হইল? এই সঙ্কটকালে যাঁহারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুনে বাতাস দিতেছেন, তাঁহারাও অস্বীকার করিতে পারিবেন না,—হিন্দুদের হৃদয়ে কড়া পড়িয়া গিয়াছে। নির্জ্জলা একাদশীর দিন বিধবার মা-বাপ, আত্মীয় স্বজন উপবাস করে না, কেবল ইহাই তাহার প্রমাণ নহে। 'প্রবাসী'র অধিকাংশ লেখক হিন্দু; চিত্রকর হিন্দু; গ্রাহকের পনের আনা হিন্দু; বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রায় সকলেই হিন্দু; পাঠকের পৌনে ষোল আনা হিন্দু। অথচ, রামানন্দ বাবু 'বিধিমত প্রকারে' কয়েক বৎসর ধরিয়া হিন্দুর শ্রাদ্ধ করিয়া আসিতেছেন।

'যার শীল, যার নোড়া,
তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া'

যাহাকে বলে, তাহাই! হিন্দুরা হৃদয়হীন, তাই রক্ষা! নতুবা রামানন্দ বাবুর এ পেশা চলিত না।—সর্ব্বশেষে, রামানন্দ বাবুর, না চারুবাবুর—কাহার নিঃস্বার্থ হিন্দু-প্রেমের অধিক

প্রশংসা করিব ? রামানন্দ বাবু ত 'হিন্দুরা হৃদয়হীন' বলিয়া বহুদিন তাহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন। চারুবাবু কিন্তু এখনও তাহা পারিয়া উঠেন নাই ! তিনি দু' নৌকায় পা দিয়া ব্রাহ্মসমাজের ভড় হইতে হিন্দুসমাজের কিস্তিতে 'সহৃদয়তা' বোঝাই করিবার চেষ্টা করিতেছেন ! আশীর্ব্বাদ করি, নৌকা দু'খানা পাশাপাশি—কাছাকাছি থাকুক, বিসর্জ্জনের নৌকার মত দু'খানা দু' দিকে সরিয়া না যায় !—গগন বাবু এই ধরণের একখানা ছবি আঁকুন না ? 'বিবিধ প্রসঙ্গ' কাজের কথায় পূর্ণ। 'প্রবাসী' বাঙ্গালার পাঠক-সমাজে 'স্বরাজে'র মন্ত্র প্রচার করিতেছেন। আমরা 'গ্রামের উন্নতি' উদ্ধৃত করিলাম।—

'মহীশূরের প্রধান মন্ত্রী সার মোক্ষগুণ্ডম্ বিশ্বেশ্বরায়া একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, গ্রাম মানবসমাজের ক্ষুদ্রতম লোকসমষ্টি। উন্নতির চেষ্টা গ্রামেই আরব্ধ হওয়া উচিত। * * * (১) * * গ্রামে ২০০ লোক থাকিলে অন্ততঃ ২০টি বালকবালিকার ইস্কুলে যাওয়া চাই। কোনও গ্রামে বিদ্যালয় না থাকিলে নিকটবর্ত্তী গ্রামের পাঠশালায় তাহাদিগকে পাঠান উচিত। (২) গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক লোকদিগকে পড়িতে, লিখিতে ও হিসাব রাখিতে শিখাইবার জন্য বিদ্যালয় বা তদ্রূপ কোনও বন্দোবস্ত থাকা উচিত। (৩) গ্রামে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য বৎসরে কত উৎপন্ন হইতেছে, তাহার একটা মোটামুটি হিসাব প্রস্তুত করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে ধনোৎপাদন বিষয়ে গ্রামটির যথেষ্ট সামর্থ্য আছে কি না। যে গ্রামে বৎসরে মাথা-পিছু অন্যূন ৩৩ টাকার দ্রব্য উৎপন্ন বা প্রস্তুত হয় না, তাহার আর্থিক বা সাংসারিক অবস্থা নিরাপদ নহে। (৪) যে গ্রামে ৩০০ বা তাহার বেশী লোক আছে, তথায় নিজ নিজ কাজে শিক্ষাপ্রাপ্ত অন্ততঃ এক জন কামার ও এক জন ছুতার থাকা চাই। (৫) প্রত্যেক চাষী গৃহস্থের ব্যয়সংকুলনের জন্য চাষ ছাড়া আর কিছু আনুষঙ্গিক উপার্জ্জনের উপায় থাকা আবশ্যক। মোটামুটি বলিতে গেলে, এক এক গ্রামের, প্রতি ২৫০ জন পিছু, চাষ ছাড়া, কোনও একটি করিয়া শিল্প বা কারবার প্রচলিত থাকা চাই। যেমন কোথাও তাঁত চালান, কোথাও বাসন গড়া, কোথাও চামড়া কষ করা, ইত্যাদি। (৬) অজন্মার প্রতীকার-স্বরূপ, প্রত্যেক রায়তকে অন্ততঃ দু'বৎসরের খাইখরচের শস্য সঞ্চিত রাখিতে প্রবৃত্ত করা কর্ত্তব্য। ধন-উৎপাদন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ঋণ করিতে খুব নিষেধ করা উচিত।—শহরের সমুদয় অধিবাসীর অন্ততঃ শতকরা ১৫ জন শিক্ষাধীন থাকা উচিত। তাহার মধ্যে মোটামুটি প্রতি দুই শতে অন্ততঃ এক জন উচ্চ বিদ্যালয়ে, প্রতি পাঁচ শতে অন্ততঃ এক জন কলেজে, এবং প্রতি হাজারে অন্ততঃ এক জন উচ্চতর বৃত্তিশিক্ষালয়ে যাহাতে শিক্ষা পায়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।—এখন যেখানে যত শস্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহার দেড়গুণ উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য নয়।' শ্রীক্ষিতিমোহন সেনের 'ব্রাত্য' প্রবন্ধে 'ব্রাত্য' সম্বন্ধে অথর্ব্ববেদ হইতে অনেক উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। সেগুলির অনুবাদও আছে। ১৫ কাণ্ড, ১ অনু, ৩য় পর্য্যায়, ঐ ৫ম ও ৬ষ্ঠ পর্য্যায় প্রভৃতির সহিত লেখকের কল্পিত বা অনুমিত 'ব্রাত্যে'র সম্বন্ধ কি, লেখক তাহা বুঝাইয়া দিলে ভাল হইত। 'দুই তার' ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনূদিত 'আর্য্যজাতির মধ্যে জাতের অঙ্কুর' আমরা সংস্কারক ও গোঁড়া, উভয় সম্প্রদায়কেই পড়িতে বলি। আমাদের দেশে অনেককেই সমাজসংস্কারের জন্য

মুদ্গর লইয়া অগ্রসর হইতে দেখি। কিন্তু চিন্তাস্রোতে সমাজের সংস্থান ও পদ্ধতির বিশ্লেষণ ত দেখিতে পাই না। এক জন বিদেশী কত সূক্ষ্মভাবে আমাদের জাতির অঙ্কুরের স্বরূপ অন্বেষণ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত ও মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। শ্রীপরিমলকুমার ঘোষের 'শুক্তি' কবিতা নহে, কথার কারিগরী। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাংখ্যের মোট সিদ্ধান্ত' আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা আশপাশ—ফুটনোট উপভোগ করিতে পারি,—'মোট সিদ্ধান্ত' বহিবার শক্তি নাই। এই বয়সে আমাদের সাহিত্যের Grand Old Man দ্বিজেন্দ্রনাথ দেশবাসীকে কত দার্শনিক চিন্তা উপহার দিতেছেন! দ্বিজেন্দ্রনাথ জরাজীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিভার জরা নাই। শ্রান্তি সকলকে অভিভূত করে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের মনীষা তাহার অধৃষ্য! 'আলোচনা'য় দেখিতেছি, শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য, ৩৪।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, বাঙ্গালা সংক্ষিপ্ত-লিপি শিখিয়াছেন, যে কোনও বাঙ্গালা বক্তৃতা 'অনায়াসে বর্ণে বর্ণে লিপিবদ্ধ করিয়া দিতে' পারেন। ইনি উৎসাহলাভের যোগ্য। বাঙ্গালা বক্তৃতাগুলি মাঠে মারা যাইতেছে। মন্মথবাবু বলেন, ইঁহার মত আরও অনেকে বাঙ্গালা short hand শিখিয়াছেন। পুলিসের কর্ম্মচারীরা শেখেন, জানিতাম। বাহিরেও যখন ইঁহারা রহিয়াছেন, তখন বাঙ্গালীর সভায় বাঙ্গালা বক্তৃতার রিপোর্ট হইবে না কেন? শ্রীপরিমলকুমার ঘোষের 'মুক্তামালা' তাঁহার 'শুক্তি'র উত্তরপুরুষ। শ্রীযদুনাথ সরকারের 'প্রবাসী বাঙ্গালী ও বঙ্গসাহিত্যে'র উপদেশগুলি অমূল্য।—'যদি সাহিত্য-সেবা করিতে চাও তবে প্রথমে মানুষ হও, বীর হও, স্বাধীন-চেতা হও। শুধু ভোগ ও আরামের লালসা ত্যাগ করিলেই হইবে না, শুধু শ্রমশীল হইলেই চলিবে না, প্রকৃত সাহিত্য-সেবককে উন্নতমস্তক হইতে হইবে, চাটুকারের বৃত্তিকে পদাঘাত করিতে হইবে, অর্থলোভকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। * * * এই নির্ভীক সত্যসন্ধানীকে গৃহে, সমাজে, এমন কি, রাজদ্বারে অনেক অবিচার, অনেক অন্যায় লাঞ্ছনা, অনেক নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়। কিন্তু তিনি সে জন্য ভীত নহেন। তাঁহার দৃষ্টি জাতীয় জীবনের সুদূর ভবিষ্যতের প্রতি নিহিত। তিনি জানেন যে, ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে এক দিন তাঁহার দিন আসিবেই আসিবে, তখন হয় ত তিনি স্বর্গগত, কিন্তু তাঁহার আত্মা পৃথিবীতে তাঁহার গ্রন্থের রূপ ধারণ করিয়া বিরাজিত।'—'বাণীর মন্দিরে সাধকগণ শুধু এই তিনটি মন্ত্রই জপ করেন—

সত্যমেব জয়তে নানৃতং!
উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ!
শরীরং বা পাতয়েয়ম্ মন্ত্রং বা সাধয়েয়ম্!

এই মন্দিরে যেন মিথ্যাভাষী চাটুকারগণ, অর্থলোভী সত্যভীত পুণ্য-ভীরু কাপুরুষগণ, বিলাসী সাহিত্যসৌখীনগণ, সরস্বতীর নামাবলীতে গা ঢাকিয়া উপস্থিত না হয়। কারণ এটি নরপূজার মন্দির নহে।' সরযূ সেনের 'কোহিনূর' কবিতা হইতে পারিত, কিন্তু প্রহেলিকা হইয়া গিয়াছে। মাথার হাত দিয়া পাঠককে ভাবাইবার জন্যই যেন কবিতার সৃষ্টি!—'ভারতবর্ষের বায়স্কোপ' প্রবন্ধটি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্তের 'পাগলা'ও প্রহেলিকা বটে, কিন্তু ইহাতে একটা ভাবের আভাস আছে। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের 'চীনি' বহু তথ্যে পূর্ণ।

বানান দেখিয়াই বলা যায়—'চিনি চিনি গো তোমায় ওগো বিদেশিনী!'—চলিত বানান হইলে সকলে সহজে ও সুখে পড়িতে পারিত। কিন্তু এমন প্রবন্ধ কষ্ট করিয়াও পড়া উচিত। 'অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চড়্-চড়্ করে বটে, কিন্তু কানীর পেয়ারাতেও বীচি থাকে। শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষের 'প্রথম দাগ' একটি গল্প। অগত্যা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চন্দ্রের 'আমারি' চারি চরণে সম্পূর্ণ—কিন্তু সুন্দর। শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 'মহতের নিন্দা'য় দুই লাইনে দিব্য উপদেশ দিয়াছেন,—

> 'মহতের নিন্দা শুনি রেগো না হে কেউ,—
> বাঘেরই পিছনে সদা ডেকে থাকে ফেউ।'

মহৎ তাহা হইলে হইলেন—বাঘ! তা গৃহস্থকে সাবধান করিবার জন্য যদি ফেউ ডাকে, আর মহতের ভক্তরা না চটেন, ত মন্দ কি? এ রকা বন্দোবস্তে, আশা করি, কাহারও আপত্তি হইবে না। শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর 'সেকেল পণ্ডিত' গল্পটি চলনসই। 'দেশের কথা' বেশ হইয়াছে। 'আলোক-দূত' একখানি সুরঞ্জিত চিত্র। চারু-রচিত ব্যাখ্যায় প্রকাশ, এই চিত্রের নারী খোদ রাত্রি। মুখখানি অমাবস্যার রাত্রির মত 'গোমরা' বটে। এই অপরূপ মূর্ত্তি আলোর অপেক্ষা করিতেছে। অন্ধকারেই এই, আলো আসিবার পূর্ব্বেই আমরা মরিয়া পড়ি।

নারায়ণ। আষাঢ়।—'ধর্ম্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ' কে লিখিয়াছেন, তাহা প্রকাশ নাই। হেঁয়ালির সৃষ্টিকর্ত্তা রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ লেখক হেঁয়ালিচ্ছন্দে নিষ্পন্ন করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন,—'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ'। 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং' যেমন 'নিহিতং গুহায়াম্', তেমনই রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মপ্রচারের তত্ত্বও লেখকের বাগাড়ম্বরে, অপপ্রযুক্ত শব্দস্তূপে নিহিত—প্রচ্ছন্ন। ইহাই 'নারায়ণে'র নৈবেদ্যের চূড়ার সন্দেশ। ইহাতে অনেক নূতন ও সাংঘাতিক সিদ্ধান্ত আছে। উপসংহারের সিদ্ধান্ত এই যে, 'আদর্শ মানুষ যিনি, আদর্শ মনুষ্যত্বের সাধক যিনি, তিনি জগতের সমস্ত দ্বন্দ্বে গা ঢালিয়া দিয়া, জীবনের শত অসুন্দর ব্যাপারের কাদা-মাটীতে লিপ্ত হইয়া তাহারই মধ্য হইতে নিজের অন্তরে বাহিরের জগতে একটা উচ্চতর মহত্তর সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন সৃষ্টি করিয়া চলিবেন।' অবশ্য, ইহার সবটার মানে হয় না। যতটুকু অর্থ বুঝা যায়, তাহাই কি 'নারায়ণে'র creed? আদর্শ মনুষ্যত্বের সাধক বলিয়াই কি 'নারায়ণ' 'জীবনের শত অসুন্দর ব্যাপারের কাদা-মাটী' একচেটিয়া করিতেছেন? শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষের 'নিঝুম রাতে' পড়িয়া বুদ্ধি নিঝুম হইয়া গেল। 'নিঝুম রাতে আমার হাতে কাঁপে পরশ তার।' 'প্রতি অঙ্গ কাঁদে মোর প্রতি অঙ্গ লাগি' নয়। শুধু কবির হাতে তার পরশ কাঁপে! আবার, কবির 'নিঝুম চোখের আলোক বেয়ে তাহার অভিসার।' আশ্চর্য্য নয়? তাহার পর, তার মুখটি কবির দৈন্যে মাখা, তাহা আবার ঘোমটায় ঢাকা। কবির দৈন্যের ঘেরাটোপের উপর আবার ঘোমটা। সুতরাং, বক্তব্যটুকু ঢাকাই রহিয়া গেল। 'রাতে সিঁথে তারা আঁকা গলে মাণিক-হার।' 'সিঁথে' ছন্দের অনুরোধে 'সিঁথ' হইয়া গিয়াছে। 'সিঁথে'র সিঁথিই পরে। কিন্তু কবি মাণিক-হার পরাইয়া দিয়াছেন। ইনিও রবীন্দ্রনাথের মত বলিতে পারেন,—'জানই আমার সকল কাজে originality!' 'অসাড় আঁধার হৃদয়ে'র উপমা,—তার!

তাহাতে অনাহত গান ! নাদ—ব্রহ্ম ! সুতরাং এইখানে কাব্যে দার্শনিকতা, সুতরাং সাত্ত্বিকতা জমিয়া গেল। কবির 'বুকে মুখটি ঢাকি' এই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় জানোয়ার, জীব, অভিসারিকা, বা ঘটস্থ-কূট-চৈতন্য—যাহাই বলুন—'শ্বাসিয়া উঠে থাকি থাকি !' শ্বসিয়া নয়, 'শ্বাসিয়া'। অর্থাৎ, তাহার শ্বাস উপস্থিত। আবার—'নিবিড় তাহার কালো আঁখি ঘেরে চারি ধার।' কালো আঁখি 'নিবিড়' হইল ; সে আঁখি আবার চারি ধার—পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—ঘিরিয়া ফেলিল। আট লাইনে যিনি এত অঘটন ঘটাইতে পারেন, তিনি শুধু কবি নন,—অঘটন-ঘটন-পটীয়ানও বটে। শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল 'আদিরসে' উপনিষৎ, অলঙ্কার, দর্শন, বিজ্ঞান, কল্পনা ও অনুভূতি দিয়া আদি-রসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'সার্ব্বজনীন আনন্দধর্ম্ম-প্রভাবে জীবের প্রজনন-প্রয়াসেও আনন্দ আছে।' শুধু তাই নয়, নিশ্চয়ই বৃদ্ধবয়সে তাহার আলোচনা-প্রয়াসেও আনন্দ নিতান্ত অল্প নহে। বিপিনবাবু গভীর গবেষণাসহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—'ইন্দ্রিয়সুখের লালসায়, যেখানে নরনারী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেখানে এই আকর্ষণকে কাম কহে। এই কামও হেয় বস্তু নহে।' নিশ্চয়ই তাহা প্রেয়—কামায়ন, পড়িলে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। বিপিনবাবু শাস্ত্রদর্শী। নিশ্চয়ই অধিকার ও অধিকারী কাহাকে বলে, তাহা তাঁহার অবিদিত নাই। রসতত্ত্ব ও 'প্রজনন-লীলা' কি সর্ব্বজনপাঠ্য মাসিকের পৃষ্ঠায় এমন মুক্ত-ভাবে আলোচনা করিবার যোগ্য ? ইহাতে কি 'হিতে বিপরীত' হইবার সম্ভাবনা নাই ? রস—বিশেষতঃ এইরূপ গাঢ় আদিরস যদি দুনিয়ায় এই ভাবে গড়াইয়া যায়, তাহা হইলে 'নারায়ণে'র মন্দিরও একটু পিছল হইয়া উঠিবে না ? মেঘদূতের যক্ষের কামই বুঝি আষাঢ়ের 'নারায়ণে'র মূলমন্ত্র। শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'উত্তরাধিকারী' গল্পে দেখিতেছি, 'যে কাঠ খাবে, সে আঙ্গরা * * *।' আমরা বাদ দিলাম, লেখক ও সম্পাদক সে জন্য দায়ী নহেন। চিত্তবাবু অসঙ্কোচে যাহা দু'হাতে 'নারায়ণে'র গায়ে মাখাইতে পারেন, আমরা তাহা সাহিত্যে মাখাইতে পারি না। এখনও চন্দনে ও উক্ত বস্তুতে 'সম-জ্ঞান' হয় নাই। তার পর, 'চালুনী বলে ছুঁচ তোর—' দ্রব্যটিতে অরুচি নাই, তাহার ধ্বনিটি বাদ পড়িয়াছে। এমন পক্ষপাত ত 'নারায়ণে' শোভা পায় না। গল্পটি মন্দ নয়। শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের 'শ্রীমঙ্গলরসকারিকা' পড়িয়া আমরা পরম কৌতুক অনুভব করিয়াছি।

'যত ছিল নাড়া-বুনে, সব হলো কীর্ত্তনে ;
কাস্তে ভেঙ্গে গড়ালে কর্ত্তাল।'

নমুনা দেখুন।—'আমরা ইহার যে প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা ১২৮৫ সালে লিখিত ; সুতরাং ইহা শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। অতএব, মূলগ্রন্থ যে ইহারই কিছু পূর্ব্বে বা সমসময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে কোনও বাধা নাই।' তোমার পক্ষে বাধা থাকিতে পারে না, তাহা এক আঁচড়েই বুঝা যাইতেছে। নকলের 'কিছু পূর্ব্বে'ই বা 'সমসময়েই' যে আসল রচিত হয়, তাহা নলিনী পণ্ডিতের পূর্ব্বে কেহ জানিত না। রাজেন্দ্রলাল, ভাণ্ডারকর, হরপ্রসাদ, এমন কি সিল্‌ভ্যান লেভীও এ তত্ত্ব অবগত নন, তাহা আমরা হলপ্ করিয়া বলিতে পারি।—'এই আকারের ক চণ্ডি-(!)-দাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিতে দেখিতে পাওয়া যায়।' শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথি কি জগতে একখানিই আছে ? তাহার পর পণ্ডিত সহজিয়া-মতের

ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'এই সকল বিষয় * * * বর্ণন করিতে অক্ষম' বলিয়াই নলিনী উদ্ধার করিয়াছেন,—

'অতএব শুন ভাই পরকীয়া যজ।
রসিক হইয়া সবে পরকীয়া ভজ।'

এইটি 'নারায়ণে'র 'মটো' করিলে হয় না? শেষটা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপর অত্যাচার। এমন অনধিকার-চর্চ্চা সচরাচর দেখা যায় না। শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'মানস-বৃন্দাবন' বৈষ্ণব ভক্তগণের চিত্তবিনোদ করিবে। ইহা সেকালের ধরণে রচিত রূপক। উপভোগ্য। 'কমলের দুঃখে'র আর অন্ত নাই। 'প্রাণের সমস্ত আবেগ, মনের সকল কথা, হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য্য এক চুম্বনে নিঃশেষ হয়ে যায়', কিন্তু কমলের দুঃখ কিছুতেই শেষ হয় না! 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরে' দেখিতেছি, 'রাজনারায়ণ বাবু দুই নায়কের মধ্যে গৌরব ভাগাভাগি করিয়া দিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু আধুনিক চেষ্টা ইহাকে ডিঙ্গাইয়া প্রায় সমস্ত গৌরবটাকেই দেবেন্দ্রনাথের হস্তে তুলিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর।' এই অন্যায় দেখিয়া শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লাঠী-হস্তে পনীর ভাগ করিতে অগ্রসর। আশা করি, কিঞ্চিৎ গৌরব ওয়ারিসের জন্য অবশিষ্ট থাকিবে। কিন্তু কথা এই, এ গৌরব গেলেই কি দেবেন্দ্রনাথ নিঃস্ব হইয়া পড়িবেন? শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী 'অচিন পাখী'র গান ধরিয়া 'অচেনা পাখী'কে নারায়ণের মন্দিরে ছাড়িয়া দিয়াছেন। দেবকুমার ইতিমধ্যেই বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার আরম্ভ করিলেন? 'যৌবনে যোগিনী' হইলেন? এখনও যে 'এক ছাত রোদ'! ৪র্থ শ্লোকে দেখিতেছি—'মিনতি করে' জিগাই তোরে—' 'জিগাই' কি? শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'কোমলে কঠোর' উপভোগ্য। ইহাতে একটুও 'আঁশ্‌টে' গন্ধ নাই, এই জন্য এই সংখ্যায় যেন একটু থাপছাড়া হইয়াছে। 'একটি মোকর্দ্দমার রায়' বেশ হইয়াছে।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চল্‌তি ভাষা—বনাম সাধু ভাষা'র মামলায় ডিক্রী দিতেছেন,—'বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে কলিকাতায় চল্‌তি ভাষার title (স্বত্ব) সাব্যস্ত হইল, কিন্তু possession (দখল) আপাততঃ সাধু ভাষারই থাকিবে। সাধু ভাষাকে চল্‌তি ভাষা eject (উচ্ছেদ) করিতে পারিবে না। উভয় পক্ষ নিজ নিজ খরচা বহন করিবে।' —আমরা বলি, তথাস্তু। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী ব্যারিষ্টার, তিনি আপীল না করিয়া ছাড়িবেন কি? 'দুনিয়ায় দুদিন' শুনিলেই ভয় হয়, তবু অগ্রসর হইয়াছিলাম; কিন্তু সব ধোঁয়া! শ্রীজগদম্বা দেবী বলিয়াছেন,—'এ ধোঁয়া মিটলে তবে আমার নিষ্কৃতি।' শুধু তাঁহার নয়, আমাদেরও ঐ কথা। এক সঙ্গে দু' কথা মিলিয়া গেল, দেখ, যদি ফলে। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তে' একটিও নূতন কথা নাই। তবে অনেক 'কোটেসন' আছে। ইস্তক কাব্যপ্রকাশ, নাগাদ 'সারদামঙ্গল' ও 'পলাশীর যুদ্ধ।' তার পর মাইকেলের রচনার ত ছড়াছড়ি। ঠিক যেন 'কেট্‌-কেট্‌-গরম'। ঘি আছে, চিনি আছে, সুজী আছে, জল নাই। অর্থাৎ নিজের 'বস্তু' নাই। চিত্তরঞ্জন ত 'পার্ম্মানেণ্ট' সভাপতি হইয়াছেন। 'এগ্‌জামিনার' না হইয়াও কি ছাড়িবেন না?

পাঠান-যুগের একখানি সংস্কৃত প্রশস্তি।

দিল্লী মহানগরীতে সংস্থাপিত মিউজিয়ম বা সংগ্রহালয়ে পাঠান ও মোগল-যুগের অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন রক্ষিত আছে। পাঠান আমলের যে ছয়খানি শিলাফলক-লিপি তথায় সংরক্ষিত আছে, তন্মধ্যে চারিখানি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। দিল্লীর পাঠান সুলতানগণের রাজত্ব-সময়েও যে মুসলমান নরপতিগণের কীর্ত্তিকথা সংস্কৃত ভাষায় কীর্ত্তিত হইত, এই লিপিচতুষ্টয়ই তাহার একটি প্রধান প্রমাণ। এই শিলালিপিচতুষ্টয়ের প্রথমখানি পাঠান সম্রাট গিয়াসুদ্দীন বল্‌বানের সময়ের, দ্বিতীয়খানি খিলজী-বংশের জালালুদ্দীন ফীরোজ শাহের সময়ের, এবং তৃতীয় ও চতুর্থখানি মহম্মদ শাহ তোগ্‌লকের সময়ের লিপি। তন্মধ্যে বল্‌বানের সময়ের লিপিখানি অবলম্বন করিয়া, বিগত ৫ই আষাঢ় তারিখে "পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য-সমাজে"র এক মাসিক অধিবেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধে শিলালিপির পাঠ ও বঙ্গানুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে। প্রবন্ধটি "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" পত্রে যথা-সময়ে মুদ্রিত হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই শিলালিপিখানির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ, ইহাতে উল্লিখিত কয়েকটি ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের আলোচনা উপস্থাপিত হইতেছে।

এই প্রশস্তি-পাষাণ পঞ্জাবের রোহতক জেলার বোহর নামক গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা প্রথমতঃ দিল্লী সিটীর (Old Delhi) ১২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পালম-নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত একটি বাপী বা পুষ্করিণীর সহিত সম্পর্কিত ছিল। পাষাণখণ্ডের পূর্ব্ব অবস্থা প্রায় অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। সমগ্র লিপি ২২ পংক্তিতে সম্পূর্ণ। ইহাতে সংস্কৃত ভাষায় নানা ছন্দে বিরচিত ৩০টি শ্লোক আছে। কেবল লিপি-প্রারম্ভে গণপতি ও শিবের নমস্কার ও ২১ পংক্তিতে লিপির রচনা-কাল-বিজ্ঞাপক সন-তারিখ সংস্কৃত গদ্যে লিখিত হইয়াছে। লিপির সংস্কৃত অংশ ত্রয়োদশ-শতাব্দীর নাগরী অক্ষরে লিখিত; কিন্তু লিপির শেষ পংক্তির ও তৎপূর্ব্ব পংক্তির কতক অংশ স্থানীয় ভাষায় [সম্ভবতঃ তৎস্থানে প্রচলিত আধুনিক বাগরী ভাষার অনুরূপ কোনও ভাষায়] রচিত, এবং শারদা অক্ষরে লিখিত। লিপি-রচয়িতা কবি যোগীশ্বরের রচনা-রীতি মধ্যযুগের

সংস্কৃত-কাব্য-রচনা-রীতির তুল্য। লিপিতে যমক, অনুপ্রাস, শ্লেষ প্রভৃতি অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। এই পালম-লিপির শেষাংশে শারদা-অক্ষরের ব্যবহার দেখিয়া ডাক্তার ভোগেল লিখিয়াছিলেন যে, কেবল কাশ্মীরে ও পঞ্জাবের পার্ব্বত্য-প্রদেশেই যে এই অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহা নহে; ইহা পঞ্জাবের দক্ষিণে অবস্থিত সমতল ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হইত। সম্ভবতঃ কৃতবিদ্য-শ্রেণী নাগরী অক্ষরের ও জনসাধারণ শারদা অক্ষরের ব্যবহার করিতেন। এই জন্যই হয় ত, পালম-লিপির সংস্কৃত-অংশ নাগরীতে ও প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত অংশ শারদা-অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। লিপির সংস্কৃত অংশের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে প্রাদেশিক ভাষায় সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য লিখিত হইয়া থাকিবে।

পাঠান সুলতান গিয়াসুদ্দীন বল্‌বানের সময়ের দিল্লী ("ঢিল্লী") মহানগরীর "পুরপতি" উড্ঢর ঠক্কুর কর্ত্তৃক পালম্ব বা পালম গ্রামে একটি বাপী বা পুষ্করিণীর প্রতিষ্ঠার কথাই এই প্রশস্তির প্রধান কথা। প্রশস্তির ২৬, ২৭ ও ২৮ শ্লোকে এই পুষ্করিণী বা বাপিকার কথা বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে। তথাপি ডাক্তার ভোগেল কেন যে এই "বাপী" শব্দের ইংরেজিতে "well" শব্দ দ্বারা অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা চিন্তনীয়। উড্ঢরের পিতা হরিপাল "উচ্চাপুরী" নামক স্থানে বাস করিতেন বলিয়া লিপিতে উক্ত হইয়াছে। এই উচ্চাপুরী বর্ত্তমান সময়ে পঞ্জাবের বহাওয়ালপুর ষ্টেটের উচ্-নামক স্থান। ইহা এখন শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা ও সিন্ধুনদের সঙ্গমস্থল হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। কিন্তু প্রশস্তির ১৪ ও ১৬ শ্লোক হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, এই "উচ্চাপুরী" তখন (অর্থাৎ লিপি-সম্পাদন-কালে) এই নদ-নদী-সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত থাকিয়া স্বসৌন্দর্য্যে "সুরধুনী-তট-বাসিনী" অমরাপুরীকেও উপহাস করিত। উড্ঢরের পিতা হরিপালের বাসস্থান এই "উচ্চাপুরী"কে ডাক্তার ভোগেল কেন যে একটি গ্রাম মনে করিয়াছেন, তাহাও চিন্তনীয়। ত্রয়োদশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, উড্ঢর ঢিল্লীপুরের "পুরপতি" ছিলেন। ডাক্তার ভোগেল "পুরপতি" শব্দের কি অর্থ হইতে পারে, তাহা বলিতে পারেন নাই। এই শব্দে পুরাধিপ বা "City-Governor", অর্থাৎ নগর-শাসক বা নগর-রক্ষক হইতে পারে কি না, তাহাও বিবেচ্য। মনে হয়, সুলতান বল্‌বানের সময়ে উড্ঢর ঠক্কুরই দিল্লীর নগর-শাসক ছিলেন। নচেৎ, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করাইতে যাইয়া, ঠক্কুর মহাশয় কবি যোগীশ্বর দ্বারা এত প্রশস্ত প্রশস্তি রচনা করাইয়া লইয়া, তাহাতে সুলতানের গৌরব-কথা

এত প্রকৃষ্টভাবে লিখাইয়া লইবেন কেন, এবং তাহাতে দিল্লী বা ঢিল্লী নগরীর পূর্ব্ব ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থার কথা এত বিশদভাবে রচনা করাইবেন কেন? উড্ঢর-ঠক্কুর মহাদেবের ভক্ত ছিলেন ["ইন্দুকলাবতংস-চরণদ্বন্দ্বৈক-নিষ্ঠাত্মনে"]। তাই, নমস্কার-শ্লোক দুইটিতে "ভবতাপহর" হরের বন্দনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তৃতীয় হইতে পঞ্চম শ্লোকে দিল্লীর চতুর্দ্দিকে অবস্থিত ভূভাগের অর্থাৎ "হরিযান-ভূ" নামক প্রদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,—

"অভোজি তোমরৈরাদৌ চৌহানৈস্তদনন্তরং(ম্)।
হরিযানকভূরেষা শকেন্দ্রৈঃ শাস্যতেধুনা ॥ ৩ ॥
আদৌ সাহবদীনস্ততঃ পরং খু(খু)টুবদীন-ভূপালঃ।
জাতোথ সমুসদীন × পেরুজসাহির্ব্বিভুব ভূমিপতিঃ ॥ ৪ ॥
পশ্চাজ্জলালদীনস্তদনন্তরমজনি মোজদীন-নৃপঃ।
শ্রীমানালাবদীনো নৃপতিবরো নসরদীন-পৃথ্বীন্দ্রঃ ॥ ৫ ॥"

"এই হরিযান-ভূমি পূর্ব্বে তোমর-গণ কর্ত্তৃক, এবং তদনন্তর চৌহান-গণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। সম্প্রতি [লিপিসম্পাদন-কালে] ইহা শক-নরপতিগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে। সর্ব্বপ্রথম সাহবদীন [Shahabu-d-din Ghori, A. D. 1191-1205] রাজা ছিলেন; তৎপর ভূপাল খুটুবদীন [Qutbu-d-din Aibak, A. D. 1205-1210], তৎপর সমুসদীন [Shamsu-d-din Altimash, A. D. 1210-1235], এবং (তৎপর) পেরুজসাহি [Ruknu-d-din Firoz Shah, 1235-1236], ভূমিপতি হইয়াছিলেন। তাহার পর, জলালদীন [Jalalu-d-din Raziyya, 1236-1240], তৎপরে মোজদীন [Muizzu-d-din Bahram, A. D. 1239-1241] নরপতি হইয়াছিলেন। (তৎপরে) শ্রীমান নৃপতিশ্রেষ্ঠ আলাবদীন [Alau-d-din Mas'ud, A. D. 1241-1246] এবং তৎপরে পৃথ্বীন্দ্র নসরদীন [Nasiru-d-din Mahmud, A. D. 1246-1265] (রাজত্ব করেন)।"

ইতিহাসে দাস-বংশীয় বলিয়া প্রখ্যাত "শক" বা মুসলমান সুলতানগণের মধ্যে যে প্রথম আট জনের নাম এই শ্লোকত্রয়ে উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সুলতান রেজিয়া বেগমের [Sultan Raziyya] নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই প্রশস্তিতে সুলতানগণের নামগুলি সংস্কৃত আকারে অভিহিত হইয়াছে। ষষ্ঠ হইতে একাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত কবি লিপি-সম্পাদন-কালের পাঠান সুলতান

গয়াসদীনের [Ghiyasu-d-din Balbon, 1265-1287] সৌরাজ্য-গৌরব-কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। অষ্টম শ্লোকে এই সুলতান "হম্মীর" বা আমীর উপাধিযুক্ত অভিহিত হইয়াছেন; যথা, "শ্রীহম্মীর-গয়াসদীন-নৃপতিস্ সম্রাট্ সমুজ্জৃংভতে"। ষষ্ঠ শ্লোকের মর্ম্ম হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই সুলতানের রাজ্য পূর্ব্বদিকে গৌড়দেশ পর্য্যন্ত, পশ্চিমে গজ্জণ বা গজণী পর্য্যন্ত, এবং দক্ষিণে দ্রবিড়জনপদ ও সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্রাটের সৌরাজ্য-বিধানে সকল জনপদেই যে সুখশান্তি বিরাজ করিত, প্রজাবর্গও যে "অন্তঃসন্তোষপূর্ণ" ছিল, এবং অন্যান্য অনেক "ক্ষিতিপতি"ও যে তাঁহার সেবার জন্য রাজধানীতে গতায়াত করিতেন, তাহা এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তম শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই নরপতির সৈন্যের গতি প্রাচ্যদেশে গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত ও প্রতীচ্য-দেশে সিন্ধু-সমুদ্র-সঙ্গম পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। যথা—

"গংগাসাগরসংগমং প্রতিদিনং প্রাচ্যাং প্রতীচ্যামপি
স্নাতুং সিংধু-সমুদ্র-সংগমমহো যৎসৈন্যমাধাবতি।"

অষ্টম ও নবম শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, এই সুলতানের সেনা-তুরঙ্গের নিকট শত্রুসেনা অগ্রসর হইতে পারিত না, এবং অন্য দেশের নরপতিগণ তাঁহার প্রতাপাগ্নি সহ্য করিতে সমর্থ হইতেন না। গিয়াসুদ্দীনের অসামান্য রাজকীয় প্রভাবে সেই সময়ের অন্যান্য দেশের লোকেরা কিরূপ ভীত ও বিকম্পিত থাকিত, প্রশস্তির দশম শ্লোকে তাহার এক সজীব চিত্র সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। যথা,—

"যস্মিন্ দিগ্বিজয়-প্রয়াণকপরে গৌড়া নিরাডংবরা
অংধ্রা রংধ্র-পরায়ণা ভয়বশান্নিষ্কেলয় × কেরলাঃ।
কর্ণ [টা *] অপি কংদরাশ্রয়পরা ভ্রষ্টা মহারাষ্ট্রজা-
স্ত্যক্তোর্জ্জা × কিল গূর্জ্জরাঃ সমভবন্ লাটা × কিরাটা ইব।"

"যিনি দিগ্বিজয়প্রয়াণে বহির্গত হইলে পর, ভয়বশতঃ গৌড়ীয়গণ আড়ম্বর-রহিত হইত, অন্ধ্র দেশীয়গণ রন্ধ্র পরায়ণ হইত, কেরলগণ কেলিলীলা পরিত্যাগ করিত, কর্ণাটগণ কন্দরে আশ্রয় লইত, মহারাষ্ট্রীয়গণ পলায়ন-রত হইত, গূর্জ্জরগণ বল-শূন্য হইত, এবং লাটদেশীয়গণ কিরাততুল্য হইয়া পড়িত।"

একাদশ শ্লোকেও কবি সুলতানের সুশাসনের বর্ণনা করিয়াছেন। শত শত মহাপুরীর অধিপতি গিয়াসুদ্দীনের রাজধানীর নাম ছিল "ঢিল্লী-মহাপুরী"। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে এই মহাপুরীর বর্ণনা আছে। এই সময়ে ঢিল্লীর অপর নাম ছিল "যোগিনীপুর"। এই নগরীর "পুরপতি" ছিলেন উদ্ধার-

চিত্ত, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, দোষবিরহিত উড্ঢর-নামা সুকৃতী পুরুষ। বলা বাহুল্য যে, পৃথ্বীরাজের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া মোগল সম্রাট শাহ-জহানের সময় পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ে রাজধানী দিল্লী অনেক বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল; যথা, "কুইল রায় পিথোরা", "সিরি", "তোগ্‌লকাবাদ", "আদিলাবাদ", "সহানপন্না", "ফিরোজাবাদ", "পুরাণা কুইল", "সাহজহানাবাদ" ইত্যাদি।

তৎপর চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ শ্লোক পর্য্যন্ত, পূর্ব্বোল্লিখিত "উচ্চাপুরী"র বর্ণনা। তৎপরে চতুর্বিংশ শ্লোক পর্য্যন্ত কবি প্রশস্তির প্রশস্ত পুরুষ উড্ঢরের পিতৃ-মাতৃ-কুলের ও তাঁহার নিজ সন্ততির নামাদির বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপরে ২৫-২৬ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, পথশ্রান্ত পান্থজনের ক্লান্তিবিনোদনের জন্য উড্ঢর ঠক্কুর পালম্ব গ্রামের পূর্ব্বে ও কুসুম্ভপুরের পশ্চিমে তট-বৃক্ষ-পরিশোভিত এক অতি রমণীয় বাপী বা পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি যে ইতিপূর্ব্বে অনেক অনেক বিশালা ধর্ম্মশালা ও সত্রাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, ইঙ্গিতে এই শ্লোকগুলিতে তাহারও উল্লেখ আছে। এই স্থলে বলা যাইতে পারে যে, "ঠক্কুর" শব্দে সেই অঞ্চলের জমীদারকে বিজ্ঞাপিত করিত। ২৭-২৮ শ্লোকে বাপীর রমণীয়তা বর্ণিত হইয়াছে। ২৯শ শ্লোকে সপরিবার উড্ঢরের কুশলের জন্য স্বস্তিবাচন প্রদত্ত হইয়াছে। ৩০শ শ্লোকে প্রশস্তি-রচয়িতা কবি যোগীশ্বরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অবশেষে লিপির সন-তারিখ এইরূপে লিখিত আছে,—"সংবৎসরেস্মিন্ বৈক্রমাদিত্যে সংবৎ ১৩৩৭ শ্রাবণ বদি ১৩ বুধে"। ডাক্তার কিলহর্ণের মতে, এই তারিখ ১২৮০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন, অথবা ১২৮১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অগষ্ট। সর্ব্বশেষে স্থানীয় ভাষায়, শারদা অক্ষরে, লিপির সংস্কৃত অংশের তাৎপর্য্য লিখিত হইয়াছে।

তখনকার "ঢিল্লী" নগরী "হরিযান" ["Militory Memoirs of Mr. George Thomas" নামক গ্রন্থে "Hurrianah" নামে উল্লিখিত] প্রদেশে অবস্থিত ছিল। এই "হরিযান প্রদেশ" বর্ত্তমান হিস্‌সার ও তৎসন্নিহিত ভূভাগকে সূচিত করিত। সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত পাঠান-যুগের সংস্কৃত শিলা-লিপিচতুষ্টয়ে বর্ণিত "হরিযান" প্রদেশ বর্ত্তমান দিল্লীর চতুর্দ্দিগস্থ দেশ-বিভাগকেই সূচিত করে। কিন্তু এখন যে স্থানে দিল্লী-মহানগরী অবস্থিত, তাহা ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই হরিযান-প্রদেশেই সন্নিবিষ্ট ছিল কি না, তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। ভৌগোলিক নাম যে অনেক সময় পূর্ব্বসূচিত স্থান হইতে অন্যত্র সরিয়া পড়িয়াছে, এই প্রশস্তির "ঢিল্লী" বা "ঢিলী" [প্রাদেশিক ভাষায়

২১ পংক্তিতে "ঢিলী" বলিয়া উল্লিখিত] নামটি তাহার একতম উদাহরণ হইতে পারে। অদ্য পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীন লিপির মধ্যে "ঢিল্লী" নগরীর নাম এই প্রশস্তিতে সর্ব্বপ্রথম উল্লিখিত বলিয়া সম্প্রতি ধরা যাইতে পারে। প্রশস্তিতে পালম-গ্রামের নামও একবার সংস্কৃতে "পালম্ব" নামে (১৭ পংক্তিতে) এবং পরে আর একবার স্থানীয় ভাষায় "পালম"-নামে (২১ পংক্তিতে), অভিহিত হইয়াছে। এই স্থান Delhi বা Shah-Jehanabad হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত, এবং ইহা Rajputana-Malwa Railwayএর দিল্লী হইতে দ্বিতীয় ষ্টেশন। লিপির "কুসুন্তপুর" কোন্ স্থান, তাহা জানা যায় নাই।

এই স্থলে প্রশস্তিতে সংক্ষেপে বর্ণিত দুই একটি ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথার আলোচনা হইতে পারে। যত বার হিন্দু-সাম্রাজ্যের সংহতি-শক্তি শিথিল বা লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তত বারই ভারতবর্ষের কি উত্তরাপথে, কি দক্ষিণাপথে, স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের নরপতিগণ স্বস্ব-প্রধান হইয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-পরবশ হইয়া সাম্রাজ্যের অধঃপতনের কারণ হইয়াছিলেন। বাস্তবিকই হিন্দু-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের কারণ রাজগণের পরস্পরের অন্তর্বিদ্রোহ, এবং এই জন্যই বহিঃশত্রুর আক্রমণ-পথও পরিষ্কৃত হইত। ভারতীয় আর্য্যগণের শক্তিক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিজাতীয় শক-প্রভৃতির বংশোৎপন্ন রাজপুতজাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। খৃষ্টীয় নবম-শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজপুত-জাতীয় চৌহাণ-বংশের অধীনে আজমীর প্রদেশ শাসিত হইত, এবং মালবের পরমারগণ,গুজরাটের চৌরাগণ,মেওয়ারের গিহ্লটগণ ও বুন্দেলখণ্ড-অঞ্চলের চন্দেলগণ, সকলেই রাজপুত-জাতীয় ছিল। আলোচ্য শিলালিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে হরিযান-প্রদেশ প্রথমতঃ তোমরগণ ও পরে চৌহাণগণ শাসন করিয়াছিল। ইতিহাস-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, প্রায় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে অনঙ্গপাল-নামক তোমরবংশীয় এক রাজপুত-প্রধান শক-বিধ্বস্ত দিল্লীনগরীকে কেন্দ্র করিয়া একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তৎপরে এই বংশের প্রায় ১৯ জন নরপতি কোনও প্রকারে রাজ্য চালাইবার পর, দ্বাদশ শতাব্দীতে এই তোমরবংশেরই আর এক জন—অনঙ্গপাল-নামধারী শেষ নরপতি, আজমীরের চৌহাণবংশীয় বিশালদেব নামক নরপতি কর্ত্তৃক পরাজিত হন। এই যুদ্ধের ফলে দিল্লী-নগরী চৌহাণগণের হস্তগত হয়। তোমর-নরপতি অনঙ্গপাল বিজেতা বিশালদেবের পুত্র সোমেশ্বরকে কন্যাদানে বাধ্য হন। দিল্লীর তোমরপতি অনঙ্গপাল আজমীরের চৌহাণপতি বিশাল-

দেবের সহিত এইরূপ এক সন্ধিসর্ত্তেও আবদ্ধ হইলেন যে, এই বৈবাহিক-মিলন হইতে তোমর-রাজের যে দৌহিত্র জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই তোমর-শাসিত দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। এই দৌহিত্রই পৃথ্বী-বিশ্রুত পৃথ্বীরাজ। তিনি চৌহাণরাজের পৌত্ররূপে আজমীর, এবং তোমররাজের দৌহিত্ররূপে দিল্লী প্রাপ্ত হইয়া, যুক্তরাজ্য দিল্লী-আজমীরের অধিপতি হইলেন। চৌহাণপতি পৃথ্বীরাজ কিরূপে কান্যকুব্জাধিপতি রাঠোর জয়চন্দ্রের সহিত শত্রুতা করিয়া বিদেশীয় মুসলমানগণের আক্রমণের সহায়তা করিয়াছিলেন, ইতিহাস-পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। উভয় রাজপুতের পরস্পর-সংঘর্ষের ফলে, তাঁহাদের রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে, সমগ্র ভারতবর্ষই একরূপ শক বা মুসলমান বিজেতাদের হস্তগত হইয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, এই উভয় রাজপুত নরপতির এক সাধারণ শত্রু উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু উভয়ের মিলিত চেষ্টায় সেই সাধারণ-শত্রুর বিপক্ষতাচরণের শক্তি বা সঙ্কল্প, উভয়ের কাহারও ছিল না। এই শত্রু সাহবদ্দীন মহাম্মদ ঘোরী, অর্থাৎ পালম-লিপির চতুর্থ শ্লোকে উল্লিখিত "সাহবদীন" নামক পাঠান স্থলতান। এই শত্রু প্রথমতঃ একবার চৌহাণ-নরাধিপ পৃথ্বীরাজের সঙ্গে স্থাণ্বীশ্বর প্রাঙ্গণে যুদ্ধ করিয়া পরাভূত হন, কিন্তু সেই প্রাঙ্গণেই দ্বিতীয় যুদ্ধে চৌহাণপতি পরাজিত হইয়া বিজেতাদের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। এই যুদ্ধের ফলেই ভারতে পাঠান-সাম্রাজ্যের বা মুসলমান-সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। হিন্দুবিজেতা সাহবদ্দীনের পর কোন্ কোন্ পাঠান নরপতি দিল্লী হইতে সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, আলোচ্য লিপির ৪।৫ শ্লোকে আমরা তাঁহাদের নামোল্লেখ প্রাপ্ত হইয়াছি। সাহবদ্দীনের রাজ্যসময়েই গৌড়বঙ্গের শেষ হিন্দু-নরপতি লক্ষ্মণসেনের রাজ্যও সাহবদ্দীনের সেনাপতি কুতুবদ্দীনের সহায়ক বখ্‌তিয়ারের হস্তগত হয়। লিপিতে উল্লিখিত তৃতীয় নরপতি সমসুদ্দীন [Shamasu-d-din Altimash] বাঙ্গালায় এক বিদ্রোহ নিবারণ করেন। তিনি প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল স্থলতান-রূপে রাজত্ব করেন। এই নরপতির সময় হইতেই ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে মোগলগণ সময়ে সময়ে ভারত-আক্রমণের স্থচনা করিয়াছিল। কিন্তু লিপিতে উল্লিখিত অষ্টম স্থলতান নসরদ্দীন [Nasiru-d-din Mahmud] তদীয় প্রধান অমাত্যের সাহচর্য্যে মোগলগণের অত্যাচার হইতে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসিবর্গকে কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাঠান স্থলতানগণের মধ্যে এই নসরুদ্দীন তাঁহার সততা, সদাশয়তা, ধর্ম্মপরায়ণতা ও বিদ্যানুরাগের

জন্য প্রখ্যাত ছিলেন। তিনি রাজা হইয়াও ফকীরের মত কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধেই আখ্যান শ্রুত হয় যে, তিনি সামান্যরূপ আহারেই পরিতৃপ্ত থাকিতেন, এবং গ্রন্থ-প্রতিলেখ প্রস্তুত করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারাই তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি মনে করিতেন,—রাজা রাজকোষের অধিকারী নহেন—কেবল তাহার সংরক্ষকমাত্র। সুলতানের হইয়া, অধিকাংশ সময়ে তাঁহার ভগিনীপতি গিয়াসুদ্দীন বল্‌বানই রাজ্যশাসনকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। নসরুদ্দীন অনপত্য-অবস্থায় পরলোকে গমন করেন, এবং তৎপরে তাঁহার রাজ্য বল্‌বানের হস্তগত হয়। বল্‌বান ১২৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। পালম-লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, বল্‌বানের সময়ে ভারতের সর্ব্বত্রই সৌরাজ্য অনুভূত হইত; সকল জনপদের প্রজাবর্গই তাঁহার সুশাসন-ফলে অন্তঃসন্তুষ্ট ছিল। লিপিতে বল্‌বান-সম্বন্ধে বর্ণিত বিষয়ে অতিরিক্ত অতিশয়োক্তি আছে বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই। কারণ, ইতিহাস-পাঠেও জানা যায় যে, বাস্তবিকই বল্‌বানের প্রভাব অল্প ছিল না। ভারতে মুসলমান-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছায়, তিনি নানারূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। তুরুষ্ক দাসগণের আধিপত্য কমাইবার জন্য তাঁহাকে অনেক হত্যাকাণ্ডেও লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। দাসরাজপদ্ধতি দূর করিয়া বংশানুক্রমিক রাজত্বপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। নিজের প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত করিবার জন্য তিনি সৈন্য-সংস্কার করিয়াছিলেন। লিপিতেও তাঁহার সেনার উৎকর্ষ-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। গৌড়ীয়গণ তাঁহার অভিযান-ভয়ে ভীত হইয়া নিরাড়ম্বর বা নির্গর্ব্ব হইত, লিপির এই কথা পাঠ করিয়া বল্‌বানের সময়ের একটি ঘটনার কথার স্মরণ হয়। তিনি গৌড়ে তুগ্রল খাঁ কৃত বিদ্রোহের দমন করিয়া, তাঁহাকে নিহত করেন, এবং তৎপরে তাঁহার স্থলে নিজপুত্র বগ্‌রা খাঁকে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। এই সুলতান মেউয়াটের রাজপুতগণকে পরাভূত রাখিয়াছিলেন। মোগলগণের অত্যাচারে ও আক্রমণে মধ্য-এসিয়ার বিভিন্ন-জাতীয় নরপতিগণ লাঞ্ছিত হইয়া ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন; তাঁহাদের অনেককে সম্রাট্ বল্‌বান আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। অদম্য উৎসাহের ফলেই তিনি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মোগলগণের সহিত পঞ্জাবে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হত হইলে পর, সম্রাট্ স্বয়ং পুত্রশোকে ১২৮৭ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ

করেন। ইঁহার সময়েই প্রাচীন হিন্দুরাজধানী দিল্লী-নগরী মুসলমান-সভ্যতার কেন্দ্র হইয়াছিল। এই নগরীকে কবি কি মনে করিয়া ১২শ শ্লোকে "পাতাল-পুরীর দৈত্যনিলয়া" অর্থাৎ পাতালপুরীর ন্যায় দৈত্যগণের আশ্রয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বলা কঠিন। বল্‌বানের রাজ্যসময়ে মেঁউরাটের রাজপুতগণও এই নগরী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া উৎপাত করিত। তাহারাই কি দৈত্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে? মোগলগণও যে এই নগরীতে আসিয়া অত্যাচার উৎপাত না করিত, তাহাও বলা যায় না।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

বাঙ্গালার প্রাচীন মহাকাব্যের প্রকৃতি।

(১)

[সারঃ—মহাকাব্য—প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন মহাকাব্য—শ্রব্যকাব্য—প্রাচীন মহাকাব্য ও পঞ্চ-লক্ষণাত্মক পুরাণ—মহাকাব্যে দেশের ও দশের কথা—গান বা পালা—ভাষা ও ভাব—আখ্যান-বস্তু এবং Execution—বাস্তবস্তু ও আদর্শ-সৃষ্টি—বিশিষ্ট দেবদেবীর পূজা-প্রচলন—বিভিন্ন মহাকাব্য-শ্রেণী ও তাহাদের প্রতিপাদনীয় বিষয়—শ্রীকৃষ্ণচরিত ও পদাবলী সাহিত্য কেমন করিয়া এক অখণ্ড মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে—জাতীয় রক্ষণশীলতা ও সংস্কৃত সাহিত্যের নিকট বাঙ্গালা মহাকাব্যের ঋণ—স্বপ্নে প্রত্যাদেশ—বাঙ্গালা মহাকাব্য-কারগণের পুচ্ছগ্রাহিতা ও কাব্যবিষয়ের ক্রমবিকাশ—মহাকাব্য ও সাধনা—ভক্তিভাবের নিদর্শন—প্রাচীন মহাকাব্য ও কাব্যকলা—কাব্যকলাবিষয়ে ক্রটী—বর্ণনায়, চরিত্রচিত্রণে অদ্ভুত কৃতিত্ব—বাঙ্গালা জীবন এবং বাঙ্গালা মহাকাব্যের প্রভাব—বাঙ্গালার ইতিহাস ও প্রাচীন বাঙ্গালা মহাকাব্য—উপসংহার।]

অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সম্বন্ধ বড়ই ঘনিষ্ঠ। বর্ত্তমান, অতীতের গৌরব-ময় সত্তাকে আচ্ছন্ন করিলেও, তাহার পুণ্যস্মৃতি, উজ্জ্বল কীর্ত্তি, বা বিশাল শক্তিকে অবহেলা করিয়া দাঁড়াইতে পারে না; তাই মানবের আচারে বিচারে, আহারে বিহারে, অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে চিরনবীনতার অভিব্যক্তির অন্তরালে আমরা প্রাচীন শক্তির অঙ্গুলিসঙ্কেত লক্ষ্য করিতে পারি। মানবের যাহা সৃষ্টি, তাহা ঈশ্বরের সৃষ্টির ধারাকেই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। মানবের চিন্তা বিরাট্ আদ্যন্তহীন সমস্যায় আপনাকে হারাইবার প্রয়াস পায় নাই। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। প্রতীচীর জ্ঞান-গবেষণা, বিজ্ঞান দর্শন ও শিল্পকলার প্রভাবে প্রভাবান্বিত বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যও বুঝি এ চিরন্তন

বিধি লঙ্ঘন করিতে পারে নাই। অতুল-প্রতিভান্বিত বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা কবিও দেশ-'বনভবনে প্রচারিত জ্ঞান, ধর্ম্ম, কাব্য-কাহিনী'র মমতা মহিমা, গাম্ভীর্য্যগরিমা হইতে আপনাকে—আপনার চিন্তাশক্তিকে দূরে রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার সাধনা, তাঁহার বন্দনা-চ্ছন্দ এ দেশেরই জিনিস। তবে কালের অপ্রতিম শক্তি, রুচি ও রসের তারতম্যে ও শিক্ষাদীক্ষার বৈলক্ষণ্যে প্রাচীন নবীন আকার ধারণ করিয়াছে; কোথায়ও বা প্রাচীন অন্ধ, অজ্ঞান, দিশাহারা হইয়া কোথাকার নিভৃত কোণে আশ্রয় লইয়া গুমরিয়া মরিয়াছে। নবীন বিদেশী বঁধুর মত আসিয়া, হাসিয়া, উজ্জ্বল, উদাত্ত, গম্ভীর বেশে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাই রামপ্রসাদ, রজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথের আদি দেশের মধ্যেই মিলে—মধুসূদনের বা হেমচন্দ্রের চিন্তাশক্তির আদি উৎসের জন্য দেশান্তরে অন্বেষণ করিতে হয়। বুঝি বা প্রাচীন বাঙ্গালা মহাকাব্য-সাহিত্যের ভাবনদী অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত লোকলোচনান্তরালে আছে, শুধু ভবিষ্যতে বিমলোজ্জ্বল-ভাবে নব-শক্তিতে বহিবার জন্য।

সাহিত্য হইল শক্তির অভিব্যক্তি। সকল প্রকৃত জাতীয় সাহিত্যই এক হিসাবে যেমন সনাতন, যেমন তদ্দেশকালের দৃঢ় বন্ধনকে লঙ্ঘন করিয়া থাকে, অন্য হিসাবে তেমনই উহারা স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট, অর্থাৎ দেশ-কালের ভিতর দিয়া জাতির প্রকৃতির উপচয়-অপচয়ের, আচার-বিচারের, যোগ-বিয়োগের, এক কথায় যুগধর্ম্মিত্বের আভাস উহাদের মধ্য দিয়াই মিলিয়া থাকে। বাঙ্গালার প্রাচীন মহাকাব্যের সাহায্যে আমরা বাঙ্গালীর—কোনও বিশিষ্ট-সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালীর নহে—সারা জাতিটার যেরূপ চিত্র পাইয়া থাকি, সে চিত্র লইয়া জগতের দরবারে দেখাইতে গেলে আমাদের লজ্জায় বা ঘৃণায় নিতান্ত অবনত হইতে হয় না। আজ আমরা সভ্যজগতের দরবারে আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যের পশরা লইয়া গিয়া বড় আদর পাইয়াছি বলিয়া যেন আমরা অতীত সাহিত্যের শক্তি ও গুরুত্বের বিষয়ে সন্দিহান বা উদাসীন না হই। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে প্রকৃতিতে ও আকৃতিতে অনেকটা বিভিন্ন;—একের পক্ষে যাহা শক্তির পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, অন্যের পক্ষে তাহা নগণ্য বিশেষত্ব, একের পক্ষে যাহা দুর্ব্বলতা, অন্যের পক্ষে তাহা নিন্দনীয় না হইতে পারে। এক আসিয়া অন্যের স্থানে বসিয়াছে মাত্র—একই কার্য্য একই ভাবে করিতেছে কি না, ইহার বিবেচনাই সমালোচকের ও ঐতি-

লোকশিক্ষার আকর, দেশের ও দশের ভাবের দর্পণ মহাকাব্য কালবশে অন্তর্হিত। এখন তাহার স্থানপূরণ করিতে কত নবাগত বস্তু চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সে অভাব তেমন ভাবে পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না। নাটক, নভেল, সংবাদপত্র অনন্ত শক্তি লইয়া বিদেশ হইতে আসিয়াছে, কিন্তু এ দেশের চিন্তারাজ্যের অরাজকতার সহিত দ্বন্দ্বে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, অশান্তির স্থানে শান্তিস্থাপন করিতে পারিয়াছে বলিয়া, মনে হয় না। তাই মধ্যে মধ্যে চিন্তাশীল মনস্বিগণের পল্লীকবি কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাসের জন্য করুণ পরিদেবনা পাষাণকঠিন বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যকে ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠে; আর প্রাচীন কীটদষ্ট পুঁথির সঙ্কলয়িতা আপনার কঠোর পরিশ্রমকে ধন্য জ্ঞান করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। সত্যসত্যই বাঙ্গালা প্রাচীন মহাকাব্যের প্রকৃত প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যাহা গিয়াছে, তাহার মূল্য ও সারবত্তা কত অধিক। তে হি নো দিবসা গতাঃ—বাঙ্গালার সাহিত্যিক যে শক্তিকে কালের কঠোর বিধানে হারাইয়াছেন, তাহার পুনঃপ্রাপ্তির পক্ষে কত সাধনা, কত উদ্বোধনের প্রয়োজন।

সংস্কৃত সাহিত্যের পঞ্চলক্ষণাত্মক পুরাণের মত বাঙ্গালা মহাকাব্যগুলি দেশের লোকশিক্ষার চরম উপাদান ছিল। আদি কবি বাল্মীকির পুণ্যরামায়ণী কথা সম্বন্ধে আর্য্যকবি যে আশার আকাঙ্ক্ষার ভাব অভিব্যক্ত করিয়াছেন—

পাপান্ত্যাশ্চ পুনাতু বর্দ্ধয়তু চ শ্রেয়াংসি সেয়ং কথা
মঙ্গল্যা চ মনোহরা চ জগতো মাতেব গঙ্গেব চ।

প্রাচীন বাঙ্গালা মহাকবিগণের পুণ্যস্মৃতি, নিসর্গসুন্দর কাব্যকাহিনী তাহা অপেক্ষা ন্যূনশক্তির বা হীন আদরের দাবী করে নাই। সমাজের শ্রেয়ঃ, সমাজের মঙ্গল, সমাজের শক্তি, সমাজের জ্ঞান তাঁহাদেরই কাব্যে নিবদ্ধ, এবং তাঁহাদের কাব্যসমূহই আবার ঐ সকলের পরিমাণনির্দ্দেষ্টা। দেবদেবীর সহিত হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মসূত্র নিবদ্ধ ছিল। তাই বন্দনা বা বন্ধনা হইতেই সকল মহাকাব্যের আরম্ভ সূচিত হইয়াছে। জগৎসৃষ্টির সম্বন্ধে বৈদিক ঋষির ঋত ও সত্যের উদারতর চিন্তা সম্বন্ধে তখনকার কবির কাব্য দেশবাসীকে সহজভাবে সরল প্রণালীতে দার্শনিক যৎকিঞ্চিতের অবতারণা করিয়া শিক্ষা দিয়াছে। শ্রীচণ্ডীমঙ্গলের বা শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের সরলচিত্ত কৃষক শ্রোতৃগণ অল্পবিদ্য হইলেও,

আদি দেব নিরঞ্জন যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন পরম পুরুষ পুরাতন।
শূন্যতে করিয়া স্থিতি সৃজিলেন মহামতি সৃজনের উপায় কারণ॥

নাহি কেহ সহচর দেবতা অসুর নর সিদ্ধ নাগ চারণ কিন্নর।
নাহি তথা দিবানিশি না উদয় রবি শশী অন্ধকার আছে নিরন্তর॥ * * * * *
পৃথিবী পাতাল স্বর্গ নাহি সুরাসুরবর্গ দিবানিশি রবিশশী নাই।
নাহি জল জীবজন্তু বিষম প্রলয়ে কিন্তু এক প্রথা আছেন গোঁসাই॥
শূন্যভরে সনাতন মনে হলো ত্রিভুবন সৃজনপালন অভিলাষ।
কে বুঝিতে পারে মর্ম্ম আপনি হ'লেন ব্রহ্ম বিশ্ববীজে শরীর প্রকাশ॥
নবীন নীরদশ্যাম জিনি কত কোটী কাম রূপ অনুপম কত তাঁর।
জিনি কত কোটী ভানু অতিশয় শোভা জনু তনুরুচি খণ্ডে অন্ধকার॥

প্রভৃতি পালার বা গানের অংশ হইতে, সৃষ্টি সম্বন্ধে ধর্ম্মসংহিতাজ্ঞানবিদগ্ধ ব্যক্তিগণ যে তত্ত্বের মর্ম্ম গ্রহণ করিতেন, তাহার আভাস পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিত।* ধর্ম্মের মর্ম্ম, পুরাণের পুণ্য-কথা, সংসারের বৈষয়িক উপদেশ, সকলই তাহারা কবির গানের দ্বারা লাভ করিত। তাহাদেরও হৃদয়ের কথা সহৃদয় কবি নিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিতেন; সমবেত রাজশক্তি, পাত্রমিত্র সভাসদ্ তাহা হইতে শিক্ষা, দীক্ষা, লোকহিতৈষণার প্রেরণা পাইতেন। আজ কাল দৃশ্যকাব্যে যাহা ফুটাইবার চেষ্টা হয়, তখন শ্রব্যকাব্যে সে উদ্দেশ্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। কবির কাব্য দেশের ও দশের জিনিস। কাজেই তাহা প্রকাশ্য লোকসভায় গীত হইত। কবির কাব্য গায়ক-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সর্গ, অথবা চলিত কথায় পালা, দিনের পর দিন আসরে গীত হইত; শিষ্ট অশিষ্ট, রাজা প্রজা সকলে সাদরে আগ্রহসহকারে সে গান, সে পালা শ্রবণ করিয়া ধন্য হইতেন। গায়কের দল ধর্ম্মের নামে কবির কবিত্বের প্রসারকল্পে চেষ্টা করিত। তাহাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী কবির বিনয়ে সময়ে সময়ে বেশ মিলিয়া যাইত। কোনও কোনও এরূপ কবির apology বড়ই প্রাণস্পর্শী বলিয়া মনে হয়। চণ্ডীমঙ্গলের অন্যতম কবি মাধবাচার্য্যের গ্রন্থে পাই—

তাঁহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য। ভক্তিভরে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥
আমার আসরে যত অশুদ্ধ গায় গান। তার দোষ ক্ষমা কর, কর অবধান॥
শ্রুতি তালভঙ্গ (অঙ্গ) দোষ না নিবা আমার। তোমার চরণে মাগি এই পরিহার॥

শুধু বঙ্গসাহিত্যে কেন, পৃথিবীর যে কোনও জাতীয় সাহিত্যের মহাকাব্যসমূহে এই সরলে সুন্দরে, উজ্জ্বলে মধুরে মিলন লক্ষ্য করিয়া থাকি। এই

* বৌদ্ধযুগের পুঁথি রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ ধর্ম্মপূজাপদ্ধতির গ্রন্থ হইলেও, তাহাতে স্থানে স্থানে মহাকাব্য-প্রকৃতি ভরপুর (predominent); কাজেই প্রসঙ্গক্রমে সে রচনাতেও সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে বৌদ্ধ-মত-প্রকাশ দ্বারা সাধারণ শ্রোতার চিত্তবিনোদনের চেষ্টা লক্ষিত হয়।

সকল গ্রন্থে উদাত্ততা আছে, সঙ্গে সঙ্গে নৈসর্গিকতা আছে, শালীনতা আছে, কৌলীন্যও—(কাঞ্চনকৌলীন্য নহে)—আছে,—কল্পকলার সত্যসুন্দর লীলা আছে, বাস্তবতার তরল বিলাসও আছে। কিন্তু ভণ্ডামী নাই, উচ্ছ্বাসের উদ্দামতা নাই, নটনটীসুলভ বাচালতা ও কৃত্রিমতা নাই;—সে সমস্ত প্রকৃত সমাজের ছবি। সমাজের অবস্থাই কাব্যের বর্ণনীয় বস্তুর বিন্যাস-প্রণালী স্থির করিয়া দিয়াছে। Teutonic French Epicএর সমালোচনা প্রসঙ্গে এক জন সুপণ্ডিত ইংরেজ লেখক * বলেন—

"The form of society in an heroic age is aristocratic and magnificent. At the same time, this aristocracy differs from that of later and more specialised forms of civilisation. It does not make an insuperable difference between gentle and single. The heroic age cannot dress up ideas or sentiments to play the part of characters. If its characters are not men, there are nothing, not even thoughts or allegories ; they cannot go on talking unless they have something to do ; and so the whole business of life comes bodily into the epic poem."

প্রাচীন বাঙ্গালা মহাকাব্য সম্বন্ধে এই মন্তব্য কত সুন্দররূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। আর বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশালতা সার্ব্বজনীতা ও শক্তির হ্রাসের জন্য উদ্দাম ভাবুকতা ও উৎকট রূপকানুরাগ কত পরিমাণে দায়ী, তাহাও অনুধাবনের বিষয়। সাহিত্য আদর্শের সৃষ্টি ও পুষ্টি করিবে সত্য বটে, কিন্তু শুধু মায়াবাদীর কল্পিত ধাত্রীবর্ণিত বালকাখ্যায়িকার মত † ফাঁকা আদর্শের জাল বুনিয়া গেলে ফল হইবে কি? আদর্শ ও বাস্তবতার সুন্দর সমঞ্জস রস-ধারায় কাব্যকে অভিষিক্ত করিয়া লইতে হইবে; তবেই তাহা দেশের জিনিস, দশের উপভোগ্য হইতে পারিবে।

দেশের সাহিত্য দশের উপভোগ্য করিতে হইলে অলঙ্কার ও ভাষার পারি-পাট্যের দিকে দৃষ্টি কম রাখিয়া আখ্যানবস্তু (plot) ও সমাজচিত্রের প্রতি সাধারণের মনোযোগ অধিকপরিমাণে আকৃষ্ট করিতে হইবে। এই সাহিত্যিক সত্যের লঙ্ঘনে কবির লোকশিক্ষা-শক্তি খর্ব্ব হইয়া পড়ে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর এবং রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রভৃতিতে ভাব ছাড়িয়া ভাষায় লালিত্যের প্রয়াস, সমাজের দশের কথা ছাড়িয়া কতক অংশের ছায়া-প্রতিচ্ছায়ায় রসচটুলতার সৃষ্টি প্রভৃতি নানা কারণে বাঙ্গালার মহা-

* W. P. Ker—Epic and Romance—Everselly Erhon P. 7.

† পঞ্চদশী—১৩শ পরিচ্ছেদ।

কাব্য সাহিত্য আপনার বিশাল ব্যাপ্তি ও শক্তি হারাইতে বসিল; বিলাসপ্রিয় নৃপতিবৃন্দের ও তাঁহাদের চিত্তানুবর্ত্তী পারিষদ্‌গণের তুষ্টিসাধনই কবির লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে যে শক্তির ক্রিয়া দেখি, সেই ক্রিয়া এখানেও পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গালায় Popular Epic শনৈঃ শনৈঃ Court Epicএ পরিণত হইয়া আপনার মাহাত্ম্য হারাইতে বসিল। Execution (অভ্যাস-দণ্ডীর ভাষায় 'অমন্দ অভিযোগ') নৈসর্গিক প্রতিভার স্থলাভিষিক্ত হইয়াও প্রাচীন মহাকাব্যের প্রসার ও প্রচারের পথে কণ্টক আরোপিত হইল। সে স্রোতের গতি আর ফিরিল না, এখনও ফিরে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা কবিগণের মহাকাব্য, ভিন্ন পথে হইলেও, সেই এক লক্ষ্যের দিকে, সাধারণের উদ্দেশ্য হারাইয়া সম্প্রদায়বিশেষের মন যোগানর দিকেই ধাবিত হইয়াছে;—সরল কৃষকের ঘরকন্নার করুণ কথা, বিলাসী রাজার বাহাদুরীর ব্যঙ্গ-বিবরণী, বারভুঁয়া ষোল পাত্রের নিখিল ক্রিয়াকলাপ, দারিদ্র্যদগ্ধ প্রজার মর্ম্মবেদনা, (গোয়ালা সোমঘোষের করুণ কাহিনী), বিজ্ঞ রসিকের বিদগ্ধসুভাষিতাবলী, পক্ককেশ নীতিবিদের তরলচপল নীতি, এ সকলই বাঙ্গালার সাহিত্যদরবার হইতে বিদায় লইয়াছে। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের পরিবর্ত্তন কতক পরিমাণে ইহার কারণ হইলেও, সকল স্থলে এগুলির বিসর্জ্জন-বার্ত্তা আমাদের গৌরবের নহে;—অর্দ্ধ-বাস্তবের জগতে অর্দ্ধ-আদর্শজগতের যে উজ্জ্বল ছবি নয়ন মন ভরিয়া কবি ফুটাইয়া তুলিতেন,তাহা দূর জগতের Realism (বস্তুতত্ত্ব) ও আসন্নজগতের idealism (আদর্শতত্ত্ব) রূপ তুলিকায় অঙ্কিত বর্ত্তমান যুগের মহাকবিগণের নিত্যপরিবর্ত্তনশীল চিত্রসমূহে মিলে না। তখনকার চিত্রে একটা তৃপ্তি, একটা শান্তির উপাদান ছিল। এখনকার চিত্রে উন্মাদনা ও আকাঙ্ক্ষার বিকট প্রকাশ। একটীতে হৃদয়ের সহিত পূর্ণমাত্রায় পরিচয় হয়; অন্যটীতে অনেকাংশে মস্তিষ্কের ক্রিয়ার সাক্ষাৎ উপলব্ধি ঘটে। সেই শরের মত directly তন্ময়ভাবে হৃদয় বিদ্ধ করিবার প্রয়াস বর্ত্তমান যুগের মহাকাব্যে খুব অল্পই দেখা যায়।

সংস্কৃত সাহিত্যের পুরাণ গ্রন্থসমূহের সহিত সামঞ্জস্য আরও বিস্তৃত-ভাবে উল্লেখ করা চলে। সংস্কৃত পুরাণ যেমন সকল পৌরাণিক দেবদেবীর প্রতি ভক্তি জন্মাইলেও, বিশেষ কোনও এক দেবতার—ত্রিমূর্ত্তির কোনও এক বিশিষ্ট মূর্ত্তির প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তির প্রচার করিয়াছে, বাঙ্গালা মহাকাব্যও সেইরূপ ভাবে মধ্যযুগের প্রধানপর্য্যায়গণ্য দেবতাসমূহের উৎকর্ষখ্যাপন করিলেও,

কোনও এক বিশিষ্ট দেবতাকে (শিব, লক্ষ্মী, চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি) সাধনীয় ও অবলম্বনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। কোনও কোনও পুরাণে (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত) যেমন কোনও এক বিশিষ্ট দেবতার লীলার ব্যাখ্যা ও বিচার আছে, প্রাচীন বাঙ্গালার এক শ্রেণীর মহাকাব্যেও সেইরূপ কোনও এক সাধনার ধনের উপাসনা-তত্ত্ব নিহিত আছে। বিশিষ্ট-দেববিদ্বেষী পুরাণসমূহের মত বিশিষ্ট-দেববিদ্বেষী বাঙ্গালা মহাকাব্যও আছে। আপন দেবতার অদ্বিতীয় শক্তি-খ্যাপনে তাহারা নিত্য উন্মুখ। পদ্মাপুরাণের কবি মনসার সর্ব্বদেবাতিশায়ী মহিমার কথা কি সরল ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

মনসার ঘট যেবা করয়ে স্থাপন। তিন কুল হয় তার স্বর্গেতে গমন।

*   *   *   *

শ্রীপদ্মাপুরাণ পুঁথি থাকে যার ঘরে। গৃহদাহ নাহি হয় মনসার বরে॥—বিজয়গুপ্ত।

পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে পুরাণ-গ্রথন, লৌকিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও গৌরবের জন্য মহাকাব্য-রচনা। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে লোকাচারের যে ধর্ম্মমূলত্ব ও ধর্ম্মপ্রাণত্বের প্রকটন সম্পন্ন বা সম্ভব হইয়াছে, এই মহাকাব্যরচয়িতা কবিগণ তাহার কতক সহায়তা করিয়াছেন। শ্রুতি যেমন স্মৃতির মূল অবলম্বন, পৌরাণিক ধর্ম্মও সেইরূপ পরবর্ত্তী যুগে লৌকিক ধর্ম্মের অনন্ত শাখা-প্রশাখা-ক্রমে বিস্তারের মুখ্য অবলম্বন। স্মৃতির চর্চ্চাপ্রসঙ্গে যেমন শ্রুতির চর্চ্চা অতুলন সহায় হইয়াছিল, লৌকিক ধর্ম্মে বিস্তারের কার্য্যও পৌরাণিক ধর্ম্ম ও পৌরাণিক সংস্কৃত গ্রন্থ তেমনই আদরের ও আগ্রহের জিনিস হইয়াছিল। তাই চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি মহাকাব্যের পার্শ্বেই আমরা মূল রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের 'ভাষা' অনুবাদ পাইয়া থাকি। বস্তুতঃ সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যই বাঙ্গালার মহাকবিগণের আদর্শ ও মূলস্বরূপ ছিল বলিলে অসঙ্গত বলা হয় না।

অনুবাদ-গ্রন্থসমূহের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। সংস্কৃত কাব্যসমুদ্র হইতে ভাবরত্ন, ভক্তিশক্তি মন্থন করিয়াই বাঙ্গালার মহাকাব্য সাহিত্য ধন্য হইয়াছে। বৈষ্ণব সাধকের পদাবলী সাহিত্য এক কৃষ্ণমঙ্গল মহাকাব্য * ব্যতীত আর কি? পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মিলন, বিহার, প্রেমবৈচিত্র্য, রসোদ্গার, বিরহ, পুনর্ম্মিলন প্রভৃতি বিভিন্ন পালার ভিতর দিয়া বিরাট্

* পদকল্পতরু, পদসমুদ্র প্রভৃতি কোষকাব্য হইতে (বিভিন্ন পদাবলী-রচয়িতার পদসমূহে যে মহাকাব্যের বীজ ও চরিত্র বর্ত্তমান) তাহা স্পষ্ট প্রতিভাত হইবে।

পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের এক ভক্তিচিত্র, সাধনা রাজ্যের মহিমময়ী মানসী প্রতিমা, বিশ্বপ্রেমের অফুরন্ত ভাণ্ডার, ললিত মধুর ভাষায় অমলোজ্জ্বল ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নবদ্বীপচন্দ্র প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহাকাব্য-চরিত সমূহেই বল, মনসামঙ্গলে, চণ্ডীকাব্যে, শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে, শীতলামঙ্গলেই বল, সকল কাব্যেই শব্দে, ভাবে, উপাখ্যানে সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বার হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া, সংস্কৃত শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, কবিগণ আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতী বাঙ্গালা ভাষা যেমন ভব্য-সংস্কৃত-বেশ-পরিধানেই অভ্যস্ত ছিল, তেমনই এই সকল প্রাচীন মহাকবিগণের ভাবাবলী সংস্কৃতগর্ভ হইয়াই নিতান্ত মহিমময়ী হইত। কাব্যকলার দিক্ দিয়া এ অনুকরণের একটা মাত্রা, একটা সীমানির্দ্দেশ থাকা বাঞ্ছনীয় বটে; কিন্তু প্রাচীন কবি কখনও কখনও এ বিষয়ে সকল গণ্ডী অতিক্রম করিয়া মুক্তহস্তে দেবভাষার প্রাপ্য দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। পৌরাণিকের অবতার-বাদ বাঙ্গালা মহাকাব্যরচয়িতার নিকট নবভাবে জাগ্রত হইলেও, পুরাতনের গন্ধ তাহাতে আছে। বাঙ্গালা মহাকাব্য-সমূহের নায়কনায়িকাগণ প্রধানতঃ শাপগ্রস্ত স্বর্গভ্রষ্ট দেব, অপ্সরা, কিন্নর;— সাধনার কাব্যে (ভক্তি-কাব্যে) তাঁহারা স্বয়ং ভগবান্, বা তাঁহারই ঈশ্বর। কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান্ স্বয়ং—আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পতিতপাবন দয়াল ঠাকুর তাঁহারাই পরম প্রেমের চরম অবতার। যেখানে কাব্যকাহিনীর আখ্যানবস্তুতে ঐতিহাসিক ধারার (historical element) সত্তা আছে, সেখানেও কবি (উদাহরণ—শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্য) অতিপ্রাকৃত দিব্য শক্তির অবতারণা করিয়া বর্ণনীয় বিষয়ের গাম্ভীর্য্য ও স্বকীয় দেবভক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। প্রাচীন মহাকাব্যের প্রকৃতিনির্ণয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের নিকট তাহার ঋণ, অবশ্য উল্লেখযোগ্য কথা;—ইহাকে জাতীয় রক্ষণশীলতার (conservatism) দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। মূল সংস্কৃত মহাকাব্যের আলঙ্কারিক-প্রদত্ত লক্ষণেও এই রক্ষণশীলতার অংশ বিচক্ষণ কাব্যালোচকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকিবে।

শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের নিকট কেন, প্রত্যেক কবি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবি-গণের রচনা হইতে অবাধে যথেচ্ছ সাহায্য পাইয়াছেন। উপাখ্যানভাগের শিল্পকলায়, ঘটনাবিন্যাসে প্রায়ই পরবর্ত্তী কবিগণ পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের প্রদর্শিত পথে চলিয়া তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। কোনও বিশিষ্ট লৌকিক

পরিপাটী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার শ্রীচণ্ডীকাব্যে বলরাম, মাধবাচার্য্য প্রভৃতির সাধনার উপাদানের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র, শঙ্কর প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী কবির পালার অনুসরণেই কবি রামেশ্বরের 'শিবায়ন' রচিত হইয়াছে। কাণা হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি কত কর্ম্মিগণের পুঞ্জীভূত চেষ্টার ফল লইয়া কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ তাঁহাদের মনসার পালা বাঁধিয়াছেন। রামাইপণ্ডিত, ময়ূরভট্ট, মাণিক গাঙ্গুলী, খেলারাম, রূপরাম, সীতারাম প্রভৃতিরই মালমশলা কবিরত্ন ঘনরামের শ্রীশ্রীধর্ম্মমঙ্গলে সযত্নে বিন্যস্ত হইয়াছে। ইংরেজী বা সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ পুচ্ছগ্রাহিতা মিলে না—এবং তাহার কারণ এই,—ইংরেজী বা সংস্কৃত সাহিত্যে কোনও মহাকাব্য স্পষ্টরূপে কোনও বিশিষ্ট লৌকিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দেবতা বা তাহার কীর্ত্তিকলাপ লইয়া রচিত নহে।—এই পুচ্ছগ্রাহিতার ফলে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দৃঢ়ত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে;—দেবতা যুগে যুগে এই ভাবের কবিসম্প্রদায়কে পাইয়া তাহার উপর আপনার কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছেন।

আর এরূপ না করিয়াও কবিগণের গত্যন্তর ছিল না। কবিগণেরই কাব্যে পাইয়া থাকি, দেবতা তাঁহাদের শরণাপন্ন হইয়া পড়েন, স্বপ্নে তাঁহারা অভীষ্ট দেবতাবিষয়ক মহাকাব্য রচনা করিতে প্রত্যাদিষ্ট হন। এই প্রত্যাদেশের দোহাইএর কথা বিভিন্ন লৌকিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাহিত্যিক প্রবর্ত্তকগণ সকলেই স্বীকার করেন। কেবল বৈষ্ণব কবি শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিচিত্র-পদাবলীতে বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরিত-মহাকাব্যে এরূপ কোনও প্রত্যাদেশের উল্লেখ নাই। স্বনামধন্য কবিকুলাগ্রগণ্য কবিকঙ্কণ কি বলিতেছেন, শুনুন :—

শুন ভাই সভাজন, কবিত্বের বিবরণ এই গীতি হইল যেমতে।
উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়রদেশে চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে ॥

* * * * *

ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা গেনু সেইখানে চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥
করিয়া পরম দয়া দিয়া চরণের ছায়া আজ্ঞা দিল করিতে সঙ্গীত।
করে লয়ে পত্রমসী আপনি কলমে বসি নানাছন্দে লিখিল কবিত্ব ॥

মনসার ভাসানের রচয়িতা বিজয়গুপ্তের প্রত্যাদেশ-কথা বা স্বপ্নকথা আরও কৌতূহলপ্রদ। তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করা যাউক—

শ্রাবণ মাসের রবিবারে মনসাপঞ্চমী। দ্বিতীয় প্রহর রাতি নিদ্রা যায় স্বামী ॥
নিদ্রায় ব্যাকুল লোকে না জাগে এক জন। হেনকালে বিজয়গুপ্ত দেখিল স্বপন ॥

* * * * *

গা তোলো রে আরে পুত্র কত নিদ্রা যাও। শিয়রে মনসা তোমার চক্ষু মেলি চাও॥
আজ্‌ নিশি অবসানে এড়িয়া বসন। গীতছন্দে রচ কিছু আমার স্তবন।
মনে কিছু না ভাবিও মুই দিলাম বর। না বুঝিয়া বল যদি হবে মিত্রাক্ষর॥

সত্যসত্যই তখন দেবদেবীর উপর দৃঢ় বিশ্বাস এইরূপই ছিল। দেবতার প্রত্যাদেশ লঙ্ঘন করা কঠোর প্রত্যবায় বলিয়া গণিত হইত। মধ্যযুগের বঙ্গদেশের, অথবা বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের সভ্যতাতে এই দেবভক্তি অপূর্ব্বরূপে ফুটিয়া উঠিয়া সাহিত্যকে সার্থক করিয়াছিল। পুরাণকার বলেন—'কবিত্বং দুর্লভং লোকে শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা'। এই সুদুর্লভা শক্তিই মানুষের ঈশ্বর-সাধনার পথ-নির্দ্দেশে অদ্ভুত সহায় ছিল। সেদিনও, প্রাচীন যুগের অবসানে, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণের সঙ্গীতে যে সাধনার ধারার লক্ষ্য পাই, তাহা প্রাচীন মহাকাব্যকারগণের কাব্যসমূহে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। যদৃচ্ছাক্রমে উদ্ধৃত একটী সন্দর্ভ হইতে এ সাধনের মহত্ত্বের ও অকপটতার পরিচয় মিলিতে পারে। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম নায়ক লাউসেনের মুখ দিয়া যে সাধনসাম গাহিয়াছেন, তাহা তাঁহার অকৃত্রিম ইষ্টদেবতার প্রতি ভক্তির পরিচায়ক ;—

প্রেমে অঙ্গ গদগদ প্রমাদে প্রভুর পদ-পঙ্কজ পরম পরিসর।
সেবিয়া সোনার কায় ধ্যান করি ধর্ম্মরায় ধরাতলে ধূলায় ধূসর॥
প্রভু পরাৎপর ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত ধর্ম্ম বিশ্ববীজ অখিল আধান।
সূক্ষ্মশূক্ষ্ম সনাতন নিরাকার নিরঞ্জন নিত্যানন্দ নির্গুণ নিধান॥
তোমার মহিমা শেষ ভববিধি হৃষীকেশ সনক সনন্দ সনাতন।
না পেলে নিয়ম ভেদ আগম পুরাণ বেদ তপে জপে যোগে যোগিগণ॥
আমি নিন্দ্য মন্দমতি কি জানি ভকতি স্তুতি কিবা মোর ভকতির দশা।
চারি বেদে অনুপাম পতিতপাবন নাম শুনে সবে হয়েছে ভরসা॥

বৈষ্ণবের পদাবলীর প্রতি পত্রে—শ্রীকৃষ্ণচরিত-মহাকাব্যের প্রতি অংশে প্রত্যংশে, এবং উহাদেরই আদর্শে রচিত ভক্তিসুধাপানবিহ্বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর চরিত-কাব্যসমূহের প্রতি অধ্যায়ে এই ভাবের—ভক্তিসরলতার, পুণ্যকোমলতার, পূর্ণ পতিতপাবনী ধারার লীলা দেখিতে পাই। প্রাচীন মহাকাব্যের—প্রাচীন বাঙ্গালার ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে এই লোকধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা জাতীয় জীবনে অস্পষ্ট ছাপ রাখিয়া গিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটী প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। যাঁহারা প্রাচীন গ্রীক্‌ আদর্শের মহাকাব্যের প্রকৃতির পর্য্যালোচনা

করিয়াছেন,—Aristotleএর মতে An epic treats of one grand, complex, entire action,—অথবা যাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে একরসপ্রধান উদাত্ত-ঘটনা-বহুল সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকাব্যের ওজস্বিতার ও প্রাণশক্তির নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে প্রাচীন বাঙ্গালা মহাকাব্যে art অথবা কলা-কৌশলের অভাব দেখিয়া বিস্মিত ও হতাশ হইবেন। তুলনা সকল ক্ষেত্রে সুখদায়ক নহে। শুধু artএর দিক্ দিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা মহাকাব্যের বিচার করা চলে না। Art (কাব্যকলা) যাহা করিতে পারে না, প্রকৃতির সুন্দর লীলা-খেলা তাহাও সুন্দরভাবে মিলাইয়া দিতে পারে। Art বা criticism-এর কঠোর আইনকানুন দ্বারা প্রাচীন বাঙ্গালা মহাকাব্যের দোষোদ্ঘাটন করাতে বিশেষ নৈপুণ্য বা শক্তির সূচনা হয় না। নির্ম্মম সমালোচক অধিকাংশ গ্রন্থে কবিপ্রয়াসের একটা লক্ষ্যহীন উদাসীনতা (diffusion and indifference) একটা অনতিরসাল বাচালতা, একটা সমতাজ্ঞানের হানির (want of proportionএর), একটা বিরাট কেন্দ্রশূন্যতার আভাস পাইয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে কবি-প্রতিভার বিচার হয় না। ইংরাজী সমালোচক There is an art that defies all art, এই প্রবচনের দ্বারা যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, প্রধান বাঙ্গালা মহাকবিগণকেও সেই শক্তিটীর অদ্বিতীয় অধিকারী বলিয়া মনে হয়। কাব্যকলার একান্ত অভাব যে তাঁহাদের গ্রন্থে আছে, তাহা কোনও দুরন্ত সমালোচকও জোর করিয়া বলিতে ভরসা করিবেন না। বর্ণনার নিখুঁত পারিপাট্যে, সৌন্দর্য্যের ললিতোজ্জ্বল চিত্রে, চরিত্র-চিত্রণের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যে বিস্মিত, মুগ্ধ, পুলকিত হইবেন না, এমন পাঠক বিরল। কবিকঙ্কণের 'কল্লোলকামিনী'-বর্ণনের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যচিত্রটী কোন সহৃদয় সৌন্দর্য্যসেবী পাঠক নয়ন মন হইতে অপসৃত করিতে পারিয়াছেন ?—

অপরূপ হের আর দেখ ভাই কর্ণধার কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বাম করে উগরয়ে করিবরে পুনরপি করয়ে সংহার॥
কমল কনকরুচি স্বাহা স্বধা কিবা শচী মদনসুন্দরী রমাবতী।
সরস্বতী কিবা রমা চিত্রলেখা তিলোত্তমা সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী॥
রাজহংসবর জিনি চরণে নূপুরধ্বনি দশ নখে দশ চন্দ্র ভাসে।
কোকনদ দর্প হরি বেষ্টিত আর কবরী অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে॥

বাঙ্গালা মহাকাব্যের সহিত বর্ত্তমান নাটক নভেলের সামঞ্জস্যের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই বিষয়ে বাঙ্গালার কবি তাঁহাদের আদর্শ সংস্কৃত পৌরাণিক কবিগণকে বহু দূরে ফেলিয়া রাখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালা

কবির কাব্যে খাঁটী বাঙ্গালার ছবি দেখিয়া আমাদের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের উদয় হয়। অবশ্য সকল কবিই যে এ 'ফোটো' সুন্দররূপে তুলিতে পারিয়াছেন, তাহা নহে। তবে কবিকঙ্কণের ভাঁড়ুদত্ত, ঘনরামের কর্পূর সেন প্রভৃতি চরিত্র হইতে বর্ত্তমান অধঃপতিত বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশের মূল কারণ লক্ষ্য করিতে পারি। অন্য দিকে মনসাকাব্যের চাঁদ সদাগর, ঘনরামের কালকেতু প্রভৃতি চরিত্র-চিত্র হইতে বাঙ্গালীর স্থিরপ্রতিজ্ঞা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও দেবদ্বিজে ভক্তির স্পষ্ট আভাস পাইয়া থাকি। বাঙ্গালীর চরিত্রে কতক গুণ ছিল বলিয়া বাঙ্গালী তখনও নিতান্ত অধঃপতিত হয় নাই। বাঙ্গালার সাহিত্যিক তাঁহার আবেষ্টনের চতুঃপার্শ্বস্থ বাস্তব ব্যক্তিবৃন্দের চরিত্র চিত্রিত করিয়া তাঁহার গ্রন্থকে কাব্যসম্পদে, তত্ত্বে, সত্যে, সারে সবল, ঐশ্বর্য্যশালী ও সুন্দর করিতে পারিয়াছেন। বর্ত্তমান বাঙ্গালার ঔপন্যাসিক ও নাটককারকে উদাত্ততার বা গৌরবের বাস্তব ছবি দেখাইতে হইলে, নিজের দেশকাল হইতে দূরে, বহু দূরে, অনন্ত অতীতে পাখা লইয়া উড়িতে হয়;—রাজস্থানের কর্ম্মিগণ, মহারাষ্ট্রের বীরবৃন্দ, প্রতীচ্য মহাদেশের কর্ম্মকুশল কীর্ত্তিশালী জননায়কসংঘ, অথবা রামায়ণ মহাভারতের পুণ্যশ্লোক মনীষিসমবায়ই তাঁহাদের প্রধান উপজীব্য হইয়া থাকে। —বর্ত্তমানের আবেষ্টনের কলুষ জলবায়ুতে মহত্ত্বের শক্তিসঞ্চার ঘটে না।

পুরুষচরিত্র সম্বন্ধে প্রাচীন মহাকবিগণের পক্ষ হইতে যে দাবী করা হইল, স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধেও তাহা অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের দাবী করা যায়। বাঙ্গালী নরনারী খুল্লনা, ফুল্লরাকে সতী, সাবিত্রী, সীতা অপেক্ষা কম আদরের ও ভক্তির চক্ষে দেখেন না। বাঙ্গালার মজ্জায় মজ্জায়, ধাতুতে ধাতুতে এই মনস্বিনী রমণীগণের চরিত্রশক্তি স্বচ্ছসুন্দরপ্রবাহে খেলা করিয়াছে, এবং করিতেছে।

যাঁহারা বাঙ্গালা সমাজের গতিস্থিতির ধারা-পর্য্যবেক্ষণে নিপুণ, তাঁহারাই বর্ত্তমান বাঙ্গালীর গৃহধর্ম্মে এই মহাকাব্যসমূহের প্রভাব বুঝিতে পারিবেন। বাঙ্গালী হিন্দুর মহাকাব্যের ভিতর দিয়া তাহার কালক্রমাগত, রীতি, নীতি, লোকাচার, তাহার গৃহের সরল দুর্ব্বলতা ও সমাজের উজ্জ্বল মধুর পবিত্রতা শান্ত-সুন্দর-ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। বাঙ্গালার অতীত ইতিহাসের গঠনকল্পে এই সকল মহাকাব্য হইতে যথেষ্ট উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে। এগুলি পাকা ঐতিহাসিকের মূল্যবান দলীল। আবার বাঙ্গালার প্রকৃত ধাতু বুঝিয়া যাঁহারা বাঙ্গালায় জাতীয়তার নবীন উদ্বোধনের পুরোহিত হইতে চাহেন, তাঁহাদেরও এগুলিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বাঙ্গালী

কতদিনে এইগুলির প্রকৃত সার্থকতা বুঝিয়া উঠিতে পারিবে, আপনার ঘরের জিনিসের দাম জানিয়া পরের দ্বারে দ্বারী হইবার অবমাননা ও অপরাধ হইতে নির্মুক্ত হইবে, তাহা কে বলিবে? *

শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

বাগদাদ।

১

ইতিহাস, উপন্যাস ও কবিতা—এই তিনের সংযোগে কল্পনা এক একটি স্থানের সঙ্গে এক একরূপ স্মৃতির সংযোগ করে; নামের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্মৃতি মনে উদিত হয়। 'বৃন্দাবন'—মনে করিলেই কলনাদিনী কালিন্দীর কূলে বিহগ-বিরাবমুখরিত কদম্বতমালকুঞ্জে বিশালায়তলোচনা কৃষ্ণপ্রেমবিলাসিনী গোপাঙ্গনা-দিগের বিলাসক্ষেত্রে রাসবিহারীর রাসলীলার কথা মনে পড়ে। 'মক্কা'—বলিলেই আরবের মরুমধ্যে মেঘলেশহীন নীলাম্বরের চিত্রপটে মসজেদ-মিনারের গলিত-কাঞ্চনদ্যুতিরবিকরদীপ্ত শোভা মনে পড়ে। 'আগ্রা'—বলিলেই নদীকূলে স্থাপত্যবিলাসী সাহজাহানের অক্ষয় প্রেমের মূর্ত্ত্য-নিদর্শন তাজ-সমাধির কথা মনে হয়। পারসী প্রবাদের কথায় যে ইস্‌পাহান লাহোর না থাকিলে "নিসফ জাহান" অর্থাৎ অর্দ্ধ-পৃথিবী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত, সেই ইস্‌পাহানের নামে গোলাববাগের সৌরভ মনে পড়ে। আর 'বাগদাদ' বলিলে আরব্য-উপন্যাসের সেই স্বপ্নপুরীর কথা স্মৃতিপথে সমুদিত হয়। এক দিন সমগ্র প্রাচীখণ্ডে বাগদাদের মত সমৃদ্ধ নগর আর ছিল না। এই পথে প্রাচী-প্রতীচীর বাণিজ্যপ্রবাহ প্রবাহিত হইত; উষ্ট্রপৃষ্ঠে সকল দেশের মূল্যবান দ্রব্য এই বাগ-দাদের বাজারে নীত হইত; টাইগ্রীসের প্রবাহে সহস্র সহস্র তরণী পণ্য বহন করিয়া বাগদাদের বিরাট বন্দরে উপনীত হইত। যে ঐতিহাসিক ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, সেই কাতিব বলিয়াছেন,—এক সময়ে বাগদাদে ৬০ হাজার হামাম—অর্থাৎ স্নানাগার ছিল; প্রত্যেক হামামে অন্ততঃ পাঁচ জন করিয়া চাকর ছিল; প্রত্যেক হামামের কাছে পাঁচটি করিয়া মসজেদ ছিল। এই বাগদাদে চারিটি স্থূফীসম্প্রদায়ের দুইটির প্রবর্ত্তন; আবদুল কাদের ও ওমর সোরাবার্দী—উভয়েই এই বাগদাদে সমাহিত। এই বাগদাদের খালিফাদিগের

* দশম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

ঐশ্বর্য্যের কথা আজ প্রবাদের মত সর্ব্বত্র পরিচিত। এই বাগদাদের প্রাসাদের দ্বার হইতে বাহির হইয়া নিশীথে খালিফা হারুণ-রসিদ প্রজার মনের ভাব জানিবার জন্য ছদ্মবেশে তাহাদের সঙ্গে মিশিতেন। আর এই বাগদাদের প্রাসাদে জোবেদা বাস করিতেন। প্রাসাদের বিলাসকক্ষে বিচিত্র নক্সায় বর্ণ-বৈচিত্র্যবহুল কোমল পারস্যদেশজাত গালিচা শোভা পাইত—কক্ষপ্রাচীর ও হর্ম্ম্যতল সেই গালিচায় আবৃত। গালিচার উপর জরীর কাজ-করা মখমলের গদীতে বসিয়া জোবেদা হারুণ-রসিদকে যে সব গল্প শুনাইতেন, বুঝি সেই সবই একত্র গ্রথিত হইয়া সাহারজাদীর (নগরজাতার) আরব্যোপন্যাসে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই বাগদাদের ধনীর প্রাসাদে—হাবসীরক্ষিরক্ষিত অন্তঃপুরে বারাণসীর জরীর কাজ-করা রেশমের পোষাকে অঙ্গ আবৃত করিয়া—"কাজল আঁকা উজল আঁখি"—হেনার বর্ণে রঞ্জিতচরণ সুন্দরীরা ভূগর্ভস্থ সারদাবে নিদাঘের মধ্যাহ্ন যাপন করিতেন। সারদাবের হাওয়া-ঘরের মধ্য দিয়া সূর্য্য-কিরণ ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া গালিচার উপর লুটাইয়া পড়িত—যেন আরব্যোপ-ন্যাসের রাজকন্যা অভিমানে কণ্ঠাভরণ রত্নহার ছিন্ন করিয়া রত্নগুলি ছড়াইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য সুদূর পর্ব্বত হইতে উষ্ট্রের ডাক বসাইয়া বরফ আনিয়া সরবৎ প্রস্তুত হইত। আর সেই সব অন্তঃপুরে কত লীলারই অভিনয় হইত! হরিণ-নয়না, দাড়িম্বোরজা, কুসুমকোমলা বাগদাদ-নারীর সৌন্দর্য্য-কীর্ত্তনে মুসলমান কবিরা কখনও শ্রান্তি অনুভব করেন নাই।

বাগদাদ অতি প্রাচীন নগর। ৭৬২ খৃষ্টাব্দে খলিফ মনসুর এই স্থানে রাজধানী স্থাপিত করেন। তখনও বাগদাদ নিতান্ত অপরিচিত ছিল না। সার্ হেনরী রলিন্সন ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে টাইগ্রীস নদীর পশ্চিম কূলে একটি পোস্তপ্রাচীরে নেবুকাড্নেজারের নামাঙ্কিত পুরাতন বেবিলনীয় ইষ্টক পাইয়া-ছিলেন। তাহাতে মনে হয়, নেবুকাড্নেজারের সময়েও বাগদাদ সমৃদ্ধ নগর ছিল। তাহার পর সিসানীয়দিগের প্রাধান্য-যুগেও পারসী বাগদাদ প্রসিদ্ধ বাজার ছিল—মুসলমানগণ ইহা লুণ্ঠিত করে। মহম্মদের পরবর্ত্তী (খালিফা) আবু বকরের প্রাধান্যকালে আরব সেনাপতি খালিদ এই বাজার লুণ্ঠিত করিয়া প্রচুর ধনলাভ করেন। সে ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের কথা। তাহার পর—৭৬২ খৃষ্টাব্দে মনসুরের রাজধানীনির্ম্মাণের পূর্ব্বে ইতিহাসে বাগদাদের আর বড় উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু মনসুরের এই রাজধানীস্থাপনব্যাপারের সঙ্গে মুসলমান ইতিহাসের দুইটা বড় ব্যাপার জড়িত;—প্রথম, শিয়া ও সুন্নী, দুই সম্প্রদায়ে

মুসলমানদিগের বিভাগ ; দ্বিতীয়, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জাতিসমূহকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য মুসলমানদিগের প্রবল আগ্রহ ও অসাধারণ আয়োজন। আমরা সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব।

কে তাঁহার পরবর্ত্তী (খালিফা) অর্থাৎ প্রধান হইবেন, মহম্মদ তাহার নির্দ্দেশ করিয়া যায়েন নাই। তাঁহার ভক্তদল তাঁহার পার্শ্বচরদিগের মধ্য হইতে প্রথমে আবু বাকরকে, তাঁহার পরে ওমারকে ও তাঁহার পরে ওসমানকে খালিফা করেন। ইঁহারা সকলেই মদিনা হইতে শাসনকার্য্য পরিচালিত করিতেন। ইঁহাদের পর আলি খালিফা হয়েন। এই আলি মহম্মদের জামাতা, তাঁহার শিয়া অর্থাৎ বন্ধুরা মনে করিতেন, মহম্মদের পর তিনিই খালিফা হইবার কথা— মধ্যবর্ত্তী তিন জন খালিফা খালিফাই নহেন। এই সময় হইতে মুসলমানদিগের মধ্যে দুই দলের স্বষ্টি হয়। আলি খালিফা হইলে ওমায়ীয়াবংশের মোয়াইয়া তাঁহার সেই পদলাভের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আপনাকে খালিফা বলিয়া ঘোষিত করেন। তিনি দামস্কাসে রাজপাট স্থাপিত করেন। এ দিকে আলি মদিনা ত্যাগ করিয়া মেসোপোটেমিয়ায় কুফায় রাজধানী স্থাপিত করেন। ইহাতে আরবদিগের শাসনের শক্তি কেন্দ্রচ্যুত হইয়া পড়ে। মোয়াইয়া খালিফা ওমার কর্ত্তৃক সিরিয়ার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া খালিফা হইবার জন্য দশ বৎসর ধরিয়া আয়োজন করিয়া আসিতেছিলেন। কাজেই আলির পক্ষে তাঁহাকে জয় করা দুঃসাধ্য হইল। শেষে কুফায় আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে আলির মৃত্যু হইল, এবং পরে তাঁহার দুই পুত্র হোসেন ও হাসান নিহত হইলে মোয়াইয়ার বংশধরগণই খালিফা হইলেন। শিয়াসম্প্রদায়ের বিশ্বাস, আলির পুত্রদ্বয়ের মৃত্যুতেই খালিফাদিগের শেষ—আর কেহ খালিফা হইতে পারেন না। তাঁহারা চিরদিনই আলির পুত্রদ্বয়ের জন্য বিলাপ করিয়া আসিতেছেন। শিয়া ও সুন্নী দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদে এ পর্য্যন্ত যে কত লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ওমায়ীয়াবংশের খালিফাগণ দামাস্কস হইতে মুসলমানদিগকে শাসন করিতে লাগিলেন। ৭৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের বংশের শেষ খালিফা দ্বিতীয় মারওয়ান আব্বাসী সাফ্ফা কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। সাফ্ফা অর্থে রক্তপাতকারী। তিনি ওমায়ীদিগের সকলকে নিহত করিয়া সাফ্ফা নাম লাভ করেন। সে বংশের এক জন মাত্র পলাইয়া স্পেনে গিয়াছিলেন। তিনিই কর্ডোভার খালিফাদিগের বংশপতি।

সাফ্‌ফা খালিফা হইয়াই বুঝিলেন, রাজধানী দামস্‌কস হইতে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। দামস্‌কসে ওমায়ীদিগের অনুরক্তদিগের বাহুল্য; বিশেষ যে পারস্য হইতে আব্বাসীদিগের শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে, দামস্‌কস সেই পারস্য হইতে বহু দূরে। আবার দামস্‌কস গ্রীক-সীমান্তের নিকটবর্ত্তী, এবং তথা হইতে খৃষ্টানরা পূর্ব্বকৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে মধ্যে মধ্যে মুসলমানদিগকে আক্রমণও করিয়া থাকে। দামস্‌কস জলপথ হইতে দূরে—বাণিজ্যকেন্দ্র হইতে পারে না। ভবিষ্যতে পূর্ব্বদিকে মধ্য-এসিয়াই ইসলাম-ধর্ম্মপ্রচারের উপযুক্ত স্থান হইবে। তাই তিনি টাইগ্রীসের বা ইউফ্রেটিসের তীরে রাজধানী-স্থাপন যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তিনি ইউফ্রেটিসের পূর্ব্বকূলে পারস্যনগর আনবারের পার্শ্বে হাসিমিয়ায় প্রাসাদ-নির্ম্মাণ করিলেন। ৭৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতা মনসুর খালিফা হইলেন। মুসলমান-বিজয়ের পর মেসোপোটেমিয়ায় দুইটি আরব নগর স্থাপিত হইয়াছিল—বসরা ও কুফা। নানা কারণে মনসুর হাসিমিয়া ত্যাগ করিয়া নূতন-রাজধানী-সংস্থাপনে কৃতসংকল্প হয়েন। তিনি দেখিলেন, রাজধানী টাইগ্রীস-তীরে সংস্থাপিত হইলে উর্ব্বরস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন টাইগ্রীস বা ইউফ্রেটিস বর্ত্তমান খাতে প্রবাহিত হইত না। মনসুর স্বয়ং দেখিয়া এই স্থানে রাজধানী-স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। ৭৬২ খৃষ্টাব্দে নূতন নগরের পত্তন হইল। এই স্থানে প্রাকৃতিক সংস্থানহেতু খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প; ইহা বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইতে পারিবে, এবং শত্রুর পক্ষে অনধিগম্য রহিবে; এই স্থানে গ্রীষ্মের তাপ ও মশকের অত্যাচারও অধিক নহে। এই সব বিবেচনা করিয়া দূরদর্শী মনসুর বাগদাদে রাজধানী সংস্থাপিত করিলেন। মধ্যযুগেও কনস্তান্তিনোপল ব্যতীত এত বড় নগর আর ছিল না। ইহার ঐশ্বর্য্যের তুলনা ছিল না; নানারূপ ভাগ্যবিপর্য্যয়, এমন কি, ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গলদিগের দ্বারা ধ্বংস সহ্য করিয়া আজও বাগদাদ বিদ্যমান—আজও তাহা মেসোপোটেমিয়ার রাজধানী। তুর্কীর আমলেও মনসুরের রাজধানী মেসোপোটেমিয়ার রাজধানী—শাসনকর্ত্তার বাসস্থান।

এই অঞ্চলে কাষ্ঠ দুষ্প্রাপ্য, সুতরাং ইষ্টক প্রস্তুত করা কষ্টসাধ্য। নিকটে কোথাও প্রস্তর পাইবার সুবিধা নাই। সুতরাং অদূরে টেসিফনে সসানীয় নৃপতিদিগের বিরাট প্রাসাদের ভগ্নাবশেষও মনসুরের পক্ষে এই স্থান-নির্ব্বাচনের অন্যতম কারণ হইয়াছিল কি না, বলা যায় না। অদূরে টাইগ্রীসের তীরে

সাসিনের এই রাজবংশের রাজধানী ছিল। যে রাজবংশ এই রাজধানীর প্রতিষ্ঠাতা, আর্দেশীর তাহার বংশপতি। তখন আলেকজাণ্ডারের উত্তরাধিকারী সেলিউকসের নামে পরিচিত সেলিউকিয়াই টাইগ্রীস উপত্যকায় সর্ব্বপ্রধান নগর। নানা কারণে মেসোপোটেমিয়ায় রাজধানী-সংস্থাপন প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহারা টেসিফনে নগরপ্রতিষ্ঠা করেন। চসরস খৃষ্টীয় ৫৫০ খৃষ্টাব্দে এই টেসিফনে এক বিরাট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। অদ্যাপি সেই প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ টাইগ্রীসের বাঁকের মুখে বিদ্যমান। সমগ্র প্রাচীতে এই জাতীয় গৃহ আর নাই। বৃহৎ কক্ষের খিলান করা ছাত ৮৬ ফিট বিস্তৃত গৃহ আবৃত করিয়া আছে—ইহা ৯৫ ফিট উচ্চ। এই কক্ষের সম্মুখভাগ অনাবৃত। আরব ঐতিহাসিক তাবারী বলেন, ইহা একটি পর্দ্দায় আবৃত থাকিত। পর্দ্দায় একটি বাগানের নক্সা ছিল—তাহার জমী স্বর্ণের—পথ রৌপ্যের—প্রান্তর মরকতের—নদী মুক্তার—বৃক্ষলতাফুলফল হীরকাদি বহুমূল্য মণির। মুসলমানের বিজয়-বাত্যা যখন মরুভূমির প্রলয়-বাত্যার মত প্রবাহিত হইয়া টেসিফনের প্রতিষ্ঠাতা রাজবংশের ও তাঁহাদের রাজধানীর সর্ব্বনাশ-সংসাধন করে, তখনও বিজেতারা এই প্রাসাদের বিরাটত্বে অভিভূত হইয়া কক্ষপ্রাচীরের চিত্রগুলিও নষ্ট করে নাই। মনসুর এই প্রাসাদের উপকরণ লইয়া নূতন-নগর-নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী খালিদ তাঁহাকে সেই কার্য্য হইতে বিরত হইতে পরামর্শ দেন। তিনি খালিফাকে এমন কথাও বলেন যে, মহম্মদের পরবর্ত্তী চতুর্থ খালিফা আলি এই স্থানে নামাজ পড়িয়াছিলেন বলিয়াও ইহা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। মনসুর মনে করিলেন, এই প্রাসাদ পারস্যদেশীয় নৃপতির কীর্ত্তি বলিয়াই পারস্যদেশীয় খালিদ তাঁহাকে এইরূপ পরামর্শ দিতেছেন। তিনি সে পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু সেই প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া উপকরণ আনিবার চেষ্টা করিয়া তিনি বুঝিলেন, তাহাতে যে ব্যয় পড়িবে, তদপেক্ষা অল্পব্যয়ে নূতন উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। তিনি টেসিফনের প্রাসাদ ধ্বংস করিতে বিরত হইলেন। তখন খালিদ বলিলেন, সে প্রাসাদ ধ্বংস করাই খালিফার কর্ত্তব্য—নহিলে লোক বলিবে, চসরস যে প্রাসাদ নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন, মনসুর তাহা ভাঙ্গিতেও পারিলেন না। কিন্তু বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মনসুর লোকনিন্দার ভয়ে অর্থ নষ্ট করিতে অসম্মত হইলেন।

এ দিকে মনসুরের উদ্যোগে বাগদাদের বিরাট বৃত্তাকার নগর ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালসৃষ্ট স্বপ্নপুরীর মত রচিত হইতে লাগিল। এই নগর ৩০ ফিট উচ্চ ও

৮ ফিট প্রশস্ত প্রাচীরে বেষ্টিত হইল—পুরপ্রাচীরে ভিন্ন ভিন্ন দ্বার রক্ষিত হইল। আব্বাসী নগরনির্ম্মাতা নগরে ২৪ হাজার রাজপথ রচিত করিলেন—প্রত্যেক পথের স্বতন্ত্র মসজেদ ও হামাম (স্নানাগার) রচনার ব্যবস্থা হইল। ১শত ৫০টি খালে নগরের সর্ব্বত্র টাইগ্রীস হইতে জল লইবার উপায় করা হইল—প্রত্যেক খালের উপর সুগঠিত সেতু রচিত হইল। আর নগরের বাহিরে, প্রমোদ-উদ্যান-সমূহে জল দিবার জন্য ৬ শত খালে জল লইতে যে বৃহৎ খাল খনিত হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন আজও ধূলিধূসর প্রান্তরমধ্যে লক্ষিত হয়। এই সৌন্দর্য্যের স্বপ্নপুরীর মধ্যে প্রাসাদ। তাহার বর্ণনা পাঠ করিলে সত্যসত্যই বলিতে ইচ্ছা হয়—

"কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গঠিলা তুমি তুষিতে পৌরবে?"

নবম শতাব্দীর শেষভাগে বাগদাদের জনসংখ্যা ২০ লক্ষ ছিল। শিল্পে, সাহিত্যে বাগদাদ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হয়। ইমাম আজম খালিফা মনসুরকে এই নগরনির্ম্মাণে সাহায্য করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের সুন্নী-সম্প্রদায় ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত,অর্থাৎ তাহারা চারি জন প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকারের মতানুবর্ত্তী। এই চারি জনের অনুবর্ত্তীদিগের জন্য মক্কার মসজেদগর্ভের (কিবলার) চারি দিকে চারিটি স্থান (মুসল্লা) আছে। এই চারি জনের মধ্যে ইমাম আজমের অনুবর্ত্তীর সংখ্যাই অধিক। আর এক জন ইমাম হাম্বল। আজম ও হাম্বল উভয়েই বাগদাদে সমাহিত হইয়াছিলেন। হাম্বলের সমাধি টাইগ্রীসগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে। আজমের সমাধিসৌধ আজও নদীর পূর্ব্বকূলে—বর্ত্তমান বাগদাদের উপকণ্ঠে মুয়াজ্জম নামক স্থানে বিদ্যমান। পশ্চিমে নগরোপকণ্ঠে কাজমেনে শিয়াদিগের দুই জন ইমামের ও পূর্ব্বে নগরোপকণ্ঠে মুয়াজ্জমে আজমের সমাধিসৌধ যথাক্রমে শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের পুণ্যতীর্থে পরিণতি লাভ করিয়াছে। উভয় সৌধই বাগদাদের মিনাকরা নীল টালি দিয়া গঠিত—সৌন্দর্য্যে নয়নমুগ্ধকর। কিন্তু কাজমেনের সৌধ ঐশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে।

কাজমেনের বর্ত্তমান মসজেদের সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য বিস্ময়কর। মুসলমান ব্যতীত অপর লোকের সিংহদ্বার অতিক্রম করিবার অধিকার নাই। তবে মুক্ত দ্বারপথেও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার দ্বার রৌপ্যের, বৃতি রৌপ্যের; গম্বুজ স্বর্ণপত্রাস্তৃত। উপরে মেঘহীন—রৌদ্রদীপ্ত—নীলাম্বর, নিম্নে গাঢ়-নীল বর্ণের মিনাকরা ইষ্টকে রচিত মসজেদের প্রাচীর, মধ্যে স্বর্ণপত্রাস্তৃত গম্বুজের

সৌন্দর্য্য শিল্পীর প্রলোভনীয়, সন্দেহ নাই। কাজমেনে শিয়াসম্প্রদায়ের সপ্তম ইমাম অল-কাজিম ও তাঁহার পৌত্র নবম ইমাম মহম্মদ সমাহিত। ৮০২ খৃষ্টাব্দে কাজিম হারুন-রসিদ কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। কাজমেনে কে প্রথম মসজেদ নির্ম্মিত করান, তাহা জানা যায় না। তবে ১২২৬ খৃষ্টাব্দে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন এই নগরোপকণ্ঠ স্বতন্ত্র প্রাচীরপরিবেষ্টিত নগর। এই মন্দির যে কতবার লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহা কে বলিবে? তখন খালিফাদিগের রাজধানীতে শিয়ায় ও সুন্নীতে প্রায়ই বিবাদ বাধিত। শিয়ারা সে সময় এই কাজমেনেই সমবেত হইত। মরুভূমির আরবরা স্বভাবতঃ বিরোধপ্রিয়; তাহাদের বিবাদ বিতর্কে বিকশিত হয় না, পরন্তু রক্তপাতে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং কোনও বিবাদে শিয়ারা পরাভূত হইলে সুন্নীরা এই মন্দির লুণ্ঠিত করিত। আবার শিয়া ধনীরা ইহার হৃতসম্পদ পূর্ণ করিয়া দিতেন। ৯৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যিনি খালিফা ছিলেন, সেই টাই স্বয়ং এই মসজেদে শুক্রবারে উপাসনায় ইমামের মত পৌরোহিত্য করিতেন। ১০৫১ খৃষ্টাব্দে একবার এই মন্দির লুণ্ঠিত ও দগ্ধ হয়। সেই বৎসর শিয়া ও সুন্নী দুই সম্প্রদায়ে বিরোধ বাধিয়া উঠে। শিয়ারা একটি দ্বারে খালিফা আলীর গুণকীর্ত্তন-সংবলিত একখানি লিপি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে। সুন্নীরা তাহা পৌত্তলিকতার পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া তাহাতে আপত্তি করে। সেই বিবাদে সুন্নী নেতা নিহত হয়েন। সুন্নীরা তাঁহার সমাধিস্থান লইয়া ইচ্ছা করিয়া আবার বিবাদ বাধায়, এবং মন্দিরের সঞ্চিত ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া মন্দিরে অগ্নিযোগ করে। সেই অগ্নিযোগেই হারুণ-রসিদের প্রিয় পত্নী জোবেদার ও তাঁহার পুত্রের সমাধি দগ্ধ হয়। তাহার পর নূতন করিয়া মসজেদ নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমানে পুরাতন বাগদাদের জীর্ণ বাজার পার হইয়া বৃহৎ দ্বিতল ট্রামগাড়ীতে উঠিতে হয়। ট্রাম কাজমেনের বাজারের বাহিরে যায়। তথায় অবতরণ করিয়া কাজমেনের বাজারের স্বচ্ছান্ধকারাবৃত পথে কিছু দূর অগ্রসর হইলে সহসা সম্মুখে মুক্ত স্থানে উপনীত হওয়া যায়, আর নয়নের সম্মুখে কাজমেনের মসজেদের সৌন্দর্য্যস্বপ্ন সাকার হইয়া আবির্ভূত হয়।

৭৬৬ খৃষ্টাব্দে নদীর পশ্চিম কূলে চক্রাকার বাগদাদ নগর নির্ম্মিত করিয়াও মনসুরের সাধ মিটিল না। তিনি নদীর পরপারে, অর্থাৎ পারস্যের দিকে, রুসাফায় মসজেদ ও প্রাসাদ গঠিত করিলেন। বর্ত্তমানে এই নগরই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; নদীর পশ্চিম কূলে মনসুরের স্বপ্নপুরীর "কেবল নাম আছে"।

মনসুরের সময় হইতে হারুণ-রসিদের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত বাগদাদ খালিফা-

দিগের রাজনীতিক রাজধানী ও বিলাসপুরী ছিল। তাঁহারা শত শিল্পীর সাধনায় ও অজস্র অর্থব্যয়ে মরুমধ্যে এই নন্দনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই মায়াপুরীর রচনা করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। বাগদাদ ব্যবসায়ের কেন্দ্র হইয়াছিল—এই পথে প্রাচীর সহিত প্রতীচীর বাণিজ্য হইত—নানা দিগ্দেশের শিল্পী ও বণিক পণ্য লইয়া এই বাগদাদে উপনীত হইত। রাজনীতির ও বাণিজ্যের গঙ্গাযমুনা-প্রবাহ এই বাগদাদে মিলিত হইয়া ইহাকে প্রয়াগে পরিণত করিয়াছিল। খালিফাদিগের যত্নে শিল্প উন্নতি লাভ করিত। আবার এই বাগদাদ তখন মুসলমানের "ভারতীর রাজধানী—ক্ষিতির প্রদীপ"; সকল স্থান হইতে মুসলমান পণ্ডিতগণ এই কেন্দ্রে সমাগত হইতেন। সর্ব্বপ্রকারেই বাগদাদ তখন "জগৎ-বাসনা" আর "সুখের সদন" ছিল। কিন্তু আজ সে বাগদাদ হৃতগৌরব—বিরাটকীর্ত্তির ভগ্নস্তূপ—অসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষার ধূলিবিলুণ্ঠিত অবশেষ। আজ টাইগ্রীসের তীরে বাগদাদ দেখিলে মানবকীর্ত্তির পরিণাম চিন্তা করিয়া হৃদয় ঔদাস্যে পূর্ণ হয়; আর মনে পড়ে—

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।"

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

আলোচনা।

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসরচনায় যুগান্তরের সৃষ্টি করিতে পারুন আর নাই পারুন, মতান্তরের সৃষ্টি ভালই করিয়াছেন। যে রুচি ও নীতি সার্ব্বজনীন, তাহার প্রতি সঙ্কীর্ণতার আরোপ করিয়া, তাঁহার রচনার রসগ্রাহী তথা গুণগ্রাহিগণ তাঁহার সৃষ্টিকৌশল-প্রদর্শনে ব্যস্ত হইয়াছেন। ইহাতে সৎসাহিত্যের ক্ষতি হইতেছে। সাহিত্যের কুঞ্জবন ক্রমেই আগাছায় ভরিয়া উঠিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের মতাবলম্বিগণের ধারণা, তাঁহার কি 'চোখের বালি', কি 'নৌকাডুবি', কি 'ঘরে বাইরে'—সকল উপন্যাসই বাঙ্গালা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ দান। 'ঘরে বাইরে'-র কোনও অনুকূল সমালোচক নায়িকা বিমলার চরিত্রে সতীত্বের নূতন আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছেন। আজ 'ঘরে বাইরে'-র কথাই বলিব।

'ঘরে বাইরে'-র বিষয়টি এই,—নিখিলেশ ও সন্দীপ দুই বন্ধু। উভয়েই উচ্চশিক্ষিত। বিমলা নিখিলেশের বিবাহিতা পত্নী। নিখিলেশ তাহার পত্নীকে ঘরে পাইয়া সন্তুষ্ট নহে; কারণ, সে উচ্চশিক্ষিত! কারণ সে বুঝিয়াছে, বিমলা ঘরে আবদ্ধ না থাকিয়া একবার বাহিরে আসিয়া বিশ্বের পণ্যশালায় তাহাকে চিনিয়া ও দর যাচাই করিয়া লয়। আচার ও সংস্কারের কৃত্রিম আবরণ ভেদ করিয়া, মনুষ্যত্বের যে পূর্ণতর রূপ, নিখিলেশ তাহাই দেখিতে চাহে। তাহাই হইল। বিমলা শিক্ষিতা মহিলা, কাজেই মনের কুণ্ঠা ঘুচাইয়া ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিল, স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু নকল স্বদেশপ্রেমিক সন্দীপের স্বদেশী বক্তৃতা শুনিয়া মন ও প্রাণ সন্দীপকে বিলাইয়া দিল। উভয়ের দেহের মধ্যে একটু ব্যবধান রহিল মাত্র। কিন্তু তাহার পর সে যখন তাহার ভুল বুঝিল, তখন কি টানাটানি—প্রাণ ছিঁড়িয়া যায় আর কি! নিখিলেশ সমস্তই দেখিত, শুনিত, এবং বুঝিত, বুঝিয়া মর্ম্মে মরিত; কিন্তু বিমলার কাজে বাধা দিত না। নিখিলেশের হৃদয় এতই উদার ছিল! যাহা হউক, শেষে বাহিরের বিমলা আবার ঘরে ফিরিল। এইবার নিখিলেশ বিমলাকে ও বিমলা নিখিলেশকে পাইল।

এই বিষয় লইয়া অন্য কেহ উপন্যাস রচনা করিলে সৎসাহিত্যে তাহার কতটুকু আদর হইত, তাহা অধিকাংশ বাঙ্গালী পাঠক সহজে বুঝিবেন। কিন্তু এই উপন্যাসের রচয়িতা প্রতিভাশালী কবি রবীন্দ্রনাথ, সুতরাং হঠাৎ রাবিশ বলিবার উপায় নাই। রাবিশ হইলেও, রাবিশ বলিবার প্রয়োজন হইত না; প্রয়োজন হইয়াছে, কারণ, কেহ কেহ অনুকূল মন্তব্যের সাহায্যে 'ঘরে বাইরে'-কে বাঙ্গালা সাহিত্যে উচ্চস্থান দিবার জন্য যথাবিহিত চেষ্টা করিতেছেন।

উপন্যাসে যিনি যতই কেরামতী দেখাইয়া বাহাদুরী লইবার চেষ্টা করুন, উহার স্থান লঘু-সাহিত্যের 'অচলায়তনে'-র মধ্যেই। অর্থাৎ, উপন্যাস উপন্যাসই। সতীকে সতী, প্রেমিককে প্রেমিক ও রসিককে রসিক সাজাইয়া যাঁহারা উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, এবং করিতেছেন, তাঁহাদের উপর টেক্কা দিতে হইলে অসতীকে সতী, অপ্রেমিককে প্রেমিক ও অরসিককে রসিক করিয়া উপন্যাস রচনা করিতে হয়; নতুবা সে উপন্যাসের বৈচিত্র্য থাকে না। রবীন্দ্রনাথ এই বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছেন; কোথাও চরিত্রবিশ্লেষণের, কোথাও মনস্তত্ত্বের, কোথাও বা আর্টের দোহাই দিয়া উপন্যাসের আকাশে সত্যের কুসুম ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এখন বিশ্বসভ্যতার রাজ্য ছাড়িয়া কবির নিমন্ত্রিত বিশ্বমানব বাঙ্গালা দেশে হঠাৎ আবির্ভূত হইলেই হয়! কেহ কি বলিতে পারেন, কোন্ কালে বিশ্বমানব ত্রিতাপদগ্ধ আমাদের পাশে বসিয়া হারমোনিয়মের পর্দ্দা টিপিয়া গান ধরিবেন—'বাংলার মাটী, বাংলার জল, সত্য হোক্, সত্য হোক্, হে ভগবান'?

যুগধর্ম্মের প্রভাবে বাঙ্গালী যদি কোনও কালে ইংরাজ হয়, তবে তখনকার কথা তখনই হইবে। বর্ত্তমানে যে যুগ চলিতেছে, সেই যুগের কথার আলোচনা করাই এ ক্ষেত্রে সমীচীন। সবুজ পত্রে রবীন্দ্রনাথ দেশ ও কালকেই তাঁহার উপন্যাসের 'বিশ্বকর্ম্মা' বলিয়াছেন। এই দেশ—বাঙ্গালা দেশ বা ভারতবর্ষ, এই কাল—বর্ত্তমান কাল। ভবিষ্যতে কোনও অনির্দ্দিষ্ট যুগে কোনও বিশ্বমানব বিশ্বসভ্যতার প্রভাবে যদি বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালীর ভিন্ন ভিন্ন সমাজকে

এক সমাজে পরিণত করিতে পারেন, করিবেন ; কিন্তু এখনও—এই বর্ত্তমান যুগে—বাঙ্গালী সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। প্রত্যেক সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলার রক্ষায় জন্য বিভিন্ন আচার, নিয়ম ও তন্ত্রমন্ত্র আছে। এখন ভবিষ্যৎকে আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা কেন? দেশ ও কালকেই যদি উপন্যাসের বিশ্বকর্ম্মা ভাবিতে হয়, তবে দেশ ও কালেরই অনুশাসন মানিয়া চলা উচিত। দেশ ও কালের উপযোগী করিয়াই উপন্যাস রচনা করা উচিত।

সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবন অপেক্ষা ব্যক্তির জীবন দীর্ঘকালস্থায়ী ; সুতরাং সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় শাসনের নাগপাশে বাঁধিয়া রাখিলে ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ অসম্ভব। ব্যক্তিত্বের দরিয়ায় মানবজীবনকে উচ্ছৃঙ্খলভাবে ভাসাইয়া দেওয়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের অনুকূল নহে। মুক্তির আনন্দের জন্য মানবাত্মা চিরকালই ব্যাকুল, কিন্তু গৃহধর্ম্মকে অবহেলা না করিয়া পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধের মূলে মানবাত্মা যে আনন্দ লাভ করে, গৃহীর পক্ষে তাহাই কাম্য। ত্যাগীর কথা স্বতন্ত্র। ত্যাগমার্গের আনন্দ অধিকতর প্রশস্ত। 'ঘরে-বাইরে'-র বিমলা ও সন্দীপ উভয়েই ভোগপরায়ণ গৃহী, উভয়েই সাধারণ মানুষ, গৃহীর আদর্শে উভয়েই মানসব্যভিচারী।

এমন কথাও শুনা যাইতেছে, যে, সন্দীপের সহিত বিমলার যে ভালবাসা, তাহা প্রেম। ইহাকে আমরা প্রেম বলি না, কাম বলি। সব চেয়ে 'লভ্' বলাই সঙ্গত। প্রেম এক জনকে অপরের অনুরাগী করে ; কামও তাহাই করে। কিন্তু কামের ভোগ অস্থায়ী ; প্রেমের ভোগ স্থায়ী। কান্তাভাবই সত্যকার প্রেম। প্রবল বাধা, দারুণ বেদনা, স্থায়ী বা অস্থায়ী বিরহের মধ্যে ভালবাসার দর যাচাই না করিলে, তাহা প্রেম কি কাম বুঝা যায় না। সত্যকার প্রেম অপরের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয় ; যাহা লয়, তাহা আর ফিরিয়া দেয় না ; যাহা পায়, তাহাতেই সে বিভোর থাকে। বিমলা সন্দীপকে সর্ব্বস্ব দেয় নাই, দিতে গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রচণ্ড কামোন্মত্ততায় ছট্‌ফট্ করিয়াছে। পরিবার, সমাজ, বা রাষ্ট্র তাহাকে সন্দীপের সহিত মিলনে বাধা দেয় নাই ; তথাপি সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া মিলিতে পারে নাই। বিমলা-জীবনের বিরহের হাঁপানী অসতী-জীবনেরই একটা পরিচ্ছেদ—মায়াকান্না। এইরূপ সর্ব্বজনগর্হিত কুৎসিত নারীজীবনকে আশ্রয় করিয়া কোনও সভ্য দেশের সভ্য জাতির সাহিত্যের আদর্শ সৌন্দর্য্যগর্ব্বে ফুলিয়া উঠিতে পারে না। এ চিত্রে আদর্শ নারীজীবনের অবমাননা করা হইয়াছে। প্রেম ছাড়িয়া যদি কামের কথাই বলা যায়, তবে কামের পূর্ণতাই বা বিমলায় কোথায়? পতনের সে উদ্দাম বেগ কোথায়? নরকের কাম ও স্বর্গের প্রেমের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের কটকের ন্যায় অবস্থানে আদর্শ নারীজীবন সৃষ্ট হয় না।

নিখিলেশের চরিত্রে অভিনবত্ব আছে। আর কোনও প্রশংসিত উপন্যাসের কোনও উচ্চশিক্ষিত নায়ক 'যাকে হৃদয়ের হার করব তাকে চিরদিন আমার হৃদয়ের বোঝা করতে পারব না'—এমন কথা বলিয়া, তাহার বিবাহিতা পত্নীকে বাহিরের আগুনে ঝলসিয়া, সতীত্বের নূতন আদর্শের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছে কি না, জানি না। ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য ঔপন্যাসিকই জানেন, কিন্তু কোনও গুণগ্রাহী লেখকের মতে, 'নিখিলেশের এই আদর্শের উপর যে দাম্পত্য প্রতিষ্ঠিত, এই যুক্তিপ্রধান যুগে তাহা অবজ্ঞার জিনিস নহে।' কেন? শ্রদ্ধা জিনিসটি কি এতই সুলভ যে,

এক জন পাপ ও হীনতার মধ্যে তাহার স্ত্রীকে ডুবাইয়া ধরিবে, আর বিশ্বের আকাশ হইতে তাহার উপর পুষ্পবর্ষণ হইবে? নিখিলেশ সত্যরূপের সাধক হউক, ক্ষতি নাই; কিন্তু সে যদি শিক্ষিত হয়, জ্ঞানী হয়, তবে সে বুঝিবে না কেন, মিথ্যার জগতে সত্যের প্রকৃত রূপ দেখা যায় না? নিখিলেশ তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু সন্দীপকে উত্তমরূপেই চিনিত। সে অবশ্যই বুঝিত, জগতে যদি কোথাও সত্যের রূপ দেখা যায়, তবে তাহা সন্দীপের কাছে নহে। তথাপি সে সন্দীপের সহিত বিমলার মিলনে বাধা দেয় নাই কেন? অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা কোনও কালেই আত্মার মুক্তির পথ সরল করিতে পারে না, ইহা নিখিলেশ না বুঝিলেও, নিখিলেশের চরিত্রস্রষ্টার—যিনি নিখিলেশের হৃদয়ে মোহ ও সত্যপ্রীতির মধ্যে বিরোধ স্থাপন করিয়াছেন—বুঝা উচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথের মতের সমর্থন বা 'ঘরে বাইরে'-র উপাদেয়তা সপ্রমাণ করিতে গিয়া এক লেখক স্পষ্টই বলিয়াছেন,—'দেবতা না হইলেও স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা আর অধিক দিন এ যুগে চলিবে না; কারণ, ইহা যুগধর্ম্মের প্রতিকূল।' ইহার উত্তরের সুর কোমল পর্দ্দায় উঠে না। যুগধর্ম্ম কি এতই প্রতিকূল হইয়াছে যে, স্বামী তাহার স্ত্রীকে পরকীয় প্রীতির গরল পান করিতে বাধ্য করিয়া অসতী-দিগের পর্য্যায়ভুক্ত করিবে? না, মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশে বাধা দিয়া মানবসমাজে পশু-ভাব জাগিয়া উঠিবে? উদ্দামলালসা চরিতার্থ করিবার পথ খুলিয়া যাইবে? যদি তাহাই হয়, তবে তথাকথিত যুগধর্ম্মের প্রতিকূলে বিদ্রোহী হইয়া দেবতা না হইলেও স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে নারীজাতিকে বাধ্য করা কর্ত্তব্য হইয়াছে।

এই কর্ত্তব্যপালনের বিধিদত্ত শক্তি অধিকাংশ পুরুষ এখনও হারায় নাই। পুরুষের শক্তির কাছে নারী তাহার কর্ত্তব্য ভুলিয়া থাকেন, ইহা সমর্থনযোগ্য না হইলেও, নারী যখন আত্মোন্নতি বা আত্মার মুক্তির দোহাই দিয়া মানবজাতির অকল্যাণের হেতু হইবেন, তখন শক্তিপ্রয়োগে তাঁহাকে সুপথে আনাই কর্ত্তব্য। পুরুষের ন্যায় নারীরও কর্ত্তব্য বিচার করা যাইতে পারে। নারী শুধু স্ত্রী নহেন, তিনি জননী, তিনি ভগিনী, তিনি প্রতিবেশিনী। শক্তি ও অধিকারের বিচার করিয়া আত্মার প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যবোধও থাকা উচিত; কিন্তু পুরুষের ন্যায় সকল রকমের কর্ত্তব্য সমানভাবে পালন করা নারীর পক্ষেও অসম্ভব। অর্থদানে দরিদ্রের দুঃখমোচন করা ব্যক্তিবিশেষের সাধ্যায়ত্ত হইলেও, যে ব্যক্তি সৎপথে থাকিয়া নিজের উদরান্নেরই সংস্থান করিতে পারে না, সে কিরূপে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিবে? যে নিজে দুর্ব্বল, সে কি কখনও সবলের হাত হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে পারে? আরও এক কথা, মানবজীবনের কর্ত্তব্য-গুলির একটি ক্রম আছে। ধাপের পর ধাপে উঠিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। স্বামী যদি দেবপ্রকৃতির লোক না হইয়া পশুপ্রকৃতির লোক হয়, স্ত্রীর ধর্ম্মাচরণে বিঘ্ন হয়, তবে স্বামীকে সুপথে আনিবার চেষ্টা করা স্ত্রীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। স্বামী পাপী, অতএব পত্নীকেও পাপিনী হইতে হইবে, ইহা যুক্তিযুক্তও নহে, হিন্দু বা অন্য কোনও সুসভ্য জাতির আদর্শের অনুকূলও নহে। রবীন্দ্রনাথ সত্যভ্রষ্ট নিখিলেশকে আদর্শ জগতের মানুষ গড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সত্যভ্রষ্ট নিখিলেশ বিমলার প্রতি তাহার নিজের কর্ত্তব্য কতটুকু পালন করিয়াছে? বিমলা যাহাতে বুকের বোঝা না হয়, এ রকমের চিন্তা আদর্শ জগতের লোকের

পক্ষে সম্ভব হইলেও, যাহাকে হৃদয়ের হার করিবার জন্য তাহার এতই আগ্রহ, সেই বিমলার প্রতি তাহার কর্ত্তব্য কি শুধু অন্যের কর্ত্তব্যের সঙ্গে বিমলার কর্ত্তব্যের যোগ করিয়া দেওয়া? তাহা হইলে স্বামীর এত বড় অকর্ত্তব্য এ জগতে আর কিছুই নাই। কোনও শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক সংস্কারের চশমা চোখে দিয়া নায়ক-নায়িকার সৃষ্টি না করিলেও, তিনি স্ত্রী ও পুরুষে আত্মা সমভাবে বিদ্যমান ভাবিয়া, একের কর্ত্তব্যের জন্য অন্যের কর্ত্তব্য বলি দিতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ বিমলার আত্মার মুক্তির পথ খুঁজিতে গিয়া নিখিলেশের চরিত্র কিস্তুতকিমাকার করিয়াছেন; কাজেই নিখিলেশকে অজ্ঞানী ও অশিক্ষিতের রূপেই পাওয়া যায়।

বিমলার কথায় হিন্দুর সতীত্বের আদর্শের কথাও উঠিয়াছে। এমন কথাও ছাপার অক্ষরে দেখিতেছি—'সীতা ও দময়ন্তীর পাতিব্রত্য ও স্বামীভক্তি মাত্র অন্ধনিয়মানুবর্ত্তিতা নহে। স্ত্রীপুরুষের যে সমান প্রেমের সম্বন্ধ, স্বামী যে কেবল স্বামী বলিয়াই দেবতাস্থানে পূজার যোগ্য নহেন, তাঁহার নিজের গুণ ও চরিত্রবলেই পূজার যোগ্য, তাহা তাঁহাদের কাহিনী হইতে বেশ বুঝা যায়।' কিন্তু হাটে, মাঠে ও ঘাটে প্রেমের দর যাচাই করিয়া বেড়াইয়া আত্মার মুক্তির পথ সরল করিবার চেষ্টা সীতা ও দময়ন্তীর চরিত্রে আমরা পাই না। রাম ও নলের চরিত্র প্রকৃতই উদার, কিন্তু তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় স্ত্রীবর্জ্জন করিয়াছিলেন। সীতার অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল। রাম বুঝিয়াছিলেন, সীতা সতী, তথাপি তিনি প্রজার মনস্তুষ্টির জন্য সীতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। আর 'বুকের বোঝা' পরপুরুষের প্রণয়লুব্ধা বিমলাকে জানিয়া ও চিনিয়া নিখিলেশ হৃদয়ের হার করিয়াছিল। উভয় আদর্শের সমতা নাই? আছে—যেমন রামে আর রামছাগলে! বিনা অপরাধে নল দময়ন্তীকে ত্যাগ করিয়া গেলেন, তথাপি নলের প্রতি দময়ন্তীর প্রগাঢ় অনুরক্তি—তাহা কি অন্ধনিয়মানুবর্ত্তিতা নহে? এই 'কবির চিত্তফুলবন-মধু'র যুগে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির মাপকাঠীতে স্বামী ও স্ত্রীর সমান প্রেমের সম্বন্ধ নির্ণয় করা হইতেছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির খিড়কী দরজা খুলিয়া অভিসারে যাত্রা করার চেয়ে সে যুগের সতীরা অন্ধনিয়মানুবর্ত্তিতার 'অচলায়তনে'র মধ্যে পড়িয়া থাকাই গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। সে যুগের প্রেম ছিল—মিলনবিরহ-জগতের অতুলনীয় কবিত্ব, বিশ্বের অপূর্ব্ব সঙ্গীত। সে প্রেমে এ যুগের স্বার্থ ছিল না, সে যুগের পরার্থ ছিল। সে যুগের প্রেমের জীবনের সর্ব্বস্বদানজনিত তন্ময়তার আদর্শের সহিত এ যুগের প্রেমের 'ভালবাসতে এসে কাঁদব কেন সই!' এই আদর্শ খাপ খায় না। সে যুগের লোক দেশাচার ও লোকাচারের মধ্যে সত্যের পূর্ণ রূপ দেখিতেন। তাঁহারা বুঝিতেন, যাঁহারা আচারনিয়মের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহারা দিব্যজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। এ যুগেও অনেকে তাহা বুঝেন; বুঝেন না কেবল তিনি, যিনি 'অচলায়তনে'র বাহিরে কল্পনার হাওয়ার মধ্যে বিশ্বরূপ তথা সত্যের পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিবার আশা করেন, এবং তাঁহার স্তাবকবর্গ। সে কথা যাউক। তাহার পর ইহাও শুনিতে হইতেছে,—'সীতা ও দময়ন্তী অসাধারণ গুণমুগ্ধ হইয়াই রাম ও নলের গলায় বরমাল্য দান করিয়াছিলেন। অর্থাৎ শুধু ঘরে নহে, বাহিরের মধ্যেও তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে পাইয়াছিলেন। নিখিলেশের আদর্শও তাহাই।" কথাটা কত দূর সত্য, বিচার করা আবশ্যক। বিবাহের পূর্ব্বে নলের প্রতি দময়ন্তীর অনুরাগসৃষ্টির কারণ আছে,

কিন্তু তাহা ঘরেরই মধ্যে, ঘরের বাহিরে নহে। জনকের ধনুর্ভঙ্গ পণ সীতাকেও ঘরের বাহিরে আসিবার অবসর দেয় নাই। সীতা রামকে পাইয়াছেন, রামকেই ভালবাসিয়াছেন। সীতা ও দময়ন্তী ঘরে নহে, বাহিরেও তাঁহাদের প্রণয়পাত্রের প্রেমের সহিত অন্য পুরুষের প্রেমের তুলনা করিয়া প্রকৃত প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছিলেন, এমন কথা এ দেশে শুনিলেও পাপ হয়। 'অসাধারণ গুণমুগ্ধ হইয়াই সীতা রামের গলায় বরমাল্য দিয়াছিলেন' কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। অসাধারণ গুণমুগ্ধ না হইলেও সীতা রামচন্দ্রের গলায় বরমাল্য দান করিতে বাধ্য হইতেন; কারণ, রাম হরধনু ভাঙ্গিয়াছিলেন। পূর্ব্বে স্বয়ংবর-সভায় রাজকুমারীদের (সাধারণ গৃহস্থকুমারীদের নহে) পাত্রনির্ব্বাচন হইত। রাজকুমারী সভায় উপস্থিত হইয়া বিবাহার্থী সমবেত রাজন্যবর্গের পরিচয় লইতেন; তাহার পর এক জনের গলায় বরমাল্য দিতেন; কিন্তু কোনও বিবাহিতা রাজকন্যার জন্য স্বয়ংবর-সভার অনুষ্ঠানের কথা শুনা যায় না। স্বয়ংবর-সভায় 'নিমেষের তরে দেখা'র মধ্যে পাত্রের প্রকৃত গুণবিচার অসম্ভব। তবে রূপবিচার অল্প সময়েই হয়। বরের রূপই কন্যার বরণীয়। সে রূপের মধ্যে গুণ থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে। কোনও কোনও স্থলে রাজকুমারী লোকের মুখে পাত্রের রূপগুণের কথা শুনিতেন, কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রের শৌর্য্যবীর্য্য ছাড়া অন্য কোনও গুণের পরীক্ষা হইত না। পুরাণে যে সকল রাজকুমারীর স্বয়ংবরের কথা শুনা যায়, তাঁহাদের কেহ এক জনকে পতিত্বে বরণ করিয়া পরে আত্মার মুক্তির জন্য পরপুরুষের ভজনা করিয়াছেন, এমন কথা শুনা যায় না। যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক, হিন্দুর সতী রমণীরা সকল অবস্থাতেই পতির অনুগামিনী ছিলেন। সুতরাং 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিমলা-চরিত্রে সতীত্বের যে নূতন আদর্শ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সহিত হিন্দুর সতীত্বের আদর্শের কোনও যোগই নাই। কিন্তু হিন্দুর সতীত্বের আদর্শ যতই উন্নত হউক, তাহা সার্ব্বজনীন নহে, কাজেই সত্যের দিক দিয়া এই আদর্শের বিচার করা অশোভন হইবে। 'ঘরে বাইরে'-র আদর্শ মানুষের পূর্ণ পরিণতি ও বিকাশের দিক্ দিয়াই সত্যের কত দূর সমর্থন ও প্রচার করিয়াছে, তাহা দেখিলেই যথেষ্ট হইবে।

নিখিলেশের আদর্শ—স্ত্রী পুরুষ সকলেই আপন আপন জীবনের সম্ভাবনাকে সত্য করিয়া তুলুক, অর্থাৎ—চলিত কথায়—'চাচা আপন বাঁচা'। ইহা মানুষের পূর্ণ পরিণতি ও বিকাশের অনুকূল নহে। পরের সাহায্য না লইয়া মানুষ নিজে নিজে পূর্ণ হইতে পারে না। নিজের স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া থাকিলে মানুষের পূর্ণ বিকাশ হয় না। পরের প্রতি যে কর্ত্তব্য, তাহার সম্পাদনেই মনুষ্যত্বের সার্থকতা। মানুষ যখন পূর্ণ হয়, তখন সে বুকের বোঝাকে বুকের হার করিয়া লইবার প্রয়াসী হয়; তখন সে বলে—'মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে' কি প্রেম দিব না ?' আর নিখিলেশ ? সে নিজের আদর্শে স্থির থাকিতে পারে নাই, জীবনে উৎকট সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া অপূর্ণ জীবনের মোহে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কোনও নায়কের মুখে 'মিথ্যা কথা বলা বড় দোষ' বলাইয়া তাহাকে মিথ্যা কথা বলাইলে, তাহার চরিত্রকে যেমন খর্ব্ব করা হয়, নিখিলেশের চরিত্র সেইরূপই হইয়াছে। কেবল কথা

নিখিলেশের চরিত্র-বিচার করিলে তাহার আদর্শ বেশী রকমের individualistic ছিল, মনে হয় না ; বরং মনে হয়, ঔপন্যাসিক নায়কের মুখ দিয়া individualismএর কতকগুলা কড়া কথা বাহির করিয়াছেন, কিন্তু সে সকল কথায় নায়কের প্রাণ সাড়া দেয় নাই।

নিখিলেশ ও বিমলার চরিত্রসৃষ্টি ছাড়া 'ঘরে বাইরে'তে আর একটি সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি আছে। তাহা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বস্তু—মনগড়া আর্ট। এই নবাবিষ্কৃত আর্টের প্রভাবে অসম্ভব সম্ভব হয়। এই সোনার কাঠী বারযোষার গায়ে ঠেকাইলে সে গৃহস্থের কুলবধূ হইয়া যায়। কোনও উপন্যাসে সুখ্যাতির আর কোনও কথাই যখন পাওয়া যায় না, তখন সেই উপন্যাস-লেখক এই সোনার কাঠী মাথায় তুলিয়া অনায়াসে বলিতে পারেন, 'তবেই ত মহাশয়, আর্টের দিক্ দিয়া ত ইহার বিচার হইল না!' এই তথাকথিত আর্টের জোরেই আজকাল অনেকগুলি উপন্যাস 'বাঙলা' ও 'বাংলা' সাহিত্যকে এতই পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিয়াছে যে, বট-তলার দোকানদারদের নাকি আর অন্ন জুটিতেছে না। কেহ কেহ আশঙ্কা করেন, 'সচিত্র প্রেমপত্র' নাকি আর মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে না ; কারণ, উক্ত গ্রন্থের তত্ত্বটুকু বিশ্লেষিত হইয়া ম্যালেরিয়া জ্বরের ন্যায় উপন্যাসের-আকারে বাঙ্গালা দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

আর্টের তর্কবিতর্ক কিছু দিন হইতে চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'মানবপ্রকৃতির মধ্যে নিয়মলঙ্ঘন করার একটা বেগ আছে, কিন্তু সেটা কি সাহিত্যে বর্ণনা করবার বিষয়? আমি এ বিষয়ে নিরুত্তর থাকলেও ক্ষতি হবে না।' তাঁহার গুণগ্রাহীরা তাঁহার কথার সমর্থন করিয়া বলেন, 'প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সমাজের অঙ্কিত গণ্ডীর বাহিরে চলিবার ইচ্ছা মানুষের হৃদয়ে চিরন্তন। জীবনে ইহা আমরা সততই দেখিতেছি ; তবে আর্টে ইহার প্রকাশকে জোর করিয়া বাধা দিয়া তাহাকে কৃত্রিম করিব কেন?'

এ স্থলে সংক্ষেপে ইহাই বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে, আর্ট কোনও কোনও স্থলে লৌকিক ধর্ম্ম ও নীতিকে অবহেলা করিয়া নূতন ধর্ম্ম ও নীতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে ; কিন্তু লৌকিক ধর্ম্ম ও নীতিকে অবহেলা করিতে গিয়া আর্ট সাধারণ মানবসমাজ ও সহজ মানবধর্ম্মকে অবহেলা করিবে কেন? মানুষের সঙ্গে এক দিকে যেমন অসংযত মানুষের প্রবৃত্তির উত্তেজনা আছে, অন্য দিকে তেমনই সংযত মানুষের ধর্ম্ম ও নীতি আছে। সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই যদি আর্টের কাজ হয়, তবে তাহা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি—উভয় পথেই চলিবে। কিন্তু আর্ট যেখানে পূর্ণ সত্যের রূপ দেখাইবে, সেখানে উহা একটিকে আদর করিয়া মাথায় তুলিয়া অপরটিকে চরণে দলিয়া চলিয়া যাইতে পারিবে না। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অনুসরণকারিগণ কৃত্রিমতাকে ভয় করেন, আমরাও ভয় করি। ভয় করি বলিয়াই বলিতেছি, তিনি বাহিরের বিমলাকে জোর করিয়া ঘরে আনিলেন কেন? মডেল-ভগিনীর স্বামী রাধাশ্যামের মত নিখিলেশ তাহার 'বুকের বোঝা' বিমলাকে ছুঁড়িয়া ফেলিলে আর্ট-হিসাবে 'ঘরে বাইরে' কৃত্রিম হইত কি? রবীন্দ্রনাথ কি বিনোদিনীকে কাশীতে পাঠাইয়া মানবজীবনের সহজ উদ্দামগতিতে বাধা দেন নাই?—সংস্কারের খাতিরে, যাহা জীবনে সনাতন সত্য ও স্বাভাবিক, তাহার প্রতি অন্ধ হয়েন নাই?

এতক্ষণ 'ঘরে বাইরে'র গুণগ্রাহীদের কথারই আলোচনা করিলাম। উপসংহারে ঔপন্যাসিকের সহিত একটু পরিচয় করিয়া লইলে ক্ষতি কি?

মনোজগতের সত্যের সমর্থন ও প্রচার করিবার অধিকার উপন্যাসিকের আছে, এ কথা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু তিনি কি দৃশ্যমান জগতের কেহই নহেন? দৃশ্যমান জগৎ হইতেই ভাবসংগ্রহ করিয়া যিনি মনোজগতে একটা আদর্শের সৃষ্টি করেন, তিনি দৃশ্যমান জগতের সত্য ও মিথ্যা, মঙ্গল ও অমঙ্গলের দিকে লক্ষ্য না করিলে দৃশ্যমান জগতের দেনা-পাওনা তাঁহার অস্বীকার করা হয়। দৃশ্যমান জগতের সহিত মনোজগতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া উপন্যাসলেখক যাহা দান করেন, তাহা ও তাহার কৌশল উপন্যাসে দেখিবার বস্তু। যেখানেই সেই সামঞ্জস্যের অভাব হয়, সেইখানেই অসম্ভব একটা মূর্ত্তি গড়িয়া উঠে। দৃশ্যমান জগতে গাছে পাতা হয়। পাতায় গাছ হয়—এমন কথায় মনোজগৎ সাড়া দেয় না। দৃশ্যমান জগতের বাস্তবেরই ভিত্তির উপর মনোজগতের আদর্শের প্রতিষ্ঠা। আদর্শ যতই সূক্ষ্ম, যতই ব্যাপক, যতই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হউক, তাহা বাস্তবের অস্তিত্ব লোপ করিতে পারে না। বাস্তবের লোপে আদর্শের লোপও অবশ্যম্ভাবী। কাজেই আদর্শ বাস্তবকে অবহেলা করিতে পারে না। কিন্তু বাস্তবের সেই একই রূপ; তাহাতে মনোহারিত্ব নাই। আর আদর্শ নিত্য নূতন মূর্ত্তিতে আসিয়া দেখা দেয়; তথাপি তাহাকে বাস্তবের মূলের সহিত সংযোগ রাখিয়া চলিতে হয়। সেই জন্য আদর্শমূলক উপন্যাসে দেখিতে হয়, তাহা বাস্তবের যোগ হারাইয়াছে কি না। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস নিখিলেশকে আশ্রয় করিয়া যে আদর্শ সত্যের প্রচার করিয়াছে, সাধারণ মানবজীবনে তাহা দুর্লভ হয় হউক, কিন্তু অসম্ভব ও অস্বাভাবিক হইলে চলিবে না। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করাই যখন মানুষের স্বভাব, তখন যে সত্যের আদর্শ সাধারণ মানব-সমাজের ও সমাজধর্ম্মের অনুকূল নহে, তাহা অস্বাভাবিক। মনে হয়, এই কারণে, 'ঘরে বাইরে'র উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। যাহাকে আমরা হৃদয়ের হার করিতে চাহি, তাহাকে বুকের বোঝা করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি না। যে বিমলার পাপ ও হীনতার ছবি আদর্শ সত্য-জগতের নিখিলেশকেও বিচলিত করিয়াছে, তাহা সমগ্র মানবজাতির বুকের বোঝা। ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিভাশালী রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত দান বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আয়ুঃ।

৩

প্রশ্ন ছিল, (ক) আয়ুঃ কিসের উপর নির্ভর করে? (খ) শেষই বা হয় কেন? (গ) বহুকোষ জীবকে কি অমর অথবা দীর্ঘায়ুঃ করা যায়? দেখা যাইতেছে, (ক) ও (খ) প্রশ্ন প্রায় একই। আয়ুঃ যাহার উপর নির্ভর করে, তাহার বিপরীত ঘটনা হইলেই আয়ুঃ শেষ হইল; অর্থাৎ, মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, (১) স্বাভাবিক মৃত্যু জীববিবর্ত্তনের ফল; (২) স্বাভাবিক

মৃত্যু দেহকোষের দুর্ব্বলতা ও ক্রিয়াক্ষীণতা হইতে ক্রমে ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হয়; (৩) প্রধান দুইটী লক্ষণ সম্বন্ধে স্বাভাবিক মৃত্যু Sclerosis নামক পীড়ার ন্যায়।

পূর্ব্বের আলোচনা স্মরণ করিলেই (ক) সুতরাং (খ) প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতেছে। মৃত্যু * জীববিবর্ত্তনের ফল; সুতরাং বংশানুক্রমের অনুগত। বিবর্ত্তনবশতঃ দেহের যে জটিলতা ঘটিয়াছে, মৃত্যু তাহার উপর নির্ভর করিতেছে। দেহস্থ ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের ক্রিয়ার মধ্যে কালক্রমে যে অসামঞ্জস্য উপস্থিত হইবেই, মৃত্যু তাহার উপরও নির্ভর করিতেছে। দেহস্থ কোষ সকলের ক্রিয়াক্ষীণতাও এই শ্রেণীর কারণ। দেহে যে সকল শ্বেত রক্ত-কীট আছে, তাহারা এককোষ জীব; দেহের কোনও যন্ত্র দুর্ব্বল কিংবা তাহার ক্রিয়া ক্ষীণ হইলেই উহারা সে যন্ত্র খাইয়া ফেলে। ইহার উপরও মৃত্যু নির্ভর করিতেছে। জীবকোষ স্বভাবতঃই ভাঙ্গা-গড়ার অধীন; কারণ, জীবজন্তু অস্থায়ী পদার্থ। এ নিমিত্ত ও সুখাদ্য ও সদ্বায়ুর অভাবে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। খাদ্যবস্তু হইতে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে বিষবৎ পদার্থও আছে; তদ্দ্বারা কোষ সকল দূষিত হইয়া ক্রমে মৃত্যু আসিতে পারে। ঐ সকল রাসায়নিক পদার্থ মলমূত্রের সহিত পরিত্যক্ত না হইয়া কোষসূত্রে যুক্ত হইলে, এবং রক্ত-সঞ্চালনের ত্রুটী হইলে, Sclerosis পীড়ার লক্ষণ সকল দেখা যায়। হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক প্রভৃতি অত্যাবশ্যক দেহযন্ত্রে ঐ সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই পরিণামফল, মৃত্যু।

সুতরাং মৃত্যু এতগুলি অনিবার্য্য (?) কারণের উপর নির্ভর করিতেছে। এ সকল পূর্ব্বেও বলিয়াছি। কিন্তু এ সকল উল্লেখ করিলেই যে মৃত্যুর কারণ নিঃশেষে বলা হইল, তাহা নহে। আমি কেবল অতি সংক্ষেপে সহজবোধ্য কতিপয় কারণের উল্লেখ করিয়াছি। যাহা হউক, যত দিন দেহস্থ ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের ক্রিয়ার জটিলতা ও অসামঞ্জস্য বন্ধ না হইতেছে; যত দিন দেহস্থ রক্তকীট-গুলির দুঃস্বভাব সংশোধিত না হইতেছে; যত দিন আহার্য্যবস্তু দেহে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার দুষ্ট রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা কোষ সকলকে আক্রমণ করা বন্ধ না হইতেছে,—তত দিন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার আশা করা সঙ্গত হয় না। দেহের বিভিন্ন যন্ত্রের ক্রিয়ার রোধ অথবা প্রায় রোধ করিতে পারিলে, খাদ্যবস্তু ও বায়ু দেহ-মধ্যে গ্রহণ না করিতে পারিলে, অমর অথবা দীর্ঘায়ুঃ

* অন্য কোনও বিশেষণ না থাকিলে, মৃত্যু শব্দে স্বাভাবিক মৃত্যু বুঝিতে হইবে।

হইবার আশা করা যায়। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? আমি দেখাইব যে, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক উপায়ে, অসম্ভব হইলেও, বস্তুতঃ অসম্ভব নহে।

শ্বাসের সহিত অম্লজান দেহমধ্যে যাইয়া অপরিষ্কারকে পরিষ্কৃত করে, দুর্ব্বল যন্ত্রকে সবল করে; কিন্তু চিরদিন করিতে পারে না। শ্বাসযন্ত্রই ক্রমে বিকল হয়; সুতরাং শ্বাসের অম্লজানের দ্বারা দেহের ক্ষতিপূরণের কোনও আশা করা যায় না। আহারের উপরও কোনও আশা করা যায় না। বাল্যকাল হইতে যৌবনকাল পর্য্যন্ত আহার দ্বারা দেহের দুর্ব্বলতা দূর হইতে পারে; কিন্তু যৌবনের শেষভাগে এমন এক সময় উপস্থিত হয় যে, তখন আর দেহকোষের দুর্ব্বলতা খাদ্যবস্তুর সার দ্বারা সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব নহে। ইহারই পরিণাম-ফল, মৃত্যু। আহার দ্বারা দেহকোষ যে পরিমাণে পুষ্ট হইবে, অন্যান্য কারণে তদপেক্ষা অধিকপরিমাণে দুর্ব্বল হইবে। সুতরাং জমা অপেক্ষা খরচ বেশী হইলে যাহা হয়, দেহস্থ কোষ সকলেরও তাহাই হয়। পরিণামফল—"দেউলে পড়া", অর্থাৎ, অবসাদ ও মৃত্যু।

দেহকোষের মৃত্যু হইলে তাহা পরিত্যক্ত হয়, এবং তৎ-স্থলে নূতন কোষ জাত হয়। নচেৎ মৃত কোষ পার্শ্ববর্ত্তী সুস্থ কোষকেও দূষিত করে। কিন্তু নূতন কোষ সকল পূর্ব্বের কোষের ন্যায় অবসন্ন ও ক্ষীণ হইলে, উহারাও পরিত্যক্ত হয়, এবং উহাদিগের স্থানেও পুনরায় নূতন কোষ জাত হয়। এইরূপে বহুবার কোষপরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যত দিন এইরূপ হয়, তত দিন মৃত্যু আসিতে পারে না। কিন্তু চিরদিন কোষপরিবর্ত্তন হয় না। এ পরিবর্ত্তনের সংখ্যা [ন্যূনাধিক] বংশানুগত। এই সংখ্যা স্বভাবতঃ শেষ হইয়া গেলে, মৃত্যু উপস্থিত হয়। এ দিক হইতে দেখিলে, বলিতে হয় যে, মৃত্যু কোষ-পরিবর্ত্তনের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। ইহা সুখাদ্য ও সদ্বায়ু দ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারে না।

কোষের দুর্ব্বলতা এবং অক্ষমতার দিক হইতে মৃত্যুকে এই ভাবে বিবেচনা করা যায়। কিন্তু যাহাকে ডাক্তারগণ Sclerosis পীড়া বলেন, বার্দ্ধক্য যখন তাহাই, তখন মৃত্যু চিরদিন অচিকিৎস্য থাকিতে পারে না। Sclerosis রোগ বর্ত্তমান সময়ে অচিকিৎস্য। বার্দ্ধক্যেরও যখন প্রধান লক্ষণ দুইটী ঐ পীড়ার ন্যায়, তখন বার্দ্ধক্যও বর্ত্তমান সময়ে অচিকিৎস্য; অর্থাৎ, বর্ত্তমান সময়ে কোনও প্রকারেই বার্দ্ধক্যের আক্রমণ হইতে দেহকে রক্ষা করা সম্ভব নহে। বলিয়াছি, কতিপয় রাসায়নিক পদার্থ কোষসূত্রে যুক্ত হইয়া উহাদিগকে শক্ত, ভঙ্গপ্রবণ এবং কোষগুলিকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে; তাহাতেই কোষ এবং কোষসূত্রের

ক্রিয়া ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসে। ইহারই নাম বার্দ্ধক্য; ইহারই পরিণাম, মৃত্যু। সুতরাং ইহাকে নিবৃত্ত করিতে হইলে কোষসূত্রের সহিত এ সকল রাসায়নিক পদার্থের যোগ বন্ধ করিতে হয়। ঐ সকল পদার্থ আহার্য্যবস্তুর সহিত দেহে প্রবেশ করে। প্রথম বয়সে উহারা প্রায় সর্ব্বদাই মলমূত্রাদির সহিত পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু ঐ বয়সের শেষে আহারবিষয়ক অসংযম হইতে ক্রমে ঐ সকল পদার্থ দেহমধ্যে কিছু কিছু জমিতে থাকে, আর পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয় না। সুতরাং ক্রমে কোষ এবং কোষসূত্র সকলকে আক্রমণ করিয়া উপরের লিখিত লক্ষণগুলি উৎপন্ন করে; ইহারই স্থূল এবং সংক্ষিপ্ত নাম—বৃদ্ধাবস্থা। তবেই দেখা যাইতেছে যে, এ স্থলে আহারই মৃত্যু ডাকিয়া আনিতেছে। স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজ দেশবিখ্যাত; তিনি এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "ওগো বাবু, মানুষ খাইয়াই মরে, না খাইয়া মরে না।" কথাটী তখন বুঝি নাই, কিন্তু উহা অত্যন্ত সত্য কথা। যদি কোনওরূপে আহারটী একবারেই বন্ধ করা যায়, তবে ঐ সকল দুষ্ট রাসায়নিক পদার্থ জমিতেই পারে না। তাহার পর, কোষগুলির ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা, যাহা নানা কারণে উৎপন্ন হয়, তাহাও যদি বন্ধ করা যায়, তবে "খরচ" বন্ধ হইল; সুতরাং "জমা"র অর্থাৎ আহারের আবশ্যকতাই থাকিল না। এইরূপে মৃত্যুকে স্থগিত করা সম্ভব হয়; অন্ততঃ দীর্ঘায়ুঃ লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার পন্থা কি? কি কি উপায়ে তাহা করা যায়?

বলিয়াছি, দেহের বিভিন্ন যন্ত্রের ক্রিয়ার রোধ অথবা প্রায় রোধ করিতে পারিলে, এবং খাদ্য ও বায়ু দেহমধ্যে গ্রহণ না করিলে, অমর অথবা দীর্ঘায়ু হইবার আশা করা যায়। মানবেতর প্রাণিগণের মধ্যে এরূপ অনেকেই করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা দুই তিন মাসের অধিক কাল এরূপ করিতে সমর্থ হয় না। ঊর্দ্ধসংখ্যা দুই তিন মাস পর্য্যন্ত অনেক কীট, পতঙ্গ, শম্বূক, সরীসৃপ, মৎস্য ও স্তন্যপায়ী জীব অনাহারে [শ্বাসরোধ করিয়া] পড়িয়া থাকে; * তাহাতে মরে না। নানা শ্রেণীর জন্তু দেশভেদে কেহ বা শীতকালে, কেহ বা গ্রীষ্মকালে শ্বাস বন্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে; তখন তাহাদের রক্তের গতি ক্ষীণ হয়, দেহের তাপ কিছু কমিয়া যায়। মানুষ এই ক্ষমতা প্রায় হারাইয়াছে; কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হারায় নাই। রুসিয়ার Pskov প্রদেশের কৃষকগণ শীতকালটা ঘুমাইয়া কাটাইয়া দেয়; প্রতি দিন একবার জাগিয়া একটু রুটী খায়। আর জাগে না।

* ভেক ও সর্পের কথা সকলেই জানেন

সকল দেশেই কেহ কেহ ৮।১০ দিন অথবা তাহারও কিছু অধিক কাল একটু একটু জলমাত্র পান করিয়া থাকিতে পারেন। এই সময় তাঁহাদিগেরও দেহ-তাপ কমে, রক্তের গতির হ্রাস হয়, কিন্তু নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চলে। পঞ্জাবের হরিদাস সাধু অনাহারে শ্বাসরোধ করিয়া প্রায় এক মাস মাটীর নীচে ছিলেন। সুতরাং ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, মানবেতর প্রাণীর যে শক্তি স্বভাবতঃ আছে, মানব যাহা বিবর্ত্তনবশে প্রায় হারাইয়াছে, চেষ্টা করিলে তাহা পুনরায় লাভ করা অসম্ভব নহে। এ চেষ্টায় যোগিগণের কেহ কেহ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে।

মেক্‌নিকফ্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বাস করেন যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালী-মতেই মানবকে দীর্ঘায়ুঃ করা যায়; অমরও করা যাইতে পারে; কারণ, জীবনের সহিত মৃত্যুর নিত্য সম্বন্ধ নাই। ইহার সাক্ষী এক-কোষ জীব, যাহারা অমর। Sclerosis পীড়ার ঔষধ আবিষ্কৃত হইলে বার্দ্ধক্য অনেকপরিমাণে নিবৃত্ত করা যাইতে পারে, ইহা বিশ্বাস হয়। কিন্তু মৃত্যু [যোগের প্রক্রিয়া ব্যতীত] নিবৃত্ত হইতে পারে, এ কথা এখনও বিশ্বাস করিতে পারি না। এই সংকীর্ণ ধরাপৃষ্ঠে মৃত্যু নিবৃত্ত হইলে মানবের বাস করা সম্ভব, বিবেচনা হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে জীবনযাত্রা নিয়মিত করিতে পারিলে দীর্ঘায়ুঃ হইবার আশা করা অসঙ্গত নহে। ইহাও কম লাভের বিষয় নহে। অন্য প্রতিকূল কারণ না থাকিলে, বাছিয়া বাছিয়া দীর্ঘায়ুঃ বংশের নরনারীদিগকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করিতে পারিলে দীর্ঘায়ু অপত্যলাভের আশা করা যায়। দেহ স্বকর্ম্মজনিত দোষে ধ্বংস করা মহা পাপ। বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া, পানে ভোজনে সংযত হইয়া, ধার্ম্মিক-জীবন যাপন করিতে পারিলে, দীর্ঘায়ুঃ হওয়া যায়। যে দেশে ১২ লক্ষ লোক একমাত্র জ্বর রোগেই প্রাণত্যাগ করে, যে দেশে শিশুমরণ প্রায় শতকরা ২৫, সে দেশে এ কথা অবহেলা করা যায় না, ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। নচেৎ জাতীয় ধ্বংস নিবৃত্ত করিবার আশা সুদূরপরাহত। মহাত্মা গ্যাল্টন বলিয়াছেন,—"The next influence to be considered is that of healthy homes. These and a simple life certainly conduce to fertility. They also act indirectly by preserving lives that would otherwise fail to reach adult ages." অর্থাৎ, মোটামুটি "গরিবী চালে" চলিয়া শান্তভাবে জীবনযাপন করিলে বংশবৃদ্ধিও হয়, এবং অকালমৃত্যুর আশঙ্কাও প্রায় থাকে না। এতদ্দেশে বর্ত্তমান সময়ে এই উপদেশ গৃহে গৃহে স্মরণ রাখা অত্যাবশ্যক।

শ্রীশশধর রায়।

ভালবেস।

["Love me for ever"—by *R. Browning.*]

এইরূপে কেটে গেল সারাটা বছর,—
ভালবেস চির দিন হায়!
সমস্ত বসন্ত গেল আরম্ভ উদ্যোগে,
সুদীর্ঘ নিদাঘ গেল আকুল চেষ্টায়।—
ভালবেস চির দিন হায়!
বসন্তে পরিয়াছিনু যেই ফুলমালা—
গ্রীষ্মশেষে শুষ্ক ঝরে যায়;
এখন বরষা ঝরে,
তুহিন-বর্ষণ পরে
নিবাইবে নিদাঘের দারুণ জ্বালায়।—
ভালবেস চির দিন হায়!

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস।

৪

[গৌড়ধ্বজ গাঙ্গেয়দেব;—মহীপাল ও মিথিলা;—চোল-আক্রমণ;—চোল, পাণ্ড্য, এবং চের বা কেরলরাজ্য;—চালুক্যরাজ্য;—পল্লব রাজ্য;—খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দে দক্ষিণ-ভারতের অবস্থা;—মহীপালের সমসাময়িক চোলরাজা;—রাজেন্দ্র চোলের বাঙ্গালা-আক্রমণ ও তিরুমলয়-পর্ব্বতলিপি;—তিরুমলয়-লিপির মহীপাল কে?—তিরুমলয়-লিপির উল্লিখিত ওড্র, দক্ষিণ রাঢ় ও বঙ্গাল দেশ;—মহীপালের গৌড়রাজ্য;—বৌদ্ধধর্ম্মসংস্কারক অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান;—বৌদ্ধ তিব্বতের সহিত বাঙ্গালার সম্পর্ক;—বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি-আলোচনা;—প্রাচীন পাল-রাজত্বের সুকুমার শিল্প।]

'গৌড়ধ্বজ' গাঙ্গেয়দেব।

পূর্ব্বোদ্ধৃত রামায়ণের হস্তলিখিত পুঁথিতে গাঙ্গেয়দেবের গৌড়ধ্বজ বিশেষণ হইতে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি গৌড়রাজ্যে আপনার প্রধান্য দাবী করিতেন। কলচুরি-বংশীয় অপর কোনও রাজা কর্ত্তৃক গৌড়ধ্বজ-উপাধি-ধারণের প্রমাণ নাই; কলচুরি-বংশীয় নৃপতি সোমদেবের ১০৭৯ খৃষ্টাব্দের যে তাম্রশাসনখানি গোরক্ষপুর

জেলার কহলা-গ্রামে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে এইরূপ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় যে,—খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দে মিথিলাতেও একটি কলচুরি রাজবংশের অস্তিত্ব ছিল। উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে,—কলচুরি-বংশীয় গুণাম্বোধিদেব বা গুণসাগর, ছয় পুরুষ পূর্ব্বে, গৌড়রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

রমাপ্রসাদ চন্দ বলেন,—মগধ যে সময় নিঃসংশয়রূপে গৌড়াধিপ প্রথম মহীপালের অধিকারভুক্ত ছিল, এবং মগধের পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী জেজাকভুক্তি যে সময় চন্দেল্লরাজগণের অধিকৃত ছিল, সে সময় কলচুরিগণ কখনই মধ্যপ্রদেশ হইতে তাহাদের ডিঙ্গাইয়া মিথিলা অধিকার করিতে পারেন নাই; এবং রমাপ্রসাদ বাবু অনুমান করেন, নেপালী রামায়ণের উল্লিখিত গাঙ্গেয়দেব হয় ত গৌড়রাজ মহীপালের কোনও সামন্ত নরপাল ছিলেন।

সত্য কথা এই যে, এই সকল প্রশ্নের নিঃসংশয় মীমাংসার উপযোগী যথেষ্ট প্রমাণ এক্ষণে আমাদিগের নিকট উপস্থিত নাই।

গৌড়াধিপ প্রথম মহীপাল যে কোনও সময়ে বারণসীতে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, সারনাথ প্রস্তর-লিপি তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ নহে। বর্ত্তমানের

মহীপাল ও মিথিলা।

ন্যায় সারনাথ যে তৎকালেও বৌদ্ধগণের তীর্থস্থান ছিল, এবং নানা দিগ্‌দেশ হইতে বৌদ্ধগণ তথায় আগমন করিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; এবং সারনাথ আপন অধিকারে না হইয়া কোনও বিদেশীয় মিত্র নৃপতির রাজ্যান্তর্ভুক্ত থাকিলেও, মহীপালের পক্ষে নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধরূপে সারনাথের জীর্ণসংস্কার করাইয়া দেওয়া, এবং বহু মন্দির ও শৈলগন্ধকূটি নির্ম্মাণ করাইয়া দেওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। আবার, মজঃফরপুরে ধাতবমূর্ত্তিতে যে লেখ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারাও ইহা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয় না যে, মিথিলার কোনও অংশ মহীপাল কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল। মিথিলার কতক অংশ মহীপালের শাসনাধীন থাকা, এবং কতক অংশ চেদীর মূল রাজবংশীয় কলচুরিগণের অথবা তাহার কোনও শাখার কলচুরিগণের শাসনাধীনে থাকা আদৌ অঘটন ব্যাপার নহে।

সুতরাং, কলচুরিগণের শাসিত রাজ্য যে এক অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড ভূভাগ ছিল, এরূপ অনুমান করা যায় না; প্রতীহারদিগের, চন্দেল্লদিগের, অথবা গৌড়ের পালদিগের অধিকৃত প্রদেশ কর্ত্তৃক বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন প্রদেশ তাঁহাদিগের শাসনাধীন ছিল—ইহা অসম্ভব নহে। গৌড়াধিপের বশংবদ কোনও মিত্রনৃপতির পক্ষে 'গৌড়ধ্বজ'-উপাধি অনুপযোগী নহে, এবং কলচুরি-বংশীয় কোনও সামন্তরাজ

ঐরূপ মিত্র-নৃপতি হওয়াও বিচিত্র নহে। মূল কলচুরি-বংশীয়দিগের, স্বাধিকৃত প্রদেশের কতকাংশের নিমিত্ত গৌড়েশ্বর মহীপালের অধীনতা-স্বীকার করাও সম্ভব হইতে পারে।

দক্ষিণ দিক হইতে পরাক্রান্ত রাজা রাজেন্দ্রচোল কর্ত্তৃক বাঙ্গালা-আক্রমণই মহীপালের রাজত্বকালের একটি প্রধান ঘটনা; মান্দ্রাজ প্রদেশের উত্তর আরকট জেলার পোলুরের নিকট তিরুমলয় পর্ব্বতের গাত্রে তামিল ভাষায় তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই আক্রমণ হইতে সাক্ষাৎভাবে কোনও স্থায়িপ্রকৃতির ফলোদ্ভব না হইলেও, ইহার পর দক্ষিণাঞ্চল হইতে ক্রমাগত এইরূপ আক্রমণ হেতু পালরাজ-বংশের অধঃপতন ঘটিয়াছিল; এবং, এই স্থলে, দক্ষিণ-ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের প্রধান লক্ষণ-গুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা সঙ্গত হইবে।

চোল-আক্রমণ।

দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব্ব-উপকূলের নাম চোলমণ্ডলম্, তাহাই ইয়ুরোপীয়দিগের নিকট "করোমাণ্ডেল কোষ্ট" নামে পরিচিত হইয়াছে; ইহারই কতকাংশের প্রাচীন নাম চোল। এই চোলদেশের চিরপ্রচলিত চৌহুদ্দী,—উত্তরে পেন্নর নদী, দক্ষিণে ভেল্লারু নদী, এবং পশ্চিমে কূর্গের প্রত্যন্ত-প্রদেশ। সুতরাং, মান্দ্রাজ, পন্দি-চারী ও ত্রিচীন্নপল্লী, এবং বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্যের অধিকাংশ উহারই অন্তর্ভুক্ত ছিল, দেখা যাইতেছে। ইহার দক্ষিণে পাণ্ড্যরাজ্য অবস্থিত ছিল; বর্ত্তমান মাদুরা ও তিনেভেল্লী জেলা তাহার অন্তর্গত ছিল। উত্তরে দক্ষিণ-ভেল্লারু নদী হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সে রাজ্য বিস্তৃত ছিল, এবং মাদুরা নগরে তাহার রাজধানী ছিল।

চোল, পাণ্ড্য, এবং চের, বা কেরল রাজ্য।

চের বা কেরলরাজ্য হইতে উত্তর-দক্ষিণমুখী একটি রেখাই পাণ্ড্যদেশের পশ্চিম সীমা নির্দ্দেশ করিত; বর্ত্তমান মালাবার জেলা, এবং ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন কেরলরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ঐ সীমা-রেখা উত্তরে চন্দ্রগিরি নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং এই চন্দ্রগিরি নদী মাঙ্গালোরের দক্ষিণে ভারত-সাগরে নিপতিত হইয়াছে; অতএব পশ্চিমঘাট প্রদেশ, এবং পশ্চিমঘাট ও সমুদ্রের অন্তর্বর্ত্তী স্থানও, পাণ্ড্যরাজ্যের অভিভুক্ত ছিল।

সম্ভবতঃ দক্ষিণ-ভারতের এই চোল, পাণ্ড, এবং চের বা কেরলরাজ্য মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। মৌর্য্য-সাম্রাজ্য বিখণ্ডিত হইলে, উপরোক্ত রাজ্যসমূহের উত্তরস্থ দাক্ষিণাত্য ও অন্যান্য ভূভাগে অন্ধ্র রাজ-বংশ প্রভাব বিস্তার করে। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দের প্রথম

চালুক্য রাজ্য।

ভাগে অন্ধ্র রাজ্যের পতন হইতে ষষ্ঠ শতাব্দের মধ্যভাগে চালুক্য রাজবংশের পরাক্রম-লাভ পর্য্যন্ত, ঐ সকল দেশের ইতিহাস অস্পষ্ট ও অবোধ্য। চালুক্য-জাতি উত্তরাঞ্চলের রাজপুতদিগের বংশোদ্ভব বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিত। সম্ভবতঃ, তাহারাও গুর্জ্জরদিগের ন্যায় উদ্ভূত হইয়া রাজপুতানা হইতে দাক্ষিণাত্যে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা প্রথমে বিজাপুর জেলায় বাতাপীতে (বর্ত্তমান বাদামী) এবং তৎপরে নাসিকে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিল; এবং তাহাদিগের পরাক্রান্ত নৃপতি দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালে, তাহারা উত্তরাপথের অধীশ্বর হর্ষের দক্ষিণ-ভারতে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্যে তাহাদিগের অধিকার-বিস্তার করিয়াছিল। কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর নিম্নপ্রবাহের মধ্যবর্ত্তী বেঙ্গীপ্রদেশে, কুব্জ বিষ্ণুবর্দ্ধন নামে পুলকেশীর এক সহোদর আপনাকে স্বাধীন নরপতি-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূর্ব্ব-চালুক্য রাজবংশের ভিত্তিস্থাপন করেন।

পল্লব নামক একটা জাতি নিরন্তরই চালুক্যদিগকে শক্তি-পরীক্ষার নিমিত্ত আহ্বান করিত। তাহাদিগের উদ্ভব-বৃত্তান্ত নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণীত হয় নাই। পূর্ব্বে তাহারা লুণ্ঠনপরায়ণ জাতি ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। তাহাদের আদিম নিবাস যে কোন্ স্থানে ছিল, সে সম্বন্ধে কোনও প্রবাদও প্রচলিত নাই। সপ্তম শতাব্দের প্রথম ভাগে চালুক্যদিগের সহিত পল্লবদিগের অবিরত যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিত; এই সকল যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ উভয় পক্ষই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ইহাদের পরস্পরের লিখিত বৃত্তান্ত স্বভাবতঃই পরস্পর-বিরুদ্ধ। যাহা হউক, ইহা সত্য যে, পল্লবগণ প্রথম নরসিংহ বর্ম্মার রাজত্বকালেই উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। নরসিংহ বর্ম্মা কাঞ্চীতে (বর্ত্তমান কঞ্জিবেরম্) রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং কার্য্যতঃ সমগ্র চোলদেশ শাসন করিতেন। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে যখন ইউয়ান-চুয়াঙ্গ কাঞ্চী দর্শন করেন, তখন নরসিংহ বর্ম্মাই কাঞ্চীতে আধিপত্য করিতেছিলেন।

পল্লব-রাজ্য।

এক শত বৎসর পরে, দ্বিতীয়-বিক্রমাদিত্য-পরিচালিত চালুক্যগণ পল্লবদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের রাজধানী কাঞ্চী অধিকার করিয়াছিল। আবার, অনতিদীর্ঘকাল পরে অষ্টম শতাব্দের মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যের এই চালুক্য রাজশক্তি রাষ্ট্রকূটগণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূটগণ তদ্দেশোদ্ভব জাতি। তাহারা নবম

খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দে দক্ষিণ-ভারতের অবস্থা।

শতাব্দের প্রথম হইতেই প্রতীহারগণের শত্রুরূপে এবং প্রায়শঃই বাঙ্গালার পালরাজগণের সন্ধিবদ্ধ-মিত্র-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। নবম শতাব্দের শেষে, ভারতবর্ষের সুদূর দক্ষিণে আদিত্যচোলের অধীন চোলগণ কর্ত্তৃক পল্লবরাজশক্তি অধিকৃত হইয়াছিল।

এইরূপে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের স্থূলতঃ প্রথম ত্রিপাদে দক্ষিণ-ভারতের প্রধান প্রধান রাজশক্তি বলিতে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটগণ, এবং তাহারও দক্ষিণস্থ প্রদেশের চোলগণ বিদ্যমান ছিল। এই উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী রাজশক্তির ভিতর সময় সময় সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে, প্রাচীন চালুক্য রাজবংশের বংশধর দ্বিতীয় তৈল বা তৈলপ কর্ত্তৃক রাষ্ট্রকূটদিগের শেষ নৃপতি দ্বিতীয় কোক্ক পরাভূত হয়েন। এই তৈল বা তৈলপ একটি স্বতন্ত্র চালুক্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। উহা তাঁহার পরবর্ত্তী কালের রাজধানী, (বর্ত্তমান হায়দারাবাদ রাজ্যে স্থিত) কল্যাণী নগরী হইতে কল্যাণীর চালুক্য রাজবংশ নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্রাচীনকালে দক্ষিণ-ভারতের নিজস্ব সভ্যতা অতিমাত্র উন্নত অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। তামিল ভাষায় এক বিপুল প্রাচীন সাহিত্য অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাসের উপাদান বিরল হইলেও, নবম শতাব্দের পরবর্ত্তী কালে দক্ষিণ-ভারতের রাজ্যসমূহের লেখমালা সংখ্যায় অতি বহুল—এ পর্য্যন্ত উত্তর-ভারতে যে সকল লেখমালা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাও বহুলতর—এবং তাহাদিগের কতকগুলি অতিশয় দীর্ঘ। ইহাদিগের একখানি মূল্যবান্ লিপি, একটি প্রকাণ্ড বলয়সংবদ্ধ একত্রিশখানি তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ হইয়াছে। দক্ষিণ-ভারতের এই সকল লেখমালার পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ-কার্য্যের উপর এখনও অনেক নির্ভর করিতেছে।

মহীপালের সমসাময়িক চোলরাজ্য।

এইরূপে, প্রথম মহীপাল যখন গৌড়ের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন, অর্থাৎ, ৯৮০ খৃষ্টাব্দের সমসময়ে, কল্যাণীর চালুক্য রাজবংশ বাঙ্গালার পালরাজগণের সহিত খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের অধিকাংশ সময়ে ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধযুক্ত রাষ্ট্রকূটগণের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। প্রায় ঐরূপ সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত চোলনৃপতি রাজরাজের ও তদীয় পুত্র রাজেন্দ্রের দিগ্বিজয় দ্বারা চোলরাজশক্তি প্রসার লাভ করিয়াছিল; রাজেন্দ্র চোল ১০১১ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার পিতার সহিত রাজ্যশাসন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং পিতার অভাব হইলে ১০১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ-

করেন। রাজরাজ চের ও পাণ্ড্যদেশ, সিংহল, দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ স্থান, এবং উত্তরের কলিঙ্গরাজ্য (বর্ত্তমান উত্তর-সরকার যাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল) বিজয় করিয়া তৎসমুদয় স্বাধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র চোল বঙ্গোপসাগর অতিক্রমপূর্ব্বক ব্রহ্মের পেগু-প্রদেশ জয় করিয়া তাহা কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্বরাজ্যের অন্তর্গত করিয়াছিলেন।

এই রাজেন্দ্র চোলই একাদশ শতাব্দের প্রারম্ভে বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং তাহা তিরুমলয় গিরির পর্ব্বত-লিপিতে তামিল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই পর্ব্বত-লিপির কাল ১০২৪ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। মেলপাড়ির চোলেশ্বর-মন্দিরে ১০২০ খৃষ্টাব্দের একখানি শিলালিপিতে রাজেন্দ্রের দিগ্বিজয়-কাহিনী বর্ণিত থাকিলেও, তাহাতে বাঙ্গালার অভিযান সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ না থাকায়, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাহা ১০২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঘটিয়াছিল।

রাজেন্দ্র চোলের বাঙ্গালা-আক্রমণ ও তিরুমলয় পর্ব্বত-লিপি।

তিরুমলয় পর্ব্বত-লিপিতে লিখিত রহিয়াছে,—রাজেন্দ্র-চোল প্রথম দুর্গম ওড্ড-বিষয় এবং তৎপর কোশল-নাড়ু অধিকার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালকে সমরক্ষেত্রে নিহত করিবার পর, এবং তক্কণলাড়ম্-বিষয়াধিপতি রণশূরকে আক্রমণ করিবার পর, তিনি তন্দবুত্তি জয় করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি নিয়ত-বর্ষণ-প্লাবিত বঙ্গাল দেশ আক্রমণ করিলে, উহার অধিপতি গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে, তিনি মহীপালকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া রমণী ও মাতঙ্গনিচয় হস্তগত করিয়া উত্তিরলাড়ম্ প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। এই আক্রমণ বা অভিযানে গঙ্গা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে হইয়াছিল বলিয়া রাজেন্দ্র চোল গঙ্গাইকন্দ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই তিরুমলয়-লিপির ওড্ড শব্দ সংস্কৃত ওড্র শব্দের তামিল অপভ্রংশ। উড়িষ্যার কতকাংশের নাম ওড্র; এবং কোশল-নাড়ু বলিতে, উড়িষ্যার বর্ত্তমান করদ মিত্ররাজ্যসমূহের অন্তর্গত পার্ব্বত্য প্রদেশকেই বুঝায় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহাই প্রাচীন কালে মহাকোশল বা দক্ষিণ-কোশল নামে পরিচিত ছিল। প্রথম প্রবন্ধেই বলিয়াছি, বর্ত্তমান অযোধ্যা ও বারাণসী প্রদেশ প্রাচীন কালের কোশলরাজ্য ছিল। হয় ত তাহারই সহিত প্রভেদ বুঝাইবার নিমিত্ত উড়িষ্যার কোশল দক্ষিণ-কোশল নামে অভিহিত হইয়াছিল; কিন্তু, এতদুভয়ের মধ্যে যে কি সম্পর্ক ছিল, এবং কি কারণেই বা উহাদের কোশল-নামকরণ হইল, তাহা

অজ্ঞাত রহিয়াছে। তন্দবুত্তি সম্ভবতঃ দণ্ডভুক্তির তামিল অপভ্রংশ। তন্দবুত্তি বলিতে কোন্ প্রদেশকে বুঝায়, তাহা লইয়া তর্ক আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উহাকে উদ্দণ্ডপুর (বর্ত্তমান ক্ষুদ্র নগর বিহার) বলিয়াই স্থির করিয়াছেন,—এই স্থানে গৌড়ের পালরাজবংশের প্রথম নৃপতি গোপাল কর্ত্তৃক একটি বিহার স্থাপিত হইয়াছিল, প্রথম প্রবন্ধেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি ; কিন্তু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—এবং তাঁহার কথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই বোধ হয় যে, সম্ভবতঃ উড়িষ্যার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে, অথবা বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার কতকাংশই দণ্ডভুক্তি নামে পরিচিত ছিল, এবং তিনি অনুমান করেন যে, বর্ত্তমান দাঁতন সহরের সহিত দণ্ডভুক্তি নামের সংস্রব থাকিতে পারে। রামচরিত কাব্যের টীকায়, দণ্ডভুক্তিরাজ জয়সিংহ কর্ত্তৃক উৎকলরাজ কর্ণকেশরী পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। তক্কণ-লাড় অবশ্য দক্ষিণ-রাঢ়, অর্থাৎ রাঢ়দেশের দক্ষিণ অংশ,—বর্ত্তমান হুগলী জেলা, বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণাংশ, এবং মেদিনীপুর জেলার কতক অংশ। বঙ্গাল দেশ বলিতে গঙ্গা বা ভাগীরথীর উত্তরস্থ অধ্যবাঙ্গালা বা উত্তর-বাঙ্গালা, এবং উত্তিরলাড়ম্—উত্তররাঢ়ম অর্থাৎ উত্তর রাঢ়-প্রদেশ ; বর্দ্ধমানের উত্তরাংশ, বীরভূম, এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের অংশবিশেষ (যে স্থানে মহীপাল ও সাগরদিঘী অবস্থিত) এই উত্তররাঢ়ের অন্তর্গত ছিল।

আমার বিবেচনায়, তিরুমলয়-লিপির মহীপাল যে গৌড়াধিপ মহীপাল, তৎসম্বন্ধে কোনরূপ সঙ্গত সন্দেহ থাকিতে পারে না।

তিরুমলয়-লিপির মহীপাল কে ?

মহীপালের রাজত্বকালে আর্য্য ক্ষেমেশ্বর কর্ত্তৃক চণ্ডকৌশিক নামে একখানি সংস্কৃত নাটক রচিত হইয়াছিল ; ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে নেপাল হইতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহার একখানি হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। ইহা যে কোনও কর্ণাট-রাজ-পরাজয়-উৎসব উপলক্ষে রচিত হইয়া মহীপালের সমক্ষে অভিনীত হইয়াছিল,—তাহা নাটকখানির প্রস্তাবনা দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় ; এবং ইহাতে রাজেন্দ্র চোলের বাঙ্গালা-আক্রমণের শেষ প্রতিরোধ-ব্যাপার উল্লিখিত হওয়াই বিশেষ সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাও বলিয়াছেন যে, চণ্ডকৌশিক নাটকের উল্লিখিত কর্ণাটরাজ কল্যাণীর কোনও চালুক্য নৃপতিও হইতে পারেন। এরূপ বলিবার হেতু এই যে,—চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বা কল্যাণীরাজ

বিক্রমাঙ্ক গৌড়াধিপ প্রথম মহীপালের মৃত্যুর সম্ভবতঃ প্রায় অৰ্দ্ধ শতাব্দ পরে ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন; কোনও কোনও লিখিত প্রমাণে তাঁহার 'কর্ণাট'-আখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু চণ্ডকৌশিক কাব্যে উল্লেখ ব্যতীত, মহীপালের রাজত্বকালে কল্যাণীর চালুক্যরাজগণ কর্তৃক বাঙ্গালার আক্রমণ সম্বন্ধে, বা মহীপালের সহিত তাঁহাদিগের কোনরূপ সংঘর্ষ সম্বন্ধে, আর কোনও লিখিত প্রমাণ বিদ্যমান নাই। পক্ষান্তরে, রাজেন্দ্র চোল যে বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা তিরুমলয়-লিপি হইতে জানিতে পারি;—এবং রাজেন্দ্র চোল তাঁহার রাজশক্তি বাঙ্গালায় স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত না করায়, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, তিনি অবশেষে মহীপাল কর্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়াছিলেন। এই বিরোধের পরিণাম সম্বন্ধে তিরুমলয়-লিপির সহিত চণ্ডকৌশিক কাব্যের যেরূপ অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়, সেরূপ থাকাই স্বাভাবিক ও সম্ভাবিত।

রাজেন্দ্র চোলকে বহু দূরদেশ হইতে আগমন করিতে হইলেও, এবং তাঁহার বাঙ্গালা-অভিযান ব্যর্থ হইবার নানা কারণ থাকিলেও, মহীপাল কর্তৃক তাঁহার ন্যায় একটি প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতির পরাজয়-ব্যাপার—নিরতিশয় শক্তির পরিচায়ক। ইহাও অসম্ভব নহে,—আক্রমণের হিসাবে আক্রমণ করিবার, অথবা ঐরূপ আক্রমণকে স্থায়ী দেশ-বিজয়ে পর্য্যবসিত করিবার সঙ্কল্প রাজেন্দ্র চোলের আদৌ ছিল না;—রাজেন্দ্র চোলের এ আক্রমণ হয় ত বিশেষ-উদ্দেশ্য-হীন আক্রমণ-মাত্র। গঙ্গার তীরভূমি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাহারই স্পর্দ্ধা করিবার অভিলাষে চোলরাজ এরূপ আক্রমণ করিয়া থাকিবেন। তথাপি, এই আক্রমণের সময়, অর্থাৎ ১০২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, মহীপালের রাজশক্তি যে অন্ততঃ উত্তররাঢ়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। ইহারই কিছুদিন পরে, ১০২৬ খৃষ্টাব্দে, মহীপাল বারাণসীর মঠ ও মন্দিরের বিপুল সংস্কার-কার্য্য সম্পন্ন করিবার মত শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমরা প্রাগুক্ত অনুমানেরই সমর্থন প্রাপ্ত হই।

তিরুমলয়-লিপির মহীপাল, গৌড়াধিপ মহীপাল না হইয়া কান্যকুব্জের মহীপাল-প্রতীহার হইতে পারেন, এইরূপ একটি সিদ্ধান্তও উপস্থাপিত হইয়াছে। এ সিদ্ধান্ত সত্য হইলে, রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণ-কালে উত্তর-রাঢ় প্রদেশ মহীপাল-প্রতীহারের অধিকারভুক্ত থাকা আবশ্যক, এবং, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত

রাঢ়ভূমি মহীপাল-প্রতীহারের রাজত্বকালে গুর্জ্জর-সাম্রাজ্যে অভিভুক্ত ছিল বলিয়া রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে অনুমান করিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত হয় না। তাহা হইলে, মুর্শিদাবাদ জেলার মহীপাল নামক স্থানকে ও সাগরদীঘীকে গৌড়াধিপ মহীপালের সহিত সংযুক্ত না করিয়া, মহীপাল-প্রতীহারের সহিত সংযুক্ত করিতে হয়। কিন্তু এই উপন্যস্ত সিদ্ধান্তকে আমরা বর্জ্জন করিতে বাধ্য। কারণ, মহীপাল-প্রতীহার কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময় ৯১৬ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটাধিপতি তৃতীয় ইন্দ্র কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন, ইহা আমাদিগের অবিদিত নাই; এবং ১০২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের ভিতর রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণ-কালে যে তিনি কান্যকুব্জের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন না, ইহাও নিঃসন্দেহ। রাঢ় কোনও সময়ে গুর্জ্জর-প্রতীহার-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল,—এরূপ মত কর্ণাটকশব্দানুশাসন নামক গ্রন্থের একটিমাত্র স্থানের উপর নির্ভর করে বলিয়া বোধ হয়; সে স্থান আমি আমার দ্বিতীয় প্রবন্ধেই উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। তাহাতে আছে—রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্রের নরসিংহ নামক এক করদমিত্র নৃপতি মহীপাল-প্রতীহারের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গঙ্গার সঙ্গমক্ষেত্রে আপন অশ্বের স্নান বিধান করিয়াছিলেন, এবং আপনার যশঃ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গঙ্গার সঙ্গমক্ষেত্র বলিতে গঙ্গার সাগর-সঙ্গম-ক্ষেত্রকেই বুঝায়—ইহা স্থির-নিশ্চয় নহে, এবং সেরূপ বুঝাইলেও, এরূপ উক্তি কবিজনোচিত উৎপ্রেক্ষাও হইতে পারে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দে যখন উত্তরের পার্ব্বত্য প্রদেশাগত কাম্বোজ আক্রমণকারিগণ উত্তর-বাঙ্গালার কতক অংশ বিধ্বস্ত করিয়াছিল, হয় ত সেই সময় গৌড়েশ্বর পাল-নৃপতিগণ গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিম কূলে রাঢ়দেশে আপনাদিগের রাজধানী সরাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, এবং মহীপাল হয় ত তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে মুর্শিদাবাদের মহীপাল নামক স্থানে আপন রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং কাম্বোজদিগের হস্ত হইতে বরেন্দ্র-উদ্ধারের নিমিত্ত উত্তর রাঢ় হইতেই তাহার অভিযান আরম্ভ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান অসম্ভব নহে। গোদাগাড়ীর ঠিক অপর পারেই রাঢ়ের উত্তরসীমা; এই গোদাগাড়ীতে আসিয়াই বরেন্দ্রের মালভূমি গঙ্গা স্পর্শ করিয়াছে, এবং এই গোদাগাড়ীর পার্শ্ব দিয়াই দক্ষিণ বাঙ্গালা হইতে উত্তর বাঙ্গালায় যাইবার বহু প্রাচীন পথ বিদ্যমান আছে।

কেহ কেহ বলিতে চাহেন,—তিরুমলয়-লিপির উল্লিখিত ওড্র, দক্ষিণ রাঢ় এবং বঙ্গাল দেশের নৃপতি মহীপালের অধীন মিত্ররাজ হইতে পারেন;—

তিরুমলয়-লিপির উল্লিখিত ওড্র, দক্ষিণ রাঢ় ও বঙ্গাল দেশ।

এ সম্বন্ধে বিশদ প্রমাণ না থাকিলেও, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। লামা তারানাথ লিখিয়া গিয়াছেন,—উড়িষ্যারাজ মহীপালকে কর প্রদান করিতেন। পাল-সাম্রাজ্য সামন্তসঙ্ঘে প্রতিষ্ঠিত ছিল; বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নানা স্থানের বহু ক্ষুদ্র সামন্ত নৃপতি, পালরাজগণ শক্তিশালী থাকিবার সময়, তাঁহাদিগকে কর প্রদান করিতেন, কিন্তু সেই কেন্দ্র-শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেই ন্যূনাধিকপরিমাণে আপনাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হইতেন।

দক্ষিণ রাঢ়ের অধীশ্বর-রূপে রণশূরের উল্লেখ কৌতুকাবহ। 'শূর'-পদ্ধতি-যুক্ত এক রাজবংশ যে তৎপ্রদেশে বর্ত্তমান ছিল, রণশূর নাম তাহারই সন্ধান প্রদান করিতেছে। বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাসে এবং কুলশাস্ত্রে যে আদিশূরের প্রখ্যাতি আছে, তাঁহারও এই রাজবংশীয় হওয়া অসম্ভব নহে।

সর্ব্বশেষে, মহীপালের রাজত্বকালের লিখিত প্রমাণের মধ্যে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরায় প্রাপ্ত একটি বিষ্ণুমূর্ত্তির উৎকীর্ণ-লিপির উল্লেখ করিব।—ইহা মহীপালের

মহীপালের গৌড়রাজ্য।

রাজ্যকালের তৃতীয় বর্ষে লোকদত্ত নামক জনৈক বৈষ্ণব বণিক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহীপালের রাজত্বের প্রারম্ভে পূর্ব্ব-বাঙ্গালার কতক অংশ যে মহীপালের অধিকারভুক্ত ছিল, উহা হইতে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মগধের কতক অংশ এবং রাঢ়ের অন্ততঃ উত্তরাংশ যে দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত বরাবর গৌড়াধিপ পালরাজগণের অধিকারে ছিল, এবং মহীপাল তাহা উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—এইরূপ সিদ্ধান্তই সম্ভাবিত বলিয়া আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে উপস্থাপিত করিয়াছি। মহীপালের রাজ্যপ্রাপ্তির সময়, উপরি-উক্ত দেশ ব্যতীত মধ্য ও উত্তর বাঙ্গালার কতক অংশও হয় ত গৌড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেহ কেহ এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করেন না;—তাঁহারা বলেন,—মহীপাল যখন রাজ্যারোহণ করেন, তৎপূর্ব্বেই চতুষ্পার্শ্বের প্রতিবেশিগণের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে পালরাজ্যের অধিকার-ভূমি বিশেষরূপে খর্ব্বীকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। রমাপ্রসাদ চন্দ বলিয়াছেন,—উত্তর বাঙ্গালার কাম্বোজ-আক্রমণের পর দ্বিতীয় বিগ্রহপাল মগধ বা মিথিলার কোনও সুদূর অঞ্চলে লুক্কায়িত ছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বাঙ্গালার পালরাজগণ-সম্বন্ধীয় ইংরেজী পুস্তকে

কতকটা হেঁয়ালির আকারে লিখিয়াছেন,—"পালরাজবংশের নারায়ণপাল, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল এবং মহীপাল নামমাত্র রাজা ছিলেন। বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাজ্য-পরিবেষ্টিত একটি নগণ্য রাজ্যে তাঁহারা রাজত্ব করিতেন।" তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে তিনি লিখিয়াছেন যে, মহীপাল কেবল রাঢ় ও বঙ্গের কোনও কোনও অংশ উত্তরাধিকারক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং রাঢ় অথবা বঙ্গের কোনও সুদূর অঞ্চলে তিনি সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার পালরাজগণের সহিত যে সকল নৃপতিবৃন্দের সময় সময় যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল, তাঁহাদিগের প্রশস্তির আক্ষরিক-অর্থ-গ্রহণে এইরূপ সিদ্ধান্ত কল্পিত হইয়া থাকিবে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এইরূপ পদ্ধতি আমাদিগকে কোনও সম্ভাব্য অনুমানে উপনীত না করিয়া অশেষ অসামঞ্জস্যে নিক্ষেপ করিতে পারে, ইহা আমি প্রথম প্রবন্ধেই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। উল্লিখিত গ্রন্থকারগণ সম্ভবতঃ মহীপালের বাণগড়-লিপির উপরও নির্ভর করিয়াছেন; তাহাতে আছে,—মহীপাল অনধিকারী কর্ত্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা পালরাজগণের আদি-নিবাস উত্তর-বাঙ্গালার অংশবিশেষের পুনরধিকারের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে।

পক্ষান্তরে, আমি যে সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করিয়াছি, অর্থাৎ দ্বিতীয় গোপাল, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল, এবং প্রথম মহীপালের অধিকারে বরাবর বঙ্গ বা পূর্ব্ব-বাঙ্গালা সহ, মগধ ও রাঢ়ের অধিকাংশ ভূভাগ ছিল, এবং মহীপাল দেশ-জয় করিয়া এই রাজ্য বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন,—সেই উপন্যস্ত সিদ্ধান্ত যে প্রমাণ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হইয়াছে, এ কথা বলি না। আমি এইমাত্র বলি যে, বর্ত্তমানে আমাদের সমক্ষে যে সকল প্রমাণ বিদ্যমান আছে, তাহাতে এই সিদ্ধান্তই অধিকতর সম্ভাবিত বলিয়া প্রতিভাত হয়।

এই প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি, ৯৮০ খৃষ্টাব্দে মহীপালের রাজ্যপ্রাপ্তির প্রায় সমসময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম-সংস্কারক অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান জন্মগ্রহণ করেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম-সংস্কারক অতীশ, বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

তিনি তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কারক বলিয়াই প্রধানতঃ পরিচিত। কিন্তু তিব্বতের লিখিত প্রমাণ হইতে এইরূপ দৃষ্ট হয় যে, তিনি বঙ্গাল-প্রদেশের বিক্রমণিপুর-নিবাসী ছিলেন। এই বিক্রমণিপুর বাঙ্গালায় ছিল, কেবল ইহাই জানি; কিন্তু কোথায় ছিল, তাহা জানি না। তিব্বতীয় বিবরণে, তাঁহার পিতার নাম কলাণশ্রী ও তাঁহার মাতার নাম প্রভাবতী প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাল্যকালে তিনি বিদ্যালাভের

নিমিত্ত ঋষিকল্প জিতারির নিকট প্রেরিত হয়েন, এবং দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের সুবিধার নিমিত্ত তিনি তাঁহার নিকট পাঁচ প্রকার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধি হইলে, তিনি হীনযান শ্রাবকদিগের ত্রিপিটকে, বৈশেষিক দর্শনে, মহাযান সম্প্রদায়ের ত্রিপিটকে, মাধ্যমিক ও যোগাচার্য্যদিগের অধ্যাত্মবিজ্ঞানে, এবং চারি প্রকার তন্ত্রশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তাহার পর, সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষা ধর্ম্মাচরণই শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া, কৃষ্ণগিরি বিহারের রাহুল গুপ্তের নিকট তিনি বৌদ্ধদিগের যোগশাস্ত্রের, অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র, এই "ত্রিশিক্ষা"র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। এই স্থানেই তিনি তাঁহার গুপ্তনাম গুহ্যযান বজ্র প্রাপ্ত হয়েন, এবং বৌদ্ধ অধ্যাত্মরহস্যে প্রবেশ লাভ করেন। ঊনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে, তিনি উদ্দণ্ডপুরের মহা-সাঙ্গিকাচার্য্য শিলা রক্ষিতের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নাম প্রাপ্ত হয়েন। একত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি ভিক্ষুদিগের সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করেন, এবং ধর্ম্মরক্ষিত তাঁহাকে বোধিসত্ত্বের দীক্ষা দান করেন। তিনি মগধের বহু প্রখ্যাতনামা বৌদ্ধ দার্শনিকের নিকট অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি সমুদ্রপথে ব্রহ্মে গমন করিয়া সুবর্ণদ্বীপের মহাস্থবির আচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তির নিকট দ্বাদশ বৎসর অধ্যয়ন করেন। বর্ত্তমান পেগুর অন্তর্গত থাটনই প্রাচীন সুবর্ণদ্বীপ, উহাই তৎকালে সুদূর প্রাচ্যভূমির বৌদ্ধ কেন্দ্র ছিল। প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি সিংহল দর্শন করিয়া মগধে আগমন করেন, এবং অবিলম্বেই তৎপ্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মহাজ্ঞানী পণ্ডিত-রূপে পরিগৃহীত হয়েন। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবন এবং তিব্বত-গমন প্রকৃতপ্রস্তাবে মহীপালের উত্তরাধিকারী নয়পালের রাজত্বকালের ব্যাপার।

সুবিখ্যাত তিব্বতরাজ স্রোংৎসান-গাম্পোর রাজত্বকালে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের প্রথম ভাগে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। এতৎসম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। তিব্বতীয় গ্রন্থাদিতে লিখিত আছে,—খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের প্রারম্ভে তিব্বত-রাজ খিস্রোংদিউৎসান কর্ত্তৃক গৌড়-নিবাসী শান্ত রক্ষিত নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়া তিব্বতে লামাসম্প্রদায় নামে সুপরিচিত সন্ন্যাস-আশ্রমের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন। পরে, উক্ত নৃপতি মগধ হইতে কমলশীল নামক এক জন বড় বৌদ্ধ দার্শনিককে তিব্বতে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; এই কমলশীল চৈনিক সন্ন্যাসী হোসং মহাযানকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেন, এবং তিব্বতের

বৌদ্ধ তিব্বতের সহিত বাঙ্গালার সম্পর্ক।

বৌদ্ধধর্ম্ম-সমাজের অধ্যাত্ম বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দে তিব্বতরাজ রাজ্যপাল ভারতবর্ষ হইতে বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া তিব্বতীয় ভাষায় সংস্কৃত গ্রন্থাদির অনুবাদ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সকল পণ্ডিতগণের মধ্যে সম্ভবতঃ বাঙ্গালা হইতেও কেহ কেহ গমন করিয়া থাকিবেন। তিব্বতীয় বৌদ্ধ ইতিবৃত্ত গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, রালপচনের লণ্ডরাম নামে এক পাষণ্ড সহোদর ছিল। সেই তাঁহাকে তাঁহার ঘাড় মুচড়াইয়া নিহত করে। তৎপরে লণ্ডরাম সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম-ধ্বংসে ব্যাপৃত হয়। যাহা হউক, এ কার্য্যে সে সম্পূর্ণ সফলকাম হইতে পারে নাই। তাহার মৃত্যুর পর তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, এবং সিদ্ধপাল, গুণপাল ও প্রজ্ঞাপাল নামক তিনটি শিষ্য সমভিব্যাহারে প্রাচ্যভারতের সুবিখ্যাত পণ্ডিত ধর্ম্মপাল ১০১৩ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে গমন করিয়া এই পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্য্যের বিশেষরূপ সহায়তা করেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয় বৌদ্ধগণ চীনদেশের ন্যায় তিব্বত-দেশেও কি কি কার্য্য করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে এখনও বহু অনুসন্ধান ও অনুশীলন আবশ্যক। মহীপালের সমসাময়িক তিব্বতাধিপতি—হ্লা লামা।

বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি-আলোচনা।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন,—এই সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল, এবং ইহারই সমসময়ে বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ-গানের প্রচলন হইয়াছিল।—এই বৌদ্ধগান হইতেই সম্ভবতঃ কীর্ত্তন গান জন্মলাভ করিয়া থাকিবে। তিনি কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্ণ নামক এক গীতি-কার ও দোহা-(দ্বিপথা)-কারের নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ঐরূপ আরও অনেক দোঁহাকার বর্ত্তমান ছিল, এবং সমগ্র বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায় বাঙ্গালায় বৌদ্ধপদ গান করিত। বাঙ্গালী কৃষকের ও শ্রম-শিল্পীর নিকট কীর্ত্তন গান করিয়া বেড়াইত—এমন ঊনিশটি সঙ্গীত-রচয়িতার তিনি নাম করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে, ডাকের বচন নামে বিখ্যাত, পদ্য প্রবচনগুলিও এই সময়েই রচিত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন,—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের বঙ্গাক্ষরে লিখিত, সংস্কৃত টীকা সহ বাঙ্গালা দোঁহা ও প্রবচনের সংগ্রহ গ্রন্থ এখনও নেপালের মঠে ও পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে এইরূপ একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ সম্প্রতি শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সকল গান, দোহা ও প্রবচন যে কি হেতু বাঙ্গালার সামগ্রী অথবা

কি কারণেই বা তাহাদিগের কাল একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ, অথবা তাহাদিগকে প্রাচীন বাঙ্গালায় রচিত মনে করিবার কারণ কি, তৎসম্বন্ধে তিনি কোনও প্রমাণ প্রদান করেন নাই। ভাষার আকারমাত্র বিবেচনা করিলে, উহাকে তুল্যরূপে মগধের, মিথিলার, অথবা আসামের ভাষাও বলা যাইতে পারে। এ বিষয়টি কৌতুকাবহ, এবং ইহার সম্বন্ধে অধিকতর অনুশীলন আবশ্যক। মহীপাল যে তাঁহার রাজত্বকালে উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন, এবং তাঁহার রাজত্বের অন্ততঃ অধিকাংশ কাল যে বাঙ্গালা-দেশ শান্তি ও সৌভাগ্য-সুখ উপভোগ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। অতএব, সে সময়ে সাহিত্যের অনুশীলন ও বিকাশ-লাভ বিশেষ সম্ভব বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

এই সময়ে ধর্ম্মবিষয়েও উন্নতি ঘটে, এবং সাধারণ বৌদ্ধধর্ম্ম তন্ত্রোক্ত শাস্ত্রোপদেশে প্রভাবিত হয়,—এরূপ প্রতীয়মান হয়।

ইহারই সমসময়ে নাথগণ পদস্থ হইয়া উঠেন; নাথ একটা সম্প্রদায়। ইহারা যোগাভ্যাসে সিদ্ধিলাভ করিয়া অতি-মানুষ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ইহাদিগের কতক বৌদ্ধ, এবং কতক শৈব ছিলেন।

বাঙ্গালার প্রাচীন পাল-রাজগণের শাসনকালে সুকুমার-শিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা কর্ত্তব্য হইবে না।

প্রাচীন পালরাজত্বের সুকুমার শিল্প।

এ বিষয়ের ইতিহাস এখনও কুহেলিকাচ্ছন্ন; কিন্তু উত্তর বাঙ্গালায় প্রাপ্ত এবং রাজসাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত কতকগুলি অতি সুন্দর শ্রীমূর্ত্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে,—প্রাচীনকালে অন্ততঃ ভাস্কর্য্য বহুলপরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এই সকল ভাস্কর-মূর্ত্তির সকলগুলিই উপাস্য দেবমূর্ত্তি নহে; ইহাদিগের কতকগুলি পূরাপূরি বৌদ্ধমূর্ত্তি, এবং কতকগুলি তান্ত্রিক-বৌদ্ধ বা হিন্দু মূর্ত্তি। তিব্বতীয় ইতিহাসকার তারানাথের বর্ণনানুসারে, ধর্ম্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকালে, বরেন্দ্রভূমে ধীমান ও বীতপাল নামক দুই জন সুবিখ্যাত ধর্ম্মবিষয়াবলম্বী চিত্রকর ও ভাস্কর প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তারানাথ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের লেখক। তিনি ভারতবর্ষের ধর্ম্মবিষয়ক শিল্প সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—"যে স্থানেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবলতা লাভ করিয়াছে, সে স্থানেই ধর্ম্মবিষয়ক সুনিপুণ চিত্রকর ও ভাস্করের আবির্ভাব হইয়াছে; যে স্থানেই ম্লেচ্ছগণ শাসনদণ্ড ধারণ করিয়াছে, সে স্থান হইতেই তাহারা অন্তর্হিত

করিয়াছে ; আবার যেখানে তীর্থীয় সম্প্রদায়ের মত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, সেখানেই নিম্নশ্রেণীর চিত্রকর ও ভাস্কর অগ্রগণ্য হইয়া উঠিয়াছে।” বৌদ্ধ তারানাথ এইরূপ মত পোষণ করিতেন। ম্লেচ্ছ শব্দে তিনি নিশ্চয়ই মুসলমান আক্রমণকারিগণকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং তীর্থীয় বলিতে তিনি গোঁড়া হিন্দু ধর্ম্মের বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মতবাদের প্রতিই লক্ষ্য করিয়াছেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সংগ্রহালয়ের পরিচয়-পুস্তকে, খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দে, ধীমান ও বীতপাল প্রবর্ত্তিত একটি স্বতন্ত্র গৌড়ীয় বা উত্তর-বঙ্গীয় প্রতিমা-শিল্পী সম্প্রদায় প্রসার লাভ করিয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে, এবং খৃষ্টীয় একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দে গৌড়রাজ্যের অবনতির ও পতনের যুগে উত্তর-বাঙ্গালার ভাস্কর্য্য-শিল্পের অধঃপতনের পরিচয় যে সুস্পষ্ট পরিদৃশ্যমান—ইহাও উক্ত হইয়াছে। যবদ্বীপের বোরো বোদরে প্রাপ্ত ভাস্কর-মূর্ত্তিতেও এই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বলিয়া উক্ত পরিচয়-পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। এই সকল উপন্যস্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সম্ভবতঃ তর্কের অবসর আছে, এবং আমরা আশা করিতে পারি যে, নানা স্থানে প্রবর্ত্তিত অনুসন্ধানের ফলে আরও অধিকসংখ্যক শিল্পনিদর্শন আবিষ্কৃত হইলে, ভারতীয় মধ্যযুগের শিল্পের ইতিহাস ও শ্রেণীবিভাগ অধিকতর দৃঢ়তার সহিত নিরূপিত হইতে পারিবে। নালন্দার খননকার্য্যে যে সকল ভাস্কর্য্যের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, ডাক্তার স্পুনারের অনুগ্রহে সম্প্রতি আমি তাহার কতকগুলি দর্শন করিয়াছি, এবং মোটামুটি দেখিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, রাজসাহীতে সংরক্ষিত ভাস্কর-মূর্ত্তিগুলির সহিত ইহাদিগের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

পাঠকগণ সম্ভবতঃ অবগত আছেন যে, একটি সিদ্ধান্ত বহুকাল হইতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে, এবং তাহা এই যে,—ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য্য গ্রীক প্রভাবের নিকট বহুপরিমাণে ঋণী, এবং এই গ্রীক প্রভাব গান্ধার-শিল্পে অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের সন্নিকটে প্রাপ্ত বহু বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যে সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে যে সকল ভাস্কর্য্যের নিদর্শনে গ্রীক প্রভাব বর্ত্তমান আছে বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, তাহাতে গ্রীক অংশ অতি সামান্য, এবং নিজ ভারতীয় প্রভাবই তাহাতে অধিক, এবং তাহা নিম্নশ্রেণীর বা অধঃপতিত

নিঃসন্দিগ্ধরূপে গ্রীক-শিল্প হইলেও, উহা উত্তরকালের নিম্নশ্রেণীর গ্রীক-শিল্প; এবং ভারতবর্ষে যে সকল প্রাচীন উচ্চশ্রেণীর ভাস্কর-শিল্প প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ নিজস্ব; তাহাতে গ্রীক প্রভাব নাই বলিলেই হয়। আমার ধারণা, যদি কেহ বাঙ্গালায় প্রাপ্ত এবং নালন্দায় প্রাপ্ত মধ্যযুগের ভাস্কর-শিল্পের সহিত গান্ধারের শিল্প-রচনার তুলনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তিনি এই মতই অবলম্বন করিবেন যে,—বাঙ্গালার এবং বিহারের ললিত শিল্পকলা গ্রীক প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হউক আর নাই হউক, বাঙ্গালার ও বিহারের মধ্য-যুগের উচ্চশ্রেণীর ভাস্কর্য্য-রচনা পরিকল্পনায় ও সম্পাদনে গান্ধার-শিল্প-রচনা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

শ্রীবিমলাচরণ মৈত্রেয়।

দাদার ভাই।

১

বুদ্ধিমান্ মোক্তার অবিনাশ দে মৃত্যুকালে আপনার সমগ্র সম্পত্তি কেন যে গোঁয়ারগোবিন্দ বৈমাত্রেয় ভাই বিনোদের নামে উইল করিয়া দিল, তাহা আমড়াগাছীর কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

বিষয় যে নিতান্ত অল্প, তাহা নয়। সাড়ে আট হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ, সত্তর বিঘা লাখরাজ জমী। তা ছাড়া ঘর, ভিটা, পুকুর, বাগান, বাগিচা, এ সবই ছিল। এ সকলই অবিনাশের মোক্তারীর পয়সায় উপার্জ্জিত। ভিটাটুকু ছাড়া আর কিছুই পৈতৃক ছিল না। অবিনাশের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিল; সাত বছরের ছেলে কালীচরণ ছিল। ইহা সত্বেও অবিনাশ যে কেন বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে—অবাধ্য গোঁয়ারগোবিন্দ বিনোদকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া গেল, তাহা এক দিকে যেমন অতিমাত্র বিস্ময়জনক, অন্য দিকে তেমনই অবিনাশের নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, ইহা ভাবিয়া লইতে কাহারও বিলম্ব হইল না।

বিনোদকে সকলেই গোঁয়ারগোবিন্দ ও অবাধ্য ছোকরা বলিয়া জানিত। সে যে কখনও দাদার বিচারেও সুবোধ বালক বলিয়া গণ্য ছিল না, বরং সকল বিষয়েই অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়া দাদার বিরাগভাজন হইত, ইহা কাহারও অবিদিত ছিল না। বাপ যখন মারা যান, তখন বিনোদের বয়স দশ এগারো

বৎসর। তখনও সে চিন্তামণি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সর্দ্দারপোড়োর পদ অধিকার করিয়াছিল। অবিনাশের তখন মোক্তারীতে একটু একটু পসার জমিতেছিল। পিতার মৃত্যুর পর অবিনাশ তাহাকে পাঠশালা ছাড়াইয়া সেনহাটীর ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। কিন্তু ছুটীতে দাদা যে কয় দিন বাড়ীতে থাকিতেন, সেই কয় দিন ছাড়া বিনোদ স্কুলে যাতায়াতের কষ্ট স্বীকার করিত না। সকালে সন্ধ্যায় পক্ষিশাবকের অন্বেষণ, এবং মধ্যাহ্নে মৎস্যশিকার কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া দিনগুলাকে বেশ সহজভাবেই কাটাইয়া দিত।

বাড়ীতে মা ছিলেন না। তিনি অনেক দিন আগেই—বিনোদকে চারি বৎসরের রাখিয়া, সংসার হইতে ছুটী লইয়াছিলেন। ছিল শুধু বৌদিদি। তাহারও সন্তানসন্ততি ছিল না। সুতরাং এই বন্ধ্যা রমণীর সমগ্র স্নেহ মাতৃহীন দেবরকেই কেন্দ্র করিয়া লইয়াছিল। অপত্যস্নেহটা পরের ছেলের উপর আসিয়া পড়িলে তাহা নিজের ছেলের অপেক্ষা কিছু অতিরিক্তমাত্রাতেই প্রকাশ পায়, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। এই নিয়মের বশে বিনোদ বৌদিদির নিকট যেটুকু তাড়না বা তিরস্কার পাইত, সেটুকু তাহার বুদ্ধির নিক্তিতে বৌদিদির স্নেহ অপেক্ষা একটুও গুরু বলিয়া বোধ হইত না। সুতরাং বিনোদ সুখকর মৎস্যশিকার-প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ক্লেশকর বিদ্যাশিক্ষার দিকে মনোযোগ দিবার আবশ্যকতা আদৌ অনুভব করিত না।

অবিনাশ বাড়ী আসিয়া যখন ভ্রাতার বিদ্যা পরীক্ষা করিতে চাহিতেন, তখন ভাইয়ের বিদ্যার দৌড় দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন। তার পর লোকের মুখে তাহার গুণের কথা শুনিয়া রাগিয়া উঠিতেন। রাগিয়া বিনোদকে ধমক দিতেন, মারিতে যাইতেন, দুই একটা চড় চাপড় দিতেও ছাড়িতেন না। তার পর তিনি ভ্রাতাকে পুনরায় স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া কর্ম্মস্থলে যাত্রা করিতেন। দাদা ষ্টেশনে না পঁহুছিতেই বিনোদ পুনরায় ছিপ বঁড়শীর সংস্কারে প্রবৃত্ত হইত, এবং যাহারা দাদার কাণ ভারী করিত, তাহাদের গাছের ফল ও পুকুরের মাছ সমূলে নষ্ট করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকিত।

এমনই করিয়া ছয় সাত বৎসর কাটিয়া গেলেও বিনোদ যখন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর কঠোর গণ্ডী ভেদ করিতে পারিল না, অধিকন্তু নবোদ্গত গুম্ফরাজি লইয়া অজাতগুম্ফ বালকদের সহিত একাসনে বসিতে লজ্জা অনুভব করিতে লাগিল, তখন অবিনাশ বিরক্ত হইয়া তাহাকে স্কুল ছাড়াইয়া দিলেন। বিনোদ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

বড় বৌ স্বামীকে অনুরোধ করিল, "বেন্দার বয়স হ'য়েছে, বিয়ে দাও।"

দুই একবার স্ত্রীর অনুরোধে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেও, শেষে অবিনাশকে ভ্রাতার বিবাহের চেষ্টা দেখিতে হইল। ছেলের কোনও গুণ না থাকিলেও এ দেশে মেয়ের অভাব হয় না। বেটা ছেলে তো বটে! সুতরাং অনেক জায়গা হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। অবিনাশ তাহাদের মধ্যে একটী ভাল ঘর, ভাল মেয়ে দেখিয়া দেনা পাওনা স্থির করিয়া ফেলিলেন, এবং মাঘ মাসে বিবাহের দিন স্থির করিয়া পূজার ছুটীতে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। কিন্তু অগ্রহায়ণের শেষে বিনোদ হঠাৎ এক দিন মামারবাড়ী গিয়া মামার প্রতিবেশী দীনু ঘোষের মেয়েকে বিবাহ করিয়া ঘরে ফিরিল। অবিনাশ রাগে আগুন হইয়া উঠিলেন। বড় বৌ তাঁহাকে শান্ত করিল; বলিল, "বেন্দার কাজটা ভাল হয়নি বটে, বৌ কিন্তু দিব্যি মনের মত হ'য়েছে।" অগত্যা অবিনাশকে তাহা মানিয়া লইতে হইল।

অতঃপর অবিনাশ আদালতে বিনোদের চাকরী করিয়া দিলেন। কিন্তু বিনোদ দুই দিন কাজ করিয়াই বুঝিতে পারিল, এইরূপে দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত এক জায়গায় বসিয়া কলমপেশা তাহার কর্ম্ম নয়। বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন উপস্থিত হইলেই মাঠপুকুরের ধারে বটগাছের ছায়ায় বসিয়া চারের চারি পাশে বৃহৎ বৃহৎ রোহিত মৎস্যের উল্লম্ফন একাগ্রচিত্তে নিরীক্ষণ করিবার স্মৃতি আসিয়া তাহাকে বড়ই অধীর করিয়া তুলিত। এ অধীরতা বিনোদ অধিক দিন সহ্য করিতে পারিল না। এক সপ্তাহ চাকরীর পর অসুস্থ হইয়া বিনোদ সেই যে বাড়ী গেল, আর কর্ম্মস্থলে ফিরিল না। প্রত্যহ সদ্যোধৃত মৎস্য ভোজন দ্বারা রোগের প্রতীকার করিতে লাগিল।

বড় বৌ বলিল, "হাঁ রে বেন্দা, চাকরী করবি নি তো খাবি কি?"

বিনোদ উত্তর করিল, "দাদা জানে।"

বড় বৌ বলিল, "দাদা কি তোকে চিরকাল বসিয়ে খাওয়াবে?"

জোরে মাথা নাড়িয়া বিনোদ বলিল, "নি-শ্চয়।"

বড় বৌ হাসিয়া উঠিল। অবিনাশ শুনিয়া বলিলেন, "নেহাৎ হতভাগা।"

তার পর এক দিন বড় বৌ অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়া স্বামীর হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া যখন ক্ষীণ কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো, বেন্দার কি হবে?" তখন অবিনাশ কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তার জন্য কাতর হ'য়ো না বড় বৌ, আমার যা কিছু সবই তার।"

বড় বৌ নিশ্চিন্তমনে হাসিতে হাসিতে পরলোকে চলিয়া গেল। বৌদিদির মৃত্যুতে বিনোদ তিন দিন তিন রাত্রি অন্নজল স্পর্শ করিল না; তুই মাস মাঠ-পুকুরের ধারে গেল না।

কিছু দিন পরে অবিনাশ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন। নূতন বড় বৌ আসিয়া পুরাতন সংসারে জাঁকিয়া বসিল। একটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল; বিনোদেরও একটী মেয়ে হইল। কিন্তু বিনোদের প্রকৃতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না। সে মাছ ধরিয়া, তাস পিটিয়া, স্বচ্ছন্দচিত্তে দিন কাটাইতে লাগিল।

এ দিকে হঠাৎ অবিনাশের দিন ফুরাইয়া আসিল। অবিনাশ যখন তাহা বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি তাড়াতাড়ি একখানা উইল করিয়া ফেলিলেন, এবং তাহাতে বিনোদকেই তাঁহার সমগ্র সম্পত্তির অধিকারী করিয়া, সতীসাধ্বীর অন্তিম শয্যাপার্শ্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিলেন। লোকে সে প্রতিজ্ঞার কথা জানিত না, সুতরাং তাহারা অতিমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল।

২

লোকে ভাবিয়াছিল, বিনোদের নামে উইল্ করিলেও, অবিনাশ আপনার ভূসম্পত্তি বা নগদ টাকাকড়ির কিছু না কিছু স্ত্রীপুত্রকে দিয়া যাইবেন। কিন্তু শ্রাদ্ধশেষে সর্ব্বসমক্ষে যখন উইল পড়া হইল, তখন লোকের বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। উইলে স্ত্রীপুত্রের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত ছিল না।

শ্রীপতি ঘোষাল বলিলেন, "তাই তো, অবিনাশ বুদ্ধিমান্ হ'য়ে এমন কাজটা কেন ক'রে গেল?"

ভোলানাথ ঘোষ বলিল, "মাথার ঠিক ছিল কি না, সেটাও দেখা দরকার।"

বুড়া মৃত্যুঞ্জয় দত্ত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এখন এই বিধবা আর নাবালক দাঁড়ায় কোথায়, সেইটেই হচ্চে প্রধান ভাবনা।"

বিনোদ রাগিয়া বলিল, "পরের ভাবনা এতটা না ভেবে আপনারা নিজের চরকায় তেল দিন গে দত্ত মশায়।"

দত্ত মহাশয় রাগে মাথা কাঁপাইতে কাঁপাইতে বলিলেন, "থাম হে বাপু, নিজের চরকায় তেল দিয়ে দিয়ে মাথার চুল সাদা ক'রেছি। স্ত্রীপুত্র কেউ হ'লো না, সতাতো ভাই হ'লো আপনার। আমরা সবই বুঝে থাকি।"

বিনোদ চড়া গলায় উত্তর দিল, "বুঝে থাকেন, ঘরের ভাত বেশী ক'রে খাবেন।"

অবিনাশের দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুর মাধব সরকার উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিনোদকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "রাগ ক'রো না বাবাজী, দত্তজা যা বলছেন, তা ন্যায্য কথাই বলছেন।"

বিনোদ বসিয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল; ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "দাদা যা ন্যায্য বুঝেছেন তাই ক'রে গেছেন; দাদার কথার উপর কথা কইবার অধিকার কোনও বেটারই নাই।"

সরকার মহাশয় বলিলেন, "অপরের না থাকলেও, আইনের সে অধিকার আছে।"

চীৎকার করিয়া বিনোদ বলিল, "আইন? আইন জানে কোন্ বেটা? আমার দাদা ছিল আইনের জহুরী।"

বিনোদ রাগে জোরে জোরে পা ফেলিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। উপস্থিত সকলেই পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন।

বাড়ীর ভিতর গিয়া বিনোদ বড় বৌকে ডাকিয়া বলিল, "শুনেছ বড় বৌ, বেটারা বলে কি না দাদা বে-আইনী কাজ ক'রে গেছেন। আরে বেটারা, আমার দাদা কি যে-সে লোক ছিল? আইনের পাকা জহুরী, বুঝলে বড় বৌ, আইনের পাকা জহুরী।"

বড় বৌ মুখ ভার করিয়া রহিল, কোনও উত্তর দিল না।

মাধব সরকার দত্তজার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপারটা কি— বলুন দেখি; আমার বোধ হয় উইলটা জাল।"

দত্তজা ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলেন, "উইল যে জাল নয়, তা আমি জানি। তবে সে সময়ে আপনার জামাতার মাথার ঠিক ছিল কি না, সেইটাই হচ্চে কথা। প্রমাণ করতে পারবেন?"

সরকার মহাশয় বলিলেন, "এক জন ভাল উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করে' দেখি।"

কয়েক দিন কন্যাগৃহে অবস্থানের পর সরকার মহাশয় যে দিন গৃহগমনে উদ্যত হইলেন, সে দিন মেয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার কি হবে বাবা?"

সরকার মহাশয় কন্যাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "কোনও চিন্তা নাই মা, মাধব সরকার বেঁচে থাকতে আর এক জন যে তোমার বিষয় ফাঁকি দিয়ে নেবে, তা কখনই হবে না।"

৩

তাসের আড্ডায় দুইখানা ছক্কা এবং একখানা বোম্ খাইয়া বিনোদ যখন নিতান্ত অপ্রফুল্লচিত্তে ঘরে আসিল, তখন ছোট বৌ তাহার সম্মুখে গিয়া সকাতরে বলিল, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, যাদের বিষয় তাদের ফিরিয়ে দাও। আমার সতু বেঁচে থাক্, তুমি ভিক্ষে ক'রে' এনে তাকে খাওয়াবে।"

বিনোদ হুঁকা কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে যাইতেছিল, স্ত্রীর কথায় থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, হ'য়েছে কি?"

ছোট বৌ মিনতি করিয়া বলিল, "না গো, এমন শাপসম্পাতের বিষয়ে আমার কাজ নাই।"

উগ্রস্বরে বিনোদ বলিল, "বিষয়ে তোমার দরকার না থাকে, আমার আছে। শাপসম্পাত দিচ্ছে কে?"

মৃদুকণ্ঠে ছোট বৌ বলিল, "যার বিষয়—দিদি।"

বিনোদ মাটীতে পা ঠুকিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "দিদি শাপসম্পাত দেবার কে? বিষয় তাঁরও নয়, তাঁর বাবারও নয়। আমার দাদার রোজগার করা বিষয়, আমাকে দিয়ে গেছে।"

হাত দুইটা যোড় করিয়া ছোট বৌ সভয়ে বলিল, "ওগো! তোমার পায়ে পড়ি, একটু আস্তে কথা কও, ও ঘরে দিদির বাবা আছেন।"

কিন্তু আস্তে কথা কওয়া বিনোদের আদৌ প্রকৃতিগত ছিল না, তাহার উপর রাগিলে তো রক্ষা ছিল না। সুতরাং সে পূর্ব্ববৎ জোর গলায় বলিল, "থাকলেই বা দিদির বাবা, আমি কারো চুরী করি নাই যে আস্তে আস্তে কথা কইব। দিদির বাবা কি বলেছেন?"

ছোট বৌ নতমুখে শঙ্কাকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "কত কি; মকদ্দমা করবেন, তোমাকে জেলে দেবেন, এমনি কত কথা বলছেন।"

বিনোদ চীৎকার করিয়া বলিল, "সরকার মহাশয় এই সব কুমন্ত্রণা দিতেই বুঝি মেয়ের কাছে আসেন? এমন যদি হয়, তা হ'লে—"

সম্মুখের ঘর হইতে সরকার মহাশয় ডাকিয়া বলিলেন, "তা হ'লে কি হবে গো বিনোদ বাবু?"

সরকার মহাশয় আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইলেন। বিনোদ জ্বলন্তদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল। সরকার মহাশয় তীব্র শ্লেষের স্বরে বলিলেন, "মেরে তাড়াবে নাকি?"

গর্জ্জন করিয়া বিনোদ বলিল, "দেখুন সরকার মশায়, আপনি কুটুম্ব মানুষ, কুটুম্বের মত আসবেন—যাবেন।"

সরকার মহাশয় বলিলেন, "আর তুমি পরের বিষয় নিয়ে দিব্যি মজা ওড়াও!"

রাগে চীৎকার করিয়া বিনোদ বলিল, "আমি আপনার বাবার বিষয় নিতে যাই নাই।"

মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে গম্ভীরস্বরে সরকার মহাশয় বলিলেন, "আমার বাবার বিষয়ে হাত দেয়, এমন বেটা ছেলে আজও জন্মায় নি। নাবালক ভাইপোর বিষয়টা ফাঁকি দিয়ে নেবার চেষ্টা কচ্চো।"

চীৎকারে বাড়ী কাঁপাইয়া বিনোদ বলিল, "কি, আমি ফাঁকি দিচ্চি? কোন্ বেটা এমন কথা বলে?"

ঘাড় নাড়িয়া সরকার মহাশয় বলিলেন, "আমি বলি গো বিনোদ বাবু, আমি বলি। তা বাপু, ফাঁকি দেব মনে করলেই ফাঁকি দেওয়া যায় না। আইন আছে, আদালত আছে, বিচার আছে। সেখানে আর জুয়াচুরী খাটবে না।"

হুঁকা কলিকা ফেলিয়া হাত দুইটা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বিনোদ বলিল, "বেরোও তুমি বাড়ী থেকে।"

বড় বৌ ঘর হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিল, এবং পিতার হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো বাবা গো, ওর সঙ্গে ঝগড়া ক'রো না গো। ও গুণ্ডা, এখনি খুনখারাপী ক'রে বসবে।"

বিনোদ দাঁতে দাঁত চাপিয়া রোষক্ষুব্ধকণ্ঠে ডাকিল, "বড় বৌ!"

ছোট বৌ গিয়া বিনোদকে টানিয়া ঘরে আনিল।

একটু পরে সরকার মহাশয় ছাতা চাদর লইয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় তিনি অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়া গেলেন, "তুমি একটুও ভেবো না মা, আমি যদি তোমার বিষয়ের কড়াক্রান্তিটী পর্য্যন্ত আদায় করে' দিতে না পারি, তবে আমার নাম মাধব সরকারই নয়।"

পিতা চলিয়া গেলে বড় বৌ আপনার ঘরের দাওয়ায় পা ছড়াইয়া বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল, স্বর্গগত স্বামীর নির্বুদ্ধিতার উল্লেখ করিয়া অনেক আক্ষেপ করিল; তার পর যে তাহার বিষয় ফাঁকি দিয়া লইতেছে, তাহাকে কিরূপ শাস্তি দিতে হইবে, সে সম্বন্ধে দিন-রাত্রির কর্ত্তাকে উপদেশ দিতে লাগিল।

ছোট বৌ স্বামীর পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো, রক্ষা কর, বিষয় ছেড়ে দাও।"

দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বিনোদ বলিল, "এক কড়া কাণা কড়িও ছাড়ব না। দেখি, কে আমার দাদার চালের উপর চাল চালতে পারে।"

কয়েক দিন পরে বিনোদ যখন জজের কাছে উইলের প্রোবেট লইতে গেল, তখন বড় বউয়ের পক্ষ হইতে দরখাস্ত পড়িল, উইল প্রকৃত কি না, সে বিষয়ে আবেদনকারিণীর সন্দেহ আছে, এবং উইল করিবার সময়ে উইলকর্ত্তার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছিল কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয়। অতএব হুজুর হইতে ইহার সুবিচারের আজ্ঞা হয়।

সুতরাং হুজুর হইতে বিচারের আজ্ঞা হইল। রীতিমত মোকদ্দমা বাধিল। দিনের পর দিন পড়িতে লাগিল। সরকার মহাশয় মেয়ের গহনা বেচিয়া উকীল মোক্তারের খরচ যোগাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ এরূপ মতও প্রকাশ করিল যে, এই সময়ে সরকার মহাশয়ের টানাটানির সংসার বেশ একটু সচ্ছল হইয়াছিল। কিন্তু ইহা বিনোদের পক্ষীয় দুষ্ট লোকের মত, সুতরাং সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।

৪

মোকদ্দমা করিতে গিয়া বিনোদ মহা বিপদে পড়িল। সে দেখিল, মোকদ্দমায় কেবল টাকার শ্রাদ্ধ হয় না, মানমর্য্যাদারও রীতিমত পিণ্ডদান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। এক দিকে মান বজায় করিতে গিয়া, অপর দিকে অপমানের একশেষ হইতে হয়। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আদালতে হাঁটাহাঁটি করিতে করিতে পা ছিঁড়িয়া যায়। সাক্ষীদের বাড়ী দিনে তিন বার যাতায়াত করিতে হয়, তাহাদের মন যোগাইতে হয়, দোকানের দেনা শোধ করিতে হয়, অনেক অন্যায় আব্দার সহ্য করিতে হয়। ছি ছি, লোকে কি সুখে মোকদ্দমা করে?

মোকদ্দমায় সুখ না থাকিলেও বিনোদ কিন্তু তাহা ছাড়িল না। ইহার সকল কার্য্য তাহার সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত হইলেও, সে এমনই ধীরতার সহিত কাজ করিয়া যাইতে লাগিল যে, লোকে তাহার প্রকৃতির বিপরীত আচরণ-দর্শনে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা মত প্রকাশ করিল যে, বিষয়ের লোভে অসম্ভবও সম্ভব হয়।

মোকদ্দমা যখন পূর্ণবেগে চলিতেছিল, তখন সহসা এক দিন বড় বৌ হাঁড়ী পৃথক্ করিয়া লইল; আলাদা রাঁধিয়া খাইল।

ছোট বৌ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি পৃথক্ হ'লে দিদি?"

বড় বৌ মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "তা হ'লাম বৈকি ভাই। আর দাঁতে জিভে ভালবাসায় কাজ কি!"

বিনোদ শুনিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল।

কিন্তু ছেলেটা বড় গোল বাধাইল। সে কাকাবাবুর সঙ্গে খাইবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিল না। বড় বৌ ছেলেকে বুঝাইল, ধমক দিল, ছেলে কিন্তু কিছুতেই বাগ মানিল না। বিনোদ আসনে বসিয়া কেলো বলিয়া ডাকিলেই সে মাতার তিরস্কার প্রহার সব উপেক্ষা করিয়া কাকাবাবুর পাশে আসিয়া বসিত। ক্রমে ইহা বড় বোয়ের অসহ্য হইল। শেষে এক দিন কালী কাকাবাবুর পাশে বসিয়া যখন ভোজনে উদ্যত হইয়াছে, তখন বড় বৌ বাঘিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া ছেলের পিঠে রীতিমত চড় চাপড় বসাইয়া দিয়া, এবং তাহাকে টানিয়া আনিয়া ঘরে পূরিয়া, ঘরে শিকল তুলিয়া দিল। ছেলে ঘর হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "কাকাবাবু গো, কাকাবাবু গো!"

বিনোদ হাতের ভাত পাতে ফেলিয়া ডাকিল, "বড় বৌ!"

বড় বৌ কোনও উত্তর দিল না, গুম হইয়া দাবায় বসিয়া রহিল। বিনোদ বলিল, "ওকে ছেড়ে দাও বড় বৌ।"

বড় বৌ গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর দিল, "কেন?"

বিনোদ। ও ভাত খাবে।

বড় বৌ। আর ভাত খাইয়ে কাজ নাই। গোড়া কেটে আর আগায় জল ঢালতে হবে না।

বিনোদ। ছাড়বে না?

বড় বৌ। না। বিষয় তো গ্রাস ক'রেছ, আবার ছেলেটাকেও গ্রাস কর কেন?

বিনোদ বিস্ময়পূর্ণকণ্ঠে বলিল, "তুমি বল কি বড় বৌ, কেলোকে আমি বিষ খাওয়াব?"

বড় বৌ বলিল, "কি খাওয়াবে না খাওয়াবে, কে দেখছে বল।"

ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিয়া বিনোদ বলিল, "ছিঃ, তুমি নিতান্ত ছোটলোক।"

বড় বৌ বলিল, "কে ছোটলোক কে ভদ্রলোক, তা বোঝাই যাচ্চে।"

বিনোদ চীৎকার করিয়া বলিল, "তুমি কিছুই বোঝ না বড় বৌ, তুমি মাধব সরকারের মেয়ে, উমেশ দের ছেলেদের বুঝতে তোমার বাবারও সাধ্যি নাই।"

বড় বৌ রাগিয়া বলিল, "দেখ ঠাকুরপো, ঠিক দুপুর বেলা বাড়াবাড়ি ক'রো না, তা বলছি।"

বিনোদ আর কোনও কথা না বলিয়া ভোজনে ব্যাপৃত হইল। ছেলেটা তখনও চীৎকার করিয়া ডাকিতেছিল, "কাকাবাবু গো, কাকাবাবু গো!"

বিনোদ হাতের ভাতগুলাকে থালায় আছড়াইয়া ফেলিয়া উঠিয়া গেল। বড় বৌ মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "আহা হা, সোহাগ দেখেও বাঁচি না। বলে— মাছ মরেছে বেরাল কাঁদে শাস্ত কল্লে বকে।"

৫

বছর খানেক পরে মোকদ্দমা মিটিল। বিচারে উইল প্রকৃত বলিয়া সাব্যস্ত হইল। বিনোদ যেদিন রায়ের নকল পাইল, সেদিন তাহার সগর্ব্ব আস্ফালনে পাড়া কাঁপিতে লাগিল। পাড়ার লোকে বলিল, "বিনোদ, মোকদ্দমায় জিতেছ, এবার এক দিন খাইয়ে দাও।"

গর্ব্বস্ফীতকণ্ঠে বিনোদ বলিল, "মোকদ্দমার আবার জিত হার কি, জিত তো হ'য়েই ছিল। আমার দাদা উইল লিখে গেছে, কার বাবার সাধ্যি তা রদ করে। দাদা ছিল আইনের জহুরী।"

বাড়ীতে আসিয়া বিনোদ উৎফুল্লকণ্ঠে ডাকিয়া বলিল, "শুনেছ বড় বৌ, মোকদ্দমায় জিত হ'য়েছে।"

বড় বৌ কিন্তু তাহার এ আনন্দসংবাদে কিছুমাত্র উৎফুল্লতা প্রকাশ করিল না। সে ঘরের ভিতর উপুড় হইয়া পড়িয়া মৃত স্বামীর উদ্দেশে, ধর্ম্মের উদ্দেশে তীব্র অভিসম্পাত প্রয়োগ করিতে লাগিল।

পর দিন ছোট বৌ বিনোদকে বলিল, "ওগো, দিদি বাপের বাড়ী চললো।"

বিনোদ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

ছোট বৌ বলিল, "কেন আর কি, দিদি বলছে, ওঁর আর এখানে কি, বিষয় আশয় তো সবই তোমার।"

ঈষৎ রুষ্টভাবে বিনোদ বলিল, "হ'লই বা আমার, তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে গেছে?"

ছোট বৌ বলিল, "কি হ'য়েছে না হ'য়েছে, তা আমি জানি না। দিদি কিন্তু যাবার যোগাড় করছে।"

বিনোদ বড় বোয়ের ঘরের কাছে গিয়া ডাকিল, "বড় বৌ!"

বড় বৌ তখন বাক্স পেটরা গুছাইতে ব্যস্ত ছিল, বিনোদের ডাকে কোনও

উত্তর দিল না। বিনোদ দাবার উপর উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বাপের বাড়ী যাবে বড় বৌ?"

বড় বৌ মুখ না ফিরাইয়াই তাচ্ছীল্যের সহিত উত্তর দিল, "হাঁ যাব।"

বিনোদ। কেন যাবে?

বড় বৌ। যাব না তো থাকবো কোথায়?

বিনোদ। তোমার কি থাকবার জায়গা নাই?

বড় বৌ। কৈ আর আছে বল। এমন হতভাগা সোয়ামীর হাতে পড়েছিলাম যে, মাথা গুঁজে থাকবার জায়গাটী পর্য্যন্ত রেখে গেল না।

রাগে চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া বিনোদ বলিল, "মুখ সাম্‌লে কথা কও বড় বৌ, আমার দাদা হতভাগা?"

মুখ ফিরাইয়া গর্জ্জন করিয়া বড় বৌ বলিল, "একশো বার হতভাগা। যে স্ত্রী পুত্রকে পথে বসিয়ে ভাইকে সর্ব্বস্ব দিয়ে যায়, সে আবার মানুষ?"

বিনোদ কঠোর দৃষ্টিতে বড় বউয়ের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বড় বৌ বলিতে লাগিল, "যেমন হতভাগার হাতে প'ড়েছিলাম, তেমনি তো ফলভোগ কত্তে হবে। আমার সব থাকতেও এখন বাপের বাড়ীতে গিয়ে দাসীবৃত্তি ক'রে খাই।"

বিনোদ বলিল, "তা হ'বে না বড় বৌ।"

বড় বৌ জিজ্ঞাসা করিল, "কি হবে না?"

বিনোদ। বাপের বাড়ী যাওয়া হবে না। আমার দাদার স্ত্রী যে মাধব সরকারের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করবে, তা কিছুতেই হতে পারে না।

তীব্র শ্লেষের স্বরে বড় বৌ বলিল, "তবে কি তোমাদের দাসীবৃত্তি করতে হবে?"

বিনোদ বলিল, "তুমি বড় বৌ, তুমি দাসীবৃত্তি করবে?"

কঠোরকণ্ঠে বড় বৌ বলিল, "দাদার বিষয়গুলি হাত করে' দাদার স্ত্রীর উপর যে বড় দরদ দেখছি।"

বিনোদ উচ্চকণ্ঠে বলিল, "বিষয়! বিষয়ের মুখে মারি লাথি। কিন্তু আমি বলছি বড় বৌ, আমি বেঁচে থাকতে তোমাকে বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে দেব না।"

বড় বৌ বলিল, "একশো বার দেবে। যেখানে আমার মাথা গুঁজে থাকবার স্থানটী পর্য্যন্ত নাই, সেখানে আমি কিছুতেই থাকব না।"

রাগে চীৎকার করিয়া বিনোদ বলিল, "আলবৎ থাকতে হবে। বিনোদলাল বেঁচে থাকতে কার সাধ্যি বাড়ীর চৌকাটের বাইরে পা দেয়।"

গর্জ্জন করিতে করিতে বিনোদ চলিয়া গেল। বড় বৌ বেগতিক দেখিয়া পিতাকে আসিবার জন্য সংবাদ পাঠাইল।

৬

চার পাঁচ দিন পরে সরকার মহাশয় আসিলেন। তিনি কন্যাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় নাই মা, আমি পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করবো। হাইকোর্টের এক জন বড় উকীলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এসেছি। তত দিন চল, আমার কাছেই থাকবে।"

বড় বৌ বলিল, "কিন্তু বাবা, ও গুণ্ডা যদি যেতে না দেয়?"

গর্ব্ব প্রফুল্লকণ্ঠে সরকার মহাশয় বলিলেন, "ওর বাবাকে যেতে দিতে হবে। আমি পুলিসে ডাইরী করিয়ে তবে এসেছি। তুমি সব গুছিয়ে নাও।"

বড় বৌ তখন পোঁটলা পুঁটলী বাঁধিতে লাগিল।

বিনোদ ব্যস্তভাবে দাবার উপর উঠিয়া ডাকিল, "কেলো, কেলো!"

কালী মাতামহের কাছে বসিয়াছিল; কাকার ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া তাহার কাছে আসিল। বিনোদ পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিল, "এই নে।"

কালী কাগজখানা হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি কাকাবাবু?"

সহাস্যে বিনোদ বলিল, "ফলারের নিমন্ত্রণপত্র। বুঝলি?"

কালী বলিল, "নেমন্তন্ন? কোথায়?"

হাসিতে হাসিতে বিনোদ বলিল, "তোর শ্বশুরবাড়ীতে। তোর শ্বাশুড়ীর বিয়ে, তারই নিমন্ত্রণ। যাবি তো?"

কাকাবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কালী বলিল, "তুমি যাবে?"

বিনোদ বলিল, "নিশ্চয়। তোর শ্বাশুড়ীর বিয়ে, আমি যাব না?"

উৎফুল্লস্বরে কালী বলিল, "ওহো, আমার শ্বাশুড়ীর বিয়ে!"

বিনোদ তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল, তার পর ধীরে ধীরে দাবা হইতে উঠানে নামিল।

কালী ঘরের ভিতর গেলে সরকার মহাশয় "দেখি" বলিয়া তাহার হাত হইতে কাগজখানা লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

বড় বৌ জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের কাগজ বাবা?"

বিস্ময়ের আতিশয্যে সরকার মহাশয়ের হাতখানা তখন কাঁপিতেছিল, গলাটা শুকাইয়া কাঠ হইয়া আসিয়াছিল। কষ্টে একটা ঢোক গিলিয়া তিনি বলিলেন, "দানপত্র।"

বড় বৌ বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "দানপত্র?"

শুষ্ক মুখে ধরা গলায় সরকার মহাশয় বলিলেন, "জামাই যে সম্পত্তি উইলে বিনোদকে দিয়ে গিয়েছিল, বিনোদ সেই সব সম্পত্তি কালীর নামে দানপত্র ক'রে দিয়েছে।"

বড় বউয়ের বিস্ময়স্তম্ভিত কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "সব?"

সরকার মহাশয় বলিলেন, "হাঁ, সব।"

বড় বৌ হাঁ করিয়া বাপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সরকার মহাশয় কাগজখানা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "এখানা যত্ন ক'রে তুলে রাখ।"

বড় বৌ কাগজখানা হাতে লইয়া ঘরের বাহিরে আসিল; উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "ঠাকুরপো!"

বিনোদ তখন জামা ছাড়িয়া দাবায় তামাক সাজিতে বসিয়াছিল। সে এক হাতে কলিকা এবং অপর হাতে তামাক লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং বড় বউয়ের দিকে চাহিয়া উগ্রকণ্ঠে বলিল, "দেখ বড় বৌ, এবার যদি কোথাও যেতে চাও, তা হ'লে ভাল হবে না—ব'লে রাখছি; আমি একটা খুনখারাবী না ক'রে ছাড়ব না।"

বড় বৌ স্তম্ভিতদৃষ্টিতে দেবরের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঘরের ভিতর বসিয়া সরকার মহাশয় আপন মনে বলিলেন, "আদত বোকারাম। দাদার উপযুক্ত ভাই বটে।"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

দধীচির দেহত্যাগ।

১

কর্ম্মযজ্ঞ সমাপন, হোমাগ্নির রক্ত-শিখা নিবিছে আকাশে ;
পাটল সন্ধ্যার মত পয়স্বিনী হোমধেনু গোষ্ঠে ফিরে আসে !
মৌনী আজি তপোবন, চঞ্চল-স্বভাব মৃগ— আজি ব্যতিক্রম—
নেহারিছে শান্তনেত্রে— দেবদারু-কুঞ্জ-মাঝে দধীচি-আশ্রম।

২

অবিদূরে মৃগাদন, নততুণ্ডে অচঞ্চল,— গণিছে প্রহর ;
কুণ্ডলিত করি' দেহ স্তিমিতনয়নে চাহি' শ্বসে অজগর ;
পাখী নাহি যায় নীড়ে, বসিয়াছে সারি-সারি অরবে শাখায় ;
নাহি বহে সমীরণ, নড়ে না পল্লব, যেন— চিত্রার্পিত-প্রায় !

৩

ধ্যানমগ্ন মহাঋষি, চক্রাকারে ঘিরি' তাঁরে দেব, ঋষিগণ ;
বাক্যহীন—রুদ্ধকণ্ঠ, কুণ্ঠিত দেবতা—সবে সন্নত-বদন !
অন্তেবাসী শিষ্যগণ কহে পরস্পরে মৃদু সজল নয়ন—
"কহিলা আচার্য্য আজি দেবহিতে করিবেন— দেহ-সমর্পণ !

৪

"পিতৃস্নেহে—গুরুস্নেহে পালিলা মোদের তাত করুণা-নিদান,
জ্ঞান-গোমুখীর ধারা রুদ্ধ হবে, গুরুদেব লভিলে নির্ব্বাণ !"
ঋষি-মুখে চাহে সবে শুনিবারে দধীচির মুখে শেষ বাণী ;
ধ্যান-ভঙ্গ-অপেক্ষায় নতমুখে শিষ্যগণ কৃতাঞ্জলি-পাণি !

৫

ধীরে ধীরে মুক্ত-শ্বাস, উন্মীলিত মহর্ষির যুগল নয়ন ;—
হেরিলেন পুরোভাগে যুক্তকর পুরন্দর— সহ দেবগণ !
"একি ভাগ্য,—দেবগণ !" স্মিতমুখে কহে ঋষি, "পূত পদার্পণে
আশ্রম করিলা ধন্য, সুকৃতার্থ কর দেব, আতিথ্য-গ্রহণে !"

৬

কহিলেন ক্ষণ চিন্তি'— "দেবকার্য্যে—দেবহিতে ত্যজিব এ প্রাণ—
"ততোধিক ভাগ্য কিবা? দেহদানে অতিথির রাখিব সম্মান!
"সার্থক তপস্যা মম, যুগে-যুগে ঋষি, নর করি আত্মজয়—
দেবতার বরগ্রাহী, কোন্ পুণ্যে হেন মোর সৌভাগ্য-উদয়!"

৭

"ভগবন্!"—চাহি দীপ্ত মহর্ষির স্মিতমুখে— কহিলা বাসব,—
"তপস্যার রুদ্রতেজে পূর্ণ তব কলেবর,— অস্থি-মজ্জা তব!
"তব ভূতময় দেহ নহে ভূত-পরিণাম,— তপস্তেজঃসার—
স্বর্গে-মর্ত্ত্যে সুদুর্ল্লভ, সেই দেহে দেবতার আছে অধিকার!"

৮

"মঘবন্!"—গাঢ়কণ্ঠে উত্তরিলা তপোধন, জীর্ণ-বাস দেহ—
নিবেদিব দেবকার্য্যে, ততোধিক পুণ্য নাহি, কি তাহে সন্দেহ?"
চাহি শিষ্যগণ প্রতি সস্নেহে কহিলা ঋষি,— "কর শোক গত;
জন্মে মৃত্যু—বৎসগণ, তপস্বীর ত্যাগ ধর্ম্ম, জীবহিত—ব্রত!"

৯

বসিলা দধীচি ঋষি রুদ্ধ করি প্রাণবায়ু— মহা যোগাসনে,
ঘিরি তাঁরে চারি দিকে বসিলেন দেবগণ উদ্ভাসি' কিরণে!
হেরিতে মহিমমূর্ত্তি সম্ভ্রমে দাঁড়া'ল রবি অস্তাচল-শিরে;
শিহরিল তপোবন, ঋষি-কণ্ঠে সামগান উঠিল গম্ভীরে!

১০

ক্রমে স্থির—স্থিরতর নাভি-নিম্নে প্রাণবায়ু উঠে সহস্রারে;
ঋষি-ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদি' জ্যোতির্ম্ময় মহাপ্রাণ মিলিল ওঙ্কারে!
দধীচি ত্যজিলা তনু সাধিতে দেবের কাজ, দেবের মঙ্গল;
মহাত্যাগ-মহাচ্ছবি অনন্ত কালের বক্ষে রহিল উজ্জ্বল!

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। শ্রাবণ। 'বিবিধ প্রসঙ্গে' 'সিদ্ধির পথ' আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে পড়িতে বলি। 'পতি-দেবতা' নামক চিত্রখানির আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। ইহাও একটা আদর্শের উপর আক্রমণ। এমন পতি-দেবতা বাঙ্গালায় নাই, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু ইহা এত সাধারণ নয় যে, এমন চিত্রের বিষয়ীভূত হইতে পারে। হিন্দু আদর্শ ইহার জন্য দায়ী নয়; সমাজের দুর্ব্বলতা ইহার সৃষ্টি করিয়াছে, সে পক্ষেও সংশয় নাই। সমাজে এমন অমানুষ পতির আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া, যে আদর্শে এ দেশের দাম্পত্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত, সে আদর্শ অপরাধী হইতে পারে না। সে আদর্শ পতিকে দেবধর্ম্মের আধার হইতে বলে। পূজার যোগ্য না হইয়া কেহ পূজা সম্ভোগ করিতে পারে না। সে পূজা অযোগ্যের পক্ষে শাস্তির অপেক্ষাও অধিক। যাহার মনে এতটুকু বিবেকবুদ্ধি নাই, তাহার আচরণের বিচারে পতি-দেবতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয় না। পতিই শুধু দেবতা নহেন। যে আদর্শে পতি দেবতা, সে আদর্শে পত্নীও তাই। সহধর্ম্মচারিণী। তিনি গৃহে লক্ষ্মী। শুধু পত্নী নহেন, নারীমাত্রই পূজার্হ। 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।' তন্ত্রে নারীই শক্তি। গগনবাবু দুর্ভাগ্যক্রমে যাহা দেখিবার অবকাশ পাইয়াছেন, তাহা এইরূপ বলিয়া, 'পতি-দেবতা'র আদর্শ আক্রমণের যোগ্য হইতে পারে না। এমন পাষণ্ড পতি-দেবতা বলিয়া পূজা লাভ করুন, এমন দাবী আমরাও করিব না। কিন্তু গগনবাবু এই চিত্রেই নিজের অজ্ঞাতসারে সেই আদর্শের এক দিকের সফলতা—মহত্বই ফুটাইয়া দিয়াছেন। পতি-দানবের পদতলে যে সহিষ্ণুতার মূর্ত্তি নারীটিকে আঁকিয়াছেন, তাঁহাকে ত দেবতা বলিয়াই মনে হইতেছে। ইহাও সেই আদর্শেরই ফল। যতই অসাম্য থাকুক, সেই আদর্শের কল্যাণেই ছবিখানিতে, এ অবস্থায় ইউরোপে যাহা হয়, এবং তাহার সাত-নকলে আমাদের দেশে যে সমাজে 'আসল খাস্ত' হইতেছে, সেখানেও যাহার আমদানী হইয়াছে, সে ভাব উগ্রচণ্ড বা পাষণ্ড পতি ও উগ্রচণ্ডী বা রণমুখী পত্নী—এই দুই দেবতার দ্বন্দ্ব—গগনবাবুর চিত্রে আত্মপ্রকাশ করে নাই। অত্যাচার সকল ক্ষেত্রেই অত্যাচার। সে অত্যাচার যত ক্ষুদ্র, তত শোচনীয়, তত ঘৃণ্য। দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের মত এ অত্যাচারও সাম্যের পদতলে দলিত হউক। কিন্তু যে আদর্শের উপর কটাক্ষ ছবিখানির অভিপ্রেত, তাহা পণ্ড হইয়াছে। কেন না, সেই আদর্শের ফলে এ দেশের নারী যে ধর্ম্মের ও যে ভাবের পবিত্র আধার হইয়াছেন, গগনবাবুর ছবিতেও তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিত্যানন্দ সেই ভাবের অভিব্যক্তি—তিনি ক্ষমার অবতার, সহিষ্ণুতার বিগ্রহ। খৃষ্টানের বাইবেল তাহাদের দেবতা 'ঈশ্বরের পুত্র' যীশুতে এই ভাবের আরোপ করিয়াছে। গগনবাবু এখন বলুন—যে আদর্শের কল্যাণে সাধারণ ও দুর্ভাগ্য নারীর আধারেও এমন ভাবের অভিব্যক্তি হয়, যাহার প্রভাবে তাঁহার তুলিতে এমন সহিষ্ণুতার ছবি অনিচ্ছাসত্বেও ফুটিয়া উঠে, সে আদর্শ

বিদ্রূপের যোগ্য কি না? সেই আদর্শের অর্দ্ধেক অংশী পুরুষ যে ভাবের আবর্ত্তে পড়িয়া, যে শিক্ষার মোহে বিকৃত হইয়া এমন পশু হইতেছে, সেই 'যত নষ্টের মূল'কে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করুন। বর্ত্তমান সকল অত্যাচারের—সকল অধঃপাতের জন্য প্রাচীন আদর্শই দায়ী নহে, তাহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে। আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি কথা' আমরা আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়াছি, এবং উপকৃত হইয়াছি। আচার্য্য রায়ের প্রত্যেক উক্তি বাঙ্গালীর মনে রাখা উচিত। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্রের 'কৃষির অন্তরায়' আর একটি উপাদেয় হিতকারী প্রবন্ধ। এইরূপ নিবন্ধ কবে বাঙ্গালীর মনোহারী হইবে? শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'বাদল-গান' পড়িয়া মনে হয়, লেখকের হাত আছে। এই সম্ভাবনাটুকু সাধনায় সফল হউক। ইনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আধুনিক রচনারীতির অনুসারী। নিজস্বটুকু যেন অন্য রীতির প্রভাবে সমাচ্ছন্ন না হয়। শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর 'বৈষ্ণব কবিতা' সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যায় না। লেখক রসজ্ঞ, এবং চিন্তাশীল। অথচ কেমন করিয়া এমন একদেশদর্শী হইলেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ইঁহারা প্রিয় কবিদের সমালোচনায় পাঠকের নিকট যে উদারতা ও ভক্তির দাবী করেন, প্রাচীন কবিদিগকে তাহার এক বিন্দুও দিতে চান না! 'আর্টের' খাতিরে সাহিত্যে—উপন্যাসে—নাটকে—কবিতায় কামের সমর্থন করেন, কিন্তু দেশের—অন্ততঃ দেশবাসী এক বিস্তৃত সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতার সম্বন্ধকে অনায়াসে অত্যন্ত কুৎসিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। স্থান ও কাল ও পাত্র ইঁহাদের একদেশ-দর্শিতার অতীত।—অজিতবাবুর মতে, চণ্ডীদাসকে বাদ দিলে বৈষ্ণব-কবিতায় কিছুই থাকে না! তবে আর এ পণ্ডশ্রমই বা কেন? বৈষ্ণবের মনে আঘাত দিয়াই বা লাভ কি? 'প্রচারে' কোনও মুন্সেফের একটি মামলার বিচারের আলোচনা-সূত্রে একটি গল্প ছাপা হইয়াছিল। অজিতবাবুর এই নিহিলিষ্ট রচনায় চণ্ডীদাসের সৌভাগ্য দেখিয়া সেই গল্পটি মনে পড়িল।—গুরু শিষ্যবাড়ী গিয়াছেন। শিষ্য হাটে গিয়া এক কুড়ি বড় বড় 'পয়জারে' কই কিনিয়া আনিল। গুরু রন্ধন করিলেন; এবং ভাত বাড়িয়া, সেই এক কুড়ি কই মাছের ঝোলের কাঁসী পাত্রের কাছে টানিয়া লইয়া খাইতে বসিলেন। আশে পাশে বাড়ীর ছেলে মেয়েরা বসিয়া আছে। গুরুর সেবা হইলে তাহারা প্রসাদ পাইবে।—গুরু একে একে উনিশটি কই নিঃশেষ করিলেন। অবশিষ্টটি নাড়িয়া চাড়িয়া কাঁসীতে রাখিয়া দিলেন। সেটি খাইলে আর প্রসাদ থাকে না। শিষ্য দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। সে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, 'ঠাকুর! উটিও খান; নয় ত আপনার ব্যাটার মাথা খান। উনিশটি যেখানে গিয়াছে, ওটাও সেখানে যাক্।' —অজিতবাবুকেও বলিতে ইচ্ছা হয়—চণ্ডীদাসকেই বা রাখিলেন কেন? উটির মাথাও খান। আপনার সমালোচনার দিব্য—উটিকেও রাখিবেন না! শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্তের 'নূতন চয়ের চাষী' নামক কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। বহুকালের পরে একটি 'কবিতা' পড়িলাম, যাহাতে গতানুগতিকতা নাই, পাকচক্র নাই; যাহা সহজ ও স্বচ্ছ; যাহাতে সামান্য আবেষ্টনের মধ্যে মহান মানব-হৃদয়ের একটু স্পন্দন, একটু সাড়া আছে। 'মন্দালয়' মন্দ নহে। 'বাঙ্গালার নূতন শিল্পী' প্রবন্ধে দেখিতেছি—'সম্প্রতি এখানেও দু জন নূতন ভাস্করের অভ্যুদয় হইয়াছে। এক জন শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় চৌধুরী, অপর জন শ্রীযুক্ত নারায়ণ

কাশীনাথ দেবল। ইঁহারা উভয়েই ইংলণ্ড হইতে প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিতে শিখিয়া আসিয়াছেন। * * শ্রীযুক্ত দেবলের মধ্যে সার্ব্বভৌম সম্মিলন হইয়াছে। তাঁহার পিতা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, মাতা ব্রহ্মদেশীয়া মহিলা; এক জন হিন্দু, অপর জন বৌদ্ধ। বাল্যকাল কাটিয়াছে, চীনের সীমান্তে ব্রহ্মের ম্যিৎকিয়িনা সহরে পিতামাতার কাছে। দশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা তাঁহাকে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে দিয়া যান; সেই অবধি আট বৎসর তিনি রবীন্দ্রনাথের ছাত্র—শিষ্য ছিলেন। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ইংলণ্ডে, তখন তিনি দেবলকে সেখানে লইয়া যান ও লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে সাহিত্য ও দর্শন অধ্যয়নে নিযুক্ত করিয়া দ্যান। দেবলের মধ্যে শিল্পপ্রবৃত্তি প্রবল থাকাতে তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে চেলসীর পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে গিয়া মাটির মূর্ত্তি প্রতিমা গঠন করিতে আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে ফিরিয়া দেবলের শিল্পানুরাগের পরিচয় পাইয়া তাহাকে সেই পথেই যাইতে উৎসাহ ও আদেশ দ্যান। দেবল কলেজ ছাড়িয়া কিংস্‌ওয়ের সেণ্ট্রাল আর্ট স্কুলে রিচার্ড গার্ব নামক শিল্পী ভাস্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। সেই স্কুলে প্রস্তরমূর্ত্তি ও ব্রঞ্জমূর্ত্তি গঠনের প্রণালী ও কৌশল শিক্ষা করিয়া তিনি দেশে ফিরিয়াছেন। দেবল এ পর্য্যন্ত অতি অল্পই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু যাহা করিয়াছেন, তাহারই মধ্যে তাঁহার শক্তি-বিকাশের আভাস পাওয়া গিয়াছে। কঠিন উপাদানে মানুষের প্রকৃতির সূক্ষ্ম সদা-সচঞ্চল ভাবগুলি ধরিয়া স্থায়ীভাবে প্রকাশ করা বড় কঠিন সাধনার কাজ। সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভের আভাস দেবলের হাতের কাজে পাওয়া যায়।' শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর 'অভয় হয়েছি' গানটি বেশ হইয়াছে। দেশের হাওয়ার সঙ্গে ইহার সুর মিলিয়া গিয়াছে। শ্রীমতী সীতাদেবীর 'চোখের আলো' নামক গল্পটিতে যেমন কল্পনার লীলা, তেমনই বর্ণনার ঐশ্বর্য্য। তাহা উপকথার ধন-রত্নের মত অগাধ নয়, এবং যেখানে সেখানে ছড়ান নাই। কিন্তু যেখানে যেটুকু সাজে, সেখানে সেটুকুর সমাবেশ আছে। চম্পার একাগ্রতা ও একনিষ্ঠা, তাহার সংযত আকাঙ্ক্ষা, অব্যক্ত কামনা, উষার অস্ফুট আলোর মত তাহার প্রেমের ঈষৎ আভাস —গল্পে বেশ ফুটিয়াছে। ইহাতে নবাবের প্রাসাদ আছে, নবাবী বিলাস আছে, কিন্তু স্বকারজনক উপাদানের অস্তিত্ব নাই। শালীনতার গণ্ডীর মধ্যেও ভোগপরায়ণ নবাবী ও হৃদয়হীন বিলাস বেশ ফুটিয়াছে। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন—'পাট-চাষ অধিক কাল পূর্ব্বে ছিল না। পাট-গাছ জানা ছিল। চরকে নালিকা নাম আছে। পাটের ডাঁটা নলের মতন ফাঁপা বলিয়া নাম না-লি-কা; ক স্থানে চ হইয়া সংস্কৃত-প্রাকৃতে না-লি-চা, এবং চ স্থানে ত হইয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালায় না-লি-তা। সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে না-লি-চা সম্বন্ধে কিছু আসিয়া জুটিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বাঙ্গীর শিকার নিমিত্ত পাটের দোড়ী করিয়াছিলেন। যথা,

নালিচা কাটিআঁ কাহ্নাঞিঁ মাঝজলে থুইল। সুথায়িআঁ বাছিআঁ পাট করিল সুসর।
বার পহর হয়িলেঁ তাহাক তুলিল॥ চারী গুণ দড়ী পাকাইল দামোদর॥ (১৬৮ পৃঃ)

এই বর্ণনা হইতে বুঝিতেছি এই কীর্ত্তন-রচনার সময় পাটগাছের আঁশের দোড়ী জানা ছিল। বহু পূর্ব্বকালে নানাবিধ গাছের আঁশ হইতে দোড়ী করা হইত; এখনও হয়। যেমন আকন্দ, মূর্বা। কিন্তু চাষ হইত না, এখনও হয় না। সে যাহা হউক, উক্ত কীর্ত্তন-রচনার সময়

নালিচার চাষ হইত না। হইলে শ্রীকৃষ্ণ (১) নিজে আঁশ বাহির করিতেন না, (২) নালিচা দেড় দিন মাত্র জলে ভিজাইয়া এবং শুখাইয়া কাঠি বাছিয়া পাট 'হুসর' আদায় করিতেন না। বর্ণনাটি পড়িলেই মনে হয়, নালিচা বস্ত্র জন্মিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ কোন-রকমে দোড়ী করিয়াছিলেন। —শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন পুথি নাকি ছয় শত বৎসরের পুরাতন। ইহার পরবর্ত্তী পুথিতেও পাট-চাষের উল্লেখ পাই নাই। রামাই পণ্ডিতের শূন্য-পুরাণে ধর্ম্ম-ঠাকুর শিব হইয়া পার্ব্বতীর অনুযোগে ভীমের সাহায্যে চাষ করিয়াছিলেন। তিনি পাটের চাষ করেন নাই। শণেরও করেন নাই। এই পুরাণে পাট শব্দ আছে। এক স্থানে ধর্ম-ঠাকুরের ঘোড়ার সাজনের মধ্যে আছে। কৃত্তিবাসে পাট শব্দ পাই নাই, 'পাটুয়া' নৌকা পাইয়াছি। এখানে হিন্দী ভাষার "পাটুয়া," শণের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে মনে করি। কবিকঙ্কণেও, এমন কি নেদিনকার (২০০ বৎসরের) শিবায়নেও পাটের চাষ নাই, অন্য চাষের কথা আছে। কৃত্তিবাস ব্যতীত অন্য চারি কবি পশ্চিম বঙ্গের। পশ্চিম বঙ্গে পাট-চাষ সেদিন আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গেরও দুই একখানা পুরাতন পুথী দেখিয়াছি। গাছ-পাটের দোড়ীর নাম-গন্ধও নাই। প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বের বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে আছে,

বুনিয়া নালিতা খেতে যাব উক্কা ধান॥ (৫৬৫ পৃঃ)

অতএব নালিতা শাগের চাষ হইত। পূর্ব্ববঙ্গের কোনো পুথীতে পাটের দোড়ীর উল্লেখ আছে কি না, জানি না। কেহ দেখিয়া থাকিলে, জানাইলে সন্দেহ যায়।" শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের 'গুড়ের উদ্ভবে' অনেক তথ্য আছে। 'দেশের কথা' এবার অত্যন্ত অল্প।

ভারতী। শ্রাবণ। 'ব্যঙ্গ' নামক ছবিখানি শ্রীযুত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত। সহরে শুনি, এখানি কোনও ইঙ্গ-বঙ্গ সম্পাদকের প্রতি-রূপ। একটা টবের উপর 'hibrid' বাঙ্গালী দণ্ডায়মান—বোধ হয় গজাইয়া উঠিয়াছে। হরি-হরের মত ইহাও আধো সাহেব, আধো বাঙ্গালী। অর্দ্ধ অঙ্গে ধুতি, পঞ্জাবী, চাদর, ছড়ি, লপেটা। অর্দ্ধ অঙ্গে কোট, পাঁতলুন, টাই, চশমা ও বুট; এ অঙ্গের হাত পাঁতলুনের পকেটে পোরা। সমাজে এমন 'type' প্রচুর। তবে দেশ-কাল-পাত্র ভোলা যায় না। দেশটা বাঙ্গালা; কালটা বস্তুতন্ত্র-সাহিত্য ও দেবেন্দ্রবাবুর ব্রাহ্মসমাজের কীর্ত্তি লইয়া 'নারায়ণ' ও 'ভারতী'র ঝগড়ার কাল; পাত্র এক দিকে চিত্তরঞ্জনাদি; অন্য দিকে ভারতী ও গগনবাবু। 'নারায়ণে'র সম্পাদক বিলাত-ফেরত, কিন্তু হিন্দুয়ানী ও স্ব-তন্ত্রের পক্ষপাতী। এই সকলের সমবায়ে জন-সাধারণ ছবিখানিকে ব্যক্তিবিশেষের নক্সা-গ্রাফ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। যাহা হউক, আমাদের মনে হয়, তাহা মনে না করিলেও চলে। 'hybrid' 'ভারতী'র অঙ্গে লগ্ন না হইলেও রসিকতা আত্মহত্যা করিত না। উহা 'ব্যঙ্গ' নয়, তাহা বোধ করি, না বলিলেও চলে। উহাতে একটা 'ধ্বনি' আছে; সে 'ধ্বনি' সাংঘাতিক; এবং সাহিত্য-সমাজে উহার প্রভাব না বাড়াইয়া কমাইবার চেষ্টা করিলেই শোভন হয়। শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমালোচক' প্রবন্ধে 'নারায়ণে' প্রকাশিত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন। শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'প্রতারণা' নামক গল্পটি বোধ হইতেছে অনুবাদ। কিন্তু আতর্থী মহাশয় তাহার উল্লেখ করেন নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে এ ধারাটা বেশ চলিয়া যাইতেছে। যাঁহার

গল্প, তাঁহার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ না করিয়া, বেমালুম হজম করা হইতেছে। 'ভারতী'র অন্যতম সম্পাদক সৌরীন্দ্রমোহনের 'পরদেশী'র সব গল্পগুলিই বিদেশী ; লেখক না বলিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন ; দয়া করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন ; ছাপিয়াছেন ; বেচিতেছেন। কিন্তু যাঁহাদের দৌলতে এতটা সম্ভব হইল, ঘুণাক্ষরেও তাঁহাদের নাম করিলেন না! সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা নাই, তাহা আর কে অস্বীকার করিবে? 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ' যদি অন্যত্র প্রশংসিত হয়, তবে সাহিত্যে তাহা নিন্দিত হইবে কেন? 'কণিকা'য় শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বলিতেছেন,—'স্বাধীনতা অবিবেকী নয়, অবিমৃষ্যকারিতার স্থান তার মধ্যে হয় না।' স্বাধীনতার বিবেক থাকিতে পারে, তবে সে চুল চিরিয়া বিচার করিবার সময় পায় না, ইহাও স্থির। 'স্বাধীনতার গতি উল্কার মত কক্ষভ্রষ্ট নয়।' কিন্তু কখনও কখনও তাহার গতি ধূমকেতুর মতও হয়। কতকগুলি অর্দ্ধপক্ব কণিকা। শ্রীগুরুদাস সরকার জুল বোয়া নামক এক জন ফরাসী লেখকের গ্রন্থ হইতে 'বিবেকানন্দ-সঙ্গমে' নাম দিয়া স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গের অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় 'আমাদের নিজস্ব সম্পদ কোথায়'—এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া অনেক মামুলী তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। তবু মনে হইতেছে, সে সম্পদ যক্ষের ধনের মত প্রচ্ছন্ন—নরেন্দ্রনাথও তাহার সন্ধান পান নাই। জাতিভেদাদি আপাততঃ উঠিবে, এমন সম্ভাবনা ত দেখিতেছি না। কন্যাকুমারী হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের মাটী উল্টাইয়া দিয়া যদি ভারতের অভিব্যক্তির বীজ বপন করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা নাচার। তাহা দু' দশ যুগের কথা। আপাততঃ, 'হালফিল' এই অবস্থা লইয়া কি করা যায়, তাহাই স্থির করুন। 'ভেদ' সব সমাজেই আছে। তাহারা 'অভেদে'র অপেক্ষায় বসিয়া নাই।—এ দেশে নিশ্চিন্ত থাকিবার একটা উপায় ছিল,—'যা আছে, থাক্।' এখন আর একটা উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে,—'যা আছে, সব যাক্।' কিন্তু ভাঙ্গা ত সহজ নয়। কে ভাঙ্গে? মহাকাল এত কাল যাহাকে ভাঙ্গিতে পারিলেন না, তাহাকে তুমি আমি ভাঙ্গিয়া সমভূম করিয়া, ভারতের উন্নতির বড় রাস্তা রসা রোডের মত আরও চওড়া করিয়া দিতে পারিব কি? যত দিন এ সমাজটা নূতন মূর্ত্তি ধারণ না করে, তত দিন কি 'বিবর্ত্ত' বন্ধ থাকিবে? নরেন্দ্রনাথ শেষকালে যে কথাটি বলিয়াছেন, তাহা সত্য। অনেক মহাপুরুষ পুনঃ পুনঃ তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।—'যদি আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সজাগ করিতে পারিতাম, জীবন-সংগ্রামে পৃথিবীর বক্ষে আজ আমরা এতটা হীনতার পরিচয় দিতাম না।' জাগাও সেই কুলকুণ্ডলিনীকে, তিনি জাগিলে সব জাগিবে ; সিদ্ধির ভাবনা থাকিবে না। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অস্থি'র বস্তু মনোরম, কিন্তু ভাষা, তাঁহারই ভাষায়, 'আমাদের অপরিচিত খটমটে ঠেকেছে।' গল্পটির পর আর একখানি ব্যঙ্গ-চিত্র।—এখানি 'কার্টুন' বটে। ইহার নাম—

'বস্তুহীন কবিতায় ভরেনাক ভুঁড়ী,
খুঁড়িতে আসল কাব্য ছ' পন ছ' বুড়ী।'

টেবিলের উপর 'কবিতা' আছে ; একটা পাত্রে, বোধ হয়, সন্দেশও আছে। চিত্রের হীরো সতৃষ্ণনয়নে, বোধ হয়, সন্দেশই নিরীক্ষণ করিতেছেন। ভুঁড়িটি বেশ অগ্রসর। কাঁধে খোঁচা

ইহা বৈষ্ণব-কবিতা-প্রীতি ও বৈষ্ণবধর্ম্মানুরাগের সূচনা করিতেছে। খোল দেখিয়া অনেকে ভবানীপুরের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—'ঐ মাটীতেই খোল হইয়াছে।' হইতে পারে। অন্য মাটীতেও খোল না হয়, এমন নয়। এ ছবি দেখিয়াও আমরা বলিব, বস্তুহীন কবিতা অপেক্ষা সন্দেশ সহস্রগুণে শোভনীয়। 'নারায়ণ' কেন ছবি না দেন? তাহা হইলে উভের শোনা যায়।—একটা কথা বলিব,—যখন 'ঘুঁটে পোড়ে, তখন গোবর হাসে'। যখন গোবর ঘুঁটে হইয়া পুড়িবে, গগনবাবুরা যেন তখন একটু সহিষ্ণুতার—ধৈর্য্যের পরিচয় দেন। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুরাতন পূজার সাজ' সংক্ষিপ্ত, কিন্তু উপাদেয় প্রবন্ধ। 'মাসকাবারী' চলিতেছে। 'উত্তর-প্রত্যুত্তরে' লেখক প্রশ্ন করিয়াছেন,—'ভারতবর্ষে আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন ব্যক্তি বৈদেশিক ন্যাশন্যালিজমের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন?' অনেকে। আপনাদের দেশেই বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, বিপিনচন্দ্র, চৌধুরী আশুতোষ, শ্যামসুন্দর প্রভৃতি অনেকে। বাঙ্গালার বাহিরেও তিলক, লাজপৎ, স্বামী রামতীর্থ প্রভৃতি ইহার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে, নানা রূপে ও নানা ভাবে, 'বৈদেশিক ন্যাশন্যালিজমে'র বিরুদ্ধ মত এ দেশে প্রচারিত হইয়াছে। ঠিক রবীন্দ্রনাথের উক্তির 'প্যারালেল্ প্যাসেজ' না হইতে পারে, আসল বস্তুটার কথা বলিতেছি। অজিতবাবু ভারতবর্ষের 'ন্যাশন্যালিজমে'র ধারা অন্বেষণ করিয়া দেখুন না। রবীন্দ্রনাথ জাতির জাতীয়তা-বিকাশের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহাও অসাধারণ, অসামান্য; সে জন্য আমরা ঋণী। কিন্তু এ ধারার উৎস তাঁহারও অগ্রবর্ত্তী। তাহাতে রবীন্দ্রনাথের গৌরব খর্ব্ব হইতে পারে না।

গৃহস্থ। চৈত্র।—বহুদিন পরে 'গৃহস্থ' পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।—এই বোধ হয় প্রথম 'গৃহস্থ' দেখিলাম, যাহাতে শ্রীবিনয়কুমার সরকারের রচনা নাই। 'আলোচনা'য় নানা বিষয়ের আলোচনা আছে। কিন্তু এবার 'আলোচনা'র দৈন্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেবল 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোলশিক্ষা' ও 'আমাদের কর্ত্তব্য' উল্লেখযোগ্য। শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষের 'কে আসিবি তোরা আয়' পড়িলাম, বুঝিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না। কবির কলমে যা আসিয়াছে, তিনি অসঙ্কোচে তাই লিখিয়া গিয়াছেন। মাঝে মাঝে 'সখি' আছে—তাহা বড় অক্ষরে ছাপা। 'রক্তিম ঘন চরণে নূপুর বাজিয়া উঠিছে হায়!'—চরণ অবশ্য 'ঘন' হইতে পারে না। 'রক্তিমে'র বা 'বাজিয়া উঠিছে'র 'ঘন'টি নূপুর টপ্‌কাইয়া চরণের চরণে পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতেছে। শ্রীঅনিলচরণ রায়ের 'মানুষ ও প্রকৃতি' উল্লেখযোগ্য। শ্রীকালিদাস রায়ের 'রুদ্রাণী' পড়িয়া কবির জন্য শঙ্কিত হইতে হয়! কবি বলিতেছেন,—

'অধিকার করে যদি চিত্তরাজ্য কামক্রোধ, মোহ,
দ্বেষ, অহঙ্কার,
কাঁসর-ঘণ্টায় তবে, মুখরিত করিয়া সংসার,
করিও পুকার।'

'পুকার'! যে বুঝিতে চাও, সে শব্দসাগর মন্থন কর। আমরা ভাবেই মসগুল,—'মানে'র জন্য মাথা খুঁড়িব না।—কবি ইন্দ্রিয়জয়ের একটা সহজ পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। মনু হইতে

বুদ্ধ ও কনফিউসিয়স হইতে শ্রীচৈতন্য পর্য্যন্ত কেহ ইন্দ্রিয়নিগ্রহের এ পথ দেখিতে পান নাই। রামদাস, নানক, গোরক্ষনাথ এ উপায়ের আভাসও পান নাই। তুকারামের অভঙ্গে, কবীর ও তুলসীদাসের দোঁহায়, অক্ষয়কুমার দত্তের ধর্ম্মনীতিতে, রামকৃষ্ণদেবের উপদেশে, ঠাকুর হরনাথের কেতাবে, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোর নীতিবোধে, দাশু রায়ের পাঁচালীতে, নিধুবাবুর টপ্পায় এ ইঙ্গিত নাই। বাঙ্গালার প্রত্যেক গৃহস্থ ছেলে মেয়েদের কাঁসর-ঘণ্টা কিনিয়া দিন। রাজা রাজড়ারা প্রাইভেট-টিউটার তাড়াইয়া কাঁসর-ঘণ্টা বাজাইবার জন্য এক এক পল্টন 'বাজিয়ে' রাখুন। কবি কালিদাস গৌড়দেশে কাঁসর-পন্থী, ঘণ্টা-পন্থী, বা কাঁসর-ঘণ্টা-পন্থী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া সমগ্র গৌড়জনের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। শ্রীরাখালরাজ রায়ের 'দুইটি কামারের কথা' উপাদেয়। শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার বিদ্যাভূষণের 'পঞ্জাবে খেজুর চাষ' উল্লেখযোগ্য। দুইটি প্রবন্ধই 'গৃহস্থে'র বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। শ্রীরমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'বর্ণভেদ' সুচিন্তিত ও সুলিখিত সন্দর্ভ।

স্থাপত্য-শিল্প।

৪

স্থাপত্য বিষয়ে ধর্ম্মপ্রভাবের কথা সংক্ষেপে উক্ত হইল; এইবার অন্যান্য প্রভাবের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা যাউক। দ্বিতীয় প্রস্তাবে প্রসঙ্গক্রমে* বলিয়াছি যে, এক ইটালী দেশের মধ্যেই রোম্যানেস্ক্ রীতির কত বিভিন্ন প্রকারের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। রেণাসাঁস্ রীতি ইটালীতে জন্মিয়া সমস্ত পশ্চিম য়ুরোপে বিস্তৃত হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মনী ও ইটালীর মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন-ভাব-যুক্ত রীতির প্রবর্ত্তনা দেখি; ইহার কারণ আমি পূর্ব্বেই স্থূলতঃ নির্দ্দেশ করিয়াছি। বিভিন্ন দেশের আদর্শ স্থাপত্যের একই মূল চরম সত্যকে বিভিন্ন ভাবে অন্বিত করিয়াছিল বলিয়া আমরা স্থাপত্যকে বিভিন্ন আকারে দেখি। প্রত্যেক দেশের যে সনাতনী ঐতিহাসিক-ধারা রহিয়াছে, তাহাকে কোনও নব আদর্শই একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারে না; ইহার নিগড়ে বদ্ধ না হইবার প্রয়াস ব্যর্থ হইতেই হইবে। এ "জলতরঙ্গ" সম্পূর্ণরূপে "রোধিতে" পারা যায় না; আদর্শটি জলপ্রবাহে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিবে বটে, কিন্তু পুরাতন তরঙ্গের আবর্ত্তে পড়িয়া তাহারও সলীল উত্থানপতন অবশ্যম্ভাবী, এবং গতিও অবস্থাক্রমে সরল বা তির্য্যক রেখায় চালিত হইবে। এই উত্থান ও পতন, এবং সরল ও তির্য্যক ভাবের নানা গতির সমষ্টি লইয়া এক জটিল গতির সংস্কার হয়। এই কারণেই আমরা ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক আদর্শ দ্বারা অন্বিত স্থাপত্য ভিন্ন ভিন্ন আকারে দেখি।

রেণাসাঁস্ রীতির কথা বলিতেছিলাম; আমি এই রীতিরই ভিন্নদেশীয় অভিব্যক্তিগুলির তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেশমূলক বিভিন্নতার উদাহরণ দেখাইবার চেষ্টা করিব। ইটালী দেশে রেণাসাঁস্ রীতির যে বিশিষ্টতা দেখা যায়, ফ্রান্স দেশে তাহা দৃষ্ট হয় না। প্রথমোক্ত দেশের গৃহগুলির মধ্যস্থলে অঙ্গন অবস্থিত, এবং তাহার চতুর্দ্দিকে খিলান ও স্তম্ভযুক্ত দালান রহিয়াছে, এবং দ্বিতীয় বা তৃতীয় তলের প্রকোষ্ঠগুলি প্রথমতলের প্রকোষ্ঠ ও বারাণ্ডার উপর ব্যাপিয়া অবস্থিত। উহার কারণ এই যে, উপরতলের প্রকোষ্ঠগুলি প্রশস্ত হওয়া চাই।

উদাহরণস্বরূপ ফ্লরেন্সের প্যালাজো (palazzo) নামক প্রাসাদগুলির বিষয় চিন্তা করিতে বলি। রেণাসাঁস্-সময়ে নির্ম্মিত ফ্রান্সদেশের অট্টালিকাগুলির অঙ্গন এ প্রণালীতে স্থাপিত করা হয় নাই; অঙ্গনের দুই পার্শ্বে নাত্যুচ্চ প্রকোষ্ঠশ্রেণী মধ্যস্থ "চক্" বা গৃহগুলি হইতে বাহির হইয়াছে। অঙ্গনের চতুর্দ্দিকে চক্ মিলাইবার জন্য সৌধের সম্মুখাংশে একটি ভিত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে; এ পদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা Chateaw de Chambord নামক প্রসিদ্ধ অট্টালিকায় প্রাপ্ত হই; এসময়কার গৃহগুলি প্রাসাদ ও দুর্গের মিশ্রণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ইটালীয় ও ফরাসীস্ রেণাসাঁস পদ্ধতিতে নির্ম্মিত অট্টালিকাগুলির বহির্দৃশ্য এত বিভিন্ন প্রকারের যে, উহাদের প্রতিকৃতিগুলি সম্মুখে স্থাপিত করিলে, কোনটি কোন্ দেশের, তাহা অনায়াসেই অবধারণ করা যাইতে পারে। ইটালীয় হর্ম্ম্যগুলির বহির্দৃশ্যে কোনও জটিলতা নাই বলিলেও চলে; ইহার ভিত্তিগুলি সরল ও লম্বভাবে উঠিয়াছে। কিন্তু ফরাসীদেশস্থ হর্ম্ম্যগুলির মাঝে মাঝে ও কোণাংশে অবস্থিত ক্রমনিম্ন-ছাদ-যুক্ত (Mansard Roof) নাত্যুচ্চ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠগুলি দর্শকের মনে ইহার বিশিষ্টতা সম্বন্ধে কৌতূহলের উদ্রেক করে। বাটীগুলির সর্ব্বোপরি বৃত্তাকার গবাক্ষযুক্ত যে অল্পোচ্চ প্রকোষ্ঠগুলি রহিয়াছে, তাহা ও চিম্‌নী (Chimney)-গুলি ইহার আর এক বিশিষ্টতা। ভিনিস্ প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলে, ইটালীয় রেণাসাঁস পদ্ধতিতে নির্ম্মিত সৌধগুলির চিম্‌নী লোকচক্ষুর গোচর নহে; ইটালীস্থ প্রাসাদগুলির ছাদ সমতল, কিন্তু ফরাসী দেশের ছাদগুলি ক্রমনিম্ন এবং গবাক্ষ-সংবলিত; এগুলি Dormer window নামে কথিত। ইটালীয় সৌধগুলির কর্ণিস্ বেশ দীর্ঘ ও স্থূল ও অধিকতর বহিঃবর্দ্ধিত। একটু চিন্তা করিলেই আমরা ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি। ইটালী দেশে সূর্য্যকিরণ অতিশয় প্রখর; এবং এই প্রখরতার প্রভাব হ্রাস করিবার জন্য এইরূপ দীর্ঘ, স্থূল ও বিপুলকায় কর্ণিসের ব্যবস্থা। আমাদের ভারতেও এইরূপ বহিঃবর্দ্ধিত ও দীর্ঘ কর্ণিসের প্রচলন দৃষ্ট হয়; ইহা "হাজা" নামে কথিত। হিন্দু সৌধ, প্রাসাদ, মস্‌জিদ ও সমাধি—সর্ব্বত্রই "হাজা" বর্ত্তমান। দাক্ষিণাত্যে এ কর্ণিসের নির্ম্মাণ-পদ্ধতি যদিও স্বতন্ত্র, তথাপি সর্ব্বত্রই ইহা প্রয়োজনীয়তা-দ্যোতক। এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, দাক্ষিণাত্যের কর্ণিস্‌গুলি অর্দ্ধবৃত্ত বা বৃত্তাংশাকারে ভিত্তিগাত্র হইতে বহিঃবর্দ্ধিত। প্রয়োজনীয় নহে বলিয়া ফ্রান্সদেশের কর্ণিস্ ইটালীদেশের

ন্যায় দীর্ঘ নহে; ইহা গথিক ও প্রাচীন বা Classical রীতির সংমিশ্রণে এক নবমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল।

পুনশ্চ, অলঙ্কারসম্পৎ দ্বারা শোভা-বৃদ্ধি বিষয়ে উভয়ের বিশিষ্টতায় বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ফরাসীস্থাপত্যে ভাস্কর্য্যের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়া ছিল। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে যদি আমরা জর্ম্মনী, ইংল্যাণ্ড, বেল্‌জিয়ম্‌ প্রভৃতি দেশে প্রবর্ত্তিত রেণাস্‌াঁস্‌ রীতির আলোচনা করি, তাহা হইলে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা দেখিতে পাইব।

ভারতবর্ষের স্থাপত্যের আলোচনা করিলেও আমরা প্রদেশ-ভেদে ইহার আকৃতিগত পরিবর্ত্তনের ব্যাপার বেশ বুঝিতে পারি। আর্য্যাবর্ত্তের স্থাপত্য ও দ্রাবিড় স্থাপত্যের মধ্যে আদর্শ হিসাবেও আকাশপাতাল প্রভেদ। আর্য্যাবর্ত্তে অগ্নিপুরাণ-কথিত বিধিনিষেধ পালন করা হইয়াছে, এবং দ্রাবিড় দেশে মানসার, ময়মত প্রভৃতি শিল্পশাস্ত্রের বচন গ্রহণ করা হইয়াছে। উড়িষ্যার মন্দিরায়তনগুলির সহিত মধ্যভারতস্থ বারোলি বা খাজুরাহো প্রভৃতি স্থানের মন্দিরগুলির তুলনা করিলে, আমরা বিমান বা গর্ভগৃহের মধ্যে স্থূলতঃ আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিলেও, তৎসংলগ্ন আয়তনের মধ্যে কোনও সাদৃশ্যই দেখি না। একটু সামান্য প্রণিধান করিয়া দেখিলে আমরা খাজুরাহোর শিবমন্দিরের সহিত উড়িষ্যার গর্ভগৃহগুলির মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য নয়নগোচর করি। পূর্ব্বোক্ত স্থানের মন্দির-শেখর যে প্রকারের চতুরস্রাকৃতি বা আয়তাকার ক্ষেত্রের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত দেখি, তাহা উড়িষ্যাস্থাপত্যে আদৌ দেখি না। ইহাদের "অধিষ্ঠানে"র মধ্যেও কোনও সাদৃশ্য নাই। যদিও বারোলিস্থ শিবমন্দিরের শেখরনিম্নের ভিত্তির সহিত উড়িষ্যা-মন্দিরের স্থূলতঃ সাদৃশ্য আছে, তথাপি উড়িষ্যার মন্দিরে সমান্তরাল ও সমোচ্চ বহিঃবর্দ্ধিত রেখা দ্বারা যে পঞ্চবিভাগ দৃষ্ট হয়, তাহা মধ্যভারতের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, দাক্ষিণাত্যস্থ চালুক্যস্থাপত্যে ইহার অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়; কিন্তু এখানে পঞ্চবিভাগের স্থলে তিনটি বিভাগের কল্পনা করা হইয়াছে। আমি এই পঞ্চবিভাগ দেখিবার জন্য রামেশ্বরম্‌ হইতে আরম্ভ করিয়া মহীশূর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের বহু প্রদেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কোথাও উড়িষ্যার এ বিশিষ্টতা দেখি নাই।

পূর্ব্বোক্ত মন্দিরগুলি অপেক্ষা গোয়ালিয়রস্থ উদয়পুর গ্রামের, বা চিতোরস্থ কুম্ভরাণার স্থাপিত মন্দিরের বহিরাকৃতি উড়িষ্যার দেবায়তন হইতে আরও

বিসদৃশ; কিন্তু ইহাদের সকলগুলির মধ্যেই খাঁটী ব্রাহ্মণ্যস্থাপত্যের বীজ নিহিত; সকলগুলিতেই একই আদর্শ প্রকটিত, কিন্তু দেশ বিভিন্ন বলিয়া একই আদর্শ ভিন্ন দেশে ভিন্ন আকারে পরিণত।

এইবার মুসলমান স্থাপত্যের বিষয়ে আলোচনা করা যাউক। ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত সিন্ধুদেশীয় সমাধিহর্ম্ম্যগুলি নিরীক্ষণ করিলে আমরা ইহাদের সহিত ভারতবর্ষীয় আর কোনও সমাধিহর্ম্ম্যের সাদৃশ্য দেখিতে পাই না; এতৎসম্বন্ধে আমি সিন্ধুদেশান্তর্গত টাট্টার নিকটবর্ত্তী সমাধিস্থানগুলির প্রতিকৃতির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে বলি; ইহারই পার্শ্বে ইহারই মত রঞ্জিত ইষ্টক ও টালি দ্বারা নির্ম্মিত ও প্রায়ই একই সময়ে নির্ম্মিত * আগ্রাস্থ ইতিমাদ্দৌলার সমাধিভবনের তুলনা করিতে বলি; দুইটির মধ্যে কত পার্থক্য রহিয়াছে। এই দুই প্রকারের সমাধিহর্ম্ম্যের সহিত আবার বিজাপুরস্থ ইব্রাহিম্ আদিল সাহের রৌজার তুলনা করিলে আমরা আর এক প্রকারের স্থাপত্য-কৌশল দেখি।

পাছে কেহ মনে করেন যে, ভিন্নদেশস্থ সমাধিহর্ম্ম্যের মধ্যে বিশিষ্টতা থাকায় কোনও বিস্ময়ের কারণ নাই,এই আশঙ্কায় আমি সর্ব্বত্র একই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত মুসলমানদিগের মস্‌জিদ্ হইতেও আমার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিব। যদি কেহ মালবদেশস্থ মাণ্ডুর মস্‌জিদের সহিত দাক্ষিণাত্যস্থ বিজাপুর মস্‌জিদের তুলনা করেন, তাহা হইলে, ইহাদের মধ্যে স্থাপনবিন্যাস বা আকৃতিগত সম্পৎ, কোনও বিষয়েই বিশেষ সাদৃশ্য পাইবেন না। মধ্যাঙ্গন ও তৎপার্শ্বস্থিত স্তম্ভশ্রেণী-যুক্ত উপাসনাস্থলগুলির মধ্যে যে অব্যক্ত গাম্ভীর্য্য বর্ত্তমান, তাহা বিজাপুরস্থ আদিলসাহ নরপতিদিগের তিন পার্শ্বে অবস্থিত প্রকোষ্ঠযুক্ত জামে মস্‌জিদে দৃষ্ট হয় না। বিজাপুরস্থ মস্‌জিদের গম্বুজটি অবশ্য বিশালতর ও অধিকতর নির্ম্মাণ-কৌশল-যুক্ত।

দেশভেদে যে স্থাপত্যের বিশিষ্টতার সৃষ্টি হয়, তাহা আরব, পারস্য, তুরুষ্ক প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের মস্‌জিদগুলির আলোচনা করিলে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। উত্তর-আফ্রিকাস্থ মস্‌জিদের সহিত পারস্যের মস্‌জিদের স্থাপনবিন্যাস ব্যাপারে সাদৃশ্য নাই। ইস্পাহানস্থ সাহ আব্বাসের নির্ম্মিত মস্‌জিদ কিংবা তাব্রিজের সুপ্রসিদ্ধ মস্‌জিদের সহিত সুলতান হাসানের নির্ম্মিত উত্তর-আফ্রিকাস্থ কায়রোর মস্‌জিদের স্থাপনবিন্যাস বা বহিরাকৃতির আদৌ মিল নাই। আবার অষ্টম

* ইতিমাদ্দৌলার সমাধিহর্ম্ম্য ১৬২১ অব্দে ও টাট্টাস্থ নবাব সার্ফখাঁর সমাধি ১৬৪০ অব্দে নির্ম্মিত।

শতাব্দীতে খালিফ আব্দ্-এল্-রহমান্ নির্ম্মিত স্পেনদেশস্থ কর্ডোভা নগরের মস্‌জিদ্ একেবারে বিভিন্ন পদ্ধতিতে কল্পিত। ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। শুদ্ধ ধর্ম্মে একতা হইলে কি হয়? যে দেশে যে সংস্কার রহিয়াছে, তাহার অনুসরণ মানবের স্বভাবসিদ্ধ। শিল্পেই হউক, সাহিত্যেই হউক, বা আহার-বিহারেই হউক—সর্ব্ববিষয়েই সংস্কারের প্রাধান্য মানিতেই হইবে; এই কারণেই আমি মহীশূর-ভ্রমণকালে শ্রীরঙ্গপত্তনস্থ হায়দর আলি ও টিপুসুলতানের সমাধি-হর্ম্ম্য দেখিতে গিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, মুসলমানযাত্রীরা টিপুর উদ্দেশে সম্মানপ্রদর্শন করিবার জন্য ও আপন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য তাঁহাকে পীরস্বরূপ জ্ঞান করিয়া সমাধির দ্বারদেশে দাক্ষিণাত্যবাসী হিন্দুদিগের ন্যায় নারিকেল ভাঙ্গিয়া পূজা দেয়। এ পদ্ধতি দাক্ষিণাত্যের জৈনমন্দিরেও দেখিয়াছি। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, সংস্কারের প্রভাব সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিতে পারা যায় না। এই কারণেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে কন্‌ষ্টান্টিনোপ্‌ল্ তুর্কদের করতলগত হইবার পর যখন নবস্থাপত্যের আবির্ভাব হইল, তখন ইহাতে অবাধে স্থানীয় বাইজাণ্টাইন্ স্থাপত্যাদর্শের মিশ্রণ চলিতে লাগিল। শুদ্ধ ইহাই নহে; এই স্থাপত্যে বাইজাণ্টাইন্ স্থাপত্যের মূল সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্টভাবে গৃহীত হইয়া এক নব আদর্শের সৃষ্টি হইল। ইহা বুঝিবার জন্য আমি "সুলেমানিয়া", "আমেদিয়া" প্রভৃতি মস্‌জিদ্‌গুলির স্থাপনবৈচিত্র্য, বহিরাকৃতি ও নির্ম্মাণ-কৌশলের বিষয় চিন্তা করিতে বলি। এই সমস্ত মস্‌জিদে St. Sophiaর অনেকগুলি আদর্শ ও বিশিষ্টতা যেন চিরমুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে; এগুলি দেখিলে St. Sophiaর কথা স্মরণে আসিবেই।

স্থানীয় প্রভাবের কথা চিন্তা করিতে গিয়া পূর্ব্বকথিত হর্ম্ম্যগুলি ভিন্ন ভারতীয় আর কয়েকটি হর্ম্ম্যের কথা স্মরণে আসিতেছে; সেগুলির উল্লেখ করিয়া প্রসঙ্গান্তরের কথা আরম্ভ করিব। জৌন্‌পুরস্থ "মান্দরওয়াজা" মস্‌জিদ্, কিংবা "অটম" মস্‌জিদে হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যের কেমন বিচিত্র মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। ইহাতে যেন এ কথা কেহ মনে না করেন যে, জৌন্‌পুরে যখন পূর্ব্বকথিত সৌধগুলির রচনা আরব্ধ হয়, তখন মুসলমান্ স্থাপত্যের তেমন বিকাশ হয় নাই, কিংবা যে স্থপতিরা ইহার কল্পনা ও নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা তখনও ইস্‌লাম্ স্থাপত্যে ততটা পারদর্শী হইয়া উঠেন নাই।

১১৯৮ অব্দে ব্রহ্মদেশে বুদ্ধগয়াস্থ মন্দিরের অনুকরণে যে "মহাবোধি" নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাও স্থানীয় প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। যবদ্বীপে যে

সমস্ত দ্রাবিড় ও চালুক্যরীতীর অন্তর্গত মন্দিরায়তন প্রভৃতি নয়নগোচর হয়, তাহা দেখিলে বেশ স্পষ্ট বোধ হইবে যে, এদেশী স্থপতিরা এগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা স্থানীয় সংস্কার অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

উপকরণ, দেশ, কাল, ধর্ম্ম প্রভৃতি সংক্রান্ত যে সমস্ত প্রভাব স্থাপত্যকে বৈচিত্র্য প্রদান করে, তাহা সংক্ষেপে উক্ত হইল। এক্ষণে আমরা এতৎসম্বন্ধীয় আর এক বিষয়ের আলোচনা করিব। শিল্প-সমালোচকেরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এক প্রকারের বা সামান্য-সাদৃশ্য-যুক্ত ভিন্ন প্রকারের গৃহায়তন প্রভৃতি দর্শন করিয়া একই প্রভাবের আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যগ্র হয়েন। এ সাদৃশ্য মেক্সিকো, বা সিংহল, বা উত্তর-মেরু-প্রদেশের যেখানেই দৃষ্ট হউক না, তাঁহাদিগকে প্রভাবের একত্ব বাহির করিবার জন্য উৎসুক করিবেই। প্রভাব একই প্রকারের হইলে ফলসাদৃশ্য ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে; কিন্তু বিপরীত সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে; অর্থাৎ, সাদৃশ্য দেখিলেই যে একই প্রভাব অঙ্গীকার করিতে হইবে, যাঁহারা সামান্য তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিবেন যে, ইহা কিরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ। বিভিন্ন মানব-মনের মধ্যে চিন্তা বা কল্পনা-প্রণালীর যে ঐকতানিকতা বর্ত্তমান, তাহা সকলেরই বিদিত; এই ঐকতানিকতার হিসাবে মানব-মনগুলি একই পর্য্যায় বা শ্রেণীর অন্তর্গত। যদি একই শ্রেণীর অন্তর্গত হইল, তাহা হইলে, চিন্তা বা কল্পনা প্রসূত সিদ্ধান্ত বা পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্যের আশা করা অন্যায় নহে। আমি এ স্থলে একটি আপাততঃ বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। কয়েক মাস পূর্ব্বে আমি বঙ্গীয় বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা কর্তৃক আহূত হইয়া পবিত্র বুদ্ধাস্থি-সংরক্ষণের জন্য এক স্তূপ ও তৎসংলগ্ন বিষয় কল্পনা ও অঙ্কিত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। ইহা অঙ্কিত করিয়া আমি বৌদ্ধ সভায় প্রেরণ করি। ইহা বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল ও বঙ্গীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ Sir John Marshallকে দেখান হয়। এই সময়ে বা কিছু পূর্ব্বে "মহাবোধি সভা" কর্তৃক আহূত হইয়া Sir John Marshall মহাশয় তাঁহাদের জন্য স্তূপ ও বিহারের এক নক্সা অঙ্কিত করেন। আমার নক্সা প্রেরণ করিবার পাঁচ মাস পরে ইহার নক্সা কলিকাতায় প্রেরিত হয়, এবং ইহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম যে, বহিরাকৃতিগত বৈষম্য ছাড়িয়া দিলেও, plan বা স্থাপনবিন্যাস-কল্পনা প্রায়ই অনুরূপ; এমন কি, প্রস্থের পরিমাণ প্রভৃতিও মিলিয়া গিয়াছে; বহিরাকৃতির মধ্যেও অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য বর্ত্তমান। Sir John Marshall

মহাশয় যে আমার কল্পনার সাহায্য লইবেন, এ কথা বলিতে সাহস হয় না, এবং আমিও যে তাঁহার কল্পনার কথা বিন্দুবিসর্গও অবগত ছিলাম না, তাহা দুই সভার সদস্যেরা জানেন। ইহাতে যে বিস্ময়ের কোনও কারণই নাই, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত বা ক্ষোদিত দাক্ষিণাত্যস্থ মহাবলিপুরম্ বা মামল্লপুরম্‌স্থিত, দ্রৌপদীর রথ বলিয়া অভিহিত ক্ষুদ্রায়তনটি যিনি নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তিনি উহার সহিত আমাদের বঙ্গদেশস্থ "চৌচাল" গৃহের সাদৃশ্যও লক্ষ্য করিয়াছেন। এই সাদৃশ্য ব্যাপার হইতে যদি কেহ অনুমান করেন যে,একটি অপরটির প্রভাবে অন্বিত, তাহা হইলে এ অনুমানকে নিতান্ত ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

চীনদেশে fret বলিয়া একপ্রকার কারুকর্ম্মের চলন আছে; গ্রীকস্থাপত্যে ইহার সমধিক আদর। আমার যত দূর জানা আছে, উড়িষ্যার কেবল একটি-মাত্র মন্দিরের উচ্চাংশে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে fretর ব্যবহার দেখিয়াছি। এ মন্দিরটি অতিশয় প্রাচীন। এই সব উদাহরণের মধ্যে একই প্রভাব বর্ত্তমান, এ কথা স্বীকার করিবার কোনও সার্থকতা দেখা যায় না। প্রাচীন গ্রীক্ ও রোম্যান্ স্থাপত্যে, বা আধুনিক য়ুরোপীয় হর্ম্ম্যাদিতে cavetto নামক mouldingর প্রচলন দেখা যায় বলিয়া যে ভারতীয় বা পারস্যদেশীয় প্রাচীন স্থাপত্যে তাহা দেখিব না, বা দেখিলেই একটি অপরের অনুকৃতি বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিব,ইহা ত একেবারেই যুক্তিযুক্ত নহে; কেন না,যাহা cavetto বলিয়া গ্রীক্‌স্থাপত্যে দেখি, তাহা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে গ্রীক্‌জাতির মধ্যে আবির্ভূত হয় নাই। ইহার আকৃতি প্রকৃতির বিচিত্র ভাণ্ডারের মধ্যে, পত্রপুষ্প বহুপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়; এবং তাঁহারা যাহা হইতে এ কল্পনার মূল পাইয়াছেন, তাহা যে অন্য দেশবাসীর নিকট অজ্ঞাত বা অদৃশ্য থাকিবে, এ কথা স্বীকার করিবার পক্ষে কোনও যুক্তিই দেখা যায় না। এই কারণেই য়ুরোপীয় Cyma, Cavetto, Fillet, Torus প্রভৃতি আমাদের দেশে যথাক্রমে পদ্ম, অলিঙ্গ, কম্প ও কুমুদ প্রভৃতি নামে অভিহিত ও দৃষ্ট হয়। এই কারণেই গ্রীক্ স্থাপত্যের অন্তর্গত Doric শাখায় Bird's beak বা "পক্ষিচঞ্চু" নামক যে moulding দেখি, তাহা ভারতীয় স্থাপত্যে সামান্যরূপে বিভিন্ন আকৃতিতে "কপোতম্" নামে প্রচলিত। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে ইহার বহুল চলন দেখিয়াছি। ইহা আর্য্যাবর্ত্তে প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না; দেখিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ হয় না;

কিন্তু প্রতিভদ্র প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের মন্দিরাধিষ্ঠান (pedestal) বা স্তম্ভের উপপীঠে ইহা সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়। কাঞ্চীস্থ "সহস্রস্তম্ভ" মণ্ডপের অধিষ্ঠান বা উপপীঠে ও অন্যান্য বহু মন্দিরে ইহার ব্যবহার দেখিয়াছি।

আরও কয়েকটি উদাহরণ দিয়া আমার মন্তব্যটিকে বিশদ করিবার চেষ্টা করিব। স্তম্ভের শীর্ষদেশে capital বলিয়া যে অঙ্গ দেখি, তাহা যে গ্রীক্ বা রোম্যান্ স্থাপত্যের একচেটিয়া সম্পত্তি, এরূপ মনে করা বিশেষ সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক। মানবের যে সহজাত-সংস্কার ও সৌন্দর্য্যবুদ্ধি আছে, তাহা এই শীর্ষদেশে একটি অঙ্গের কল্পনা করিবেই; এই জন্যই আমরা ভারতীয় স্তম্ভগুলির অগ্রভাগ capital বা বোধিকা দ্বারা শোভিত দেখি। এই বোধিকার পরিমাণ প্রভৃতি সম্বন্ধে "মানসার" গ্রন্থে অনেকগুলি বিধিব্যবস্থা আছে। বোধিকার উপর যে entablature আছে, তাহাও ভারতীয় স্তম্ভে বিদ্যমান; ইহা "প্রস্তার" সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত; এবং য়ুরোপীয় entablature যেমন architran, frieze, cornia প্রভৃতি দ্বারা বিভক্ত, আমাদের "প্রস্তার"ও তেমনই নানা অংশে বিভক্ত। ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় আমি দ্রাবিড় ও চালুক্য স্থাপত্যে পাইয়াছি; দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে এই স্তম্ভপরিমাণ সম্বন্ধে সামান্য গবেষণা করিয়া তাহার অঙ্গগুলির পরিমাণ স্থির করিয়া যাহা জানিয়াছি, তাহার সহিত য়ুরোপীয় স্তম্ভগুলির অংশবিশেষের তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব।

	প্রস্তারের সহিত স্তম্ভের অনুপাত
গ্রীক ডোরিক স্তম্ভ (থিসুসের মন্দির, এথেন্স)	১: ২.৬
রোম্যান্ ডোরিক স্তম্ভ	১: ৪
গ্রীক্ আয়োনিক্ স্তম্ভ (ইলিসস্ নদীর উপরস্থিত মন্দির) ...	১: ৩.৫৯
রোম্যান্ আয়োনিক স্তম্ভ	১: ৫
গ্রীক্ করিন্থিয়ান্ (চোরাজিক মনুমেন্ট)	১: ৪.৩৪
রোম্যান্ করিন্থিয়ান্ (প্যান্থিয়ন্, রোম)	১: ৪.২৫
মহীশূরস্থ শ্রবণবেলগোলার শাসনবস্তি মন্দির (জৈন) ...	১: ৩.০৯
মহীশূরস্থ শ্রবণবেলগোলার চামুণ্ডারায় বস্তি (জৈন) ...	১: ৩.৬২
মহীশূরস্থ বেলুড় গ্রামের অণ্ডালসন্নিধি (হিন্দু)	১: ৩.০৮
মহীশূরস্থ বেলুড় গ্রামের কাপ্পে চেন্নরায় মন্দির (হিন্দু) ...	১: ৩.৪৬
মহীশূরস্থ হালেবিড্ গ্রামের কেদারেশ্বর মন্দির (হিন্দু) ...	১: ৩

পূর্ব্বোক্ত ভারতীয় উদাহরণগুলির সমস্তই চালুক্যস্থাপত্যের অন্তর্গত। উপরিলিখিত অঙ্কগুলি হইতে বুঝা যাইবে যে, মহীশূরস্থ চালুক্যস্থাপত্যের স্তম্ভ-

গুলির সহিত তাহার প্রস্তারের অনুপাত অনেকটা গ্রীক্ আয়োনিকের ন্যায়, এবং স্তম্ভগুলি অনেকটা সদৃশ অংশে বিভক্ত; তাহা বলিয়া কেহ যদি এরূপ অনুমান করেন যে, চালুক্যীয় স্থাপত্যে গ্রীক্ প্রভাব বর্ত্তমান, তাহাকে বাতুলতা ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না।

হায়দ্রাবাদ রাজ্যে ভ্রমণকালে দেখিয়াছি যে, ওয়ারাঙ্গল্ দুর্গে স্থিত কীর্ত্তিস্তম্ভযুক্ত তোরণগুলি দেখিলে সাঞ্চীস্থ স্তম্ভযুক্ত স্তূপ-বেষ্টনকারী তোরণগুলির কথা মনে পড়ে; কিন্তু Fugussun যাহাই বলুন না, আমি ইহাদের মধ্যে কোনও প্রভাবই দেখি না। মহীশূরান্তর্গত শ্রবণবেলগোলা যাইবার পথে কিক্কেরী-গ্রামস্থ ব্রহ্মেশ্বরের মন্দিরের উপলগাত্রে ঠিক ক্রশের (cross) ন্যায় এক প্রকার চিহ্ন ক্ষোদিত দেখিয়াছি; এগুলি এত স্পষ্টভাবে ক্ষোদিত যে, অনায়াসেই কোনও পাদ্‌রী মহাশয় বা সেই ভাবে অনুপ্রাণিত কোনও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইহাতে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের প্রভাবের কল্পনা করিতে পারেন। তাহার প্রমাণস্বরূপ তিনি হয় ত দাক্ষিণাত্যে সিরিয়ান্ ক্রিশ্চিয়ান্‌দিগের কথারও অবতারণা করিবেন। কিন্তু ক্রশ্ চিহ্নটি স্থাপত্যে বা ভাস্কর্য্যে অলঙ্কারস্বরূপ ব্যবহারের কল্পনা যে মানব-মনে সহজেই উদিত হইতে পারে, সে কথা কি প্রণিধানযোগ্য নহে? পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলি হইতে দেখা গেল যে, সাদৃশ্য-জ্ঞান হইতে প্রভাববিশেষের অনুমান ও কল্পনা করা যুক্তিবিরুদ্ধ।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

মেজর হায়দার হার্সে। *

ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসসময়ে বহু য়ুরোপীয়ান প্রাধান্য-স্থাপন-প্রয়াসী বিভিন্ন দলের পক্ষাবলম্বন করিয়া আপনাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি-সাধনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাদিগের জীবন বিস্ময়কর, বৈচিত্র্যবহুল। তন্মধ্যে কয়েক জনের জীবনকথা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। † হার্সের জীবন-কথাও বিস্ময়কর। তাঁহার নাম হায়দার জঙ্গ হার্সে। তাঁহার পিতা কাপ্তেন

* The Hearsays—Pearse ; Hindusthan under Freelances—Keene ; European Military Adventurers of Hindusthan—Compton ; East Indian Worthies—Stark and Madge ; Asiatic Researches.

† 'আর্য্যাবর্ত্ত' ও 'মানসী'।

হ্যারী হার্সে মৈত্রার যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মাতা জাঠ-জাতীয়া। এরূপ বিবাহ তৎকালে দোষাবহ বিবেচিত হইত না। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে হায়দারের জন্ম হয়। তিনি উলীচ সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েন। তখনও ফিরিঙ্গীদিগের পক্ষে ইংরাজের সেনাবিভাগে প্রবেশাধিকার সহজপ্রাপ্য ছিল না। কিন্তু হায়দারের আত্মীয় কর্ণেল আগুরু হার্সে তখন এলাহাবাদ দুর্গের সেনাপতি। তাঁহার চেষ্টায় হায়দার সেনাবিভাগে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্ণৌর নবাব সাদৎ আলীর পার্শ্বচর নিযুক্ত হয়েন। তখন তাঁহার বয়স ষোড়শ বৎসর মাত্র। সাদৎ আলী তখন বারাণসী-প্রবাসী। তাঁহার লক্ষ্ণৌর গদীপ্রাপ্তি বিষয়ে যে গোল হইয়াছিল, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। পরিশেষে গভর্ণর জেনারেল সার জন শোর তাঁহার অধিকার স্বীকার করিলে তিনি গদীতে আরোহণ করেন।

লক্ষ্ণৌর কার্য্য হার্সের পক্ষে প্রীতিপ্রদ হয় নাই। তিনি সে কার্য্য ত্যাগ করিয়া সিন্ধিয়ার সেনাদলে কার্য্য গ্রহণ করিলেন। তিনি জেনারল পেরং-এর পদাতিক দলে নিযুক্ত হইলে, তাঁহার ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি দেখিয়া পেরং তাঁহাকে স্বীয় এডিকং নিযুক্ত করিলেন, এবং তাঁহার সহিত বিশেষ সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অল্পকালমধ্যেই হায়দারের ভাগ্যে যুদ্ধদর্শন ঘটিল। পেরং সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক দিল্লীর ও আগ্রার দুর্গদ্বয়ের ভার লইতে আদিষ্ট হইলেন। দিল্লীর সম্রাটবংশের ভাগ্যহীন বংশধর শাহ আলম ইঁহারই কর্ত্তৃত্বাধীন হইলেন। পেরং উৎকোচ দিয়া দিল্লী দখল করিয়াছিলেন; কারণ, রাজনীতিক হিসাবে যুদ্ধ করিয়া দিল্লী জয় করিয়া অন্ধ সম্রাটের বিরাগোৎপাদন যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় নাই। কিন্তু আগ্রার সম্বন্ধে এরূপ কোনও বিঘ্ন না থাকায় পেরং সহসা স্বীয় কেন্দ্রস্থল আলীগড় ত্যাগ করিয়া ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আগ্রার সম্মুখীন হইলেন। এই অতর্কিত আক্রমণে নগর সহজেই জিত হইল; কিন্তু দুর্গ জয় করিতে অষ্টপঞ্চাশৎদিনব্যাপী অবরোধের প্রয়োজন হইল। দুর্গস্থ সেনাগণ আত্মসমর্পণের পর সসম্মানে ও নিরাপদে দুর্গত্যাগের অধিকার পাইল। যুদ্ধে পেরং-এর সেনাদলে হতাহতের সংখ্যা ছয় শত। দুর্গ দৃঢ় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, এবং দুর্গমধ্যে চারি সহস্র সৈনিক অবস্থিতি করিতেছিল। সুতরাং পেরং-এর বলক্ষয় অধিক বলা যায় না। এই অবরোধকালে পেরং হার্সের কার্য্যে বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাকে উচ্চতর পদে উন্নীত করেন। ইহার কয়েক মাস পরেই পেরং তাঁহাকে আবার উচ্চতর পদে উন্নীত করিয়া

আগ্রা দুর্গের সহকারী সেনাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। ইহা সপ্তদশবর্ষবয়স্ক যুবকের প্রতি তাঁহার বিশেষ বিশ্বাসের পরিচায়ক। আবার অল্পদিন পরেই তিনি হার্সেকে মহারাষ্ট্রীয় সেনাদলের ডেপুটী কোয়ার্টার-মাষ্টার-জেনারলের উচ্চ পদ প্রদান করেন।

এই সময় পেরং আপনার অধীনস্থ ইংরাজ সেনাধ্যক্ষদিগের সহিত নিরপেক্ষ ব্যবহার করিতেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এই সময় ইংরাজ কর্তৃক যুদ্ধে বন্দীকৃত কয়েক জন ফরাসীস বোম্বাই হইতে পলায়ন করিয়া সিন্ধিয়ার সেনাদলে যোগদান করিলে, তাঁহারা ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের উপরিস্থিত পদ লাভ করিলেন। ইংরাজ কর্ম্মচারীরা ইহার প্রতিবাদ করিয়া প্রতীকার না পাইয়া পদত্যাগ করিলেন। তখন পেরং-এর ক্ষমতা অসীম—তাঁহার পক্ষে ইংরাজকে দূর করিয়া ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্যের জন্য পুনরায় চেষ্টা করাও অস্বাভাবিক নহে। কম্পটন বলিয়াছেন,—এই সময় পেরং-এর ভাগ্যরবি মধ্যগগনে দীপ্তি পাইতেছিল। তিনি সমগ্র হিন্দুস্থান পদানত করিয়াছিলেন; সিন্ধিয়ার অধিকারের উত্তরাংশে তাঁহার একাধিপত্য ছিল। দক্ষিণে কোটা হইতে উত্তরে সাহারাণপুর ও পশ্চিমে যোধপুর হইতে পূর্ব্বে কোইল পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিল না। এই সময় পেরং যে সকল প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন, এবং যে সকল দেশ তাঁহার আজ্ঞাধীন ছিল, সে সকলের আলোচনা করিলে তাঁহার প্রভাবের স্বরূপ উপলব্ধ হইবে। দোয়াবের উৎকৃষ্ট অংশ তাঁহার জায়দাদ (জায়গীর) ছিল; সে প্রদেশে তিনি রাজার অধিকার সম্ভোগ করিতেন, এবং রাজোচিত ভাবে বাস করিতেন। সাহারাণপুর, পাণিপথ, দিল্লী, কাণুল, আগ্রা ও আজমীর—এ সব সুবাই তাঁহার অধীন ছিল। তিনি সে সকলের রাজস্ব আদায় ও শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি জয়পুরের, যোধপুরের ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজপুত রাজ্যের রাজাদিগের রাজনীতিক নিয়ন্তা ছিলেন, এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে কর পাইতেন। হিন্দুস্থানে তখন লবণের ও বাণিজ্যের শুল্ক পাইতেন। কেবল তিনিই মুদ্রা প্রস্তুত করিতে পারিতেন। তখন তাঁহার বার্ষিক রাজস্ব ২ কোটী ৪৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা।

পেরং সামান্য নাবিকরূপে ভারতের ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই অসাধারণ সাফল্যে তাঁহার মনে ভারতে ফরাসী-প্রাধান্যস্থাপনের ইচ্ছার উদয় অসম্ভব নহে। নামে না হইলেও কার্য্যতঃ তিনি তখন স্বাধীন সম্রাট।

অরাজক ভারতে তখন সাহসী সেনানায়কের উচ্চাভিলাষ সীমাবদ্ধ করিবার কিছুই ছিল না। পেরং স্বীয় জীবনের শেষ-অভিলাষ পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি ভারতের নানা স্থান হইতে ফরাসীদিগকে, বিশেষ হায়দ্রাবাদে লর্ড ওয়েলেসলীর কার্য্যকুশলতায় কর্ম্মচ্যুত ফরাসী সৈনিক কর্ম্মচারী-দিগকে আহ্বান করিয়া স্বীয় সেনাদলের উচ্চ পদগুলিতে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। যে সকল ইংরাজ ও ইংরাজ-জাতীয় ফিরিঙ্গী কর্ম্মচারী পেরং-এর ও দুবোঁয়ার অধীনে সর্ব্বত্র—সমরে, অভিযানে, অবরোধে—সাহসের ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহাতে ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পদত্যাগ করিলেন, হার্সে ও হপ্‌কিন্স তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহারা উভয়েই "হরিয়ানার রাজা" জর্জ্জ টমাসের সেনাদলে যোগদান করিলেন।

পেরং ও টমাস একইরূপ উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে-ছিলেন। টমাসের উদ্দেশ্য—সমগ্র পঞ্চনদ প্রদেশ জয় করিয়া ইংরাজরাজ্য বিস্তার করিয়া স্বয়ং শাসক হইবেন। পেরং-এর উদ্দেশ্য—সমগ্র ভারত ফরাসীর অধিকারভুক্ত করিয়া স্বয়ং ফরাসী সাম্রাজ্যশাসকের পদ লইবেন। কাযেই পেরং-এর পক্ষে টমাসকে জয় করিয়া আপনার পথ নিষ্কণ্টক করাই বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিল। টমাস তখন এমনই পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি যদি কোনও সুযোগে পঞ্চনদের প্রতি লোলুপদৃষ্টিপাতে নিরস্ত হইয়া বৃদ্ধ সম্রাট শাহ আলমকে নামে সম্রাট রাখিয়া প্রকৃতপক্ষে বন্দী করিতে পারিতেন, তবে তিনিই উত্তর-ভারতে প্রাধান্য লাভ করিতেন। সিন্ধিয়াও তখন তাঁহাকে কৌশলে বিমুখ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি টমাসকে মহারাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারী হইতে অনুরোধ করিতেছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় সেনাদলের প্রধান সেনাপতি পেরং তাহার সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় ছিলেন। পেরং যেমন ঘোর ইংরাজবিদ্বেষী, টমাস তেমনই বিষম ফরাসীবিদ্বেষী। প্রধানতঃ এই কারণেই হার্সে ও হপ্‌কিন্স পেরং-এর সেনাদল ত্যাগ করিয়া টমাসের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তখন টমাসের গৌরবরবি পশ্চিমগগনপ্রান্তে উপনীত হইয়াছে। তাঁহার শেষ অবস্থার বিবরণ স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়।

টমাসের পরাভবের পর হায়দার হার্সে বিষম অসুবিধায় পড়িলেন। তিনি প্রথমে জয়পুরে ও যোধপুরে সেনাদলে কার্য্য পাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পেরং ও সিন্ধিয়া প্রতিকূল থাকায় সফলকাম হইতে পারিলেন না। তখন তিনি টমাসের আদর্শের অনুকরণে স্বতন্ত্র সৈন্যদল গঠিত করিয়া যে পক্ষে অর্থ

পাইবেন, সেই পক্ষেই যোগ দিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া মেবাৎ অঞ্চলে পঞ্চ সহস্র সৈনিক সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মেবাৎ মোগল সাম্রাজ্যের সুবা আগ্রার অন্তর্গত ও বর্ত্তমান মথুরা ও গুরগাঁউ জিলার ও আলোয়ার ও ভরতপুর রাজ্যের কতক কতক লইয়া গঠিত ছিল। হার্সে দেখিলেন, মেবাতীরা ও তাঁহার সৈনিকগণ তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত। তখন তিনি তাহাদিগকে শিক্ষিত সেনাদলে পরিণত করিয়া স্বীয়-শাসনাধীন প্রদেশ সুশাসিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এই সময় একটি রাজনীতিক ঘটনায় সমগ্র ভারতের ইতিহাস অন্য রূপ ধারণ করিল।

লর্ড ওয়েলেসলী দেখিলেন, ধ্বংসোন্মুখ মোগলসাম্রাজ্যে মহারাষ্ট্রীয় প্রাধান্যই ইংরাজাধিকার সুদৃঢ় করিবার পক্ষে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। তিনি সেই প্রাধান্য ও তৎসহ পেরং-এর প্রভুত্ববিনাশে সচেষ্ট হইলেন। তিনি প্রধান সেনাপতি লর্ড লেককে অন্যান্য আদেশের মধ্যে আদেশ দিলেন—পেরং-এর জায়গীর অধিকৃত করিতে হইবে, বৃদ্ধ সম্রাট শাহ আলমকে ইংরাজের আয়ত্ত ও অধীন করিতে হইবে, পেরং-এর সেনাসংখ্যার হ্রাস করিতে হইবে। প্রধানতঃ পেরং-এর বিরুদ্ধেই সমর-সজ্জা হইল। পেরং-এর জায়গীর তখন স্বাধীন ফরাসী রাজ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না—তথায় তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা, তাঁহার সেনাদল তখন ইংরাজের পক্ষে আশঙ্কার কারণ। ইংরাজ-অভিযানের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য মহারাষ্ট্রীয় শক্তিনাশ হইলেও,বাস্তবিক ইহা পেরং-এর বিরুদ্ধেই নিয়োজিত হইল। দেশীয় রাজ্যের ও পেরং-এর সেনাদলের সকল ইংরাজ ও ইংরাজজাতীয় ফিরিঙ্গী সেনাধ্যক্ষদিগকে ইংরাজের সেনাদলে যোগ দিতে আহ্বান করিয়া ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল। এই আহ্বানে হায়দার হার্সে আপনার অন্য সকল উদ্দেশ্য ত্যাগ করিয়া ইংরাজের সেনাদলে যোগ দিলেন। তাঁহার মাসিক বৃত্তি ৮ শত টাকা নির্দ্দিষ্ট হইল। হার্সের বয়স তখন কেবল একুশ বৎসর, তিনি কোনও দলেও ছিলেন না; সুতরাং তাঁহাকে বিশেষ উপযুক্ত মনে না করিলে কখনই তাঁহাকে এরূপ অধিক বৃত্তি দিয়া ইংরাজ দলে রাখা হইত না।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দের অগষ্ট মাসে লর্ড লেক স্বয়ং পেরং-এর প্রধান আশ্রয় আলীগড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এ দিকে হার্সে একটি মহারাষ্ট্রীয় দুর্গ আক্রমণ করিলেন; কিন্তু মস্তকে গুরু আঘাত পাইলেন। অল্পদিন পরে তিনি লর্ড ওয়েলেসলীর প্রস্তাবানুসারে স্বীয় পঞ্চ সহস্র সৈন্যকে বিদায় করিয়া কেবলমাত্র এক সহস্র অশ্বারোহী লইয়া লর্ড লেকের সৈন্যদলে যোগ দিলেন।

হার্সে ই এই অশ্বারোহীদলের সেনানায়ক রহিলেন, এবং ইহাদিগকে লইয়া আগ্রা-জয়ে, দিল্লী উদ্ধারে ও ডীগের যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধের শেষকালে হার্সে স্বীয় সেনাদল লইয়া বেরিলী অঞ্চলে কয় জন দুর্দ্ধর্ষ জমীদারকে শাসন করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের শেষে তিনি করেলীর নিকটে যুদ্ধে তাঁহাদিগকে পরাভূত করেন। পরে করেলীর সম্পত্তি তাঁহার হয়, এবং এখনও তাঁহার বংশধরগণ তথায় বাস করিয়া উহা সম্ভোগ করিতেছেন। * এ দেশে ইংরাজের প্রথম আমলে য়ুরোপীয় ও ফিরিঙ্গীদিগের পক্ষে ভূসম্পত্তি-অধিকার কষ্টসাধ্য ছিল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমাবধিই কর্ম্মচারীদিগের পক্ষে শাসিত স্থানে ভূসম্পত্তি-অধিকারের বিরোধী ছিলেন। এমন কি, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইংরাজদিগের পক্ষে কোম্পানীর রাজ্যমধ্যে ভূসম্পত্তি-ক্রয় আইনবিরুদ্ধ ছিল, এবং দেশীয় রাজ্যে তাহাদিগের ভূসম্পত্তি-ক্রয় বিশেষ আপত্তিকর ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে হার্সের ব্যবস্থা অন্যরূপ হইয়াছিল। কারণ, এই সময় তিনি কাম্বের স্বাধিকারচ্যুত নবাবের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই নবাব রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবরের শরণাপন্ন হইলে, ক্ষমতাহীন বাদশাহ তাঁহাকে হৃতরাজ্য পুনঃপ্রদানে অসমর্থ হইলেন, কিন্তু তাঁহার কন্যাদ্বয়কে স্বীয় দুহিতা ঘোষণা করিয়া সম্মানিত করিলেন। এই কন্যাদ্বয়ের জ্যেষ্ঠাকে কর্ণেল গার্ডনার † ও কনিষ্ঠাকে হায়দার হার্সে বিবাহ করেন। তৎকালে এইরূপ বিবাহ সমাজে—বিশেষতঃ মুসলমান সমাজে—বৈধ বলিয়া পরিগণিত হইত।

গার্ডনার ও হার্সে উভয়েই উদারহৃদয় ও ভাবপ্রবণ ছিলেন। তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধে কোনও বিরুদ্ধ মত গার্ডনার সহ্য করিতে পারিতেন না, এবং একবার কোনও ভারতীয় সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচার করেন যে, কাজীর দ্বারা সম্পাদিত কোনও খৃষ্টানের সহিত মুসলমান-মহিলার বিবাহ কলিকাতার লর্ড বিশপের দ্বারা সম্পাদিত বিবাহেরই মত সিদ্ধ; তাঁহার পুত্রের সহিত সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্রী নবাব মালখা হুমানী বেগমের বিবাহে ইহা স্থির হইয়াছে।

* হায়দার হার্সের দৌহিত্রী আমাদিগকে লিখিয়াছেন,—তাঁহাদের পারিবারিক চিত্র ও দলীলাদি সিপাহীবিপ্লবের সময় অগ্নিদাহে নষ্ট হয়; যাহা কিছু বিশ্বাসী ভৃত্যগণের চেষ্টায় রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাও প্রায় ২৬ বৎসর পূর্ব্বে জলপ্লাবনে নষ্ট হইয়াছে। ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর পরলোকগত মিষ্টার ম্যাজকে কতকগুলি কাগজপত্র দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর সেগুলির আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই—লেখক।

† মানসী।

তাঁহার পুরস্ত্রীগণের সম্মানের বিষয়—সম্রাট কর্ত্তৃক তাঁহার পত্নীকে কন্যারূপে গ্রহণে ও পরে সাম্রাজীর তাঁহার গৃহে আগমনেই ব্যক্ত হইয়াছে।

এই বিবাহের ফলে সম্রাটের ফার্ম্মানের বলে গার্ডনার ও হার্সে উভয়েই প্রচুর ভূসম্পত্তি লাভ করেন। গার্ডনার আগ্রা হইতে ৩০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী খাসগঞ্জে ও হার্সে বেরিলীর নিকটবর্ত্তী করেলীতে আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন।

হার্সের শ্যালকগণ তাঁহার সহিত কাজ করিতেন, এবং বোধ হয় মেবাতে কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা পশ্চাদ্বিবৃত কুমায়ুন-অভিযানে (১৮১৫ খৃষ্টাব্দে) যোগ দিয়াছিলেন।

১৮০৭—খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার নবার্জ্জিত প্রদেশ জরীপ করিবার জন্য কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে এক দল—কাপ্তেন হার্সে, লেফটেনাণ্ট ওয়েব ও কাপ্তেন রেপার—এই তিন জনের অধীনে গঙ্গার উৎপত্তি-স্থাননির্দ্ধারণে নিযুক্ত হয়েন। তখনও গঙ্গার উৎপত্তিস্থান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কেহ কেহ বলিতেন, গঙ্গোত্রীতেই গঙ্গার উৎপত্তি—আবার কেহ কেহ বলিতেন, গঙ্গা মানসসরোবর হইতে হিমালয়ের মধ্য দিয়া সুড়ঙ্গ-পথে গঙ্গোত্রীতে আসিয়াছে। হার্সে প্রভৃতি গঙ্গা যে সকল পার্ব্বত্যপ্রদেশমধ্যে প্রবাহিত, সেই সকল প্রদেশের সূক্ষ্ম জরীপ করেন, এবং গঙ্গা যে গঙ্গোত্রীতেই উৎপন্ন, তাহা স্থির করেন। এই উপলক্ষে তাঁহারা তিন মাস ভ্রমণ করিয়া হরিদ্বার, দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, যোশীমঠ, বদরীনাথ প্রভৃতি গঙ্গা-কূলস্থিত প্রধান প্রধান তীর্থগুলি দেখিয়াছিলেন।

ইহার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে গাড়োয়াল প্রদেশ গুর্খাদিগের অধিকারগত হইয়াছিল। কিন্তু এই পরিব্রাজক দল তথায় কোনরূপ বাধা বা অসুবিধা ভোগ করেন নাই। তাঁহাদিগের সহিত এই সময় গুর্খা শাসনকর্ত্তা হস্তিদল চতুরিয়ার সহিত পরিচয় হয়। হার্সে পরিবারে কিংবদন্তী আছে যে, হস্তিদল বন্যবরাহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও আহত হইলে হার্সে চিকিৎসায় তাঁহার জীবন রক্ষা করেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে গুর্খারা আরও অগ্রসর হইয়া কোম্পানীর অধীনস্থ ও কোম্পানীর মিত্ররাজন্যবর্গের রাজ্য আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। অযোধ্যা-প্রদেশের প্রান্তস্থ তরাই অঞ্চল তাহাদিগের অধিকৃত হইলে, হার্সে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া ঐ অঞ্চল পুনরায় অধিকার করিতে আদিষ্ট হইলেন, এবং ব্রহ্মদেও নামক স্থানে গুর্খাদিগকে সমরে পরাভূত করিলেন। পরে কোম্পানী অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে নগদ দেড় কোটী টাকা ও কাণপুরের নিকটস্থ হাণ্ডিয়া

নামক ক্ষুদ্র প্রদেশ লইয়া হার্সে কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত প্রদেশ নবাবকে দেন। এই সময় হার্সের তেহরীর স্বাধিকারচ্যুত রাজার সহিত পরিচয় হয়। তাঁহারা বংশপরম্পরাক্রমে বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া গাড়োয়ালে রাজত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা প্রদ্যুম্ন শাহ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে গুর্খাগণ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত ও রাজ্যাধিকার-চেষ্টায় পর বৎসর ডেরাডুনের নিকট যুদ্ধে নিহত হয়েন। প্রদ্যুম্নের পুত্র সুদর্শন এই সময় হীনাবস্থ হইয়া বেরিলীতে বাস করিতেছিলেন। অত্যন্ত অর্থাভাবহেতু ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন তারিখে লিখিত দলীলে তিনি তিন হাজার পাঁচ টাকা মূল্যে ডুন ও চাঁদি পরগণাদ্বয় হার্সের নিকট বিক্রয় করিলেন। পরে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গুর্খাযুদ্ধের পর কোম্পানী সুদর্শনকে তদীয় রাজ্যের—অলকনন্দার পশ্চিমাংশে স্থাপিত করেন। পূর্ব্বাংশস্থিত ডুন ও চাঁদি পরগণাদ্বয় কোম্পানী রাখিলেন। এই গুর্খাযুদ্ধে হার্সে কোম্পানীর সাহায্য করিয়া বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিলেন। কোম্পানী বার্ষিক বার শত টাকা খাজনা স্বীকার করিয়া চাঁদি পরগণা হার্সের নিকট হইতে চিরস্থায়িরূপে বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখে এই দলীল সম্পাদিত হয়। এই দলীলে লিখিত হইল, ডুন কোম্পানীর অধিকারে আসিলেই হার্সে উহা কোম্পানীকে বিক্রয় করিবেন। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে কোম্পানী হার্সেকে ডুন পরগণার অধিকার দিতে ও তাঁহার নিকট হইতে উহা ক্রয় করিতে অস্বীকৃত হয়েন। কোম্পানী প্রকারান্তরে তাঁহার স্বত্ব অস্বীকার করেন। ডেরাডুন এক্ষণে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পত্তি। হার্সের উত্তরাধিকারীরা দলীলের বলে ঐ পরগণার মূল্য পাইবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। কিন্তু যে দলীলে কোম্পানী চাঁদি পরগণা বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন, সেই দলীলেই ডুনে হার্সের স্বত্ব স্বীকৃত হয়। হার্সের বংশধরগণ বলেন, গুর্খাযুদ্ধের পর ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর সেগোলীতে যে সন্ধি হয়, তাহাতে ইংরাজ গভর্মেণ্ট যে সকল স্থান অধিকৃত করেন, এবং আপনারা শাসনাধীন রাখেন, সে সকলেরই উল্লেখ আছে। উহাতে ডুনের উল্লেখ নাই। ইহা হইতেও বুঝা যায়, কোম্পানী ডুন প্রদেশ যুদ্ধে জয় করিয়া লয়েন নাই, হার্সের সহিত সম্পাদিত দলীলের বলে ভোগ করিতেছেন। বিশ্বাসভাজন কর্ম্মচারীর প্রতি সরকারের এই ব্যবহার বাস্তবিকই বিস্ময়কর ও বেদনার কারণ। *

---

* এই প্রবন্ধ-রচনার জন্য আমরা হার্সে-পরিবারের সহিত যে সকল পত্রব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহারা সরকারের এই ব্যবহারে বিশেষ দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন।—লেখক।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে যখন হার্সে বেরিলীর নিকট আপনার সম্পত্তিস্থ গৃহে বাস করিতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে গুর্খাদিগকে তেরাই প্রদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার প্রস্তাব কোম্পানীর নিকট উপস্থাপিত করিতেছিলেন, তখন তিনি উইলিয়ম মূরক্রফ্‌টের * সহিত কুমায়ুন গাড়োয়ালের মধ্য দিয়া মানসসরোবর-দর্শনোদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

এই ভ্রমণের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, যাত্রীরা ইংরাজ রাজ্যের সীমান্ত রোহিলাখণ্ড হইতে হিন্দু তীর্থযাত্রীর বেশে ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে তারিখে গুর্খাধিকৃত কুমায়ুনে প্রবেশ করেন। তাঁহাদের সঙ্গে ৫২ জন ভারতবাসী ছিল—সম্ভবতঃ ইহাদের অধিকাংশই পার্ব্বতীয় কুলী। গোলাম হায়দার নামক হার্সের পুরাতন অনুচরও তাঁহাদের সঙ্গে ছিল। গোলাম হায়দার জাতিতে আফগান। অনুচরদিগের মধ্যে দুই জন ভারতবাসী শিক্ষিত ছিলেন। তাঁহারা জরীপের কার্য্যে নিয়োজিত হয়েন। মূরক্রফ্‌ট বলেন, হার্সে সমস্ত পথ জরীপের ভার লইয়াছিলেন; ভারতবাসীদিগের অন্যতর হরকদেব পদক্ষেপে সমস্ত পথ জরীপ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইবার পদক্ষেপে ৪ ফুট স্থান অতিক্রান্ত হইত। তাঁহারা ৯ই হইতে ২৬শে পর্য্যন্ত যে স্থান অতিক্রম করেন;

---

* মূরক্রফ্‌টের জীবনকথা বিস্ময়কর। তিনি স্বদেশে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পশু-চিকিৎসার অনাদর দেখিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রের ঐ অংশ শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। এই কার্য্যে প্রসিদ্ধ অস্ত্রচিকিৎসক ডাক্তার হাণ্টার তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন। পরে ফ্রান্সে পশু-চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া তিনি লণ্ডনে ফিরিয়া ঐ ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করেন। কিন্তু অন্যান্য ব্যবসায়ে অর্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ নষ্ট হইলে, তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক সেনাদলের পশুচিকিৎসা বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়া ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আইসেন। তিনি ভারতবর্ষের সহিত পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহের বাণিজ্যসম্বন্ধ-সংস্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন, এবং স্বদেশের পক্ষ হইতে ঐ সকল দেশের ভৌগোলিক-তথ্যানুসন্ধান তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। এই সকল উদ্দেশ্যেই তিনি তিব্বতে যাত্রা করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বাল্ক ও বোখারা যাত্রা করেন। তথায় তিনি স্বয়ং, তাঁহার য়ুরোপীয় সঙ্গিদ্বয় ও প্রায় সকল ভারতীয় সমভিব্যাহারী প্রাণ-ত্যাগ করেন। সেবার হার্সেরও সেই সঙ্গে যাইবার কথা ছিল। কিন্তু কোন্ পথে যাওয়া যুক্তি-যুক্ত, তাহা লইয়া মতভেদ হওয়ায় হার্সের যাওয়া ঘটে নাই। অভিযানের ভারতত্যাগের সাত বৎসর পরে সমভিব্যাহারী গোলাম হায়দার ভগ্নদূতরূপে মূরক্রফ্‌টের লিখিত পথের বিবরণ লইয়া প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ বিবরণ ও গোলাম হায়দারের স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া হার্সে মূরক্রফ্‌টের এই শেষ যাত্রার একটি সুখপাঠ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। উহা London Asiatic Journalএ প্রকাশিত হয়।

তাহা দুই বৎসর পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কোলব্রুকের ভ্রাতা কর্তৃক অতিক্রান্ত হইয়াছিল। ২৪শে তারিখে তাঁহারা যোশীমঠে বদরীনাথের পথ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্ব্বে ইংরাজ কর্তৃক অনতিক্রান্ত নূতন পথে প্রবেশ করেন। ৪ঠা জুন তাঁহারা নীতি নামক গ্রামে উপনীত হইলে তিব্বতীয়েরা তাঁহাদিগের যাত্রায় নানারূপ বাধা দিতে থাকে। কারণ, এ পথে মানস-সরোবর যাত্রীরা সচরাচর গমন করে না। এই যাত্রীরা সশস্ত্র—তাঁহাদের সঙ্গে বহু সহযাত্রী, এবং তাঁহারা তিব্বতীয়দিগের শত্রু ফিরিঙ্গী, বা গুর্খা। তিব্বতীয়গণ চিরদিনই য়ুরোপীয়দিগের তিব্বত প্রবেশের বিরোধী। এ দিকে কুমায়ুন গাড়োয়াল তখন গুর্খাধিকৃত—গুর্খারাও ইংরাজদ্বেষী। কাজেই তিব্বতীয়দিগের পক্ষে এই যাত্রিগণের প্রকৃত-পরিচয়-প্রাপ্তি অসম্ভব নহে।

মূরক্রফ্‌ট ও হার্সে নীতির মণ্ডলকে বুঝাইলেন, তাঁহারা কেবল ধর্ম্মার্থ মানসসরোবরে যাইতেছেন; তাঁহাদিগের সহযাত্রীর সংখ্যাধিক্যের কারণ—তাঁহারা পথে ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বিক্রয় জন্য অনেক জিনিস আনিয়াছেন, আর আত্মরক্ষা ও দ্রব্যাদিরক্ষার্থ তাঁহাদিগকে অস্ত্র লইতে হইয়াছে। তিব্বতীয়েরা ইচ্ছা করিলে তাঁহারা তাহাদিগের নিকট অস্ত্র রাখিয়া অগ্রসর হইতে প্রস্তুত। এই কথায় নীতির মণ্ডল প্রভৃতি বাহ্যতঃ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিল, তাঁহারা পক্ষকাল তথায় অপেক্ষা করিলে, তাহারা কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অভিপ্রায় বুঝিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিবে। পরে জানা যায়, নীতির মণ্ডল যাত্রীদিগকে যাইতে দিলে পার্ব্বত্য পথের অপর পারে তিব্বতীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের তাহাদিগকে বাধা দিবার কোনও অধিকার নাই। এই সংবাদ-প্রাপ্তির পর বহু বাদানুবাদের ও এক বোতল ব্রাণ্ডিদানের ফলে, তাঁহারা ২৩শে জুন যাত্রার অনুমতি পাইলেন, এবং ঐ মাসের শেষদিন পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন। ৩রা জুলাই তিব্বতীয় অধিকারমধ্যে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী দাবা নামক স্থানে উপনীত হইলেন। দাবার কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের সহায়তায় তাঁহারা ১২ই তারিখে দাবা ত্যাগ করিয়া ১৭ই গারটোপে উপনীত হইলেন।

দাবায় এক বিভ্রাট ঘটে। তথায় প্রকাশ পায় যে, হার্সের পদে বিলাতী ধরণের হাফ বুটজুতা! মূরক্রফ্‌ট খুব কৌতুকের সহিত এই কথা লিখিয়াছেন—কারণ, তিনি আপনার জুতায় নাগরার মত শুঁড় লাগাইয়া লইয়াছিলেন।

তাঁহারা ২৩শে জুলাই গারটোপ ত্যাগ করিয়া ২রা অগষ্ট রাবণহ্রদে উপনীত হইলেন। ৫ই তাঁহারা অভিলষিতদর্শন মানসসরোবরের দর্শন লাভ করিয়া

পরদিন তাহার তীরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দুই দিন তীরে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মূরক্রফ্ট বলিয়াছেন, হ্রদটি আয়তক্ষেত্র (oblong) বলিয়া মনে হইল—পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণের তীর সরল রেখায় লম্বিত; বিস্তার—উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১১ মাইল; দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫ মাইল। সিকতাময় কূলের সান্নিধ্য ব্যতীত অন্যত্র জল স্বচ্ছ ও সুস্বাদু। জলের উপর শৈবাল দৃষ্ট হয় না, কেবল কূলের নিকটে জলমধ্যজাত ঘাস দেখা যায়। দূরে জল হরিৎবর্ণ বলিয়া মনে হয়। কি স্থির অবস্থায়—কি চঞ্চল অবস্থায় হ্রদের দৃশ্য সর্ব্বদাই মনোরম।

পথে কয় জন সন্ন্যাসীকে অর্থাভাবে প্রত্যাবর্ত্তনপর দেখিয়া যাত্রীরা তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন।

মূরক্রফ্ট সরোবরকূলে সন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত কতিপয় গুহা দেখিতে পান। গুহাবাসিনী এক জন সন্ন্যাসিনী সম্ভবতঃ তাঁহার শীর্ণ গৌরতনু দেখিয়া দয়াপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে আতিথ্যগ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে বিনয়ব্যঞ্জকভাবে তাঁহার আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহাদের কথায় ভবিষ্যতে কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশিত হইলে, তাহার অপনোদনার্থ হার্সে এক খণ্ড প্রস্তরে উভয়ের নাম ক্ষোদিত করিয়া একটি নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিয়া আইসেন।

তাঁহারা ৮ই অগষ্ট মানসসরোবর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ করিলে, ৯ই চাঁদপুরে গুর্খানায়ক বান্দা থাপ্পা তাঁহাদিগকে ছদ্মবেশে গুর্খাধিকারে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, পর্য্যাটকগণ সাধারণতঃ ভ্রমণকালে ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং এ ক্ষেত্রে ছদ্মবেশ গ্রহণ ব্যতীত তাঁহাদের তিব্বতে প্রবেশের উপায় ছিল না। তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ অন্যায় আচরণের অভিযোগ আছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহারা জানিলেন, সেরূপ কোনও অভিযোগ নাই। তখন তাঁহারা বলিলেন যে, শত শত নেপালী প্রজা কোম্পানীর অধিকারমধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকে—কেহ তাহাদিগকে বাধা দেয় না। বান্দা থাপ্পা বাহিরে অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না বটে, কিন্তু ১৫ই তারিখে পর্য্যাটকগণ বন্দী হইয়া প্রহরিবেষ্টিত হইলেন। তাঁহাদিগকে বলা হইল যে, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কি করা হইবে, সে বিষয়ে পরামর্শ চলিতেছে। কিন্তু পরে প্রকাশ পায়, রাজধানী কাটমুণ্ড হইতে প্রেরিত আদেশানুসারেই তাঁহারা বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। মূরক্রফ্ট

সশস্ত্র ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করা হইয়াছিল—তাঁহার হস্তদ্বয় বন্ধন করা হইয়াছিল। পণ্ডিতদ্বয় ও অন্যান্য সহচরগণকে শৃঙ্খলিত করা হয়। গুর্খা সৈন্যদলের প্রধান সেনাধ্যক্ষ অমরসিংহের ও আলমোরার গুর্খা শাসনকর্ত্তা বামশাহের পত্রব্যবহারের ফলে ১লা নভেম্বর হার্সে ও মূরক্রফ্‌ট মুক্তিলাভ করেন। আর সকলে তখনও বন্দী রহিলেন। পরে ৫ই নভেম্বর নেপালের মহারাজের আদেশলিপি-প্রাপ্তির পর সকলকেই মুক্তি দিয়া ইংরাজাধিকারে রাখিয়া যাওয়া হয়। এইরূপে মানসসরোবর পর্য্যন্ত ইংরাজ পর্য্যাটকদিগের প্রথম পর্য্যটন পরিসমাপ্ত হয়।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর অধিকৃত প্রদেশে গুর্খাদিগের অত্যাচার অসহনীয় হইয়া উঠে, এবং পর বৎসর যুদ্ধ অনিবার্য্য হয়। সে যুদ্ধের বিবরণ আমরা গার্ডনারের বিবরণে বিবৃত করিয়াছি। * তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে বলা যায়, চারিটি আক্রমণের মধ্যে তিনটিতে ইংরাজের পরাজয় ও তাঁহাদের খ্যাতি মলিন হইয়াছিল। চারি দলই অগ্রসরে অক্ষম দেখিয়া বড়লাট লর্ড ময়রা ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধের প্রণালীর পরিবর্ত্তন প্রয়োজন বুঝিয়া কুমায়ূন অঞ্চল আক্রমণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। হার্সে ও গার্ডনার এই কার্য্যের ভার পাইলেন। তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ বৈবাহিক সম্বন্ধের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইঁহারা উভয়েই যেরূপ দুঃসাহসিক, তাহাতে মনে হয়, ইঁহারাই এই প্রণালী-পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বিশেষ, হার্সে ১৮০৮ ও ১৮১২ খৃষ্টাব্দে কুমায়ূন অঞ্চলে গমন করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, গুর্খারা বিক্রমশালী নহে। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের জন্য এবার তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

গার্ডনার মোরাদাবাদ জেলায় তিন হাজার ও হার্সে বেরিলী ও পিলিভিট অঞ্চলে দেড় হাজার রোহিলা সৈন্য সংগ্রহ করিতে উপদিষ্ট হইলেন। ঐ অঞ্চলে হার্সের প্রচুর সম্পত্তি ও প্রভাব ছিল। স্থির হইল—গার্ডনার কুশী নদীর উপত্যকাপথে কুমায়ূনাভিমুখে অগ্রসর হইবেন, এবং হার্সে পিলিভিট হইতে কালী নদী ধরিয়া টিমনা উপত্যকা দিয়া কালা-কুমায়ূনে প্রবেশ করিবেন। এইরূপে শতদ্রু ও গণ্ডক নদীদ্বয়ের নিকটস্থ অভিযান দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। অমরসিংহ তখন জেনারল অক্‌টারলোনীর সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। এই ব্যবস্থায় তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের একমাত্র পথ বন্ধ হইবে।

হার্সে অল্পকালমধ্যেই দেড় হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু বেরিলী

* 'মানসী'।

অঞ্চলের রোহিলাদিগের যোদ্ধা বলিয়া খ্যাতি ছিল না—হার্সে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিবার সময়ও পাইলেন না। এক মাসে সৈন্যসংগ্রহ শেষ করিয়া, এক মাসেরও কম সময় তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া, তৃতীয় মাসে হার্সে গুর্খাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মার্চ্চ মাসের শেষ দিনই তাঁহার কষ্ট শেষ হয়। ১লা এপ্রেল তাঁহার সেনাদল বিধ্বস্ত হইল।

হার্সের সহিত কামান ছিল না—গুলী বারুদও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না—রসদেরও অভাব ছিল। দলপতি হস্তিদল ও অপর এক জন নায়কের অধীনে গুর্খারা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিল। যুদ্ধের আরম্ভেই হার্সে উরুতে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার এক শ্যালক নিহত হইলেন —আর এক শ্যালক ঢালের উপর বসিয়া নিম্নগ ভূমিতে অবতরণ করিয়া রক্ষা পাইলেন। তাঁহার অনুচর গোলাম হায়দারও আহত হইয়া কোনরূপে প্রাণ-রক্ষা করে। রোহিলারা নায়কদিগকে আহত দেখিয়া পলায়নপর হইল। তখন গুর্খারা অগ্রসর হইয়া তাহাদিগের সামরিকপ্রথানুসারে হতাহতের শিরশ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা হার্সের শিরশ্ছেদনে উদ্যত হইলে, হস্তিদল তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিলেন, এবং তাঁহাকে আলমোরায় লইয়া যাইলেন। হার্সে ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন; সেই কথা স্মরণ করিয়া হস্তিদল তাঁহার সহিত ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

ঐ এপ্রেল মাসে ইংরাজগণ জয়ী হইয়া আলমোরা হস্তগত না করা পর্য্যন্ত হার্সে তথায় বন্দী রহিলেন। গার্ডনার আলমোরা-দুর্গজয়ে অসমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু কর্ণেল নিকলস্ আর এক সৈন্যদল লইয়া দুর্গ জয় করিলেন। হস্তিদল দৌত্যকার্য্যে হার্সেকে নিযুক্ত করায় সন্ধির পথ সুগম হয়।

কুমায়ূনের যুদ্ধের পর হার্সে বেরিলীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। গোলাম হায়দারও অল্পদিনমধ্যে তথায় আসিল। হায়দার অল্প দিনেই সুস্থ হইল; কিন্তু অবরোধ ও কুচিকিৎসার ফলে হার্সে আর নষ্টস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন না। জীবনের অবশিষ্ট কাল—পঞ্চদশ বৎসর—তিনি আর পূর্ব্ববৎ স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বেরিলী জেলার জনগণমধ্যে অসন্তোষ আত্ম-প্রকাশ করিল; বৃটিশশাসনে ভারতে যে শান্তি সংস্থাপিত হয়, রোহিলাদিগের পক্ষে তাহা প্রীতিপ্রদ হয় নাই। অধিকন্তু বেরিলীর তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট অসৌজন্যহেতু লোকের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। ১৬ই এপ্রেল তথায়

দাঙ্গা হইল, এবং তাহার দুই দিন পরে নিকটবর্ত্তী নানা স্থান হইতে প্রায় পঞ্চ সহস্র মুসলমান বেরিলী সহরে সমবেত হইয়া প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে সিপাহী-সংখ্যা মোট ৪২০ ও দুইটি কামান, এক জনও সেনানায়ক নাই। হায়দার হার্সে যাচিয়া কামান চালাইবার ভার লইলেন। ১৯শে তারিখে বেরিলীতে এক দল অশ্বারোহী সেনা উপস্থিত হইল। বিলম্বে আরও সৈন্যসমাগম হইবে বুঝিয়া বিদ্রোহীরা অতর্কিতভাবে সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিল। হার্সের পরিচালিত কামানের সাহায্যে ইংরাজগণ বিদ্রোহী-দিগকে পরাভূত করিলেন—তাহাদের মধ্যে তিন চারি শত লোক হত ও বহু লোক আহত ও বন্দী হইল। এই কার্য্যের জন্য বড়লাটের ঘোষণাপত্রে হার্সেকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল, এবং তিনি মেজর-পদে উন্নীত হইলেন, এবং একখানি তরবারি উপহার পাইলেন।

এবারও গোলাম হায়দার প্রভু হার্সের পার্শ্বে ছিল। সে বন্দুকের গুলীতে মস্তকে আহত হইয়াছিল। সে গুলী বাহির করা যায় নাই—মস্তকেই ছিল। তথাপি হার্সের অনুরোধে হায়দার মুরক্রফ্‌টের শেষ অভিযানে তাঁহার সহগামী হইয়াছিল। মুরক্রফ্‌ট ও তাঁহার সঙ্গীদের শোচনীয় মৃত্যুর পর হায়দার প্রায় আট বৎসর বহু কষ্ট ভোগ করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করে,এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল হার্সের আশ্রয়ে অতিবাহিত করে। তাহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ হার্সের পুত্রদিগের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছিল।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে হরিদ্বারে বহুযাত্রীর সমাগমে বিষম দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। তাহাতে প্রায় চারি শত নরনারী নিষ্পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করে। সেই সময় হায়দার হার্সে ও তাঁহার আত্মীয় বেনেট হার্সে হরিদ্বারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট এই দুর্ঘটনার কারণ বিবৃত করিলে, বড়লাট মার্কুইস অব হেষ্টিংসের আদেশে হরিদ্বারে প্রশস্ত ও সুগঠিত তীর্থ—সোপান-শ্রেণী প্রস্তুত হয়। তদবধি স্নানার্থীর বাহুল্যে হরিদ্বারে আর কখনও কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

হার্সে আরও একবার যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ভরতপুর যুদ্ধে তিনি যোগ দিয়াছিলেন। গুর্খাযুদ্ধের আঘাতের ফলে তিনি তখন ভগ্ন-স্বাস্থ্য; ডুন পরগণা লইয়া তিনি তখন কোম্পানীর ব্যবহারে মর্ম্মাহত। কিন্তু ইংরাজ সৈন্য যুদ্ধযাত্রা করিতেছে শুনিয়া তিনি সব বিস্মৃত হইলেন। যুদ্ধের পর—ভরতপুর-জয়ান্তে ইংরাজ সৈন্যগণ আপনাদের স্বার্থসংরক্ষণার্থ তাঁহাকে সহকারী Prize Agent মনোনীত করে। এ সম্মান বড় সাধারণ নহে।

এই কার্য্য শেষ করিয়া হাসে´ করেলীতে স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং সুখে ও সম্ভ্রমসহকারে জীবনের অবশিষ্ট কয় বৎসর কাটাইয়া, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

তাঁহার তিন পুত্র ও এক কন্যা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় দশ বৎসর পরে তাঁহার পত্নী—কাম্বের নবাবনন্দিনীর ~~মৃত্যু~~ হয়। প্রাচীরবেষ্টিত ভূমিখণ্ডে তাঁহার দেহ সমাহিত হয়। আজও পর্ব্বদিনে গ্রামবাসীরা এই মহিলার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য তাঁহার সমাধি কুসুমে সজ্জিত ও দীপালোকিত করিয়া থাকে। তিনি আগ্রার তাজমহলের প্রবেশদ্বারের নিকটে স্বীয় পিতার আবাস-গৃহের সান্নিধ্যে সাধারণের ব্যবহার জন্য একটি কূপ খনন করাইয়া দেন। সেই কূপপ্রাচীরে একখানি প্রস্তরফলক সন্নিবিষ্ট আছে। কিন্তু সেই আবাস এক্ষণে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার উত্তরাধিকারীরা এখনও তাঁহার অর্জ্জিত সম্পত্তি সম্ভোগ করিতেছেন।

শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ভালবাসার এক ধারা।

["One way of Love"—by *R. Browning.*]

১

সারাটা বসন্ত আমি গাঁথিলাম গোলাপের হার।
এখন সে সব ছিঁড়ি—একে একে দলগুলি তার,
ছড়াই সে পথে—যেথা মাঝে মাঝে প্রিয়া মোর যায়।
ছেঁড়া ফুল হেরি পথে, ফিরে কি সে চাহিবে না—হায়!
থাক্‌না ছড়ান সেথা—থাক্ থাক্—শুকাবে? শুকাক।
কোন যোগে পড়ে যদি চোখে তার—তাই, থাক্ থাক্।

২

কত কত মাস ধরি করিয়াছি কত না যতন,
অবাধ্য অঙ্গুলি মোর বীণা-বশে করিতে চালন!
সাহস করেছি আজ, যাহা জানি সবই তা বাজাতে।
শুনে যদি সে গান? না শুনুক্—কি ক্ষতি তাহাতে?
ছিঁড়িব বীণার তার—থামাইব সঙ্গীত-ঝঙ্কার।
ভাবিব—গাহিতে গান বলেছিল প্রেয়সী আমার!

৩

সারাটা জীবন ধরি শিখিয়াছি ভালবাসিবারে।
ছলাকলা যত জানি, পরিচয় দিব আজি তারে;
কহিব মর্ম্মের কথা—স্বর্গ কি নরক তায় হবে?
দিবে না মোরে সে স্বর্গ? নাহি দেয়—তাই ভাল তবে!
হারাই—লভুক্ স্বর্গ যে বা হয়—কহি এ নিশ্চয়—
যে লভে প্রেমের স্বর্গ, সেই ধন্য—ভাগ্যে তারই জয়।

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

আলোচনা।

আর্ট ও আর্ট-রসিক।

গত ভাদ্রের 'ভারতী'তে শ্রীযুত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—'বাংলা সাহিত্যে যাঁরা থিয়রি লইয়া মারামারি করেন, তাঁদের রচনায় র‍‍সবোধ ও রসবিশ্লেষণের ক্ষমতার গন্ধ পর্য্যন্ত পাই না।' ইহা অবশ্যই থিয়রি-ওয়ালাদের দুর্ভাগ্য! কিন্তু সাহিত্যে যাঁহারা থিয়রি লইয়া মারামারি করেন না, তাঁহাদের ঘ্রাণশক্তি কত দূর প্রবল, তাহার পরিচয় তাঁহারা কতটুকু দিয়াছেন? রুমাল দ্বারা নাসিকা আবৃত করিয়া মুখগহ্বরের সাহায্যে যাঁহাদের শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া চলে, তাঁহাদের নাসিকা হইতে রুমাল টানিয়া ফেলিয়া দিবার শক্তি অবশ্যই থিয়রি-ওয়ালাদের নাই।

অজিতকুমার বাবু বলেন,—'আসলে তর্কটা আর্টের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ লইয়া দাঁড়ায় না—আর্টের সঙ্গে নীতির সম্বন্ধবিচার লইয়াই এই তর্ক।...তর্কটা পুরাণো—বাংলা দেশের মাটিতে নূতন করিয়া গজাইয়াছে মাত্র।' ক্ষতি কি? তর্ক পুরাতন হইলেই যে তাহা আলোচনার অযোগ্য হইবে, এমন কোনও বিধান নাই। বিশেষতঃ, এতকাল যে তর্কের মীমাংসা হয় নাই, তাহা যতই পুরাতন হউক, আলোচনার যোগ্য। আর্টের সঙ্গে নীতির সম্বন্ধবিচার লইয়াই এই তর্ক হইতেছে, এ কথা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু সেই নীতি কোন্ নীতি? নীতির উৎপত্তি কোথায়? বিশিষ্ট সমাজের নীতি আর্টের আলোচ্য হউক বা না হউক, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত যদি আর্টের যোগ থাকে, তবে সাধারণ মানবসমাজের সহিত শ্রেষ্ঠ আর্টের যোগ থাকিবেই। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত যোগ আছে বলিয়াই শ্রেষ্ঠ আর্ট সর্ব্বতোভাবে বিশ্বপ্রকৃতির অনুসরণ করে না; দোষগুণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পাপপুণ্যের বিচার করিতে পারে, কিন্তু সাধারণ ও স্বাভাবিক সমাজজীবনের মূলে কুঠারাঘাত করে না। যে আর্ট নীতি মানে না, তাহা সাধারণ মানবের সমাজধর্ম্মও মানে না। সাধারণ মানবের সমাজধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া কয় জন আর্টিষ্টের দান সাহিত্যে স্থায়ী হইয়াছে, 'ভারতী'র লেখক তাহার একটা হিসাব দিলে,

আমরাও বুঝিতে পারি যে, সাধারণ মানবের সমাজধর্ম্মকে অবহেলা না করিয়াই কোনও কোনও লেখক সাহিত্যে যাহা দান করিয়াছেন, তাঁহাদের দান তথাকথিত আর্টিষ্টের দানের অপেক্ষা কত উচ্চ, বা কত নীচ। নতুবা এক পক্ষ যদি ক্রমাগতই বলেন—আর্টের সঙ্গে নীতির যোগ না থাকিলে ক্ষতি নাই ; আর অপর পক্ষ বলেন—আর্টের সঙ্গে নীতির যোগ চাহি ; তবে এই তর্কের মীমাংসা কোনও কালেই হইবে না।

অস্কার ওয়াইল্ড আর্টের সঙ্গে নীতির সম্বন্ধ বিচার করিতে চাহেন নাই। রাস্কিনের মতে, আর্টের সঙ্গে নীতির সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। অজিতকুমার বাবু অস্কার ওয়াইল্ড বা রাস্কিন, এই দুইয়ের কাহারও মতের সমর্থন করেন না। অজিতকুমার বাবু অস্কার ওয়াইল্ড বা রাস্কিনের মত শক্তিশালী হইলে, এবং একটা নূতন মতের প্রতিষ্ঠা করিয়া 'আর্টের আদর্শ' নির্ণয় করিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম, কিন্তু তিনি অস্কার ওয়াইল্ডের মতের দিকে ঝুঁকিয়া পড়া ছাড়া আর কিছুই করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—'আর্টের মধ্যে সব ক্ষেত্রেই নৈতিক উদ্দেশ্যের প্রেরণার সন্ধান করিতে গিয়া রাস্কিন যে সব সময়ে আর্ট-সম্বন্ধে সুবিচার করিয়াছেন এমন কথা বলা যায় না।' এমন কথা বলিতে না পারিবার কারণ দেখাইতে গিয়া তিনি যে উদাহরণটি দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত কাঁচা। সিপাহীবিদ্রোহকালে ভারতবাসীর চরিত্র সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত অর্থাৎ মিথ্যা সংবাদ বিলাতে প্রচারিত হওয়ায় রাস্কিন ভারতবাসীকে নীতিতে দুর্ব্বল ভাবিয়াছিলেন। এই ভুল সমালোচনার আশঙ্কায় রাস্কিনের মতটা যে কিরূপে উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। রবীন্দ্রনাথের এখনকার 'যৌবন রে তুই যে পারিস্ কাঁটা গাছের উচ্চ ডালে পুচ্ছ নাচাতে' জাতীয় কবিতার, বা 'ঘরে-বাইরে', 'চোখের বালি', বা 'নৌকাডুবি'র ভুল সমালোচনার আশঙ্কা ত রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বচরগণ ষোল আনাই করেন, তবে কি আর্ট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সুবিচার করিতেছেন না, ইহা সকলেই অবিসংবাদিতরূপে সিদ্ধান্ত করিবেন? তাহা হইলে আর্ট সম্বন্ধে আলোচনার আর কোনও কারণই থাকে না।

তাহার পর হুইস্লারের কথা। তিনি আর্টকে নীতির আধিপত্য হইতে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হুইস্লারের পরবর্ত্তী এখনকার অনেক লেখকও ত ঐ ধুয়া ধরিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন—আর্ট জীবনের প্রকাশক, জীবনের উদ্ঘাটক। কেহ কেহ বলেন—জীবনের সৃষ্টিই সাহিত্যের কাজ, আর্ট জীবন-সৃষ্টিকৌশলের স্রষ্টা। ইহাতেই ত তর্কের সৃষ্টি। তথাপি অজিতকুমার বাবু সর্ব্বত্র শুনিতেছেন—আর্ট জীবনের প্রকাশক, জীবনের উদ্ঘাটক। বিপক্ষীয়েরা যাহা বলিতেছেন, তাহা কি সর্ব্বত্রের গণ্ডীর বাহিরে? এক পক্ষ সামাজিক শুভাশুভের দিক্ দিয়া আর্টের বিচার করিতে চাহেন ; অন্য পক্ষ বলেন, 'সমাজের দিক্ হইতে কোন্ জিনিসটা ইষ্টকর বা অনিষ্টকর, আর্টের সেজন্য কোনও মাথাব্যথা নাই।' দ্বিতীয় পক্ষের কথা এই, গল্প বা উপন্যাসের বিষয় যাহাই হউক, রচনাটি কলাসৌষ্ঠবপূর্ণ ও রসযুক্ত হইয়াছে কি না, তাহাই বিচারের বিষয়। প্রথম পক্ষ রচনাটি কলাসৌষ্ঠবপূর্ণ ও রসযুক্ত হইয়াছে কি না, তাহা ত বিচারের বিষয় বলিয়া গণ্য করেনই, অধিকন্তু ইহাও বিচার করেন যে, সামাজিক শুভাশুভের সঙ্গে ঐ রচনার কতটুকু সম্বন্ধ আছে। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, এই ভাবে বিচার

করিলে আর্ট নীতির শাসনে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু উপায় কি? নীতিকে অবহেলা করিয়া কোনও সভ্যজাতির সমাজ কোনও কালেই উন্নতিলাভ করিতে পারে না। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করাই মানুষের স্বভাব। সমাজের কল্যাণের জন্যই মানুষ কার্য্যে ও ব্যবহারে নীতির অনুসরণ করে। সেই জন্য কোনও স্বয়ংসিদ্ধ আর্টিষ্ট আর্টের দোহাই দিয়া দুর্নীতির প্রচারে উদ্যত হইলে, সমাজের শুভাশুভের দিকে লক্ষ্য করা সমাজহিতৈষী যে কোনও ব্যক্তির পক্ষে আবশ্যক হয়। তখন সাধারণ সমাজবাসীর পক্ষ হইতে স্বতঃই একটা প্রশ্ন উত্থিত হয়—তোমার রচনার রস ও কলাসৌষ্ঠব আমার কি উপকারে আসিল? রবীন্দ্রনাথ গল্পে ও উপন্যাসে বিলাতী পাপের ছবি বায়স্কোপের মত বাঙ্গালীকে ক্রমাগতই দেখাইতেছেন বলিয়াই বাঙ্গালার জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা আসিয়াছে। প্রথম-পক্ষভুক্ত অনেকেই এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়বৃত্তি—রসের গভীরতা—পরখ করিয়া লইতেছেন। 'ভারতী'র লেখক বলিয়াছেন,—'আর্টের বিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ আর্টিষ্ট তাঁর ভিতরকার কোন্ vision বা কোন্ রসভাব তাঁর কলাসৃষ্টিতে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে।' শিল্পীর কলাসৃষ্টির রসভাবের সঙ্গে শিল্পীরও রসভাবের অনুসন্ধান করা ক্ষতির বিষয় হইলেও, দোষের বিষয় নহে। কলাসৃষ্টির রসভাবের অভাবের জন্য শিল্পীই দায়ী। যিনি স্বেচ্ছায় যে কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাহার জন্য তিনি হয় নিন্দা, নতুবা প্রশংসা পাইবেনই। প্রশংসা যদি এতই মুখরোচক হয়, তবে নিন্দাও মুখরোচক হওয়া উচিত। দ্বিতীয় পক্ষ যদি কোনও শিল্পীকে প্রশংসার জোরে 'ঋষি' করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন, তবে প্রথম পক্ষ সেই শিল্পীতে ঋষিত্বের 'ঋ' পর্য্যন্ত নাই, ইহা সপ্রমাণ করিয়া দিলে কদাচ নিন্দিত হইতে পারেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে 'ভারতী' এই এক বৎসরের মধ্যে কত চরম অভদ্রতা দেখাইয়াছেন, আলোচ্য সংখ্যায় 'সাহিত্যে গণ্ডগোল' প্রবন্ধেও অভদ্রতার আভাস দিয়াছেন, সেই 'ভারতী'ই আবার ভদ্রতার দাবী করেন! নবকুমারের লম্ফঝম্প আমাদের মনে আছে। ছুঁচো, চামচিকে, বাদুড়, সাহিত্য-কোটাল—এগুলা কোন্ ভদ্রসাহিত্যের উপযুক্ত? সেই জন্যই বলি, ভদ্রতার বিচার এখন থাকুক। আর্ট সম্বন্ধে লেখকের মূল বক্তব্য বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করা যাউক।

আর্টের সঙ্গে নীতির যোগ আছে, এ কথা অজিতকুমার বাবু স্বীকার করেন না। তিনি রসের স্ফূর্ত্তি লইয়াই 'আর্টের আদর্শ' গড়িতে চাহেন। ইহার উত্তরে আমরা বলিতে চাহি—কেবলমাত্র রসসৃষ্টির স্ফূর্ত্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া বিচার করিলে আর্টকে হীন করা হয়। কারণ, জীবনসৃষ্টিই আর্টের কাজ। রসসৃষ্টি জীবনস্ফূর্ত্তির অন্তর্গত। জীবনই রসের আধার। শিল্পসৃষ্টি বিশ্বসৃষ্টির মত নব নব রূপে ব্যাখ্যাত হয়, হউক; কিন্তু সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির সংযতভাব শিল্পসৃষ্টির মধ্যেও থাকা আবশ্যক। বিশ্বের কুৎসিত ও নিষ্ঠুর দিকটাতেই সমগ্র বিশ্বকে চিনিতে পারা যায় না। শ্রেষ্ঠ আর্ট লেখকের অসংযম বা স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেয় না। স্বেচ্ছাচারমূলক আর্ট পদে পদে বিকৃত রসের সৃষ্টি করে। রসের দিক্ দিয়াই যদি আর্টের বিচার করিতে হয়, তবে যে রস শুধু বিষই দেয়, অমৃত দেয় না; অথবা অমৃতই দেয়, বিষ দেয় না, তাহা খণ্ড ও অপূর্ণ। এই খণ্ড ও অপূর্ণ রসে পূর্ণ সত্যের প্রচার হয় না। আর্ট যে সত্যের প্রচার করে, তাহা অখণ্ড

ও পূর্ণ। খণ্ডরসমর্য্যাদিরাপানে সাময়িক উত্তেজনায় কোনও লেখক যাহা দান করেন, তাহাতে রসভাবের প্রকাশ যতই সূক্ষ্ম ও গভীর হউক, তাহা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর দান নহে। এই খণ্ড, অপূর্ণ ও বিকৃত রসের স্ফূর্ত্তি যে আর্টের সৃষ্টি করে, তাহা স্থায়ী হইবে না, এমন কথা বলা যায় না; কারণ, বিকৃতরুচিসম্পন্ন আর্ট-রসিকের অভাব কোনও দেশে কোনও কালেই হয় না।

দুঃখের বিষয়, নীতি লইয়া যে দেশের লোকের—পরিবারে ও সমাজে, রাষ্ট্রে ও সাহিত্যে—এতকালের সাধনা, আজ সেই দেশে—আমাদের এই বাঙ্গালায়—নিকৃষ্ট শ্রেণীর আর্ট-রসিকের সংখ্যা বাড়িতেছে। প্রমাণ—তাঁহাদের বিবিধ গল্প, বিবিধ উপন্যাস, বিবিধ কবিতা ও সঙ্গীত। এই শ্রেণীর আর্ট-রসিকের কল্পনাপটে কোন্ রসভাবের ছাপ সহজেই পড়ে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইঁহারা যে অন্যের রচনায় রসবোধ ও রসবিশ্লেষণের গন্ধ পর্য্যন্ত পান না, তাহার কারণ—ইঁহাদের ব্যক্তিগত রুচি, শ্লীলতা ও আর্টের আদর্শ সাধারণ বাঙ্গালী-জীবনের রুচি, শ্লীলতা ও আর্টের আদর্শের প্রতিকূল।

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিন্ধু।

["পুরীতে সমুদ্রদর্শন"-দর্শনে।]

কাব্যগ্রন্থে পড়ি—তুমি হে বারিধি! অনন্ত উদগ্র মূর্ত্তি ধরি'
গর্জ্জিতেছ রাত্রিদিন অনিবার, রোষে ফুলি' আছাড়ি' আছাড়ি'!
কি সে রোষ নাহি জানি, এত দূরে আসে না সে গুপ্ত পরিচয়;
গ্রন্থ-গত শব্দে শুধু স্তব্ধ কর্ণে জাগে এক প্রচণ্ড বিস্ময়!
গর্জ্জ, গর্জ্জ,—রোষে, ক্ষোভে, অভিমানে, অপমানে, তীব্র তিরস্কারে,—
শুনি বুঝি যাত্রিমুখে, নিরন্তর তুচ্ছ কাব্যে কি লিখিছে নরে?

সৃষ্টির প্রথম দিবা, জাগি যবে প্রভাতের অরুণ কিরণে,
নিরখিল রক্তনেত্রে তোমার তরঙ্গ-পুষ্ট দুষ্ট বারি পানে,—
ঊর্দ্ধে উঠি', আরো ঊর্দ্ধে চাহিল সে যাত্রাপথে লঙ্ঘিতে তোমারে,
প্রাণান্ত নিষ্ফল চেষ্টা দিনান্তে ডুবিল তার তব ক্ষুব্ধ নীরে!
সেই এক দিন! আর সেই দিন হ'তে কত লক্ষ বর্ষ ধরি'
প্রতি প্রাতে চাহে দিবা,—সভয়ে, বিস্ময়ে, ক্ষোভে,—সেই কথা স্মরি'!

রাত্রি যবে বিস্তারিয়া বিশ্বব্যাপ্ত মসীলিপ্ত সুপ্তি-যবনিকা,
—নক্ষত্রখচিতা কভু, চন্দ্রকরোজ্জ্বলা কভু, কভু রাকা-আঁকা—
তোমারে ঢাকিতে চাহে, তাহার প্রশান্ত গৃহে, লুকাতে তোমারে;
প্রভাতে ভাঙ্গে সে স্বপ্ন; ডুবে যায় গর্ব্ব তার তোমারি গহ্বরে!
রাত্রিদিন পরাজিত; লক্ষ বর্ষ পরাজিত; পরাজিত নহে কিন্তু নর,
অদ্যাপি সে থাকি' থাকি' বাক্যে চাহে ডুবাইতে তব রুদ্র স্বর!

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

নাসিক।

নাসিক বুরহাণপুর হইতে দূরত্বে ১৯৩ মাইল। পথের প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা বলিতে পারিব না। কারণ, বুরহাণপুর হইতে ট্রেণ ছাড়িবার একটু পরেই অন্ধকার হইয়া গেল। আর সে দিন কৃষ্ণপক্ষ। কাজেই সকলই অন্ধকারে ঢাকা ছিল। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, বন-পথের অনেক স্থানেই পাহাড় আছে।

ভোর ছয়টার সময় ট্রেণ নাসিক ষ্টেশনে পঁহুছিল। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল —নাসিক রোড। আমি ট্রেণ হইতে নামিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, সারি সারি টাঙ্গা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সজ্জিত রহিয়াছে। পাণ্ডারা ষ্টেশনে যাত্রী লইতে আসিয়া অনেককে বেরাও করিয়া ফেলিয়াছে। ষ্টেশন হইতে নাসিক সহরে টাঙ্গায় যাওয়া যায়। ভাড়া এক টাকা হইতে দেড় টাকা। আবার ট্রামগাড়ীও আছে—এ ট্রাম ঘোড়ায় টানে। ভাড়ার ঠিক নাই, যখন যেমন, তখন তেমন। কখনও এক আনা, কখনও দেড় আনা, কখনও বা দুই আনাও হইয়া থাকে। আরোহীর ভিড় অনুযায়ী ভাড়ারও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। আমি এক স্থানে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি যে, দ্রব্যাদি লইয়া টাঙ্গায় যাই, কি ট্রামে যাই? ট্রামে যাওয়াই ত সুবিধা, ভাড়া যৎসামান্য, তবে কিছু কুলী খরচ লাগিবে। তাহা হইলেও টাঙ্গার চেয়ে ঢের সস্তা। দু' একটি পাণ্ডা দূর হইতে আমার পানে মিটি-মিটি তাকাইতেছে—আধা-সাহেবী পোষাক দেখিয়া, সন্দেহভরে সাহস করিয়া নিকটে আসিতে পারিতেছে না। আমি একটি পাণ্ডাকে নিকটে ডাকিয়া হিন্দু বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিবামাত্র অমনই মক্ষিকার ন্যায় পাণ্ডার দল আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। কিন্তু আমি পূর্ব্বকথিত ব্যক্তিকেই পাণ্ডা মনোনীত করিয়াই তাহার সহিত ট্রামে আরোহণ-পূর্ব্বক নাসিক সহরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

পথটি বেশ মনোরম! কতক দূর রাস্তার উভয় পার্শ্বেই শীতলছায়াময় বটশ্রেণী! ষ্টেশনের অল্প দূরেই পথের বাম দিকে কতকগুলি সুদৃশ্য বাঙ্গলোর সমষ্টি। এগুলি স্বাস্থ্যনিবাস (Sanatorium); শুনিলাম, অল্প ব্যয়েই রোগীরা এই সকল বাঙ্গালোয় বাস করিতে পায়। প্রায় এক ঘণ্টার কিছু পরে আমরা সহরে পঁহুছিলাম। যেখানে ট্রাম থামিল, সেখান হইতে আমার পাণ্ডা বালকৃষ্ণ

মহাদেও খাণ্ডোয়ের বাটী কিছু দূরে। একটি কুলীর মস্তকে দ্রব্যভার চাপাইয়া তাহার বাটীতে উপনীত হইলাম। নাসিকের যে মহল্লায় বালকৃষ্ণের বাটী, তাহার নাম সোমবারিপেট।

২৪শে জানুয়ারী, ১৯১৪।—বালকৃষ্ণ মহাদেবের বাটী ত্রিতল। কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। একতল ও দ্বিতলের ছাদ কাষ্ঠ ও মৃত্তিকায় গঠিত। সর্ব্বোপরি ত্রিতলের ছাদ খর্পরাচ্ছাদিত। নাসিকের সকল বসতবাটীই প্রায় এইরূপ। কাষ্ঠনির্ম্মিত গবাক্ষে ও বারান্দায় কারুকার্য্যও আছে। তবে আধুনিক ফ্যাশানের সুরম্য হর্ম্ম্যও নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু সংখ্যায় অল্প।

রাস্তার ধারেই (এখানে রাস্তা অতি অল্প-পরিসর, গলি বলাও চলে) দ্বিতল কক্ষটি আমার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। আর কেহ যাত্রী ছিল না। আমি যে কয়দিন নাসিকে ছিলাম, একাই একটি কক্ষে বাস করিয়াছিলাম।

কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন জলযোগ করিয়া আমি পাণ্ডার ভ্রাতুষ্পুত্র—একটি কিশোরবয়স্ক বালককে সঙ্গে লইয়া গোদাবরীতীরে উপনীত হইলাম। গোদাবরী নদী এই অঞ্চলে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; কিন্তু প্রায় এক মাইল দীর্ঘ নাসিক সহরের সম্মুখভাগে অপূর্ব্ব কৌশলে বড় বড় প্রস্তরনির্ম্মিত বিরাট চতুষ্কোণ কুণ্ডসমূহ (basin) নির্ম্মাণ করিয়া যেরূপ ভাবে জলপূর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা দেখিলে তরঙ্গায়িত নদী বলিয়াই বোধ হয়। স্নানের নিমিত্ত প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলী জলগর্ভে নামিয়াছে। নদীর পরপারে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তরনির্ম্মিত কুণ্ডের আলগুলিই পাদপথ (cause-way)। তাহার উপর দিয়াও জল চলিতেছে। হিন্দুমাত্রই পাদুকা উন্মোচন করিয়া তাহার উপর দিয়া যাতায়াত করিতেছেন। গোদাবরীর উভয় কূলেই মন্দির-সৌধ-সমন্বিতা নয়ন-রঞ্জিনী নাসিক নগরী। মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণমহিলাসমূহ গোদাবরীতটে ফটাফট্ শব্দে আকাশ ফাটাইয়া বস্ত্র আছড়াইতেছেন! তাঁহাদের বস্ত্রাদি বিধৌত করিবার স্থানই গোদাবরী। সাধারণ স্ত্রীলোকেরা অনেকে বড় বড় পিত্তল ও তাম্র-নির্ম্মিত বিচিত্র গঠনের কুম্ভপূর্ণ গোদাবরী-বারি কাঁখে ও মস্তকে লইয়া গৃহে গমন করিতেছে। অনেকে স্নান করিতেছে। গোদাবরীর উভয় তটের দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব! উভয় তটই জনকোলাহলময়। লোকে লোকারণ্য। দক্ষিণবাহিনী গোদাবরী স্বচ্ছস্নিগ্ধপ্রবাহে, ধীরমন্থরগতিতে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিতা। পশ্চিম তটে তরিতরকারী, ফল মূল ও বিবিধ প্রকার শাকসব্জীর বাজার বসিয়াছে। এমন সুন্দর ফল, তরকারী ও শাক

পশ্চিম-ভারতেই দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব তটে বস্ত্রনির্ম্মিত মণ্ডপসমূহের ভিতর তাম্র ও পিত্তল-নির্ম্মিত রন্ধনের তৈজসপত্র, গেলাস, ঘটী, বাটী, থালা প্রভৃতি ও নানা প্রকারের পিত্তল-নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি, পশুপক্ষীর মূর্ত্তি, এবং বহুবিধ গঠনের তাম্র ও পিত্তলের মিশ্রণে (গঙ্গা-যমুনা) গেলাস, ঘটী, পুত্তলিকা ও শিল্প প্রভৃতি অত্যন্ত সুন্দর। তাম্র ও পিত্তলের এরূপ কারুকার্য্যময় দ্রব্যাদি পশ্চিম-ভারতে আর কোথাও নাই। অন্যান্য বস্ত্রমণ্ডপে আহারের স্থান; তদ্দেশীয় নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইতেছে। চায়ের দোকান; টেবিলের উপর অসংখ্য চায়ের পেয়ালা প্রভৃতি সজ্জিত রহিয়াছে। কত রকমের হালুয়া, কত প্রকার মিষ্টান্ন, কত রকমের সরবত যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইতেছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। মহারাষ্ট্রদিগের আহারের দোকানে কত প্রকার ভাজি প্রস্তুত হইতেছে। বড় বড় থালায় সে সব সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। কড়ি তৈয়ারি হইতেছে। কড়ির কথা পরে লিখিব।

এইবার আমরা গোদাবরীর পশ্চিম তটের (অর্থাৎ যে তীরে বাজার বসে) মন্দিরসমূহ ও দ্রষ্টব্যস্থান দেখিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমেই কপালেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া মহাদেব-দর্শন করিলাম। এখানকার দেবমন্দিরগুলি প্রায় সমস্তই কালো পাথরে নির্ম্মিত ও বিচিত্র-দর্শন! কতকটা দক্ষিণ-ভারতের ও বারাণসীর মন্দিরের আদর্শে গঠিত। মন্দিরগুলি উচ্চবেদিকার উপর প্রতিষ্ঠিত। উঠিবার সিঁড়ি আছে; প্রথমেই জগমোহন বা দেবতা-দর্শনের বারান্দা; তার পরেই মন্দির। কপালেশ্বর দর্শন করিয়া, কালারামের অর্থাৎ, শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির দেখিতে গেলাম। ইহাই নাসিকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। ইহার সবই কালো,—আগাগোড়া সবই কৃষ্ণপ্রস্তরের দ্বারা রচিত। প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকস্থ স্তম্ভমালা—বারান্দা, নাটমন্দির, দেবমন্দির, সোপানাবলী, এমন কি, মন্দির-মধ্যে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের মূর্ত্তিত্রয়—সবই কালো পাথরের। এই মন্দির হইতে অল্প দূরে সীতাগুম্ফা। এবং নিকটেই পঞ্চবটী। পঞ্চবটী পঞ্চবটে শোভিত; অর্থাৎ, পাঁচটি সুদীর্ঘ বটতরুবেষ্টিত একটি ছায়াশীতল স্থানের নাম পঞ্চবটী। পূর্ব্বকালের সেই সুরম্য কাননশোভা এখানে নাই। মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের সেই অপূর্ব্ব বর্ণনাসমূহ মনে পড়িল।—

"ছিনু মোরা, সুলোচনে! গোদাবরী তীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন সম।

* * * *

কুটীরের চারি দিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি !
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিকরাজ ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি ? * *

* * * *

পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরীতটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি ?"

হায়, মহাকালের প্রভাবে সেই প্রাকৃতিক-স্বর্গ—নিবিড়পাদপসমাচ্ছন্ন পঞ্চবটী ভূ-পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে। কেবল নাম ও স্মৃতি আছে—'পঞ্চবটী !' পাঠক, অনেক ভ্রমণকারীই কবি-বর্ণিত পঞ্চবটীর বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু যদি কখনও তাঁহারা এ স্থান দেখিতে আসেন,তাহা হইলে বাস্তব, কল্পনা ও অতিরঞ্জিত বর্ণনার প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন। ভ্রমণকাহিনী যে কাব্য নহে, লিখিবার সময়ে অনেকে এ কথা ভুলিয়া যান।

তৎপরে সীতাগুম্ফা দেখিলাম। একটি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত বাটীর অভ্যন্তরে একটি কক্ষের নিম্নতলে সুড়ঙ্গ-পথ প্রস্তুত করিয়া গুহা প্রস্তুত করা হইয়াছে। একটি অতি সঙ্কীর্ণ সোপান দ্বারা ভূ-গর্ভস্থ গৃহে অবতরণ করিতে হয়। গুহাভ্যন্তরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। পাষাণগাত্রে ক্ষোদিত সীতাদেবীকে অনেকে ফলজলপুষ্পে পূজা করিতেছে,—পয়সা দিয়া প্রণাম করিতেছে। আমিও যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া মহাদেবীর চরণতলে মস্তক লুণ্ঠিত করিলাম। একটি বিষয় চিন্তা করিয়া আমার আপাদ-মস্তক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল! পরমসাধ্বী জননী সীতাদেবীর মহিমা এমনই যে, ভারতের ধনকুবের হইতে সামান্য ভিক্ষুক অবধি জননীজ্ঞানে তাঁহাকে ভক্তি-অর্ঘ্যে চিরদিন পূজা করিতেছে !

এতদ্ভিন্ন রামকুণ্ড ও আরও কয়েকটি মন্দিরে দেব-দর্শন করিয়া বাসায় প্রত্যাগমনকালে একটি দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলাম। এত বড় প্রকাণ্ড মস্তক ইতিপূর্ব্বে আর দেখি নাই। এই প্রথম দেখিলাম। বেলা সাড়ে এগারটার সময় বাসায় প্রত্যাগত হইয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলাম। মহারাষ্ট্র-পরিবারে এই আমার প্রথম আহার। তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, অনেকের নিকট নূতন না হইলেও, সম্ভবতঃ অপ্রীতিকর বোধ হইবে না।

পাণ্ডা মহাশয়ের পরিবারবর্গের মধ্যে তাঁহার ভ্রাতা, তিনটি ভ্রাতুষ্পুত্র, একটি বিধবা ভগ্নী ও তিনটি কিশোরী ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ। তিনি নিজে বিপত্নীক। ভগ্নী রন্ধনকার্য্য করেন; বধূ তিনটি তাঁহাকে রীতিমত সাহায্য করে।

আশ্চর্য্য! ইহাঁদের অণুমাত্র আলস্য নাই। আমি যখনই দেখিয়াছি, তাঁহারা কোনও না কোনও গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা আছেন। আমার বিবেচনায় মহারাষ্ট্র-মহিলাদিগের ন্যায় শ্রমপটু মহিলা ভারতে আর নাই।

বাটীতে স্নানের সময় একটি ভৃত্য বাল্‌তি করিয়া গরম জল, ঘটী প্রভৃতি দিয়া যায়। যদি কোনও সময়ে ভৃত্য অনুপস্থিত থাকে, তাহা হইলে মহিলারাও সে কার্য্যে সহায়তা করেন। কোনও দ্রব্য আবশ্যক হইলে, মহিলাদিগকে বলিলে, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া দেন। তাঁহারা অতিথিসেবায় চির-তৎপর।

ভোজনের নিমিত্ত আমাকে থালা দেওয়া হইল; (আবার সময়ে সময়ে শালপাতাও দেওয়া হইয়াছিল) একটি ঘটীতে পানের জন্য জল রাখা হইল। আমি ভোজনে উপবেশন করিলে একটি কিশোরী বধূ অন্ন আনিয়া (একটি হাতার মাপে) দিয়া গেল। তাহা অতি অল্প। তৎক্ষণাৎ আর একটি বধূ আসিয়া তুপ অর্থাৎ গরম ঘৃত সেই অন্নের উপর ঢালিয়া দিল। পূর্ব্বোক্ত বধূ তৎপরে দাল, নিরামিষ ব্যঞ্জন, এবং দুই প্রকার ভাজি পর পর দিয়া গেল। আমি ভোজনে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু সেই বধূদ্বয় পাকশালার দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া আমার ভোজনকার্য্য দেখিতেছে। সামান্য ভাত দিয়াছিল, শীঘ্রই ফুরাইয়া গেল। কি বলিয়া চাহিব, কারণ, তাহাদের ভাষা অবগত নহি। কিন্তু এ দিকে চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে সেই প্রথমা বধূ সেই হাতায় অন্নপূর্ণার ন্যায় অন্ন দিয়া গেল। আর তাহার পশ্চাতেই দ্বিতীয়া বধূ চকিতের ন্যায় ঘৃত ঢালিয়া দিল। কোনও দ্রব্য চাহিবার আবশ্যক নাই। যতবার ফুরাইবে, ততবার দিবে। সে বিষয়ে তাহাদের তীব্র লক্ষ্য। অন্ন ফুরাইলে অন্ন, ব্যঞ্জন ফুরাইলে ব্যঞ্জন, দাল ফুরাইলে দাল ক্রমাগতই দিতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের আদৌ শ্রান্তি নাই। আমি দেখিয়া বাস্তবিকই বিস্মিত হইলাম। আবার দেখি, রুটী লইয়া আসিয়াছে। এক একখানি গোল বড় রুটী চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া দুই অংশ দিয়া গেল। তৎসঙ্গে দুগ্ধ, মিষ্টান্ন আসিল। রুটী ফুরাইলে আবার রুটীখণ্ড লইয়া আসে। আমি হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া নিষেধ করিলে তবে ক্ষান্ত হয়। কিন্তু তাহাদের ভাষায় বলিতে হইলে 'নাকু' 'নাকু' বলিতে হয়। আমি ঐ কথাটি শিখিয়া লইয়া পরবর্ত্তী আহারের সময়, তাহারা রুটী দিতে আসিলে, যেমন 'নাকু' 'নাকু' বলিলাম, অমনি বিদেশীয়ের মুখে দেশীয় বুলি শুনিয়া তাহারা মৃদুমধুর হাসিতে লাগিল।

নাসিকের ব্রাহ্মণেরা কেহই মৎস্যমাংসভোজী নহেন। তাঁহাদের প্রায় সকলেরই পুরোহিত-বৃত্তি; ধর্ম্মকার্য্য করিয়াই তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এখানে প্রায় দেড় হাজার ব্রাহ্মণ-পুরোহিত সপরিবারে বাস করেন। ইঁহাদের মধ্যে পলাণ্ডুর ব্যবহার নাই, কিন্তু রশুনের চাট্‌নীর ব্যবহার আছে। আমি পাণ্ডার গৃহে একদিন রাত্রে রশুনের চাট্‌নী খাইয়া সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারি নাই; তবুও শীতকাল।

মহারাষ্ট্রদিগের নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যাদি আছে। সকলগুলির নির্দ্দেশ সম্ভবপর নহে। আর আমার ভাগ্যে সকল প্রকার খাদ্যের আস্বাদলাভের সুবিধাও ঘটে নাই। তবে তাঁহাদের খাদ্যবস্তুর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইঁহারা ঝাল ভালবাসেন। অনেক তরকারী ও ভাজি লঙ্কাসহযোগে প্রস্তুত হয়। আচার বিবিধ প্রকারের থাকিলেও, তাহাতে ধনেশাকের প্রচলন অত্যধিক। ধনেশাকে যে কেবলই আচার প্রস্তুত হয়, এমন নহে, অনেক তরকারী ও ভাজিতেও ধনেশাক ব্যবহৃত হয়। বাস্তবিক, ধনেশাক যেন পশ্চিম-ভারতে রাজত্ব করিতেছে! আমিও সে প্রদেশে বহুদিন ভ্রমণ করায় ধনেশাক-প্রিয় হইয়াছি। এখনও বঙ্গদেশে বাজারে গেলে অগ্রেই উহার অনুসন্ধান করিয়া থাকি। 'কড়ি' একটি বৈচিত্র্যময় খাদ্য। ইহা বেসম গুলিয়া, ধনেশাক প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত হয়; আস্বাদ লবণাক্ত, অভ্যাসে মন্দ লাগে না। তিন্তিড়ী, লঙ্কা ও ধনেশাক দিয়াও তরকারী প্রস্তুত হয়। গোধূম, জওয়ারা ও বাজরা প্রভৃতি শস্যের রুটী প্রস্তুত হয়। দধি দুগ্ধের বিবিধ প্রকারের খাদ্য, মিষ্টান্ন ও হালুয়া খাইয়াছি। সকল খাদ্যদ্রব্যই মুখরোচক ও উপাদেয়; তবে কতকগুলি বাঙ্গালীর রসনার প্রিয় না হইতে পারে।

আমি আহারান্তে কিয়ৎ কাল বিশ্রামের পর একটি টাঙ্গা আনাইয়া পাণ্ডুলেনা নামক পর্ব্বতে ক্ষোদিত দেবালয়সমূহ দেখিতে যাত্রা করিলাম। এই পাহাড়-শ্রেণী বোম্বাই-এর পথপ্রান্তে অবস্থিত। নাসিক সহর হইতে দূরত্বে তিন ক্রোশ। আমি পাণ্ডার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে লইয়া টাঙ্গাযোগে পাণ্ডুলেনা গুহাবলী দেখিতে চলিলাম। আমি ইতিপূর্ব্বে উল্লেখযোগ্য পাহাড়-ক্ষোদিত গুহা-মন্দির (Cave Temples) কখনও দেখি নাই। বিহারের রাজগৃহে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা গণনার যোগ্যই নহে। বেলা প্রায় তিনটার সময় পাহাড়-তলে উপনীত হইয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। পাহাড়ের উচ্চতা দুই তিন শত ফিটের অধিক নহে; কারণ, অধিরোহণে বিশেষ শ্রান্তি অনুভব করি

নাই। এই গিরি-অঙ্গে সারি সারি [illegible]৪টি পর্ব্বত-ক্ষোদিত গুহামন্দির আছে। আমি প্রত্যেকটিই ভাল করিয়া দেখিয়াছি। তাহাদের বিস্তৃত বর্ণনা সম্ভবপর নহে, এবং অনেকগুলি একই ধরণের; সুতরাং তাহাদের স্বতন্ত্র বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। আমি অল্পে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গুহার উল্লেখ করিব। একটি গুহার অভ্যন্তরে ৪০ ফিট দীর্ঘ ও ২৫ ফিট প্রস্থ জলাধার আছে। ইহার নাম সীতা-সরোবর। একটিতে গৌতম, কীচক ও বিরাটের মূর্ত্তি রহিয়াছে। একটি গুহার সম্মুখভাগে কারুকার্য্যময়, সুদৃশ্য-স্তম্ভ-সমন্বিত অলিন্দ; স্তম্ভশীর্ষ অতীব মনোহর; সিংহ, ব্যাঘ্র, ষণ্ড ও অপর একটি জন্তুর মূর্ত্তির দ্বারা অলঙ্কৃত; অভ্যন্তরে ৪০ × ৪০ ফিট হল; চারি দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষসংবলিত দালান। কোনটিতে হস্তিমূর্ত্তি, কোনটিতে হনুমান, কোনটিতে শিলালিপি, কোনটিতে গাভী, ব্যাঘ্র ও হস্তী। তাহার পরে আবার একটি প্রকাণ্ড হল (৪৫´ × ৪৫´) ইহার স্তম্ভগুলি নানা জন্তুর মূর্ত্তির কারুকার্য্যে শোভিত—তলদেশ বড় বড় কুম্ভসদৃশ জলপাত্রের ন্যায়। কতকগুলি গুহায় বুদ্ধমূর্ত্তি বিরাজিত। একটিতে ইন্দ্রসভা, ইহা একটি গুহার উপরে। অপর একটি গুহায় ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদিগের মূর্ত্তি-সমন্বিত সভা। একটি মধ্যাকৃতি সুদৃশ্য শিল্পযুক্ত স্তম্ভশোভিত গুহায় মহাদেব অবস্থান করিতেছেন। একটি গুহার অভ্যন্তর ঠিক গির্জ্জার মত। ভিতরের সমস্ত স্তম্ভের তলদেশ কুম্ভাকৃতি—বড়ই সুন্দর বাহ্যদৃশ্য! ছাদ গোল, অর্দ্ধ-অণ্ডাকৃতি (oval); এতদ্ভিন্ন নানা গুহায় নানা পৌরাণিক মূর্ত্তি ও বুদ্ধমূর্ত্তি বিরাজিত। একটীতে দ্রৌপদী—দুই পার্শ্বে ভীমার্জ্জুন, দ্বারদেশে গদা ও ধনু অবস্থিত। এই অসংখ্য বুদ্ধমূর্ত্তি ও নানা প্রকার উৎকীর্ণ মূর্ত্তি-শোভিত গুহাবলী দর্শন করিয়া আমরা পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রসভা নামক গুহার সম্মুখভাগে উপবেশন করিয়া বিরাম উপভোগ করিতে লাগিলাম। স্নিগ্ধসমীর আমার ঘর্ম্মাক্ত ললাটদেশ স্পর্শ করিতে লাগিল। বড়ই তৃপ্তি ভোগ করিলাম। তখন অপরাহ্ণ ঢলিয়া পড়িয়াছে—'অস্তগামী ভানুপ্রভা' ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া আসিতেছিল। ইন্দ্রসভা হইতে নিম্নস্থ নাসিক প্রদেশ একটি বিশাল তৃণ-তরু-লতা-বর্জ্জিত পীতমরুখণ্ডবৎ প্রতীয়মান হইতেছে—মধ্যে মধ্যে শ্যামল বৃক্ষগুলি যেন হরিদ্রা বর্ণের বস্ত্রের উপর হরিত ছীটের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল! আমার মনে হইল, এই নির্জ্জলা ভূমি সুফলা হইল কিরূপে? এত তরিতরকারী, ফল, পুষ্প কিরূপে উৎপন্ন হয়? নাসিকের মৃত্তিকা কি রসময়ী?—যাহা হউক, গিরিশিখরে আর অধিক বিলম্ব করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া, অবতরণ করিতে লাগিলাম।

২৫শে জানুয়ারী, রবিবার, ১৯১৪।—প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া গোদাবরীর পরপারে, অর্থাৎ, পশ্চিম তটে তপোবন-দর্শনে যাত্রা করিলাম। সঙ্গে সেই পথপ্রদর্শক কিশোর বালক। নদীর পশ্চিম তট হইতে তপোবন দুই মাইলের কিছু অধিক; তপোবন দক্ষিণ-পশ্চিমাভি-মুখে গোদাবরীতটেই অবস্থিত। প্রবাদ,—সেইখানেই রামানুজ লক্ষ্মণ রাবণ-ভগ্নী স্থূর্পনখার নাসিকা কর্ত্তন করেন। রাত্রির সুশান্ত নিদ্রায় শরীর বেশ সচ্ছন্দ—মনও স্ফূর্ত্তিযুক্ত। পথপ্রদর্শকের সহিত নানা কথা কহিতে কহিতে, পথ-চিত্র দেখিতে দেখিতে, পদব্রজে চলিয়াছি। গ্রাম্যপথ—চলিতে চলিতে বিস্তর ফণীমনসা ও তেকাটাশিরের গাছ পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। পথি-মধ্যে এক স্থানে মারুতি-নন্দনের মন্দির দেখিলাম। মন্দিরমধ্যে প্রকাণ্ড হনুমানজীর মূর্ত্তি। মধ্যে মধ্যে এক একটি তেকাটাশির কিংবা ফণীমনসার বৃক্ষের নিকট প্রস্তর-নির্ম্মিত সুদীর্ঘ সর্পমূর্ত্তি ফণা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। দেখিয়া বোধ হইল, এ দেশে নাগপূজাও প্রচলিত। পথের দৃশ্যাবলী মনোরম না হইলেও অসহনীয় নহে। পথ অতিক্রম করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে রাম-সীতার মন্দির, সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্মশালা, ছোট ছোট মন্দির ও মঠ, বেদিকা প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। একটি বড় ধর্ম্মশালার পশ্চাদ্-ভাগে একটি উদ্যানমধ্যে দ্রাক্ষাকুঞ্জ দেখিলাম। গাছগুলি বেশ শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে সন্নিবিষ্ট। প্রত্যেক দ্রাক্ষালতায় গুচ্ছ গুচ্ছ হরিতমুক্তানিভ দ্রাক্ষাফল ঝুলিতেছে। বৃক্ষগুলি উচ্চতায় অধিক নহে; দাঁড়াইয়া ফল পাড়া যায়। দুই চারিটি দ্রাক্ষাফল পাড়িবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। ফল এখনও পাকে নাই, আস্বাদনে বেশ অম্লরস অনুভূত হইল। তখন 'Grapes are sour' মনে পড়িল! ক্রমে গোদাবরীতটে উপনীত হইয়া দেখি, নদীবক্ষ রুক্ষ-পাষাণময়; নদীগর্ভস্থ অনুচ্চ পাষাণকুঞ্জ হইতে প্রপাতের ন্যায় জলধারা পতিত হইতেছে। এখানেও বাইদিগের পাষাণের উপর বস্ত্র ধৌতকরণের পটাপট্ চটাচট্ শব্দ দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতেছে! এই স্থানের নদীতীরের বনশোভা প্রীতিপ্রদ। এখানেও নদীগর্ভে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুণ্ড আছে। নদীগর্ভস্থ পাষাণস্তূপের মধ্যে একটি কুণ্ডের নিকট রাম-সীতার মূর্ত্তি ও অপর একটি কুণ্ডের নিকট কপিল মুনি ও কপিলা গাভীর মূর্ত্তি, এবং অদূরে একটি শিবলিঙ্গ ও বৃষভমূর্ত্তি রহিয়াছে। এখানে প্রস্তরে উৎকীর্ণ লক্ষ্মণ রাক্ষসী স্থূর্পনখার নাসিকা ছেদন করিতেছেন। অনেকে

পূজা দিতেছে; কেহ বা পয়সা দিতেছে। মূর্ত্তিগুলি অনাবৃত নদীবক্ষে বিরাজিত। বর্ষাকালে সমস্তই জলমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যায়। স্থানীয় সাধারণ লোকেরা বলে যে, সূর্পনখার নাসিকা হইতেই শ্রীরামচন্দ্রের চিরস্মৃতিময় মহা-তীর্থের নাম 'নাসিক' হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, নয়টি পর্ব্বতের উপর নগরী প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহার নাম নাসিক। নাসিকই পশ্চিম-ভারতের বারাণসী; গোদাবরীই এ দেশে গৌতমীগঙ্গা বলিয়াই পূজিতা। এ দেশে গঙ্গা অপেক্ষাও গোদাবরীর মাহাত্ম্য অধিক। আমি তপোবনেই স্নানাদি শেষ করিয়া বেলা ১১টার সময় বাসায় প্রত্যাগত হইলাম।

অপরাহ্ণে নগরদর্শনে বহির্গত হইলাম। নগরীর অধিকাংশ পথই অপ্রশস্ত, গলির মত। দুই চারিটি চওড়া রাস্তাও আছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে নানাবিধ পিত্তল ও তাম্রনির্ম্মিত দ্রব্যের উজ্জ্বল বিপণী শ্রেণী—ঘড়ীর দোকানও বিস্তর। চা, লেমনেড, সরবতের দোকান হইয়াছে। নগরীমধ্যে একটি নাট্যশালা আছে। প্রত্যহ রাত্রেই অভিনয় হয়। ইতরসাধারণ দোকানদার, ফেরীওয়ালা, টাঙ্গাচালক, ট্রাম-কনডাক্‌টার প্রভৃতি সকলেই নাটক দেখিতে যায়। শুনিলাম, ইহারাও চা, লেমনেড ও সিগারেটের শ্রাদ্ধে বিলক্ষণ পটু হইয়াছে। সহরের স্থানে স্থানে রক্তবর্ণ মৃত্তিকায় নির্ম্মিত দশভুজা দুর্গার মূর্ত্তি দেখিলাম। গণেশের মূর্ত্তিতে নাসিক পরিব্যাপ্ত। কালভৈরবও আছেন।

ক্রমে গোদাবরীতীরে উপনীত হইলাম; নদীতট প্রভাতের ন্যায় তেমনই জনপূর্ণ—কোলাহলময়। নদীতটে অনেক প্রস্তর-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাধি দেখিলাম। প্রত্যেক সমাধির উপরে দুইটি করিয়া চরণ-চিহ্ন ক্ষোদিত রহিয়াছে। কর্পূরথালার মহারাজের স্মৃতিস্তম্ভ নদীতটে অবস্থিত। ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার স্মৃতি-কাহিনী স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ। স্তম্ভের চারি দিকে চারিটি সিংহের মুণ্ড সংলগ্ন।

নগরীপ্রান্তে সোণারালী নামক সমুচ্চ মৃত্তিকাস্তূপের উপর হইতে নাসিক নগরীর চতুঃপার্শ্বস্থ দৃশ্য অবলোকন করিলাম। দৃশ্য বড়ই বিচিত্র। অস্তাচল-চূড়াবলম্বী সূর্য্য-করে দূরস্থিত ভগ্ন দুর্গকিরীট, নগ্ন গিরিরাজি, নদী, তরু, প্রান্তর ও নগরীশোভা বড়ই মনোহারিণী। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে দীপ-মালিনী গোদাবরীর তীর পরিক্রমণ করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

২৬শে জানুয়ারী, সোমবার, ১৯১৪।—অদ্য প্রভাতে পুণ্য-গোদাবরীর হিম-স্নিগ্ধ নীরে অবগাহন করিয়া, রামকুণ্ডের উপকূলে বসিয়া আমার স্বর্গগত পিতৃদেবের শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলাম।

বেলা চারিটার পূর্ব্বে আমার পাণ্ডাপ্রবর ব্যস্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন, 'এতক্ষণ শয়ন করিয়া করিতেছেন কি? শীঘ্র উঠুন, সত্বর গোদাবরী-তীরে গিয়া রামকুণ্ডের নীরে কপালেশ্বর মহাদেওজীর স্নানদৃশ্য দর্শন করুন। বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র যান।' আমি বলিলাম, 'সে কিরূপ?' পাণ্ডা বলিলেন, 'বলিবার সময় নাই, গিয়া দেখুন, সে অপূর্ব্ব ব্যাপার!' আমি আর কোনও উত্তর না করিয়া, ধড়মড় করিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম; তাড়াতাড়ি অলষ্টারটা টানিয়া স্কন্ধে ফেলিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্রুতপাদবিক্ষেপে গোদাবরীর রামকুণ্ডের নিকটে উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখি—অবাক কাণ্ড! কুণ্ডের চারি দিকে লোকে লোকারণ্য! বালক বালিকা, যুবক যুবতী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, নানা শ্রেণীর নরনারী রামকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে গিস্-গিস্ করিতেছে! বহু কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া কুণ্ডতীরে একটু সুবিধামত স্থানে (অর্থাৎ যে স্থান হইতে সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়) গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, মন্দির হইতে বিবিধ বাদ্যভাণ্ড সহকারে দেবাদিদেব মহাদেব কপালেশ্বর সজ্জিত শিবিকায় মহাসমারোহে রামকুণ্ডের উত্তর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাঠক, মনে করিবেন না যে, পাল্‌কীতে শিবলিঙ্গ আসিলেন; শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে সকল দেশেই একই ব্যবস্থা; 'শিবলিঙ্গং ন চালয়েৎ।' তবে আসিলেন কে? আসিলেন, তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, অধরোষ্ঠ-সংবলিত, সর্পজটা-বিভূষিত, রৌপ্যনির্ম্মিত, অনিন্দ্যসুন্দর ফাঁপা মস্তক। সন্ধ্যার সময় মহাদেবের শৃঙ্গার-বেশের সময় এই রৌপ্যনির্ম্মিত মস্তক শিবলিঙ্গের উপর বসাইয়া দিয়া, নানা পুষ্পালঙ্কারে আভরণে অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

পুরোহিত কুণ্ডতীরে বসিয়াছিলেন। দেবাদিদেবের পাল্‌কী উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাঁহাকে অবতরণ করাইয়া একটি সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। তূরী, ভেরী, শৃঙ্গ, দামামা, বাঁশী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনি ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। তৎপরে পুরোহিত মহাশয় শিবের মস্তকে, দুগ্ধ, জল, চন্দন প্রভৃতি নানা সৌগন্ধসম্ভার ঢালিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি ঐ শিব-মস্তক রামকুণ্ডের নীরে ভাসাইয়া দিলেন। মস্তক জলে ভাসিতে ভাসিতে চলিল! উপস্থিত জনসঙ্ঘের উল্লাস দেখে কে? আবালবৃদ্ধবনিতা দুই হস্তে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া, কুণ্ড হইতে জল তুলিয়া মহাদেবের মস্তক লক্ষ্য করিয়া সজোরে কুণ্ডের জলে ছিটাইতে লাগিল। তাহাদের উল্লাস-ধ্বনি গগন

কম্পিত করিয়া তুলিল! শিবমস্তক যতই ভাসিয়া অগ্রসর হয়, সন্নিহিত নর-নারীবৃন্দ ততই মহোল্লাসে অঞ্জলিসঞ্চিত জল ছুঁড়িতে থাকে। কতকগুলি ব্রাহ্মণ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া শিবমস্তকের সঙ্গে সঙ্গে সন্তরণ করিতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে শিবমস্তক সলিল হইতে উত্তোলিত হইল। পুরোহিত পুনর্ব্বার সেই মস্তক মাল্যচন্দনে ও নানা পুষ্পস্তূপে সুসজ্জিত করিয়া, প্রজ্বলিত দীপদামে আরতি আরম্ভ করিলেন। তৎপরে মহাদেব পাল্‌কী আরোহণে, বাদ্যধ্বনি ও জনমণ্ডলীর উচ্চ জয়ধ্বনি সহকারে, মন্দিরে প্রত্যাগমন করিলেন। বস্তুতঃই কপালেশ্বর মহাদেবের স্নান-দৃশ্য অপূর্ব্ব! পাণ্ডা মহাশয় আমাকে না জানাইলে, আমার ভাগ্যে দর্শন ঘটিত না।

কপালেশ্বর মহাদেবের মন্দির ছয় শত বৎসরের পুরাতন। নাসিকের ইহাই প্রাচীনতম মন্দির। পঞ্চাশটি সোপান ভাঙ্গিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। সুন্দরনারায়ণের মন্দির অতি সুন্দর। এতদ্ভিন্ন নারোশঙ্কর, তিলভাণ্ডেশ্বর, ত্রিপুরেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, শঙ্কর, গোরারাম, মুরলীধর ও বালাজীর মন্দিরসমূহও উল্লেখযোগ্য। এখানে অহল্যাবাই-এর নির্ম্মিত তিনটি দেবমন্দির আছে। কাশীর ন্যায় অসংখ্যমন্দিরময়ী ও ঘাটশ্রেণীমেখলা নগরী না হইলেও নাসিক অতীব মনোরম, শান্তরসাস্পদ ও তৃপ্তিপ্রদ উজ্জ্বল নগরী। এখানকার জলবায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর। এ অঞ্চলের অনেকেই জলবায়ুপরিবর্ত্তনের নিমিত্ত নাসিকে বাস করেন। অসংখ্য যাত্রী ও সাধু সন্ন্যাসী প্রতিদিন যাতায়াত করিতেছেন। গোদাবরীতীরে তাঁহাদের নিমিত্ত সুদৃশ্য ধর্ম্মশালাসমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে। কার্ত্তিক মাসে মহামেলা হয়। তখন এখানে প্রায় পাঁচ ছয় লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। গোদাবরীর তটযুগশোভিনী শুভ্র ধর্ম্মশালা, হর্ম্ম্যমালা ও মন্দিরমঠ বড়ই মনোহর ও নয়নরঞ্জন।

নাসিকে আমি যে বাড়ীতে ছিলাম, ঠিক তাহার অপর পার্শ্বে একটি ব্রাহ্মণ তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী পত্নীকে লইয়া বাস করিতেছিলেন। আমি সতত তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতাম। পতি পত্নীকে ছাড়িয়া কোথাও গমন করেন না। গৌরাঙ্গীর একটি শিশু হইয়াছে, তাঁহার স্বামী কেবল তাহাকে ক্রোড়ে লইয়াই থাকেন। আর সুন্দরী কেবলই দোলনায় দুলিতেছেন, এবং কেশপ্রসাধনে ও অঙ্গরাগে নিমগ্ন হইয়াই আছেন। কচিৎ দুই জনে একত্র বেড়াইতে বাহির হন! এই কপোত-কপোতী-যুগলকে দেখিয়া আমার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি কজরীগীতির দুই ছত্র মনে পড়িত;—

"গোরি, চলো বাগ্ মে,
তোঁহে হাওয়া খিলাই না।
বন্ বন্ মে আম কে ডারিয়া পর,
তোঁহে ঝুলাই না॥"

নাসিক হইতে ত্র্যম্বকেশ্বর প্রায় দশ ক্রোশ। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম ত্র্যম্বক তথায় বিরাজ করিতেছেন। আমি নাসিক হইতে ২৭শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার, অতি প্রত্যুষে টপালে ত্র্যম্বকেশ্বর যাত্রা করিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

বৈষ্ণব-কবিতা।

প্রথম বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রও, বৈষ্ণব-কবিতা লইয়া হঠকারিতা করিয়াছিলেন। তাঁহার এক ইংরাজী বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, কতকগুলি নিকৃষ্ট-রুচি ব্যক্তির মনোরঞ্জনের জন্য, কতকগুলি ক্ষমতাশালী চাটুকার কবি, বৈষ্ণব কবিতারূপ আবর্জ্জনার আমদানী করিয়াছে। বৃন্দাবনলীলা সম্বন্ধেও তাঁহার ঐরূপই অভিমত ছিল, এবং সে মতটা একটু বেশী বয়স পর্য্যন্তও ছিল।

আমাদের ভবিষ্যৎ সাহিত্য-মহারথ তখন পাশ্চাত্য সাহিত্যের সৌরভে এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, যে কাব্যের রচয়িতা জন্মযোগী শুকদেব, শ্রোতা মৃত্যু-প্রতীক্ষায় উপবিষ্ট মোক্ষার্থী রাজা পরীক্ষিত, স্থান গঙ্গাতীর, এবং বিষয় ভগবৎপ্রসঙ্গ, উহা নিকৃষ্টরুচি ব্যক্তিদিগের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত হইতে পারে কি না, তাহা চিন্তা করিবার অবসর পান নাই। যদি বা শুকদেব রচয়িতা না হন, তবু যে ব্যক্তি এইরূপ বক্তা, শ্রোতা, বিষয় ও স্থান নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, তিনি কখনই নিকৃষ্ট-মনা ব্যক্তি নহেন।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ গায় শোনে পরম আনন্দ।

যিনি পবিত্রতার অবতার, সেই মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব যে সকল গান শুনিয়া গায়িয়া, নাচিয়া আনন্দে বিভোর হন, কোনও মানুষের মাথার উপর এমন মাথা নাই যে, সেই সকল গানকে কুরুচির সৃষ্টি বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারে।

আজি চারি শত বৎসরের অধিক কাল হইতে যে সকল সঙ্গীত বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় ধর্ম্ম-সঙ্গীতরূপে সমাদৃত, যাঁহাদের চরিত্রের ছায়ামাত্র পাইলে

জীব কৃতার্থ হয়, এমন সহস্র সহস্র বৈষ্ণব সাধু যে সকল সঙ্গীত দ্বারা সচ্চিদানন্দ-ঘন ভগবানের উপাসনা করেন, এবং যে সকল সঙ্গীতের ভাবে অশ্রুকম্পপুলকে অভিভূত হন, সেগুলি যে কুরুচিপূর্ণ, এমন উক্তি খুবই দুঃসাহসিকের কর্ম্ম। বলা বাহুল্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনে তাঁহার এই পূর্ব্বমতের প্রায় আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

বাঙ্গালার অমর কবি, অপূর্ব্ব-প্রতিভাশালী, বাণীর বরপুত্র মাইকেল মধুসূদনও বৈষ্ণব-কবিতা সম্বন্ধে বিষম ভুল করিয়াছেন। বৈষ্ণব-কবিতা তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল, তাই তিনি উহার অনুকরণ করিয়া 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য' লিখিয়াছেন। 'ব্রজাঙ্গনা' নব্য-বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "ললিতকাব্য", কিন্তু ব্রজাঙ্গনা বৈষ্ণব-কবিতা নহে।

"যে যাহারে ভালবাসে,
সে যাইবে তার পাশে,
মদন রাজার বিধি—
লঙ্ঘিব কেমনে?"

ইহা ত বৈষ্ণব-কবিতা নহেই, হিন্দু-কবিতাও নহে। ইহা স্বাধীন প্রেমের ধুয়া। রাধাকৃষ্ণের প্রেম, আধুনিক স্বাধীন প্রেম (Free love) নহে। এইটা না বুঝিতে পারিয়াই যত ভুলের উৎপত্তি হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ মদন-মোহন, শ্রীমতী মদন-মোহন-মোহিনী। "ধনী যে দিকে পয়ান করে, মদন পলায় ডরে"। বৃন্দাবনে কামের স্থান নাই। গোপীর প্রেম কাম-গন্ধশূন্য। রাসপঞ্চাধ্যায়ীর ফল-শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, রাসলীলা পাঠ বা শ্রবণ করিলে "হৃদ্‌রোগ কাম বিনষ্ট হয়।" আর আমাদের মধুসূদন লিখিয়াছেন;—

"যদি অবহেলা করি, রুষিবে সম্বর-অরি
কে সম্বরে স্মর-শরে এ তিন ভুবনে?"

ছি, ছি! আদ্যাশক্তি, পরমা-প্রকৃতি, সতী-শিরোমণি, বৈষ্ণবারাধ্যা শ্রীমতীর মুখে কি এমন কথা বলাইতে আছে?

সাধু বৈষ্ণবদিগের সঙ্গ না ঘটায়, এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম না বুঝায়, বুঝিবার চেষ্টা না করায়, বৈষ্ণব-কবিতার শত্রু মিত্র উভয় পক্ষই বিষম গোল করিয়াছেন।

বঙ্গ-গৌরব কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কোনও কোনও রকমের কবিতার সঙ্গে কেহ কেহ বৈষ্ণব-কবিতার তুলনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বৈষ্ণব-কবিতা অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে উচ্চতর স্থান প্রদান করেন।

এই শ্রেণীর সমালোচকদিগের সমালোচনার প্রণালীটা কিছুই বুঝা যায় না। আমরা এই মোটা কথা বুঝি যে, ন্যাংড়া আম ও রসগোল্লা, এই উভয়ের যেমন

তুলনায় সমালোচনা চলে না, সেইরূপ বৈষ্ণব-কবিতার সঙ্গে অন্য কোনও কবিতার তুলনা হয় না। এক-জাতীয় বস্তু না হইলে তুলনা কি করিয়া করিবে? বৈষ্ণব-কবিতা যে একান্তই ভিন্ন-জাতীয়। কালিদাস, মাঘ, ভারবি, ভবভূতি, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, বঙ্কিম, হেম, নবীন, দ্বিজেন্দ্র, রবীন্দ্র, কাহারও সহিতই ইহার মেল-বন্ধন নাই। বৈষ্ণব-কবিতা একাই এক। যদি ইচ্ছা কর, তবে বলিতে পার যে, কাব্য-রাজ্যে বৈষ্ণব-কবিতা একান্তই একঘরে।

আমরা যে চক্ষে বাঙ্গালা কাব্য ও কবিতার রূপ দেখি, সে চক্ষে দেখিতে গেলে, বৈষ্ণব-কবিতা অতি নিম্ন শ্রেণীর কবিতামাত্র। একমাত্র অশ্লীলতা দোষে বৈষ্ণব-কবিতার সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

যে যে স্থানে স্পষ্ট অশ্লীলতা নাই, সে সকল স্থানেও প্রেম বড়ই স্থূল, বড়ই মোটা, একান্তই শারীরিক লালসার পূতিগন্ধময়; মিলন শুধু শারীরিক-মিলন। সুতরাং শুধু খাতির করিয়া কিংবা চক্ষুলজ্জায় বৈষ্ণব-কবিতাকে ভাল বলিবার প্রয়োজন কি? সমালোচকের দৃষ্টিতে উহা বিদ্যাসুন্দরের মতন অপাঠ্য। সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা গলিত-কুষ্ঠ-রোগিণী রমণী যেমন অস্পৃশ্যা, বৈষ্ণব-কবিতাও সেইরূপই।

এরূপ সমালোচনা বেশ রোখা চোখা, কিন্তু "হাঁ, বৈষ্ণব-কবিতা খুব উৎকৃষ্ট কবিতা বই কি, কিন্তু বড়ই শারীরিক-প্রেমজ", এইরূপ মন-রাখা কথার কোনও অর্থই হয় না। বৈষ্ণব-কবিতাকে হয় বলিতে হইবে অতি নিকৃষ্ট, নতুবা বলিতে হইবে অত্যুৎকৃষ্ট; অন্যথা বলিতে হইবে বৈষ্ণব-কবিতা বুঝিতে পারিলাম না। মাঝামাঝি কোনও মীমাংসা নাই।

বৈষ্ণব-কবিতার সর্ব্বস্বই রাধাকৃষ্ণের প্রেম; তাহা শুনিয়া লোকেরা ভক্তি-ভাবে গদ্‌গদ হয় কেন? বিদ্যাসুন্দরও ত বাঙ্গালার প্রেম-কাব্য, উহাও অসাধারণ শক্তিশালী কবি কর্ত্তৃক রচিত, বিদ্যাসুন্দরের মিলন-সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কেহ ত ভক্তিতে অশ্রু-বিসর্জ্জন করে না।

"শ্যামচাঁদ চাঁদ চাঁদের বামে
চাঁদবদনী দাঁড়াল,
কাচে বেড়া কাঞ্চন, কাঞ্চন বেড়া কাচে,
রাধাশ্যাম দু'হো তনু এক হ'য়ে আছে।"

এই সঙ্গীত শুনিয়া নির্ম্মল-চরিত্র ভক্তের মনে যে ভাবের ও যে রসের সঞ্চার হয়, বিদ্যাসুন্দরের মিলন-সঙ্গীতে কাহারও মনে সে ভাবের সঞ্চার হয় কি?

"ব্রজগোপীর নেত্র যেন
ভ্রমরার পাঁতি,
কৃষ্ণ মুখ নীলপদ্মে
পড়ে মাতি মাতি।"

এই সঙ্গীতে গায়ক ও শ্রোতা, উভয়ের শরীর মন রসাবেশে অবশ হয়, চক্ষের চাহনী বদলাইয়া যায়। বিদ্যা ছাদের উপর হইতে নায়ক দর্শন করিতেছেন, তাহারও চক্ষু মুগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাহা লইয়া কেহ ত কাঁদে না, কেহ ত ঐ ভাবের সাধনা করে না। উভয়ই ত বাঙ্গালা শ্রেষ্ঠতম কবির রচনা।

শুধু রচনার তাৎপর্য্যই বৈষ্ণব-কবিতার সর্ব্বস্ব নয়। মহাকবি কালিদাসের একটী অত্যুৎকৃষ্ট কবিতার বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে যত্ন করিব; অনুবাদ শুনিয়া মূল কবিতাটী অনেকেরই মনে পড়িবে;—

কুচযুগভারে যেন অল্প আকুঞ্চিতা,
তরুণ-অরুণ-বর্ণ-বাস-পরিহিতা,
পর্য্যাপ্ত-কুসুম-গুচ্ছ-ভারে অবনত
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতাটীর মত।

একটী বৈষ্ণব-কবিতায় শ্রীমতীর রূপবর্ণনা এইরূপ,—

"অপরূপ পেখনু বামা,
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল
হরিণীহীন হিমধামা।
* * *
গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশিয়ে
গীম গজমতিহারা,
কাম কম্বু ভরি, কণয়া শম্ভু পরি
ঢারত সুরধুনীধারা।"

এখানে দুইটী বর্ণনার মধ্যে কোন্‌টী উৎকৃষ্ট, তাহা দেখাইবার জন্য আমি উদ্ধৃত করি নাই। কালিদাসের বর্ণনাটীও যে খুব সরস, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু উহা লইয়া কেহ ভক্তিসাধনা করে না। কিন্তু বৈষ্ণব-কবিতাটী যখন গীত হয়, তখন সভাস্থলে ভাবের বন্যা প্রবাহিত হয়।

অন্যান্য কাব্যের নায়কনায়িকাদিগকে যদি পাঠক পাঠিকা পছন্দ করেন, তবে তার ফল এই হয় যে, পাঠকগণ আপনাকে নায়কের অনুকরণে এবং আপনার প্রণয়িনীকে নায়িকার অনুকরণে গঠিত করিতে চাহেন; আবার পাঠিকারাও আপনাদিগকে নায়িকার এবং প্রেম-পাত্রদিগকে নায়কগণের অনুকরণে গঠিত করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু বৈষ্ণব-কাব্যের ভক্তগণ—স্ত্রীপুরুষ কেহই রাধা কিংবা কৃষ্ণ হইতে চাহেন না, তাঁহারা সখীর অনুগত হইয়া রাধাকৃষ্ণ-লীলা দেখিতে চাহেন, তাঁহারা উভয়ের রূপেই সমান মুগ্ধ।

"কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়",
এ কথা বলিয়া কেন,
গৌরাঙ্গ কাতর হেন,
ঝর-ঝর আঁখিনীরে গণ্ড ভেসে যায়?
পুরুষের সে রূপ কেমন,
যে রূপে পাগল করে পুরুষের মন?

কেউ কি দেখে নাই শিখিচূড়া?
দেখেনি শ্যামল পৃষ্ঠে পীত-ধড়া উড়া?
কেউ কি শুনে নাই মোহন বাঁশী?
দেখে নাই কি বিম্বাধরে সুমধুর হাসি?
কেউ কি দেখে নাই কদমতলা?
পাঁচন হাতে রাখালগণের গোপাল
নিয়ে চলা?

কেমন ধারা পুরুষের সে শোভা ?
যুগে যুগে যোগি ঋষি ভক্ত মনোলোভা ?
বল সখি এ কেমন প্রীতি,
পুরুষ-রূপে পুরুষের এ হেন পিরিতি।

সখি আমরা না হয় কুলবালা,
কালো রূপে ঝাঁপ দিয়ে জুড়ায়েছি জ্বালা।
সই, পুরুষের সে রূপ কেমন
যে রূপে পাগল করে পুরুষের মন ?

কোন্ নাটকের নায়কের রূপে পুরুষের এবং নায়িকার রূপে স্ত্রীলোকের চিত্তকে এরূপ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে ?

"সখি, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

রূপ গুণ না জানিয়া নামটা যে কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল, এবং প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিল, ইহার কারণ কি ? অলঙ্কারশাস্ত্র মতে কোন্ জাতীয় নায়কের নামের এমন গুণ থাকে ?

কালিদাস ত প্রাণপণে রতিবিলাপ লিখিয়াছেন, ব্রজবিলাপের সঙ্গে কোনও অংশে তুলনা হয় কি ? বৈষ্ণব-কবিদের অনুকরণ করিয়া আমাদের কবিওয়ালা-গণ যে সকল গান রচিয়াছেন, তাহাও দেশের লোকের প্রাণে লাগিয়া আছে। একটী কবিগানে শ্রীমতী বলিতেছেন,—

"বিচ্ছেদ বিরহে, যদি প্রাণ না রহে,
এই ক'রো তোমরা সখী সকলে,
আমার কৃষ্ণবিলাসের দেহ
দগ্ধ করো না কেহ,
দেহ বাঁধিয়া রেখো তরু তমালে।"

মানবদেহ অসার বস্তু, বিশেষতঃ মৃতদেহ ঘৃণিত জিনিস, কিন্তু আমার দেহ যে কৃষ্ণবিলাসের দেহ, তাই ইহাকে পোড়াইতে মানা, আমার প্রিয় তমাল ভাল-বাসিত, বিশেষতঃ শ্যাম ও তমাল উভয়ই কালো, তাই তমালে বাঁধিয়া রাখিও।

আর একটী কবিগানে আছে, উদ্ধব ব্রজ হইতে ঘুরিয়া আসিয়া কৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

"দেখে এলেম শ্যাম, তোমার বৃন্দাবনধাম
কেবল নাম আছে।
সেথা বসন্ত ঋতু নাই, কোকিল নাই, ভ্রমর নাই,
জলেতে কুমুদ কমল নাই,
শুধু রাই কমল ধূলায় প'ড়ে রয়েছে।

যেমন প্রেম, তেমনই বিরহ। সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য রসের চরম বিকাশ

দেখাইতে সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবান্ ব্রজভূমে প্রকাশিত। তাই সখ্যে, বাৎসল্যে, মাধুর্য্যে বৃন্দাবন রসময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই তিন রসের পূর্ণাদর্শ প্রকাশিত করিয়া সর্ব্বচিত্তাকর্ষকরূপে ঠাকুর বৃন্দাবনে ত্রিভঙ্গ হইয়াছেন; গোলোক, মথুরা, দ্বারকা, কোথায়ও এই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা নাই। মা যশোদার বাৎসল্য, ব্রজ রাখালের সখ্য, এবং ব্রজগোপীর প্রেম জগতে অতুলনীয়। এই তিনটী রসের আদর্শ-প্রতিষ্ঠার জন্যই শ্রীভগবান আপনাকে "সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন" করিয়াছেন।

যেখানে রাধাকৃষ্ণের রূপে নরনারী সবাই সমান মুগ্ধ, সেখানে অশ্লীলতার স্থান কোথায়? অশ্লীলতাটা মনের ভাবের উপরেই নির্ভর করে। আমাদের কোনও কোনও দেবী পূর্ণযৌবনা উলঙ্গিনী। সে মূর্ত্তি দেখিয়া কেহ অশ্লীল মনে করে না, সকলেই মা বলিয়া ভক্তি করে; অথচ নৃত্যপরায়ণা মিস্ মড্‌কে দেখিয়া হিন্দুমাত্রেরই মনে লজ্জা ও ঘৃণার সঞ্চার হয়। পিতা পুত্র, মাতা কন্যা, একই সভায় রাধাকৃষ্ণলীলা শ্রবণ করেন, কাহারও মনেই সঙ্কোচ নাই, বরঞ্চ নয়নে অশ্রু দেখা যায়।

যদি কেহ বলেন যে, হিন্দুদের অশ্লীলতাবোধ নাই, তাদের মন এখনও পশুর মতনই আছে, এ কথার উত্তর এই যে, তবে তাহারা মিস্ মডের নগ্ন-নৃত্যের কথা শুনিয়া ঘৃণায় জিভ্ কাটে কেন? আর ত্রৈলঙ্গ স্বামী বা ভাস্করানন্দ স্বামী সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকিতেন, হিন্দু নরনারী ভক্তিভরে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেন, অশ্লীল ভাব কাহারও মনে আসিত না কেন? কাহারও মনে যে না আসিতে পারে, তাহা নয়; সেরূপ লোক কৃষ্ণলীলাশ্রবণের ও সাধুদর্শনের অধিকারী নহে।

বৈষ্ণব-কবিতার অশ্লীলতা সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে অধিক কিছু বলিবার অবসর নাই,

"রাই অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে শ্যাম দাঁড়াল"

এ কথা শুনিয়া কেন যে সাধকের প্রাণমন পুলকিত হয়, শরীরে সাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হয়, তাহা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া উহাকে অশ্লীল বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া একান্তই হাল্‌কা বুদ্ধির কার্য্য।

যিশুখৃষ্ট জীবের কল্যাণের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বে এবং পরে শত শত কেন, সহস্র সহস্র লোক জগতের কল্যাণের জন্য, সত্যপ্রচারের জন্য, প্রাণ দিয়াছেন। যিশুখৃষ্টের ক্রুশারোহণের কথা গাহিয়া লোকেরা অশ্রুবিসর্জ্জন

করে ; সক্রেটিসের, এমন কি, সেণ্টপলের মৃত্যু-বিবরণ গায়িয়া সেরূপ করে না কেন ? আজ খৃষ্টের নামে জগৎ মাতিয়াছে, অন্যান্য মার্টারদের নামে মাতে নাই কেন ? রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহ লইয়া এত কাঁদাকাটি কেন, দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রেম-বিরহ লইয়া সেরূপ হয় না কেন ?

লোকেরা বৈষ্ণবদিগের ভাবপ্রবণতাকে পরিহাস করিয়া বলে যে, "এই মাটিতে মৃদঙ্গ হয়" বলিয়া বৈষ্ণব ভূমিতে গড়াগড়ি দেয়। আমি বলি, এত ভাঁগা কিছু সকলের হয় না, যার হয়, তাহার ধন্য সুকৃতি! ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের কুলীনগ্রামের বসুবংশে গুণরাজ খাঁন নামে এক কবি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" নামে একখানি কাব্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন, সেই গ্রন্থে নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে "প্রাণনাথ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া শ্রীচৈতন্য ভাবে বিভোর হইলেন, আমার প্রাণনাথকে যে প্রাণনাথ বলেছে, সেই লোক ধন্য, তার বংশ ধন্য। তাই বলিলেন,

গুণরাজ খাঁন কৈল "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়",
তাঁহা একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময়।
"নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"—
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত।

—চরিতামৃত—ম-লী।

আমার প্রিয়তমকে যিনি "প্রাণনাথ" বলিয়াছেন, আমি তাঁহার বংশের নিকট বিকাইয়া আছি। এ প্রেম বুঝা কি সহজ কথা ? এমন ভাব শুধু কবি হইলেই কি বুঝিতে পারে ? তাই বলি, এই মাটীতে মৃদঙ্গ হয় বলিয়া যে ব্যক্তি মাটীতে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, সর্ব্বপ্রথম যাঁহার মনে এই ভাব উদিত হইয়াছিল, তাঁহার সুকৃতিকে ধন্য ধন্য বলিতে হয়। এখনও ত কীর্ত্তনীয়ারা খোল করতালকে নমস্কার করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করেন ; সে সমস্তই যে পূজার উপচার। কতটা প্রাণের টান হইলে তবে "এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি" ভাব আসিতে পারে ? যে যুগে গর্ভধারিণীকে গুদাম ভাড়া দিবার গল্প উঠিয়াছে, সে যুগে কুটুম্বের কুটুম্ব তস্য কুটুম্বকে পাইয়া যে ব্যক্তি প্রেমে অধীর হয়, সে ত উন্মাদ পাগল! মৃদঙ্গের উদ্দেশে মাটীতে গড়াগড়ি দেওয়া, আর আমার প্রিয়কে প্রাণনাথ বলিয়াছে বলিয়া তাহার বংশের নিকট বিকাইয়া থাকা, সে যুগে উভয়ই পরিহাসের বিষয়।

অনেকে মনে করেন, প্রেম যে পূজা, এ কথাটা বুঝি নূতন আবির্ভূত হইয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব-কবিতায় প্রেম আর পূজা অঙ্গাঙ্গি হইয়া আছে ; তবে সেটা কথায় নয়, কাজে,

"আনিয়া যমুনার জল চরণ পাখালে,
নমঃ প্রেমময়ী বলে রাই চরণে ঢালে,
ছিঁড়িয়া চূড়ার ফুল নিজ হাতে নিল,
নমঃ প্রেমময়ী বলে রাই-চরণে দিল।"
(নাগর পূজা যে কৈল গো)

বৈষ্ণব-কবিতার প্রেম যেমন উচ্চ, তেমনই গভীর, তেমনই পবিত্র, তেমনই নিগূঢ়। এ প্রবন্ধে দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইবার স্থান নাই।

"কৃষ্ণ ইতি আথর দু'টী, বদনে যব্ বিলসতি
বাঢ়য় রতি রসনা কোটী লাগি,
(এক মুখে আর সাধ মিটে না)
মম শ্রবণকন্দরে, যবহুঁ পুন ক্রীড়তি
রতি শ্রবণ অর্ব্বুদ লাগি।"

পুনহুঁ যব পরশে হৃদি, প্রাণ মন ইন্দ্রিয়াদি কত না সুধা রস ছানি, সৃজিলা বিহি না জানি
স্তব্ধ রহু মানি বহু ভাগি। ধনী রে ধ্বনি মরমে রহু জাগি।

এই কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্যই প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব একটু বিশদ করিয়া বলিয়াছেন,—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরব-চন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্ম স্নপনং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।"

এইরূপ যাঁর নামের গুণ, তাঁর প্রেমের গুণ কে কহিতে পারে? যাঁর নামে জীব পবিত্র হয়, তাঁর প্রেম কি ব্যভিচার? সহস্র সহস্র বৎসর হিন্দুজাতি কি ব্যভিচারের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিতেছে, ব্যভিচারীর পূজা করিয়া আসিতেছে? অনধিক দুই শত বৎসরের মধ্যে নব্য হিন্দু কেমন শোচনীয়রূপে ধর্ম্মহারা ও মর্ম্মহারা হইয়াছে, রাধাকৃষ্ণ-লীলার অপব্যাখ্যাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।

কৃষ্ণলীলার তিনটী ধাম অথবা অবস্থা, তিন প্রকারের নায়িকা বা অধিকারী। তিনটী ধামের নাম মথুরা, দ্বারকা ও বৃন্দাবন; তিন প্রকারের নায়িকার নাম সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। যাঁহারা আত্মসুখ-কামনায় সাধনা করেন, তাঁহারা সাধারণী। তাঁহাদের ধাম মথুরা; যাঁহারা আত্মসুখ ও কৃষ্ণসুখ, উভয় চান, তাঁহারা সমঞ্জসা; তাঁহাদের ধাম দ্বারকা। যাঁহারা শুধু কৃষ্ণসুখে সুখী, তাঁহারা সমর্থা; তাঁহাদের ধাম শ্রীবৃন্দাবন। ভগবান্ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার

অধিকারীর সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লীলা করেন। বৃন্দাবনে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভিন্ন ঐশ্বর্য্য ভাব নাই, তাই বৃন্দাবনের কৃষ্ণ ও মথুরা দ্বারকার কৃষ্ণ এক বস্তু নয়। কৃষ্ণের অন্বেষণে মথুরায় আসিয়া দূতী জিজ্ঞাসা করিল, এখানে নন্দের নন্দন কৃষ্ণ কোথায় আছেন ? মথুরাবাসিনী বলিল—

"সো কাঁহে ইহা আওব,
হেথা, বসুদেবকী-সুত, কৃষ্ণ খ্যাত
কংশবাদী মাধব।"

মথুরা ঐশ্বর্য্যধাম, এখানে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ কেমন করিয়া আসিবেন ? "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি" রসের হিসাবে এই কথাটী সদাই সত্য।

বসন্ত-রাগের আলাপে পঞ্চমে মেজরাপ ঠেকিলেই যেমন সমস্ত নষ্ট হয়, সেইরূপ বৈষ্ণব-কবিতায় এক রসের মধ্যে অন্য রসের একটী শব্দের প্রবেশ-মাত্রই রসাভাস ঘটে। যাহার তাল বোধ আছে, এমন ব্যক্তি যেমন বেতালা গান বাদ্য শুনিতে পারে না, সেইরূপ রসাভাস হইলে বৈষ্ণব-শ্রোতা সেখান হইতে দৌড়াইয়া পলায়ন করেন, রসাভাসের আঘাতে তাঁহার শরীর পর্য্যন্ত অস্থির হয়।

যমুনা নদীর এ পারে বৃন্দাবন ও পারে মথুরা। ব্রজবাসীরা এই নদী পার হইয়া মথুরায় যাইতে পারিল না ; তারা যে ব্রজের কৃষ্ণ চায়, মথুরার কৃষ্ণ চায় না, তাই বিরহে মরিবে তবু মথুরায় যাইবে না। সেখানে গেলে রসাভাস ঘটে। বৈষ্ণব ভাষায় ভক্তদিগের পরিচয়প্রসঙ্গে "ইনি ব্রজের লোক" এই কথা বলিলে বুঝিতে হয় যে, ইনি সখ্য, বাৎসল্য, বা মধুর রসের সাধক। দ্বারকার লোক, মথুরার লোক বলিলে তেমনই সাধকের "সমঞ্জসা" ও "সাধারণী" অবস্থা বুঝায়। কিন্তু ব্রজের লোক কথাটা মোটা কথা, ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম বিবিধ অবস্থা আছে।

"সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ। আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ॥ চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥"

ভগবান সচ্চিদানন্দ, সুতরাং তাঁহার তিনটী স্বরূপ শক্তি আছে, সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিৎ, এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী। এই হ্লাদিনী শক্তিই আনন্দ-দায়িনী।

সুখ রূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন,
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম,
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥

প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি,
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী—

এই হ্লাদিনীর পরম সার বা চরম আনন্দরূপিণী রাধাঠাকুরাণী, ইনি কৃষ্ণানন্দ-বিধায়িনী, এবং ভক্তানন্দদায়িনী। এই পরমাশক্তির সহিত সচ্চিদানন্দ ভগবানের যে বিলাসসম্ভোগ, তাহারই নাম রাধাকৃষ্ণলীলা। ইহার কিছুই কল্পনা নহে, কিছুই রূপক নহে। এই নিত্যলীলা নিত্য বৃন্দাবনে অনাদিকাল হইতে চলিতেছে। দ্বাপরের শেষে এই মর্ত্ত বৃন্দাবনে উহারই মূর্ত্তলীলা হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবকবিগণ তাঁহাদের কবিতায় এই লীলারই বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা সাধকের হৃদয়ে হ্লাদিনীর সঞ্চার করে; তখন মাধুর্য্য রসে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়; তখন তুচ্ছ কাম পথে পড়িয়া মূর্চ্ছা যায়। এই অমৃত-রসসম্ভোগে আত্মা নিষ্পাপ হয়, ইহাই বৈষ্ণব সঙ্গীতের শক্তি ও উদ্দেশ্য। কিন্তু

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং।"

গীতার এই ভগবদ্‌বাক্য সত্য বলিয়াই তর্কপরায়ণ সংশয়াত্মা ব্যক্তিগণ তাঁহার মানুষী তনুকে বিশ্বাস করিতে পারে না। বৈষ্ণবরা বলেন,—

"শ্রীকৃষ্ণের যত খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা।"

কেন না, সচ্চিদানন্দ মানুষের মধ্য দিয়া যেরূপ ফুটিয়াছেন, মানুষের চক্ষে অন্য কোথাও সে রূপ প্রকাশ পান নাই। উপনিষদের প্রমাণে যিনি একা থাকিতে ইচ্ছা না করিয়া বহু হইয়াছেন, সেই বহুর মধ্যে নরই সর্ব্বোত্তম, নরের মধ্যে যিনি নরোত্তম, তাহাতেই সচ্চিদানন্দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি, তিনিই সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। যোগীরা পরমাত্মারূপে যাঁহাকে অন্তরে ধ্যান করেন, তিনি এই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি।

কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি এই প্রবন্ধে এই সকল তত্ত্ব প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমি যথাসাধ্য বৈষ্ণব মতের আভাস দিতেছি। ইহাও যেন কেহ মনে না করেন যে, বৈষ্ণবগণ একটা তত্ত্বকে কাল্পনিক মূর্ত্তি প্রদান করিয়া উপদেশকে উপন্যাস করিয়া লইয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহারা ভগবানের সাকার রূপই বিশ্বাস করেন, এবং সাকার রূপেরই উপাসক। ইহা সৌভাগ্যের কি দুর্ভাগ্যের কথা, এরূপ বিশ্বাস জ্ঞানজনিত কি মূর্খতাজনিত, সে কথা লইয়া আলোচনা করা বৃথা। এক দল প্রাচীন কালের ব্রহ্মজ্ঞানী, যখন বৈষ্ণব হইলেন, তখন কেন বৈষ্ণব হইলেন জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর দিলেন—

"অদ্বৈতবীথিপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দ-সিংহাসন-লব্ধ-দীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥"

ভক্তিপথে যুক্তির অপেক্ষা থাকে না। প্রাণই টানিয়া লইয়া যায়। মানুষী তনু পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ বৃন্দাবনে লীলা করিয়াছেন, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের পূর্ণাদর্শ প্রকটিত করিয়া প্রেমের বন্যায় বৃন্দাবন ভাসাইয়া দিয়াছেন, কবি গায়িয়াছেন,

"রাধাকৃষ্ণ আমার পঞ্চ রসের রসময়
বৃন্দাবন প্রেম রসেতে ভেসে যায়।"

বৃন্দাবন, ব্রজ, বর্ষাণ, প্রভৃতি স্থান, নদী যমুনা, পর্ব্বত গোবর্দ্ধন, সেই বংশীবট আর কদমতলা, গোষ্ঠ, গোপাল, রাখাল প্রভৃতি নামগুলি সমস্তই অমৃতসেচনে চিরকালের জন্য অমর ও মধুময় হইয়া রহিয়াছে।

রাধাকৃষ্ণের ইতিহাস যাহাই হউক, বৈষ্ণব কবিগণ অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে যে রাধাগোবিন্দলীলা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, উহা অমৃতের প্রস্রবণ-রূপে প্রবাহিত হইয়া চিরকাল তপ্তধরা জুড়াইবে। কোনও কবিতা, কোনও সঙ্গীতই উহার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। অন্য কবিদের বৃন্দাবন নাই, রাধাকৃষ্ণও নাই, অন্য নায়ক নায়িকায় রাধাকৃষ্ণের ভাব অর্পণ করিতে গেলে, উহা বিদ্যাসুন্দর হইবে, বৈষ্ণব-কবিতা হইবে না।

"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
সকল-নিগম-বল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপং ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"

উপনিষদে যিনি "রসস্বরূপ" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তিনিই বিবর্ত্তিত হইয়া "রাসলীলা"য় আপনাকে "রসরাজ"রূপে প্রকটিত করিয়াছেন। সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি,—

"শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষণ্ বেণুস্বনৈর্গোপী র্গোপীনাথঃ শ্রেয়োঽস্তু নঃ॥" *

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

পূজার কাপড়।

১

দুখের মা বারো বছরের ছেলে দুখীরামকে কিছুতেই আপনার দৈন্য বুঝাইতে না পারিয়া প্রমাদ গণিল।

তখন চারি দিকে পূজার ঢাক বাজিয়া উঠিয়াছে; ছেলের দল নূতন কাপড়

* বাঁকীপুরের দশম সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

পরিয়া নাচিতে নাচিতে ঠাকুর দেখিতে ছুটিয়াছে; ভিখারী দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া খঞ্জনীর তালে তালে গায়িতেছে,—

"গা তোলো গা তোলো বাঁধো মা কুন্তলো,
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী।"

এমনই সময়ে বাগ্দীর ছেলে দুখীরাম্ বিধবা মাকে ধরিয়া বসিল, "আমার নতুন কাপড় চাই।"

মা ধান ভানিয়া, গোবর কুড়াইয়া, দিন চালাইত। কাপড় ছিঁড়িলে কায়েত-পাড়া হইতে গৃহস্থের পরিত্যক্ত ছেঁড়া কাপড় চাহিয়া আনিয়া, শেলাই করিয়া আপনি পরিত, ছেলেকে পরিতে দিত। সুতরাং ছেলেকে নূতন কাপড় কিনিয়া দিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। কিন্তু অবোধ আদুরে ছেলে মাতার অক্ষমতা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। গ্রামের প্রায় সকল ছেলেই নূতন কাপড় পরিয়াছে। দীনু খোড়ুয়ের ছেলেরা নূতন কাপড় দেখাইয়া দেখাইয়া, হাততালি দিয়া, তাহাকে উপহাস করিয়াছে। সুতরাং সে ভাত খাইতে বসিয়া গোঁ ধরিল, "আমার নতুন কাপড় চাই। নয় তো ভাত খাব না।"

মা ছেলেকে অনেক বুঝাইল; বলিল, "ছি বাবা, পেটে খেতে পাই না, কাপড় কিনতে পয়সা কোথায় পাব?"

দুখীরাম জোরে মাথা নাড়িয়া, বলিল, "তা আমি শুনবো না, আমার কাপড় চাই। কেন, পটলাকে বেচলে তো পয়সা হয়?"

মা তাড়াতাড়ি দন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া বলিল, "ছি বাবা, অমন কথা বলতে আছে? ও যে বাবা পঞ্চানন্দের পাঁঠা। সে বছর কি তুই ছিলি? কেবল বাবাই দয়া করে' ফেলে গেছেন। ও বাবার মানসিকী।"

দুখীরাম বলিল, "হোক মানসিকী, তুই ওকে বেচে কাপড় কিনে দে।"

মা কিন্তু কিছুতেই পটলাকে বেচিতে সম্মত হইল না। দুখীরাম তখন পঞ্চানন্দের উদ্দেশে একটা কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া থালার ভাতগুলাকে উঠানময় ছড়াইয়া দিল। ভাতের জন্য না হউক, ঠাকুরের উপর কটূক্তি প্রয়োগ করায় মা না রাগিয়া থাকিতে পারিল না; সে "হতভাগা ছেলে" বলিয়া ছেলের পিঠে একটা চড় বসাইয়া দিল। ছেলে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া পলাইল। মা তখন একটী একটী করিয়া উঠানের ভাত খুঁটিতে খুঁটিতে বাঁ হাতে ছেঁড়া কাপড়ের আঁচলটা টানিয়া ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল।

হায়! অনেক দুঃখের ছেলে দুখীরাম। যে দিন দুখীরাম জন্মিয়াছিল, সে দিন কি আনন্দ! মিন্সের মুখে কি হাসি! সেই ছেলে আজ একখানা কাপড়ের জন্য মার খাইল? আজ যদি মিন্সে থাকত? তাহার চাকরী-বাকরী ছিল না, জমীজমাও ছিল না, তবু গতরের মেহনতে সে যাহা আনিত, তাহাতে ছেলে কত নূতন কাপড় পরিত! তাহা হইলে আজ কি দুখীরামকে ভাত খাইতে বসিয়া চড় খাইতে হইত, না এত দুঃখের ছেলের এই করুণ চীৎকার তাহার বুকে শেল বিদ্ধ করিত! দুখের মা যত চোখের জল মুছিতে লাগিল, ততই কোথা হইতে চোখের কোলে জল আসিয়া জমিতে লাগিল। আঁচল ভিজিয়া গেল, কিন্তু সে জলস্রোত আর থামিল না।

হায় মা, আনন্দময়ী তুই; তোর আগমনে দুখের মার মত কত মাকে চোখের জল মুছিতে হয়! কেন?

২

সেই দিন বিকালে রামজীবন দত্তের গোমস্তা শিবু আকুলি আসিয়া ডাকিলেন, "দুখের মা, ও দুখের মা!"

দুখের মা তখন কুটীরের পশ্চাতে এক গাদা গোবর লইয়া ঘুঁটে দিতেছিল। সে গোবরমাখা হাতে ছেঁড়া কাপড়ের আঁচলটা তাড়াতাড়ি মাথায় তুলিয়া দিয়া, সম্মুখে আসিয়া বলিল, "কেনে গা বাবাঠাকুর!"

আকুলি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর না একটা কালো পাঁঠা আছে?"

দুখের মা একটু থতমত খাইয়া উত্তর করিল, "পাঁঠা? একটা পাঁঠা আছে বাবাঠাকুর, কিন্তু—"

আকুলি মহাশয় একটু চড়া গলায় বলিলেন, "কিন্তু-মিন্তু নয়, পাঁঠাটা চাই। আমাদের সন্ধিপূজার কালো পাঁঠা পাওয়া যাচ্চে না। কৈ পাঁঠাটা কোথায়?"

আকুলি মহাশয় ইতস্ততঃ ব্যগ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

পাঁঠাটী তখন অদূরে আশস্থাওড়ার বনের ধারে দাঁড়াইয়া বুনোগাছের পাতা চিবাইতেছিল। আকুলি মহাশয়ের সঙ্গে চাকর দামু আসিয়াছিল। সে সেই দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ বুঝি?"

আকুলি মহাশয় নধরকান্তি ছাগনন্দনের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "বেশ পাঁঠা, বলির যোগ্য বটে। ধ'রে নিয়ে আয় দামু!"

দামু পাঁঠা ধরিতে চলিল। দুখের মা আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, "না বাবাঠাকুর, ও বাবা পঞ্চানন্দের পাঁঠা, আমার দুখীর মানসিক। ওকে আমি বেচতে পারব না।"

মৃদু হাসিয়া আকুলি মহাশয় বলিলেন, "দূর বেটী, এত বড় পাঁঠা পঞ্চানন্দকে দেয়? এর দামে যে তিনটে পাঁঠা হবে। সিকে পাঁচেক হ'লেই মানসিক-শোধের মত একটা পাঁঠা পাওয়া যাবে। বাকী টাকায় তোর দুখেকে কাপড় কিনে দিতে পারবি।"

দুখের মার বুকটা যেন একটু কাঁপিয়া উঠিল। সে নীরবে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

দামু পাঁঠা ধরিয়া আনিলে আকুলি মহাশয় তাহার সর্ব্বশরীর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, কোথাও একটু সাদা বা লালের দাগ পর্য্যন্ত নাই। তিনি হৃষ্টচিত্তে পাঁঠার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত নিবি দুখের মা?"

দুখের মার মুখে কোনও কথা নাই। সে তখন কোন্ দিক্ রক্ষা করিবে, তাহাই ভাবিতেছিল। এক দিকে ঠাকুরের কোপ, অন্য দিকে ছেলের আব্দার। ছেলে কোলের ভাত ফেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গিয়াছে। কোথায় ঘুরিতেছে, তাহার ঠিকানা নাই। যে রকম একগুঁয়ে ছেলে, তাহাতে কাপড় না পাইলে সে যে শান্ত হইবে, বা কিছু মুখে দিবে, এমন ত বোধ হয় না। কিন্তু অন্য দিকে ঠাকুর। সত্যই কি কম দামের আর একটা পাঁঠা কিনিয়া দিলে ঠাকুর সন্তুষ্ট হইবেন?

দুখের মার কোনও উত্তর না পাইয়া আকুলি মহাশয় দামুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি রে দামু, কত দাম হ'তে পারে?"

দামু পাঁঠাটাকে একবার শূন্যে তুলিয়া তাহার মাংসের গুরুত্বের পরিমাণ অনুমান করিয়া লইল; তার পর মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল, "কত আর হবে? জোর সিকে এগারো।"

আকুলি মহাশয় সহাস্যমুখে বলিলেন, "তাই বটে, তবে দুর হোক, পূজোর বাজার, আর ভাঙ্গা ভর্ত্তিতে কাজ নাই। তিন টাকাই হ'লো। গরীব মানুষ!"

বাস্তবিক, গরীব বলিয়া চার আনা বেশী স্বীকার করিবার পাত্র আকুলি মহাশয় ছিলেন না। পাঁঠাটার দর পাঁচ টাকার কম হইতে পারে না। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে চার আনা দর বাড়াইয়া তিনি গরীবের উপর সহানুভূতি

প্রকাশ করিতে ছাড়িলেন না। এরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তিনি প্রায়ই অনেক গরীবকেই অনুগৃহীত করিয়া থাকেন।

দুখের মার কিন্তু দরের দিকে লক্ষ্য ছিল না। সে শুধু পঞ্চানন্দের কোপ, আর ছেলের রাগের কথাই ভাবিতেছিল। সুতরাং পাঁচ টাকার পাঁঠার তিন টাকা দর শুনিয়াও সে কোনও প্রতিবাদ করিল না। আকুলি মহাশয় তখন পাঁঠাটাকে বাঁধিয়া লইতে হুকুম দিয়া দুখের মাকে বলিলেন, "কাল এক সময় গিয়ে দামটা চুকিয়ে নিয়ে আসিস্।"

দামু আপনার গামছা দিয়া পাঁঠাটাকে বাঁধিল। দুখের মা সহসা ছুটিয়া আসিয়া গোবর-মাখা হাতে আকুলি মহাশয়ের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল; ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "দোহাই বাবাঠাকুর, আমাকে বাবার কোপে ফেলো না।"

আকুলি মহাশয় তাহার হাত হইতে পা ছিনাইয়া লইলেন, এবং গাছের পাতা ছিঁড়িয়া পায়ের গোবর মুছিতে মুছিতে বিকৃতমুখে বলিলেন, "মর বেটী, বাবার আবার কোপ কিসের? এই পাঁঠাটাই বাবাকে দিতে হবে, এমন কোনও লেখাপড়া আছে? এটা যদি হঠাৎ মারা যায়?"

দুখের মা শঙ্কিতদৃষ্টিতে আকুলি মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আকুলি মহাশয় গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তোর কোনও ভয় নাই। আমি বামুন, ব্যবস্থা দিচ্ছি, সিকে পাঁচেক দিয়ে একটা ছোট পাঁঠা কিনে মানসিক শোধ করবি। মানসিক শোধের সময় আমাকে খবর দিতে ভুলিস্ নি, বুঝলি?"

আকুলি মহাশয় অগ্রসর হইলেন। দামু পাঁঠাটাকে টানিতে টানিতে তাঁহার পশ্চাৎ চলিল। দুখের মা স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

যখন ছেলে আসিয়া ডাকিল, তখন তাহার চৈতন্য হইল। দুখীরাম জিজ্ঞাসা করিল, "পটলাকে বেচেছিস্, মা?"

মা কোনও উত্তর দিল না, শুধু স্নিগ্ধদৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চাহিল। দুখীরাম প্রফুল্লমুখে বলিল, "আমাকে কাপড় কিনে দিবি?"

মা সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া বলিল, "চল্, এখন ভাত খাবি আয়।"

৩

পর দিন বৈকালে দুখের মা দত্তবাবুদের বাড়ীতে গিয়া আকুলি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিল। আকুলি মহাশয় তখন গয়লা, জেলে, ময়রা প্রভৃতির বায়না লইয়া বড় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি দুখের মার দিকে চাহিয়া বিরক্তভাবে

বলিলেন, "তোর যে আর হাঁড়ী চড়ে না দেখছি। তাড়াতাড়ি দাম আদায় করতে এসেছিস্।"

দুখের মা কোনও উত্তর না দিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। আকুলি মহাশয় অন্যান্য গোলযোগ কতক মিটাইয়া তাহার হিসাব দেখিতে বসিলেন। দুই তিনখানা খাতা উল্টাইয়া, আঁক কষিয়া বলিলেন, "পাঁঠাটার দাম তিন টাকা, না? তা তোর গেল সনের ভিটের খাজনা দশ আনা বাকী। তা গেল সনের দশ আনা, আর হাল সনের দেড় টাকা, হ'লো দু' টাকা দু' আনা; সুদ চার আনা আট গণ্ডা। মোট দু' টাকা ছ' আনা আট গণ্ডা। আর পার্ব্বণী চার আনা, নগদীর রোজ দু' আনা, তা হ'লে দু' টাকা বারো আনা আট গণ্ডা। যাক্, দু'কড়া ছেড়ে দিলাম, সাড়ে সাত গণ্ডা। তিন টাকার দু' টাকা বারো আনা সাড়ে সাত গণ্ডা বাদ গেলে থাকে তিন আনা সাড়ে বার গণ্ডা, তা হ'লে সাড়ে চোদ্দ পয়সা। বুঝলি?"

না বুঝিলেও দুখের মা ঘাড় নাড়িল। তখন আকুলি মহাশয় বাক্স হইতে সাড়ে চোদ্দ পয়সা বাহির করিলেন, এবং দুইবার গণিয়া তাহা দুখের মার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। দুখের মা কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, "বাবাঠাকুর, মোটে সাড়ে চোদ্দটী?"

আকুলি মহাশয় ধমক দিয়া বলিলেন, "যা যা মাগী, এখন কাজের সময় বকাস্ নি; (গয়লাকে লক্ষ্য করিয়া) তার পর কি বলছিলে হে ঘোষের পো, সাড়ে আট টাকা ক'রে দই? কেন, তোমাদের দই দুধও যুদ্ধে যাচ্ছে নাকি?"

দুখের মা পয়সা কয়টী কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

ঘরে না ঢুকিতেই দুখীরাম ছুটিয়া আসিয়া মায়ের আঁচল ধরিল; ব্যগ্র—উৎফুল্লকণ্ঠে বলিল, "কৈ দেখি, কেমন কাপড়?"

মা কোনও উত্তর দিতে পারিল না; তাহার চোখ দুইটা তখন জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। দুখীরাম কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করিল না; মা আসিবার সময় কেন পালেদের দোকান হইতে কাপড় কিনিয়া আনে নাই, তজ্জন্য মাতাকে তিরস্কার করিল, এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দোকানে যাইবার জন্য মায়ের হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। শেষে মা যখন অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে তাহাকে আকুলি মহাশয়ের প্রদত্ত পয়সার পরিমাণ বুঝাইয়া দিল, তখন দুখীরাম রাগে আগুন হইয়া বলিল, "কি, আমার পটলাও গেল, কাপড়ও হ'লো না? আমি পটলাকে ফিরিয়ে আনব।"

মা বলিল, "তারা কিনে নিয়ে গেছে, আর কেন ফিরিয়ে দেবে?"

দুখীরাম জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তার বাবা দেবে। আমি আমার পাঁঠা ফিরিয়ে আনব, দেখি সে বামুন—"

মা তাড়াতাড়ি ছেলের মুখ চাপিয়া ধরিয়া ব্যস্তভাবে বলিল, "ছি বাবা, বামুনকে কি গাল দিতে আছে? বামুন দেবতা।"

দুখীরাম কিন্তু এমন প্রতারক ব্রাহ্মণকে দেবতা বলিয়া মানিতে চাহিল না। সে আকুলি মহাশয়ের উদ্দেশে যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিতে লাগিল। মা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "রক্ষে কর্ দুখে, যদি বাঁচতে চাস্ ত বামুনকে আর গাল দিস্ নি।"

দুখীরাম দৃঢ়স্বরে বলিল, "বাঁচি আর মরি, আমি হয় কাপড় চাই, নয় পটলাকে চাই। আমি পটলাকে কত ভালবাসি—তা জানিস্?"

মা শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

৪

ষষ্ঠীর দিনে দত্তবাড়ীর লোক জন যখন এক দিকে কল্পারম্ভের, অন্য দিকে ঠাকুর সাজান, মেরাপ বাঁধা, বাজার করা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, তখন দুখীরাম ধীরে ধীরে গিয়া, বাহিরে যেখানে পাঁচ ছয়টা পাঁঠা বদ্ধ-অবস্থায় তৃণভক্ষণে নিরত ছিল, সেই খানে দাঁড়াইল। পটলাও সেখানে ছিল। দুখীরামকে দেখিয়া পটলা সকরুণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া অব্যক্ত শব্দ করিতে লাগিল। দুখীরাম তাহার গায়ে হাত বুলাইল, তাহার মাথাটা জড়াইয়া ধরিয়া বুকের উপর রাখিল। তার পর ইতস্ততঃ সতর্কদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে তাহার গলার বাঁধন খুলিয়া দিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিল। পটলা কূর্দ্দন করিতে করিতে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

দামু বাজার করিয়া ফিরিতেছিল; সে "পাঁঠা-চোর, পাঁঠা-চোর"! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বাড়ীর ভিতর হইতে লোক জন ছুটিয়া বাহিরে আসিল। দুখীরাম ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। কিন্তু সে অধিক দূর যাইতে পারিল না, একটা নালা ডিঙ্গাইতে গিয়া আছাড় খাইল। পাঁচ সাত জন আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। পটলা কিন্তু ধরা পড়িল না, সে পাশের জঙ্গলে ঢুকিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কয়েক জন লোক তাহার অনুসরণ করিল।

পূজক তখন কল্পারম্ভের পূজা শেষ করিয়া চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন। দত্তজা ক্ষৌমবস্ত্রে বিশাল বপু আবৃত করিয়া ভক্তিগদ্গদচিত্তে দেবীমাহাত্ম্য শুনিতে-

ছিলেন, আর মাঝে মাঝে ভৃত্যদিগকে নিম্নস্বরে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতেছিলেন। এমন সময় চাকরেরা পাঁঠা-চোরকে ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিল, এবং সে কিরূপে নবক্রীত সন্ধিপূজার পাঁঠাটা চুরী করিয়া পলাইতেছিল, দামু তাহা সালঙ্কারে বিবৃত করিল। পূজকের চণ্ডীপাঠ থামিয়া গেল। দত্তজা ক্রোধরক্তদৃষ্টিতে চোরের দিকে চাহিলেন। দুখীরাম কিন্তু তাহাতে একটুও ভীত হইল না; সে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া তীব্র সতেজকণ্ঠে বলিল, "তোমরা বুঝি ফাঁকি দিয়ে পটলাকে নেবে? আমার হয় কাপড় চাই, নয় পটলাকে চাই।"

উত্তর শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। বাগ্দীর ছেলের মুখে এত বড় তেজের কথা শুনিয়া দত্তজা রাগে আগুন হইয়া উঠিলেন; ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে আদেশ দিলেন, "বেটা বিছুটীর ঝাড়; জুতিয়ে বেটার মুখ ছিঁড়ে দাও।"

আদেশমাত্র সেই দ্বাদশবর্ষীয় বালকের পৃষ্ঠে পটাপট্ শব্দে জুতা, কিল, চড় পড়িতে লাগিল। যখন প্রহারের নিবৃত্তি হইল, তখন দুখীরাম অর্দ্ধমৃত। প্রতিবেশী দীনু খোড়ুই তাহাকে ধরিয়া তাহার ঘরে লইয়া গেল। পুরোহিত মহাশয় পুনরায় আচমন করিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি উদাত্ত স্বরে পড়িতে লাগিলেন,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

দত্তজার চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় ভক্তির নির্ঝর বহিতে লাগিল!

৫

মা ডাকিল, "দুখী, ও বাবা দুখীরাম!"

দুখীরাম রক্তচক্ষু উন্মীলিত করিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। মা জিজ্ঞাসা করিল, "অমন কচ্চিস্ কেন বাবা? কিছু খাবি?"

দুখীরাম নিরুত্তর। মা তাহার মুখে মুখ দিয়া কাতরস্বরে বলিল, "কাল সারা দিনরাত যে একটু কাঁচা জলও তোর পেটে যায় নি! কিছু খাবি?"

দুখীরাম বলিল, "খাব।"

মা তাড়াতাড়ি একটা থালায় ফেনভাত আনিয়া দিল। দুখীরাম উঠিয়া খাইতে বসিল, কিন্তু খাইতে পারিল না; এক গ্রাস ভাত মুখে তুলিয়াই

শুইয়া পড়িল। মা তাহার হাত ধুইয়া দিল, মাথার কাছে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

দত্তবাবুদের বাড়ীতে সপ্তমীপূজার বলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠিল। দুখীরাম ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল; চীৎকার করিয়া বলিল, "ঐ পটলাকে কাটলে! কৈ, আমার নতুন কাপড় কোথায়?"

মা তাহাকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিল। দুখীরামের মাথা মায়ের কোলে লুটাইয়া পড়িল।

দীনু খোড়াই আসিয়া বলিল, "দেখছিস্ কি মাগী, বিকার হয়েছে, ডাক্তার ডাক্।"

দুখের মা আস্তে ব্যস্তে দত্তবাবুদের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তারকে ডাকিতে ছুটিল। ডাক্তার বাবু কিন্তু আসিলেন না; বলিলেন, "এখনি আমাকে বাবুদের বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখতে যেতে হবে।"

না আসিলেও তিনি ঔষধ দিলেন। বলিলেন, "এই ওষুধটা নিয়ে যা, তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবি।"

দুখের মা একবার ছেলেকে দেখিয়া আসিবার জন্য কাঁদাকাটা করিতে লাগিল। ডাক্তার রাগিয়া বলিলেন, "ভিজিট দিতে পারবি?"

দুখের মার সে সংস্থান ছিল না। থাকিলে ভিজিটের টাকা দিয়া সে ছেলেকে কাপড় কিনিয়া দিত, ছেলেকে আজ ঔষধ খাইতে হইত না। দুখের মা ব্যথিতচিত্তে শুধু ঔষধ লইয়াই ফিরিল। ফিরিবার পথে সে ঘোষপুকুরের পাড়ে পঞ্চানন্দের গাছতলায় মাথা কুটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দোহাই বাবা, আমার অপরাধ হ'য়ে থাকে, আমায় নাও, আমার দুখীকে বাঁচাও। আমি ভিক্ষে ক'রে ডাইনে বাঁয়ে পাঁঠা দিয়ে তোমার পূজো দেব।"

ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া ফিরিতেই সহসা দুখের মা দেখিল, পুকুর-ধারে পটলা চরিতেছে। এই যে এখানে পাঁঠা, আর বাবুদের লোক জন আজ দুই দিন পাঁঠা খুঁজিয়া হায়রাণ হইতেছে। দিনে সাতবার তাহার ঘরে খানাতল্লাসী করিতে আসিতেছে, তাহাকে কত ভয়, কত লোভ দেখাইতেছে। সে যেন পাঁঠাটাকে বেচিয়া আবার তাহাকে ঘরে লুকাইয়া রাখিয়াছে। ছি ছি, লোকের কি অশুদ্ধ মন!

পটলাকে ডাকিতেই পটলা মুখ তুলিয়া চাহিল, এবং ধীরে ধীরে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। দুখের মা বাঁ হাতে ওষুধের শিশিটা ধরিয়া ডান হাতটা

তাহার গায়ে বুলাইতে লাগিল। তার পর আঁচলের খুঁটে কোনরূপে তাহাকে বাঁধিয়া দত্তবাবুদের বাড়ীর দিকে চলিল।

যাইতে যাইতে সহসা তাহার মনে হইল, কে যেন তাহার বুকের ভিতর বসিয়া বলিতেছে, "ও দুখের মা, করিস্ কি? এ যে বাবার পাঁঠা, বাবাই ইহাকে লোকচক্ষুর অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছেন। নয় ত এত লোকের চক্ষু এড়াইয়া সে কি এখানে বেড়াইতে পারে? তুই কি না আবার সেই পাঁঠা ধরিয়া বাবুদের বাড়ী দিতে চলিয়াছিস্? তোর কি ভাল হইবে? একবার ত পাঁঠা বেচায় তোর ছেলে এমন শাস্তি পাইল, ইহার উপর তুই নিজে উহাকে ধরিয়া দিয়া আসিলে কি তোর দুখে বাঁচিবে?"

দুখের মার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল। সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সভয়-দৃষ্টিতে পশ্চাতে চাহিল। দেখিল, বাবার অধিষ্ঠিত বৃহৎ অশ্বত্থ গাছটা যেন নীরব নিথর ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তলদেশে সিন্দুর-মণ্ডিত ঘটের উপর বসিয়া কে এক রুদ্রমূর্ত্তি পুরুষ হস্তসঙ্কেতে তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিতেছে, "সাবধান দুখের মা, আমার মানসিকী পাঁঠা ফিরিয়ে দিলে তোর ভাল হবে না।"

দুখের মা স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। হায় বাবা, অভাগী আমি, তোমার মানসিকী পাঁঠা যে বেচিয়া ফেলিয়াছি! স্বেচ্ছায় না হউক, অনিচ্ছা-সত্ত্বেও—ছেলের আবদার রাখিতে বেচিয়াছি, বেচিয়া দাম লইয়াছি। এখন ইহাকে দেখিয়াও ফিরাইয়া দিয়া না আসিলে কি অধর্ম্ম হইবে না? ক্রেতাকে কি ফাঁকি দেওয়া হইবে না? কিন্তু বাবার কোপে যদি—

দুখের মার বুকটা বড় জোরে কাঁপিতে লাগিল। সে ভাবিল, "দূর হোক, নিজে একে ধ'রে দিয়ে আসব না, বাবুদের বাড়ীতে খবর দিই, তারা এসে ধ'রে নিয়ে যাক্। কিন্তু ততক্ষণে পাঁঠাটা যদি আর কোথাও চলিয়া যায়?"

দুখের মা কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

তা দুখের মার যদি একটুও বিচারশক্তি থাকিত, তাহা হইলে সে অনায়াসেই বুঝিতে পারিত, এ ক্ষেত্রে পাঁঠাটাকে ধরিয়া দিয়া আসিবার জন্য তাহার কি এমন মাথাব্যথা! সে মূল্য লইয়া বিক্রেয় বস্তু ক্রেতার হাতে তুলিয়া দিয়াছে। তার পর সে জিনিস কোথায় গেল, তাহার কি হইল, এত খোঁজে

তাহার দরকার কি? এখানে ক্রেতাই দায়ী; ন্যায়ের সূক্ষ্ম তর্কে সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

কিন্তু দুখের মা কখনও ন্যায়ের তর্ক লইয়া আলোচনা করে নাই। সে গরীবের মেয়ে, সংসারে শুধু ধর্ম্ম অধর্ম্ম এই দুইটা জিনিসই চিনিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং সে হারানো পাঁঠাটার জন্য আপনাকেই সম্পূর্ণ দায়ী স্থির করিল, এবং তাহাকে দেখিয়াও ছাড়িয়া দিলে ধর্ম্মের নিকট দোষী হইবে ভাবিয়া লইল। সে পশ্চাৎ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া পাঁঠাটাকে টানিতে টানিতে দ্রুতপদে দত্তবাবুদের বাড়ীর দিকে চলিল।

৬

পাঁঠার জন্য দত্তবাবুদের বাড়ীতে হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছিল। সকলেই জানে, রামজীবন দত্তের পূজা যে সে পূজা নয়, যথার্থ সাত্বিকী পূজা; এ পূজায় তিলমাত্র ত্রুটী হইবার যো নাই। যাহা নিয়ম, দত্তজা অর্থ সামর্থ্য দিয়া যেরূপেই হউক, তাহা নিশ্চয়ই করিবেন। জগদম্বার উপর তাঁহার অচলা ভক্তি, সে ভক্তির তিলমাত্র ব্যতিক্রম হইলে, মায়ের পূজার একটু অঙ্গহানি হইলে তিনি আছাড় খাইয়া পড়েন। সন্ধিপূজায় কৃষ্ণবর্ণ ছাগে মায়ের প্রীতি, সুতরাং কালো পাঁঠা চাই-ই। পাঁচখানা গ্রাম খুঁজিয়া, অনেক কল কৌশলে সংগৃহীত সেই পাঁঠা পলাইয়াছে। তাহার অন্বেষণে গ্রাম ছাড়িয়া ভিন্ন গ্রামে লোক ছুটাছুটি করিতেছে, কিন্তু পলায়িত পাঁঠার কোনও সন্ধানই পাওয়া যাইতেছে না। সময়ও নাই, রাত্রি পোহাইলেই সন্ধিপূজা; পূজা রাত্রিতে নয়, দিনমানে বেলা আটটার সময়। মাঝে আর একটা রাত্রিমাত্র ব্যবধান। ইহার মধ্যে যদি পাঁঠা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ! পূজার নিয়মভঙ্গ হইবে, মা রুষ্ট হইবেন, ভক্তের ভক্তির মূলে কুঠার পড়িবে।

দত্তজা অনাহারে মায়ের সম্মুখে বসিয়া মাথা কুটিতে লাগিলেন; আর লোকজনদের হুকুম দিলেন, "যেখান থেকে পার, পাঁঠা খুঁজে এনে হাজির কর। যে আনতে পারবে, সে নগদ দশ টাকা বকশীস পাবে।"

বকশীসের লোভে দূরদূরান্তরে লোক ছুটিল।

এমন সময় দুখের মা যখন আঁচলে বাঁধা পাঁঠা লইয়া উপস্থিত হইল, তখন বাড়ীতে একটা হৈ হৈ পড়িয়া গেল। দত্তজা প্রতিমার দিকে চাহিয়া ভক্তি-গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "মা গো, তুইই সত্যি, নিজের বলি নিজে খুঁজে এনেছিস্। তুই কি কখন ভক্তের প্রাণে ব্যথা দিতে পারিস্?"

আকুলি মহাশয়ের ধড়ে যেন প্রাণ আসিল। তিনি তাড়াতাড়ি এক-গাছা শক্ত দড়ি আনিয়া পাঁঠাটাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। তখন সকলেই বলিতে লাগিল, "এ সব দুখের মারই বজ্জাতী। এই মাগীই পাঁঠা লুকিয়ে রেখেছিল। এখন বকশীসের লোভে এনে হাজির ক'রেছে।"

দত্তজা ক্রুদ্ধ হইয়া গম্ভীরস্বরে আদেশ দিলেন, "মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে মাগীকে গ্রামের বা'র ক'রে দাও।"

সকলেই চীৎকার করিয়া এই দণ্ডের অনুমোদন করিল। দুখের মা সেই উন্মত্ত জনকোলাহলের মধ্যে বিস্ময়স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময় দীনু খোড়্ই আসিয়া তাহার গা ঠেলিয়া বলিল, "মর্ মাগী, এখানে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস্, আর সেখানে ছেলেটা যে হ'য়ে এসেছে। সে ঝেড়ে ঝেড়ে উঠছে, আর 'কাপড়, কাপড়' ব'লে চেঁচাচ্চে। এতক্ষণ বোধ হয় নাই।"

দুখের মা একটা আর্ত্তনাদ করিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। তাহার করুণ আর্ত্ত চীৎকারে উৎসবময় পূজাপ্রাঙ্গন কাঁপিয়া উঠিল।

দত্তজা গম্ভীরকণ্ঠে আদেশ করিলেন, "হতভাগা মাগীকে বাইরে টেনে নিয়ে যা।"

তার পর তিনি আকুলি মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কাল পাটের কাপড় দিয়ে মায়ের আলাদা এক প্রস্থ ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন ক'রে রাখ।"

পূজক বিদ্যানিধি মহাশয় মুক্তকণ্ঠে তাঁহার ভক্তির সাধুবাদ করিয়া উঠিলেন।

বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া তখন চণ্ডে মাতাল স্খলিতচরণে জড়িতকণ্ঠে গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল,—

"দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে মন! কেবল ভক্তিমাত্র উপাসনা;
তুমি লোক-দেখানো ভক্তি কর, মা তো কারো ঘুষ খাবে না।
মন তোমার কি ভ্রম ঘোচে না।"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা।

২

কলিকাতায় মাল্‌পাড়া মহাল্লার অধিবাসী মৌলবী ইম্‌তিয়াজ আলী মরহুমের (১০) মুখে শুনিয়াছিলাম, তাঁহারা কলিকাতা সহর পত্তনের পূর্ব্ব হইতে বংশপরম্পরায় ঐ মহাল্লায় বাস করিয়া আসিতেছিলেন। (১১) মৌলবী সাহেব মরহুমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুন্‌শী আহ্‌সান্‌ আলী সাহেবের মুখে শুনিয়াছি, আজমগড় জেলার মাদারবক্‌শ্‌ নামক এক ব্যক্তি ঐ মহাল্লায়, তাঁহাদের বাড়ীর পার্শ্বে বাস করিত। এক দিন কোনও কারণবশতঃ মাদারবক্‌শের সহিত মৌলবী সাহেব মরহুমের ঝগড়া হয়। মাদারবক্‌শ্‌ হিন্দী বা উর্দ্দূ ভাষায় কথা বলিতেছিল, এবং মৌলবী সাহেব বঙ্গভাষায় তাহার উত্তর দিতেছিলেন। এই জন্য মাদারবক্‌শ্‌ বলিয়াছিল, "আপ্‌কো খেয়াল্‌ রাখ্‌না চাহিয়ে কে ম্যাঁয় বাংলা জবান মোত্‌লাকান্‌ নেহি সমঝ্‌তাহুঁ। আওর আপ্‌কো এহ ভি খেয়াল্‌ রাখ্‌না চাহিয়ে কে আপ্‌ আলে'ম্‌ হ্যাঁয়। ইস্‌তারাইসে বাংলা জবান্‌ ইস্তেয়ামাল্‌ কর্‌নেসে আলেমোঁকি ইজ্জাত মে ধাক্কা লাগ্‌ জাতা হায়।"

অর্থাৎ—আপনার মনে রাখা উচিত যে, আমি আদৌ বাঙ্গালা ভাষা বুঝি না; আর ইহাও আপনার স্মরণ রাখা উচিত যে, আপনি (আরবী ও ফার্সী ভাষায় পণ্ডিত) আলেম। আপনি যদি এই প্রকারে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আলেমদিগের সম্মানের লাঘব হইবে।

মৌলবী সাহেব মরহুম উর্দ্দূ ভাষায় মাদারবক্‌শের এই কথার যে উত্তর দিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতেছি।

মৌলবী (১২) সাহেব মরহুম বলিয়াছিলেন, "তোমারও মনে রাখা উচিত

---

(১০) মরহুম একটি সাঙ্কেতিক শব্দ। মৃত ব্যক্তিদিগের নামের শেষে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। হিন্দুরা যে ক্ষেত্রে ৺ এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিয়া থাকেন, মুসলমানেরা সেই ক্ষেত্রে "মরহুম" শব্দ ব্যবহার করেন।

মৌলবী ইম্‌তিয়াজ আলী কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কিছু দিন চাকরী করিয়া, ইস্তফা দিয়াছিলেন।

(১১) এখন তাঁহাদের বংশধরেরা উক্ত মহাল্লায় বাস করেন না; নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোডে বাস করিতেছেন।

(১২) ইংরাজী-শিক্ষিত মুসলমানদিগকেও আজ কাল "মৌলবী" বলা হইতেছে। মৌলবী লিখিলে কে আরবী-ফার্সীর মৌলবী ও কে ইংরাজীর মৌলবী, তাহা বুঝিবার

যে, এই কলিকাতা সহরটীও বাঙ্গালা দেশের একাঙ্গ। এখানকার ভাষা বাঙ্গালা। আমি যখন তোমার দেশে যাইব, তখন উর্দ্দূ অথবা হিন্দী ভাষায় কথা কহিব। এখন তুমি আমাদের দেশে আসিয়াছ, তোমাকে এই দেশের ভাষায় কথা কহিতে হইবে। তুমি যেমন উর্দ্দূ বা হিন্দীকে তোমার মাতৃভাষা মনে কর, আমিও তেমনই বাঙ্গালা ভাষাকে আমার মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করি। প্রয়োজন তোমার, আমার নহে। তোমাকেই আমাদের ভাষায়, তোমার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া আমাদিগকে বুঝাইতে হইবে। নিজের বাড়ীতে বসিয়া কেন আমি আমার মাতৃভাষাকে ত্যাগ করিব ?

"মৌলবী ও মওলানা হইলেই যে উর্দ্দূ ভাষায় কথা কহিতে হইবে, এ কথা তোমাকে কে বলিল ? উর্দ্দূভাষাও ত ঐস্‌লামিক ভাষা নহে ? মুসলমান রাজত্বের সময়, সৈন্যদিগের মধ্যে ভাবের বিনিময় করিবার জন্য, উর্দ্দূ ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। (১৩) যে সকল ইংরাজ শাসনকর্ত্তা এ দেশ শাসন করিতেছেন, তাঁহারা যেমন প্রজার মনের ভাব বুঝিবার জন্য, প্রজার সহিত ভাবের বিনিময় করিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকেন, তোমরাও সেই প্রকার নিজের মনের ভাব আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য, এবং আমাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কর্ম্ম করিবার জন্য, বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা কর না কেন ? বাঙ্গালা দেশে বাস করিবে, বাঙ্গালীর সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া চলিবে, এবং নিজের দেশের ভাষায় বাঙ্গালীর সহিত বাক্যালাপ করিবে, ইহা কখনও হইতে পারে না। হয় তোমাদিগকে বাঙ্গালা দেশ ছাড়িতে হইবে, নতুবা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে।"

মওলানা আব্দল খালেফ্ মরহুম ও মৌলবী ইম্‌তিয়াজ আলী মরহুমের উক্তির সারমর্ম্ম উপরে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। উহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে খাঁটী বাঙ্গালা ভাষাই কলিকাতার মুসলমানদিগের মাতৃভাষা ছিল। কলিকাতা ব্যতীত বাঙ্গালা দেশের অপরাপর স্থানের মুসলমানেরাও যে

উপায় নাই। তাই আমরা আরবী ও ফার্সী ভাষায় পণ্ডিতদিগকে "মৌলবী" ও ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে "মৌলভী" লিখিবার ব্যবস্থা করিয়াছি।

(১৩) কাহারও কাহারও মতে, সম্রাট শাহজাহানের শাসনকালে, ভারতবর্ষের কয়েকটী প্রাদেশিক ভাষা ও আরবী-ফার্সী ভাষা হইতে কতকগুলি শব্দ লইয়া উর্দ্দূ ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল।

(১৪) পূর্ব্বাপর বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, যশোহরের "নবম-বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন"-সভায়, আমি "মুসলমান ও বঙ্গ-সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছি। (১৫)

কলিকাতা সহরের পঞ্চম শ্রেণীর পৃথক পৃথক শাখার মুসলমানেরা বাঙ্গালা ভাষার সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধ না রাখার ফলে, তাঁহারা খাঁটী বাঙ্গালী মুসলমানদিগের নিকট সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না। পরন্তু তাঁহারা খাঁটী উর্দ্দূভাষাভাষীদিগের দলেও সম্পূর্ণরূপে মিশিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের এখন উভয়-সঙ্কট হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার বর্ণমালার সহিত তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত থাকায়, এ দিকে অগ্রসর হইতে সাহসে কুলাইতেছে না। পরন্তু ভাঙ্গা-উর্দ্দূর কল্যাণে তাঁহারা বিশুদ্ধ উর্দ্দূ ভাষা শিক্ষা করা সহজসাধ্য বলিয়া মনে করিতেছেন। এই কারণে তাঁহারা বিগত ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ক্রমে ক্রমে উর্দ্দূ ভাষার পক্ষপাতী হইয়াছেন।

বিগত ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার টাউন্‌হলে এক সভা হইয়াছিল। সভা-আহ্বানকারীরা যে প্রায় সকলেই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম শ্রেণীর প্রথম শাখা শ্রেণীর মুসলমান ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। উক্ত সভায় মোট তিনটী মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল। আমরা নিম্নে প্রথম প্রস্তাবটী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। যথা—

"ভারতের মুসলমানদিগের মাতৃভাষা উর্দ্দূ। সুতরাং এই সভা ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বঙ্গপ্রদেশের মুসলমানদিগের মধ্যেও উর্দ্দূ ভাষার প্রচলন আবশ্যক বলিয়া মনে করেন, এবং এই সভা বঙ্গপ্রদেশের মুসলমান নেতৃবৃন্দকে এই কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।"

যিনি সেই সভায় এই প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তিনি এক জন

(১৪) ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ-সিটী সহরদ্বয়ের অধিকাংশ মুসলমান অধিবাসীই ভাঙ্গা-উর্দ্দূ মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, উক্ত দুই স্থান মুসলমান আমলের শেষ সময় বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যে সকল আরব ও পারস্যদেশবাসী সওদাগর, দরবেশ ও পরিব্রাজক আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরা এখন বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত আলাওল, কাজী দৌলত, মৌলবী হামিদুল্লা প্রভৃতি খ্যাতনামা কবিগণ ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

(১৫) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ত্রয়োবিংশ ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যার ৯৫ হইতে ১২২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

শ্রদ্ধাভাজন বাঙ্গালী মুসলমানের বংশধর। তিনি বলিয়াছিলেন, "যে বা যাহারা বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করে ও বাঙ্গালা ভাষায় কথা-বার্ত্তা কহে, তাহারা মুসলমান নহে।" আমি প্রকাশ্য সংবাদপত্রে একাধিকবার বিবিধ যুক্তিতর্ক দ্বারা তাঁহার এই উক্তির খণ্ডন ও প্রতিবাদ করিয়াছি।

অতঃপর কলিকাতা সহরে আরও কয়েকবার এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আলোচনাকারী মহোদয়েরা বিশেষ কোনও সুফল প্রাপ্ত হয়েন নাই। তাঁহাদের এই চেষ্টা বরাবরই বন্যার প্রবাহে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বারংবার অকৃতকার্য্য হইয়াও তাঁহারা হতাশ বা ভগ্নোদ্যম হয়েন নাই। সম্প্রতি তাঁহারা আবার নূতন করিয়া এই আন্দোলনের আরম্ভ করিয়াছেন।

কিছু দিন হইল, উর্দ্দূ ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য ভারতের বর্ত্তমান রাজধানী দিল্লী নগরে এক উর্দ্দূ সাহিত্য-সভা স্থাপিত হইয়াছে, এবং কলিকাতাতেও উহার একটি শাখা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত পূজাবকাশের সময় এই সভার পক্ষ হইতে কয়েক জন প্রচারক বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় সভার উদ্দেশ্য প্রচার করিতে বাহির হইয়াছিলেন। (১৬)

কলিকাতায় যে সভা স্থাপিত হইয়াছে, তাহার নাম হইয়াছে, "আঞ্জুমন-ই-তারাক্কিয়ে উর্দ্দূ-বাঙ্গালা।" অর্থাৎ, বাঙ্গালা দেশের মুসলমানদিগের (মঙ্গলের) জন্য, উর্দ্দূ ভাষার উন্নতিবিষয়িণী সভা। সভার সভাপতি হইয়াছেন, দিল্লী-নিবাসী ও কলিকাতা-প্রবাসী বিখ্যাত সিগারেট-সওদাগর, হাজী বক্শ্ ইলাহী সাহেবের অন্যতম পুত্র, আমাদের প্রিয় বন্ধু মিঃ আব্দর রহিম বক্শ্ ইলাহী; আর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন সাহেব, বি-এল, উকীল। (১৭) আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সভা বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী মুসলমানদিগের জন্য স্থাপিত হইল, তাহার কোনও সংবাদই বঙ্গদেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৫২॥০ জন মুসলমানকে

(১৬) পরে জানা গিয়াছে যে, আজিও বঙ্গদেশে মধ্যে মধ্যে প্রচারকদিগকে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু শ্রোতার অভাবের জন্য তাঁহাদের প্রচার কার্য্যে বাধা উপস্থিত হইতেছে।

(১৭) আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, বন্ধুবর মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন সাহেব, আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয় অবগত হইয়া, এবং নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, উর্দ্দূ সাহিত্য-সভার সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ, সন্দেহ নাই। যে খোলা

জানান হইল না ; অথচ সভা স্থাপিত হইল! দুই চারি জন 'খোষ-খেয়ালী' ও 'খোষ-মেজাজী' লোকে যাহা করিবেন, বাঙ্গালা দেশের মুসলমান অধিবাসিবর্গ যে 'জো-হুজুর' ও 'হাঁ-হুজুর' বলিয়া অবনতমস্তকে তাহা স্বীকার করিয়া লইবেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে।

প্রিয় বন্ধু মিঃ আব্দর রহিমের মাতৃভাষা উর্দ্দূ, সুতরাং তাঁহাকে একটি উর্দ্দূ সাহিত্য-সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে দেখিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। কিন্তু বন্ধুবর মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন সাহেবকে কোনও দিনও আমরা এই প্রকার উর্দ্দূ সাহিত্য-সভার সম্পাদক-রূপে দর্শন করিবার আশা করি নাই। কারণ, আমরা জানি, তিনি খাঁটী বাঙ্গালী। (১৮)

কোন্ ভাষা বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মাতৃভাষা হওয়া উচিত, এবং বাঙ্গালী মুসলমানেরা কোন্ ভাষাকে স্বীয় মাতৃভাষার স্থলাভিষিক্ত করিলে তাঁহাদের মঙ্গল হইবে, সে চিন্তা বাঙ্গালার খাঁটী বাঙ্গালী মুসলমানদিগের পক্ষেই স্বাভাবিক, এবং সেরূপ চিন্তা তাঁহারা করিয়াও থাকেন। মুন্শী মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী মরহুম, শাহ গরীবউল্লা মরহুম, মৌলবী সৈয়েদ হামজা মরহুম, সৈয়েদ আলাওয়াল মরহুম, মৌলভী সৈয়েদ হামিদুল্লা মরহুম, কাজী দৌলত মরহুম, পণ্ডিত আব্দল হাকিম মরহুম, মীর মোশাররফ হোসেন মরহুম, মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা মরহুম, নওয়াব সৈয়েদ নওয়াব আলী চৌধুরী খান্‌বাহাদুর, মুন্শী মোহাম্মদ রেয়াজদ্দিন আহমদ, মুন্শী শেখ আব্দর রহিম, মুন্শী আব্দল হামিদখান, ইউসফজাই মরহুম, মৌলভী নৈমুদ্দিন মরহুম, মুন্শী আব্দল কাদের মরহুম, মুন্শী গোলাম মওলা সিদ্দিকী, মুন্শী আব্দল করিম সাহিত্যবিশারদ, মুন্শী মোজাম্মেল হক কাব্য-কণ্ঠ, মৌলবী মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মৌলবী মোহাম্মদ মণির উজ্জমান, মৌলভী রেয়াজদ্দিন, মৌলভী একিন্‌উদ্দিন আহমদ, মুন্শী আব্দল লতিফ, মুন্শী মোহাম্মদ কে, চাঁদ, মুন্শী ফজ্‌লুল করিম, মৌলভী কাজী ইম্‌দাদুল হক, মুন্শী ইস্‌মাইল হোসেন সেরাজগঞ্জী, মৌলভী মোহাম্মদ শহীদুল্লা, মুন্শী রওশন আলী চৌধুরী, মৌলভী ইয়াকুব আলী চৌধুরী, মৌলভী ওস্‌লিমউদ্দিন আহমদ, মুন্শী কায়কোবাদ, মৌলভী মোহাম্মদ মোজাম্মিল হক্, মুন্শী আব্দল মালেক

---

(১৮) মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন সাহেব বরাবরই বঙ্গভাষার অনুরাগী। উর্দ্দূ সাহিত্য-সভার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি যে যে ভাবে বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলন করিয়াছিলেন, এই প্রবন্ধমধ্যে আমরা সেই সকল ঘটনা উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি তাঁহার ভ্রমসংশোধন করায়, তাহা পরিত্যক্ত হইল।

চৌধুরী, মুন্‌শী আব্দুল জব্বার, শ্রীমতী মিসেস্ আর, এস, হোসেন, শ্রীমতী ফাতেমা খানম্, শ্রীমতী জোহরার রহমান, শ্রীমতী আজিজুল্ নিসা প্রভৃতি সাহেবান্ ও সাহেবানীগণ বাঙ্গালা ভাষাকেই বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

গত পূর্ব্ব চৈত্র মাসে বর্দ্ধমান সহরে বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষাসমিতির যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতেও এ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষাই যে বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মাতৃভাষা, সে কথা উক্ত শিক্ষা-সমিতিও স্বীকার করিয়াছেন। এমন কি, উক্ত শিক্ষা-সমিতিতে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের জন্য জুমা ও ঈদের খোত্‌বা যে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ও পঠিত হওয়া উচিত, এই মর্ম্মে এক মন্তব্যও গৃহীত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত, বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতা ও বঙ্গদেশের অপরাপর মাদ্রাসা-সমূহে বঙ্গভাষা শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একাধিকবার অনুরোধও করিয়াছেন। এমন অবস্থায় বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মাতৃভাষা—বাঙ্গালা ভাষাকে পরিবর্জ্জন করিয়া, উর্দ্দূ ভাষাকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিবার সার্থকতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, অতঃপর আমরা বাঙ্গালী মুসলমানদিগের জন্য স্থাপিত, পূর্ব্বোক্ত উর্দ্দূ সাহিত্যের উন্নতিবিষয়ক সভার উদ্দেশ্যগুলি একে একে নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, মোট নয়টী উদ্দেশ্য লইয়া এই সভা গঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম তিনটী মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং শেষ ছয়টী গৌণ উদ্দেশ্য।

১। বৃটীশ ভারতে উর্দ্দূ ভাষা ও সাহিত্যের প্রাধান্য-স্থাপন। (১৯)

২। উর্দ্দূ ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা, এবং তাহার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের উপায়-অবলম্বন।

৩। ভারতের সকল প্রদেশের মুসলমানেরা যাহাতে উর্দ্দূ ভাষাকে কথিত ও লিখিত ভাষারূপে গ্রহণ করেন, তাহার চেষ্টা।

৪। ভারতবর্ষের সকলপ্রদেশবাসী মুসলমানদিগের মাতৃভাষা এক না হইলে, তাহাদের মধ্যে একতার ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে না।

---

(১৯) সভার কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন যে, ইউরোপের বর্ত্তমান মহাসমর শেষ হইলে, ভারতীয় শাসন-ব্যাপারের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্ত্তনের সময়, ভারতের যে কোনও একটি ভাষাকে সরকারী ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হইবে। উর্দ্দূ ভাষা যাহাতে সেই প্রাধান্যলাভ করিতে পারে, সভার কর্ত্তৃপক্ষ সেরূপ চেষ্টা করিবেন ও করিতেছেন।

৫। ভারতবর্ষ হিন্দুপ্রধান। হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অল্প। যদি মুসলমানেরা একতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাদের উপর হিন্দুর অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

৬। উর্দ্দূ ব্যতীত অপর কোনও দেশীয় ভাষাই ভারতের মুসলমানদিগের মাতৃভাষার স্থান অধিকার করিতে পারে না। কারণ, ভারতের ভাষাসমূহের মধ্যে উর্দ্দূ ভাষাই একমাত্র ইস্‌লামধর্ম্মানুমোদিত ভাষা।

৭। যাহাদের ধর্ম্মের সহিত মাতৃভাষার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর নহে, তাহারা সমানভাবে ধর্ম্ম ও মাতৃভাষার সম্মান বজায় রাখিতে পারে না। হয় তাহাদিগকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অপরের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা মাতৃভাষার মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্মানুমোদিত কোনও ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহার উৎকর্ষসাধনে যত্নবান হইতে হইবে।

৮। হিন্দুরাই ভারতের আদিম অধিবাসী, এবং অল্প দিন হইল, মুসলমানেরা এ দেশে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মুসলমানেরাই উর্দ্দূ ভাষার স্রষ্টা, এবং ইহাই ইস্‌লাম ধর্ম্মের অনুমোদিত ভাষা। একমাত্র উর্দ্দূ ভাষা ব্যতীত, এ দেশের অপর সমস্ত ভাষাই হিন্দুদিগের ধর্ম্মানুমোদিত ভাষা। মুসলমানেরা যদি উর্দ্দূ ভাষা ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত কোনও ভাষার, যে কোনও একটির প্রাধান্য স্বীকার করে, তাহা হইলে ক্রমেই তাহাদের জাতীয়তার আদর্শ নষ্ট হইয়া যাইবে, এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়া পড়িবে।

৯। ভারতের সকলপ্রদেশবাসী মুসলমানেরা যদি উর্দ্দূ ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার না করে, তাহা হইলে যে যে স্থানের বা যে যে প্রদেশের মুসলমানেরা সেই সেই প্রদেশের প্রাদেশিক ভাষাকে মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করিতেছে ও করিবে, তাহাদিগকে প্রাইমারী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকতার অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। কারণ, প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে কিছুতেই মুসলমানেরা হিন্দুদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না। ফলে মুসলমান ছাত্রেরা অর্থ দ্বারা হিন্দু শিক্ষকদিগের উদর পূর্ণ করিতে বাধ্য থাকিবে। মুসলমান সমাজে শিক্ষকের সৃষ্টি হইবে না। অর্থনীতি হিসাবে একটি প্রধান আয়ের অংশ হইতে চিরকালতরে মুসলমানদিগকে বঞ্চিত থাকিতে হইবে।

আমরা একে একে উপরে নয়টী উদ্দেশ্যের সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এইবার আমরা একে একে বিবিধ যুক্তি ও তর্কের দ্বারা ঐ উদ্দেশ্যগুলির খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিব। ক্রমশঃ।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী।

মৃত্যুর আহ্বান।

হায় নিদ্রা, হায় শান্তি, হায় রে জীবন !
হা আমার মূঢ়, মূক, মলিন বেদন !
আবার উঠিল ঝড়—আঁধার করিয়া,
সকল বন্ধন বাধা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ;
একবার খুঁজেছিলি আলো আলেয়ার—
এবার কোথায় যাবি হৃদয় আমার !
রে পথিক প্রাণ ! কার মুগ্ধ করি গান
নিশির ডাকের মত ডাকে তোর নাম।
উঠিলি আসন ছাড়ি' ফেলিয়া সাধনা—
বক্ষে আঁকড়িয়া ধরি' অসীম বেদনা।
তারে যদি দিবি পূজা, চল্, তবে চল,
ছিঁড়ে লয়ে হৃদয়ের রক্ত জবাদল !
ওরে মূর্খ, নহে প্রিয়া,—মৃত্যু তোরে মাগে ;
বংশীসম—মধু কণ্ঠে—মধু অনুরাগে !

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। ভাদ্র।—'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে রামমোহন রায় লাইব্রেরী হলে' আচার্য্য শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল 'পশ্চিমে ও পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের আদান প্রদান' নামক যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, 'প্রবাসী'র এই সংখ্যায় তাহাই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। শীল মহাশয়ের নামের মহিমাই বোধ হয় তাহার প্রধান কারণ। 'Cult of Nationalism' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'সর্ব্বাবরণমুক্ত মানবে'র 'যে আদর্শ ইউরোপের সম্মুখে ধরিয়াছেন', তাহা আমরা দেখি নাই ; দেখিবার উপায়ও নাই। কারণ, গবর্মেণ্ট এ দেশে তাহার প্রচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সেই অজ্ঞাত আদর্শের

বিচার অসম্ভব। শীল মহাশয় প্রবন্ধের প্রথমে বলিয়াছেন,—রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ হইতে 'লইয়া আসিলেন একটা বড় অশান্তি, একটা ঝঞ্ঝাবাত, একটা storm and stress * * যাহা আজ প্রাচ্যে ব্যক্তিজীবনের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।' শীল মহাশয় কি শেষোক্ত সিদ্ধান্তটি সত্যই মানেন? 'storm and stress' পাছে বাঙ্গালী না বুঝিতে পারে বলিয়া তিনি কৈসরের দেশের ভাষায় বন্ধনীর মধ্যে 'strurm und drang' বলিয়া যাহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা 'আজ প্রাচ্যে ব্যক্তিজীবনের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়', ইহাই যদি তাঁহার মত হয়, তাহা হইলে, বাঙ্গালীর জীবন হইতে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার জন্য গোলদীঘীর গোলামখানায়—'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' নামক সর্ব্ববিধ গোলামীর লীলাক্ষেত্রে—শীল মহাশয় সার ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতীর সাহচর্য্য করিতেছেন কেন? 'সর্ব্বাবরণমুক্ত' মানবের আদর্শই যদি তাঁহার কাম্য হয়, তাহা হইলে, বাঙ্গালীর উত্তরপুরুষের জন্য তিনি 'সর্ব্ববন্ধনযুক্ত' আদর্শের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন কেন? অবশ্য, সার আশুতোষ যে 'সর্ব্বাবরণ-মুক্ত' মানবের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, অর্থাৎ যথেচ্ছাচারের অতি সুন্দর আদর্শ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ডাক্তার শীল কি সেই আদর্শের পূজা করিয়াই বাঙ্গালীকে মুক্তির পথে প্রবর্ত্তিত করিবেন?—তাহার পর প্রশ্ন করিব,—বিদেশ হইতে 'ঝড় ও ঝঞ্ঝা' আনিয়া কি কোনও জাতিকে 'মুক্তির পথে বাহির' করা যায়? জর্ম্মনীর পণ্যের মত তাহার 'strurm und drang'ও কি কেহ জাহাজে তুলিয়া আমদানী করিতে পারে? আবহাওয়ার যে অবস্থায় ঝড় ও ঝঞ্ঝার আবির্ভাব হয়, দেশে তাহার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি না হইলে কি ঝড়-ঝঞ্ঝার উদ্ভব সম্ভব?—ডাক্তার শীল মনে করেন,—'পূর্ব্ব ও পশ্চিমের পরস্পরের' একটা 'আদানপ্রদান' চলিতেছে। পূর্ব্ব প্রদান করিতেছে, ইহা সত্য; তবে তাহা কাঁচা মাল ও পাকা সোনা। পশ্চিম তাহা গ্রহণ করিতেছে। পূর্ব্বের ভাবের আদানে পশ্চিমের তেমন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। সে বিষয়ে বরং পূর্ব্বের আগ্রহ অত্যন্ত অধিক; এত অধিক যে, সময়ে সময়ে সে জন্য আমাদের লজ্জা করে। শীল মহাশয়ের মত অনেক মনীষী অবাধে আদান করিয়াছেন, এবং করিতেছেন বটে, কিন্তু প্রদানের সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আছে। আর এক কথা, প্রদান করিবে কে? যাহারা প্রদান করিতে পারে, তাহারা ত পশ্চিমের আমদানী মালেই আপনাদের গুদাম পূর্ণ করিয়াছে; তাহাতে দেশী মালের স্থান নাই। পূর্ব্ব,—অন্ততঃ আমাদের পূর্ব্ব যেমন সহজে অসঙ্কোচে পশ্চিমের দান গ্রহণ করে, পশ্চিম তাহা পারে না। দেড় শত বৎসর আমাদের সংস্রবে থাকিয়াও ইংলণ্ড আমাদের একটা ভাবেরও ভাবুক হইতে পারে নাই, ইহাও তাহার অন্যতম প্রমাণ। তবে 'কালে বাপু পণ্ডিত হইতে পারে।' তাহার পর,—'পশ্চিমের সামাজিক আদর্শের ভিতর যাহা উদার ও উন্নত, তাহার সহিত পূর্ব্বদেশীয় হিন্দুর সামাজিক আদর্শের reconciliation বা সৌসামঞ্জস্যের স্থান আছে। Rituals (পদ্ধতি) symbols (প্রতীক) ceremonials (অনুষ্ঠান) myths (পুরাণ) প্রভৃতি ছাড়াও হিন্দুর মধ্যে বরাবর একটা বিশাল মুক্তির ভাব আছে—হিন্দু-সভ্যতার তাহা এক আশ্চর্য্য বিশেষত্ব। সেই মুক্তি-তত্ত্বে ও মুক্তি-সাধনায় সাম্য-বৈষম্য, সসীম-অসীম, ভোগ ও ত্যাগের এক মহাসম্মিলন, এক মহাশ্চর্য্য সমাধান দেখিতে পাই। হিন্দুধর্ম্ম কেবলি কর্ম্মকাণ্ড নহে, কেবলি rituals (পদ্ধতি) symbols (প্রতীক)

প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন ও ভারাক্রান্ত নহে। এই ভারতবর্ষে নানাজাতির ও ধর্ম্মমতের বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া এই এক বিশাল মুক্তির আদর্শ হিন্দুধর্ম্মের ভিতরে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং এই আদর্শ বিশ্বজগৎকে দান করা সম্বন্ধে হিন্দুর গুরুতর দায়িত্ব আছে।' 'reconciliation' কি 'সৌসামঞ্জস্য'? সে কথা যাউক;—'পদ্ধতি, প্রতীক, পুরাণ প্রভৃতি ছাড়াও হিন্দুর মধ্যে বরাবর একটা বিশাল মুক্তির ভাব আছে' বটে, কিন্তু তাহা প্রতীক প্রভৃতি ছাড়া নয়। তাহার আদ্যোপান্তে একটা সম্বন্ধ, সঙ্গতি, ধারা আছে। তাহার একটাকে ছাড়িয়া আর একটাকে রাখা যায় না;—প্রতীক প্রভৃতিও সেই মুক্তির সাধন। স্তরে স্তরে, ক্রম-পর্য্যায়ে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে হয়, ইহাই হিন্দুর বিধান। বন্ধনে সংযত সাধারণ মানব অনুশীলনের দ্বারা আপনাকে মুক্তি-সাধনার যোগ্য করিবে; তাহার পর ক্রমে ক্রমে সাধনার পথে অগ্রসর হইবে; সাধনায় উন্নত হইতে হইতে অবশেষে পূর্ণ পরিণতি ও সিদ্ধি লাভ করিবে; তখন কোনও বন্ধন থাকিবে না; ইহাই হিন্দুর বিধান। পুরাণমাত্রই 'myths' নহে। আচার্য্য শীল রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার এই অংশের বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া ইঙ্গিতে দুই একটা কথা বলিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। অত্যন্ত কৃপণ যেমন অতি কষ্টে দুই একটা পয়সা খরচ করে, সেইরূপ। শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্যের পুরাতন ও নূতন ধারা'য় আপনার ইংরেজী পড়া-শুনার ও বাঙ্গালা লেখাপড়ার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। ললিতবাবু এই প্রবন্ধে বলিয়াছেন;—'ইতরশ্রেণীর মধ্যেও যে মনুষ্যত্ব মহত্ত্ব সংযম আত্মত্যাগ আছে তাহা বর্ণনীয়; অবহেলিত, পদ-দলিত, ঘৃণিত "নীচ" জাতির হৃদয়েও যে কমনীয় ও মহনীয় ভাব আছে, যে মনুষ্যত্ব দেবত্ব আছে, তাহা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, নিদিধ্যাসিতব্য।'—ললিতবাবুর বক্তব্য এই যে, ইংরেজী সাহিত্যের নূতন ধারায় এই 'নীচ জাতি' স্থান লাভ করিয়াছে, এবং বাঙ্গালাতেও তাহার সূচনা হইয়াছে। শ্রীমান রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যে এ বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, এবং করিতেছেন। ললিতবাবুর প্রবন্ধে উদাহরণ ভিন্ন অন্য কোনও নূতন কথা নাই।—রাধাকমল রবীন্দ্রনাথে ইহার অভাব দেখিয়াছেন; ললিতকুমার বলিতেছেন,—'যত দূর বুঝি, তাহাতে মনে হয়, ইংরেজী সাহিত্যে যেমন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এই নবধারা-সঞ্চারে অগ্রণী, তেমনি আমাদের সাহিত্যে "এসিয়ার রাজকবি" রবীন্দ্রনাথ এই নবভাবের, নবরুচির, নবধারার, নব সাহিত্যকলার প্রবর্ত্তয়িতা। কবিতা ও ছোট-গল্পে তিনিই এই নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।' রাধার ও ললিতার বুঝা-পড়া হউক।—এই আলোচনার আর একটা দিক আছে। সংক্ষেপে তাহা এই;—যাহা ইউরোপের সাহিত্যে আছে, তাহাই ভারতের বা বাঙ্গালার সাহিত্যে থাকিবে, এ কামনার কারণ কি? ইংরেজী সাহিত্যের 'আদর্শে' নয়—নকলে বাঙ্গালা সাহিত্যে ইংরেজীয়ানার প্রবর্ত্তন হইয়া থাকিবে; কিন্তু তাহা গতানুগতিকতার লক্ষণ, মৌলিকতার পরিচায়ক নহে। ইউরোপের 'ইতরে' ও বাঙ্গালার 'ইতরে' প্রভেদ আছে। সমাজের সংস্থানেও পার্থক্য অত্যন্ত অধিক।—স্বাভাবিক কারণে ইউরোপের সাহিত্যে যে বিবর্ত্ত হইয়াছে, তথাকথিত 'ইতর' নায়ক-নায়িকার সৃষ্টি হইতেছে, সেই সকল কারণের সমবায়ে এ দেশে সেই অবস্থার সৃষ্টি না হইলে, ইউরোপে হয় বলিয়া, আমাদের সাহিত্যেও তাহার যোড়-কলম বাঁধিলে চলিবে না। ইউরোপের সাহিত্যে উদাত্ত চরিত্রের বিকাশের পর স্বাভাবিক কারণে মানব-

সাধারণের ছবি ফুটিতেছে। তোমার আধুনিক সাহিত্যে সে পূর্ব্ব-স্তর কই? গোড়া কই? আগেই ডগার সৃষ্টি করিবে? নিজের জীবনই দেখিতে পাও না, পরের জীবন, উচ্চ স্তরের জীবন, বা নিম্ন স্তরের জীবন কেমন করিয়া দেখিবে?—ইউরোপে 'ইতর' ও 'দরিদ্র' প্রায় একার্থক। ভারতে দরিদ্র ও ধর্ম্ম—ইউরোপের মত এখনও 'ভিন্ন' হয় নাই; একান্নবর্ত্তীই আছে। অন্ততঃ, বাঙ্গালায় 'দারিদ্র্য' ও 'অপরাধ' একার্থবাচী নহে। এ দেশের সনাতন সাহিত্যে মানব-সাধারণের শ্রেণীবিভাগ করিয়া কখনও রসের সৃষ্টি হয় নাই। ধনীর সাহিত্য ও গরীবের সাহিত্য ইউরোপে আবশ্যক হইয়াছে। এখানে রাজা প্রজার সাহিত্য একই ছিল। এক থাকাই স্পৃহনীয়। তাহাই আমাদের আদর্শ।—ইউরোপে আছে বলিয়াই এখানেও তাহা থাকিবেই, অথবা না থাকিলে চলিবে না, এমন কোনও কথা নাই। যদি তর্কের অনুরোধে তাহাও স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও মনে রাখা উচিত, যে অনুভূতির প্রভাবে ইউরোপ এখন Demosকে স্বীকার করিতেছে, দেশে সে অনুভূতির সঞ্চার না হইলে, সাহিত্যে স্বাভাবিক ভাবে মানব-সাধারণের ছবি ফুটিবে না, ফুটিতে পারে না। দেশ যখন আবার মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবে—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', তখন সকলের সুখ-দুঃখে তাহার বেদনা-বোধ জাগিয়া উঠিবে;—সেই বেদনাবোধ সাহিত্যকেও অনুপ্রাণিত করিবে। বোধ হয়, ভারতবর্ষে সে বেদনাবোধ একটু জাগিয়াছে। তাই এ দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। আশার কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইউরোপের চশমা দিয়া যেন আমরা দেশকে দেখিবার চেষ্টা না করি। ইউরোপে উচ্চ স্তরে ও নিম্ন স্তরে যেরূপ সম্বন্ধ, প্রতীচ্য সমাজে উভয় স্তরের যেরূপ সংঘর্ষ, ভারতবর্ষে 'পতিত জাতির দুর্দ্দশা' সত্ত্বেও, অবস্থা সেরূপ বিষম—সেরূপ শোচনীয় নহে। অন্ততঃ, আমাদের আদর্শ উচ্চ। তাহা যেন আমাদের মনে থাকে।—আর একটা কথাও স্মরণীয়। বিজিত, পরাধীন, নিষ্ক্রিয় দেশে জীবনের সে স্ফূর্ত্তি কই, যাহাতে মানব-জীবন বিচিত্র ও নানা রসে পূর্ণ হইয়া উঠে?—যে তীব্র সুখ, যে তীব্র দুঃখ 'গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারী'র মত মানুষকে 'চাঙ্গা' করিয়া তোলে, সে তীব্র সুখ, সে তীব্র দুঃখ তোমার সমাজের কোন্ স্তরে আছে? যে তীব্র দুঃখবোধে নিষ্পিষ্ট রুসিয়ায় টলষ্টয়ের মত, ডেষ্টোভস্কীর মত, গোর্কীর মত মানবমিত্রের উদয় সম্ভব হইয়াছে, তোমার দেশে সে অরুন্তুদ দুঃখের তীব্র, তীক্ষ্ন, অনুভূতি কই? শুধু 'ফরমাসে' লোক-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না; হইতে পারে না; কখনও কোনও দেশে হয় নাই; হইবে না। জাতির অনুভূতিই সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে। সাহিত্যই জাতির অনুভবকে সঞ্চয় করিয়া রাখে। শুধু 'সাত নকলে' পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করা যায় না। বঙ্কিম, রবীন্দ্রই সম্ভব; টলষ্টয়, ওয়াল্ট হুইটম্যান সম্ভব নয়। 'অন্য' ও 'ভিন্ন' দেশের আদর্শে 'জাতীয়' ও 'স্বদেশী' সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। যখন জাতির মধ্যে দেশাত্মবোধ ফুটিয়া উঠে, তখন জাতীয় প্রতিভারও উদয় হয়। সে প্রতিভা নকল করে না, ফরমাস খাটে না। তখন সেই প্রতিভা জগতের নানা আদর্শ দেখিয়া, আপনার ভাবে আপনার আদর্শ গড়িয়া লয়। সেই আদর্শে জাতি অনুপ্রাণিত হয়। তাহার সাহিত্যও জাতির উপযোগী; আত্ম-শক্তিবিকাশের অনুকূল হয়; সে সাহিত্যে 'সাত রাজার ধন এক মাণিক'; তাহাতেই আত্মস্বরূপের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। সেই ভাবী সাহিত্যই মণি; এ সাহিত্য সে হিসাবে 'মৃদাং চয়ঃ'।

'প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্‌গ্রাহে মণি র্ন মৃদাং চয়ঃ।' এই জন্য ঐ মাটীর সাহিত্যে জাতীয় জীবনের কোনও স্তরই জাতীয়-ভাবে প্রতিবিম্বিত হইতেছে না। এই 'মৃদাং চয়ঃ' মাটী চাপা পড়িবে; ঘোর সংঘর্ষের চাপে কয়লাও হইবে। আরও চাপে, আরও উত্তাপে, মহাকালের মহা-রসায়নে সেই অন্ধকার স্তূপে হীরকও উৎপন্ন হইতে পারে। কেবল ফরমাসে, নকলনবীশীতে বাঙ্গালা সাহিত্য গোলকণ্ডায় পরিণত হইবে না। শ্রীমতী শান্তা দেবীর 'সুনন্দা' নামক গল্পটি মন্দ নহে। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'রাজপুতানার অনার্য্য মীনা জাতির মধ্যে প্রচলিত, একটি গানে'র অনুবাদ করিয়াছেন। মীনা কবি বলিতেছেন,—

'খাজনা রাণা! দিই তোমাকে
খাজনা তোমার পাওনা,
তার বেশী আর চাও যদি তো
বল্‌বো সোজা—"যাও না।" '

'জমীর মালিকে'র শেষ দুইটি ছত্র—

'খাজনা রাজার, জমী প্রজার—
এই আমাদের গাওনা।'

এ কালে সর্ব্বস্ব দিতে হয়! অনেকে তাহার উপর বিবেকবুদ্ধিটুকুও সঁপিয়া দেন। তবে তাহার বদলে 'পায়া' পাওয়া যায়; 'যেমন তেমন চাকরী—ঘি-ভাত' কপালে ফলিয়া যায়; অসার সার হইয়া উঠে; পশুপতি দলপতি হইতে পারে; জয়চাঁদ-পৃথ্বীরাজের ভাবটা চিরজাগরূক থাকে।—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাহিত্যের পাকা শড়ক' নামক ব্যঙ্গ চিত্রখানি আমরা উপভোগ করিয়াছি, যদিও ঐ 'রোলারে'র নীচে পড়িয়া আমরাও ছাতু হইয়া গিয়াছি। কিন্তু গগনবাবু মা সরস্বতীকে ডালে বসাইলেন কেন? এ কল্পনাটি একটু 'গেছো' হইয়াছে। তিনি নিজে কবি কালিদাসের মত যত্র তত্র উপবেশন করিলে আমরা নিশ্চয়ই আপত্তি করিতাম না। কিন্তু মা সরস্বতী, বা কলালক্ষ্মী গাছের ডালে! 'জাপানের সুকুমার শিল্পে' যে ভাষার সুকুমার শিল্প আছে, তাহা অত্যন্ত সাংঘাতিক। 'কল্কি অবতারের ঐতিহাসিকত্বে' শ্রীকাশীপ্রসাদ জায়সবাল সপ্রমাণ করিতেছেন,—'পুরাণবর্ণিত কল্কি এক জন ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং দ্বিতীয়তঃ এই কল্কি সম্ভবতঃ বিষ্ণুবর্দ্ধন-যশোধর্ম্মন।' তাহা হইলে আর 'ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্' বলিয়া স্তব করিবার অবকাশ পাইব না? সব চুকিয়া গিয়াছে? শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের 'গুড়ের উদ্ভব' পড়া দুষ্কর। আমেরিকায় যাহারা জর্ম্মনীর সাইফার উদ্ধার করিতেছে, তাহারা সাহায্য করিলে নিজের দেশের ভাষায় যোগেশ রূপ চেনা যাইতে পারে। শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্তের 'একা' একটি প্রহেলিকা। কবি বলেন,—'অসীমে মায়ার ঘরে পরাণ টানে।' ইহা নূতন সৃষ্টি। মায়া এত দিন সসীমের ঘরে ছিল। নিরঙ্কুশ কবি তাহাকে অসীমের গ্রামে 'অন্তরীণ' করিলেন। তাহার মুক্তির জন্য বাঙ্গালীরা কি আন্দোলন করিবেন না? হয় ত পদ্যটির মধ্যে খুব গভীর রহস্য ও অত্যন্ত গম্ভীর আধ্যাত্মিকতা আছে। আমরাই 'ও রসে বঞ্চিত'। 'বাঘগুহা' সুখপাঠ্য। শ্রীক্ষিতিমোহন সেনের 'মেঘের গান' উল্লেখযোগ্য। ডাক্তার সার

রবীন্দ্রনাথের 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথও অনেক দিন এমন চক্‌চকে, ঝক্‌ঝকে, শানানো, ধারালো রচনা বাঙ্গালীকে দেন নাই। ইহাতে অনেক কথা আছে। তবে অনেক কথার সামঞ্জস্য বা পূর্ব্বাপর সঙ্গতি পাই নাই। সামাজিক সিদ্ধান্তগুলি 'নানা মুনির নানা মতে'র উৎস। হিন্দুর বিরোধী। সে সম্বন্ধে মতভেদ অনিবার্য্য। কিন্তু রাজনীতিক সিদ্ধান্তগুলি দেশ-কাল-পাত্রের অনুকূল। এ অংশের অনেক কথা বাঙ্গালীর পক্ষে সুপথ্য। 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্মে'র প্রকাশে দেশে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাহাও অল্প লাভ নহে। এই সংখ্যায় শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাংখ্যদর্শনের প্রথম পৈঁটা' হইতে যাত্রারম্ভ করিয়াছেন। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'দাবীর চিঠি'তে mannerism ও চল্‌তী ভাষার 'বক্কালে' sublimeকে অত্যন্ত অনায়াসে ridiculous করিয়া তুলিয়াছেন। ক্ষমতার এমন অপব্যবহার ও প্রতিভার এমত লাঞ্ছনা দেখিবার দুর্ভাগ্য বিধাতা বাঙ্গালীর ললাটে লিখিয়া দিলেন কেন? কবি যেন নির্দ্দয়ভাবে ভাব ও ভাষার তুলো ধুনিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালায় ত ধুনুরী কবির অভাব নাই। ইনি তাহাদের পেশার হন্তারক হইতেছেন কেন? 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ভারবির ভাষায় 'হিতং মনোহারি চ'। আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে পড়িতে বলি; পড়িয়া ভাবিতে বলি।

নারায়ণ। ভাদ্র। মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'মেদিনীপুর পরিষদে সভাপতির কথা'য় অনেক নূতন কথা শুনিলাম। শাস্ত্রী মহাশয় চিরজীবন ধরিয়া কত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার ফর্দ্দও শুনিলাম। জ্ঞানের এমন ভাঁড়ার-ঘর বাঙ্গালা দেশে আর কোথায় আছে? ভারতেই বা কই? আমার দেশের কথা এত মমতা করিয়া আর কেই বা কোন দেশে সংগ্রহ করিবে?—কিন্তু ভাবিলে চোখে জল আসে, শাস্ত্রী মহাশয় যক্ষের মত এই 'সাত রাজার ধন' একলা আগলাইয়া রহিলেন! ছিটে-ফোঁটাও দেশবাসীকে দিলেন না। শাস্ত্রী মহাশয়! আপনি যে ফর্দ্দ দিয়াছেন, তাহার সবই আমরা শুনিতে চাই। আমরা ত হাত ধুইয়া বসিয়া আছি। আমাদের ত কানে বাজিতেছে,—'শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।' আর কবে শুনাইবেন? আপনি 'ফাঁকা দেওড়া'র নিন্দা করিয়া 'ফাকা দেওড়া'তেই, যাহা পারিবেন, এবং যাহা পারিয়া উঠিবেন না, তাহারও একটা 'জায়' দিয়াছেন।—আমরা বলি, যাহা ইচ্ছা, যেমন ইচ্ছা, তেমনই করিয়া বলুন। আমরা কেবল শুনিতে চাই। 'ভিক্ষার চাল কাঁড়া কি আঁকাড়া', তাহার বিচার ত করিতেই নাই। এ ক্ষেত্রে সে বিচারের অবকাশও ঘটিবে না, তাহাও আমরা মানি। এখন আমরা হরীতকী হাতে করিয়া বসিব কি? 'হর-মুখ-বিনির্গত' কিছু শুনিবার সৌভাগ্য বাঙ্গালীর ঘটিবে কি? শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বামী' নামক গল্পে প্রতিপন্ন হইয়াছে,—'যে আসে লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ।' শুনিলাম, শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলিয়াছেন,—'রাম! বাঁচা গেল। আমারও দাদা আছে।' তা তিনি বলিতে পারেন। শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাটি মন্দ নহে। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের 'বঙ্গভাষা ও বাংলা ভাষা' প্রবন্ধের ভাষা 'নূতন'ও বটে, 'নতুন'ও বটে। লেখক বলেন,—'বাংলার সাধু ভাষাটি কুলেখকের হস্তে প্রাণহীন, আড়ষ্ট, আড়ম্বরগ্রস্ত পণ্ডিতী ভাষা হইয়া উঠিতেছে।' কুলেখকের হস্তে পণ্ডিতী ভাষার কিরূপ দুর্গতি হয়, নলিনীর ভাষায় তাহার পূর্ণ পরিচয় আছে। কিন্তু 'পণ্ডিতী ভাষা' 'প্রাণহীন' হইতে আরম্ভ করিয়া 'আড়ম্বরগ্রস্ত' পর্য্যন্ত সব, তাহা স্বীকার করিব না। ইনি 'নূতন

কিছু অনুস্যূত' করিয়া দেন ; আবার 'দৈনন্দিন জীবনকে হুবহু অনুকরণ' করেন। 'বাংলার চলিতভঙ্গিমা' প্রভৃতি নলিনীর 'নতুন' সৃষ্টি! আমরা সে দিন চল্‌তী ভাষার প্রধান পাণ্ডা শ্রীপ্রমথ চৌধুরীকে বলিয়াছিলাম,—বাঙ্গালী কি লিখিবে, আগে তাহাই ঠিক কর। তার পর, কোন ভাষায় লিখিবে, তাহার বিচার করিও।—ভাষা কি ফরমাইসে চলে? না, যাহার style আছে, সে কাহারও উপদেশে সে style ছাড়ে, ছাড়িতে পারে, অথবা ছাড়িলে সাফল্য লাভ করে? খোদ প্রমথনাথের মত সংস্কৃত ত অনেক পণ্ডিতও চালাইতে পারেন না? 'তাজ-মহল' লিখিবার সময় রবীন্দ্রনাথও ত 'খেয়া'র ভাষায় লেখেন নাই? সব জিনিসের ভাষাও কি 'এক-রকম' হইতে পারে? শক্তিশালী লেখকেরা কি একটা style-এর গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিতে পারেন? পণ্ডিতেরা কি চল্‌তী ভাষায় লেখেন নাই? বিদ্যাসাগরের 'উপযুক্ত ভাইপোস্য' বা 'ব্রজবিলাসে'র ভাষায় শকুন্তলার অনুবাদ চলিত না; সীতার বনবাসের ভাষায় তিনি বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহের বিচার করেন নাই। মদন তর্কালঙ্কার বাসবদত্তার ভাষায় শিশুশিক্ষা লেখেন নাই। শিশুশিক্ষার ভাষাই বঙ্কিমের হাতে পড়িয়া বঙ্কিমী ভাষায় বিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের বড় গাছ, ছোট পাতাও সেই ভাষা। ভাষারও বিবর্ত্ত আছে। প্রমথ বা নলিনী, কেহই সে বিবর্ত্তের গতি রুদ্ধ করিতে পারিবেন না। তবে না শিখিয়া যাহারা বাঙ্গালা লেখে, তাহাদের হাতে সকল ভাষারই লাঞ্ছনা হয়। অপপ্রয়োগ সকল রচনারীতিরই জল্লাদ। বাঙ্গালা ভাষা 'অশিক্ষিতপটুত্বে'র অত্যাচারেই কাবু হইয়া পড়িতেছে। সাধু বা চল্‌তী, যেটা জানো, তাহাতেই লেখো। কিন্তু প্রথমে লিখিবার বস্তুর ও বক্তব্যের সন্ধান কর। আর গুছাইয়া লিখিতে শেখ। শ্রীবিপিনচন্দ্র পালের 'বুদ্ধিমানের কর্ম্ম' রবীন্দ্র-নাথের 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্মে'র—প্রতিবাদ বলিবার যো নাই,—আলোচনা! 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি!'— এখনও সমাপ্ত হয় নাই।

ভারতী। ভাদ্র।—এই সংখ্যার প্রথমেই 'কার্টুনে' এক জন 'খর্ব্ব স্থূলকলেবর' ইঙ্গ-বঙ্গ টাকার মিনারে দাঁড়াইয়া সূর্য্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া হাউই ছুঁড়িতেছেন। দক্ষিণ পার্শ্বে হাইকোর্টের চিত্র।—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত। 'বুঝ লোক, যে জানো সন্ধান!' —'কার্টুনে'র কল্পনা প্রশংসনীয়। তবে সূক্ষ্মদর্শী বাঙ্গালা দেশের পক্ষে উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যে এইরূপ ব্যঙ্গ-চিত্রের আমদানীর ফলে কি ঘটিবে, তাহা বলা যায় না। শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর 'দণ্ডনীতির প্রথম ইতিহাস' সুসঙ্কলিত সন্দর্ভ। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'টুপি' চলনসই—কিন্তু সুখপাঠ্য। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ক্রপটকিনের 'সার্ব্বজনীন কল্যাণ' সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। ভাষায় জড়তা আছে। লেখক প্রাঞ্জল করিবার জন্য চল্‌তী ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু দুরূহ সংস্কৃত শব্দেরও অভাব নাই। বোধ হয়, 'হালে পানী' পান নাই। রচনারীতি আয়ত্ত না হইলে, পরিপাক করিয়া লিখিবার অভ্যাস না হইলে, শুধু চল্‌তী ভাষায় কুলায় না। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকারের 'বংশানুক্রমের গোড়ার কথা' এক বিন্দু। বিষয়টি সময়োপযোগী। শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী 'পূজা' কবিতায় বলিয়াছেন,—

'দুঃখ এ যে চিরমৌন, কোথায় ভাষা তার?'

এই জন্যই কি এই শ্রেণীর কবিতায় ভাষা এত নিষ্ফল হয়? শ্রীমতী রেণু রায় ওয়াশিংটন

আর্ভিং হইতে 'স্বপ্নসুন্দরী'র আবাহন করিয়াছেন। এরূপ অনুবাদ তথাকথিত বহু মৌলিক রচনা অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'হিন্দোল-বিলাস' নামটিতে যে কবিত্ব আছে, কবিতায় কবি যেন তাহাকে ভ্যাঙ্গচাইয়াছেন। একটি চরণ, বা চরণার্দ্ধ—তাহা বুঝিবারও কবি পথ রাখেন নাই!—এইরূপ,—'ফুরসুৎ নেই আজ নেই, বন্ধু!' তোমার নিশ্চয়ই আছে, নহিলে লিখিলে কেমন করিয়া? কিন্তু বন্ধু, বাঙ্গালীর 'ফুরসুৎ' কি এত বেশী যে, তাহারা বার্ষিক তিন টাকা ছয় আনা দিয়া ধরা পড়িয়াছে বলিয়া এইরূপ কবিতার অপচার পড়িবে? রবীন্দ্রনাথের 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' 'ভারতী'তেও ছাপা হইয়াছে। রবীন্দ্র-নাথের 'গান'—'দেশে দেশ নন্দিত করি' চল্‌তী ভাষার বিপক্ষে বিষম অভিযান।

"নূতন-যুগ-সূর্য্য উঠিল, ছুটিল তিমির রাত্রি,
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?
গত গৌরব, হৃত আসন, নতমস্তক লাজে,
গ্লানি তার মোচন কর, নরসমাজ মাঝে
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে,
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান।

জনগণপথ তব জয়রথচক্রমুখর আজি,
স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?
দৈন্যজীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাস রুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা,
কোটিমৌনকণ্ঠপূর্ণ বাণী কর দান হে,
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান।"

প্রমথ চৌধুরী এও কোং কি বলেন? চল্‌তী ভাষায় 'চল্‌তী চাক্‌রী' চলিতে পারে, বড় কাজ চলে না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাহা স্বীকার করিলেন। অন্ততঃ তাঁহার প্রতিভা এই গানের ভাষায় চলতী ভাষার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিতেছে।—ইহার 'দিন আগত ঐ, তবু ভারত কই?' এই ধুয়ার অর্থ ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া বুঝিতে হয়। ইহাতে উদ্দীপনা আছে, কিন্তু 'অগ্নি নির্ম্মল-সূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরণী'র অপূর্ব্ব ঝঙ্কারও নাই, অতুলনীয় সৌন্দর্য্যও নাই, সে প্রাণের স্পন্দনও নাই। 'মিশরবাসীর পূর্ব্বপুরুষ' উল্লেখযোগ্য। 'মাস-কাবারী'র 'রাষ্ট্র ও ব্যক্তি' যুগ-ধর্ম্মের সাধকগণের সাহায্য করিবে।

স্বাস্থ্য-সমাচার। ভাদ্র।—ডাক্তার শ্রীরাখালচন্দ্র নাগের 'যক্ষ্মা রোগে দিনচর্য্যা'য় অনেক জানিবার ও শিখিবার কথা আছে। এ সকল কথা জানি না, এবং শিখি না বলিয়া, আমরা প্রায়ই 'আথান্তরে' পড়ি। কোন রোগের দিনচর্য্যা কিরূপ, তাহা জানা থাকিলে, রোগীরও উপকার, গৃহস্থেরও সুবিধা। ডাক্তার শ্রীরাজেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত 'চা-বাগানে কুলীদের

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা' প্রবন্ধে অনেক রহস্যের উদ্ভেদ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি এখনও সমাপ্ত হয় নাই। বিশেষবিৎ লেখকগণ কলম ধরিলে এইরূপ অনেক নূতন তথ্য জানা যায়। 'শরীর-চর্চ্চা'র মত প্রবন্ধ অধিকমাত্রায় প্রকাশিত হইলে ভাল হয়।

গৃহস্থ। শ্রাবণ। বহু দিন পরে 'গৃহস্থ' পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বাঙ্গালী যদি 'গৃহস্থে'র জীবন রক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলে, বাঙ্গালীকে দুর্ভাগ্য ভাবিবার কারণ ঘটিবে। এবারকার 'আলোচনা'য় 'পল্লী-সেবার আয়োজনে' অনেক সুপরামর্শ আছে। পল্লীই বাঙ্গালার প্রাণ। পল্লীর দুর্দ্দশার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর অধঃপাত হইয়াছে; বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি কমিতেছে। পল্লী রক্ষা না করিলে আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারিব না। গৃহস্থ জন্মাবধি পল্লীসেবার পথে বাঙ্গালীকে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সুখের বিষয়, 'গৃহস্থে'র চেষ্টা সার্থক হইয়াছে ;—'কয়েক স্থানে আমাদের ['গৃহস্থে'র] আদর্শানুযায়ী কাজ আরম্ভ হইয়াছে ও কিছু সুফলও পাওয়া গিয়াছে।' 'পল্লীসেবার সদুপায়' গ্রামে গ্রামে অনুসৃত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। 'আমাদের শিক্ষা' ও 'অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস' উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ 'কচু' নামক প্রবন্ধে কচুর নানা জাতির ও নানা তথ্যের পরিচয় দিয়াছেন। 'নিজামপুর পরগণার বিবরণ' বার্ত্তাশাস্ত্রের আলোচনাকারীদের উপকারে আসিবে। 'মফস্বলের বাণী'তে 'সুরমা' হইতে কোনও বাঙ্গালী সৈনিকের জননীর এক পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা সকলকে তাহা পড়িতে বলি।—যুগধর্ম্মের প্রভাব কে অতিক্রম করিবে? বাৎস্যায়ন তাঁহার 'সূত্রে' কত শত বৎসর পূর্ব্বে যে বঙ্গাঙ্গনাকে 'কোমলা' বলিয়া গিয়াছেন, এবং আজও যে বঙ্গনারী 'অবলা' বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ, সেই বঙ্গনারীকে যিনি এই মনোবলের আধার করিয়াছেন, তাঁহার কৃপায় এই যুগধর্ম্ম সাফল্য লাভ করুক, বাঙ্গালী ধন্য হউক।

ভ্রম-সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৮২	৬	Chateaw	Chateau
"	২৬ ও ২৭	হাজা	ছাজা
৩৮৪	১০	-ভবনের	-ভবনের প্রতিকৃতি রাখিয়া
"	২৯	সাফর্খাঁর	সাকার্খাঁর
৩৮৫	২৩	"মান—"	লাল—
"	২৪	"অটম"	"অটল"
৩৮৬	১	রীতীর	রীতির
৩৮৮	১৩	architran	architrave
"	"	cornia	cornice
৩৮৯	৭	Fugussun	Fergusson
"	৯	উপল	উপান

মাঘের কাল—কত কাল ?

বহু বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়গণ বি. এ.-পরীক্ষার্থিগণের সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকগুলির মধ্যে মহাকবি মাঘের মহাকাব্যের পুনরায় স্থানবিধান করিয়াছেন। এই সময়ে, মাঘের অভ্যুদয়-কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিত হইলে, অন্য কাহারও কোনরূপ উপকার হউক বা না হউক, পরীক্ষার্থিগণের কিছু উপকার হইলেও হইতে পারে, এইরূপ বিবেচনায় এই পুরাতন প্রসঙ্গের পুনঃ-পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। বিষয়টি প্রাচীন হইলেও, তৎসম্বন্ধে শেষ কথা অদ্যাপি বলা হয় নাই। ভারতীয় প্রাচীন মহাকবিগণের কাল-নিরূপণ যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাহা বোধ হয়, কাহারও অবিদিত নাই। কি অজ্ঞাত কারণে আমাদের দেশের প্রাচীন কবিগণ স্ব স্ব গ্রন্থে আত্ম-পরিচয় নিবদ্ধ করিতেন না, তাহা লইয়া বিতর্ক নিরর্থক। এমন কি, কবিগণ প্রায়ই সম-সময় ব্যক্তিবিশেষের, বা রাজাদির, অথবা সম-সময়-প্রসিদ্ধ বৃত্তান্তাদির উল্লেখেও বিমুখ। ভাস, অশ্বঘোষ, কালিদাস, বিশাখদত্ত, ভারবি, ভট্টি, ভবভূতি প্রভৃতি কোনও মহাকবিই নিজ অভ্যুদয়কালের কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই। তবে তন্মধ্যে কোনও কোনও মহাকবি স্ব স্ব গ্রন্থে অল্পবিস্তর আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তত্তৎ-কবি-রচিত কাব্য-নাটকাদিই তাঁহাদের নাম সংস্কৃত-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিয়াছে। কবির অন্য পরিচয় সংগ্রহ করিতে হইলে, কবি-লিখিত গ্রন্থাদির বাহিরেও উপাদান খুঁজিতে হয়। বাহিরের উপাদানই অনেক সময়ে কবি-কাল-কল্পনায় প্রধান সহায় হইয়া পড়ে।

অশ্বঘোষ, কালিদাস, ভারবি প্রভৃতি মহাকাব্য-রচয়িতৃগণের ন্যায় মহাকবি মাঘের স্থানও যে সংস্কৃত-সাহিত্যে উচ্চ, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। "শিশুপাল-বধ" ব্যতীত কবির রচিত অন্য কোনও গ্রন্থের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। মাঘের ন্যায় মনীষা-সম্পন্ন মহাকবি যে অন্য কোনও গ্রন্থাদির রচনা করেন নাই, তাহাও বলা কঠিন। মাঘের রচিত বলিয়া বল্লভদেব ও ক্ষেমেন্দ্র কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু এই শ্লোকগুলি "শিশুপাল-বধে" প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহাতে পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বিবেচনা করেন

যে, প্রতিভা-সম্পন্ন মহাকবি মাঘ "শিশুপাল-বধ" ব্যতীত অন্য গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক, "শিশুপাল-বধে"র অনেক টীকা প্রাপ্ত হওয়া যায়; তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় মল্লিনাথের রচিত সর্ব্বঙ্কষা নাম্নী ব্যাখ্যাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। ভারতের সর্ব্বত্রই এই মহাকাব্যের পঠন-পাঠন চলিতেছে। মাঘের কাল-নির্ণয়-কল্পে যে সকল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিত যথোচিত চেষ্টা করিয়াছেন, তন্মধ্যে পূণার অধ্যাপক পাঠক ও সর্ব্বদেশ-বিশ্রুত মনীষী কিলহর্ণের নাম প্রধানভাবে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। অধ্যাপক পাঠক ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর তারিখে "Bombay Branch of the Royal Asiatic Society"র এক অধিবেশনে (১) মাঘের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে এক গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং মনীষী কিলহর্ণ "Journal of the Royal Asiatic Society"টীতে এই সম্বন্ধে দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ (২) লিখিয়াছিলেন।

মাঘ গ্রন্থাবসানে শ্লোক-পঞ্চকে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতে যাইয়া, সে কালের এক নরপতির নামের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সেই নৃপতির নাম ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আখ্যাত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। মূল নামটির আকার যে কিরূপ ছিল, তাহা সম্প্রতি ধার্য্য করা কঠিন। গ্রন্থ-প্রতিলিপি-লেখকগণের দোষেই রাজ-নামটির আদি রূপটি লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মাঘের পিতামহ [দত্তক-পিতা] সুপ্রভদেব যে নৃপতির "সর্ব্বাধিকারী" মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার নাম "শ্রীবর্ম্মলাখ্যস্ত", "শ্রীবর্ম্মলাতস্ত" ও "শ্রীধর্ম্মনাভস্ত" এই তিন আকারে বিভিন্ন সংস্করণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত অসংখ্য প্রাচীন লেখের মধ্যে কোনও স্থানেই এইরূপ নামে পরিচিত কোনও নৃপতির অস্তিত্ব বিষয়ে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মনীষী কিলহর্ণ J. R. A. S. (p. 728) পত্রিকায় মাঘের কাল সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, মিঃ জি. এইচ্. ওঝা অধ্যাপক কিলহর্ণের নিকট রাজপুতানায় প্রাপ্ত একখানি প্রাচীন লিপির যে প্রতিলিপি পাঠাইয়া দেন, তাহাতে ৬৮২

(১) Proceedings of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society—1897-1898—pp. 303-307—দ্রষ্টব্য।

(২) I. R. A. S—1906, p. 728, 3, I. R. A. S—1878, pp. 499-502 দ্রষ্টব্য।

বিক্রমাব্দে (=৬২৫—২৬ খৃষ্টাব্দে) বর্ম্মলাত নামক এক রাজা ভারতবর্ষের সেই অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন বলিয়া উল্লেখ আছে। এই লিপি হইতে অধ্যাপক কিলহর্ণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, কবির আত্ম-পরিচয়-বিজ্ঞাপক শ্লোকে যে "বর্ম্মলাত"-নামক নরপতির উল্লেখ আছে, সেই নরপতি ও রাজপুতানায় প্রাপ্ত প্রাচীন লিপিতে উল্লিখিত বর্ম্মলাত নামক নরপতি অভিন্ন ব্যক্তি। অতএব, অধ্যাপক কিলহর্ণ মনে করেন যে, সুপ্রভদেবের পৌত্র ও দত্তকের পুত্র মহাকবি মাঘ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধের [৬৫০-৭০০ খৃঃ] লোক ছিলেন। কিন্তু বর্ম্মলাতের রাজত্ব-সময়ের উল্লেখ হইতে এরূপ বলা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হইবে না যে, মাঘ সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধেরই লোক ছিলেন; অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের বা প্রথম পাদের লোক ছিলেন না। তবে মাঘকে যাঁহারা দশম বা দ্বাদশ শতাব্দীর কবি বলিয়া ধার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মত যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তাহা বলা আর অসঙ্গত হইবে না। কোনও কোনও পণ্ডিত "ভোজপ্রবন্ধ", "প্রবন্ধ-চিন্তামণি", "প্রভাবক-চরিত" প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আখ্যানমালা হইতে অনুমান করিয়া থাকেন যে, মাঘ ধারার ভোজরাজের [১০১৮-৬০ খৃঃ] সম-সাময়িক কবি ছিলেন। কিন্তু এই সকল আখ্যানে বর্ণিত বিষয় যে ঐতিহাসিক সত্য নহে, এবং মাঘ যে ভোজরাজের বহু পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার প্রমাণরূপে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষার্দ্ধের আলঙ্কারিক আনন্দবর্দ্ধনও মাঘের কাব্য হইতে উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন কি, রাজা ভোজদেবও তাঁহার "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ" নামক অলঙ্কার গ্রন্থে "শিশুপাল-বধ" হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সোমদেবের "যশস্তিলক" গ্রন্থ ৮৮১ শকাব্দায় সমাপ্ত হইয়াছিল; এই গ্রন্থেও মাঘের উল্লেখ আছে। মাঘ যে ধারার ভোজরাজের সম-সাময়িক নহেন, শেষোক্ত প্রমাণই তদ্বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু অধ্যাপক পাঠক তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধে একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মাঘ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ছিলেন—পরে কখনই নহে। প্রমাণটি এই,—৮১৪ খৃষ্টাব্দে নৃপতুঙ্গ নামক এক গুণবান নৃপতি সিংহাসন প্রাপ্ত হন; সিংহাসনলাভের কিছু কাল পরে তিনি "কবিরাজ-মার্গ" নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; সেই গ্রন্থে তিনি মহাকবি মাঘেরও উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ অনুমান বোধ হয় অ-যুক্তিসহ হইবে না যে, নৃপতুঙ্গের সমসাময়িক লোক-সমাজে, অর্থাৎ নবম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে, মহাকবি মাঘের যশঃ ও প্রতিপত্তি বিদ্বজ্জনমণ্ডলে একরূপ সংস্থাপিত হইয়া

গিয়াছিল; কারণ, উক্ত "কবিরাজমার্গ" নামক গ্রন্থে শকুন্তলা-রচয়িতা কবির সহিত মাঘের স্থান নিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব, অষ্টম শতাব্দীর শেষার্দ্ধকে আমরা মাঘের অভ্যুদয়কালের উত্তর-সীমা বলিয়া ধার্য্য করিয়া লইতে পারি।

কবি-কালের পূর্ব্বসীমা সম্বন্ধে এখন একটু আলোচনা করা যাউক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অধ্যাপক কিলহর্ণের মতে, মাঘের অভ্যুদয়-কাল সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধের [৬৫০-৭০০ খৃষ্টাব্দের] মধ্যে ধার্য্য করা যাইতে পারে। আমরা বলিব যে, অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে মাঘের কাল নিরূপিত হইলে কোনও ক্ষতি নাই। মাঘের পিতামহ সুপ্রভদেব যে বর্ম্মলাত-নৃপতির মন্ত্রী ছিলেন, তিনি সৌগতধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, এরূপ অনুমান করা কঠিন নহে। কবির অভ্যুদয়-কালে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাবও যে বহুলভাবে বিস্তৃত ছিল, তাহার প্রমাণ কবিকৃত তদ্ধর্ম্মের নানা ভঙ্গীতে উল্লেখ। বর্ম্মলাত স্বমন্ত্রী সুপ্রভদেবের হিতোপদেশ কিরূপ অনুরাগের সহিত শ্রবণ করিতেন, তাহার বর্ণনায় মাঘ লিখিয়াছেন—

"কালে মিতং বাক্যমুদর্কপথ্যং তথাগতস্যেব জনঃ সুচেতাঃ।
বিনানুরোধাৎ স্বহিতেচ্ছয়ৈব মহীপতির্যস্য বচশ্চকার॥"—২০।৮১

"সুচেতা ব্যক্তি যেমন বিনা অনুরোধে, আত্মহিতকামনায়, বুদ্ধদেবের যথাকালে প্রযুক্ত, পরিণাম-হিতকর বাক্য মান্য করিতেন, সেইরূপ মহীপতি [বর্ম্মলাতও] তাঁহার [সুপ্রভদেবের] যথাকালে প্রযুক্ত পরিণাম-হিতকর উপদেশ-বাক্য বিনা অনুরোধে, আত্মহিতেচ্ছায়, মানিয়া চলিতেন।" অন্যত্রও [১৫।৫৮ শ্লোকে] মাঘ শিশুপাল-পক্ষাশ্রিত রাজমণ্ডলকে "মার-বলে"র সহিত তুলনা করিয়া, "হরি"কে [কৃষ্ণকে] "বোধিসত্ত্বে"র সহিত তুলনা করিয়া উপমা-অলঙ্কারের প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা,

"ইতি তত্তদা বিকৃতরূপমভজত্তদবিভিন্নচেতসম্।
মারবলমিব ভয়ঙ্করতাং হরি-বোধিসত্ত্বমভি রাজমণ্ডলম্॥"

"এই ভাবে, সেই সময়ে, সেই রাজমণ্ডল মদন-সৈন্যের ন্যায় [ক্রোধে] বিকৃত আকার ধারণ করিয়া. অবিকৃত-চিত্ত বোধিসত্ত্বরূপী হরির সমীপে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিলেন।" হয় ত শাক্যসিংহের ধর্ম্মে অনুরক্ত পৃষ্ঠপোষক নরপতি বর্ম্মলাতকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্যই কবি এইরূপ বর্ণনার অবতারণা করিয়া থাকিবেন। মাঘ নিজ মহাকাব্যে বৌদ্ধ বৈয়াকরণগণের প্রণীত গ্রন্থেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তবে সর্ব্বশাস্ত্র-পারীণ মহাকবি সৌগত-শাস্ত্রেও অধীত-

বিদ্য ছিলেন, ইহা হইতে তাহাও প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, বৌদ্ধ-রচিত কোনও কোনও ব্যাকরণ গ্রন্থ মাঘকাব্যে উল্লিখিত হইয়াছে, এবং তাহা হইতে কবির কাল-নিরূপণে কোনও সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। তন্মধ্যে কোনও কোনও বৌদ্ধকৃত ব্যাকরণ-গ্রন্থের নূতনতা কবির জীবনসময়েও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই, এরূপ মনে করিলেও করা যাইতে পারিবে। শিশুপালবধের দ্বিতীয় সর্গের ১১২শ শ্লোকে কবি—রাজার চার-প্রেরণ কার্য্য অতীব প্রয়োজনীয়—এই কথার বর্ণনায় শ্লেষ-অলঙ্কারের প্রয়োগ করিয়া ভগবান্ পতঞ্জলির প্রণীত ব্যাকরণ-মহাভাষ্য ও সেই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের পস্পশ-নামক প্রথম আহ্নিক, কাশিকা-বৃত্তি ও কাশিকা-বিবরণ-পঞ্জিকা বা [বৃত্তি-ব্যাখ্যান গ্রন্থ] ন্যাস-নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"অনুৎসূত্র-পদন্যাসা সদ্বৃত্তিঃ সন্নিবন্ধনা।
শব্দবিদ্যেব নো ভাতি রাজনীতিরপস্পশা॥"

"শব্দবিদ্যাতে সূত্র-প্রযুক্ত-পদ ব্যতীত অন্য পদের ব্যবহার-বিহীন ন্যাস গ্রন্থের, [কাশিকা]-বৃত্তির ও ভাষ্যগ্রন্থের সৎপরিচয় থাকা সত্ত্বেও, যেমন সেই বিদ্যা পস্পশ-নামক [ভাষ্য-সন্দর্ভের] জ্ঞান না থাকিলে [পাঠকের পক্ষে] শোভন হয় না, সেইরূপ রাজনীতিতে এক পদবিক্ষেপও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ না হইলেও, এবং [অমাত্যাদির] বৃত্তির ও [অনুজীব্যগণের] পারিতোষিকাদির সদ্ব্যবস্থা থাকিলেও, তাহা চারগণের [স্পশের] অপ-ব্যবস্থায় শোভন হয় না।"

টীকাকার মল্লিনাথ স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে, এই শ্লোকে শব্দবিদ্যাপক্ষে "ন্যাস"-শব্দে বৃত্তিব্যাখ্যান গ্রন্থবিশেষকে, "বৃত্তি"-শব্দে কাশিকাখ্য সূত্র-ব্যাখ্যান গ্রন্থবিশেষকে ও "নিবন্ধন"-শব্দে ভাষ্যগ্রন্থকে বুঝাইতেছে, এবং "পস্পশ"-শব্দ শাস্ত্রারম্ভ-সমর্থক উপোদ্‌ঘাত-সন্দর্ভ গ্রন্থকে বিজ্ঞাপিত করিতেছে। বলা বাহুল্য যে, পাণিনি ব্যাকরণের "কাশিকা-বৃত্তি" জয়াদিত্য ও বামন নামক দুই জন বৌদ্ধ আচার্য্যের সহযোগে রচিত হইয়াছিল। এই কাশিকা-বৃত্তির ন্যাস-গ্রন্থ নামক ব্যাখ্যা বোধিসত্ত্ব-দেশীয় আচার্য্য জিনেন্দ্রবুদ্ধির বিরচিত। জয়াদিত্য সম্বন্ধে চীন-দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ইৎ-সিঙ্গ লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার মৃত্যু খৃষ্টীয় ৬৬১-৬২ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। জিনেন্দ্র-বুদ্ধি ন্যাস-গ্রন্থে জয়াদিত্য-প্রণীত বৃত্তিরই ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। তিনি জয়াদিত্যের অন্ততঃ কিছু কাল পরেই বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সে যাহা হউক,

এই উভয় ব্যাকরণ-গ্রন্থই অত্যুৎকৃষ্ট বৌদ্ধ-কৃতি। বৌদ্ধ ইৎ-সিঙ্গের পক্ষে উভয় গ্রন্থেরই সমাদর কম হইবার কথা নহে। তবে তিনি কাশিকাকারের উল্লেখ করিয়াছেন, ন্যাস-কারের উল্লেখ করেন নাই কেন? ইহা হইতে এইরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, কাশিকাকার জয়াদিত্যের মৃত্যুসময় [৬৬১-৬২ খৃঃ] হইতে পরিব্রাজকের ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবর্তনসময় পর্য্যন্ত [৬৯৫ খৃঃ], হয় ত ন্যাস-কার জিনেন্দ্রবুদ্ধির অভ্যুদয় হয় নাই। এই প্রসঙ্গে আমাদের আরও একটি কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, সৌগতধর্ম্মের উপর যে যে গ্রন্থের বা যে যে বৃত্তান্তের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হইত, তাহার সংগ্রহের জন্যই বৌদ্ধ ইৎ-সিঙ্গ, ইউয়ান চোয়াঙ্‌ প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজকগণ ভারতভ্রমণে সময়ক্ষেপ করিতেন। সুতরাং ইৎ-সিঙ্গ কর্ত্তৃক [৬৭১-৯৫ খৃঃ] জিনেন্দ্রবুদ্ধি বা তদীয় ন্যাসগ্রন্থের অনুল্লেখ হইতে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, ন্যাসগ্রন্থ অষ্টম শতাব্দীর কোনও সময়ে রচিত হইয়া থাকিবে, এবং সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধের নরপতি বর্ম্মলাতের মন্ত্রী সুপ্রভদেবের পৌত্র ন্যাস-গ্রন্থের উল্লেখকারী মাঘকবিকে আমরা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের [৭০০-৭৫০ খৃঃ] লোক বলিয়া অনায়াসে ধরিয়া লইতে পারি। হয় ত, তখন জিনেন্দ্রবুদ্ধি-বিরচিত ন্যাস-গ্রন্থও নূতন অবস্থায়ই লোকসমাজে খ্যাতি লাভ করিয়া থাকিবে। পূর্ব্বেও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মাঘের অভ্যুদয়কালের উত্তর-সীমা নবম-শতাব্দীর পূর্ব্বেই ধার্য্য করিতে হইবে।

এ স্থলে আরও একটি প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ করা যাইতেছে। অধ্যাপক কিলহর্ণ মাঘের উপরি-উল্লিখিত শ্লোকটির মল্লিনাথ-কৃত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া বলিয়াছেন যে, সেই শ্লোকে কেবল "ন্যাস" ও "বৃত্তি" শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া, তাহা হইতে গ্রন্থবিশেষের নাম বুঝিয়া লওয়া সঙ্গত হয় না। তাঁহার মতে, "পাণিনি-প্রণীত-সূত্রাণাং বিবরণম্"-ই বৃত্তি নামে আখ্যাত হয়, এবং কাশিকা-কার জয়াদিত্য যেমন প্রাস্তাবিক শ্লোকে "ভাষ্য" ও "বৃত্তি"র উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্রূপ মাঘও এই শ্লোকে তাহাই করিয়াছেন। "বৃত্তি" শব্দে মাঘ কাশিকা-বৃত্তির ন্যায়, কুণি প্রভৃতি আচার্য্য-বিরচিত বৃত্তিকে, এবং চুল্লি [বা রুল্লি], ভট্টি, নল্লূর প্রভৃতির বৃত্তিকেও উদ্দেশ্য করিয়া থাকিতে পারেন। হরদত্ত ও ন্যাসকার জিনেন্দ্রবুদ্ধি এই সকল টীকাকারের নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, কাশিকা-কার প্রভৃতি তাঁহাদের বৃত্তি হইতে সাহায্য পাইয়াছেন। মাঘ কোনও গ্রন্থবিশেষের নাম গ্রহণ করিয়া-

ছেন বলিয়া অধ্যাপক কিলহর্ণ স্বীকার করেন নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ব্যাকরণ শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় কোনও "পদের ন্যাস উৎসূত্র [সূত্রবহির্ভূত]" হইবে না—তাহা অতি প্রাচীন মহাভাষ্য গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে ; যথা, "যো হি উৎসূত্রং কথয়েন্নাদো গৃহ্যেত"। তিনি আরও বলেন যে, "সূত্রেষ্বেব হি তৎসর্ব্বং যদ্বৃত্তৌ যচ্চ বার্ত্তিকে"—এই বাক্য পরবর্ত্তী বৈয়াকরণদের কথা। এই বিষয়টির সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি সম্প্রতি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির ব্যয়ে জিনেন্দ্র-বুদ্ধি-কৃত ন্যাসগ্রন্থের এক সংস্করণ করিয়া, জগতে সর্ব্বপ্রথম সেই অমূল্য গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করিতেছেন। তিনিও বলিলেন যে, মাঘ এই শ্লোকে ন্যাস-গ্রন্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন যে, বাস্তবিকই এই "ন্যাস" "অনুৎসূত্রপদ" গ্রন্থ ; অর্থাৎ, ন্যাসকার সূত্রাক্ষর অবলম্বন করিয়াই কাশিকা-বৃত্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং প্রতিপদে কাত্যায়ন-প্রণীত বার্ত্তিকসূত্রের খণ্ডন করিয়াছেন। অধ্যাপক কিলহর্ণ আরও একটি কথা লিখিয়াছিলেন যে, ন্যাসকার জিনেন্দ্রবুদ্ধি সম্ভবতঃ মাঘের পরবর্ত্তী কালের লোক ; কারণ, তাঁহার মতে জিনেন্দ্রবুদ্ধি হরদত্তের পদমঞ্জরী হইতেই যদৃচ্ছাক্রমে নিজগ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং পদমঞ্জরী-কার একাধিকবার মাঘের নামোল্লেখপূর্ব্বক মাঘগ্রন্থ হইতে উদাহরণ প্রয়োগ করিয়াছেন ; অর্থাৎ, কিলহর্ণের মতে, কালসম্বন্ধে মাঘ, হরদত্ত ও জিনেন্দ্রবুদ্ধির ক্রম পর পর ধরিতে হইবে। কাযেই তাঁহার মতে, ন্যাসকার মাঘের অনেক পরবর্ত্তী। কিন্তু আমার অধ্যাপক মহাশয় স্বয়ং পদমঞ্জরী-গ্রন্থ হইতে আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, তদ্গ্রন্থকার হরদত্ত বহুস্থলে "ন্যাসকারস্ত্বাহ" বলিয়া ন্যাস গ্রন্থ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং অন্যান্য স্থানেও "কেচেত্তু"—"অন্যে চ" ইত্যাদি নির্দ্দেশপূর্ব্বক ন্যাসকারের মতের সমালোচনা করিয়াছেন। অতএব, ন্যাসকার জিনেন্দ্রবুদ্ধি যে পদমঞ্জরী-কার হরদত্তের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, এবং তিনি যে মাঘেরও পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন, তাহাও বলা কঠিন। সে যাহা হউক, পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতেও ন্যাস-গ্রন্থ অষ্টম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং পূর্ব্ব-প্রদর্শিত-ক্রমে আমরা মহাকবি মাঘের কাল অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে ধার্য্য করিতে পারি।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

ত্র্যম্বকেশ্বর।

ত্র্যম্বক অথবা ত্র্যম্বকেশ্বর নাসিক হইতে প্রায় দশ ক্রোশ। ১৯১৪, ২৭শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার প্রত্যুষে টপালে অর্থাৎ ডাক-টাঙ্গায় আরোহণ করিয়া ত্র্যম্বক তীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্রথমে কতকগুলি সাহেবদিগের বাঙ্গলো দেখিলাম। তার পর দুই মাইল ধরিয়া পথের দু'ধারে বড় বড় আম্রতরুর সারি সুন্দর বিতান-পথের সৃষ্টি করিয়া পথটিকে ছায়াময় করিয়া রাখিয়াছে। শীতকাল—কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে; দুই দিকেই প্রায় উন্মুক্ত তৃণতরু-শস্যশূন্য প্রান্তর ধূ-ধূ করিতেছে। উদ্ভিদের শ্যামশোভাশূন্য কালো কালো পাহাড় দেখা যাইতে লাগিল। শুনিলাম, বর্ষায় এই শৈলমালা তৃণপত্রোদ্গমে শ্যামায়িত হইয়া অপূর্ব্ব-শ্রী ধারণ করে। টপাল-চালক থাকিয়া থাকিয়া ঝিমাইতেছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোম্ ঝিম্‌তা কাহে?' সে মুসলমান, উত্তর দিল,—'বাবু সাহেব, কাল রাত্‌মে নাটক দেখনে গেয়েথেঁ, নিদ্ নেই হুয়া।' নাসিকে একটি নাট্যশালা আছে। সেখানে এই টাঙ্গা-চালক সমস্ত রাত ধরিয়া নাটক দেখিয়াছে। তাই ঢুলিতেছে। আমার ধারণা ছিল, বাঙ্গালীদের মধ্যে রাত জাগিয়া থিয়েটার দেখার বাই ঢুকিয়াছে, কিন্তু এ দেশের দরিদ্র টাঙ্গা-চালকও থিয়েটার দেখিতে ছাড়ে না! যাহা হউক, প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া এক স্থানে সে অশ্ব দুইটি বদ্‌লাইয়া লইল।

বেলা প্রায় দশটার সময় ত্র্যম্বকের নিকটবর্ত্তী হইলাম। প্রকৃতিদেবী একটি সুরম্য স্বভাব-স্বর্গের তোরণ উদ্‌ঘাটন করিয়া পথিকের অভ্যর্থনা করিলেন। কি অপূর্ব্ব শোভা! কি সুন্দর দৃশ্যাবলী! বড় বড় হ্রদের ন্যায় জলপূর্ণ সরোবরসমূহ দৃষ্ট হইতে লাগিল। সুন্দর প্রস্তররচিত ঘাট, চাঁদনী প্রভৃতি সরসীর শোভা সম্পাদন করিতেছে। অদূরে গগনস্পর্শী প্রাচীরের ন্যায় ব্রহ্মগিরি গগন-চুম্বন করিয়া আদিত্যরথের গতিরোধ করিতেছে। যেন বিশ্বকর্ম্মা রচিত কৃষ্ণপ্রস্তরের বহুদূরব্যাপী দেড় হাজার ফিট উচ্চ সুদীর্ঘ প্রাচীর ভগবান্ ত্র্যম্বকের চিত্রপ্রতিম রম্যকুঞ্জ রক্ষা করিতেছে! সেই পর্ব্বতপ্রাচীর দেখিতে বিচিত্র—সুন্দর—অদ্ভুত। না দেখিলে উহার আকৃতি লিখিয়া বুঝান যায় না। ত্র্যম্বকেশ্বরের কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত অপূর্ব্ব-সুন্দর তুঙ্গ মন্দির নেত্রপথে প্রকটিত হইল। ক্রমে টাঙ্গা সহরের মধ্যে উপনীত হইলে আমি একটি

কৃষ্ণমন্দিরে বাসা লইলাম। দীর্ঘাকৃতি পাণ্ডাপ্রবর গঙ্গারাম-গণেশরাম জাট-দেওকুট মহাশয়কে সন্ধান করিয়া আনাইলাম। ইঁহার নাম নাসিক হইতেই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম।

পাণ্ডাটি বেশ ভদ্র—ভাল লোক। পত্নী ও দুইটি শিশুসন্তান আছে। ত্র্যম্বকেই একখানি পাথরের বাটী করিয়াছেন; সেইখানেই সপরিবারে বাস করেন। আমাকে তাঁহার বাটীতে থাকিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণভবনের দ্বিতলে একটি ক্ষুদ্র কুঠারী পাইয়া আমি সেইখানেই অবস্থান করিলাম।

সহরের মধ্য দিয়া গোদাবরী নদীর নালা গিয়াছে। ইহার দুই দিকে অবতরণের জন্য সোপান আছে। শীতকাল; নালার জল শুকাইয়া গিয়াছে; বর্ষায় জলপূর্ণ হয়। কিন্তু একটি ব্রাহ্মণ বলিল, গোদাবরী এখানে গুপ্তা হইয়াছেন। সহরের উত্তর-পশ্চিমাংশে কুশাবর্ত্ত কুণ্ড। জল গাঢ় সবুজ বর্ণ। কুণ্ডটি চতুষ্কোণ; স্নানের জন্য চারি দিকে সোপানাবলী; এবং উপরে চারি দিকে প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভশ্রেণী-শোভিত অলিন্দশ্রেণী। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের অলিন্দে নানা দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি একটির পর একটি করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজান আছে। আমি কুশাবর্ত্ত কুণ্ডের হরিদ্বর্ণ জলে স্নান করিয়া পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করিলাম।

কুশাবর্ত্ত কুণ্ডের অলিন্দস্থিত দেব দেবীর মধ্যে শেষশায়ী বিষ্ণু, পার্ব্বতী, মহাদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, গণেশ, অহল্যাগৌতম প্রভৃতির মূর্ত্তিগুলিই উল্লেখযোগ্য। কুশাবর্ত্ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রচলিত।—

"গঙ্গাদ্বারে, কুশাবর্ত্তে, বিল্বকে, নীলপর্ব্বতে,
স্নাতো কনখলে তীর্থে পুনর্জ্জন্মো ন বিদ্যতে।"

আমি উপর্য্যুক্ত বিল্বক ব্যতীত সকল তীর্থেই স্নান করিয়াছি; আমার ত পুনর্জ্জন্ম হইবার কথা নহে; তবে একটির জন্য যদি ফস্‌কায় ত নাচার!

অপরাহ্ণ চারিটার সময় গঙ্গাদ্বার দেখিতে যাত্রা করিলাম। একটি মহারাষ্ট্র বালক আমার পথ-প্রদর্শক হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সহরের পশ্চিমপ্রান্ত অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে একটি কৃষ্ণমন্দিরে উপনীত হইলাম। শুভ্রমর্ম্মরনির্ম্মিত এমন সুন্দর দীর্ঘ শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার মূর্ত্তি কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। কিয়ৎকাল পুলকিতচিত্তে দর্শন করিলাম। তৎপরে নাটমন্দিরের (ইহা মন্দিরসংলগ্ন একটি বড় চতুষ্কোণ গৃহ) দেয়ালের গায়ে নানা মনোমুগ্ধকর চিত্রাবলী নানা রঙ্গে চিত্রিত দেখিলাম। চিত্রসমূহ

বৃহদাকার; অতীব নয়ন-রঞ্জন। সর্ব্বসমেত৹ নয়খানি চিত্র আছে। প্রথম-খানিতে শ্রীকৃষ্ণ একটি রমণীর করকমল ধৃত করিয়া প্রেমালাপ করিতেছেন! দ্বিতীয়ে, একটি রমণী দুইটি শিশুকে আদর করিতেছেন; তৃতীয়ে, তিনটি রূপসী ললনা কুসুম-কিশলয়-পরিবেষ্টিত কুঞ্জবনে বসিয়া আছেন; চতুর্থে, অশ্বারোহী শিবাজী দুইটি অনুচর সহ একটি গিরিদুর্গের নিকট দিয়া যাইতেছেন; পঞ্চমে, হরজটা হইতে গঙ্গা উথলিয়া অবতরণ করিতেছেন—সম্মুখে পার্ব্বতী বসিয়া আছেন; ষষ্ঠে, সুভদ্রা, কৃষ্ণ ও বলরাম; সপ্তমে, ত্রিমুণ্ড দত্তাত্রেয়ী; অষ্টমে, শ্রীকৃষ্ণ কংসবিনাশ করিতেছেন; নবমে, শ্রীকৃষ্ণ দুইটি গোপবালার কলসী ভাঙ্গিতেছেন। চিত্রগুলি কতদিন হইল চিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তেমনই নূতন রহিয়াছে।

কৃষ্ণমন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগেই গণেশের মন্দির। গম্ভীর-দর্শন মন্দিরের মধ্যে নিবিড় অন্ধকারে গণপতি বিরাজিত। গণেশ-মন্দিরের নিকটে গঙ্গাতলাও নামক হ্রদবৎ সুবৃহৎ পুষ্করিণী—চারি দিক পাথর দিয়া বাঁধান। মধ্যে মধ্যে স্নান করিবার ও জল লইবার জন্য ঘাট আছে। গঙ্গাতলাও হইতে কিছু দূর যাইতে যাইতে ব্রহ্মগিরি আরোহণ করিবার পর্ব্বতগাত্রবাহী সোপানাবলী দৃষ্ট হইল। ক্রমে সোপানসন্নিকটে উপনীত হইয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম। সোপান এমনই সুন্দররূপে নির্ম্মিত যে, অধিরোহণকালে কোনরূপ ক্লেশ বা শ্রান্তিবোধ হয় না। তাহাতে আবার অপরাহ্ণের হিমশীতল সমীর ললাট স্পর্শ করিয়া বহিতেছে। মধ্যে মধ্যে বনফুলের সৌরভ, বনবিহগের গীতি। নিম্নে ত্রিম্বক-সহর। মন্দির, সরোবর, কানন ও কুঞ্জভূমির চিত্রপ্রতিম দৃশ্যাবলী। সমস্ত একত্রীভূত হইয়া হৃদয়ে কি এক অব্যক্ত স্বর্গীয় ভাবের সঞ্চার করিতে লাগিল, তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। উঠিতে উঠিতে সোপানপার্শ্বে এক একটি ছোট ছোট দেবমন্দিরের পূজক পর্ব্বতারোহীদিগের নিকট হইতে পয়সা চাহিতে লাগিল। ভিক্ষুকেরাও সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া, পাহাড়ে উঠিয়া, সোপান-পার্শ্বে বসিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে। তীর্থস্থানে ত ভিক্ষুক আছেই, কিন্তু পাহাড়ে উঠিয়াও তাহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের উপায় নাই। আমার বোধ হয়, ধর্ম্মার্থী সাংসারিকগণের চিত্তপরীক্ষার নিমিত্তই ভগবান ত্র্যম্বক আতুর, বধির, মূক, অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গুদিগকে পাহাড়ে উঠাইয়া দিয়াছেন। অর্দ্ধ পর্ব্বতগাত্রে গিয়া সোপান শেষ হইয়াছে। ৭৫০টি সোপান অতিক্রম করিয়া গঙ্গাদ্বারে উপনীত হইলাম। ইহাই পুণ্য গোদাবরী নদীর উৎপত্তিস্থল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মগিরি খাড়া সোজাসুজি ভাবে প্রায় দেড় হাজার ফিট উচ্চে আকাশে উঠিয়াছে। অর্দ্ধ পর্ব্বতগাত্রে গিয়া সোপান শেষ হইল; আর সেইখানেই গঙ্গাদ্বার। সেখান হইতে আর উপরে উঠিবার উপায় নাই; যতটা অংশ একটু ঢালু ছিল, ততটাতেই সিঁড়ি প্রস্তুত হইয়াছে; তার পর একেবারে খাড়া সমুচ্চ পর্ব্বত-প্রাচীর। আরোহণ ত দূরের কথা, দেখিলেই আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যায়। আর যেখানে সোপান শেষ হইল, সেখানেও এমন বিস্তৃত সমভূমি নাই যে, একটু সচ্ছন্দে বিচরণ করা যায়। অতি সঙ্কীর্ণ একটি পাদপথ আড়াআড়ি ভাবে রচিত। কেবল তাহারই সাহায্যে পর্ব্বত-অঙ্গে ক্ষোদিত গুহামধ্যে স্থানে স্থানে যে কয়টি দেবদেবী আছেন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে হয়। নিম্ন দিকে চাহিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে; যদি কোনও প্রকারে পাদপথ হইতে পদস্খলন হয় ত চির-তরে নিশ্চিন্ত।

গঙ্গাদ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলাম, পর্ব্বতের এক ফাটালের নিকট একটি বেদীর উপর গঙ্গাদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত। বেদিকার গাত্রে একটি বৃষভের মুণ্ড সংলগ্ন। বৃষভ ধাতুনির্ম্মিত; অতি সরু জিহ্বা বিলম্বিত করিয়া মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। সেই সরু জিহ্বা বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল নিম্নস্থ একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ কুণ্ডে পতিত হইতেছে! ইহাই সেই বিশাল গোদাবরী নদীর উৎপত্তিস্থল,—যে মহানদী তরঙ্গায়িত বিস্তৃত জলপ্রবাহে বহু পর্ব্বত, কানন, কান্তার ভেদ করিয়া যজ্ঞোপবীতের ন্যায় ভারতভূমির পশ্চিমপ্রান্ত হইতে পূর্ব্ব-প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় সহস্রাধিক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বঙ্গোপসাগরে গিয়া সিন্ধু সহ মিলিত হইয়াছে।

গঙ্গাদ্বারের পার্শ্বে শৈলকন্দরে দুইটি চৌবাচ্চার ন্যায় কুণ্ড জলপূর্ণ রহিয়াছে। শৈলারোহণে ক্লান্ত তৃষিত পথিক ও যাত্রীরা এই জলে তৃষ্ণা দূর করেন। এতদ্ভিন্ন গঙ্গাদ্বারে একটি পার্ব্বতী-মূর্ত্তি বিরাজিত।

পার্ব্বতীর মূর্ত্তি হইতে একটু দূরে পর্ব্বতগাত্রে একটি বড় কুলঙ্গী কাটিয়া এক ব্যক্তি বসিয়া আছে। শুনিলাম, গৌতম মুনি এখানে তপস্যা করিতেন। তৎপত্নী অহল্যার প্রতিমূর্ত্তি সেইখানে সংস্থাপিত। ইহার কিছু দূরে শৈলাঙ্গে দুইটি মহাদেব অবস্থিত। তাহার নিকটে একটি গুহায় গোরক্ষনাথের মূর্ত্তি। ভিতরে আরও একটি গুহার মধ্যে মহাদেব আছেন। সেই গুহার মধ্যে স্থূল-কলেবর নরনারীর পক্ষে প্রবিষ্ট হওয়া কষ্টকর ব্যাপার।

উপর্য্যুক্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি, যাহা বর্ণিত হইয়াছে, সমস্তই অর্দ্ধ পর্ব্বতগাত্রে

অবস্থিত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তার পর পর্ব্বত সোজাসুজি ঊর্দ্ধে উঠিয়া পশ্চিম দিক ঢাকিয়া ফেলিয়াছে! গঙ্গাদ্বার হইতে আরও আড়াই ক্রোশ ঊর্দ্ধে জটাভট্‌কা। এখানে একটি বৃহৎ পাষাণখণ্ডে মহাদেবের জটার ভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেকে বলেন, সেই স্থানই গোদাবরী নদীর মূল উৎপত্তিস্থল। জটাভট্‌কা হইতে গোদাবরীধারা নিঃসৃত হইয়া, আবার গুপ্তা হইয়া, গঙ্গাদ্বারে প্রকট হইয়াছেন। সেখান হইতে আবার গুপ্তা হইয়া কুশাবর্ত্তে শেষশায়ী বিষ্ণুর চরণতলে প্রকট, এবং তথা হইতে আবার গুপ্তা হইয়া ভগবান ত্র্যম্বকেশ্বরের শিরোদেশে আবির্ভূতা হইয়াছেন। এইরূপে ক্রমাগত প্রকট ও গুপ্ত হইতে হইতে পরিশেষে স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নাসিকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া প্রখরা স্বচ্ছতোয়া নদীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

২৮শে জানুয়ারী, বুধবার ১৯১৪।—ভগবান্ দেবাদিদেব মহাদেব ত্র্যম্বক ভারতের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। এই তীর্থই তাঁহার অধিষ্ঠান-ভূমি। এই সুরম্য-প্রকৃতি-কুঞ্জ তাঁহারই উপযুক্ত বাসভূমি। মহাদেবের মন্দিরও তেমনই মনোহর। ইংরেজী ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ ১৮৬ বৎসর হইল, বাজীরাও পেশওয়ে, ত্রিশ বৎসর সময়ে, একত্রিংশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া এই কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত অনিন্দ্য-সুন্দর উত্তুঙ্গ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দির ও প্রাঙ্গণ বহু স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীর। তিনটি প্রবেশদ্বার। সিংহদ্বার উত্তরমুখী। দক্ষিণমুখ হইয়া প্রবেশ করিতে হয়। দ্বারের বামপার্শ্বে দেবাদিদেবের রথ রক্ষিত। ব্রহ্মরূপী সারথি রথ চালাইয়া থাকেন।

আমি সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া প্রস্তর-মণ্ডিত বিশাল প্রাঙ্গণে উপনীত হইলাম। মন্দির দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া গেল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা কৃষ্ণ-প্রস্তরে নির্ম্মিত। মন্দিরের কারুকার্য্য অতি নৈপুণ্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমে জগমোহনে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, গৃহতলের মধ্যস্থলে শ্বেত-প্রস্তর-রচিত কূর্ম্মাবয়বসংবলিত কূর্ম্মাসন। তৎপরে ত্র্যম্বক-মন্দিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া দেবদর্শন করিলাম। ত্র্যম্বকেশ্বর লিঙ্গমূর্ত্তি নহেন। গৌরীপট্টের মধ্যস্থলে বৃত্তাকার বিবর। বিবরের অভ্যন্তরে তিন দিকে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত তিনটি প্রস্তর আছে। তলদেশ হইতে জল নিঃসারিত হইয়া বিবরটি সতত জলপূর্ণ রাখিতেছে। আমি দ্বারদেশ হইতে মহাদেবকে বিল্বদল পুষ্প প্রভৃতির দ্বারা পূজা করিলাম। কি কায়স্থ, কি ব্রাহ্মণ, মন্দিরের ভিতরে কাহারও প্রবেশা-

ধিকার নাই। কেবল পূজক ব্রাহ্মণেরাই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। সন্ধ্যার সময় ভগবান ত্র্যম্বকের পুষ্পশয্যা দেখিয়াছি। গৌরীপট্টটি নানা শুভ্র গোলাপী পুষ্পে ঢাকিয়া ফেলা হইয়াছে। পুষ্পসমূহের বিন্যাস-নৈপুণ্য চক্ষে দেখিবার, লিখিয়া বুঝাইবার নহে। মধ্যস্থলে ত্র্যম্বকের রৌপ্যনির্ম্মিত সর্প-জটা-তিলক-ভূষিত মস্তক বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পুণার ছবিতে যেরূপ শিবমস্তক অঙ্কিত আছে, এই মস্তক দেখিতে ঠিক তদ্রূপ। মন্দিরমধ্যে ঘৃত-কর্পূরবাসিত উজ্জ্বল দীপাবলী জ্বলিতেছে। ধূপগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে। প্রকৃতই সেই হেমন্ত-সন্ধ্যায় এই দূরতীর্থের দেবায়তনের দ্বার-প্রান্তে বসিয়া আমার মনে হইল, আমি যেন সুরলোকের কোনও দেবমন্দিরে উপনীত হইয়াছি।

উক্ত রৌপ্যনির্ম্মিত মস্তক ব্যতীত ভগবান্ ত্র্যম্বকের সুবর্ণনির্ম্মিত ত্রি-বদন-সংবর্দ্ধিত সুদীর্ঘ টোপরভূষিত মস্তক আছে। প্রতি সোমবারে কুশাবর্ত্ত কুণ্ডে মহা-সমারোহে ত্র্যম্বক-মস্তক স্নাত হইয়া থাকেন, এবং সোমবার সন্ধ্যার সময়ে নানা পুষ্পে ও মাল্যচন্দনে সেই স্বর্ণনির্ম্মিত মস্তকের শিঙ্গার বেশ হইয়া থাকে। সে দৃশ্য অপূর্ব্ব-দর্শন। আমি সোমবারে সেখানে না থাকায়, আমার ভাগ্যে সে দৃশ্য দেখা ঘটে নাই। আর কি এমন দিন আসিবে, যখন আবার ত্র্যম্বকে উপনীত হইয়া ত্র্যম্বকেশ্বরকে দর্শন করিব ?

মন্দিরের দক্ষিণ দিকে গায়ত্রীদেবীর মন্দির আছে। ত্র্যম্বকে অবস্থান-কালে ত্র্যম্বক-মন্দিরে সন্ধ্যা-যাপনের স্মৃতি আমার জীবন-কালে কখনই অন্তর্হিত হইবে না। ত্র্যম্বকের কৃপায় যেন এ জীবনে আর একবার তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি। ত্র্যম্বক-তীর্থে আরও অনেক শিব আছেন ; তন্মধ্যে ত্রিভুবনেশ্বর, ত্রিসন্ধ্যেশ্বর, নীলকণ্ঠেশ্বর, গৌতমেশ্বর ও ইন্দ্রেশ্বর প্রসিদ্ধ।

২৯শে জানুয়ারী, ১৯১৪।—অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সহরের উত্তর দিকে নীলপর্ব্বতে যাত্রা করিলাম। নীলাম্বুকি দেবী এই পর্ব্বতচূড়ে বিরাজ করি-তেছেন। পর্ব্বতে উঠিবার আড়াই শত পায়েরী অর্থাৎ সিঁড়ি আছে। ধাপ-গুলি একটু উঁচু উঁচু। প্রভাত-বায়ুতে মস্তিষ্ক শীতল করিতে করিতে পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলাম। সহসা ব্রহ্মগিরির পশ্চাদ্ভাগ রক্তাভায় উদ্ভাসিত হইল অনিমেষনেত্রে চাহিয়া দেখিলাম, কৃষ্ণপর্ব্বতের পশ্চাদ্ভাগ হইতে রক্তবর্ণ ভাস্কর উদিত হইয়া ভুবন আলোকময় করিলেন। সূর্য্যোদয়ের এরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য আমি ভারতবর্ষের কোথাও দেখি নাই। আমি পথদর্শক বালকের সহিত

পাহাড়ের শিরোদেশে উপস্থিত হইয়া দেবীমণ্ডপে উপনীত হইলাম। ইহা একটি বারান্দা-সমন্বিত, করোগেটের ছাদযুক্ত চতুষ্কোণ প্রকোষ্ঠমাত্র। নীলাম্বুকি দেবী রক্তবর্ণা—ভীষণদর্শনা! প্রকাণ্ড মুখমণ্ডল। লোলজিহ্ব নহেন; বিচিত্র মূর্ত্তি! প্রকোষ্ঠের প্রাচীরে চারিখানি চিত্র অঙ্কিত। সেইগুলি এইরূপ;— (১) বীণাবাদিনী সরস্বতী, (২) অষ্টভুজা দুর্গা মহিষাসুর বধ করিতেছেন, (৩) দশভুজা পঞ্চমুখী দেবী, (৪) চতুর্ভুজা কমলা প্রফুল্লনলিনীবহুল সরোবরে কমলোপরি দুই ভুজে লীলাকমল ধারণ করিয়া দণ্ডায়মানা।

দেবীমণ্ডপের নিকটে দত্তাত্রেয়ীর মর্ম্মরগঠিত ত্রিমূর্ত্তি। আর একটি বেদিকার চরণচিহ্নের উপর ফণী ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। মণ্ডপসম্মুখে উড়ুম্বর বৃক্ষে গুচ্ছে গুচ্ছে উড়ুম্বর ফলিয়াছে। এই পর্ব্বতের উপর হইতে চারি দিকের পাহাড়ের শোভা অতীব মনোহর। কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর আমরা পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলাম।

ত্র্যম্বকতীর্থে অনেক মিষ্টান্নের দোকান আছে। বরফী, মিঠাই, পেঁড়া, সন্দেশ প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন পাওয়া যায়। নিমকী কচুরীরও অভাব নাই। আমি সহরের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম।

ইহা প্রকৃতই শোভাতীর্থ! সহরের তিন দিক বৃহৎ বৃহৎ সরোবরে পরিবেষ্টিত। চারি দিক প্রস্তররচিত সোপান-সমন্বিত। পশ্চিমভাগে এই সকল বিশাল হ্রদপ্রতিম সরোবর বা তলাও-তটে পাণ্ডাদিগের একতল, দ্বিতল পাথরের বাটীগুলি ছবির ন্যায় দেখাইতেছে। চারি দিকেই পাহাড়। এ সকল পাহাড়ে উদ্ভিদ্ ও বনের শোভা শ্যামল, নয়নাভিরাম! কোনও কোনও সরোবরের জল গাঢ় সবুজবর্ণ—সূর্য্যকিরণে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে —তাহার উপর কালো পাহাড়ের প্রতিবিম্ব অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সরোবরগুলির মধ্যে, অমৃততীর্থ, কুশাবর্ত্ত, গৌতমতলাও, ইন্দ্রতলাও, গঙ্গাতলাও, অতিতলাও, মুকুন্দতলাও, বিশ্বনাথতলাও ও প্রয়াগ-তলাও প্রসিদ্ধ। গঙ্গাতলাওয়ে নিবৃত্তিনাথের সমাধি আছে।

ত্র্যম্বকে কৃষ্ণমন্দিরে অবস্থান এবং পাণ্ডামহাশয়েরই বাটীতেই আহার হইত। তাঁহার বাটী একটী বাপীতটে বিরাজিত। তাঁহার পত্নী আমার তত্ত্বাবধান করিতেন। কতক হিন্দী ও কতক মারাঠী ভাষায় কথা কহিতেন। আহার নাসিকের অনুরূপ; কোনও প্রভেদ নাই। অপরাহ্নে পাণ্ডামহাশয়কে তিনটী টাকা দিয়া, বিদায় গ্রহণ করিলাম। তিনি উহাতেই পরিতুষ্ট হইলেন।

গঙ্গারাম-গণেশরাম এত ভাল লোক যে, তুলাভরা সে-দেশীয় পা পর্য্যন্ত লম্বা অলষ্টার পরিয়া, আমার বিছানা মাথায় করিলেন। আমি নিষেধ করাতে বগলে লইয়া টাঙ্গায় তুলিয়া দিলেন। আমি রাত্রি ৮ ঘটিকায় নাসিকে পঁহুছিলাম। পর দিন ৩০শে জানুয়ারী, নাসিক হইতে বিদায় লইলাম। পাণ্ডা বালকৃষ্ণ মহাদেওকে ৬৲ টাকা দিলাম। ছুটি বধূ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহাদিগকেও ১৲ দিলাম। তাহারা অনেক যত্ন করিয়াছিল। বালকৃষ্ণ টাঙ্গায় চড়িয়া আমাকে নাসিক রেলওয়ে ষ্টেশনে পঁহুছাইয়া দিল। আমি বেলা তিনটার ট্রেণে বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

আলোচনা।

বাঙ্গালীর আত্মঘাত।

১

গত আশ্বিন সংখ্যার 'প্রবাসী'র 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র অন্যতম প্রসঙ্গ—বঙ্গে আত্মহত্যা। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের সরকারী রিপোর্ট দেখিয়া ১৩২২ সালের পৌষ সংখ্যার 'প্রবাসী' 'বঙ্গে ও অন্যান্য প্রদেশে নারীজীবন' শীর্ষক যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন, আমরা ১৩২৩ সালের মাঘ সংখ্যার 'উপাসনা'য় তাহার আলোচনা করিয়াছিলাম। 'ভারতী'র অন্যতম লেখক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সে আলোচনা মনোমত হয় নাই; কাজেই তিনি ১৩২৩ সালের চৈত্র সংখ্যার 'ভারতী'তে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাহার পর ১৩২৪ সালের বৈশাখ সংখ্যার 'উপাসনা'য় আমরা সেই প্রতিবাদের যথাযথ উত্তর দিয়াছি। এখন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট বাহির হওয়ায় 'প্রবাসী' আবার সেই পুরাতন কথারই আবৃত্তি করিয়াছেন। সেই জন্য আমাদিগকেও এ বিষয়ের পুনরালোচনা করিতে হইতেছে। আবশ্যকবোধে নিম্নে আত্মহত্যার বিবরণ দিতেছি।—

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের আত্মহত্যার সংখ্যা।

অধিবাসীর সংখ্যা	আত্মহত্যাকারী পুরুষ	আত্মহত্যাকারী নারী
বাঙ্গালা—৪৫৩২৯২৪৭	১০০৩	২০০৭
আগ্রা-অযোধ্যা—৪৬৮২০৫৫৬	৫৯৩	১৬২৬
বিহার-উড়িষ্যা—৩৪৪৮৯৮৪৬	৫৭১	১১২১

আত্মঘাতিনী নারীর সংখ্যার গড়।

প্রতি দশ লক্ষে
- বাঙ্গালা—৯০ জন।
- আগ্রা-অযোধ্যা—৭২ জন।
- বিহার-উড়িষ্যা—৬৩ জন।

বাঙ্গালায় প্রতি এক হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ৯৪৫। কলিকাতা সহরে প্রতি এক হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ৪৭৫। কলিকাতায় নারীর আত্মহত্যার হার পুরুষের চারি গুণেরও অধিক। বাঙ্গালার অন্যান্য সহরের নারীর আত্মহত্যার হার পল্লীগ্রামগুলির নারীর আত্মহত্যার হারের অপেক্ষা অধিক। সমগ্র বাঙ্গালার নারীর আত্মহত্যার হার পুরুষের প্রায় দেড় গুণ।

২

বাঙ্গালী নারীর আত্মহত্যার কারণগুলির নির্দ্দেশ করিতে গিয়া আমরা বলিয়াছিলাম,—'এখনকার অধিকাংশ উপন্যাসই বিলাতী ছাঁচে ঢালা—উৎকট বিলাতী গন্ধে ভরপুর। সাধারণ বাঙ্গালী রমণী মনস্তত্ত্ব বুঝে না, দার্শনিক তত্ত্বও বুঝে না; তাহারা সাধারণ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার চলা-ফেরা, হাব-ভাব, আদব-কায়দাই বুঝিবার চেষ্টা করে, তাহারই ফলে বাঙ্গালীর শান্তির কুটীরে অশান্তির সৃষ্টি করে। * * * বাঙ্গালীর মেয়েরা উপন্যাস পড়ুক, যাহা পড়িয়া গৃহকর্ম্মে পটুত্ব লাভ করিয়া বাঙ্গালীর গৃহস্থাশ্রমকে তাহারা পূর্ব্বের মতই লোভনীয় করিতে পারে, সেইরূপ উপন্যাস তাহারা পড়ুক।' ইহা পড়িয়াই অজিতকুমার বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, আমরা না কি নারীর হাতে কোনও উপন্যাসই দিবার পক্ষপাতী নহি। 'চোখের বালি'র মত জঘন্য রুচির উপন্যাস সাধারণ অর্থাৎ অল্পশিক্ষিত মেয়েদের হাতে দেওয়া যাইতে পারে কি না, তাহার তিনি বিচার করেন নাই, অথচ আজ পর্য্যন্ত বুঝাইতে চাহেন, উপন্যাস পড়িলে নারীদের মানসিক অবনতি হয় না। 'প্রবাসী'র প্রবীণ সম্পাদক মহাশয়েরও অজিতকুমার বাবুর মতেই মত। বিলাতের লোকের আদর্শের সহিত বাঙ্গালীর আদর্শের তুলনা না করিয়াও তিনি গত বৎসর বলিয়াছিলেন,—'কেহ কেহ মনে করেন, বাঙালীর [বাঙ্গালীর] মেয়েরা উপন্যাস পড়ে বলিয়া আত্মহত্যা করে! কিন্তু ইউরোপের মেয়েরা যে শতগুণ বেশী উপন্যাস পড়ে?' এত আন্দোলন ও আলোচনার পরেও আবার তিনি বলিতেছেন,—'আমাদের দেশের চেয়ে পাশ্চাত্য দেশ সকলে লেখাপড়া-জানা মেয়ে খুব বেশী, এবং তাহারা উপন্যাস পড়ে অত্যধিক মাত্রায়; কিন্তু তাহারা ত আমাদের দেশের মেয়েদের মত এত বেশী আত্মহত্যা করে না?' অর্থাৎ 'প্রবাসী'র সম্পাদক মহাশয়ের এখনও ধারণা,—'চোখের বালি' ও 'ঘরে-বাইরে'র মত কুরুচিপূর্ণ কোনও উপন্যাস-পাঠ নারীর আত্মহত্যার কারণ নহে। এ ধারণা ভুল। বিলাতী মেয়েরা যে শ্রেণীর উপন্যাস পড়িয়া সহজেই হজম করিতে পারেন, বাঙ্গালী মেয়েরাও তাহাই পারিবে, না পারিলেও পারিতে হইবে, এ আশা দুরাশা। উভয় জাতির সামাজিক রুচি ও আদর্শ একই প্রকারের নহে, সুতরাং উভয় জাতিকে একই মাপকাঠীতে মাপিতে যাওয়াই ভুল। চীনের সাধারণ লোক যে পরিমিত অহিফেন সেবন করিয়া অতি সহজে হজম করিতে পারেন, বাঙ্গালার সাধারণ লোক সেই পরিমিত বা কিছু কম অহিফেন সেবন করিলে কপালে চক্ষু উঠিবার আশঙ্কা আছে কি না, সহজেই অনুমেয়। এক দেশের সহিত অন্য দেশের তুলনা না করিয়া, যে কোনও একই দেশের অবস্থা দেখিলেও বিষয়টি পরিস্ফুট হইতে পারে। দেশের 'ভদ্রলোক'রা অর্থাৎ ধনীরা যে শৈত্য ও উষ্ণতা সহ্য করিতে পারেন না, তথাকথিত 'ছোটলোক'রা অর্থাৎ দরিদ্ররা তাহা অনায়াসেই সহ্য করে। আসল কথা অভ্যাস। যে যাহাতে অভ্যস্ত নহে, তাহাকে

তাহাই করিতে বাধ্য করা, আর তাহার মৃত্যু কামনা করা একই কথা। বাঙ্গালী নারী সেই দিন 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'চোখের বালি' হজম করিতে পারিবে, যখন সে পাশ্চাত্য নারীজীবনের ব্যর্থ অনুকৃতিতে 'ঘরে-বাইরে'র বিমলার ন্যায় 'আদর্শসতী' হইবে। কিন্তু তাহা অসম্ভব। বাঙ্গালার মাটী ও বাঙ্গালার জল সাধারণ বাঙ্গালীকে তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ পথে চলিতে পদে পদে বাধা দিবে। বিদ্রোহীদের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের পরিণামও ভীষণ। আসল কথা এই,—গল্প হউক, উপন্যাস হউক, নাটক হউক, কাব্য হউক, যে গ্রন্থ অসংযম ও দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়, তাহা নারীদের ত কথাই নাই, যুবকদেরও হাতে দেওয়া উচিত নহে। যে শ্রেণীর গ্রন্থ পুরুষ বা নারীর মনে মানসিক বিকারের সৃষ্টি করে, যাঁহারা তাহা পড়িতে উৎসাহ দেন, তাঁহারা পুরুষ ও নারীর আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করেন। মানসিক বিকারই আত্ম-হত্যার মূল কারণ। মানসিক বিকারেই জীবন দুর্ব্বহ বলিয়া বোধ হয়, আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জন্মে।

কদর্য্য ভাবের উপন্যাসাদি মেয়েদের হাতে না দিলেই তাহাদের আত্মহত্যার সকল কারণ দূর হইবে, এমন কথা আমরা অবশ্যই বলি না। আত্মহত্যার আরও অনেক কারণ আছে। যে যে কারণে মানসিক বিকার জন্মে, তাহা দূর করিতে পারিলে পুরুষ ও নারীর আত্মহত্যার পথ রুদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতিদেবী মানুষের আত্মপ্রয়োজনে চালিত হয়েন না। প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া সকল রকমের দুঃখের প্রতীকার করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। মানুষ জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে যতই উন্নত হউক, রোগ, শোক ও পরিতাপের কারণগুলির মূল উৎপাটন করিতে পারে না। এই জন্যই প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জাতির মধ্যে আত্ম-হত্যার প্রবৃত্তি আছে। এই যে সর্ব্বজননিন্দিত প্রবৃত্তি, ইহার মধ্যেও ভাল ও মন্দ দুইটি দিক্ আছে। পতিবিয়োগে পতিপ্রাণা নারীর আত্মহত্যা, প্রাণাধিক প্রিয়সন্তানের মুখে ক্ষুধার অন্ন দিতে না পারিয়া মাতাপিতার আত্মঘাত,—সমর্থনযোগ্য না হইলেও সহানুভূতি আকর্ষণ করে। কিন্তু মনের মত পতি জুটিল না, অতএব মরিতে হইবে; মাতাপিতা, শ্বশুরশাশুড়ী, বা স্বামী তিরস্কার করিল, অতএব মরিতে হইবে; হইল বা স্বামী দরিদ্র, প্রতিবেশিনী ধনিপত্নীর ন্যায় আমাকে আমার স্বামী গহনায় ঢাকিয়া দিল না, অতএব মরিতে হইবে;—ইহা অতীব নিন্দিত, অতীব গর্হিত; ইহা অপরের সহানুভূতি আকর্ষণ করে না। এ যুগের বঙ্গনারীদের এই দ্বিতীয় শ্রেণীর আত্মহত্যাপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়াছে।

কিন্তু বেহার-উড়িষ্যা ও আগ্রা-অযোধ্যাবাসীদের তুলনায় বাঙ্গালার নরনারীর আত্মহত্যার হার অধিক কেন? বাঙ্গালী ধনে, মানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে উক্ত দুই প্রদেশবাসীর অপেক্ষা কোনও অংশেই হীন নহে। সামাজিক কঠোরতায় বাঙ্গালীর দুঃখের মাত্রা বাড়িয়াছে, এমন কথাও বলা যায় না; কারণ, বাঙ্গালীর—বিশেষতঃ হিন্দু বাঙ্গালীর—সমাজবন্ধন ক্রমেই শিথিল হইতেছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ত সকলেরই সমান অধিকার। তবে বাঙ্গালীর আত্মহত্যার হার অধিক হয় কেন? আমরা দেখিতেছি,—

(১) বাঙ্গালীদের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির বড়ই অভাব। বিশেষতঃ, হিন্দু বাঙ্গালী-দের মধ্যে সহানুভূতি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিন্দু বাঙ্গালী জ্ঞানযোগের ব্যাখ্যা

করিতে পারে, হিতোপদেশের শ্লোক আওড়াইতে পারে, কর্ম্মযোগের কথা ত হিন্দু বাঙ্গালীর মুখে মুখে ; কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মী কোথায় ? বাঙ্গালায় রামকৃষ্ণ মিশন আছে, হিতসাধন-মণ্ডলী আছে, ব্রাহ্মণসভা আছে, মোসলেম লীগ আছে, কংগ্রেস-কনফারেন্স আছে, সকলই আছে ; কিন্তু আসল জিনিসটিই নাই !—একপ্রাণতা নাই, একাগ্রতা নাই, সংযম নাই। বাঙ্গালার ধনীদের দানের খাতা আছে, কিন্তু যে দানে নাম নাই, সংবাদপত্রে নাম উঠে না, 'রাজা-রায়-বাহাদুর' উপাধি জুটে না, এমন দান কয় জন বাঙ্গালী করেন ? দেশের মধ্যে যাঁহারা দাতাকর্ণ নামে খ্যাত, এমন অনেক ধনীর সংবাদ আমরা রাখি ; আমরা জানি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহারা অসদ্ব্যয়ে মুক্তহস্ত, দানের পাত্রাপাত্র বিচার করেন না। প্রকৃত দুঃখী গলা-ধাক্কা খাইয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া যায়, ফিরিয়া গিয়া আত্মহত্যা করে ; ও দিকে গহরজান টাকার তোড়া লইয়া গিয়া নূতন লোহার সিন্দুক পূর্ণ করে। অর্থের অভাবে, সুপারিসের অভাবে অনেক মেধাবী ছাত্র উচ্চশিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়, কিন্তু অর্থসাহায্য না পাইলেও যাহার ক্ষতি নাই, এমন ছাত্রও অর্থসাহায্য পায়। হিন্দু বাঙ্গালী নীতির পথ ছাড়িয়া পরস্পরের সহানুভূতি হারাইয়াছে। ইহাতে সে কালের তুলনায় এ কালে হিন্দু বাঙ্গালীর দুঃখের মাত্রা বাড়িয়াছে। দুঃখাতিশয্যে আত্মহত্যার হারও বাড়িয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এই বাঙ্গালায় মুসলমানদের মধ্যে যেটুকু প্রীতির বন্ধন আছে, হিন্দুদের মধ্যে তাহাও নাই।

(২) বাঙ্গালার লোক আগ্রা-অযোধ্যা বা বিহার-উড়িষ্যার লোকের অপেক্ষা অধিকতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত নহে, কিন্তু বাঙ্গালার আত্মঘাতের হার ঐ দুই প্রদেশের আত্মঘাতের হারের চেয়ে অধিক। কারণ, ঐ দুই প্রদেশের লোকের ন্যায় বাঙ্গালার লোকেরও অভাববোধ আছে, কিন্তু অভাবপূরণের চেষ্টা নাই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরা—বিশেষতঃ হিন্দু বাঙ্গালীরা—অভাবপূরণের চেষ্টাকে অপমানের বিষয় মনে করে। তাঁতীর ছেলে দুই পাতা ইংরাজী পড়িলে আর তাহাকে পায় কে ? তখন তাহার ধারণা—তাহার তাঁতীত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে। সুতরাং পিতৃপিতামহের তাঁতগাড়ায় বসিতে তাহার লজ্জা হয়। হইবেই ত, সে যে এ যুগের এক জন 'শিক্ষিত' হইল ! সুতরাং 'দেশে গুণের আদর নাই', এই ভাব সম্বল করিয়া সে অর্দ্ধ-অনশনে দিন কাটাইতে প্রস্তুত। সুতরাং স্ত্রীপুত্রের 'খাই খাই' রব শুনিলে সে বিজ্ঞের মতই বলিবে, 'আমি ত আর চুরী করিতে পারি না !' অথচ আমরা দেখিতেছি, আগ্রা-অযোধ্যার, বা বেহার-উড়িষ্যার অশিক্ষিত ব্রাহ্মণরাও—আমরা যাহাকে হীনকর্ম্ম বলি—তাহা করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের ন্যায় আগ্রা-অযোধ্যার ও বেহার-উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণরাও কোঁচার পত্তনে অভ্যস্ত হইলে, তাঁহাদের আত্মহত্যার হার যে বাঙ্গালীর মতই বাড়িয়া উঠিত, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

(৩) বিলাসব্যসন বাঙ্গালীর আত্মঘাতের পথ সম্প্রসারিত করিয়াছে। দেশের ধনীরা ইহুদী রমণীর পদতলে অজস্র অর্থ ঢালিয়া দিউন, আর মোটরগাড়ীর হাওয়া খাইয়াই বেড়ান, তাঁহাদের পক্ষে সকলই শোভা পায় ; কিন্তু দরিদ্র বাঙ্গালী সে পথে চলে কেন ? কোনও স্বার্থপর, অপরিপকবুদ্ধি ধনীর সহবাসে দরিদ্র বাঙ্গালীর মনে বিলাসবাসনার উদ্ভবে যে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়, তাহার প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়,—তাঁহার সংস্রব ত্যাগ করিয়া সৎপথে

থাকিয়া কোন্ উপায়ে তাহাদের অভাবমোচন হইতে পারে, সেই বিষয়ে চিন্তা করা ও সেইরূপ কর্ম্ম করা। কোনও ধনী সর্ব্বাঙ্গে পমেটম মাখিয়া ল্যাভেণ্ডারের জলে স্নান করেন বলিয়াই তোমাকে ও আমাকে তাহাই করিতে হইবে? কোনও কোনও স্বার্থপর ধনীর অনুকরণে সাধারণ দরিদ্র বাঙ্গালী আত্মসুখে বিভোর হইয়াছে; পরিবারস্থ সকলের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে না। বাঙ্গালী ত দলে দলে আত্মঘাতী হইবেই।

এই যে অভাব, অসংযম, বিলাসিতা—ইহা কি শুধু বাঙ্গালা দেশেই আছে, আর কোনও দেশে নাই? আছে। কিন্তু ইহা বাঙ্গালীর ধাতুতে সহিতেছে না। যে দেশের হিন্দু মুসলমান নিজে অভুক্ত থাকিয়াও মুখের গ্রাস সাদরে অতিথির মুখে তুলিয়া দিতে এত কাল কুণ্ঠিত হয় নাই, আজ তাহাদের সে ভাবের একান্তই অভাব। ইহাতে বুঝা যায়, বাঙ্গালী তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। পরিবার ও সমাজের সর্ব্ববিধ কল্যাণের মূলে যে দেশে ধর্ম্মমূলক শিক্ষা এত কাল আদৃত হইয়াছে, আজ জড়বাদী পশ্চিমের সাম্যের ভেরীনাদে সে শিক্ষার আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বাঙ্গালী বাহিরে সাম্যের জয় ঘোষণা করিতেছে, ঘরে ফিরিয়া সাম্যের কুফল দেখিয়া আত্মঘাতী হইতেছে। পুরুষ নূতন ভাবে নারীর মান বাড়াইতে গিয়া নারীর অপমান করিতেছে। পুরুষের কাছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবুদ্ধিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নারী যখন প্রবৃত্তির মার্গে নামিয়া পড়িতেছে, তখন অনুতাপে অনুশোচনায় পুরুষও আত্মঘাতী হইতেছে। এ যুগে এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

বাঙ্গালায় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতার অভাব হইয়াছে। যে কোনও উপায়ে একটা দল গঠন করিতে পারিলেই তিনি নেতা হয়েন। পূর্ব্বে এরূপ হইত না। সে দিন যখন স্নেহলতা যত্নে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া পুড়িয়া মরিল, তখন দেখিলাম, দেশের নেতারা 'হা হতোঽস্মি' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বিবিধ সংবাদপত্রে ও মাসিক পত্রিকায় স্নেহলতার ফটো উঠিল। পণপ্রথার ভীষণ পরিণাম দেখাইয়া কত নূতন গল্পের সৃষ্টি হইল; কত পুরাতন গল্প পুনর্মুদ্রিত হইল; কত নূতন কবিতা রচিত হইল। অনেক বাঙ্গালী সম্পাদক শোকে, দুঃখে ম্রিয়মাণ হইলেন। ব্রাহ্মণরা তামাতুলসী ও গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া 'অকাট্য' প্রতিজ্ঞা করিলেন—আর বরপণ লই ত আমরা চণ্ডাল। আর স্নেহলতার পিতার দশা যে তখন কিরূপ, তাহা গদ্যে প্রকাশ করা যায় না! আত্মঘাতিনী স্নেহলতার এই 'সস্তায় কিস্তিমাৎ' দেখিয়া অনেক নভেলপড়া স্নেহলতা মরিবার জন্য ব্যগ্র হইল। এই 'ফ্যাসান-চোস্ত' আত্মঘাতের জের এখনও মিটে নাই। সত্য কথাই ত—মরিয়া যখন এত বাহাদুরী, বাঁচিয়া তখন কি লাভ? তাহার পর কি হইল? তাহার পর সেই স্নেহলতার পিতা দেশের নেতাদের গালে চূণকালি দিয়া পুত্রের বিবাহে মোটা রকমের বরপণ লইলেন। অন্যের কথা আর বলিয়া কাজ নাই। কিন্তু দেশের স্বয়ংসিদ্ধ নেতারা এখনও তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারেন নাই, এখনও ভাঙ্গা গলায় হিন্দুসমাজকে গালি দিতেছেন। যাঁহারা 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' বলিয়া হিন্দুর ধর্ম্মসংস্কারকে নিন্দা করিতেছেন, দেখিতেছি, তাঁহারাই সাম্প্রদায়িক সংস্কারের পতাকা উড়াইতেছেন। ইহাতে কি বুঝা যায় না, বাঙ্গালী সংযমের সঙ্গে শান্তিকেও বিসর্জ্জন দিয়াছে?—অসন্তোষের আগুনে পুড়িয়া মরিবার জন্য ছুটিয়াছে?

বাঙ্গালীর সমাজবন্ধন ক্রমেই শিথিল হইতেছে, সেই সঙ্গে পরিবার-প্রথার আদর্শ খর্ব্ব হইতেছে। বাঙ্গালী মানসিক বিকারে ক্রমেই দিক্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হইতেছে। বাঙ্গালী ত আত্মঘাতী হইবেই। এই আত্মঘাতের মূল উৎপাটন করিতে হইলে সমাজের শিথিল পাশকে সুদৃঢ় করিতে হইবে; যুগধর্ম্মের হুজুগে মাতিয়া কালের স্রোতে ভাসিয়া গেলে চলিবে না। আবার বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী হইতে হইবে। যে সংস্কার, যে রীতিনীতি, যে আচার-অনুষ্ঠানের বলে বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের সভ্যতার ক্রমবিকাশ হইতেছিল, আবার বাঙ্গালীকে সেই পথে ফিরিতে হইবে। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাতর হইলে চলিবে না;—অতীতে আমরা কি ছিলাম, বর্ত্তমানে আমাদের কিসের অভাব, তাহাই চিন্তা করিতে হইবে।

বাঙ্গালায় পুরুষের অপেক্ষা নারীর আত্মহত্যার হার অধিক কেন, দেখা যাউক। 'প্রবাসী' বলেন,—

(১) 'আমাদের দেশে নারীদের চেয়ে অনেক বেশী পুরুষ উপন্যাস পড়ে। কিন্তু তজ্জন্য তাহারা ত আত্মহত্যা করে না। পাশ্চাত্য দেশ সকলে লেখাপড়া-জানা মেয়ে খুব বেশী, এবং তাহারা উপন্যাস পড়ে অত্যধিক মাত্রায়; কিন্তু তাহারা ত আমাদের দেশের মেয়েদের মত এত বেশী আত্মহত্যা করে না? সুতরাং স্ত্রীলোকের আত্মহত্যার অন্য কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।'

(২) 'পুরুষদের চেয়ে তাহাদের (নারীদের) মনে নৈরাশ্য আসিবার অধিকতর সম্ভাবনা আমাদের দেশের সামাজিক ও পারিবারিক কতকগুলি ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।'

পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি, আত্মহত্যাবিষয়ে কোনও পাশ্চাত্য দেশের সহিত বাঙ্গালার তুলনা করা সমীচীন নহে। আমাদেরই দেশের কথা আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বাঙ্গালার সহর ও পল্লীগ্রামের আত্মহত্যার হারের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সহরে মেয়েদেরই আত্মহত্যাপ্রবৃত্তি প্রবলতর। যদি সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থাই আত্মহত্যার জন্য দায়ী হইত, তাহা হইলে, পল্লীগ্রামেই আত্মহত্যার হার অধিক হওয়া উচিত ছিল; কারণ, পল্লীগ্রামে সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থার যতটা কষাকষি আছে, সহরে তাহা নাই। সুতরাং সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থার কঠোরতার জন্যই নারীদের আত্মহত্যার হার অধিক হয় না। অপিচ, দেখা যায়, স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা সহরে যেরূপ আছে, পল্লীগ্রামে তাহার শতাংশের একাংশ আছে কি না সন্দেহ। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার যদি নারীর আত্মহত্যার অন্তরায় হইত, তবে সহরের নারীরা পল্লীগ্রামের নারীদের চেয়ে অধিক সংখ্যায় আত্মহত্যা করিত না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে কলিকাতায় মেয়েদের স্কুল-কলেজ আছে, উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেইখানেই নারীর আত্মহত্যার হার পুরুষের চতুর্গুণ। অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত পুরুষের চেয়ে অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা নারীর সংখ্যা কম হইলেও, ইহা স্থির যে, কলিকাতায় বা অন্য সহরে নভেল-পড়া মেয়ের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। 'প্রবাসী'র সম্পাদক মহাশয় এ দিকে লক্ষ্য করিলে সহজেই বুঝিতেন, নভেল-পড়ার মধ্যেই নারীদের আত্মহত্যা-প্রবৃত্তির বীজ যথেষ্টপরিমাণে সঞ্চিত আছে। কলিকাতা বা বাঙ্গালার অন্যান্য সহরে উচ্চশিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা উচ্চ-

শিক্ষিতা নারীর চেয়ে অবশ্যই অধিক; কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। নভেল পড়িতে পারে, এমন মেয়ের সংখ্যা কলিকাতায় যে খুব বেশী, এ কথা কলিকাতার অনেক অধিবাসী স্বীকার করিবেন। এই জন্যই আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, 'সাধারণ বাঙ্গালী রমণী মনস্তত্ত্ব বুঝে না, দার্শনিক তত্ত্বও বুঝে না। তাহারা সাধারণ উপন্যাসের নায়কনায়িকার চলা-ফেরা, হাব-ভাব ও আদব-কায়দাই বুঝিবার চেষ্টা করে; তাহারই ফলে বাঙ্গালীর শান্তির কুটীরে অশান্তির সৃষ্টি করে।' 'প্রবাসী' হয় ত বলিবেন,—'নারীর উচ্চ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হউক; কালে তাহারা আর সাধারণ থাকিবে না, তখন তাহারা রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' বা 'চোখের বালি'র মনস্তত্ত্ব তথা দার্শনিক তত্ত্ব সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, এবং তখন তাহাদের নভেল পড়িয়া মানসিক বিকারের কোনও আশঙ্কাই থাকিবে না।' যুক্তির হিসাবে প্রস্তাবটির কিছু মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু যে দেশের সাধারণ গৃহস্থ পুরুষেরই উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার সহজে বহন করিতে পারে না, সে দেশের লোক আপাততঃ নারীর উচ্চশিক্ষালাভের পথ সুগম করিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। অধিকন্তু ইহাও দেখা যাইতেছে যে, আধুনিক স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার যেখানে যত, নারীর আত্মহত্যাপ্রবৃত্তি সেখানে ততই। বিশেষতঃ, যে শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি জাগে, তাহা বাঙ্গালীর আদর্শের প্রতিকূল। সে শিক্ষায় নারীর আত্মহত্যাপ্রবৃত্তি ক্রমেই বর্দ্ধিত হইবে, ইহা অনুমান করিবার কারণ আছে। কারণ, বাঙ্গালীর—বিশেষতঃ হিন্দু বাঙ্গালীর—সমাজ পাশ্চাত্য দেশসমূহের আদর্শে নারীর যথেচ্ছ আহার-বিহারে প্রশ্রয় দিবে না। ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কার। এ সংস্কার বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জাগত। এ সংস্কার উৎকট সাম্যবাদীর চক্ষে বিসদৃশ বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে সমাজের বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয়, এ কথা এ দেশের হিন্দু ও মুসলমান বুঝেন। যে কোনও সমাজের সাধারণ ব্যবস্থা যে সেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মনে আশার সঞ্চার করিবে, এমন কোনও নিয়ম নাই; সুতরাং সামাজিক কোনও ব্যবস্থার ফলে যদি কোনও নারী নৈরাশ্যে আত্মহত্যা করে, তবে তাহার জন্য সমগ্র সমাজের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। একটা ব্যবস্থাই দেখা যাউক। পতি-নির্ব্বাচনে নারীর স্বাধীনতা দিলে হিন্দু ও মুসলমানের জাতিগত ও ধর্ম্মগত বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে না। যেহেতু যাহাকে খুসী পতিত্বে বরণ করিয়া, আবার তাহাকে ছাড়িয়া, অপর পুরুষের অনুগামিনী হইবার প্রবৃত্তি রুদ্ধ করিবার শক্তি যে সাধারণ বা অসাধারণ, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সকল নারীর নাই, ইহা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। এই জন্যই বলি, নারীদের মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার হইলেই একটা সামাজিক ব্যবস্থার মূল উৎপাটন করিয়া ফেলিতে হইবে, ইহা দূরদর্শী ও বুদ্ধিমানের কথা নহে। সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার মধ্যে পুরুষদের অপেক্ষা নারীদের মনে অধিকতর নৈরাশ্যসঞ্চারের কারণ থাকিলে, সে কারণ নূতন নহে, তাহা বহু কাল হইতেই আছে। তবে পূর্ব্বেই বা নারীরা দলে দলে মরিত না কেন, আর এখনই বা মরে কেন? এ যুগের সাম্যবাদী সমাজসংস্কারকগণের ভুল এইখানেই ধরা পড়িবে। আলোচনা করিলে তাঁহারা সহজেই বুঝিবেন, স্ত্রীশিক্ষার বর্ত্তমান আদর্শ কত দূর হেয়। তাঁহারা বুঝিবেন, যে শিক্ষা নারীজাতিকে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবহেলা করিতে দীক্ষা দেয়,

বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা অমৃত নহে—তাহা গরল। যে শিক্ষা নারীর মনের কুণ্ঠা ঘুচাইয়া নিরঙ্কুশ অধিকারলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগায়, বাঙ্গালায় তাহার পরিণাম আত্মঘাত। দুরাশা যে নৈরাশ্যের সঞ্চার করে, তাহার ফল কদাচ শুভ হয় না।

যাহা হউক, যে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট হইতে পারে না, অথচ নারীদের দুঃখ দূর হয়, সে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনই আবশ্যক। কিন্তু কোনও সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না করিয়াও নরনারীর আত্মহত্যার পথ সঙ্কুচিত করা যায় কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। সর্ব্ববিধ চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ নির্ণয় করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিলে আত্মহত্যার পথে সহজেই কাঁটা পড়ে। চিত্তচাঞ্চল্য দূর করিবার একমাত্র উপায়—দেশে নীতি ও সংযমের চাষ। এই জন্য দেশে আমরা সেইরূপ শিক্ষারই প্রচলন চাহি, যাহাতে দেশের নরনারী সংযমী ও নীতিপরায়ণ হইতে পারে। কিন্তু সেইরূপ শিক্ষার দিকে দেশের নেতাদের কতটুকু দৃষ্টি আছে? যাঁহারা স্বায়ত্তশাসন লইয়া মারামারি, কাটাকাটি করিতেছেন, তাঁহারা কি একবার নিজের নিজের ঘরের দিকে ফিরিয়া চাহিবেন না? বিদেশিনী বেসাণ্টের দুর্দ্দশা দেখিয়া যাঁহাদের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইতেছে, মাতা ভগিনীর দুঃখে কি তাঁহাদের প্রাণ কাঁদে না? কাঁদে না বলিয়াই ত বঙ্গের এই অস্বাভাবিক আত্মঘাত।

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা।

"ইউরোপের বর্ত্তমান মহাসমর শেষ হওয়ার পর" যে সময় "ভারতীয় শাসন-ব্যাপারের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী" হইবে, সে সময় "যে কোনও একটি দেশীয় ভাষাকে সরকারী ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হইবে", এই আশায়, উর্দ্দূ-ভাষাভাষী মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ ভারতীয় ও বঙ্গীয় উর্দ্দূ সাহিত্য-সভা স্থাপন করিয়াছেন। উর্দ্দূ-ভাষাভাষীদিগের এরূপ চেষ্টা অন্যায় ও অস্বাভাবিক না হইলেও, আমরা তাঁহাদের এইরূপ চিন্তার কোনও যুক্তি-যুক্ত কারণ দেখিতে পাইতেছি না। কর্ত্তৃপক্ষ যদি বাস্তবিকই যুদ্ধের পর কোনও ভারতীয় ভাষাকে ভারতবর্ষে প্রাধান্য দান করেন, তাহা হইলে উর্দ্দূ যে সেই স্থান লাভ করিতে পারিবে, তাহা কিছুতেই সম্ভব নহে। কারণ, বর্ত্তমান সময় যে যে স্থানের মুসলমানদিগের মাতৃভাষা উর্দ্দূ, ইতিপূর্ব্বে গবর্মেণ্ট সেই সেই স্থানের আফিস-আদালতে হিন্দী ভাষার প্রচলন করিয়াছেন। কোন্ যুক্তির বলে এখন গবর্মেণ্ট সে ব্যবস্থা উল্টাইয়া দিবেন? হিন্দী-ভাষাভাষী অপেক্ষা উর্দ্দূ-ভাষাভাষীর সংখ্যা কি অধিক? পরন্তু কলিকাতার লোক—বঙ্গদেশের উর্দ্দূ সাহিত্য-সভার যাঁহারা

কর্ণধার, আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহি যে, তাঁহারা কি বঙ্গদেশের আফিস-আদালতেও উর্দ্দূভাষা-প্রচলনের আশা করিতেছেন?

কারণ উর্দ্দূভাষার ব্যাকরণ নাই। যে ভাষার ব্যাকরণ নাই, সে ভাষা কি প্রকারে হিন্দী অথবা বাঙ্গালা ভাষার উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে? যাঁহারা বৃটিশ ভারতে উর্দ্দূভাষার প্রাধান্য স্থাপন করিতে চাহেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে—যদি সম্ভব হয়—উর্দ্দূভাষার ব্যাকরণের সৃষ্টি করুন। কয়েক শত বৎসর অতীত হইল, উর্দ্দূভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। কত বড় বড় পণ্ডিত বড় বড় গ্রন্থ ও কাব্য রচনা করিয়া উর্দ্দূ সাহিত্যভাণ্ডারের সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেহই ত ব্যাকরণ রচনা করেন নাই? ব্যাকরণ ভাষার জীবন। উর্দ্দূভাষার ব্যাকরণ না থাকায়, অধুনা বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক যুগে, উহা মৃতভাষা বলিয়া জনসমাজে পরিচিত।

দিল্লীতে ভারতীয় উর্দ্দূ সাহিত্য-সভা স্থাপিত হইয়াছে,—বেশ কথা। সে স্থানের মুসলমানদিগের অধিকাংশের মাতৃভাষা উর্দ্দূ। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের রাজধানীও দিল্লীতে। সুতরাং ভারতীয় উর্দ্দূ সাহিত্য-সভা-স্থাপনের পক্ষে যে সেই স্থানই উপযুক্ত, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই নাই। কিন্তু ভারতবাসী উর্দ্দূ সাহিত্যিকদিগের মধ্যে কোন্ দলের মতানুসারে এই সভা চলিবে? (২০) প্রথমে ঘর সাম্‌লাইয়া পরে বাহির সামলাইবার চেষ্টা করিলে শোভনীয় হয়।

সভার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কারণ, উর্দ্দূ যাঁহাদের মাতৃভাষা, তাঁহারা যদি স্বীয় মাতৃভাষার সেবা না করেন, তবে কে করিবে? তাঁহারাই মায়ের সু-সন্তান, যাঁহারা মায়ের মলিন মুখ উজ্জ্বল করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন। যিনি গর্ভে ধারণ করিয়া, দশ মাস দশ দিন গর্ভ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন,—কেবল সন্তানের চন্দ্রবদন দর্শনের আশায়,

(২০) ভারতবর্ষে উর্দ্দূ সাহিত্যিকদিগের মধ্যে দুইটি দল আছে। একটি দিল্লীর দল; অপরটী লক্ষ্ণৌএর দল। আমাদের বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমবাবুর দলের সহিত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের দলের যে ঝগড়া গত কয়েক বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে, সে ঝগড়া—দিল্লী-লক্ষ্ণৌএর সাহিত্যিকদিগের ঝগড়ার তুলনায় অতি তুচ্ছ। যাঁহারা সে ঝগড়ার বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারাই জানেন যে, সে কি ভয়ানক ব্যাপার। লক্ষ্ণৌএর দল কর্দ্দমকে 'কীচড়' বলিয়া থাকেন। কিন্তু দিল্লীর দল কর্দ্দমকে বলেন,—'কীচ'। এই ব্যাপার লইয়া প্রায় দুই শত বৎসর হইতে ঝগড়া চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ঝগড়ার মীমাংসা হইতেছে না!

এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর, যিনি সেই সন্তানকে শরীরের রক্তবিন্দু পান করাইয়া তাহার দেহের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, তিনি যেমন মা, মানবের সেই প্রকার আরও দুইটী মা আছেন। গর্ভধারিণী মাতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে যেমন সন্তানের মহাপাপ হয়, সেইরূপ অপর দুই মাতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেও দুঃখ দুর্দ্দশার অবধি থাকে না।

মানবের দ্বিতীয় মা, জন্মভূমি মা। গর্ভধারিণী মাতার গর্ভে যখন সন্তানের আর স্থান হয় না, তখন যিনি আপন প্রশান্ত বক্ষে স্থান দান করেন, শৈশব-কালে যাঁহার প্রশান্ত বক্ষের উপর ধূলা-খেলা করিয়া কাল কাটে, যাঁহার বুক-চেরা—রক্ত-দেওয়া শস্য ও জলবায়ুর সাহায্যে মানবের দেহ ও মস্তিষ্ক বর্দ্ধিত হয়, তিনিও মা। এই মা, মানবের নিকট স্বর্গাদপি-গরীয়সী। ইহাকে অবহেলা করিলে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

মানবের তৃতীয় মা, ভাষা-জননী বাক্‌দেবী। যিনি গর্ভধারিণী মাতার নিকট একবিন্দু স্তনদুগ্ধের জন্য প্রার্থনা জানাইবার স্বর শিক্ষা দেন; ক্রন্দন করিবার স্ফূর্ত্তি যাঁহার বিকাশের প্রথম সূচনা; যাঁহার দ্বারা মানবের মস্তিষ্কের বিকাশ হয়; যিনি মানবকে পশু হইতে পৃথক করেন; মানব যাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়া পৃথিবীর মঙ্গল ও শান্তির জন্য লালায়িত হয়; যাঁহার সাহায্য ব্যতীত মানব খোদাতায়ালার পথ হইতে দূরে গিয়া পড়ে; অর্থাৎ, যে ভাষা-জননী, স্বভাবের গতির সহিত আপনা হইতেই মানবকে আশ্রয় করেন; তিনিই মানবের তৃতীয় মা। আমাদের বোধ হয়, ইনিই মানবের শ্রেষ্ঠ মা। কারণ, সন্তান ঐ সময় গর্ভধারিণী মাতার প্রতি যথার্থ ভক্তিপরায়ণ হয়, যে সময় সে ভাষা-জননীর আশ্রয় লাভ করে। সন্তান যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভাষা-জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে উপবেশন করিতে না পারে, ততক্ষণ সে স্বীয় কর্ত্তব্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের ন্যায় উর্দ্দূ ভাষা ও উর্দ্দূ সাহিত্যের সেবা এবং তাহার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্যও এক দল লোকের প্রয়োজন। কিন্তু সে লোক—সে সেবক, বাঙ্গালা দেশের—বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মধ্য হইতে গ্রহণের চেষ্টা বৃথা।

"ভারতের সকল প্রদেশের মুসলমানেরাই যাহাতে উর্দ্দূ ভাষাকে কথিত ও লিখিত ভাষারূপে গ্রহণ করেন, তাহার চেষ্টা" করিয়া কৃতকার্য্য হইবার আশা করাও বৃথা। কারণ, দেশের স্বভাবের উপরেই ভাষার ভিত্তি স্থাপিত হইয়া থাকে। তাই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সৃষ্টি বোধ হয়

খোদাতায়ালার অভিপ্রেত। তাহা না হইলে হয় ত পৃথিবী অচল হইত। সেই কারণেই বোধ হয় সৃষ্টিকর্ত্তা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা ঈশ্বরবিশ্বাসী, তাঁহারা নিশ্চয়ই এ কথা স্বীকার করিবেন যে, খোদাতায়ালার বিনানুমতিতে পৃথিবীতে কোনও মঙ্গল কার্য্যই হয় না। সুতরাং নিঃসঙ্কোচে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, সেই জগৎ-পাতা দয়াময় খোদাতায়ালাই ভিন্ন ভিন্ন ভাষার স্রষ্টা। এমন অবস্থায় যদি বাঙ্গালা দেশে উর্দ্দু ভাষা-প্রচলনের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে স্বভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে হইবে। আর স্বভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইলে, যিনি স্বভাবের স্রষ্টা, তাঁহার বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করা হইবে না কি? কিন্তু তাহা কি সম্ভব? খোদা-বিশ্বাসী মানবের কি তাহা করা উচিত? যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা; গড়া, রাখা ও ভাঙ্গা যাঁহার কার্য্য; যিনি রহমান, 'যব্বার' ও 'কাহ্হার', তাঁহার শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্য করিবার মত শক্তি কাহার আছে? কে এমন শক্তিমান্ পুরুষ, যিনি সেই সর্ব্বশক্তিমান খোদাতায়ালার মহাশক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জয়লাভ করিতে পারেন (২১)?

"ভারতবর্ষের সকলপ্রদেশবাসী মুসলমানদিগের মাতৃভাষা এক না হইলে, তাহাদের মধ্যে একতার ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে না", যাঁহারা এরূপ বলেন, বা বিশ্বাস করেন, কোনও মতেই তাঁহাদের মতের সমর্থন করিতে পারি না। কারণ, খোদাতায়ালার উপর যাঁহাদের ভক্তি ও বিশ্বাস আছে, তাঁহারা কখনই এরূপ উক্তি করিতে সাহসী হইতে পারেন না। কোরাণ শরীফের ন্যায় মহাগ্রন্থ যাঁহাদের ইহ-পরকালের সার সম্বল, হাদিসের ন্যায় মহান উপদেশ ও ব্যবস্থা-পুস্তক যাঁহাদের পথপ্রদর্শক, তাঁহারা যদি উর্দ্দু ভাষার সাহায্য ব্যতীত ভারতের মুসলমানদিগের মধ্যে একতা সুদৃঢ় করিবার উপায় খুঁজিয়া না পান, তবে আমরা তাহা মুসলমানের দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিব।

'কল্মায়-তৈয়ব', 'কল্মায়-শাহাদাৎ', 'কল্মায়-তওহিদ্', 'কল্মায়-তম্জিদ্',

(২১) বেহার ও উড়িষ্যা বহুকাল বাঙ্গালা দেশের সহিত একই ভাগ্য-সূত্রে গ্রথিত ছিল। এখনও বেহার ও উড়িষ্যা এক শাসনাধীন রহিয়াছে, এবং একই প্রদেশ বলিয়া পরিচিত। আসামও পূর্ব্ব ও উত্তর বাঙ্গলার সহিত যুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু কৈ, রাজশক্তি ত ঐ দুই দেশকে মাতৃভাষা হইতে এক চুলও হটাইতে পারে নাই? বেহারীরা পূর্ব্বাপর হিন্দীরই সেবা করিয়া আসিতেছেন, এবং উড়িষ্যায় উড়িয়ারাও আপনাদের ভাষা-জননীর অর্চ্চনা করিয়াছেন, এবং করিতেছেন।

ও 'কলুমায়-রদ্দেকোচর', এই পাঁচ কল্‌মাকে যাঁহারা একতার ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার পক্ষে যথেষ্ট মনে করেন না, 'ঈমান্‌-মোজমল্‌' ও 'ঈমান্‌-মোফাস্‌সল্‌'কে একতা সুদৃঢ় করিবার পক্ষে যাঁহারা অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে করেন, পবিত্র ও স্বর্গীয় গ্রন্থ কোরাণ মজিদকে যাঁহারা একতা সুদৃঢ় করিবার পক্ষে প্রধান সহায় বলিয়া মনে করেন না, হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (দং) পবিত্র উপদেশবাণী যাঁহাদের মধ্যে একতা সুদৃঢ় করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা কি প্রকারে ইস্‌লাম-বিশ্বাসী বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবেন, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। যে ক্ষেত্রে কোরাণ, হাদিস, ফেকা, এজ্‌মা,—কেয়াস ও কল্‌মা, এবং ঈমান যথেষ্ট হইল না, সে ক্ষেত্রে যে উর্দ্দূ ভাষা গ্রহণ করিলে কি প্রকারে একতা সুদৃঢ় হইতে পারিবে, তাহাও আমরা বুঝিতে অক্ষম। কি প্রমাণের বলে যে তাঁহারা ভারতের মুসলমানদিগের মধ্যে একতা সুদৃঢ় করিবার জন্য বাঙ্গালার বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে উর্দ্দূ ভাষাকে মাতৃভাষা রূপে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন, তাহা আমরা তাঁহাদের যুক্তির ভিতর খুঁজিয়া পাইতেছি না। কোরাণ, হাদিস, ঈমান, কল্‌মা ও ফেকাএজ্‌মা—কেয়াস প্রভৃতির উপর যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা মুসলমানদিগের মধ্যে একতা সুদৃঢ় করিবার পক্ষে তাহাকেই যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন। যাঁহারা তাহা করেন না, যাঁহাদের সে বিশ্বাস নাই, মস্‌জিদ্‌, মেম্বার ও মিমামার আহ্বান একতা সুদৃঢ় করিবার পক্ষে যাঁহাদের নিকট প্রশস্ত ও পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না, তাঁহাদের যুক্তির সমর্থন করিতে পারি না। মুসলমানদিগের মধ্যে একতা সুদৃঢ় করিবার জন্য এ হেন সদুপায়গুলিকে যাঁহারা উপেক্ষা করিয়া উর্দ্দূ ভাষার সাহায্য গ্রহণ করিতে চান, তাঁহাদিগকে আমি জ্ঞানী বলিতে প্রস্তুত নহি।

যে সকল বঙ্গ-সন্তান সমুদায় ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের মধ্যে উর্দ্দূ ভাষার প্রচলন করিয়া একতা সুদৃঢ় করিবার প্রয়াসী, তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন না যে, এক দিকে একতা দৃঢ় করিতে গিয়া, অপর দিকে তাঁহাদের সাধের একতা ভাঙ্গিয়া 'চুর-মার' হইয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে উর্দ্দূ ভাষা ধরাইয়া, তাঁহাদের সহিত বঙ্গের বাহিরের মুসলমানদিগের সৌহৃদ্য বর্দ্ধিত করিতে যাইয়া যে তাঁহাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে কলহের সূত্রপাত হইতেছে, ভাইয়ে ভাইয়ে, চাচা-ভাইপোয়, মামা-ভাগিনেয়ে, শ্বশুর-জামাতায়, আত্মীয়-প্রতিবেশীতে যে এই উপলক্ষে মারামারি ও কাটাকাটী আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা ঘটিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবার মত শক্তি, সামর্থ্য ও বুদ্ধি তাঁহাদের কোথায়?

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পবিত্র ও স্বর্গীয় গ্রন্থ কোরাণ, হজরত পায়গাম্বার সাহেবের উপদেশ-বাণী হাদিস, এবং ফেকা,—এজ্‌মা-কেয়াসই মুসলমানদিগের সার সম্বল। কল্‌মা ও ঈমানগুলিই মুসলমানদিগের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু উর্দ্দূ সাহিত্য-সভার কর্তৃপক্ষের উর্দ্দূ-গ্রহণের এই যুক্তিটী উহার কোন্‌টীর অন্তর্ভুক্ত? মুসলমানদিগের প্রধান ধর্ম্মকার্য্যাবলীর মধ্যে 'হজ্ব' ব্যবস্থা অন্যতম। পবিত্র ভূমি মক্কা-মোয়াজ্জমা-স্থিত কাবা মন্দির ও আরাকাৎ-প্রান্তর প্রভৃতি স্থানগুলি 'হজ্ব' কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু ঐ সকল স্থানের মুসলমানদিগের মাতৃভাষা আরবী, এবং কোরাণ-হাদিস প্রভৃতির ভাষাও আরবী। যে স্থানের পবিত্র ধূলিকণা শিরে ধারণ করিতে পারিলে পৃথিবীর তাবৎ স্থানের মুসলমানেরা নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন, এবং নিজেকে শ্লাঘান্বিত মনে করেন, উর্দ্দূ অথবা বঙ্গভাষাভাষী মুসলমানেরা সেই পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইলে, যথাক্রমে হিন্দী অথবা বাঙ্গালী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। হিন্দু শব্দ হইতে যে 'হিন্দুস্থান' নামের সৃষ্টি, এবং হিন্দুস্থানের অধিবাসী বলিয়াই যে হিন্দী নামের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। 'বাঙ্গালী' নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেছে। এমন অবস্থায় হিন্দী হওয়া অপেক্ষা কি বাঙ্গালী হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে?

শুনা যায়, প্রত্যেক বৎসর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্নজাতীয় ৯,০৯,৯০৯ জন মুসলমান 'হজ্ব' ব্রত পালন করিবার জন্য মক্কাধামে উপস্থিত হইয়া থাকেন। ধর্ম্মের হিসাবে ও স্থানমাহাত্ম্যে আমরা যাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ, বরেণ্য ও সম্মানার্হ বলিয়া মনে করিয়া থাকি, এবং সর্ব্বদাই যাঁহাদের উদ্দেশ্যে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া থাকি, সেই আরবীয় মুসলমান ভ্রাতারা, তাঁহাদের মাতৃভাষা আরবী হইলেও, রুস, তুর্কী, ইংরেজ, আফ্‌গানী, পার্শী, চীনা, জাপানী, হিন্দী ও বাঙ্গালী প্রভৃতি মুসলমান হাজীদিগকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন দান করিতে ও তাঁহাদের সহিত আত্মায় আত্মায় এক হইয়া ইস্‌লামানুমোদিত প্রেম বিতরণ করিতে কি কখনও কুণ্ঠিত হয়েন? তাঁহারা ত ভিন্ন দেশের ভিন্ন-ভিন্ন-ভাষা-ভাষী মুসলমানদিগকে আপন সহোদর ভ্রাতা অপেক্ষাও আপনার জন ভাবিয়া, সেইরূপ স্নেহ-ভক্তির চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন? কোরাণ ও হাদিসাদিতে ত মাতৃভাষা সম্বন্ধে কোনও কথাই উল্লিখিত হয় নাই? যাঁহাদের ধর্ম্ম-সম্বন্ধ এক, তাঁহারা পরস্পর ভাই ভাই—সে যে-দেশবাসী ও যে-ভাষাভাষীই হউক না কেন—সে আপন অপেক্ষাও আপনার জন, ইহাই হইল কোরাণ ও হাদিসের শিক্ষা।

এরূপ আদর্শ উপদেশ ও আদর্শ শিক্ষা সম্মুখে থাকিতে, যাঁহারা ভাষা এক না করিয়া কোরাণ-বিশ্বাসী 'কল্মা-গো' ভ্রাতাদিগের সহিত একতা স্থাপন করিয়া তাহাদের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইতে সমর্থ নহেন, তাঁহারা ইস্লামের দাবী করেন,—মুসলমান বলিয়া শ্লাঘা করেন কোন্ সাহসে? ভারত-বর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমানদিগকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন দান করিবার জন্য যাঁহাদিগকে ভাষা বদ্লাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাঁহারা কি প্রকারে পৃথিবীর অপরাপর স্থানের মুসলমানদিগের সহিত কোরাণের আদেশানুসারে সৌহৃদ্য ও ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিতে সমর্থ হইবেন? যাঁহারা ভাষা এক না করিয়া, কোরাণ ও হাদিসের আদেশ মান্য করিয়া চলিতে অক্ষম, আমি তাঁহাদিগকে কোনও ক্রমেই বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসা করিতে পারি না।

যে সকল বাঙ্গালী-সন্তান প্রায় পৌণে চারি কোটী মুসলমানের স্বার্থে এইরূপে জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছেন, কোনও জ্ঞানী মহাজনই বোধ হয় তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিবেন না। যে কয় জন বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালা দেশে উর্দ্দূ মন্ত্র প্রচার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, উর্দ্দূ-ভাষাভাষীদিগের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিজের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করিতে বসিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে ইহার পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। যে দেশের মহিলাদিগের মধ্যে—

"মাসী বল, পিসী বল, মায়ের সমান নয়।
ভাজা বল, ভুজা বল, ভাতের সমান নয়॥"

এইরূপ প্রবচন প্রচলিত আছে, সে দেশে চাউলের পরিবর্ত্তে যব ও গম চালাইবার চেষ্টা যেমন অস্বাভাবিক, বাঙ্গালা ভাষার পরিবর্ত্তে উর্দ্দূ ভাষা প্রচলিত করিবার চেষ্টাও সে দেশে সেই প্রকার অস্বাভাবিক।

যাঁহারা বাঙ্গালা দেশে, বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে, স্বভাবের গতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া,একতা-বৃদ্ধির দোহাই দিয়া উর্দ্দূ ভাষার প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে, এরূপে 'পীর-পয়গম্বর' বনিবার চেষ্টা না করিয়া, ভারতের যে যে প্রদেশবাসী মুসলমানদিগের মধ্যে উর্দ্দূ ভাষার প্রচলন আছে, সেই সেই প্রদেশে উর্দ্দূ সাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা কর, সফলতা লাভ করিতে পারিবে। বাঙ্গালা মুল্লুকে উর্দ্দূ চালাইবার জন্য এক পদও অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিও না; ফল মন্দ হইবে। সেরূপ চেষ্টা করিলে, তোমাদের উৎসাহ, উদ্যম ও অধ্যবসায় বন্যার জল-স্রোতে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে।

ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে বাঙ্গালী-সন্তান হইয়া, আজি যাঁহারা জন্মভূমি মাতা ও মাতৃভাষা জননীকে মাতৃসম্বোধন করিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন, জাতিগত স্বার্থরক্ষার্থ আমরাও তাঁহাদিগকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করিতে লজ্জা বোধ করিতেছি। বাঙ্গালার মুসলমানেরা বাঙ্গালী, কেবল এই ওজুহাতে যাঁহারা প্রায় পৌনে চারি কোটী মুসলমানকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, ইসলাম ধর্ম্মের সার সম্বল মহাগ্রন্থ কোরাণ কি তাঁহাদের এই কার্য্যের সমর্থন করেন? দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, কান্‌পুর প্রভৃতি স্থানের মুসলমানদিগের কথা বলিব না। যে বেহার এত কাল বাঙ্গালার অঙ্গীভূত ছিল,যে বেহার বাঙ্গালার—বাঙ্গালীর খাইয়া পরিয়া মানুষ, সেই বেহারী মুসলমান ভ্রাতারা বাঙ্গালার বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে আন্তরিক ঘৃণা করিয়া থাকেন কোন্ ওজুহাতে? কেবলমাত্র বাঙ্গালার—বাঙ্গালী হইবার অপরাধে যাঁহারা পৌনে চারি কোটী বাঙ্গালী মুসলমানকে কুক্কুর, বিড়াল অপেক্ষাও হেয় ও ঘৃণ্য মনে করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত একতা ও সৌহৃদ্য-বৃদ্ধির আশায়, বাঙ্গালী মুসলমান কখনই স্বীয় মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া, উর্দ্দূ ভাষার সেবায় অগ্রসর হইবেন না—হইতে পারেন না।

বেহার প্রভৃতি স্থানের সাধারণ মুসলমানেরাও ত উর্দ্দূর সেবা করে না। তাহারাও ত হিন্দী ভাষাকেই মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করে। সুতরাং বাঙ্গালী মুসলমান দেশভাষা—বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা না বলিয়া, দূর দেশের উর্দ্দূ ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। বাঙ্গালী মুসলমানের পক্ষে তাহা সম্ভবও নহে, এবং বাঙ্গালী মুসলমান এরূপ কার্য্যকে গর্হিত, অন্যায় ও পাপকার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

ইস্‌লামের একতা ও ভ্রাতৃভাব কোনও ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর সীমাবদ্ধ নহে। বাঙ্গালী মুসলমান আজিও কোরাণের শিক্ষা ভুলিয়া যান নাই। ধর্ম্মের অনুশাসন মান্য করিয়া চলিবার মত শক্তি আজিও তাঁহারা হারান নাই। বাঙ্গালী মুসলমানের হৃদয় এত ক্ষুদ্র, এবং অন্তঃকরণ এত নীচ নহে যে, কোরাণানুমোদিত একতা, ভ্রাতৃভাব ও প্রেম ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর সীমাবদ্ধ রাখিবে। পৃথিবীর তাবৎ মুসলমানই আমাদের ভাই। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ মনুষ্যই আমাদের আপনার জন;—আমাদের প্রেমাস্পদ। কোরাণের ন্যায় মহাগ্রন্থ ইহ-পরকালের সার সম্বল থাকিতে আমরা আমাদের মাতৃভাষা ছাড়িয়া উর্দ্দূ ভাষাকে মাতৃভাষার আসন দিব কেন?

"ভারতবর্ষ হিন্দুপ্রধান"—প্রায় বিশ কোটী হিন্দু ভারতবর্ষের অধিবাসী।

আর "হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অল্প"—প্রায় সাত কোটী। তাহাতে ভয়ের কি কারণ আছে? যাঁহাদের কোরাণ বিশ্বপ্রেম শিক্ষা দিতেছেন, যাঁহাদের পয়গম্বর বিশ্বনীতির আদর্শ শিক্ষক, তাঁহারা যদি সামান্য বিশ কোটী হিন্দুর ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের লজ্জা রাখিবার স্থান কোথায়? "আশরাফল মখ্‌লুকাত" (২২) হইয়া, ইসলাম-বিশ্বাসী হইয়া, যাঁহারা শত্রুকেও মিত্র করিবার স্পর্দ্ধা হারাইয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই মানব-নামের—মুসলমান-নামের অযোগ্য। ধর্ম্মের বলই মহাবল। তুমি ধার্ম্মিক হও, তুমি প্রেমিক হও, তোমার হৃদয়কে প্রকৃত মানব-হৃদয়ে উন্নীত কর, তুমি কোরাণের আদেশ ও হাদিসের উপদেশের অনুসরণ কর, তোমার শত্রু থাকিবে না। তুমি মুষ্টিমেয় হইলেও, বিশ কোটী হিন্দুর আপনার জন হইতে পারিবে। বিশ কোটী হিন্দু তোমার বন্ধু হইবে—তোমার জয়লাভ হইবে।

কিন্তু তর্কস্থলে যদি উক্ত অমূলক আশঙ্কাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে কেবল ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের জন্য চিন্তা না করিয়া, সমস্ত পৃথিবীর মুসলমানদিগের জন্য চিন্তা করা উচিত। সংখ্যায় অধিক হইলেই যদি ভয়ের কারণ হয়, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবীতে খৃষ্টান, য়িহুদী, বৌদ্ধ, হিন্দু, প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীই ত অধিক। তোমাদের মত অনুসারে কেহই ত আপনার নয়—কেহই ত মিত্র নয়? মুসলমানদিগের সংখ্যাল্পতার জন্য যদি তাঁহাদের প্রতি অধিকসংখ্যক অ-মুসলমানের অত্যাচারের মাত্রা বর্দ্ধিত হয়, এবং মাতৃভাষা এক করিলেই যদি সে আশঙ্কা দূর হয়, তাহা হইলে, পৃথিবীর সকল স্থানের মুসলমানদিগের মাতৃভাষা এক হওয়া উচিত নহে কি? মুসলমান, সুতরাং তাঁহাদের মাতৃভাষা এক করিতে হইবে, এই যুক্তি যদি বলবতী হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর সকল স্থানের মুসলমানদিগের মাতৃভাষা আরবী হওয়া উচিত নহে কি? যেহেতু তাঁহাদের কোরাণ, তাঁহাদের হাদিস, তাঁহাদের ফেকা-এজমা-কেয়াস-ওসুল প্রভৃতি মূল ধর্ম্মগ্রন্থগুলি যখন আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, মুসলমান-দিগের মাথার মুকুট-মণি হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (দং) মাতৃভাষা যখন আরবী ছিল, সেই হেতু পৃথিবীর তাবৎ স্থানের মুসলমানদিগের—ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেক মানবের মাতৃভাষা আরবী না হইবে কেন? কিন্তু তাহা কি সম্ভব?

(২২) ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাদিগকেই "আশরাফল মখ্‌লুকাত" বলে। মানব শ্রেষ্ঠ, তাই মানবের আর একটি নাম আশরাফল মখ্‌লুকাত।

তাহার পর হিন্দুর অত্যাচারের কথা। ভারতবর্ষের মুসলমান অধিবাসী-দিগের সহিত যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতাদিগের মধ্যে মধ্যে গরু কোরবাণীর ব্যাপার লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে, সে কথা আমি অস্বীকার করিতে চাহি না। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে সে বিরোধ যে চিরস্থায়ী নহে, সে কথা আমরা জোর করিয়া বলিবই।

ভারতের ভাষাসমূহের মধ্যে উর্দ্দূভাষাই যে একমাত্র ইস্‌লাম-ধর্ম্মানুমোদিত ভাষা, এ কথারও কোনও মূল্য নাই। কারণ, বিদেশী আরবী, পার্শী, এবং ভারতীয় হিন্দী, নাগ্‌রী, প্রাকৃত, সংস্কৃত, মারহাঠী, মান্দ্রাজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে কয়েক শত বৎসর হইল, উর্দ্দূভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। পরন্তু বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে যে সকল মুসলমান বাস করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই আরব ও পারস্য দেশ হইতে আইসেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে আমরা "ভারতের মুসলমান" নামক একখানি পুস্তক-প্রণয়নে ব্যাপৃত আছি। প্রায় ছয় বৎসর ধরিয়া এই পুস্তকের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। সেই সকল উপকরণ হইতে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি। যাঁহারা বলেন, এ দেশ মুসলমানদিগের মাতৃভূমি নহে—উপনিবেশ, তাঁহারা নিম্নের তালিকা দৃষ্টে বুঝিতে পারিবেন যে, অধিকাংশ মুসলমানই এই দেশের হিন্দুদিগের বংশধর। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, অতি অল্পসংখ্যক মুসলমান বাস করেন, যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ আরব অথবা পারস্য দেশ হইতে আসিয়া এ দেশে বাস করিয়াছিলেন। সর্ব্বসমেত মোট একাদশ শ্রেণীর মুসলমান এখন এ দেশে বাস করিতেছেন। যথা—

(১) ভারতবর্ষ মুসলমানাধিকৃত হইবার পূর্ব্বে যখন হিন্দুরা স্বাধীন ছিলেন, কিংবা মুসলমানাধিকৃত হইবার পর, আরব ও পারস্য দেশ হইতে যে সকল মুসলমান সওদাগর, পরিব্রাজক ও দরবেশ এ দেশে আসিয়াছিলেন, এবং এই দেশে বাস করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের সহিত স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে, যে সকল অনুচর, সহচর ও শিষ্য-শাগ্‌রেদ আসিয়াছিলেন, এই দেশেই স্থায়িভাবে বাস করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সংসার-আশ্রমের মধ্যে থাকিয়া ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যে সকল বংশধরেরা আজিও এ দেশে বাস করিতেছেন।

(২) ভারতবর্ষ মুসলমানাধিকৃত হওয়ার পূর্ব্বে ও পরে আরব ও পারস্য-দেশবাসী যে সকল পরিব্রাজক ও দরবেশ এ দেশে আসিয়াছিলেন, এবং

তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্থায়িভাবে বাস করিয়াছিলেন। এই সকল পরিব্রাজক ও দরবেশদিগের অনেকেরই বংশধরেরা আজিও ভারতবর্ষে অথবা বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন।

(৩) আরব ও পারস্য দেশবাসী যে সকল মুসলমান, ভারতসম্রাজ্য মুসলমানাধিকৃত হইবার পর রাজকার্য্য উপলক্ষে, বঙ্গদেশাদি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, এবং তাঁহাদের যে সকল বংশাবলী আজিও এ দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন।

(৪) ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইবার পর, ধর্ম্মপিপাসু উচ্চ শ্রেণীর যে সকল হিন্দু স্বেচ্ছায় ইস্‌লামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের যে সকল বংশাবলী আজিও এ দেশের বিভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন।

(৫) ভারতসম্রাজ্য মুসলমানাধিকৃত হইবার পর যে সকল হিন্দু কর্ম্মোপলক্ষে মুসলমানদিগের সংস্রবে আসিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য হিন্দুসমাজ সেই সকল হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহাদের সহিত সকল প্রকার সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বাধ্য হইয়া ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর মুসলমানদিগের যে সকল বংশধর আজিও এ দেশে বাস করিতেছেন।

(৬) ভারতবর্ষে ও বঙ্গদেশে 'পীর-আলী' বংশের যে সকল বংশধর আজিও মুসলমানরূপে বাস করিতেছেন।

(৭) ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের উচ্চ শ্রেণীর যে সকল হিন্দু সস্ত্রীক ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের যে সকল পুত্র-কন্যার সহিত আরব, পারস্য, অথবা আফগান দেশ হইতে সমাগত যে সকল মুসলমানদিগের পুত্র-কন্যার বিবাহ হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের যে সকল বংশধর আজিও এ দেশে বাস করিতেছেন।

(৮) ভারতবর্ষের কতক অংশ মুসলমানাধিকৃত হইবার পর, যে সকল অনধিকৃত অংশে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য ছিল, মুসলমান বাদ্‌শাহেরা সেই সকল হিন্দুরাজ্যে অধিকারবিস্তারের জন্য অনেক সময় সৈন্য-সামন্ত লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতেন। যে যে স্থানের মধ্য দিয়া বাদশাহের 'লস্কর' গমন করিত, সেই সেই স্থানে নিম্ন শ্রেণীর যে সকল হিন্দুর বাস ছিল, তাহাদের অনেকেই বাদশাহের সেনার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, অনর্থক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত—কল্‌মা পড়িত—মাথায় টুপী দিত। কিন্তু বাদশাহ-সৈন্য চলিয়া যাইবার

পর কেহ কেহ পুনরায় পূর্ব্ব ধর্ম্ম গ্রহণ করিত; আর কেহ কেহ ইস্‌লাম ধর্ম্মের আশ্রয়েই থাকিত। সেই শ্রেণীর হিন্দু অথবা হিন্দু হইতে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত মুসলমানেরা কেহই ধর্ম্ম বুঝিত না। হিন্দুধর্ম্মের অনুশাসনও জানিত না—মানিত না; ইস্‌লাম ধর্ম্মের আদেশ ও বিধিসম্বন্ধেও তাহারা 'ওয়াচেফ-হাল্' ছিল না। যাহারা ইস্‌লাম ধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতর থাকিত, তাহাদের বংশাবলী আজিও মুসলমান নামে খ্যাত।

(৯) ভারতসাম্রাজ্য মুসলমানাধিকৃত হইবার পর, উচ্চ রাজকার্য্যে অধিকারলাভের আশায়, এক দল হিন্দু ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর মুসলমানদিগের যে সকল বংশধর আজিও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বাস করিতেছেন। অথবা বৈরি-দমন জন্য যে সকল হিন্দু মুসলমান সম্রাট ও রাজপুরুষদিগের সহানুভূতি-প্রাপ্তির আশায় হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের যে সকল বংশধর আজিও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বাস করিতেছেন।

(১০) ভারতসাম্রাজ্য মুসলমানাধিকৃত হইবার পর যে সকল উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থপর হিন্দু, মুসলমান বাদশাহ অথবা আমীর-ওমরাহদিগের সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং হিন্দুসমাজ সেই সকল হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহাদিগকে জাতি-চ্যুত করিয়াছিলেন, তাঁহারাই পরে প্রকাশ্যভাবে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই শ্রেণীর মুসলমানদিগের যে সকল বংশধর আজিও এ দেশে বাস করিতেছেন।

(১১) ভারতসাম্রাজ্য মুসলমানদিগের হস্তচ্যুত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, এবং তাহার কিঞ্চিৎ পরে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় খৃষ্টান ব্যবসায় উপলক্ষে অথবা অপর কোনও নীচ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া এ দেশে আসিয়াছিল, এবং তাহাদের মধ্যে ক্ষমতাশালী ও চরিত্রহীন যে সকল খৃষ্টান এতদ্দেশীয় দুই চারি জন হিন্দু অথবা মুসলমান স্ত্রীলোককে ছলে, বলে ও কৌশলে ভুলাইয়া উপপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। এই শ্রেণীর হতভাগিনীদিগের মধ্যে যাহাদের গর্ভে সন্তানসন্ততি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এবং তাহাদের মধ্যে এখন যাহারা নিজেকে মুসলমান বলিয়া পরিচিত করিতেছে, এবং এই দেশেই বাস করিতেছে। কিংবা যে সকল চরিত্রহীন মুসলমান ও হিন্দু, খৃষ্টান ও য়িহুদী নারীদিগকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, এবং তাহাদের গর্ভে যে সকল সন্তানসন্ততি জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং তন্মধ্যে যাহারা মুসলমানরূপে এ দেশে বাস করিতেছে। চরিত্রহীনা হিন্দু ও

মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের গর্ভজাত যে সকল সন্তান এ দেশে মুসলমানরূপে বাস করিতেছে। বারবিলাসিনীদিগের গর্ভজাত সন্তানদিগের মধ্যে যাহারা মুসলমান-রূপে এ দেশে বাস করিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ, বঙ্গদেশে উল্লিখিত একাদশ শ্রেণীর মুসলমান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রতি শতকরা প্রায় আট জন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রতি শতকরা প্রায় তিন জন। তৃতীয় শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রতি শতকরা প্রায় পনর জন। চতুর্থ শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রতি শতকরা প্রায় পাঁচ জন। পঞ্চম শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রতি শতকরা প্রায় আট জন। ষষ্ঠ শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রতি শতকরা প্রায় এক জন। সপ্তম শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রতি শতকরা প্রায় বিশ জন। অষ্টম শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রতি শতকরা প্রায় ছাব্বিশ জন। নবম শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রতি শতকরা প্রায় আট জন। দশম শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রতি শতকরা প্রায় চারি জন। একাদশ শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রতি শতকরা প্রায় দুই জন। এই তালিকা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বাঙ্গালা দেশের আদিম অধিবাসী-(হিন্দু)-দিগের যে সকল বংশধর ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যাই বাঙ্গালা দেশে অধিক। সুতরাং এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালা দেশ বাঙ্গালী মুসলমানদিগের উপনিবেশ নহে। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেবল ধর্ম্মপরিবর্ত্তনই করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলেই ভাষার পরিবর্ত্তন করেন নাই। ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই যদি ভাষা-পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়, এবং এই যুক্তির যদি কোনও মূল্য থাকে, তবে আমরা দৃঢ়তার সহিত এ কথা বলিব যে, তাহা উর্দ্দূ ভাষা নহে; সে ভাষা আরবী ভাষা।

উর্দ্দূ ভাষা যে ইস্‌লাম-ধর্ম্মানুমোদিত ভাষা নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। একমাত্র আরবী ভাষা ব্যতীত অপর কোনও ভাষাকেই ইস্‌লাম-ধর্ম্মানুমোদিত ভাষা বলা যাইতে পারে না, সে কথাও পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

ধর্ম্মের সহিত মাতৃভাষার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর না হইলে যে সমান ভাবে ধর্ম্ম ও মাতৃভাষার সম্মান বজায় রাখা সম্ভব নহে, এ কথাও আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কারণ, মাতৃভাষার সহিত যে ধর্ম্মের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, ইহার কোনও প্রমাণ নাই। তবে মাতৃভাষার সহায়তায় ধর্ম্মের বিধি-

ব্যবস্থা, আদেশ-নিষেধগুলি বুঝিয়া সেই মত কার্য্য করিবার প্রয়োজন হয় বটে। যেমন বৃটিশ-রাজ এখন ভারতবর্ষের সম্রাট। তাঁহার আইনগুলি ইংরাজী ভাষায় রচিত। আমরা সেই আইনের মর্ম্ম কেহ বাঙ্গালায়, কেহ হিন্দীতে, কেহ উর্দ্দূতে বুঝিয়া লইয়া সেই মত কার্য্য করিয়া থাকি। কিন্তু আইনের ভাষা ইংরাজী বলিয়া, কেহই ত আপনাপন মাতৃভাষা বাঙ্গালা, হিন্দী, অথবা উর্দ্দূ ভাষাকে ত্যাগ করিয়া, ইংরাজী ভাষাকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা স্বীকার করিতে পারি না? ঠিক সেই প্রকার খোদার আইনের মর্ম্ম মাতৃভাষায় বুঝিয়া লইয়া, সেই অনুসারে কার্য্য করাই আবশ্যক; মাতৃভাষা ত্যাগ করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। যে ভাষা যাহার মাতৃভাষা, সেই ভাষার সাহায্যে সে কোরাণ, হাদিস, বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের আদেশ, বিধি ও নিষেধ বুঝিয়া লইবে, এবং সেই অনুসারে কার্য্য করিবে।

লণ্ডনের মুসলমানেরা যদি তাঁহাদের মাতৃভাষার সহায়তায় (ইংরাজী তাঁহাদের মাতৃভাষা) ধর্ম্মপালন করিতে পারেন, পারস্যের মুসলমানেরা যদি তাঁহাদের মাতৃভাষা ফার্সীর সাহায্যে ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়েন, আফগানের মুসলমানেরা যদি তাঁহাদের মাতৃভাষা পোস্তের সাহায্যে ইস্‌লাম ধর্ম্মের ব্যবস্থা মান্য করিয়া চলিতে অক্ষম না হয়েন, চীনের মুসলমানেরা যদি চীনাভাষার সাহায্যে ইস্‌লাম ধর্ম্মে আস্থাবান থাকিতে পারেন, তাহা হইলে, বাঙ্গালার মুসলমানেরা বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে ধর্ম্মপালন করিতে ও ধর্ম্মের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন না কেন? উর্দ্দূভাষাই যে মুসলমানের জাতীয়তার আদর্শ রক্ষা করিতে সমর্থ, এবং উর্দ্দূ ব্যতীত বাঙ্গালাভাষাকে মাতৃভাষা রূপে স্বীকার করিলে বাঙ্গালার মুসলমানদিগের জাতীয়তার আদর্শ নষ্ট হইয়া যাইবে কেন, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। এই বিংশ শতাব্দীতে প্রমাণ ব্যতীত কোনও কথাই গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু জাতীয়তার আদর্শ নষ্ট হইবার অমূলক আশঙ্কার প্রমাণাভাব। তাহার পর জাতির কথা। জাতি না হইলে ত জাতীয়তা হয় না? পরন্তু জাতির সহিত ধর্ম্মের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ধর্ম্ম এক, জাতি আর। ব্যক্তির জন্মভূমি এবং মাতৃভাষা ধরিয়াই তাহার জাতি নির্ণীত হয়। যেমন আরব জাতি, জর্ম্মণ জাতি, তুর্কী জাতি, ইংরেজ জাতি, ফরাসী জাতি, সেইরূপ বাঙ্গালার অধিবাসীরাও বাঙ্গালী জাতির অন্তর্ভুক্ত। যেমন বোম্বাইবাসীদিগকে বোম্বাইয়া, মান্দ্রাজের অধিবাসীদিগকে মান্দ্রাজী, কটকের অধিবাসীদিগকে কট্‌কী, উড়িষ্যার অধিবাসীদিগকে উড়িয়া, এবং

বেহারের অধিবাসীদিগকে বেহারী বলা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্ম, এবং আস্তিক ও নাস্তিক সবাই আছেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মোট নয়টী উদ্দেশ্য লইয়া, বাঙ্গালা দেশের মুসলমানদিগের জন্য উর্দ্দূ সাহিত্য-সভার সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে উপরে পর পর আটটী উদ্দেশ্যের আলোচনা করিয়াছি। এইবার নবম উদ্দেশ্যের আলোচনা করিব। নবম উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে, যে, বাঙ্গালী মুসলমানেরা অপদার্থের একশেষ। তাঁহারা প্রাইমারী বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকতা করিবারও অযোগ্য। তাঁহারা হিন্দুশিক্ষকদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু বাঙ্গালী নামে শ্লাঘা বোধ করেন, বাঙ্গালা দেশের এমন কোনও মুসলমানই এ কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। আমরা বাঙ্গালা দেশের যতটা সংবাদ রাখি, তাহাতে দৃঢ়তার সহিত এ কথা বলিতে পারি যে, বাঙ্গালা দেশে এখন যতগুলি উচ্চ ও নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, এবং সেই সকল বিদ্যালয়ে যাঁহারা শিক্ষকতা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু শিক্ষক অপেক্ষা মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যা অধিক না হইলেও (২৩) অল্প নহে।

বাঙ্গালার মুসলমান-ছাত্র-দত্ত অর্থ যে কেবল হিন্দু শিক্ষকদিগেরই উদর পূর্ণ করিতেছে, এ কথাও সত্য নহে। এক দল মুসলমান ছাত্র যেমন হিন্দু শিক্ষককে অর্থ দান করিতেছে, সেই প্রকার আর এক দল হিন্দুছাত্র মুসলমান শিক্ষককেও অর্থ দান করিতেছে। বাঙ্গালী মুসলমানদিগের অন্তঃকরণ এত নীচ নহে যে, তাঁহারা গুরু শিক্ষককে যে অর্থ দিতেছেন, তাহার জন্য অনুতাপ করিবেন? যাঁহারা এরূপ কথা বলিতেছেন, তাঁহারা কি হিন্দু শিক্ষকের সংস্রব ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন? বাঙ্গালী মুসলমান এ সম্বন্ধে কোনও প্রকার আলোচনা করা অন্যায় কার্য্য বলিয়া মনে করেন। প্রাইমারী বিদ্যালয়সমূহে যে সকল পুস্তক পড়ান হয়, তাহার অধিকাংশই যে হিন্দুর লেখা, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার জন্য দায়ী কে? হিন্দু, না মুসলমান? মুসলমানদিগকে উপযুক্ত পুস্তক প্রণয়ন করিতে কে নিষেধ করিয়াছিল?

যে সকল হিন্দু বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী—মুসলমানদিগের প্রতিবেশী। প্রতিবেশী ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর নিকট যদি আমার সঞ্চিত অর্থের কতক পরিমাণ চলিয়া যায়, তাহাতে আমার ক্ষতি

(২৩) কেহ কেহ বলেন, প্রাইমারী বিদ্যালয়ে মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যা শতকরা প্রায় ষাট জন।

কি? সে অর্থ ত আবার ঘুরিয়া আমার নিকট আসিতেও পারে? কিন্তু বাঙ্গালার বাহিরে 'আঞ্জুমন-ই-হেমায়েৎ ইস্‌লামের' কর্ত্তৃপক্ষের, অথবা অপর কাহারও হস্তগত হইলে, আমার, এবং আমার দেশের ও সমাজের কি লাভ হইল? তাহা ছাড়া বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যালয়-সমূহের পাঠ্যপুস্তক লিখিতেও আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রমেই যে ইহাদের সংখ্যা বাড়িবে, সে সম্বন্ধেও কোনও সন্দেহ নাই। তখন ঘরের পয়সা ঘরেই থাকিবে। বাঙ্গালী মুসলমানদিগের যে পরিমাণ অর্থ এখন মৌলভী আব্দুল করিম সাহেব বি. এ. ও মুন্সী মোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ সাহেব প্রভৃতির নিকট যাইতেছে, সে পরিমাণ অর্থ লাহোরের মুসলমানদিগের হস্তে দিব কেন?

এ সম্বন্ধে বলিবার ও লিখিবার এখনও অনেক বিষয় রহিয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাওয়ায়, ইহার উপসংহার করিতেছি। যদি আবশ্যক হয়, সময় ও সুযোগানুসারে সকল কথা বিস্তারিত ভাবে বলিব। বাঙ্গালার বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানকে এই ভাবে যাঁহারা বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। কনিষ্ঠ মুসলমান জ্যেষ্ঠের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হউক, এবং বাঙ্গালা দেশে শান্তি বিরাজ করুক।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী।

রত্ন-প্রসঙ্গ।

বঙ্গীয় ১৩২১ সালের ৩০শে কার্ত্তিক বঙ্গের গৌরব মহামহোপাধ্যায় ৺ রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় কাশীলাভ করেন। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর পূর্ণ হইল। এই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠের বিয়োগে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, কত দিনে তাহার পূরণ হইবে, জানি না। একমাত্র নব্যন্যায়ের জন্য বঙ্গদেশের প্রাধান্য। মিথিলার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা অস্তমিত হইবার পর বাঙ্গালীরাই নৈয়ায়িকী প্রতিভার পূর্ণাধিকারী হইয়া সর্ব্বদেশের বিদ্বন্মণ্ডলীর উপর আধিপত্য করিয়া আসিতেছিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালীর এই পাণ্ডিত্য-গৌরব তিরোহিত হইয়াছে।

ষড়্‌দর্শনের মধ্যে ন্যায়-বৈশেষিক, চিন্তার শাস্ত্র। এই শাস্ত্রের সূক্ষ্মানুশীলনের প্রভাবে স্বীয় বুদ্ধি-প্রতিভার পরিচয় দিবার অবসর লাভ করা যায়

চিন্তাশীল দার্শনিকেরা ন্যায়-বৈশেষিকের অবলম্বনে নূতন নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়া বিদ্বৎসমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। দর্শনমাত্রই যুক্তিশাস্ত্র। দার্শনিক ক্ষেত্রে অযৌক্তিক কোনও সিদ্ধান্ত স্বীকার্য্য হয় না। যে পক্ষের যুক্তির সমীচীনতা থাকে, সেই পক্ষই বলবৎ হয়। গৌতম, কণাদ, কপিল প্রভৃতি দর্শনপ্রণেতা ঋষিবৃন্দ, যোগর্দ্ধির প্রভাবে সর্ব্বজ্ঞ হইলেও, স্ব স্ব লৌকিক মনীষার অনুসারেই সূত্রাত্মক দার্শনিক সন্দর্ভের রচনা করিয়াছেন,—এ ক্ষেত্রে তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞতার প্রভাব নিয়োজিত করেন নাই। দার্শনিক সন্দর্ভে ঋষিদের সর্ব্বজ্ঞতা অনুস্যূত থাকিলে পরস্পর মতভেদ হইত না। প্রত্যেক দর্শনেই স্বীয় সিদ্ধান্তের অনুকূল যুক্তিতর্ক প্রদর্শিত হইয়াছে। এই যুক্তিতর্কের আধিক্য ও বিশুদ্ধতায় ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রই "বর্ব্বর্ত্তি সর্ব্বোপরি।"

দার্শনিক সন্দর্ভ, "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় আজ্ঞাশাস্ত্র নহে বলিয়াই প্রতিভার অবতার রঘুনাথ শিরোমণি আর্ষমত-বিশ্বাসী আস্তিক হইয়াও মহর্ষি কণাদের ব্যবস্থাপিত 'বিশেষ' পদার্থের খণ্ডনে অণুমাত্র ভীত হন নাই। ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রের সূক্ষ্মানুশীলনের ফলেই এইরূপ খণ্ডন-মণ্ডনের শক্তি লাভ করা যায়। নব্যন্যায়ের অন্তর্গত অনুমান-খণ্ডে যে সূক্ষ্ম বিচার-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার আলোচনা করিলে প্রকৃত প্রতিভাশালী পণ্ডিত অনেক নূতন রহস্যের আবিষ্কার করিতে পারেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম হইতে আরম্ভ করিয়া রাখালদাস ন্যায়রত্ন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী বিদ্বন্মণ্ডলী বুদ্ধি-প্রতিভার অসাধারণ্য প্রদর্শন করিয়া 'নৈয়ায়িক' আখ্যার সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। এই বুদ্ধি-প্রতিভার অসাধারণ্যের জন্যই তার্কিক-সম্প্রদায় নাস্তিককুলের মতবাদের নিরাস করিতে পারিয়াছিলেন। নাস্তিকেরা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না, সুতরাং উপনিষদাদিকে প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করিয়া নাস্তিকের সহিত বিচার করা চলে না। যুক্তিতর্কে সমীচীন অভিজ্ঞতা থাকিলেই নাস্তিকের আক্রমণ হইতে আমাদের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করা যায়। ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্র, ঈদৃশ যুক্তিতর্ক-উদ্ভাবনের পথ দেখাইয়া দিয়া মানব-সমাজের পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রের সূক্ষ্ম আলোচনায় বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়, ও বিবিধ উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ হয় বলিয়া, ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ন্যায়বিদ্যার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন-কালে বলিয়াছেন,—

"প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা॥"

ন্যায়রত্ন মহাশয় পর্য্যন্ত নৈয়ায়িকমণ্ডলী যেরূপ নিপুণ ভাবে ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছেন, সেই অনুশীলনের ফলে সত্যই তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত করিবার শক্তিশালী হইয়াছিলেন,—নূতন নূতন তথ্যের উদ্ভাবন করিয়া লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে ভাবে ন্যায়শাস্ত্রের পঠন-পাঠনার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতে আর সে সূক্ষ্ম অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায় না। নূতন উদ্ভাবন ত দূরের কথা, দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ নৈয়ায়িক ন্যায়শাস্ত্রের সকল গ্রন্থের সুসঙ্গতরূপে অধ্যাপনা করিতে পারেন না। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাত্র-সম্প্রদায় অনেক বিদ্বৎসভায় ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থসংক্রান্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নবোদ্ভাবিত পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া দেখিয়াছেন, কোনও সদুত্তর হয় নাই। নব্যন্যায়ের অন্তর্গত "ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব" গ্রন্থে রঘুনাথ শিরোমণির ও "সৎপ্রতিপক্ষ" গ্রন্থে গদাধর ভট্টাচার্য্যের ভ্রান্তি দেখাইয়া "দীধিতিকৃন্ন্যূনতাবাদ" ও "গদাধরন্যূনতাবাদ" নামে ন্যায়রত্ন মহাশয় যে সন্দর্ভদ্বয় প্রকাশ করিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত কোনও নৈয়ায়িকই তাহার উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

ন্যায়রত্ন মহাশয় যে কেবল খণ্ডনেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাহা নহে; মণ্ডনেও তাঁহার লোকোত্তর পাণ্ডিত্য ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ ন্যায়শাস্ত্রে স্বীকৃত যে সকল পদার্থের খণ্ডন করিয়াছেন, "বিবিধবিচার" গ্রন্থে ন্যায়রত্ন মহাশয় নানা যুক্তি দেখাইয়া সেই সকল পদার্থের স্থাপন করিয়াছেন। এই গ্রন্থেই তিনি রঘুনাথ শিরোমণির খণ্ডিত 'বিশেষ' পদার্থ মানিবার অভিনব যুক্তি দেখাইয়াছেন। দার্শনিক ক্ষেত্রে এ প্রতিভা আর কি দেখিতে পাইব?

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দার্শনিক প্রতিভার আর অধিক আলোচনা করিব না,—ভারতের সর্ব্বত্রই তাঁহার তার্কিকতার প্রভূত কীর্ত্তি সমুজ্জ্বলভাবে বিরাজ করিতেছে। এই প্রবন্ধে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ঈশ্বরনির্ভরতার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রত্যহ পূজান্তে ও সায়ংসন্ধ্যার অবসানে মহিমময় পরমেশ্বরের নানা নাম উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেন। গদ্গদ স্বরে এই নামাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারায় তাঁহার পুলকোচ্ছ্বাসিত বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইত। তিনি যেন ভাবাবিষ্টের ন্যায় হইয়া পড়িতেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের তাৎকালিক অবস্থা দেখিলে নাস্তিকের হৃদয়েও ভক্তিরসের সঞ্চার

হইত। তিনি যখন চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া ভক্তিভরে স্তোত্র পাঠ করিতেন, তখন উপস্থিত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর হৃদয়-তন্ত্রী এক অপূর্ব্ব ভাবে আহত হইয়া উঠিত। অতি আবশ্যক কার্য্য থাকিলেও সে সময়ে তাঁহাকে ডাকিতে কাহারও সাহস হইত না। "সাহিত্য"-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিয়াছেন,—"এক দিন প্রাতঃকালে আমি কাশীতে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে যাই। তাঁহার বাড়ী গিয়া শুনিলাম, তিনি উপরে পূজা করিতে বসিয়াছেন। আমি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পূজাস্থানে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহার দৌহিত্র আমাকে সেখানে লইয়া গেল। দেখিলাম, সেই কান্তিমান্ মহাপুরুষ ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে সাশ্রুনেত্রে 'শিব' 'শিব' করিতেছেন। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভক্তের মুখোচ্চারিত সেই মধুর নাম শ্রবণ করিলাম। তাঁহার সহিত কথা কহিতে সাহস হইল না,—দূর হইতে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।"

ন্যায়রত্ন মহাশয়,আন্তরিক দৃঢ় ভক্তি ও একাগ্রতা সহকারে ভগবানের অর্চ্চনা, স্তোত্রপাঠ ও নামোচ্চারণ করিতেন, তাই তিনি সাহস করিয়া লিখিতে পারিয়াছেন,—

"উচ্চারয়াম্যনুদিনং শিবশঙ্করেতি,
গৌরীশ্বরেতি ভবভীতিহরং হরেতি।
অর্চ্চামি নৌমি চ শিবং প্রণমামি নিত্যং
ভীতির্মমাস্তি শমনায় মনাগপীতি॥"

"আমি প্রতিদিন 'শিব' 'শঙ্কর' প্রভৃতি ভগবানের ভবভীতিহারী নাম সকল উচ্চারণ করি, ভক্তিভরে তাঁহার পূজা, তাঁহার স্তোত্রপাঠ এবং তাঁহার চরণোদ্দেশ্যে প্রণিপাত করি, শমনকে আমার ভয় কি?"

ঈশ্বরের নিকটে স্বার্থ-প্রত্যাশায়—স্বর্গাপবর্গের কামনায় ন্যায়রত্ন মহাশয় যে ভগবদারাধনা করিতেন, তাহা নহে;—ভগবানের প্রতি তাঁহার অহেতুকী ভক্তি ছিল। এই অহেতুকী ভক্তি বা নিষ্কাম প্রেমের প্রভাবে আত্মহারা হইয়া তিনি পরমেশ্বরের মূর্ত্তি সকলের ধ্যান করিতেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন,—

"জীবাঃ সন্তু ন সন্তু বা স্থিরতরা জন্মান্তরাদীনি বা
ধর্ম্মাঃ সন্তু ন সন্তু বা সুখকরং স্থানান্তরং মাস্তু বা।
আজীবং তব মূর্ত্তয়স্তদপি মে প্রীত্যাস্পদং হে শিব
প্রেম্ণঃ প্রীতিরপেক্ষতে ন হি ফলং প্রীতিঃ সুতাদিষ্বিব॥"

"যদি দেহাত্মবাদী চার্ব্বাকের "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাবর্ত্তনং কুতঃ" ইত্যাদি

ব্যবস্থানুসারে শ্মশানে চিতানির্ব্বাপণের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়,—জন্মান্তরকে যদি কবির কল্পনাপ্রসূত বলিতে হয়, বল; পুণ্য বা সেই পুণ্যের প্রভাবে স্বর্গভোগ যদি অলীক হয়, হউক; হে সত্য, হে সুন্দর, হে শিব, তবু আমি তোমাকে ভালবাসি—তবু তোমার মূর্ত্তি সকল আজীবন আমার নিকট অতিমাত্র প্রীতিপ্রদ। তোমার পূজা করিয়া আমার পুণ্যসঞ্চয় হইবে, সেই পুঞ্জীভূত পুণ্যের ফলে জন্মান্তরে আমার অবিনাশী আত্মা অবিচ্ছিন্ন স্বর্গভোগ করিবে,—এ প্রত্যাশায় আমি তোমাকে ভালবাসি না। ভালবাসা কখনও ফলের মুখাপেক্ষা করে না। পশু-পক্ষীরা তাহাদের শিশু সন্তানগুলিকে কোন্ প্রত্যাশায় নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়াও বাৎসল্যভরে লালন পালন করে?"

ভক্ত সাধক ন্যায়রত্ন মহাশয়, ভগবানের ধ্যান করিয়া, এবং তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া যে অনাবিল আনন্দ লাভ করেন, তাহা তিনি চাটুকারের মতন ভগবান্‌কে জানাইতে চাহিতেন না। তিনি লিখিয়াছেন,—

"স্থাণো বিদ্ধি ন বা ভবান্বিতরপৈস্ত্বন্নামসঙ্কীর্ত্তনৈ-
স্ত্বদ্‌ধ্যানৈশ্চ মুদং সমেত্য সময়ং সংযাপয়ামো বয়ম্।
শ্রীখণ্ডাচলচারুচন্দনতরোর্ম্মন্দানিলৈঃ সৌরভং
জিঘ্রন্ মোদভরং বিভর্ত্তি কিমিদং বিদ্যাদয়ং পাদপঃ॥"

"হে শিব, তুমি সেই দূর কৈলাস-পর্ব্বতে স্থাণুরূপে বিরাজ করিতেছ, সুতরাং তোমার ধ্যান ও নামোচ্চারণে পরম আনন্দ লাভ করিয়া আমরা যে সময় অতিবাহিত করি, তাহা তুমি জান, আর না-ই জান। এই আনন্দের কথা তোমার গোচর করিবার জন্য আমাদের ব্যস্ততা নাই। মন্দানিলের সহায়তায় মলয়মহীধরজাত চন্দনতরুর সুরভি আঘ্রাণ করিয়া লোকে যে প্রীতি লাভ করে, তাহা কি সেই চন্দনবৃক্ষকে জানাইবার জন্য কেহ ব্যস্ত হয়?"

ন্যায়রত্ন মহাশয় সাকার ঈশ্বরের উপাসনারই পক্ষপাতী ছিলেন। সাকার-উপাসনাই যে মুক্তির সাক্ষাৎ উপযোগিনী, ইহা তিনি স্বরচিত "অদ্বৈতবাদখণ্ডন" গ্রন্থের উপসংহারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাই ভক্ত কবি ন্যায়রত্ন মহাশয় শ্লোকাকারে ভগবান্‌কে বলিয়াছেন,—

"দ্রষ্টুং ত্বাং জগদিষ্টদেব সবিধে দাসাশ্চিরাশান্বিতা
দৃষ্ট্বৈব ত্বজমূর্ম্মনশ্চ নয়নং ধন্যানি মন্যামহে।
মূর্ত্তিং দারুময়ীং তবানুকরণীং শৈলীঞ্চ বা মৃন্ময়ীং
পিত্রোশ্চিত্রপটং নিরীক্ষ্য ন হি কিং চিত্তং প্রমোদং ভজেৎ॥"

হে জগদিষ্টদেব, এ দাসেরা হৃদয়ের নিভৃত কোণে চিরদিন এই আশা পোষণ করিয়া আসিয়াছে যে, তোমার সেই কেয়ূরশোভিত, কনককুণ্ডল-মণ্ডিত, কিরীটভূষিত, বা চারুচন্দ্রাবতংস, পরশুমৃগবরাভয়হস্ত, রজতগিরিনিভ, অথবা সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়, তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ, দশপ্রহরণসনাথ মূর্ত্তি সম্মুখে বিরাজমান দেখিয়া কৃতকৃত্য হইবে। কিন্তু আমাদের এ জন্মে সে সৌভাগ্য হইল না। তথাপি তোমার সেই সকল মূর্ত্তির অনুকরণে গঠিত মৃন্ময়ী, শিলাময়ী, বা দারুময়ী প্রতিমা দর্শন করিয়া নয়ন মনকে কৃতার্থ জ্ঞান করি,—জন্ম সফল বিবেচনা করি। যে কখনও নিজের পিতামাতাকে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই, সে কি তাঁহাদের চিত্রপট নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দিত হয় না ?"

মহাপুরুষ ন্যায়রত্ন মহাশয় ভগবানে এত দৃঢ় আসক্ত ছিলেন যে, শোক দুঃখ কিছুই তাঁহাকে ভগবদ্‌ভক্তি হইতে বিচ্যুত করিতে পারিত না। ভগবদ্‌-বিশ্বাসের প্রভাবে তিনি দারুণ দুঃখের সময়েও "নিবাতনিষ্কম্প ইব প্রদীপঃ" স্থির থাকিতেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার একমাত্র উপযুক্ত পুত্র, পণ্ডিত ৺হরকুমার শাস্ত্রীর অন্তিমসময়ে গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া ঠাকুরঘরে পূজা করিতে গিয়াছিলেন। পাছে পুত্রের মৃত্যু হইলে অশৌচনিবন্ধন ঠাকুরপূজার কোনও ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি তিনি পূজাকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। এত ধৈর্য্য—এত বিশ্বাস বর্ত্তমান যুগে দেখিতে পাওয়া যায় কি ? এই পুত্রবিয়োগ-রূপ দারুণ অনিষ্টপাতেও ভগবানের প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র বীতশ্রদ্ধ হন নাই। এই দুরন্ত শোকে ভগবানের প্রতি তাঁহার একটু অভিমানমাত্র হইয়াছিল। পুত্রবিয়োগের পর ন্যায়রত্ন মহাশয় নূতন ক্রীত বাটীতে 'কুমারহর' নামক শিবস্থাপন করিয়া প্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ পশ্চাল্লিখিত শ্লোকে স্বীয় মানসিক অবস্থার পরিচয় নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।—

"লব্ধং হরকুমারাখ্যরত্নং শ্রীশিবসেবয়া।
ত্যক্ষ্যামি ন কদা দাস্যং তস্য দত্তাপহারিণঃ॥"

"শিবের আরাধনা করিয়া 'হরকুমার' নামক পুত্ররত্ন পাইয়াছিলাম, তিনি তাহা হরণ করিয়া লইয়া এখন দত্তাপহারী হইয়াছেন। আমি কিন্তু কখনও তাঁহার দাসত্ব পরিত্যাগ করিব না।"

দারুণ শোকাগ্নি ভগবচ্চিন্তার পরিপন্থিতা করে বলিয়া পুত্রবিয়োগের পর ন্যায়রত্ন মহাশয় অতি কাতরভাবে কাশীপতি শঙ্করের চরণোপান্তে নিবেদন করিয়াছিলেন,—

"অন্যৈঃ স্বীয়বিভুত্বযাচনভিয়া তৎসাধকানাং তপো-
ব্যাঘাতায় বিভীষিকা তু বিবিধা নির্ম্মীয়তাং নন্দ্যতাম্।
কার্পণ্যং শিবতার্পণেঽপি ন চ তে কীটেঽপি কাশীপতে
ত্বচ্চিন্তাপরিপন্থিশোকদহনৈর্দাসঃ কথং দহ্যতে ॥"

"সাধক উগ্র তপস্যা করিয়া পাছে স্বর্গরাজ্যাদি স্ব স্ব ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করে, এই ভয়ে অন্য দেবতারা সেই তপোব্যাঘাতের নিমিত্ত বিবিধ বিভীষিকার নির্ম্মাণ করিয়া নিজেরা নিরাপদ হইতে পারেন। কিন্তু হে কাশীশ্বর, সামান্য কীটকেও 'শিবত্ব' অর্পণ করিতে তোমার ত কার্পণ্য নাই,—তবে কেন এ দাসকে প্রবল শোকাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তোমার ধ্যানরূপ তপস্যা হইতে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছ?"

দৃঢ়ভক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয় ভীষণ শোক-বজ্রে আহত হইয়াও ভগবান্‌কে বলিয়াছেন,—

"পাতর্নাথ পিতঃ পতেদ্ যদি শতঃ শোকাশনেঃ সন্ততং
দগ্ধং স্যাদ্ যদি মানসঞ্চ সবলৈর্দারিদ্র্যদাবানলৈঃ।
ত্বচ্চিন্তাং ন জহাম্যহং তদপি ভোঃ শম্ভো কৃপাম্ভোনিধে-
প্রেয়োঽপায়জশোকবজ্রপতনং দাসে কিমর্থং কৃতম্ ॥"

"হে নাথ, যদি সতত শত শত শোকাশনি দাসের উপর নিপাতিত কর, যদি প্রবল দারিদ্র্যদাবানলে আমার চিত্ত দগ্ধ করিয়া ফেল, তথাপি আমি তোমার চিন্তা পরিত্যাগ করিব না। বল—বল দয়াময়, তবে কেন এ দাসের উপর প্রিয়বিয়োগরূপ শোকবজ্র নিক্ষেপ করিলে?"

একান্ত ভগবৎপরায়ণ ন্যায়রত্ন মহাশয় পুত্রবিয়োগরূপ অনিষ্টপাতেও ভগবানের দয়াময়তারই পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"পাতিত্যে সতি পার্ব্বতীপ্রিয় পরাং প্রাপ্তানপি ত্বৎপুরীং
স্পৃষ্ট্বা তারকমন্ত্রমন্তসময়ে কর্ণে প্রভো নার্পয়েঃ।
তস্মাৎ কিং বিদধাসি মদ্গতমহাপাপস্য নাশেচ্ছয়া
ভোগং যোগবিযুক্তদাসহৃদয়ে প্রেয়োবিয়োগোদ্ভবম্ ॥"

"হে পার্ব্বতীপ্রিয়, তুমি যে আমাকে শোকগ্রস্ত করিয়াছ, এতক্ষণে তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম। কাশীতে লোকের মৃত্যু-সময়ে তুমি তাহার কর্ণে তারক-মন্ত্র উপদেশ কর। আমি মহাপাপী,—পাপ থাকিলে তুমি আমাকে স্পর্শ করিবে না, তাই কি আমার পাপক্ষয়ের জন্য পুত্রবিয়োগ-দুঃখভোগ

করাইতেছ ? আমার ত যোগসমৃদ্ধি নাই যে, তাহার প্রভাবে পাপের দৃঢ়বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিব ?”

ঈশ্বরনির্ভরশীল ভক্ত অমঙ্গলের মধ্যেও ভগবানের মঙ্গলময়তা লক্ষ্য করিলেন।

ভক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয় ভগবানের সকল মূর্ত্তিকেই সমানভাবে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি “শিবে চ পরমেশানে বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি। অভেদবুদ্ধ্যা বর্ত্তেত ভেদকৃন্নরকং ব্রজেৎ।”—ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের কখনও অমর্য্যাদা করিতেন না। একই ব্রহ্ম শক্তি, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি নানারূপে জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়াদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। ব্রহ্মের এক মূর্ত্তিকে বিদ্বেষ করিয়া অন্য মূর্ত্তির আরাধনা করিলে শাস্ত্র-মতে ঘোর অপরাধ হয়। এইরূপ কার্য্য করিলে যে মূর্ত্তির উপাসনা করা হয়, তিনিও কদাপি প্রীত হইতে পারেন না। তাই ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছেন,—

“বিষ্ণোরর্চ্চনমাচরত্যপি চিরং বিদ্বিষ্য বিশ্বেশ্বরং
যো দ্বিষ্ট্বাপি চ দুষ্টচেতনদুরাচারো জগন্মাতরম্।
শস্ত্রাঘাতশতং বিধায় দহনৈর্দগ্ধ্বা পুনশ্চন্দনৈ-
রালেপাদিকতুল্যমস্তু কিমু তন্নাবৈধমারাধনম্॥”

“শিবেরে বিদ্বেষ ক’রে,—দ্বেষ ক’রে কালিকায়,
অবিবেকী যে পামর বিষ্ণু আরাধিতে চায়,
নরাধম সে মানব, অতিশয় দুরাচার,
আরাধনা বৈধ নয় শাস্ত্রমতে কভু তা’র।
হরি হর শক্তি কিবা কিছুই বিভিন্ন নয়,
এক সে ব্রহ্মের মূর্ত্তি, সব(ই) বপুঃ ব্রহ্মময়।
শত শত অস্ত্র হেনে, দহনে জ্বালায়ে কায়,
চন্দনের আলেপন যতনে করিলে তায়,
যেই প্রীতি হ’তে পারে, সেই প্রীতি ভগবান্,
শক্তি শিবে-দ্বেষ করি’ বিষ্ণু আরাধিলে পান।”

—৺হরকুমার শাস্ত্রি-কৃত অনুবাদ।

পূজনীয়চরিত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ভগবদাসক্তির পরিচয় দিবার উদ্দেশে যে কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোক আমরা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার যে অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল, তাহা সহজেই অনুভূত হয়। ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পর ন্যায়রত্ন মহাশয়ই একাধারে এইরূপ কবিত্ব ও তার্কিকত্ব লাভ করিয়া কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কবিত্ব, তার্কিকত্ব ও ভগবন্নিষ্ঠত্ব প্রভৃতি গুণপরম্পরা অনুভব করিলে রঘুনাথ শিরোমণির সেই গর্ব্বোক্তিটী মনে পড়ে,—

"কাব্যেঽপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে
তর্কেঽপি কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে।
তন্ত্রেঽপি যন্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নান্যে
কৃষ্ণেঽপি সংযতধিয়ো বয়মেব নান্যে॥"

বাঙ্গালীর সৌভাগ্যবশতঃ এমন সর্ব্বতোবিসারিপ্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষ বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মৃত্যুতে ভারতীয় দার্শনিক ক্ষেত্রের পাণ্ডিত্য-গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল। "বসুমতী" সত্যই (১১ই পৌষ, ১৩২১) লিখিয়াছিলেন,—

"পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মৃত্যুতে বাঙ্গালী যে পণ্ডিতরত্ন হারাইয়াছে,—তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে। বাঙ্গালায় এরূপ পণ্ডিত আর নাই,—আর হইবার সম্ভাবনাও নাই। প্রতিভায় তিনি প্রাচীন কোনও মনস্বী অপেক্ষা হীন ছিলেন না। বারাণসীস্থ সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিকট নতমস্তক ছিলেন। সে শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি বাঙ্গালী আর দেখিতে পাইবে না। এই পল্লবগ্রাহিতার দিনে বাঙ্গালীর—কেবল বাঙ্গালীর কেন, ভারতবাসীর এই পাণ্ডিত্যের দৈন্য ঘুচিবার আশা আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

মহামহোপাধ্যায় কবিসম্রাট্ পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় এই মনীষি-শ্রেষ্ঠের বিয়োগে যে শোক-শ্লোকাবলী লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নির্ব্বাণ-মুক্তির কথা অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।* সেই শ্লোক তিনটী উদ্ধৃত হইল,—

"সুরপুরবরবধ্বঃ পুষ্পমালা দধত্যো বিমলধবলচঞ্চচ্চামরাণাম্বুজানি।
নিধিশতকৃতদীপান্ হেমপাত্রে দধানা দধিমধুঘৃতদূর্ব্বাধান্যলাজাঞ্জলীংশ্চ॥
দিবমিব নবলোকং নেতুকামা ভবন্তং তড়িদুড়ুজড়িতৈস্তৈর্নাকলোকাদ্ বিমানৈঃ।
ভবভুবমবতেরুর্জহ্নুকন্যাম্বুসিক্তাং বৃহদুপলঘটাভির্নির্ম্মিতে গাঙ্গঘট্টে॥
অভবদচিরপূর্ব্বং দেবদেহে লয়স্তে ন খলু সুরযুবত্যো লোকিতুং ত্বাং সমর্থাঃ।
ন চ বুধবর লজ্জা ত্যক্ত তা দেববধ্বোঽশ্রুমলিনমুখপদ্মাঃ স্বস্বসদ্মানি জগ্মুঃ॥"

শ্লোকগুলির ভাবার্থ এই যে, হে বুধরত্ন, সুরবধূরা সুরভিসুন্দর পুষ্পমালা, শ্বেতচামর, পদ্ম, দধি, মধু, ঘৃত, দূর্ব্বা ও রত্নদীপ প্রমুখ মাঙ্গলিক দ্রব্যপূর্ণ

স্বর্ণপাত্র হস্তে করিয়া অমরাবতীতে তোমাকে সাদরে লইয়া যাইবার জন্য বারাণসীর গঙ্গাতীরে বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রখচিত ব্যোমযান হইতে অবতরণ করিলেন। কিন্তু অচিরকালপূর্ব্বে দেবদেবে তোমার লয় হইয়া গিয়াছে, তাই দেববালারা তোমাকে দেখিতেও পাইলেন না! সেই সুরসীমন্তিনীগণ তোমাকে না পাইয়া অশ্রুমলিনমুখে হতাশহৃদয়ে স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন।

শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।

নাস্তিকের বৃন্দাবন।

১

পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি জ্যেঠামহাশয়ের স্নেহের অভাব ছিল, এমন কথা বলিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইব। আমার শৈশবে, আমার পিতার মৃত্যুর পর ধনবান মাতামহ তাঁহার কন্যাদৌহিত্রকে তাঁহার গৃহে রাখিবার প্রস্তাব করিলে জ্যেঠা-মহাশয় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, "আপনি মনে করিতেছেন, আমার বাড়ীতে আপনার কন্যাদৌহিত্রের অযত্ন হইবে; যদি কখন তাহা হয় আপনি আসিয়া আমাকে জুতা মারিবেন। আমার ভাই গিয়াছে, কিন্তু কর্ত্তব্য ত যায় নাই। আমার মা আর ভাই বাড়ীর 'কর্ত্তা' ছিলেন, এখন মা আর বৌমা 'কর্ত্তা' থাকিবেন।" বাস্তবিক তদবধি কোনও দিন মা বা আমি কখন কোনরূপ অযত্ন বা অনাদর অনুভব করিতে পারি নাই। জ্যেঠামহাশয় বিহারের একটা বড় জিলায় উকীল সরকারের কাজ করিয়া অর্থার্জ্জন করিতেন; জ্যেঠাইমা তাঁহার কাছে থাকিতেন। কলিকাতার বাড়ীতে থাকিতেন—পিতামহী, মা, আমি, আর জ্যেঠা মহাশয়ের দশ বৎসরের অধিক বয়স্ক ছেলেরা—ইত্যাদি। আমার আদরের মাত্রা যেন অধিক ছিল। জ্যেঠামহাশয় স্নেহশীল ছিলেন; কিন্তু তিনি বিষয়ী লোক ছিলেন—বর্ত্তমানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভবিষ্যতের ভাবনায় অন্ধ হইয়া তাহা উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। তাই তাঁহার ছোট ছেলেটিও অগ্রজদিগের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অনাবশ্যক বিবেচনা না করা পর্য্যন্ত তাঁহার আশা ও আকাঙ্খা ছিল—ছেলেদের এক জনকে আপনার ব্যবসার কেন্দ্রে বসাইয়া তাহার পশার জমাইয়া দিয়া যাইবেন। সেই জন্য আমি উকীল হইয়া তথায় যাইবার ইচ্ছা

প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "বলিস্ কি রে? এম. এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকৃত করিয়া, উকীল হইয়া, তুই বিহারের জঙ্গলে যাইবি! তোর কিসের অভাব? তুই হাইকোর্টে ওকালতী কর—কালে বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবি।" আমাকে হাইকোর্টের জজীয়তীর দুরাশা-ঝুমঝুমি দিয়া ভুলাইয়া তিনি নিরস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু দশ বৎসর পরে যখন তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রও অগ্রজদিগের অনুসৃত পথ অবলম্বন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহ-দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়াই ফিরিয়া গেল এবং আমারও জজীয়তীর সন্নিহিত হইবার কোনও সম্ভাবনাই দৃষ্টিগোচর হইল না, তখন জ্যেঠামহাশয়ই আমাকে বলিলেন, "দেখ, বংশের মধ্যে আর কেহ ত 'মানুষ' হইল না। বিদেশে আমি যে পশার জমাইয়াছি তাহাতে তথায় তোর কিছু না হইলেও মাসে হাজার বার শত টাকা কেহ মারিবে না—তুই সেখানেই চল।" একটা পূজার ছুটীতে জ্যেঠামহাশয় এই কথা বলিলেন—ছুটীর পর আমি তাঁহার সঙ্গে তাঁহার কর্ম্মস্থানে গেলাম। আমাকে দুই বৎসর কাজে বসাইবার পরই তাঁহার মৃত্যু হয়; কিন্তু তাহার মধ্যেই তিনি বুঝিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার আশা ও আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইবে না।

তথায় আসিয়া আমি আমার এক জন পুরাতন পরিচিত ব্যক্তিকে পাইলাম—সুধীরচন্দ্র তথায় ডাক্তারী করিত। কিন্তু তখন তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কোনও সুযোগ হইল না। কারণ, তখনও বৃদ্ধ কালী ডাক্তারই চল্লিশ বৎসরের বাঁধা ব্যবস্থায়—বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা পারিশ্রমিকের চুক্তিতে প্রতিদিন প্রাতে পেণ্ট্‌লেন কোট পরিয়া মাথায় ক্যাপ চড়াইয়া একবার করিয়া আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। ডাক্তার বাবু "নেটিব ডাক্তার" হইলেও তাঁহার অভিজ্ঞতা বিজ্ঞতার কারণ হইয়াছিল—তাঁহার "হাত-যশও" ছিল। আবার দেশের জলবায়ুর গুণে বাড়ীতে পীড়ারও বড় গতায়াত ছিল না। সুতরাং কালী বাবুকে দিয়াই আমাদের কাজ বেশ চলিয়া যাইত। কিন্তু জ্যেঠামহাশয়ের শেষ অসুখের সময় তাঁহার ডাক্তার যখন তাঁহার পূর্ব্বেই পরপার যাত্রা করিলেন, তখন আমি সুধীরকেই ডাকিয়া আনিলাম। সে যাত্রায় জ্যেঠামহাশয় রক্ষা পাইলেন না বটে, কিন্তু সুধীর যে সুচিকিৎসক সে বিষয়ে আমার আর সন্দেহ রহিল না। সেই দিন হইতে সুধীর আমার বাড়ীর চিকিৎসক হইল এবং তাহার সঙ্গে আমার অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠতার অবসরও ঘটিল।

২

সুধীরের সঙ্গে আমার "অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠতা"র অবসর ঘটিল, বলিয়াছি।

এ কথা বলিবার একটু বিশেষ কারণ আছে। হাঁস যেমন জলে বিচরণ করিলেও তাহার দেহে জল "বসে" না, সুধীরের প্রকৃতিতে বা ব্যবহারেও তেমনই একটা কি ছিল, যাহাতে তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অন্তরঙ্গ আত্মীয়তায় পরিণত হইত না। সে যেন কেমন একটু স্বতন্ত্রই থাকিত। একটা বড় বাগানবাড়ীতে সে বাস করিত—বাড়ীতে সে একা। তাহার সখের অভাব ছিল না; ফুল, পাখী, হরিণ সবই ছিল, কিন্তু কোনটির প্রতিই তাহার আন্তরিক আকর্ষণের পরিচয় সপ্রকাশ হইত না। একটা গাছ শুকাইলে সে তাহার স্থানে আর একটা গাছ পুতিত, একটা পাখী মরিলে সে খাঁচায় আর একটাকে আনিত; কিন্তু কোনটির অভাব যে সে কখন অনুভব করিত, এমন বুঝা যাইত না। সে সুচিকিৎসক ছিল; কিন্তু রোগীর প্রতি তাহার মমতার কোনও পরিচয় কখন তাহার মুখভাবে বা ব্যবহারে সপ্রকাশ হইত না। সর্ব্বোপরি সে ঘোর নাস্তিক.। আমার বাড়ীতে সে-ই চিকিৎসা করিত; কিন্তু তাহার ব্যবহারে এমন একটা কঠোরতার পরিচয় ছিল যে, সেই জন্য তাহাকে কোনও দিন আত্মীয় ভাবে রোগসম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে শুনি নাই। তাহার এই ভাবটির জন্যই আমার স্ত্রীর তাহার প্রতি বিরক্তি ছিল। তিনি বলিতেন, যে চিকিৎসকের হৃদয় নাই. সে কখন ভাল চিকিৎসক হয় না। আমি বলিতাম, লোকটির যে হৃদয় নাই—এমন কোনও প্রমাণের অভাব; বরং আমার বোধ হয় উহার কঠোরতার আবরণের মধ্যে কোমল হৃদয় প্রচ্ছন্ন আছে। আমার স্ত্রী বলিতেন, সে কি রকম? আমি হাসিয়া বলিতাম, "ধর না যেমন পেস্তা বা বাদাম।" তিনি বলিতেন, "যদি ফলের কথাই বলিলে, তবে আমি বলি, তোমার বন্ধুটি বাঙ্গালার খেজুর; সবটাই শক্ত আঁটি, উপরে কেবল একটু শিষ্টার ও শিষ্টাচারের পাতলা শাঁস। তত্ত্বতাবাসে দেখনাই ভাল, ঘর-ব্যবহারের কিছু নহে।" আমি বলিতাম, "তা' ঘরব্যবহারের ভাবনা ত তোমার আমার নাই; যেরূপ ভাব তাহাতে বোধ হয় কাহারও নাই।" গৃহিণী বলিতেন, "সেই ত কথা। যদি কাহারও সে ভাবনার কারণ না থাকে, তবেই ভাল; নহিলে যদি কাহারও জীবন দুর্ব্বহ করিয়া থাকেন তবেই ত সর্ব্বনাশ!" আমি ভাবিতাম, তাহাই কি? লোকটি ত একাই থাকে—সঙ্গে কেহ নাই; সত্যই কি বাঙ্গালীর ছেলে বিবাহ করে নাই; পরিবারেও আর কেহ নাই? কিন্তু কোনও দিন সুধীরকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ পাইতাম না। যে ঘনিষ্ঠতায় অকারণ কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার অধিকার লাভ করা যায়, সে

ঘনিষ্ঠতার অবকাশ সে কখনই কাহাকেও দিত না। আমিও মনে করিতাম, দূর হউক ছাই—আমার সে কথায় কাজ কি? মানুষের জীবনের রহস্য ভেদ করিবার প্রয়াস কেন করিব?

এমনই ভাবে দীর্ঘ দশ বৎসর কাটিয়া গেল—সুধীর আমার কাছে তেমনই রহস্যের আবরণে আপনাকে আবৃত করিয়া রাখিল। সে আমার কাছে আপনাকে যে রহস্যে আবৃত রাখিল, আপনার কাছে অবশ্যই তাহাতে আবৃত রাখিতে পারিল না। তাহার মনের চাঞ্চল্য তাহার ব্যবহারে আত্মপ্রকাশ না করিলেও—আগ্নেয়গিরির গলিত ধাতুধারা যেমন এক দিকে বাহির হইবার পথ না পাইলে আর এক দিকে বাহির হয়, তেমনই ভাবে তাহার দেহে আত্মপ্রকাশ করিল। যৌবনের শেষ হইতে না হইতেই জরার পূর্ণ অধিকার তাহার দেহে দেখা দিল; তাহার কেশ শ্বেত হইয়া গেল—তাহার শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

৩

সে বার পূজার ছুটীর পূর্ব্বেই মা 'নোটিশ' দিয়াছিলেন, তিনি আমার কর্ম্মস্থানে আসিবেন, এবং আমাকেই তাঁহাকে লইয়া তীর্থভ্রমণ করাইয়া আনিতে হইবে। সে প্রস্তাবে আমার গৃহিণীরও উৎসাহের অভাব ছিল না। কারণ, আমরা যতই কেন 'কালাপাহাড়' হই না, আমাদের অবিশ্বাসের প্রবাহ আমাদের অন্তঃপুরের প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বৈঠকখানাতে বা ড্রয়িংরুমেই ছড়াইয়া পড়ে—"পর্দ্দার" পশ্চাতে আমাদের গৃহ সত্য সত্যই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের দুর্ভেদ্য দুর্গ।

মাকে ও গৃহিণীকে লইয়া আমি তীর্থভ্রমণে বাহির হইলাম—আমার পক্ষে সে বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান। মা যে স্থানেই যাইতেন, সেই স্থানে 'ত্রিরাত্রি' বাস করিতেন, কাজেই যখন আমরা কতকগুলি তীর্থ ঘুরিয়া বৃন্দাবনে আসিলাম, তখন আমি ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। আমার অবস্থা দেখিয়া মাও বলিতেছিলেন, "তোর বড় কষ্ট হইতেছে; আর কাজ নাই, এইবার বাড়ী চল; 'জগবন্ধু' যদি ডাকেন, তবে রথের সময় শ্রীক্ষেত্রে যাইব—এখন আর নহে।" আমার গৃহিণী কিন্তু বলিতেছিলেন, "তা হইবে না; একবার যখন বাহির হইয়াছি, তখন সব সারিয়া যাইব; আবার কি শীঘ্র বাহির হওয়া হইবে? বিশেষ, কবে কাহার কি হয়, বলা যায় না। কষ্টই বা কি? মক্কেলের কাজে টাকার লোভে যদি হিল্লী দিল্লী যাওয়া যায়, তবে আর আমাদের জন্য ধর্ম্মের কাজে একটু কষ্ট সহ্য করা যায় না?" শুনিয়া মা হাসিয়া বলিতেন, "তা সে ঝগড়া

তোমরা মীমাংসা কর।” কাজেই আমাকে একটা রফা বন্দোবস্ত করিতে হইল—বৃন্দাবন হইতে সকলকে মথুরা, গোবর্দ্ধন, গোকুল ও শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড দেখাইয়া আনিতে হইবে। বৃন্দাবনে থাকিবারও সুবিধা ছিল। আমার মাতামহ-পরিবারের একটি “কুঞ্জ” ছিল। বাড়ীটি ভাল—যমুনার কূলেই অবস্থিত।

যে দিন আমরা বৃন্দাবনে পঁহুছিলাম, তাহার পরদিন প্রাতে গোবিন্দজীর ও গোপীনাথের মন্দির, সা’জীর ও লালা বাবুর মন্দির, সেবাকুঞ্জ বা নিকুঞ্জবন, এবং বংশীবট ঘুরিয়া আসিলাম; অপরাহ্নে বঙ্কবিহারীর মন্দির দেখিয়া মদনমোহনের মন্দিরে দেবদর্শনান্তে ফিরিবার সময় পথিপার্শ্বে একটি অপেক্ষাকৃত অপরিচিত মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। তথায় ঠাকুর দেখিয়া ফিরিবার সময় মন্দির-প্রাঙ্গণে একখানি শিলাফলকে ক্ষোদিত লিপিতে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল—

হুগলী, কাঞ্চনপুর-নিবাসী
ক্ষেত্রনাথাত্মজ শীতলাকান্ত রায়ের পুত্র
শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়ের সহধর্ম্মিণী
নীলাঞ্জনয়নার কল্যাণকামনায়।

কাঞ্চনপুর-নিবাসী শীতলাকান্ত রায়ের পুত্র সুধীরচন্দ্র! এ ত আমারই সতীর্থ সুধীরচন্দ্র। তবে সে বিবাহিত? তাহার পত্নী জীবিতা, না মৃতা? জীবিতা হইলে কোথায়? এইরূপ নানা চিন্তায় যখন আমি ব্যাকুল, তখন মা ও গৃহিণী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ভাবিতেছিস?” আমি পাথরখানা দেখাইয়া বলিলাম, “দেখিতেছি, এ পাথরে আমাদের ডাক্তার সুধীরের স্ত্রীর নাম ক্ষোদা!” মা বলিলেন, “সে কি রে?” আমি বলিলাম, “তাই ত দেখিতেছি। লোকটার জীবন যে রহস্যে আবৃত, বুঝি এইবার তাহা ভেদ করিতে পারিব।”

আমাদের ‘ব্রজবাসী’কে আমি লোকটির কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি মন্দিরের পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পুরোহিত বলিলেন, “দশ বার বৎসর পূর্ব্বে এই বৃন্দাবনে আসিয়া এক জন যুবক বাঙ্গালী এই মন্দিরপ্রাঙ্গণ মর্ম্মর প্রস্তরে আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর একবার বা একাধিক বার বৃন্দাবনে আসিয়া এই মন্দিরে পূজা দিয়া থাকেন।”

গৃহিণীর বিস্মিত দৃষ্টি আমার মুখে বদ্ধ হইয়াছিল। আমার বিস্ময় ক্রমেই

বর্দ্ধিত হইতেছিল। নাস্তিক সুধীর বৃন্দাবনে আসিয়া পূজা দেয়—যে কখনও স্ত্রীর অস্তিত্বের কথা কাহাকেও অনুমান করিতে দেয় নাই, সে-ই স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষার্থ বহুব্যয়ে মন্দিরপ্রাঙ্গণ মর্ম্মরাস্তৃত করিয়া দিয়াছে! এ কি রহস্য!

পুরোহিত বলিলেন, "আজ আমি সংবাদ পাইয়াছি, তিনি কাল বৃন্দাবনে আসিয়া কালই মন্দিরে পূজা দিবেন।"

পর দিন মথুরায় যাইয়া দেবদর্শনের পর সন্ধ্যাকালে বিশ্রামঘাটে আরতি দেখিব, স্থির করিয়াছিলাম। মা'কে বলিলাম, তাহা হইবে না; পর দিন আমি এই মন্দিরে আসিব, দেখিব—এ আমাদের সুধীর কি না। মা বলিলেন, "ভাল; আমি কাল আর সব মন্দির দেখিতে যাইব।"

গৃহিণী বলিলেন, তিনি কিন্তু আমার সঙ্গে এই মন্দিরেই আসিবেন।

রাত্রিকালে উৎকণ্ঠায় আমার ভাল ঘুম হইল না।

৪

পর দিন গৃহিণীকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরে যাইয়া দেখিলাম, তখনও সুধীর আইসে নাই। পুরোহিত বলিলেন, সে অনতিবিলম্বে আসিবে। প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে একটি তুলসীমঞ্চ—গৃহিণীকে তাহারই আড়ালে ছায়ায় বসাইয়া আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

অল্পক্ষণ পরেই সুধীর আসিল। সে নগ্নপদ—গাত্রে নামাবলী। সে আসিয়া সেই ক্ষোদিত প্রস্তরফলকের উপর উপবিষ্ট হইল। তখন তাহার দৃষ্টি আমার প্রতি পতিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি!"

আমি বলিলাম, "আমি মা'কে তীর্থ দর্শন করাইতে আনিয়াছি। কিন্তু তুমি—এখানে—এ বেশে—তুমি?"

"কেন; আমার কি এ স্থানে আসিতে নাই?"

"তুমি নাস্তিক—তোমার বিশ্বাসে ও তোমার ব্যবহারে সামঞ্জস্য কোথায়? তুমি এখানে কেন? তুমি কি বিবাহিত? তোমার স্ত্রী কোথায়?"

সুধীর কয় মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক হইয়া রহিল; তাহার পর বলিল, "শুনিবে? এ দগ্ধ জীবনের বেদনার বিবরণ শুনিবে?"

আমি কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সে যেন আপনাকেই সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—

"আমি নাস্তিক। যদি সত্য সত্যই ঈশ্বর থাকেন, তবে কি তাঁহার বিধান সত্বেও মানুষ আমার মত ভুল করিতে পারে? পারে না। তবে কি তিনি

মানুষের মর্ম্মের নিবেদনে বধির হইতে পারেন? পারেন না। ঈশ্বর নাই—ও কেবল মানুষ আপনাকে ভুলাইবার জন্য কল্পনা করে। সব মিথ্যা। মানুষের কল্পনা দেবতাকে গড়ে—মানুষের ভক্তি তাহাকে সজীব করিয়া তুলে। সবই মানুষের।

"আমার বাবা সম্পত্তিশালী লোকের পুত্র ছিলেন। কিন্তু জ্ঞাতিদিগের সঙ্গে মোকর্দ্দমা করিয়া করিয়াই তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। মোকর্দ্দমাটা যেন তাঁহার একটা নেশা ছিল। মোকর্দ্দমার জন্য তাঁহার যখন যে টাকা ধার করিতে হইত, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মহাজন অকাতরে তাহা ধার দিতেন, কখনও তাগাদা করিতেন না, মধ্যে মধ্যে খত বদলাইয়া লইতেন। ক্রমে যখন দেনার পরিমাণ সম্পত্তির দাম ছাপাইয়া গেল, তখন তিনি চাপ দিলেন। প্রায় সব সম্পত্তি বিক্রয় হইল—অনেকটা দেনাও শোধ হইল; সম্পত্তির মধ্যে বসতবাটী ও দেনার মধ্যে হাজার তিন টাকা পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া রহিল। বাবা অন্ধকার দেখিলেন। আর এক বৎসর হইলে আমার পাঠ শেষ হয়; তখন আমার রোজগার করিবার সম্ভাবনা। কিন্তু মহাজন আর বিলম্ব করিতে অসম্মত হইলেন; জ্ঞাতিরাও মহাজনকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তখন মহাজন প্রস্তাব করিলেন, তাঁহার কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ দিলে তিনি সব টাকা ছাড়িয়া দিবেন—সেইটাই জামাতার যৌতুক হইবে। প্রস্তাবটা বাবা অপমানজনক মনে করিলেন; কিন্তু উপায় কি? তাঁহার আশার সঙ্গে সঙ্গে শরীরও ভাঙ্গিয়া গেল। শেষে মার কাছে সব কথা শুনিয়া আমিই সে বিবাহে সম্মতি দিলাম; মনে করিলাম, বাবার জন্য যে কোনও স্বার্থত্যাগ করা আমার কর্ত্তব্য। আমি মনে করিলাম, বাবার দুশ্চিন্তার কারণ দূর করিলাম—তিনি সারিয়া উঠিবেন। কিন্তু দুশ্চিন্তার অপেক্ষা অপমান তাঁহার অধিক বেদনার কারণ হইল। তিনি কেবলই বলিতেন, এই উদ্দেশ্যেই—আমাকে ধরিবার জন্যই মহাজন ঋণের জালে তাঁহাকে জড়াইয়াছিলেন; আর তাঁহার জন্যই আমি অপমান বরণ করিয়া লইয়াছি। এই বেদনার দংশনই তাঁহার অকাল-মৃত্যুর কারণ হইল।

"আমারও মনে হইল, যিনি আমার পিতার অকাল-মৃত্যুর কারণ, তাঁহার কন্যাকে আমি কেমন করিয়া পত্নীরূপে গ্রহণ করিব? এক বৎসরের মধ্যে আমি বাড়ী গেলাম না; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই চাকরী লইয়া বিদেশে আসিলাম, মাকে তথায় লইয়া আসিলাম। যে পৈত্রিক গৃহ মহাজন শ্বশুরের দয়ায় রক্ষা

পাইয়াছিল, সে গৃহের প্রতি আমার আর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। আমি সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, সে গৃহে আর ফিরিব না।

"মা পুনঃ পুনঃ বধূকে আনিবার প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু আমার মত করাইতে পারিলেন না। শ্বশুর মহাশয় পুনঃ পুনঃ আমাকে পত্র লিখিলেন, আমি উত্তর দিলাম না। মা আমাকে অনেক করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, যদি আমার শ্বশুরের কোনও অপরাধই হইয়া থাকে, সেজন্য তাঁহার কন্যার দোষ দেওয়া যায় না। সে কন্যার ভরণপোষণ করিতে আমি লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য। যদি আমার আপত্তি থাকে, তিনি বধূকে একবার আনিয়া আর পিত্রালয়ে পাঠাইবেন না—কিন্তু আমি যেন তাঁহার বধূকে ঘরে আনিতে আপত্তি না করি। তাহাতে নিন্দা তাঁহার, আর নিন্দা আমার। আমি বুঝিলাম না—মনে করিলাম, যে দেশ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সে দেশের লোকনিন্দায় আমার ভয় কি? আমার ব্যবহারে মা মর্ম্মাহতা হইলেন। তবুও আমার সঙ্কল্প বিচলিত হইল না।

"এই সময় বড় মামার এক মেয়ের বিবাহে মা পিত্রালয়ে গেলেন। মার পিত্রালয় ও শ্বশুরালয় পাশাপাশি গ্রামে। তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, তাঁহার বেহাইন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। যদি তাঁহাদের কোনও অপরাধই হইয়া থাকে, আমি যেন তাহা ক্ষমা করি। তিনি আরও বলিলেন, তিনি পিত্রালয়ে অবস্থানকালে বধূকে আনাইয়া কাছে রাখিয়াছিলেন, এবং প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছেন, তিনি বধূকে আনিবেন; তিনি সঙ্গেই আনিতেন, কেবল ভাদ্র মাস বলিয়া আনিতে পারেন নাই।

"মার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাঁহার স্নেহের একমাত্র সম্বল পুত্র তাঁহার প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা করিবে। তাহাতে যে সে আপত্তি করিতে পারে, তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার সে বিশ্বাসও আমি ভাঙ্গিয়া দিলাম। 'সবই আমার অদৃষ্ট' বলিয়া তিনি অশ্রু গোপন করিতে উঠিয়া গেলেন। তবুও আমার সঙ্কল্প টলিল না—আমি এমনই পাষাণ।

"এই বিশ্বাসভঙ্গের আঘাত মা'র পক্ষে কত বেদনার কারণ হইয়াছিল, তাহা অনুভব করিবার যোগ্যতাও আমার ছিল না। যে শিক্ষায় আমরা সে যোগ্যতাও অর্জ্জন করিতে পারি না, আমরা আবার সেই শিক্ষার গর্ব্ব করি! আজ যখন সংসার মরুময়—জীবন দাবানল-দগ্ধ হইয়াছে, তখন বুঝিতেছি, আমি মঙ্গলঘট অমঙ্গল পদাঘাতে চূর্ণ করিয়াছি। কিন্তু আজ বুঝিয়া আর ফল কি?

"মা তাঁহার বধূকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। কি লিখিয়াছিলেন, জানি না; কিন্তু সে পত্র যে তাঁহার হৃদয়ের বেদনায় রঞ্জিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করিতে পারি। তাহার পর হইতেই মা 'বৃন্দাবনবাসী' হইবেন বলিয়া পুনঃ পুনঃ আমাকে বলিতে লাগিলেন। তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে আমি সে প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। আমি মনে করিলাম, এইবার সংসারের সব বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব—অনন্যকর্ম্মা হইয়া চিকিৎসাবিজ্ঞানের চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিয়া আবিষ্কারের অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া অমরত্ব লাভ করিব। মানুষ মনে করে, তাহার পুত্রপৌত্রাদির দ্বারা তাহার নাম রক্ষিত হইবে। সে সব সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু যাহারা আপনাদের সাধনায় অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করে, তাহারা আপনারাই কালজয়ী। আমি ভ্রান্তিবশে—অভিমানে সেই স্বপ্ন দেখিয়াছি। আজ সে স্বপ্ন টুটিয়াছে—আজ আমি বুঝিয়াছি, স্বপ্নসঞ্চারচালিত হইয়া আমি যে কাজ করিয়াছি, তাহার জন্য আমাকে দীর্ঘ জীবন কাঁদিয়া কাটাইতে হইবে।"

৫

"মাকে লইয়া বৃন্দাবনে আসিলাম—তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যাইব—আমার মুক্তির পথ মুক্ত করিয়া যাইব।

"বৃন্দাবনে আসিয়া মনে হইল, যখন আসিয়াছি, স্থানটা দেখিয়া যাই। তাই মার সঙ্গে মন্দিরগুলি দেখিতে লাগিলাম। বুঝিলাম না, আমার অদৃষ্ট আমার সকল গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দিবার আয়োজন করিতেছিল।

"এই মন্দিরে মাকে দেবদর্শন করাইয়া আমি যখন প্রাঙ্গণ পার হইতেছি, তখন তিন জন বাঙ্গালী মহিলা মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন—দুই জন প্রৌঢ়া, এক জন কিশোরী। কিশোরীর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই আমি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলাম; কিন্তু একবার-দৃষ্ট সেই মুখের স্মৃতি আমার চিত্তে অঙ্কিত হইয়া রহিল। সে মুখে বিষাদের যে বিকাশ সপ্রকাশ দেখিয়াছিলাম, তাহা আমি আর কোথাও—কখনও দেখি নাই। আমার পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া কখন যে করুণার ধারা প্রবাহিত হইল, ঊষরকে স্নিগ্ধ করিল, তাহা জানিতে পারিলাম না। কিন্তু মনে হইল, যদি সে মুখের বিষণ্ণভাব দূর করিবার জন্য আমার জীবন দিতে পারি, তবে জীবন সার্থক হয়। কখনও যে দৌর্ব্বল্য অনুভব করি নাই, এই দেবমন্দিরে সেই বিষাদপ্রতিমাকে দেখিয়া সেই দৌর্ব্বল্যে অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

"মাকে দেখিয়া এক জন প্রৌঢ়া বলিলেন, 'এই যে বেহাইন! কবে আসিলে?' মা বলিলেন, 'জীবনের সব সাধই ত মিটিয়াছে—এখন যে কয়দিন বাঁচি, গোবিন্দ গোপীনাথের চরণ দেখিয়া কাটাইব মনে করিয়া আসিয়াছি। সুধীর আমাকে রাখিতে আসিয়াছে।' কিশোরী ততক্ষণ মাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মার শেষ কথা শুনিয়া সে একবার আমার দিকে চাহিল; তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এই স্থানে বসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মাও বসিয়া পড়িলেন। উভয়েরই নয়নে দরবিগলিতধারায় অশ্রু ঝরিতেছিল।

"আমার মা শান্ত হইবার পূর্ব্বে কিশোরী শান্ত হইল; যেন সে তাহার দৌর্ব্বল্যবিকাশে লজ্জানুভব করিয়া আপনাকে শান্ত ও সংযত করিল। সে তাহার মাতার ও পিসীমাতার সঙ্গে যাইয়া দেব-প্রণাম করিল। তাহার মা ডাকিলেন 'মা, চল যাই।' সে তখনও মন্দিরের সম্মুখে প্রণতাবস্থাতেই ছিল। তাহার পর সে উঠিল। মা তখনও এই স্থানেই বসিয়াছিলেন। সে আসিয়া মাকে প্রণাম করিল। তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, 'মা আমার, চিরসুখিনী হও!' সে বলিল, 'মা, আশীর্ব্বাদ করুন—এ জন্মে যাহা পাইলাম না, পরজন্মে যেন তাহাই লাভ করিতে পারি; স্বামীর পদসেবা করিতে পাই। আমার ইহকালের দেবতা ও পরকালের দেবতা উভয়ের সমক্ষে আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।' সে আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না; অঞ্চলে অশ্রু মুছিতে মুছিতে প্রৌঢ়াদ্বয়ের সঙ্গে মন্দির ত্যাগ করিয়া গেল।

"মাকে লইয়া আমি গৃহে ফিরিলাম—হৃদয়ে নূতন অনুভূতি লইয়া আসিলাম। সে অনুভূতি সুখের কি দুঃখের, বুঝিতে পারিলাম না। তবে আমার মনে হইল, আমি ভক্তির, শ্রদ্ধার, ভালবাসার মূর্ত্ত বিকাশ দেখিয়া আসিলাম।

"আমি সমস্ত দিন ভাবিলাম। আর সঙ্কোচ রহিল না—মিথ্যা অভিমান তখন আমাকে ত্যাগ করিয়াছে। রাত্রিকালে আমি মা'কে বলিলাম, 'মা, তুমি আমার সঙ্গে ফিরিয়া চল—তোমার বধূকে লইয়া চল।'

"আমার কথায় মা যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন। রাত্রি প্রভাত হইলেই তিনি তাঁহার বৈবাহিকের বাসায় গেলেন; বলিয়া গেলেন, তিনি বধূকে সঙ্গে লইয়া আসিবেন।

"মা চলিয়া গেলেন; আমি তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।"

৬

"বেলা হইল। মা ফিরিলেন না। সংবাদ লইয়া ভৃত্য আসিল—মা আমাকে যাইতে বলিয়াছেন। পূর্ব্বদিন মন্দির হইতে গৃহে ফিরিয়া সকলে গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর যখন ফিরিয়াছেন, তখন আমার পত্নী অসুস্থা—রাত্রিতে রোগ বাড়িয়াছে—বিসূচিকা।

"শুনিয়া মনে করিলাম, আজ প্রায়শ্চিত্তকাল সমাগত। আমি ব্যস্ত হইয়া ভৃত্যের সহগামী হইলাম।

"এক জন অনভিজ্ঞ অর্দ্ধশিক্ষিত হোমিওপ্যাথকে ডাকিয়া চিকিৎসা করান হইতেছিল। আমি তাহাতে আপত্তি করিয়া দেহের শিরা কাটিয়া লবণাক্ত জল প্রবিষ্ট করাইয়া চিকিৎসার প্রস্তাব করিলাম। অস্ত্রপ্রয়োগে আমার শ্বশুরের বড় ভয় ছিল; তিনি আপত্তি করিয়া বলিলেন, 'যাহা হইবে, তাহা আমি বুঝিতেছি। এ সময় আর আমি কাটাকুটি করিতে দিব না।' আমি একটু জিদ করিতেই অভাগিনী দুহিতার প্রতি আমার দুর্ব্যবহারে তাঁহার সঞ্চিত অপমান ও অভিমান ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 'বলে—জীয়স্তে নয় ভাত কাপড়—মরে গেলে দানসাগর। আজ তুমি কোন্ মুখে আমার কন্যার চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার কথার প্রতিবাদ করিতে আসিয়াছ?' কথাটা অত্যন্ত সত্য—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। যে আমার, আমি আপনার ব্যবহারে তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিবার অধিকারও হারাইয়াছি। আমি চিকিৎসক, আমাকে বসিয়া দেখিতে হইবে, কুচিকিৎসায় আমার সহধর্ম্মিণীর প্রাণবিয়োগ হইতেছে! সে কি যাতনা!"

৭

সুধীরের হৃদয়ে সে দিনের সেই যাতনা যেন আবার নূতন হইয়া উঠিল। সে সেই পাষাণপ্রাঙ্গণে লুটাইয়া কাঁদিল। তাহার পর সে একটু স্থির হইয়া বলিল—

"তাহার পর? সন্ধ্যা হইতে না হইতে সব ফুরাইল—সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের সব সুখ—সব আশা, আমার পাপের অনলে পুড়িয়া শেষ হইয়া গেল।

"যখন আশা, সুখ সব যায়, তখনও জীবন যায় না; তখনও দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিতে হয়। মা আর বৃন্দাবন হইতে ফিরিলেন না। দুই বৎসর পরে বৃন্দাবনেই দেহরক্ষা করিলেন।

"সে দিন—সেই দীর্ঘ দিন আমি মানুষের অসহায়তা উপলব্ধি করিয়া যেমন

একাগ্রভাবে ভগবানকে ডাকিয়াছিলাম, সাধকও সমস্ত জীবনে তেমন করিয়া ডাকিতে পারেন না। কিন্তু কই—অন্ধকারে আলোকের কোনও চিহ্নই পাইলাম না—নিস্তব্ধতায় কোনও শব্দই আমার শ্রবণগোচর হইল না। সেই দিন ভগবানে আমার বিশ্বাস শেষ হইয়াছে।

"আমি নাস্তিক; কিন্তু ভক্ত যেমন মনে করে, সে এই দেবতার দর্শনেই সর্ব্বপাপমুক্ত—পূর্ণকাম হয়, তেমনই যাঁহার দর্শনে আমার মোহান্ধকার ঘুচিয়া গিয়াছিল—আমি নূতন জীবনে জাগিয়া মানুষের যাহা সত্য ও সুন্দর, তাহার সন্ধান পাইয়াছিলাম, তাঁহার বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করিবার যোগ্যতাও আমি সেই দিন এই দেবমন্দিরে দাঁড়াইয়া লাভ করিয়া গিয়াছি।"

* * * * *

পূজার সব আয়োজন হইয়াছে বলিতে আসিয়া 'ব্রজবাসী' ও পূজারী অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুধীর তাঁহাদের সঙ্গে দেউলে চলিয়া গেল।

আমার স্ত্রী তুলসীমঞ্চের অন্তরাল হইতে আসিলেন—দেখিলাম, তাঁহার চক্ষু দুইটি ক্রন্দনস্ফীত। তিনি আসিয়া সুধীরের পত্নীর নামাঙ্কিত প্রস্তরের ধূলি লইয়া মস্তকে দিলেন; বলিলেন, "জীবনে তুমি দুঃখ কষ্ট পাইয়াও অনাহত পতিপ্রেমে নারীর ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছ; ধর্ম্ম আজ তোমাকে তাহার পুরস্কার দিয়াছে; তাই মৃত্যুতে তুমি যে পতিপ্রেম পাইয়াছ, তাহা অক্ষয় ও অমূল্য।"

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

আমার দুই দুগ্ধবতী গাভী।

[স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় লিখিত।]

সংসারে আমার আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, দুইটী দুগ্ধবতী গাভী আছে। তাহাদের একটীর নাম—

অহেতুকী হিংসা।

এবং অপরটীর নাম—

নিষ্কাম নিন্দা।

আমার এই গাভীদ্বয় সুরভি-তুল্যা। অহরহ, অযাচিত ভাবে, ইহারা আমাকে অতি উপাদেয় গব্যরস পান করায়। আমি স্বর্গীয় পুলকে পরিপূর্ণ হই।

কে বলে, সংসারে সুখ নাই! সংসারে আমি যথেষ্ট সুখী—যাহার-পর-নাই সুখী। অহেতুকী হিংসা এবং নিষ্কাম নিন্দা নাম্নী চিরদুগ্ধবতী গবী দুইটীই আমার অক্ষয় সুখ ও অনন্ত শান্তির নিদানীভূত হইয়া সংসারকে স্বর্গতুল্য করিয়াছে।

শাস্ত্রকর্ত্তারা সত্যই কহিয়াছেন,—নিষ্কাম কর্ম্মেই সুখ। আমি নিষ্কাম কর্ম্মী। কেন না, কামনারহিত হইয়া, বিনা কারণে, আমি লোকের কুৎসা করি—কলঙ্ক রটাই—'অঘটন-পটীয়সী' প্রভায় পর-নিন্দা সংঘটন করিয়া, আমি তাহার আলোচনা ও ঘোষণা করি। পরন্তু, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ-কাম হইয়া, অহেতুক ভাবে, আমি পর-হিংসা রূপ পুণ্য-কার্য্যে অষ্টপ্রহর রত থাকি।

অতএব, এই নিষ্কাম কর্ম্মজনিত আত্মপ্রসাদ রূপ পরমানন্দে আমি নিয়ত ভাসমান আছি। সংসারে আমি সুখী। সত্যই সুখী। সর্ব্বদাই সুখী। সর্ব্বতোভাবে সুখী।

অহেতুকী হিংসা, আমার অতি রূক্ষ হবিষ্যান্নকেও ঘৃতাক্ত পলান্নে ও সুমিষ্ট পায়সান্নে পরিণত করে। অর্দ্ধাশনে ও অনশনে থাকিয়াও, আমি উহার দেব-দুর্লভ দুগ্ধে, পরিপুষ্ট হই। আমার কঙ্কালাবশিষ্ট দেহাভ্যন্তরে দিব্য জ্যোতির্ম্ময়, সুকুমার, কনক-কান্তি বিভাসিত হইয়া, হিংসা-রসের হেম-হিল্লোলে, হেলিয়া দুলিয়া ক্রীড়া করে!

পরন্তু, অপরা পয়স্বিনী—নিষ্কাম নিন্দা, নিয়ত আমার নিকট নন্দনকানন ফুটাইয়া রাখিয়াছে। আমি তাহার সুধাবিনিন্দী নির্ম্মল গব্যামৃতের আস্বাদে অণুক্ষণই আনন্দ-কুণ্ডে নিমগ্ন রহিয়াছি। মরি! কি অনির্ব্বচনীয় অনুপম আরাম!

আমার দুই গাভী একই রজ্জুতে আবদ্ধ। একটীকে স্মরণ করিলে, তাহারা উভয়েই একত্র আসিয়া, আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়। স্মরণ না করিলেও, ইহারা আপনা হইতেই আমার অনুগামিনী হইয়া থাকে। আমার প্রীতি-রজ্জুতে ইহারা আবদ্ধ; আমার পালনে, পরিচর্য্যায় ইহারা পরিতুষ্ট ও হৃষ্টপুষ্ট; আমার সোহাগ-সন্তর্পণে ও আদরের অবিচলিত আকর্ষণে এই গাভীদ্বয় আমার একান্ত অনুগত।

বামে নিন্দা, দক্ষিণে হিংসা—কভু বা দক্ষিণে নিন্দা, বামে হিংসা; সুরভি-যুগল সর্ব্বদাই সম্মুখে থাকিয়া আমার সেবা করিতেছে। আমি সেবিত হইয়া ইহাদের সেবা করিতেছি। যেন বিষ্ণু বৈষ্ণব সম্বন্ধ!

আমার যুগ্ম গবী-রত্ন, কভু উন্নত শৃঙ্গ উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মানা। মরি! কি মসৃণ, কি তীক্ষ্ণ, কি সরল,—সরলে কিবা অনুপম, অপরূপ, বঙ্কিম, সুঠাম, সুশ্রী, 'সেমিটিকাল' ও সমুন্নত—আহা!—ইহাদের শৃঙ্গ! অত্যুজ্জ্বল ও সুতীক্ষ্ণ ও সুচিক্কণ সূচ্যগ্রসন্নিভ—সূচ-শরীরবিনিন্দী শৃঙ্গাগ্রভাগ! শৃঙ্গ দ্বারা আমার এই সোহাগিনী সুরভিদ্বয় গিরি-শরীর বিদীর্ণ—ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে; অত্যুচ্চ অভ্রভেদী গিরি-শ্রেষ্ঠ ধবল গিরির শৃঙ্গকেও উৎপাটিত, অবনীত, ধূল্যবলুণ্ঠিত ও পদদলিত করে!

উন্নত শৃঙ্গ উত্তোলন করিয়া, কভু ইহারা দণ্ডায়মানা; কভু বা বিলাসাবেশে বিভোর হইয়া আমার দুই পার্শ্বে দু'টীতে শয়ানা; আহা! কভু বিচরণ করিতেছে—কভু শয়নে থাকিয়া চর্ব্বণ ও রোমন্থন করিতেছে। হরিণ-নয়না হিংসা ও নিরুপমা নিন্দার আহারোদ্গার করিয়া ধীরে ধীরে রোমন্থন; আহা! এই রোমন্থনের 'রিট্রস্পেকটিপ্' রস যে কি সুধাসম সুস্বাদু, তাহা কেবল আমিই জানি; আর সংসারের যে সাধু মহাত্মগণ এই নিষ্কাম কর্ম্মের কর্ম্মী, তাঁহারাই জানেন!

স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, সর্ব্বত্রই আবার এই গাভীদ্বয় বিচরণ করে। ত্রিসংসারে, এমন স্থান বিরল, যে স্থানে ইহারা চরে না। অমর-ভুবন হইতে নর-নিকেতন ও তাহারও নিম্নতর, নিম্নতম তোরণ, তথা প্রাসাদচূড় হইতে পয়ঃ-প্রণালীর কর্দ্দমকুড় ও সম্রাটের স্বর্ণমন্দির হইতে কাঙ্গালের পর্ণকুটীর, কোথায় আমার এই দুলালী দুইটীর গতিবিধি নাই? গন্ধ-ঘ্রাণেই, অস্মদীয় গবীদ্বয় দূরে নিকটে সর্ব্বদিকে গমন করে, এবং সুখাদ্যমাত্রেরই সর মন্থন ও সার সঙ্কলন করিয়া আমাকে দুগ্ধরূপে দান করে। আমি সেই অমৃত পীযূষ দুই হস্তে দোহন করি। তাহার চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় প্রস্তুত করিয়া, একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা একে একে ও একত্রে আস্বাদ লই। আমার কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি আত্মা এক অনুপম স্বাদ-সায়রে সন্তরণ দিতে থাকে!

আমার গবীদ্বয় জান্তব ও খনিজ, উদ্ভিদ চেতন ও অচেতন, আমিষ ও নিরামিষ, আমান্ন ও সিদ্ধান্ন, সর্ব্ববিধ বস্তুই সর্ব্বপ্রকার অবস্থায়, আস্বাদ ও উদরসাৎ, উদ্গার ও পৌনঃপৌনিক চর্ব্বণ করিতে পারে। তবে ঐ সকল পদার্থের মধ্যে যাহা সুখাদ্য ও সুকুমার খাদ্য, তাহাই বাছিয়া বাছিয়া ভক্ষণ ও রোমন্থন করে। আমার হাস্যমুখী হিংসা-নিন্দার 'দন্ত রুচির' লৌহ, প্রস্তর, কূর্ম্ম-পৃষ্ঠকেও পুলিপিষ্টকবৎ বা নধর নব দূর্ব্বাদলবৎ চর্ব্বণ করিতে পারে;—

চর্ব্বণ করে। ইহারা আমার সন্তোষার্থ সর্ব্ব ভূতেই চরে। আমি ইহাদের শির চুম্বন, গাত্র কণ্ডূয়ন ও শৃঙ্গ লেহন করিয়া দুগ্ধ দোহন করি।

আমি সেব্য হইয়াও সেবক। সুরভি গবীদ্বয়কে আশ্রয় দিয়া ও উহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া অনবরত নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি। কামধেনুদ্বয় ক্রমাগতই আমার গাত্রের উপর নিষ্কাম কর্ম্ম আনিয়া দিতেছে। আমি কামনা-শূন্য হইয়া তাহা সম্পন্ন করিতেছি।

কায়মনোবাক্যে, গমনে, উপবেশনে, কথোপকথনে, জাগরণে, শয়নে, স্বপনে, সর্বত্র সকল অবস্থাতেই আমি নিষ্কাম কর্ম্মী। সর্ব্বত্র সকল অবস্থাতেই আমি হব্য গব্য দ্বারা হিংসার সেবা করি। আমি নিদ্রাতেও নিষ্কাম নিন্দার নিদিধ্যাসন করিয়া থাকি।

অহো! নিষ্কাম কর্ম্ম আমার কোথায় নয়! সুমুখী সুরভির সেবা কিসে নয়!

আচারে বিচারে, প্রচারে, ব্যবহারে, ধর্ম্ম-সাধনে, নীতি-সঞ্চালনে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, গ্রন্থে, মন্ত্রে, তন্ত্রে, গল্প-গাজায়, বক্তৃতা-মালায়, পুস্তক পুস্তিকায়, কাব্য, উপন্যাস নাটকের পত্রে পত্রে, সংবাদ-পত্রের ছত্রে ছত্রে, আমি নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গাভীযুগলকে চরাই। আমার নিষ্কাম ধর্ম্মের এই সকল কর্ম্মক্ষেত্রে; আমার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা চরে, চর্ব্বণ ও রোমন্থন করে। তৎকালে, তাহাদের স্বত-বিগলিত অমৃতোপম অজস্র দুগ্ধধারায়, আমার নিষ্কাম-কর্ম্ম-নিচয় সিক্ত হইয়া এক অতি অপরূপ শ্রী ও অপূর্ব্ব সৌরভ বিস্তার করিতে থাকে। আনন্দে আমি আত্মহারা হই; পৃথিবী পুলকিত হয়। পৃথিবীর লোক পরিপুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হইয়া, আমাকে 'পুণ্য-শ্লোক' বলিয়া সাধুবাদ করে।

সর্ব্বঘটেই আমার নিষ্কাম কর্ম্মক্ষেত্র; অতএব আমার গবীদ্বয়ের চারণ-ভূমি। তবে এই সুসভ্য 'সেঞ্চুরী'তে সংবাদপত্রই আমার সবিশেষ নিষ্কাম কর্ম্ম-ভূমি। অতএব আমার কামধেনুযুগলেরও চর্ব্বণ ও বিচরণের ক্ষেত্র। তাহারা প্রতি দিন এবং প্রতি সপ্তাহে আমার নিষ্কাম কর্ম্মের সাহচর্য্যে সংবাদ-পত্র রূপ পুণ্যক্ষেত্রে প্রাত্যহিক সাপ্তাহিকাদি বিপুল ও বিনোদ ক্ষেত্রে নব নধর শ্যামল কোমল দূর্ব্বাদল, তৃণরাজি, কাঁচা পাকা শস্য-শিষ ও ফুল মুকুল খুঁটিয়া খুঁটিয়া খায়, আর আমায় দুগ্ধ দান করে। আমি এই পবিত্র দুগ্ধে দেব-সেবা করি, দোল দুর্গোৎসব করি, ব্রাহ্মণ-ভোজন করাই, মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া অধ্যাপক বিদায় করি; এক কথায়, ঐ দুই গাভীর দুগ্ধের দ্বারা

আমি আমার নিষ্কাম যজ্ঞের সাধন ও উদ্যাপন করিয়া কৃতার্থ হই, এবং সে অর্থ তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করি।

যজ্ঞ-ফল নিজে ভোগ করিবার জন্য আমি যজ্ঞ করি না। যজ্ঞ-ফল 'সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বর হরি'কে বিনা নোটিসেই নিবেদন করিয়া দিই।

সংবাদপত্র আমার নিষ্কাম ব্রত।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

এ যুগে আমি সমাচারপত্রের সম্পাদক ও সত্ত্বাধিকারিরূপে জগতে অবতীর্ণ। সমাচারপত্র আমার যজ্ঞক্ষেত্র—আমার উদ্ধার-ব্রতের বিরাট কর্ম্ম-ভূমি। অহেতুকী হিংসা ও নিষ্কাম নিন্দা নাম্নী গৌরবান্বিতা গবীদ্বয় সেই যজ্ঞের কাম-ধেনু। এই ধেনুদ্বয়ের সাহচর্য্যে ও সহায়তায়—গব্যে ও হব্যে আমি নর-নারীর সম্মান-মেধ-যজ্ঞানুষ্ঠান করি। যজ্ঞের জ্যোতি জগৎ আলোকিত ও জীবন পুলকিত করিয়াছে। পাপরাজ্য পবিত্রীকৃত হইতেছে; পৃথিবী পূর্ণানন্দে প্লাবিতা হইয়া পুণ্য-ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে। আমার সমাচারপত্র রূপ যজ্ঞ-কুণ্ড হইতে কৌস্তভ অমৃত ও উচ্চৈঃশ্রবাদি উদ্গীর্ণ হইতেছে। আমি পুনঃ মন্ত্রপূত করিয়া সেই সুমহান হোম-কুণ্ডে নরের নাক-কাণ ও নারীর সম্মান আহুতি দিতেছি। আবার পালে পালে উচ্চৈঃশ্রবাদি আকাশে উড়িতেছে। 'শ্রী' ঝাঁকে ঝাঁকে বৃক্ষ-শাখে সমারোহণ করিয়া লম্প ঝম্প করিতেছে;—অহো! যজ্ঞ-কুণ্ড কলসে কলসে, কানেস্তারে কানেস্তারে, পিপায় পিপায় অমৃত উদ্গার করিতেছে। পাইপে পাইপে, (প্রেজেন্‌টেসনের প্রেসারে) জম্বুদ্বীপের আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সেই সুধামৃত সঞ্চালিত হইতেছে। জম্বুদ্বীপী সে পীযুষ পান করিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতেছে।

এ যুগে সংবাদপত্রের পবিত্র যজ্ঞের দ্বারা সাধুর পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতের দমন করিয়া আমি ভূভার হরণ করিব।

তবে, সিডিসন-সংহিতা সংশোধিত হইয়াছে, এবং লাইবেল 'ল' আছে বটে। তা হউক। আমি নিষ্কাম অবতার; উহারা আমার ঈপ্সিত ও উদ্দিষ্ট উদ্ধারের অন্তরায় হইবে না। আমি উহাদের একের ধামা অবিরতই ধারণ করিয়া আছি, এবং অবস্থা বুঝিয়া অপরের পদলেহন ও পয়জার-ভক্ষণ বা শ্রীগৃহে গমন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত আছি। আমার নিষ্কাম কর্ম্ম কোনও আইনেই আটকাইয়া রাখিতে পারে না।

তোমরা জিজ্ঞাসা করিতেছ, কোন কোনটী আমার নিষ্কাম কর্ম্ম। উত্তর,—কোনটী আমার নিষ্কাম কর্ম্ম নয়? সকাম আমার কিছুই নাই। সবই সটান নিষ্কাম। পান ভোজন হইতে * * * প্রতারণ ও পরবৃত্তাপহরণ, এ সবই আমার নিষ্কাম কর্ম্ম। কেন না, এ সবই আমি কামনা-বিরহিত হইয়া করি।

দাতারামের দুর্গোৎসব।

১

চালতাপুরের দাতারাম সরকারের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইবে শুনিয়া গ্রামের লোকেরা যেরূপ বিস্ময় অনুভব করিল, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হইয়াছে দেখিলেও তাহারা ততটা বিস্ময় বোধ করিত কি না সন্দেহ। কেন না, গ্রামের সকলেই জানিত, দাতারামের মা বাপ ভ্রমক্রমেই ছেলের নাম দাতারাম রাখিয়াছিল, তৎপরিবর্ত্তে কঞ্জুষরাম নাম রাখিলেই তাহার নামের সহিত কার্য্যের ঠিক সামঞ্জস্য থাকিত।

গ্রামের মধ্যে দাতারাম সরকার প্রসিদ্ধ মহাজন ছিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরে গিয়া হাত পাতিলে তিনি নগদ দশ হাজার টাকা গণিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি যে টাকা পয়সা একবার সিন্দুকে তুলিতেন, খাতকের প্রয়োজন ব্যতীত তাহা আর সূর্য্যালোক দেখিতে পাইত না। তবে তিনি পয়সা সিন্দুকে তুলিতেন না; টাকা, সিকি, দুয়ানী, আধুলীরই সিন্দুকে উঠিবার অধিকার ছিল। এ জন্য তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন, সাত পয়সার অধিক পাওনা হইলে তিনি কাহারও নিকট খুচরা পয়সা লইবেন না। এই খুচরা পয়সাতেই তাঁহার সংসার চলিত। যে দিন পয়সার আমদানী হইত না, সে দিন ধারকর্জ্জ করিয়া সংসারের দৈনিক খরচ চালাইতেন, তথাপি দুয়ানীর থলীতে হাত দিতেন না।

সংসারে তাঁহার বিধবা ভগ্নী সুভদ্রা ছাড়া আর কেহ ছিল না। স্ত্রী অনেক পূর্ব্বেই গতাসু হইয়াছিলেন। তখনও দাতারামের বিবাহের বয়স যায় নাই; পাত্রীরও অভাব ছিল না। অভাব ছিল শুধু দাতারামের বিবাহ করিবার ইচ্ছার। পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া তিনি গলগ্রহ জুটাইতে এবং অনর্থক পোষ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে রাজী ছিলেন না।

ভগ্নী বিধবা, একাহারী; নিজেও পরম হিন্দু, মৎস্য মাংস স্পর্শ করিতেন না। সুতরাং সংসার অতি সহজেই চলিয়া যাইত। খাতকদের ক্ষেতের আলু, বেগুন, কচু, কাঁচকলার কল্যাণে নিরামিষাশী দাতারামের আহার্য্যের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা ছিল না।

পরম হিন্দু হইলেও দাতারাম কতকগুলা বিষয়ে ইংরাজী-শিক্ষিত নব্যগণের মতের অনুমোদন করিতেন। যেমন, ভিখারীকে মুষ্টি ভিক্ষা দিলে সমাজে অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। দৈব বা পিতৃকার্য্যে অর্থব্যয় কেবল অলস ব্রাহ্মণ জাতির উদরপূরণমাত্র, ইত্যাদি। এই মতে দৃঢ় আস্থা থাকিলেও

সমাজ-শাসনের অনুরোধে তাঁহাকে যে সকল কাজ করিতে হইত, তাহা এরূপ সংক্ষেপে নির্ব্বাহ করিতেন, যাহাতে উদরপরায়ণ ব্রাহ্মণের পেটও না ভরে, অথচ নিজেরও কার্য্য উদ্ধার হয়। দাতারাম সুদের হিসাবের মত কাজকর্ম্মেরও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হিসাবে পারদর্শী ছিলেন।

এ হেন দাতারাম সরকার দুর্গোৎসব করিবেন শুনিয়া গ্রামের লোক যে আকাশ হইতে পড়িবে, তাহা আর বিচিত্র কি!

তা দাতারাম যে স্বেচ্ছায় এই অর্থহানিকর অকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ইহা বলিলে তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক অর্পণ করা হইবে। পূজার মাসখানেক আগে গ্রামের কতকগুলা বওয়াটে ছোঁড়া আসিয়া বারোয়ারীর চাঁদার জন্য দাতারামকে ধরিয়াছিল। দাতারাম চাঁদা ত দিলেন না, অধিকন্তু এরূপ নিষ্ফল আমোদে অর্থব্যয় ও সময় নষ্ট করার জন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট তিরস্কারও করিলেন। ছোঁড়ারা রিক্তহস্তে ফিরিয়া গিয়া অনেক পরামর্শের পর স্থির করিল, "রও বেটা কঞ্জুষরাম, এক টাকার বদলে তোমার একশো টাকায় ঘা দেওয়াব।"

দাতারাম ছোঁড়াদের পরামর্শের বিন্দুবিসর্গও জানিলেন না। জানিতে পারিলে মহালয়ার দিন কখনও এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইতেন না। প্রতিহিংসা-পরায়ণ ছোঁড়ার দল তাঁহার দরজায় ঠাকুর ফেলিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি অন্য দিনের মত ভোরে উঠিলেই সকল গোল চুকিয়া যাইত; সেই ক্ষুদ্র প্রতিমা-খানিকে আস্তে আস্তে তুলিয়া খিড়কী পুষ্করিণীর জলমধ্যে স্থাপন করিলেই ছোঁড়াদের নিদারুণ প্রতিহিংসা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইত। কিন্তু হায়, "দৈবী বিচিত্রা গতিঃ"; প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিলেও সেই দিনই তিনি বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার গাত্রোত্থানের পূর্ব্বেই পাড়ার ছেলে বুড়া সকলে তাঁহার দরজায় সমবেত হইয়া বিস্ময়পূর্ণ কোলাহল তুলিয়া দিয়াছিল।

২

সে দিন একটু বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইবার কারণও ছিল। পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার সময় তাগাদা সারিয়া দাতারাম যখন ঘরে ফিরিলেন, তখন ভগ্নী সুভদ্রা বলিল, "দাদা, পুরুতঠাকুর ব'লে গেছেন, কাল শ্রাদ্ধ করতে হবে।"

দাতারাম সক্রোধে উত্তর করিলেন, "কার শ্রাদ্ধ? তোর, না আমার?"

সুভদ্রা একটু ব্যথিতস্বরে বলিল, "আমার শ্রাদ্ধ হ'লে ত সব আপদ্ চুকে যায় দাদা। কিন্তু তোমার—ছি ছি, কি অলক্ষণে কথাই যে বল?"

বিকৃতমুখে দাতারাম বলিলেন, "আর তোমার কথাটাই বুঝি খুব সুলক্ষণ হ'লো?"

সুভদ্রা বলিল, "আমি এমন কি মন্দ কথা ব'লেছি? বছরে একটা দিন, চোদ্দপুরুষকে একটু জলপিণ্ডী দেবে না?"

বিরক্তির সহিত দাতারাম বলিলেন, "এই যে পনরোটা দিন ধ'রে চোদ্দ-পুরুষকে আঁজলা আঁজলা জল দিলাম। এতেও কি তাঁদের পেট ভরে না?"

পিতৃপুরুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলেও দাতারাম তর্পণটা নিয়মিতরূপে করিতেন। বিনা আয়াসে প্রাপ্ত দুই অঞ্জলি জল দিলে যদি পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়, তবে তাহা দিতে ক্ষতি কি?

সুভদ্রা মুখ ভার করিয়া বলিল, "চোদ্দপুরুষের পেট ভরেছে কি না, তা তুমিই জান। পুরুতঠাকুর ব'লে গেলেন, তাই বলছি।"

ভ্রুকুটী করিয়া দাতারাম বলিলেন, "ব'লে গেলেই ত হ'লো না। শ্রাদ্ধ হ'বে কি ক'রে, আজ তো নিরামিষ্য করা হয় নি?"

সুভদ্রা গালে হাত দিয়া বলিল, "ও মা, তুমি আবার কবে মাছ খাও দাদা, যে আলাদা নিরামিষ্যি করতে হবে?"

দাতারাম ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "মাছ খাই না ব'লে কি নিরামিষ্য করতে হবে না? শুধু মাছই খাই না, কলায়ের ডাল খাই, পুঁইশাক খাই, এগুলা তো আমিষ? সেই হাঁড়ীতে ত খেয়েছি?"

সুভদ্রা বলিল, "তা প্রাতঃস্নান করলেই হবে।"

দাতারাম বলিলেন, "হাঁ, আজ আমিষ খেয়ে কাল প্রাতঃস্নান করলেই হবে! ও সব নাস্তিকের কথা, ফাঁকির মতলব। আমার দ্বারা ও সব নাস্তিকের কাজ হবে না।"

সুভদ্রা রাগিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "নাস্তিকের কাজও হবে না, আস্তিকের কাজও হবে না। আসল কথা, পয়সা খরচ করতে পারবে না।"

ভগ্নীর রাগ দেখিয়া দাতারাম একটু হাসিলেন; বলিলেন, "দূর পোড়ার-মুখী, পয়সা খরচকে কি আমি ভয় করি? কি জানিস্, ও সব ফাঁকির কাজে আমার মন যায় না। তা, তুই যখন রাগ করছিস্, তখন একটা ভুজ্যি উচ্ছুগ্যু করা যাবে।"

সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "রাতে কি খাবে?"

দাতারাম বলিলেন, "কিছু না। ভুজ্যি উচ্ছুগ্যু, এও ত এক রকম শ্রাদ্ধ। রাত্রে আর কিছুই খাব না।"

সুভদ্রা বুঝিল, দাদা এক বেলা উপবাস দিয়া ভোজ্যোৎসর্গের খরচের কতকটা সাশ্রয় করিলেন। আর দাতারাম শুইয়া এক সের চাউল দিবে, কি আধ সের চাউল দিবে, গামছা একখানা কিনিবে কি না, কিনিলেও তাহা দেড় হাতি কি দুই হাতি লওয়া হইবে, দক্ষিণা চার পয়সা কি দুই পয়সা দেওয়া উচিত, এই সকল ভাবিয়া একটা হিসাব নিকাশ করিতে লাগিলেন। হিসাব যখন স্থির হইল, তখন রাত্রি প্রায় তিন প্রহর। সঙ্কল্প স্থির করিয়া শেষ-রাত্রিতে দাতারাম ঘুমাইয়া পড়িলেন। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন প্রতিবাসীরা আসিয়া দরজায় কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে।

৩

দাতারামকে দেখিয়া, এবং তাঁহার ভীষণ ভ্রূভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া প্রতিবাসীরা যখন একে একে সরিয়া পড়িল, তখন দাতারাম উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "সুবি, ও সুবি!"

সুভদ্রা সম্মুখে আসিয়া বলিল, "কেন দাদা?"

ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে ভগ্নীর মুখের দিকে চাহিয়া দাতারাম উগ্রকণ্ঠে বলিলেন, এ সব কি কাণ্ড কারখানা?"

সুভদ্রা ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "কি জানি।"

দাতারাম দাঁত মুখ খিঁচাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি জানি? তুমি জান না, আমি জানি না, তবে জানবে কে? ও পাড়ার শঙ্করা?"

সুভদ্রা নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। দাতারাম একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এখন এই নিয়ে কি করা যায়?"

সুভদ্রা বলিল, "ঠাকুর নিয়ে আর কি করে? পূজো করবে।"

দাতারাম রাগিয়া বলিলেন, "পূজো? কে পূজো করবে?"

সুভদ্রা বলিল, "কে আবার? তুমি।"

দাতারাম বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "আমি? তুই বলিস্ কি সুবি, আমি গোঁসায়ের শিষ্যি, আমি শক্তিপূজা করবো?"

সুভদ্রা চিবুকে অঙ্গুলি সংলগ্ন করিয়া বলিল, "ওমা, তুমি আবার গোঁসায়ের শিষ্যি হ'লে কবে দাদা?"

দাতারাম বলিলেন, "কবে কি? আমার সাত পুরুষ গোঁসায়ের শিষ্যি।"

সুভদ্রা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দাতারাম বলিলেন, "আর জেনে

কি হবে, তুই এক দিক্ ধর্, আমি এক দিক্ ধরি। ধ'রে পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে আসি।"

সুভদ্রা বিস্ময়স্তম্ভিতকণ্ঠে বলিল, "বল কি দাদা? মা ঘরে এসেছেন, তাঁকে জলে ফেলে দেবে?"

মুখভঙ্গী করিয়া দাতারাম বলিলেন, "তা নয় ত কি ঘরে তুলে ফুল চন্দন দিয়ে পূজো করবো?"

তীব্রস্বরে সুভদ্রা বলিল, "তা করবে কেন, সিন্দুকের পূজো করবে। গলায় দড়ি দাও দাদা।"

রাগে সুভদ্রা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দাতারাম মৃদু হাসিলেন; বলিলেন, "এই পোড়ারমুখী রেগে মরেছে। আরে! এ কি তোর মনসা-পূজো, লক্ষ্মী-পূজো, এ দুর্গোৎসব। বাবা! তা তুই না পারিস্, আমি নিজেই ফেলে দিয়ে আসছি।"

সুভদ্রা বলিল, "তা দাও, কিন্তু লোকে একঘ'রে করবে, তা জেনো।"

দাতারাম বলিলেন, "তবে আমি ভয়েই সারা হ'লাম। আমি কোনও বেটা বেটীর ঘরে পাত পাড়তে চাই না, কোনও বেটা বেটীকে বাড়ীতে পাত পাড়াতেও চাই না।"

সুভদ্রা ভ্রাতার মুখের উপর তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল। দাতারাম বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

দাতারাম ঠাকুর ফেলিয়া দিবার কথা মুখে বলিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যে তাহা করিতে সাহসী হইলেন না। সমাজ-শাসনের ভয় আসিয়া বাধা দিল। দেবতার এই অবমাননা হিন্দুসমাজ কখনই সহ্য করিবে না; সমাজ তাঁহাকে ভীষণ দণ্ডে দণ্ডিত করিবে। তাঁহার ধোপা, নাপিত, হুঁকা বন্ধ হইবে; নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ রদ হইবে; সমাজ তাঁহার সহিত সর্ব্বপ্রকার সংস্রব ত্যাগ করিবে। তাঁহার পয়সা থাকিলেও, গ্রামের অনেকের মহাজন হইলেও, সমাজ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবে না। গ্রামে এক জন হাড়ীও যে সম্মান পায়, সে সম্মান হইতেও তিনি বঞ্চিত হইবেন।

দাতারাম ইহা জানিতেন; জানিতেন বলিয়াই তিনি ঠাকুর ফেলিয়া দিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি পুরোহিতের সঙ্গে পরামর্শ করিতে চলিলেন।

পুরোহিত কিন্তু যে ফর্দ্দ দিলেন, তাহা দেখিয়া দাতারামের চক্ষুঃস্থির হইল।

সে যে প্রায় দুই শত টাকার ফের। ফর্দ্দের অনেক কম করিলেও, দশ হাতি কাপড়কে ছয় হাতি করিলেও, দেড় শত টাকার কমে কিছুতেই হইবে না। দাতারাম রাগিয়া বলিলেন, "আমি এত টাকা খরচ করতে পারব না।"

পুরোহিত বলিলেন, "এর কমে দুর্গোৎসব হয় না।"

দাতা। না হয়, আমি ঠাকুর জলে ফেলে দিব।

ঈষৎ হাসিয়া পুরোহিত বলিলেন, "সে উপায় থাকলে তুমি আমার কাছে আসতে না।"

দাতারাম রাগে ফুলিতে ফুলিতে বলিলেন, "আপনি পুরোহিত ব'লেই আপনার কাছে এসেছি। যজমানের হিত করাই পুরোহিতের কর্ত্তব্য।"

পুরোহিত বলিলেন, "আমি তোমার অহিত চিন্তা করি নাই।"

দাতা। তাই বুঝি দু'শো টাকার লম্বা ফর্দ্দ দিলেন ?

পুরো। দুর্গোৎসব কলির অশ্বমেধ, দু'শো টাকা কি বেশী খরচ হ'লো ?

দাতা। আপনাদের পক্ষে বেশী নয় ; কেন না, আপনারা পাবেন ; আমার পক্ষে বেশী, কেন না, আমায় দিতে হবে।

পুরোহিত চুপ করিয়া রহিলেন। দাতারাম বলিলেন, "এত চাল কাপড় কলা মূলো—এ সব কি হবে ? মা কি খাবেন ?"

পুরোহিত ঈষৎরুষ্টভাবে বলিলেন, "মাকে খাওয়াবার সৌভাগ্য তোমার আমার নাই দাতারাম।"

দাতা। নাই ত এ সব কেন ?

পুরো। শাস্ত্রের বিধান।

দাতা। ছাই বিধান! যার এত টাকা নাই, সে কি মায়ের পূজা করবে না ?

পুরো। অসমর্থের পক্ষে বিধান অন্যরূপ।

দাতারাম ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন, "আর আমিই বুঝি সমর্থ ? কেন, দাঁতে দাঁত দিয়ে কোনও রকমে দু'টো পয়সা সঞ্চয় ক'রেছি ব'লে বুঝি ?"

দাতারামের সহিত তর্কবিতর্ক বৃথা বিবেচনায় পুরোহিত নিরুত্তর রহিলেন। দাতারাম জোরে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "তা হবে না পুরুত মশায়, শাস্তর কেবল আপনারাই যে জানেন, তা নয় ; আমিও জানি। মায়ের পূজোয় ও সকলের কোনও দরকার নাই। রামপেসাদ কি ব'লে গেছেন, জানেন ত ? 'আলো চাল আর পাকা কলা কাজ কি রে তোর আয়োজনে ; তুমি ভক্তি-

সুধা পান করিয়ে তৃপ্ত কর আপন মনে।' এ যে সে লোকের কথা নয়, সাধক রামপ্রেসাদের কথা, মা নিজে যার বেড়া বাঁধতেন।"

পুরোহিত বলিলেন, "রামপ্রসাদের সে ভক্তি ছিল, আমাদের তা নাই।"

দাতারাম বলিলেন, "ততটা না থাক্, কিছুও ত আছে। ব্যস্, গাছের ফুল, বেলপাতা, পুকুরের জল, আর মনের ভক্তি, এই হ'লেই যথেষ্ট। এই দিয়েই আমি মায়ের পূজো করবো।"

দাতারাম সত্বরপদে বাড়ীতে ফিরিলেন। সুভদ্রাকে ডাকিয়া উৎফুল্লকণ্ঠে বলিলেন, "না সুবি, আর জলে ফেলে কাজ নাই। মা যখন এসেছেন, তখন সাধ্যমত পুজোটা করাই দরকার। অভাগা কপালে আর ত কিছু হ'লো না, হবেও না; ভাল, মায়ের পায়ে এক আঁজলা ফুল গঙ্গাজলই দেওয়া যাক্।"

ভ্রাতার মতিপরিবর্ত্তন-দর্শনে সুভদ্রার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তখন ভাই ভগ্নীতে ধরাধরি করিয়া প্রতিমাকে চণ্ডীমণ্ডপে তোলা হইল।

সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে দাদা, কিছু চাল ধান করতে হবে তো?"

হাত নাড়িয়া দাতারাম বলিলেন, "না না, সে সব কিছুই করতে হবে না।"

বিস্ময়ের সহিত সুভদ্রা বলিল, "তবে কিসে কি হবে?"

দাতারাম বলিলেন, "ফুল জল বেলপাতা, এই হ'লেই যথেষ্ট। তুই মেয়ে মানুষ, কিছুই তো বুঝিস্ না। রামপেসাদের গান শুনিস্ নি?" বলিয়া দাতারাম গুন্ গুন্ করিয়া গায়িতে লাগিলেন,—

"আলো চাল আর পাকা কলা কাজ কি রে তোর আয়োজনে,
তুমি ভক্তিসুধা—মন রে আমার—ভক্তিসুধা পান করিয়ে
তৃপ্ত কর আপন মনে।"

৪

ষষ্ঠীর দিন সকালে পুরোহিত কল্পারম্ভ করিতে আসিয়া দেখিলেন, রাশীকৃত ফুল, বিল্বপত্র, আর এক ঘড়া গঙ্গাজল ছাড়া পূজার অন্য কোনও উপকরণই নাই। পুরোহিত সুভদ্রাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ও সুভদ্রা, পূজার নৈবেদ্য কোথায়?"

সুভদ্রা মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমি জানি না, দাদাকে জিজ্ঞাসা কর না।"

দাতারাম অদূরে বসিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে আর জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হইল না। তিনি উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, "নৈবেদ্য আবার কি হবে?"

পুরোহিত বলিলেন, "নৈবেদ্য না দিলে কি দিয়ে পূজা হবে ?"

দাতারাম উত্তর করিলেন, "ফুল্, গঙ্গাজল, আর ভক্তি।"

দাতারাম মুখে যাহা বলিয়াছিল, কাজেও যে তাহাই করিবে, পুরোহিত তাহা ভাবেন নাই। সুতরাং দাতারামের উত্তর শুনিয়া বৃদ্ধ পুরোহিত হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাতারাম সহাস্যে বলিলেন, "ভাবছেন কি, এ আর কারো পূজা নয়, দাতারামের পূজা। দাতারাম মাকে চালকলা খেতে দেয় না। জানেন ত, রামপেসাদ কি ব'লে গেছে—"জগৎকে যে খাওয়ায় রে মন মিছরী আদি—"

বাধা দিয়া পুরোহিত বলিলেন, "মা সন্তানকে যাই খেতে দিক্, সন্তানের উচিত মাকে কিছু খেতে দেওয়া।"

দৃঢ়স্বরে দাতারাম বলিলেন, "নিশ্চয় দেব। মা যা ভালবাসেন, যা চান, তাই দেব।"

গম্ভীরকণ্ঠে পুরোহিত বলিলেন, "তাই দিতে পারবে দাতারাম ?"

মাথা উঁচু করিয়া গর্ব্বস্ফীতকণ্ঠে দাতারাম উত্তর করিলেন, "পারি কি না দেখে নেবেন।"

সুভদ্রার নিকট এক মুঠা আলো চাল চাহিয়া লইয়া পুরোহিত পূজায় বসিলেন।

প্রতিমার গায়ে রঙ্ পড়িয়াছিল, কিন্তু সাজ দেওয়া হয় নাই। সুভদ্রা বলিল, "হাঁ দাদা, মাকে সাজাবে না ?"

দাতারাম বলিলেন, "কি ? ডাকের গয়না দিয়ে ? দূর, দূর ! রামপেসাদ কি ব'লেছে জানিস্ ?" বলিয়া দাতারাম গান ধরিলেন,—

> "জগৎকে যে সাজায় রে মন ! দিয়ে হীরে জহর মুক্তোদানা ;
> তুই কোন্ প্রাণে সাজাবি মাকে দিয়ে ছার ডাকের গহনা।"

দাতারাম কতকগুলা স্থলপদ্ম, অপরাজিতা প্রভৃতি আনিয়া প্রতিমা সাজাইতে বসিলেন। সাজান শেষ হইলে দাতারাম ভগ্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ও সুবি ! মা কেমন সেজেছে— দেখে যা।"

সুভদ্রা দেখিল, ডাকের সাজ অপেক্ষা ফুলের সাজে মন্দ মানায় নাই, বরং বেশ ভালই সাজিয়াছে। সে ভ্রাতার ব্যয়কুণ্ঠতা বিস্মৃত হইয়া হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে বলিল, "বেশ সেজেছে দাদা।"

দাতারাম আপনার নৈপুণ্যে আপনি মুগ্ধ হইয়া প্রতিমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "সত্যি সুবি, ঠিক মায়ের মতই দেখাচ্চে।"

৫

সপ্তমীর দিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই দাতারাম তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, চণ্ডীমণ্ডপের উঠানে এক পাল ছেলে আসিয়া জমিয়াছে, তাহাদের আনন্দ-কোলাহলে প্রাঙ্গণ মুখরিত হইতেছে; শারদ-সপ্তমীর স্নিগ্ধ প্রভাতালোকে ধরণী যেন হাসিয়া উঠিয়াছে; ঘরে বাহিরে, আকাশে বাতাসে, সর্ব্বত্রই যেন একটা আনন্দের ধারা ছড়াইয়া পড়িয়াছে; রাস্তা দিয়া নিতাই বৈরাগী এক-তারার সুরের সঙ্গে গায়িতে গায়িতে চলিয়াছে,

"উঠ উঠ গিরি, পোহালো শর্ব্বরী,
গৌরী আমার আজি এসেছে।"

দাতারামের বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল।

পুরোহিত তখন পত্রিকা-প্রবেশ করাইয়া প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে-ছিলেন। দাতারাম প্রতিমার দিকে ফিরিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, প্রতিমার মুখে কি শান্ত মধুর হাসির রেখা! মাটীর পুতুলের মুখে এমন মিষ্ট হাসি, এমন আনন্দের ঔজ্জ্বল্য কি থাকিতে পারে? তবে কি গৌরী আজ সত্যই আসিয়াছেন? দাতারামের বুকের ভিতর হইতে কে যেন মুগ্ধবিহ্বলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সত্যই কি তুই এসেছিস্ মা?" দাতারাম ভয়ে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্!

পুরোহিত সপ্তমীপূজা শেষ করিলেন। পূজার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত দাতারাম এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ পুরোহিতের গম্ভীর-কণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্রগুলা তাঁহার কাণে যেন নূতন সুরে বাজিতে লাগিল। টাকার ঝন্ ঝন্ শব্দ অপেক্ষা জগতে মিষ্ট সুর আর কিছুই নাই; কিন্তু এই অপার্থিব সুরের নিকট সে সুরও বুঝি পরাজিত হয়! দাতারাম প্রতিমার মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই স্বর্গীয় সুর শুনিতে লাগিলেন।

পূজা-শেষে দাতারাম অঞ্জলি দিতে বসিলেন। পুরোহিত উদাত্ত গম্ভীর স্বরে অঞ্জলিদানের মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন,—

"ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম।
আগতাসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরি মদাশ্রয়ম্।
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরি।
যৎ পূজিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥"

পুরোহিতের উচ্চারিত মন্ত্রের আবৃত্তি করিতে করিতে দাতারামের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত, কণ্ঠ গদগদ হইয়া আসিল।

এক রুক্ষকেশ মলিনবসন ভিখারিণী আসিয়া করুণকণ্ঠে ডাকিল, "জয় হোক্ বাবা, কিছু খেতে দাও বাবা!"

পুরোহিত ডাকিলেন, "দাতারাম!"

দাতারাম চমকিয়া উঠিলেন। পুরোহিত বলিলেন, "মা খেতে চাইছেন দাতারাম, মাকে খেতে দাও।"

দাতারাম বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে করিতে ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "এঁ্যা, মা খেতে চাইছেন? মা কৈ?"

পুরোহিত উঠানের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন।

দাতারাম বলিলেন, "ও তো ভিখারিণী।"

গম্ভীরকণ্ঠে পুরোহিত বলিলেন, "মা আমার বিশ্বরূপিণী, বিশ্বই মায়ের রূপ দাতারাম। এ মায়ের মৃন্ময়ী মূর্ত্তি, আর ঐ দেখ মায়ের চিন্ময়ী মূর্ত্তি। মৃন্ময়ী মাকে কিছু খেতে দাও নাই, এবার চিন্ময়ী মা এসেছেন, মাকে খেতে দাও দাতারাম।"

ভিখারিণী বলিল, "মা এসেছেন, কিছু খেতে দাও বাবা।"

দাতারামের সর্ব্বশরীর ভয়ে বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইল। তিনি রুদ্ধশ্বাসে একবার ভিখারিণীর দিকে, আর বার প্রতিমার দিকে চাহিতে লাগিলেন। দেখিলেন, অন্নপ্রার্থিনী ভিখারিণীর মুখে যে হাসি, ভক্তিপ্রার্থিনী মায়ের মুখেও সেই মৃদু মধুর হাসি! ভিখারিণী করুণকণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছে, "মা এসেছেন, কিছু খেতে দাও বাবা।" মাও যেন তেমনই হাসিমুখে প্রার্থনার সুরে বলিতেছেন, "আমি এসেছি দাতারাম, কিছু খেতে দাও।" দাও দাতারাম, মা খাইতে চাহিতেছেন, বিশ্বরূপিণী মাকে খাদ্য দিয়া তৃপ্ত কর।

দাতারাম উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "সুবি, সুবি!"

প্রায় শতাধিক ভিখারী উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের পশ্চাতে তাহাদের প্রেরক সেই প্রত্যাখ্যাত ছোঁড়ার দল। ভিখারীরা উচ্চকণ্ঠে বলিল, "জয় হোক্ বাবা, কিছু খেতে পাই বাবা।" যেন বিশ্বের অনন্ত কণ্ঠ হইতে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিল, "কিছু খেতে পাই বাবা।"

দাতারাম উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "সুবি, সুবি!"

সুভদ্রা ছুটিয়া আসিল। দাতারাম কোমরের ঘুন্সী হইতে সিন্দুকের চাবীটা

খুলিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন; ব্যগ্রস্বরে বলিলেন, "টাকা নিয়ে আয় সুবি, মাকে খেতে দিতে হবে।"

সুভদ্রা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দাতারাম উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "শীগ্‌গীর যা, তোড়া নিয়ে আসবি। একটা নয়, দু'টো। দু'টো চারটে যা পারিস্—নিয়ে আয়।"

সুভদ্রা চাবি কুড়াইয়া লইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। ছোঁড়ার দল বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পুরোহিত প্রতিমার দিকে চাহিয়া যুক্তকরে গদগদকণ্ঠে পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। আশ্বিন।—শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায় গুপ্তের 'মধুলুব্ধ' নামক ছবিখানি সুন্দর; রঙ্গের ও রেখার কবিতা। ইহাতে 'ভারতীয় চিত্রকলা'র অত্যাচার ও উপহাস নাই। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ইতিহাসের ধারা' নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি, অনেক শিখিয়াছি।—লেখক চিন্তাশীল, কৃতবিদ্য, পরিশ্রমী। বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় তাঁহার আগ্রহ আছে। মাতৃভাষার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াই তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সাধনা সফল হউক।—দুঃখের বিষয় এই যে, নব-ব্রতীদিগকে বাঙ্গালা সাহিত্যে আপনার পথ আপনি করিয়া লইতে হয়। এ দেশে সম্পাদক নাই, রচনার আচার্য্য শিক্ষানবীশকে বাঙ্গালা ভাষার ধাতু ও প্রকৃতির সহিত পরিচিত করিয়া দেন না। লিখিতে লিখিতে শিখিতে হয়। এই জন্য শক্তিশালী নব-ব্রতীদের রচনাও বাঙ্গালা ভাষার রীতি হইতে অত্যন্ত অন্তরিত হইয়া পড়ে। 'ইতিহাসের ধারা' প্রত্যেক বাঙ্গালীর পড়া উচিত। কিন্তু এমন তথ্যপূর্ণ রচনাটি সকল বাঙ্গালী সমানভাবে উপভোগ করিতে পারিবেন না। 'কোনও দেশের প্রাচীন যুগের কথার বিষয় আলোচনা বা চর্চ্চা করিতে হইলে সকলের চেয়ে বেশী কার্য্যকরী ও উপযোগী উপাদান হইতেছে মানুষ নিজে যাহা বলিয়া গিয়াছে' * * * 'কিন্তু এই উপাদান আমাদের খুব প্রাচীন যুগে লইয়া যায় না।' ইহা বাঙ্গালা রচনা-রীতির অনুগত' নহে। অবশ্য, 'একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।' কিন্তু এমন লেখকের রচনায় মুদ্রাদোষ দেখিলে দুঃখ হয় না? শ্রীক্ষিতিমোহন সেন 'কজ্জলী' প্রবন্ধে হিন্দী

সাহিত্যের এক অংশের পরিচয় দিয়াছেন। বহুকাল পূর্ব্বে 'মালঞ্চে' স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান লেখক তদপেক্ষা বিস্তৃতভাবে 'কজরী'র আলোচনা করিয়াছেন, এবং ইতিহাস দিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিবেশী সাহিত্যসমূহের পরিচয় পাইবার উপায় নাই। এই শ্রেণীর প্রবন্ধে সে অভাব পূর্ণ হইতে পারে। ইনিও নূতন লেখক। বেশ গুছাইয়া লেখেন। 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ' চারি চরণের কবিতা। এরূপ কবিতা খুব চাঁচা-ছোলা—খুব উজ্জ্বল—খুব নিটোল না হইলে ভাল লাগে না। 'অন্তরে সঞ্চিয়া রাখ, আমি পিয়ে লব' নিতান্ত গদ্য। 'পিয়ে লব' একবারে অচল। শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর 'ডাকপিয়ন' চলনসই গল্প। 'আলোচনা'য় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় নিপুণভাবে 'ঙ্গ'-র ওকালতী করিয়াছেন; গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। যোগেশবাবুর মতে, 'ঙ' কোনও মতে 'ঙ্গ'র স্থান অধিকার করিতে পারে না। তিনি বলিতেছেন—'আমি রেঢ়ো; আমি ঙ্গ স্পষ্ট শুনিতে পাই। শাস্ত্রী মহাশয় গৌড়ীয়; গৌড় দেশেও কি ঙ পরগাছা প্রবল হইয়াছে, আ-ঙি-না ডি-ঙা-ই-য়া ভা-ঙি-য়া ঙ্গ-বেচারার রস নি-ঙ-ড়া-ই-য়া খাইয়া ফেলিয়াছে।' শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরীর 'ডায়েরী' নামক গল্পে কোনও বিশেষত্ব নাই। শ্রীকালিদাস রায়ের 'কাব্যে বস্তুবিচার' অনধিকার-চর্চ্চার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইনি ইংরেজ ও স্কচ কবির রচনা তুলিয়া, সেই প্রমাণে কাব্য হইতে বস্তুকে নির্ব্বাসিত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।—অনুবাদেও 'গুরু-চণ্ডালী'র ছড়াছড়ি। 'বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ কাঁচীখানি ছেঁটে দিবে পাখাগুলি দেবদূতগণে টানি আনি।' আবার, 'বিশ্লেষিছে হায় আখণ্ডল-ধনুখানি খণ্ড খণ্ড তুচ্ছ ক্ষুদ্রতায়।' শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'দোয়োখা একাদশী' কবিতাও নয়, পাঁচালীও নয়, ছড়াও নয়। ইহা কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অগত্যা 'নেতি নেতি'র পথেই ইহার পরিচয় দিলাম। অনুভব না করিয়াই সমাজসংস্কারের অনুরোধে ইহা লেখা হইয়াছে। করুণ রস কৃত্রিমতার অতীত। শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের 'ঋতুসংহার' ঋতু-সংহারই বটে। 'ভারী রোদ, 'কড়্-কড়্' ভাঙা ডাল 'মড়্-মড়্' তবু পদে আছে। 'ভোর বেলা নামতা' ও 'বউঝির আমতা' কি? এক জন খোট্টা এমন চিঠি লিখিয়া দিয়াছিল যে, সেই পত্রখানি তাহারই নিকট পড়াইতে আনিতে হইয়াছিল। আর কেহ সে দেবাক্ষর পড়িতে পারিল না। যে লিখিয়াছিল, সে অনেকক্ষণ চিঠিখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল; কিন্তু পড়িতে পারিল না। অবশেষে চটিয়া বলিল,—'কোন্—লিখা রে?' গল্পটি শোনা না থাকিলে কবিকেই অর্থ জিজ্ঞাসা করিতাম। শ্রীমতী হেমলতা দেবী 'ভালো'র বলিতেছেন,—

'ভালো ওগো ভালো আমার সকল কথার শেষ,'
'যে দেশেতে যাবার লাগি যাত্রা সবার সুরু,
যে দেশেতে আছেন বসে প্রাণের পরম গুরু;'

যদি বাস্তবিকই শেষ হয়, তাহা হইলে আমরাও 'ভালো' বলিতে প্রস্তুত। কারণ, 'সব ভালো, যার শেষ ভালো।' 'যাত্রা সুরু'র পূর্ব্বেও কি কবিতা লিখিয়া পা বাড়াইতে হয়? তাহা হইলে অ-কবিদের উপায় কি? আর, 'সে দেশেতে আছেন বসে প্রাণের পরম গুরু', অতএব, দেশশুদ্ধ লোক মিলে 'কাটনা কাটেন সরু-সরু!' এও ত বড় বিপদ। শ্রীযোগেশ-

চন্দ্র রায় 'প্রাচীন কালের গুড় ও আখে' তথ্যের রাশি সংগ্রহ করিয়াছেন। 'বিবিধ প্রসঙ্গে' দেখিতেছি,—'আমি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বা স্বকর্ণে শুনিয়াছি, তাহার বিপরীত কথা কেহ বলিলেই সে যে নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী, এমন কথা বলা যায় না। কারণ সব জিনিস সকলের ইন্দ্রিয়গোচর হয় না, সকলে সব জিনিস একই ভাবে দেখে না বা শুনে না। আমরা উভয় দলের কার্য্যের মধ্যেই চাতুরী, এবং ভাল ও মন্দ দুই দেখিতেছি।' চক্ষু ও কর্ণের সাক্ষ্য দরিয়ায় ফেলিয়া দিয়া, যাহা দেখিয়াছি, বা শুনিয়াছি, তাহাকে 'মিথ্যা' ভাবিব, এবং যাহা দেখি নাই, বা শুনি নাই, তাহাকে 'সত্য' বলিয়া মানিয়া লইব ? 'ধ্রুব সত্য' সম্বন্ধে 'প্রবাসী'র এ বিধান চলুক, তাহাতে আপত্তি করিব না ; কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে চোখে শাদা দেখিলে তাহাকে কালো বলিব, এবং দেশের নেতা জানিয়া শুনিয়া শুধু দলাদলির খাতিরে ডাহা মিথ্যা কথা বলিলে, এবং পলিতশ্মশ্রু, চশমা-চক্ষু ধর্ম্মধ্বজীরা গরজের খাতিরে তাহার সমর্থন করিলে, বা নীরব থাকিলে, সেই নির্জ্জলা মিথ্যাকে 'সত্য' বলিয়া মানিয়া লইব, এবং শিরোধার্য্য করিব ? আবার এই আত্মপ্রতারণার সমর্থনের জন্ত দর্শন ও বিজ্ঞানের আমদানী করিয়া ভাবিতে বসিব,—'সব জিনিস সকলের ইন্দ্রিয়গোচর হয় না ?' কারণ,—'সকলে এক জিনিস এক ভাবে দেখে না, বা শুনে না !' গরজের খাতিরে ? প্রয়োজনের অনুরোধে ? সোজা, সাদা কথা দুই জনে দুই রকম শুনিবে ? 'অনাহত ধ্বনি' সম্বন্ধে হয় ত এ কথা খাটিতে পারে, কিন্তু 'নির্জ্জলা মিথ্যা' সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। সেরূপ মিথ্যা পদাঘাতের যোগ্য। আশ্চর্য্য এই যে, রামানন্দ বাবুর মত এক জন শিক্ষিত নীতিবাগীশের পত্রেও মিথ্যার এমন ওকালতী দেখিতে হইল। এমন 'monstrous' উপদেশ ও নির্লজ্জ ওকালতী সাহিত্যে আর কখনও দেখি নাই ! রামানন্দ বাবু কংগ্রেসের বিরোধে 'ধরি মাছ, না ছুঁই পাণি' নীতির অনুসরণ করিয়াছেন। ইহা সুবুদ্ধির কাজ হইতে পারে, কিন্তু নিরপেক্ষ সম্পাদকের পক্ষে কোনও মতেই শোভন নহে। শেষ সিদ্ধান্ত—'উভয় দলের কার্য্যের মধ্যেই চাতুরী এবং ভাল ও মন্দ দুইই দেখিতেছি।' এমন 'সাপ্‌টা' নির্দ্দেশ না করিলেই ভাল হইত। উভয় দলের 'চাতুরী এবং ভাল ও মন্দ' দেখাইয়া দিয়া উভয় পক্ষকেই আত্মপক্ষ-সমর্থনের অবকাশ দিলে, সত্যের ও স্তায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হইত। নিত্যানন্দের ভাবটা—অর্থাৎ, 'মেরেছ কলসীর কাণা, তা বলে কি প্রেম দিব না' মন্দ নহে। কিন্তু তাহার খাতিরেও মিথ্যার—জালের—সংঘবদ্ধ কপটতার—প্রসাদপুষ্ট ভীরুতার সমর্থন করা যায় না ; কংগ্রেসের খাতিরেও নহে, স্বর্গের জন্তও নহে। কারণ, মিথ্যা যাহার ভিত্তি, তাহা কখনও সাফল্যে চরিতার্থ হইতে পারে না। 'বিবিধ প্রসঙ্গে' সত্য কথা বলিবার চেষ্টা দেখিতে পাই। তাই তাহাতে সহসা এই মন-রাখা কথা ও 'দু কূল বজায় রাখিবার' চেষ্টা দেখিয়া দুই একটা কথা বলিতে হইল। সাম্প্রদায়িক মমতা মন্দ নহে ; কিন্তু তাহার ফলে যদি সত্যনির্দ্দেশ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে 'সব্‌সে ভালা চুপ' নীতির অনুসরণই কর্ত্তব্য। 'সাপও মরিবে, লাঠীও ভাঙ্গিবে না', এমন ভাবে এ সকল কথা বলিতে নাই। 'শক্ত মানুষ চাই' প্রত্যেক বাঙ্গালীর পড়া উচিত। কিন্তু 'চেরাগে'র নীচেই কি অন্ধকার থাকিবে ? শক্ত সম্পাদকও কি আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক নহে ?

প্রতিভা। আশ্বিন।—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদারের 'সুইডেনের নাট্যকার ষ্ট্রিণ্ডবার্গ'

উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ। ইহাতে দ্বিজ গুরুবর্গ ও তাঁহার রচনা সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা যায়। লেখক নাট্যকারের দৃশ্যকাব্যগুলির বিস্তৃত পরিচয় দিলে ভাল হয়। 'মীনচেতন' প্রবন্ধে শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় সালিস হইয়া রায় দিয়াছেন,—১। পুস্তকের নাম মীন-চেতন, না গোরক্ষ-বিজয়? আমার বোধ হয়, দুই-ই ঠিক। তবে বোধ হয়, আদি কবি গোরক্ষবিজয় রাখিয়াছিলেন। পরে বিষয় অনুসারে মীনচেতন নাম হইয়াছিল। রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড যেমন বলা যায়, রাবণ-বধও তেমন বলিতে পারা যায়। 'ভক্তমাল' গ্রন্থে মীননাথের যোগভ্রংশের কথা আছে। সেখানে আছে,—

দরোজা সম্মুখে এক ঢোল বাজাইয়া।
চেৎ মছন্দ গোর্খা আয়া ইহাই বলিয়া॥

'চেৎ মছন্দ' বলা যাহা, 'মীনচেতন' বলাও তাহা। ২। পুথীখানি চট্টগ্রামের কি? প্রমাণাভাব। বরং বোধ হয়, মূল পশ্চিমবঙ্গে রচিত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়াছিল। একখানা অশুদ্ধ ও খণ্ডিত পুথী দেখিয়া পথনির্দ্দেশ সোজা নহে। আমার বিশ্বাস, রাঢ়ের হিন্দু চট্টগ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিল। আমি ইতিহাসবেত্তা নই; তবে ভাষা দেখিয়া এইরূপ বিশ্বাস হইয়াছে। এমনও হইতে পারে, মূল পুথী রাঢ় হইতে চট্টগ্রামে গিয়া উত্তরে গিয়াছিল।

৩। যে চারি কবির ভণিতা পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কে আদি? বলিতে পারা যায় না। * * * মীনচেতন যেমন ছাপা হইয়াছে, অর্থাৎ তাহার প্রক্ষিপ্ত অংশও গ্রহণ করিলে, ফয়জুল্লার সংস্করণ বলিতে হয়।' শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'প্রাচীন ভারতে ব্যবহার' নামক উপাদেয় ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধটির তৃতীয় প্রস্তাবে পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ আছে। 'শরদাগমে' কবিতা—সুতরাং ইহাতে কবির পিয়ীমার আবির্ভাব হইয়াছে।—'গভীর নীল আকাশতলে হেসে যখন ফুটে উঠে সে ছায়াপথের রেখা।' ছায়াপথের হাসি নয়, তাহার মেথায় হাসি! বাস্তবিক,—কবির বাক্য মিথ্যা হইবার নহে।—দ্বিজেন্দ্রলালের সেই গানটি মনে পড়ে—'হাসি চেপে রাখতে পারে কোন—'। শ্রীমতী ইন্দুবালা সেনের 'বিক্রমপুরে বিবাহমঙ্গল' উপভোগ্য। দেশের সংস্কারগুলির প্রাদেশিক রূপের পরিচয় এই ভাবে সঙ্কলিত হইলে, সামাজিক ইতিহাসের অনেক উপকরণ সাহিত্যে সঞ্চিত হইতে পারে। প্রাদেশিক মাসিক-গুলিকে আবর্জ্জনার স্তূপে পরিণত না করিয়া এইরূপ তথ্যের আধার করিলে সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। গল্প লিখিয়া মোপাসাঁর কীর্ত্তিলোপ করিবার, বা কবিতা লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ হইবার সৌভাগ্য বিধাতা সকলের ললাটে লিখিয়া দেন নাই। কিন্তু অল্প চেষ্টায় এরূপ তথ্য-সংগ্রহ সম্ভব। তাহাও আবশ্যক। সাহিত্যে তাহার মূল্যও অল্প নহে। শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন 'বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যাকরণে' লিখিয়াছেন,—'এই ব্যাকরণ রচনা করিতে হ্যালহেড্ সাহেবকে যে কি অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, পুস্তকখানি পাঠ করিলেই তাহা সম্পূর্ণ উপলব্ধ হইতে পারে। তিনি সংস্কৃত, আরবী, পারসী, গ্রীক ও ল্যাটিন প্রভৃতি কয়েকটী ভাষার ব্যাকরণের সহিত তুলনা করিয়া এই বাঙ্গলা ব্যাকরণ রচনা করেন।' এই আদর্শ কবে আমরা গ্রহণ করিব? কবে আমরা পল্লবগ্রাহিতা ছাড়িয়া সাহিত্যের সৃষ্টি

ও পুষ্টির জন্ত পরিশ্রম করিতে শিখিব ? শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় 'বীরাঙ্গনা স্বর্ণময়ী'তে পুরাতন তথ্যের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের 'মাতৃগুপ্ত' কবিতার গদ্য ভণিতায় দেখিতেছি—'উজ্জয়িনীপতি হর্ষ বিক্রমাদিত্যের দেহত্যাগসংবাদে!'—এ সংবাদ কি এত দিন পরে কবির কর্ণগোচর হইল ? কবির সমবেদনা প্রশংসনীয়। 'প্রবাসী'তে এক দত্ত কবি 'দোরোখা একাদশী' দেখিয়া চোখে লঙ্কা দিয়া কাঁদিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালী কবির এমনই কই-মাছের প্রাণ, চক্ষু এমন শুষ্ক যে, এত চেষ্টা সত্ত্বেও দোরোখার একটা সুতাও ভেজে নাই। আর এক দত্ত চট্টগ্রামে বসিয়া কাশ্মীরের অতীত শোক স্মরণ করিয়া কাঁদিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, ইহাও থিয়েটারের কান্নায় পরিণত হইয়াছে। আমরা পাঠক সম্প্রদায়কে বলি,—তোমরাও 'কাঁদো কাঁদো,—জন্মভূমির সে এক দরিদ্র কবি।' দরিদ্র—ভাবদরিদ্র। ইতি মল্লিনাথ। শ্রীঅভয়াচরণ চক্রবর্তীর 'পেদ্দভট্ট' সংস্কৃত-পাঠীদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবে। সংস্কৃত ভাষার সহিত যাঁহাদের সামান্ত পরিচয় আছে, মল্লিনাথ তাঁহাদের সুপরিচিত। মল্লিনাথ শুধু ব্যাখ্যাকার নন, ভাবুক।—'মল্লিনাথ বাল্যজীবনে নিরতিশয় মূর্খ ছিলেন। তজ্জন্ত সকলেই তাঁহাকে পেদ্দ বলিয়া ডাকিত। * * ত্রিশ বৎসর বয়সে বিদ্যাশিক্ষার জন্ত ৺কাশীধামে প্রস্থান করেন। * * সেই মল্লিনাথই উত্তরকালে নানাবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া কাব্য শাস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টীকাকার বলিয়া সর্ব্বত্র সুযশঃ লাভ করিয়া গিয়াছেন।—মল্লিনাথের নামের পূর্ব্বে 'কোলাচল' নাম সংযুক্ত দেখা যায়। কোলাচল রাজমাহেন্দ্রী জিলার একটী গ্রামের নাম। মল্লিনাথ উক্ত কোলাচলে থাকিয়াই টীকা-সমূহ প্রণয়ন করেন বলিয়া তিনি 'কোলাচল মল্লিনাথ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।' 'অশোকের প্রতি কুণালে' কোনও বিশেষত্ব নাই। ব্যর্থ রচনা। শ্রীসতীশচন্দ্র রায়ের 'বীরপূজা'ও তথৈবচ। কেবল শ্রীশ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষের 'অতিথি' হইতে একটি বিশেষত্ব খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি—'তপ্ত অধরে থরে থরে থরে ঝরিছে সুধার ধারা।' মানে হয় না বটে, কিন্তু মজা হয়।—হায়! নিমে দত্ত এমন কবিতা পড়িতে পাইল না! সুধার তিনটা থরে কত সুধা, একবার কুৎ করিয়া দেখ। শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'প্রতিভা ও চরিত্রনীতি' সারবান, দার্শনিক নিবন্ধ। উচ্চ শ্রেণীর রচনা।

সাহিত্য, ২৭শ-বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

বৈষ্ণব-কবিতা।

প্রত্যেক দেশে এরূপ কতকগুলি সামগ্রী থাকে, যাহা সেই দেশের যুগ-যুগব্যাপিনী রসধারায় পুষ্ট। সেই দেশের বৃহৎ কোনও পাদপের ন্যায় তাহা দীর্ঘকাল দেশের আপামর সাধারণকে আশ্রয় দিয়া আসিতেছে। রোগের শয্যায় তাহা রোগীর সান্ত্বনা, আনন্দের আসরে তাহা হাসি ও কৌতুকের নির্ঝর, নৈরাশ্যে তাহা আশা, এবং দুঃখের সময় তাহা নির্ভর। মন্দিরের ধূলার ন্যায় তাহা বহু ভক্ত, আর্ত্ত ও হৃদয়বান্ লোকের অশ্রু দ্বারা পবিত্র।

প্রত্যেক দেশের ধর্ম্ম তাহার পক্ষে সেইরূপ সামগ্রী। বহু যুগের কাব্য-কথাও সেইরূপ আর এক সামগ্রী। আমাদের দেশের ধর্ম্ম, কাব্য ও সাহিত্য আমাদের নিকট এই হিসাবে পবিত্র, প্রাণপ্রিয়। আমরা যদি আমাদের প্রাচীন ইতিহাস লোপ করিয়া ফেলিতে চাই, তবেই ইহাদের সহিত সম্বন্ধ-বিচ্যুত হইতে চাহিব। যে দিন হইতে এসিয়ার পশ্চিমাংশ মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, সেই অবধি তাহার পূর্ব্বের ইতিহাস মুছিয়া গিয়াছে। ইউরোপে গ্রীক্ ও রোম ছাড়া অপরাপর জাতিরা তাহাদের ইতিহাস লোপ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। গ্রীক ও রোমক জাতিরাও তাহাদের প্রাচীন ধর্ম্ম ও কাব্যসাহিত্যকে দূর হইতে অপরিচিতের শ্রদ্ধা প্রদান করিতেছে; তাহাদের সহিত যে আন্তরিক যোগ ছিল, তাহা আর তাহাদের নাই।

আমাদের ধর্ম্ম, কাব্য ও সাহিত্য ঠিক খ্রীষ্টপূর্ব্ব গ্রীক কি রোমক জাতির ধর্ম্ম ও সাহিত্যের মত নহে। বেদের সঙ্গে উপনিষদের, উপনিষদের সঙ্গে পৌরাণিক ধর্ম্মের, এবং পৌরাণিক ধর্ম্মের সহিত আধুনিক ভাবস্রোতের একটা অবিচ্ছিন্ন সংযোগ রহিয়াছে। যদি এ সমস্ত বিদায় করিয়া নূতন 'বিশ্বমানব' পদবী গ্রহণ করিতে হয়, তবে সেই মানবক সভ্যতার হিসাবে নগণ্য শিশু হইয়া দাঁড়াইবে; কারণ, যাহার যত বড় প্রতিভাই থাকুক না কেন, বহুযুগব্যাপী জাতীয় প্রতিভার নিকট তাহা তুচ্ছ। বর্ত্তমান প্রতিভা যদি যুগব্যাপিনী জাতীয় তপস্যার ফলস্বরূপ না হয়, কিংবা যদি তাহা পূর্ব্বতন জাতীয় তপস্যাকে অগ্রাহ্য করিয়া দাঁড়াইতে চায়, তবে তাহা বিফল হইবে। বসোরার গোলাপের কলম এ দেশে সেরূপ আশ্চর্য্য ফুল উৎপাদন করিতে পারিবে না। কেহ যদি

এ দেশের নিভৃতে বসোরার অনুকরণে একটু জমী প্রস্তুত করিয়া কৃত্রিম আলো ও বায়ুর সাহায্যে হদ্দ মুদ্দ দুই একটা ফুল জন্মাইতে পারে, তবে বসোরাবাসীরা সেই কলম ও তাহার ফুল পরীক্ষাপূর্ব্বক অবশ্যই সাক্ষ্য দিবেন যে, ইহা তাঁহাদের দেশের গোলাপের জাতীয় বটে; বঙ্গদেশে সেই নমুনার কিছু উৎপাদন করিবার জন্য মালীকে উৎসাহ, এমন কি, পুরস্কারও তাঁহারা দিতে পারেন; কিন্তু সেই প্রশংসার স্থায়ী মূল্য কি? গোলাপের সেই চারাটী ঠিক বসোরারও নহে; এ দেশেরও নহে; উহা কোথাও চিরন্তন প্রতিষ্ঠা পাইবে বলিয়া বোধ হয় না। যদি জাতীয় ভাবের রসে পুষ্ট না হইয়া প্রতিভা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে, তবে তাহা পরানুকরণের শক্তি দ্বারা যতই কেন সাময়িক প্রশংসা লাভ করুক না, সে প্রতিষ্ঠা স্থায়ী না হইবারই কথা।

যে সাহিত্য দেশের যুগব্যাপিনী সাধনার ফলে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া, বা তাহা পদদলিত করিয়া, স্বীয় বিক্রম দেখাইবার চেষ্টা করিতে পারে দুই শ্রেণীর লোক,—বাতুল ও বালক। সেই সাধনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা হইতে জাতীয় মহত্ত্বের বিশ্লেষণ করা তদপেক্ষা কঠিনতর ও প্রশংসার্হ কার্য্য। এই দেশের বৈষ্ণব-সাহিত্য হিমালয় অথবা বঙ্গোপসাগরের ন্যায়ই বিরাট। আমি এই দেশের অধিবাসী, এবং এই রসের মধ্যে চিরদিন অভিষিক্ত হইয়া আছি বলিয়াই আমি সেই রসের প্রকৃত বিচার করিবার অধিকারী, এমন স্পর্দ্ধার কোনও কারণ নাই। জন্মাবধি যে পিপীলিকা একটা শাল কি শাল্মলীর শাখায় শাখায় বেড়াইতেছে, সে কি সেই তরুবরের পরিমাণ জানে? জন্মাবধি যে শফরী হ্রদে কি তড়াগে সন্তরণ করিতেছে, সে কি সেই জলরাশির গুরুত্ব আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে? আমরা যাহার মধ্যে আছি, তাহা যে আমাদের অপেক্ষা কত বড়, তাহার ইয়ত্তা করা অনেক সময় সহজ হয় না। মণ্ডুকের দুটী চক্ষু যাহা দেখিতে পায়, পৃথিবীটা তাহার অপেক্ষা অনেক বড়, সুতরাং সে যদি তাহার অপ্রমেয় বিশাল মাতৃভূমির এক পার্শ্বে পদাঘাত করিয়া মনে করে, তাহার পদভরে পৃথিবীটা কাঁপিয়া উঠিতেছে, তবে তাহাকে কৌতুকের বিষয় ছাড়া অন্য কিছু মনে করা উচিত নহে।

কোনও কালে কোনও যুগে হয় ত সূর্য্যদেব ভারতবর্ষের একমাত্র কিংবা প্রধান উপাস্য দেবতা ছিলেন। তখন তাঁহার কথা লইয়া লোকে উৎসব করিত। তাঁহার পূর্ব্বরাগ, তাঁহার নৌকাবিহার ও বিবাহ প্রভৃতি লইয়া লোকে গান বাঁধিত। সেরূপ গান ও ছড়া বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন অধ্যায়ে অনেক

পাওয়া গিয়াছে। বৈদিক সময়ে সম্ভবতঃ 'বিষ্ণু' শব্দে সূর্য্যকে বুঝাইত; এমন কি, বাল্মীকির সময়েও বোধ হয় "বিষ্ণুণা সদৃশো বীর্য্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ" ছত্রে 'বিষ্ণু' অর্থে সূর্য্য। বৈদিক কালে সূর্য্যদেব কংসমণ্ডল, কালীয়হ্রদমণ্ডল প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে বিহার করিতেন কি না, এবং রাধা, অনুরাধা, বিশাখা প্রভৃতি নক্ষত্রের সহিত মিলিত হইতেন কি না, তাহা বৈদিক-রহস্যজ্ঞ পণ্ডিতেরাই বলিতে পারেন। উত্তরকালে সম্ভবতঃ এই বিষ্ণু বা সূর্য্য কৃষ্ণের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছিলেন; কংসমণ্ডল ও কালীয়হ্রদমণ্ডল দৈত্য ও সর্পে পরিণত হইয়া গিয়াছিল, এবং রাধা অপরাপর নক্ষত্র হইতে বিশেষত্ব লাভ করিয়া কৃষ্ণের প্রধান নায়িকা হইয়াছিলেন। এই ধর্ম্ম যদি বৈদিক কাল হইতে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে লোকসংস্কার ও বিশ্বাসের উপর ইহার দাবী অতি প্রাচীন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে এই সংস্কার হইতে নানা গান ও কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে। এই ধর্ম্ম কাব্যে উপগত হইয়া অশ্রু, আনন্দ ও কারুণ্যের স্রোতে এ দেশকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। তার পর যুগে যুগে সময়ের উপযোগী করিয়া এই ধর্ম্মের নানা প্রকার ব্যাখ্যা হইয়াছে; সেই ব্যাখ্যা এখনও চলিতেছে। যদি জিজ্ঞাসা করেন, এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন কি? প্রেমভক্তি ও স্নেহসারে প্রতিষ্ঠিত এই গৃহ রক্ষা করিবার জন্য যে সংস্কারের প্রয়োজন, যুগে যুগে এই ব্যাখ্যাকারীরা কেবল তাহারই যোগান দিতেছেন। ভক্তির মন্দাকিনী ও প্রেমের অমৃত দ্বারা যে স্থান তীর্থে পরিণত হইয়াছে, তাহার তীরে দাঁড়াইয়া যে শুষ্ককণ্ঠে রহিল, সে হতভাগ্যের বিলাপ শুনিয়া লাভ কি? নারদের বীণাধ্বনি শুনিয়া যে কর্ণকুহর রুদ্ধ করে, এবং বলে, তাহা অপেক্ষা অনেক মিষ্ট কথার তত্ত্ব সে জানে, তাহাকে "নীরসতরুরয়ং" বলিয়া পরিত্যাগ কর।

এই রাধাকৃষ্ণ-প্রেম দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি হৃদয়ের নানা রসে পরিপুষ্ট হইয়া এক বিশাল ভাবকল্পতরুর সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা এই দেশের ব্যথিত প্রাণের সান্ত্বনা, কত মাতা যশোদার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের প্রাণের দুলালদিগকে সাজাইয়াছেন, চুম্বন করিয়াছেন, স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়াছেন; কত সখা শ্রীদাম-সুদামের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বন্ধুর সৌহার্দ্যে ধন্য হইয়াছেন; কত ভক্ত রাধার ন্যায় কুল-শীল ও মান-যশ ছিন্নকন্থাবৎ ত্যাগ করিয়া ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়াছেন! এই পদাবলী চৈতন্যের মত প্রেমিক ও রঘুনাথ দাসের মত সাধকের জপের সামগ্রী হইয়াছিল। ইহার বিশালত্ব, ইহার ব্যাপকত্ব

ধারণা করা অর্দ্ধশিক্ষিত সমালোচকের কাজ নহে। যুগের পর যুগ যে বন্যা গৃহস্থের গৃহ আনন্দের কলরবে মুখরিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই তীর্থের কাক হইয়া তাহার রসাস্বাদে বঞ্চিত হইবার দুর্ভাগ্য যেন কাহারও না হয়। হিমালয় হইতে একটী শুষ্ক পত্র বা ভগ্ন কঙ্কর লইয়া দাঁড়াইয়া যদি কেহ বলে, ইহা কিছুই নহে, এই দেখ, আমি দেশান্তর হইতে এই পাতাবাহার লইয়া আসিয়াছি, ইহা কত উৎকৃষ্ট! তাহাতে কি সেই পাতাবাহারের নিকট হিমালয় ছোট হইয়া যাইবে? বিরাট কোনও সামগ্রীর রস-বিশ্লেষণের এই রীতি নহে। কোন্ কালের কোন্ কবির হস্তে কুলশীলত্যাগিনী সর্ব্বস্বসমর্পণকারিণী রাধার ন্যায় প্রেমের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে? যশোদার মাতৃভাব বিশ্বসাহিত্যে মেরী ভিন্ন অপর কে আংশিক ভাবেও দেখাইতে পারিয়াছেন? আজ জীবনে প্রথম দিন শুনিলাম,যশোদা পুত্রবৎসলা নহেন, শ্রীদাম-সুদামের মধ্যে সখ্য ভাব ফোটে নাই, এবং রাধিকার প্রেম ভদ্র-সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য নহে! প্রেমের স্বনিকেতন বৃন্দাবনের ন্যায় তীর্থ অপর কোন্ কাব্য-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? যে তীর্থ পূর্ব্বরাগ মান অভিসার মাথুরের স্বপ্ন; যাহার নিকুঞ্জের তরুলতা মণিমুক্তাকে অগ্রাহ্য করিয়াও উজ্জ্বলতর; যাহার গুঞ্জাফলের হারটি রাজকুমারী হীরার হারের উপর ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন; যাহার সম্পদ্ বাহ্য ঐশ্বর্য্য নহে, ভাবের অশ্রু; যাহার সম্পদ্ বিদ্যাবুদ্ধি নহে, বালকের অকপটতা; যাহার সম্পদ্ আত্মম্ভরী দর্প নহে, প্রেমের নির্ভর; যাহার সম্পদ্ রাজমুকুট নহে, বাঁশের বাঁশী; যাহার সম্পদ্ রাজভাণ্ডার নহে,—মাতৃস্নেহের সুধা, সখার আত্মসমর্পণ, এবং প্রেমিকার প্রেম; যে স্থানে বীরত্বের দর্প শতবার ধূলিসাৎ হইয়াছে, শিশুরা কলকাকলী করিয়া স্বর্গরাজ্যের সম্মুখীন হইয়াছে; যে স্থানে অসির ঝনৎকারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, অশ্রুবিন্দুতে আতঙ্ক; যে হাটে বিনিময় নাই, আছে শুধু দান; এমন তীর্থ কোন্ কাব্যে কবে ফুটিয়া উঠিয়াছে? বৈষ্ণব কবিতা এই অপূর্ব্ব তীর্থের সৃষ্টি করিয়াছে—ইহা মানস ছবি। ইহা অন্ধ ধর্ম্মসংস্কার নহে। এই সংস্কার কবি ও প্রেমিকগণের বহুযুগব্যাপিনী সাধনায় সৃষ্ট হইয়াছে। কোনও ভাগ্যবান্ যদি পৃথিবীর সাহিত্যের কণ্টকাকীর্ণ পথ, রাজপ্রাসাদ ও সমৃদ্ধ নগরী সকল ক্রমে ক্রমে পরিদর্শন করিয়া অবশেষে বৈষ্ণব-পদ-রাজ্যের পথে এই বৃন্দাবনে একবার প্রবেশ করেন, তবে তিনি শীতল হইবেন। কীর্ত্তনীয়ারা কবির পদ বুঝাইয়া দিয়া থাকেন; বৈষ্ণব পদের প্রত্যেক অক্ষরের পশ্চাতে যে ভাবের সাম্রাজ্য আছে, তাহা সাধারণ

পাঠকের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে, এই জন্য কীর্ত্তনীয়ারা তাহা বুঝাইয়া দেন। বৈষ্ণব কবিতার শব্দগুলির মধ্যে ভাবের নির্দ্দেশ আছে, তাহা উহ্য; সাধারণ পাঠকের নিকট তাহা আত্মগোপন করিয়া থাকে। কীর্ত্তনীয়ারা তাহা প্রকাশ করেন। অদৃষ্ট প্রসন্ন হইলে বীরভূম কি বাঁকুড়া অঞ্চলের প্রধান কোনও কীর্ত্তনীয়ার মুখে 'গোষ্ঠ', 'পূর্ব্বরাগ' ও 'মাথুরে'র পালা শুনিয়া সাধারণ পাঠকগণ এই কবিতার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-কবিতার জন্ম সাধনার ক্ষেত্রে। এক দিকে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন; আর এক দিকে মহাপ্রভু তমালকে আলিঙ্গন করিয়া, মেঘে কৃষ্ণভ্রম করিয়া, সেই কবিতা যে সাধনার রসে পুষ্ট, তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। নরোত্তম ঠাকুর যে সময় তাঁহার আরাধ্যের বংশীরব শুনিয়া উন্মত্তবৎ ছুটিয়া গেলেন, রাজবেশ তুচ্ছ করিয়া ছিন্নকন্থা বরণ করিয়া লইলেন, রাজপ্রাসাদ ধূলিঘরের ন্যায় পরিত্যাগ করিলেন, সেই সময় পক্কপল্লীর রাজা নৃসিংহদেব সেই ভিক্ষুবেশী রাজকুমারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রাজকুমারী রাধার কথায় গায়িলেন,—

"আমার ধৈর্য্যশালা হেমাগার, গুরুগৌরব সিংহদ্বার,
ধরম কপাট ছিল তায়;
বংশীরব বজ্রাঘাত পড়ে গেল অকস্মাৎ,
সমভূমি করল আমায়।
আমার দম্ভশালে মত্ত হাতী বাঁধা ছিল দিবারাতি,
ক্ষিপ্ত কৈল কটাক্ষ-অঙ্কুশে,
দন্তের শিকল কাটি আবেশে লুকাল ছুটি,
পলাইয়া গেল কোন্ দেশে।"

অন্য কোনও কবি বজ্রাঘাতের সহিত বংশীরবের তুলনা করিতে সাহসী হইতেন কি না, জানি না; কিন্তু যে বংশীধ্বনি প্রেমিক মানসকর্ণে ভাগ্যক্রমে শুনিতে পাইয়া থাকেন, তাহা সমস্ত পার্থিব সুখের উপর বজ্রাঘাত বই কি? সেই সুরে ভোগবিলাসের বৃহৎ রাজপুরী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়। অজ্ঞাতজনের প্রেম-চাহনীতে বিপুল দম্ভ অঙ্কুশাহত হস্তীর ন্যায় পলায়ন করে, মানুষের সমস্ত স্পর্দ্ধা ও ভোগেচ্ছা লুপ্ত হয়। তাহার জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ নরোত্তম ঠাকুরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যখন রাজা নৃসিংহ দেব স্বহস্তে মৃদঙ্গবাদনপূর্ব্বক এই গানটি গায়িয়াছিলেন, তখন নরোত্তম ঠাকুর ও রাধা শ্রোতৃবৃন্দের নিকট এক হইয়া গিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস রাধার কথায় বলিয়াছিলেন, "যে করে কানুর নাম তার ধরে পায়।" চৈতন্যপ্রভু চণ্ডালের মুখেও

কৃষ্ণনাম শুনিয়া তাহার পায়ে ধরিতেন। এরূপ শত শত উদাহরণ দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে, বৈষ্ণব কবিতার জন্ম সাধনার ক্ষেত্রে, কবিত্বের উচ্চ গ্রামে সাধনার শিখরে আসীন ভক্তগণ যে লীলা করিয়াছেন, কবিগণ তাহাই বাগ্‌দেবীর বরে বাক্‌সুধায় অভিষিঞ্চিত করিয়া কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এরূপ সাধনার সুধাধারায় কাব্যকথা আর কোথায় ফুটিয়াছে?

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বিশ্বমানব চন্দ্রসূর্য্যের উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা কবিত্ব-মাত্র বুঝিবে; আধ-ফোটা ফুলে যে সৌন্দর্য্য, তাহাই দেখিয়া মাতোয়ারা হইবে; ভগবানকে আরতি করিবার জন্য মলয়ানিল তাহার ধূপ হইবে; গগনই তাহার ফুলের ডালা হইবে। বিশ্বমানব তোমার রাধাকৃষ্ণ বিশাখা চিত্রা ও মধুমঙ্গল-রূপ হ-য-ব-র-লর মধ্যে প্রবেশ করিবে কেন? উহা যে তোমার ক্ষুদ্র সমাজের কতকগুলি আবর্জ্জনা। তোমরা কাঁদিয়া কাটিয়া নিজেদের কাছে সেগুলি বড় করিয়া তুলিয়াছ; বিশ্বসাহিত্যে সেগুলির প্রবেশাধিকারের স্পর্দ্ধা কর কেন?

তোমার সাধনা যদি সিদ্ধ হইয়া থাকে, তবে তোমার জাতীয় সংস্কার পৃথিবী গ্রহণ করিবে। যদি উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতে পার, যদি আরাধ্যের পদপ্রান্ত হইতে চিত্তের আবেগে প্রবাহিত করিয়া, সাধনার কমণ্ডলুতে পবিত্র করিয়া, সংযমের শিবজটা হইতে মুক্ত করিয়া, তোমার সংস্কার, তোমার জাতীয় ভাব পৃথিবীর দ্বারে দ্বারে আনিতে পার, তবে সেই ভক্তি-মন্দাকিনী স্বদেশ বিদেশের প্রত্যেক গৃহে গৃহে আসিয়া পঁহুছিবে। আল্লার সঙ্গে জিব্রেল ও পয়গম্বরের কথাবার্ত্তা জগতের এক বিপুল অংশের অধিবাসীরা শুনিয়া শুনিয়া এখনও ক্লান্ত হইতেছে না; অথচ সেই সকল সংস্কারের জন্মস্থান—আরব দেশ। পবিত্র আত্মার প্রভাবে মেরীর গর্ভে খ্রীষ্টের জন্ম, মারের সহিত বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তাহার পরাভব, বিশ্বের বহু স্থলের লোকেরা ক্রমাগত শুনিতেছে, এবং তাহার সুখ্যাতি করিতেছে; এমন কি, গ্রীক ও রোমক অলৌকিক উপাখ্যানমালা সমস্ত ইউরোপীয় সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত। যাঁহারা পৌরাণিক উপাখ্যানের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া ইংলণ্ডের সাহিত্যে নূতন ভাবের স্রোত বহাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারাও ত সে প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। শেলী "প্রমিথিয়সে"র কথা লইয়া কাব্য লিখিয়াছেন, কীট্‌স্ "হাইপীরিয়ন" লিখিয়াছেন, প্রাচীন ইংলণ্ডের প্রবাদ লইয়া টেনিসন "মর্ট ডি আর্থার" লিখিয়াছেন, সার গ্যালাহাডের "হোলি গ্রেল" দৃশ্য-দর্শনের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, স্বদেশের প্রাচীন সংস্কার লইয়া

শেলী "কুইন্ ম্যাব"-এর পুষ্পক-রথের বর্ণনা করিয়াছেন, এবং আর্থারের অলৌকিক উপাখ্যানমালায় টেনিসনের কবিত্ব এরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে যে, আমরা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া এখনও ক্লান্ত হইয়া পড়ি নাই। মূল কথা, যে জাতি শক্তিশালী, তাহারা স্বীয় দেশের আদর্শ লইয়া অপর জাতিকে পরাজিত করিবে। বিশ্বমানব শুধু গবাক্ষপথে আকাশের নক্ষত্র গণনা করেন না, এবং শরৎকালের সোনালী রৌদ্রকেই বিশ্বের চরম সৌন্দর্য্য বলিয়া মনে করেন না। জগতের কোন্ জাতি যুগ যুগ ব্যাপিয়া কোন্ সাধনা করিয়াছে, কোন্ সংস্কারকে উজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছে, তাহা শুনিবার জন্য বিশ্বমানবটির বিলক্ষণ কৌতূহল আছে। অনেক সময় সেই সংস্কার শুধু ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র জাতিগত থাকিয়া অবশেষে জগতের চিত্ত দখল করিয়া লইয়াছে। তাই ইস্রায়েলদের আব্রাহামের অধস্তন চৌদ্দপুরুষের নাম এখনও অর্দ্ধজগৎ বসিয়া বসিয়া মুখস্থ করিতেছে। তোমার যদি শক্তি থাকে, তবে তোমার দেশের সাধনাকে—সংস্কারকে—উজ্জ্বল করিয়া আঁকিয়া দেখাও। সায়ংবিহারী পক্ষিবিশেষের কণ্ঠে জাতীয় সাধনার নিন্দা না করিয়া,যে সাধনার ক্ষেত্রে তুমি এখন পর্য্যন্ত হামাগুড়ি দিতে শিখ নাই, তাহাতে একবার প্রবেশ করিবার চেষ্টা পাও। যাহাকে বিশ্বসাহিত্য বলিয়া পূজা করিতেছ, তাহা ভিন্ন দেশের একটি সংস্কারমাত্র। সেই সংস্কারের নিকট মাথা হেঁট করিয়া অর্ঘ্য দিতেছ, এবং ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যকে সেই বিশ্বসাহিত্য হইতে নিষ্কাশিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছ! সে ব্যবস্থা কে শুনিবে? মোল্লারা ইতিপূর্ব্বে দুর্গামণ্ডপ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা দিয়াছিল। নিজের ঘর ছাড়িয়া পরের দ্বারে ভিখারী হইতে যাইতেছ, সেখানে ভিখ্ মিলিবে না।

কাহারও কাহারও মুখে একটা অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়—বৈষ্ণব সাহিত্যটা কামশাস্ত্রমাত্র। যাঁহারা প্রেমের সাধনাকে বৈরাগ্যের সাধনা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা 'কামগন্ধ নাহি তায়' বলিয়া নির্ম্মল প্রেমকে মাথায় ধারণ করিয়াছেন, প্রেয়সীকে মাতা, পিতা ও গায়ত্রী বলিয়া পূজা করিয়াছেন, তাঁহাদের কবিতা হইল কামশাস্ত্র! প্রিয়ার প্রণয়ের মধ্যে জননী ও পিতার প্রেম আছে, এবং গায়ত্রীর পবিত্রতা আছে, এত বড় কথা যাঁহারা বলিয়াছেন, "ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, আছয়ে যে জন, কেহ না দেখয়ে তারে। প্রেমের এ রীতি, যে জন জানয়ে, সেই সে চিনিতে পারে।" এমন কথা যাঁহারা বলিয়াছেন, তাঁহাদের কবিতা হইয়াছে কামশাস্ত্র! "পিরীতি করিয়া ভাঙ্গয়ে যে।

সাধন অঙ্গ পায় না সে।" এমন কথা কোথাকার কোন্ কবি বলিতে পারিয়াছেন? "যাহাকে একবার ভালবাসিয়াছ,তাহাকে তোমার ছাড়িবার আর উপায় নাই; সে যাহাই করুক না কেন, তাহার ভালবাসা লইয়া থাক; কারণ, প্রেম বিনিময়ের সামগ্রী নহে, উহা মহাদান। একবার দিয়া তুমি তাহা ফিরাইয়া লইতে পার না। যদি ফিরাইয়া আন, তবে আর তোমার সাধনা হইবে না।"—এত বড় কথা যাঁহারা বলিয়াছেন,তাঁহাদের কবিতা হইতেছে কাম-শাস্ত্র! "মরম না জানে, ধরম বাথানে, এমন আছয়ে যারা। কাজ নাই সখি, তাদের কথায়, বাহিরে রহুন্ তারা। আমার বাহির-দুয়ারে কপাট লেগেছে, ভিতর দুয়ার খোলা।"—এমন সকল কথা যাঁহারা বলিয়াছেন, তাঁহাদের কবিতা হইতেছে কামশাস্ত্র! বিদ্যাপতির উপরই বেশী আক্রোশ। তাঁহার একটি কবিতায় রাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—"হে কৃষ্ণ! তুমি আমার মাথার ফুল, তুমি আমার চক্ষুর অঞ্জন, কণ্ঠের হার, তাহা হইতেও বেশী—পাখীর নিকট পাখ, মীনের নিকট জল যেরূপ—তুমি আমার তাহাই। তোমাকে ছাড়া আমি এক দিনও বাঁচিতে পারি না। তোমাকে ত আমি সব দিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু তুমি কে, আমি তাহা চিনিলাম না।" সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া সাধক সেই জ্ঞানাতীত দুর্ভেদ্য পরম প্রহেলিকার অসীমত্বকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া কাঁদিতেছেন—হায়! কাহাকে দিলাম? কে সে? আমার সরল বুদ্ধি দিয়া তাঁহাকে বুঝিলাম না, আমার সকল প্রাণ দিয়া তাঁহাকে ধরিতে ছুঁইতে পারিলাম না। "মাধব! তুঁহু কৈছে কহবি মোয়।" এই প্রশ্ন, সাধনান্তে সাধকের স্তব্ধ বিস্ময়কে একছত্রে আঁকিয়া দেখাইতেছে। এই সকল কবিতা হইতেছে কামশাস্ত্র! রাধা যেখানে কৃষ্ণের অশরীরী আবির্ভাব বিরহের তপস্যা দ্বারা হৃদয়ের নিভৃতে উপলব্ধি করিতেছেন, তাহা ভাবসম্মিলনের অপূর্ব্ব কবিতা। তিনি বলিতেছেন,—আমার অঙ্গ তাহার বেদী হইবে, এবং সেই বেদী আমি চোখের জলে ধৌত করিয়া আমার মাথার চুল দিয়া মুছিয়া রাখিব, আমার বক্ষের মতির হার আলিপনা হইবে, আমার হৃদয় মঙ্গলকলসস্বরূপ হইবে, তাহা দ্বারা প্রিয়কে সংবর্দ্ধনা করিয়া লইব। এখানে শরীর এবং অশরীরের ভেদ ঘুচিয়া গিয়াছে, জড় ও চৈতন্য এক হইয়াছে। ইহাই কি বিদ্যাপতির কামশাস্ত্র? চণ্ডীদাস বলিয়াছেন,—কৃষ্ণকে ভজনা করিতে যাইয়া "তোরা না হইবি সতী, না হবি অসতী, ফিরিবি লোকের মাঝে।" ধার্ম্মিকের বাহ্যবেশ ত্যাগ কর, গেরুয়া ও জপের মালায় দরকার নাই, ভিতরে খাঁটী থাকিবে, এবং দশ জনের এক জন

ছুঁইয়া কাজ করিবে; অথচ, "সিনান করিবি, জল না ছুঁইবি, ভাবিনি ভাবের দেহা।" জল না ছুঁইয়া স্নান করিবে, অর্থাৎ, সংসারের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবে, কিন্তু সংসারের কাদামাটী যেন গায়ে না লাগে। "ভাবিনি ভাবের দেহা"—দেহের জড়ত্ব ঘুচাইয়া উহাকে চিন্ময় করিয়া লইবে। এ সকল উচ্চ সাধনার কথা। যিনি প্রেম করিবেন, তাঁহার দেহকে "শুষ্ক কাষ্ঠসম" করিতে হইবে; অর্থাৎ, বহিরিন্দ্রিয়ের রস তাঁহাতে থাকিবে না। পুনঃ পুনঃ এই সকল উক্তির দ্বারা যাঁহারা প্রেমকে কঠোর তপস্যার বিষয়ীভূত করিয়াছেন, তাঁহাদের কবিতা কামশাস্ত্র নহে ত কি? যাহা বড়, তাহাকে কিছু বাদ দেওয়া চলে না, বড় জিনিসের ছোঁয়াচে রোগ নাই। গঙ্গায় শব ভাসিয়া যায়, কিন্তু পুকুরে কীট মরিলেই ভয় হয়। যে কবিতা সাধনার রসে পরিপুষ্ট, যাহার আদর্শ উচ্চতম, তাহা হইতে দুই চারিটি ভোগবিলাসের ছত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া কি দেখাইবে? তাহা হইলে "দর্শয়ন্তি শরন্নদ্যঃ পুলিনানি শনৈঃ শনৈঃ", এবং "মীনোপসন্দর্শিতমেখলায়াঃ" প্রভৃতি লেখার দরুণ বৃদ্ধ বাল্মীকিকে বর্জ্জন কর, ভীনাস্ অ্যাডোনিস্ ও লুক্রীস্ লেখার অপরাধে সেক্সপীরকে অদূরবর্ত্তী বৃক্ষের শাখায় ঝুলাইয়া দাও, এবং 'বালেন্দুবক্রাণ্যবিকাশভাবাৎ' প্রভৃতি লেখার জন্য কালিদাসের কুমারসম্ভবকে মাটী বলিয়া প্রতিপন্ন কর। কোনও কাব্যই বাদ পড়িবে না। রুচির বিষয়ে অতিরিক্ত সাবধান হইলে গৃহে গৃহে অরুচির গন্ধে শিহরিয়া উঠিতে হইবে। কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণের স্থূল কথা সূক্ষ্মকথার চিহ্নমাত্র। এ কথা আমি নিজে কল্পনা করিয়া লিখিতেছি না। বহু পাঠক বৈষ্ণব কবিতার স্থূল জিনিসটাতে তত্ত্বকথার আভাস পাইয়া থাকেন। একদিন শিবু কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে ঠাকুর-বাড়ীর শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও মহিলাবর্গের সম্মুখে "খণ্ডিতা" পালা গাহিয়াছিল। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকাহিনীর মধ্যে আধুনিক রুচি অনুসারে এই পালাটিই সর্ব্বাপেক্ষা শিথিল, কিন্তু শিবু প্রথমেই ভাবের এমন এক উচ্চগ্রামে তাহার সুর বাঁধিয়া লইয়াছিল যে, যত কিছু অশ্লীলতা, তাহা পবিত্র ভাবের জ্ঞাপক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এমন একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়াইয়া কথা বলা যায়, যেখানে শীলতার আধুনিক প্রচলিত বুলিগুলির মাথা ডিঙ্গাইয়া গেলেও কিছু গর্হিত হয় না। বিজ্ঞানের প্রকোষ্ঠে শবচ্ছেদকারীর হস্তে কুৎসিতের অভ্যন্তর প্রকটিত হয়, কিন্তু সেখানে কলঙ্কের ভাষা নিষ্কলঙ্ক। বৈষ্ণব সাধনার কবিতাও সেইরূপ। তাহাতে ভাষার কলুষ কল্পনা করা বিড়ম্বনামাত্র। আমি শুধু মহাজনগণের পদের কথাই বলিতেছি।

যেখানে ভাবজগতে সেরূপ সাধনা নাই, সেখানে অবশ্য কথার রুচি লইয়া সমালোচনা চলিতে পারে। এখনকার অনেক কবি ছদ্মবেশী কথা লিখিয়া চলিত রুচির মুখ রক্ষা করিয়া চলেন, কিন্তু সেই সকল শব্দের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত অতি জঘন্য। নির্লজ্জতা যেখানে নিজকে লোভনীয় করিবার জন্যই লজ্জাকে আশ্রয় করে, সেখানে ছদ্মবেশী লজ্জাকে সাহিত্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নয়। যাহাতে ভাবের উচ্চাঙ্গের পবিত্রতা নাই, অথচ যাহা আকারে ইঙ্গিতে বিলাসকে নির্দ্দেশ করে, তাহা ভদ্রসাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য নহে।

বৈষ্ণব কবির কবিত্ব—হঠাৎ বৃদ্ধ বয়সে জীবনে প্রথম দিন শুনিতে পাইলাম,—বৈষ্ণব কবিতায় কবিত্ব নাই! আমার এক জন ইংরেজ বন্ধু—যাঁহার মত লেখক আধুনিক কালে বড় বেশী নাই—এক দিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন—"বৈষ্ণবগণ হৃদয়ের সুকোমল ভাবের শেষ করিয়া গিয়াছেন, আর কিছু বাকী রাখেন নাই।" "চলে নীলশাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিতে মোর।" "প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।" "ঢল ঢল ঢল অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়।" এই সকল অশ্লীল পদের কবিত্বের প্রশংসা ত আধুনিক বঙ্গীয় বড় কবিদের মুখেই শুনিয়াছি। "রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেওয়া গরজন, রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।" কিংবা, "ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ ঝিণকি ঝাঁঝে, ডাহুকী সে গরজে" প্রভৃতির ভাষা লইয়া ত আধুনিক অনেক কবিই কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন; "মুখানি", "ফুয়ল", "লাবণি" প্রভৃতি বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট সাহিত্যের ভোজে উচ্চদরে বিক্রীত হইতেছে। এ সকলের মধ্যে ছিটাফোঁটা কবিত্ব অবশ্যই কিছু আছে। কিন্তু একটা কথা। বিদেশী কবিতার দুই ছত্র তুলিয়া 'ইয়া বাঃ!' 'কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ!' করিলেই সমালোচনা হয় না। কিংবা, বৈষ্ণব কবিতার দুইটি ছত্র তুলিয়া "এতে কি আছে?" বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিলেই সমালোচক সেই সকল কবিগণ অপেক্ষা দীর্ঘ হইলেন, এরূপ বলিতে পারি না। সমগ্র জিনিসটা দেখিবার শক্তি চাই। তাজমহল হইতে এক টুকরা কাচ, গঙ্গা হইতে এক বিন্দু জল, এবং অ্যাল্‌পাইন গিরিশিখরের একটি কাঁকর তুলিয়া নিয়া সেই সেই দ্রব্যের পরিচয় দেওয়া যেরূপ, এই সব সমালোচনাও সেইরূপ। কোনও কবি হয় ত সহসা এক ছত্রে একটি সুন্দর ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। হয় ত কেহ এক আঁচড়ে চমৎকার একটা ছবি আঁকিয়াছেন।—তাহা মুহূর্ত্তের কৌতুকের বস্তু ও আনন্দপ্রদ হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র জাতির সাধনার কেন্দ্রে যুগব্যাপিনী তপস্যায় যে কল্পতরু সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সমগ্রভাবে দেখিবার ও

দেখাইবার জিনিস। শুধু একটু পল্লব লইয়া তাহাকে দেখানো যায় না। কল্প-বৃক্ষের পত্র জিহ্বা দ্বারা লেহন করিবার শক্তি অনেকের থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার ফুলের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার মত চক্ষু ভগবান সকলকে দেন নাই।

আজ ইংরাজ জাতির কেহ সেক্ষপীয়রের নিন্দা করুক, ইংলণ্ডের মাটীতে সেই হতভাগ্যের স্থান হইবে না। আর তুমি জাতীয়তার বড়াই কর, অথচ তোমার যাহা বুঝিবার সাধ্য নাই, এমন সকল বিষয় লইয়া উচ্চদরের কথা শুনাইবার স্পর্দ্ধা করিতেছ! দেবতারা যেখানে প্রবেশ করিতে সাহসী নহেন, হঠকারিতার বলে সেইখানে যাইয়া আরাধ্যের টিকি ধরিতেছ! জাতীয় আদর্শকে খর্ব্ব করিয়া তাহা হেয় প্রতিপন্ন করাই তোমার জাতীয়তা! আর সর্ব্বংসহ আমাদের সম্পাদকবর্গ! গোচারণের মাঠের ন্যায় তাঁহাদের কাগজ পড়িয়া আছে, যে আছ, স্বচ্ছন্দে চরিয়া বেড়াও!

৩০শে আশ্বিন, ১৩২৪।
৮গোকুল মুন্সীর বাড়ী;
বগজুড়ী, পোঃ মত্ত, ঢাকা। — শ্রীচুণীলাল সেন।

নিধুবাবু।

[স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় লিখিত।]

কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের কবি-কীর্ত্তির বিশাল বিস্তৃতির কথা ছাড়িয়া দিয়া, অতি-মধ্যকাল ও অব্যবহিত মধ্যকালের কবিদিগের মধ্যে, অন্যে কি কথা, কবি-কঙ্কণ ও রায়গুণাকরের অপেক্ষাও নিধুবাবুর খ্যাতির বিস্তার বেশী। এ বিস্তার কেবল কবি-রঞ্জন রামপ্রসাদ সেনেরই সমতুল্য; এ কালের ঈশ্বর-গুপ্তাদির অপেক্ষা অত্যন্ত অনেক; পরন্তু, এই ইংরেজী আমলের কবি-কুলের সবগুলিকে জুড়িলেও নিধুবাবুর বিস্তৃতি হইতে বহু বহু দূরে থাকেন। কবি-কঙ্কণ মুকুন্দরাম ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র অপেক্ষাও নিধুবাবুর বিস্তার বেশী বলিয়াছি; তাহার কারণ এই যে, নিধুবাবু নিরক্ষরের নিত্য আবৃত্তির বিষয়।

নিধুবাবুর খ্যাতি, নিধুবাবুর নাম সমগ্র বঙ্গদেশে বিস্তৃত, বিপুল। নিধুবাবুর একটী গীতও না জানে, এমন বাঙ্গালী বিরল। আর নিধুবাবুর গান জানিয়া, গলায় সুর না থাকিলেও, প্রাণে প্রেমোদয় হইলে, সে গান গুণ্ গুণ্ করিয়া না গায়, এমন বাঙ্গালীও বেশী দেখি নাই। নবীন যুবক, পরিপক্ক প্রৌঢ়, স্ফূর্ত্তিবান

বৃদ্ধ, ভদ্র, ইতর, মার্জ্জিত, অমার্জ্জিত,—সকলেরই নিকট নিধুবাবু সমান সমাদৃত। ঘাটে, বাটে, বৈঠকে, লোকের মুখে, মজলিসে, মাফেলে, নির্জ্জনে—নিধুবাবু কোথায় নয়? নিধুবাবু সর্ব্বত্রই লোকের সঙ্গে—সাথে। কিন্তু, এই নিধুবাবু কে? নিধুবাবু কবি কি না?

নিধুবাবু কবি, না কি বলিব? কিন্তু নিধুবাবুর কাব্য লোকের মুখস্থ। তবে এখনকার নবীন কবিরা নিধুবাবুকে কবি না বলিলেও বলিতে পারেন। কারণ, নিধুবাবু গান রচিতেন, সে গান নিজে গায়িতেন, সে গান সকল লোকেই গায়, সে গান আবার টপ্পা গান; পুনশ্চ,সে গান বহুকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং এখনকার গীতি-কবিদের গণনায় গান-রচয়িতা নিধুবাবু কবি না হইলেও পারেন; কেন না, গীতিকাব্য অগৌণে গ্রন্থে পরিণত হইয়া পুস্তকবিক্রেতার আলমারীতে পচাই এখনকার নিয়মানুসারে প্রকৃত কবিতার পূর্ণ পরিচয়। নিধুবাবুর ভাগ্যে এমন ঘটনা ঘটে নাই। অতএব তিনি কবি কিসে, এবং কোন্ হিসাবে?

প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দায়। কিন্তু এখনকার গীতি-কবিদের সহিত নিধু-বাবুর কি এক বিন্দুও সৌসাদৃশ্যও নাই? বোধ হয়, একটু আছে। প্রণয়-সঙ্গীত, প্রতীচ্য মতেও, কবিত্বের উচ্চতর নিদান। সেক্সপীয়র, টেনিসন, ব্রাউনিং প্রভৃতি বড় বড় অতিবিখ্যাত কবিদিগের প্রসিদ্ধি প্রণয়গীতির জন্য কম নহে। নিধুবাবুও প্রণয়-গীতি রচিতেন। এখনকার নব্য কবিরাও প্রণয়-গীতি রচেন। তবে এঁদের গীত গাওয়া যায় না; নিধুবাবুর গান গীত হয়। পরন্তু, নিধুবাবু রচনা করিতেন টপ্পা; ইহারা রচেন তুক্কো। তুক্কোই বলি; কেন না, তাহা আয়তনে অনেক সময়ে টপ্পা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। নিধুর টপ্পা সংসারের সব লোকেই বুঝে, নবীন গীতি-কবিদের অঙ্গুষ্ঠপরিমিত তুক্কো শতকরা সাড়ে ৯৯ জনে বুঝে না। কবিদের নিজেরই সকল সময় তাহা বোধগম্য হয় না। নিধুবাবু ও নব্য বাবু কবি-সম্প্রদায়ে সাদৃশ্য ও পার্থক্য এই। একই ক্ষেত্রে, এবং একই রসে, নিধুর টপ্পা ও নবীন তুক্কো পাশাপাশি রাখিয়া তুলনায় সমালোচনা করিতে পারিতাম; কিন্তু স্থানে কুলাইবে না।

নিধুবাবুর গান সকলেই জানে; কিন্তু নিধুবাবু ব্যক্তিটী কে, তাঁহার পুরা নাম ও উপাধি কি, নিবাস কোথায়, বৃত্তি-ব্যবসায় কি ছিল; তিনি কোন্ জাতি ছিলেন, এমন কি, কোন্ সময়ের লোক ছিলেন; অনেকেই জানে না।

জীবনচরিত জানিয়াছি, তাহাও নহে। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক অনুসন্ধানে এ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। আসল কথা এই যে, তখনকার লোক এখনকার মত আপনাকে অতি বড় বলিয়া ভাবিত না; অত-বিয়োগ্রাফীও লিখিত না। আত্মজীবন গোপন রাখিয়া জীবনে কিছু কাজ করিয়া যাওয়াই তখন রীতি ছিল। নিধুবাবুও তাই করিয়াছিলেন। সুতরাং নিধুবাবু, খুব অনেক দিনের লোক না হইলেও, তাঁহার জীবন-বৃত্ত বড় বেশী লোকে জানে না।

নিধুবাবু কিঞ্চিৎ সংস্কৃত জানিতেন; পার্শী, উর্দ্দু, হিন্দীও জানিতেন; নিধুবাবু অল্প ইংরেজীও জানিতেন। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে বাঙ্গালী নিধুবাবু বলিতেন,—

নানান দেশে নানান ভাষা;
বিনা স্বদেশী ভাষা
মিটে কি তৃষা!

যখন "বাঙ্গালা সাহিত্য" বলিয়া একটা সোরগোল উঠে নাই, তখনকার এই আন্তরিক উক্তি নিধুবাবুর। এখন বাঙ্গালা সাহিত্যের হৈ চৈ রব। হৈ চৈ হয় কিন্তু ইংরেজীতে। খুঁটআখুরে বাঙ্গালীও ইংরেজীতে কাব্য লেখে।

নিধুবাবু বাঙ্গালার "সোরী মিঞা" বলিয়াও বিখ্যাত। সোরী মিঞা সুকবি; সুললিত ও সুমধুর হিন্দুস্থানী টপ্পার জন্মদাতা; সোরী মিঞা সুগায়ক, এবং সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। নিধুবাবুও ঠিক তাই। সুতরাং এই উপমা। পরন্তু, নিধুর টপ্পায় সোরীর টপ্পার আভা আমেজও আছে। নিধুবাবু সুগায়ক ছিলেন, কিন্তু গীতি তাঁহার ব্যবসায় ছিল না। তিনি কখনও ফরমাশী গীত রচিতেনও না; গাইতেনও না। তিনি ইচ্ছামত নিজ হৃদয়ের আবেগে গীত রচনা করিতেন, এবং সে গীত গায়িতেন। কখনও কাহারও আদেশে বা উপরোধে তৎকর্ত্তৃক একটী গানও গীত হয় নাই। কেহ তাঁহাকে গান গায়িতে বলিতে সাহসীই হইত না। রাজাই হউন, আর প্রজাই হউন, নিধুবাবু নিজে ইচ্ছা করিয়া না গায়িলে, তাঁহার গান কেহ শুনিতে পাইত না। নিধুবাবু আখড়ার আটচালায় বসিয়া সায়ংকালে স্বেচ্ছামত গান গায়িতেন, লোকে আসিয়া তাহা শুনিত, এবং শিখিত। শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি কলিকাতার বড় বড় বিখ্যাত ধনাঢ্য লোকেরা সে গান শুনিবার জন্য আটচালায় উপস্থিত হইতেন। নিধুবাবুর গান শুনিবার জন্য বর্দ্ধমানাধিপ

মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর একবার নিধুবাবুকে বর্দ্ধমানে আহ্বান করেন। নিধুবাবু শিষ্টাচারের সম্মানের সহিত সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এরূপ ঘটনা বিরল ছিল না। নিধুবাবু একবার কলিকাতার বিখ্যাত বাবু কৃষ্ণমোহন মল্লিকের সহিত জল-পথে বেড়াইতে যান। এই জল-যাত্রা সাত দিনব্যাপিনী হইয়াছিল। কিন্তু নিধুবাবু এই সাত দিনের মধ্যে একটীবারও গান করেন নাই। ইহাতেই বুঝুন, তাঁহার স্বভাবের এবং সঙ্গীতের স্বাধীনতা। কবি-হৃদয় আপন মনে আপন আবেগেই গায়িত; কখনও কাহারও মোশায়েবী করিত না; কবি-কীর্ত্তি ও সঙ্গীত-সুখ্যাতির জন্যও শশব্যস্ত ছিল না। কিন্তু এখনকার কবিরা এ অঙ্গে কিরূপ? এখনকার অনেক কবিই ত দেখিতে পাই, একটু সমালোচনার সুখ্যাতির জন্য, লোকের পাছে পাছে, প্রেসে প্রেসে ফেরেন। অথচ সুখ্যাতি-ঔদাসীন্য ও স্বাধীনতার ভান করিয়া ইঁহারাই আবার বলেন—"আপনার মনে আপনি গাই।"

নিধুবাবুর আসল নাম রামনিধি গুপ্ত। নিধুবাবু বৈদ্যবংশীয়। আদি-নিবাস ছিল তাঁহাদের হুগলী জিলার ত্রিবেণীর নিকট চাঁমতা গ্রামে। চাঁমতাতেই রামনিধির জন্ম হয়। জন্ম হয় খৃঃ ১৭৪২ অব্দে। পিতার নাম হরিনারায়ণ কবিরাজ। কবিরাজ মহাশয় বিষয়কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতার কুমারটুলীতে থাকিতেন। রামনিধি জন্মিবার সাত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বোরগীর [বর্গীর] ভয়ে বড় ভীত হয়। কলিকাতার অনেক লোক ধন প্রাণ লইয়া স্থানান্তরে গমন করে। হরিনারায়ণ কবিরাজও সেই সময়ে কলিকাতা ছাড়িয়া পল্লীবাস চাঁপতায় যান। সাত বৎসর পরে, কলিকাতায় শান্তি সংস্থাপিত হইলে, তিনি পুনর্বার সপরিবারে কুমারটুলীর ভবনে প্রত্যাগমন করেন।

পিতামাতার সঙ্গে সাত-বৎসর-বয়স্ক রামনিধি কলিকাতায় আসেন। কলি-কাতায় আসিয়া তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি প্রথমতঃ সংস্কৃত ও পার্সী পড়েন। প্রখরা বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি থাকাতে, অপেক্ষাকৃত অল্প দিনেই রাম-নিধির সবিশেষ পাঠোন্নতি হয়। তিনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বেশ উপযুক্ত হইয়া উঠেন। তাহার পর অল্পবিস্তর ইংরেজী শেখেন। ইংরেজী শিখিয়া সরকারী ইংরেজী সেরেস্তায় চাকুরী পান। প্রথমতঃ, ছাপরা কালেক্টরীর সেকেণ্ড-ক্লার্ক, এবং পরে তথাকার হেডক্লার্ক নিযুক্ত হন। কালেক্টরীর দেওয়ানী হইবার সবিশেষ সম্ভাবনা—সম্যক উপযুক্ততা ছিল। কিন্তু শয়তানীর ষড়যন্ত্র বা শ্যাস্তানীতে তাহা হয় না। বিষয়কার্য্যে তখন (এখনও কোন্ নয়?) তোষা-

মোদ ও উৎকোচাদির প্রভৃত প্রাচুর্ভাব ছিল। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ, তেজস্বি-স্বভাব, কবি-হৃদয় কাব্যামোদী রামনিধি সে পথে যাইবার লোক ছিলেন না। বিষয়কার্য্যের ব্যভিচারে বিরক্ত হইয়া রামনিধি কিছুকাল পরে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন। নিধুবাবু ছাপরা কালেক্টরীতে আঠার বৎসর কর্ম্ম করিয়াছিলেন। এই কালের মধ্যে যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তদ্দারা তাঁহার শেষ জীবন মধ্যবৃত্ত-গৃহস্থ-সুলভ স্বচ্ছলতায় চলিয়াছিল। কর্ম্ম ছাড়িয়া কলিকাতায় আসার পরেও নিধুবাবু দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘকাল তিনি কেবলমাত্র কাব্যের কোমলতর অঙ্গ সঙ্গীত-রচনা ও সঙ্গীত-চর্চ্চাতেই কাটাইয়াছিলেন। তিনি "হাফ আখড়াই" গীতির আবিষ্কর্ত্তা ও জন্মদাতা। সুপ্রসিদ্ধ নিধুর টপ্পা ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীতও আছে। ৯৭ বৎসর বয়সে নিধুবাবুর মৃত্যু হয়। তিনি সচ্চরিত্র, স্বধর্ম্মরত, নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহার বংশাবলী কুমারটুলীতে আছেন। বলা বাহুল্য, ইহা নিধুবাবুর অতি-সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী।

আলোচনা।

মিলনের অন্তরায়।

১

এবার বকরীদ পর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমানে রীতিমত দাঙ্গা হইয়াছে। হাঙ্গামার জের এখনও মিটে নাই। ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়, পর্ব্ব একটা অছিলা—হাম্ বড়া, কি তোম্ বড়া, ইহাই পরীক্ষার উপলক্ষ। আমরা বলি—হাম্‌ও বড়া নহে, তোম্‌ও বড়া নহে; যিনি বড়া, তিনি গোকুলে বাড়িতেছেন। বৃথা এ দ্বন্দ্ব কেন? হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের অন্তরায় দূর করিতে হইলে হিন্দুর অভিযোগে মুসলমানকে, এবং মুসলমানের অভিযোগে হিন্দুকে কর্ণপাত করিতে হইবে। উভয়ের অভিযোগ ন্যায়সঙ্গত হওয়া আবশ্যক—কেহ কাহারও অন্যায় আবদার সহ্য করিবে না। হিন্দু বনাম মুসলমানের বিরোধের কথা এখন থাকুক। হিন্দু বনাম হিন্দুর বিরোধের কথাই আজ বলিব। আগে ঘর, পরে পর।

হিন্দুসমাজে কায়স্থদের মধ্যে দুইটি দল হইয়াছে। এক দল উপবীত লইয়া 'ক্ষত্রিয়' হইয়াছেন; অপর দল যথাপূর্ব্বং শূদ্র। অর্থাৎ, এক দল উন্নতিশীল; অন্য দল স্থিতিশীল। এই ক্ষত্রিয়-কায়স্থদের সহিত বৈদ্যদের মনোমালিন্য আছে। প্রশ্ন—এ হাম্ বড়া, কি তোম্ বড়া। শূদ্র-কায়স্থদের দলটিও সামান্য শক্তিশালী নহে। উপবীত লইয়া আলোকে আসার চেয়ে পিতৃপিতামহের আঁধার কুটীরে পড়িয়া থাকাই সুখের বিষয়, ইহাই শূদ্র-কায়স্থদের বিশ্বাস। ক্ষত্রিয়-কায়স্থরা সকলকে ছাড়িয়া এখন ব্রাহ্মণ জাতির আভিজাত্য চূর্ণ করিবার জন্য

বদ্ধপরিকর হইয়াছেন—অসিদ্বারা নহে, মসীদ্বারা। ব্রাহ্মণ জাতির অপরাধ, তাঁহাদের সভা ও সমাজ অশাস্ত্রীয়-বোধে কায়স্থের উপনয়নের ব্যবস্থা দেন নাই, দিতেছেন না। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের সিদ্ধান্ত ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া যে সকল কায়স্থ উপবীত লইয়াছেন, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ তাঁহাদের সহিত সকল প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়-কায়স্থগণের হুঙ্কারের কারণ ইহাই। ও দিকে আবার নমঃশূদ্র জাতিরা বলিতেছেন,—'হিন্দুসমাজে আমাদিগকে জলচল জাতি বলিয়া গণ্য করা হউক'; যেহেতু, 'সংস্কারহীন অধঃপতিত পৌরাণিক চণ্ডাল জাতি হইতে আমরা অনেক শ্রেষ্ঠ।' ইহার উত্তরে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজ বলিতেছেন,—'তাই ত, তোমরা এত দিন ছিলে কোথায়? এই বংশগত জাতিবিচারের যুগে বর্ণাশ্রম-সমাজে কোনও জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। কাজেই এ জন্মে তোমরা যাহা আছ, তাহাই থাক; এ জন্মের সুকৃতির ফলে পরজন্মে তোমরা উচ্চ কুলে জন্মগ্রহণ করিও, আশীর্ব্বাদ করি।' কিন্তু এই কাষ্ঠ-আশীর্ব্বাদে কি নমঃশূদ্ররা, কি ক্ষত্রিয়-কায়স্থরা, কেহই সন্তুষ্ট নহেন; কারণ, ইঁহারা ইহজন্মের দেনা-পাওনা ইহজন্মেই শোধ করিতে চাহেন। সম্প্রতি নমঃশূদ্র জাতির এক সমাজপতি—গুরুট্রেণিং স্কুলের এক জন শিক্ষক—ক্ষত্রিয়-কায়স্থদের মুখপত্রিকা 'আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভা'র শরণাপন্ন হইয়া বলিতেছেন,—'আমার বাসস্থান বরিশাল, বরিশালে ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার নমঃশূদ্র বাস করিতেছে। আমি ও আমার সহকারীবর্গ (সহকারিবর্গ) সভাসমিতি করিয়া একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি। আমরা যাহা করিব, তাহাতে ঢাকা, খুলনা, ফরিদপুর বাধ্য। আমি প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু আমার আশা ফলবতী হইতেছে না। আমরা কতকগুলি ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। যদি লিখিতে আদেশ করেন, প্রবন্ধ পাঠাইতে পারি।' ইহা পড়িয়া মধুসূদনের কথাটি মনে পড়ে।—

'————যে মন
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।'

ক্ষত্রিয়-কায়স্থসমাজ যদি দয়া করিয়া নমঃশূদ্র জাতিকে জলচল করিয়া লয়েন ত লউন। 'ন্যায্য অধিকার' হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিতে নাই। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজ কিন্তু নমঃশূদ্রের এই 'ন্যায্য অধিকার'কে শাস্ত্রসম্মত অধিকার বলিয়া এখনও স্বীকার করেন নাই। সমাজে স্বস্থানে থাকিয়া যত উন্নত হইতে পার, হও;—ইহাই ব্রাহ্মণ-সমাজের সরল উপদেশ। কিন্তু ব্রাহ্মণসমাজের উপদেশ ক্ষত্রিয়-কায়স্থরা মানেন না; নমঃশূদ্রের ত কথাই নাই,—তাঁহারা একতাবদ্ধ হইয়াও এখনও যে অস্পৃশ্য। এই স্পৃশ্যাস্পৃশ্য-তত্ত্বের ও ক্ষত্রিয়ত্ববিচারের শক্তি আমাদের নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সাম্প্রদায়িক স্বার্থের প্রেরণায় উচ্চতর বর্ণের প্রতি অযথা কটূক্তিপ্রয়োগ না করিলে কি চলে না? ব্রাহ্মণ-জাতির কর্ত্তা যাঁহারা গুরুবাক্যের মত শিরোধার্য্য করেন না, ব্রাহ্মণের কাছে অনুকূল ব্যবস্থা না পাইয়া ব্রাহ্মণমাত্রেরই প্রতি তাঁহারা খড়্গহস্ত হইলেন কেন? অনেকেই জানেন, 'আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা' ক্রমাগতই ব্রাহ্মণবিদ্বেষের হলাহল উদ্গীরণ করিতেছেন। আজ তাহারই একটু পরিচয় দিব।

গত আশ্বিনের 'আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভা'য় শ্রীযুত ভোলানাথ ঘোষ 'বর্ম্মা'র 'বালবিধবা' আলোচনায় সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন,—'গোবিন্দলাল কায়স্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের কায়স্থবিদ্বেষের হলাহল গোবিন্দলালের শিরোদেশে বর্ষিত হইয়াছিল। কবিবর কায়স্থ-বিধবার ইহ ও পরকাল নষ্ট করিয়াছেন।...কুন্দনন্দিনীও ঐরূপ (রোহিণীর ন্যায়) বালবিধবা। তাহার চরিত্রেও কবিবরের কায়স্থ-বিদ্বেষ পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।' কোনও কোনও মুসলমান-লেখক ত পূর্ব্বেই সাব্যস্ত করিয়াছেন—বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে মুসলমান-বিদ্বেষ বড়ই প্রবল ছিল! এখন ক্ষত্রিয়-কায়স্থরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়িয়া তাঁহার কায়স্থ-বিদ্বেষের আবিষ্কার করিলেন। বাকি রহিলেন ব্রাহ্মণ। এখন ব্রাহ্মণরাও বলুন—বঙ্কিমচন্দ্র (ব্রাহ্মণ হইলেও) ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। প্রমাণ—চন্দ্রশেখরের শৈবলিনী-চরিত্র। ব্রাহ্মণপণ্ডিতরাও দুর্গেশনন্দিনীর অভিরাম স্বামী ও বিদ্যাদিগ্‌গজের চরিত্রাঙ্কনের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারেন—বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে কুচক্ষে দেখিতেন! নতুবা পুরুষ ও নারীর ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা সপ্রমাণ হয় না!

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—'উপন্যাস উপন্যাসই, উপন্যাস ইতিহাস নহে।' চিত্রগুপ্তের বংশতালিকা খুঁজিয়া উহাতে রোহিণী ও কুন্দনন্দিনীর নাম বাহির করিতে পারিলেও, 'আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভা'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন বাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে দোষ দিতে পারেন না; কারণ, 'সত্যঘটনামূলক' গল্প প্রকাশ করিতে তাঁহার কোনই আপত্তি নাই। রাম-সীতা, বা নল-দময়ন্তী, বা সাবিত্রী-সত্যবানের অনুরূপ চরিত্র লইয়া বাজারে 'সত্যঘটনামূলক' গল্প বাহির হইতেছে, এ কথা হলপ লইয়া বলিলেও কেহ বিশ্বাস করিবেন না। কোনও গল্পে গল্পের খাতিরে কোনও নায়ক বা নায়িকাকে যদি কোনও লোক হীনচরিত্র করেন, তবে তাহাতে লেখককেও হীনচরিত্র ভাবা সঙ্গত নহে। গল্প বা উপন্যাসের মূল ভাবের সহিত লেখকের প্রাণের যোগ থাকে। খণ্ড-চিত্রের মধ্যে লেখককে ধরিতে পারা যায় না। খণ্ড অখণ্ডেরই অংশ, খণ্ডেই অখণ্ডের প্রকাশ; কিন্তু খণ্ড অখণ্ডের পূর্ণপ্রকাশ নহে। সরল কথায়, একটি হাত বা একটি পা দেখিয়া একটি মানুষের স্বরূপ কল্পনা করা যায় না; সেইরূপ, একটি চরিত্রাঙ্কনের দিকে লক্ষ্য করিয়া লেখক সুবিচার করিয়াছেন, কি অবিচার করিয়াছেন, তাহার সিদ্ধান্ত করা যায় না। তাহার পর, 'ধার্ম্মিক স্বামীর হস্তে এই রমণীরত্ন সংসারের বহু মঙ্গল সাধন করিতে পারিত। কিন্তু নিষ্ঠুর সমাজের তাড়নায় তাহার জীবনস্রোত অধর্ম্মের দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল।' সম্পাদকীয় এই মন্তব্যটি পড়িলে, সহজেই বোধ হয়, কালীপ্রসন্ন বাবু রোহিণীকে উপন্যাসের নায়িকা না ভাবিয়া যেন কোনও কুলকন্যা ভাবিয়াই সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। এই ভুল পথে চলিয়াই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কায়স্থ-বিদ্বেষের আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমরাও কোনও উপন্যাসে রোহিণী বা কুন্দনন্দিনীর অনুরূপ চরিত্রের সমর্থন করি না। কেন করি না? বঙ্কিমচন্দ্র কায়স্থ-বালবিধবার ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিয়াছেন বলিয়া নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের কায়স্থ-বিদ্বেষ প্রবল ছিল বলিয়াও নহে। আমাদের মতে, উহা পড়িলে হিন্দু যুবক-যুবতীর মনে স্বভাবতঃই কলুষতাস্পর্শের সম্ভাবনা ঘটে। রোহিণী ও কুন্দ-

নন্দিনীর সম্বন্ধে আমাদের বলিবার অনেক কথা আছে ; কিন্তু সে সকল কথা এ প্রসঙ্গের আলোচ্য নহে। কারণ, ভোলানাথ বাবু বলিয়াছেন,—'বঙ্কিমচন্দ্রের' দুইখানি উপন্যাসে বিধবার দুইটি বিভিন্ন চিত্র নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। এক জন রোহিণী, অপরা কুন্দনন্দিনী।' এ বিষয়ে আমাদের মতভেদ নাই। কিন্তু কালীপ্রসন্ন বাবু ব্রাহ্মণ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছেন বলিয়াই আমাদিগকে এই নীরস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। শ্রীকালীপ্রসন্ন বাবু অবান্তর টীকার যোগ করিয়া কি ভাবে প্রবন্ধের উপাদেয়তা নষ্ট করিয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি।

ভোলানাথ বাবু বলিয়াছেন,—'রোহিণী বিধবা, কিন্তু বিধবার মত তাহার বেশভূষা কিছুই ছিল না ; তাহার অধরে তাম্বূলরাগ, হাতে স্বর্ণ-বলয়, পরিধানে লাল-ফিতা-পাড়িয়া ধুতি। আর মস্তকের উপর চারু বিনির্ম্মিতা কৃষ্ণকেশ কবরী।...রোহিণী বোধ হয় ভাবিতেছিল, সে (?) কি অপরাধে এ বালবৈধব্যযন্ত্রণা আমার অদৃষ্টে ঘটিল। আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে পৃথিবীর কোনও সুখভোগ করিতে পারিলাম না। আমার অসুখের জীবন রাখিয়া লাভ কি ?' ইহা হিন্দুরমণীর কথা নহে ; ইহা ব্রাহ্মসমাজের ধুয়া—একটা সংস্কার—Individualism বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র 'কায়স্থ বালবিধবা' রোহিণীর ব্যথায় ব্যথিত হইয়া এমন কথা লিখিয়া থাকিলে, আবার সেই রোহিণীকে প্রতিকূল অবস্থায় ফেলিয়া ডুবাইয়া মারিতেন না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি অপূর্ণ মানুষকে কোন্ পথে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে, রোহিণী-চিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই দেখাইয়াছেন। আমরা এইরূপ বুঝিয়াছি।

কিন্তু কালীপ্রসন্ন বাবু ইহারই মূলে টীকা করিয়াছেন,—'হিন্দুরমণীর এই বালবৈধব্য হিন্দুসমাজের কিম্বা (?) হিন্দুশাস্ত্রের বিধান নহে। আর্য্যমহিলাগণ স্বামীর মৃত্যু হইলে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারিতেন। আমরা পুত্রবতী বিধবার পুনর্ব্বিবাহ সমর্থন করি না। কিন্তু বাল-বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ আমরা সহস্রকণ্ঠে সমর্থন করিয়া থাকি। আধুনিক অধ্যাপক মহাশয়েরা বালবিধবাদের প্রতি এই ভীষণ দণ্ড কেন নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার উত্তর কে দিবে ?'

তাহার উত্তর আমরাই দিব। কিন্তু জানিতে চাহি,—

(১) কালীপ্রসন্ন বাবু 'সহস্রকণ্ঠে' যে ব্যবস্থার সমর্থন করেন, তাহা (সমগ্র হিন্দুসমাজ সমর্থন না করিলেও) কায়স্থসমাজের অনুমোদিত কি না ? অনুমোদিত হইলে, সেই ব্যবস্থা-অনুসারে উপবীতধারী কায়স্থগণ চলিতেছেন কি না ?

(২) বালবিধবাদের জন্য সমাজে যে ব্যবস্থা আবশ্যক, পুত্রবতী বিধবাদের পক্ষে সে ব্যবস্থা অনাবশ্যক কেন ? পুত্রবতী বিধবার পুত্র অকালে মারা গেলে সেই বিধবা পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারেন কি না ? পারিলে, কত বয়স পর্য্যন্ত সেইরূপ বিধবার বিবাহ হইতে পারে ? না পারিলে, না পারিবার হেতু কি ? কন্যাবতী বালবিধবার ব্যবস্থা কি ?

একটা ব্যবস্থার সমর্থন করিতে হইলে অনেক কথা ভাবিতে হয়। 'অধ্যাপক মহাশয়েরা' কেবল বাল-বিধবার বিবাহের পথ রুদ্ধ করেন নাই, সকল রকমের বিধবারই বিবাহ বন্ধ করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন বাবু এই সামাজিক ব্যবস্থাকে 'ভীষণ দণ্ড' মনে করেন; বাস্তবিক, ইহা দণ্ড নহে। চিকিৎসকগণ রোগীকে উপবাসের যে ব্যবস্থা দেন, তাহা দণ্ড নহে। হিন্দুর পক্ষে বাসনা একটা ব্যাধি। ব্রহ্মচর্য্য-সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য, বাসনাকে সংযত করা। রোহিণী বলিয়াছে,—'আমি অন্যের অপেক্ষা কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে পৃথিবীতে কোন সুখভোগ করিতে পারিলাম না।' ইহা ব্রহ্মচারিণী কায়স্থ বালবিধবার উক্তি নহে। মানসব্যভিচারিণী রোহিণীর এই আকাঙ্ক্ষিত সুখ—ইহকালের সুখ। হিন্দুর ধর্ম্ম ইহকালসর্ব্বস্ব নহে বলিয়াই রোহিণীর ভাবের সঙ্গে হিন্দুর ভাবের যোগ নাই। রোহিণী যে সুখের কল্পনা করিয়াছে, হিন্দুর সধবাদেরও ততটুকু সুখ-উপভোগের অবসর ছিল না। পূর্ব্বে পুরুষেরা গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিতেন; মেয়েরা গৃহেই গৃহধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা করিতেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে পুরুষের গুরুগৃহে শিক্ষার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও হিন্দুসমাজে আমাদের মাতা-ভগিনীরা গৃহে গৃহে ব্রতনিয়মের ব্যবস্থায় চলিয়া হিন্দুর চিরাচরিত আদর্শ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অন্নসমস্যার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া পুরুষ এখন স্কুল-কলেজের অর্থকরী বিদ্যা শিখিয়া 'পণ্ডিত' হইতেছেন। পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য শিকায় উঠিয়াছে। সমাজদেহের একটা অঙ্গ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এ সময়ে হিন্দুবিধবাগণকে পতিপ্রেমে পাগলিনী করিবার ব্যবস্থা না করাই ভাল।

বিধবার বিবাহ শাস্ত্র-অনুসারে চলিতে পারে কি না, এ বিষয়ে দুইটি মত আছে। শাস্ত্র-ব্যবসায়ী এক দল ব্রাহ্মণপণ্ডিত ইহার স্বপক্ষ, অপর দল ইহার বিপক্ষ। প্রথম দলটিই বড়, কিন্তু যুক্তি ও তর্কে কোনও দলই দুর্ব্বল নহেন। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই, বর্ত্তমান কালে সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইলে বিধবাবিবাহের সমর্থন করা চলে না। সে কালের সমাজে বরকর্ত্তাদের উৎপাত ছিল না, কন্যার পিতাকে বরকর্ত্তাদের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া ফিরিতে হইত না। সমাজের সে অবস্থার পরিবর্ত্তনে সে ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহাতে এ যুগের অধ্যাপক মহাশয়দিগকে ধমক দিলে চলিবে কেন? ধনীরা একটি কন্যার দশবার বিবাহ দিতে পারেন, কিন্তু সেরূপ সঙ্গতিশালী ধনী সমাজে কয় জন আছেন? ধনীর কন্যার সুখ বাড়ে, বাড়ুক; কিন্তু দরিদ্রের কন্যার দুঃখ বাড়িবে কেন? সাধারণ গৃহস্থদের কুমারী-কন্যা যাহাতে সহজেই পাত্রস্থা হইতে পারে, আগে তাহারই ব্যবস্থা কর, তাহার পর বিধবার কথা। বিধবা ত এক দিন পাত্রস্থা হইয়াছিল, তাহার পর নিয়তির চক্রে বিধবা হইয়াছে।

বিধবার দুঃখ আমরাও যথেষ্টপরিমাণে অনুভব করি, কিন্তু বিধবার মৃতপতিকে পুনর্জ্জীবিত করিবার সামর্থ্য নাই বলিয়াই আমরা নীরব থাকি। এ সংসারের সুখটুকু রামী শ্যামীর ন্যায় কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে পারেন, লউন; কিন্তু শ্যামী ত বিধবা হয়েন নাই, তবে রামী বিধবা হইলেন কেন? যাহার ধন আছে, তিনি অবাধে ধন বিতরণ করিতে পারেন; কিন্তু যাহার ধন নাই, সে কি বিতরণ করিবে? যে রমণীর পতি আছে, তিনি পতিসোহাগিনী হইয়া এ সংসারে চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারেন, করুন; কিন্তু যিনি পতি পাইয়াও হারাইয়াছেন, তিনি কি করিবেন? নূতন পতি গ্রহণ করিবেন? কই, পুত্রহারা জননী ত পুত্র

পান না! ব্যথাটা কি বিধবারই বেশী? হয় ত বেশী বলিয়াই তিনি নূতন পতি গ্রহণ করিবেন। কিন্তু কিসের বিনিময়ে? শত শত কুমারী-কন্যার অশ্রুর বিনিময়ে—শত শত দরিদ্র কন্যাকর্ত্তার অভিসম্পাতের বিনিময়ে। এই কারণেই আমরা বিধবা-বিবাহের সমর্থন করি না। হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত যাঁহার পরিচয় আছে, তিনিই এ কথা স্বীকার করিবেন। ইহা গোঁড়ামীর কথা নহে। বিধবাবিবাহের পাপপুণ্যের আলোচনা করিব না; কারণ, বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয়, এমন কথা বলি নাই। অতঃপর আশা করিতে পারি কি, 'আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভা' আর ব্রাহ্মণবিদ্বেষের পরিচয় দিয়া মিলনের অন্তরায় হইবেন না? তর্ক করিতে নিষেধ করি না, কিন্তু বৃথা তর্ক করিয়া, ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষের পরিচয় দিয়া কোনও লাভ নাই।

২

তারকনাথ-স্মৃতি।

'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে প্রকাশিত 'তারকনাথ-স্মৃতি'তে বর্ণলতা-প্রণেতা তারকনাথ বাবুর অনেক কথাই জানা গিয়াছে। ইহাতে তারকনাথ বাবুর চরিত্রে পঞ্চ ম কারের দুইটি পাওয়া গিয়াছে। প্রথম—মদ্য, দ্বিতীয়—মটন। পুরা তান্ত্রিক না হইলেও তিনি অবশ্যই সিদ্ধপুরুষ ছিলেন; নতুবা তাঁহার স্মৃতিকথা কর্ম্মযোগের পাশেই স্থান পাইত না। রাজেন্দ্রবাবু তারকনাথের স্মৃতি-কথা লিখিয়া অনেককেই হাসাইয়াছেন। এমন হাসির কথার একটু আলোচনা আবশ্যক।

তারকনাথ বাবু যে কেমন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা তাঁহার তেল না মাখিয়া সাবান-মাথার অভ্যাস হইতে এক জন মাংসবিক্রেতার প্রতি দিন মটন দেওয়া পর্য্যন্ত ঘটনায় বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। পাক করিত অবশ্যই এক বামুন ঠাকুর; নতুবা জাতি যাইবে যে! ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও পিতৃদেবের মৃত্যুকামনা, এই দুইটি ভাবই যে তারকনাথ বাবুর মনে সজাগ ছিল, তাহা তাঁহার একটি রসিকতা হইতেই আমরা জানিতে পারিয়াছি। যথা—তারকনাথ বাবু এক দিন তাঁহার স্মৃতিলেখককে বলিয়াছিলেন, 'রাজেন্দ্র, আমি বিনা-স্লিপারে (তিনি গ্রীসিয়েন স্লিপার ব্যবহার করিতেন) এক পা চলিতে পারি না। বাবার মৃত্যুর পর শুধু পায়ে কি করিয়া বেড়াইব?' রাজেন্দ্রবাবু ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, 'ভিতরে ও উপরে মখমল দেওয়া এক প্রকার চটী আছে, আপনার পিতার গঙ্গাস্নানের পর সেইরূপ জুতা এক যোড়া আনাইয়া দেওয়া যাইবে। দশটা দিন কোনও রকমে কাটাইয়া দিবেন।' তাহার পর তারকনাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'এক বৎসর বিনা-পাদুকায় থাকিতে হয় না?' রাজেন্দ্রবাবু নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিয়াছিলেন, 'শ্রাদ্ধের সময় এক যোড়া চটী জুতা ব্রাহ্মণকে দান করিলে ঐ ফাঁড়াটা কাটিয়া যায়।' তাহা শুনিয়া তারকনাথ বাবু বলিয়াছিলেন, 'তবে ব্রাহ্মণরা একটা উপায় করিয়া রাখিয়াছেন!' এই অনাবশ্যক রসিকতা-প্রচারের মূলে কি সাধু উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? অন্য কেহ তারকনাথ বাবুর সেই মজলিসে উপস্থিত থাকিলে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন, 'যে ব্রাহ্মণরা এই উপায় করিয়া রাখিয়াছেন,

তাঁহারা আপনাদেরই পূর্ব্বপুরুষ ; আর আপনাদের ন্যায় সাহেব ব্রাহ্মণের জন্যই আপনাদের দূরদর্শী পূর্ব্বপুরুষদের এই ফাঁড়া কাটাইবার ব্যবস্থা। নতুবা যে শাস্ত্রকারগণ রাজমুকুটকে তুচ্ছ বোধ করিয়া ভিক্ষার পাত্র সম্বল করিয়াছিলেন, তাঁহারা দুই চারি আনার চটী জুতার ভিখারী ছিলেন না।' ইহাতে আরও দুই একটি উৎকট রসিকতার পরিচয় আছে। তারকনাথ বাবু নির্ব্বংশ-অর্থে একবার bambooless শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহা শুনিলে সহরের ছোক্‌রা দোকানীদের—take take take, না take না take, একবার ত see (লউন বা না লউন, একবার দেখুন)—গ্রাহককে ভুলাইবার কথাটি মনে পড়ে। আর, স্ত্রীবিয়োগের পর পুনর্ব্বিবাহে অসম্মতি জানাইয়া কোনও মৃতদারের মুখে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের প্রথম শ্লোকের 'পরোপকৃতয়ে ময়া' যিনি এ যাবৎ না শুনিয়াছেন, তাহার কাছে এ রসিকতা অবশ্যই মৌলিক। রসিকরাজ পঞ্চানন্দের সহপাঠী যদি রসিকতার পরিচয় না দেন, তবে সে পরিচয় আর কে দিবে? বঙ্কিমযুগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের তালিকায় এমন লোকের নামও ত পাওয়া গিয়াছে, যিনি সাহিত্যসেবার প্রকৃষ্ট পরিচয় না দিতে পারিলেও, পরবর্ত্তিকালে 'হায় রে সেকাল' বলিয়া উর্দ্ধশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। যাহা হউক, তারকনাথ বাবুর রসিকতায় তাঁহার সহপাঠী বন্ধু ইন্দ্রনাথের মদ্যপানের কথাও আছে। ইহাতে তারকনাথের স্মৃতির গৌরব কতখানি বাড়িয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ প্রথম বয়সে মদ্যপায়ী ছিলেন কি না, জানি না ; কিন্তু তিনি সাহিত্যে ও সমাজে যে সুনাম রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তিনি আমাদের পূজার্হ। আমরা তাঁহাকে শেষ বয়সে দেখিয়াছি। সে সময়ে তাঁহার চরিত্রে ভণ্ডামীর কোনও লক্ষণই আমরা দেখি নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয়, চতুষ্পাঠী ও অতিথিশালা তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। কিন্তু তারকনাথ বাবু কি করিয়াছেন? রাসলীলায় যিনি আছেন, গিরি-গোবর্দ্ধনধারণেও তিনিই আছেন! ইন্দ্রনাথও মানুষ ছিলেন, তারকনাথও মানুষ ছিলেন। মানুষের পরিচয় দিতে হইলে, তাহার ভাল ও মন্দ দুই দিকেরই বিচার করিতে হয়। উইলসনের হোটেলের পরিচয় দিতে হইলে, কোন্ কোন্ বাঙ্গালীর সেই হোটেলে যাতায়াত আছে, তাহা না বলিলেও চলে ; বলিলে, সেই সেই বাঙ্গালীকে মাথা হেঁট করিতে হয় ; কিন্তু উইলসন কোম্পানীর গৌরব বৃদ্ধি হয় না। তারক-নাথ-স্মৃতিতে তারকনাথের কথাই বলা উচিত ছিল।

রাজেন্দ্রবাবু জানাইয়াছেন, 'নিজের ও পুত্রগণের পোষাক পরিচ্ছদের উপর তারকবাবুর বড় দৃষ্টি ছিল। তাঁহার দৃষ্টি ছিল—সাহেবী কোট-প্যাণ্টের দিকে। পুত্রগণ সকলেই যে ভবিষ্যতে L. M. S. হইবেন, এমন ধারণা তাঁহার ছিল কি না, জানিতে পারা গেল না। তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি উপায় যত করুন, সঞ্চয় কিছুই করিতে পারিতেন না ; এমন কি, ৫০০৲ টাকায় 'স্বর্ণলতা'র copyright বিক্রয় করিয়া স্ত্রীর অলঙ্কার গড়াইয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক, অনেক বড় লোকেরই বড় দৃষ্টি আমরা দেখিয়া আসিতেছি।

'ষ্টার থিয়েটারে স্বর্ণলতা' অধ্যায়ে প্রকাশ,—প্রবন্ধলেখক তারকনাথ বাবুকে বলিয়াছিলেন,—'আপনি যদি কখনও সেখানে (ষ্টার থিয়েটারে) 'সরলা'র অভিনয় দেখিতে যান, 'স্বর্ণলতা'র গ্রন্থকার বলিয়া আপনাকে সম্মান করিয়া রয়াল সীটে বসিতে আসন দেওয়া হইবে।' এ

কথার মূল্য কতটুকু, বুঝিলাম না। ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজারের সঙ্গে প্রবন্ধলেখকের এ সম্বন্ধে পত্রব্যবহার হইয়াছিল কি?

'বন্ধারে ডিনার পার্টি' অধ্যায়ে প্রকাশ,—পাছে কোনও নিষিদ্ধ মাংস খাইতে হয় বলিয়া প্রবন্ধলেখক তারকনাথ বাবুর বন্ধুগণের 'ফাষ্টে'র নিমন্ত্রণে যাইতে অস্বীকৃত হইলে, তারকনাথ বাবু বলিতেন,—'আমার কিন্তু বঙ্কিমবাবুর সহিত ঐ একটি বিষয়ে একমত আছে—পানাহারের সঙ্গে ধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই।' ইহাতে বুঝা যায়, তারকনাথ বাবুর পানাহারের সংযম ছিল না, কিন্তু তিনি 'ধার্ম্মিক' ছিলেন! যাহা হউক, প্রবন্ধলেখক প্রবন্ধের শেষে যখন তাঁহাকে 'অমরধামে' পাঠাইয়া দিয়াছেন, তখন হিন্দুর নিষিদ্ধ পানাহারের সহিত হিন্দুধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, সে আলোচনা শোভন হইবে না।

এখন তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চা-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ব্যক্তিত্ব ছাড়িয়া এইবার ব্যক্তির মতের কথাই বলিব।

তারকনাথ বাবু এক জন সাহিত্যসেবী ছিলেন; সুতরাং সাহিত্যালোচনায় তাঁহার মতামত জানা আবশ্যক। তাঁহার কোনও মত অসার হইলে, তাহাও জানা আবশ্যক। 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম' তিনি পছন্দ করিতেন না। উহা, তাঁহার মতে, 'কেবল ফাঁকা আওয়াজ, অন্তঃসারশূন্য।' 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম'-সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে (গত শ্রাবণের 'সাহিত্যে') আলোচনা করিয়াছি। নূতন কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। উপন্যাস-রচনায় তারকনাথের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের যে মতভেদ ছিল, তাহারই আলোচনা করিতেছি।

তারকনাথ বাবু বলিতেন,—'Fictions to please should wear the face of Truth,—বাস্তবজীবনে যে সমস্ত ঘটনাবলী নিয়ত সংসারে সংঘটিত হইতেছে, তাহা অবলম্বন করিয়া উপন্যাস রচনা করিলে বড় হৃদয়গ্রাহী হয়,—বঙ্কিমবাবু এই প্রথা অনুসরণ করেন নাই।' বাস্তবজীবনে যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি, কোনও উপন্যাসে সেইরূপ ঘটনাবলী সাজাইলে, তাহা অতি সহজেই সাধারণের প্রিয় হয়; কিন্তু তারকনাথ বাবুর ঐ মাপকাঠী উপন্যাসের একমাত্র মাপকাঠী নহে। বাস্তবজীবনে নারকীয় ঘটনারও ত অভাব নাই। কতকগুলি অসম্ভব ও অস্বাভাবিক ঘটনার সমাবেশে উপন্যাসের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অসম্ভব ও অস্বাভাবিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া কোন্ উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, তাহা ত আমরা দেখিতে পাই না। তারকবাবুর কথা এই,—'যে মুসলমান-নবাবের হারেমে খোজা প্রহরী ভিন্ন পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর পর্য্যন্ত প্রবেশনিষেধ, তাহাতে বঙ্কিমবাবু অবাধে জগৎসিংহকে প্রবেশ করাইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে—আবার নবাবপুত্রী দ্বারা তাহার সেবা করান—তাহা আবার গোপন নহে—নবাব কতলু খাঁর অনুমোদনে, এবং তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ওসমানের সমক্ষে আয়েসা বলিয়াছেন, "শুন ওসমান! আবার বলি, এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর"।' ইহাতে বুঝা যায়, উপন্যাসে তারকনাথ বাবুর দৃষ্টি বড়ই স্থূল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী ইতিহাস নহে উপন্যাস, ইহা বুঝিলে তিনি 'আয়েসা'র ব্যবহারে অস্বাভাবিকতার আরোপ করিতেন না। উপন্যাসে ইতিহাসের 'আয়েসা'কে খুঁজিতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। যে সেবাধর্ম্ম নারীত্বের গৌরব বৃদ্ধি করে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসের আয়েসাকে সেই ভাবেই গড়িয়াছেন। দুর্গেশ-

নন্দিনী-উপন্যাসে দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাঁহার আয়েসা তাঁহারই ওসমানকে বলিয়াছে, 'ওসমান! আমি ত স্বভাবতঃ রমণী, পীড়িতের সেবা আমার পরম ধর্ম্ম; না করিলে দোষ, করিলে প্রশংসা নাই।' ইহা নবাব কতলু খাঁয়ের দুহিতার কথা নহে, ইহা সেবাধর্ম্মিণী আদর্শ-রমণীর কথা। সেবাধর্ম্মিণী আয়েসাকে মূর্চ্ছিতা তিলোত্তমার সেবায় রত হইতে দেখা যায়। কতলু খাঁয়ের অন্তিমকালেও এই রমণীরত্নকে স্থির, গম্ভীর ও নিঃস্পন্দভাবে 'নিঃশব্দে পিতার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন'—'পুনঃ পুনঃ পানীয়াভিষিঞ্চন করিতেছেন' দেখিতে পাই। উপন্যাসের নায়িকা-হিসাবে সেবারতা আয়েসার পক্ষে জগৎ সিংহের সেবা করা অসম্ভব নহে, অস্বাভাবিকও নহে। কিন্তু জগৎসিংহ নবাবের অন্তঃপুরে অবাধে প্রবেশ করিলেন কেন? ইহার উত্তর দুর্গেশনন্দিনী-উপন্যাসেই আছে। ওসমানের সহিত আয়েসার ও জগৎ সিংহের সহিত ওসমানের কথোপকথনেই ব্যক্ত হইয়াছে, কতলু খাঁ ইচ্ছা করিয়াই জগৎ সিংহকে সাধারণ কারাগারে না রাখিয়া হারেমেই আশ্রয় দিয়াছিলেন। জগৎ সিংহের পিতা মানসিংহের সন্তোষ-উৎপাদনের জন্যই জগৎসিংহের প্রতি কতলু খাঁয়ের এই সদয় ব্যবহার। এই সদয় ব্যবহারের মূলে ছিল প্রবল স্বার্থ—মোগল সম্রাটের সহিত অনুকূল সন্ধির আশা। জগৎ সিংহের রূপের ফাঁদে পড়া নবাবনন্দিনী আয়েসার পক্ষে গর্হিত হইতে পারে, কিন্তু ঔপন্যাসিক সে জন্য দায়ী নহেন। ইহা বাস্তব-জগতেরই চিত্র। সেবাধর্ম্মিণী কোনও হিন্দুললনাও কোনও মুসলমানের রূপের ফাঁদে পড়িতে পারে, পড়িয়াও থাকে। ধনিকন্যা স্বর্ণলতা যদি দরিদ্র পাচকব্রাহ্মণ গোপালের প্রণয়ে মুগ্ধ হইতে পারে, তবে নবাবনন্দিনী আয়েসাই বা মহারাজ মানসিংহের পুত্রকে ভালবাসিবে না কেন? যে প্রেম একের সর্ব্বস্ব দান করে, উপন্যাসের আয়েসা সেই প্রেমেরই জ্বলন্ত ছবি। উপন্যাসের আয়েসা যখন বুঝিল, ওসমান তাহার হৃদয়দেবতার সহিত মিলনের পথে কণ্টক, তখনই সে সাময়িক উত্তেজনায় হৃদয়ের ভাব চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া ওসমানকে বলিল, 'শুন ওসমান! এই বন্দীই (জগৎসিংহই) আমার প্রাণেশ্বর।' পরক্ষণেই আয়েসা জগৎ সিংহকে বলিল, 'রাজপুত্র! তুমিও আমার অপরাধ ক্ষমা কর। যদি ওসমান আজ আমাকে মনঃপীড়িত না করিতেন, তবে এ দগ্ধ হৃদয়ের তাপ কখনও তোমার নিকট প্রকাশ পাইত না, কখনও মনুষ্যকর্ণগোচর হইত না।' পরে জগৎ সিংহের সহিত এ জগতে তাহার মিলন অসম্ভব বুঝিয়াও সে প্রেমের পাত্রেরই সুখ ও তৃপ্তির কামনা করিয়াছে; নিজের অলঙ্কার তিলোত্তমার অঙ্গে পরাইয়া বলিয়াছে, 'আমি যে রত্নগুলি দিলাম, অঙ্গে পরিও। আর আমার—তোমার সাররত্ন হৃদয়মধ্যে রাখিও।' বঙ্কিমচন্দ্র আয়েসার চরিত্রে যে ধৃতিবলের পরিচয় দিয়াছেন, যে সতীত্বের আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা ব্যঙ্গের বস্তু নহে।

তারকনাথ বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে দোষ দেখিয়াছেন, সে দোষের আমরা সমর্থন করি না; কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী' ত্রুটীহীন, এমন কথাও বলি না। বিমলা তিলোত্তমার বিমাতা, তাহা তিলোত্তমা না জানিলেও, বিমলা জানিত। তিলোত্তমার জন্য বিমলার দৌত্যে, হাসিঠাট্টায় ও রসিকতায় স্থানে স্থানে দুর্গেশনন্দিনীর সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বিমলাকে বুদ্ধিমতী নায়িকা গড়িয়াছেন; বিমলার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় 'দুর্গেশনন্দিনী'তে যথেষ্ট-

পরিমাণে আছে ; কিন্তু সকল কার্য্যে ও ব্যবহারে বিমলার বুদ্ধি পাশ্চাত্য নারীর আদর্শে চালিত হওয়ায় বাঙ্গালী পাঠকের মনে রসভঙ্গের আশঙ্কা আছে। প্রথম খণ্ডের ষোড়শ ও সপ্তদশ পরিচ্ছেদ দুইটি আমাদের ভাল লাগে না। তিলোত্তমা সম্বন্ধে জগৎ সিংহের সহিত বিমলার যে কথা হইয়াছে, তাহার উপযুক্ত স্থান কোনও দেবমন্দির নহে। উপন্যাসের আত্ম-প্রয়োজনে দেবমন্দিরেও প্রেমালাপ হইতে পারে ; কিন্তু দেবমন্দির ছাড়িয়া নিকটবর্ত্তী কোনও পর্ণকুটীরে বসিয়া প্রেমালাপের পথও যখন খোলা আছে, তখন হিন্দু-ঔপন্যাসিকের ঐ পথেই চলা উচিত। তাহার পর সপ্তদশ পরিচ্ছেদে তিলোত্তমার সহিত জগৎ সিংহের 'কোর্টসিপে'র ব্যবস্থাটি হিন্দু বাঙ্গালীর আদর্শের প্রতিকূল। কতলু খাঁয়ের চরদিগকে দুর্গের মধ্যে প্রবেশের সুযোগ অন্যরূপেও দেওয়া যাইতে পারিত। তিলোত্তমার গৃহে বীর জগৎ সিংহের বন্দী হওয়া অস্বাভাবিক নহে, অশোভন। ওসমানের আক্রমণের পূর্ব্বে মোগলসম্রাটের দূত-রূপেও জগৎ সিংহ গড়ের মধ্যে অবস্থান করিয়া বন্দী হইতে পারিত। আমরা অবশ্য উন্নত আদর্শের কথাই বলিতেছি ; কিন্তু ঔপন্যাসিক যাহা গড়েন নাই, তাহা না দেখিয়া, যাহা গড়িয়াছেন, তাহাই দেখিতে হইবে। এই কারণে বলি, 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস না হইলেও, উহাতে তারকনাথ বাবু আয়েসার যে রূপ দেখিয়াছেন, উহা আয়েসার প্রকৃত রূপ নহে, বিকৃত রূপ।

এখন তারকনাথ বাবুর 'Fictions to please should wear the face of Truth' মাপকাঠীতে তাঁহার তথাকথিত 'সর্ব্বজনপ্রশংসিত' স্বর্ণলতাকে মাপিয়া দেখিলে মন্দ হয় না। স্বর্ণলতা তাহাদের বংশের গুরুঠাকুর শশাঙ্কশেখর শর্ম্মার সম্মুখে গলায় 'ফাঁসি টানিবেন, এমন সময় বহির্বাটী হইতে এক প্রকাণ্ড আলোক দেখা গেল।...আলোক মুহূর্ত্তমধ্যে দশদিক ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।' ইহা পড়িয়া ডিটেকটিভ ঔপন্যাসিক পাঁচকড়ি বাবুর 'মনোরমা'কে মনে পড়ে। পলাইবার পথ নাই, এক হাত দূরে পুলিস দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু হঠাৎ মনোরমা অদৃশ্য হইল!—কেমন 'Face of Truth' 'wear' করে! নীলকমল যে বিদ্যাদিগ্‌গজের, এবং স্বর্ণলতা যে তিলোত্তমার ব্যর্থ অনুকরণ, একটু চেষ্টা করিলেই বুঝা যায়। প্রমদার নৌকাডুবিতে অধর্ম্মের যতই পরাজয় ঘোষিত হইয়া থাকুক, উহা অস্বাভাবিকতার পয়লা-নম্বরের দৃষ্টান্ত। মুদিখানায় ব্রহ্মজ্ঞানী যুবক দুইটির চিত্রের অস্বাভাবিকতা কিরূপে চাপা দেওয়া যায়? চিত্রে এবং বর্ণনায় কুমারী স্বর্ণলতার ক্রোড়ে মস্তক ন্যস্ত করিয়া টেনিস-শার্ট-পরা দরিদ্র পাচক ব্রাহ্মণ-যুবক গোপাল 'বাবু'র মূর্চ্ছা দেখিলে 'face of truth'এর ধাক্কা খাইয়া যে কোনও সাহিত্যরসিককে হতজ্ঞান হইতে হয়। কর্ম্মচ্যুত শশিভূষণের প্রতি খাতাকী রামসুন্দরের ও তাহার তিন জন সঙ্গীর ব্যবহার রসাধিক্যে স্বাভাবিকতার শিকল কাটিয়াছে। সরলা বাপের বাড়ী গেলে তাহার স্বামীর দুঃখ ত আর দূর হইবে না, কাজেই সে যায় না ; কিন্তু সরলার যে বাপের বাড়ী ছিল, তাহার পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না ; অথচ নীলকমলের তিন পুরুষের, এবং স্বর্ণলতার সাত পুরুষের সংবাদ উহাতে পাওয়া যায়। দাসীর সঞ্চিত অর্থে ভাগ-বসান অপেক্ষা বাপের বাড়ী যাওয়া ভাল ছিল কি না, গ্রন্থকার তাহার বিচার করেন নাই, কিন্তু মধ্যে মধ্যে পাঠককে সম্বোধন করিয়া বাজে কথায়

সময় কাটাইয়াছেন। যাহা হউক, সরলার চিত্র কল্পনার স্পর্শে মনোহর হইয়াছে। একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা খর্ব্ব হওয়ায় অধিকাংশ হিন্দু গৃহস্থকে কি শোচনীয় অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে, স্বর্ণলতা-উপন্যাসের প্রথম অংশে আমরা তাহারই সুচারু চিত্র দেখিতে পাই। ঐ চিত্রটুকু আমাদের প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া যায়। এই জন্যই আমরা 'স্বর্ণলতা'র সুখ্যাতি করি। থিয়েটার 'স্বর্ণলতা' হইতে 'সরলা'কেই লইয়াছে। বোধ হয়, তারকনাথ বাবু স্বর্ণলতাকে মারিয়া বড়ই বিব্রত হইয়াছিলেন; তাহার পর উপসংহার লিখিয়া সবটুকুই স্বর্ণলতা-নামে বাহির করিয়াছেন; সরলার মন্দিরে স্বর্ণলতাকে বসাইয়া ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো দেখাইয়াছেন। *

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘোড়ার চৌষট্টি ঘর ভ্রমণ।

এখন দাবা খেলা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়াছে। পুরাকালে ভারতবর্ষে এই খেলার বিশেষ চর্চ্চা ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে কলাবিদ্যার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এই খেলার আলোচনাও ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। আজকাল ইউরোপে এই ভারতীয় খেলার বিশেষ আদর। ইউরোপীয় দাবা খেলোয়াড় মর্ফি, টিচ্‌ম্যান, এণ্ডারসন্, লোয়েন্থর প্রভৃতি খেলোয়াড়ের নাম অতি প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের অনেক অদ্ভুত খেলা আছে। ইঁহারা কোনও কোনও খেলায় শত্রুপক্ষকে লোভ দেখাইয়া এক একটী করিয়া নিজের প্রায় সমস্ত বল ক্ষয় করিতে দিয়া, অবশেষে সামান্য বল লইয়াই বিপক্ষের রাজাকে মাৎ করিয়া দিয়াছেন। খেলার কৌশল এই যে, শত্রুপক্ষ এক একটী করিয়া বল ধ্বংস করিতেছেন বটে; কিন্তু নিজে সেই সঙ্গে ব্যূহজালের মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়া ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছেন। পল্ মার্ফ আজকাল অদ্বিতীয় দাবা খেলোয়াড়। তিনি চক্ষু বাঁধিয়া অনায়াসেই

* 'তারকনাথস্মৃতি' গত ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যার 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি প্রীতিকর না হওয়ায়, আমি এ সম্বন্ধে একটি আলোচনা লিখিয়া বিগত ১৫ই আশ্বিন ডাক-যোগে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' কার্য্যালয়ের পরিবর্ত্তিত ঠিকানায় পাঠাইয়াছিলাম। আলোচনাটি অমনোনীত হইলে, দয়া করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে ফেরত দিতে অনুরোধ করিয়া ঐ তারিখেই পত্রও দিয়াছিলাম। পরে ৩০শে আশ্বিন, আলোচনাটি দয়া করিয়া বেয়ারিং ডাকে ফেরত দিবার জন্য, পুনরায় পত্র দিয়াছি। কিন্তু এ যাবৎ (৫ই কার্ত্তিক) উহা ফেরত পাই নাই, প্রত্যুত্তরও পাই নাই। সুতরাং উহা 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র সম্পাদক মহাশয়ের হস্তগত হয় নাই, ইহাই আমার বিশ্বাস। সময়াভাবে আলোচনার নকল রাখি নাই, নূতন করিয়া লিখিয়া দিতে হইল।—লেখক।

দশ বার জন ভাল খেলোয়াড়ের সঙ্গে দাবা খেলিতে পারেন, এবং সকলকে অতি অল্প কালের মধ্যেই পরাস্ত করিয়া থাকেন।

বিলাতী মাসিক পত্রিকায় অনেকগুলিতে দাবা খেলার সমস্যা থাকে। দাবা খেলা আমাদের দেশ হইতে উৎপন্ন, এবং এখনও একটী জাতীয় খেলা বলিয়া প্রচলিত আছে; সেই জন্য দাবাখেলা সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের দেশীয় মাসিক পত্রিকায় প্রকাশের যোগ্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশে পুরাকাল হইতে দাবা খেলার একটী সমস্যা লইয়া কতক আলোচনা হইয়াছে। এই সমস্যাটী "ঘোড়ার চৌষট্টি ঘর ভ্রমণ"। অর্থাৎ ঘোড়া এক ঘর হইতে ক্রমাগত অন্য ঘরে যাইয়া দাবার ছকের চৌষট্টি ঘর বেড়াইয়া বেড়াইবে, অথচ এক ঘরে দুইবার যাইবে না।

ইউরোপীয় অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ এবং দাবা খেলোয়াড়েরা এই সমস্যার একটী সাধারণ মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছি, ডাক্তার রজেট এই বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার সেই গবেষণা আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পঠদ্দশায় দিন কতক আমি ইহার একটী সহজ মীমাংসা বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু অঙ্ক শাস্ত্রের দিক দিয়া প্রশ্নটী বিশেষ জটিল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। যাহা হউক, যদিও সাধারণ মীমাংসা বাহির হয় নাই, তথাপি দুই একটী বিশেষ মীমাংসা বাহির হইয়াছিল। যাহা হউক, এই বিশেষ মীমাংসা বাহির করা বিশেষ কঠিন কার্য্য নয়। যদিও ইহাতে কতকটা পরিশ্রম নিশ্চয়ই করিতে হয়, তথাপি ধৈর্য্য ও একাগ্রতা থাকিলে সকল কার্য্যের ন্যায় ইহাতেও সিদ্ধিলাভ ঘটে। পরে কর্ম্মোপলক্ষে অনেক স্থানে অনেক বন্ধুবান্ধবকে এই সমস্যার পূরণ করিতে দিয়াছিলাম, এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই সমস্যার পূরণ করিয়া দিয়াছেন। আশা করি, এই পত্রিকার পাঠকগণের মধ্যে যাঁহাদের এই বিষয়ে অনুরাগ আছে, তাঁহারাও এই সমস্যা তাঁহাদিগের নিজের পদ্ধতিতে পূরণ করিয়া ছাপাইবার জন্য পাঠাইয়া দিবেন। অনেক সমস্যা-পূরণ এক সঙ্গে পাওয়া গেলে বোধ হয় সাধারণ নিয়ম বাহির করা সহজ হইতে পারে। নিম্নে এই সমস্যা-পূরণের কতকগুলি মীমাংসা দেওয়া গেল। এই দেশে এই সমস্যা-পূরণের একটী মীমাংসা প্রচলিত আছে। সেটি সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ভাবে লিপিবদ্ধ,—

"হে কৃষ্ণ দ্বারকানাথ কাসি যাদবনন্দন।
মথুরেশ হৃষীকেশ ত্রাতা ভব জনার্দ্দন॥"

এই কবিতার অক্ষরগুলি প্রত্যেক ঘরে সাজাইবার জন্য একটী স্বতন্ত্র বচন আছে। এই বচনটী নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই বচন অনুসারে অক্ষরগুলি যথানিয়মে খেলার প্রত্যেক ঘরে সাজাইয়া লইয়া পরে "হে কৃষ্ণ দ্বারকানাথ" ইত্যাদি কবিতার দ্বারা ঘোড়া চালনা করিলেই ইহা সহজ হইয়া পড়িবে। বচন যথা :—

"থুষ্ণযীর্দ্দি নকাদনা,
কেনা মকৃ হ্নকাভসি,
দ্বারেশন্দ নযাথব,
ত্রান জশ হেতাবর।"

এখানে দেখা যাইতেছে যে, বচনটীর প্রত্যেক লাইনে আটটী করিয়া, অর্থাৎ চারি লাইনে ৩২টী অক্ষর আছে। কিন্তু খেলার ঘর সর্ব্বশুদ্ধ চৌষট্টিটী। নিম্ন কোষ্টক অনুসারে বচনটী দুইবার ধরিয়া লইয়া সাজাইলেই চৌষট্টিটী ঘরের সমস্তগুলিতেই অক্ষর সাজান হইবে। তৎপরে "হে কৃষ্ণ দ্বারকানাথ" কবিতা দ্বারা ঘোটক সঞ্চালন করিলেই বেশ চালিত হইবে।—

অক্ষর সাজাইবার নিয়ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

না	দ	কা	ন	র্দ্দি	যী	ষ্ণ	থু
সি	ভ	কা	হ্ন	কৃ	ম	না	কে
ব	থ	যা	ন	ন্দ	শ	রে	দ্বা
ব	র	তা	হে	শ	জ	ন	ত্রা
ত্রা	ন	জ	শ	হে	তা	র	ব
দ্বা	রে	শ	ন্দ	ন	যা	থ	ব
কে	না	ম	কৃ	হ্ন	কা	ভ	সি
থু	ষ্ণ	যী	র্দ্দি	ন	কা	দ	না

খেলার ঘরের সর্ব্বনিম্নে বাম দিকের প্রথম ঘর হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর দক্ষিণ দিকে থু, ষ্ণ, যী, র্দ্দি, ন, কা, দ, না, এই আটটী অক্ষর প্রত্যেক ঘরে পর পর সাজাইয়া বসাইয়া, পুনরায় উহার উপর লাইনের বাম দিকে প্রথম ঘর হইতে কে, না, ম, কৃ, হ্ন,কা, ভ, সি, আটটী অক্ষর বসাইয়া, পুনরায় তদূর্দ্ধ অর্থাৎ তৃতীয় লাইনের বাম দিক হইতে যথাক্রমে দ্বা, রে, শ, ন্দ, ন, যা, থ, ব, এবং চতুর্থ লাইনের বাম দিক হইতে ঐরূপ ত্রা, ন, জ, শ, হে, তা, র, ব অক্ষরগুলি বসাইলে, ৩২টী ঘর পূরণ হইল। তৎপরে ঘরখানিকে ঘুরাইয়া ঊর্দ্ধভাগকে নিম্ন দিকে আনিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়ম-অনুসারে সর্ব্ব নিম্নের বাম দিকের ঘর হইতে

ঐরূপ থূ, ষ্ণ, ষী, র্দ্দ, ন, ক্কা, দ, র্না, ইত্যাদি অক্ষরগুলি যথাক্রমে পর পর সাজাইলেই বাকী ৩২টী ঘর পূরণ হইল। এই বার "হে কৃষ্ণ দ্বারকানাথ" কবিতানুযায়ী ঘোড়া চালনা করিলেই ঘোড়া সহজেই ৬৪ ঘর ঘুরিয়া আসিবে।

এই নিয়মটী অঙ্কপাত করিয়া এইরূপে প্রকাশ করা যায়ঃ—

১	৩০	৯	২০	৩	২৪	১১	২৬
১৬	১৯	২	২৯	১০	২৭	৪	২৩
৩১	৮	১৭	১৪	২১	৬	২৫	১২
১৮	১৫	৩২	৭	২৮	১৩	২২	৫

এখানে ৩২শের চাল ঘরে আছে; তাহার পর হইতে ৩৩শের ঘরের চাল দাবার ছকের আর অর্দ্ধেকের ঠিক প্রথম ঘরে পড়িবে, এবং দাবার এই নীচের অর্দ্ধেক ছকের ঘোড়া ঠিক উপরের অর্দ্ধেক ছকের ন্যায় ঘুরিবে।

এই ঘোড়ার ৬৪ ঘর ভ্রমণের নিয়ম আমার বন্ধু এবং পরিচিতগণের মধ্যে কেহ কেহ জানাইয়াছেন, তাহা এই স্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি। বাবু সতীশচন্দ্র বসু যখন ধানবাদের মুনসেফ্ ছিলেন, তখন তিনি আমাকে এই নিয়মটী জানাইয়াছিলেনঃ—

১	৩২	১৫	১২	২৩	৩০	১৭	১০
৪৬	১৩	৬৪	৩১	১৬	১১	২৪	২৯
৩৩	২	৪৭	১৪	৬৩	২২	৯	১৮
৪৮	৪৫	৬	২১	৮	৫৫	২৮	২৫
৩	৩৪	৪৯	৬২	৫	২৬	১৯	৫৬
৪৪	৬১	৪	৭	২০	৩৯	৫৪	২৭
৩৫	৫০	৫৯	৪২	৩৭	৫২	৫৭	৪০
৬০	৪৩	৩৬	৫১	৫৮	৪১	৩৮	৫৩

বাবু প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী ষ্টীমার ষ্টেশনমাষ্টার, উলুবেড়িয়া, নিম্নলিখিত সমস্যা পূরণ করিয়া দিয়াছেন।

৭	৫৮	১৯	৩২	৯	৬০	২১	৩৪
১৮	৩১	৮	৫৯	২০	৩৩	১০	৬৩
৫৭	৬	৪৩	৪০	৬১	৬৪	৩৫	২২
৩০	১৭	৬	৫৩	৪৪	৪১	৬২	১১
৫	৪৬	৩৯	৪২	৫৫	৫২	২৩	৩৬

১৬	২৯	৫৪	৪৫	৩৮	২৫	১২	৫১
৪৭	৪	২৭	১৪	৪৯	২	৩৭	২৪
২৮	১৫	৪৮	৩	২৬	১৩	৫০	১

হাবড়া জিলার অন্তঃপাতী বাইনান-নিবাসী বাবু রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় নিম্নলিখিত ভাবে সমস্যার পূরণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর, এবং তিনি এক জন পাকা খেলোয়াড়।

৭	২৮	৯	২৪	১৩	২০	৩	২২
১০	২৫	৬	২৯	৪	২৩	১৬	১৯
২৭	৮	৩১	১২	১৭	১৪	২১	২
৩২	১১	২৬	৫	৩০	১	১৮	১৫

এই ঘরের অপরার্দ্ধ ঠিক পূর্ব্বার্দ্ধের মত হইবে।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু, "সিদ্ধ মলম" আফিস, কলিকাতা, ১৬—৯—০৯ তারিখের "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় যে একটী পূরণের নিয়ম বাহির করিয়াছেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

১	৫০	৫	১৪	৬৩	২৪	২৭	২২
৬	১৩	৬৪	৪৯	৪	২১	৪২	২৫
৫১	২	৭	৬২	১৫	২৬	২৩	২৮
৮	৬১	১২	৩	৪৮	৪১	২০	৪৩
১১	৫২	৯	১৬	৩৫	৪৪	২৯	৪০
৬০	৫৫	৫৮	৪৭	৩০	৩৯	৩৪	১৯
৫৭	১০	৫৩	৩৬	১৭	৩২	৪৫	৩৮
৫৪	৫৯	৫৬	৩১	৪৬	৩৭	১৮	৩৩

শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর, Principle of class নামক ইংরেজী পুস্তক হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে অগষ্টের "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় একটী সমস্যা-পূরণের নিয়ম বাহির করেন, তাহা এই :—

৪৮	৩৭	২৪	১১	৪৬	৩৫	২২	৯
২৫	১২	৪৭	৩৬	২৩	১০	৪৫	৩৪
৩৮	৪৯	৬২	৫৫	৬০	৫৭	৮	২১
১৩	২৬	১	৫৮	৬৩	৫৪	৩৩	৪৪
৫০	৩৯	১৪	৬১	৫৬	৫৯	২০	৭

১৬	২৯	৫৪	৪৫	৩৮	২৫	১২	৫১
৪৭	৪	২৭	১৪	৪৯	২	৩৭	২৪
২৮	১৫	৪৮	৩	২৬	১৩	৫০	১

হাবড়া জিলার অন্তঃপাতী বাইনান-নিবাসী বাবু রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় নিম্নলিখিত ভাবে সমস্যার পূরণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর, এবং তিনি এক জন পাকা খেলোয়াড়।

৭	২৮	৯	২৪	১৩	২০	৩	২২
১০	২৫	৬	২৯	৪	২৩	১৬	১৯
২৭	৮	৩১	১২	১৭	১৪	২১	২
৩২	১১	২৬	৫	৩০	১	১৮	১৫

এই ঘরের অপরার্দ্ধ ঠিক পূর্ব্বার্দ্ধের মত হইবে।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু, "সিদ্ধ মলম" আফিস, কলিকাতা, ১৬—৯—০৯ তারিখের "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় যে একটী পূরণের নিয়ম বাহির করিয়াছেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

১	৫০	৫	১৪	৬৩	২৪	২৭	২২
৬	১৩	৬৪	৪৯	৪	২১	৪২	২৫
৫১	২	৭	৬২	১৫	২৬	২৩	২৮
৮	৬১	১২	৩	৪৮	৪১	২০	৪৩
১১	৫২	৯	১৬	৩৫	৪৪	২৯	৪০
৬০	৫৫	৫৮	৪৭	৩০	৩৯	৩৪	১৯
৫৭	১০	৫৩	৩৬	১৭	৩২	৪৫	৩৮
৫৪	৫৯	৫৬	৩১	৪৬	৩৭	১৮	৩৩

শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর, Principle of class নামক ইংরেজী পুস্তক হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে অগষ্টের "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় একটী সমস্যা-পূরণের নিয়ম বাহির করেন, তাহা এই :—

৪৮	৩৭	২৪	১১	৪৬	৩৫	২২	৯
২৫	১২	৪৭	৩৬	২৩	১০	৪৫	৩৪
৩৮	৪৯	৬২	৫৫	৬০	৫৭	৮	২১
১৩	২৬	১	৫৮	৬৩	৫৪	৩৩	৪৪
৫০	৩৯	১৪	৬১	৫৬	৫৯	২০	৭

১৫	২	২৭	৪০	৫৩	৬৪	৪৩	৩২
২৮	৫১	৪	১৭	৩০	৪১	৬	১৯
৩	১৬	২৯	৫২	৫	১৮	৩১	৪২

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি আর একটী সমস্যা-পূরণের নিয়ম বাহির করেন, তাহা এই। তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত, কি অন্য কিছু হইতে সংগৃহীত, তাহা তিনি লেখেন নাই।—

২৪	১৩	৩৮	৫৩	২৬	১৫	৪০	৫৫
৩৭	৫২	২৫	১৪	৩৯	৫৪	২৭	১৬
১২	২৩	৫০	৪৭	৪	১৭	৫৬	৪১
৫১	৩৬	১	১৮	৫৭	৪৮	৫	২৮
২২	১১	৪৬	৪৯	৩২	৩	৪২	৫৯
৩৫	৬৪	১৯	২	৪৫	৫৮	২৯	৬
১০	২১	৬২	৩৩	৮	৩১	৬০	৪৩
৬৩	৩৪	৯	২০	৬১	৪৪	৭	৩০

আমিও চেষ্টা করিয়া এই সমস্যা-পূরণের দুইটী নিয়ম বাহির করিয়াছিলাম। তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

১	৩৬	২৭	৩০	২১	৪	২৫	৩২
২৮	৩৯	২	৩৫	২৬	৩১	২০	৫
৩৭	৬৪	২৯	৫২	৩	২২	৩৩	২৪
৪০	৪৩	৩৮	৬৩	৩৪	৫১	৬	১৯
৫৭	৬২	৪১	৪৪	৫৩	১৮	২৩	৫০
৪২	৪৫	৫৬	৫৯	১২	৯	১৬	৭
৬১	৫৮	৪৭	৫৪	১৭	১৪	৪৯	১০
৪৬	৫৫	৬০	১৩	৪৮	১১	৮	১৫

অন্যটী এইরূপ :—

১	২৪	৩৭	৪২	৩১	২৬	৩৫	৪৪
৩৮	৪১	৬৪	২৫	৩৬	৪৩	৩০	২৭
২৩	২	৩৯	৩২	২১	২৮	৪৫	৩৪
৪০	৬৩	২২	৩	৪৬	৩৩	২০	২৯
১৩	৪	৪৯	৬২	১৯	৬	৪৭	৫৬

৫০	৬১	১২	৫	৪৮	৫৫	১৮	৭
১১	১৪	৫৯	৫২	৯	১৬	৫৭	৫৪
৬০	৫১	১০	১৫	৫৮	৫৩	৮	১৭

নিম্নের সমস্যা-পূরণগুলি ইংরেজী পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে :—

১	৫২	১৫	৩৪	৩	৫০	১৭	৩৬
১৪	৩৩	২	৫১	১৬	৩৫	৪	৪৯
৫৩	৬৪	৩১	২৪	২৯	২৬	৩৭	১৮
৩২	১৩	৬২	২৭	৬০	২৩	৪৮	৫
৬৩	৫৪	১১	৩০	২৫	২৮	১৯	৩৮
১২	৪৩	৫৬	৬১	২২	৫৯	৬	৪৭
৫৫	১০	৪১	৫৮	৪৫	৮	৩৯	২০
৪২	৫৭	৪৪	৯	৪০	২১	৪৬	৭

অন্যটী এইরূপ :—

৩৭	৬২	৪৩	৫৬	৩৫	৬০	৪১	৫০
৪৪	৫৫	৩৬	৬১	৪২	৪৯	৩৪	৫৯
৬৩	৩৮	৫৩	৪৬	৫৭	৪০	৫১	৪৮
৫৪	৪৫	৬৪	৩৯	৫২	৪৭	৫৮	৩৩
১	২৬	১৫	২০	৭	৩২	১৩	২২
১৬	১৯	৮	২৫	১৪	২১	৬	৩১
২৭	২	১৭	১০	২৯	৪	২৩	১২
১৮	৯	২৮	৩	২৪	১১	৩০	৫

১২

১	১৮	৫৩	৩৮	১৫	৩০	৫১	৩৪
৫৪	৩৯	২	১৭	৫২	৩৩	১৪	৩১
১৯	৪	৩৭	৫৬	২৯	১৬	৩৫	৫০
৪০	৫৫	২০	৩	৩৬	৪৯	৩২	১৩
৫	২২	৫৭	৪৪	৯	২৮	৬৩	৪৮
৫৮	৪১	৮	২১	৬৪	৪৫	১২	২৭
২৩	৬	৪৩	৬০	২৫	১০	৪৭	৬২
৪২	৫৯	২৪	৭	৪৬	৬১	২৬	১১

৫০	৬১	১২	৫	৪৮	৫৫	১৮	৭
১১	১৪	৫৯	৫২	৯	১৬	৫৭	৫৪
৬০	৫১	১০	১৫	৫৮	৫৩	৮	১৭

নিম্নের সমস্যা-পূরণগুলি ইংরেজী পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে ঃ—

১	৫২	১৫	৩৪	৩	৫০	১৭	৩৬
১৪	৩৩	২	৫১	১৬	৩৫	৪	৪৯
৫৩	৬৪	৩১	২৪	২৯	২৬	৩৭	১৮
৩২	১৩	৬২	২৭	৬০	২৩	৪৮	৫
৬৩	৫৪	১১	৩০	২৫	২৮	১৯	৩৮
১২	৪৩	৫৬	৬১	২২	৫৯	৬	৪৭
৫৫	১০	৪১	৫৮	৪৫	৮	৩৯	২০
৪২	৫৭	৪৪	৯	৪০	২১	৪৬	৭

অন্যটী এইরূপ ঃ—

৩৭	৬২	৪৩	৫৬	৩৫	৬০	৪১	৫০
৪৪	৫৫	৩৬	৬১	৪২	৪৯	৩৪	৫৯
৬৩	৩৮	৫৩	৪৬	৫৭	৪০	৫১	৪৮
৫৪	৪৫	৬৪	৩৯	৫২	৪৭	৫৮	৩৩
১	২৬	১৫	২০	৭	৩২	১৩	২২
১৬	১৯	৮	২৫	১৪	২১	৬	৩১
২৭	২	১৭	১০	২৯	৪	২৩	১২
১৮	৯	২৮	৩	২৪	১১	৩০	৫

১২

১	১৮	৫৩	৩৮	১৫	৩০	৫১	৩৪
৫৪	৩৯	২	১৭	৫২	৩৩	১৪	৩১
১৯	৪	৩৭	৫৬	২৯	১৬	৩৫	৫০
৪০	৫৫	২০	৩	৩৬	৪৯	৩২	১৩
৫	২২	৫৭	৪৪	৯	২৮	৬৩	৪৮
৫৮	৪১	৮	২১	৬৪	৪৫	১২	২৭
২৩	৬	৪৩	৬০	২৫	১০	৪৭	৬২
৪২	৫৯	২৪	৭	৪৬	৬১	২৬	১১

	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০
২৬০	৫০	১১	২৪	৬৩	১৪	৩৭	২৬	৩৫	২৬০
২৬০	২৩	৬২	৫১	১২	২৫	৩৪	১৫	৩৮	২৬০
২৬০	১০	৪৯	৬৪	২১	৪০	১৩	৩৬	২৭	২৬০
২৬০	৬১	২২	৯	৫২	৩৩	২৮	৩৯	১৬	২৬০
২৬০	৪৮	৭	৬০	১	২০	৪১	৫৪	২৯	২৬০
২৬০	৫৯	৪	৪৫	৮	৫৩	৩২	১৭	৪২	২৬০
২৬০	৬	৪৭	২	৫৭	৪৪	১৯	৩০	৫৫	২৬০
২৬০	৩	৫৮	৫	৪৬	৩১	৫৬	৪৩	১৮	২৬০
	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	

শেষের সমস্যা-পূরণ শুধু দাবা খেলার সমস্যা-পূরণ নহে, উহা একটী ম্যাজিক স্কোয়ার (magic square) বটে; অর্থাৎ উহা পঞ্জিকায় যেমন ৩২শের ঘর পূরণ করা আছে, সেইরূপ আড়াআড়ি কিংবা লম্বালম্বি যোগ করিলে ২৬০ হইবে।

নিম্নে একখানি প্রচলিত ইংরেজী কাগজে প্রকাশিত একটী সমস্যা-পূরণের নিয়ম দিতেছি। ঐটী মনে রাখিবার একটী নিয়ম স্থির করিয়াছিলাম, সেটীও লিপিবদ্ধ করিয়া দিতেছি। প্রচলিত নিয়মটী এই ঃ—

৫৮	৩৫	৪	১৯	৫৬	৩৭	৬	২৩
১	১৮	৫৭	৩৬	৫	২২	৫৫	৩৮
৩৪	৫৯	২০	৩	৪০	৫৩	২৪	৭
১৭	২	৩৩	৬০	২১	৮	৩৯	৫৪
৬২	৪৭	১৬	২৯	৫২	৪১	১০	২৫
১৫	৩২	৬১	৪৮	৯	২৮	৫১	৪২
৪৬	৬৩	৩০	১৩	৪৪	৪৯	২৬	১১
৩১	১৪	৪৫	৬৪	২৭	১২	৪৩	৫০

দাবার ঘরগুলিকে এইরূপ ভাবে নিৰ্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে।—

ক ১	ক ৫	ক ৯	ক ১৩	খ ১	খ ৫	খ ৯	খ ১৩
ক ১৩	ক ১৪	ক ৪	ক ৮	খ ১৩	খ ১৪	খ ৪	খ ৮
ক ৬	ক ২	ক ১৬	ক ১২	খ ৬	খ ২	খ ১৬	খ ১২

ক ১৫	ক ১১	ক	ক ৩	খ ১৫	খ ১১	খ ৭	খ ২
ঘ ১	ঘ ৫	ঘ ৯	ঘ ১৩	গ ১	গ ৫	গ ৯	গ ১৩
ঘ ১০	ঘ ১৪	ঘ ৪	ঘ ৮	গ ১০	গ ১৪	গ ৪	গ ৮
ঘ ৪	ঘ ২	ঘ ১৬	ঘ ২২	গ ৬	গ ২	গ ১৬	গ ২
ঘ ১৫	ঘ ১১	ঘ ৭	ঘ ৩	গ ১৫	গ ১১	গ ৭	গ ৩

ঘরগুলিকে এইরূপ ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিবার প্রণালী যে অতি সহজ, একটু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। দাবা খেলার ৬৪ ঘর, ১৬ ঘর করিয়া ছকে চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই চারিটী ভাগে ক খ গ ঘ, এই চারিটী অক্ষর সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। প্রত্যেক ভাগের ১৬ ঘর নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য অক্ষরের পার্শ্বে ক খ দেওয়া হইয়াছে। প্রথম কোণের ঘর ক ১ হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহা হইতে ক ১ ক ২ ক ৩ ক ৪, এই চারিটী ঘোড়ার ঘর ঐ ছকের মধ্যে ঘুরিবে; তাহা পরে ক ১-এর পার্শ্বের ঘর ক ৫ নাম দিয়া ঘোড়ার চালক ক, ক ৬, ক ৭, ক ৮ ঘর নির্দ্দিষ্ট কর। তাহার পার্শ্বের ঘর ক ৯ হইতে ক ১০, ক ১১, ক ১২ ঘর নির্দ্দিষ্ট কর। এইরূপ অন্যান্য ঘর নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। এক্ষণে উপরে যে সমস্যা-পূরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা এই নূতন রূপ নির্দ্দিষ্ট ঘরের প্রণালী মতে সংজ্ঞা (notion) দ্বারা লিপিবদ্ধ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়।

ক ১০	ক ১১	ক ১২	ক ৯	খ ১০	খ ১১	খ ১২	খ ৯
গ ১০	গ ১১	গ ১২	গ ৯	ঘ ১০	ঘ ১১	ঘ ১২	ঘ ৯
ক ১৫	ক ১৪	ক ১৩	ক ১৬	খ ১৫	খ ১৪	খ ১৩	খ ১৬
গ ১৫	গ ১৪	গ ১৩	গ ১৬	ঘ ১৫	ঘ ১৪	ঘ ১৩	ঘ ১৬
ক ৭	ক ৬	ক ৫	ক ৮	ক ৭	ক ৬	ক ৫	ক ৮
গ ৭	গ ৬	গ ৫	গ ৮	ঘ ৭	ঘ ৬	ঘ ৫	ঘ ৮
ক ৪	ক ১	ক ২	ক ৩	খ ৪	খ ১	খ ২	খ ৩
গ ৪	গ ১	গ ২	গ ৩	ঘ ৪	ঘ ১	ঘ ২	ঘ ৩

এই বিবরণে দেখা যাইবে যে, ক-এর শেষে যে যে সংখ্যা, তাহা খ গ-এর সংখ্যা হইতে অভিন্ন; অতএব, ক-এর শেষের সংখ্যাগুলি স্মৃতিগোচর থাকিলেই এই সমস্যা-পূরণ স্মৃতিপথে থাকিবার কোনও অসুবিধা নাই। ক-এর সংখ্যাগুলি এইরূপ :—

ক ১০	ক ১১	ক ১২	ক ৯
ক ১৫	ক ১৪	ক ১৩	ক ১৬
ক ৭	ক ৬	ক ৫	ক ৮
ক ৪	ক ১	ক ২	ক ৩

ক-এর এই সংখ্যাগুলির মধ্যেও নিয়ম আছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় লাইনের সংখ্যার যোগফল ২৫। প্রথম লাইনের সংখ্যা হইতে দ্বিতীয় লাইনের সংখ্যা নিরূপণ করিতে পারা যায়। দ্বিতীয় লাইন ও তৃতীয় লাইন সংখ্যার বিয়োগফল ৮। ইহা হইতে তৃতীয় লাইনের সংখ্যা অনায়াসে জানা যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনের সংখ্যা ঘোড়ার চালে অবস্থিত থাকিলে, তাহার যোগফল ৯। অতএব প্রথম লাইনের সংখ্যা ১০, ১১, ১২, ৯ উহা হইতে ক্রমশঃ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনের সংখ্যা উদ্ধার করা যায়। এই সামান্য নিয়মটী মনে রাখিলেই এই সমস্ত সংখ্যা-পূরণ মনে রাখা অতীব সহজ। আশা করি, 'সাহিত্যে'র পাঠকগণ মৌলিক উপায় দ্বারা এইরূপ সমস্যা-পূরণের নিয়ম প্রকাশ করিয়া দাবাখেলার অনুরাগী ব্যক্তিগণের চিত্তবিনোদন করিবেন।

শ্রীসরসীলাল সরকার।

দক্ষিণ-ভারত।

মান্দ্রাজ হইতে কঞ্জিবরম প্রায় পাঁচ ঘণ্টার পথ। বেলা দুইটার সময় আমরা চিঙ্গলপৎ জংশনে পঁহুছিলাম। এখানে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয়। চিঙ্গলপৎই একটী তীর্থস্থান—এখান হইতে পাঁচ ছয় মাইল দূরে পক্ষিতীর্থ অবস্থিত। কিন্তু সেখানে যাইবার আমাদের সুবিধা হয় নাই। আমরা কঞ্জিবরম অভিমুখে চলিলাম। বেলা চারিটা বাজিল। দূরে দুইটী গোপুরমের উচ্চ চূড়া নয়নগোচর হইল। বুঝিলাম, আমরা কঞ্জিবরমের নিকটে আসিয়াছি। গাড়ী ষ্টেশনে আসিল। আমরা গাড়ী হইতে নামিলাম। এক জন পাণ্ডা ভাল ঘর দেখাইয়া দিবে বলিয়া আমাদের সঙ্গে চলিল। কাঞ্চীনগর দুই ভাগে বিভক্ত—শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী। শিবকাঞ্চী ষ্টেশনের নিকটে। আমরা সেখানেই থাকিব, স্থির করিলাম। কাঞ্চীর পথগুলি অতি সুন্দর। পরিষ্কৃত প্রশস্ত পথগুলি ঋজুভাবে বিস্তৃত। পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষের শ্রেণী—সাধারণতঃ নারিকেল বৃক্ষ। বৃক্ষশ্রেণীর পর একটু ব্যবধান, তাহার পর বাড়ীগুলি পরস্পর সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। বড় বাড়ী বেশী দেখিলাম না। রাস্তার ধারে জলের কল। সেখানে বিচিত্র-বস্ত্র-পরিহিত তামিল-রমণীগণ কলসী লইয়া জল

আহরণ করিতেছে। পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষের ছায়ায় ছেলে মেয়েরা খেলা করিতেছে। নগরের সুপ্রশস্ত পথগুলি "নগরেষু কাঞ্চী" এই বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতেছিল।

অনেক অনুসন্ধান করিয়া আমরা একটী বাসা পাইলাম। বাসাটি দোতালা,—এবং শিবকাঞ্চীর বৃহৎ গোপুরমের সন্নিহিত। নীল আকাশের পটে গোপুরমের সমুন্নত শ্রী আমরা বাসায় বসিয়াই দেখিতে পাইতাম। গোপুরমের সম্মুখস্থ প্রস্তরগঠিত চত্বরের উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্যও এখান হইতে দেখা যাইত। সন্ধ্যাবেলায় নহবৎ বাজিত, গোপুরমের সর্ব্বাঙ্গে আলোক প্রজ্বলিত হইত, এবং মন্দির-যাত্রীদিগের ভিড়ে সম্মুখস্থ সুবিস্তৃত পথ জনাকীর্ণ হইত—সে সময় সকলের হৃদয় আপনা হইতেই ভক্তি ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইত।

শিবকাঞ্চীর এই সুবৃহৎ মন্দিরে একাম্রনাথ নামক শিবলিঙ্গ বিরাজিত। মন্দিরের চারি পার্শ্ব উচ্চ প্রস্তরগঠিত প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ৫০০।৬০০ গজ হইবে। এই প্রাচীরের দক্ষিণে ও পশ্চিমে প্রবেশদ্বারের উপর দুইটি গোপুরম। দক্ষিণের গোপুরমটিই সমধিক উচ্চ। ইহা কাঞ্চীর মধ্যে উচ্চতম গোপুরম, এবং দক্ষিণ-ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ গোপুরমগুলির মধ্যে অন্যতম। গোপুরমের চিত্র অনেকেই হয় ত দেখিয়াছেন। ইহা সমচতুষ্কোণ ভিত্তির উপর নির্ম্মিত। শিবকাঞ্চীর বৃহৎ গোপুরমে সর্ব্বশুদ্ধ এগারটি তল আছে। উপরের দিকে ক্রমশঃ আয়তন কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্র চতুষ্কোণ। হিন্দু স্থপতিবিদ্যার বিশিষ্ট লক্ষণ arch বা খিলানের অভাব। দক্ষিণ-ভারতের গোপুরম ও মন্দিরগুলিতেও কোথাও খিলান নাই। এই গোপুরমের প্রতি তলের মধ্যদেশে জয় ও বিজয়ের মূর্ত্তি।

এতদ্ব্যতীত আরও মূর্ত্তি ও শিল্পকার্য্য বিদ্যমান। গোপুরম দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে দুই তিনটি সরোবর দেখা যায়। একধারে সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট একটী দালান। সংস্কারাভাবে ইহা ভগ্নপ্রায় হইয়া গিয়াছে। মূল মন্দিরের সম্মুখে একটী বিস্তৃত চত্বর। তাহার স্তম্ভগুলি নানা প্রকার কারুকার্য্যে খচিত। অশ্ব সম্মুখের পা দুইটী তুলিয়া প্রায় দাঁড়াইয়া আছে, এবং তাহার পৃষ্ঠে যোদ্ধৃবেশে অশ্বারোহী—এই মূর্ত্তিটি দক্ষিণ-ভারতের স্তম্ভগুলির উপর প্রায়ই উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যাবেলায় এই সকল স্তম্ভগুলি এবং দ্বারপথ আলোকমালায় সজ্জিত হয়; তখন দৃশ্য অতি মনোহর বোধ হয়। মন্দিরের মধ্যে একটী বৃহৎ পিত্তলনির্ম্মিত বৃষভ-মূর্ত্তি। দক্ষিণ-ভারতের পাঁচটী প্রসিদ্ধ স্থানে ক্ষিতি, অপ্,

তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতের পাঁচটী শিবলিঙ্গ আছে। কাঞ্চীতে ক্ষিতি-মূর্ত্তি। এই জন্য এখানে শিবলিঙ্গ জল বা দুগ্ধ দ্বারা অভিষিক্ত হয় না। মন্দিরের অভ্যন্তরে এক স্থানে এক অতি প্রাচীন আম্র বৃক্ষ আছে। শোনা যায় যে, ইহার চারি শাখায় চারি প্রকার ভিন্ন আস্বাদনের ফল ধরিয়া থাকে। এই আম্রবৃক্ষ হইতেই মহাদেবের নাম একাম্রনাথ হইয়াছে। বিমান মন্দিরের চারি পাশে বারাণ্ডায় অসংখ্য শিবলিঙ্গ বিরাজিত।

শিবকাঞ্চীতে কামাক্ষীদেবীর মন্দির অতি প্রাচীন। দক্ষিণদেশীয় অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় ইহাও উচ্চ প্রাচীর দিয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত। সুপ্রশস্ত বাঁধান প্রাঙ্গণের মধ্যে পুষ্করিণী, মণ্ডপ ও বিমান মন্দির বিরাজিত। এখানে একটী মন্দিরের মধ্যে জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে। কামাক্ষী-দেবীর মূর্ত্তি,—বিশেষ করিয়া তাঁহার বহুপুষ্পাভরণ-ভূষিত, ভোগমূর্ত্তি * দেখিলে হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। মা যেন অল্প অল্প হাসিতেছেন। তাঁহার সেই ঈষৎ-স্মিতবিকশিত বদন হইতে করুণা ও প্রসন্নতা যেন ঝরিয়া পড়িতেছে।

শিবকাঞ্চী হইতে বিষ্ণুকাঞ্চী প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। উভয় স্থান দীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত রাজপথ দ্বারা সংযুক্ত। পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী, এবং তাহার পশ্চাতে সুবিন্যস্ত গৃহশ্রেণী। বিষ্ণুকাঞ্চীর মন্দিরও অতিশয় প্রাচীন। এখানে শতস্তম্ভবিশিষ্ট একটী মণ্ডপ আছে। কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভগুলির উপর অশ্বারোহীর মূর্ত্তি, এবং নানা প্রকার জীব জন্তুর মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। এই মণ্ডপের শিল্পকার্য্য অতি উৎকৃষ্ট। বিষ্ণুকাঞ্চীর বিগ্রহের নাম বরদরাজস্বামী। অন্ধকার প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া আমরা মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নানালঙ্কারশোভিত বৃহৎ বিষ্ণুমূর্ত্তির সম্মুখে আমরা নীত হইলাম। দর্শনানন্তর অন্যান্য ক্ষুদ্র বিগ্রহ দেখিয়া আমরা ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীরঙ্গম যাইবার পূর্ব্বে রামানুজ কয়েক বৎসর বিষ্ণুকাঞ্চীতে বাস করিয়া-ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী উভয় স্থানই দর্শন করিয়া-ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডে দেখিতে পাই—

---

* দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলিতে সাধারণতঃ দুইটী করিয়া মূর্ত্তি থাকে। একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত অচল মূর্ত্তি, আর একটী ধাতুনির্ম্মিত ভোগমূর্ত্তি। উৎসবাদির সময় এই ভোগমূর্ত্তিই বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়।

শিবকাঞ্চী আসি কৈল শিব-দরশন।
প্রভাতে বৈষ্ণব কৈল শাক্ত শৈবগণ॥
বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিল লক্ষ্মীনারায়ণ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন॥
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত বহুত করিল।
দিন দুই রহি লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈল॥

কাঞ্চীতে দুই দিন থাকিয়া আমরা বিকালের ট্রেণে তাঞ্জোর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। চিঙ্গলপৎ ষ্টেশনে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া Ceylon Boat mailএ আরোহণ করিলাম। এই ট্রেণ মান্দ্রাজ নগরী হইতে লঙ্কাযাত্রী-দিগকে লইয়া রামেশ্বর দিয়া পরবর্ত্তী ষ্টেশন ধনুষ্কোটি পর্য্যন্ত গিয়া থাকে। সেখানে ষ্টীমার (Ceylon Boat) যোগে লঙ্কাদ্বীপ দুই ঘণ্টার পথ। সমস্ত রাত্রি ট্রেণে কাটিল। প্রত্যূষে গাড়ী তাঞ্জোর ষ্টেশনে থামিল। ষ্টেশনের খুব নিকটেই নবনির্ম্মিত তাঞ্জোর-রাজ ছত্রমের প্রাসাদতুল্য দ্বিতল অট্টালিকা। এখানে থাকিবার কিছুমাত্র অসুবিধা নাই। আহারের বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হইয়াছিল। কিন্তু পরে আমাদের মনে হইয়াছিল যে, হোটেলের সন্ধান লইলে আমাদের কম কষ্ট হইত। দক্ষিণ-যাত্রিগণ হোটেলের সন্ধান লইলে অনেক অসুবিধা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন। কলিকাতার হোটেলগুলি সাধারণতঃ বেশ পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন নহে। তাহার পর নানা অখাদ্য থাকে বলিয়া নিষ্ঠাবান লোকদের খাইতে অভিরুচি হয় না। কিন্তু দক্ষিণ দেশের হোটেলগুলি বেশ ভাল বলিয়া বোধ হইল। বলা বাহুল্য, মাছ মাংস নাই, তবে কোথাও কোথাও পলাণ্ডু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যঞ্জনে অবশ্য ঝালের ভাগ বেশী। কিন্তু ঘোল ও দধি বেশী করিয়া খাইলে সে ঝাল সহ্য করা যায়। স্বাস্থ্যবান লোকদের বিশেষ অনিষ্ট হয় না।

তাঞ্জোরের মন্দিরটি অতিশয় উচ্চ ও সুগঠিত। মন্দিরের বাহিরে গোপুরম আছে—কিন্তু অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় এখানে গোপুরমটি মূল মন্দির অপেক্ষা বৃহত্তর নহে। মন্দির-বেষ্টনকারী প্রাচীরের চারিধারে পরিখা। যুদ্ধের সময় এখানে সৈন্যসমাবেশ করা হইত, এবং কামান বন্দুক প্রভৃতির জন্য দেওয়ালে ছিদ্র কাটিয়া রাখা হইয়াছিল। মন্দিরমধ্যস্থ সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণটি প্রস্তরমণ্ডিত। মন্দিরের সম্মুখে তাঞ্জোরের প্রসিদ্ধ সুবৃহৎ প্রস্তরগঠিত বৃষভ-মূর্ত্তি। বৃষভ-রাজের বিশাল মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া রহিলাম। নিকটে এমন

পাহাড় নাই, যেখানে এই প্রস্তর পাওয়া যাইতে পারে। দূরস্থ পর্ব্বত হইতে এই বৃহৎ ব্যাপারটি এত দূর আনিয়া এই উচ্চ বেদীর উপর স্থাপন করিতে যে কত পরিশ্রম ও কৌশলের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা ভাবিবার বিষয়। মন্দির-মধ্যস্থ শিবলিঙ্গটিও অতি বৃহৎ—আমরা এত বৃহৎ লিঙ্গ কুত্রাপি দেখি নাই। তাঞ্জোরের সমুন্নত মন্দিরের কারুকার্য্য অতি সুন্দর। প্রাঙ্গণস্থ সুব্রহ্মণ্য * দেবের মন্দিরের শিল্পকার্য্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকের প্রাচীর উজ্জ্বল বর্ণের বিবিধ চিত্রে সুশোভিত। একটী কক্ষের মধ্যে তাঞ্জোরের প্রাচীন রাজাদের চিত্র, এবং অশ্ব, ময়ূর প্রভৃতি বিবিধ প্রাণীর সুরঞ্জিত প্রতিকৃতি। কিন্তু এখানে দেবদর্শনার্থীর কোনও সমাগম দেখিলাম না। এত ঐশ্বর্য্য ও শিল্পকৌশল ভক্তিপূর্ণ যাত্রীর অভাবে প্রাণহীন বলিয়া বোধ হইল।

বিকালে আমরা রাজপ্রাসাদ দেখিতে গেলাম। ইহাও একটি দুর্গমধ্যে অবস্থিত। সকালে এক জন Guide বা প্রদর্শকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বিকালেও সে আমাদের সঙ্গে চলিল। সে ইংরেজী ভাষায় কথা কহিতে পারে। প্রাসাদের বিবিধ দ্রষ্টব্য বস্তু সে অনর্গল বর্ণনা করিয়া যাইতে লাগিল। বেশ বোঝা গেল যে, সে এই সব বর্ণনা মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে। তাঞ্জোরের রাজপ্রাসাদের কিয়দংশে এক্ষণে সরকারী আফিস হইতেছে। বিচিত্র সভাগৃহ দেখিয়া আমরা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। এক অংশে রাজবংশের বর্ত্তমান বংশধরগণ বাস করিয়া থাকেন। রাজবাটীর মধ্যস্থ কক্ষগুলি বিশৃঙ্খল-ভাবে নির্ম্মিত। প্রাচীরবেষ্টিত একটী শুষ্ক জলাশয় দেখিলাম—রাজারা এখানে জলবিহার করিতেন। একটী ভূগর্ত্তস্থ অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া আমরা কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছিলাম। স্থানটি ভীতিজনক। একটী কক্ষে সুবর্ণময় অশ্বা-ভরণ, সিংহাসন, পরিচ্ছদ প্রভৃতি বন্ধ রহিয়াছে—এই সকল লইয়া উত্তরাধিকারী-দের মধ্যে মোকদ্দমা চলিতেছে। রাজপ্রাসাদে বিশেষ চিত্তাকর্ষক কিছু নাই। প্রাসাদের বাহিরে পরিখার পার্শ্বে মঞ্চের উপর এক সুবৃহৎ কামান দেখিলাম। আজ কতকগুলি দরিদ্র শিশু নগ্নদেহে নিশ্চিন্তমনে ইহার উপর চড়িয়া খেলা করিতেছে।

পর দিন প্রাতে আমরা মন্দিরপার্শ্বস্থ শিবগঙ্গা নামক জলাশয় দেখিতে

* দক্ষিণ দেশে বহুসংখ্যক কার্ত্তিকেয়ের মন্দির আছে। তিনি এতদ্দেশে সুব্রহ্মণ্য দেব নামেই সমধিক পরিচিত।

গেলাম। বর্ষাকালে নদীর জল যেরূপ ঘোলা হয়, এই পুষ্করিণীর জলও তদ্রূপ। প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়ায় প্রশস্ত বাঁধান ঘাট। ঘাটের সোপানাবলী আরোহণ করিয়া রমণীগণ কলসীকক্ষে জল লইয়া যাইতেছিল। পুষ্করিণীর নিকটে Schwartz নামক ওলন্দাজ পাদ্রীর গির্জ্জা। দাক্ষিণাত্যে পাদ্রীগণ বহু দিন হইতে প্রচার কার্য্য করিতেছে। সেই জন্য নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে বহু-সংখ্যক খৃষ্টান আছে। সরোবরপার্শ্বস্থ উদ্যান দেখিয়া আমরা ঝটকায় করিয়া নগরের মধ্য দিয়া বেড়াইয়া আসিলাম। সুপ্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বে দোকান, বাজার এবং বসতবাটী। পথোপরি জনপ্রবাহ। দুই চারিটী ভদ্রবংশীয় স্ত্রীলোক হাঁটিয়া যাইতেছেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, দাক্ষিণাত্যে পর্দ্দা নাই। ভদ্রবংশীয় স্ত্রীলোকেরা অনাবৃতমুখে প্রকাশ্য স্থলে বাহির হন। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের সংস্কারকের দল যেরূপ বলেন, সেরূপ নহে। আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকগণ যেরূপ পরপুরুষের সহিত আলাপ করেন না, দাক্ষিণাত্যেও সেইরূপ। মূল প্রথা উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে এক; উভয় দেশের সমাজেই স্ত্রী ও পুরুষ স্বতন্ত্র করিয়া রখে।

তাঞ্জোর হইতে ত্রিচিনাপল্লী আড়াই ঘণ্টার পথ। আমরা দুইটার পর গাড়ীতে চড়িলাম। বিকালে ত্রিচিনাপল্লী জংশন ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। এখানে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা ত্রিচিনাপল্লী ফোর্ট ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ত্রিচিনাপল্লী বড় সহর, এখানে তিনটী রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। ফোর্ট ষ্টেশনের কাছেই দেশী লোকদের বাস, এবং এখান হইতে শ্রীরঙ্গম নিকটবর্ত্তী—তাই আমরা ফোর্ট ষ্টেশনেই নামিলাম। আমরা যখন ষ্টেশন হইতে সহরের অভিমুখে যাইতেছিলাম, তখন সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে চলিয়া পড়িয়াছেন। পৃথিবীর তপ্ত বক্ষ হইতে ক্লেশাবসানব্যঞ্জক নিঃশ্বাসের ন্যায় বিকালের বাতাস বহিতেছে। পথের ধারে হরিৎ বর্ণের ক্ষেত্রগুলি শোভা পাইতেছে। নারিকেল ও অন্যান্য বৃক্ষের উচ্চ শিরগুলি সুবর্ণকিরণে রঞ্জিত হইতেছে। পাদ্রীদের গির্জ্জা, কলেজ, ছাত্রাবাস প্রভৃতির বৃহৎ অট্টালিকাগুলি শোভা পাইতেছে। ছাত্রেরা টেনিস, ব্যাড্‌মিণ্টন প্রভৃতি খেলিতেছে।

আমাদের গাড়ীর গরুগুলি ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে ছুটিতেছিল। রাজ-পথস্থ লোকগণ বিদেশী দেখিয়া কৌতূহলবশতঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছিল। পথের ধারে এক বিস্তীর্ণ জলাকৃত স্থান দেখিলাম। শুনিলাম, কাবেরী নদীর প্রবাহ

হইতে এই জল ছাপাইয়া আসিয়াছে। একটু পরেই আমাদের গাড়ীগুলি চিনিয়া পিল্লের সুন্দর ছত্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ছত্রটি দ্বিতল। যাত্রীরা সাধারণতঃ এক তলাতেই থাকে। সম্ভ্রান্ত যাত্রিগণ গৃহস্বামীর বিশেষ অনুমতি পাইলে দ্বিতলে থাকিতে পারেন। আমরা শুনিলাম, একতলায় স্থান নাই—ছত্ররক্ষক আমাদিগকে স্বতন্ত্র আশ্রয় খুঁজিতে বলিল। অগত্যা আমরা গৃহস্বামীর ভবন অভিমুখে গাড়ী ছুটাইলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। পথিপার্শ্বস্থ জলের কলের চারিধারে বিচিত্র-বেশ-পরিহিত জলার্থিনী রমণীবৃন্দের ভিড় অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। ক্রমে আমরা উদ্দিষ্ট ভবনে উপস্থিত হইলাম। পিলে মহাশয় ব্যবসাদার লোক। একটী দ্বিতল প্রকোষ্ঠে তাঁহার কয়েকটি কর্ম্মচারী দোকানের খাতা খুলিয়া বসিয়াছিলেন। আমরা পরিচয় প্রদান করিলে তাঁহারা যথেষ্ট সমাদর করিয়া আমাদিগকে পাশের সুসজ্জিত কক্ষে বসিতে বলিলেন, এবং কহিলেন, "ছত্রের ভৃত্যগণ আপনাদের উচ্চপদ জানে না বলিয়া উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিতে পারে নাই। তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। তাহাদিগকে এই লিপি দিলেই উপরের ঘর খুলিয়া দিবে। আপনারা সেখানে থাকিতে পারিবেন।" ইহাদের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া আমরা ছত্রমে ফিরিলাম। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। পান্থনিবাসের স্থানে স্থানে স্ত্রী ও পুরুষ যাত্রিগণ ছোট ছোট দল বাঁধিয়া বসিয়াছিল। একটী বৃহৎ কক্ষে রঙ্গনাথ স্বামীর শয়ান মূর্ত্তি। আমরা উপরের ঘরে গেলাম। একটী দীর্ঘ হলের দুই পার্শ্বে দুইটী ক্ষুদ্র ঘর। দেওয়ালে বহুসংখ্যক ছবি। চেয়ার, টেবিল ও অন্যান্য গৃহোপকরণে কক্ষগুলি সুসজ্জিত।

পর দিন প্রাতে শ্রীরঙ্গম যাত্রা করিলাম। সহর ছাড়িয়াই আমরা কাবেরী নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পবিত্র নদীর সুন্দর শোভা দেখিয়া চক্ষু জুড়াইল।

ক্রমশঃ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

স্মৃতি-কথা।

নিদাঘদিনান্তে যখন শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের খাগড়ার আবাসে উপনীত হইলাম, তখন তিনি অসুস্থদেহে বিশ্রাম করিতেছিলেন ; আমাদিগকে পাইয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। তাহার পর বর্ত্তমান সময়ের সাহিত্যের কথা হইতে লাগিল। চন্দ্রশেখর বাবু আজ কাল লেখা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছেন—কিন্তু যত দিন বাঙ্গালা সাহিত্য পঠিত ও আলোচিত হইবে, তত দিন তাঁহার 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম' রচনারীতির উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলিয়া আদৃত হইবে। 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম'-রচনাকালে তিনি তরুণবয়স্ক। তখনই তিনি যে রচনারীতি নিজস্ব করিয়াছিলেন, এবারৎ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক বঙ্কিমচন্দ্রও তাহার অনাবিল প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক, বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র লেখকদিগের মধ্যে প্রায় সকলের রচনাই পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেন—সে পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের রচনাও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার পার্শ্বে মলিন দেখাইত না। বিদ্যাগুরু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কোনও কোনও রচনাও তিনি পুনরায় লিখিয়া আনিতে বলিয়া প্রত্যর্পণ করিতেন। কিন্তু চন্দ্রশেখর বাবুর রচনারীতির বৈশিষ্ট্যে তিনি এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার রচনায় কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিতেন না। আমি চন্দ্রশেখর বাবুকে বলিলাম, "বঙ্কিম বাবু তাঁহার আপনার সম্বন্ধে যে সব কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, তিনি ইংরাজী লিখিতেন। এমন সময় তিনি বুঝিতে পারেন, বাঙ্গালীকে বুঝাইতে হইলে—বাঙ্গালী জাতি গড়িতে হইলে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে হইবে। ইহা বুঝিয়াই তিনি 'বঙ্গদর্শন' বাহির করেন, বাঙ্গালা লেখক গড়িবার চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব কিরূপ অসাধারণ ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অর্জ্জুন আর গাণ্ডীব তুলিতেও পারেন নাই, তাঁহার সমস্ত শক্তি সহসা তিরোহিত হইয়াছিল, 'বঙ্গদর্শনে'র অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তেমনই 'বঙ্গদর্শনে'র অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাবান লেখকও আর সাহিত্য-ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। এই সময় বোধ হয় ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজে বাঙ্গালা-চর্চ্চার প্রতি প্রবল আগ্রহ আত্মপ্রকাশ করে।"

চন্দ্রশেখর বাবু বলিলেন, "সে আগ্রহ 'বঙ্গদর্শনে'র পরিকল্পনার পূর্ব্বেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। মধুসূদনের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের কথা ধরিলেও, তখন তিনি বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী',

'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' তখন প্রকাশিত হইয়াছে—'বিষবৃক্ষ' তখন লিখিত হইয়াছে—প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার যশ তখন 'বঙ্গে যথা তথা।' সে যশ তাঁহার বাঙ্গালা রচনার ফল।"

আমি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতি-কথা বিবৃত করিতে বলায়, তিনি বলিলেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আমার যখন প্রথম পরিচয়, তখন তিনি যশস্বী লেখক—আমি কেবল বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহরমপুর স্কুলে অতিরিক্ত হেডমাষ্টারের পদ পাইয়াছি। তখন তাঁহার সঙ্গে সসঙ্কোচে আলাপ করিতাম—সে সব আলাপে মানুষকে সম্যক বুঝিবার সম্ভাবনা থাকে না। কাযেই সে সময়ের কথা আমি বিশেষ কিছু বলিতে পারিব না। বলিবার পক্ষে একটু অন্তরায়ও আছে। আমার সহিত ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা বলিতে হইলে, আমাকে আমার কথা যেরূপ বলিতে হয়, সেরূপ বলা অহঙ্কারের পরিচায়ক—তাই আমি সে সব কথা বলিতে ইচ্ছা করি না।"

তাহার পর তিনি বলিলেন, "কিন্তু আমার সহিত ব্যবহারেই আমি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাভাবিক নেতৃত্ব-শক্তির—লেখকদিগকে বশ করিবার ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলাম। 'প্রদীপে' 'বন্ধুবৎসল বঙ্কিম' প্রবন্ধ লিখিবার পর চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিবেন মনে করিয়া, আমাকে আমার স্মৃতি-কথা বিবৃত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে যে কয়টি কথা বলিয়াছিলাম, সে কয়টি তোমাকে বলিতে পারি। সেই কয়টি কথা হইতেই তুমি তাঁহার সে গুণের পরিচয় পাইবে।"

চন্দ্রশেখর বাবু বলিলেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত যখন তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বহুবিশ্রুত-কীর্ত্তি—তিনি তরুণবয়স্ক; বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহরমপুর কলেজের স্কুলে চাকরী পাইয়াছেন। বহরমপুরেই বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষয়কীর্ত্তি 'বঙ্গদর্শনে'র প্রচারপরিকল্পনা পুষ্ট ও পূর্ণ হয়। তখন বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট; বহরমপুরে তখন বহু সাহিত্যিকের বাস—literary atmosphere ছিল। ইংরাজীতে সুপণ্ডিত লালবিহারী দে তখন বহরমপুর কলেজে অধ্যাপক। পণ্ডিত লোহারাম শিরোরত্ন নর্ম্যাল স্কুলের পণ্ডিত ও রামগতি ন্যায়রত্ন তখন কলেজে শিক্ষক। * সার গুরুদাস

* লোহারামের বাঙ্গালা ব্যাকরণ আজকাল আর বড় পঠিত হয় না—কিন্তু এক সময় উহাই বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পঠিত হইত। ব্যাকরণখানি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। লোহারামের সম্বন্ধে দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'সুরধুনী কাব্যে' লিখিয়াছেন—

বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বহরমপুরে উকীল। গঙ্গাচরণ সরকারও তখন বহরমপুরে বিচারক। 'ঐতিহাসিক রহস্যে'র উদ্ঘাটক ডাক্তার রামদাস সেন তখনই বহু পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। রামদাস বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-প্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, এবং রামদাস বাবুকে লেখকশ্রেণী-ভুক্ত হইতে অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধের ফলে, রামদাস বাবুর বহু প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শন' অলঙ্কৃত করিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি জ্ঞানচর্চ্চার জন্য বহরমপুরে একটি সমিতিও সংস্থাপিত করেন। সে সমিতিতে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'রত্নাবলী' নাটক সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। লালবিহারী বাবু বঙ্কিম বাবুকে বিদ্রূপ করেন, বঙ্কিম বাবুও জবাব দেন। * উভয়ে বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। চন্দ্রশেখর বাবু সে সমিতিতে প্রবন্ধ শুনিতে যাইতেন। সমিতি অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।

এই সময় তিনি ঘটনাচক্রে বাঙ্গালা রচনায় ব্রতী হয়েন। তিনি বলিলেন—

"লোহারাম গুণধাম আত সদাচার,
বিরাজিত রসনায় কাব্য অলঙ্কার,
লিখিয়াছে 'মালতীমাধব' সুললিত,
'বঙ্গ ব্যাকরণ' বঙ্গময় বিচলিত।"

রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় 'বস্তুবিচার' প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থের প্রণেতা। তৎকালে বিদ্যালয়-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক ভাগ ন্যায়রত্ন মহাশয়, এক ভাগ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও এক ভাগ ভূদেব বাবু লিখিয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ই প্রথম বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লেখেন।

* শ্রদ্ধাস্পদ রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর বলিয়াছেন,—বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধে বাক্‌লের সভ্যতার ইতিহাস হইতে একাংশ উদ্ধৃত করেন। লালবিহারী বাবু বিদ্রূপ করিয়া বলেন, তিনি বাক্‌লের কথা আপনার বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন,—'Bengal Peasant Life' প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ লালবিহারী দে এই সময়ে (১৮৭০—৭১) বহরমপুর কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। Grant Hall Club নামক নব-প্রতিষ্ঠিত সভার তিনি সম্পাদক ও প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র উহার সহকারী সভাপতি, এবং তৎকালীন সবজজ দিগম্বর বিশ্বাস উহার সভাপতি ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সভায় Indian Civilisation সম্বন্ধে, সার গুরুদাস Abused India vindicated সম্বন্ধে, এবং মতি বাবু Polygamy সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। দিগম্বর বিশ্বাস বদলী হইয়া গেলে, সার গুরুদাস প্রস্তাব করেন যে, সহকারী সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্থলে সভাপতি হউন। ইহাতে লালবিহারী অত্যন্ত বিরক্ত হয়েন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা ঢের ভাল ইংরাজী জানেন, এবং প্রেসিডেন্ট-পদে তাঁহার পূর্ণমাত্রায় অধিকার। লালবিহারীর মনোভাব বঙ্কিম বুঝিতেন। সার গুরুদাস বঙ্কিমকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব করিলে, বঙ্কিম তাঁহাকে বলেন, 'করিলেন কি?' ইহার পরে লালবিহারী ক্লাবে আসা বন্ধ করিলে উহা উঠিয়া যায়। অল্পদিন পরে লালবিহারী হুগলী কলেজে বদলী হয়েন।—মানসী, ১৩২০।

"শ্রীকৃষ্ণ দাস বহরমপুর কলেজে আমার সতীর্থ ছিলেন। তিনি এফ এ. পড়িবার সময় ব্রাহ্ম মতের অনুরাগী হওয়াতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে আর বহরমপুরে আসিতে দেন নাই; রাজশাহীতেই 'নজরবন্দী' রাখিয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শন'-প্রচারের কয়েক মাস পরেই তিনি 'জ্ঞানাঙ্কুর' প্রকাশ করিলেন। তিনি বহরমপুরে আসিয়া আমাকে 'জ্ঞানাঙ্কুরে' লিখিবার জন্য জিদ করিলেন। আমি তৎপূর্ব্বে কখনও বাঙ্গালা লিখি নাই। সময় সময় ইংরাজী সংবাদপত্রে লিখিয়াছি বটে; কিন্তু বাঙ্গালা লেখক হইবার কল্পনা বা ইচ্ছা কখনও আমার হয় নাই। আমি বাঙ্গালা লিখিতে জানি না, শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলে, তিনি বলিলেন, তাঁহার এক জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আমার রচনার ভাষা ও ব্যাকরণগত ত্রুটী সংশোধিত করিবেন। যদি পারিয়া উঠি, তাঁহার কাগজের জন্য কিছু লিখিব প্রতিশ্রুত হইয়া কিছু দিন পরে তাঁহাকে 'বিদ্যাবিড়ম্বনা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠাইয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া দিলাম, প্রবন্ধে যেন লেখকের নাম না থাকে। তিনি কিন্তু প্রবন্ধের শেষে আমার নাম ও সঙ্গে সঙ্গে 'খাগড়া, বহরমপুর' ছাপাইয়া দিলেন। আমার সেই প্রথম প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। এক দিন কবিরাজ গোবিন্দচন্দ্র সেন মহাশয় আসিয়া আমাকে বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছেন। আমি এক দিন কবিরাজ মহাশয়ের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলাম। সাদর অভ্যর্থনার পর বঙ্কিমচন্দ্র নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি এই চাকরীতেই থাকিব কি না, তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়া, শেষে 'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রকাশিত প্রবন্ধটি মৌলিক কি অনুবাদ, তাহা জানিতে চাহিলেন। উত্তরে আমি বলিলাম, প্রবন্ধটির পরিকল্পনা আমার, কেবল উপাদান প্রধানতঃ ডিজরেলীর Curiosities of Literature হইতে গৃহীত। তিনি মধ্যে মধ্যে আমার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন,এবং বলিলেন, আমি 'বঙ্গদর্শনে'র জন্য কোনও প্রবন্ধ লিখিলে তিনি সানন্দে তাহা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ করিবেন। তরুণ লেখকের পক্ষে তাঁহার এই কথা যে কত উৎসাহজনক, তাহা সহজেই অনুমেয়। দুর্গোৎসবের পর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলাম। তিনি তখন পুরা ইংরাজীনবিশ, আমিও যুবক। আমি শেকহ্যাণ্ডের জন্য হাত বাড়াইয়া দিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, ও ব্যবহারটা তাঁহার কাছে বড়ই insincere মনে হয়। তিনি উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। এরূপ ব্যবহারে তরুণ লেখক যে তাঁহার অনুরক্ত হইবে, তাহাতে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে?

"আমার 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম' প্রকাশিত হইলে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তিনি তখন কাঁটালপাড়ায়। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'আপনি আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইতেছে; আমি তাহার ভূমিকা লিখিয়াছি। আপনি 'বঙ্গদর্শনে'র জন্য গ্রন্থাবলীর একটা সমালোচনা লিখিয়া দিউন।' আমি বিস্মিত হইলাম। 'বঙ্গদর্শনে'র সমালোচনায় বঙ্কিম ব্যতীত আর কাহার অধিকার থাকিতে পারে? আমি বলিলাম, 'সে কি কখন হয়? আপনি লিখুন।' তিনি বলিলেন, 'আমি ভূমিকা লিখিয়াছি; সমালোচনা করিব না। আপনি লিখিলে আরও ভাল হইবে।' বলা বাহুল্য, আমি সে অনুগ্রহ ভোগ করিতে স্বীকৃত হইতে পারি নাই। কিন্তু এই অনুরোধে তাঁহার নেতৃত্বগুণের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র যে লেখককে এরূপ অনুরোধ করেন, সে লেখক তাঁহার ভক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না।

"বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' উঠিবার মত হইল। কাগজ প্রকাশে বিলম্ব হইতে লাগিল। * শুনা গেল, 'বঙ্গদর্শন' আর প্রকাশিত হইবে না। এ সংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম। যাহাতে তিনি অন্ততঃ আরব্ধ খণ্ডটি শেষ করেন, সেই জন্য অনুরোধ করিবার উদ্দেশ্যে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। আমি সে অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'সকলে সাহায্য করুন, আমি চেষ্টা করিয়া দেখি।' আমি সে অনুরোধ—আদেশ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম।

"একটি ঘটনার কথা বলি—আমার কোনও প্রবন্ধে আমি কৌতূহল—লিখিতে কৌতুহল লিখিয়াছিলাম। তাহার পর আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, আমি কৌতুহল লিখিয়াছি; কিন্তু কথাটা কৌতূহল; তিনি সেটার সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; আমাকে জানান প্রয়োজনবোধে জানাইলেন। কথা শুনিয়া আমি নির্ব্বাক হইলাম। আমি লিখিবার সময় অসাবধানতাবশতঃ একটা বানান ভুল করিয়াছি, আর বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই সংশোধিত করিয়া আবার সে কথা বলিতেছেন। কিন্তু এই কথা বলাতে তাঁহার নেতৃত্বগুণ—লোককে বশ করিবার ক্ষমতা কিরূপ প্রকাশিত হইয়া-

* বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' তুলিয়া দিবার যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী লেখকদিগের পক্ষে গৌরবের নহে। 'বঙ্গদর্শনে' আর্থিক লাভ হইতেছে দেখিয়া লেখকগণ তাহার অংশ লইতে অধীর হইলে, তাহা লইয়া সম্পাদকের সহিত তাঁহাদের মনোমালিন্য ঘটে।

ছিল, তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র Republic of Letters-এর উপযুক্ততম নেতা ছিলেন।”

অন্যান্য কথার পর চন্দ্রশেখর বাবু আজ কাল সাহিত্যের গল্পাংশের কথায় বলিলেন, “সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য বিভাগের সভাপতি পণ্ডিতরাজ শ্রীযুত যাদবেশ্বর তর্করত্ন বলিয়াছেন—‘দিন দিন ছোট গল্পলেখকের সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িতেছে; মাসিক পত্রিকার পত্র উদ্ঘাটন করিলে একটি নয়, দুই তিনটি ছোট গল্প আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু পড়িলেই বুঝা যায়, তাহার মধ্যে অধিকাংশ লেখকেরই মৌলিকতার অভাব। অধিকাংশ ছোট গল্পই জীবিত বা মৃত পাশ্চাত্য লেখকগণের ছোট গল্পের অনুবাদ। ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, গল্প প্রস্তুত করিতে হইলে যে কল্পনার আবশ্যক, চিন্তার আবশ্যক, অলস লেখক সেই পরিশ্রমটুকু করিতে নারাজ। অনুবাদেরও আবশ্যকতা আছে; কিন্তু তাহা ছোট গল্প নয়, গভীর বিষয় লইয়া। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের তর্কবিদ্যার অনুবাদ হউক, আবশ্যকতা আছে; কার্লাইল, মেকলে, ইমার্সনের এসের (essays) অনুবাদ হউক, আবশ্যকতা আছে; প্লেটো ও হেগেলের প্রতিষ্ঠিত দর্শনের অনুবাদ হউক, আবশ্যকতা আছে; কিন্তু ছোট গল্প, যাহা প্রস্তুত করিবার জন্য প্রতিভাবান লেখক বাঙ্গালায় বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাহার জন্য আবার ইংরেজী গল্পের অনুবাদ কেন? তুমি অসমর্থ হও, ছাড়িয়া দাও।’ আজ কাল মাসিকপত্রের গল্প পড়িতে পড়িতে এই কথাই মনে হয়।”

আমি কোনও মাসিকপত্রের সম্পাদকের নাম করিয়া বলিলাম, “অতি অল্প দিন পূর্ব্বে আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি স্পষ্টই বলিলেন, তিনি উচ্চাঙ্গের—আর্ট হিসাবে উৎকৃষ্ট গল্প চাহেন না। তিনি তৃতীয় শ্রেণীর চমকদার গল্পই চাহেন। তাঁহার গ্রাহকগণ তাহাই চাহেন—গ্রাহকের অধিকাংশই মহিলা ও ব্যবসায়ী দলের।”

চন্দ্রশেখর বাবু বলিলেন, “তাহা না হয় বুঝিলাম, কিন্তু তিনি স্বয়ং তৃতীয় শ্রেণীর গল্প লেখেন কেন? ব্যবসায়ের হিসাবে না হয় তিনি তৃতীয় শ্রেণীর গল্পে মাসিকপত্রখানি পূর্ণ করিয়া গ্রাহক ধরিলেন; কিন্তু নিজে লিখিবার সময় ত সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিয়া আর্ট হিসাবে উৎকৃষ্ট গল্প লিখিতে পারেন। কই, তাহা ত করেন না!”

আমি বলিলাম, “সেটা বোধ হয় অক্ষমতাবশতঃ।”

চন্দ্রশেখর বাবু বলিলেন, “তাহাই ত বোধ হয়।”

তাহার পর তিনি বলিলেন, "এক কালে আমাদের লেখকদিগের মধ্যে পাদটীকায় পুস্তকের নামোল্লেখ—authority quote করা রোগের অত্যন্ত প্রাবল্য ঘটিয়াছিল। এখনও সে রোগ একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। আবার এমন অনেক লেখক আছেন, যাঁহারা যে মূল পুস্তক দেখেন নাই—অন্যত্র তাহাতে প্রকাশিত মতের উল্লেখমাত্র দেখিয়া পাদটীকায় মূল পুস্তকের নামোল্লেখ করিয়া বিদ্যাবাহুল্যের পরিচয় দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাঙ্গালায় ইহার সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনিই প্রথম সপ্রমাণ করেন, বিদ্যাপতি মৈথিল কবি ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালীরা বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী কবি বলিয়াই জানিত। তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র জন্য জ্ঞান ও নীতিবিষয়ক সন্দর্ভ (প্রথম বর্ষ) লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে দিলে তিনি উহা পাঠ করিয়া বলিলেন, 'এই প্রবন্ধে যে সব মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সমর্থন করিয়া authority quote করিলে তবে এ প্রবন্ধ ছাপান যায়।' রাজকৃষ্ণ বাবু তাহাই করিলেন—প্রবন্ধের পাদটীকায় তিনি স্বীয় মন্তব্যের সমর্থনে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ লেখকদিগের মতের উল্লেখ করিলেন। সেই সময় হইতে বাঙ্গালা রচনায় পাদটীকায় এইরূপ নামোল্লেখ আরব্ধ হইল। আর এই প্রথার যে যথেষ্ট অপব্যবহার হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।"

তাহার পর চন্দ্রশেখর বাবু আজ কাল মাসিকপত্রে প্রকাশিত কবিতার রুচির নিন্দা করেন। আজ কাল এক শ্রেণীর লেখক আর্টের নামে অশ্লীলতার আমদানী করিয়া অক্ষমতা-গোপনের প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ইংরাজীতে যাহাকে realism বলে, তাহারও প্রকারভেদ আছে। Gutter-reporting realism আর্ট নহে। মনে হইল, চন্দ্রশেখর বাবু এই মতাবলম্বী।

অনুবাদেই মূলের সৌন্দর্য্য রক্ষা করা দুঃসাধ্য—ভাষান্তরিত হইলে রচনার সৌন্দর্য্যহানি অনিবার্য্য; তাহার উপর আবার অনুবাদের অনুবাদ হইলে "সাত-নকলে আসল খাস্তা" হইয়া পড়ে। মূল না পড়িয়া অনুবাদের অনুবাদ করা অসঙ্গত, চন্দ্রশেখর বাবু কথাপ্রসঙ্গে এই মত ব্যক্ত করিলেন।

তিনি এখনও ফরাসী সাহিত্যের আলোচনা করেন কি না জিজ্ঞাসা করায় চন্দ্রশেখর বাবু বলিলেন, অসুস্থশরীরে এখন আর বাঙ্গালার চর্চ্চাই হইয়া উঠে না—ফরাসী বা সংস্কৃত সাহিত্য ত পরের কথা। বিশেষ মফঃস্বলে ফরাসী পুস্তক সহজপ্রাপ্য নহে। বোধ হয় অনেকে অবগত নহেন, চন্দ্রশেখর বাবু

মূল ফরাসীতে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসসম্বন্ধীয় যত পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, তত আর কোনও বাঙ্গালী পাঠ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু তিনি তাঁহার সে অধ্যয়নের ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিলেন না, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

চন্দ্রশেখর বাবুকে 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম'-রচনার ইতিহাস জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "তখন শোকাবেগে আপনার তৃপ্তির জন্য আপনি লিখিতাম। প্রথম প্রবন্ধটি বহরমপুরে, দ্বিতীয়টি কলিকাতায় ও আর কয়টি পুঁটিয়ায় লিখিত হয়। তখন আমি পুঁটিয়া স্কুলে মাষ্টারী করি। ছুটীর সময় বহরমপুরে আসিতে রাজশাহীর পথে আসিতে হইত। আসিবার সময় আমি একবার শ্রীকৃষ্ণ দাসের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আসিতাম। সেবার এই রচনার কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিবার জন্য খাতাখানি রাখিয়া দিলেন। আমি বহরমপুরে আসিলাম। ইহার পরই শ্রীকৃষ্ণ কলিকাতায় হরিশচন্দ্র শর্ম্মার ছাপাখানায় যোগ দেন। তিনি খাতা কলিকাতায় লইয়া যায়েন। কিছু দিন পরে তিনি আমাকে লিখিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র এক দিন ছাপাখানায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কোন রচনা তাঁহার কাছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া, আমার রচনার কথা শুনেন, এবং রচনাগুলি পাঠান্তে 'শ্মশানে' শীর্ষক প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশজন্য লইয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ আমাকে না জানাইয়া প্রবন্ধ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হইবে কি না— এই সন্দেহ প্রকাশ করায়, বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, 'তিনি প্রবন্ধ লইয়া গিয়াছেন শুনিলে আমি বোধ হয় আর প্রবন্ধ দিতে অস্বীকার করিব না। আমি শ্রীকৃষ্ণকে সেই ভাবেই উত্তর দিলাম। ইহার কয় দিন পরে শ্রীকৃষ্ণ লিখিলেন, তিনি রচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন। পুস্তক তাঁহার ছাপাখানায় মুদ্রিত হইবে; প্রেসের প্রুফসংশোধক ও তিনি স্বয়ং প্রুফ দেখিয়া দিবেন। তবে পুস্তকখানি বড়ই স্বল্পায়তন হইবে। সুতরাং একটু বাড়াইলে ভাল হয়; আর আমি যদি বাড়াইতে চাহি, তবে যেন অতি শীঘ্র আরও কিছু রচনা পাঠাই; কারণ, পুস্তক ছাপা আরব্ধ হইয়াছে। পত্র অপরাহ্ণে পাইয়া রাত্রিতে 'শয়নমন্দিরে' লিখিতে বসি, এবং পর দিন অপরাহ্ণের মধ্যে উহা শেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হই। ইহাই 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম'-প্রকাশের ইতিহাস।"

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

কাব্যময়ী।

১

বিনোদের প্রতিদিনই সময়ে অসময়ে মনের মধ্যে একটা বিষণ্ণ-ভাবের উদয় হয়। সংসারে কাব্যের স্থান কোথায়? সৌন্দর্য্য কোন্ দিক দিয়া ফুটিয়া উঠে? সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে, অনেক প্রকারে তাহার মর্ম্মটুকু বর্ণনা করিলেও, বাস্তবের মধ্যে, মানব-হৃদয়ে, কর্ম্ম-জগতে তাহার জীবন্ত প্রমাণ বিরল কেন? সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে মতভেদ কেন? ধর্ম্মের সহিত বিরোধ কেন? জরা-মরণদুঃখক্লেশমথিত সংসারের মধ্যে তাহার গতি কোন্ দিক দিয়া? মানব এ সকল সমস্যার পূরণ করিতে অক্ষম হইলে তাহার জন্মই বৃথা।

প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিবার সময় বিনোদের মুখে বিষাদের চিহ্ন দেখা দিত। সে দিন সকলে তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছিল। অগ্রজ বলিলেন, সেটা বয়সের দোষ। পিসী বুঝাইয়া দিতেন যে, অত্যন্ত লেখাপড়া শিখিয়া বিনোদের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। জননী বলিতেন, 'হাওয়া বদলান' দরকার; কারণ, এক এক জায়গার হাওয়া এক এক সময় দূষিত হইয়া পড়ে। সকলে বিনোদের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিত। কি ঘোর অসভ্যতা! বিনোদ তাহাতে বিরক্ত হইত।

'এ সংসারে এই ঘোর বাধা বিঘ্ন, শোক দুঃখ, এবং অজ্ঞতা ও অসভ্যতার মধ্যেও একটা অসীম সৌন্দর্য্য বিন্যস্ত রহিয়াছে—তাহা নিশ্চয়, নচেৎ জগৎ মিথ্যা হইয়া যায়। অথচ আমরা তাহা দেখিতে পাই না। এটা বোধ হয় আমাদের দৃষ্টিরই দোষ। কোন্ দিক দিয়া দেখিলে সে সৌন্দর্য্য অনুভূত হয়, তাহারই আবিষ্কার করা আবশ্যক।'

বিনোদ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দার্শনিক ভাব অবলম্বন করিল। কলিকাতার প্রভাত চিরকালই সৌন্দর্য্যবিহীন। যে বাহ্য সৌন্দর্য্যটুকু নিশাকালে বারনারীর রূপের মত ঝলসিয়া উঠে, প্রভাতসমাগমে তাহার মাধুর্য্য থাকে না। তবুও সেদিন প্রভাতে, বাটীর ছেলেপুলে, বাহিরের কাক ও কুক্কুর, ঘরের দাসদাসী, বাহিরের পাণ্ডুবর্ণ পথিক, সকলে মিলিয়া বোধ হয় বিনোদের মনে একটা আশার সঞ্চার করিতেছিল।

কিন্তু সে আশা বৃথা। গৃহও যেমন কাব্যহীন, গৃহের বাহিরও তেমনই। সারি সারি নর নারী নিমতলার ঘাট দিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছে, এবং গঙ্গাস্নান

করিয়া ফিরিতেছে, সকলেরই মুখশ্রী সংসারাসক্তিতে পরিপূর্ণ। কাহারও প্রফুল্লতা নাই। নীরস কর্ম্মক্ষেত্রে উদ্দেশ্যবিহীন আনাগোনা ও দৌড়াদৌড়ি! বাহিরে বিরিঞ্চি চাকরের নাসিকা-গর্জ্জন তখনও শেষ হয় নাই, তাহার মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত হইতেছিল। বিনোদ এক পদাঘাতে তাহাকে শয্যা হইতে তুলিয়া দিল! ভৃত্য মনে করিল যে, ছোটবাবু আজ 'ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে'। সে আস্তে-ব্যস্তে চা' তৈয়ারী করিতে গেল। সেই দৈনিক চা'র পেয়ালা, গোয়ালিনী-মার্কা ক্ষীরের টীন! বৈঠকখানার একটা জানালা খুলিবামাত্র প্রাতঃকালের দৈনিকপত্র আবির্ভূত হইল। ট্রামকারের প্রথম নির্ঘোষ কর্ণকুহরে সঞ্চারিত হইল। দুই একখানা 'মোটরকার' পেট্রোলের সুগন্ধ বিকীর্ণ করিয়া চলিয়া গেল। নিরুপায় হইয়া বিনোদ সংবাদপত্র লইয়া বসিল।

যুদ্ধ চলিতেছে। এক দিকে 'হোমরুলে'র আন্দোলন, অন্য পৃষ্ঠায় যুদ্ধ-সংবাদ। মঙ্গলবার। হাবড়ার 'ব্রিজ-কমিশনর'গণের নোটিশ! বক্‌রীদের দাঙ্গার বিবরণ। গোটাকতক আত্মহত্যা ও জাল জুয়াচুরী। থিয়েটর, ফুটবল, নাচতামাসার তালিকা। নোয়াখালির বন্যা ও লোকক্ষয়। ক্রমে বিজ্ঞাপন। ব্যাধির ঔষধ, নানাপ্রকার সালসা, যৌবন বর্দ্ধিত করিবার উপায়, কর্ম্মখালির সংবাদ ও অকর্ম্মা লোকের কর্ম্মলালসার আবেদন! কর্ম্ম! কর্ম্ম! সংসারবৃক্ষ কর্ম্মফলভারে অবনত, ক্ষুব্ধ, ক্লিষ্ট! এ কর্ম্মের শেষ কোথায়?

এই যে সংবাদপত্রের বিরাট আট পৃষ্ঠা! সংসারের বহু সমাজের দৈনিক 'বায়স্কোপ'! ইহার মধ্যে কাব্য কোন্‌টুকু? তবে আমরা ইহার জন্য এত উৎকণ্ঠিত কেন? মরণেও কাব্য আছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে আত্মহত্যার সৌন্দর্য্যটুকুও নাই!

বিনোদ সংবাদপত্র ফেলিয়া দিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইল। ক্রমে বেলা আটটা বাজিয়া গেলে পুরাতন 'লক্ষ্মীবিলাসে'র শিশি হইতে শেষ তৈলটুকু অতিকষ্টে বাহির করিয়া কেশে মাখিল।

টব কলের জলে পরিপূর্ণ হইতেছিল। ব্রাহ্মণ বলিল, 'দাদাবাবু, এখনও রান্না চড়ে নাই।' বিনোদ তাহার কথার উত্তর না দিয়া স্নান করিতে বসিয়া গেল।

আজ বিনোদের অবস্থা একটু চড়া ও কড়া রকম দেখিয়া পিসী দুইটি গোটা গল্‌দাচিংড়ীর কালিয়া সযত্নে রন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন। তখন বেলা প্রায় দশটা। থালায় নানাবিধ ব্যঞ্জন দেখিয়া বিনোদ তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব

করিবার চেষ্টা করিল। সকলেই মৃত। অন্ন, মৎস্য, তরকারী, দুগ্ধ, কেহই সজীব নহে। প্রাণ সজীব পদার্থ চাহে না। পরিপাক করিতে পারে না। পাঞ্চভৌতিক সরঞ্জাম অবলম্বন করিয়া প্রাণের খেলা! কি অপদার্থ এই জীবন! কতকগুলি অসার বস্তুর আণবিক উত্তাপ যত দিন আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তত দিন তাহাদেরই ভাব ও স্মৃতিগতি লইয়া এই পাশবিক জীবন কাটাই! তাহাদেরই মধ্যে আমরা সৌন্দর্য্য দেখি, এবং সাহিত্যের সৃষ্টি করি!

২

আহারের পূর্ব্বে বিনোদ অনেক গভীর বিষয় ভাবিয়াছিল। আহারের পর সেগুলি ক্রমে ক্রমে বিলীন হইয়া গেল। হায় রে অন্ন! বিনোদ প্রতিজ্ঞা করিল, আর কখনও গুরুতর আহার করিবে না। ক্ষুধা কাব্য লইয়া আসে, কিন্তু নিবৃত্তি হইলে অন্তর্দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া যায়। ক্রমে নিদ্রা, দুঃস্বপ্ন, এবং কচিৎ অগ্নিমান্দ্য! জঠরানল জ্বলিয়া না উঠিলে সৌন্দর্য্যের কোনও আভাস পাওয়া সুকঠিন। ক্ষুধা! ক্ষুধা! ক্ষুধাই প্রেমিকের সম্বল, মৃত্যুর চিরসঙ্গিনী। ঈশ্বর-বিরহ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। জ্ঞান ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। ভক্তি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। যখন ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় জীব বিকল হয়, তখনই নিভৃত অগ্নি অন্তরের সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতে চাহে। কিন্তু সেই নিষ্কলঙ্ক, নগ্ন সৌন্দর্য্য আমরা অন্নব্যঞ্জনের আবরণ দিয়া ঢাকিয়া ফেলি। আমার জঠরাগ্নি অন্য জঠরাগ্নির সহিত মিশিয়া বিশ্বসৌন্দর্য্য প্রদীপ্ত করিতে পারে না। আমার অশ্রু অন্যের সহিত মিশে না। আমার হৃদয় আমার শোণিতেই আবদ্ধ থাকে। আমার যজ্ঞ আমারই দেহমন্দিরে হয়। সেখানে কপাট রুদ্ধ, অন্যের প্রবেশনিষেধ! ক্ষুদ্র শ্মশানবৎ এই উদর, বহু ক্ষুদ্র অণুসমষ্টির চিতা। আমি নিজেই তাহার মধ্যে দগ্ধ হই, অথচ সকলে সযত্নে তাহা লুকাইয়া রাখে। আমাদের ভয়, পাছে হিংসাদ্বেষপূর্ণ জীব-কটাক্ষ তাহার প্রতি সঞ্চারিত হয়! হায় রে উপবাসী পরলোকস্থ আত্মা! তোমরাই সুখী। আমাদের অবস্থা তোমরা বোধ হয় দেখিয়া হাস।

ভবিষ্যতে ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য বিশেষ ব্যস্ত হওয়া অতি মূর্খের কাজ, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া বিনোদ শয্যাগত হইল। বিনোদের একটা গুণ ছিল। অন্য লোকে এহেন সময়ে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। কিন্তু বিনোদের চেয়ারে না বসিলে নিদ্রা আসিত না। কারণ, এম. এ. পাশ করা পর্য্যন্ত বিনোদ শয্যায় শয়ন করিয়া পাঠ করিত। বড় বড় কঠিন সমস্যা ও প্রগাঢ় চিন্তা তাহার শয়নাবস্থাতেই মনোমধ্যে উদিত হইত, এবং এ দেশের অধিবাসিগণের প্রতিভা,

শৌর্য্য ও বীর্য্য, যে শয়নাবস্থাতেই বর্দ্ধিত হইবে, তাহা বিনোদের মতে নিশ্চিত। অনেক সময় মনে হইত, সেটা অনন্তশয্যা। বিনোদের মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা হইত, কোনও গিরিশৃঙ্গে কিংবা ধূসর বর্ণের মাঠে, কিংবা মরুভূমির উপর শয়ন করিয়া বিশ্বের কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

পূজার অবসর সম্মুখে। এমন সুযোগ ছাড়িয়া দিলে হয় ত সংসারের নিগূঢ় সৌন্দর্য্যতত্ত্ব আবিষ্কার করা দুষ্কর হইয়া পড়িবে, তাহা মনে করিয়া, একটা কোনও অজানা দেশ পর্য্যটন করিবার সঙ্কল্প বিনোদের মনে উদিত হইল।

এই যে বিশাল ও বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ, ইহার প্রত্যেক প্রদেশই অদ্ভুত। প্রত্যেকেরই এক একটা বিশেষত্ব। কোনটারই ইতিহাস কাহারও মত নহে। তাহাদের সমাজ কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশে গিয়া কি প্রকারে সমাজের পরিবর্ত্তন ঘটায়, তাহা সৌন্দর্য্যতত্ত্বে একটা শিখিবার ও দেখিবার বিষয়।

বিনোদ বাক্স হইতে গোটা কতক টাকা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কৃষ্ণ বর্ণের একটা পিরিহান ও কৃষ্ণ বর্ণের একখানা ধুতি পরিধান করিয়া, এবং কৃষ্ণ বর্ণের চাদর দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া, বিনোদ একেবারে ছোটনাগপুরের রেলে আরোহণ করিয়া বসিল।

এবম্প্রকারের বিকৃতবর্ণ পরিচ্ছদ দেখিয়া অনেকের কৌতূহল জন্মিয়াছিল। এক জন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়ের নিবাস ?'

বিনোদ। এখানেই।

ভদ্রলোক। মহাশয় এ কালো ধুতি চাদর কোথা হইতে যোগাড় করিলেন ?

বিনোদ। রঙ্গাইয়া লইয়াছি। অনেকে গেরুয়া রং পছন্দ করে, কিন্তু সেটা আবদার বই আর কিছু না। আমার মতে বিদেশে কাপড় চোপড় ময়লা হয় বলিয়া, কালো রংই খুব সময়োপযোগী।

ভদ্রলোক বিনোদের কর্ণের নিকট মুখ লইয়া চুপি চুপি বলিলেন, 'আমার মতে কালোর মধ্যেই জগতের সৌন্দর্য্য নিহিত। দুঃখের মধ্যে। মরণের মধ্যে। মৃত্যুর মধ্যে।'

ইহা বলিয়া তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের আলোকের দিকে ঘোর অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

বিনোদ খুব আহ্লাদিত হইয়া বলিল, 'মার্জ্জনা করিবেন, আমার বোধ হইতেছে—আপনি এক জন কবি।'

ভদ্রলোক ধীরে ধীরে বলিলেন, 'ঠিক কবি নহি। আমি কাব্য লিখি না, তবে কাব্যটা কি, তাহার অনুসন্ধানে ব্যস্ত।'

বিনোদ। কি সুন্দর! আমি ঠিক আপনার ন্যায় একটি লোকের তল্লাস্ করিতেছিলাম। যদি ধৃষ্টতা না হয়, তবে আপনার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

ভদ্রলোক। আমি অজ্ঞাতভাবে জীবন কাটাইতে চাহি। তবে আপাততঃ আমার নাম হৃষীকেশ বলিয়া জানিয়া রাখুন। মনে করুন, আমি এক জন পুলিসের কর্ম্মচারী, কিন্তু পেন্সনপ্রাপ্ত এবং বার্দ্ধক্যগ্রস্ত। আপনি নির্ব্বিবাদে আমার সহিত মিশিতে পারেন। আপনি কত দূর যাইবেন?

বিনোদ। ঠিক নাই। তবে আপাততঃ রাঁচীর টিকিট লইয়াছি।

ভদ্রলোক। অত দূর যাইবার এখন দরকার নাই। আপনাকে প্রথমে কয়লার খনিগুলি দেখাইয়া দিতে চাহি। আপনি 'ঝরিয়া'র টিকিট লউন।

৩

ইহা বলিয়া হৃষীকেশ বাবু একটি সিগারেট টানিতে বসিয়া গেলেন। বিনোদ তাহার টিকিট বদলাইয়া লইয়া আসিল।

হৃষীকেশ বাবু বলিলেন, 'পথে এক জন সঙ্গীর দরকার। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আপনি আমারই মত সৌন্দর্য্যের পথের পথিক। আমিও জীবনের প্রাক্কালে,—অর্থাৎ যৌবনকালে, (তাহার পূর্ব্বে জীবনের কালাকাল বিচার হয় না) আপনার ন্যায় বহির্জগতে—খুঁজিয়া বেড়াইতাম (আমার অধিক কথা কহিবার শক্তি কম, সুতরাং কোনও কথা ছাড়িয়া গেলে আপনাকে মনে মনে পূরণ করিয়া লইতে হইবে)। কিন্তু বহির্জগতে যে সৌন্দর্য্যটুকু আমরা দেখি, এবং উপাসনা করি, তাহার —নাই।'

'যৌবনে'র কথা শুনিয়া বিনোদের প্রেমের কথা মনে পড়িল। 'প্রেম সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?'

হৃষীকেশ। কিসের প্রেম? —র প্রেম?

বিনোদ। আপনি রমণীর প্রেমের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

হৃষীকেশ (হাসিয়া)। আমি ত তাহা বলি নাই। আপনি কোন্ প্রেমের কথা বলিতেছেন?

বিনোদ। মনে করুন তাহাই।

হৃষীকেশ। আমি সে ভাবে দেখি নাই। আমার মতে রমণীই প্রেম,

কারণ, রমণী দুঃখময়ী প্রকৃতি। আপনার যদি শুনিবার ইচ্ছা থাকে, তবে একটা গল্প বলি। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে—তখন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি বড় ভাল লাগিত—আমার হঠাৎ মনে হইয়াছিল যে, আমি —বাসি। তখন বাঙ্গালা দেশ সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়ায় পরিপূর্ণ হয় নাই, তবে আমার —যেখানে ছিল, সে স্থান বর্দ্ধমান জেলায়। সে সেখানে থাকিত বলিয়াই হউক, কিংবা উপন্যাস পড়িয়াই হউক, আমার —প্রতি একটা প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মিয়া গেল। তাহার জল, বায়ু, পানাপূর্ণ পুষ্করিণী, শ্রীহীন বাসগৃহ, ঘন-আঁধারপূর্ণ কদলীবন, এমন কি, ম্যালেরিয়া পর্য্যন্ত আমার প্রাণসম প্রিয় হইয়া পড়িল। তাই সপ্তমীর দিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া আমি একাকী সেই গ্রামখানিতে গিয়া উপস্থিত।

বিনোদ। রেলের ধারে?

হৃষীকেশ। তখন রেল ছিল না বলিয়াই রক্ষা। রেল থাকিলে বঙ্কিমের উপন্যাসের অর্দ্ধেকাংশ কদর্য্য হইয়া পড়িত। —ব্রজে গিয়াছিলাম। হৃদয়ের — হৃদয়ে অতি সন্তর্পণে লুকাইয়া গিয়াছিলাম। প্রত্যেক পথশ্রান্ত নিঃশ্বাসের সঙ্গে, প্রত্যেক দীপহীন জীর্ণ পান্থনিবাসের নৈশবায়ুর সঙ্গে আমার —র কথা মনে পড়িত। কি কথা? মানুষের সঙ্গে মানুষের কি কথা সম্ভব?

বিনোদ। সুখ দুঃখের কথা।

হৃষীকেশ। বেশ ভাবিয়া দেখুন। আমার সুখ দুঃখের কথা আপনার কখনই ভাল লাগিবে না, যদি একটু কিছু তাহাতে মিশ্রিত না থাকে। আমার গানের সঙ্গে, আমার কথার সঙ্গে, কাব্যের সঙ্গেও সেইটুকু চাহি। মনে করুন, যদি আমি 'দেশে'র কথাই বলি, তার মধ্যেও তারতম্য আছে। সে কথার এখন দরকার নাই। পথ হাঁটিয়া গ্রামে উপস্থিত হইলাম। সপ্তমীর চাঁদ উঠিতেছিল। বন বাদাড় ভাঙ্গিয়া, কদলীর বন পার হইয়া, একটি নিস্তব্ধ, ভগ্ন জীর্ণ, পুরাতন বাটীতে গিয়া উপস্থিত।

বিনোদ। সে গ্রামে পূজা হয় না?

হৃষীকেশ। পূজা দুই রকম। পুরাতন ও নূতন। নূতন পূজার আসরে গ্রাম হইতে দলে দলে সকলে সহরে আসিতেছে। তাদের কথা ও ক্রিয়া পুরাতন, কিন্তু পূজা বাহ্যাড়ম্বরমাত্র। পুরাতন পূজা এখন নীরবে হয়। নীরবে। আঁধারে ও রোগে শোকে। জগতে চিরকাল ইহাই হইয়া থাকে। পৌত্তলিকতা সহরে আসিয়া জীবন্ত হয়। তাহার মধ্যে যে ধর্ম্মটুকু নিহিত থাকে, সেটুকু মরণের পথে পুরাতন তীর্থে সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া যায়!

তাহারই কথা বলি। আমার বাল্যকালের বন্ধু শ্রীশের সেই বাটী। কলেজ হইতে বাহির হইয়া চারি বৎসর তাহাকে দেখি নাই। আমি দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিলাম—'শ্রীশ'—। কোনও সাড়া শব্দ নাই।

হৃষীকেশ। শ্রীশ তাহারই এক বৎসর পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছিল। আমি তাহার প্রাণের বন্ধু হইয়াও তাহা জানিতাম না। অথচ শ্রীশের রাশীকৃত চিঠি আমার বাক্সে! কিন্তু আমার তখনও বিশ্বাস হয় নাই। আমার সেই বাটীতে প্রবেশের অধিকার ছিল। প্রাঙ্গণ পার হইয়া গৃহে গেলাম, তখন সম্মুখে একটি কঙ্কালময়ী মূর্ত্তি প্রদীপ লইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই শ্রীশের জননী। 'বাবা, তুই এতদিন পরে এসেছিস'? আমি প্রণাম করিলাম। তিনি কাঁদিলেন না। কিন্তু তাঁহার নয়নের জ্যোতিঃ লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম যে, পর-লোকস্থ শ্রীশের আত্মা আমার দিকে করুণদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। আমার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা, শ্রীশের স্ত্রী কোথায়?' তিনি বলিলেন, তাহার একটি কন্যা হইয়াছিল, এখন তাহার পিতার কাছে। আবার বলিলেন, 'তোমার —বুঝি আর বাঁচে না। একবার দেখিবে এস।'

বিনোদ। সে কে?

হৃষীকেশ। বুঝিয়া লউন। যে নাই, তাহার নাম বলিয়া লাভ কি? সে শ্রীশের অত্যন্ত আদরের সহোদরা। আমি যে তাহাকে ভালবাসিতাম, তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। কেন বুঝিব? তখন মৃত্যু কি, তাহা জানিতাম না। আত্মীয়স্বজনের মরণ, সমাজের মরণ, দেশের মরণ, সকলই প্রাকৃতিক মরণ, তাহারই সঞ্চার হইলে হৃদয়ে প্রেম জাগিয়া উঠে। রুগ্নার নিকটে গেলাম। সে বলিল, আমি তাহার অনেক সাধের, কিন্তু তাহার বাঁচিতে সাধ ছিল না। কম্পিত নেত্রের জ্যোতিঃ ম্লান হইয়া গেল, —হৃদয়ের কথা হৃদয়েই থাকিল; শব্দ, স্পর্শ, রূপের বাহিরে সে চলিয়া গেল। সেই কদলীবনের মধ্যে, পুরাতন ভগ্ন বাটীর মধ্যে, তাহার বহু-দুঃখ-সন্তপ্ত দেহ পড়িয়া রহিল।

ইহাই পুরাতন পথ। প্রেমের পথ। আর একটা নূতন পথ আছে। তাহাও প্রেমের। কিন্তু উভয়ের সৌন্দর্য্য বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

৪

বিনোদ ধীরভাবে গল্প শুনিতেছিল। সপ্তমীর নিশি—আনন্দহীন, রোগ-প্রপীড়িত, জীর্ণ, শীর্ণ গ্রাম—সন্ততিবিয়োগশোকার্ত্তা জননীর কঙ্কালসার দেহ—নিরাশ হৃদয়ের শেষ কথা—সকলে একত্র হইয়া বিনোদের মানসপটে মধ্যে

মধ্যে অস্পষ্ট একটা চিত্রের মত প্রতিভাত হইতেছিল। একটা অজ্ঞাত দুঃখ বিনোদের হৃদয়ে জড়াইতেছিল। বিনোদের নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল।

হৃষীকেশ বাবু তাহা দেখিয়া খুব কসিয়া একবার সিগারেট টানিয়া লইলেন, এবং তাঁহার গ্রীবা বিনোদের স্কন্ধের দিকে পুনর্ব্বার প্রসারিত করিয়া বলিলেন—

'শ্রোতা ঈশ্বর, আমরা কবি।
দ্রষ্টা ঈশ্বর, আমরা ছবি।'

'আমরা আমাদের কাব্য বুঝিতে পারি না, আমরা আমাদের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না। একটা সৌন্দর্য্য আছে, তাহা ব্যবহারিক—বাহিরের রূপে তাহার আভাস পাওয়া যায়। সে থাকে না, চিরকাল বদলায়, নষ্ট হইয়া যায়। তাহার নীচে জগতের 'অন্তঃশিলা' অশ্রুপ্রবাহ। তাহার নীচে ধর্ম্মের জ্যোতিষ্মান চক্ষু। তাহাই পবিত্রতার উৎস। সৌন্দর্য্য সেখানে। আমরা যাহা বাহিরে দেখি ও শুনি, তাহা কাব্যের ও সৌন্দর্য্যের প্রতিবিম্ব। তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া আমাদের হৃদয়ে যে তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, তাহার প্রতিঘাত অন্তর্জগতে গিয়া কাব্যের সৃষ্টি করে। মানবের ন্যায় কাব্যের দ্বিজত্ব আছে।

'আর একটা কথা মনে রাখিবেন। দূরত্ব সৌন্দর্য্যের একটা অঙ্গ। ঐ যে গ্রামখানি এই অন্ধকারে আমরা দেখিতে পাইতেছি, উহার অধিবাসীরা পরস্পর হইতে অনেক দূরে থাকে। তাহারা সেই জন্য পরস্পরকে ভালবাসে। সহরে আমরা গ্যাসলাইটের পার্শ্বে জড়াজড়ি করিয়া থাকি, কিন্তু সকলেই পরস্পরের শত্রু। দূরে থাকিলে প্রাণ ব্যাকুল হয়, মিলিতে ইচ্ছা করে। অনেক কথা মনে পড়ে। সে কে? কোথায় তাহার বাস? সে আমার কি না? যে গিয়াছে, তাহার কেহ হয় কি না? যে আসিবে, তাহাদের কে? যতই অজ্ঞাত, ততই আমাদের প্রিয়, ততই আমরা পথ খুঁজিয়া তাহার নিকট যাইতে চাহি। যেটুকু জানিতে পারিয়াছি, সেটুকু আমাদের নহে; তাহার মধ্যে কাব্য নাই, সৌন্দর্য্য নাই। যাহাকে কখনও জানিতে পারিলাম না, যে আপনাকে হৃদয়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখে, সেই আমাদের। সেই লুকানটুকু যত দিন না বাহির করিতে পারি, তত দিন আমাদের তৃষ্ণা মিটে না, সৌন্দর্য্যের তত্ত্ব পাওয়া যায় না।'

দেখিতে দেখিতে ঝরিয়া ষ্টেশনে ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হইল। পার্ব্বতীয় ভূমি, অদূরে গিরিশ্রেণী। বহু শত কলকারখানার আগার সগর্ব্বে গ্রীবা উত্তোলন করিয়া ধূম উদ্গিরণ করিতেছিল। রাশি রাশি কয়লার স্তূপ মাঠের

এপার হইতে ওপার ছাইয়া। ভূগর্ভে ও বাহিরে লক্ষাধিক লোক খনিজাত কয়লার ভার মস্তকে বহন করিয়া পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় অবিরাম আনাগোনা করিতেছে।

বিনোদ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'এও দেখিতেছি কলিকাতার মত জনপূর্ণ।'

হৃষীকেশ। এই শতাব্দীর চিতার মালমশলার মধ্যে এটা প্রধান। যত জনাকীর্ণ স্থান মহাযজ্ঞাগ্নির সমিধ-সংগ্রহ লইয়া ব্যস্ত। সেখানেই নগদ টাকা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা জন্মাবধি মৃত্যুর আয়োজনে ব্যস্ত, এবং যত উপার্জ্জন করি, তাহাতেই ব্যয় হইয়া যায়। যে মৃত্যুর যত আয়োজন করিতে পারে, সেই জগতে তত প্রধান। ধর্ম্মজগতেও তাই, কর্ম্মজগতেও তাই। যাহাতে শীঘ্র মরণের সম্ভাবনা, তাহাই খুব গৌরবের, এবং সভ্যজগতের অনুমোদিত।

বিনোদ। মরণ কি বাঞ্ছনীয় নহে?

হৃষীকেশ। নিশ্চয়। তবে উহার মধ্যে সৌন্দর্য্য কোন্ দিকে? নিজে বাঁচিয়া অপরকে মারা, না অপরকে দলিত করিয়া নিজে বাঁচা? আরও গভীর ভাবে দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, অপরকে মারিয়া নিজের জীবনরক্ষার যে উপায়, সেই উপায় দ্বারাই নিজের মৃত্যু শীঘ্র ঘটে। একটা লোক তাহা বুঝিতে পারিয়া আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

বিনোদ। সে কে?

হৃষীকেশ। আমাদের রামধনের কথা শুনেন নাই? সে লোকটা টাকা ধার দিয়া, কলকারখানার 'শেয়ার' লইয়া, জাল জুয়াচুরী করিয়া, আত্মীয় স্বজনের আহার বন্ধ করিয়া, কালক্রমে অনেক টাকার মালিক হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে, গাড়ী, ঘোড়া, ইমারত, নাচ, গান, বায়ুসেবন, রাত্রিজাগরণ, 'মোটরকার', তীব্র আহার্য্য ও পানীয়, দেশবিদেশে দৌড়াদৌড়ি, সভায় চীৎকার, দলাদলি, বাতব্যাধি, অবশেষে পক্ষাঘাত। ক্রমে ডাক্তার ও উকীলের আবির্ভাব, মামলা ও মোকদ্দমা, এবং শেষ অবস্থায় পুত্রের হস্তে লগুড়াঘাত। লোকটার প্রাণসংশয় দেখিয়া গৃহিণীর রাত্রি তিনটার সময় থিয়েটর হইতে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন। পাড়ার লোকের জাগিবার সম্ভাবনা দেখিয়া রামধন উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে আরম্ভ করিল।

বিনোদ। উদ্দেশ্য?

হৃষীকেশ। একটা আঙ্গিনায় যদি এক জন কাঁদে, এবং অন্য জন হাসে,

তবে সেখানে একটা 'রিহার্স্যল' (অভিনয়) হইতেছে, প্রতিবাসীর মনে ইহাই ধারণা হয়। এই চালাকীটুকু করিয়া রামধন সে যাত্রা কলঙ্ক ও আসন্নমৃত্যু হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল। ভগবান জীবকে যতই অধম করিয়া সৃষ্টি করুন না কেন, সকলেরই একটু অহঙ্কার ও আত্মজ্ঞান আছে। মান অপমানের ভয় আছে। ইহাই কাব্যের প্রথম বিষয়। মিল্টনের শয়তানকে মনে করিয়া দেখুন।

৫

ষ্টেশনে নামিয়া হৃষীকেশ বাবু গাড়ী ভাড়া করিতে বাহির হইলেন। বিনোদ প্রায় এক ঘণ্টা বসিয়া থাকিল। তাঁহার দেখা নাই! বিনোদ ত্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া তাঁহার কোনও সন্ধান পাইল না। বিনোদ পকেটে হাত দিয়া দেখিল, তাহার 'মনিব্যাগ' নাই; কেবল টিকিটখানি ও এক খণ্ড কাগজ আছে। কাগজখানি খুলিয়া বিনোদ পাঠ করিয়া দেখিল, —'আপনার চল্লিশ টাকার নোট, আমি ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিলাম। কোনও সময়ে তাহা শোধ করিয়া দিব। আপাততঃ আপনি পথে বিপন্ন বলিয়া একটা সন্ধান বলিয়া দিতেছি—এখানে হরিনাথ মিত্র বলিয়া এক জন সহৃদয় লোক বাস করেন। অতিথিসৎকারে তিনি প্রখ্যাত। তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইলে আপনার কষ্ট দূর হইবে—মনে রাখিবেন, জগৎ কাব্যময়।—আপনার চিরস্নেহের হৃষী।' বিনোদ ভাবিল, 'লোকটা কি ভয়ানক জুয়াচোর!' কিন্তু কোনও উপায় নাই। এখন হরিনাথ বাবুর সন্ধান পাওয়া যায় কোথায়? সম্মুখে এক জন কুলী দাঁড়াইয়া বিনোদের কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রের দিকে লক্ষ্য করিতেছিল। বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হরিনাথ বাবুর বাড়ী জান?'

কুলী। কেন জানিব না?

বিনোদ। দেখাইয়া দাও। বখসিস্ দিব।

কুলী। আমি সেই বাড়ীর চাকর গো।

উভয়ে পথ ধরিয়া চলিতেছিল।

বিনোদ। বাবু কি রকম লোক?

কুলী। অনেকটা আপনার মতনই বটে গো। কিন্তু বুড়াও বটে, মা বাপও বটে।

বিনোদ ভাবিল, 'বর্ণনাটা মন্দ নহে। তাহার মধ্যে একটু সৌন্দর্য্য ছিল।'

বিনোদ। বাবুর ছেলেপুলে কয়টি?

কুলীর নাম মাঙ্গারাম। জাতিতে সাঁওতাল। সে বলিল, 'তাহা ত গণিয়া দেখি নাই। অনেকগুলা মেয়েও বটে, অনেকগুলা ছেলেও বটে, এবং তাদেরও ছেলে মেয়ে কম নয় হে। দশটা, বিশটা, ত্রিশটা ছা শুদ্ধা হইতে পারে। বেশী হওয়া অসম্ভব নয়।'

বিনোদ। তুমি কি কর?

মাঙ্গারাম। আমি দুঃখীমণির গরুর ঘাস কাটি গো, আর 'কলিরি'র কুলী মর্‌লে মুখে জল দিই।

বিনোদ প্রথম কথাটা বুঝিতে পারিল না। দ্বিতীয় কথার উত্তরে কহিল, 'এখানে অনেক লোক মরে?'

মাঙ্গারাম (হাস্যপূর্ব্বক)। সেই রকম দেখা যায় বৈ কি। যত মরে, তার অধিক ছা জন্মায়। আগে বাবুর বত্রিশখানা ঘর ছিল, এখন চল্লিশখানা গো।

বিনোদ যখন হরিনাথ বাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। গেটে প্রবেশ করিয়া বিনোদ দেখিল, কতকগুলি সারি সারি গাছপালা ও অজানা ফুলের বাগান। মধ্যে মধ্যে শতমূলীর ক্ষীণ শ্যামল ঝাড়ের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র শ্বেত পুষ্পগুচ্ছ সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছিল। সম্মুখে একটী রাণীগঞ্জের 'টাইল'-মণ্ডিত বাংলো। একটি বৃদ্ধ চশ্‌মা-চক্ষে বেঞ্চে বসিয়া পত্র পাঠ করিতেছিলেন। মুখমণ্ডল ঈষৎ বিমর্ষ।

মাঙ্গারাম অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, 'এই ব্যাটাছেলেটি ইষ্টাশনে আপনকার নাম করিতেছিলেন গো।' মাঙ্গারাম চলিয়া গেল। বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে বলিলেন, 'আপনি বসুন।' বিনোদ লজ্জিত ভাবে বলিল, 'আমি বিপন্ন। আপনার গৃহে আসিবার আমার কোনও অধিকার নাই। তবে এক জন জুয়াচোর আমার পাথেয়ের টাকা কয়টি লইয়া পলাইয়া গিয়াছে।' বৃদ্ধ করুণ ভাবে বলিলেন, 'আপনার নিবাস?'

বিনোদ। কলিকাতায়। আমার নাম বিনোদলাল। আমার পিতার নাম ৺রমানাথ বসু। বাড়ী হইতে টেলিগ্রাম করিয়া টাকা আনাইব, তাহারও উপায় নাই। আপনি যদি এই সোনার আংটীটি হাতে রাখিয়া আমাকে আপাততঃ গোটা দুই টাকা দেন, তবে বাড়ীতে একটা 'আর্জেণ্ট' টেলিগ্রাম করিয়া দি।

ইহা বলিয়া বিনোদ তাহার অঙ্গুলী হইতে পিতৃদত্ত স্বর্ণাঙ্গুরীয় খুলিয়া বৃদ্ধের হস্তে দিল। বৃদ্ধ সেই অঙ্গুরীয়টি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া অবাক হইয়া

বিনোদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিনোদ দেখিল যে, তাঁহার বিমর্ষ মুখ অতিশয় প্রফুল্ল, উভয় চক্ষু বহিয়া বিমল অশ্রুবিন্দু ঝরিতেছে। হঠাৎ বৃদ্ধের সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। বোধ হইল, তিনি পড়িয়া যাইবেন। বিনোদ সযত্নে বৃদ্ধের শুভ্রকেশরাশিপূর্ণ মস্তক স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া ত্রস্ত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার কোনও অসুখ হয় নাই ত? বাড়ীতে যদি কেহ থাকে, তবে—'

বৃদ্ধ বলিল, 'না। আনন্দে আমার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছে। সে আনন্দ ধরিবার শক্তি এখন আমার নাই। তাহার কারণ বলি, শুন। তোমার পিতা রমানাথ আমার বাল্যসখা ও প্রাণদাতা। 'হুগলী ব্রিজের' নীচে যখন নৌকা উল্টাইয়া আমি ডুবিয়া যাই, তোমার পিতা রমানাথ আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। এই অঙ্গুরীয়টি স্মরণার্থ এক দিন তাহার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়া-ছিলাম। তুমি দুই টাকার জন্য যাহা আমার হাতে দিয়াছ, তাহার মূল্য আমার নিকট লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা অপেক্ষা বেশী। তুমি বোধ হয় এখনও বিশ্বাস কর নাই?'

বৃদ্ধের পবিত্র স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের বিশাল আনন্দ বিনোদের প্রাণে সঞ্চারিত হইতেছিল। বিনোদ বলিল, 'নিশ্চয় বিশ্বাস করি। আপনাকে দেখিয়া আমার স্বর্গস্থ পিতাকে মনে পড়িতেছে।'

বৃদ্ধ। হাঁ। ঠিক। স্বর্গস্থ। তাহা হইলেই হইল। একটাই পথ আছে, তাহাতে ইহলোকের ও পরলোকের লোক পরস্পরের হাত ধরিয়া বিচরণ করে; সেই পথেই স্নেহ, বিশ্বাস, ভক্তি ও স্মৃতি। আমারও মনে পড়িতেছে। প্রথমে তুমি তোমাদের সংসারের কথা বল, পরে আমিও বলিব।

বিনোদ তাহার জননীর কথা, সংসারের স্বচ্ছল অবস্থার কথা, তাহার লেখাপড়ার কথা, এবং অবশেষে দেশ-ভ্রমণের সঙ্কল্পের কথা সলজ্জভাবে সংক্ষেপে বলিয়া গেল। বৃদ্ধ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অমৃতধারার ন্যায় তাহা গ্রহণ করিতেছিলেন। তাহার পর বৃদ্ধ তাঁহার নিজের সংসারের কথা বলিলেন।

'আমার সংসার দুইটি। তাহার অর্থ এই যে, আমার বিষয়কর্ম্ম ও 'কলিয়ারি'র ভার আমার পুত্র সীতানাথের হস্তে ন্যস্ত। সে নিজের কন্যা ও তাহাদের সন্তানসন্ততিগণ লইয়া অনেকটা দূরে থাকে। ঐ যে প্রকাণ্ড অট্টালিকা মাঠের ওপারে দেখিতেছ, ঐটি তাহাদের বাসস্থান। আর আমি এখানে একাকী থাকি।'

বৃদ্ধের চক্ষু আবার অশ্রুপূর্ণ হইল। 'ঠিক একাকী নয়। আমার একটি

আদরের কন্যা ছিল। সে নাই। ষোল বৎসর পূর্ব্বে সে একটি কন্যা রাখিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছে। পরলোকে—স্বামিসন্নিধানে। তাহাদের দেশে কেহ নাই। দেশ উচ্ছন্ন গিয়াছে। আমার নাত্নীটি বড় স্নেহের—তাহাকে আমি দুঃখীমণি বলিয়া ডাকি। কিন্তু তার পিতা সাধ করিয়া নাম রাখিয়াছিল—'কাব্যময়ী'।' বৃদ্ধ তখন কাব্যময়ীকে আহ্বান করিলেন।

৬

দুঃখীমণির গলদেশে ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষের মালা। দক্ষিণ হস্তে একগাছি স্বর্ণ-বলয়। পরিধানে এক খণ্ড পুরাতন নীলবর্ণ শাড়ী। মস্তকের কেশ রুক্ষ, তাহা স্তূপাকারে সাঁওতাল-বালিকাদিগের ন্যায় মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে শুষ্ক বনলতা দিয়া বাঁধা। কমণ্ডলু আকারের একটি কাংস্যপাত্র হস্তে দুঃখীমণি উপস্থিত হইয়া বলিল, 'দাদা! আজ বড় গরু দুধ দেয় নাই।' বৃদ্ধ হরিনাথ বাবু বলিলেন, 'তবেই ত সর্ব্বনাশ! আমাদের বিনোদ খাইবে কি?'

বিকট কৃষ্ণ বর্ণের চাদর জড়ান বিনোদের সুশ্রী, সুন্দর, লজ্জাবনত, জীবন্ত মুখখানি দেখিয়া দুঃখীমণি প্রথমে বড় ভয় পাইয়াছিল। কিন্তু মাতামহের আশ্বাসপূর্ণ 'আমাদের বিনোদ' শুনিয়া তাহার সে ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। দুঃখীমণি দুই চক্ষু ভরিয়া বিনোদের দিকে তাকাইয়া, মাতামহের স্নেহপূর্ণ বাণী প্রতি-ধ্বনিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'আমাদের'?

বৃদ্ধ বলিলেন, 'হাঁ, আমাদের। অনেক দিন পরে এ বাড়ীতে এক জন অতিথি আসিয়াছে, সে 'আমাদের'। তুমি কিছু জলখাবার যোগাড় কর। বিনোদ সমস্ত দিন খায় নাই।'

বিনোদ দুঃখীমণির দৃষ্টিতেই কাব্যের প্রথম আভাস পাইয়াছিল। একটা কথা ঠিক। যেটুকু সুন্দর, তাহার বর্ণনা সম্ভবে না। সাহিত্য কেবল বীণার ন্যায় ঝঙ্কার দিয়া সুরের উৎপত্তি করে। তাহার কোনও অর্থ নাই। যাহার প্রাণে যেটুকু সৌন্দর্য্য পূর্ব্বে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহারই আলোকে সে সাহিত্য দিয়া একটা ছবি গড়িয়া লয়। বিনোদ চঞ্চলার ন্যায় সে আলোকটুকু দেখিতে পাইয়াছিল। কিন্তু কোন্ আধারে তাহার প্রথম চিত্র গড়িয়া তুলিবে, তাহার কোনও কূলকিনারা পাইল না।

বিনোদকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া হরিনাথ বাবু বলিলেন, 'তোমার মাকে এক-খানা পত্র লিখিয়া জানাও। নয় ত টেলিগ্রাম কর। তিনি ভাবিবেন।'

বিনোদ মনে করিল, 'ঠিক!' পত্র লেখাই স্থির করিয়া বিনোদ লিখিল, 'মা!

না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছি, কিছু মনে করিও না। এ স্থানটি পাহাড়ে পরিপূর্ণ। খুব সুন্দর। আমি এখানে একটা কাব্য রচনা করিয়াই বাটী ফিরিব। আমি হরিনাথ বাবুর বাটীতে আছি। বোধ হয়, তাঁহাকে মনে পড়িবে। তিনি আমার পিতার পরম বন্ধু ছিলেন।'

বৃদ্ধ হরিনাথ বাবু শয়ন করিলে, বিনোদ তাহার ঈপ্সিত কাব্যের প্রথমাংশ খুব ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিল। দুঃখীমণি জলখাবারের থালা সাজাইয়া আনিয়াছে। বিনোদ বলিল, 'পূর্ব্বে আমার খুব খাওয়া অভ্যাস ছিল। এখন ছাড়িয়া দিয়াছি। যাহা হউক, আজ সবগুলিই খাইব, কিন্তু মনে থাকে যেন, আর এত অপরিমিত জলখাবার তৈয়ারি না হয়।' বিনোদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দুঃখীমণি বলিল, 'আচ্ছা।'

আহারের সম্বন্ধে বিনোদের কখনই লজ্জা ছিল না, তবুও সে দিন মুখ ফিরাইয়া ধীরে ধীরে খাইতে বসিয়া গেল। দুঃখীমণি মাতামহের শয্যার পার্শ্বে গিয়া কানে কানে জিজ্ঞাসা করিল, 'উনি—আমাদের কে?'

হরিনাথ। এখন তাহা বলিব না। তুমি 'বিনোদ বাবু' বলিয়া ডাকিতে পার। প্রাতঃকালে ও বাড়ীতে লইয়া গিয়া তোমার দিদিমাকে বলিবে যে, উনি আমার প্রাণের বন্ধু রমানাথ বাবুর পুত্র। এ দেশে বেড়াইতে আসিয়াছেন। আর দেখ; বিনোদ বোধ হয় না বলিয়া বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। আমার পূজার সময়ের ধুতি ও চাদর তাহার জন্য ঠিক করিয়া রাখিবে।

বিনোদ আহার করিতে করিতে তাহা শুনিতেছিল। কি লজ্জার কথা! কি লজ্জার কথা!

৭

প্রভাতে মাঠের ওপার হইতে একটা সঙ্গীত-তরঙ্গ আসিয়া হরিনাথ বাবুর কুটীর ও উদ্যান ছাইয়া ফেলিল। ভৈরবীর আলাপ।

গান শুনিয়া বিনোদের প্রভাত-নিদ্রার জড়তাটুকু ভাঙ্গিয়া গেল। বিনোদ ভাবিতেছিল, 'জগতে কি চাহি? পরিপাটী আহার, সুদৃশ্য পরিচ্ছদ, সুরম্য বাসাগার, আজ্ঞাকারী দাসদাসী, দুইটি পিয়ানোর তান, একবার হাওয়াগাড়ীর সান্ধ্য দৌড়, মধ্যে মধ্যে একটু তন্দ্রার আবেগ ও সেই সময় প্রিয়তমার আব্দার—কিন্তু যদি প্রিয়তমা কথার বাধ্য না হয়? তবেই ত মুস্কিল! আর কি চাহি? দেশের জন্য ঘোর দুঃখপ্রকাশ ও খবরের কাগজে দেশের নানাবিধ মঙ্গলের জন্য প্রস্তাব। কিসে ম্যালেরিয়া বিদূরিত হয়, কিসে দেশের অধিবাসীরা বীরপুরুষ

হইয়া পড়ে, এবং কিসে সকলে মিলিয়া আত্মশাসন ও আত্মগর্জ্জনে দড় হয়, তাহার উপায়-উদ্ভাবন।

বিনোদ খানিকটা পাইচারি করিয়া বাগানে আসিয়া বসিল। দুঃখীমণি দূর হইতে ডাকিল, 'বিনোদ বাবু—চা খাবেন না?'

বিনোদ গৃহের মধ্যে গিয়া বলিল, 'দুঃখীমণি, আমি চা' খাই না, অন্ততঃ এখন ছাড়িয়া দিয়াছি।'

দুঃখীমণি। তবে ও বাড়ীতে চলুন।

হরিনাথ বাবু। বিনোদ, একবার ওদের সঙ্গে দেখা কর গে।

দুঃখীমণি বিনোদের ধুতি চাদর আনিয়া দিল। বিনোদ বলিল, 'কালো পোষাকে আমাকে কি মানায় না? ওগুলি সবই রেশমী।'

দুঃখীমণি। অন্ততঃ কাপড়খানা ছাড়ুন।

বিনোদ দুঃখীমণির আব্দারটুকু গ্রাহ্য করিয়া শুভ্র বসন পরিধান করিল। দ্বারে ভৃত্য মাঙ্গারাম দাঁড়াইয়া ছিল। বিনোদ বলিল, 'মাঙ্গারাম, পথ দেখাইয়া দিতে পারিবি?'

মাঙ্গারাম। এই রকম ত বোধ হয় গো। তবে কর্ত্তা বল্‌ছেন যে, দুঃখীমণি পথ দেখাইয়া দিবেক।

বিনোদ বাহিরের 'গেট্' পার হইয়া গেল। দুঃখীমণি ডাকিল, 'বিনোদ বাবু! দাঁড়ান, আমি আপনার চশ্‌মা নিয়ে যাচ্ছি। আমি সঙ্গে যাব।'

দুঃখীমণি চশ্‌মা লইয়া আসিলে বিনোদ বলিল, 'ওটা এখন পকেটে থাক্।'

দুঃখীমণি সম্মুখে পথ দেখাইয়া চলিল। বিনোদ মধ্যে। পশ্চাতে মাঙ্গারাম সগর্ব্বে হাসিতেছিল। বিস্তীর্ণ মাঠ, বন্ধুর পথ, মধ্যে মধ্যে দুই একটি শাল-বৃক্ষ ও শিলাখণ্ড। এক মাইল গিয়া দুঃখীমণির মস্তকের কেশপাশ শিথিল হইয়া পড়িল, শুষ্ক বনলতার বন্ধন খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। দুঃখীমণি তাহা কুড়াইতে গিয়া দেখিল যে, বিনোদ তাহার পূর্ব্বেই সেগুলি একত্র করিয়া পকেটে রাখিয়া দিয়াছে। বিনোদ লজ্জিতা কাব্যময়ীকে দেখিয়া বলিল, 'আমার একটু কাব্যচর্চ্চার সাধ হইয়াছে। বাধা দিও না।'

অদূরে প্রজাপতির ন্যায় একখানা মোটরকার দৌড়িয়া আসিতেছিল। সেখানি তাহাদের নিকট আসিয়াই থামিয়া গেল। দুঃখীমণি আবার কেশগুচ্ছগুলি বাঁধিবে মনে করিয়াছিল, তাহা হইল না।

'বিনোদ বাবু! এই আমাদের লীলা দিদি।'

বিনোদ ভাবিল, 'কি জঞ্জাল! কি ঘোর দুরন্ত বাধা বিপত্তি।'

কিন্তু তখনও বিনোদ মুখ ফিরাইয়া দেখে নাই। লীলার দিকে চাহিতে গিয়া বিনোদের চক্ষু ঝলসিয়া গেল। শুভ্রবসনা লীলা মোটরকার নিজেই চালাইতেছিল, পার্শ্বে দুইটি শিশু হাস্যমুখে বসিয়া। তাহারা মাঙ্গারামকে দেখিয়া তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া বলিল, 'আমরা মোটরকারে যাব না।'

দুঃখীমণি বিনোদকে দেখাইয়া বলিল, 'ইনিই আমাদের বিনোদ বাবু। আমরা তোমাদের বাড়ীতে যাচ্ছিলাম।'

লীলা বিনোদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল 'কি দুরন্ত ছেলেরা! ওদের মাঙ্গারাম কাঁধে করিয়া লইয়া যাউক। আপনি ও দুঃখীমণি 'ব্যাক্‌সিটে' বসুন। আমরা কলিয়ারির দিকে যাব।'

বিনোদ অবাক হইয়া লীলার রূপ দেখিতেছিল। চক্ষের নিমেষে প্রভাত সূর্য্যরশ্মি খরতর হইয়া পড়িল, মাঠের শ্যামল শষ্পের শিশিরগুলি শুকাইয়া গেল, প্রান্তরের বায়ু চঞ্চল ভাবে বহিল, অদূরে বনকুসুমের সৌরভ বিলীন হইল।

দুঃখীমণি 'কারে' আরোহণ করিয়া ডাকিল, 'বিনোদ বাবু আসুন, আমরা কলিয়ারি দেখিয়া আসি।'

বিনোদের মোহ ভঙ্গ হইল। বিনোদ লীলাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'আপনি ব্যাক্‌সিটে বসুন, আমি মোটর চালাইব।'

লীলা হাসিয়া বলিল, 'বেশ কথা।'

লীলা সুন্দরী ও নবীনা। দুঃখীমণিকে উপেক্ষা করিয়া লীলার নিকট বসা হঠাৎ বিনোদের মনে অন্যায় বলিয়া ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু লীলাকে 'কার্' চালাইতে দিয়া দুঃখীমণির সঙ্গে বসিয়া থাকাটা কি অসভ্যতা নয়? বিনোদ সেই সমস্যাটুকু পূরণ করিয়া মোটর চালাইয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে সকলে 'কলিয়ারি'র সম্মুখে উপস্থিত। কলিয়ারির কর্ম্মচারিগণ 'মিস্' লীলাকে অভিবাদন করিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। দলে দলে সাঁওতাল-যুবতীগণ আসিয়া দুঃখীমণির হাত ধরিল। দুঃখীমণি এক জনের কানে কানে কহিল, 'ইনি আমাদের বিনোদ বাবু।'

লীলা। সংবাদটা পরে দিলে ভাল হইত না?

কাব্যময়ী কাতর ভাবে বলিল, 'যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার আর চারা নাই। লীলা দিদি! আমি চিরকালই মূর্খ।'

৮

লীলা সাঁওতাল কুলীদিগকে দেখাইয়া বলিল, 'বিনোদ বাবু, এরা বড় হতভাগা জাতি। এদের বাঁধিয়া রাখা শক্ত। ভাল ঘর দিয়াছি, কাপড় কিনিয়া দিয়াছি, অন্য কলিয়ারির চেয়ে এরা এখানে সুখে থাকে, তবুও মধ্যে মধ্যে পলাইয়া যায়।'

বিনোদ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'কেন ?'

লীলা। এদের বিবাহ-বন্ধন বড় কাঁচা। যখন যার খুসী, তার স্ত্রীকে লইয়া চলিয়া যায়। আমি সেটা নিতান্ত অন্যায় মনে করিয়া এদের সাজা দিই। তাও মানে না। এদের পুরুষ যোলটা টাকা পাইলেই স্ত্রীর দোষ মার্জ্জনা করে।

বিনোদ প্রথমে মনে করিল, 'লীলা কি নির্লজ্জা, বেহায়া মেয়ে।' কিন্তু 'সমাজ এমন একটা জিনিস যে, ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হয়।' লীলার ভারতবর্ষীয় সরলতার মধ্যে পাশ্চাত্য দণ্ডবিধি আইনের সংমিশ্রণ দেখিয়া, এবং সাঁওতাল যুবতীগণের হাসিখুসীপরিপূর্ণ মুখ দেখিয়া, বিনোদ পাপ ও পুণ্যের সন্ধিস্থলে কাব্য রচনা করিয়া বসিল।

'আমার বোধ হয়, মানবের পূর্ব্ব প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া নূতন কিছু সৃষ্টি করিবার চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া পড়ে। সাঁওতালদের মধ্যে মনুসংহিতা সংস্থাপন করা যেমন অসম্ভব, আমাদের দেশে পণ লইবার প্রথা তুলিয়া দেওয়াও সেই রকম অসম্ভব। বরং আমার বোধ হয় যোল টাকা লইয়া অবাধ্য স্ত্রী ছাড়িয়া দেওয়া ভাল, কিন্তু এক রাশি পণ লইয়া আজন্মদুঃখিনী স্ত্রীকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া যন্ত্রণা দেওয়া মহাপাপ। প্রথমটা পাপের দণ্ড, দ্বিতীয়টা পুণ্যের দণ্ড।'

লীলার মুখ রক্তিম হইয়া পড়িল। 'এদের উদ্দেশ্য কি ? কি চায় ?'

বিনোদ। স্বাধীনতা চায়। যাহারা আত্মস্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে স্বামীর পদে উৎসর্গ করিয়াছে, তাদের কথা স্বতন্ত্র। তাহার নাম উপাসনা। ভারতবর্ষের বিশেষত্ব সেইটুকু। সেটা পাশ্চাত্য চক্ষে হেয়।

লীলা। 'আপনার মত যে, স্ত্রী চিরকালই স্বামীর উপাসনা করিবে, আর স্বামী যাহা খুসী করিতে থাকিবে।' লীলার রাগ হইয়াছিল।

বিনোদ নতমুখে বলিল, 'উপাসনার বলে স্বামীকে দেবতুল্য করিয়া লইবে। তখন সে "যাহা খুসী" করিবে না। তাই বোধ হয় বিধাতার নিয়ম। শৌর্য্য, বীর্য্য, স্বাস্থ্য, বল, সৌন্দর্য্য, প্রীতি, স্নেহ ও ধর্ম্ম, স্ত্রীর সাধনার বলে স্বামীতে

সঞ্চারিত হয়। স্বামীর অপরাধ দেখিলে সমাজের তাহাকে দণ্ড দেওয়া উচিত। সাঁওতাল সমাজ পুরুষকে দণ্ড দিয়া বিশেষ কোনও অসভ্যতা প্রকাশ করিয়াছে, তাহা বোধ হয় না।'

বিনোদ আবার বলিল, 'প্রভাতে একটা সুন্দর গান শুনিতেছিলাম। কথাগুলি মনে নাই। সখা, জগতে কি চায়? সখার অদৃষ্ট চিরকালই দগ্ধ। কি চায় সে তা নিজেই জানে না।'

দুঃখীমণি পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, 'বিনোদ বাবু, ঐ যে গান তুমি সকাল বেলা শুনিয়াছিলে, সে লীলাদিদির গান।'

হঠাৎ বিনোদকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করাতে লীলা একটু বিরক্ত হইল। লীলা বিনোদকে কয়লার খনির দিকে লইয়া গেল। দুঃখীমণি গেল না।

'আপনি এ সব পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই?'

বিনোদ হাসিয়া বলিল, 'না। আমার বোধ হয় ইহার মধ্যে কাব্য আছে। সৌন্দর্য্য আছে। আমরা বুঝিতে পারি না।'

লীলা বলিল, 'ছাই আছে। এই সব ভস্মরাশি সৌন্দর্য্যের পথে কাঁটার মতন। দাদামণি কাল্ বাবাকে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছিলেন। আপনি এক জন বিখ্যাত কবি। আপনার একটা কবিতা আমি দেখিব।'

বিনোদ। লীলা! আমি কবি নহি। জন্মদুঃখী। আমি বিশ্বকাব্যের কোনও আভাস এখনও পাই নাই। এ জন্মে পাইব কি না, জানি না। মাঝে মাঝে সৌন্দর্য্যের ছটা দেখিয়া মুগ্ধ হই, কিন্তু কোন পথ দিয়া তাহার আকর গিয়াছে, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই। শুনিয়াছি, অন্ধকারময় ভূগর্ভে কয়লার খনির গভীর স্তরে মণিমাণিক্য পাওয়া যায়। তুমি কখনও তাহার সন্ধান পাইয়াছ কি? এই যে বিস্তীর্ণ দেশ, কত দুঃখী দরিদ্রকে তুমি অন্ন দিতেছ, কত অদ্ভুত জাতি লইয়া কলকারখানা পাতিয়াছ, কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, ইহাদের দুঃখ কখনও মিটে না কেন? ইহাদের উন্নতি কোন দিক দিয়া হইবে? কোন্ পথে গেলে এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে সেই মণির সন্ধান পাইবে? তোমার রূপ আছে, ঐশ্বর্য্য আছে, প্রভুত্ব আছে। তুমি মুগ্ধ করিতে পার। তোমার করস্পর্শে যাহা হইবে, আমার শত কাব্যেও তাহা জগতে ঘটিবে না। লীলা! আমি যাহা বলিলাম, মনে রাখিও। তোমার শক্তি সেই মণির সন্ধানে নিযুক্ত হউক। যদি কখনও তাহার সন্ধান পাও, তবে আমি তোমার 'ভাই' বলিয়া জগতে গৌরব করিব।

লীলা বিনোদের বক্ষে তাহার কমনীয় মুখখানি রক্ষা করিয়া বলিল, 'আজ হইতে তুমি আমার ভাই।' আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম।

বাহির হইতে আলোক আসিয়া খনির মুখে মধ্যে মধ্যে উদ্ভাসিত হইতেছিল। বিনোদ অবাক হইয়া লীলার অপূর্ব্ব রূপের পরিবর্ত্তন দেখিতে লাগিল। সকলই সুন্দর, সকলই শোভাপূর্ণ। রমণীর মুখ শরতের আকাশ, রমণীর হৃদয় বীণাযন্ত্র। মন্ত্র-সঞ্চারে প্রদীপ্ত হয়, ছবির মত জাগিয়া উঠে, ঝঙ্কার দেয়। সৃষ্টিতত্ত্ব সেইখানে।

সংহার সৃষ্টির স্থান, সংহারের স্থান। বিশ্বসৃষ্টিমাঝে কতকগুলি জিনিস আছে, তাহারা অমর। তাহার মধ্যে প্রেম একটি। সেখানে সংহারের অধিকার নাই। কালাগ্নি তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না। শাণিত কুঠারের আঘাত সেখানে নিষ্ফল হইয়া যায়। বিপুল জীবনসংগ্রামে বড় বড় পাদপ ঝড়ে ও দাবানলে নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ বনকুসুম একাকী অরণ্য-মধ্যে সহস্র বৎসর ধরিয়া অশ্রুবর্ষণ করে। তাহার মরণ নাই।

৯

দুই দিনের মধ্যে অনেক ঝড় বহিয়া গেল। হরিনাথ বাবুর স্ত্রী ও সীতানাথ বাবুর বিনোদকে খুব পছন্দ হইয়াছে। তাঁহারা বিনোদের জননীকে পত্র লিখিয়াছেন। কথা—লীলার সঙ্গে বিনোদের বিবাহের প্রস্তাব। তাঁহাদের ধারণা যে, লীলা বিনোদকে ভালবাসে। ধারণাটা অন্যায় হয় নাই, কেন না, বিনোদের গানগুলি লইয়া লীলা গাইত। লীলা তাহার 'গাউন' ছাড়িয়া ঢাকাই শাড়ী পরিধান করিত, এবং নিজের পরিবর্ত্তন দেখিয়া অতিশয় লজ্জিতা হইত। লীলা কুলীদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য ও তাহাদের ধর্ম্মে মতিসঞ্চারের জন্য কতকগুলি প্রকাণ্ড উপায় উদ্ভাবন করিয়া বসিল। ইহা অপেক্ষা আবার প্রমাণ কি চাহি? এমন কি, এই সব কথা শুনিয়া ডাক্তার বসু, এম. ডি. (এডিনবরা) সন্দিগ্ধচিত্তে সীতানাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার কি আর কোনও আশা নাই?

সীতানাথ বাবুর বিপুল ঐশ্বর্য্য লোভনীয় হইলেও ডাক্তার বসু সেটার দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই, সেটা তিনি লীলার বড় দিদিকে কলিকাতায় বুঝাইয়া দিলেন। লীলার দিদি হরিনাথ বাবুর স্ত্রীকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন 'মা, তোমরা কি পাগল হইয়াছ। আমার বোধ হয়, তোমাদের একটা ভ্রম ঘটিয়াছে।' লীলা এ সব কথা কিছুই জানিত না। হঠাৎ দিদিমণির পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইল। 'লীলা, তোমার হৃদয় বুঝিয়া দেখ।'

সন্ধ্যার পর একাকিনী গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া লীলা দিদিমণির অদ্ভুত পত্রের উত্তর দিতে বসিল।

লীলা ভাবিল, 'এ সব কথা উঠিল কেন? হৃদয়ে বুঝিবার কি আছে? আমি বিনোদকে ভালবাসি। ভালবাসা কি? বিনোদকে দেখিলে, বিনোদের কথা শুনিলে, আমি ব্যাকুল হইয়া পড়ি। সেটা কি যৌবনের মোহ? কখনও না। অনেক সময় অনেকে অধীর হইয়া পড়ে। জীবনে সাথী চায়।

'কিন্তু একটা কথা। আমি ত বিনোদকে জানিতাম না। হঠাৎ আমি তাহার কথা শুনিয়া আত্মবিস্মৃত হইলাম কেন? মনে কর, সে আমার বন্ধু। ভাই কি? বন্ধু কি? তাহারা কি আমার বাধ্য? তাহারা কি জীবনের পথে আমার সঙ্গী হইয়া যাইবে?

'বিনোদই কি যাইবে? কখনও না। সে তাহার গন্তব্য পথ আমাকে বলিয়া দিয়াছে। আমি তাহার কথা শুনিব। সেই পথ অন্বেষণ করিব। নাও করিতে পারি। বিনোদ কি আমার বাধ্য হইবে, কখনই না। আমি উপাসনা চাহি। উপাসনা করিতে পারিব না। সেটা নিশ্চিত।

'তবুও তাহাকে ভালবাসি কেন?'

লীলার হৃদয় জলধিতরঙ্গের ন্যায় উছলিতে লাগিল।

'ওটা ভালবাসা নয়—ক্ষোভ। নিরাশা নয়—পরাজয়। বিনোদ তাহার উদ্ধত বাক্যে আমাকে পরাস্ত করিয়াছে। সে কখনও আমার হইবে না।

'ওঃ! এই কথাটুকু এতক্ষণ মনে পড়ে নাই। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, বিনোদ কাব্যময়ীর। বিনোদ দুঃখীমণিকে ভালবাসে। সে যদি বলে, 'না', তবুও আমি বিশ্বাস করিব না। কখনও বিশ্বাস করিব না।

'বিনোদ ভক্তি চাহে, উপাসনা চাহে। দুঃখের মধ্যে মণির অনুসন্ধান করে। সে রকম কাব্য আমার মানসে উদিত হইবে না। সে দুঃখীমণিকে লইয়া সুখে থাকুক। আমি তাহার পথে বাধা দিব না। তাহাকে সুখী দেখিলেই আমার সুখ।

'কিন্তু বিনোদ বলিয়াছে, সে চিরকালই জন্মদুঃখী হইয়া থাকিবে। তাহাই বা হইতে দিব কেন?'

হায় রে রমণী-হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য! শক্তি কখনও আপনাকে চিনিতে পারে না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া লীলা লিখিল, 'দিদিমণি, তোমার বয়সের সঙ্গে সন্দেহ বাড়িতেছে। বিনোদ আমার ভাই। আমাদের দুই [illegible] ভ্রাতা

কেহ নাই। সেই জন্য হঠাৎ মনে হইয়াছে, বিনোদ আমাদের 'ভাই'। বিনোদ সংসারের কিছু বুঝে না, কিন্তু তার কথাগুলি মনে লাগিয়াছিল, তাই ভ্রাতৃ-স্নেহের একটা গ্রন্থি হৃদয়ে পড়িয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া আমার হৃদয়ের অন্য কোনও সংবাদ নাই। আমাদের হৃদয়ে খুব বল আছে। বাহিরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিব। তুমি 'সকলকে' এ কথা বলিতে পার।'

হরিনাথ বাবুর বাড়ীতে বিনোদ বসিয়া জননীকে পত্র লিখিতেছিল, 'মা, তুমি বোধ হয় ভাবিয়া দেখ নাই। লীলা বড়লোকের মেয়ে। তাহার বিবাহের কথা পূর্ব্বে একবার হইয়া গিয়াছে। তুমি আমার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইও না। আমার মনের কথা তোমার সঙ্গে দেখা হইলে বলিব।'

দুঃখীমণি সমস্ত দিন মাঠে মাঠে রৌদ্রে দৌড়াইয়া বেড়াইয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিনোদের জন্য জলখাবার প্রস্তুত করিয়া 'দাদামণি'র নিকট শয্যায় শুইয়া পড়িল।

হরিনাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ সমস্ত দিন কোথায় ছিলে?'

দুঃখীমণি। আজ গরু চরাইতে গিয়াছিলাম। মাঠে ঘাস নাই, তাই অনেক দূরে গিয়াছিলাম। সেখানে রৌদ্র বড় প্রখর। অন্য দিন ছোট ছোট পাখী গাছে বসিয়া ডাকিত, আজ ডাকে নাই। অন্য দিন একটু ছায়া থাকে, আজ তাহাও ছিল না। শীত গিয়াছে। কিন্তু আমার বোধ হয় ভুল। দাদামণি! আজ বুকে সেই রকম যাতনা!

হরিনাথ বাবু দুঃখীমণির কপাল স্পর্শ করিয়া দেখিলেন যে, খুব উত্তপ্ত। হরিনাথ বাবুর ভয় হইল। দুঃখীমণির তাহার মাতার ন্যায় 'হার্টে'র ব্যায়রাম ছিল। হরিনাথ বাবু শয্যা হইতে উঠিয়া ভৃত্যকে ডাকিলেন।

দুঃখীমণি। কেন? কেন? দাদামণি?

হরিনাথ বাবু। ডাক্তারকে ডাকিয়া আনুক।

দুঃখীমণি হাসিয়া বলিল, 'কখনই না। সামান্য শীত। খুব সামান্য। তুমি বিনোদ বাবুকে জল খাইতে বল।'

হরিনাথ বাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'তবে বিনোদকে ডাকি।'

১০

হরিনাথ বাবু বলিলেন, 'বিনোদ! দুঃখীমণির একটু জ্বর হইয়াছে বোধ হয়। কিন্তু ডাক্তার ডাকিতে বারণ করিতেছে।'

বিনোদ গম্ভীরভাবে বলিল, 'এখন দরকার নাই। যদি সকালে জ্বর না ছাড়ে, তখন দেখা যাবে।'

ভৃত্য সন্ধ্যা-প্রদীপ গৃহে রাখিয়া গিয়াছে। হরিনাথ বাবু তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। বিনোদ শিয়রে একখানি চেয়ারে বসিয়া রহিল।

দুঃখীমণি বিনোদকে বলিল, 'আপনি জলখাবারটুকু খেয়ে আসুন।' সে বিনোদের দিকে তাকাইতে গেল, কিন্তু দৃষ্টি উঠিল না। অর্দ্ধপথে, অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষুর মধ্যে দৃষ্টি রহিয়া গেল।

বিনোদ ভাবিল, 'আপনি' আবার কেন? জ্বরে বোধ হয় দুঃখীমণির অলৌকিক রূপ সম্পূর্ণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বিনোদ তাহাই দেখিতে লাগিল।

বিনোদ বলিল, 'তুমি বড় অসাবধান। আর কখনও রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিও না।'

দুঃখীমণি। না।

বিনোদ ধীরে ধীরে দুঃখীমণির কেশপাশ উন্মুক্ত করিতেছিল। দুঃখীমণি বলিল, 'না।'

তাহা শুনিয়া বিনোদ সমস্ত কেশগুলি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া দিল। দুঃখীমণি তাহাতে বাধা দিল না। বিনোদ কপাল স্পর্শ করিয়া বলিল, 'তোমার বেশ জ্বর হয়েছে।'

দুঃখীমণি। না।

বিনোদ। তবে আমার সঙ্গে গল্প কর।

দুঃখীমণি। না।

বিনোদ। তবে আমি তোমাকে ঘুম পাড়াইয়া দিই। ইহা বলিয়া বিনোদ নির্ব্বিবাদে দুঃখীমণির মস্তকের এক ভাগ বাম হস্তে রাখিয়া, দক্ষিণ করসংযোগে তাহার ভ্রূযুগল স্পর্শ করিল। সেই স্পর্শে লজ্জাবতী লতার ন্যায় দুঃখীমণির নয়ন মুদ্রিত হইল। ঈষৎ কম্পিত পত্রদ্বয় কোমল অঙ্গুলী দ্বারা আবরণ করিয়া বিনোদ বলিল, 'এইবার একটু ঘুমাইবার চেষ্টা কর।'

বিনোদ ভাবিতেছিল, 'এই চিরদুঃখিনীর যত্ন করিবার কেহ নাই। আমরা বনের ফুল আনিয়া উদ্যানে যত্ন করিয়া রাখি, সে স্নেহটুকুও ইহার উপর সিঞ্চিত হয় না। অথচ দুঃখিনী সকলের সেবা করিয়া বেড়ায়।'

বাতায়ন দিয়া সহস্র নক্ষত্রালোক গৃহে প্রবেশ করিতেছিল। বিনোদ আকাশের দিকে তাকাইয়া মনে মনে বলিল, 'দয়াময়! তোমাকেই যখন আমরা উপেক্ষা করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিই, তখন তোমার সন্তান কোন্ ছার? তোমাকেই যখন বিশ্বাস করি না, তখন প্রেমের স্থান কোথায়? তবুও

তোমার কত করুণা! এইগুলিকে জগতে পাঠাইয়া মানবের উচ্চাসন দেখাইয়া দাও।'

কোন্‌গুলি? বিনোদের অশ্রু গিয়া দুঃখীমণির নয়নকোণে পড়িল। উভয়ের অশ্রুধারা সেই পুণ্য নিশীথে মিশিল।

দুঃখীমণি চুপি চুপি শয্যা হইতে উঠিয়া গিয়াছে। বিনোদের জলখাবার ও অন্নব্যঞ্জন পার্শ্বের গৃহে সাজাইয়া রাখিয়াছে। রাত্রি তখন প্রায় দশটা।

হরিনাথ বাবু প্রগাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। তাই ত উপায়? কি করিয়া জাগাই? একবার নিদ্রিত মুখখানি অনিমেষনয়নে দেখিয়া লইল। 'তাহাতে দোষ কি? বিনোদ লীলাদিদিকে ভালবাসে? তাহাতে কি আসে যায়?'

বিনোদ স্বপ্ন দেখিতেছিল। স্বপ্নভরে বলিল, 'না, না, তোমার ভুল হয়েছে।' বিনোদ জাগিয়া উঠিল। বিনোদ গৃহের চতুষ্পার্শ্বে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি নাকি?'

দুঃখীমণি খুব হাসিয়া বলিল, 'বোধ হয়।'

বিনোদ। আমি কি বল্‌ছিলাম?

দুঃখীমণি। 'আমার ভুল হয়েছে।'

বিনোদ। ঠিক তাই! আমার সম্বন্ধে তুমি যত কথা ভাব, সবই ভুল, সে ভুলটুকু কেন হয়? আমি বুঝাইয়া দিই। প্রথমতঃ, তুমি আমাকে একটা উচ্চাসনে বসাইয়াছ, এক জন কবি বলিয়া স্থির করিয়াছ। আমি সে আসনের অধিকারী নহি। দ্বিতীয়তঃ, সেই উচ্চাসনে আর এক জনের পার্শ্বে বসাইয়া কল্পনায় একটা মিথ্যা জগতের সৃষ্টি করিয়াছ। তৃতীয়তঃ, নিজেই এই কল্পনা-জাল পাতিয়া নিজের দুঃখ, এবং আমার দুঃখ টানিয়া আনিয়াছ।

দুঃখীমণি। তোমার দুঃখ?

বিনোদ। নিরপরাধীর দুঃখ। কাব্যময়ী! তোমার মনে যখন যাহা উদয় হয়, আমি জাগ্রতে ও স্বপ্নে দেখি। আমি সকল ভাব বিসর্জ্জন দিয়া, আমার হৃদয় তোমাকে পাতিয়া দিয়াছি। তুমি কল্পনায় দুঃখ গড়িলেও আমি মনে দুঃখ পাই। আমি জানি, তোমার জীবন দুঃখময়, এবং তোমার স্বভাবই দুঃখের ছবি সৃষ্টি করা। যে দেশ তোমার, তাহাও চিরদুঃখী। কিন্তু আমি সে দুঃখ সহিব, কেন না, এই সহাটুকুই আনন্দ ও ধর্ম্ম।

কাব্যময়ী প্রশান্ত প্রেমময় দৃষ্টিতে বিনোদের দিকে চাহিল। মানবজীবনে সে দৃষ্টি দুর্লভ।

'বিনোদ, এখন আমার সন্দেহ গিয়াছে, লজ্জাও গিয়াছে। আমার বোধ হয়, দুই জন জগতে একত্র সুখী হইতে পারে না। আমার দুঃখ সহিলে তুমি সুখী হও, তোমার দুঃখভার সহিলে আমি সুখী হই। তবে আমাদের উভয়কেই চিরদুঃখী হইতে হইবে। আমার কল্পনার কি দোষ পাইলে বিনোদ?'

বিনোদ কাব্যময়ীর হাত ধরিয়া বলিল, 'চল, আমি আহারের কথাটা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।'

গৃহান্তরে গিয়া বিনোদ আসনে বসিল। কাব্যময়ী পার্শ্বে উপবেশন করিল। বিনোদ গোটা দুই সন্দেশ মুখে দিয়া বলিল, 'আশ্চর্য্যের কথা এই, এক জন যদি আর এক জনের দুঃখভার বহে, তবে উভয়কেই ভগবান সুখী করেন। তুমি যদি আমার দীনগৃহে লক্ষ্মী হইয়া এস, তবে সেটুকু চেষ্টা করিয়া দেখিব।' কাব্যময়ী সরমে অবগুণ্ঠন দিয়া চলিয়া গেল।

১১

দশমীর দিন দিবাভাগে একটি পথিক 'রাঁচি এক্‌স্‌প্রেসে' বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ ধরিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। পথিক নিদ্রিত। হঠাৎ মেদিনীপুর ষ্টেশনে এক জন লোক প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়ের নামই কি বিনোদ বাবু?'

বিনোদ। কেন?

আগন্তুক। আপনাকে এক জন ভদ্রলোক এই পত্রখানি দিতে বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। লোকটি সন্ন্যাসী বলিয়া বোধ হয়।

পত্র গ্রহণ করিবামাত্র রেল ছাড়িয়া দিল। বিনোদ আলোকের সাহায্যে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিল—'বিনোদ বাবু—বোধ হয় মনে পড়িতে পারে—আমি সেই হৃষীকেশ। আপনার পকেট হইতে যে চল্লিশটি টাকা অপহরণ করিয়াছিলাম, তাহার ফলে, আপনি কাব্যময়ীর সন্ধান পাইয়াছেন। ফলাফলের ভার ভগবানের হস্তে। আপাতঃ এই পত্রের মধ্যে ৪৫৲ টাকার নোট পাইবেন। পাঁচ টাকা সুদস্বরূপ গ্রহণ করিবেন। আর একটা কথা, কাব্যময়ীর সঙ্গে আপনার অচিরে বিবাহ হইবে। আমার ভাগ্যে তাহা দর্শন করা ঘটিবে কি না সন্দেহ। কারণ, আমি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছি। যদি আপনার কাব্যময় ব্রতের ভবিষ্যতে কোনও আভাস পাই, তবে বাঁচিয়া থাকিলে হয় ত দেখা হইতে পারে। শেষ কথা—আপনাকে যে আমার বাল্যবন্ধু শ্রীশের কথা বলিয়াছিলাম, কাব্যময়ী সেই শ্রীশের কন্যা। যদি পরিচয় না পাইয়া থাকেন, তবে, সেই পুরাতন গল্প মনে করিয়া তাহার জন্য একবিন্দু অশ্রুবিসর্জ্জন করিবেন। আজ বিজয়ার দিন—ধর্ম্মজগৎ ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে, আজ আরও একপদ গভীর স্তরে অগ্রসর হইবেন। কল্যাণকামনায় আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি। বাড়ী ফিরিয়া, জননীর চরণে প্রণাম করিয়া সব কথা বলিবেন। বোধ হয় মনে থাকিবে—দুঃখের পথেই ধর্ম্ম—অশ্রুর মধ্যে পবিত্রতা ও ধর্ম্ম নিহিত। ধর্ম্মের মধ্যে শক্তি —চিরস্নেহের হৃষীকেশ।'

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। কার্ত্তিক।—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাজরি' তাঁহার আবিষ্কৃত 'ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি'র বিজয়-বৈজয়ন্তী। আবার পরিত্যক্ত চিত্র-রীতির পুনরাবর্ত্তন।—অবনীন্দ্রনাথ যেন পাকা ঘুঁটী কাঁচাইয়া খেলাটা মাটী করিতেছেন।—কেমন করিয়া বলিব—কেমন সেই ছবিখানি। কোন ভাষায় বর্ণিব সেই তিন রূপসীর তিন রূপ। কেমন করিয়া বুঝাইব তাহাদের ঢেউ-খেলানো দেহযষ্টির সেই আঁকা-বাঁকা ভাব, পাঁকাটী-বিনিন্দিত হাতের সেই ত্রিভঙ্গিম ভঙ্গী, শুক্‌নো, পাকানো, লতানে আঙ্গুলের সেই উৎক্ষেপ, বিক্ষেপ, প্রক্ষেপ। কোন ছন্দে বাখানিব এই তিন সুন্দরীর সৌন্দর্য্য!—অবনীন্দ্রনাথ সেকালের দোহাই দিয়া ছবিখানি আঁকিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার 'মডেল'—আদর্শ তত পুরাতন নহে। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও কলিকাতার রাজপথে বিবাহের শোভাযাত্রায়, ময়ূরপঙ্খীর উপর নির্লজ্জ নাচের যে জঘন্য caricature—ললিত লাস্যের যে অপমান দেখিয়া মরমে মরিয়া যাইতে হয়, সুবেশা, সালঙ্কৃতা সুন্দরীর অপভ্রংশে 'ভারতীয় চিত্রকলা'র রাফেল সেই কদর্য্য, নির্লজ্জ ভঙ্গীর আরোপ করিয়াছেন। শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর 'এবারের আগমনী'র প্রথম শ্লোকটি মামুলী প্রকৃতি-বর্ণনা—পুরাতনের চলনসই প্রতিধ্বনি। তাহার পর টানিয়া বোনা। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী আধ-আধ আড়ষ্ট ভাষায় 'নারীশিল্পাশ্রমে'র সমর্থন ও নারীজাতির শিল্পশিক্ষার উপযোগিতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। নূতন কথা নাই বটে, কিন্তু ভাষার নূতন সৃষ্টি আছে।—'তাই এখন কাটা শিল্পই প্রধানভাবে অর্থকরী।' 'কাটা' শিল্প—অর্থাৎ, দরজীর কাজ। 'প্রধান ভাবে'র প্রাধান্য নিশ্চয়ই শিরোধার্য্য। তার পর 'শিল্প * * 'অর্থকরী'। প্রলয়ঙ্করী ভাষা বটে। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ইন্দু' উল্লেখযোগ্য, উপভোগ্য। অপভাষার কালো মেঘেও তাঁহার কল্পনার 'ইন্দু' মলিন হয় নাই। 'ইন্দু' যে ভাবুক চিত্রকরের সৃষ্টি, তাহা কথায় আঁকা ছোট ছোট চিত্রে, কবিত্বের মৃদু সৌরভে, সৌন্দর্য্যের চকিত বিকাশে সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়। 'ভারতী'র কুঞ্জে শ্রীযামিনীকান্ত সোম যে বিদেশের 'নীলপাখী' ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহা এখনও উড়িতেছে। শ্রীকালিদাস রায় টেনিসনের 'Turner' হইতে যে 'সৌভ্রাত্রে'র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা যদি টেনিসনের দৃষ্টিগোচর বা কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার গোরে নড়িয়া উঠিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এমন অপচার জাহির করিতে কবি কালিদাসের লজ্জা হয় নাই।—আজ কাল ইহাঁর 'কবিতা' দেখিয়া মনে হয়, 'একাং লজ্জাং পরিত্যজ্য ত্রিভুবনবিজয়ী ভব' 'কবিবরে'র কবিজীবনের মূলমন্ত্র হইয়াছে। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধ' উল্লেখযোগ্য।—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর 'বিদায়ে'র এক বর্ণও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু 'মানে' না হউক, মজা হয়! যথা,—'ইন্দ্রধনু পরিবে সে ধরণীর ফাঁদ?' কখনই নহে। ইন্দ্রধনু দূরে থাক, তাহার ছিলাও কখনও এমন দুষ্কর্ম্ম করিবে না, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। যে চাষা সোনার বাটীর সন্ধানে ইন্দ্রধনু লক্ষ্য করিয়া তেপান্তর মাঠে ছুটিয়াছিল, সেও ইন্দ্রধনুর এমন অপবাদ রটায় নাই।

অতএব, উদ্ভট-প্রসবিনী যতীন্দ্র-প্রতিভার উতলা হইবার কোনও কারণ নাই। 'কররক্তফাগ'! —সোনার উপর গিল্টী! 'ক্ষণিক চিত্তের দীপ্তি খেয়াল-খনির!' 'নূতন কিছু করো'র জয়-জয়কার! কবির মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই বরাকর, অন্ততঃ ঝড়িয়া, নতুবা এমন উপাদেয় 'খেয়ালের খনি' সম্ভব হইত না। উপসংহারে একবারে 'কাব্যি'র চূড়ান্ত!—

'তবু শেষ-আশা প্রিয়, যদি কোন দিন
চিত্তে মেঘ করে আসে স্নেহার্ত্ত নবীন
আজি শ্রাবণের মত—পূর্ণ কূলে-কূলে
সমস্ত আকাশ ভরি—পূর্ব্ব স্মৃতিফুলে'
উঠে সে পালের মত মরমের তলে,
জানিও একটি চিত্ত ছায়া-অন্তরালে
রবে চির-নির্নিমেষ ঐ মুখ চাহি'—
এই সে অন্তিম সাধ—অন্য সাধ নাহি।'

প্রথম চারি চরণের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে কবিও নিশ্চয়ই বলিবেন,—'কোন * * লিখা রে?' 'স্নেহার্ত্ত নবীন' কে? এ প্রশ্ন বাঙ্গালার আগামী সাত বৎসরের সমস্ত বরযাত্রীকে অনায়াসে হারাইয়া দিতে পারিবে। তার পর, 'পূর্ণ কূলে—কূলে, সমস্ত আকাশ ভরি—।' যতীন্দ্রমোহন আকাশের কূল পাইয়াছেন! কে বা কি 'পূর্ণ কূলে কূলে', তাহা অবশ্য যতীন্দ্র-কূট। তার পর, 'পূর্ব্ব স্মৃতিফুলে সমস্ত আকাশ' ভরিয়া গেল! ইহাতেও নিস্তার নাই! কোনও উহ্য বস্তু, অথবা প্রথম চরণের 'শেষ-আশা', 'উঠে সে পালের মত মরমের তলে!' ইংরেজী ভাষায় ইহাকেই বোধ হয় climax বলে! পালের কবিতাই বটে। আশ্চর্য্য এই যে, ইহাও ছাপা হইয়াছে। 'তাও ছাপালি পদ্য হোলো' বটে, কিন্তু ইহার দাম যে একটা কাণা কড়াও নয়! শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবীর 'স্মরণ' গদ্য-প্রহেলিকা। ইহাতে 'বেদনাহত' আছে, 'মৃত্যুশ্রী' আছে, মেটারলিঙ্ক আছে, কেবল নিস্জে নাই। তাহা হইলেই 'সময়োচিত' হইত। শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভূতগত ব্যাপার' ভুতুড়ে গল্প। ভূতের ব্যাপার যেমন হয়। 'বাদশাহ আকবরের নিরক্ষরতা' শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের রচনা। আকবরের স্বাক্ষর এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। লেখক বলেন,—'অন্যান্য প্রমাণের সহিত ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, আকবর নিরক্ষর ছিলেন।' কিন্তু 'অন্যান্য প্রমাণের সহিত ইহা হইতে' কি ভাষা? 'ইহা হইতে' তাঁহার প্রতিপাদ্য ত অনুমানে কুৎ করিয়া লইতে হয়। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'অন্ধকার' সূচীপত্রের হুকুম অনুসারে 'গল্প' হইতে বাধ্য। যেমন আখ্যানবস্তু, তেমনই ভাব, তেমনই ভাষা। এ বলে, আমাকে দেখ্, ও বলে আমাকে দেখ্! বাঙ্গালা ভাষায় একটা অদ্ভুত প্রয়োগ ক্রমে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিতেছে। 'একটি চাপা নিশ্বাস উঠিল—সে যেন চুপে-চুপে অস্ফুট হাহাকার!' সর্ব্বনাম 'সে' এখন 'তাহা'র স্থান অধিকার করিতেছে। 'চুপে-চুপে অস্ফুট' অবশ্য লেখকের খাস্ 'প্যাটেণ্ট'। শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শেষ-গোধূলি' ধূলিজালে অন্ধকার—আলোর লেশমাত্র নাই। আমরা জানিতাম, ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু এখনকার গৌড়-কবিরা ভাব ঢাকিবার জন্য তাহার ব্যবহার করিতেছেন। বিধাতা বাঙ্গালীকে অন্তর্য্যামী করিয়া না দিলে এই শ্রেণীর রচনা চিরকালই abracadabra হইয়া থাকিবে। 'স্বপ্নকে' ও 'চম্পকে' মিল হয় বটে, কিন্তু তাহা 'যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ী কিবা ডোম'-বৎ অধম। 'শুকিয়ে গেছে, তরুণ কলি আমার মানস-চম্পকে' উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক বটে, কিন্তু মনের সঙ্গে

চম্পক বৃক্ষের উপমা কষ্ট-কল্পনার আটাশে ছেলে। ইহা যদি চলে, তাহা হইলে 'জড়িয়ে গেছে রশী ও পালে আমার মানস-মাস্তুলে'ও কবিতা হইতে পারে। 'মৃত্যু দেছে ফাল্গুনী চুম্বন!' —চুম্বনের অনেক রকম-ফের বাঙ্গালা 'কাব্যি'তে দেখা গিয়াছে, কিন্তু 'ফাল্গুনী' চুম্বন সম্পূর্ণ নূতন! কুঁজোর কি চিৎ হইয়া শুইবার সাধ হয় না? মৃত্যুরও চুম্বনের সাধ হইতে পারে। কিন্তু তাহার চুম্বনের নাম 'ফাল্গুনী' হইল কেন? ফাল্গুন মাসেই কি মৃত্যুর 'চুম্বন পায়'? অথবা করুণা-নিধান-কবিতা-বাঞ্ছিত মৃত্যুর চুম্বন কুম্ভীর তুল্য? মৃত্যুর চুম্বনে গাণ্ডীবের টঙ্কারের মত শব্দ হয় বলিয়াই কি তাহার এই অভিধান?—এ সমস্যা কে পূর্ণ করিবে? 'ছায়া-পথ'টি কবির কল্পনায় 'বীণে' পরিণত হইয়াছে! ইহা খুব উচ্চ শাখার কল্পনা। সমগ্রই ত মানব-বুদ্ধির অগম্য। 'টুক্‌রো' অলঙ্কারও এইরূপ অস্পৃশ্য। অ-চিন পাখীকেও চেনা যায়, কিন্তু করুণানিধানের কবিতার 'অ-পার' পার হওয়া দায়। যুগল-সম্পাদকের বালাই লইয়া মরি। নহিলে এমন 'শেষ-গোধূলি' বাঙ্গালার ভাগ্যে ঘটিত না। শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী 'মল্লারের সুরে' আগুন লইয়া খেলা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'ঢেলে ধরিবার আগে কেউটে ধরিবার' চেষ্টা সুবুদ্ধির কাজ নহে। বাঙ্গালা দেশের মাসিকপত্রে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস যে রুচির উত্তরসাধক, বাঙ্গালী পাঠক তাহা চাহিতেছে। তাই শুদ্ধান্তঃপুরচারী মাসিকে আজকাল অবাধে এই শ্রেণীর গল্পের আমদানী হইতেছে। Realism ধন্য হউক।— 'আর্ট' গোকুলে বাড়ুক। 'লক্ষ্মী'র মাহাত্ম্য ফুটিয়া উঠুক। কাঁচা হাতের এইরূপ সৃষ্টি যাঁহারা বাঙ্গালা দেশে ছড়াইয়া দিতেছেন, তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। কিন্তু যাঁহারা ছেলে মেয়ে লইয়া ঘর করেন, তাঁহারা সাবধান হউন। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচীর 'প্রভাতে ও রাত্রে' 'ভারতী'র কবিতার standardএর মান রাখিয়াছে। 'ইহা বলিলেই সকল বলা হইল'। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'আর্টে অধিকারী-ভেদে' বুঝা যাইতেছে, অনধিকারচর্চ্চাও আর্টের অন্তর্গত।—'অধিকারী-ভেদে' অশিক্ষিতপটু, অনধিকারী লেখক দীর্ঘ-ঈকার দিয়াছেন। যদি সংস্কৃত লেখ, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সন্ধি কর, তাহা হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুশাসন অনুসারে বানান করিও। নয় ত 'সবুজ-পত্র' খাও।—লেখক বলেন,—'অনুশীলন না করিলে শিল্পবোধ অসম্ভব।' বটে? রামমোহন রায় এক দিন আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চুল ফিরাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গী বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল,—'রায় মহাশয়! "শেষের সে দিন মন কর রে স্মরণ" কি কেবল পরের জন্যই হইয়াছিল?' লেখককেও তেমনই জিজ্ঞাসা করা যায়—এ উপদেশটাও কি কেবল পরের জন্য? তুমি কবে শিল্পের অনুশীলন করিলে? পুঁথি খুলিয়া তর্জ্জমাকে কোন্ আর্ট-শাস্ত্রে 'অনুশীলন' বলে? রবীন্দ্রনাথের 'গানে' তাঁহার একালের ভাষায় সেকালের সুর বাজিতেছে। শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হতাশের খেদ' চমৎকার। যিনি ইহার লক্ষ্য, তাঁহার পক্ষেও ইহা উপভোগ্য। ইহাতে সুমিষ্ট শ্লেষ আছে; দীনবন্ধু যাহাকে 'মৌমাছি-খোঁচা' বলিতেন, তাহা নাই। গগন বাবুর হাত আসিয়াছে, মাথা খুলিতেছে। আমরা উজ্জ্বল বর্ত্তমানে উজ্জ্বলতম ভবিষ্যতের আভাস দেখিতেছি। শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী 'মাসকাবারে' এবার যেরূপ রসজ্ঞতা ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পড়িয়া অনেকেই স্তম্ভিত হইবেন।—

'নারায়ণে' প্রকাশিত 'স্বামী' নামক গল্পটি তাঁহার 'ভাল লাগিয়াছে।' তাই তিনি 'গল্পটি মথিয়া তত্ত্বামৃত উদ্ধার করিয়া 'ভারতী'র পাঠকপাঠিকাদিগকে বাঁটিয়া দিয়াছেন। একটা 'তত্ত্ব' এই যে, কুলাঙ্গনা 'অভিমানে' কুলত্যাগিনী হইতে পারে।—আর, গল্পের নায়িকা সৌদামিনী 'নরেনের সঙ্গে তার জীবন কাটাইবার অভিপ্রায়ে ঘর ছাড়ে নাই।' কুলাঙ্গনার ঘর-ছাড়ার কৈফিয়ৎও দেখিতে হইল। সৌদামিনী যখন নরেনের সঙ্গে 'বাহির' হইয়া গিয়াছিল, তখন তাহার 'অভিপ্রায়' কিরূপ ছিল? গল্পের ইন্দ্রজালে সে এক মুহূর্ত্তে স্বামীর অনুরাগিণী হইতে পারে, কিন্তু সেই কুল-ত্যাগের মুহূর্ত্তটা? অজিত বাবুরা হিন্দু বা ব্রাহ্ম না থাকিয়া 'সহজিয়া' হউন না! যদি হুকুম পাই, 'নারায়ণে'র নলিনী পণ্ডিতকে পাঠাইয়া দিতে পারি। শিক্ষায় ধিক্, বিদ্যায় ধিক্, দার্শনিকতায় ধিক্। 'সংযম' কি সাহিত্যে নামশেষ হইল?

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মিত্রের সরল বাঙ্গালা অভিধান।—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত। ৬৬।৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, নিউ বেঙ্গল প্রেস হইতে প্রকাশিত।

এই অভিধানখানি ৺সুবলচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক প্রথমে সঙ্কলিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ইহার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্যক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দত্ত এই সংস্করণের সম্পাদক। অভিধানখানি এবার পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত, সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্ব সংস্করণে ইহাতে যে সকল ভ্রম বা ত্রুটী ছিল, সম্পাদক সে সকলের যত দূর সম্ভব পরিশোধন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্ত্তন করিয়া, স্বীয় অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন। ছোট বড় নির্ব্বিচারে অনেক গ্রন্থকারের চরিত সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকের পথ প্রশস্ত ও বাঙ্গালার Dictionary of National Biographyর সদৃশ পুস্তকের সূচনা করিয়া দিয়াছেন।

এই অভিধানখানি কেবল শব্দকোষ নহে। ইহা একাধারে শব্দকোষ, চরিতকোষ, সাহিত্যপঞ্জিকা, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত প্রবাদের সংগ্রহ। সংক্ষেপে বাঙ্গালা বিশ্বকোষ। একাধারে এত জীবনচরিত অন্য কোনও গ্রন্থে দেখিয়াছি, এমন ত মনে হয় না। তদ্ব্যতীত ভারতের ভৌগোলিক বিবরণ, গ্রন্থ-পরিচয়, প্রসিদ্ধ উপন্যাস ও নাটকসমূহের চরিত্রবিশ্লেষণ, বৈষ্ণব কবিদিগের ব্যবহৃত শব্দের ব্যাখ্যা, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা প্রবাদের সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা, বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তাদিগের, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিদিগের, এবং লর্ড বিশপগণের জীবনচরিত ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্বের ও বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশে অভিধানখানি উপাদেয় হইয়াছে। আশা করি, মিত্রের সরল বাঙ্গালা 'অভিধান' শিক্ষিতসমাজে সমাদর লাভ করিবে। ডিসেম্বর মাসে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা। বর্ত্তমানে কাগজ-পত্রাদির মূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। সে হিসাবে, চামড়ায় ও কাপড়ে বাঁধা, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ সুন্দর সংস্করণের সাড়ে ছয় টাকা মূল্য যে অত্যন্ত সুলভ, তাহা বলাই বাহুল্য।

লক্ষ্মীছাড়া।

১

লক্ষ্মীছাড়া লোক অনেক থাকে বটে, কিন্তু ছিষ্টে সরকারের মত লক্ষ্মীছাড়া আর দুটী ছিল না। জন্মিবার মাস কতক পরেই সে মাকে খাইল; তিন বৎসর বয়সে বাপও মারা গেল। বিধবা পিসী মাতৃপিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে মানুষ করিতে লাগিল। কিন্তু ছিষ্টের অদৃষ্টদেবতার ইহাও সহ্য হইল না। কালের ডাকে পিসীও অনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। তখন ছিষ্টের বয়স সাত বৎসর মাত্র। উপরের এক জন ছাড়া তাহাকে দেখিবার আর কেহ রহিল না।

ছিষ্টের জেঠা ছিল, জেঠী ছিল। কিন্তু জেঠী নিজের সংসার ছেলেপিলে লইয়াই অস্থির। আর জেঠা গোবিন্দ সরকার লোকের মামলা মোকদ্দমার তদ্বির এবং হরিনামের মালা লইয়া ব্যতিব্যস্ত। সুতরাং ছিষ্টেকে দেখিবার অবসর তাঁহাদের ছিল না। ছিষ্টে বামুনপাড়ার গরু চরাইয়া, বামুনদের পাতের ভাত খাইয়া মানুষ হইতে লাগিল।

ছিষ্টের বাপের লাখরাজে জমায় দশ বারো বিঘা জমী ছিল, খিড়কী পুকুরের অর্দ্ধেক অংশ ছিল। গোবিন্দ সরকার শুধু দায়ে পড়িয়াই ভ্রাতুষ্পুত্রের জমী জায়গার দেখা শোনা করিতে লাগিলেন। আর ছিষ্টেকে দেখিতে লাগিল, উপরওয়ালা।

এই অদৃশ্য উপরওয়ালার অযাচিত করুণার বলে ছিষ্টে যখন চৌদ্দ বৎসরে পড়িল, তখন জেঠা এক দিন তাহাকে ডাকিয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "হাঁরে ছিষ্টে, আমার ভাইপো হ'য়ে তুই লোকের গরু চরিয়ে বেড়াবি, এটা কি ভাল দেখায়? তুই আমার ঘরে থাক্।"

ছিষ্টের তখন বামুনদের পান্তা ও পাতের ভাতে অরুচি জন্মিয়া গিয়াছিল। সুতরাং জেঠার কথায় সে হাতে চাঁদ পাইল। জেঠার আশ্রয়ে থাকিতেই স্বীকৃত হইল।

জেঠার ঘরে থাকিয়া ছিষ্টে গরম ভাতের মুখ দেখিতে পাইল বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে সারাদিন মাঠে যে খাটুনী খাটিতে হইত, তাহাতে সে পান্তা

ভাত ও গরম ভাতের মধ্যে কোন্‌টা তাহার পক্ষে অধিক সুখকর, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিত না। জেঠার তিন চারিটী গরু ছিল। ছিষ্টে আসিবার পরই রাখালটা সেই যে চলিয়া গেল, আর আসিল না। জেঠা বলিলেন, "ওরে ছিষ্টে, গো-সেবা পরম ধর্ম্ম। বারো বৎসর গোয়াল পরিষ্কার করলে হাতে পদ্মগন্ধ হয়।" ধার্ম্মিক জেঠার আদেশে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছিষ্টেকে এই পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইল।

ছোট ছেলেটা তাহার এমনই নেওটা হইয়া পড়িয়াছিল যে, ছিষ্টের কোল ছাড়া সে এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারিত না। একবার মাটীতে বসাইয়া দিলে চীৎকারে পাড়া মাথায় করিত। রোদনান্তে তাহার নাসানিঃসৃত জলধারা পরিষ্কার করিতে ছিষ্টের কাপড়ের খুঁট ভিজিয়া যাইত।

এইরূপে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ছিষ্টে এক দিন জেঠা মহাশয়ের নিকট গরম ভাত ও পান্তা ভাতের পার্থক্য বুঝিয়া লইতে গেলে, জেঠা শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, "ওরে হতভাগা, সে যে পরের ভাত, লোকে বলতো—অমুকের চাকর। আর এটা নিজের ভাত, তুই কি আমার অপর পর? আপনার ভাইপো যে।"

ছিষ্টেও বুঝিল, কথাটা মিথ্যা নয়। বাপ আর জেঠায় কি প্রভেদ আছে? সুতরাং সে দিন রাত খাটিয়া দুই বেলা দুই মুঠা ঘরের ভাত খাইতে লাগিল। আর জেঠা মামলায় এবং হরিনামে অধিকতর মনোযোগ দিবার অবকাশ পাইয়া হরিকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

মাস কতক পরে গোবিন্দ সরকার এক দিন ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাপু ছিষ্টিধর, তোমার জমী-জায়গাগুলো পাঁচ ভূতে লুটে খাচ্ছে, তার চেয়ে ওগুলো বেচে ফেল। ওর একটা বিলি বন্দেজ হোক্।"

ছিষ্টে জেঠার পরামর্শে সম্মতিদান করিল। বিপিন চক্রবর্ত্তী তাহাকে বলিলেন, "মর বেটা চাষা, জমী বেচবি কি দুঃখে?"

ছিষ্টে বলিল, "জেঠা বলেছে, ওগুলোর বিলি বন্দেজ হবে।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "তোর সাত পুরুষের মাথা হবে। আমাকে কবুলতী ক'রে দে। বছর বছর খাজানা পাবি, জমী তোরই থাকবে।"

ছিষ্টে গিয়া জেঠাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। জেঠা মালা জপিতেছিলেন। জপ বন্ধ রাখিয়া তিনি বলিলেন, "লোকের কথায় কাণ দিস্ নে বাবা, লোকে কি কারও ভাল দেখতে পারে? আমি আপনার লোক, আমি তোর মন্দ করবো, আর পরে ভাল করবে? বলে—মার চেয়ে দরদী যে, তারে বলি ডান।"

সে দিন রাত্রিতে আহারকালে জেঠা আপনার পাতের মাছের মুড়াটা ভাইপোর পাতে তুলিয়া দিলেন। গৃহিণী প্রতিবাদের সুর তুলিতে যাইতে-ছিলেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে জেঠা স্নেহ-কোমল-কণ্ঠে বলিলেন, "আহা, থাক্। ও কি আমার পর? ও খেলেই আমার খাওয়া হ'লো।"

মাছের মুড়াটা যত মিষ্ট না হউক, জেঠার এই কথাগুলা ছিষ্টের এত মিষ্ট লাগিল যে, তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল।

পর দিন সকালেই গোবিন্দ সরকার ভাইপোকে লইয়া রামপুরের রেজেষ্ট্রী-আফিসে গেলেন। ছিষ্টে জেঠার শিক্ষামত খাওয়া-পরার জন্য জমী বিক্রয় করিতেছে, ইহা রেজিষ্টারের সম্মুখে স্বীকার করিয়া টিপসই দিয়া জমীজায়গা বেচিয়া আসিল। আসিবার সময় জেঠা তাহাকে সাড়ে সাত আনা দিয়া একটা গেঞ্জী কিনিয়া দিলেন।

গ্রামের লোকে বলিল, ছোঁড়াটা কি লক্ষ্মীছাড়া!

২

"দিদি! ও দিদি!"

দিদি মুখ ঝামটা দিয়া উত্তর করিল, "কেন?"

ক্রুদ্ধভাবে ছিষ্টে বলিল, "কেন আবার কি? আমি এলাম ভোর দুপুর খেটে, আর উনি ঘরে শুয়ে শুয়ে বলছেন কেন? বাঃ রে!"

কথাটা হইতেছিল, গোবিন্দ সরকারের বিধবা কন্যা বিধুমুখীর সঙ্গে। বিধবা হইয়া সে বাপের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল।

ছিষ্টে একটু অপেক্ষা করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিল, "তবু যে শুয়ে রইলে?"

বিধু বলিল, "উঠে কি করবো?"

ছিষ্টে বলিল, "ভাত দেবে, আর করবে কি?"

বিধু মুখটা বালিশে গুঁজিয়া বলিল, "ভাত নাই।"

বিস্মিতকণ্ঠে ছিষ্টে বলিয়া উঠিল, "ভাত নাই!"

বিধু বলিল, "না। রাঁধা বাড়ার পর মামার বাড়ীর এক জন লোক এসেছিল। সে তোর ভাত খেয়ে গেছে।"

ছিষ্টে কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তার পর উগ্রকণ্ঠে বলিল, "বাঃ রে, ভাত খেয়ে গেছে, তা আমি খাব কি?"

বিধু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল; তীব্রস্বরে বলিল, "আমার মাথা, খেতে পারবি?"

বিধুর গলাটা যেন ভারী হইয়া আসিল। ঈষৎ হাসিয়া ছিষ্টে বলিল, "যে রকম পেটের জ্বালা ধরেছে, খেতে থাকলে তা খুব পারতাম দিদি।"

বিধু মুখ ফিরাইয়া লইয়া আঁচলে চোখ মুছিল। ছিষ্টে সহাস্যে বলিল, "তুমি যে কেঁদে ফেললে দিদি।"

বিধু ভ্রুকুটী করিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "বোয়ে গেছে আমার কাঁদতে। তোর মত লক্ষ্মীছাড়ার জন্য আবার মানুষে কাঁদে।"

ছিষ্টে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "সত্যি দিদি, তুমি ছাড়া আমার জন্যে আর কেউ কাঁদে না।"

বিধু কোনও উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। ছিষ্টে মাটীতে পা ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "তাই তো দিদি, মুড়ি-টুড়ি কিছু নাই? উঠে দেখ না?"

ধরা গলায় "আমি পারব না" বলিয়া বিধু আবার শুইয়া পড়িল। ছিষ্টে বলিল, "তবে কি আমি উপোস দেব নাকি?"

তীব্রকণ্ঠে বিধু বলিল, "তোর কপাল! বেটাছেলে, হাত পা আছে, আর কোথাও এই খাটুনী খাটলে তো দু'বেলা পেট ভ'রে খেয়ে বাঁচিস্।"

ছিষ্টে কোনও উত্তর দিল না; শুধু দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

গৃহিণী আহারান্তে গালে দোক্তা ও কোলে ছেলে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বাড়ীতে ঢুকিলেন। ঢুকিয়াই ছিষ্টেকে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে ছিষ্টে, ছেলেটাতো কেঁদে কেঁদে সারা হ'য়ে গেল। নে, একবার ধর্।"

ছিষ্টে করুণদৃষ্টিতে দিদির মুখের দিকে চাহিল। বিধু উঠিয়া বসিল, এবং মাতার দিকে রুক্ষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শ্লেষের স্বরে বলিল, "শুধু ছেলেটা দিচ্চ কেন মা, তুমি আছ, বাবাকে ডাক, আর কেউ থাকে, ডেকে নিয়ে এস। সকলে মিলে ছোঁড়াটার বুকে চেপে ব'সো।"

নাসা কুঞ্চিত করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "কেন বল্ দেখি বিদি, আজ কাল দেখছি তোর বড় কথা হ'য়েছে।"

বিধু উঠিয়া দাঁড়াইল; তীব্রকণ্ঠে বলিল, "কথার মত কাজ করলেই কথা শুনতে হয় মা। তোমরা কি মানুষ?"

গর্জ্জন করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "না, মানুষ শুধু তুমি। আচ্ছা আসুক বাড়ীতে; আমার সঙ্গে সমানে কথা! খেংরা মেরে বিদেয় করবো, তা জানিস্?"

মাতার মুখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কঠোরস্বরে বিধু বলিল, "তা তোমরা পার মা।"

বিধু জোরে জোরে পা ফেলিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল।

হাঁড়ীতে এক মুঠা পান্তা ভাত ছিল। কতকটা আমানীর সহিত সেই ভাতগুলি একটা পাথরে বাড়িয়া বিধু ছিষ্টেকে ডাকিল। ছিষ্টে সহর্ষে উঠানে নামিয়া রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিল। এমন সময় সরকার মহাশয় সদর দরজা হইতে চীৎকার করিতে করিতে বাড়ীতে ঢুকিলেন—"বাবু গেলেন কোথায়? গরুগুলো মাঠ থেকে এসে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে। হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া আমার সর্ব্বনাশ করবে দেখছি, গরুর শাপে যে সব যাবে?"

গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "থাম, আগে নিজের পিণ্ডী দান হোক্। গরুর কি আবার ক্ষিদে তেষ্টা আছে?"

ক্রুদ্ধভাবে সরকার মহাশয় বলিলেন, "ওগো বাবু, গরুগুলোকে এক মুঠো ঘাস জল দিয়ে এসে নিজের পিণ্ডী চটকাও না। গরু যে সাক্ষাৎ ভগবতী, ভগবতীর নিঃশ্বেসে যে ভিটে উঠে যাবে।"

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "তুমিও যেমন, ঐ তিন-কুল-খেকো লক্ষ্মীছাড়াকে আবার ঘরে ঠাঁই দেয়।"

রান্নাঘর হইতে বিধু ডাকিল, "ছিষ্টে!"

ছিষ্টে বলিল, "আগে গরুগুলোকে খাবার দিয়ে আসি দিদি।"

ছিষ্টে চলিয়া গেল। "চুলোয় যা" বলিয়া বিধু ভাত আমানী পুনরায় হাঁড়ীতে ঢালিয়া রাখিয়া রাগে গর-গর করিতে করিতে ঘাটের দিকে চলিয়া গেল। গৃহিণী তাহার দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বিদির আজ কাল বড্ড বাড় বেড়েচে দেখচি।"

গম্ভীরস্বরে সরকার মহাশয় বলিলেন, "বাড়লেই পড়তে হয় গিন্নী, দর্পহারী মধুসূদন আছেন। তিনি কারও বাড় রাখেন না। হরি বল মন, হরি বল।"

৩

গোবিন্দ সরকারের মেয়ে বিধুর হৃদয়টা ঠিক বাপের মত ছিল না। দুঃখের প্রচণ্ড আঘাতে তাহা এতই কোমল হইয়া পড়িয়াছিল যে, দুঃখীর দুঃখে তাহা ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারিত না। সুতরাং ছিষ্টের জন্য তাহার প্রাণটা আপনা হইতেই কাঁদিয়া উঠিত। কিন্তু প্রতীকার করিবার উপায় তাহার ছিল না। তাহার ইচ্ছা, ছিষ্টে অন্যত্র খাটিয়া খাউক। কিন্তু ছিষ্টে তাহাতে সম্মত ছিল না। জেঠার বাড়ী ছাড়িয়া দিদিকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে তাহার মন সরিত না। বিধু তাহাকে তিরস্কার করিত, গালাগালি দিত; ছিষ্টে হাসিমুখে নীরবে সে

স্নেহ-কোমল তিরস্কার সহিয়া যাইত। এই তিরস্কার, এই গালাগালির ভিতর এমন একটা স্নেহের আস্বাদ অনুভব করিত যে, দুঃখময় জীবনে এই আস্বাদটাই তাহার লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু তাহার এই লোভনীয় জিনিসটুকুর জন্য দিদিকে যে কতটা নিগ্রহ সহ্য করিতে হইত, তাহা ছিষ্টে জানিত না। যে দিন জানিতে পারিল, সে দিন সে জেঠার আশ্রয় ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইল। জেঠাও ইহাতে অসম্মত ছিলেন না। বলিলেন, "তোমার যেখানে ইচ্ছা, যেতে পার। তুমি দু'বেলায় যা খাও, তার অর্দ্ধেক খরচে একটা লোক থাকবে! গরু বাছুরগুলোও খেয়ে বাঁচবে।"

ছিষ্টে বলিল, "বেশ, কিন্তু আমার জমী জায়গাগুলো?"

জেঠা বলিলেন, "সে সব তো তুমি বেচে ফেলেছ।"

ছিষ্টে জিজ্ঞাসা করিল, "বেচেছি তো, তার টাকা কোথায়?"

জেঠা বলিলেন, "টাকা কোথায়, তা আমি কি জানি?"

ছিষ্টে রাগিয়া বলিল, "তবে সব জুয়াচুরী!"

কি? পরম ধার্ম্মিক গোবিন্দ সরকার জুয়াচোর! জেঠা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে পায়ের জুতাটা খুলিয়া সজোরে ছিষ্টের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। জুতাটা গিয়া ছিষ্টের কপালে লাগিল। ছিষ্টে কপালটা টিপিয়া ধরিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

ছিষ্টে গিয়া বিপিন চক্রবর্ত্তীকে চাপিয়া ধরিল; বলিল, "বামুনকাকা, আমার যা হয় একটা উপায় করে দাও।"

বিপিন চক্রবর্ত্তীর সহিত গোবিন্দ সরকারের একটু বিবাদ ছিল। সরকার মহাশয় তাঁহার বিরুদ্ধে একটা মোকদ্দমার তদ্বির করিয়া প্রতিপক্ষকে জয়ী করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং বিপিন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার উপায় পাইয়া ছিষ্টেকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "উপায় তোমার ক'রে দিতে পারি, তুমি আমার কথামত চলবে?"

ছিষ্টে তাঁহার কথামত কাজ করিতে স্বীকার করিল। বিপিন বলিলেন, "বেশ, তোমার জমী জায়গা সব বা'র ক'রে দেব, তোমার বিয়ে দিয়ে তোমাকে স্থিতু করব।"

ছিষ্টে আশ্চর্য্যান্বিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে!"

বিপিন বলিলেন, "হাঁ; বিয়ে। শ্রীপতি ঘোষ মারা গেছে। তার বিধবা

স্ত্রী আর একটী মেয়ে আছে। তাদের দেখবার শুনবার কেউ নাই। তোমাকে ঘরজামাই হ'য়ে তাদের দেখা শোনা করতে হবে।"

ছিষ্টে শ্রীপতি ঘোষকেও জানিত, তাহার মেয়ে পুঁটীকেও জানিত। মেয়েটী দেখিতে বেশ। কিন্তু তাহার সহিত যে বিবাহ হইতে পারে, এ কথাটা ছিষ্টে আদৌ কল্পনা করিতে পারিত না। সুতরাং সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে?"

বিপিন বলিলেন, "আমি বললেই দেবে। কিন্তু বাপু, তোমার এ রকম লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে থাকলে চলবে না, আগে জমী জায়গাগুলো উদ্ধার করতে হবে।"

ছিষ্টে বলিল, "আমি যে সব বেচে ফেলেছি।"

বিপিন তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, বিষয় বিক্রয় করিলেও তাহা আইন-সিদ্ধ হয় নাই, কেন না, নাবালকের দান-বিক্রয়ে অধিকার নাই। মোকদ্দমা করিলেই সমস্ত বিষয় বাহির হইয়া আসিবে। ছিষ্টে মোকদ্দমা করিতে টাকা কোথায় পাইবে জিজ্ঞাসা করিলে বিপিন বলিলেন, "সে জন্য তোমার চিন্তা নাই। টাকা যা খরচ হয়, আমি দেব; কিন্তু বাপু, এর পর খালধারের আড়াই বিঘা জমিটী আমায় দিতে হবে।"

ছিষ্টে জমী দিতে স্বীকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তত দিন আমি থাকব কোথায়? খাব কি?"

বিপিন বলিলেন, "তত দিন তোমার হবু শ্বশুরবাড়ীতেই থাকবে, সেই-খানেই খাবে দাবে।"

ছিষ্টে বামুনকাকার পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিল।

৪

বিধু যখন রায়দীঘীতে গা ধুইয়া ফিরিতেছিল, তখন ছিষ্টে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। বিধু জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে ছিষ্টে, তোর নাকি বিয়ে?"

ছিষ্টে বলিল, "হাঁ দিদি, বামুনকাকা আমার বিয়ে দিয়ে দেবে।"

বিধু বলিল, "তা বেশ, বামুনকাকার কথামত চলবি। যা বলে, তাই শুনবি।"

ছিষ্টে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা আর শুনবো না দিদি, আমার বিয়ে হবে, জমী জায়গা সব ফিরে পাব। তবে কি জান—"

বিধু জিজ্ঞাসা করিল. "আবার কি ?"

ছিষ্টে বলিল, "আর কিছু নয়, তবে জেঠার সঙ্গে মোকদ্দমা—"

বিধু একটু বিরক্তভাবে বলিল, "তা হোক মকদ্দমা, খবরদার বলছি, বামুন কাকার কথার একটু এ-দিক ও-দিক করিস না। তা হ'লে তোর মুখ পর্য্যন্ত দেখবো না।"

ছিষ্টে বলিল, "না দিদি, তা করবো না। তা হ'লে তোমারও এতে মত আছে ?"

বিধু বলিল, "খুব মত আছে।"

ছিষ্টে প্রস্থানোদ্যত হইল। বিধু ডাকিয়া বলিল, "হাঁরে ছিষ্টে ?"

ছিষ্টে ফিরিয়া দাঁড়াইল। বিধু জিজ্ঞাসা করিল, "তোর হবু শাশুড়ী কেমন যত্ন করে রে ?"

ছিষ্টে সহাস্যে উত্তর করিল, "তা খুব যত্ন করে। তবে তোমার মতন কি ?"

ঈষৎ হাসিয়া বিধু বলিল. "আমার মত গাল দিতে পারে না বুঝি ?"

ছিষ্টে বলিল, "গাল ? তা দিদি, তোমার মত গাল যদি দেশশুদ্ধ লোক দেয়—"

ছিষ্টে হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া পায়ের বুড়া আঙ্গুল দিয়া মাটী খুঁড়িতে লাগিল। বিধু রাগতভাবে বলিল, "যা যা, আর তোর অত ন্যাকামো করতে হবে না।"

ছিষ্টে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিধু সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রে, বৌ তোর সামনে আসে ? কথা টথা কয় ?"

ছিষ্টে মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। বিধু ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তা বিয়েটা হ'য়ে যাক্, তার পর এক দিন গিয়ে দেখে আসব।"

মুখ তুলিয়া ছিষ্টে বলিল, "বিয়ের সময় যাবে না ?"

বিধু বলিল, "যাব না কেন। তুই নিয়ে যাবি ত ?"

মুখ ভার করিয়া ছিষ্টে বলিল, "নাঃ।"

"আচ্ছা আচ্ছা, সে দেখা যাবে" বলিয়া বিধু হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

৫

গোবিন্দ সরকার যখন শুনিলেন যে, ছিষ্টের জমী জায়গা ভোগ করার জন্য ছিষ্টে তিন বৎসরের জমীর আয় বাবদ তাঁহার নামে দুই শত তিয়াত্তর টাকার দাবীতে নালিশ রুজু করিয়াছে, তখন তিনি কয়েকবার শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া জবাব দিয়া আসিলেন যে, তিন বৎসর আগে তের শত তের সালের মাহ চৈত্রের

সাত তারিখে স্থষ্টিধর সাত শত একচল্লিশ টাকা মূল্যে এই সকল জমী জায়গা তাঁহাকে বিক্রয় করিয়াছে, এবং সে বিক্রয়-কোবালা রেজিষ্টার সাহেবের দ্বারা রীতিমত রেজেষ্টারী হইয়াছে। এক্ষণে দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় ছিষ্টিধর তাঁহার নামে এই বে-আইনী নালিশ করিয়াছে।

ইহার জবাবে স্থষ্টিধর বলিল,প্রতিবাদীর কথিত তারিখে সে একখান বিক্রয়-কোবালা রেজেষ্টারী করিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সে স্বেচ্ছায় করে নাই, বা সে জন্য তাহাকে এক পয়সাও দেওয়া হয় নাই। তাহার নাবালক অবস্থায় তাহাকে ভুলাইয়া এই দলীল লেখাইয়া লওয়া হইয়াছিল। স্থতরাং প্রতিবাদীর দাখিলা এই বিক্রয়-কোবালা আইন অনুসারে সম্পূর্ণ অসিদ্ধ।

গোবিন্দ সরকার মোকদ্দায় ঘুণ। মোকদ্দমার তদ্বির করিয়া তিনি মাথার চুল সাদা করিয়াছেন। স্থতরাং তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ মোকদ্দমায় তাঁহার পরাজয় নিশ্চিত। উকীলও মোকদ্দমা মিটাইয়া লইবার পরামর্শ দিলেন। সরকার মহাশয় কিন্তু মিটাইবার মত কোনও উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। বিপিন চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "ছিষ্টিধরের জমীর সঙ্গে গোবিন্দ সরকার যদি নিজের তিন বিঘা জমী ফিরাইয়া দেন, তবেই মোকদ্দমা মিটিতে পারে।" সরকার মহাশয় ছিষ্টিধরের অর্দ্ধেক বিষয় ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু বিপিন চক্রবর্ত্তী তাহাতে কাণ দিলেন না, হাসিয়া প্রস্তাবটা উড়াইয়া দিলেন। সরকার মহাশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

১৫ই অগ্রহায়ণ মোকদ্দমার দিন পড়িয়াছিল। বিশে অগ্রহায়ণ ছিষ্টের বিবাহের দিনস্থির হইল। ১৫ই মোকদ্দমা মিটিয়া গেলেই—মোকদ্দমায় যে ছিষ্টেই জয়ী হইবে, সে পক্ষে কাহারই সন্দেহ ছিল না—বিশে তারিখে বিবাহ হইয়া যাইবে। বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। ছিষ্টের উল্লাসের সীমা রহিল না। তাহার অত্যধিক উল্লাস দেখিয়া লোকে তাহাকে কত পরিহাস করিতে থাকিল। আর গোবিন্দ সরকার চিন্তাবিষে জর্জ্জরিত হইয়া ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীহরিকে প্রাণপণে ডাকিতে লাগিলেন।

সেদিন সন্ধ্যা হইতে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সরকার মহাশয় মালা জপ করিলেন। জপ শেষ করিয়া যখন উঠিলেন, তখন তাঁহার মুখে প্রফুল্লতার চিহ্ন দেখিয়া গৃহিণী আশ্বস্তা হইলেন।

পর দিন সকালে ছিষ্টে জেঠার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া বাজারে যাইতেছিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে জেঠা ডাকিলেন, "বাবা ছিষ্টিধর!"

ছিষ্টে চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। জেঠার চেহারা দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। এই কয়দিনেই তিনি যেন আধখানা হইয়া গিয়াছেন। জেঠা ধীর-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "গোটাকতক কথা আছে বাবা।"

ছিষ্টে বিস্মিতভাবে জেঠার পশ্চাৎ বাড়ী ঢুকিল। সরকার মহাশয় তাহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়াই তাহার হাত ছুইটা জড়াইয়া ধরিয়া, হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ছিষ্টে বিস্মিত-স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সরকার মহাশয় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা ছিষ্টিধর, বুড়ো জেঠাকে মারবি? এই বয়সে—"

ছিষ্টে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সরকার মহাশয় বাঁ হাতে চোখ মুছিয়া অশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "এই বয়সে তুই আমাকে অপমান করাবি? আমার অপমানে কি তোর অপমান নয়? আমার গায়ের রক্ত তোর গায়ের রক্ত কি আলাদা?"

ছিষ্টের বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। মুখ নীচু করিয়া বলিল, "আমাকে কেন জুতো মারলে?"

সরকার মহাশয় দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "রাগ চণ্ডাল বাবা, রাগ চণ্ডাল।"

ছিষ্টে নিরুত্তর। সরকার মহাশয় বলিলেন, "আর যদিই মেরে থাকি। তোর বাপ যদি মারতো, তার নামে কি নালিশ করতিস্? বাপ আর জেঠা কি আলাদা ছিষ্টিধর?"

লজ্জাজড়িতকণ্ঠে ছিষ্টে বলিল, "আমার অন্যায় হয়েছে জেঠা।"

জেঠা সহর্ষে বলিলেন, "তোর অন্যায় নয় বাবা, লোকে তোকে নাচিয়েছে। তা নইলে তুই কি আমার তেমন? কিন্তু বাবা, এই আমি বলে রাখছি, মোকদ্দমা শেষ হ'লেই আমি গলায় দড়ী দেব, জলে ঝাঁপ দেব। তোমাকে এর পাপের ভাগী হ'তে হবে।"

ছিষ্টের প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল। ভয়ে ভয়ে বলিল, "আমি কি করবো?"

তখন সরকার মহাশয় তাহাকে বসাইয়া, এক্ষণে তাহার কি করা কর্ত্তব্য, তাহার বিস্তৃত উপদেশ দিলেন। উপদেশদানান্তে বলিলেন, "তুমি কি মনে কর বাবা, আমি তোমার বিষয় ফাঁকি দিয়ে নেব? রাধে মাধব, রাধে মাধব! আমি কি এতটা পাষণ্ড? পাছে ছেলেমানুষ পেয়ে কেউ বিষয়টা ফাঁকি দিয়ে নেয়, তাই ওটাকে হাত ক'রে রেখেছি। আমি সব ফিরিয়ে দেব, কড়ায় গণ্ডায় হিসেব ক'রে ফিরিয়ে দেব। তোমার বিষয় আমি নেব? হরি, হরি!"

ছিষ্টে ম্লানমুখে বলিল, "কিন্তু বামুনকাকা যে আমার বিয়ে দিয়ে দেবে ?"

সদন্তে সরকার মহাশয় বলিলেন, "বিয়ে ? আজ যদি মনে করি, কাল তোর তিন গণ্ডা বিয়ে দিতে পারি। নয় তো আমার নাম গোবিন্দ সরকারই নয়।"

ছিষ্টে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সরকার মহাশয় বলিলেন, "তোর যদি রাগ থাকে, তুই আমাকে দু' ঘা মার, কিন্তু বাবা, বিপিন চক্রবর্ত্তীকে দিয়ে আমার অপমানটা করাস্ নি।"

সরকার মহাশয়ের দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারা গড়াইতে লাগিল। ছিষ্টে উঠিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বিধু স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। সে ছিষ্টেকে বাড়ীর বাহির হইতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ঈষৎ-উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "ছিষ্টে!"

ছিষ্টে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না, মাথা নীচু করিয়া আপন মনে চলিয়া গেল।

আদালতে মোকদ্দমা উঠিলে ছিষ্টে হাকিমের সমক্ষে দাঁড়াইয়া বলিল, "হুজুর, আমি স্বেচ্ছায় জেঠাকে বিষয় বিক্রী ক'রেছি। পাঁচ জনের কথায় আমি মিথ্যা নালিশ ক'রেছিলাম, এখন আর আমি মোকদ্দমা চালাতে চাই না।"

আদালত শুদ্ধ লোক হাঁ করিয়া ছিষ্টের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হাকিম মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দিলেন।

৬

সন্ধ্যার পর গোবিন্দ সরকার মালা হাতে প্রফুল্লচিত্তে গৃহিণীর সহিত গল্প করিতেছিলেন, এমন সময় ছিষ্টে বাড়ী ঢুকিয়া ডাকিল, "জেঠা!"

জেঠা উত্তর দিলেন, "কে?"

ছিষ্টে বলিল, "আমি ছিষ্টিধর।"

জেঠা গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কি ?"

ছিষ্টে জেঠার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আমাকে ওখানে আর থাকতে দেবে না।"

জেঠা রুক্ষকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "তোমার মত লক্ষ্মীছাড়াকে কে ঠাঁই দেবে, বল। তুমি একটী আস্ত কাল-সাপ। আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করতে বসেছিলে। কেবল ধর্ম্মই আমাকে রক্ষা করেছেন। হরি হে দীনবন্ধু!"

ছিষ্টে স্তম্ভিতভাবে উঠানে দাঁড়াইয়া রহিল। গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন,

"কাল জেঠার নামে নালিশ ক'রে আজ আবার সম্পর্ক পাতাতে এসেছেন! লক্ষ্মীছাড়া হ'লে তার কি লজ্জাও থাকে না গা?"

গৃহিণী উঠিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। জেঠা মুখ ফিরাইয়া লইয়া ঘন ঘন মালা ঘুরাইতে লাগিলেন।

ছিষ্টে অন্ধকারময় উঠানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হইল। বিধু রান্নাঘরের দাবায় দাঁড়াইয়াছিল। ছিষ্টে তাহার সম্মুখে গিয়া ডাকিল, "দিদি!"

রোষগম্ভীরস্বরে বিধু উত্তর দিল, "কেন?"

ছিষ্টে বলিল, "সারাদিন খাওয়া হয়নি দিদি, কিছু আছে?"

বিধু গর্জ্জন করিয়া বলিল, "উনানের ছাই আছে। খাবি?"

ছিষ্টে দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। বিধু উচ্চকণ্ঠে বলিল, "হতভাগা—লক্ষ্মীছাড়া, আমি তোকে খাবার দেব? দূর হ'য়ে যা বলছি আমার সামনে থেকে।"

ছিষ্টে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তার পর একবার দিদির মুখের উপর কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে সন্ধ্যার স্তব্ধ অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। বিধু দাঁতে দাঁত চাপিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা যেন বিধুর চমক ভাঙ্গিল; সে ছুটিয়া গিয়া সদর দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, "ছিষ্টে, ছিষ্টে!"

কোনও উত্তর আসিল না। বিধু আবার চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ছিষ্টে, ওরে ছিষ্টে!"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে সরকার মহাশয় বলিলেন, "সে লক্ষ্মীছাড়া চুলোয় গেছে, এখন তুই তার সঙ্গে যাবি?"

বিধু দুই হাতে সদর দরজা চাপিয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সরকার মহাশয় জপান্তে মালাছড়াটা গলায় ফেলিয়া ভক্তিগদগদকণ্ঠে পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে॥"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আলোচনা।

নারীর ব্যক্তিত্ববিকাশে মতভেদ।

ব্রাহ্মণের সমাজে আজ কাল সকল সংস্কারই তামসিক বলিয়া ঘোষিত হইতেছে; কিন্তু এইরূপ ঘোষণা যাঁহারা করেন, তাঁহারা যদি না জানেন যে, ব্রাহ্মের সমাজেও সকল সংস্কার সাত্ত্বিক নহে, তবে তাহা হিন্দুসমাজের একান্তই দুর্ভাগ্য! কিন্তু ব্রাহ্মসমাজেও তামসিক সংস্কারের অভাব নাই; 'নারায়ণে' 'বুদ্ধিমানের কর্ম্ম' প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র কিছু কিছু দেখাইয়াছেন; আরও দেখাইতে পারিতেন। যাহা হউক, ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মণ, উভয়কেই এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তামসিক সংস্কার সকল সমাজেই আছে। যে হেতু, কোনও সমাজ নারীর মনে পাতিব্রত্যের সংস্কারের সৃষ্টি করিয়া নারীকে যবনিকার অন্তরালে রক্ষা করিয়া তামসিকতার পরিচয় দিতেছে; কোনও সমাজ বা নারীর স্বাধীনতার পথ মুক্ত করিয়া, পুরুষের সহিত নারীর সমানভাবে মেলামেশা ও হাসিখেলার সুযোগ দিয়া তামসিকতার পরিচয় দিতেছে। ব্যাপারটি ঘুরাইলে যাহা, ফিরাইলেও তাহাই। এক দিকে সংযমের দোহাই দিতে গিয়া দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া; অপর দিকে উদারতার দোহাই দিতে গিয়া অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে বরণ করা। প্রভেদ ইহাই। সমাজের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন একটা সামাজিক আদর্শের সহিত অন্য সামাজিক আদর্শের তুলনা না করাই উচিত। কিন্তু এ নিয়ম সকলে মানেন না বলিয়াই সামাজিক তত্ত্বটুকু মধ্যে মধ্যে বিশ্লেষণ না করিলে চলে না। কিন্তু বিশ্লেষণ করিবার ফল এই, যে সমাজের মনোমত কথা বলা না যায়, সেই সমাজই রুষ্ট হন। সুতরাং ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মতের প্রচারের দ্বারা মাতৃভাষার সেবা করা উচিত।

সমাজে—সকল সমাজেই—মন্দ সংস্কার আছে; ভাল সংস্কারও আছে। কিন্তু দেখা যায়, 'ভারতী' প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক পত্রিকাগুলি হিন্দুসমাজের মন্দ সংস্কারগুলি যে ভাবে দেখাইবার চেষ্টা করেন, ভাল সংস্কারগুলি দেখাইবার জন্য যদি তাহার শতাংশের একাংশও চেষ্টা করিতেন, অথবা তাঁহাদের নিজের সমাজের মন্দ সংস্কারগুলিও যদি দেশের লোকের সম্মুখে তুল্যভাবে দেখাইতেন, তাহা হইলে সাহিত্যের গণ্ডগোলে সমাজের কথা উঠিত না, কতিপয় ব্রাহ্ম লেখকের ন্যায় মক্ষিকাবৃত্তির পরিচয় দিবার জন্য আমাদিগকেও সাহিত্যের আসরে দাঁড়াইতে হইত না।

এ সম্বন্ধে হিন্দুবিদ্বেষীদের স্বপক্ষে বলিবার কথাও আছে। মানুষ যখন এক আদর্শ ছাড়িয়া অপর আদর্শ গ্রহণ করে, তখন বুঝিতে হয়, নূতন আদর্শই তাহার চক্ষে নির্দ্দোষ বা অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। যে ব্যক্তি বাধ্য হইয়া এক আদর্শ ত্যাগ করিয়া অপর আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সঙ্কীর্ণভাবে বিষয়টির বিচার করিলে চলিবে না। বাধ্য হইয়া বা না হইয়া যে, যে আদর্শ ত্যাগ করিয়াছে, তাহার পক্ষে সেই আদর্শ অত্যুৎকৃষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু সে ন্যায়তঃ অপর আদর্শকে উপেক্ষা করিতে পারে

না; কারণ, ইহা অনুমান করা অনুচিত যে, লক্ষ-লক্ষ কোটী-কোটী লোক যে আদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিও সদ্বিবেচক নাই। বলিয়া রাখা ভাল, আমরা ব্রাহ্মসমাজকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখি না; কারণ, ব্রাহ্মসমাজেও দূরদর্শী ও নিরপেক্ষ ব্যক্তির অভাব নাই। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত যে সকল লেখক সাধারণতঃ হিন্দুবিদ্বেষের পরিচয় দেন, তাঁহাদের অপেক্ষা বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, দেবীপ্রসন্ন প্রভৃতি কোনও অংশেই নিকৃষ্ট নহেন। হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বা বংশগত জাতিবিচারের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা না থাকিতে পারে, কিন্তু হিন্দুর আচার-নিয়ম বা বিধি-ব্যবস্থার প্রতি—যত দূর জানি—ইঁহারা বিদ্বেষভাবাপন্ন নহেন। যে দেবেন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মসমাজ 'মহর্ষি' নাম দিতে কুণ্ঠিত নহেন, ব্রাহ্মসমাজের সেই একমাত্র মহর্ষির প্রদর্শিত পথে আজ কাল কয় জন ব্রাহ্ম চলিতেছেন? যাঁহারা চলেন না, তাঁহারা মুখে হিন্দুবিদ্বেষের পরিচয় দিলেও, অন্তরে তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পায়। কারণ, তর্কচ্ছলে যাহাই বলা যাউক, আমাদের বিশ্বাস, ব্রাহ্মরা হিন্দুসমাজেরই একটি শাখা। যদি তাহা সত্য হয়, তবে কোনও কোনও ব্রাহ্ম-লেখক বিপরীত বুদ্ধির বশে হিন্দু-সমাজের যে কলঙ্কঘোষণা করেন, তাঁহারাও সে কলঙ্কের ভাগী। আর যদি হিন্দুধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ না থাকে, তবে হিন্দু ও ব্রাহ্ম, কেহ কাহারও ত্রুটী দেখাইতে পারেন না। এ দেশে মুসলমানেরা ব্রাহ্মদের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে হিন্দুর ঘরের পাশে ঘর তুলিয়া, মন্দিরের পাশে মসজিদ তুলিয়া, মারিয়া এবং মরিয়া বাস করিতেছেন। ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলনের অন্তরায়ের কারণ যথেষ্ট আছে; তথাপি কয় জন শিক্ষিত মুসলমান হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতেছেন? শিক্ষিত হিন্দুরাও মুসলমান সমাজের কুৎসা কীর্ত্তন করেন না। তবে ব্রাহ্মরাই বা কোন্ অধিকারে হিন্দুসমাজকে আক্রমণ করেন? হিন্দুরাই বা আর কত কাল তাঁহাদের আদর্শচ্যুত বাঁড়ুয্যে, মুখুয্যে, চাটুয্যে, দাস ও মিত্রকে 'সনাতনী' কথা শুনাইয়া, ঘরের ছেলেকে ঘরে আনিবার চেষ্টা করিবেন? সেই ব্রহ্মচর্য্যের কথা, সেই সদাচারের কথা, সেই সংযমের কথা—সে সকল কথা এখনকার কালে বিকাইবে না। কারণ, তাহাতে 'দখ্‌নে হাওয়া বয়' না, 'মূর্চ্ছিত জ্যোছনাতলে' নারকীয় প্রেম 'পুলক নাচায়' না, 'ক্ষুধিত পাষাণ' গুমরিয়া উঠে না! সে সকল কথা থাকুক।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের মতে, কতকগুলা অমূলক সংস্কারের বশবর্ত্তী হওয়ায় হিন্দুসমাজ ক্রমেই অবনত হইতেছে। আমরা এ কথা স্বীকার করি না; কারণ, অমূলক হউক আর সমূলক হউক, হিন্দুসমাজের কোনও সংস্কারই আধুনিক নহে, এবং সেই সকল সংস্কারের মূলেই ভারতীয় সভ্যতা বিকাশলাভ করিয়াছিল, এবং ঐ সকল সংস্কার থাকা সত্ত্বেও বর্ত্তমান ভারতের অন্যান্য জাতির অপেক্ষা হিন্দুজাতি জ্ঞানে, বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে কোনও অংশেই নিকৃষ্ট নহে। আমাদের মনে হয়, যে কারণে হিন্দুসমাজে শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়াছে, সেই কারণেই ব্রাহ্মসমাজ কতকগুলি শ্রেষ্ঠ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াও ক্রমেই অবনত হইতেছে। কারণটি একই—হিন্দু ও ব্রাহ্মের সমাজ ক্রমে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়া মূল আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়াছে। এই যে ঘরে ঘরে মারামারি, কাটাকাটি, ইহার কারণ ঐ পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাব। ব্রাহ্মের সহিত হিন্দুর যে

এই বিরোধ, ইহার মূলে রহিয়াছে ভীষণ স্বার্থ—যে স্বার্থের প্রেরণায় 'পরের ধনে পোদ্দার' কোনও ধনী তাঁহার দরিদ্র প্রতিবেশীর জীর্ণ কুটীরখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রমোদাগার নির্ম্মাণ করেন।

'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' করিতে যাঁহারা অভ্যস্ত, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তাঁহাদের স্থান অতি নীচে হইতে পারে; হউক। কিন্তু তাঁহারা যে শান্তিপ্রিয়, এ কথা তাঁহাদের পরম শত্রুরাও স্বীকার করেন। আর, কতকগুলা বিধি-নিষেধের মূল উদ্দেশ্য যে সমাজে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা, এ কথা অস্বীকার করিবার কোনও সঙ্গত কারণই দেখি না। কিন্তু 'ভারতী' সমাজবিরুদ্ধ স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য শান্তিকে বিসর্জ্জন দিবার ব্যবস্থা দিয়া বলিতেছেন,—'স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব জাগ্রত হইলে সমাজে মোটের উপর শান্তির চেয়ে অশান্তির সম্ভাবনা বেশি। বস্তুত (!) সেই অশান্তির সম্ভাবনাকে স্বীকার করিয়াই ত মানুষ স্বাধীনতাকে বরণ করিয়া লয়। কেন না, অশান্তিকে ঘুচাইবার একমাত্র প্রশস্ত রাস্তা, মানুষকে অন্ধ তামসিক সংস্কারের গারদে চিরদিন নজরবন্দী করিয়া রাখা।' অর্থাৎ, নারীর স্বাধীনতা চাই-ই চাই, তাহাতে সমাজের শান্তি নষ্ট হয়, হউক! ইহাতে বুঝা যায়, 'ভারতী' সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তিকেই বড় ভাবেন; কিন্তু আমরা ব্যক্তিকে সমাজ অপেক্ষা বড় বলি না। কারণ, ব্যক্তি যখন সমাজের মধ্যে ঐহিক জীবনের কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের অধীন হইয়াছে, তখনই ত সে তাহার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিয়াছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-মন্ত্রের ঋষি বা প্রথম দ্রষ্টা 'ভারতী' নহেন, 'প্রবাসী' নহেন, ব্রাহ্মসমাজও নহেন। ব্রাহ্মরা তাঁহাদের সমাজ গঠন করিবার জন্য ইউরোপ হইতে যে সকল মাল-মশলা সংগ্রহ করিয়াছেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত একটি মাল বা একটি মশলা। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ হিন্দুর কর্ণে সোনার পাথরবাটীর মত অসম্ভব বা অস্বাভাবিক শুনায়। যাহা হউক, এ দেশে মনুবাক্যের প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা নাই, তিনিও এই মতের কত দূর পক্ষপাতী, তাহাও দেখা কর্ত্তব্য। নারীর ব্যক্তিত্বও ঐ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরই কথা। কিন্তু নারীর ব্যক্তিত্ব আমরা কথায় শুনিব, না—কাজে দেখিব? হিন্দুরা না হয় কুসংস্কারের বশে মনুবাক্য মানিয়া কোনও অবস্থাতেই নারীর স্বাতন্ত্র্য দিবার পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা লইয়া যাঁহারা লাফালাফি করেন, তাঁহারাও ত নারীর ব্যক্তিত্ববিকাশের ব্যবস্থা করেন না। যে ভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে পারেন, নারীদিগকে আজিও সে সুযোগটুকু দেন না কেন? যে বিধানে সমাজের চক্ষে পুরুষকে কলুষতা স্পর্শ করে না, সেই বিধানে নারীকেও ত কলুষতা স্পর্শ করিতে পারে না। পারে না, তবে করে কেন? হিন্দুরা না হয় 'এক-চোখো'—কথায় কথায় ধর্ম্ম ও নীতির কথা বলেন; কিন্তু যাঁহারা 'দুই-চোখো', অর্থাৎ, স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য যাঁহারা সামাজিক অশান্তিকে গ্রাহ্য করেন না, তাঁহারাও যদি এ বিষয়ে হিন্দুদের মতই 'একচোখো' হন, তবে আর সংস্কারের ধূয়া ধরিয়া লাভ কি? যাঁহারা সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় না ভাবিয়া, সমাজের কুমারী-কন্যাদের দিকে না চাহিয়া, বরপণ-সমস্যা অধিকতর জটিল করিয়া, বিধবার বৈধব্যযন্ত্রণা দূর করিবার জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের হুজুগে মাতিয়া ছুটাছুটি করিতে পারেন, তাঁহারা এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের গলদ-টুকু দেখিতে পান না, ইহাই তাজ্জব ব্যাপার। এই সকল কথা ভাবিয়াই আমরা (গৃহস্থে) বলিয়াছি, 'পাঁচ কোটি লোকের মধ্যে পাঁচটি নারী যদি আত্মহত্যা করিল, অমনই চীৎকার—

আর চীৎকার ; কিন্তু প্রতি বৎসর শত শত নরনারী ধর্ম্ম ও নীতির পথ ছাড়িয়া জীবন্মৃত হইতেছে, সে দিকে কয় জনের লক্ষ্য আছে।' ইহা উপহাসের কথা নহে। যে দেশের লোকের আয় লোক-প্রতি দৈনিক একটি পয়সা, সে দেশের লোক খাইবেই বা কি, আর উচ্চশিক্ষা-লাভের জন্য ব্যয় করিবেই বা কি ? উচ্চশিক্ষা-লাভ দুর্ঘট বলিয়াই আমরা নারীজাতিকে ধর্ম্ম ও নীতির সংস্কারে জাগিতে ও জাগাইতে বলি ; কারণ, মূল উদ্দেশ্য, একই—মনকে সংযত করা। কিন্তু এই ধর্ম্ম ও নীতির কথা 'ভারতী'র কর্ণে শ্রুতিমধুর হয় নাই ; যে হেতু তিনি বলিয়াছেন, —'যে কারণে বাঙালী (বাঙ্গালী) মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যা বাড়িতেছে, সেই কারণেই তাদের মধ্যে ভ্রষ্টা নারীর সংখ্যাও বাড়িবেই। দুই রোগের ভিন্ন লক্ষণ হইলেও তাদের মূল কারণ এক। মূল কারণ ব্যক্তিত্ববিহীন, সংস্কারশৃঙ্খলিত, অবরুদ্ধ জীবনের গ্লানি ও দুঃখ এবং সেই হেতু শরীর ও মনের অবসাদ ও দুর্ব্বলতা।' কথাটা আলোচনার যোগ্য না হইলেও বিশ্লেষণ-যোগ্য বটে ; নতুবা, 'ভারতী' তাঁহার ভুল দেখিতে পাইবেন না। মানুষ সমাজশাসন না মানিলেও স্বতঃই যে সকল সংস্কারের অধীন হয়, আত্মরক্ষার সংস্কার তাহাদের অন্যতম ; কিন্তু সতীত্ব বা পাতিব্রত্যের সংস্কারটি সমাজবদ্ধ মানুষেরই হাত-গড়া। রাজপুতানায় নারীরা জহর-ব্রতে জীবন আহুতি দিতেন ; বাঙ্গালাতেও সতীদাহের প্রথা ছিল। সতীত্বের সংস্কার হইতেই ঐ প্রথার সৃষ্টি। ঐ প্রথা আত্মহত্যার পোষক, আত্মরক্ষার বিরোধী। সুতরাং নারীরা যে যে কারণে আত্মহত্যা করে, সেই সেই কারণে সতীত্ব-বিসর্জ্জন দেয় না। সমাজে থাকিয়া সামাজিক নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হইলে যে নারীর হৃদয় তথাকথিত অবরুদ্ধ জীবনের গ্লানিতে পূর্ণ হইয়া উঠে, সে নারী আত্মহত্যা করিতেও পারে ; আত্মহত্যা না করিয়া সতীত্ব বিসর্জ্জন দিয়া ঐহিক সুখে দিন কাটাইতেও পারে। কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত, যে নারীর চলা-ফেরা গৃহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বাহিরের জগতের সহিত যাহার সকল সম্বন্ধ ছিন্ন, মানসিক বিকারে হয় সে আত্মহত্যা করিবে, নতুবা 'সমাজশাসনে রহিব না আর, বহিব না দুখ-জ্বালা !' বলিয়া চিরজীবনের মত তাহার গৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। আর যে সমাজে গৃহের বাহিরে নারীর অবাধগতি আছে, মানসিক বিকারে সতীত্ব বিসর্জ্জন দিবার সুযোগও সে সমাজ নারীকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে দিয়াছেন। শুষ্ক ব্যক্তিত্ববাদের দৌড় ঐ পর্য্যন্ত। এই জন্য আমরা 'যে কারণে বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যা বাড়িতেছে, সেই কারণে তাদের মধ্যে ভ্রষ্টা নারীর সংখ্যাও বাড়িবেই'—এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়াও বলি,—যে উপায়ে বাঙ্গালী মেয়েদের আত্ম-হত্যার প্রবৃত্তি নষ্ট হইতে পারে, সেই উপায়েই পতিতা নারীর সংখ্যারও হ্রাস হইতে পারে। সেই উপায় ব্যক্তিত্ববিহীন ও সংস্কারশৃঙ্খলিত প্রত্যেক সমাজেই আছে। ধর্ম্ম ও নীতির শান্তি-নিকেতনেই সে উপায় আছে। অবসাদ ও দুর্ব্বলতা অশান্তিনিকেতনে যত শীঘ্র আসে, শান্তি-নিকেতনে তত শীঘ্র আসে না।

'ভারতী'র দোষ দেখাইলাম, এইবার গুণের কথা বলিব। তিনি বলিয়াছেন,—'বাঙালীর (বাঙ্গালীর) মেয়েরা বেশি গল্প পড়ে বলিয়া বেশি আত্মহত্যা করে, এ সম্ভাবনাটাকে [প্রবাসীর] সম্পাদক একেবারেই ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।' আরও বলিয়াছেন, 'গল্প পড়াটা আত্মহত্যার আসল কারণ এবং মুখ্য কারণ না হইলেও অনেক ক্ষেত্রেই তাহা

যে আত্মহত্যার প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া তোলে এ কথা অস্বীকার করা যায় না।' এখন 'ভারতী'র মত শ্রেষ্ঠ, কি 'প্রবাসী'-সম্পাদকের মত শ্রেষ্ঠ, সে বিচার সুধীগণ করিবেন; 'ভারতী' এ বিষয়ে আমাদের মতের সমর্থন করিয়াছেন, অতএব আমরা তাঁহাকে তাঁহার এই উদারতার জন্য সরল-ভাবে ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু এই ধন্যবাদ-প্রাপ্তির পূর্ব্বেই 'ভারতী' সাব্যস্ত করিয়াছেন,—আমরা তাঁহার পরম হিতৈষী, যে হেতু তিনি এবং তাঁহারা হিন্দু নারীর ব্যক্তিত্ব 'জাগ্রত' করিবার জন্য দয়া করিয়া যে আগুন জ্বালিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমরা (গৃহস্থে ও উপাসনায়) 'স্মৃতির ও আচারের কুলোর বাতাস' দিয়া সেই 'ধোঁয়াটাকে ক্রমশ আগুনে পরিণত করিয়া তুলিতে সাহায্য' করিতেছি। অর্থে পুষ্ট 'ভারতী' তাঁহার এই হিতৈষিবর্গকে অর্থসাহায্যে পরিতুষ্ট না করেন, ইহাই এখন আশঙ্কার বিষয়। কিন্তু বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের গত বৎসরের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ, অর্থের অভাবে ব্রাহ্মণ-সমাজ নাকি 'স্মৃতির ও আচারের কুলোর বাতাস' জোরে দিতে পারিতেছেন না। অতএব মা ভৈঃ!

মূল কথা এই,—শুষ্ক ও অসার ব্যক্তিত্ববাদে হিন্দুসমাজ জাগিবে না। নীতি যেখানে দুর্ব্বল, উচ্ছৃঙ্খলতা সেখানে বাড়িবেই। দাঁতে মিশি, ঠোঁটে আলতা এবং পাকা চুলে পাকা কলপ লাগাইলে যৌবন ফিরিয়া আসে না। ব্যক্তিত্ব চাহিলেই ব্যক্তিত্ব পাওয়া যায় না। ব্যক্তিত্ব জাগ্রত করিবার আগে মনুষ্যত্বের সাধনা চাই। আজ কাল নারীদিগকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য কতটুকু চেষ্টা হইতেছে? বেথুন-কলেজ এখন হিন্দুনারীর গৃহশিক্ষার ভার লইয়াছে। নীতিহীন গল্প-নাটক এখন নারীদের ধর্ম্মমূলক শিক্ষার অন্তরায় হইয়াছে। গোলাপ-জল এখন গঙ্গাজল, সা-ঋ-গা-মা এখন দেবপূজার মন্ত্র, চরিত্রহীন গৃহশিক্ষক এখন গুরু। এমন অবস্থায় নারীদের ব্যক্তিত্ব জাগ্রত না করিলে আর চলে কই?

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শাহ্ এতিম।*

দামোদর নদের উত্তরে চাম্পাই নগরী নামে এক প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন গ্রাম আছে। উহা বর্দ্ধমান জেলার গলসী থানার অন্তর্গত, এবং মানকর রেলষ্টেশনের দক্ষিণে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে চাম্পাই নগরী—নগরীবিশেষই ছিল; এখনও উহা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পরগণাবিশেষ। উহা এক সময়ে জনপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালিনী ছিল। ঐ অঞ্চলের লোকেরা উহাকেই সতী বেহুলার জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে অনেকের অনেক মত আছে। কেহ কেহ পূর্ব্ব-বঙ্গের কোনও চম্পানগরীকে বেহুলার জন্মভূমি বলিয়া পুস্তক-প্রবন্ধাদিরও রচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বেহুলা প্রসঙ্গে

---

* দশম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত।

কোনও আলোচনার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু বেহুলার দুই একটি কথা না বলিলে, এ চাম্পাই নগরীর প্রসিদ্ধতা গুপ্ত থাকিয়া যায়। অতএব অনাবশ্যক হইলেও, বেহুলা-সংক্রান্ত দুই একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব।

চাম্পাই নগরীতে সরস্বতীপূজার ষষ্ঠীর দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমান্বয়ে আট দিন পর্য্যন্ত একটি মেলা হইয়া থাকে। উহা বেহুলার মেলা নামে আজিও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। ঐ মেলা উপলক্ষে তথায় প্রতি বৎসর অসংখ্য নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে। এই অঞ্চলের লোকেরা চাম্পাই নগরীর এক ভগ্নাবশিষ্ট এমারতের উচ্চস্থানকে বেহুলার 'লোহার বাসরঘর' বলিয়া থাকেন। মেলায় সমাগত হিন্দুললনাগণ স্নানান্তে আর্দ্রবসনে ও আর্দ্র-কেশে সতীত্বরক্ষা-কামনায় তথায় ভূলুণ্ঠিতা হইয়া সতী বেহুলার উদ্দেশে প্রণাম করেন, এবং 'বেহুলার শিল' নামে যে এক শিল পতিত আছে, তাহাতে ইষ্টক চূর্ণ করিয়া, সিন্দূরস্বরূপে সীমান্তে ধারণ করেন। ঐ উচ্চ স্থান হইতে দক্ষিণবাহিনী একটি নালার চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কথিত হয় যে, বেহুলার ভাতের ফেন্ গড়াইয়া ঐ নালা হইয়াছিল, এবং ক্রমে দক্ষিণবাহিনী হইয়া, গাঙ্গুর নদে মিশিয়াছিল। চাম্পাই নগরীর পূর্ব্বাংশে কতক দূর পর্য্যন্ত এখনও গাঙ্গুর নদের নিদর্শন পাওয়া যায়। তৎপরে পূর্ব্ব দিকে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত উহার আর কোনও চিহ্নই পাওয়া যায় না। কিন্তু বর্দ্ধমানের পূর্ব্ব-দক্ষিণে গাংপুর নামে যে গ্রাম আছে, তাহার পশ্চিমে খালের মত কতক দূর স্থান গাঙ্গুর বলিয়া কথিত হয়। এখন গাঙ্গুরের শেষ সীমা গাংপুর; এই জন্যই বোধ হয় গ্রামের নাম গাংপুর হইয়াছে।

গাংপুরই এখন গাঙ্গুরের শেষ সীমা হইলেও, বর্দ্ধমানের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে আর একটি নদী 'বেহুলা নদী' নামে কথিত হয়। উহা বর্দ্ধমান জেলার সাত-গেছে থানার অন্তর্গত ভূমিভাগের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, অতি প্রাচীন কালে গাঙ্গুর ও বেহুলা নদীর সংযোগ ছিল, এবং গাঙ্গুরের গাংপুরের পরবর্ত্তী স্থানের অংশের নাম বেহুলা নদী ছিল।

আমাদের চাম্পাই নগরী দুইবার দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। যত দূর পর্য্যন্ত উহার সীমানা, তন্মধ্যে এখনও বেণে জাতি বাস করিতে পারে না। শুনা যায়, ঐ জাতি উনান্ করিতে গেলে সেই স্থান হইতে সাপ বাহির হয়।

চাম্পা নগরীর অনেকগুলি পল্লী আছে। সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত। মৌজা কস্‌বাও উহার একটি পল্লীবিশেষের নাম। কসবায় অনেকগুলি

পাঠানের বসতি আছে। তাহাদের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ দরিয়া খাঁ, তাঁহাকে আফ্গান বংশধর বলিয়া উল্লেখ করিতেন। বলিতেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ এতিম খাঁ বিদ্রোহী রহিম খাঁর বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। বিদ্রোহশেষে এতিম শাহজাদা আজিম-উশ্-শানের শরণাপন্ন হইলে, শাহজাদা তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া, তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, ঐ মৌজা কস্‌বা জাইগীর দান করেন।

এতিম খাঁ ঐ জাইগীর-লাভের পর চাম্পাই নগরীর ঐ কসবা পল্লীতে আসিয়া বাস করেন। তাহার অল্প দিন পরেই এতিম এক মহাতপা সুধী মুসলমানের শিষ্য হইয়া কিছুকাল ধরিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা ও তাঁহার নিকট তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করিতে থাকেন, এবং শাহ এতিম দরবেশ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ক্রমে তিনি বিষয়-বাসনা-বিরহিত ও সংসার-কামনা-শূন্য হইয়া লোকালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক চাম্পাইনগরীর পশ্চিমদিকস্থিত দামোদর নদের উত্তর তীরে এক প্রশস্ত প্রান্তরে তপঃসাধনায় নিরত থাকেন। তিনি ঈশ্বরে ভক্তিমান থাকিয়া, তাঁহার আরাধনা প্রভাবে প্রসিদ্ধ পীর-শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান নরনারী তাঁহাকে ভক্তি করিতেন।

তাঁহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কতকগুলি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তৎসমূহের মধ্যে এখানে একটির উল্লেখ করিব। তিনি একদা ঐ প্রান্তরের এক তেঁতুল বৃক্ষতলে ধ্যানস্থ ছিলেন। এমন সময়ে প্রবল ঝটিকাবেগে ঐ বৃক্ষের এক বৃহৎ শাখা ভগ্ন হইল। তিনি ধ্যানমগ্ন—ঐ স্থানত্যাগ না করিলে ভগ্ন শাখা তাঁহারই উপর পতিত হইবে বলিয়া ঐ শাখা স্থানচ্যুত হইবামাত্রই এক শিষ্য তাঁহার গাত্রস্পর্শপূর্ব্বক স্থান ত্যাগ করিতে বলিল। শা এতিম তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানচ্যুত নিম্নাগত শাখার দিকে লক্ষ্য করিলেন; শাখা তৎক্ষণাৎ অন্য এক শাখায় বাধা পাইয়া তাহারই সংলগ্ন হইল। ঐ বৃক্ষ উক্ত উভয় শাখা সহ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, একটা স্থানচ্যুত পতনোন্মুখ শাখা অন্য এক শাখায় সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে।

কালক্রমে শাহ এতিম, ঐ প্রান্তরেই লোকনয়নের অন্তরিত হয়েন। সেই স্থান এখনও "শাহ এতিমের বেড়" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। শাহ এতিমের সমাধি—প্রাচীন ইষ্টকে রচিত; উহার চতুর্দ্দিক প্রাচীরে বেষ্টিত। সমাধির অনেক স্থান ভগ্ন হইয়াছে; অনেক ইট্ খসিয়া পড়িয়াছে। উহার নিকটেই একটি অর্দ্ধ-ভগ্ন প্রস্তরফলকে কতকগুলি আরবী তোগ্‌রা অক্ষর ক্ষোদিত আছে। ঐ অক্ষরগুলির অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া এমন

ভাবে বিকৃত হইয়াছে যে, কেবলমাত্র 'আজিম-উশ্-শান্' ভিন্ন অন্য কোনও শব্দ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। প্রস্তরফলকটী বোধ হয় পূর্ব্বে শাহ এতিমের সমাধিসংলগ্ন ছিল,—পরে উহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে ঐ সমাধিস্থান দেখিয়াছিলাম।

শাহ এতিমের সমাধির নিকটে আরও পাঁচ ছয়টী পাকা সমাধি আছে; সেগুলি তাঁহার শিষ্যবর্গের। তাঁহার সমাধিস্থানে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। সাধারণতঃ নদীতটস্থ পুষ্করিণীর জল বর্ষাশেষে শেষ হইয়া যায়। কিন্তু ঐ পুষ্করিণীর পার্শ্ব দিয়া দামোদর নদ প্রবাহিত হইলেও, উহাতে বার মাস সমান জল থাকে। রোগমুক্তি ও সন্তানাদির কামনায় অনেকে ঐ পুষ্করিণীতে স্নান ও উহার জল পান করিয়া থাকেন। শাহ এতিম শিষ্য সহ দামোদরতটে চিরনিদ্রায় নিমগ্ন। তাঁহার অস্থি-পঞ্জর ধরণীর ধূলিরাশিতে পরিণত হইয়াছে। তথাপি তাঁহার সমাধিস্থান আজিও তীর্থস্থান-স্বরূপে অনেকের সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছে। শাহ এতিম বিদ্রোহীদিগের দলভুক্ত অস্ত্রধারী ছিলেন। অস্ত্র তাঁহার নিত্য সহচর ছিল। কিন্তু সাধুসঙ্গ ও সদ্গুরুর উপদেশ লাভ করিয়া পীর-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। নরহন্তা রত্নাকরও এক দিন সাধুসঙ্গ ও সদ্গুরুর উপদেশ পাইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

আবদুল লতিফ।

শ্রীরঙ্গম্।

বিস্তীর্ণ জলপ্রবাহ। বর্ষাসমাগমে বারিরাশি গাঢ় বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। জল কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে। পর পারে শ্রীরঙ্গমের শ্যামল স্নিগ্ধ কান্তি দেখা যাইতেছে। তীরস্থিত ঘনবিন্যস্ত তরুরাজির অধোবিলম্বিত শ্যামল পত্রাবলী প্রায় স্পর্শ করিয়া গৈরিক বর্ণের জলরাশি দ্রুতবেগে প্রবাহিত হইতেছে। কাবেরী নদীর উপরে বৃহৎ সেতু বিস্তৃত। আমাদের গাড়ী যখন সেই পুলের উপর দিয়া যাইতেছিল, তখন আমরা একবার নীচে চাহিয়া গভীর জলরাশির দ্রুত প্রবাহ দেখিতেছিলাম, একবার শ্রীরঙ্গমের তরুরাজির শ্যামকান্তি ও একবার ত্রিচিনাপল্লীর শুভ্রসৌধখচিত তীর-শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। দেখিতে দেখিতে আমরা পর পারে উপস্থিত হইলাম।

শ্রীরঙ্গম্ কাবেরী নদীর মধ্যস্থ দ্বীপ। কিন্তু দ্বীপটির আয়তন বিশাল বলিয়া

এবং নদীর গতি এখানে বক্রাকার বলিয়া ইহার দ্বীপত্ব সহজে প্রতিভাত হয় না; মনে হয়, ইহা বুঝি নদীর পর পার। আমরা মন্দির-অভিমুখে চলিলাম। পথের ধারে দুই একটী বাড়ী দেখা যাইতেছিল। প্রায় প্রত্যেক গৃহের উপরেই বড় করিয়া আঁকা ত্রিবন্ধ—(ত্রিপুণ্ড্র, সুদর্শন ও পাঞ্চজন্য)—ঘোষণা করিয়া দিতেছিল যে, ইহা বৈষ্ণব-প্রধান স্থান। কাবেরীর একটি সঙ্কীর্ণ প্রণালী এই দ্বীপের মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে প্রবাহিত হইতেছে। কাবেরীর সেই ক্ষুদ্র শাখা অতিক্রম করিয়া একটু পরেই আমরা মন্দিরের বহির্দ্বারের সমীপে উপস্থিত হইলাম। পাণ্ডা মিলিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহার আলয়ে দ্রব্যাদি রাখিয়া আমরা স্নানার্থ কাবেরীর ঘাটে ফিরিয়া চলিলাম।

নদীতীরে বহু নর নারী সংকল্প করিয়া স্নান করিতেছিল। আমরাও পাণ্ডার সম্মুখে সংকল্প করিয়া স্নান করিলাম। নদীজল খরবেগে প্রবাহিত। আমরা সাহস করিয়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। দুই চারিটি ক্ষুদ্র মৎস্য আমাদের পাদদেশে দংশন করিয়া আমাদিগকে মুহূর্ত্তের জন্য চকিত করিয়া তুলিতেছিল। স্নানান্তে মন্দিরাভিমুখে চলিলাম।

শ্রীরঙ্গমের মন্দির অতিশয় বৃহৎ—অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া আছে। সুপ্রশস্ত রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইয়া আমরা সুবৃহৎ তোরণের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। এই তোরণের উপরে একটী গোপুরম। মন্দিরের সর্ব্বাপেক্ষা বাহিরে অবস্থিত প্রাচীরের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিবার এই পথ। এই তোরণের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া আমরা রাজপথের উভয় পার্শ্বে বহুসংখ্যক বিপণী ও গৃহাবলী দেখিতে পাইলাম। রাজপথের জনতার মধ্য দিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। সম্মুখে দ্বিতীয় তোরণ, তাহার উপরে গোপুরম, এবং মন্দির বেষ্টনকারী দ্বিতীয় প্রাচীর। এই ভাবে উপর্য্যুপরি সাতটি তোরণের মধ্য দিয়া সাতটি প্রাচীর অতিক্রম করিলে মূল মন্দিরে উপস্থিত হওয়া যায়। এই সকল প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এত অধিকসংখ্যক গৃহ ও বিপণী রহিয়াছে যে, মন্দিরটিকেই একটী নগরী বলা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা বাহিরের প্রাচীর দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইলের তিন-চতুর্থাংশ, এবং প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধ মাইল। সকল তোরণগুলি অতিক্রম করিয়া অভ্যন্তরে আমরা কারুকার্য্যখচিত বহুসংখ্যক-স্তম্ভযুক্ত একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ দেখিতে পাইলাম। প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে মন্দিরের মধ্যে গরুড় দেবের বৃহৎ মূর্ত্তি। মধ্যস্থলে বিমান-মন্দির। আমরা দ্বারের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। মন্দিরের মধ্যে শ্রীরঙ্গনাথস্বামীর বহুস্বর্ণালঙ্কারশোভিত

ভোগমূর্ত্তি, এবং তাহার পশ্চাতে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত বিশাল শয়ান-মূর্ত্তি। বিষ্ণু অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। মস্তকের উপর অনন্তের সহস্র ফণা বিস্তৃত। অন্ধকারে এই মূর্ত্তি সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। প্রদীপের আলোক সুচিক্কণ বিগ্রহের নানা স্থলে প্রতিফলিত হইতেছিল। পূজাসমাপনান্তে আমরা বাহিরে আসিলাম। আমাদের মাথার উপর ছাদ থাকায় বিমান-মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না। কিছু দূর সরিয়া গিয়া মন্দিরের স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া দেখিতে পাইলাম। ছোট ছোট দোকানগুলি চিত্র, শঙ্খ, আয়না প্রভৃতি বিচিত্র দ্রব্যে পরিপূর্ণ। যে রাজা এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এক স্থানে তাঁহার, তাঁহার পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূর প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলাম। রঙ্গনাথস্বামীর বহুমূল্যবান মণিমাণিক্যখচিত স্বর্ণালঙ্কার আছে। উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিলে তাহা দর্শকগণকে দেখান হইয়া থাকে।

এই মন্দিরনির্ম্মাণে কত অজস্র অর্থ ব্যয় হইয়াছে, এবং এই দেবায়তন কত দীর্ঘকাল ধরিয়া দূরদেশ হইতে আগত ধর্ম্মপিপাসু ভারতবাসীর হৃদয়ে ভক্তির উৎস ছুটাইয়াছে, আমরা তাহাই ভাবিতেছিলাম। রামানুজের গুরু যামুনাচার্য্য এইখানে বাস করিতেন। যামুনাচার্য্যের মৃত্যুর পর রামানুজ কাঞ্চী হইতে আসিয়া এই স্থানে তাঁহার পুণ্যময় দীর্ঘ জীবনের অধিকাংশকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বেদান্ত-সূত্রের বৈষ্ণব ভাষ্য—ভারতবিখ্যাত শ্রীভাষ্য—এবং অন্যান্য বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এই স্থানে রচিত হইয়াছিল। আজ প্রায় আট শত বৎসর হইল, তিনি শ্রীরঙ্গমে তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছেন। আরও চারি শত বৎসর পরে সুদূর বঙ্গদেশ হইতে সমাগত এক প্রেমোন্মত্ত যুবকের শ্রীচরণস্পর্শে শ্রীরঙ্গমের পবিত্র ধূলি পবিত্রতর হইয়াছিল। সেই যুবকটি ভারতের গৌরব শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীচৈতন্যদেব এখানে চারি মাস কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার ফুল্লারবিন্দসদৃশ নয়নযুগল হইতে উৎসের ন্যায় উৎসারিত প্রেমাশ্রুতে কতবার মন্দিরাঙ্গন অভিষিক্ত হইয়াছিল; তাঁহার মধুর কণ্ঠে উচ্চারিত অমৃতময় হরিনামে মন্দিরাভ্যন্তরস্থ বায়ু তরঙ্গায়িত হইয়া কত বার ঐ প্রস্তরময় প্রাচীরে আঘাত করিয়াছিল।

কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ। প্রেমাবেশে কৈল বহু গান নর্ত্তন।
স্তুতি প্রণতি করি মানিল কৃতার্থ॥ দেখি চমৎকার হৈল সব লোকের মন।

—চৈতন্যচরিতামৃত।

না জানি মন্দিরমধ্যে শ্রীবৈষ্ণব ভেঙ্কটভট্টের বাটী কোথায় অবস্থিত ছিল। সেখানে মহাপ্রভু চারি মাস কাল যাপন করিয়া চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পারণ করিয়াছিলেন।

অনেকেই জনৈক ভক্ত বিপ্রের অশুদ্ধ গীতা-পাঠের কাহিনী অবগত আছেন। এই শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে সেই ঘটনা ঘটিয়াছিল, এবং শ্রীচৈতন্যদেবই সেই উপহসিত বিপ্রের ভক্তির উৎকর্ষ সর্ব্বজনের বিদিত করিয়াছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে আমরা সেই কাহিনী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ;—

সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে আসি করে গীতা-আবর্ত্তন ॥
অষ্টাদশাধ্যায়ে পড়ে আনন্দ-আবেশে।
অশুদ্ধ পড়েন, লোক সব উপহাসে ॥
কেহ হাসে, কেহ নিন্দে, তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হঞা গীতা পড়ে আনন্দিতমনে ॥
পুলকাশ্রু কম্পস্বেদ যাবৎ পঠন।
দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন ॥
মহাপ্রভু পুছিল তারে—শুন মহাশয়।
কোন অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয় ॥
বিপ্র কহে—মূর্খ আমি, শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি ॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয়-রজ্জু-ধর।
বসিয়াছেন তাতে যেন শ্যামল সুন্দর ॥
অর্জ্জুনেরে কহিয়াছেন হিত উপদেশ।
তাঁরে দেখি হয় মোর আনন্দ-আবেশ ॥
যাবৎ পাঠো তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতা-পাঠ না ছাড়ে মোর মন ॥
প্রভু কহে—গীতা-পাঠ তোমার অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার ॥
এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভু-পদে ধরি বিপ্র করেন রোদন ॥

সেই জ্ঞানহীন ভক্ত ব্রাহ্মণের হৃদয়ে ভগবানের অনুগ্রহে যে কৃষ্ণমূর্ত্তি স্ফুরিত হইত, পাণ্ডিত্যাভিমানী দর্শকগণের হৃদয়ে সে স্ফূর্ত্তি হইলে তাহারা ধন্য হইত,—ইহা দেখাইবার জন্যই লীলাময় মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে এই অভিনয় করিয়াছিলেন।

শ্রীরঙ্গম দ্বীপে রঙ্গনাথ স্বামীর মন্দির হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে শৈবদের একটি মন্দির আছে। ঐ মন্দিরের নাম জম্বুকেশ্বরের মন্দির। বিখ্যাত পঞ্চ-লিঙ্গের মধ্যে অপ্‌ময় বা জলময় লিঙ্গ এখানে বিরাজিত। জম্বুকেশ্বরের মন্দিরও সুবৃহৎ, এবং বহু কারুকার্য্যে শোভিত। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন মন্দিরের সংস্কারকার্য্য চলিতেছিল। শুনিলাম, এক জন শ্রেষ্ঠী মন্দিরটি সংস্কৃত করিবার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। প্রস্তরখণ্ড সকল উৎকীর্ণ করিয়া যে সকল মূর্ত্তি গঠিত হইতেছিল, সেই মূর্ত্তিগুলি প্রাচীন শিল্পকার্য্যের পার্শ্বে স্থান পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ভুবনেশ্বর, শ্রীরঙ্গম্ ও রামেশ্বরে প্রাচীন কীর্ত্তির সংস্কারকার্য্য দেখিয়া আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে, আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে শিল্পের যে অবনতি ঘটিয়াছে, শিল্পীর অভাব তাহার কারণ নহে। প্রকৃত কারণ এই যে, দেশের শিল্পিগণ যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ পায় না। পূর্ব্বে

হিন্দু নরপতিগণ দেবমন্দির নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়া লক্ষ লক্ষ মুদ্রা লইয়া মুক্তহস্তে কার্য্য আরম্ভ করিতেন। দূর-দূরান্তর হইতে শিল্পিগণ তথায় উপনীত হইত, এবং পরস্পরের প্রতিযোগিতায় জাতীয় শিল্পের উন্নতিবিধান করিত। এক্ষণে সে অমিতব্যয়িতা নাই। আমরা ইংরেজী ফ্যাশনে বাড়ী করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাহার মধ্যে ভারতীয় শিল্পের কোনও বিশেষত্ব ফুটাইয়া তুলিবার কখনও প্রয়াস করি না। যাঁহারা খুঁজিয়াছেন, তাঁহারা কখনও শিল্পীর অভাব অনুভব করেন নাই।

মন্দির দুইটি দেখিয়া আমরা দ্বিপ্রহরের পর ছত্রমে ফিরিয়া আসিলাম। প্রখর সূর্য্যকিরণে নগরের গৃহগুলি সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। তাহাদেরই মধ্য হইতে নগরের ঠিক মধ্যস্থলে ত্রিচিনাপল্লীর পর্ব্বত-দুর্গ হঠাৎ আকাশে সমুত্থিত দেখিলাম। পর্ব্বতের অনাবৃত পৃষ্ঠে সেনানিবাস, এবং সর্ব্বোচ্চ শিখরে গণেশের মন্দির শোভা পাইতেছিল। পর্ব্বতবেষ্টনকারী পথ ধরিয়া দুই চারিটি পথিক গতিশীল বিন্দুর ন্যায় যাতায়াত করিতেছে। সন্ধ্যার সময় আমাদের ট্রেণ। সহর হইতে কয়েকটি আবশ্যক বস্তু ক্রয় করিয়া জিনিসপত্র বাঁধিয়া আমরা ষ্টেশনে চলিলাম। আমাদের ঝট্‌কাগুলি দ্রুতবেগে ষ্টেশন অভিমুখে ধাবিত হইত। পথের উভয় পার্শ্বে ফলবিক্রেত্রীগণ আতা ও আপেলের ঝুড়ি লইয়া বসিয়াছে। রাজপথের নরনারীগণ গাড়ী দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিতেছে। গৃহ ও বৃক্ষগুলির শিরোভাগ অস্তোন্মুখ-সূর্য্য-কিরণে রঞ্জিত হইয়াছে। কাল আমরা বহু দূরে চলিয়া যাইব। এই সকল দৃশ্য আর কখনও দেখিতে পাইব কি না সন্দেহ। এই চিন্তা সুন্দর দৃশ্যগুলির মধ্যে করুণ ভাব সঞ্চারিত করিল। দুই দিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়াও সংসারী জীবকে মায়ার বন্ধনে পড়িতে হয়!

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের

প্রতিষ্ঠা-উৎসব।

গত ১৪ই অগ্রহায়ণ অপরাহ্নে বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি আচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের চিরজীবনের কামনা পূর্ণ হইয়াছে। কলিকাতায় সারকুলার রোডে আচার্য্যের বাসভবনের উত্তর পার্শ্বে 'বসুর বিজ্ঞান-মন্দির' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জগদীশচন্দ্র 'ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনায়' তাঁহার 'বিজ্ঞান-মন্দির দেব চরণে নিবেদন' করিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বৈদিক মন্ত্রে আচার্য্য-পদে ব্রতী হইয়া বৈদিক মন্ত্রে শিষ্যগণকে দীক্ষিত করিয়াছেন। শিষ্যবর্গও বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানশালার গঠনে হিন্দুত্ব, সে কালের অলঙ্করণে হিন্দুত্ব। বক্তৃতা-শালার চিত্রে হিন্দুর আশা ও আকাঙ্ক্ষা হিন্দু চিত্রকর নন্দলাল প্রতিভার আলোকে ফুটাইয়া দিয়াছেন।

বক্তৃতা-শালার অভ্যন্তরে ছাদে চন্দ্রাতপের মত ভারতের চিরন্তন প্রতীক শতদল দলে দলে ফুটিয়া আছে। অনুভূতি-প্রবণ উদ্ভিদের সুবিন্যস্ত মালা সেই সহস্রার-কমলকে বেষ্টন করিয়া জগদীশচন্দ্রের নূতন আবিষ্কারের দ্যোতনা করিতেছে। বেদীর পশ্চাতে প্রাচীরে রূপক-চিত্রে নন্দলাল নব-ভারতের সনাতন আদর্শকে নূতন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।—পুণ্য প্রবাহিণীর পবিত্র পুলিন হইতে জ্ঞান-বিগ্রহ অগ্রসর হইতেছেন;—তাঁহার দৃষ্টি অনন্তে সম্বদ্ধ। তাঁহার পার্শ্বে নারী—শক্তি পুরুষকে প্রেরণা দিতেছেন। ভারত যখন অনন্তের সন্ধানে প্রথম যাত্রা করিয়াছিল, তখন তাহার মুখে এমনই জ্যোতি প্রতিভাসিত হইয়া থাকিবে। ভারত যখন জাগিয়া সত্যের উপলব্ধি করিয়া পূর্ণ সত্যের আবিষ্কারকামনায় অনন্তে উদার একাগ্র দৃষ্টি সন্নদ্ধ করিয়া জীবন-তীর্থে ধাবিত হইয়াছিল, তখন বুঝি এমনই ভাবে গগন পবন পূর্ণ হইয়াছিল। শক্তি-রূপিণী নারী তখনও সত্যের সন্ধানে পুরুষোত্তমকে এমনই ভাবে প্রেরণা দিয়াছিলেন। সার জগদীশচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা চিত্রকরের কল্পনায় অপূর্ব্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমগ্র জাতিকে গন্তব্য তীর্থের ইঙ্গিত করিতেছে।

ছবির নীচে রক্ত-পতাকায় 'বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্র অঙ্কিত। শব্দদ্বয়ের মধ্যে বজ্র। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার অভিভাষণে বজ্রের সার্থকতা বুঝাইয়া দিয়াছেন। ত্যাগের অবতার দধীচি 'লোক-হিতার্থায় জগদ্ধিতায় চ' আপনার অস্থি দান করিয়া মানব-সমবায়ে নিষ্কাম ধর্ম্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই অস্থিনির্ম্মিত বজ্রে দানব-শক্তির অপচয় ও দেব-শক্তির উপচয় হইয়াছিল।—সেই 'বজ্র' আচার্য্য জগদীশের আরাধ্যা বিজ্ঞানলক্ষ্মীর মন্দিরের প্রতীক! দধীচির সেই বজ্র ও ভারতীয় সাধকের জয়-বাণী 'বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্র গঙ্গা-যমুনার মত মিলিয়াছে। শক্তি ও ভক্তির অতুলনীয় সম্মিলন। এ প্রতীক সার্থক হউক, ধন্য হউক, হে ভগবান!

বেদীর সম্মুখভাগে, স্বর্ণ, রজত ও তাম্রে নির্ম্মিত সূর্য্য-বিগ্রহ। ধ্বান্তারি, সর্ব্বপাপঘ্ন দিবাকর সপ্তাশ্ব রথে অয়ন-পথে যাত্রা করিয়াছেন। অন্ধকার অন্তর্হিত, আলোক উদ্ভাসিত হইয়াছে। মহাদ্যুতি কাশ্যপেয় কিরণের—আলোকের,—প্রকাশের দেবতা; তাঁহার প্রসাদে বিজ্ঞানলক্ষ্মীর এই মন্দির জ্ঞান-ময়ূখমালায় চিরসমুজ্জ্বল থাকুক। অজ্ঞানের অন্ধকার অন্তর্হিত হউক,—এই মন্দিরে প্রতিফলিত আলোকে বিশ্ববাসীর চিত্তে সত্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক। ভারত ধন্য হউক; আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সাধনা সিদ্ধ হউক; 'প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ' তাঁহার অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের দীপ হইতে ভারতে—বিশ্বে অগণিত দীপ জীবনের জ্যোতি সঞ্চয় করুক।

* * * *

ছয়টার পর জগদীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। সমগ্র সভাজন দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। সম্মুখে রক্তকৌষেয়-পটে দেদীপ্যমান বজ্রে, বন্দে মাতরম্ মহামন্ত্রে, এবং জগদীশের বিগ্রহে—জাতির নব-তীর্থের যাত্রী পুরুষোত্তমের অবভাস দেখিলাম। মনে আন্তরিক কামনা জাগিয়া উঠিল—মা! তোমার এই একনিষ্ঠ ভক্ত সাধকের সাধনার পথ প্রশস্ত করিয়া দাও—কালের প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিয়া এই বাঙ্গালীর বাঙ্গালীকে বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর আরাধনার অবকাশ দাও।

সুমধুর সঙ্গীতের পর জগদীশচন্দ্র বৈদিক মন্ত্রে আচার্য্য পদে বৃত হইলেন। আচার্য্য-বরণের পর বৈদিক মন্ত্রে তিনি কয়েক জন শিষ্যকে দীক্ষা দিলেন; তাঁহারাও বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তাহার পর স্যার রবীন্দ্রনাথের রচিত 'আবাহন'-সঙ্গীত গীত হইল।—

মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন
কর মহোজ্জ্বল আজহে !
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজহে !
ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ কর, লহ জ্যোতির্দীক্ষা,
যাত্রিদল সব সাজহে !
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজহে !
বল 'জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বীরাজ হে !
জয় হে, জয় হে, জয় হে !'
এস—বজ্রমহাসনে, মাতৃআশীর্ভাষণে,
সকল সাধক এস হে, ধন্য কর এ দেশ হে !

সকল যোগী, সকল ত্যাগী,
এস দুঃসহ-দুঃখভাগী,
এস দুর্জ্জয় শক্তিসম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে !
এস জ্ঞানী, এস কর্ম্মী, নাশ ভারতলাজ হে !
এস মঙ্গল, এস গৌরব,
এস অক্ষয় পুণ্য সৌরভ,
এস তেজঃসূর্য্য উজ্জ্বল কীর্ত্তি অম্বর মাঝ হে !
বীর ধর্ম্মে পুণ্য কর্ম্মে বিশ্বহৃদয়ে রাজ হে !
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজহে !
জয় জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বীরাজ হে !
জয় হে, জয় হে, জয় হে !

সঙ্গীতের অবসানে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিবার উপায় নাই। জগদীশচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—ইহা 'পরীক্ষাগার' নয়, বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর মন্দির। সত্যের অন্বেষণ মন্দিরেই করিতে হয়। অতীন্দ্রিয় জগতের সত্যের উপলব্ধি অনুভূতিসাধ্য। সে অনুভূতির বিকাশ যে সাধনাসাপেক্ষ, সে সাধনা মন্দিরেই সম্ভব। তাহার পর রবীন্দ্রনাথের রচিত ভারতভাগ্য-বিধাতার বন্দনা—বাঙ্গালীর আশার গান, আকাঙ্ক্ষার গান, ভক্তির গান, শক্তির গান, মুক্তির গান, ভারতের মর্ম্মবাণী—সমবেত-কণ্ঠে গীত হইল।—

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট-মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ।
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিষ মাগে, গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ-মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
জয়হে জয়হে জয়হে জয় জয় জয় জয় জয় হে !

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে, প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয়হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
জয়হে জয়হে জয়হে জয় জয় জয় জয়হে।

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লবমাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে, সঙ্কট-দুঃখ-ত্রাতা।
জনগণ-পথ-পরিচায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা!
জয় হে জয় হে জয় হে জয় জয় জয় জয় হে!

ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত নয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণ-দুঃখত্রায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা!
জয় হে জয় হে জয় হে জয় জয় জয় জয় হে।

রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব্ব উদয়গিরিভালে।
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবন রস ঢালে।
তব করুণারুণ-রাগে নিদ্রিত ভারত জাগে, তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে জয় রাজেশ্বর ভারত-ভাগ্য-বিধাতা!
জয় হে জয় হে জয় হে জয় জয় জয় জয় হে।

সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন।

তাহার পর, যাহাদের জন্য আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহারা—বাঙ্গালার নন্দদুলাল—বাঙ্গালীর উত্তরপুরুষগণ 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে হুঙ্কার করিয়া প্রাণশক্তির ও বাঙ্গালীর মর্ম্মগত ভক্তির পরিচয় দিয়া সমবেত ভক্ত-সম্প্রদায়ের ভক্তিনম্র চিত্ত আশায় উদ্দীপ্ত করিলেন।—সভাভঙ্গ হইল।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের অভিভাষণ।

নিবেদন।

বাইশ বৎসর পূর্ব্বে যে স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল, সে দিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সে দিন যে মানস করিয়াছিলাম, এত দিন পরে তাহাই দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা মন্দির,—কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য, পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়েরও অতীত দুই-একটি মহাসত্য আছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাস আশ্রয় করিতে হয়।

বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। তাহার জন্যও অনেক সাধনা আবশ্যক। যাহা কল্পনার রাজ্যে ছিল, তাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হয়। এই আলোটা চক্ষুর অদৃশ্য ছিল, তাহাকে চক্ষুগ্রাহ্য করিতে হইবে। শরীর-নির্ম্মিত ইন্দ্রিয় যখন পরাস্ত হয়, তখন ধাতুনির্ম্মিত অতীন্দ্রিয়ের শরণাপন্ন হই। যে জগৎ কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে অশব্দ ও অন্ধকারময় ছিল, এখন তাহার গভীর নির্ঘোষ ও দুঃসহ আলোরাশিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি।

এই সকল একেবারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও মনুষ্যনির্ম্মিত কৃত্রিম ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু আরও অনেক ঘটনা আছে, যাহা ইন্দ্রিয়েরও অগোচর। তাহা কেবল বিশ্বাসবলেই লাভ করা যায়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধেও পরীক্ষা আছে, তাহা দুই-একটি ঘটনার দ্বারা হয় না, তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা আবশ্যক। সেই সত্য-প্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির উত্থিত হইয়া থাকে।

কি সেই মহা সত্য, যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও সমস্ত আরাধনা কোনও উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না, যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ-শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু যাঁহারা কর্ত্তব্যসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন, এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উন্মুখ হইয়াছেন, আমার কথা বিশেষভাবে কেবল তাঁহাদের জন্য।

পরীক্ষা

যে পরীক্ষার কথা বলিব, তাহা শেষ করিতে দুইটি জীবন লাগিয়াছে। যেমন একটি ক্ষুদ্র লতিকার পরীক্ষায় সমস্ত উদ্ভিদ-জীবনের প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হয়, সেইরূপ একটি মনুষ্যজীবনের বিশ্বাসের ফল দ্বারা বিশ্বাসরাজ্যের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্যই স্বীয় জীবনে পরীক্ষিত সত্যসম্বন্ধে যে দুই-একটি কথা বলিব, তাহা ব্যক্তিগত কথা ভুলিয়া সাধারণভাবে গ্রহণ করিবেন। পরীক্ষার আরম্ভ, পিতৃদেব স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বসুকে লইয়া, তাহা অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বের কথা। তাঁহারই নিকট আমার শিক্ষা ও দীক্ষা। তিনিই শিখাইয়াছিলেন, অন্যের উপর প্রভুত্ববিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবন-শাসন বহুগুণে শ্রেয়স্কর। তিনি জনহিতকর নানা কার্য্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার সকল চেষ্টা ও সর্ব্বস্ব নিয়োজিত

করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার সে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। সুখ-সম্পদের কোমল শয্যা হইতে তাঁহাকে দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সকলেই বলিত, তিনি তাঁহার জীবন ব্যর্থ করিয়াছেন। এই ঘটনা হইতেই সফলতা কত ক্ষুদ্র এবং কোন্ কোন্ বিফলতা কত বৃহৎ, তাহা শিখিতে পারিয়াছিলাম। পরীক্ষার প্রথম অধ্যায় এই সময় লিখিত হইয়াছিল।

তাহার পর বত্রিশ বৎসর হইল, শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিয়াছি। বিজ্ঞানের ইতিহাস-ব্যাখ্যায় আমাকে বহু দেশবাসী মনস্বিগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহার মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? শিক্ষাকার্য্যে অন্যে যাহা বলিয়াছে, সেই সকল কথাই শিখাইতে হইত। ভারতবাসীরা যে কেবলই ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধান কার্য্য কোনও দিনই তাহাদের নহে, এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এ দেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্র-নির্ম্মাণও এ দেশে কোনও দিনও হইতে পারে না, তাহাও কত বার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সেই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্ম্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে। তেইশ বৎসর পূর্ব্বে অদ্যকার দিনে এই সকল কথা স্মরণ করিয়া এক জন তাহার সমগ্র মন সমগ্র প্রাণ ও সাধনা ভবিষ্যতের জন্য নিবেদন করিয়াছিল। তাহার ধনবল কিছুই ছিল না, তাহার পথপ্রদর্শক কেহ ছিল না। বিশ বৎসরেরও অধিক একাকী তাহাকে প্রতিদিন প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। এত দিন পরে তাহার নিবেদন সার্থক হইয়াছে।

জয়-পরাজয়

তেইশ বৎসর পূর্ব্বে অন্ধকার দিনে যে আশা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম, দেবতার করুণায় তিন মাসের মধ্যে তাহার প্রথম ফল ফলিয়াছিল। জার্ম্মাণীতে আচার্য্য হর্টস বিদ্যুৎতরঙ্গ সম্বন্ধে যে দুরূহ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার বহুল বিস্তার ও পরিণতি এখানেই সম্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু এদেশের কোনও প্রসিদ্ধ সভাতে আমার আবিষ্ক্রিয়া-সংবাদ যখন পাঠ করি, তখন সভাস্থ কোনও সভ্যই আমার কার্য্য সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করিলেন না; বুঝিতে পারিলাম, ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা একান্ত সন্দিহান। অতঃপর আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার বর্ত্তমানকালের সর্ব্বপ্রধান পদার্থবিদের নিকট প্রেরণ করি। আজ বাইশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার উত্তর পাইলাম ; তাহাতে

অবগত হইলাম, যে আমার আবিষ্ক্রিয়া রয়েল সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত হইবে, এবং এই সকল তথ্য ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহায় হইবে বলিয়া পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি আমার গবেষণাকার্য্যে নিয়োজিত হইবে। সেই দিনে ভারতের সম্মুখে যে দ্বার অর্গলিত ছিল, তাহা সহসা উন্মুক্ত হইল! আর কেহ সেই উন্মুক্ত দ্বার রোধ করিতে পারিবে না। সে দিন যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা কখনও নির্ব্বাপিত হইবে না।

এই আশা করিয়াই আমি বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত মন ও শরীর লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলাম। কিন্তু মানুষের প্রকৃত পরীক্ষা এক দিনে হয় না, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাকে আশা ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হইতে হয়। যখন আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিপত্তি আশাতীত উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তখনই সমস্ত জীবনের কৃতিত্ব ব্যর্থপ্রায় হইতেছিল।

তখন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্ম্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম; দেখিলাম, হঠাৎ কলের সাড়া কোনও অজ্ঞাত কারণে রুদ্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি যেরূপ অনুমান করা যায়, কলের সাড়ালিপিতে সেই একইরূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল,এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধ-প্রয়োগে তাহার সাড়া দিবার শক্তি বাড়িয়া গেল, এবং বিষ-প্রয়োগে তাহার সাড়া চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি জীবনের এক প্রধান লক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা আমি রয়েল সোসাইটীর সমক্ষে পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম,কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ বলিয়া জীবতত্ত্ববিদ্যার দুই এক জন অগ্রণী ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তদ্ভিন্ন আমি পদার্থবিৎ, আমার স্বীয় গণ্ডী ত্যাগ করিয়া জীবতত্ত্ববিদের নূতন জাতিতে প্রবেশ করিবার অনধিকারচেষ্টা রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইল। তাহার পর আরও দুই একটি অশোভন ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাঁহারা আমার বিরুদ্ধ পক্ষে ছিলেন, তাঁহারই মধ্যে এক জন আমার আবিষ্কার পরে নিজের বলিয়া প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ফলে, দ্বাদশ বৎসর যাবৎ আমার সমুদয় কার্য্য পণ্ডপ্রায় হইয়াছিল। এতকাল এক দিনের জন্যও মেঘরাশি ভেদ করিয়া আলোকের মুখ দেখিতে পাই নাই। এই সকল স্মৃতি অতিশয় ক্লেশকর, বলিবার একমাত্র আবশ্যকতা এই, যদি কেহ কোনও বৃহৎ

কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য্য থাকে, কেবল তাহা হইলেই বিশ্বাস-নয়নে কোনও দিন দেখিতে পাইবেন, বার বার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই, সেই এক দিন বিজয়ী হইবে।

পৃথিবী-পর্য্যটন

ভাগ্য ও কার্য্যচক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে—তাহার নিয়ম, উত্থান, পতন, আবার পুনরুত্থান। দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া যে ঘন দুর্দ্দিন আমাকে ম্রিয়মাণ করিয়াও সম্পূর্ণ পরাভব করিতে পারে নাই, সেই দুর্য্যোগও এক দিন অভাবনীয়রূপে কাটিয়া গেল। সে আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা। বিলাত হইতে আগত জনৈক ইংরাজ এক দিন আমার পরীক্ষাগার দেখিতে আইসেন; তিনি উদ্ভিদ্-জীবন সম্বন্ধে যে সকল পরীক্ষা হইতেছিল, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং যে সকল কর্ম্মকার আমার শিক্ষা-অনুসারে এই সকল কল নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাদিগকে দেখিতে চাহিলেন। সাক্ষাৎ হইলে তাহাদিগের হাত ধরিয়া বলিলেন, তোমাদের জীবন ধন্য হউক, তোমরাই প্রকৃত স্বদেশসেবক! জানিতে পারিলাম, সেই দিনের আগন্তুক আজ আমাদের ভারতসচিব মণ্টেগু। ইহার পর ভারত গবর্মেণ্ট ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আমার নূতন আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক-সমাজে প্রচার করিবার জন্য আমাকে পৃথিবী-পর্য্যটনে প্রেরণ করেন। সেই উপলক্ষে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, ভিয়েনা, হার্ভার্ড, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, সিকাগো, কালিফর্ণিয়া, টোকিও ইত্যাদি স্থানে আমার পরীক্ষা প্রদর্শিত হয়। এই সকল স্থানে জয়মাল্য লইয়া কেহ আমার প্রতীক্ষা করে নাই, বরং আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিগণ আমার ত্রুটী দেখাইবার জন্যই দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তখন আমি সম্পূর্ণ একাকী, অদৃশ্যে কেবল সহায় ছিলেন, ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী। এই অসম সংগ্রামে ভারতেরই জয় হইল, এবং যাঁহারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাঁহারা পরে আমার পরম বান্ধব হইলেন।

বীরনীতি

বর্ত্তমান উদ্ভিদবিদ্যার অসীম উন্নতি লাইপজিগের জর্ম্মাণ অধ্যাপক ফেফারের অর্দ্ধ শতাব্দীর অসাধারণ কৃতিত্বের ফল। আমার কোনও কোনও আবিষ্ক্রিয়া ফেফারের কয়েকটী মতের বিরুদ্ধে। ইহাতে তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছি মনে করিয়া আমি লাইপজিগ না গিয়া ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ

রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে ফেফার তাঁহার সহযোগী অধ্যাপককে আমায় নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমার প্রতিষ্ঠিত নূতন তত্ত্বগুলি জীবনের সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকটে পৌঁছিয়াছে; তাঁহার দুঃখ রহিল যে, এ সকল সত্যের পরিণতি তিনি এ জীবনে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। যাঁহার বৈরভাব আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তিনিই মিত্ররূপে আমাকে গ্রহণ করিলেন। ইহ্হি ত চিরন্তন বীরনীতি, যাহা আপনার পরাভবের মধ্যেও সত্যের জয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই বীরধর্ম্ম কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। অগ্নিবাণ আসিয়া যখন ভীষ্মদেবের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিল, তখন তিনি আনন্দের আবেগে বলিয়াছিলেন, সার্থক আমার শিক্ষাদান! এই বাণ শিখণ্ডীর নহে, ইহা আমার প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনের।

পৃথিবী পর্য্যটন ও স্বীয় জীবনের পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে, নূতন সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য সমস্ত জীবন পণ ও সাধনা আবশ্যক। জগতে তাহার প্রচার আরও দুরূহ। ইহাতে আমার পূর্ব্বসঙ্কল্প দৃঢ়তর হইয়াছে। বহু দিন সংগ্রামের পর ভারত বিজ্ঞানক্ষেত্রে যে স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা যেন চিরস্থায়ী হয়! আমার কার্য্য যাঁহারা অনুসরণ করিবেন, তাঁহাদের পথ যেন কোনও দিন অবরুদ্ধ না হয়!

বিজ্ঞান-প্রচারে ভারতের স্থান

বিজ্ঞান ত সার্ব্বভৌমিক, তবে বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রে এমন কি কোনও স্থান আছে, যাহা ভারতীয় সাধক ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিবে? তাহা নিশ্চয়ই আছে। বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানের প্রসার বহু বিস্তৃত হইয়াছে, এবং প্রতীচ্য দেশে কার্য্যের সুবিধার জন্য তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়াছে, এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। দৃশ্যজগৎ অতি বিচিত্র এবং বহুরূপী। এত বিভিন্নতার মধ্যে যে কিছু সাম্য আছে, তাহা কোনরূপেই বোধগম্য হয় না। এই সতত চঞ্চল প্রাণী, আর এই চিরমৌন নিস্তব্ধ অবিচলিত উদ্ভিদ, ইহাদের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য দেখা যায় না। আর এই উদ্ভিদের মধ্যে একই কারণে বিভিন্নরূপে সাড়া দেখা যায়। কিন্তু এত বৈষম্যের মধ্যেও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালী একতার সন্ধানে ছুটিয়া জড় উদ্ভিদ এবং জীবের মধ্যে সেতু বাঁধিয়াছে। এতদর্থে ভারতীয় সাধক, কখনও তাহার চিন্তা কল্পনায় উন্মুক্ত রাজ্যে অবাধে প্রেরণ করিয়াছে, এবং পর মুহূর্ত্তেই তাহাকে শাসনের অধীনে আনিয়াছে। আদেশবলে জড়বৎ

অঙ্গুলিতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে, এবং যে স্থলে মানুষের ইন্দ্রিয় পরাস্ত হইয়াছে, তথায় কৃত্রিম অতীন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহা দিয়া এবং অসীম ধৈর্য্য সম্বল করিয়া অব্যক্ত জগতের সীমাহীন রহস্য, পরীক্ষা প্রণালীতে স্থির প্রতিষ্ঠা করিবার সাহস বাঁধিয়াছে। যাহা চক্ষুর অগোচর ছিল, তাহা দৃষ্টিগোচর করিয়াছে। কৃত্রিম চক্ষু পরীক্ষা করিয়া মনুষ্যদৃষ্টির অভাবনীয় এক নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে যে, তাহার দুইটী চক্ষু এক সময়ে জাগরিত থাকে না, পর্য্যায়ক্রমে একটি ঘুমায়, আর একটি জাগিয়া থাকে। ধাতুপত্রে লুক্কায়িত স্মৃতির অদৃশ্য ছাপ প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়াছে। অদৃশ্য আলোক-সাহায্যে কৃষ্ণ প্রস্তরের ভিতরের নির্ম্মাণকৌশল বাহির করিয়াছে। আণবিক কারুকার্য্য ঘূর্ণ্যমান বিদ্যুৎ-উর্ম্মির দ্বারা দেখাইয়াছে। বৃক্ষজীবনে মানবীয় জীবনের প্রতিকৃতি দেখাইয়া, নির্ব্বাণ জীবনের বেদনাচাঞ্চল্য মানবের অনুভূতির অন্তর্গত করিয়াছে। স্থির বৃক্ষের অদৃশ্য বৃদ্ধি মাপিয়া লইয়াছে, এবং বিভিন্ন আহার ও ব্যবহারে সেই বৃদ্ধি মাত্রা পরিবর্ত্তন, মুহূর্ত্তে ধরিয়াছে। মনুষ্যস্পর্শেও যে বৃক্ষ সঙ্কুচিত হয়, তাহা সপ্রমাণ করিয়াছে। যে উত্তেজক মানুষকে উৎফুল্ল করে, যে মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার প্রাণনাশ করে, উদ্ভিদেও তাহাদের একইবিধ ক্রিয়া প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিষে অবসন্ন মুমূর্ষু উদ্ভিদকে ভিন্ন বিষের প্রয়োগ দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিয়াছে। উদ্ভিদপেশীর স্পন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে হৃদয়স্পন্দনের প্রতিচ্ছায়া দেখাইয়াছে। বৃক্ষশরীরে স্নায়ুসূত্র ও স্নায়ুপ্রবাহ আবিষ্কার করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিয়াছে। প্রমাণিত করিয়াছে যে, যে সকল কারণে মানুষের স্নায়ুর উত্তেজনা বর্দ্ধিত বা মন্দীভূত হয়, সেই একই কারণে উদ্ভিদস্নায়ুর উত্তেজনা উত্তেজিত অথবা প্রশমিত হয়। এই সকল কথা কল্পনাপ্রসূত নহে। যে সকল অনুসন্ধান এই স্থানে গত তেইশ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত হইয়াছে, ইহা তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত ও অপরিপূর্ণ ইতিহাস। যে সকল অনুসন্ধানের কথা বলিলাম, তাহাতে নানা পথ দিয়া পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, এমন কি, মনস্তত্ত্ববিদ্যাও এককেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের যদি কোনও বিশেষ তীর্থ বিধাতা ভারতীয় সাধকের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তবে এই চতুর্ব্বেণীসঙ্গমেই সেই মহাতীর্থ।

আশা ও বিশ্বাস

এই সকল অনুসন্ধান বিজ্ঞানের বহুশাখা লইয়া। কেহ কেহ মনে করেন, ইহাদের বিকাশে নানা ব্যাবহারিক বিদ্যার উন্নতি এবং জগতের কল্যাণ সাধিত

হইবে। যে সকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা কি এক জনের জীবনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে? একটিমাত্র বিষয়ের জন্ত বীক্ষণাগার-নির্ম্মাণে অপরিমিত ধন আবশ্যক হয়, আর এইরূপ অতিবিস্তৃত এবং বহুমুখী জ্ঞানবিস্তার যে আমাদের দেশের পক্ষে অসম্ভব, এ কথা বিজ্ঞজন-মাত্রেই বলিবেন। কিন্তু আমি অসম্ভাব্য বিষয়ের উপলক্ষে, কেবলমাত্র বিশ্বাস-বলেই চিরজীবন চলিয়াছি; ইহা তাহারই মধ্যে অন্ততম। হইতে পারে না বলিয়া কোনও দিন পরাঙ্মুখ হই নাই, এখনও হইব না। আমার যাহা নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, তাহা এই কার্য্যেই নিয়োগ করিব। রিক্তহস্তে আসিয়াছিলাম, রিক্তহস্তেই ফিরিয়া যাইব; ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হয়, তাহা দেবতার প্রসাদ বলিয়া মানিব। আর এক জনও এই কার্য্যে তাঁহার সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাঁহার সাহচর্য্য আমার দুঃখ ও পরাজয়ের মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে। বিধাতার করুণা হইতে কোনও দিন একেবারে বঞ্চিত হই নাই। যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান ছিলেন, তখনও দুই এক জনের বিশ্বাস আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাঁহারা মৃত্যুর পর পারে।

আশঙ্কা হইয়াছিল, ভবিষ্যতের অনিশ্চিত বিধানের উপর এই মন্দিরের স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে। অল্পদিন হইল বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমি যে আশায় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, তাহার আহ্বান ভারতের দূরস্থানেও মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। বোম্বাই হইতে দুই জন প্রধান শ্রেষ্ঠী সর্ব্বপ্রথমে মুক্তহস্তে মন্দিরের চিরস্থায়ী ভাণ্ডারে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহা-দের নিকট সম্পূর্ণরূপ অপরিচিত ছিলাম। গবর্মেণ্ট এ বিষয়ে বিশেষ সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, আমি যে বৃহৎ সঙ্কল্প করিয়া-ছিলাম, তাহার পরিণতি একেবারে অসম্ভব নহে। জীবিত থাকিতেই হয় ত, দেখিতে পাইব যে, এই মন্দিরের শূন্য অঙ্গন দেশবিদেশ হইতে সমাগত যাত্রী দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

আবিষ্কার এবং প্রচার

বিজ্ঞান অনুশীলনের দুই দিক আছে, প্রথমতঃ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার; ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর জগতে সেই নূতন-তত্ত্ব প্রচার। সেই জন্যই এই সুবৃহৎ বক্তৃতা-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা ও

তাহার পরীক্ষার জন্য এইরূপ গৃহ বোধ হয় অন্য কোথাও নির্ম্মিত হয় নাই। দেড় সহস্র শ্রোতার এখানে সমাবেশ হইতে পারিবে। এ স্থানে কোনও বহু-চর্ব্বিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই মন্দিরে যে সকল আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে, সেই সকল নূতন সত্য এ স্থানে পরীক্ষাসহকারে সর্ব্বাগ্রে প্রচারিত হইবে। সর্ব্ব জাতি সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে। মন্দির হইতে প্রচারিত পত্রিকার দ্বারা নব নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জগতে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে। এই স্থানে প্রকাশিত আবিষ্কার এইরূপে জগতের সম্পত্তি হইবে, এবং হয় ত তদ্দ্বারা ব্যাবহারিক বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু এখান হইতে কোনও পেটেন্ট লওয়া হইবে না; কারণ,আমি মনে করি, জ্ঞান দেবতার দান, তাহা অর্থলাভের উপায় নহে।

আমার আরও অভিপ্রায় এই যে, এ মন্দিরের শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতে জ্ঞান সার্ব্বভৌমিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় দেশদেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তখনই আমরা মহৎ দান করিয়াছি। ক্ষুদ্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্ব্বজীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন প্রাণময়। যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই আমাদের আরাধ্য। শিল্পী কারুকার্য্যে এই মন্দির মণ্ডিত করিয়াছেন, এবং চিত্রকর আমাদের হৃদয়ের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা চিত্রপটে বিকশিত করিয়াছেন।

আমি যে উদ্ভিদ-জীবনের কথা বলিয়াছি, তাহা আমাদের জীবনেরই প্রতিধ্বনি। সে জীবন আহত হইয়া মুমূর্ষুপ্রায় হয়, এবং ক্ষণিক মূর্চ্ছা হইতে পুনরায় জাগিয়া উঠে। এই আঘাতের দুই দিক আছে, আমরা সেই দুইএর সংযোগস্থলে বর্ত্তমান। এক দিকে জীবনের, অপর দিকে মৃত্যুর পথ প্রসারিত। জীবন, আঘাতেরই ক্রিয়া, যে আঘাত হইতে আমরা পুনরায় উঠিতে পারি। প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা আঘাত দ্বারা মুমূর্ষু হইতেছি, এবং পুনরায় সঞ্জীবিত হইতেছি। আঘাত-বলেই জীবনের শক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। তিল তিল করিয়া মরিতেছি, বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি।

একদিন আসিবে, যখন আঘাতের মাত্রা ভীষণ হইবে; তখন যাহা হেলিয়া পড়িবে, তাহা আর উঠিবে না, অন্য কেহও তাহাকে তুলিয়া ধরিতে পারিবে না। ব্যর্থ তখন স্বজনের ক্রন্দন, ব্যর্থ তখন সতীর জীবনব্যাপী ব্রত ও সাধনা।

কিন্তু যে মৃত্যুর স্পর্শে সমুদয় উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য শান্ত হয়, তাহার রাজত্ব কোন্ কোন্ দেশ লইয়া? কে ইহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবে? অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন আমরা। চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইলেই আমরা এই ক্ষুদ্র বিশ্বের পশ্চাতে অচিন্তনীয় নূতন বিশ্বের অনন্ত ব্যাপ্তিতে অভিভূত হইয়া পড়ি।

কে মনে করিতে পারিত, এই আর্ত্তনাদবিহীন উদ্ভিদজগতে, এই তুষ্ণীভূত, অসীম জীবসঞ্চারে অনুভূতি শক্তি বিকশিত হইয়া উঠিতেছে? তাহার পর কি করিয়াই বা স্নায়ুযন্ত্রের উত্তেজনা হইতে তাহারই ছায়ারূপিণী অশরীরিণী স্নেহ-মমতা উদ্ভূত হইল! ইহার মধ্যে কোন্‌টা অজর, কোন্‌টা অমর? যখন এই ক্রীড়াশীল পুত্তলীদের খেলা শেষ হইবে, এবং তাহাদের দেহাবশেষ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে, তখন সেই সকল অশরীরিণী ছায়া কি আকাশে মিলাইয়া যাইবে, অথবা অধিকতররূপে পরিস্ফুট হইবে?

কোন্ রাজ্যের উপর তবে মৃত্যুর অধিকার? মৃত্যুই যদি মনুষ্যের একমাত্র পরিণাম, তবে ধনধান্যে পূর্ণা পৃথিবী লইয়া সে কি করিবে? কিন্তু মৃত্যু সর্ব্ব-জয়ী নহে; জড়সমষ্টির উপরই কেবল তাহার আধিপত্য। মানব-চিন্তা-প্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি মৃত্যুর আঘাতেও নির্ব্বাপিত হয় না। অমরত্বের বীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে। মহাসাম্রাজ্য, দেশ-বিজয়ে কোনও দিন স্থাপিত হয় নাই। তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্যজ্ঞান প্রচার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতখণ্ডেই অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব ঐশ্বর্য্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা কেবল বিতরণের জন্য, দুঃখমোচনের জন্য, এবং জীবের কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তি হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল, যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্দ্ধ আমলক-মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন, এখন ইহাই আমার সর্ব্বস্ব, ইহাই যেন আমার চরম দানরূপে গৃহীত হয়।

অর্ঘ।

এই আমলকের চিহ্ন মন্দিরের গাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। পতাকাস্বরূপ সর্ব্বোপরি বজ্রচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত—যে দৈব অস্ত্র নিষ্পাপ দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা পরার্থে জীবনদান করেন, তাঁহাদের অস্থি দ্বারাই বজ্র নির্ম্মিত হয়, যাহার জ্বলন্ত তেজে জগতে দানবত্বের বিনাশ ও দেবত্বের

প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। আজ আমাদের অর্ঘ, অর্দ্ধ আমলকমাত্র; কিন্তু পূর্ব্ব দিনের মহিমা মহত্তর হইয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করিবেই করিবে। এই আশা লইয়া অদ্য আমরা ক্ষণকালের জন্য এখানে দাঁড়াইলাম; কল্য হইতে পুনরায় কর্ম্ম-স্রোতে জীবনতরী ভাসাইব। আজ কেবল আরাধ্যা দেবীর পূজার অর্ঘ লইয়া এখানে আসিয়াছি; তাঁহার প্রকৃত স্থান বাহিরে নহে, কিন্তু হৃদয়-মন্দিরে। তাঁহার পূজার প্রকৃত উপকরণ ভক্তের বাহুবলে, অন্তরের শক্তিতে, এবং হৃদয়ের ভক্তিতে। তাহার পর সাধক কি আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিবে? যখন প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন করিয়াও তাহার সাধনার সমাপ্তি হইবে না, যখন পরাজিত ও মুমূর্ষু হইয়া সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই আরাধ্যা দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। এইরূপ পরাজয়ের মধ্য দিয়াই সে তাহার পুরস্কার লাভ করিবে।

বঙ্কিমচন্দ্র।

[শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের ইংরাজী কবিতা হইতে।]

মধু-পুষ্পভরা এই মধু দিনে আজ,
সহসা নীরব তব পিককুল-রাজ,—
হে বসন্ত!—প্রাণসম ছিল যে তোমার,
কোথা গেল বল সেই সুধাস্বর-ধার?
সৃষ্টিকারি-বৃষ্টিধারা কোকিল-কূজন,
ভ্রমর-গুঞ্জন, মৃদু মলয় পবন,
নব-মুকুলিত তরু, আনন্দের হাসি,
ভরা-হৃদি-ভার-হারি ঝরা-অশ্রু-রাশি,
নবোদ্গত ভাবচয়, কোমল, মহান,
যূথিকা ও শতদল, বিহঙ্গের গান,—
তোমারি সন্তান সবে,—প্রতিভার বলে,
করি' রূপান্তর সুষ্ঠু-শব্দ-শতদলে,
রচিত সে প্রাণদ্রাবী মহা গ্রন্থচয়,—
চিত্রিয়া বিবিধ বর্ণে মানব-হৃদয়,

রমণীর মধুমাখা কটাক্ষ কোমল,—
প্রণয়-রসের উৎস, পবিত্র নির্ম্মল।
কি মধুর বাণী তব হে শিল্পি-উত্তম!
প্রতি ছত্রে চম্পকের বর্ণ মনোরম;
গন্ধরাজ পুষ্পশ্বাস—সৌরভের সার
নারীর নূপুর-কাঞ্চী-কঙ্কণ-ঝঙ্কার;
গৃহের আনন্দরোল; হাস্যের লহর,—
বায়ু সহ রত, যেন, পত্রের মর্ম্মর।
পাঠ করে যেই তব রচনা সুন্দর,
নেত্রে তার খুলে যায় দৃশ্য মনোহর;
প্রতি পত্রে প্রকটিত বিশ্ব চরাচর;—
ছয় ঋতু, দিবা, রাত্রি, কত নারী-নর,
বিরাজে তথায়; শুধু নহে মনোরম,—
জীবিত, প্রকৃত বলি' মনে হয় ভ্রম।
প্রকৃতির লীলাভূমি, হে বঙ্গ সুন্দর!
গিরি, নদী, অধিত্যকা, কানন, প্রান্তর!
প্রেমের জনমভূমি! পুষ্পের আকর!
বৃক্ষে বৃক্ষে তব মঞ্জু কোকিলের স্বর,
মলয়-নিঃস্বন সদা জন-চিত্ত-হর;
কিন্তু এ কবির ভাষা আরো মিষ্টতর!
এ কবির প্রাণ ছিল যুক্ত তব প্রাণে,
জানিত স্বরূপ তব তাই সূক্ষ্মজ্ঞানে।
রাজোচিত ছিল তার প্রকৃতি মহান,
দেবোপম ধৈর্য্য, চক্ষু দিব্য-দীপ্তিমান।
আয়স-কঠোর এই নিরানন্দ দিনে,
ধীর-পদে বীরসম নির্ভীকচরণে,
চলিত সে, স্থির-লক্ষ্য; প্রতি পদে তার,
সৌন্দর্য্য চালিত রশ্মি হরিয়া আঁধার,—
বীর-হস্তে লোহ-অসি যথা শোভা পায়,
কুসুমের হার যদি তাহারে জড়ায়।
উষর মরুর মাঝে, যতনে আপন,
করিল সে রক্ত-বক্ষ গোলাপ বপন;
গাহিল সে মহাগান, গলায়ে পাষাণ;
গন্ড কভু ধরে নাই হেন মিষ্ট তান।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ।

রাজলক্ষ্মী ।

ঊষা রাঙ্গা মেয়ে, অরুণের কন্যা,
ঢালি দিল যেন আলোকের বন্যা
নীরবে নিশির নিবিড় আঁধারে !
ভরি' গেল বিশ্ব আলোর জোয়ারে !
সাগরের নীল ফেনপুঞ্জরাশি
ভেদ করি' মরি, গাল-ভরা হাসি,
এসেছেন আহা জননী ইন্দিরা ;
নাকেতে বেসর, কাণে দোলে হীরা !
বদনে এখনও হাসিছে বালেন্দু ;
কেশের তরঙ্গে নীল-নীর-বিন্দু
এখনও ঝরিছে মায়ের আমার ;
ঝলকে অলকে মুকুতার হার ;
ভুজে শ্বেত শাঁখা মরি কি মধুর !
চরণ-পারুলে প্রবাল-নূপুর ;
যেখানে দাঁড়ান আমার অম্বুজা
নিত্য সেথা সুখ, নিত্য সেথা পূজা !

*   *   *

এই বালিকার সৌন্দর্য্যের শিখা
করিছে দাহন মায়া-যবনিকা !
সে অনলে আজি, সেই হোম যাগে,
ভক্তি-সর্জ্জরস ঢালি অনুরাগে,
করি জয়ধ্বনি, ডাকিতেছি তোরে,
দেখা দে, দেখা দে, দেখা দে মা মোরে !
এ অনিত্যরূপে হয় না মা তৃপ্তি,
নিত্যরূপে তোর প্রকাশিয়া দীপ্তি,
দেখা দে মা আজি ! কাণেতে কুণ্ডল,
রত্ন চেলী অঙ্গে করে ঝল্‌মল্‌,
চরণে নূপুর আনন্দে ঝঙ্কারে,
মধুর বচনে পিক-বধূ হারে,
যেখানে পা পড়ে ধরা হেসে উঠে।
পাদ-পদ্ম-স্পর্শে পদ্ম-ফুল ফোটে !
সেই নিত্য রূপে দে মা দরশন,
মহা ধ্যানে আজি মুদিনু নয়ন !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন ।

স্থাপত্য-শিল্প।

৫

এইবার স্থাপত্যের উৎকর্ষসাধনে কি কি বিষয়ের প্রয়োজন, তাহার আলোচনা করিব। এই আলোচনা করিবার পূর্ব্বে দেখা যাউক যে, স্থাপত্যের মধ্যে কত প্রকারের বিভিন্ন শ্রেণী বর্ত্তমান। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পাঁচটী শ্রেণীর উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা—মন্দির বা দেবায়তনসংজ্ঞক, স্মারক, রাষ্ট্রীয়, সামরিক ও বাসস্থলীয়। উদাহরণ দ্বারা এই শ্রেণীগুলির অর্থ বিশদ করা যাউক। ইহাদের পার্শ্বে ইহাদের অন্তর্গত উদাহরণগুলি সন্নিবেশিত হইল।

দেবায়তনসংজ্ঞক—জগন্নাথের মন্দির, সেণ্টপলের গির্জ্জা (St. Paul's Cathedral), দিল্লীস্থ জামে মসজিদ্, আবু পর্ব্বতশৃঙ্গস্থ দিলোয়ারা প্রভৃতি।

স্মারক—তাজমহল, এথেন্স-স্থিত Lysioratesর Monument, সারনাথের স্তূপ, জুনাগড়স্থ মাইজি সাহেবার সমাধি প্রভৃতি।

রাষ্ট্রীয়—কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিং, হাইকোর্ট, লণ্ডনস্থ পার্লিয়ামেণ্ট প্রভৃতি।

সামরিক—দিল্লীর দুর্গ, আগ্রার দুর্গ, কলিকাতার দুর্গ ইত্যাদি।

বাসস্থলীয়—তোমার আমার মত সাধারণ বা ধনী নির্ধনের আবাসস্থলী, বা রাজ-প্রাসাদ; যেমন, ভারসাইল (Versailles) প্রভৃতি।

পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীগুলিকে আবার উহাদের অন্তর্গত ক্ষুদ্র শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যাহা হউক, প্রত্যেক শ্রেণীর এক একটী বিশেষত্ব আছে; এই বিশেষত্ব উদ্দেশ্য বা সার্থকতা দ্বারা অনুপ্রাণিত। সুতরাং বুঝা গেল যে, স্থাপত্যের উৎকর্ষবিধানে সার্থকতার সংরক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন। এ কথা আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু শুদ্ধ উদ্দেশ্যের রক্ষা সাধিত হইলেই যে স্থাপত্যের উৎকর্ষ সাধিত হইল, ইহা কখনই কেহ স্বীকার করিবেন না। প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কোনও একটি সৌধকে সুদৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত করিলেও তাহাতে মৌলিকতার অবতারণা করিলে কেহ যদি মনে করেন যে, স্থাপত্যের সার্থকতা রক্ষিত হইয়াছে, তিনি নিতান্ত ভ্রান্ত। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সুদৃঢ় ও পেশীবহুল হইলেই যে দেহে লাবণ্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে, তাহা আশা করাই অন্যায়। দেহের কমনীয়তা ও লাবণ্য এক স্বতন্ত্র

বস্তু; ইহার সন্ধান, শরীরবিজ্ঞানে কেন, কোনও বিজ্ঞানেই মিলিবে না। এই প্রকার কোনও সৌধের সার্থকতা শুদ্ধ উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা, মৌলিকত্ব ও সুদৃঢ়তায় মিলিবে না; ইহার সার্থকতা সৌন্দর্য্যবিধানে। দেহের সম্বন্ধেও যেমন, সৌধের সম্বন্ধেও তেমনই। দৈহিক সৌন্দর্য্য যে কি এবং কোথায়, তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু ইহা বেশ অনুভব করিতে পারা যায়; তেমনই স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য কি, এবং কি প্রকারে সংরক্ষিত হয়, তাহার ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে, অলঙ্কার সম্পাদন করিলেই সর্ব্বস্থলে বা সর্ব্বাবস্থায় সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয় না। অলঙ্কার অনেক সময় শোভাবৃদ্ধি না করিয়া ইহার তিরোধানে সহায়তা করে; কোনও হর্ম্ম্যের রুক্ষ-রিক্ততা অনেক স্থলে তাহার উপরিবিন্যস্ত অলঙ্কার অপেক্ষা অধিকতর মনোজ্ঞ, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। গিয়াসুদ্দিন টোগলকের সমাধিহর্ম্ম্যের বাহ্য-সম্পৎ কিছুই নাই বলিলেও চলে, কিন্তু রচনা ও অঙ্গসংস্থানে, এবং অলঙ্কার-বিমুক্ততার মধ্যে এমন এক অতুল্য সৌন্দর্য্য নিহিত রহিয়াছে যে, সমাধিটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মন এক অব্যক্ত রসাবেশে বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে। এরূপ সৌন্দর্য্য ইংলণ্ডস্থ নবম্যান্ স্থাপত্যেরও এক বিশিষ্টতা।

অনেককে বলিতে শুনা গিয়াছে যে, এই কঠোর জীবন-সংগ্রামের দিনে অট্টালিকাকে সুন্দর করিবার আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তর যে কি দিব, তাহা ত ভাবিয়া পাই না। আমার কেবল একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে, তাহা এই।—পৃথিবীতে থাকিতে হইলে মানুষের খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন করা ও তজ্জন্য অর্থোপার্জ্জন করাই ত যথেষ্ট। সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত প্রভৃতির আলোচনা বা হৃদয়ের সদ্বৃত্তিগুলির পরিপোষণের কোনও সার্থকতাই ত থাকে না; তথাপি আমরা জীবনধারণোপায়ের বন্দোবস্ত ভিন্ন নানা আপাততঃ-অপ্রয়োজনীয় কার্য্য করি কেন? করি এই জন্য যে, যাহা মানুষকে মানবেতর জীব হইতে বিশিষ্টতা প্রদান করে, এবং যাহা দ্বারা মনুষ্যের "তাদাত্ম্যত্ব"* সিদ্ধ হয়, সেই বৃত্তিগুলির উৎকর্ষসাধনের প্রয়োজন বলিয়া। এই কারণেই আমাদের বাস প্রভৃতিকে শুদ্ধ সুদৃঢ় ও সুবিধানুযায়ী করিয়া নির্ম্মাণ করিলে আমাদের মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রদান করা হইবে না, এবং স্থাপত্য মনুষ্যের রচিত বলিয়া ইহার সার্থকতারও লোপ হইবে।

রসমাধুর্য্য উপভোগ করিবার জন্য যেমন কাব্য বা সঙ্গীতের সৃষ্টি, প্রয়োজনীয়তার

* "অন্যোন্যাভাববত্ত্বং তদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাববত্ত্বং"। ভাষাপরিচ্ছেদ।

কথা ছাড়িয়া দিলেও স্থাপত্য সম্বন্ধেও এ কথা প্রয়োজ্য; যে স্থাপত্যে রসাস্বাদন করিতে পারা যায় না, তাহা নগণ্য, তুচ্ছ। কাব্যে বা সঙ্গীতে যেমন হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে, স্থাপত্যেও তদ্রূপ। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—ধর্ম্মের চরম পরিণতি রসোপভোগ দ্বারা পরমানন্দ লাভ করা; কেন না, সেই ব্রহ্মই রসস্বরূপ। এ হিসাবে স্থাপত্যেরও আধ্যাত্মিকতা সিদ্ধ হয়। এই কারণেই মহাকবি গেটে (Goethe) গথিক স্থাপত্যকে "প্রস্তরীভূত ধর্ম্ম" (petrified religion) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; তিনি এই স্থাপত্যকে মনুষ্যের অধ্যাত্মজ্ঞানের সহায়ক-স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক একটি সৌধের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ ত দূরে থাক, হৃদয়ে এমন এক একটি বৃত্তি জাগিয়া উঠে, যাহা আমাদিগের প্রবৃত্তিগুলিকে অধোগামী করিয়া তুলে। কলিকাতাস্থ Town Hall ও তৎপার্শ্বস্থিত Temple Chambers সৌধ অনেকে দেখিয়াছেন, কেমন বিস্ময়ের কথা যে, দুইটি বিপরীতধর্ম্মাক্রান্ত ও বিপরীত বৃত্তি-উত্তেজক সৌধ পাশাপাশি নির্ম্মিত হইয়াছে; একটিতে যেন জাতীয় জীবনের জটিল সমস্যাগুলির সমাধান করিবার একটা তীব্র ব্যগ্রতা ও উদ্বেগ মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া রহিয়াছে; আর একটি যেন যেন তেন প্রকারেণ অর্থোপার্জ্জন দ্বারা আপনার স্থূলোদর ও দীর্ঘাঙ্গ অনাবৃত রাখিয়া যেন পশুত্বের পরিচয় দিতেছে; শুদ্ধ তাহাও নহে। ইহাতে স্পর্দ্ধার ভাবও বর্ত্তমান; পশুত্বের দম্ভে ইহা যেন মস্তক উন্নত করিয়া আকাশ ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে; এই যে পূর্ণ পশুত্ব ভাব আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে, ইহাতে আমাদের প্রবৃত্তিগুলির উপর কি পশুত্বের রেখাসম্পাত বা ছায়াস্পর্শ ঘটিবে না?

আর একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। তুমি যে অভ্রভেদী সৌধ রচনা করিয়া আমার দৃষ্টির সীমা ক্ষুণ্ণ—তাহার গতি অবরুদ্ধ করিতেছ, আর প্রকৃতিপ্রদত্ত বায়ু ও আলোকের অব্যাহত অধিকার হইতে আমায় বঞ্চিত করিতেছ, তোমার কি উচিত নহে, অন্ততঃ ভদ্রতার অনুরোধেও কর্ত্তব্য নহে যে, আমার মধ্যে যে সৌন্দর্য্যজ্ঞান আছে, তাহাকে চরিতার্থ না কর, অন্ততঃ তাহার মূলে আঘাত করিবে না? শিষ্টাচারের অন্যথাচরণ মানবসমাজে যেমন নিন্দনীয়, তেমনই যে সৌধনির্ম্মাণ দ্বারা আমার সৌন্দর্য্যজ্ঞান অব্যাহত থাকে না, হৃদয়ে পশুত্বের উদ্রেক হয়, তাহা দ্বারা কি পূর্ব্বোক্ত শিষ্টাচারেরই সনাতন নিয়মকে অবমাননা করা হয় না? তুমি আমার বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের প্রত্যেক অঙ্গুলিপরিমাণ স্থানে ইষ্টক ও লৌহনির্ম্মিত স্তূপের পত্তন করিয়া আয়বৃদ্ধি বা ব্যয়হ্রাসের সন্ধানে ফিরিতেছ,

এবং তাহার সুবিধা সংঘটন করিতে পারিলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছ; ইহাতে কি তোমার পশুত্বের পরিচয় প্রদান করা হইতেছে না? তোমার নীচ স্বার্থপরতা বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করা হইতেছে না? জীবনটা শুধু ত কড়াক্রান্তি লইয়া নহে। এবং ইহাই যদি জীবনের নিয়ামক হয়, তাহা হইলে সে জীবনের কোনও সার্থকতাই নাই। সুতরাং সামাজিক শিষ্টাচার হিসাবে না ধরিলেও, ব্যক্তিগত ভাবেও নিজ নিজ সৌধকে সুন্দর করিবার আবশ্যকতা আছে। আমি ভাল হইলে শুদ্ধ যে সমাজের মঙ্গল, তাহা নহে, আমার নিজেরও উপকার। তেমনই সুন্দর ও স্থাপত্যশ্রীযুক্ত কোনও সৌধ রচনা করিলে অপরের সৌন্দর্য্যানুভূতিরই যে কেবলমাত্র পুষ্টি সাধিত হয়, তাহা নহে, নিজেরও বহু উপকার সাধিত হইবে। ইহাতে মানুষকে সৌন্দর্য্যভোগজ্ঞানের সহিত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে শিক্ষা দিবে। বাস্তবিক, কলিকাতাস্থ বড়বাজার, হাটখোলা প্রভৃতি অঞ্চলের বাটীগুলি দেখিলে আমার ত আতঙ্কের উদয় হয়; যতই অর্থ হউক না মানুষের পশুত্বের এক বীভৎস মূর্ত্তি দেখিয়া আমার ত শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়, এবং এগুলিকে ভূমিসাৎ করিতে ইচ্ছা করে।

গৃহনির্ম্মাণ ব্যাপারে সামাজিক দাবীদাওয়ার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া ইউরোপের ফ্রান্স, জর্ম্মনী প্রভৃতি দেশে অনেক বিধি নিষেধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গৃহস্বামী ইচ্ছা করিলেই যে সে প্রকারের গৃহ রচনা করিতে পারেন না; রাষ্ট্রীয় স্থপতির আদেশ ও অভিমত লইয়া কার্য্য করিতে হয়। Albert Shaw লিখিত Municipal Administration in the European Continent গ্রন্থে দেখিয়াছি যে, প্যারিনগরীর কতিপয় নির্দ্দিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন পথের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আদর্শ নক্সা (Type plan) অঙ্কিত ও নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে; উহার অনুসরণ করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়। এক এক পথের উপর ঠিক একই প্রকারের বহির্দৃশ্যযুক্ত সৌধের শ্রেণী চলিয়াছে। ইহাতে কিন্তু অনেকগুলি দোষ বর্ত্তমান;—একই পথের উপর নানা প্রকারের উদ্দেশ্য লইয়া সৌধ নির্ম্মাণ করা হয়। কলিকাতাস্থ হ্যারিসন রোডের কথা উদাহরণস্বরূপ অবতারণা করা যাউক; এই পথের উপর ভদ্রলোকের গৃহস্থলী, বিপণী ব্যাঙ্ক, মাড়বারীদিগের বাণিজ্যসভা (Chamber of commerce), দেবমন্দির প্রভৃতি নানা উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত সৌধ রহিয়াছে; ইহা আশা করা অন্যায় যে, এই সমস্ত সৌধগুলির বহির্দৃশ্য একই প্রকারের হইবে। কেহ যদি এ কথা বলেন যে, সমাজের সকলেই ব্যবহারাজীবী হইবেন, বা সকলেই কুসীদজীবী বা

ব্যবসায়জীবী হইবেন,তাহা হইলে সে কথা যেমন অতিশয় অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়, কোনও একটি পথের উপর নির্ম্মিত সমুদয় বাটীগুলির একই প্রকার বহিরাকৃতি হইবে, এইরূপ আদেশ তদ্রূপ যুক্তিবিরুদ্ধ বোধ হইবে। ইহা দ্বারা এক হিসাবে যেমন স্থাপত্যের সম্মান রক্ষা করা হইয়াছে, তেমনই স্থাপত্য-বিকাশের যাহা প্রাণস্বরূপ, সেই স্বাধীনতার লোপ করিয়া, ইহার উৎকর্ষের তিরোধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যাপার লইয়া Viollet-le-Duc প্রভৃতি ফরাসীদেশস্থ অনেক প্রসিদ্ধ স্থপতি অনেক আক্ষেপ করিয়াছেন; কিন্তু তেমন ফলোদয় হয় নাই। তাঁহারা দুঃখ করেন যে, এ অবস্থায় মৌলিক ও অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান স্থপতির উদ্ভব কখনই সম্ভবপর নহে। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমাদের কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কয়েকটি বিধি-নিষেধের কথা মনে আসিতেছে; ফুটপাথের উপর স্তম্ভযুক্ত বারাণ্ডা নির্ম্মাণ করিতে হইলে ইঁহাদের অনুমোদিত নক্সার অনুমোদন করিতে হইবে; বাটীটির দৈর্ঘ্য, উচ্চতা, বা বহির্দৃশ্য যাহাই হউক না, ইঁহাদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ও মামুলী নক্সানুযায়ী বারাণ্ডাটি নির্ম্মিত হইলেই উহা স্থাপত্যের ললামভূত হইয়া পড়িবে, এবং তৎসঙ্গে স্থাপত্যের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করি যে,পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী বারাণ্ডার বহির্দৃশ্যের পরিবর্ত্তনও কি বাঞ্ছনীয় নহে? কিন্তু সে কথা শুনে কে?

সামাজিক শিষ্টাচার ও কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত বলিয়া সুন্দর অট্টালিকার নির্ম্মাণ সমর্থিত হইয়াছে। আবাসপল্লীর নিকটে কলকারখানা নির্ম্মাণ বা দুর্গন্ধের প্রশ্রয় দেওয়া যেমন কর্ণ ও নাসিকার পক্ষে কষ্টদায়ক বলিয়া আইন-বিরুদ্ধ, তেমনই বিকৃত রুচিসম্পন্ন বা কদাকার গৃহনির্ম্মাণ দ্বারা অপরের চক্ষে পীড়াদায়ক বলিয়া ইহার বিরুদ্ধে আইন-প্রণয়নও বাঞ্ছনীয়। নাসিকা, কর্ণ যেমন একাদশ ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত, চক্ষুও তদ্রূপ; সুতরাং ইহার তৃপ্তিসাধন সামাজিক কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত। সুখের বিষয়, আমরা ক্রমশঃ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটা ভয়ের কারণও আছে। শিষ্টাচার কর্ত্তব্যের অন্তর্গত হইলেও, ইহার বাহুল্য উপহাসাস্পদ হইয়া পড়ে; ভাষায় শিষ্টাচারের বাহুল্য অনেক সময় যেমন "ন্যাকামী" বা ভণ্ডামী হইয়া পড়ে, বা মিথ্যা প্রশংসা-বাদে পর্য্যবসিত হয়, কিংবা সময় সময় মূর্খামীর সীমায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তেমনই স্থাপত্য-সম্বন্ধীয় শিষ্টাচারের প্রাচুর্য্যে উদ্দেশ্যহানি অবশ্যম্ভাবী। ইহাকে স্থাপত্যবিষয়ক চাটুবাদরূপ সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারে। "আপ্ খাইয়ে

—আপ্ খাইয়ে" দ্বারা অনেক সময় উদারভাবের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অনেক স্থলে আহার করান রূপ উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত ঘটে।

উপযুক্ত উপমানের সাহায্যে বুঝা গেল যে, স্থাপত্য-সংপৃক্ত শিষ্টাচার ও স্থাপত্য-সংপৃক্ত চাটুবাদে অনেক প্রভেদ। এই শিষ্টাচারবাহুল্যের প্ররোচনায় অনেকে সৌধের গাত্রে অলঙ্কার-সম্পাদন বা ইহার অঙ্গবিন্যাস সম্বন্ধে এক কঠোর নিয়মের ব্যবস্থা করেন; তাঁহাদের এই নিয়মের সনাতনত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইলে মহা বিপদ; তখনই সৌধটি স্থাপত্যশ্রীবিহীন বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। তাঁহাদের মতে, আয়োনিক (Ionic) বিভাগান্তর্গত স্তম্ভ গুলির গাত্রস্থ পল্-গুলির উপর যে চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যক খাঁজ (fluting) ক্ষোদিত করিবার নিয়ম আছে, তাহার দুই একটি সংখ্যার হ্রাস হইলেই সৌধটি একেবারে গ্রীক্ রীতি হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূমধ্যসাগরের জলে নিমজ্জিত হইবে। এই প্রকার বিধি-নিষেধের ব্যবস্থার মূলে পূর্ব্বোক্ত স্থাপত্য-শিষ্টাচার সূক্ষ্মশরীরে বর্ত্তমান থাকিলেও, শিষ্টাচারটিকে মিথ্যাচারে পরিণত করা হইয়াছে; কেন না, শিষ্টাচার ২৪ সংখ্যার স্থলে ২৫ সংখ্যা দেখিলে কখনই দুঃখে মর্ম্মাহত বা ক্রোধে উদ্ধত হইয়া উঠিবে না। কারণ, খাঁজের সংখ্যা গণনা করা তাহার কার্য্য নহে। এই স্থাপত্য-শিষ্টাচারে এক একটি বিভিন্ন রীতি বা Styleর সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু আবার ইহার প্রবর্ত্তকদিগের অন্যায় অত্যাচারে বা অসহিষ্ণুতায় অনেক স্থলে Style বেচারী প্রাণহীন কাষ্ঠপুত্তলিকার দশা প্রাপ্ত হয়। আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, কোন্ অংশটির লোপ বা পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে রীতিটিরও পরি-বর্ত্তন হয়। উদাহরণের স্বরূপ ব্রাহ্মণ্য স্থাপত্যের উড়িষ্যাপ্রদেশীয় শাখা বা বিভাগের কথা ধরা যাউক। এ বিভাগান্তর্গত বিমানের শেখর কখনও বিশুদ্ধ মোচাগ্র আকারে (Pyramidal) দৃষ্ট হয় না; শীর্ষের নিকট ইহা বক্র বা Curvilinear হইয়াছে, এবং তাহার উপরে গ্রীবার ন্যায় এক নাত্যুচ্চ অংশ উঠিয়াছে। মন্দিরায়তনটি অনেকটা মনুষ্যদেহসদৃশ। উড়িষ্যার স্থাপত্যে আর এক বিশেষত্ব এই যে, বিমান বা গর্ভগৃহ কখনও স্তম্ভের উপর স্থাপিত নহে; সুতরাং স্তম্ভবিহীনত্বও ইহার বিশেষত্ব। এই প্রকারের কতিপয় বিশেষত্ব আছে। কিন্তু যদি কেহ কোনও বিশেষত্ব Styleর দোহাই দিয়া ইহার গ্রীবা-নিম্নের বক্রতাকে এক অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে বাঁধিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে; কেন না, আমি কতিপয় বর্ষ ধরিয়া এ বিষয়ে যথেষ্ট আলো-চনা করিয়া দেখিয়াছি যে, এই বক্রতার মধ্যে কোনও নিয়ম নাই। লিঙ্গেশ্বর,

রাজরাণী, মুক্তেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরের শেখর-শীর্ষের বক্রতায় সমতা দৃষ্ট হয় না। এই জন্য বলিতেছিলাম যে, যে স্থপত্য-শিষ্টাচার Styleর প্রবর্ত্তক, তাহার অত্যাচারে আবার ইহার বিশেষ দুরবস্থা ; যাহা ইহার নিজস্ব নহে, যাহাতে ইহার কোনও বিশেষত্ব সিদ্ধ হয় না, তাহা লইয়া এত বিধি-নিষেধের অবতারণা করিলে আসল জিনিসটি বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বে অলঙ্কার-সম্পাদন দ্বারা সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির কথা উক্ত হইয়াছে। অলঙ্কার দ্বারা শোভাবৃদ্ধি সর্ব্বাবস্থায় সম্ভবপর নহে। মনুষ্যদেহ লাবণ্যবিহীন ও কর্কশ হইলে, তাহা যেমন অলঙ্কার দ্বারা কমনীয়ত্ব প্রাপ্ত হয় না, তেমনই যে সৌধের আকৃতি ও স্থাপনবিন্যাসগত সৌন্দর্য্য নাই, অলঙ্কার তাহার কি করিবে? কাহারও প্রতি ব্যবহৃত ভাষা যদি পরুষ কঠোর হয়, তাহা হইলে তাহা সুন্দর শব্দযোজনা দ্বারা কোমল করিবার সহস্র চেষ্টা করিলেও ব্যর্থ হইবে ; বরং শব্দ-যোজনা তীক্ষ্ণ শরযোজনার ন্যায় মর্ম্মস্থলে আঘাত করিবে। একটী রুচিবিহীন কদর্য্য বাটীর সর্ব্বাঙ্গ যদি অলঙ্কারে আবৃত করা যায়, তাহা হইলে কেহই মনে করিবেন না যে, বাটীর অধিকারী মহাশয় অনেক অর্থব্যয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বিকৃত রুচি মার্জ্জনীয় হওয়া উচিত ; বরং তাঁহার বিকৃত রুচির সহিত তাঁহার ধনগর্ব্ব দর্শকের চিত্তে বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক করিবে। তাঁহার অর্থব্যয়-সূচক আত্মত্যাগের পশ্চাতে ধনগর্ব্বরূপ রাক্ষসের মদগর্ব্ব ও আত্মপ্রকাশের চেষ্টা দর্শকের চক্ষে বিষম পীড়া ও মনে ঘৃণার ভাব উদ্রিক্ত করিবে। বাস্তবিক, অর্থব্যয় সর্ব্বসময়ে ত্যাগ-জ্ঞানের সূচনা করে না ; নিত্য নৈমিত্তিক সামাজিক অনুষ্ঠানে আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, ব্যয়বাহুল্য অনেক স্থলে আত্ম-গরিমার পরিচায়ক। এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, অনেক স্থলে ইহা আত্মত্যাগেরও পরিচায়ক বটে।

অনেক সময়ই দেখা যায় যে, অলঙ্কার-প্রাচুর্য্যে গৃহ মন্দিরায়তন প্রভৃতির সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাসই সংঘটিত হয়। অত্যধিক ব্যবহারে মানুষের পেশীগুলি যেমন নিস্তেজ হইয়া পড়ে, সেইরূপ অনেক প্রকারের সৌন্দর্য্যের সমাবেশে মানব-মনও নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। মনের রসাস্বাদনও এক ভৌতিক ব্যাপার, এবং শক্তি-সাতত্য নিয়মানুসারে (conservation of energy) এই রসাস্বাদন রূপ ব্যাপারের মূলগত শক্তিও পরিচ্ছিন্ন। সুতরাং মনের ক্ষমতা কোথায় যে, সে সমস্ত অলঙ্কারগুলিকে এক সুসংবদ্ধ, শৃঙ্খলাযুক্ত একক স্বরূপে (Integral whole) পরিণত করিয়া তাহার রসাস্বাদন করিবে?

সেগুলির সমষ্টিকে কখনই সুন্দর একক সত্তায় উপভোগ করা যাইবে না। এই জন্যই অলঙ্কারপ্রাচুর্য্যনিবন্ধন দর্শকের চিত্তে এক বিসদৃশ অসুন্দর ভাবের উদ্রেক হয়। ইহা সৌন্দর্য্যানুভূতির ভূততত্ত্বানুযায়ী (Physical) ব্যাখ্যা। ইহার আরও অনেকগুলি দিক্ আছে;—যেমন ইহার সহিত অধ্যাত্মবোধের সম্বন্ধ। ইহার আভাস সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে আর একটি বিষয়ের কথা চিন্তা করিয়া দেখা যাউক। এমন অনেক প্রকারের অলঙ্কার আছে, যাহা বাহিরের আলোক, বাহিরের স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না। রমণী-অঙ্গের শোভাবৃদ্ধিকারী অলঙ্কারের কথাই প্রথমে ভাবিয়া দেখা যাউক। সাংসারিক নিত্য কার্য্যের শত সংঘর্ষের মধ্যেও মণিবন্ধে বলয় শোভাপ্রদ; কিন্তু বলয়ের পরিবর্ত্তে যদি সূক্ষ্মকারুকার্য্যযুক্ত কণ্ঠহার-সদৃশ কোনও অলঙ্কারের সমাবেশ করা হয়, তাহা হইলে শোভার বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস হইবে বলিয়া মনে হয়। যে প্রকারের অলঙ্কার উৎসব-সময় ভিন্ন অন্য সময়ে পেটিকার মধ্যে সংরক্ষিত হইবার উপযুক্ত, এবং যাহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ত নহে, তাহা যেমন শোভা-বৃদ্ধি বিষয়ে তেমন সহায়তা করে না; তেমনই শিল্প-কার্য্য-বহুল অলঙ্কার সম্পাদন করিলেই যে কোনও আয়তনের বহিঃশোভা-বৃদ্ধির আশা করা যাইতে পারে এমন আশা সঙ্গত নহে। বাস্তবিক মহিসূরস্থ বেলুড় গ্রামে প্রসন্নচন্নকেশবের মন্দির নিরীক্ষণকালে কার্ণিসের নিম্নে ভিত্তিগাত্রে অতিসূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যযুক্ত ভাস্কর্য্যের যোজনা দেখিয়া আমার শ্বাসরোধের মত বোধ হইয়াছিল। এ ভাস্কর্য্যের সমাবেশ ওরূপ অনাবৃত, সাধারণ লোকচক্ষুর গোচরীভূত স্থানে সার্থক বলিয়া বোধ হয় না; ইহা অতিশয় যত্নের জিনিস। মণ্ডপমধ্যস্থ স্তম্ভের গাত্রে ইহা শোভা পায়। এ হিসাবে হালেবিডের, কেদারেশ্বরের মন্দির বেলুড়ের মন্দির অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, সেন-বংশীয় বিষ্ণুবর্দ্ধন নরপতির সময় চালুক্য-বংশীয় স্থাপত্যের যে শাখার উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে শিল্পবাহুল্যযুক্ত ভাস্কর্য্যের বিশেষ প্রবর্ত্তনা দৃষ্ট হয়। ইহার প্রবর্ত্তক জকনাচার্য্য স্থাপত্যে বিশেষ উৎকর্ষ সম্পাদন করিলেও, অলঙ্কারপ্রাচুর্য্যের অবতারণা করিয়া মূল উদ্দেশ্যের হানি ঘটাইয়াছিলেন। এ রীতি দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে নাই; দ্রাবিড় বা চালুক্য স্থাপত্যের কোথায়ও এ প্রকারের অলঙ্কার-যোজনা দেখা যায় না। পরবর্ত্তী বিজয়নগরীর নরপতিদিগের দ্বারা ব্রাহ্মণ্য স্থাপত্যের অনেক পরিবর্ত্তন ও উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রীতি গৃহীত হয় নাই।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

প্যারীচাঁদ মিত্র।

ব্যক্তির জীবনে যেমন, জাতির জীবনেও তেমনই সময়ে সময়ে ঘটনা-পরিবর্ত্তনে নূতন ভাবের আবির্ভাব হয়; সে ভাব-প্রবাহ অতিক্রান্তপর্ব্বতপ্রতিরোধ প্লাবনের মতই বহিয়া যায়—পুরাতনের পরিবর্ত্তন করিয়া নূতনের প্রবর্ত্তন করে। রাজনীতিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, জ্ঞানসম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তনে এইরূপ ভাবপ্রবাহের কারণ লক্ষিত হয়। শিল্পে ও সাহিত্যে তাহার চিহ্ন থাকে। বাঙ্গালায় ইংরাজের আগমনে এইরূপ নূতন ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। যাঁহারা সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহাদিগের অন্যতম। দেবাদিদেব মহাদেব যেমন জটামধ্যে মন্দাকিনীধারা ধরিয়া তাহার উচ্ছ্বসিত চাঞ্চল্যবেগ প্রশমিত করিয়া লোকহিতার্থ তাহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, ইঁহারাও তেমনই নূতন শিক্ষার ও সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী ফল নূতন ভাব হৃদয়ে ধরিয়া তাহার চাঞ্চল্য প্রশমিত করিয়া তাহাকে দেশের হিতকর কার্য্যে প্রযুক্ত করিয়াছিলেন।

আমরা তাঁহাদিগের উৎসাহের আধিক্য ও কৃত কার্য্যের বাহুল্য দেখিয়া বিস্মিত হই। তাঁহারা সংবাদপত্র, সভা, সমিতি প্রভৃতির সাহায্যে দেশে রাজনীতির চর্চ্চা আরম্ভ করেন; তাঁহারা দেশে সমাজসংস্কারের সূচনা করেন; তাঁহারা দেশে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করেন; তাঁহারাই এ দেশে নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টি করেন। কৃষি, শিল্প, সমাজতত্ত্ব, সর্ব্ব বিষয়ের আলোচনাই তাঁহারা করিতেন; তাঁহাদের কর্ম্মপ্রাণতাই তাঁহাদিগের হৃদয়ে অসাধারণ উৎসাহের উৎস উৎসারিত করিয়াছিল। প্যারীচাঁদ মিত্র কলিকাতা পবলিক লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান ও সেক্রেটারী ছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"তাঁহাতে যেমন সাহিত্যানুরাগ, তেমনই বিষয়কর্ম্মে দক্ষতা দৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি এক দিকে কলিকাতা পবলিক লাইব্রেরীতে লাইব্রেরীয়ানের কর্ম্ম করিতেন, অপর দিকে তাঁহার বন্ধু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর সহিত সম্মিলিত হইয়া বিষয়বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নানাবিধ দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীর কাজ করিতেন। * * * এক দিকে যেমন বৈষয়িক উন্নতি, অপর দিকে তেমনি স্বদেশের হিতসাধনে মনোযোগ। যৌবনে বাল্যসুহৃদ রামগোপাল, রামতনু প্রভৃতির সহিত সম্মিলিত হইয়া 'সাধারণ

জ্ঞানার্জ্জন সভা'র সভ্যরূপে উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রৌঢ়াবস্থাতেও সোসিয়াল সায়েন্স এসোসিয়েসন, এগ্রিহর্টিকলচরাল সোসাইটী, ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটী, স্কুলবুক সোসাইটী, পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা-নিবারিণী সভা প্রভৃতি বহু সভাসমিতির সভ্য ছিলেন। কেবল যে নামমাত্র সভ্য ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার সভ্য থাকার অর্থ ছিল সভার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য পরিশ্রম করা। আমরা অনেক সময় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিতাম, কিরূপে তিনি এত সভাতে যোগ দিয়া হৃদয় মনের সহিত সকলেরই উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিতে পারেন। ১৮৬৮ সালে তিনি বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যরূপে মনোনীত হন। এই পদে দুই বৎসর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কায়মনে স্বদেশের কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। * * * * তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা কিশোরীচাঁদ মিত্র উভয়ে তৎসমকালীন শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ইংরাজী লেখা সম্বন্ধে অগ্রগণ্য ছিলেন। * * প্যারীচাঁদ প্রথমে তাঁহার বন্ধু রসিকচন্দ্র মল্লিক ও রামগোপাল ঘোষের সহিত সমবেত হইয়া তাঁহাদের প্রচারিত 'জ্ঞানান্বেষণ' নামক দ্বিভাষী পত্রিকাতে লিখিতেন; তদ্ভিন্ন ইংলিশম্যান, কলিকাতা রিভিউ প্রভৃতি ইংরাজ-সম্পাদিত পত্রিকাতেও সর্ব্বদা লিখিতেন। এতদ্ভিন্ন ইংরাজীতে মহাত্মা ডেবিড হেয়ারের জীবনচরিত, রামকমল সেনের জীবনচরিত ও গ্রাণ্ট সাহেবের জীবনচরিত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। * * * * তাঁহার সহধর্ম্মিণীর পরলোক হইলে তিনি অনেকটা সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া পড়েন; এবং প্রেততত্ত্বের আলোচনাতে মনোনিবেশ করেন। * * তখন সকল প্রকার আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনাতে তাঁহার বালকের ন্যায় উৎসাহ দেখিতাম। আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক বিষয়ের চর্চ্চাতে সর্ব্বদা উৎসাহিত করিতেন, তাঁহার কাছে বসিলে অনেক জ্ঞানলাভ করা যাইত।

তিনি ডেবিড হেয়ার, রামকমল সেন ও কোল্‌স্‌ওয়ার্দী গ্রাণ্ট—এই তিন জনের যে জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন, সে সকল সমসাময়িক ইতিহাসের উপাদানে পূর্ণ, এবং বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস-লেখকদিগের—বাঙ্গালার উন্নতির স্বরূপনির্ণয়কারীদিগের অবশ্যপাঠ্য। দেওয়ান রামকমলের জীবনচরিতে তিনি ডাক্তার উইলসনের যে পত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে বিলাতে রামমোহন রায়ের জীবনান্তকালের দুঃখকথা বিবৃত হইয়াছিল। রামমোহনের সেক্রেটারী স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট তাঁহাকে প্রাপ্য টাকার জন্য বিব্রত করিয়াছিলেন, এবং রামমোহনের বিলাতে প্রকাশিত রচনা যে তাঁহার, সে কথা প্রচার করিয়া দিবেন

বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন। তিনি নীচ লোকের সঙ্গে পড়িয়া স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তি হারাইয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি বিলাতে অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন;—"Ram Mohun died of brain-fever; he had grown very stout, and looked full and flushed when I saw him. It was thought he had the liver, and his medical treatment was for that and not for determination of the head. It appears also that mental anxiety contributed to aggravate his complaint. He had become embarassed for money, and was obliged to borrow of his friends here in doing which he must have been exposed to much annoyance, as people in England would as soon part with their lives as their money. Then Mr. Sandford Arnot, whom he had employed as his Secretary, importuned him for the payment of large arrears which he called arrears of salary, and threatened Ram Mohan, if not paid, to do what he has done since his death, claim as his own writing all that Ram Mohan published in England. In short, Ram Mohan got among a low, needy, unprincipled set of people, and found out his mistake, I suspect, when too late, which preyed upon his spirit and injured his health."

প্যারীচাঁদের কর্ম্মবহুল জীবনের সকল কার্য্যের আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা পণ্ডিত শ্রীযুত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনা হইতে তাঁহার কার্য্যবাহুল্যের পরিচয় দিয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়াই আমরা তাঁহার কল্পান্তস্থায়িনী কীর্ত্তি—বাঙ্গালা ভাষার সংস্কারচেষ্টার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে লিখিয়াছিলেন—প্যারীচাঁদ য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে সংযোগ-সেতু ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে সেই সেতুর বিলোপে উভয় সম্প্রদায়ই দুঃখিত হইবেন। ভারতবাসীদিগের উচ্চাকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তির সকল সম্বল তাঁহার মত আর কাহার ছিল? কিন্তু তিনি পার্থিব আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থ অবহেলা করিয়া কেবল স্বদেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। অল্প বয়সে তিনি স্বগৃহে একটি পাঠগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত করিয়া কয় জন বন্ধুর সহযোগিতায় প্রতিদিন প্রত্যুষে পল্লীর বালকদিগকে শিক্ষা দিতেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই শাসন বা বিচার বিভাগে চাকরী পাইতেন। কিন্তু সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তিনি মেটকাফ

লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ও লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। লাইব্রেরী হইতে অতি সামান্য পারিশ্রমিক লইয়া তিনি লাইব্রেরিয়ানের কার্য্য করিতেন। তাঁহার জন্যই লাইব্রেরীতে সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্যগণ, সুপ্রীম কোর্টের জজ ও ব্যারিষ্টারবর্গ, কলিকাতার ব্যবসায়ীরা ও দালালেরা সমবেত হইতেন। প্যারীচরণের নাম তাঁহাদের সকলেরই পরিচিত ছিল। কেহ নূতন সংবাদ জানিতে চাহিলে লাইব্রেরীতে আসিলেই পাইতেন। তিনি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও কাজের পথ দেখাইয়াছেন। যদি বাঙ্গালীরা তাঁহার মত বুদ্ধি, দূরদৃষ্টি ও সাধুতা সহকারে ব্যবসায় ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়েন তবে স্বর্ণপ্রসূ বাঙ্গালার বিশেষ উন্নতি অনিবার্য্য। তিনি সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মসাধনোপযোগী ক্ষমতাশালী ও সৎকর্ম্ম-সাধনতৎপর ছিলেন। তাঁহার রচনা এতই সুপরিচিত যে, সে সকলের সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য। তিনি বহু সভাসমিতির অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ভূস্বামী ও প্রজার কল্যাণকামনায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান জমীদার-সভা বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন তাঁহার সংস্থাপিত সেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটীর এক অংশ।

যে সময়ে বাঙ্গালায়, কেবল বাঙ্গালায় নহে, পরন্তু সমগ্র ভারতের রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে নূতন অঙ্কে যবনিকা-উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন অভিনেতা ইংরাজগণের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে সময় বাঙ্গালার মানসিক দৈন্য বাঙ্গালার শিল্পে ও সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। উপযুক্ত উপাদানের অভাবে আমরা তৎকালীন চিত্রশিল্পের পরিচয় দিতে পারিলাম না। কিন্তু যে স্থাপত্যে সভ্যতার স্বরূপ নির্ণীত হয়, সে স্থাপত্যে তখন বাঙ্গালীর মানসিক দৈন্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালার স্থাপত্যে বৈশিষ্ট্য ছিল। বাঙ্গালার সহজে নমনীয় বংশের বাহুল্য ও গৃহনির্ম্মাণে বহুল প্রয়োগ বাঙ্গালার স্থাপত্যে বৈশিষ্টের সঞ্চার করিয়াছিল। বাঙ্গালায় পুরাতন স্থাপত্য-নিদর্শন অধিক নাই। রাজনীতিক বিপ্লবে, অধিকারি পরিবর্ত্তনে, মুসলমানের পুরাকীর্ত্তিনাশচেষ্টায় সে সব নিদর্শন দুর্ল্লভ হইয়াছে। তাহার উপর আবার এ দেশের জল-বায়ু ও বৃক্ষলতার দ্রুতবর্দ্ধন পুরাকীর্ত্তি-রক্ষার পক্ষে অনুকূল নহে। এইরূপ বহু কারণ সমন্বয়ে বাঙ্গালার পুরাকীর্ত্তি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। কিন্তু ১৬২১ খৃষ্টাব্দে ও তাহারও পরে নির্ম্মিত বিষ্ণুপুরের মন্দিরে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। কেবল তাহাই নহে। এ দেশের মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগকে এ দেশের শিল্পী নিযুক্ত করিতে হইত বলিয়া, গৌড়ে ও পাণ্ডুয়ায় সে সব গৃহ এখনও বিদ্যমান, সে সকলেও

হিন্দু স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য সপ্রকাশ। আর সেই জন্যই বাঙ্গালায় মুসলমান স্থাপত্য বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত হইতে পারে নাই। কিন্তু এ দেশে ইংরাজ-শাসন-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে প্রধানতঃ রাজনীতিক কারণে দেশের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা শিল্পের উন্নতির পক্ষে নূতন সৃষ্টির পক্ষে কোনরূপেই অনুকূল নহে। সেই জন্য তখন স্থাপত্যে কেবল সজ্জাভারে পীড়িত হইতেছিল। দিনাজপুরের, কৃষ্ণনগরের মন্দিরে ও কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রকাশিত। স্থাপত্যে যেমন, ভাস্কর কার্য্যেও তেমনই তখন কেবল প্রসাধনের বাহুল্য। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বাঙ্গালা প্রস্তরশিল্পের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। "হিন্দু ও বৌদ্ধ বহুবিধ ধাতু ও প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।" আবার, "রামপাল দেবের রাজত্বকাল হইতে গৌড়ীয় ভাস্করশিল্পের পুনরুন্নতি আরব্ধ হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেনের সময়ে গৌড়ীয় শিল্প উন্নতির অতি উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল।" যে বাঙ্গালায় ভাস্করগণ নূতন নূতন ভাবের বিকাশ সুন্দর মূর্ত্তি-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন—যে বাঙ্গালার ভাস্কর-কার্য্য এখনও মৃত্তিকাতল ও পুষ্করিণীগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়া আমাদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট করিতেছে—সেই বাঙ্গালায় তখন আর ভাস্করকার্য্যে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় নাই—আছে কেবল প্রসাধন-প্রাবল্য। তখন কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারগণ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত পূজার জন্য জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি গঠিত করিতেছে—দেবদেবীর মূর্ত্তিতে ধ্যানসঙ্গত ভাব-বিকাশ অপেক্ষা সাজসজ্জায় অধিক মনোযোগ দিতেছেন।

আর সাহিত্যে? সাহিত্যে তখন ক্ষমতাশালী লেখকের অভাব আর গোপন থাকিতেছে না। প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্যের সন্ধান আমরা এখনও পাই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া এমন কথা বলিতে পারি না যে, সে কালে বাঙ্গালা গদ্যে গ্রন্থ রচিত হইত না। তবে সে কালের কবিকীর্ত্তির পরিচয়ের অভাব নাই। আর কবিতা বোধ হয় গদ্যকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাস, এই দুই জনকে যাঁহারা অনুবাদকমাত্র মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। ইঁহারা যে দুইটী বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সে দুইটি বিষয় ভারতের সাধারণ সম্পত্তি। তাঁহাদের মহাভারত ও রামায়ণ অনুকরণ বা অনুবাদ নহে—মৌলিক গ্রন্থ, বাঙ্গালীর প্রতিভার সৃষ্টি। কাশীরাম, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, ঘনরাম—সকলেই কবি; কেহই অনুকরণকারী বা পদ্যলেখকমাত্র নহেন। তাঁহাদের প্রতিভা "স্বর্গ মর্ত্য

উপকরণ সংগ্রহ করিয়া কবিকল্পনায় নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহাদের কাব্য "সাগরবৎ—হৃদয়োত্থিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ, দুরন্ত রাগদ্বেষ ঈর্ষ্যাদি বাত্যাসন্তাড়িত।—আবার ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণপ্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহার বৃক্ষরাজি, ইহার মধুগীতি সাহিত্য-সংসারে দুর্ল্লভ।" সাগরোত্থিত বাষ্পরাশি যেমন ক্রমাগতই উত্থিত হইয়া নানা আকার ধারণ করিয়া মিশিয়া গলিয়া আবার সাগরেই মিশিয়া যায়, তাঁহাদের কল্পনা তেমনই ক্রমাগত উঠিয়া—ভাসিয়া—মিশিয়া—চলিয়াছে—কেবল সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহারা খনির সন্ধান পাইয়াছেন—অবাধে রত্নরাজি ছড়াইয়া গিয়াছেন। তাই সকল রত্ন সমান উজ্জ্বল—সমান পরিষ্কৃত—সমান মূল্যবান নহে—কোনখানি কেবল রত্নে পরিণতি লাভ করিতেছিল—কোনখানির দীপ্তি সমুজ্জ্বল। তাই তাঁহাদের রত্নের প্রাচুর্য্যে আমাদের বাহুল্যবোধে শ্রান্তি অনুভূত হয়। কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত কবি। তাঁহাদের কল্পনা এমনই প্রবল যে তাহা আত্মপ্রকাশের জন্য যে দীর্ঘ ঘটনা-পরম্পরার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার মধ্যে আমরা পথ হারাইয়া ফেলি। কিন্তু ইংরাজ প্রাধান্য-সংস্থাপনের অব্যবহিত পূর্ব্ব কবিদিগের সেরূপ কল্পনা কোথায়? ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ কবি—কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের ক্ষমতার তুলনায় তাঁহাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ—সঙ্কীর্ণ। তাঁহাদের ভাবের অভাব ভাষায় পূর্ণ হয়। তাঁহারা ভাবপ্রকাশের জন্য কাব্য রচনা করেন না—ভাব ভাল করিয়া প্রকাশের চেষ্টাই করেন। তাই ভাষার প্রসাধনে তাঁহারা অধিক মনোযোগ দেন। উভয়ের 'বিদ্যাসুন্দর' পাঠ করিলে দেখা যায়—উভয়ে একই আদর্শ লইয়াছিলেন—একই পুরাতন ভাব আপন আপন ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় ভাষা ভূষণভারে পীড়িতা হয়—তাহার স্বচ্ছন্দগতি ক্ষুণ্ণ হয়—তাহার স্বাভাবিক সরসতা শুকাইয়া উঠে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের কথায় কোনও সমালোচক সত্যই বলিয়াছেন—"অনুপ্রাসের ছটা, অপ্রচলিত শব্দের ঘটা, দুরান্বয় প্রভৃতি দোষ, আর হিন্দী ও পারসী কথার বাড়াবাড়ি ও এইরূপ অপ্রচলিত ভাষায় বর্ণনার আধিক্য হেতু অনেক স্থলে অর্থ সাহজবোধ্য নহে।" শব্দমন্ত্রে ভারত সিদ্ধবিদ্য। সুতরাং তিনি এ সব দোষের ঘূর্ণাবর্ত্ত অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রামপ্রসাদ তাহা পারেন নাই। তাঁহার গানের ভাষা সরল—সরস—সম্মোহন। কিন্তু তাঁহার কাব্যের ভাষা অন্যবিধ। ভারতের বর্ণনা যে স্থলে সরল—

"ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে আঁচল ধরায় পড়ে
আলুথালু কবরী-বন্ধন ;
চক্ষু ঘুরে যেন চাক হাতনাড়া ঘন ডাক
চমকে সকল পুরজন।"

রামপ্রসাদের বর্ণনা সে স্থানে দুর্ব্বোধ—

"নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে।
অসম্বর অম্বর অম্বর পড়ে শিরে ॥
তারাহারা তারাকারা ধারা শতশত।
গোযুগে গলিত ধারা তৃষ্ণা নিষ্ঠাগত ॥
বিগলিত কুন্তল জলদপুঞ্জছটা।
নিরানন্দ গতি মন্দ জিনিয়া বরটা ॥"

অর্থ বুঝিতে অভিধান খুলিতে হয়—গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়। পাণ্ডিত্যপ্রস্তরপেষণে কমনীয় কবিতা-কুসুম নিষ্পিষ্ট হইয়া যায়। ভারতের ভাষা দুর্ব্বোধ নহে—কিন্তু তাঁহার রচনায় ভাবপ্রাচুর্য্যের অভাব সর্ব্বত্র সপ্রকাশ। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের ভাব যে ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, আর কেহ তাহার অনুকরণ করিতেও পারেন না। তাই সমসাময়িক কবিদিগের মধ্যে ভারতচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দী নাই। কিন্তু ভাষাই কবির সর্ব্বসম্পদসার নহে। যে কবি ভাব-সম্পদের অধিকারী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে ভাষার ভাণ্ডার অধিকৃত করেন, তিনি জগতে চিরস্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করেন। এ সময় সেরূপ কবির অভাব গোপন করা অসম্ভব। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ—স্ব স্ব বিভাগে যশস্বী। কিন্তু তাঁহাদিগের সমসাময়িক কবিদিগের কবিতা বাত্যাতাড়িত শুষ্ক বৃক্ষপত্রের মত কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। আজ সেই সকল কবির নাম বিস্মৃতির অতলতলগত—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসকে অনেক যত্নে—অনেক চেষ্টায় তাঁহাদের পরিচয় সংগ্রহ করিতে হয়। সে পরিচয়-সংগ্রহ যে সম্ভব হইতেছে, সেও কেবল "বটতলা" ছিল বলিয়া।

তখন দেশ অরাজক। তাহার পর পলাসীক্ষেত্রে ভারতের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তখন অশান্তির স্থানে শান্তি সংস্থাপিত হইল; অরাজকতার পরিবর্ত্তে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে আসিল—নূতন ভাব, নূতন শিক্ষা, নূতন সভ্যতা, নূতন অধিকার। ভারতবর্ষের লোক বহুকাল যথেচ্ছ শাসনে অভ্যস্ত ছিল—এখন রাজার কার্য্যের আলোচনা করিবার

অধিকার পাইল—রাজনীতিক অধিকারের আস্বাদ পাইল। সম্পূর্ণ নূতন সভ্যতা তাহাদিগের সম্মুখে উপনীত হইল—তাহারা পার্থিব সম্পদকে সমাদর করিতে শিখিল—উন্নতির সোপান বলিয়া গণিতে লাগিল। তাহারা যে নূতন সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইল তাহা বহুশতাব্দীর সাহিত্যসেবিগণের সাধনায় পুষ্ট—নানা দেশের সাহিত্য-সম্ভারে সমৃদ্ধ। তাই ভারতবাসীরা নূতন আদর্শের অনুকরণে ও অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা নূতন আদর্শের ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হইয়া প্রাচীন আদর্শ পরিহার করিতে লাগিল। তখন ইংরাজী পঠন পাঠন হইতে লাগিল; সকল দিকেই ইংরাজের অন্ধ অনুসরণ হইতে লাগিল। ফলে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে আচারে, ব্যবহারে, বিদ্যায় দেশের জনসাধারণের যে পার্থক্য জন্মিতে লাগিল তাহার ফলে দেশের এক সম্প্রদায়ে মেঘাবগুণ্ঠিতা রজনীর ঘন অন্ধকার ঘনীভূতই হইতে লাগিল।

সুখের বিষয় অল্পদিনেই বাঙ্গালীর ভ্রম ঘুচিল। যে সকল ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভ্রম প্রথমে ঘুচিয়াছিল প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহাদিগের অন্যতম। তাহার কারণ, যে যুগে শিক্ষিত বাঙ্গালীরা আহারে, বিহারে, বেশে, আচারে দেশীয় প্রথা লঙ্ঘন করাই গৌরবজনক মনে করিতেন সেই যুগেও তিনি প্রকাশ্যভাবে সমাজশাসন অবহেলা করা সঙ্গত মনে করিতেন না। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার 'আত্ম চরিতে' লিখিয়াছেন—ছোটলাট সার রিচার্ড টেম্পলের নিমন্ত্রণে তিনি লাটের বিলাস-তরণীতে সম্মিলনে গিয়াছিলেন—"আমি কিছু আহার করিতে গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) প্রকাশ্যরূপে ইংরাজের তরণীতে জলযোগ করিতে নিষেধ করাতে আমি তাহা হইতে বিরত হইলাম।" বাঙ্গালী বুঝিল—"সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি না লইলে দেশের কোনও মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজী বুঝে না, কস্মিন্ কালে বুঝিবে এমন প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে না, বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।"

তখন বাঙ্গালার দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল—বাঙ্গালা গদ্যের প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। কারণ দেশমধ্যে সর্ব্বত্র—সমাজের সর্ব্বস্তরে—স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে শিক্ষাবিস্তারের জন্য গদ্য সাহিত্যের প্রয়োজন;

গদ্যসাহিত্য ব্যতীত সে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই বাঙ্গালা গদ্য গঠিত হইয়াছে—সংস্কৃত হইতেছে। রামরাম বসু রচিত 'লিপিমালা' পুস্তকের ভূমিকায় গদ্য সাহিত্যের আরম্ভকথা লিখিত আছে—

"সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা জ্ঞানদ সিদ্ধিদাতা পরম-ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে।—

এ হেন্দুস্থান মধ্যস্থল বঙ্গদেশ কার্য্যক্রমে এ সময় অন্যোন্য দেশীয় ও উপ-দ্বীপীয় ও পর্ব্বতস্থ ত্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম অধম অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে এবং অনেক অনেকের অবস্থিতিও এই স্থানে। এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এদেশীয় ভাষা অবগত নহিলে রাজ-ক্রিয়া ক্ষম হইতে পারেন না, ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখাপড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্য ক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে এ ভূমীয় যাবদীয় লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপিমালা নাম পুস্তক রচনা করা গেল। প্রথম ধারা দুই তিন অধ্যায় তাহার প্রথমতো রাজাগণ অন্য রাজারদিগকে লেখেন তাহার প্রত্যুত্তর পূর্ব্বক দ্বিতীয় রাজাগণ আপন সচিব লোককে অনুজ্ঞাও বিধি ব্যবস্থা ক্রয় দান। ইতি প্রথম ধারা। দ্বিতীয় ধারা সামান্য লেখাপড়া। সমান সমানীকে গুরু লঘুকে এবং লঘু গুরুকে প্রভু কর্ম্মকরকে এবং অঙ্কমালা এই মতে পুস্তক লেখা যাইতেছে। ইহাতে অন্যোন্য বিদ্বান লোকের স্থানে আমার এই আকাঙ্ক্ষা যদি আমার রচিত এই পুস্তকের মধ্যে কদাচিত ক্রমে কল্পিত দোষ হইয়া থাকে তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক দৃষ্টিমাত্রে নিন্দামদে মত্ত না হয়েন একারণ কোন লোক দোষ ভিন্ন হইতে পারে না।—

মানব সৃজন বিধি করিল যখন।
সেই কালে ষড়রিপু কৈল নিয়োজন।
অতএব ভুল-ভ্রান্তি আছে সর্ব্ব জনে।
মানব লক্ষণ বসু রামরাম ভণে।
শতাদিত্য বসুবর্ষ পঞ্চশ্রেষ্ঠ মাস।
পরম আনন্দে রাম করিল প্রকাশ।"

সুতরাং এই গদ্য সৃষ্টির গৌরব এ দেশে ইংরাজের। এই সময় এ দেশের প্রাচীন সাহিত্যের উপর ইংরাজদিগের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে; সংস্কৃত সাহিত্যের সমাদর হইয়াছে। সংস্কৃত-ব্যবসায়ী পণ্ডিতদিগের দ্বারা

তখন বাঙ্গালা গদ্য সংস্কৃতও হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—

"একদিকে পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অপর দিকে খ্যাতনামা অক্ষয়-কুমার দত্ত, এই উভয় যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষের প্রভাবে বঙ্গভাষা যখন নবজীবন লাভ করিল, তখন তাহা সংস্কৃতবহুল হইয়া দাঁড়াইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবু উভয়ে সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ ও সংস্কৃত-ভাষানুরাগী লোক ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা বাঙ্গালাকে যে পরিচ্ছদ পরাইলেন. তাহা সংস্কৃতের অলঙ্কারে পরিপূর্ণ হইল। অনেকে এরূপ ভাষাতে প্রীতিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকের নিকট, বিশেষতঃ সংস্কৃতানভিজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকট ইহা অস্বাভাবিক, কঠিন ও দুর্ব্বোধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে সময়ে পাঁচ জন ইংরাজী শিক্ষিত লোক কলিকাতার কোনও বৈঠকখানাতে একত্র বসিলেই এই সংস্কৃত-বহুল ভাষা লইয়া অনেক হাসাহাসি হইত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে'র ন্যায় পত্রেও সেই উপহাস-বিদ্রূপ প্রকাশিত হইত। অক্ষয় বাবু যখন সংস্কৃতকে আশ্রয় করিয়া, "জিগীষা" "জিজীবিষা" প্রভৃতি শব্দ প্রণয়ন করিলেন, তখন আমরা কলিকাতার যে কোনও শিক্ষিত লোকের বাটীতে যাইতাম, শুনিতে পাইতাম "জিগীষা" "জিজীবিষা" প্রভৃতি শব্দের সহিত 'চিচ্‌টীমিষা' শব্দ যোগ করিয়া হাসাহাসি হইতেছে।"

যাঁহারা এই দুই জনের অনুকরণ করিতেন, তাঁহাদের ভাষা আরও রসহীন—শক্তিহীন হইতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—'এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতাহেতু বাঙ্গালা-সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্ব্বল এবং বাঙ্গালা-সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরাজিতে সুশিক্ষিত। ইংরাজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবন-বারি নিষিক্ত হইল।"

প্যারীচাঁদ যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন—তাহার প্রথম তূর্য্যনিনাদ ধ্বনিত হইল, 'মাসিক পত্রিকায়।' ইহার প্রতি সংখ্যার প্রথমে লিখিত থাকিত—"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায়

আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। প্রতি মাসে এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক, তাহার মূল্য এক আনা মাত্র।"

এই কয় ছত্রেই পাঠক "আলালী" ভাষার গুণ ও দোষ উভয়ই দেখিতে পাইবেন—"জন্তে"র সঙ্গে লেখককে "প্রস্তাব" "লিখিত" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে। তাই যিনি উভয় ভাষার সমন্বয়ে সর্ব্বভাবপ্রকাশক্ষম—মনোরম বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা। তাহার অভাব পূরণজন্য অন্য অন্য ভাষা হইতে সময়ে সময়ে শব্দ কর্জ্জ করিতে হইবে। কর্জ্জ করিতে হইলে চিরকেলে মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী; ইহার রত্নময় শব্দ ভাণ্ডার হইতে যাহা চাও, তাহাই পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত শব্দ লইলে, বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিশে; বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে নূতন শব্দ লইলে অনেকে বুঝিতে পারে; ইংরাজী বা আরবী হইতে লইলে কে বুঝিবে? 'মাধ্যাকর্ষণ' বলিলে কতক অর্থ অনেক অনভিজ্ঞ লোকেও বুঝে। 'গ্রাবিটেশুন' বলিলে ইংরাজী যাহারা না বুঝে, তাহারা কেহই বুঝিবে না। অতএব যেখানে বাঙ্গালা শব্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে অর্থাৎ বাঙ্গালা শব্দ থাকিতে তদ্বাচক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার যাঁহারা করেন তাঁহাদের কিরূপ রুচি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।"

বিদ্রোহ প্রচলিত ব্যবস্থা বিনাশের প্রয়াস—সুতরাং তাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা থাকে। টেকচাঁদী ভাষাতে সেই উচ্ছৃঙ্খলতার চিহ্ন আছে। প্যারীচাঁদের পরবর্ত্তী রচনা হইতে সে চিহ্ন মুছিয়া যাইতেছিল। কিন্তু টেকচাঁদী ভাষা একদলে বিষম বিক্ষোভ উপস্থিত করিয়াছিল। তিনি 'মাসিক পত্রের' পূর্ব্বে 'জ্ঞানালোচন' প্রভৃতিতে যে বাঙ্গালা লিখিয়াছিলেন তাহা নীরস ও দুর্ব্বল ছিল। "মদ্য মুরগী ও টেকচাঁদী-বাঙ্গালা এককালে প্রচলিত হইয়া ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠীকে আকুল করিয়া তুলিল।" দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণপ্রমুখ সংস্কৃতপ্রিয় পণ্ডিতগণ এ ভাষার নিন্দা করিতে লাগিলেন। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় এই সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য

'বিষয়ক প্রস্তাবে' লিখিলেন—"আলালের ঘরের দুলাল বল, হুতোম পেচা বল, মৃণালিনী বল—পত্নী বা পাঁচজন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি—কিন্তু পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে কখনই ও সকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে, ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ হয়। পাঠকগণ! যদি আপনাদের উপর বিদ্যালয়ের পুস্তকনির্ব্বাচনের ভার হয়, আপনারা আলালী ভাষায় লিখিত কোন পুস্তককে পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন কি?—বোধ হয়, পারিবেন না। কেন পারিবেন না?—ইহার উত্তরে অবশ্য এই কথা বলিবেন যে, ওরূপ ভাষা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নয় এবং উহা সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিতে লজ্জা বোধ হয়। অতএব বলিতে হইবে যে, আলালী ভাষা সম্প্রদায় বিশেষের মনোরঞ্জিকা হইলেও উহা সর্ব্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ঐরূপ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা উচিত কি না?—আমাদের বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়—মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাট্টা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার পরিবর্ত্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যক। ফলকথা এই যে, পাঠক যেমন নানা প্রকার, তাঁহাদের রুচিও সেইরূপ নানা প্রকার; একবিধ রচনা পাঠে সর্ব্ববিধ পাঠকদিগের রুচি চরিতার্থ হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে, অতএব ভাষার মধ্যে নানাপ্রকার রচনারীতি থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। যাহা হউক আমাদের বিবেচনায় হাস্য-পরিহাস আদি লঘু বিষয়ের বর্ণনায় আলালী ভাষা যেরূপ মনোহারিণী হয়, শিক্ষাপ্রদ বা প্রগাঢ় গুরুতর বিষয়ের বিবরণ কার্য্যে বিদ্যাসাগরী ভাষা সেইরূপ প্রীতিপ্রদা হয়।"

ইহার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' লিখিলেন—

"আমরা ইহাতে বুঝিতেছি যে, প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রধান আপত্তি যে, পিতাপুত্রে একত্রে বসিয়া এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে পারে না। বুঝিলাম যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিবেচনায় পিতা-পুত্রে বড় বড় সংস্কৃত শব্দে কথোপকথন করা কর্ত্তব্য; প্রচলিত ভাষায় কথাবার্ত্তা

হইতে পারে না। এই আইন চলিলে বোধ হয়, ইহার পর শুনিব যে, শিশু মাতার কাছে খাবার চাহিবার সময় বলিবে, 'হে মাতঃ, খাদ্যং দেহি মে' এবং ছেলে বাপের কাছে জুতার আবদার করিবার সময় বলিবে, 'ছিন্নেয়ং পাদুকা মদীয়া।' ন্যায়রত্ন মহাশয় সকলের সম্মুখে সরল ভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জাবোধ করেন, এবং সেই ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ বিবেচনা করেন না। ইহা শুনিয়া তাঁহার ছাত্রগণকে উপদেশ দিবার সময়ে লজ্জাবশতঃ দেড়গজী সমাসী পরম্পরাবিন্যাসে তাহাদিগের মাথা মুড়াইয়া দেন। তাহারা যে এবংবিধ শিক্ষায় অধিক বিদ্যা উপার্জ্জন করে, এমত বোধ হয় না। কেন না, আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে ইহাই উপলব্ধ হয় যে, যাহা বুঝিতে না পারা যায়, তাহা হইতে কিছু শিক্ষালাভ হয় না। আমাদের এরূপ বোধ আছে যে, সরল ভাষাই শিক্ষাপ্রদ। ন্যায়রত্ন মহাশয় কেন সরল ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ নহে বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। বোধ হয় বাল্যসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই সরল ভাষার প্রতি তাঁহার বীতরাগের কারণ নহে। আমরা আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলাম যে, তিনি স্বয়ং যে ভাষায় বাঙ্গালা বিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহাও সরল প্রচলিত ভাষা। টেকচাঁদী ভাষার সঙ্গে এবং তাঁহার ভাষার সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল এই যে, টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে, ন্যায়রত্নে কোন রঙ্গরস নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, পিতা-পুত্রে একত্রে বসিয়া অসঙ্কুচিত-মুখে টেকচাঁদী ভাষা পড়িতে পারা যায় না, তাহার প্রকৃত কারণ টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে। বাঙ্গালা দেশে পিতা পুত্রে একত্রে বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না। সরলচিত্ত অধ্যাপক অতটুকু বুঝিতে না পারিয়াই বিদ্যাসাগরী ভাষার মহিমা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভাষা হইতে রঙ্গরস উঠাইয়া দেওয়া যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মত হয়, তবে তাঁহারা সেই বিষয়ে যত্নবান্ হউন। কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে চেষ্টা করিবেন না।"

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে "বাঙ্গালা সাহিত্য" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধে লেখকের নাম ছিল না। কিন্তু তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলিয়া চলিত। তাহাতেও প্যারীচাঁদকে বাঙ্গালা গদ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক বলা হইয়াছিল। "It was reserved to Tekchand Thakur to deal the first blow to this insufferable pedantry, and all

honour to the man who did it." * * He vigorously excluded from his works, except on very rare occasions, every word and phrase that had a learned appearance. His own works suffered from the exclusion, but the movement was well-timed. * * * His success was eminent and well-deserved." আমরা বলিয়াছি, তাঁহার পূর্ব্বের বাঙ্গালা পুরাতন আদর্শানুগ—নীরস। তিনি যে ভাষার সৃষ্টি করেন, তাহাতে ইচ্ছা করিয়া সংস্কৃত-শব্দ-বর্জ্জনের চেষ্টা করেন। সে ভাষা বিদ্রোহের ভাষা।

বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদের পুত্রকে প্যারীচাঁদের পুস্তকগুলি একত্র করিয়া পুনর্মুদ্রিত করিতে বলেন। যখন প্যারীচাঁদের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয় (১২৯৯ বঙ্গাব্দ) তখন তিনি "বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান" নির্দ্দেশ করিয়া এক প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে তিনি বলেন,—"বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ।" সাধারণের বোধগম্য ভাষা সাহিত্যে যত অধিক ব্যবহৃত হয়, সাহিত্যের দ্বারা দেশের ততই মঙ্গল হয়—এই সমীচীন মত ব্যক্ত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"গদ্য যত সুখবোধ্য হইবে, সাহিত্য ততই উন্নতিকারক হইবে। যে সাহিত্যের পাঁচ সাত জন মাত্র অধিকারী, সে সাহিত্যের জগতে কোন প্রয়োজন নাই।

"প্রাচীন কালে অর্থাৎ এ দেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, বাঙ্গালায় সচরাচর পুস্তকরচনা সংস্কৃতের ন্যায় পদ্যেই হইত। গদ্য-রচনা যে ছিল না, এমন কথা বলা যায় না, কেন না, হস্ত-লিখিত গদ্যগ্রন্থের কথা শুনা যায়। সে সকল গ্রন্থও এখন প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহার ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইলে, গদ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য-লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এ স্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে

শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃতব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না,—'খদির' বলিতেন; কদাচ 'চিনি' বলিতেন না—'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্য'ই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ 'ঘৃতে' নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না,—'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না,—'রম্ভা' বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, এক জন অধ্যাপক একদিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ 'শিশুমার' অর্থ জানে না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত, কেন না, কেহ তাহা পড়িত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি হইত না।

"এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্ব্বজনবোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে, ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্বমত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।

"ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় আরও একটি গুরুতর বিপদ্ ঘটিয়াছিল। সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সারসঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরাজি হইতে

এবং বেতাল-পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী এবং অনুবর্ত্তী। বাঙ্গালী লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্ত প্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া, সকলেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরীর সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ্ আর কিছুই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবু যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সময়ের প্রয়োজনানুমত, অতএব তাঁহারা প্রশংসা ব্যতীত অপ্রশংসার পাত্র নহেন; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালি-লেখকের দল সেই একমাত্র পথের পথিক হওয়াই বিপদ্।

"এই দুইটি গুরুতর বিপদ্ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। 'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালে'র দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোনও বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।

"আমি এমন বলিতেছি না যে, 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষা আদর্শ ভাষা। উহাতে গাম্ভীর্য্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে, উহাতে অতি উন্নত ভাব সকল, সকল সময়ে, পরিস্ফুট করা যায় কি না, সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থরচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয় এবং যে সর্ব্বজন-হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল।' ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালে'র পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে একের প্রবলতার ও অপরের অল্পতার দ্বারা আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।"

প্যারীচাঁদ মিত্রের দ্বিতীয় কীর্ত্তি বাঙ্গালায় উপন্যাস সাহিত্যের প্রবর্ত্তন। গল্প সর্ব্বকালেই লোকের প্রিয়। মানব সভ্যতার প্রথম বিকাশ কাল হইতে গল্প লোকের চিত্তরঞ্জন করিয়া থাকে। উপকথার সংস্কার বিষ্ণুশর্ম্মা, ঈশপ প্রভৃতির দ্বারা হয়। তাহার পর রোমান্সের যুগ। শেষে উপন্যাসে রোমান্সের পরিণতি। এ পরিণতির ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক, সন্দেহ নাই। অন্যান্য দেশের মত বাঙ্গালাতেও এই পরিণতি লক্ষ্য করিবার বিষয়—সেই পরিণতির পদে পদে জাতীয় ভাবের পরিবর্ত্তন ও পরিপুষ্টি পরিলক্ষিত হয়। বর্ত্তমান বাঙ্গালা উপন্যাসের আদর্শ ইংরাজী হইতে গৃহীত। কিন্তু আদর্শ যাহাই হউক, উপাদান আমাদের; কারণ, উপন্যাস আমাদেরই ঘরের কথা লইয়া রচিত। সে রচনার পথপ্রদর্শক—প্যারীচাঁদ মিত্র। তাঁহার উপন্যাস খালি উপন্যাস হিসাবে অত্যুৎকৃষ্ট, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না—'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের সমালোচক তাহার অসঙ্গতি ও ত্রুটী দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন—we hail this book as the first novel in the Bengali language—তাহাতেই প্রশংসার উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। প্যারীচাঁদ শিল্পী না হইতে পারেন—কিন্তু স্রষ্টার গৌরব তাঁহার। আর সেই গৌরবমুকুট-ময়ূখের বিচ্ছুরিত দীপ্তি বাঙ্গালায় তরুণ-অরুণ-বিকাশ সূচিত করিয়াছিল, তাহাই পরে দিবালোকে 'উজ্জ্বল—বিহঙ্গবিরাবে কলম্বিত সৌন্দর্য্যময়—সাহিত্যে বাঙ্গালীকে গর্ব্বানুভবের অবকাশ দিয়াছে। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—"এ প্রকার পুস্তক লেখনের প্রণালী এতদ্দেশ মধ্যে বড় প্রচলিত নাই, ইহাতে প্রথমোদ্যমে অবশ্য সদোষ হইবার সম্ভাবনা, পাঠকবর্গ অনুগ্রহ করিয়া ঐ দোষ ক্ষমা করিবেন।" বিশেষ—একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখিত। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যে উপন্যাস রচিত হয়—তাহাতে ত্রুটী অনিবার্য্য। সুতরাং প্যারীচাঁদের উপন্যাসের ত্রুটী তাঁহার কৃত কর্ম্মের তুলনায় নগণ্য। তাঁহার এই দ্বিতীয় কীর্ত্তির কথায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

"আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে, তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে, তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল'। প্যারীচাঁদ মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি।"

আজ যে বাঙ্গালা সাহিত্য বিকশিতচারুসর্ব্বাঙ্গ—যে সাহিত্য বাঙ্গালীর সুজলা-সুফলা-মলয়জশীতলা জননী জন্মভূমিরই মত প্রাচুর্য্যে প্রোজ্জ্বল—যে সাহিত্যে আজ বাঙ্গালীর মনের ক্ষুধা মিটিতেছে, প্যারীচাঁদ সেই সাহিত্যের প্রবর্ত্তক। প্যারীচাঁদের আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের—বঙ্গসাহিত্যের যুগাবতার বঙ্কিম-

চন্দ্রের শিল্পপ্রতিভায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। সহসা—"কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি; কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই সব বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত "সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ"। এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য, নাটক, উপন্যাস, কত প্রবন্ধ, কত সমালোচনা, কত মাসিকপত্র, কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। অগ্রহায়ণ।—প্রথমেই শ্রীবসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের অঙ্কিত একখানি ছবির প্রতিলিপি। চিত্রকর কবিবর রবীন্দ্রনাথের

'পুষ্প যেমন আলোর লাগি, না জেনে রাত কাটায় জাগি,
তেমনই তোমার আশায় আমার হৃদয় আছে ছেয়ে।'

লেখার প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ছবিখানি আশাপ্রদ। ইহা 'ভারতীয়' হইলেও, চিত্রকলার বিশ্বজনীন নিয়মের ব্যতিক্রম নহে। বসন্তকুমার এই চিত্রে উদ্ভট ও অদ্ভুত রীতির প্রভাব অনেকটা অতিক্রম করিয়াছেন।—ইহাই প্রকৃত পথ। শ্রীগুরুদাস সরকার 'পল্লীর বৈষয়িক উন্নতি ও পল্লীসংস্কার' প্রবন্ধে দেশের জীবন-মরণের সমস্যা উপস্থিত করিয়াছেন।—আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র স্বর্গ হইতে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।—যাঁহারা সরকার মহাশয়ের অভিভাষণে পল্লীর প্রসঙ্গ, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়ার কথা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন, বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতামতই 'ভারতী'র কুঞ্জে প্রতিধ্বনিত হয়। সেই সম্প্রদায়ের মুখপত্রে এই শ্রেণীর প্রবন্ধের অবতারণা দেখিয়া মনে হইতেছে, যুগধর্ম্ম অনতিক্রমণীয়। লেখক লিখিয়াছেন,—'ম্যালেরিয়ার প্রতিকার-(?)-কল্পে সরকার ও জেলা বোর্ড হইতে বহুবিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। গ্রামবিশেষের অবস্থা-অনুসারে জঙ্গল ও ড্রেন প্রভৃতি কাটাইয়া যাহাতে ম্যালেরিয়া এবং মশকের হাত হইতে গ্রামবাসী-(?)-গণ উদ্ধার পায়, সে বিষয়ে উৎসাহ ও অর্থসাহায্য প্রদত্ত হইতেছে। কোথাও বা ডাক্তার বেণ্টলি (Dr. Bentley) কর্তৃক অনুমোদিত Beneficazione প্রথায় বন্যার জলে পল্লীর বিষাক্ত আবর্জ্জনাদি ধুইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা হইতেছে।'—'উৎসাহ প্রদত্ত' হইতেছে বটে, এবং মুক্তহস্তে ক্রমাগত প্রদানের ফলে তাহা হিমালয়ের মত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও সত্য; কিন্তু শুধু উৎসাহে পল্লীসংস্কার কেন, কোনও সংস্কারই সম্পন্ন হয় না। 'অর্থসাহায্য'ও 'প্রদত্ত' না হইতেছে, এমন নহে। কিন্তু দেশের পরিমাণ, জনসংখ্যা, ম্যালেরিয়ার ব্যাপকতা, বিস্তৃতি ও ভীষণতা, এবং তজ্জন্য দেশবাসীর শোচনীয় অবস্থার অনুপাতে তাহা যে সমুদ্রে পাদ্য-অর্ঘ্য। এ বিষয়ে 'আন্তরিক চেষ্টা' রিপোর্টে যতটা প্রকাশ পায়, কার্য্যক্ষেত্রে টাকার অভাবে তাহা ততটা প্রকাশ পায় না। এই জন্যই এই অকর্ম্মণ্য ও উৎসাহ-বাহুল্যে পরিপূর্ণ রিপোর্টগুলা ম্যালেরিয়া-রোগীর প্লীহা-যকৃৎ-স্ফীত, নীলশিরাখচিত চকচকে দামোদরের মত বিরাট হইলেও, আমাদের মনে দুঃখের—বিষাদের—হতাশারই সৃষ্টি করে। উৎসাহের বা আশার সৃষ্টি করিতে পারে না।—'বন্যার জলে পল্লীর বিষাক্ত আবর্জ্জনাদি ধুইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা' হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা স্থগিত হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরই বোধ হয় লেখকের লক্ষ্য। আমাদের এইরূপ অনুমানের কারণ এই যে, লেখক সরকারী কর্ম্মসূত্রে কিছু দিন জঙ্গীপুরে বাস করিয়াছিলেন।—তিনি বোধ হয় জানেন না,—বাঙ্গালার গবর্ণর লর্ড রণাল্ডশে জঙ্গীপুরের ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধের উদ্যোগপর্ব্ব স্বয়ং দেখিতে গিয়াছিলেন, এবং দেখিয়া হতাশ হইয়াছিলেন। তাহার পর উহা স্থগিত বা রহিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, গবর্মেণ্ট ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডকে ইহাও জানাইয়াছেন, যাহা খরচ হইয়াছে, তাহাও অনর্থক অপব্যয় ভিন্ন আর কিছুই নহে।—ডাক্তার বেণ্টলীর উপদিষ্ট পরীক্ষার জন্য দুইটি স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহার একটির এই দশা।—আর সমগ্র বঙ্গের তুলনায় এই ক্ষুদ্র পরীক্ষা কি ও কতটুকু?—লেখক বলিয়াছেন,—'সভ্যতার স্রোত স্বতই পল্লীমুখী হইলে তাহাতে আনন্দ বই দুঃখের কারণ দেখি না।'—সভ্যতা অর্থে যদি জুতা, ছাতা, গন্ধ-তেল, বিস্কুট ও মোজা-গেঞ্জী না হয়—এবং নিশ্চয়ই তাহা লেখকের অভিপ্রেত নহে—তাহা হইলে আমরা ইহার সমর্থন করি। পল্লীই বাঙ্গালার সভ্যতা-বিকাশের কেন্দ্র। পল্লী মরিয়াছে, তাই বাঙ্গালী মরিয়াছে; বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব গিয়াছে, লক্ষ্মী ছাড়িয়াছে।—পল্লী মরিলে আমরাও মরিব, নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইব।—স্বভাবের পথে পল্লীর বিকাশে জনপদ হইতে পারে; কিন্তু পল্লীর শ্মশানে, পল্লীশ্রীর চিতাভস্মে জনপদ নির্ম্মাণ করিবার অধিকার স্বভাবেরও নাই, মানবেরও নাই।—লেখক একটি নূতন তথ্য বাঙ্গালীর গোচর করিয়াছেন। বাঙ্গালায় এক জন 'কীটতত্ত্ববিৎ' আছেন, তাঁহার নাম 'শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়'। তত্ত্ব, বিৎ ও তত্ত্ববিৎ—এই তিন বস্তুই আজকাল বাঙ্গালার ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। ফৌজদারী আদালতের মৌচাকও কীটের পরীক্ষাক্ষেত্র বটে। কিন্তু 'কীটতত্ত্ববিৎ' অন্য বস্তু।—এই প্রবন্ধে প্রকাশ,—'রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানের কালেক্টারগণ লালবাগের নিকটস্থিত চুনাখালির কাগজের জন্য মুর্শিদাবাদের কালেক্টার সাহেবকে মধ্যে মধ্যে তাগিদ দিতেন। এখন চুনাখালি আম্র-বাগিচার জন্যই প্রসিদ্ধ। খুঁজিয়া এক জনও "কাগজী" পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।' শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়ের 'পল্লী-উৎসব—চিত্র' কাঁচা হাতের ও কাঁচা মাথার রচনা হইলেও উল্লেখযোগ্য। কারণ, কাঁচা কিন্তু তাজা চোখে দেখিয়া লেখক এই ছবিখানি টানিয়াছেন। আজ কাল আমাদের দেশের 'angle of vision' কিরূপ বদলাইয়া গিয়াছে, এই শব্দ-চিত্রে তাহার পরিচয় আছে। পল্লীর মাধুর্য্য লেখকের চোখে পড়িয়াছে। পল্লীর প্রতি তাঁহার মায়াও আছে। তবু, বিজাতীয় হাওয়ার গুণে লেখকের মনে যে সকল বিজাতীয় সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, মন্তব্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 'শেষে উভয়েরই কল্পিত কথঞ্চিৎ-সভ্য মূর্ত্তির ভিতর হইতে নৈসর্গিক পল্লী-সুলভ স্বভাবমূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িল। বেছুট গালাগালি!' লেখকের মতে, ইহাই 'নৈসর্গিক পল্লী-সুলভ স্বভাবমূর্ত্তি!' উদীয়মান উত্তরপুরুষকে আমরা গোলামখানার ছায়ায় কি শিক্ষাই দিতেছি! 'বেছুট গালাগালি' যে পল্লীর নিজস্ব বা একচেটে নয়, লেখক বয়স হইলে অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই তাহা বুঝিয়া লইবেন। সে জন্য আমরা এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করি নাই।—পল্লীর জীবন-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ নবীন বাঙ্গালী একদেশদর্শিতার ফলে একটা নমুনা দেখিয়া ব্যষ্টির পাপ কেমন অসঙ্কোচে সমষ্টির উপর আরোপ করিতেছে, তাহা শুধু দর্শনীয় নহে, চিন্তনীয়ও বটে।—লেখক কোন পল্লীর ছবি আঁকিয়াছেন, বলিতে পারি না। কিন্তু সেখানে—'গ্রামের বৃদ্ধ-সম্প্রদায়, কোন বিষয়ে চোখ-কাণ দিবেন না; পিতার সাক্ষাতে পুত্র মদ খাইলেও পিতা সেখান হইতে সরিয়া যাইবেন। আজ কেহই রিক্তহস্তে নাই; কাহারও হস্তে সদ্য-আহরিত বৃক্ষশাখা, কাহারও হস্তে তৈলপক্ক যষ্টি, কাহারও হস্তে-বা তিন-চারিটা পরিপূর্ণ মদের বোতল।' কি বিড়ম্বনা! তোমরা ছেলেদের কামস্কট্কা ও আলাস্কার কাহিনী শিক্ষা দাও!—গ্রামবাসীরা ঠাকুর আনিতে যাইতেছে—'সকলেরই পা টলিতেছে'। কি ভয়ানক! ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, কেহ বাদ নাই!—রুসিয়াতেও মাতলামী এমন 'সার্ব্বজনিক' ও 'সার্ব্বভৌমিক' হয় নাই! বাঙ্গালায় এমন পল্লী আছে, আমরা তাহা জানিতাম না। তবে সে জন্য দুঃখ করিব না। কারণ, যাঁহারা পল্লীতে জন্মিয়া পল্লীতেই মরিয়াছেন, তাঁহারাও নিশ্চয়ই এ তথ্য জানিতেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সকল নির্দ্দেশ মায়ার অভাব

বা বিবেষের ফল নহে। অনভিজ্ঞতা, অসাবধানতা ও কাঁচা মাথার ফল। লেখক পল্লীর ভাল দিকও দেখিয়াছেন, দেখাইয়াছেন। সন্তোষ বলিতেছে,—"আমরা সকলেই যাত্রা শুনতে যাবো, তা হলে ঘরে কে থাকবে?" নীহার কহিল, 'কে আবার থাকবে? এখানে সহরের মত চোরের ভয় নেই, তিন দিন বাড়ীতে না থাকলেও কেউ একগাছি কুটো নাড়বে না।' লেখক পল্লীবাসীদের ভোজনপটুতার প্রতিও একটু কটাক্ষ করিয়াছেন!—আমরা বলি, তোমরা বিস্কুটের কণা খাইয়া ক' দিন বাঁচিবে? 'কণাদ' হইবার লোভ সংবরণ কর। আবার তোমরা জীবানন্দের মত খাইবার ও পরিপাক করিবার চেষ্টা কর। অতিভোজন নয়, পর্য্যাপ্ত ভোজন। না খাইয়া, এবং পরিপাক করিবার শক্তি হারাইয়া বাঙ্গালী ক্রমে মানবকে পরিণত হইতেছে। তাই তাহারা এত রুগ্ন কাব্যির সৃষ্টি করিতেছে।—মনে ও দেহে পর্য্যাপ্তমাত্রায় প্রচুর খাদ্য গ্রহণ কর। অচিরে রাষ্ট্রতন্ত্রে, সমাজে, সাহিত্যে তাহার ফল ফলিবে। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'বর্ত্তমান ভূগোলের দিগ্‌দর্শন' প্রবন্ধের শিরোনামের ব্যাপকতাই সর্ব্বস্ব। প্রতি-পাদ্য বিষয়ের কণাও নাই। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অভাব ও প্রতিকার' ক্রপট্‌কিন হইতে সঙ্কলিত—উল্লেখযোগ্য। এরূপ অনুশীলনে যথেষ্ট লাভের আশা করা যায়। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জামাই বাবাজীর কাগজে 'অরোরা' ছাপাইয়া চাণক্যের প্রতি ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। 'প্রাপ্তেষু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।' উদাহরণ,—'অমাবস্তার রাত্রে তারার জুঁইফুলে সাজানো নীল আকাশের নীচে কলকাতার অন্ধকার গলিতে আমরা দুই বন্ধু যে অরোরার বন্ধ খিড়কি খোলা না পেয়ে ঘুরে ঘুরে হয়রান ও হতাশ হয়ে রাত সাড়ে-চারটের আহিরীটোলার ঘাটের রানায় বসে পয়লা এপ্রেলের সকালবেলার প্রতীক্ষা করে রইলেম সেটা স্বীকার করতে এখন আর লজ্জা নেই বা সে লজ্জার কথাটা গোপন করতে দুটো মিথ্যে কথাও এখন আর আমার বলবার আবশ্যক হয় না।' তাহা 'প্রকাশ করিয়া' বলিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না!—সংক্ষিপ্ত বর্ণনাগুলি অতি সুন্দর—হীরার টুক্‌রার মত। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারতবাসী ও ভারতীয় ইংরেজ' প্রবন্ধে নাপিত বনাম গোরার মারপীটের আমলার কাহিনীটি আমরা সকলকে পড়িতে বলি। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'ঝড়' একটি তথাকথিত গল্প। নব্য রুচির ভাষাই ইহার নূতনত্ব। শ্রীকালিদাস রায়ের 'নৈসর্গিকী' পড়িয়া মানে বোঝা যায়। প্রথম ছ' চরণ বেশ। কবিতাটির উপসংহারও সুন্দর।—মধ্যে কবি বলিতেছেন,—

'বসন্ত কাননে আর সায়াহ্ন-আকাশে
যে অধর রক্তিমার চুম্বন-পিয়াসে
ঘুরিতাম অন্যমনা।'

ওঃ! সে কি ভয়ঙ্কর দিনই গিয়াছে! কবি নিশ্চয়ই 'বসন্তকাননে' ঘুরিতেন; কিন্তু লেখার গুণে মনে হয়, তিনি 'সায়াহ্ন-আকাশে'ও পায়চারী করিতেন! প্রকৃতি-দর্শনে চুম্বন-লালসা নব্য-বঙ্গের কাব্যি-রূপ মুক্তিমণ্ডপের নিজস্ব। হেমচন্দ্রের 'চিন্তাতরঙ্গিণী'তে এমন পিয়াসের পরিচয় নাই। 'অভিনয়ের কথা' শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের অনধিকার-চর্চ্চা। ইনি বাঙ্গালার কুক্কুটমিশ্র শর্ম্মা। চিত্র, ভাস্কর্য্য, অভিনয়—সকল কলায় স্বয়ংসিদ্ধ। মন্তব্য ও সিদ্ধান্তগুলির বহরও বড় মন্দ নয়। ইঁহার মুখে 'বড় কথা' শুনিতে শুনিতে আমরা শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম, কিন্তু শ্রীমানের শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই; বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। কি অনুকম্পা! 'বাঙ্গালী যে সাহেবের মতন ভাল অভিনেতা হইতে পারে, গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর এবং কতক-পরিমাণে মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, ও শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন।' এই 'কতক পরিমাণে'র মূল্য কে পরিমাণ করিবে? 'লক্ষ্মীছাড়া' প্রসিদ্ধ রুস সাহিত্যিক শেকভের রচিত গল্পের অনুবাদের অনুবাদ। আখ্যানবস্তু আমাদের পক্ষে নূতন। গল্পটি উপভোগ্য।

দ্বাত্রিংশত্তম জাতীয় মহাসমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী অ্যানী বেসাণ্টের অভিভাষণ।

প্রতিনিধি ভ্রাতৃগণ, বন্ধুগণ!

ভারতমাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান সত্য সত্যই এই জাতীয় মহাসমিতির সভানেতৃত্ব। আমার অগ্রে যিনি যখন এই সম্মানের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, তিনিই শোভন ভাষায় আপন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই আসন জননীর পূর্ণ স্নেহ, নির্ভর ও সম্মতির জাজ্বল্যমান নিদর্শন—কারণ, যিনি যে বৎসর এই আসন অধিকার করেন, তিনি সেই বর্ষের জন্য ভারতমাতার চিহ্নিত সেবকাগ্রণী। কিন্তু আমার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ যদি বা যোগ্যভাবে নিজেদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন, আমি কি ভাষায় আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব—আমার ঋণ যে তাঁহাদের অপেক্ষা শতগুণে অধিক। কন্‌গ্রেসের ইতিহাসে এই প্রথমবার আপনারা এমন ব্যক্তিকে সভানেত্রী নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, যে নির্ব্বাচনের সময় রাজপুরুষদিগের বিরাগভাজন ছিল, এবং দেশের শান্তির পরিপন্থী বলিয়া অন্তরীণে আবদ্ধ ছিল। যখন আমি লাঞ্ছনায় অপমানিত ছিলাম, তখন আপনারা আমাকে সম্মানের কিরীটে ভূষিত করিয়াছিলেন; যখন আমি ধিক্‌কৃত ছিলাম, তখন আপনারা আমার সততা ও সদুদ্দেশ্যে বিশ্বাস করিয়াছিলেন; যখন আমি আমলা-শক্তির প্রতাপে পরাভূত ছিলাম, তখন আপনারা আমাকে নেত্রী বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন; যখন আমি মৌনগ্রস্ত হইয়া আত্মরক্ষায় অসমর্থ ছিলাম, তখন আপনারাই আমার পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন, এবং আমার জন্য মুক্তি জয় করিয়াছিলেন। আমি অকিঞ্চিৎ সেবিকারূপে জননীর সেবা করিয়া ধন্য হইতেছিলাম—আপনারা জগতের সমক্ষে আমাকে নেত্রীরূপে বরণ করিয়া এই উচ্চাসন দান করিলেন। আমার এমন কি বাগ্মিতা আছে, যদ্দ্বারা আপনাদের ঋণ পরিশোধ করিব? কি ভাষায় আপনাদের ধন্যবাদ দিব! বাক্য যখন এত দীন, তখন কার্য্যে তাহা প্রকাশিত হউক। আপনাদের এই অভিনন্দন আমি জননীর সেবায় নিয়োজিত করিব—আমার জীবন তাঁহার কার্য্যে উৎসর্গ করিব। আমার সর্ব্বস্ব মাতৃভূমির যজ্ঞ-

বেদীতে নিবেদন করিলাম—আসুন, কেবল বাক্যে নয়, কর্ম্মের দ্বারা ঘোষণা করি—'বন্দে মাতরম্'।

ভারতের ভাগ্যচক্রের এই সন্ধিক্ষণে আমার নির্ব্বাচনে হয় ত একটা সার্থকতা আছে। সত্য বটে, জন্মতঃ ভারতসন্তান হইবার সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই—কিন্তু উত্তরসমুদ্রবর্ত্তী সেই ক্ষুদ্র দ্বীপ আমার জন্মস্থান, পশ্চিমের মধ্যে যে দেশ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান-সমূহের নির্ম্মাতা। অনেকেই জানেন যে, প্রাচীন যুগে আর্য্যজাতির যে সকল শাখা য়ুরোপভূখণ্ডে উপনিবেশ রচনা করে, তাহারা আপনাদের এসিয়াস্থ ধাত্রীভূমি হইতে স্বভাবসিদ্ধ স্বাধীনতার বীজ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে সাক্‌সান গ্রামসমূহে আমরা যে স্বায়ত্তশাসন দেখিতে পাই—পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদিগের মতে, তাহার পূর্ব্বরূপ এই প্রাচ্য ভূখণ্ডে। তাঁহারা আরও বলেন যে, ইংরেজ জাতির যে বরণীয় স্বাধীনতা, তাহা স্বায়ত্ত ও স্বাধীন প্রাচীন আর্য্য 'পল্লীসমাজ'-রূপ বীজের ফলবান্ বৃক্ষমাত্র।

ইংলণ্ডের পল্লীসমাজে ঐ স্বাধীনতার বিকাশ নরম্যান-বিজয়ে বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল—যেমন এখানকার পল্লীসমাজের যুগসংরক্ষিত স্বাতন্ত্র্য ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনে মৃতপ্রায় হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ড ঐ নরম্যান-নিগড় ভগ্ন করিয়া এক স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় জাতির ধাত্রী হইলেন, এবং স্বাধীন পারলামেণ্ট গড়িয়া তুলিলেন। এখানেও স্বায়ত্তশাসনের সেই পুরাতন বীজ কন্‌গ্রেস-রূপে এবং পরে মোস্‌লেম-লীগ-রূপে অঙ্কুরিত হইয়া এখন হোমরুল বা স্বরাজ-রূপে পুষ্পিত হইতেছে। যে ইংলণ্ড মিল্‌টন্, ক্রমওয়েল, সিড্‌নী, বার্ক, পেইন, শেলী, উইলবারফোর্স ও গ্লাডষ্টোনের জননী, যে ইংলণ্ড ম্যাটসিনী, কসথ্, ক্রোপট্‌কিন, ষ্টেপ্‌নেকের আশ্রয়দাত্রী, যে ইংলণ্ড গারিবল্‌ডীর আবাহনকর্ত্রী, যে ইংলণ্ড অত্যাচারের—স্বেচ্ছাচারের শত্রু, যে ইংলণ্ড স্বাধীনতার উপাসিকা—আজ আমি সেই ইংলণ্ডের প্রতিভূ-রূপে আপনাদের সমক্ষে দণ্ডায়মানা। আজ যখন ভারতবর্ষ আপনার পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছে—আজ্ঞাকারী জনসঙ্ঘ-রূপে নয়, কিন্তু স্বতন্ত্র, স্বালম্ব, স্বাধীনতাকামী জাগ্রত মহাজাতি-রূপে—আজ যখন ভারতজননী আজ্ঞাধীন সেবিকা-রূপে নয়, কিন্তু সহকারিণী সখী-রূপে বৃটানিয়ার সহিত মিলিতে প্রস্তুত—আজ এই মহাদিনে আমি দেহে প্রতীচ্যা কিন্তু প্রাণে প্রাচ্যা, ইংলণ্ডের দুহিতা কিন্তু ভারতের পুত্রিকা—আমি বৃটনের ও ভারতের মহামিলনের সূচী-রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছি। এ মিলন হৃদয়ের মিলন, স্বেচ্ছাকৃত মিলন—হুকুমের মিলন নহে। সেই জন্য এ মিলন স্থায়ী

মিলন, এ মিলন—বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। ইহা প্রেমের তন্তু—সহযোগিতার 'রাখী'—ইহাতে উভয় জাতিরই কল্যাণ—ইহার উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

শান্তিধামে।

ভারতের প্রধান জননায়ক দাদাভাই নাওরোজী ইহধাম ছাড়িয়া গিয়াছেন। আজ যাঁহারা দিব্যধামে থাকিয়া ভারতের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন, অভ্যুদয়ের সহায়তা করিতেছেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাণাড়ে, এ. ও. হিউম, হেনরী কটন, ফিরোজ শা মেহেতা এবং গোপালকৃষ্ণ গোখলে—যাঁহারা কবি সিউনবারণের ভাষায় স্বাধীনতা-লোকের ধ্রুবতারা, যাঁহাদের—

"হে মানব! পূজ চিরদিন
স্বাধীনতা আর ইহাদেরে।
তোমার, আমার, মানবের তরে
দীপ্ত শিখামণি সদা শিরে ধরে'
(যাঁরা) আলোকিয়া পথ দেখাইলা নরে
স্বাধীনতা-দেবী অমলিন!
পারে যেন লভিতে তাঁহারে।"

—দাদাভাই সেই সকল অমৃতযাত্রীদিগের অন্যতম। ব্যর্থ স্তুতিবচনে আমি তাঁহার স্মৃতির কি সম্মান করিতে পারিব? তাঁহার কীর্ত্তিই তাঁহার স্তুতিবাদ করিতেছে—তাঁহার প্রখ্যাত মাতৃসেবাই তাঁহার অনশ্বর মহিমা। তাঁহার অদম্য সাহস ও অক্ষুণ্ন দেশপ্রীতির অনুকরণ করিয়া যদি আমরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারি, তাহা হইলে সে কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধিত হইতে পারিবে—তবেই সেই স্বরাজ আমরা অচিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব— যে স্বরাজ দেখিবার জন্য সেই মহাপুরুষ উৎসুক ছিলেন, কিন্তু জড়-নেত্রে দেখিতে পান নাই—যাহা দিব্যধাম হইতে দিব্যচক্ষে তিনি শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন।

যুদ্ধ ও যুদ্ধপূর্ব্বের সমর-ব্যয়।

যে মহাযুদ্ধের আবর্ত্তে জাতির পর জাতি আকৃষ্ট হইতেছে, সেই যুদ্ধ এখন চতুর্থ বর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। যেরূপ সতর্কভাবে সংবাদ-প্রকাশের পথ

রুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে কত কালে এই মহাহবের বিরাম ঘটিবে, কর্ত্তৃপক্ষ ভিন্ন অপরের পক্ষে তাহার পূর্ব্বনির্দ্দেশ অসম্ভব। তবে রাজনীতিকের দৃষ্টিতে নয়, আধ্যাত্মিক চক্ষে দেখিলে আমার মনে হয়, এ যুদ্ধের শেষফল নিশ্চিত। কারণ, এ যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য,—স্বেচ্ছা-তন্ত্রের এবং এক জাতি কর্ত্তৃক অপর জাতির উপর প্রভুত্ব-স্থাপনের অপকারিতা-প্রদর্শন ও বিলোপ সাধন, আর প্রত্যেক জাতির ও (জাতীয় কল্যাণের অবিরোধে) প্রত্যেক ব্যক্তির স্বায়ত্ত-শাসনে ও আত্মবিকাশে যে বিধিদত্ত অধিকার আছে, সুদৃঢ় ভিত্তিতে সেই অধিকারের ব্যবস্থাপন। সেই জন্য যে শক্তিনিচয় স্বেচ্ছা-তন্ত্রের দীর্ঘজীবনের অনুকূল (যে তন্ত্রে একের খামখেয়াল সকলের দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা), এবং তদপেক্ষা অধিকতর সাংঘাতিক আমলা-তন্ত্রের দীর্ঘজীবনের অনুকূল (যে তন্ত্রে এক ক্ষুদ্র আত্মীয়-সম্প্রদায় সমস্ত জাতিকে নিগড়বদ্ধ করে), সেই সমস্ত শক্তিকে ধ্বংস করিবার জন্য মধ্য-য়ুরোপের জাতিপুঞ্জে (জর্ম্মণী ও অষ্ট্রীয়ায়) কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে—যেমন পুরাকালে রাবণে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছিল। কারণ, প্রাচীনের চিতাভূমিতেই নবীনের প্রতিষ্ঠা হয়।

যে সকল দুর্নির্মিত বর্ত্তমান সভ্যতার উচ্চসৌধকে ধূলিশায়ী করিয়াছে, তাহাদের উচ্ছেদ ভিন্ন নবযুগের সভ্যতা—যাহার ভিত্তি হইবে ধর্ম্ম ও ন্যায়, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতা, শান্তি ও সুখ—সে সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। অতএব ইহাই হওয়া চাই—যেন অকাল-সন্ধি দ্বারা যুদ্ধের বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট পরিণাম ব্যাহত না হয়। কি পূর্ব্বে, কি পশ্চিমে, স্বেচ্ছাতন্ত্র ও আমলা-তন্ত্র সমূলে বিনষ্ট হইবেই হইবে, এবং পাছে তাহার দগ্ধ বীজ হইতে ভবিষ্যতে অঙ্কুর উদ্গত হয়, সেই সম্ভাবনা দূর করিবার জন্য ঐ দুই তন্ত্রকে মানুষের চক্ষে হেয় করিতে হইবে। সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহাদের এমন প্রিয়তম ব্যসন যে যুদ্ধ - সে ক্ষেত্রেও স্বাধীন জাতির রাজ্যতন্ত্র বেশী কার্য্যক্ষম;—আর যদি বা তাহাদের কঠোর শাসনযন্ত্র আপাততঃ সম্পদ্ ও সফলতার ভাণ করে, কিন্তু পরিণামে সে প্রণালী গণতন্ত্রের কমনীয় বিধিব্যবস্থার নিকট পরাভূত হয়। জগতের সমক্ষে তাহাদের অসারতা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিতে হইবে—যেন আর কেহ তাহাদের বাহ্য চাকচিক্যে ও আপাতরম্য সফলতায় প্রতারিত না হয়। তাহাদের উপযোগিতার দিন চলিয়া গিয়াছে—এখন তাহারা কালের অনুপযোগী, বাঁচিবার অযোগ্য—তাহাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত।

বৃটন যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন, সে কিসের জন্য? এক ক্ষুদ্র জাতির সন্ধি

দ্বারা সুরক্ষিত স্বাধীনতার রক্ষার জন্য। সে সময় তিনি যে সকল মহাসত্যের ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতবর্ষে এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য মহাদেশে উৎসাহের তাড়িত প্রবাহিত হইয়াছিল। তাহারা দ্বিধা না করিয়া, অবিলম্বে তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিল। তখন তাঁহার কণ্ঠে প্রাচীন ইংলণ্ডের স্বাধীনতার বাণী শুনিয়া তাহাদের হৃদয়তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনি জাগিয়াছিল। কিন্তু সকলেই যুদ্ধার্থ অপ্রস্তুত ছিল—কেবল লর্ড হাল্‌ডেনের প্রতিভা ও দূরদৃষ্টিপ্রসূত ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র প্রাদেশিক চমূ, এবং লর্ড হার্ডিংয়ের ক্ষিপ্রকারিতায় সর্ব্বদা অভিযানের জন্য প্রস্তুত ভারতীয় ফৌজ রণমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র বাহিনী কালবিলম্বের জন্য যুঝিতেছিল; ফ্রান্সের হৃদয় প্যারীসের পথে শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য যুঝিতেছিল; এক পদ এক পদ করিয়া পিছু হটিয়া মুহূর্ত্ত গণিতেছিল। এমন সময় ভারতীয় সেনা ফ্রান্সের ভূমিতে পদার্পণ করিয়া ব্যূহমুখে অগ্রসর হইল, এবং ইংলণ্ডের অবসন্ন সৈনিক-পুরুষদের জয়ধ্বনি-মুখরিত যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হইল, ব্রিটিশ-বাহিনীর প্রতিযান (retreat) স্থগিত করিল। অচিরে ইংলণ্ড ও ভারতের মিলিত বাহিনী এমন দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিল, যাহার পশ্চাতে দুই বৎসর ধরিয়া তাহারা দুরন্ত শীতে (গ্রীষ্ম দেশের অধিবাসী বীরেরা অনেক সময় আবক্ষ তুষার-কর্দ্দমে নিমজ্জিত হইয়া) মৃত্যুপণে যুঝিয়াছিল, কিন্তু কখনই শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করে নাই।

ভারতবর্ষ তাহার সত্যপূত দৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিল যে, এ যুদ্ধে বৃটনই স্বাধীনতার সারথি, এবং জর্ম্মণী স্বেচ্ছাচারের সহায়। যদিও ভারতবাসী নিজের দেশে পরাধীন, এবং জর্ম্মণ স্বেচ্ছাতন্ত্রের অপেক্ষাও কঠোরতর নিয়ম-নিগড়ে আবদ্ধ, তথাপি সে ইংলণ্ডের সহযোগি-রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। কারণ, সে বুঝিয়াছিল যে, এ নিগড় un-English অর্থাৎ 'ইংরাজোচিত' নহে, অতএব অস্থায়ী, এই জন্য তাহার অবসান অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য সে জর্ম্মণীর উৎকোচ-মুদ্রায় পদাঘাত করিয়াছিল, এবং জর্ম্মণীর বিদ্রোহ-প্ররোচনা ব্যর্থ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ ধন ও জন দিয়া ইংলণ্ডকে সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল। শিক্ষিত ভারতবাসী (উকীল প্রভৃতি) স্বেচ্ছাসৈনিক হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের উপহৃত সাহায্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু এংলো-ইণ্ডিয়ার সতত জাগ্রত অবিশ্বাস সে সাহায্য গ্রাহ্য করে নাই; অর্থের জন্য আগ্রহান্বিত ছিল বটে, কিন্তু সৈন্য-রূপে গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিল। তাহার ফলে শিক্ষিত ভারতবাসীর আগ্রহ ক্রমশঃ শ্লথ

ও মন্দীভূত হইল, এবং তাঁহাদের উৎসাহে অবসাদ আসিল। ফলতঃ এই দুই মহাজাতিকে একতাসূত্রে গ্রথিত করিবার এমন অমূল্য সুযোগ ব্যর্থ হইয়া গেল।

যুদ্ধারম্ভের কিছু পরে আমি সাহস করিয়া বলিয়াছিলাম যে, যত দিন ইংলণ্ড কৃতনিশ্চয় না হইবেন যে, স্বেচ্ছাতন্ত্র ও আমলা-তন্ত্রের—শুধু ইউরোপে নয়—ভারতবর্ষেও অবসান করিতে হইবে, ততদিন যুদ্ধের শেষ হইবে না। কলিকাতার সদাশয় বিশপ মহোদয় স্বাধীন-জাতি-সুলভ সৎসাহসসহকারে সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে স্বেচ্ছাতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইউরোপে তাহার ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করা মিথ্যাচারমাত্র। এখন এই ঘোষণা সুস্পষ্ট ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজ্যের লক্ষ্য—স্বরাজ-স্থাপন, এবং অচিরে সেই স্বরাজের বহুলাংশ প্রদত্ত হইবে। যখন গত বর্ষে লক্ষ্ণৌয়ে-লিপিবদ্ধ সংস্কার-সমূহের প্রদান দ্বারা ঐ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে, তখনই যুদ্ধের অবসান সমীপবর্ত্তী হইবে। কারণ, স্বেচ্ছাতন্ত্রের মৃত্যুনিনাদ ঘোষিত না হইলে এ যুদ্ধের অবসান নাই।

সত্য বটে, ভারতবাসীর সহানুভূতির প্রথম উৎসাহ কতক মন্দীভূত হইয়াছে, এবং সাম্রাজ্যের মধ্যে তাহার হীনাবস্থার দিকে তাহার চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে,—কি কারণে এইরূপ ঘটিয়াছে, তাহার আলোচনা আমি পরে করিতেছি। এই মন্দীভাবের জন্য কিন্তু ভারতবাসী দায়ী নহে। সে যাহা হউক, ভারতবর্ষ যুদ্ধ বিষয়ে যে প্রভূত সাহায্যদান করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার অপলাপ করিবার উপায় নাই। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, যুদ্ধারম্ভের বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষ—প্রথমতঃ নিরাপত্তে, এবং ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের পর কংগ্রেসের নিয়ত আপত্তি সত্বেও—সতত-বর্দ্ধমান সমর-ব্যয়ের ভার বহন করিয়াছে। ইহার জন্য ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের সমবায়-প্রণালী (Amalgamation Scheme), সীমান্তের পারে বিবিধ যুদ্ধের খরচ এবং সর্ব্বদা সঞ্চরমান সীমান্ত-ও-প্রত্যন্তগামী সমরাভিযানই দায়ী। ঐ সকল অভিযানে ভারতবর্ষের কোনও স্বার্থসিদ্ধি হয় নাই। তথাকথিত সাম্রাজ্যিক সুবিধার জন্যই ঐ সকল অভিযানের সৃষ্টি হইয়াছিল।

১৮৫৯ হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৪৫ বৎসরে ভারতীয় সেনা ৩৭টি যুদ্ধ ও অভিযানে লিপ্ত হইয়াছিল—১০টী যুদ্ধ ও ২৭টী অভিযান। ১৮৬০ ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দের দুইটী চীন-যুদ্ধ, ১৮৮৪—৬ খৃষ্টাব্দের ভুটান-যুদ্ধ, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের অ্যাবিসীনীয়-যুদ্ধ, ১৮৭৮—৯ খৃষ্টাব্দের আফগান-যুদ্ধ, এবং কাবুলে প্রেরিত দূত-

গণের হত্যার পর ১৮৭৯—৮০ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় আফগান-যুদ্ধ, এবং তাহার ফলে সতত সঞ্চরণশীল 'বৈজ্ঞানিক' সীমান্তের অন্বেষণে ভারতের পশ্চিম-সীমান্তের অগ্রগমন; (কীন বলেন, এই উপলক্ষে পশ্চিম সীমান্ত সিন্ধুনদের রেখা হইতে সুলিমান পর্ব্বতের পশ্চিম উপত্যকা, এবং পেশাবার হইতে কোয়েটা অবধি অগ্রসর করা হইয়াছিল); ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মিশরীয় যুদ্ধ, যাহাতে ভারতবাহিনী বিশেষ গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল; ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় বর্ম্মা-যুদ্ধ, যাহার ফলে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে উত্তর ব্রহ্মদেশ ভারত-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইয়াছিল; ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এবং পুনশ্চ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিব্বত-বিজয়—যুদ্ধের এই সংক্ষিপ্ত তালিকা। ক্ষুদ্র যুদ্ধ বা অভিযানের সংখ্যা ২৭। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ক্ষুদ্রতর সীতানা অভিযান, এবং ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বৃহত্তর সীতানা-অভিযান; ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে নেপাল ও সিকিম অভিযান; ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সিকিম অভিযান; ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তুমুল রণ; ১৮৭১—২ খৃষ্টাব্দে লুশাইদিগের বিরুদ্ধে অভিযান; ১৮৭৪—৭৫ খৃষ্টাব্দে ডাফলাদিগের বিরুদ্ধে, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নাগাদিগের বিরুদ্ধে, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আফরীদীদিগের বিরুদ্ধে, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে রম্পা পার্ব্বতীয়দিগের বিরুদ্ধে, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বাজিরী ও নাগাদিগের বিরুদ্ধে, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আকাদিগের বিরুদ্ধে, ঐ অব্দেই জোয়াব উপত্যকায় অভিযান, এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ঐ উপত্যকায় দ্বিতীয় অভিযান। ১৮৮৮—৯ খৃষ্টাব্দে পুনশ্চ সিকিমের বিরুদ্ধে অভিযান, কৃষ্ণ-পর্ব্বত অভিযান, এবং উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের পার্ব্বত্য জাতিদিগের বিরুদ্ধে অভিযান, ১৮৯০ অব্দে দ্বিতীয় কৃষ্ণ-পর্ব্বত অভিযান, এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় অভিযান। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মণিপুর যুদ্ধ, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে লুশাই যুদ্ধ, এবং মিরানজান-উপত্যকায় অভিযান; ১৮৯৪—৬ খৃষ্টাব্দে চিত্রল অভিযান, এবং ১৮৯৭—৯৮ খৃষ্টাব্দে গুরুতর টিরা-অবরোধ, যাহাতে ৪০০০০ ফৌজ লিপ্ত ছিল। এই দীর্ঘ তালিকা—যাহা আমি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে শেষ করিতেছি, তাহার শেষভাগে সীমান্তে আর তিনটী অভিযান—১৯০১ খৃষ্টাব্দে মাসুদ যুদ্ধ, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কাবুল অভিযান, এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব-কথিত তিব্বত অভিযান। এই সকল ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা সামরিক ব্যয়-বৃদ্ধির কারণ বুঝিতে পারি। এই সঙ্গে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মাল্‌টা ও সাইপ্রাসে ভারতসেনা-প্রেরণ উল্লেখযোগ্য ঘটনা (যাহা কতকটা রঙ্গভূমির অভিনয়ের মত প্রতীত হইয়াছিল) এবং রুষভীতিবারণের জন্য প্রায় ২০০০০০০ পাউণ্ড ব্যয়। এই সকল যুদ্ধবিগ্রহের অধিকাংশই ভারতের প্রয়োজনে নহে,

সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে আরব্ধ হইয়াছিল, এবং তাহাদের ব্যয়ভার-বহনের বিরুদ্ধে অনেক সময়ে ভারত-গবরমেণ্টই আপত্তি করিয়াছিলেন, যদিও দুই এক জন দুরাকাঙ্ক্ষ বড়লাট কদাচ বা ঐরূপ যুদ্ধে উৎসাহ দিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস, উপরে যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহাও সম্পূর্ণ নহে।

যে অবধি ভারতের শাসনভার ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তচ্যুত হইয়া ইংলণ্ডের রাজশক্তির অধীন হইয়াছে, তদবধি এই ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটা সমর-সামগ্রী ও আখড়া রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থবুদ্ধি ভারতবর্ষকে এই ব্যবহার হইতে অনেকটা রক্ষা করিত; কারণ, কোম্পানীর জেদ ছিল যে, তাহার অর্থে পুষ্ট ভারতসেনা ভারতের স্বার্থ ও প্রয়োজন ভিন্ন প্রযুক্ত না হয়।

এইরূপে সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ভারত-বাহিনীর নিয়োগের ফলে কেবল যে ভারতের প্রভূত আর্থিক ক্ষতি হইতেছে, তাহা নয়, ভারতবাসীর আত্ম-সম্মানও বিশেষ খর্ব্ব হইতেছে; কারণ, ভারতীয় সমর-বিভাগে ভারতের যোদ্ধৃজাতি-বর্গের স্বাভাবিক যুদ্ধ-প্রবৃত্তি পূর্ব্ববৎ চরিতার্থ হইবার সুযোগ বা অবসর লুপ্ত হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই যে, মহারাণী ভারতশাসন অঙ্গীকার করিবার ২০ বৎসর পরেই অস্ত্র-আইন পাস করিয়া সমস্ত জাতিকে নিরস্ত্র করা হইল— তাহার ফল-স্বরূপ ভারতে পঙ্গুত্ব ও ক্লীবত্ব আবির্ভূত হইল, এবং তথাকথিত সমরবিমুখ জাতিদিগকে এবং অতিসমরপ্রমুখ অতএব অবিশ্বাস্য জাতিদিগকে সৈন্য-বিভাগে প্রবেশ করিতে না দেওয়াতে রংরুট-সংগ্রহের ক্ষেত্র ক্রমশই উত্তর-বাহী হইল, এবং তাহার ফলে বাঙ্গালী ও মান্দ্রাজী—যাহারা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান নির্ভরস্থল ছিল, তাহাদের দৈহিক অবনতি ঘটিতে লাগিল।

এই সম্বন্ধে পঞ্জাবের শ্রেষ্ঠতা যাহার উপর সার মাইকেল ওডায়ার সেদিন এতটা উৎকট ঝোঁক দিয়াছিলেন, সে শ্রেষ্ঠতা বৃটিশ রাজনীতি ও রাজ্যপ্রণালীর কৃত্রিম ফল, এবং পঞ্জাবের বাহিরে রংরুট-সংগ্রহের চেষ্টার বিফলতা—যাহার সম্বন্ধে তিনি অবজ্ঞাসূচক অত্যুক্তি করিয়াছিলেন, তাহাও সেই নীতি ও প্রণালীরই ফল, যাহার জন্য বাঙ্গালী, মান্দ্রাজী ও মারাঠা আজ সৈন্য-বিভাগে বিরল হইয়াছে। বাঙ্গালায় কিন্তু প্রধানতঃ লর্ড কর্জ্জনের কৃত খামখেয়ালী বঙ্গভঙ্গের অসহনীয় অপমানের ফলে আবার রণবীর দেখা দিয়াছে। এ সম্বন্ধে গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন—"রাজপুরুষদিগের নির্ম্মম ও অসংযত অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর বীরোচিত অভ্যুত্থানে সমস্ত ভারত চকিত ও

পুলকিত হইয়াছে * * সমস্ত ভারতবাসী আজ বাঙ্গালীর নিকট বিশেষ-ভাবে ঋণী।'

এই সঙ্কুচিত বীর্য্য বাঙ্গালী যুবকের মধ্যে বিদ্রোহের আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল—যতদিন তাহারা নেতৃবৃন্দের শাসনাধীন ছিল, ততদিন ইহা স্বদেশী ও বয়কটে নিবদ্ধ ছিল; কিন্তু পরে সেই শাসন ছিন্ন হইলে উহা ষড়যন্ত্র, গুপ্ত-হত্যা ও ডাকাতীর আকার ধারণ করিল। নব্য ইটালীতে ম্যাটসিনীর সময়ে এবং নব্য রুসিয়ায় ক্রোপটকিন ও ষ্টেপনেকের সময়েও ঐরূপই হইয়াছিল। বাঙ্গালী যুবার আশাভঙ্গ হইতে যে অপরাধের উদ্ভব হইল, অগত্যা তাহার দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইল ফাঁসী ও দ্বীপান্তর।—তাহার কুফল বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় লর্ড হার্ডিং ও লর্ড কারমাইকেলকে ভুগিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে সুফলও যে ফলে নাই, তাহা নহে। বাঙ্গালী যুবকের স্পৃহনীয় দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও সাহস, যাহা বাঙ্গালার প্রচণ্ড জলপ্লাবনে ও দুর্ভিক্ষনিবারণে প্রকটিত করুণা ও আত্মত্যাগে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা ঐ বীজেরই পরিণত ফল। বর্ত্তমান যুদ্ধে তাহারা যে সাহায্যদান করিয়াছে এবং করিতেছে—তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বাহক-বাহিনী (ambulance Corps) এবং সমুদ্রগামী জাহাজডুবির পর নূতন সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া মেসোপটেমিয়ায় অক্লান্তভাবে সেবাদান—সম্মুখযুদ্ধে নিযুক্ত হইবার জন্য ৯০০ সৈনিক লইয়া বাঙ্গালী পল্টন গঠন, এবং অপচয়-পূরণ করিবার জন্য আরও ৯০০ রিজার্ভ-রচনা, এবং নব নব রংরুট-সংগ্রহ—ঐ সমস্তের মধ্যেই আমরা ভগবানের মঙ্গলহস্ত দেখিতে পাই—যাহার দ্বারা তিনি অকল্যাণের ভিতর হইতে কল্যাণকে নিষ্কাশন করেন, এবং দ্রোহ-জাত প্রবৃত্তিকে সেবায় নিয়োজিত করেন।

ইংলণ্ডেও আমরা এইরূপ ব্যাপারই লক্ষ্য করিয়াছি। এক জন কয়েদী কারামুক্ত হইয়া 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' অর্জ্জন করিয়াছে। রাজনীতিক অপরাধে বা রাজপুরুষদিগের সন্দেহে যাহারা এখন কারাগারে বা অন্তরীণে আবদ্ধ আছে, এই সময় যদি তাহাদের প্রত্যেককে যুদ্ধক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের সেবা করিবার সুযোগ প্রদত্ত হয়, তবেই যথার্থ রাজনীতিজ্ঞের কার্য্য করা হইবে, এবং তাহাদের প্রতিও প্রকৃত করুণা প্রদর্শিত হইবে। ইহাদের অধিকাংশই তরুণ যুবক; যদি দরকার মনে হয়, তাহাদের লইয়া স্বতন্ত্র পল্টন গঠিত হউক, এবং তাহাদের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখা হউক, কিন্তু তাহাদিগকে তাহাদের অখ্যাতি ক্ষালন করিবার ঐরূপ অবসর দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য।

পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে এবং অন্যান্য কারণে (ক্রমশঃ তাহার উল্লেখ করিতেছি) ভারতের স্কন্ধে যে দুর্ব্বহ ব্যয়ভার অর্পিত হইয়াছে, তাহাতে এতটা অপ্রীতি উৎপন্ন হইত না, যদি ভারতবাসী নিজে নিজের উপর ঐ ভার চাপাইত, এবং ভারতকে সাম্রাজ্যের যে রণ-শিক্ষার আখড়ায় পরিণত করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা ভারতবাসী নিজে উপকৃত হইত। কারণ, অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের বোঝা বহন করিয়াছে, অথচ সাম্রাজ্যের শক্তি ও স্বাধীনতার ভাগী হইতে পারে নাই।

সে যাহা হউক, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যে পরিবর্ত্তনের ফলে ভারতীয় সমর-বিভাগের ব্যয়ভার এতটা বাড়িয়া উঠিয়াছে, এবং দুর্ব্বহ হইয়াছে, তাহার নাম—"ব্রিটিশ রিলিফ" প্রণালী। এই প্রণালীর সারমর্ম্ম এই যে, বিলাত হইতে সর্ব্বদা স্বল্প কালের জন্য বিলাতী সৈন্য এ দেশে আনীত হয়, এবং যেমন তাহাদের শিক্ষানবীশি শেষ হয়, অমনই তাহাদিগকে বিলাতে ফেরত পাঠাইয়া অন্য নূতন সৈন্যদল আমদানী করা হয়। তাহার ফলে, ঐ সকল শিক্ষিত সৈন্য থাকার সমুদায় সুবিধা ও লাভ ইংলণ্ড ভোগ করেন, এবং তাহাদের শিক্ষা, যাতায়াত ও অন্যান্য সমস্ত ব্যয় ভারতবর্ষকে বহন করিতে হয়। এক কথায় ভারতবর্ষকে বৃটিশ সেনার শিক্ষাক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করা হয়। এ সম্বন্ধে সিমলার সমর-সমিতি বলিয়াছেন—"বৃটিশ সমর-বিভাগে সম্প্রতি যে স্বল্পকালি প্রথা (short-service system) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার ফলে এক দিকে ভারতবর্ষের ব্যয়ভার বাড়িয়াছে, অন্য দিকে ভারতপ্রবাসী বৃটিশ সৈন্যের কার্য্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এ কথা আমরা বলিতে বাধ্য যে, এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার সময় ভারতীয় করদাতাদিগের স্বার্থের প্রতি আদৌ দৃষ্টি করা হয় নাই।" এ উক্তি খুব সঙ্গত উক্তি। কারণ, এই স্বল্পকালি প্রথার ফলে ভারতবর্ষ বহু ব্যয়ে সংগৃহীত ও শিক্ষিত বৃটীশ সৈনিকের 'সার্ভিস' ৫ বৎসর মাত্র ভোগ করে—আর যাহা কিছু লাভ ইংলণ্ডেরই হয়। ইহার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইংলণ্ডের 'রিজার্ভ' খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, এবং ভারতের ব্যয়ে সংগৃহীত ও শিক্ষিত সৈনিকের সংখ্যা চারি লক্ষ হইয়াছিল।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ভারত-রক্ষী সৈন্যের সংখ্যা ছিল ১৪০০০০; আর শ্বেতাঙ্গ সেনার সংখ্যা ছিল ৬৫০০০। ১৮৮৫ হইতে ১৯০৫—এই কুড়ি বৎসরের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দের শেষে লর্ড কিচনার যখন জঙ্গীলাট হইলেন, তখন তিনি সমর-বিভাগের অনেক সংস্কার করিলেন। ঐই

প্রসঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে, অধিকাংশ সামরিক উপাদান—যাহা ভারতের কারখানায় প্রস্তুত করা উচিত ছিল, এবং যাহা করিলে সমরব্যয় দ্বারা ভারত লাভবান হইতে পারিত, সেই সমুদায় প্রভৃত ব্যয়ে ইংলণ্ড হইতে আমদানী করা হইতেছে। সম্প্রতি যুদ্ধের প্রয়োজনবশতঃ ভারতীয় কল-কারখানায় গোলাগুলি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে বটে; কিন্তু ইহা বহু পূর্ব্বে আরম্ভ করা উচিত ছিল। ঐরূপ করিলে ভারতের অর্থহানি না হইয়া সমৃদ্ধি হইতে পারিত। যুদ্ধের জন্য বাধ্য হইয়া রাজপুরুষেরা ভারতের খনিজ সম্পদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বেই এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে ভাল হইত। তাহা না করিয়া জর্ম্মণীকে ভারতের খনিজ-সম্পদ লুণ্ঠন করিতে দেওয়া হইয়াছিল। ভারতে হোমরুল থাকিলে ভারতবাসী নিজে এই খনিজ-সম্পদে সম্পন্ন হইতে পারিত। ভারতকে সম্পত্তি না ভাবিয়া যদি অংশীদার-রূপে স্বীকার করা হইত, তবে ভারতও সমৃদ্ধ হইত, সাম্রাজ্যও নিরাপদ হইত। (ভারতীয় বণিক্‌দিগের জাগরণের প্রসঙ্গে এ বিষয়ের আবার আলোচনা করিব।) এখন যদি আমরা আশা করি যে, যুদ্ধের সময় যুদ্ধসামগ্রী প্রস্তুতের জন্য গবর্মেণ্ট যে সাহায্য দিতেছেন, সন্ধির পর পণ্যসামগ্রী প্রস্তুতের জন্য সেই সাহায্য দিবেন, তবে কি দুরাশা করা হইবে? সে যাহা হউক, সমর-ব্যয়-বৃদ্ধির যে সকল কারণের উল্লেখ করিলাম, তাহার ফলে সমরবিভাগের ব্যয় লক্ষে লক্ষে বাড়িয়া গিয়াছে, এবং যে ক্ষেত্রে ইংলণ্ড ২৮০০০০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিতেছে, সে ক্ষেত্রে ভারতের ব্যয় ২১০০০০০০ পাউণ্ড; কিন্তু কেনেডা ও অষ্ট্রেলিয়ার মত ধনী রাজ্যে সমর-বিভাগের ব্যয় ১৫ লক্ষ ও ১২॥০ পাউণ্ড মাত্র। (অবশ্য এ কথা অস্বীকার করি না যে, ইংলণ্ড নৌবিভাগের জন্য ৫১০০০০০০ পাউণ্ড বৎসর বৎসর ব্যয় করেন; সে স্থলে ভারতবর্ষের নৌবিভাগের সাহায্যদান ৫ লক্ষ পাউণ্ড মাত্র।)

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে কন্‌গ্রেস এই নিয়ত বর্দ্ধমান সমর-ব্যয়ের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ আপত্তি করিয়াছে, কিন্তু কন্‌গ্রেসের বাণী রাজদ্রোহ ও সম্প্রদায়-বিশেষের দুরাকাঙ্ক্ষার বিজৃম্ভণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অথচ আমরা জানি যে, ভারতীয় প্রজার মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক ও সর্ব্বাপেক্ষা রাজভক্ত, ইহা সেই ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই উক্তি। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম কন্‌গ্রেসে শ্রীযুক্ত পি. রঙ্গিয়া নাইডু দেখাইয়াছিলেন যে, ভারতের সমর-বিভাগের ব্যয়—যাহা ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১১৪৬৩০০০ পাউণ্ড ছিল, তাহা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বাড়িয়া ১৬৯৭৫৭৫০ পাউণ্ড হইয়াছে। ঐ সময়ে শ্রীযুক্ত ডি. ই. ওয়াচা

বলিয়াছিলেন যে, ঐ ব্যয়-বৃদ্ধির প্রধান কারণ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের সমবায় প্রণালী (amalgamation scheme)। তিনি আরও দেখাইয়াছিলেন যে, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ১৫ কোটী পাউণ্ড মাত্র ব্যয়ে ২৫৪০০০ জন সৈনিক নিয়োগ করিত। কিন্তু মহারাণী ভারত-সাম্রাজ্যের ভার লইবার পর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৮১০০০ সৈনিকের জন্য ১১৭০০০০০০ পাউণ্ড ব্যয় পড়িত। এই ব্যয়বৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল ইয়ুরোপীয় পল্টনের মহার্ঘতা, নৌ-যাত্রার ব্যয়াধিক্য, এবং সরঞ্জাম, রসদ, পেন্‌সন, ছুটীর ভাতা ইত্যাদি। এই সকল ব্যয়ের অনেক দফা সম্বন্ধেই ভারত গবর্মেণ্ট আপত্তি করিয়াছিলেন, এবং ইহাও অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, ঐ সমবায়প্রণালীজনিত অধিকাংশ খরচ সাম্রাজ্যের প্রয়োজন-ঘটিত, তদ্বিষয়ে ভারতের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় নাই। এ আপত্তি গ্রাহ্য হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষকে বৎসর বৎসর হোম-ডিপোর জন্য ৭ সাত লক্ষ পাউণ্ড দিতে হইয়াছিল। এ 'হোম' অবশ্য ভারতবর্ষে নয়, ইংলণ্ডে। সেই হোমে বিশ হাজার হইতে বাইশ হাজার বৃটিশ সৈনিক বাস করিত, কিন্তু তাহাদের পল্টন এ দেশে থাকিত বলিয়া ঐ সকল হোমের ব্যয় ভারতবর্ষকে দিতে হইত।—ওয়াচা সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় আরও অনেক অবৈধ ব্যয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। কুতূহলী পাঠক তাঁহার সেই সুন্দর বক্তৃতা পাঠ করিতে পারেন।

ফসেট সাহেব একবার বলিয়াছিলেন যে, "ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবসানের পর ইংরেজ জাতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভারতীয় শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, আমরা এই দায়িত্ব এমন শ্লথভাবে পালন করিয়াছি যে, অনেক ক্ষেত্রে নূতন শাসনপ্রণালী পুরাতনের তুলনায় অপকৃষ্ট। সে সময়ে ব্যয় বিষয়ে স্বাধীনভাবে নিকাশ লওয়া হইত। এখন সে প্রথা প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে।"

মহারাণী সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভারত-শাসনের ভার গ্রহণ করিবার কিছু পরে ডিস্‌রেলী সাহেব পার্লামেণ্ট সভায় বলিয়াছিলেন যে, "সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ভগবানের অচিন্ত্য বিধানে ভারতের শাসনভার যে ইংরাজ জাতির উপর ন্যস্ত হইয়াছে, তাহাকে একটী মহান্ দায়িত্বপূর্ণ ন্যাসস্বরূপ বিবেচনা করা উচিত।" এই উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া ৮র্থ কন্‌গ্রেসে জর্জ্জ ইউল সাহেব বলিয়াছিলেন যে, "মনে হয়, যেন পার্লামেণ্টের অল্লাধিক ৬৫০ জন সভ্য ঐ ন্যাস ন্যাসকর্ত্তা ভগবানের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, ভগবানই যেন তাহার সংরক্ষণ করেন।" বোধ হয়, এমন

সময় আসিয়াছে যখন আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, ভগবান্ তাহারই সাহায্য করেন, যে নিজেকে সাহায্য করে!

বৎসরের পর বৎসর কন্‌গ্রেস সমরবিভাগের ব্যয়-বৃদ্ধির সম্বন্ধে আপত্তি করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসরের ব্যর্থ প্রতিবাদের পর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে যখন গোরা সৈনিকের বেতন-বৃদ্ধির ফলে ভারতের সমর-ব্যয় প্রতি বৎসর ৭৮৬০০০ পাউণ্ড বাড়িয়া গেল, তখন কন্‌গ্রেস উহার প্রতিবাদ করিয়া দেখাইলেন যে, যখন দক্ষিণ আফ্রিকা ও চীনদেশে বহুসংখ্যক গোরা সৈন্য পাঠান সত্ত্বেও ভারত নিরাপদ ছিল, তখন নিশ্চয়ই অপ্রয়োজনে এত অধিক গোরা সৈন্য রাখা হইতেছে। পর বৎসর কন্‌গ্রেস আবার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, ভারতের বর্তমান সমর-ব্যয় ভারতকে অন্তর্বিগ্রহ বা বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নয়, পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য-নীতির পরিপুষ্টির জন্য। উপনিবেশসমূহ সাম্রাজ্যের সমর-ব্যয়ে অতি অল্পই সাহায্য করে। কিন্তু ভারতবর্ষ শুধু ভারতীয় সৈনিকের নয়, বৃটিশ সেনারও প্রায় এক-তৃতীয়াংশের গুরু ব্যয় বহন করিতেছে। সাম্রাজ্যের সমর-প্রয়োজনে ভারতের সাহায্যের যখন পরিমাণ করা হয়, তখন এই সব কথা স্মরণ রাখা উচিত।

১৯০৪ ও ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কন্‌গ্রেস বলিয়াছিলেন যে, ভারত তখনকার সামরিক ব্যয়ভার বহন করিতে অক্ষম; এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এই আবেদন করিয়াছিলেন যে, লর্ড কিচেনারের সংস্কার-প্রণালীর প্রয়োজনে যে এক কোটী পাউণ্ড মঞ্জুর করা হইয়াছিল, তাহা শিক্ষার জন্য এবং রায়তদিগের ভার-লাঘবের জন্য ব্যয় করা হউক।

বৃটিশ সমর আফিস ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতের স্কন্ধে যে ব্যয়ভার চাপাইয়া আসিতেছিলেন, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কন্‌গ্রেস তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, ভারত-রাজস্বের প্রায় একতৃতীয়াংশ সামরিক প্রয়োজনে ব্যয় করা হইতেছে, এবং তাহার ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে রিক্ত রাখা হইতেছে।

লর্ড কিচেনারের সংস্কার-প্রণালীর ফলে ভারতসেনাকে অহরহ অভিযানের জন্য প্রস্তুত রাখা হইত, এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ঐরূপ প্রস্তুত সৈনার সংখ্যা ছিল—৭৫ হাজার গোরা সৈন্য সমেত ২৪৭০০০। যেহেতু ভারতবর্ষ বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বহু অর্থব্যয়ে ভারতের সেনাকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত রাখিয়াছিল, সেই জন্যই যুদ্ধের প্রভাতে ফ্রান্সে বৃটিশ সৈনার সঙ্কটসময়ে ভারত

গবর্মেণ্ট যেরূপ সাহায্যপ্রেরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯১৪।১৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের সমর-ব্যয় ছিল ২০০ ০০০০ পাউণ্ড। ১৯১৫।১৬ খৃষ্টাব্দে ঐ ব্যয়ের অঙ্ক ২১২৫০০০০ পাউণ্ড ও ১৯১৬।১৭ খৃষ্টাব্দের বজেটে ২২০০০০০০ পাউণ্ড মঞ্জুর হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও কুলাইবে না।

এই অতিরিক্ত ব্যয় সম্বন্ধে বড় লাট যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ভয়ের কারণ আছে। ভারতীয় সমর-ঋণের জন্য (ইংলণ্ডে প্রাপ্ত ট্রেজারী বিল বাদে) অন্যূন ৩২০০০০০০ পাউণ্ড ইতিমধ্যেই আদায় হইয়াছে—আরও আদায় হইতেছে। এই সমর-ঋণের টাকা বিলাতে পাঠান হইতেছে। ইহা ভারতের প্রতিশ্রুত ১০০০০০০০০ পাউণ্ড বিশেষ সাহায্যের অংশমাত্র। বৃটিশ গবর্মেণ্টের পক্ষে ভারতে ও মেসোপটেমিয়ায় যে সব সামরিক খরচ হইতেছে, সমর-ঋণের টাকা তাহাতেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সম্পর্কে বড়লাট বলিয়াছেন—"ভারতের সমর-ব্যয় বজেটের অঙ্কের অপেক্ষা অনেক অধিক হইবে। বজেটের অঙ্ক, তখন অবধি যতদূর জানা ছিল, তাহারই অনুপাতে ধরা হইয়াছিল। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, ফাজিল ব্যয়ে কেবল যে বজেটের অঙ্ক এক কোটী পাউণ্ড ব্যয়িত হইবে, তাহা নহে; তাহার উপর এ পর্য্যন্ত সমর-ঋণ দ্বারা লব্ধ সমস্ত অর্থই নিঃশেষিত হইবে। ভারতবর্ষই বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রাচীস্থ অর্থকেন্দ্র। সেই জন্য ভারতের ও মেসোপটেমিয়ার সময়-ব্যয়ের উপর ইংলণ্ড, উপনিবেশ, এবং মিত্ররাজ্য-সমূহকে ভারতবর্ষ যে গম, পাট, চামড়া ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করিতেছে, তাহার জন্যও ভারতকেই টাকা আমানত করিতে হইতেছে। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষকে পূর্ব্ব-আফ্রিকা ও পারস্য দেশকেও প্রচুর-পরিমাণে অর্থ যোগাইতে হইতেছে, এবং কয়েকবার সিংহল, মারীচদ্বীপ ও মিশরেও মুদ্রা ও অন্যান্য দ্রব্য পাঠাইতে হইয়াছে। অবশ্য, এ সব সাহায্য আমরা বিনামূল্যে দিতেছি না। কিন্তু সে মূল্যের টাকা যখন ভারতে আমদানী হইতেছে না, তখন তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল আমাদের বর্ত্তমান পুঁজীর অপচয়।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ব্যয়ের অঙ্কে যাহা ফাজিল হইবে, প্রচলিত করের দ্বারা কিছুতেই সেই ফাজিলের পূরণ করিতে পারা যাইবে না। অতএব নূতন ট্যাক্স নিশ্চিত বসিবে। এই ট্যাকস্ কাহার উপর বসিবে? অসম্ভব নয় যে, যে সকল জমীদার সরকারী ও বেসরকারী শ্বেতাঙ্গের সহিত হৃদ্যতা করিয়া স্বদেশের বিপক্ষতা করিতেছেন, তাঁহারা ঐ সকল নূতন বান্ধবের আচরণে ভগ্নাশ হইবেন,

প্রতিনিধিগণও যথাযোগ্য আসন পাইবেন) হাত থাকা উচিত, ইহা তাঁহারা ঠেকিয়া শিখিয়া বুঝিবেন।

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড হার্ডিং (ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি উদার সহানুভূতির জন্য যাঁহার স্মৃতি এ দেশে সম্মানিত রহিয়াছে) বিগত ৩রা জুলাই পার্লামেন্টের লর্ড-সভায় বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতের সাহায্যদান সম্বন্ধে চমৎকার বিবরণ বিবৃত করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধের পূর্ব্বকালীন ভারতের সামরিক ব্যয়ের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, 'নিকলসন' কমিটীর নির্দ্দেশানুসারে বার্ষিক ১৯২৫০০০০ পাউণ্ড ভারতীয় সমর-ব্যয়ের সর্ব্বোচ্চ হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু তৎপরে ১৩ বৎসরের মধ্যে ১১ বৎসর ভারতবর্ষ ঐ অঙ্কের অতিরিক্ত খরচ করিয়াছিল, এবং তাঁহার শাসনের শেষ বৎসরের বজেটে ঐ ব্যয়ের হার ২২০০০০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ঐ ১৩ বৎসরের আয়ের অঙ্ক ৪৮০০০০০০ হইতে ৫৮০০০০০০ পাউণ্ডের বেশী ছিল না—কেবল এক বৎসর ৬ কোটী হইয়াছিল। ভারতের মোট আয়ের অনুপাতে সমর-ব্যয়ের পরিমাণ কর, তবেই ভারতবর্ষ যুদ্ধে কতটা ত্যাগস্বীকার করিয়াছে, তাহার প্রমাণ পাইবে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অগষ্ট বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ আরব্ধ হয়। ঐ মাসের সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভে ভারতবর্ষ হইতে তিনটি 'ডিভিসান' (দুইটী পদাতিক সৈন্যের ও একটী অশ্বারোহী সৈন্যের 'ডিভিসান') ফ্রান্সে প্রেরিত হইল। নভেম্বর মাসে অশ্বারোহী সৈন্যের আর একটী 'ডিভিসান' তাহাদের সহিত যোগ দিল। লর্ড হার্ডিংয়ের ভাষায়, 'প্রথমোক্ত সৈনিকগণ বৃটিশ-বাহিনীর যে শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়াছিল, অন্য কেহ তাহার পূরণ করিতে পারিত না।' লর্ড হার্ডিং খেদের সহিত বলিয়াছিলেন—'সেই বীর পদাতিক সৈন্যের অল্পমাত্রই জীবিত আছে।' সত্যই তাহাদের গৃহদ্বার আজ শূন্য; কিন্তু যে স্বাধীনতার জন্য তাহারা ফ্রান্সে প্রাণপাত করিয়াছে, তাহাদের বংশধরগণ সে স্বাধীনতা নিশ্চয়ই ভোগ করিবে। ভারতের সীমান্ত-রক্ষার জন্য আর তিনটি ডিভিসান অচিরে প্রেরিত হইয়াছিল, এবং ঐ সেপ্টেম্বর মাসে এক মিশ্র ডিভিসান পূর্ব্ব-আফ্রিকায়, এবং অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে আর দুইটি 'ডিভিসান' ও একটী অশ্বারোহী 'ব্রিগেড' মিশরে প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে এক ব্যাটালিয়ন ভারতীয় পদাতিক মারীচদ্বীপে, আর এক ব্যাটালিয়ন ক্যামিরুনে, এবং দুইটি ব্যাটালিয়ন পারস্য-উপসাগরে প্রেরিত হইয়াছিল। এ দিকে অন্য অন্য সৈন্যেরা সিংটাউ-অবরোধে জাপানীদিগের সহায়তা করিয়াছিল। এইরূপে ২১০০০০ ভারত-সৈনিক সমুদ্র-

পারে প্রেরিত হইয়াছিল। এই সমস্ত সৈন্যের অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম ভারত-বর্ষ যোগাইয়াছিল। তা ছাড়া যুদ্ধের প্রথম কয় সপ্তাহে ভারতীয় অস্ত্রাগার হইতে ৪ কোটী টোটা, ৬০০০০ বন্দুক ও ৫৫০এরও অধিক অতি উৎকৃষ্ট কামান ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল।

লর্ড হার্ডিং বলেন যে, 'ইহা ব্যতীত প্রচুরপরিমাণ সরঞ্জাম অর্থাৎ তাঁবু, বুট, জিন, পোষাক ইত্যাদিও ভারত হইতে বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল, এবং বিলাতের সমর আফিসের নিত্য নূতন আবদার যোগাইবার পক্ষে চেষ্টার কোনও ক্রটী হয় নাই। মোটের উপর এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, যুদ্ধ-ঘোষণার পর প্রথম কয় সপ্তাহ ভারতবর্ষকে নিঃশেষে দোহন করা হইয়াছিল।' যদিচ লর্ড হার্ডিং এ কথা ধরেন নাই, কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, যুদ্ধে যেমন যেমন সৈন্যক্ষয় হইয়াছে, অমনই তাহাদের শূন্য স্থান পূর্ণ করা হইয়াছে; সেই পূরণকারী সৈন্যের সংখ্যা ৪৫০০০০। নূতন রংরুট ও অন্যান্য সৈন্যের গণনা করিলে ৯১৬ খৃষ্টাব্দের শেষ অবধি অন্যূন ১০ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য বর্ত্তমান যুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। তা' ছাড়া ভারতের ব্যয়ে শিক্ষিত ও সজ্জিত ৮০০০০ গোরা সৈন্য ভারত হইতে যুদ্ধস্থলে প্রেরিত হইয়াছিল। ইহার বিনিময়ে কয়েক মাস পরে ৩৪টি টেরিটোরিয়্যাল ব্যাটেলিয়ন ও ২৯টি ব্যাটারী ভারতবর্ষকে দেওয়া হইয়াছিল। ইহাদের 'সাজসজ্জা ও অস্ত্র-শস্ত্র সংস্কৃত হইলে পর, এবং শিক্ষানবীশদিগের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে পর, তবে তাহারা ভারত-সীমান্তে, কিংবা মেসোপটেমিয়ায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়।'

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের শরৎ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত ভারত-সীমান্তের রক্ষাকার্য্যও সুকর ব্যাপার ছিল না। এ সম্বন্ধে লর্ড হার্ডিং বলিয়াছেন—'অনেক দিন পর্য্যন্ত আফগানিস্থানের ভাব অনিশ্চিত ছিল; যদিও আমি আমাদের মিত্ররাজ আমীরের ব্যক্তিগত সততা সম্বন্ধে কখনও সন্দিহান ছিলাম না; কিন্তু আমার ভয় ছিল, পাছে পার্ব্বত্য জাতিদিগের মধ্যে জেহাদের প্রচার সফল হইয়া, কিংবা আফগান-প্রজার মধ্যে ধর্ম্মান্ধতার ঢেউ উঠিয়া আমীরকে বিপ্লুত করে। * * এ কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে স্থলে যুদ্ধের পূর্ব্ব তিন বৎসরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উল্লেখযোগ্য কোনও বিগ্রহ হয় নাই, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ঐ প্রদেশে ৭টি গুরুতর আক্রমণ ব্যাহত করিতে হইয়াছিল।' ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে এবং শেষে সমর-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে দুইটি জর্ম্মণ

ষড়যন্ত্রের প্রতীকার করিতে হইয়াছিল—প্রথমতঃ ক্যানেডা ও মার্কিণ দেশ হইতে ৭০০০ লোক পঞ্জাবের কয়েকটি ঘাটি হঠাৎ অধিকার করিবার সংকল্পে ভারতবর্ষে উপনীত হয়। পরে ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গালা প্রদেশে আর একটি জর্ম্মণ ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, এবং তাহার জন্য স্থলে সৈন্য চালনা ও জলে বন্দররক্ষার আয়োজন করিতে হইয়াছিল।

লর্ড হার্ডিংকে বিলাতের ও এ দেশের টোরী ও ইউনিয়ানিষ্ট সংবাদ-পত্র-কৃত তীব্র আক্রমণ সহিতে হইয়াছে—বিলাতে মেসোপটেমিয়াসমিতির মন্তব্যের জন্য, এবং এ দেশে ভারতবাসীর পক্ষসমর্থন-জনিত অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান বিদ্বেষের জন্য। ভারতবাসী কিন্তু তাঁহার প্রতি নিজেদের শ্রদ্ধাবিশ্বাস লিপিবদ্ধ করিয়াছে। লর্ড হার্ডিং ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন।

মেসোপটেমিয়া-সমিতি-কৃত ভারত-প্রচলিত আমলা-তন্ত্রের নিন্দাবাদের এ স্থলে আলোচনা নাই করিলাম। লর্ড হার্ডিং নিজের ও ভারতের কলঙ্কভঞ্জন করিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহই আমলা-তন্ত্রের ক্ষালন করিতে পারে নাই। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা মন্দ নয় যে, ১৮৭৮—৯ ও ১৮৭৯—৮০ খৃষ্টাব্দের আফগান যুদ্ধে আমলা-তন্ত্রের অসারতা আরও চমৎকার-রূপে প্রমাণিত হইয়াছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সম্ভাবিত সমর-ব্যয় ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের বেশী হইবে না, এইরূপ স্থির করা হইয়াছিল; এবং বজেটে ব্যয়ের উপর ফাজিল আয় ২০ লক্ষ পাউণ্ড ধরা হইয়াছিল। ঐ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রেল ভারত গবর্মেণ্ট সংবাদ দিলেন যে, 'সমর-ব্যয় বড় ভীতিপ্রদ—বজেটে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অনেক অধিক।' ১৩ই এপ্রেল শুনা গেল যে, তিন মাসের মধ্যে অত্যধিক সমর-ব্যয় জন্য ফাজিল তহবিল ১৩ কোটী হইতে ৯ কোটীর নীচে নামিয়াছে। পরে ২২শে এপ্রেল লাট সাহেবের নিকট সংবাদ আসিল যে, 'ফাজিল ত দূরের কথা অন্যূন ৫½ কোটী টাকা ঘাটতি পড়িতেছে।' ঐ প্রকাণ্ড ভুলটা সমরজনিত দেনার অঙ্ক কম করিয়া ধরায় ঘটিয়া গিয়াছিল, এবং সেই জন্য পার্লামেণ্ট সভাকে অতটা বিভ্রান্ত করা হইয়াছিল, এবং নিয়মিত খরচের ভার বহন করিবার অক্ষমতা হঠাৎ ধরা পড়িয়াছিল। দেখা গিয়াছিল যে, প্রকৃত প্রস্তাবে কত টাকা ব্যয় হইয়াছিল, কর্ত্তৃপক্ষ তাহা জানিতেন না—আয়-ব্যয় পরীক্ষার কাগজে কত অঙ্ক ফেলা ছিল, তাহাই জানিতেন। ব্যয়ের অঙ্ক 'আমানত' বলিয়া লিখিত হইয়াছিল; যদিচ এই আমানত-আদায়ের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। পরে প্রকাশ হইল যে, হিসাব-বিভাগের কর্ত্তাদিগের অনবধানতায় ঐ ত্রুটী ঘটিয়াছিল। এ দেশে

স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার পর—ভগবান্ না করুন—যদি ঐরূপ একটা দুর্ঘটনা ঘটে, তবে ভারতীয় কর্ম্মচারীদিগের লোমহর্ষণ অযোগ্যতার প্রতি তখনকার "ইংলিশম্যান" ও "মান্দ্রাজ মেল" যে কঠোর কটাক্ষ করিবেন, তাহা ভাবিতে গেলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়!

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেম্‌সফোর্ড পরবর্ত্তী নিন্দুকদিগের আক্রমণ লক্ষ্য করিয়া ভারতবর্ষের পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন। এই সকল নিন্দুকদিগের আশঙ্কা এই যে, পাছে ভারতের সাহায্যের প্রকৃত বিবরণ প্রকাশিত হইলে ইংলণ্ডকে কৃতজ্ঞতায় পড়িতে হয়, পাছে তাহার ফলে ভারতের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করিতে গিয়া ভারতকে স্বরাজ্যের অধিকার দিতে হয়! লর্ড চেম্‌সফোর্ড অতি সংযত ভাষায় তাঁহার ব্যবস্থাপক-সভার সমক্ষে বিগত দুই বৎসরে ভারতবর্ষ যুদ্ধ সম্বন্ধে কি কি সাহায্য দিয়াছে, তাহার বিবৃতি করিয়াছিলেন। লর্ড হার্ডিংয়ের আমলের প্রসঙ্গ বাদ দিয়া আমি তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।—"যখন যুদ্ধ বাধে, তখন ভারতীয় সৈন্যবিভাগের ৪৫৯৮ জন গোরা অফিসারের মধ্যে ৫০৩ জন ছুটী লইয়া বিলাতে ছিল। ইংলণ্ডের সমর-আফিস তাহাদিগকে য়ুরোপেই যুদ্ধার্থ রাখিয়া দিলেন। তাহা ছাড়া যুদ্ধ-ঘোষণার পর ভারতবর্ষ হইতে আজ পর্য্যন্ত ২৬০০ জন যুদ্ধযোগ্য অফিসারকে টানিয়া লইলেন। এ গণনায় যাহারা নিজ নিজ ব্যাটারী বা সৈন্যদিগের সহিত বিদেশে যুদ্ধার্থ প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদের ধরা হইল না। এই ঘাট্‌তি ও যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী অপচয় পূরণ করিবার জন্য ভারতীয় সৈন্যের সেনাধ্যক্ষের রিজার্ভ, যাহা ৪ঠা আগষ্ট ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৪০ জন মাত্র ছিল, তাহা বাড়াইয়া ৩০০০ হাজার করা হইয়াছে। ভারতীয় সৈনিকের সংখ্যার হ্রাস ত করা হয়ই নাই, বরং অনেক বাড়ান হইয়াছে। অশ্বারোহীর সংখ্যা শতকরা ২০ জন, এবং পদাতিকের সংখ্যা শতকরা ৪০ জন বাড়িয়াছে, এবং যুদ্ধারম্ভের পর যে সকল রংরুট সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট সমস্ত ভারত-সৈন্যের যে সংখ্যা ছিল, তদপেক্ষা বেশী।" লর্ড চেমস্‌ফোর্ড যথার্থ ই বলিয়াছেন—"অতএব প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতীয় ফৌজ সাম্রাজ্যের এক প্রধান সহায়ক (asset)। যখন যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সাহায্যের তৌল করা হইবে, তখন যেন এ কথা মনে রাখা হয় যে, ভারতীয় ফৌজ একটা হঠাৎ-সৃষ্ট ব্যাপার নয়; কিন্তু সুচিরকালকলিত সুশিক্ষিত সুসজ্জিত বাহিনী। এই ফৌজ প্রস্তুত রাখিবার জন্য ভারতবর্ষকে অনেক কাল ধরিয়া বৎসর বৎসর বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল।"

লর্ড চেমস্‌ফোর্ড সম্প্রতি একটা জনশক্তি-সমিতি (Man power Board) গঠিত করিয়াছেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ভারতীয় জনশক্তি-সংগ্রহের উপযোগী সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা। সকল প্রদেশে ইহার শাখা গঠিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যূহমুখে সৈন্যের যে অপচয় হইতেছে অবিলম্বে নূতন সৈন্য দ্বারা তাহার পূর্ত্তি করা হইতেছে; এবং মজুর, চালক, বাহক প্রভৃতি কুলী সংগ্রহ করিয়া মেসোপো-টেমিয়ার ২০টী এবং ফ্রান্সে ২৫টী 'গণ' (corps) গঠিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ৬০০০০ হাজার কারুকর, শ্রমজীবী, বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি মেসোপোটেমিয়ায় ও পূর্ব্ব-আফ্রিকায় নিযুক্ত হইয়াছে, এবং কুড়ি হাজার ব্যক্তি ভৃত্য-রূপে সমুদ্রপারে গিয়াছে। প্রায় ৫০০ শত ভারতীয় চিকিৎসক ভারতীয় চিকিৎসা-বিভাগে কমিশন গ্রহণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের এ সময়ে নাকি বিশেষ জরুরী প্রয়োজন, তাই এই ভাবে কমিশন দেওয়া হইয়াছে। যখন দেওয়াই হইয়াছে, তখন আমরা কি আশা করিতে পারি না যে, যুদ্ধের সময় যেমন, শান্তির সময়েও তেমনই ভারতীয় চিকিৎসককে সাদরে গ্রহণ করা হইবে, এবং বিলাতী ডিগ্রীর অভাবকে মন্দিরে প্রবেশের অন্তরায়-রূপে স্থাপন করা হইবে না? ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে,জিলাস্থ সিবিল-সার্জ্জনের স্থান অনেক স্থলে ভারতীয় ডাক্তার-গণ গ্রহণ করিয়াছেন। যুদ্ধের পর যেন এ ব্যাপারে অন্যথা না করা হয়। রিজার্ভভুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষের সংখ্যা যখন ৪০ হইতে তিন হাজার বর্দ্ধিত হইয়াছে, তখন এরূপ ভাবা কি অসঙ্গত যে, উপযুক্ত ভারতবাসীর পক্ষে সম্রাটের কমিশন-প্রাপ্ত সেনানায়ক হইবার অধিকার ৯টি মাত্রে সীমাবদ্ধ রাখা অসঙ্গত? যদি ১৯।২০ বৎসরের ইংরেজ বালক সম্রাটের কমিশন পাইবার যোগ্য হন (মৃত দ্বিতীয় লেপ্টনেণ্টের তালিকা দেখিলে এই কথা সপ্রমাণ হইবে) তাহা হইলে যখন ভারতীয় ফৌজ ইংরেজ সৈন্যের সমান সাহসে যুঝিতেছে, কেন তবে ভার-তীয় যুবকের পক্ষে নিজের দেশে সম্রাটের কমিশন পাইবার অধিকার অপাবৃত হইবে না? এবং ভারতীয় সেনাধ্যক্ষের অধীনে ভারতীয় ফৌজ রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবে না?

ভারতবাসীর যুদ্ধে সহায়তার যে চিত্র আমি অক্ষম-তুলিতে অঙ্কিত করিলাম, ইহার পর ভারতবাসীর কৃত ইংলণ্ড ও অন্যান্য মিত্র-রাজ্যের পক্ষ-সমর্থনের বিষয় আর অধিক কি বলিবার আছে? ভারতবর্ষ যে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যভুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করে, এবং ইংলণ্ডের সহিত সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রাখিবার অভিলাষী, এ কথা বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ড যদি ভারতীয় জনশক্তির

সম্যক প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন (এবং লর্ড চেমসফোর্ডের অনুষ্ঠিত জন-শক্তি-সমিতির উদ্দেশ্যও ইহাই) তাহা হইলে, ভারতীয় জনগণের স্বদেশে মনুষ্যোচিত অধিকার থাকা আবশ্যক। বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রধান শিক্ষাই এই যে, যদি সাম্রাজ্যকে নিরাপদ করিতে হয়, তবে ভারতবর্ষকে হোমরুল দিতেই হইবে। যদি যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের জনশক্তির প্রকৃষ্ট প্রয়োগ করা হইত, তবে বোধ হয় যুদ্ধই বাধিত না। কারণ, কাহার এত সাহস যে, ইংলণ্ড ও ভারতের সংযুক্ত শক্তিকে সম্মুখ-যুদ্ধে আহ্বান করে। কিন্তু যত দিন ভারত পরাধীন জাতি থাকিবে, তত দিন তাহার জনশক্তির প্রকৃষ্ট প্রয়োগ সম্ভব হইবে না। ভারতবর্ষ কিরূপে একটা বিপুল সেনার ব্যয়ভার বহন করিবে, যদি সেই সঙ্গে তাহাকে গোরা সৈন্যের ব্যয়, তাহাদের যাতায়াতের ব্যয়, বিলাতে উচ্চদরে সরঞ্জাম-খরিদের ব্যয়, এবং ইংলণ্ডের প্রয়োজন হইলে সেই সরঞ্জাম রপ্তানী করিবার ব্যয় বহন করিতে হয়? ভারতবর্ষের পক্ষে ইংলণ্ডে গোরা সৈন্যের শিক্ষানবিশীর ব্যয়-ভার বহন করা সম্ভব নহে—বিশেষতঃ যখন সেই সকল সৈনিক ৫ বৎসরের অধিক ভারতবর্ষে থাকে না। ইহা কিছুতেই সম্ভব নহে যে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডে মোহরের বিপুল কাঁড়ি জমাইয়া রাখিবে, এবং নিজে অর্থকৃচ্ছ্রে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের করাধিক্য-জাত কষ্টসঞ্চয় হইতে যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য ২৭০০০০০০০ পাউণ্ড কর্জ্জ দান করিবে। স্মরণ রাখিবেন যে, এ কর্জ্জ-দান বৃহৎ সমর-ঋণ-আদানের পূর্ব্বের ঘটনা। আমি একবার বিলাতে বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম যে, যদি ভারতের রাজভক্তি চাও, তবে ভারতকে স্বাধীন কর। আজ আরও বলিতে চাই যে যদি ভারতকে সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে লাগাইতে চাও, তবে ভারতবাসীকে স্বাধীন কর। ভারতবাসী যখন দেখিবে যে, ভারতীয় করজাত অর্থ ভারতবর্ষেই থাকে, এবং ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে, ভারত-বাসীর শিক্ষায় ও তাহাদিগের শক্তির উপকর্ষের জন্য ব্যয়িত হয়, এবং তাহার বাণিজ্যের উন্নতিতে এবং নব নব শিল্পের উদ্ভাবনে নিয়োজিত হয়, তখন ভারত-বর্ষ স্বেচ্ছায় নিজের উপর ব্যয়ভার স্থাপন করিবে। শান্তিতে সমৃদ্ধি এবং যুদ্ধে আপদ্ উদ্ধার জন্য ভারতবর্ষের যেমন ইংলণ্ডকে প্রয়োজন, তেমনই ইংলণ্ডের ভারতবর্ষকে প্রয়োজন। মণ্টেগু সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন যে, যুদ্ধকালে রণসজ্জার জন্য শান্তিকালে স্বাধীনতার প্রয়োজন। অতএব বলিতে চাই যে, ইংলণ্ড ও ভারত দুই দেশের পক্ষেই যুদ্ধের শিক্ষা এই যে, ভারতবর্ষকে হোমরুল

অবশেষে এই সভায় সমবেত সহস্র সহস্র নরনারীর শ্রদ্ধাপূর্ণ রাজভক্তি [illegible] সম্রাটের সিংহাসনতলে উপহার দিয়া এই প্রসঙ্গের অবসান করিতেছি। [illegible]ের নিশ্চিত আশা ও বিশ্বাস এই যে, অচিরে স্বরাজ মণ্ডিত এই মহাজাতির শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি তাঁহার চরণে উপহৃত হইবে।

ভারতীয় নবজাগরণের নিদান।

ভারতে নবজাগরণের উষা যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবসর নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনজনিত ভাববিনিময়, ইংরাজী শিক্ষা সাহিত্য ও আদর্শের প্রভাব, ইয়ুরোপ, জাপান এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ভ্রমণের ফল প্রভৃতি যে সকল পরিজ্ঞাত কারণ এ সম্বন্ধে কার্য্য করিয়াছে, এ স্থলে তাহার বিস্তার করিব না। কিন্তু তদ্ব্যতীত যে কয়েকটী বিশিষ্ট শক্তি কার্য্যকরী হইয়া ভারতবর্ষে এই যুগপরিবর্ত্তন ও নবীন ভাবের প্রবর্ত্তন করিয়াছে, সংক্ষেপে তাহারই উল্লেখ করিব।

(ক) প্রথমতঃ এশিয়ার উদ্বোধন।

(খ) বিদেশী শাসন ও সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা।

(গ) শ্বেতাঙ্গ জাতিদিগের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বিশ্বাস হানি।

(ঘ) বণিকদিগের জাগরণ।

(ঙ) নারীদিগের প্রাচীন স্থান অধিকারের চেষ্টা।

(চ) জনসাধারণের সুপ্তিভঙ্গ।

ভারতীয় জাতির মধ্যে যে মহনীয় ভাব-বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইতেছে, যে দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, যে স্বাতন্ত্র্য, স্বাবলম্বন, আত্মমর্য্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে, উল্লিখিত প্রত্যেকটি তাহার সহকারী কারণ। যুদ্ধের ফলে জগতের বিকাশক্রম সর্ব্বত্রই দ্রুততর হইয়াছে; কিন্তু আমাদের জন্মভুমি যতটা এই অনুপ্রাণনা অনুভব করিয়াছেন, আর কোনও দেশ ততটা করে নাই।

(ক) এশিয়ার উদ্বোধন :—

লর্ড মিণ্টো রাজপ্রতিনিধি হইয়া এ দেশে আসিবার অল্পদিন পরে তাঁহার সঙ্গে ভারতের অশান্তি সম্বন্ধে আমার আলোচনা হইয়াছিল। ঐ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ঐ অশান্তি ইংরাজী শিক্ষার ও ইংরাজী গণতন্ত্রের আদর্শ, জাপানের হস্তে রুষের পরাজয় এবং বহির্জগতের পরিবর্ত্তন-পরম্পরার অবশ্যম্ভাবী ফল। সেই জন্য লর্ড মিণ্টো যখন প্রকাশ্য ভাবে ও স্পষ্টভাষায় বলিলেন যে,

ভারতবাসীর হৃদয়ে যে নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা সমস্ত প্রাচ্যের বিরাটতর ভাবপরিস্পন্দের ব্যঞ্জনামাত্র এবং শাসন-কার্য্যে ভারতবাসীকে অধিকতর ভাগী করিয়া ঐ আশা আকাঙ্ক্ষার পূরণ করা আবশ্যক, তখন আমি বিস্মিত হই নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতের মধ্যে যে প্রেরণা দৃষ্ট হইতেছে, যদি ইহাকে প্রাচীর জাগরণের অঙ্গমাত্র বলিয়া মনে করা যায়, তবে বুঝিতে ভুল করা হইবে। এশিয়ার জাগরণ জাগতিক উদ্বোধনের একাংশ। এই উদ্বোধন এই জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের ফলে অত্যাশ্চর্য্য গতি লাভ করিয়াছে। জগতের গতি এখনও গণতন্ত্রের অভিমুখে। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে যখন আমেরিকার উপনিবেশসমূহ ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, ঐ ব্যাপারে ইহার আরম্ভ, এবং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসীবিপ্লবে ইহার পরিণতি। বলা বাহুল্য যে, ইহার মূলে বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতি এবং রুঁষো, টমাস পেইন ও ফরাসী বিশ্বকোষ-কর্ত্তাদিগের চেষ্টায় ইয়ুরোপের মানসিক দাসত্বের অপনোদন। প্রাচ্যে, জাপানে দ্রুততর পরিবর্ত্তন এবং রুষিয়ার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ, চীনে মাঞ্চু রাজবংশের অধঃপতন এবং চৈনিক গণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, পারস্যের অভ্যুদয়প্রযত্ন (যাহা রুষিয়া ও ইংলণ্ডের হস্তক্ষেপে এবং প্রভাবকেন্দ্রের (spheres of influence) স্থাপন দ্বারা ব্যাহত হইয়াছিল, এবং পারস্যের ন্যায্য স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিয়াছিল) এবং সর্ব্বশেষে রুষ রাজ্যবিপ্লব এবং ইয়ুরোপ ও এশিয়ার রুসীয়গণতন্ত্রের সম্ভাবনা—এই সমস্ত মিলিত হইয়া ভারতের পূর্ব্বতন ভাবের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। ভারতবাসী এখন হিমালয়ের পরপারে এশিয়ার বক্ষের উপর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জাতিসমূহের বিস্তার লক্ষ্য করিতেছে। স্বেচ্ছাচারী জার বা চীন সম্রাটের বিপুলরাজ্যদেশ এখন আর ভারতের প্রতিবাসী নহে। ভারত এখন আর এই সকল অত্যাচার-পীড়িত জাতিসমূহের দুরবস্থার সহিত নিজের সৌভাগ্যের তুলনা করে না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত (যখনও এদেশে স্বেচ্ছাচার প্রবল হয় নাই) ভারতবর্ষ প্রতিবেশী দেশের তুলনায় সৌভাগ্যশালী ছিল। কিন্তু এখন হইতে যতদিন না ভারতবর্ষে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হয়, ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসী প্রতিবেশীদিগের অবস্থায় ঈর্ষ্যান্বিত হইবে, এবং এই তুলনা ভারতের অশান্তিকে প্রবলতর করিবে।

কিন্তু যদিচ ভারতবর্ষ স্বারাজ্য লাভ করে, (আমি বিশ্বাস করি, ইহা সুনি-শ্চিত) তাহা হইলে সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষ যে স্থান অধিকার করিবে, তাহাতে তাহার স্বাধীন হইলেই চলিবে না, তাহাকে সবল হইতে হইবে। কারণ,

ভারতবর্ষ যে কেবল সাম্রাজ্যের মধ্যে দুর্ভেদ্য গ্রন্থি থাকিবে, তাহা নহে, ভারতের প্রতি অন্য জাতিরা লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে থাকিবে। ইয়াং সাহেব এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের দুগ্ধবতী গাভী—এক কথায় কামধেনু। এশিয়ার মধ্যে যদি ঐ ধারণা প্রবল হয়, তবে কে জানে—প্রাচীন কালে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে কামধেনু লইয়া যেরূপ বিবাদ ঘটিয়াছিল, সেইরূপ ভারতবর্ষের স্বামিত্ব লইয়া বিবাদ না ঘটিবে। অতএব, কি স্থলপথ কি জলপথ, উভয় পথে ভারতের আত্মরক্ষায় সমর্থ হওয়া আবশ্যক। বাণিজ্য-ব্যবসায়ের অবশ্যম্ভাবী বিরোধের কথা নাই বলিলাম, (যদিও দেখিতেছি, জাপান ইতিমধ্যেই ভারতীয় ব্যবসায় ও বাণিজ্যের সঙ্কটদশা করিয়া তুলিতেছে, যে হেতু ভারত আত্মরক্ষায় অসমর্থ) কিন্তু এশিয়ার অধিরাট হইবার জন্য, প্রশান্ত মহাসাগরে প্রভুত্বলাভের জন্য, অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপপুঞ্জের স্বত্বাধিকার জন্য বিরোধ-বিসংবাদ কি অসম্ভব?

অম্লানচিত্তে এই সকল সুবৃহৎ সম্ভাবনার সম্মুখীন হইবার জন্য সাম্রাজ্যের মধ্যে এমন ভারতবর্ষ থাকা চাই, যাহা স্বাধীন, সশস্ত্র, সবল, এবং সন্তুষ্ট। কেবল সে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলে চলিবে না; কিন্তু উপনিবেশসমূহকে বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়াকে (যাহার জনসংখ্যা ক্ষুদ্র, কিন্তু যাহার জনহীন ও অরক্ষিত ভূমি বিস্তৃত) সাহায্য করিতে সমর্থ হওয়া আবশ্যক। কেবল এক ভারতবর্ষেরই এমন প্রভূত জনশক্তি আছে, যাহার সাহায্যে এশিয়ায় বৃটিশ-সাম্রাজ্য সুরক্ষিত হওয়া সম্ভব। যে অদূরদর্শিতার ফলে বৃটিশ রাজচ্ছত্রের ছায়ায় স্বরাজ-প্রাপ্ত সবল স্বপ্রতিষ্ঠ ভারতবর্ষকে লইয়া কয়েকটি স্বাধীন জাতির সাহচর্য্যে এক বিশাল যুক্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার প্রত্যবায় ঘটিতেছে, সে অদূরদর্শিতা পাপ অপেক্ষাও ভীষণ। ভারত-প্রবাসী ইংরেজ-সম্প্রদায় তারস্বরে আপনাদিগের স্বার্থের কথা ঘোষণা করে। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় জনসঙ্ঘ ভবিষ্যতে অপর জাতির আক্রমণ হইতে কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে? ভারতবর্ষ স্বাধীন ও সবল হইলে তবেই তাহারা নিরাপদ। যাঁহারা জাপানী সংবাদপত্র পাঠ করেন, তাঁহারা জানেন যে, এই যুদ্ধের সময়েও তাহারা অসঙ্কোচে জর্ম্মণীর সম্বন্ধে তাহাদের প্রবল পক্ষপাত প্রকাশ করিতেছে। যুদ্ধের পর এই দুই দুরাকাঙ্ক্ষ দুর্দ্দমনীয় জাতির মধ্যে মৈত্রীস্থাপন আদৌ বিচিত্র নহে। জাপান তাহার সৈন্যবল ও নৌবল অক্ষুণ্ণ লইয়া এই যুদ্ধ-ব্যাপার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাণিজ্যবল অতিশয় উৎকর্ষলাভ করিবে। অতএব বুদ্ধিমান্ রাজনীতিকের ব্যবস্থামতে ইংলণ্ডের উচিত যে, জাপানের

অপেক্ষা ভারতবর্ষকে অধিক বিশ্বাস করা। আমরা চাই যে, এশিয়ায় বৃটিশ-সাম্রাজ্য স্বাধীন ও সন্তুষ্ট ভারতীয় প্রজার রাজভক্তির দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হউক। সে সাম্রাজ্য যেন সম্ভাবিত ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্ষণভঙ্গুর বন্ধুতার উপর নির্ভর না করে। কারণ, আন্তর্জ্জাতিক মিত্রতা জাতিগত স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত; তাহার ভিত্তি-ভূমি বালুকা, প্রস্তর নহে।

ভারতপ্রবাসী ইংরাজের অনেকেরই ধারণা এই যে, তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য (১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এই স্বার্থের পরিমাণ ৩৬৫৩৯৯০০০ পাউণ্ড ছিল) ভারতে ইংরাজের প্রভুত্ব অত্যাবশ্যক। কিন্তু যদিচ ইংরাজ জাতির আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যে ৬৮৮০৭৮০০০ পাউণ্ড খাটিতেছে, এবং আর্য্যেণ্টাইন প্রদেশে ২৬৯৮০৮০০০ পাউণ্ড খাটিতেছে, কৈ সে সকল দেশে ত ইহারা প্রভুত্বস্থাপনের দাবী করে না? তবে ভারতবর্ষে টাকা খাটাইতেছে বলিয়া তাহারা কেন প্রভুত্বের দাবী করিবে? "ভারতবর্ষ আমাদের সম্পত্তি, আমাদের প্রয়োজনে ইহার বিনিয়োগ করিব", এই ভ্রান্ত ধারণা ইংরাজকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। "ভারতবাসী আমার বন্ধু, আমার সমকক্ষ, ভারতবর্ষ বৃটিশ-সাম্রাজ্য-ভুক্ত একটী স্বাধীন রাজ্য, আমাদের মতই একটী স্বতন্ত্র জাতি, সাম্রাজ্যের অংশীদার, পরতন্ত্র নহে", এই ভাবই ইংরাজকে অতঃপর পোষণ করিতে হইবে।

জাপান, চীন এবং এসিয়াস্থ রুসিয়ায় যে গণতন্ত্রের প্রেরণা উঠিয়াছে,ভারতের তন্ত্রীতে তাহার প্রতিধ্বনি বাজিতেছে। কেহ যদি মনে করেন যে, এ তরঙ্গ ভারতের তটে আঘাত করিবে না, তবে তিনি ভ্রান্ত।

(খ) বিদেশী শাসন ও সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা।

কিন্তু এসিয়ার জাগরণ ভিন্ন অন্যান্য কারণও ভারতবর্ষে কার্য্য করিয়াছে। ইয়ুরোপে ইংলণ্ড স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিপক্ষে এবং স্বাধীনতার স্বপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছে, অথচ কিছুদিন পূর্ব্বেও ভারত সম্বন্ধে তাহার ভাব অনিশ্চিত ছিল। এ জন্য আমি বলিতেছিলাম যে, ইংলণ্ড একটী সুবর্ণসুযোগ হেলায় হারাইয়াছে। প্রথম প্রথম ভারতবর্ষ স্থিরবিশ্বাস করিয়াছিল যে, ইংলণ্ড জাতিনির্ব্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্যই যুদ্ধ করিতেছে। পার্লামেণ্ট সভায় শান্তির প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, গত অক্টোবর মাসেও এস্কিথ্ সাহেব বলিয়াছিলেন যে, মিত্ররাজ্যসমূহ শুদ্ধ স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছে। স্বাধীনতার কক্ষে

তাহারা নিবৃত্ত হইবে না। ফ্রান্স যাহাতে এলসেস্ লোরেণ পুনঃপ্রাপ্ত হয়, এই প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি বলিয়াছিলেন যে, পরাধীনতার নিগড় একেবারে দুঃসহ। কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন যে, ঐ নিগড় এলসেস্ লোরেণ অপেক্ষা এখানে কম দুঃসহ? জাতীয় সম্মানের কম ক্ষতিকারক? এলসেস্ লোরেণে শাসক ও শাসিত উভয়ই ধর্ম্মে কর্ম্মে ও জাতিতে এক; এ দেশে কিন্তু তাহার বিপরীত। যেমন যেমন যুদ্ধ অগ্রসর হইতে লাগিল, ভারতবাসী ধীরে ধীরে অনিচ্ছায় বুঝিতে পারিল যে, স্বেচ্ছাচারীর প্রতি যে বিদ্বেষ, তাহা কেবল পশ্চিম ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত স্বেচ্ছাচারকে লক্ষ্য করিয়া; আর পরাধীনতার যে দুঃসহ অপমান, তাহা কেবল শ্বেতাঙ্গ জাতিদিগের পক্ষে প্রযোজ্য। ইহাও বুঝিল যে, সকল দেশেই স্বাধীনতার বৃষ্টি হইবে, কেবল ভারতের ভূমি শুষ্ক থাকিবে, এবং উপনিবেশ সকলকে নূতন অধিকার দেওয়া হইবে, কিন্তু ভারত রিক্তহস্তে ফিরিবে। সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রাজপুরুষেরা যে সকল বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, তাহাতে ভারতবর্ষকে যেন ইচ্ছা করিয়া বাদ দেওয়া হইল, এবং অবশেষে স্পষ্টতঃ শ্বেতসাম্রাজ্যের প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। ঐ সাম্রাজ্যের হর্ত্তা কর্ত্তা থাকিবেন, শ্বেতজাতি-পঞ্চক; এবং কৃষ্ণকায় জাতিদের সম্বন্ধে শ্বেতাঙ্গদিগের তত্ত্বাবধানে চিরস্থায়ী নাবালকত্ব বিহিত হইল। অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল, এবং ভয়ের যথেষ্ট কারণ দেখা গেল। সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনের জন্য আলোচনা চলিতে লাগিল; কিন্তু তথায় ভারতবর্ষের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল না। উপনিবেশদিগকে অংশিরূপে গ্রহণ করা স্থির হইল। তবে কি ভারতবর্ষ চিরদিন পরাধীনই থাকিবে? খোলা তপ্ত থাকিতে থাকিতে বনার-ল সাহেব উপনিবেশদিগকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। ভারত কি হেলায় ঐ সুযোগ হারাইবে? ফ্লাণ্ডার্সে, ফ্রান্সে, গ্যালীপোলীতে, এসিয়া-মাইনরে, চীনে, আফ্রিকায় ভারতীয় সেনা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু যাহার জন্য যুদ্ধ করিল, ভারত কি সেই স্বাধীনতার ভাগী হইতে পারিবে না? অবশেষে ভারতবাসী সুপ্তোত্থিত হইয়া ভারতমাতার এক সুপুত্রের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল, 'স্বাধীনতা আমার বিধিদত্ত অধিকার, আমি স্বাধীন হইতে চাই।' সে স্বরাজ-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিল, এবং সাম্রাজ্যের মধ্যে তাহার যোগ্যস্থান দাবী করিল।

এইরূপে যদিও সে সাম্রাজ্যের জন্য যুদ্ধ করিতে উদাসীন হইল না, এবং যদিও সে যুদ্ধসংক্রান্ত বিবিধ ব্যাপারে (হাঁসপাতাল-জাহাজ, সমরফণ্ড, রেড্ক্রস অনুষ্ঠান, এবং সুবৃহৎ সমর-ঋণে) জলের মত অর্থ ঢালিতে লাগিল,

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা পীড়াদায়ক আতঙ্ক তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল যে, যদি না সে নিজের দেশে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, তাহা হইলে হয় ত সাম্রাজ্যের বিজয়ে তাহার স্বাধীনতা আরও খর্ব্ব হইবে।

সাম্রাজ্য-পরিষদের অধিবেশন—যাহা সাম্রাজ্য-ঘটিত-ব্যাপারের আলোচনার জন্য সমবেত হইয়াছিল, তথায় ভারত গবর্মেণ্টকে প্রতিনিধি-প্রেরণের অধিকার দিয়া ইংলণ্ডের মন্ত্রিসমাজ সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল, যে স্থলে অন্যান্য দেশ নিজের নিজের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিল, সে স্থলে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হইয়াছিলেন—গবর্মেণ্টের নিযুক্ত, প্রজার নিকট দায়িত্বশূন্য ব্যক্তিগণ। যাঁহারা ঐরূপ প্রতিনিধি হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত আপত্তির কিছু কারণ ছিল না। কিন্তু তাঁহারা গবর্মেণ্টের নিযুক্ত প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপক-সভার নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মনোনীত প্রতিনিধি নহেন, ইহাই আপত্তির বিষয় ছিল। ব্যবস্থাপক-সভায় মাননীয় খান বাহাদুর সাফী সাহেব ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে মান্যবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লাট সাহেবকে সম্বোধন করিয়া যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন,—"এই আশা ও প্রত্যাশার অবস্থায় প্রস্তাবক মহাশয়ের মন্তব্য যথাযোগ্য হয় নাই। ইনি সাম্রাজ্য-সমিতিতে সরকারী প্রতিনিধি পাঠাইতে চাহেন, নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি পাঠাইবার প্রসঙ্গ করেন নাই। সরকারী প্রতিনিধি পাঠাইবার সার্থকতা অল্প, হয় ত তাহাতে আমাদের অনিষ্টও ঘটিতে পারে। কারণ, আমি এ কথা বলিতে বাধ্য যে, জনহিতকর ব্যাপার আমরা যে চক্ষে দেখি, তাঁহারা সকল সময় সে চক্ষে দেখেন না। অনেক সময় তাঁহাদের মতি গতি আমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধ। এ কথা আমি অস্বীকার করি না যে, সাম্রাজ্য-পরিষদে ইংলণ্ডের এবং স্বায়ত্তশাসক উপনিবেশ-সমূহের মন্ত্রিগণ সমবেত হইবেন, কিন্তু ঐ সকল কর্ম্মচারীতে এবং আমাদের কর্ম্মচারীতে অনেক প্রভেদ। তাঁহাদের মন্ত্রিগণ প্রকৃতিপুঞ্জের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি, সেই সেই দেশের জন-সাধারণের মুখস্বরূপ, এবং তাহাদের কার্য্যাকার্য্যের জন্য প্রজার নিকট দায়ী; কিন্তু আমাদের কর্ম্মচারিগণ নামে মাত্র সাধারণের সেবক, কার্য্যে তাঁহারা আমাদিগের প্রভু। আমি আশা করি যে, আপনার হিতকারী শাসনের গুণে আমাদের এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের শূন্যে সৌধরচনা শোভা

পাইবে না। কারণ, তাহা স্বপ্নদৃষ্ট অট্টালিকার মত হঠাৎ বিলীন হইতে পারে।"

ঐ সাম্রাজ্য-পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গকে স্থানদান একটা যুগান্তরকারী ঘটনা বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহারা প্রতিনিধি ছিলেন বটে; কিন্তু ভারতের নয়, ভারত গবর্মেণ্টের; এই খানেই প্রভেদ। কারণ, তাহাদের সহযোগিগণ স্ব স্ব দেশের প্রকৃত প্রতিনিধি। তথাপি তাঁহাদের কার্য্যে আমরা সন্তুষ্ট। কারণ, তাঁহারা যোগ্য ও বহুজ্ঞ ব্যক্তি। যদিচ দুইটি বিষয়ে, অর্থাৎ সাম্রাজ্যগত বিশিষ্ট বাণিজ্যবিধান ও চুক্তিবদ্ধ কুলীর সম্বন্ধে তাঁহাদের কার্য্য আমাদের মনোমত হয় নাই, তথাপি আমরা আশা করিতে পারি যে, এই পরিষদে ভারত-সন্তানকে স্থানদানের ফলে 'ছুঁচ হইয়া প্রবেশ ও ফাল হইয়া নির্গত হইবার' প্রবাদ সার্থক হইবে। অন্ততঃ তাঁহাদের সহযোগিগণ এবার বুঝিয়াছেন যে, যদিচ ভারত পরাধীন বটে, তথাপি ভারতসন্তান তাঁহাদের সম্পূর্ণ সমকক্ষ।

এই স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পব্‌লিক সার্ভিস কমিশনের মন্তব্যে ভারতে নৈরাশ্য ও বিরক্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশ্য, ঐ মন্তব্য অন্য যুগের কথা, বর্ত্তমানে আলোচনার অযোগ্য। কিন্তু ঐ প্রসঙ্গে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কমিশনের সভ্যদিগের অধিকাংশের মতে ভারতশাসনে ইংরাজের প্রভুত্ব চিরস্থায়ী করা আবশ্যক, এবং ৩০ বৎসর পরে ভারতবাসী সিভিল-সার্ভিস ও পুলিস বিভাগের চারি আনা মাত্র পদ পাইতে পারিবে। ঐ কমিশনের যখন সামান্য উল্লেখও করিলাম, তখন সঙ্গে সঙ্গে বিচারপতি রহিম সাহেবকে ভারতবাসীর কৃতজ্ঞ হৃদয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। তিনি সুদুর্লভ সাহসের পরিচয় দিয়া একক সমস্ত সভ্যের অনুমোদিত মন্তব্যের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এবং ভারতবর্ষে কি সুসঙ্গত প্রণালীমতে কর্ম্মচারি-নিয়োগ করা উচিত, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ঐ সমিতিতে তিন জন মাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন। শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে রিপোর্ট-প্রকাশের পূর্ব্বেই ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছিলেন। আমরা জানি, সমিতির অধিবেশনের সময় তাঁহার স্বদেশবাসীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহার অপমান ও বেদনায় তাঁহার মৃত্যু আসন্ন হইয়াছিল। রহিম সাহেবের কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মাননীয় চৌবল মহোদয় রিপোর্টে স্বাক্ষর করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি উহার অনেকগুলি গুরুতর

প্রস্তাবের সহিত একমত নহেন। যাহা হউক, ঐ সমিতির রিপোর্টকে আমরা পূর্ব্ব-মন্বন্তরের ব্যাপার বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি। উহা প্রত্নতত্ত্ববিদের অনুসন্ধানের বস্তু হইতে পারে—সাধারণের উহাতে কোনও প্রয়োজন নাই।

এই সমস্ত কারণে ভারতবাসী বাধ্য হইয়া বুঝিয়াছিল যে, জগতের মধ্যে তাহার অদৃষ্টেই চিরদাসত্ব। ইংলণ্ডে ইংরেজ প্রভু, ফ্রান্সে ফরাসী, আমেরিকায় মার্কিণ জাতি, উপনিবেশসমূহে ঔপনিবেশিকগণ প্রভু; কিন্তু ভারতবাসী কোথাও প্রভু নহে। পৃথিবীর মধ্যে কেবল ভারতবাসীই 'নিজবাসভূমে পরবাসী'। 'বৃটিশের জন্য বৃটন'—যদি এ কথা বল, তোমার উক্তি ন্যায্য ও সঙ্গত; কিন্তু যদি বল, 'ভারতবাসীর জন্য ভারতবর্ষ', তবে শুধু অন্যায় বলিলে, তা' নয়, তুমি রাজদ্রোহী। তোমার বলা উচিত, 'সাম্রাজ্যের জন্য ভারতবর্ষ'; বরং আরও ভাল,—যদি বল, 'ভারতকে বাদ দিয়া যে সাম্রাজ্য, তাহার জন্য ভারতবর্ষ।'

ইংরেজের পক্ষে স্বদেশীয় পণ্য-গ্রহণ সুবুদ্ধি ও স্বদেশ-প্রেমের ঘোষক, কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষে বিদেশী বর্জ্জন সংকীর্ণতা ও সাম্রাজ্য-দ্রোহের পরিচায়ক। ভারতবাসীর পক্ষে এই বিধান যে, সে চিরদিন প্রফুল্লচিত্তে এখনকার মত— 'অধীনতার আবহাওয়ায়' (ইহা গোপালকৃষ্ণ গোখলের শব্দ) বসবাস করুক, এবং যে সাম্রাজ্যে সে সামাজিকের অধিকারবর্জ্জিত, সেই সাম্রাজ্যের জন্য গর্ব্ব অনুভব করুক। আর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অপরাপর জাতির পক্ষে এই বিধান যে, তাহারা সামাজিকের পূর্ণ অধিকারে অধিকারী হইয়া সাম্রাজ্যভুক্ত থাকুক। এইরূপে ঠিক যখন ইংলণ্ডের প্রতি ভারতবাসীর বিশ্বাস বিলুপ্ত হইতেছিল, এমন সময় মণ্টেগু সাহেবের ভারতসচিব-পদে নিয়োগরূপ আনন্দ-সংবাদ ভারতে ঘোষিত হইল, এবং ভারতবাসীর অভাব অভিযোগ স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার জন্য আমাদের রাজপ্রতিনিধির নিমন্ত্রণ তাঁহার নিকট প্রেরিত হইল। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে যেন আলোক-রেখা ফুটিয়া উঠিল, ইংলণ্ডের সম্বন্ধে প্রণষ্ট বিশ্বাস নব-জীবন লাভ করিল, এবং সুহৃৎসমাগমের সম্ভাবনায় ভারতময় আনন্দ-তূর্য্য বাজিয়া উঠিল।

এইরূপে ভারতবাসীর সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট ও বৃটিশ গবর্মেণ্টের ভাবান্তর হওয়ায় ভারতের ভাবেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, স্বরাজ-লাভের জন্য ভারতবাসীর দৃঢ় সংকল্পের কিছুমাত্র খর্ব্বতা হইয়াছে। সন্ধির প্রস্তাব শুনিতে তাহার আপত্তি নাই, কিন্তু সে সন্ধি

'সম্মানসহিত সন্ধি' হওয়া চাই। এ ক্ষেত্রে সম্মানের অর্থ—স্বাধীনতা। তাহা যদি না প্রদত্ত হয়, তবে এ দেশে আরও প্রবলতর আন্দোলন আরম্ভ হইবে।

(গ) শ্বেতাঙ্গ জাতির শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসহানি।

আর্য্য-সমাজ ও থিওজফিকাল সোসাইটীর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ জাতির শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসহানির স্ত্রপাত হইয়াছিল। কারণ, উভয় সমাজেরই লক্ষ্য ছিল—ভারতবাসীর হৃদয়ে ভারতীয় সভ্যতার উৎকর্ষ-ভাবনা জাগ্রত করা, এবং তাহাকে অতীতের গৌরবে গৌরবিত করিয়া বর্ত্তমানে আত্মসম্মান এবং ভবিষ্যতে আত্মনির্ভর আনয়ন করা। ঐ দুই সমাজের চেষ্টার ফলে সর্ব্ব বিষয়ে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণস্পৃহা ক্রমশঃ নিবারিত হইয়াছিল, এবং পাশ্চাত্য জাতির চিন্তা ও সভ্যতার মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট, তাহাই গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব বিশেষভাবে কার্য্য করিয়াছিল। তাঁহার জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম, তাঁহার দেশানুরাগ, এবং তৎকৃত পাশ্চাত্য জড়বাদের অনিষ্টকারিতা-প্রদর্শন ভারতীয় সমাজে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল। তাঁহার একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—"ভারতসন্তানগণ! আমি যে আজ ভারতের গৌরবময় অতীতের প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। অনেকে অনেক বার আমাকে বলিয়াছেন যে, অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত কেবল যে নিষ্ফল, তাহা নহে, তদ্দ্বারা মানুষের অবনতি ঘটে। এ কথা মিথ্যা নহে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, অতীতই ভবিষ্যতের নির্ম্মাণকর্ত্তা। অতএব, দূর অতীতের প্রতি—যত দূর দৃষ্টি চলে, দৃষ্টিক্ষেপ কর। অতীতের সনাতন ধারায় অবগাহন কর। তাহার পর ভবিষ্যত্যের দিকে চাহিয়া অগ্রসর হও, এবং ভারতের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতর কর। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কত মহান্ ছিলেন, তাহা মনে রাখা চাই। কোন্ বংশে আমার জন্ম, কোন্ রক্ত আমার ধমনীতে প্রবাহিত, তাহার জ্ঞান থাকা চাই। আমাদের আভিজাত্যে, আমাদের গৌরবময় অতীতে, বিশ্বাস থাকা চাই। সেই বিশ্বাস হইতে, গৌরবিত অতীতের সেই স্মৃতি হইতেই অতীতের অপেক্ষাও মহিমান্বিত ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিতে পারিব।" আর একটি উক্তি শুনুন ঃ—"আমি নিশ্চয় জানি, প্রত্যেক সভ্য দেশের লক্ষ লক্ষ—হাঁ, প্রকৃতই লক্ষ লক্ষ নর নারী ভারতের বাণী শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে—যে বাণী তাহাদিগকে মুদ্রার উপাসক জড়বাদ-দানবের বিকট গ্রাস হইতে পরিত্রাণ করিবে। এখন নব্যতন্ত্রের সমাজসংস্কারকদিগের

মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছেন যে, বেদান্তের উচ্চ ভাব ভিন্ন তাঁহাদের সামাজিক চেষ্টার মধ্যে কেহই আধ্যাত্মিকতার সঞ্চার করিতে পারিবে না।”

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও দার্শনিক-কৃত সংস্কৃত সাহিত্যের স্তুতিবাদও এই ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছিল। তথাপি এই ভাবান্তর অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল—সাধারণের অধিগত ছিল না। কিন্তু যখন ভারতবাসী দেখিল, জাপান-যুদ্ধে রুস পরাজিত হইল, একটি ক্ষুদ্র প্রাচ্য জাতি এক সুবৃহৎ পাশ্চাত্য জাতিকে পরাভূত করিল, যখন দেখিল, রুসীয় জন-নায়কগণ দুর্ব্বল ও অন্তঃসারহীন, আর তাহাদের সবল ও সুদৃঢ় প্রতিদ্বন্দ্বিগণ দেশের জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত—তখনই শ্বেতাঙ্গ জাতির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে তাহাদের পূর্ব্বতন বিশ্বাস আঘাত প্রাপ্ত হইল। বর্ত্তমান যুদ্ধে জর্ম্মণীর দুর্ব্যবহারে ঐ বিশ্বাস আরও দুর্ব্বল হইয়াছে। একে ত রাজ্যতন্ত্র সম্বন্ধে জর্ম্মণ মত-বাদ স্পষ্টতঃ দ্বিধাহীন। তাহার উপর ভারতবাসী যখন দেখিল যে, অভিযানের সময় জর্ম্মণেরা বিজিত দেশের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করে, এবং প্রতিযানের সময় পরিত্যক্ত প্রদেশকে কিরূপে বিধ্বস্ত করে, আর বিসমার্কের শিক্ষা ফ্রান্স, ফ্লান্ডার্স, বেলজিয়ম, পোলণ্ড, সার্ভিয়া প্রভৃতিতে কতটা কার্য্যকরী হইয়াছে, তখন ‘এসিয়ার তুলনায় খৃষ্টিয়ান ইয়োরোপ অনেক শ্রেষ্ঠ’, এই ভ্রান্ত ধারণা একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। দেখা গেল যে, ইয়োরোপ যে সভ্যতার এত বড়াই করে, তাহা বাহ্য চাকচিক্য-মাত্র, তাহার ধর্ম্মও কেবল প্রাণ-হীন বাহ্য অনুষ্ঠানমাত্র। অতএব ইয়োরোপের রণক্ষেত্রে হত ও আহতদিগের বিকট স্তূপ লক্ষ্য করিয়া,এবং নিত্য নূতন ছেদন ও ভেদনকারী যন্ত্রণাদায়ক যন্ত্রের উদ্ভাবনে নিযুক্ত বিজ্ঞানকে দানবিকতায় পরিণত দেখিয়া এশিয়া যদি নিজেদের ধর্ম্ম ও সভ্যতার পক্ষপাতী হয়, তবে কি তাহাকে অপরাধী বলিতে হইবে?

কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহের বহিঃ-কোলাহল অপেক্ষা আর এক সন্দেহ নিবিড়তর ভাবে ভারতবাসীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে যাঁহারা অগ্রণী, তাঁহারা তারস্বরে স্বাধীনতা ও জাতীয়তা সম্বন্ধে যে সকল উচ্চ আদর্শের ঘোষণা করেন, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে, ঘোষকদিগের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ ভারতবাসীর হৃদয়কে আঘাত করিয়াছে। যুক্ত-প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সার জন্ মেষ্টন সে দিন যে বলিয়াছিলেন যে, আজ তিনি ভারতবাসীর মধ্যে যেরূপ সংদিগ্ধ ও প্রত্যয়হীন ভাব দেখিতেছেন, তাঁহার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ঐরূপ ভাব কখনও দেখেন নাই, তাহা অপ্রকৃত নহে। অনেক বৎসর ধরিয়া

ভারতবাসিগণ উপর্য্যুপরি রাজপুরুষ-কৃত প্রতিজ্ঞা ও শপথভঙ্গের মনস্তাপে জর্জ্জরিত হইতেছিল। তাহার উপর এ দেশে রাজনৈতিক নির্য্যাতন অবাধে চলিয়াছে; আর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যে সকল কঠোর আইন প্রচলিত ছিল, এই কয়েক বৎসরে তাহাদের সংখ্যা ও পরিমাণ বেশ বাড়িয়াছে, এবং যদিও সন্ধির পবিত্রতা ও জাতীয়তা রক্ষার জন্য ইয়োরোপে যুদ্ধ চলিতেছে, তথাপি এ দেশে ঐ নির্য্যাতন-নীতির সংকোচ না হইয়া প্রসার বর্দ্ধিত হইতেছে। এই সকল কারণে ভারতবাসীর সন্দেহ ঘনীভূত হইয়াছে। যদি এই সন্দেহ দূর করিতে হয়, তবে সরলভাবে সাহসের সহিত রাজনীতিজ্ঞদিগকে দীর্ঘ প্রত্যাশিত সংস্কার-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। রাজনীতিক ছিটাফোঁটার আর কাল নাই; এখন বিজ্ঞতার সহিত বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন করিবার সময় আসিয়াছে।

যে সকল ব্যাপারের সহিত প্রজার সুখ-স্বচ্ছন্দতার নিকট-সম্বন্ধ, সেই সকল ব্যাপার সম্বন্ধে ইংরেজ-শাসিত ভারত কিরূপ মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছে, এবং তাহার তুলনায় কোনও কোনও ভারতীয় মিত্ররাজ্য কিরূপ দ্রুততর গতিতে উন্নতি করিয়াছে, এ ঘটনাও ভারতবাসীর বিশ্বাসহানির অন্যতম কারণ। ভারতবাসী লক্ষ্য করিয়াছে যে, তাহার স্বদেশীয় রাজা ও সচিবের নেতৃত্বে ঐ উন্নতি সাধিত হইতেছে। সে দেখিতেছে যে, মহীসূরের প্রতিনিধি-সভায় গৃহীত মন্তব্য সকল বিশিষ্টভাবে বিবেচিত হইতেছে, এবং যথাসম্ভব অনুসৃত হইতেছে, এবং বুঝিতেছে যে, আমাদের ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যগণ অপেক্ষা ঐ সভার সভ্যগণ—আইনতঃ না হউক—কার্য্যতঃ বেশী অধিকার পাইয়াছেন। সে দেখিতেছে, ঐ সকল প্রদেশে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, নূতন শিল্পের পোষণ হইতেছে, পল্লী-সমাজ স্বায়ত্ত-শাসনে এবং নিজের দায়িত্ব-বহনে উৎসাহ পাইতেছে, সুতরাং সে বিস্মিত হইতেছে যে, এ কি অপরূপ যে, ভারতবাসীর পঙ্গুতা ইংরাজের দক্ষতা অপেক্ষা কার্য্যকরী হইয়াছে।

হয় ত মোটের উপর ভারতবাসীর পক্ষে ভারতীয় শাসনই সর্ব্বোত্তম।

(ঘ) ভারতীয় বণিকদিগের জাগরণ।

যে সকল শক্তিপুঞ্জের সমবায় নূতন ভারতবর্ষ রচনা করিয়াছে, তাহার মধ্যে বোধ হয় ভারতীয় বণিকদিগের রাজনৈতিক জাগরণ সকলের অপেক্ষা সবল ও শুভদ। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের বোম্বাই শিল্প-সম্মিলনে সার দোরাব টাটা

শিল্প ও রাজনীতির রাখীবন্ধন অভীষ্ট বলিয়াছিলেন। ঐ বন্ধন এখন আগত-প্রায়। এত দিন পর্য্যন্ত বণিকেরা স্ব স্ব ব্যাপার লইয়া নিমগ্ন ছিলেন, কিন্তু এখন যুদ্ধের ফলে তাঁহারা প্রবুদ্ধ হইয়াছেন, এবং বুঝিয়াছেন যে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রবেশ করা দরকার—নতুবা গবর্মেণ্টের কার্য্যপ্রণালী দ্বারা তাঁহাদের সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যে সকল ব্যবসায় জর্ম্মণ-বাণিজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ ছিল, এবং যুদ্ধারম্ভের পর যাহাদের সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা হইল, গবমেণ্ট ঐ সকল ব্যবসায়কে কোনও রূপ সাহায্য করিলেন না। যে সকল নিত্য-ব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্য জর্ম্মণী হইতে আমদানী হইত, যুদ্ধারম্ভের পর সেই সকল পণ্যদ্রব্য এই দেশের কারখানায় তৈয়ার করিবার জন্য কারখানা-স্থাপনের উদ্যোগ হইলে গবমেণ্ট টাকা দিয়া বা অন্যরূপে তাহার কোনও রূপ সহায়তা করিলেন না। যুদ্ধের ফলে যে সকল শিল্পের স্বভাবতঃ বিস্তার হইবার সম্ভাবনা হইল, গবমেণ্ট যুদ্ধের অছিলায় এরূপ কঠোর নিয়ম করিলেন যে, তজ্জন্য সেই সকল শিল্পের প্রসার না হইয়া সঙ্কোচ সাধিত হইল। যখন যুদ্ধের জন্য টাকার বাজার খুব মন্দা হইল, তখন গবমেণ্ট সেই অর্থকৃচ্ছ্র-নিবারণের কোনও উপায় করিলেন না। তাহার ফল এই হইল যে, ও দিকে ইংরেজ দেনদারেরা বিলাত হইতে টাকা পাঠান বন্ধ করিল, সেই জন্য সমৃদ্ধ বণিকেরাও মুদ্রার ঘাট্‌তি অনুভব করিতে লাগিলেন। এ দিকে কেহ কেহ নিজের ইজ্জৎ বজায় রাখিবার জন্য বাধ্য হইয়া প্রচুর লোকসান সহিয়া কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিলেন। কোনও কোনও স্থলে তাঁহারা দ্রব্যের মূল্য বাবত টাকার পরিবর্ত্তে যুদ্ধ-বণ্ড (war bond) লইতে বাধ্য হইলেন। অবশ্য, এই সকল দুর্গতি বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্রে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। বোম্বাইয়ের ধনশালী ও স্বাধীন বণিকদিগকে তত কষ্ট সহিতে হয় নাই, যত মান্দ্রাজের বণিকেরা (যাঁহাদের অভাব অভিযোগের সহিত আমি বেশী পরিচিত আছি) সহিয়াছেন। মান্দ্রাজে প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক ইংরেজ বণিকদের প্রতি পক্ষপাত করাতে, এবং ঐ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদিগের মধ্যে দেশীয় লোক আদৌ না থাকাতে, মান্দ্রাজ প্রদেশের বণিকদিগকে অধিকতর কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর কাগজের দরের ঘাট্‌তি হওয়ায় বণিকদিগের দুশ্চিন্তার কারণ আরও বাড়িয়াছিল। কারণ, যখন জরুরী প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া তাহারা কোম্পানীর কাগজ বাজারে বিক্রয় করিয়াছিল, তখন যে কেবল মূলধনের অপচয় হইয়াছিল, তাহা নহে;

কিন্তু কোম্পানীর কাগজের দর ঘাট্‌তি হওয়ায় সকলের মনে গবর্মেণ্টের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও আতঙ্কের উদয় হইয়াছিল।

গোলযোগের আর একটী কারণ হইয়াছিল এই যে, কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতের জমী ও খনি প্রভৃতি নিম্ন সত্ত বিদেশীয়েরা হস্তগত করিতেছিল, কিন্তু গবর্মেণ্ট সে বিষয়ে উদাসীন ছিলেন।

পশ্চিম উপকূলের নারিকেলের মালার ও নারিকেল-ছোবড়ার ব্যবসায় ভারতবাসীর হস্তচ্যুত হইয়া জর্ম্মণীর হস্তগত হইয়াছিল। যুদ্ধের ফলে এই ব্যবসায় যখন জর্ম্মণীর কবলমুক্ত হইল, তখন ইহা ইংরাজ বণিকের গ্রাসে পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। সুখের বিষয়, টাটা এণ্ড সন্স কোম্পানী মাহেন্দ্রক্ষণে অগ্রসর হইয়া ব্যবসায়টীকে বিদেশীর গ্রাস হইতে রক্ষা করিলেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে মোনাজাইট (monazite) নামক খনিজ দ্রব্যের কারবার (গোলাগুলি প্রস্তুত করিবার ইহা একটা উপাদান) জর্ম্মণেরা একচেটিয়া করিয়াছিল। ভারতীয় অভ্রের খনির অধিকাংশ জর্ম্মণীর হস্তগত হইয়াছিল। অমার্জ্জিত চামড়া বহুল-পরিমাণে জর্ম্মণীতে রপ্তানী হইত। অথচ দেখা গিয়াছিল যে, মহীসূরে ভারতীয় কারখানায় ইয়ুরোপ অপেক্ষা এই মার্জ্জন ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত, এবং অল্পমাত্র সাহায্য পাইলে এই চামড়ার ব্যবসায় খুব একটা লাভজনক ব্যাপারে পরিণত হইতে পারিত। তাহা না করিয়া গবর্মেণ্ট নিজের নির্দ্দিষ্ট দরে প্রচুর-পরিমাণ অমার্জ্জিত চামড়া খরিদ করিতে লাগিলেন, এবং সেই চামড়া মার্জ্জন করিয়া শিল্প-দ্রব্যে পরিণত করিবার জন্য বিদেশে পাঠাইতে লাগিলেন। বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে বড় লাট সাহেব ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তৎপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "ভারতীয় চামড়া-পরিষ্কর্ত্তা-দিগকে প্রচুর অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, চামড়া মার্জ্জন সম্বন্ধে যে সকল পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহার ফল সন্তোষজনক হইয়াছে, এবং ঐ ব্যবসায়ে সফলতার সম্ভাবনা দৃঢ় হইয়াছে। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের পর চামড়া মার্জ্জনের ব্যবসায় প্রচুর প্রসার লাভ করিবে। কিন্তু ইতিমধ্যে যুদ্ধের নির্দ্দিষ্ট হারে চামড়া খরিদ হইবে, এই হুকুম প্রচারিত হওয়ায়, চামড়া-ব্যবসায়ীরা সন্ত্রস্ত হইয়াছেন। কারণ, কেবল যুদ্ধস্থলে ব্যবহারের জন্য নয়, ইংলণ্ডের জনসাধারণকে সস্তা দরে চামড়ার দ্রব্য যোগাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে ইংলণ্ডের সমর-আফিস এই দেশে চামড়া খরিদ করিতেছেন। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, জনসাধারণকে বুট যোগানর সহিত সমর-আফিসের কি সম্বন্ধ?

শুধু যুদ্ধের প্রয়োজনে নয়, যুদ্ধেতর প্রয়োজনেও কি ভারতকে শোষণ করিতে হইবে? যখন ইংলণ্ডের মহাজনদিগের অর্থে নয়, ভারতের ব্যয়ে বিশেষজ্ঞেরা চামড়া-সংস্কার সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেছেন, তখন তাহাদের পরীক্ষা-লব্ধ জ্ঞান ভারতেরই সম্পত্তি হওয়া উচিত, এবং ভারতীয় প্রজার সমৃদ্ধিসাধনেই প্রযুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা না হইয়া ইংরেজ বণিক ও ইংরেজ কারখানার মালিকদিগের উহা দ্বারা শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

যুদ্ধের ফলে ভারতের বিপুল স্বভাবজাত সম্পদের সদ্ব্যবহার করিবার পক্ষে গবর্মেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং সেদিন বড়লাট সাহেব বলিয়াছেন যে, ভারতকে স্বাবলম্ব করিবার জন্য, এবং বিদেশীয় পণ্যদ্রব্যের উপর ভারতের নির্ভর হ্রস্ব করিবার জন্য ঐ সকল সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার করা উচিত। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই অভিপ্রায়ের সমর্থন করি। ভারতবাসীরা অনেক দিন হইতে এই কথাই বলিতেছিল, কারণ, ভারতবর্ষের আবহাওয়া ও মাটীর এতই বৈচিত্র্য যে, আমাদের যে কিছু প্রয়োজন, সমস্তই এ দেশে উৎপন্ন করা যাইতে পারে, এবং খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ফিলিমোর সাহেব যাহা বলিয়াছিলেন, এখনও আমাদের ভূমির উচ্ছিষ্ট দ্বারা সমস্ত পৃথিবী পরিতুষ্ট হইতে পারে।

কিন্তু প্রথমতঃ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী, তাহার পর বৃটিশ গবর্মেণ্ট, এবং সম্প্রতি শোষণশীল সাম্রাজ্যপন্থা বণিক-সম্প্রদায় দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষ কেবল কারু-কার্য্যের উপযোগী উপাদানমাত্র যোগাইবে। সেই উপাদান বিদেশে রপ্তানী হইবে এবং বিদেশী কারখানায়—ঐ কারখানা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশে স্থিত হইলেই ভাল হয়—পণ্যদ্রব্যে পরিণত হইয়া ভারতে আমদানী হইবে, এবং ভারতবাসী তাহাই খরিদ করিবে। অনেক দিন পূর্ব্বে মেকলে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি-হানির সঙ্গে সঙ্গেই বিলাতী বাণিজ্যের অদ্ভুত প্রসার দৃষ্ট হইয়াছিল। আমাদের বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি যদি ভারতীয় কলকারখানার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে পারেন ('ভারতীয়' অর্থে ভারতবর্ষে স্থিত ইংরাজী কলকারখানা নয়) তবে তিনি চিরদিনের জন্য ভারতবর্ষের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়া এক জন বলিয়াছেন যে, ভারতের উচিত,—ভারতবর্ষের বাহিরে ব্যবহারের জন্য চাষের দ্রব্য উৎপন্ন করা; অর্থাৎ, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী যাহা বলিতেন, ভারতবর্ষ অপরের কারখানার উপাদান যোগাইবার জন্য একটা আবাদে পরিণত

হউক। কথাটা যদি অপ্রিয় হয়, তবে বড়লাট বাহাদুর ক্ষমা করিবেন, কিন্তু পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া আমাদের আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। আমরা এ কথা ভুলিব না যে, এক শতাব্দী পূর্ব্বে মধ্যভারতে লৌহের খনি পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেই লৌহ উত্তোলন করিবার কোনও ব্যবস্থাই করা হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, তখন ইংলণ্ডই জগৎকে লৌহ যোগাইয়া প্রভূত লাভবান্ হইতেছিল। সে স্বভাবতই ঐ ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী আসিতে দেয় নাই। এতদিন পরে টাটা কোম্পানী লৌহখনির উদ্ধার করিয়াছে—আজ তাহাদের শেয়ার ৩০৲ টাকার স্থলে ১১৮০৲ টাকায় বিকাইতেছে। টাটারা একটা প্রকাণ্ড কারখানা খুলিয়াছেন, এবং টাটার ইস্পাতের এত কাট্‌তি যে, তাঁহারা যোগাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এই ব্যাপার যদি ১০০ বৎসর পূর্ব্বে আরব্ধ হইত, যদি এত বৎসর ধরিয়া লৌহের কারখানা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তবে কি আজ কলকারখানার জন্য আমাদিগকে ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষা করিতে হইত? উহার অভাবেই ত আমরা নূতন কারখানা খুলিতে পারিতেছি না, পুরাতন কারখানা বাড়াইতে পারিতেছি না, এবং ইংলণ্ডের অনেক কারখানা যুদ্ধের প্রয়োজনে নিযুক্ত থাকায় বাজারে যে সকল পণ্যের অভাব হইয়াছে, তাহাও যোগাইতে পারিতেছি না।

বড়লাট সাহেব সেদিন যথার্থই বলিয়াছেন—'এ ক্ষেত্রে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে কিছু চেষ্টা হইয়াছে, তাহা কদাচ কখন হইয়াছে, স্থায়ী চেষ্টা হয় নাই।' তিনি আরও বলিয়াছেন—"বৈজ্ঞানিক কৃষিকর্ম্ম সম্বন্ধে পরীক্ষা ও প্রদর্শন কার্য্যের ব্যবস্থাপন, এবং ভূতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক খনিজ শিল্পের সাহায্যদান দ্বারা যে আশাপ্রদ ফললাভ হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, অন্যান্য শিল্প—বিশেষতঃ কারু-শিল্পের হিতার্থে ঐরূপ প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিবার সময় আসিয়াছে।" এ প্রসঙ্গে কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বৈজ্ঞানিক কৃষিসম্বন্ধীয় পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানও অনেক স্থলে ভারতের প্রয়োজনে নয়, ইংলণ্ডের প্রয়োজনে প্রযুক্ত হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারতের চরকায় এবং অন্যত্রও ক্ষুদ্র-তন্তু (short stapled) তূলার ব্যবহার। ল্যাঙ্কশায়ার চাহে দীর্ঘতন্তু তূলা—মিশর ও মার্কিনদেশে তাহা যথেষ্ট পাওয়া যাইতেছে না। অতএব ভারতের কৃষিক্ষেত্রের ক্ষুদ্র-তন্তু তূলার পরিবর্ত্তে দীর্ঘতন্তুর চাষ করা হউক। এ কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ আমাদের বেশ হৃদয়ঙ্গম হইল না। যে ইংলণ্ডকে আমাদের আদর্শ বলা হয়, কই, সেই ইংলণ্ডের শিল্পবাণিজ্যের ইতিহাসে ত কখনও দেখি নাই যে, ইংলণ্ড আত্মত্যাগ-ব্রতে ব্রতী

হইয়া নিজের ক্ষতি করিয়া বিদেশের প্রয়োজন যোগাইবার জন্ত আপনার উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকার নির্দ্ধারণ করিয়াছে।

যাহা হউক, যুদ্ধের একটা সুফল এই হইয়াছে যে, ভারতীয় জননায়ক-দিগের চেষ্টায় এত দিনে যাহা হয় নাই, আজ ভারতের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। যুদ্ধের ফলে শিল্প-কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, এবং গোলা বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনে শিল্প সম্বন্ধে সংহত চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছে। ভারতীয় বণিক্‌দিগকে সতর্ক থাকিতে হইবে, যেন শিল্প সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট-কৃত এই সংহতি ও সাহায্যের ফলে তাঁহাদের বর্ত্তমান শোচনীয় তাঁবেদারীর অবস্থা আরও শোচনীয় না হয়। তাহা যাহাতে না হয়, গবর্মেণ্ট যাহাতে আমাদের নিজস্ব হয়, তজ্জন্য শাসন-শক্তিতে তাঁহাদিগকে শক্তিমান্ হইতে হইবে। ভারতীয় বণিক্‌দিগের মধ্যে আজ যে জাগরণ দৃষ্ট হইতেছে, ঐরূপ সম্ভাবনার আতঙ্ক তাহার প্রধান কারণ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দেখুন—কৃষিজাত পণ্য-লব্ধ আয়ের উপর কর ধার্য্য করা হইয়াছিল। চা যদিও কৃষিজাত পণ্য, কিন্তু চা-করেরা প্রধানতঃ ইংরেজ বলিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত চায়ের বিক্রয় লব্ধ অর্থের উপর কর ধার্য্য হয় নাই। যদি এই নীতিই অনুসৃত হয়, এবং ভারতীয় অর্থে পুষ্ট পণ্য-শিল্পের পোষণ দ্বারা ঐ ঐ শিল্প বিদেশীয়দিগের হস্তগত হয়, তবে ভারতবাসীর ভাগ্যে ইংরেজ হাউসওয়ালার অধীনে কেরাণীগিরি ডুবাসগিরি ইত্যাদি ভিন্ন স্বাধীন সওদাগরী কখনও জুটিবে না, এবং দিন দিন প্রতিযোগিতার ফলে ক্ষীয়মাণ বেতনই তাহার জীবিকার সম্বল হইবে।

যদি ভারতবাসীরা এখনও আত্মরক্ষায় উদ্‌যোগী হইতে পারে, তবে শিল্প সম্পর্কে ভারতের ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যময় নহে। এ সম্বন্ধে টোজার সাহেব তাঁহার "বৃটিশ ইণ্ডিয়ার বাণিজ্য" (British India and its trade) নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"তূলা ও পাটজাত পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ এখনই অল্প নহে; উহার প্রসার-বৃদ্ধির এখনও ক্ষেত্র রহিয়াছে। এ দেশে চিনি ও তামাক যথেষ্ট উৎপন্ন হইতেছে, কিন্তু উহাদিগের চাষে ও তৈয়ারীতে চরমোদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত হওয়া উচিত। তৈল-শস্যের রপ্তানী না করিয়া উহা এ দেশেই ভাঙ্গান উচিত, আর কার্পাসের বীজ—যাহার এখন যথাযথ ব্যবহার হইতেছে না, তাহার সদ্ব্যবহার হওয়া উচিত। চামড়া, ও খোলস যাহা এখন প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী

করা হয়, তাহার সংস্কার ও মার্জ্জন অনেক পরিমাণে এ দেশেই হইতে পারে। রেশমী ও পশমী দ্রব্য, যাহা এখন এ দেশে প্রস্তুত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই মোটা জিনিস ; সূক্ষ্ম ও মসৃণ মাল প্রস্তুত করার সুযোগ আছে। রেল-কোম্পানীরা নিজের গাড়ী এ দেশেই প্রস্তুত করে বটে, কিন্তু চাকা, নেমি, অক্ষ প্রভৃতি লৌহ-দ্রব্য বিদেশ হইতে আনীত হয়। সম্প্রতি এ দেশে ইস্পাত অল্পই প্রস্তুত হয়, এবং যদিও লোহা ঢালাইয়ের কারখানা এবং কল প্রস্তুত করিবার কারখানার সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িতেছে বটে, কিন্তু ইহার ভূয়িষ্ঠ বিস্তার সম্ভব। কল ও যন্ত্র প্রায়ই আমদানী করিতে হইতেছে। লক্ষ লক্ষ কৃষক ও কারিকর মোটা রকমের যন্ত্র ব্যবহার করিতেছে। উহার স্থানে ভাল কারিকরের তৈয়ারী মজবুদ যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব। উৎকৃষ্টতর তৈল মাড়িবার কল ও চরকার যথেষ্ট কাটতি হইতে পারে। কাগজের কল ও ময়দার কলের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িতে পারে। তা ছাড়া শেলাইয়ের কল, বাজি, দড়ি, জুতা, জিন, রাশ, ঘড়ি, টেঁক-ঘড়ি, কৃত্রিম ও অকৃত্রিম রং, তাড়িত-উপকরণ, কাচ, কাচের দ্রব্য, চায়ের সিন্দুক, দস্তানা, চাউল, মাড়, দিয়াশলাই, ল্যাম্প, বাতি, সাবান, লিলেন, ছুরি-কাঁচি, হার্ডওয়্যার (hard-ware) ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করিবার প্রশস্ত ক্ষেত্র এ দেশে পড়িয়া রহিয়াছে।" ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ভারতদ্রব্য দ্বারাই ভারতবর্ষের অভাব পর্য্যাপ্তরূপে মিটিতে পারে, এবং সে পূর্ব্বকালের মত উদ্বৃত্ত জিনিসও বিদেশে রপ্তানী করিতে পারে। পক্ষান্তরে, ভারতের আমদানী দিন দিন বাড়িতেছে, এবং যে প্রকারে রপ্তানী চলিতেছে, তাহাতে ভারতবর্ষের উচিতমত সমৃদ্ধি হইতেছে না।

যুদ্ধের পূর্ব্বে আমদানীর হার ক্রমশঃই বাড়িতেছিল ; যুদ্ধের সুরু হইতে উহা ক্রমশঃ কমিতেছে,—নিম্নের তালিকা হইতে এ বিষয় দৃষ্ট হইবে।

খৃষ্টাব্দ	মোট আমদানী	সূতী ও পশমী মাল
১৯১১-১২	৯১৩৮৩২০০ পাউণ্ড	২৮৫৯২০০০ পাউণ্ড
১২-১৩	১০৭৩৩২৪৯০ "	৩৫৫৩৬০০০ "
১৩-১৪	১২২১৬৫২০৩ "	৩৮৭৫৮০০০ "
১৪-১৫	৯১৯৫২৬০০ "	২৮৬৪৩০০০ "
১৫-১৬	৮৭৫৬০১৬৯ "	২৫১৭৫০০০ "

ইহার পূর্ব্বের পাঁচ বৎসরের অঙ্ক হইতেও আমদানীর বৃদ্ধির হার দেখা যাইবে।—

খৃষ্টাব্দ	টাকা
১৯০৬-৭	১৩১৫০৮৫৬৭৬৲
৭-৮	১৬২৭১১৫২৩৪৲
৮-৯	১৪৩৮৯৭৫৭৯৬৲
৯-১০	১৫৫৪৮৩৬২১৪৲
১০-১১	১৬৯০৫৭২৭২৯৲

কিন্তু আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর হার বেশী দেখা যায়। সেই জন্য যুদ্ধের ফলে পাওনা টাকা আদায়ের গোল বাধিয়াছে।

খৃষ্টাব্দ	পাউণ্ড
১৯১১-১২	১৪৭৮৭৯০৬০
১২-১৩	১৬০৮৯৯২৮৯
১৩-১৪	১৬২৮০৭৯১০
১৪-১৫	১১৮৩২৩৩০০
১৫-১৬	১২৮৫৬৬১১

ভারতীয় বণিকগণ জাপানী ব্যবসায়ের অতি দ্রুত প্রসার লক্ষ্য করিয়াছে। তাহারা জানে, জাপানী গবর্মেণ্ট আমদানী-শুল্ক ও অর্থসাহায্য দ্বারা ঐ ব্যবসার পুষ্টিসাধন করে। নিজের দেশে তাহাদিগকে জাপানী প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুঝিতে হয়। এ অবস্থায় যদি তাহারা স্বরাজ চায়, তবে কি তাহা বিস্ময়ের বিষয়? তাহারা দেখিতেছে জাপানী পণ্যে তাহাদের বাজার পরিপূর্ণ, এবং জাপানীরা ঐ মাল কমতি দরে বিক্রয় করিতেছে। এ অবস্থায় হোমরুল না চাহিয়া তাহাদের উপায় কি? হোমরুল হইলে তাহারা সংরক্ষণ-নীতি (protection) অবলম্বন করিয়া বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক বসাইতে পারিবে। ইউরোপীয় বণিক-সভা—যাহারা ভারতবাসীর সম্পর্কিত রাজনীতিক বিষয়ে সর্ব্বদা উদাসীন —সেই সকল সভার আকস্মিক অভ্যুত্থান দেখিয়া ভারতীয় বণিকগণ বেশ বুঝিয়াছেন যে, তাঁহাদের ইংরেজ প্রতিদ্বন্দ্বিগণ পাছে ভারতবাসীর হস্তে শাসন-শক্তি ন্যস্ত হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়াছেন। কারণ, ঐরূপ হইলে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর নগণ্য বণিকগণ যে দিন ভারতবর্ষের প্রভু হইয়াছিল, তদবধি তাহারা যে অন্যায় সুবিধা ও সুযোগ ভোগ করিয়া আসিতেছে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার খর্ব্বতা হইতে পারে। সমানে সমানে যুদ্ধে তাহারা অভ্যস্ত নয়, কাজেই ঐরূপ সম্ভাবনায় তাহারা সন্ত্রস্ত হইয়াছে। তাহারা বিশিষ্ট সুবিধা

চায়—ন্যায় ও সাম্যের তাহারা বিরোধী, কিন্তু সমানে সমানে প্রতিযোগিতা অপেক্ষাও তাহাদের বেশী ভয় হোমরুল বজেটকে। সেই জন্য তাহাদের এত রোষ, এত আতঙ্ক। সেই জন্যই ভারতপ্রবাসী ইংরেজের স্বার্থরক্ষার জন্য সার হিউ ব্রে ভারতে ইংরেজ প্রভুত্বের চিরস্থায়িত্ব চাহিয়াছেন।

ভারতীয় বণিকগণ বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের পর যে বাণিজ্য-যুদ্ধ বাধিবে, সেই যুদ্ধে তাহাদের পরাভব অনিবার্য্য, যদি না ইতিমধ্যে তাহারা নিজের দেশ শাসন করিবার শক্তি নিজের হাতে লইতে পারে। ইউরোপীয় চেম্বার অফ্ কমার্স ও ট্রেড এসোসিয়েসনসমূহের সভ্যগণ যদি ভারতের ব্যবসায় ও শিল্প বাণিজ্যের হর্ত্তা কর্ত্তা হয়েন, তবে ভারতীয় বণিক্ ও ব্যবসাদারগণ অধঃপাতে যাইবে। এত দিন তবু ইংরেজ বণিক্গণ সংহত-ভাবে কার্য্য করিত না। তথাপি গবর্মেণ্টের ইংরাজী ব্যাঙ্কের প্রতি পক্ষপাতের ফলে ভারতীয় বণিক্দিগকে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইত। ইহার উপর যদি তাহাদিগকে বিদেশী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত সংঘ-শক্তির সহিত যুঝিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ সুনিশ্চিত। এ সম্বন্ধে জে, ডব্‌লিউ, রুট্ সাহেব ঠিকই বলিয়াছেন:—"বর্ত্তমান অবস্থায় সমান হারে শুল্ক বসাইয়া যদি ইংলণ্ডকে ভারতের অন্তঃশিল্প ও বহির্বাণিজ্যের নিয়ন্তা করা হয়, তবে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করা হইবে। * * এ কথা মনেও ভাবিবেন না যে, যদি ভারতের শুল্ক-গত বিধিব্যবস্থার ভার ইংরেজ আইন-কর্ত্তাদের করায়ত্ত করা হয়, তবে ইংরেজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া ঐ বিধি ব্যবস্থা প্রণীত হইবে। ভারতের শুল্ক-গত ও বাণিজ্য-গত বিধি-প্রণয়নে অদ্যাবধি ভারতের প্রতি তীব্র ঈর্ষ্যাই মূলাধার।"

রুট সাহেব যে বিপদের আশঙ্কা করিতেছেন, ভারতীয় বণিক্গণ তাহা বেশ লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং ঐ বিপদ্-নিবারণের জন্যই তাঁহারা হোমরুলের পক্ষপাতী হইয়াছেন।

ভারতীয় বণিক্গণ ইহাও বুঝিয়াছেন যে, শাসন-গত স্বরাজ ভিন্ন শুল্ক-গত স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না। শুল্ক-গত স্বাতন্ত্র্যকে বরণ করা এবং শাসন-গত স্বরাজকে প্রত্যাখ্যান করা মূঢ়তার কার্য্য। ভারতীয় রাজস্ব-সচিবের হস্তে যখন বজেট-প্রণয়নের ক্ষমতা আসিবে, তখন তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জলসেচন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ব্যয়ের অঙ্ক অনেক বাড়াইবেন; কারণ, ঐরূপ ব্যয়ে প্রজার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, শক্তির বিকাশ হইবে, এবং ভূমির উর্ব্বরতার বৃদ্ধি

হইবে। তখন রাজস্ব হইতে রেল-নির্ম্মাণের ব্যয় নির্ব্বাহিত না হইয়া ঋণলব্ধ অর্থের দ্বারা ঐ প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইবে। বেতনের হার কমাইয়া ও অন্যত্র ব্যয়-সংকোচ করিয়া শাসনের ব্যয় লঘু করা হইবে। (লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, দশ বৎসরে আমাদের শাসন-ব্যয় ষোল কোটী বাড়িয়াছে।) আয়ের অঙ্কে ভূমির উপর কর কমান হইবে, যেন কৃষক স্বীয় শ্রম দ্বারা স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে পারে। যে সকল পণ্য ভারতের একচেটিয়া (যেমন পাট ও নীল) তাহার রপ্তানীর উপর উচ্চ হারে কর বসান হইবে। ভারতের প্রয়োজন অনুসারে বিদেশী আমদানীর উপরও শুল্ক বসিবে; এবং রাজকীয় সাহায্যপুষ্ট পণ্যের উপর ঐরূপ শুল্কের হার খুব উচ্চ হইবে। বিদেশী মদ্যের উপর শুল্কের হার এত উচ্চ হইবে যে, যেন উহার আমদানী বন্ধ হইতে পারে। (১৯১০।১১ খৃষ্টাব্দে আমদানী-কৃত মদের দাম ছিল ১৮৯৮১৬৬৬।) ঐ বৎসর ভারতে তিন কোটী টাকার খাদ্যসামগ্রীর আমদানী হইয়াছিল। বিলাসের সামগ্রী বলিয়া উহার উপরও উচ্চ হারে শুল্ক বসান হইবে। পাঁচ বৎসরে চিনির আমদানী দশ কোটীর স্থলে ১৪ চৌদ্দ কোটী হইয়াছে। ভারতবর্ষে যাহাতে বেশী চিনি উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিবার জন্য আমদানী-কৃত চিনির উপর উচ্চ হারে শুল্ক বসাইতে হইবে। সূতী বস্ত্রের আমদানী ৩৭ কোটীর স্থলে ৪১ কোটী হইয়াছে, এবং রেশমী বস্ত্রের আমদানী ১½ স্থলে ২½ হইয়াছে; অথচ উভয় জিনিসই ভারতে উৎপন্ন হওয়া উচিত। সম্প্রতি সমর-ব্যয় কমান চলিবে না বটে, কিন্তু ক্রমশঃ প্রাদেশিক সেনা গঠিত হইবে, এবং এ দেশেই বৃহৎ রিজার্ভ স্থাপিত হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যেরূপ হইয়াছিল, এখানেও কিছু দিনের জন্য গোরা সৈন্য রাখা হইবে, কিন্তু 'বল্লকালি' প্রণালী রহিত হইবে, এবং বিলাতে রংরুট-সংগ্রহের ব্যয়-হার হ্রাস করা হইবে।

ভারতের অর্থগত অবস্থার যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে,—কেন ভারতীয় বণিকগণ জাগরিত হইয়াছেন, এবং কেন তাঁহারা হোমরুলের দলে প্রবেশ করিতেছেন।

(৬) ভারতীয় নারীগণের জাগরণ।

প্রাচীন আর্য্য সভ্যতায় নারীদিগের স্থান বেশ উচ্চ ছিল। অনেকে বিবাহ করিয়া গৃহিণী হইতেন—ভগবান্ মনুর ভাষায় গৃহের শ্রী হইতেন। কেহ কেহ অন্দরে থাকিয়া ব্রহ্মবাদিনী হইয়া ব্রহ্মচিন্তায় জীবনযাপন করিতেন। প্রাচীন

যুগে রাণী দময়ন্তী—নল রাজা দ্যূতক্রীড়ায় উন্মত্ত হইলে সচিবেরা সেই সংকটে যাঁহার পরামর্শ লইয়াছিলেন; গান্ধারী, যিনি নৃপতি ও রাজন্ত ভূপতিগণের মণ্ডলীর মধ্যে মদান্ধ পুত্র দুর্য্যোধনকে হিতবাণী শুনাইয়াছিলেন; আধুনিক সময়ে চিতোরের রাণী পদ্মাবতী, মারবাড়ের মধুর স্ত্রী-কবি মীরাবাই, টোড়ার বীর-নারী তারাবাই, আমেদনগরের রক্ষাকর্ত্রী চাঁদবাই, ইন্দোরের প্রসিদ্ধ রাণী অহল্যাবাই—এই সকল এবং আরও অসংখ্য নারীর ইতিহাস ভারতরমণীর শ্রেষ্ঠতার যথেষ্ট নিদর্শন।

কেবল বিগত ৫।৬ পুরুষ ধরিয়া ভারত-নারী আর স্বামীর পার্শ্বচারিণী নহেন—জনহিতকর কার্য্যে আর স্বামীর সহায়তা করেন না। এখনও তাঁহারা পতিপুত্রের উপর যথেষ্ট প্রভুত্ব করেন, কিন্তু সহায়দাত্রী হইবার জন্য যে বিজ্ঞতার প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের নাই। সুশিক্ষা তাঁহাদের মধ্য হইতে কখনই তিরোহিত হয় নাই, তবে পতিপুত্র ইংরাজি-শিক্ষিত সংস্কৃত প্রাকৃতের চর্চ্চা করেন নাই—সেই জন্য পুরুষের শিক্ষা ও নারীর শিক্ষার মধ্যে স্বভাবতঃ একটী ব্যবধান গঠিত হইয়াছে, তাহার ফলে তাঁহারা পুরুষদিগের ব্যাপকতর জীবনের সহিত আগেকার মত আর সহানুভূতি করিতে পারিতেছেন না। এক দিকে স্বামীদিগের লক্ষ্যস্থল প্রসৃত হইতেছে, অন্য দিকে স্ত্রীদিগের লক্ষ্য-স্থল সংকীর্ণ হইতেছে। স্বামীদিগের মধ্যে ধর্ম্মহানি হওয়াতে তাহার প্রতি-ক্রিয়ার ফলে স্ত্রীদিগের ধর্ম্ম-বিশ্বাস অনুদার ও অজ্ঞানবিদ্ধ হইতেছে। পূর্ব্বের মত স্বামী আর স্ত্রীর ধর্ম্মশিক্ষক নাই। স্ত্রীকে এখন ধর্ম্মশিক্ষার জন্য পুরোহিতের শরণাপন্ন হইতে হইতেছে। তাহার ফলে ধর্ম্ম এখন নগ্ন ভক্তিতে পরিণত হইয়াছে, এবং জ্ঞানের শুভ্র জ্যোতিতে আলোকিত না হওয়াতে ঐ ধর্ম্ম সহজেই কুসংস্কারে ও ভাবহীন ক্রিয়া-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অবনত হইতেছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন ধর্ম্মশিক্ষাকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করিবার জন্য একটা অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়, তখন ঐ চেষ্টার সহিত ভারতরমণীরা যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন। কারণ, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরাজি-শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয় যুবকদিগের হৃদয়ে যে নাস্তিক্যের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল, ঐ অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার প্রতীকারের সম্ভাবনা ছিল। বর্ত্তমান যুগে বোধ হয় ঐ অনুষ্ঠানই সর্ব্বপ্রথম ভারতরমণীগণের মধ্যে একটা দেশব্যাপী আগ্রহ ও অনুরাগ উত্তেজিত করিয়াছিল।

তাহার পর ভারতের বাহিরে ভারতবাসীর নির্য্যাতন দেখিয়া ভারতরমণীর

স্বভাবসিদ্ধ সহানুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। পরে যখন দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় বিবাহের পবিত্রতার উপর আক্রমণ করা হইয়াছিল, তখন সেই অত্যাচারের প্রতিবাদ করিবার জন্য তাঁহারা দলে দলে বাহির হইয়াছিলেন।

বঙ্গ-ভঙ্গ বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের তীব্র অসন্তোষ উৎপন্ন করিয়াছিল, এবং তাঁহাদিগের বহির্মুখী হইবার অন্যতম নিদান হইয়াছিল। যখন এক চরমপন্থী সংবাদপত্রের সম্পাদক রাজদ্রোহের জন্য অভিযুক্ত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, তখন ৫০০ শত বঙ্গনারী তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দুঃখনিবেদন দ্বারা নয়, অভিনন্দন দ্বারা আপনাদের সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতেই সদ্‌বংশজাতা বঙ্গনারীর হৃদয়ের পরিচয় জানা যায়।

চুক্তিবদ্ধ শ্রমজীবীদিগের দুর্দ্দশা লইয়া যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারাও ভারতরমণীগণ উত্তেজিত হইয়াছিলেন। কারণ, উহার সহিত নারী জাতির মান অপমান জড়িত ছিল, এবং ঐ উপলক্ষে তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া বড়লাটের নিকট দরবারও করিয়াছিলেন।

এ পর্য্যন্ত যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিলাম, ভারতীয় নারী জাতির জাগরণের বোধ হয় উহাই প্রধান কারণ। কিন্তু ইহার উপর আর একটা গম্ভীরতর কারণ বিদ্যমান ছিল। ভারতমাতার কন্যাগণের হৃদয়ের অন্তস্তলে জননীর বাণী বাজিয়া উঠিয়াছিল। সে বাণী স্বরাজের বাণী, নিজের দেশে রাণী হইবার জন্য ভারতমাতার সহায় হইবার আহ্বান-বাণী তাহাদের হৃদয়ে ধ্বনিত হইয়াছিল। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের স্তন্য-পানে পুষ্ট, রমণীর পূর্ণ আদর্শের উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত ভারত-দুহিতৃগণ ভারত-স্বাধীনতার বৃহৎ চেষ্টায় উদাসীন থাকিতে পারেন নাই, এবং গত কয় বৎসরে স্বদেশ-প্রেমের সন্ধুক্ষিত অগ্নি—যাহা বহু দিন তাঁহাদের হৃদয়ে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল—এবং যে ধর্ম্মকে তাঁহারা প্রাণের সহিত ভালবাসেন, সেই ধর্ম্মের প্রভাবহানিদর্শনে প্রদীপ্ত রোষানল বিদেশী শাসনের প্রতি সহজাত বিরাগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের মধ্যে এক অপূর্ব্ব জাগরণের সঞ্চার করিয়াছিল। ফলতঃ বহুসংখ্যক ভারতীয় নারীর সহানুভূতি-লাভের ফলে হোমরুল-অনুষ্ঠানের শক্তি দশ গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। কারণ, তাঁহারা উহার মধ্যে রমণীসুলভ তিতিক্ষা, আত্মত্যাগ ও নিঃস্বার্থ বীর্য্য আনয়ন করিয়াছেন। আমাদের হোমরুল লীগের ভারত-রমণীগণই শ্রেষ্ঠ রংরুট ও রংরুট-কর্ত্রী। মান্দ্রাজ-রমণীরা আজও গর্ব্ব করেন যে, যখন পুরুষদের শোভাযাত্রা রাজাজ্ঞায় স্থগিত হইয়াছিল, তখন তাঁহাদের

শোভাযাত্রা বন্ধ হয় নাই, এবং মন্দিরে মন্দিরে অনুষ্ঠিত তাঁহাদেরই পূজা অন্তরীণে আবদ্ধ ব্যক্তিদিগকে মুক্তিদান করিয়াছিল।

প্রথমতঃ ভারতের পুণ্যতীর্থের মন্দির সকলে, এবং সেই তরঙ্গ পল্লীগ্রামে পঁহুছিলে গ্রামস্থ মন্দিরসমূহে প্রদত্ত পূজা, প্রার্থনা ও সাধু সন্ন্যাসীদিগের দেশব্যাপী প্রচারকার্য্যের ফলে ধর্ম্মের সহিত স্বরাজ এরূপ একতাসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে যে, ধর্ম্মপ্রাণ ভারতরমণী ও ভারতীয় জনসাধারণের চক্ষে এখন উভয়ের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। উচ্চ বর্ণের ভারতরমণীও পল্লীবাসী নরনারীকে স্বরাজের পক্ষপাতী করিবার ইহাই এ দেশে সুনিশ্চিত উপায়। সেই জন্য আমি বলিতেছিলাম যে, 'স্বরাজ' এই তিনটি অক্ষর এখন একটী মন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

(চ) সাধারণ জনশ্রেণীর জাগরণ।

বর্ত্তমান সময়ের ইহা আর একটী অতি বিস্ময়কর ঘটনা। পূর্ব্বে সাধু-সন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক যে প্রচার ও সমবেত প্রার্থনা প্রবর্ত্তনের কথা বলা হইয়াছে, তাহার ফলে পূর্ব্ব হইতেই জাগরণ আরব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এই জাগরণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বহুবর্ষব্যাপী নিয়ত প্রভাবের দ্বারাই অধিক পরিমাণে সফল হইয়াছে। এই শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণ জনশ্রেণীর সহিত অসংশ্লিষ্ট নহে। এ সম্প্রদায়ের মূল পল্লীজীবনের গভীর প্রদেশে নিহিত, ইহা আমরা ক্রমে আলোচনা করিব। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রায়তরা ইংরাজী আদৌ জানে না বটে, কিন্তু তাহাদের এক রকম বিদ্যা আছে। এই বিদ্যা স্মরণাতীত-কাল হইতে প্রচারিত প্রাচীন কিংবদন্তী, উপাখ্যান, কাহিনী প্রভৃতির সাহায্যে অর্জ্জিত হয়। ভারতীয় রায়ত ধর্ম্মপ্রাণ, কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের বিধানও সে জানে, সে শ্রমশীল ও চতুর। 'সরকার' কে, তাহাতে তাহার কিছু আসে যায় না, তবে সরকারের যে কর্ম্মচারী কর আদায় করিতে আসে, এবং তাহার জমীতে হস্ত-ক্ষেপ করিতে আসে, তাহার সম্বন্ধে তাহাকে বিশেষভাবে ভাবিতে হয়। প্রাচীনকালে পঞ্চায়েত গ্রামের সমুদয় কার্য্য পরিচালনা করিতেন, তখন রায়তের অবস্থা ভাল ছিল, সে সন্তুষ্টচিত্তে দিনযাপন করিত, রাজার কর-আদায়কারী আসিলে বা সৈন্যগণ গ্রাম আক্রমণ করিলে তাহার অবস্থার কিছু ব্যতিক্রম হইত। এই সমুদয় ব্যতিক্রম, অনাবৃষ্টি বা বন্যার মত, অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক দুর্বিপাক। গ্রামে লুণ্ঠন হইলে, বা শত্রুরাজা গ্রাম আক্রমণ

করিলে, প্রজাগণ ইহা বেশ অনুভব করিত যে, তাহাদের রাজা যেমন অসুবিধা ভোগ করিতেছেন, তাহারাও সেইরূপ অসুবিধা ভোগ করিতেছে; আর যে কর সংগৃহীত হইতেছে, তাহার সুবিধা রাজাও যেমন উপভোগ করিতেছেন, তাহারাও সেইরূপ উপভোগ করিতেছে। কিন্তু এখন কি হইয়াছে? এক চেতন লৌহযন্ত্রের নিষ্পেষণে তাহারা জর্জ্জরিত, পূর্ব্বে শাসন-যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে যে সহৃদয় মানবতার সম্বন্ধ-বন্ধন ছিল, এখন আর তাহা নাই।

"হোমরুলে"র কথা গ্রাম্যজীবনের মধ্য দিয়া রায়তকে স্পর্শ করিয়াছে—বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থা তাহাকে যে কত প্রকারে ক্লিষ্ট করিতেছে তাহা কৃষির অবস্থা-বর্ণনার সময় নির্দ্দেশ করিব। নির্দ্দিষ্ট নগ্‌তি খাজনা দেওয়ার যে কড়াকড়ি বিধান, তাহাতে সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে—"শস্য যেমন উৎপাদিত হইবে, রাজাকে তাঁহার অংশ পরিমাণমত আদায় দিব" এই বিধানের পরিবর্ত্তে পুনঃ পুনঃ জমীর মাপ ও খাজানা নির্দ্দেশের ব্যবস্থায় বেশী খাজনা দিবার জন্য তাহাকে মহাজনের নিকট টাকা ধার করিতে হয়, এই ব্যবস্থায় সে ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে প্রাচীন পঞ্চায়েত-প্রথা আবার ফিরিয়া পাইতে চায়। সে চায় যে, তাহার গ্রামের সমুদয় কার্য্য তাহার ও তাহার গ্রামবাসিগণের দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রাচীন সমাজের সুনিপুণ সেবকগণের স্থান অধস্তন রাজকর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। এই সমুদয় রাজকর্ম্মচারিগণের অত্যাচার হইতে সে পরিত্রাণ পাইতে চায়।

সাধারণ জনশ্রেণীর এই জাগরণ যে সমুদয় কারণের সাহায্যে সাধিত হইয়াছে, তাহার তালিকা হইতে যৌথ-সমিতির আন্দোলনের প্রভাব এবং গ্রামের ও গ্রামবাসীর স্বাস্থ্যবিধান ও অন্যান্য সাধারণের হিতকর ব্যাপার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণের গ্রামে যাতায়াতের প্রভাবকেও বাদ দেওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত মোরল্যাণ্ড ও শ্রীযুক্ত ইউয়িং, "কোয়ার্টার্লি রিভিউ" পত্রে লিখিত, প্রবন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন;—

"প্রধানতঃ যৌথসমিতির আন্দোলনের দ্বারা সমবেতভাবে কার্য্য করিবার শক্তির যে উন্নতি ও বিকাশ হইয়াছে, তাহার সহিত বর্ত্তমান সময়ের কৃষকগণের মনোভাবের পরিবর্ত্তন জড়িত রহিয়াছে। গত দশ বৎসরে যে সফলতা হইয়াছে, ইহাই তাহার স্থায়ী ফল, এবং যাঁহারা কৃষির সংস্কার ও উন্নতিকামী, তাঁহারা যে আজ কাল আশাময় বিশ্বাসের সহিত ভবিষ্যতের কল্পনা করিতে পারেন, এইটিই তাহার প্রধান ভিত্তিস্থল।"

দেশের নানা স্থানে সভাসমিতির কার্য্য এখন সর্ব্বসাধারণের কথিত ভাষায় পরিচালিত হয়, বহুসংখ্যক রায়ত দলে দলে এই সকল সভাসমিতিতে উপস্থিত হয়, এবং স্থানীয়-ব্যাপার-সংক্রান্ত যে সমুদয় কার্য্যকরী আলোচনা হইয়া থাকে, তাহাতে যোগদান করে। এখন তাহারা আশার সহিত বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, এই যে বৃহৎ জাতীয় আন্দোলন, তাহারাও ইহার অংশী, এবং তাহাদেরও ভাল দিন আসিতেছে।

উপেক্ষিত জাতিসমূহও আশালোকের স্পর্শ অনুভব করিয়াছে, এবং তাহাদের নত-শির উত্তোলিত করিতেছে। ক্রমেই অধিক হইতে অধিকতর স্পষ্টভাবে তাহাদের জননী জন্মভূমির গৃহপ্রাঙ্গণে তাহারা তাহাদের স্থান দাবী করিতেছে। কোনও কোনও আন্দোলন তাহারা আপনা-আপনিই সৃষ্টি করিয়াছে, আবার কোনও কোনও আন্দোলন উচ্চতর জাতিগণের দ্বারা আরব্ধ হইয়াছে। এই সমুদয় আন্দোলন তাহাদের মধ্যে একটা আত্মসম্মান-বোধ উদ্দীপিত করিতেছে। ব্রাহ্মণেরা আজ জাগ্রত হইয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহারা বহুকাল তাঁহাদের কর্ত্তব্যকর্ম্মে হেলা করিয়াছেন; এইরূপ বুঝিয়া তাঁহারা এই সকল উপেক্ষিত জাতিকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এখন বৎসরের পর বৎসর এই সমুদয় উপেক্ষিত জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে।

আজ উন্নত জাতিগণ বুঝিতেছেন যে, তাঁহারা যেমন কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তেমনই ফল ফলিয়াছে; তাই ন্যায়ের বিধানে সরকারী ও বেসরকারী ইউরোপীয়গণ এই সমুদয় জাতি যাহাতে "হোমরুল"এর বিরোধী হয়, সে জন্য তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন। এই সমুদয় উপেক্ষিত জাতি এত দিন যে ঘৃণার সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই ঘৃণার উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে বলা হইতেছে যে, যদি "ব্রাহ্মণ-শাসন" আবার ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহারা আবার সেই ভাবে ঘৃণিত হইবে। কুড়ি বৎসর অগ্রে এবং তাহারও পূর্ব্বে আমি সাহসের সহিত হিন্দু-সমাজকে এই আসন্ন বিপদের কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলাম। উপেক্ষিত জাতিগণকে অবহেলা করা হইয়াছিল—তাহারা দেখিতেছে যে, খৃষ্টান অথবা মুসলমান হওয়া তাহাদের পক্ষে লাভজনক, তাহাতে তাহাদের সামাজিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়। এই যে ব্যাপার, ইহার ভিতর যে বিপদ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সে বিপদের কথাই আমি বলিয়াছিলাম। সেই অবধি কিছু কিছু কার্য্য হইয়াছে, কিন্তু যে সিন্ধুর প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে

বিন্দুমাত্র হইয়াছে। অবশ্য তাহারা বেশ ভাল করিয়াই জানে যে, কেবল উচ্চতম জাতিগুলিই নহে; সকল জাতিই তুল্যরূপে অপরাধী। কিন্তু সে সান্ত্বনা ত সান্ত্বনা নহে, ইহাও দুঃখের কথা। বড়ই সুখের বিষয় এই যে, তাহাদের মধ্যে এখন বহুসংখ্যক লোক অতীতকে ভুলিয়া যাইতে ইচ্ছুক, এবং স্বদেশবাসী সকলের জন্য, ভবিষ্যতের জন্য সমবেতভাবে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক। মাতৃভূমির প্রত্যেক ভক্তসন্তানের এখন এই সমুদয় উপেক্ষিত সন্তানগণকে জননীর সাধারণ গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসা একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত গান্ধীর সঙ্কল্প অতি চমৎকার। জাতীয় মহাসমিতি ও মুসলমান-সমিতির শাসন-সংস্কারের প্রস্তাবের সমর্থনকল্পের জন্য এক অতি বৃহৎ আবেদন-পত্র প্রস্তুত হউক, এবং এই প্রস্তাবের তাৎপর্য্য সর্ব্বত্র বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়া লোকের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হউক। এই চেষ্টার দ্বারা অতি সুন্দর রাজনীতিক প্রচারকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। সকলে বুঝিতে পারে, এমন সাহিত্য খুব বিস্তৃতভাবে বিতরণ করিয়া মান্দ্রাজ প্রদেশে ক্ষেত্র বেশ সুন্দররূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রচার-সমিতি সমগ্র প্রদেশে দেশের প্রচলিত ভাষায় হোম-রুলের সরল ব্যাখ্যা সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছে। গত বৎসর এই ভাবে গ্রামে গ্রামে কার্য্য করায় এই ফল হইয়াছে যে, প্রায় দশ লক্ষ স্বাক্ষর সংগৃহীত হইয়াছে। এই স্বাক্ষর দুইটি করিয়া লওয়া হইয়াছে, কাজেই "হোমরুলে"র পক্ষপাতী বহুসংখ্যক লোকের নাম আমাদের নিকট আছে—এই লোকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে, এবং ভবিষ্যৎ স্বাধীনতালাভের যাত্রীর বিরাট দল গঠিত হইবে।

ভারতবর্ষ কেন 'হোমরুল' চায়?

দুইটি কারণে ভারতবর্ষ 'হোমরুল' চায়। একটি কারণ অন্তরঙ্গ, তাহা প্রাণের কথা; আর একটি কারণ অত্যাবশ্যক নয়, কিন্তু খুব গুরুতর। প্রথম কারণ এই যে, স্বাধীনতা প্রত্যেক জাতির জন্মসিদ্ধ দাবী; দ্বিতীয়তঃ, ভারত-বর্ষের যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থ, এখন তাহা ভারতবর্ষের সম্মতি ব্যতীত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের করতলগত, এবং ভারতবর্ষের নিজের সম্পদ্, তাহার নিজের যে সমস্ত প্রধান প্রধান অভাব, তাহা পূরণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় না। কেবলমাত্র এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সমরবিভাগের জন্য ভারতের যে অর্থ ব্যয় হয়—ভারতরক্ষার জন্য নহে, সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে,—তাহার তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্যয় কত নগণ্য?

(১) অন্তরঙ্গ হেতু।

(ক) জাতি কাহাকে বলে?

প্রত্যেক জাতির আত্মসম্মান ও মহত্ত্বের জন্য স্বায়ত্তশাসন আবশ্যক। বৈদেশিকের শাসন শাসিত জাতিকে বিকলাঙ্গ করে, তাহার চরিত্রকে অবনত করে, এবং তাহার শক্তিকে খর্ব্ব করে। অস্ত্র-আইনের দ্বারা কি না অনিষ্ট ঘটিয়াছে? জাতীয় মহাসমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে রাজা রামপাল সিংহ বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজ-শাসনে দেশের যে সমস্ত সুবিধা হইয়াছে, তাহা এক দিকে, আর অস্ত্র-আইনের অনিষ্টকারিতা আর এক দিকে রাখিয়া ওজন করিলে ঐ অনিষ্টকারিতাই অধিক হইবে। অস্ত্র-আইন ভারতের মনুষ্যত্বকে দুর্ব্বল ও বিকৃত করিয়াছে। রাজা রামপাল সিংহ আরও বলিয়াছিলেন, "এই বিধান আমাদের প্রকৃতিকে অবনত করিয়াছে, নিয়তভাবে আমাদের সামরিক শক্তিকে চূর্ণ করিয়াছে, সৈনিক ও বীরের জাতিকে ভীরুস্বভাব মসীজীবী মেষপালে পরিণত করিয়াছে। আমরা এই বিধানের প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে পারি না।" মানুষ সর্ব্বদা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চলা ফেরা করিতে পারে না বলিয়া যে এরূপ হইয়াছে, তাহা নহে; ইংলণ্ডেও কেহ সর্ব্বদা অস্ত্র লইয়া বেড়ায় না—কিন্তু দেশবাসীর অস্ত্র-ব্যবহারের অধিকার কাড়িয়া লওয়ায় এইরূপ হইয়াছে। স্বাধীনতা ব্যতিরেকে কোনও জাতি বা কোনও ব্যক্তিবিশেষ তাহার শক্তির পূর্ণ বিকাশ-সাধন করিতে পারে না। ভারতবর্ষ ছাড়া এ কথা সর্ব্বত্রই স্বীকৃত। ম্যাট্‌সিনি যথার্থই বলিয়াছেন—"জগদীশ্বর তাঁহার চিন্তার একটী লিপি প্রত্যেক শিশুর দোল্‌নার উপর লিখিয়া রাখিয়াছেন। সেইটীই তাহার জীবনের বিশিষ্ট পরমার্থ। তাহার অপলাপ হইতে পারে না। অবাধে তাহার বিকাশ না হইলেই নয়।"

কারণ, জাতি বলিতে কি বুঝায়? এক একটি জাতি ব্রহ্মরূপ অগ্নির এক একটি স্ফুলিঙ্গ—পরমেশ্বরের একটি একটি বিশিষ্ট অংশ জগতের মধ্যে নিঃশ্বসিত হইয়া বহুসংখ্যক নরনারী ও শিশুকে এক জনসংঘে গ্রথিত করিয়া এক একটি জাতিরূপ শরীর গ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক জাতির গুণসমূহ, তাহার শক্তি-সমূহ, এক কথায় তাহার প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা তাহার প্রাণভূত সেই ঐশ-জীবনের অংশের উপর নির্ভর করে—সেই ঐশ-জীবন উহাকে আকৃতিদান

একত্বে পরিণত করিতেছে। জাতীয় ভাবের ইন্দ্রজাল একত্ববুদ্ধি—একটী বিশেষ ভাব আশ্রয় করিয়া পৃথিবীর সেবা করা, যে বিশেষ ভাব রক্ষা করিবার জন্য ইহার প্রকৃতিগত বিশিষ্টতার প্রয়োজন আছে—সেই বিশেষ-ভাবে বিশ্ব-মানবের সেবা করাই জাতীয় জীবনের উপযোগিতা ও সার্থকতা। ইহাকেই ম্যাট্‌সিনি তাহার "বিশিষ্ট পরমার্থ" বলিয়াছেন—জাতির জন্মকালেই ঈশ্বর তাহাকে সেই কর্ত্তব্যভার অর্পণ করিয়াছেন। ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের পরমার্থ; পবিত্রতার ভাব পারস্যের, বিজ্ঞান মিশরের, সৌন্দর্য্য গ্রীসের, বিধি রোমের বিশিষ্ট পরমার্থ। কিন্তু মানবজাতির পূর্ণাঙ্গ সেবা করিতে হইলে প্রত্যেক জাতি নিজের আত্মপ্রকৃতির অনুবর্ত্তন করিয়া বিকাশ লাভ করিবে, নিজের ক্রমবিকাশ-সাধনের ব্যবস্থা তাহাকে নিজের হাতেই লইতে হইবে। সে যাহা—ঠিক তাহাই হইবে, অন্য কিছু হইবে না। একটী জাতির যাহা বিশ্বমানবকে দিবার আছে, তাহা সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই সেই জাতির বিশিষ্ট জাতীয়তা যদি বিকৃত বা বিকাশে বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে সমগ্র বিশ্বেরই ক্ষতি।

(খ) স্বায়ত্তশাসনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা।

এই কারণে কোনও জাতি যখন স্বাধীনতার জন্য বা স্বায়ত্তশাসনের জন্য একান্ত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, তখন সেই আকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র স্বার্থ-পরতা হইতে উদ্ভূত অধিকতর সুখ-সম্ভোগের অধিকার লাভ করিবার দাবী নহে। এমন কি, তাহাও যদি হয়, তাহা হইলেও তাহাতে কোনও দোষ নাই; কারণ, সুখ বলিলে জীবনের পূর্ণতা বুঝায়, এবং সেই পূর্ণতার উপভোগ একটি ন্যায্য দাবী। কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের দাবী বিশ্বমানবের সেবার জন্য নিজের প্রকৃতির বিকাশসাধনের দাবী। এই দাবী অন্তরতম আধ্যাত্মিকতার দাবী—নিজের যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পদ, তাহাই বিশ্বকে দান করিবার যে সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা, সেই আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। কাজেই বিপদরাশি ইহাকে দলন করিতে পারে না, ভ্রূকুটী ইহাকে ভীতিকাতর করিতে পারে না, অধিকতর সুখ-সম্ভোগের প্রলোভন ইহাকে তাহার স্বাধীনতার দাবী পরিত্যাগ করাইতে পারে না। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী উক্তির কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া এ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে বলিতে হয় যে, সে তীব্র আকাঙ্ক্ষার সহিত হুঙ্কার করিয়া বলে, "একটি জাতি যদি সমগ্র পৃথিবী লাভ করে, কিন্তু

তাহার বিনিময়ে তাহার আত্মাটী হারায়, তাহাতে তাহার লাভ কি? তাহার আত্মার বিনিময়ে একটী জাতিকে কি দান করিবে? দুঃখ কষ্টই ভাল, যদি তাহার সহিত স্বাধীনতা পাই, ভোগ বিলাসের সঙ্গী দাসত্বে প্রয়োজন নাই।” ‘হোমরুল’-আন্দোলনের ইহাই প্রাণের কথা—কাজেই ইহাকে দমন করা যায় না, বিনাশ করা যায় না, ইহা সনাতন ও চিরতরুণ। দক্ষতার লোভ দেখাইয়া আমলা-তন্ত্র—তাহার জন্মসিদ্ধ দাবী—কখনই ছাড়াইতে পারা যাইবে না।

(গ) জাতীয় বিকাশের অবরোধ।

দেশবাসিগণের দৈনন্দিন জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিলে, প্রত্যেক পুরুষ, প্রত্যেক নারী ও প্রত্যেক শিশুর চরিত্র যে বৈদেশিক শাসনের দ্বারা অধঃপাতিত ও দুর্ব্বলীকৃত হইতেছে, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।—এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারত-বাসিগণ বড়ই বেদনার সহিত ইহা অনুভব করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হন।

সরকারী কার্য্যে দেশবাসীর নিয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন—“বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির ফলে আমাদের জাতি ক্রমশঃ বামন হইয়া যাইতেছে। চিরজীবন আমাদিগকে হীনতার আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিতে হইতেছে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা প্রাংশুতম, তাঁহাদিগকেও নত হইয়া চলিতে হইতেছে—নহিলে শাসননীতির প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। যে উর্দ্ধমুখী প্রেরণা ইংলণ্ডের ইটন বা হ্যারো বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্র অনুভব করিতে পারে—এবং যাহার প্রভাবে এক দিন এক জন গ্লাড্‌ষ্টোন্‌, এক জন নেল্‌সন, বা এক জন ওয়েলিংণ্টন হইবে, এই উচ্চ আশায় অনুপ্রাণিত হয়, সে ভাবের আস্বাদে বঞ্চিত করা হইয়াছে। আমাদের তাহাতে অধিকার নাই। (বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির অধীনে আমাদের মনুষ্যত্ব যে পরিপূর্ণ উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ, আমরা সে উন্নতি লাভ করিতে পারি না। স্বায়ত্তশাসনভাগী জাতিসমূহ নৈতিক জীবনের যে মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারে, আমাদের তাহা অনুভব করিবার উপায় নাই। একেবারে অব্যবহারের ফলে আমাদের রাজ্য-শাসনের ক্ষমতা, আমাদের যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে লোপ পাইবে; তাহার পর পরের জন্য কাঠ কাটা আর জল তোলার বৃত্তি আমাদের ভাগ্যে চিরস্থায়ী হইয়া উঠিবে।”

মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুও ঠিক এই ভাবেরই কথা বলিয়াছেন—“আমলা-তন্ত্র শাসনপদ্ধতি, যাহা বিদেশ হইতে আমদানী করা লোকের দ্বারা

চালিত—যাবতীয় শক্তি তাহাদেরই হাতে কেন্দ্রীভূত, যাবতীয় দায়িত্ব ভার তাহাদের উপরই ন্যস্ত; এই ব্যবস্থা ভারতের আত্মার উপর একটা মরণের বোঝার মত চাপিয়া আছে—আমাদের উদ্ভাবন-শক্তি একেবারে লুপ্ত করিয়া দিতেছে—মাথা খাটাইতে হয় না বলিয়া আমরা অধঃপাতে যাইতেছি, কর্ম্মশক্তির স্নায়ুগুলি চৈতন্যশূন্য হইয়া পড়িতেছে—এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ব্যাপার এই হইতেছে যে, ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপে আমাদের আত্মসম্মান-বোধ একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।”

কুপার্স হিল্ কলেজের ছাত্রগণের প্রতি লর্ড সলসবরীর উপদেশবাণী এই প্রসঙ্গে বেশ সার্থক,—“শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ যদি শাসিতগণের হীনতাবোধ ও মনস্তাপের দ্বারা কলুষিত হয়, তাহা হইলে সে শাসন-ব্যবস্থা কখনই স্থায়িরূপে নিরাপদ নহে। যাহারা এ দেশ ছাড়িয়া ভারতবর্ষ শাসন করিতে যাইতেছে, তাহাদের হৃদয়ে আমি এই উপদেশটুকু বিশেষভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে চাই, তাহারা যদি ঐ ভাবে কাজ করে, তাহা হইলে তাহারাই ইংলণ্ডের ভয় করিবার মত একমাত্র শত্রু। তাহারাই ইচ্ছা করিলে ইংলণ্ডের ভবিষ্যতের ভারত-শাসনের মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারে।

এই বিপদের কথা আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি। ভারতবাসিগণের আত্মসম্মানবোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, ইদানীং ঐ বিপদ আরও বাড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের এ দেশে সত্যগোপনই শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচিত হয়।”

জাতীয় বিকাশের এই অবরোধ শিশুদিগের শিক্ষাদান হইতেই আরব্ধ হয়। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় ইংরেজ ও ভারতবাসী শিক্ষকের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, কলেজেও তাহাই। ছাত্রেরা দেখিতে পায়, প্রথম শ্রেণীর ভারতবাসিগণকে অতিক্রম করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর অপরিপক্ক বিদেশী উচ্চপদ পাইতেছে। বিদেশী ভিন্ন কাহারও কলেজের অধ্যক্ষ হইবার অধিকার নাই,ভারতের ইতিহাস অপেক্ষা বিদেশের ইতিহাস অধিক প্রয়োজনীয়। ইংলণ্ডের গ্রাম সম্বন্ধে যিনি কিছু লিখিয়াছেন, ভারতের অর্থনীতিশাস্ত্র পড়াইবার গুণ তাঁহার আছে। ইস্কুলের ও কলেজের সমস্ত বায়ুমণ্ডল বৈদেশিকের প্রাধান্যের নিদর্শনে পরিপূর্ণ—এমন কি, অধ্যাপকেরা যখন এ কথা প্রকাশ করিয়া নাও বলেন, তখনও তাহা অনুভব করা যায়। কি শিক্ষা দেওয়া হইবে, শিক্ষাবিভাগ তাহা নিয়ন্ত্রিত করিবেন—বিদেশের আদর্শে ইহা স্থিরীকৃত হয়—এবং ইহার উদ্দেশ্য—বৈদেশিকের স্বার্থ-সাধন, স্বদেশের নহে। স্বদেশপ্রেমিক রাজনীতিক—দায়িত্ববোধসম্পন্ন সামাজিক

প্রস্তুত করা ইহার উদ্দেশ্য নহে, বেশ পোষ-মানা সরকারী কর্ম্মচারী প্রস্তুত করাই ইহার উদ্দেশ্য। উন্নত তেজস্বিতা, সাহস, আত্মসম্মানবোধ এ সকলে উৎসাহ দেওয়া হয় না। বেশ পোষ-মানা 'গো-বেচারা' হওয়ার গুণই ছাত্রদিগের মধ্যে বেশ ভাল গুণ বলিয়া বিবেচিত হয়। দেশের জন্য গর্ব্ববোধ, দেশহিতৈষণা, উচ্চাভিলাষ, এ সমস্ত বিপজ্জনক বলিয়া বিবেচিত হয়; ভারতবর্ষীয় আদর্শসমূহের পরিবর্ত্তে বিলাতী আদর্শসমূহের গুণ-কীর্ত্তন করা হয়; বৈদেশিক শাসনের সুফল এবং নিজেদের কার্য্য-পরিচালনায় ভারতবাসীর অক্ষমতা—সকল সময়েই উপদিষ্ট হয়। এই প্রকারে যে সমুদয় বালক শিক্ষালাভ করে, তাহারা যখন বড় হয়, তখন তাহারা মতলব-বাজ ও চাটুকার হইয়া পড়ে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাহারা যখন দেখে যে, তাহাদের ন্যায়সঙ্গত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিফল হইতেছে, তখন অত্যন্ত স্বার্থপর হইয়া পড়ে, এবং সাধারণের সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে আদৌ বিবেচনা করে না।—তাহারা যে হীন, এই কথাটা, তাহাদের হৃদয় যখন কোমল থাকে, সেই সময়ে তাহাদের হৃদয়ে এমন করিয়া মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হয় যে, তাহারা সেই জিনিসটা অনুভবই করিতে পারে না, যাহাকে এস্‌কিথ সাহেব "বৈদেশিক শাসনের অসহনীয় অবমাননা" বলিয়াছেন।

(ঘ) ভারতবর্ষের দাবী।

এই শাসন ভাল কি মন্দ, ইহা আদৌ বিচার্য্যই নহে। ইংলণ্ডে ইংরাজ-শাসনের সাফল্য অপেক্ষা জর্ম্মণীতে জর্ম্মণ-শাসনের সাফল্য ঢের বেশী। জর্ম্মণরা ভাল খাইতে পাইত, তাহাদের আমোদ-প্রমোদ ও বিশ্রামের অবকাশও অধিক। ইংলণ্ড অপেক্ষা সেখানে দারিদ্র্যের পেষণও কম। কিন্তু তাই বলিয়া কি কোনও ইংরেজ ইচ্ছা করে যে, ইংলণ্ডের যত বড় বড় পদ জর্ম্মণরা আসিয়া দখল করুক! কেন তাহা করে না? কারণ এই যে, বৈদেশিক শক্তির দাসত্ব যতই ভাল হউক, স্বাধীন মানবের ধর্ম্মসঙ্গত আত্মসম্মানবোধ ও মহত্ত্ব-বোধ তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী না হইয়া থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভে মিষ্টার এস্‌কিথ্ বলিয়াছিলেন,—এ প্রকারের অবস্থা "ধারণাতীত এবং অসহনীয় হইবে।" আচ্ছা, তাহা হইলে এই পদ্ধতি এ কালে এই ভারতবর্ষে একমাত্র 'ধারণাযোগ্য' পদ্ধতি হইল কিরূপে? কেন সমুদয় ভারতবাসী কর্ত্তৃক ইহা 'অসহনীয়' বলিয়া অনুভূত হইবে না? কারণ এই যে, শিশুকাল হইতে এই ভাবের মধ্যে লালিত পালিত

হওয়ায়, 'সাহেব লোকেরা স্বভাবতঃই আমাদের অপেক্ষা বড়', এই ধারণা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে।

ইংরেজ-শাসনে ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট এই হইয়াছে যে, ইহা স্বাধীন মানবমাত্রেরই সাবলম্ব ও আত্মস্থ হইবার যে সহজাত অধিকার, তাহা হইতে ভারতবাসিগণকে বঞ্চিত করিয়াছে। ভারতবর্ষীয় পরিচ্ছদ, ভারতবর্ষীয় খাদ্য, ভারতীয় জীবনযাত্রা-পদ্ধতি, ভারতীয় আচার-নিয়ম, এ সমস্তই নিম্নস্তরের বলিয়া বিবেচিত হয়; ভারতের মাতৃভাষা ও ভারতের সাহিত্যের দ্বারা লোকে পণ্ডিত হয় না। ভারতবাসিগণ ও ইংরেজগণ ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া ধরিয়া লন যে, প্রত্যেক জাতির যাহা স্বাভাবিক অধিকার, ভারতবাসীদের তাহা নাই। ভারতবাসিগণ তাহাদের দেশের শাসনের সমগ্র অধিকার দাবী না করিয়া দেশ-শাসনে আর একটু বেশী অধিকার ভিক্ষা করে, এবং তাহাদিগকে কিছু বর বা সুবিধা দিলে ইংরেজ আশা করে যে, তাহারা কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে। যেন বৃটনেরই অধিকার—সে কি দিবে। সমস্ত ব্যাপারই উদ্‌ভ্রান্ত, বিপর্য্যস্ত ও অযৌক্তিক। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, ভারতের চক্ষু খুলিতেছে। ভারতের অধিবাসিগণের মধ্যে এখন লক্ষ লক্ষ লোক উপলব্ধি করিয়াছে যে, তাহারাও মানুষ, নিজের দেশে মানুষমাত্রেরই যে স্বাধীনতার অধিকার, তাহা তাহার আছে, তাহার নিজের দেশের কাজকর্ম্ম পরিচালন করিবার অধিকার তাহার আছে। আর ভারতবর্ষ জানু পাতিয়া বসিয়া বরভিক্ষা করিতেছে না, এখন পায়ের উপর দাঁড়াইয়া তাহার অধিকার দাবী করিতেছে। আমি এই সব প্রচার করি বলিয়া ভারতপ্রবাসী ইংরাজেরা আমাকে ভুল বোঝে, এবং আমাকে রাজদ্রোহী বলে; আমি এই সব শিক্ষা দিয়াছি বলিয়াই আজ আমি এই জাতীয় মহাসমিতির সভানেত্রী।

মনে হইবে যে, এ ভাষা বড় তীব্র; কারণ, স্পষ্ট সত্য কথা ভারতবর্ষে সাধারণতঃ বলা হয় না। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রত্যেক ইংরাজ নিজের দেশের জন্য এইরূপ অনুভব করে, এবং ভারতবর্ষে প্রত্যেক ভারতবাসীর স্বদেশের জন্য এইরূপ অনুভব করা উচিত। এই সেই স্বাধীনতা, যাহার জন্য মিত্রশক্তিপুঞ্জ যুদ্ধ করিতেছেন—ইহারই নাম প্রজাতন্ত্র, ইহাই এ যুগের কালশক্তি। ইহা ঠিক তাহাই, যাহা প্রত্যেক প্রকৃত ইংরাজ যেমন দাবী করিবে, ভারতবর্ষ অমনি ইহা ভারতের ন্যায্য দাবী বলিয়া অনুভব করিবে। ভারতবর্ষ যখন এই অধিকার পাইবে, তখন ভারতবর্ষ ও গ্রেটব্রিটেনের সম্বন্ধ-বন্ধন পরস্পরের প্রতি প্রেম ও

সেবা-বিনিময়ের স্বর্ণতন্তুতে পরিণত হইবে—বৈদেশিক দাসত্বের লৌহরজ্জু তখন খসিয়া পড়িবে। আমরা একত্র পাশাপাশি বাস করিব, এবং কাজ করিব, কোনরূপ অবিশ্বাস বা অপ্রীতি থাকিবে না—একই লক্ষ্য লইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে যেমন কাজ করে, ঠিক সেইরূপ। আর সেই মিলন হইতে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান সাম্রাজ্যের বা গণতন্ত্রের উদ্ভব হইবে; পৃথিবী তেমনটি কখনও দেখে নাই; আর ভগবানের ইচ্ছায় সুসময় হইলে তাহারাই পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে বন্ধ করিয়া দিবে।

(২) গৌণ হেতুসমূহ।—(ক) সাফল্যের পরীক্ষা।

'হোমরুলে'র জন্য এখন যে দাবী করা যাইতেছে, তাহার গৌণ কারণগুলি সংক্ষেপে সরল ভাষায় এই ভাবে বলা যায়।—"বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতি গৌণ ব্যাপারসমূহে এবং ইংরাজের স্বার্থসংপৃক্ত বিষয়ে সুফলপ্রসূ হইলেও, মুখ্য ব্যাপারে, অর্থাৎ যাহার উপরে দেশের লোকের সুস্থ জীবন ও সুখ নির্ভর করিতেছে, সে সমুদয় ব্যাপারে সফল নহে।" বাহিরের ব্যাপারগুলির প্রতি চাহিয়া—যেমন বাহ্য শৃঙ্খলা, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ—অবশ্য যে স্থলে রাজনীতিক আন্দোলনকারীদের কোনও সম্বন্ধ নাই—সেই সব ব্যাপার—এবং রাজপথ লৌহবর্ত্ম প্রভৃতি দেখিয়া, বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ—একটা অর্দ্ধসভ্য দেশ দেখিবার প্রত্যাশায় এ দেশে আসিয়া—বিস্মিত হন, এবং প্রশংসা করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা যদি দেশবাসিগণের জীবন দেখিতেন, মাসে ২৫৲ টাকা বেতনভোগী জীবনসংগ্রামে বিব্রত ও সন্তান-সন্ততির শিক্ষার জন্য ব্যাকুল কেরাণীকুলকে দেখিতেন, দিনে একবার করিয়া খায়—এই প্রকারের শ্রমজীবিগণকে যদি দেখিতেন, যে কুটীরে তাহারা বাস করে, সেই কুটীরসমূহ যদি দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা চিন্তা করিবার হেতু পাইতেন। আর শিক্ষিত লোকেরা যদি অসঙ্কোচে তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের তীব্র অসন্তোষ দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে গোপালকৃষ্ণ গোখলে এ সমুদয় বেশ স্পষ্ট ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন—

"এ দেশে ইংরেজশাসনের যে বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহার প্রাথমিক সর্ত্ত-সমূহের মধ্যে একটি এই যে, ইহাকে ক্রমিক উন্নতিমুখী শাসনব্যবস্থা হইতে হইবে। আমি মনে করি, প্রত্যেক চিন্তাশীল লোক—তিনি যে সমাজেরই হউন—এ কথা স্বীকার করিবেন। এখন আমি এই শাসনব্যবস্থা উন্নতিমুখী

কি না, এবং ইহা ক্রমিক উন্নতিমুখী কি না, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য চারিটি প্রমাণ প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করিতেছি। প্রথম প্রমাণ, যাহা আমি প্রয়োগ করিতে চাই, তাহা এই,—সমুদয় জনশ্রেণীর নৈতিক ও আর্থিক উন্নতির জন্য সরকার কি কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন? অবশ্য এই সমুদয় বলিতে আমি আধুনিক শাসন-ব্যবস্থার সেই সব উপায়গুলি ধরিব না, যাহা সরকারকে নিজের অস্তিত্বরক্ষার জন্যই প্রবর্ত্তন করিতে হইয়াছে—তবে সেগুলি আনুষঙ্গিকরূপে জনশ্রেণীর উপকার করিয়াছে—যেমন রেলওয়ে, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ ও এই প্রকারের অন্যান্য ব্যবস্থা। সর্ব্বসাধারণের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতির উপায়-বিধান বলিতে আমি ইহাই জানিতে চাই যে, শিক্ষাবিস্তারের জন্য সরকার কি করেন? স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কি করেন? কৃষির উন্নতির জন্য কি করেন? ইত্যাদি। ইহাই আমার প্রথম প্রমাণ। দ্বিতীয় প্রমাণ যাহা আমি প্রয়োগ করিতে চাই, তাহা এই—আমাদের স্থানীয় ব্যাপারের পরিচালনায় অর্থাৎ মিউনিসিপালিটী ও ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডে আমাদের অধিকার বাড়াইয়া দেওয়া সম্বন্ধে সরকার কি করেন? তৃতীয় প্রমাণ এই,—যে লাট-পরিষদে রাজ্যশাসনের নীতি স্থিরীকৃত হয়, সেই পরিষদে সরকার আমাদের কি অধিকার দেন? পরিশেষে আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে, ভারতবাসীরা কত দূর পর্য্যন্ত সরকারী কর্ম্মের উচ্চপদের অধিকারী?"

(খ) পদ্ধতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক—সরকারী কর্ম্মচারিগণ।

এগুলির—গোখলের প্রমাণ এবং প্রশ্নগুলির—সমাধান ভারতবাসিগণ নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতে করিতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত পরীক্ষার দ্বারা যে বিফলতা প্রতিপন্ন হইবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, এই কথাটা এখানে বলা দরকার যে, এখানে মানুষের নিন্দা করিবার দরকার নাই, ইংরাজের জায়গায় ভারতবাসীকে বসাইলেও হইবে না, সমগ্র পদ্ধতিটাই বদ্‌লানো দরকার। দায়িত্ববিহীন শক্তি হাতে পাইলে খুব ভাল লোকও খারাপ হইয়া যায়, ইহা একটী খুবই সাধারণ সত্য। যেমন বার্ণার্ড হাউটন বলেন যে, "অশাসিত শক্তি অনেক উন্নততর সদ্‌গুণকেও কলুষিত করে।" সরকারী কর্ম্মচারিগণ বেশ সরল প্রাণেই এই বিশ্বাসে আসিয়া উপস্থিত হন যে, যাহারা এই পদ্ধতি বদ্‌লাইতে চায়, তাহারা রাজ্যের ভিত্তিই দুর্ব্বল করিতে চায়। রাজ্য বলিতে তাঁহারা নিজেদেরই বুঝেন, কাজেই তাঁহাদের সমালোচনা করিলে তাহা

রাজদ্রোহ বলিয়া বিবেচিত হয়। এ প্রকারের ঘটনা ইতিহাসে সুপরিচিত—ভারতবর্ষে ইতিহাসের কেবল পুনরাবৃত্তিমাত্রই হইতেছে। পূর্ব্বোল্লিখিত লেখকেরই কথা উদ্ধৃত করিতেছি। আমি আমার নিজের কথায় বলার চেয়ে তাঁহার কথায় বলাই বেশী সঙ্গত মনে করি—আমার যাহা মত, তিনি ঠিক তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন, এবং আমি যেমন পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া বিবেচিত হই, তিনি অবশ্য সেরূপ বিবেচিত হইবেন না। উক্ত লেখক মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় নিম্নরূপমত প্রকাশ করিয়াছেন ;—

"তিনি (সরকারী কর্ম্মচারী) বহু বৎসরের অভ্যাসের ফলে কার্য্যবিবরণী-প্রেরণ, রিটার্ণ দাখিল ও অন্যান্য যন্ত্রবদ্ধ কার্য্যে বেশ সুদক্ষ হইয়াছেন। এই কাজগুলি তাঁহার মস্তিষ্কবৃত্তির টানা-পোড়েন বলিলেও হয়। তাঁহার নিজের কোনও ধারণা নাই, কেবল অপরের ধারণার প্রতিবিম্ব আছে। অপরীক্ষিত কোনও সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইলে তিনি তৎপ্রতি বিরক্তি ও অরুচির ভাব প্রকাশ করেন। কল হাতে করিয়া সর্ব্বদা কাজ করিতে করিতে কলের ঝঞ্ঝাটহীন কাজ ও কলের চাকচিক্যময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সামঞ্জস্যময় পরিচালনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা যিনি মনে করেন—তিনি তাঁহার এই প্রবাসক্ষেত্রের আর কি সেবা করিতে পারেন ? তিনি প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া বসিয়া থাকেন। যেন তাঁহার এই বিশিষ্ট কলের চাকার দন্তগুলি বেশ উজ্জ্বল ও মসৃণ থাকে, এবং নিঃশব্দে কাজ করে, এবং চাকার ঘূর্ণনের ব্যতিক্রম হইতে উৎপন্ন কোনরূপ কোলাহল যেন একেবারেই না হয়। কাজেই কিছুদিন পরে তিনি আপিসের জানালার সোজা ছিদ্র দিয়া যে সমগ্র জগৎ দেখিবেন, ইহা মোটেই অস্বাভাবিক নহে। কাজেই যখন কোনও নূতন প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহাকে মন্তব্য প্রকাশ করিতে হয়, তখন সেই প্রস্তাব জনসাধারণের জীবনের পথে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহা সম্মুখে রাখিয়া তিনি বিচার করিতে পারেন না। আমলাতন্ত্রের ইহাতে কি সুবিধা অসুবিধা হইবে, এবং তাহাদের প্রতিপত্তিরই বা কিরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হইবে, তাহাই সম্মুখে রাখিয়া তিনি বিচার করিতে বাধ্য হন। সেকালের মঠাধ্যক্ষের মত অথবা ইংলণ্ডের খাঁটী গ্রাম্য জমীদারের মত তাঁহার সাধারণ জনগণের প্রতি একটা করুণার ভাব থাকে, এবং তাহাদের মঙ্গলের জন্য সাধারণভাবে মনোযোগী হইবার তাঁহার ইচ্ছা ও আগ্রহও থাকে,—যদি তাহারা কোনরূপ নিজেদের বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ না করে, যদি তাহারা নিজেদের মত-প্রতিষ্ঠার জন্য কোনরূপ চেষ্টা না করে, এবং তাঁহার ও তাঁহার আদেশের যদি

কোনরূপ বিরুদ্ধতাচরণ না করে। এই যে সর্ত্ত, ইহার অনেক তাৎপর্য্য আছে। নিজের সিদ্ধান্তকে একরূপ ভগবানের সিদ্ধান্তের মত বিবেচনা করায়, এবং তিনি নিজে যে আমলা-তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, সেই আমলা-তন্ত্রকে একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান-রূপে বিবেচনা করায়, বাহিরের সাধারণ লোক যতক্ষণ নিজ নিজ কর্ত্তব্য নীরবে ও শান্তভাবে পালন করে, রাজ্যের বড় বড় ব্যাপার লইয়া কিছু না বলে—ততক্ষণ তিনি তাহাদের প্রতি সদয়। রাজ্যের বড় ব্যাপার সম্বন্ধে কথা কওয়া তাহাদের পক্ষে অতি ভয়ানক অপরাধ। সরকারী কর্ম্মচারিগণের কার্য্যের সরল সমালোচনা আরও গভীরতর স্থান স্পর্শ করে। কোনও কর্ম্মচারীই তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারীর কোন সমালোচনাই সহ্য করিতে পারেন না—সাধারণ লোক ত গণ্ডীর বাহিরে অন্ধকারে অবস্থিত, তাহারা ত তাঁহার মতে তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারীদেরও সমকক্ষ নহে। আচ্ছা, তাহা হইলে যখন সাধারণ লোকে কার্য্যের দোষ প্রদর্শন করিয়া এইরূপ অভিযোগ উপস্থিত করে যে, এই উন্নতমনা আমলা-তন্ত্রের পরিশ্রম সত্ত্বেও সমস্ত ব্যাপার এই সর্ব্বোত্তম জগতে ঠিক সর্ব্বোত্তম নহে, তখন কেমন করিয়া ধৈর্য্যের সহিত তাঁহারা তাহা শুনিবেন? আর তাঁহারা যদি এমন কোনও সংস্কারের কথা উপস্থাপিত করেন, যাহা কখনও তাঁহার বা তাঁহার সম্প্রদায়ের মনে উদিত হয় নাই, এবং যে সংস্কারের সহিত তাঁহার চিরপোষিত আদর্শের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তিনি কি করিবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। দেশশাসন করা এই আমলাগণের কাজ। শাসনের পবিত্র রহস্যে কেবল তাঁহারাই দীক্ষিত। শাসন-যন্ত্রের রহস্যময় কর্ম্মপ্রণালী কেবল তাঁহারাই বুঝেন। সাধারণ বাহিরের লোকে বড় জোর বিনীতভাবে দুই একটা প্রার্থনা জানাইতে পারে, কিন্তু তাহার বেশী নয়। যাহারা স্বাধীন-ভাবে চিন্তা করে, বা স্বাধীন ভাবে কার্য্য করে, তাহাদের মূর্খতা ও ভ্রান্তি তাহাদের দম্ভেরই সমতুল্য। যেন কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাত্র তাহাদের শিক্ষকের নিকট চিরদিনের ব্যবস্থাপত্রের পরিবর্ত্তন করিতে বলিতেছে, অথবা পাঠ্যপুস্তকের তালিকা বদ্‌লাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। এই সকল কর্ম্মচারিগণ মানবোচিত স্বাধীনতাকে রাজদ্রোহিতা বলিয়া মনে করেন; দেশে দুই রকম লোক থাকিতে পারে,—এক বিদ্রোহী অথবা নিরীহ মেষ, তাঁহারা ইহা ভিন্ন আর কিছুর কল্পনা করিতে পারেন না।”

এই আমলা-তন্ত্রের ফল সম্বন্ধে অন্যান্য উদ্ধৃত মত প্রথম পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

(গ) বেসরকারী ইঙ্গ-ভারতবাসী।

এই সকল উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ যে জাতির লোক, সেই জাতির অল্পসংখ্যক, কিন্তু শক্তিশালী এক দল লোক ভারতবর্ষে বাস করায় সমস্যা আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ লোকের সংখ্যা এ দেশে ১২২৯১৯; আর ব্রিটিশরাজ্যের লোকসংখ্যা ২৫ কোটী ৫০ লক্ষ আর অল্পবিস্তর পরিমাণে ব্রিটিশ প্রভাবে প্রভাবিত দেশীয় রাজ্যের লোকসংখ্যা ৭ কোটী। সাধারণতঃ এই বেসরকারী দল রাজনীতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না; তাঁহারা অন্য কার্য্যে ব্যস্ত; কিন্তু জাতির পক্ষে সত্য সত্য কল্যাণকর কোনও সংস্কারের কোনও আশা যখন ভারতবাসিগণের হৃদয়ে জাগ্রত হয়, সেই সময়ে তাঁহারা রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। এ বিষয়ে জন ষ্টুয়ার্ট মিল এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,—"শাসক জাতির যে সমুদয় লোক অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদেশে যায়, তাহাদিগকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রবল শাসনে সংযত রাখা দরকার। তাহারা রাজ্যশাসনের প্রধান অন্তরায়সমূহের মধ্যে অন্যতম। উচ্চপদবীর প্রতিপত্তির অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, বিজেতৃজাতি-সুলভ ঘৃণাপূর্ণ দম্ভের দ্বারা হৃদয় পূর্ণ করিয়া, প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য শক্তির দ্বারা যে সমুদয় হৃদয়ভাব উদ্দীপিত হয়, তাহারা সেই সমুদয় পোষণ করে, কিন্তু তাহাদের কোনরূপ দায়িত্ববুদ্ধি থাকে না।

এই ভাবে সার জন লরেন্স লিখিয়াছিলেন,—"এই সমস্ত ব্যাপারে ন্যায়পথে কার্য্য করিবার পক্ষে বাধা ভারতসরকারের খুব বেশী। দেশের লোকদের সাহায্য করিবার জন্য যদি কিছু করা হয়, বা করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে চারি দিকে একটা অসন্তোষের গর্জ্জন উপস্থিত হয়; সেই গর্জ্জনের প্রতিধ্বনি ইংলণ্ডে জাগ্রত হয়, এবং সেখানে সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। আমি সময়ে সময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ি। ভাবের রাজ্যে সকলেই ন্যায়পরতা, মিতব্যবহার প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর পক্ষপাতী, কিন্তু এই সকল বিধান যখন এমন ভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে যাওয়া যায় যে, তাহাতে কাহারও স্বার্থের আঘাত লাগে, তাহা হইলেই তাহাদের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।"

সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের সহিত সমানভাবে ব্যবহার করার বিধান সম্বন্ধে কীন বলেন—"কিন্তু ভারতবর্ষে এই নীতির প্রয়োগ করিতে গেলেই, যে অল্পসংখ্যক শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে

প্রতিবাদ জাগিয়া উঠে। এই শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়, এমন কি, শাসনব্যবস্থার সহিত তাহাদের কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও, সম্প্রদায় হিসাবে তাঁহারা যে উচ্চ, এইরূপ দাবী করেন—অবশ্য ইহা অনেকটা স্বাভাবিক যে, যে দেশে জাতিভেদপ্রথা প্রবল—সে দেশে শাসকগণের স্বজাতীয়গণ, লর্ড লিটন যাহাকে এক প্রকার শ্বেতাঙ্গ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, তাহাই হইয়া পড়িবে,এবং ইহাও নিশ্চিত যে, কার্য্যতঃ জাতির গর্ব্ব ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অধিকার তাঁহাদের মধ্যে 'আমরা উচ্চ' এই প্রকারের একটা ভাব জাগাইয়া দেয়। এই ভাবটি যখন আত্মপ্রকাশ করে, এবং উচ্চ-কর্ম্মচারী হওয়ার যে দায়িত্ব, সেই দায়িত্বভার-বহনের দ্বারা যখন তাহা কিছু কোমল হইয়া পড়ে, সে সময় ইহা বড়ই অশোভন, এমন কি, বিপজ্জনক হইয়া উঠে। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময় এই ভাবটা খুব বেশী রকম উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে সময়ে, যে দলের কথা বলা হইল, সে দলে লোকসংখ্যাও খুব বেশী ছিল না। আর, তাঁহাদের তেমন প্রতিপত্তিও ছিল না। কিন্তু এখন ইহাদের সংখ্যা খুব বেশী, এবং কলিকাতার ও লণ্ডনের খবরের কাগজ-গুলির সহিত সম্বন্ধ থাকায় তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ের জ্বালা অপরকে বেশ শুনাইতে পারেন।"

লর্ড রিপণের সহানুভূতিপূর্ণ শাসনের সময় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হয়। আজ আবার সেই প্রকারের ঘটনা উপস্থিত। আমরা দেখিতেছি, মান্দ্রাজ মেল, কলিকাতার ইংলিশম্যান, প্রয়াগের পায়োনীয়র ও লাহোরের সিভিল-মিলিটারী গেজেট, লণ্ডনের সংবাদ-পত্রের—টোরী ও ইউনিয়নিষ্ট সহযোগিগণের নেতৃত্বে, এবং যে সকল সরকারী ও বেসরকারী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অবসর লইয়া ইংলণ্ডে বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের সাহায্যে ইউরোপীয় সভাগুলি অধুনা-প্রস্তাবিত সংস্কার-প্রস্তাবে প্রাণপণে বাধা দিতেছে। আমরা জানি যে, ইংলণ্ডের অধিবাসিবৃন্দের চিত্তের উপর তাহারা ক্রিয়া করিতে না পারিলেও এই প্রতিবন্ধকতা, স্বাধীনতার জন্য এ দেশে যে আন্দোলন হইতেছে, তাহার এক অন্তরায়। ইংলণ্ডে যে এই চেষ্টা বিফল হইতেছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু এ দেশে রাজার আদেশে সংস্কার হইলেও তাহারা তাহার প্রভাব হ্রাস করিবার চেষ্টা করিবে, এবং তাহা যাহাতে বিফল হয়, তাহারও চেষ্টা করিবে। এই প্রকারে মিণ্টো-মর্লে সংস্কারের উপযোগিতা নষ্ট হইয়াছে, এবং এখন হইতে খুব সতর্ক না হইলে জাতীয় মহাসমিতি ও মুসলমান-সমিতির প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়া যখন আইন রচিত হইবে, তখনও তাহারা এইরূপ চেষ্টা করিবে।

(ঘ) ইংলণ্ডের উপর প্রতিক্রিয়া।

এই যে ইংরাজনীতিবিরুদ্ধ ভারতবর্ষীয় শাসনপদ্ধতি, ইহা খাস ইংলণ্ডের যে কি ভয়ানক ক্ষতি করিতেছে, তাহার বিচার না করিয়া নিরস্ত থাকা যায় না। মিষ্টার হব্‌সন দেখাইয়াছেন,—

"যেমন আমাদের স্বাধীন স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত উপনিবেশগুলি আমাদিগকে একটা আশা ও উৎসাহ দান করিয়াছে, এবং স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে কৃতকার্য্যতা লাভ করায় ও স্বাধীনতা ও সাম্যের ভাব কলমের চারার মত তাহাদের দেশে রোপণ ও পোষণ করায় গ্রেটব্রিটেনেও জনশ্রেণীর মধ্যে মহাভিলাষ জাগাইয়া দিয়াছে, সেইরূপ যথেচ্ছাচারের সহিত শাসিত আমাদের অধীন দেশগুলি আমাদের দেশের লোকের চরিত্র একবারে নষ্ট করিয়া দিতেছে। তাহাদের মধ্যে হীন ক্রীতদাসোচিত অভ্যাসসমূহ ধন ও উচ্চপদবীর প্রতি অত্যধিক প্রশংসার ভাব ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছে; এই ভাবগুলি মধ্যযুগের অভিজাত-তন্ত্রের বৈষম্যের কলুষিত নিদর্শনের ন্যায়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কব্‌ডেন আমাদের ভারত সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বেশ জোরের সহিত এই প্রশ্ন উপস্থিত করেন। 'যেমন গ্রীস ও রোম এসিয়ার সহিত সংস্পর্শে আসিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিল, সেইরূপ প্রাচ্যদেশে যথেচ্ছাচারপূর্ণ যে সমস্ত রাজনীতিক বিধানের প্রবর্ত্তন করা হইতেছে, সেইগুলি আমাদের দেশের শাসন-ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করিয়া আমাদিগকেও কলুষিত করিতে পারে, ইহা কি খুব সম্ভব নহে?' এই প্রতিক্রিয়া কেবল সম্ভব নহে, অবশ্যম্ভাবী। আমাদের সাম্রাজ্যের যথেচ্ছাচারের সহিত শাসিত অংশের পরিমাণ যে পরিমাণে বাড়িতেছে, সেই পরিমাণে আমাদের দেশের অধিকতর সংখ্যক লোক আমাদের উপনিবেশে, আশ্রিত রাজ্যে ও ভারতসাম্রাজ্যে সৈনিক ও দেওয়ানী কর্ম্মচারীর কাজ করিয়া যথেচ্ছাচারের পদ্ধতি ও তদুপযোগী হৃদয়বৃত্তিতে অভ্যস্ত হইতেছে; ব্যবসায়ী, নীলকর, চা-কর, পূর্ত্তবিভাগের বড় ও ছোট কর্ম্মচারী প্রভৃতির দ্বারা ইহাদের সংখ্যা আরও বাড়িয়া যাইতেছে। ইহারা সাধারণ ইউরোপীয় সমাজের সমুদয় স্বাস্থ্যকর সংযমের বাহিরে এক উচ্চশ্রেণীর জাতির মত কৃত্রিম জীবন যাপন করিয়া যে চরিত্র, চিন্তা ও ভাব সেই বৈদেশিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে প্রাপ্ত হয়, তাহাই লইয়া দেশে ফিরিয়া আসে।"

যাঁহারা ইণ্ডিয়ান সিভিল-সারভিসের লোক, তাঁহারা বিদেশী বলিয়া এখানে তাঁহাদের বড়ই কষ্ট হয়; তাহার পর যখন তাঁহারা দেশে ফিরিয়া যান, তখন

দেখেন যে, এখানে যে সমস্ত কলুষময় প্রভাবের মধ্যে থাকেন, তাহার ফলে তাঁহারা দেশেও বিদেশী হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা যখন তাঁহাদিগকে কাঁচা মালের মত আমদানী করি, তখন আমাদের অসুবিধা হয়; আবার যখন এখানে গড়িয়া পিটিয়া তাঁহাদের দেশে চালান করি, তখন তাঁহাদের প্রতিক্রিয়া-প্রবণ মনোবৃত্তি ও অভ্যাসের জন্য তাঁহারা গ্রেটব্রিটেন ও ভারতবর্ষ উভয় দেশেরই ক্ষতি করেন। ইহার ফল উভয় পক্ষেরই অসন্তোষজনক।

(ঙ) প্রথম প্রমাণের প্রয়োগ।

এখন গোখলের প্রথম প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া দেখা যাউক, এই আমলা-তন্ত্র শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষির উন্নতির জন্য কি করিয়াছে? আমি তথ্যগুলি খুব সংক্ষেপে উপস্থাপিত করিব; কিন্তু এই তথ্যগুলি অকাট্য।

শিক্ষা।—যে সমস্ত বালকবালিকা শিক্ষা পায়, তাহাদের হার সমুদয় লোকসংখ্যার তুলনায় শতকরা ২০.৮। মিষ্টার গোখলে ছয় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার পর এই হার শতকরা ০.৯ বাড়িয়াছে। কিন্তু এই যে শতকরা হিসাব, ইহাও ভ্রমোৎপাদক শিক্ষাবিষয়ক বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, বালকবালিকাগণকে চারি বৎসরের কম সময় পড়াইলে তাহারা ঐ সময়ে যাহা শিক্ষা করে, তাহা ভুলিয়া যায়। ১৯১৪—১৫ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সংখ্যা-তালিকায় (ইংরেজ-শাসিত ভারতের) আমরা দেখিতে পাই যে, ৬,৩৩৩,৬৬৮ বালক ও ১,১২৮,৩৬৩ বালিকা, একুনে ৭,৭৬১,০৩১ বালকবালিকা শিক্ষাধীন ছিল। ইহার মধ্যে ৫,৪৩৪,৫৭৬ নিম্ন প্রাথমিক পর্য্যন্তও পড়ে নাই। আবার ইহার মধ্যে ২,৬৮০,৫৬১ পড়িতেই শেখে নাই। সমগ্র সংখ্যা হইতে যদি এই সংখ্যাটিকে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র ২,০২৭,৪৫৫ বালকবালিকা এমন শিক্ষা পাইতেছে, যাহা তাহাদের কাজে লাগিবে—ইহাতে শতকরা হিসাবে .৮৩ দাঁড়ায়। কি ভয়ঙ্কর কথা! ৫৫ লক্ষ বালকবালিকার বিদ্যালার্জ্জের জন্য যে টাকাটা খরচ হয়, তাহা বঙ্গোপসাগরের জলে ফেলিয়া দিলেও চলে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের শেষে, যে সমস্ত বালকবালিকার বিদ্যালয়ে যাইবার বয়স, তাহাদের সমগ্র সংখ্যার শতকরা ২০.৪ অংশ বিদ্যালয়ে যাইত।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্মেণ্টের হিসাবে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৫ লক্ষ ছিল। সার চার্লস উড ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যে শিক্ষা-বিষয়ক নিদেশপত্র প্রচার

করেন, তাহার দ্বারা শিক্ষাবিভাগ গঠিত হয়। শিক্ষাবিভাগ-গঠনের ৫৯ বৎসর পরে এই ফল হইয়াছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে একটী শিক্ষা-আইন প্রবর্ত্তিত হয়। সে সময়ে ইংলণ্ডের শিক্ষার অবস্থা যেরূপ ছিল, এখন আমাদের অবস্থা অনেকটা সেইরূপ। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রধানতঃ ধর্ম্মযাজকগণের অধীন বিদ্যালয়সমূহে নিয়মিত সাহায্যদান আরব্ধ হইয়াছিল। ১৮৭০ ও ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়। বার বৎসরের মধ্যে ৪৩০.৩ হইতে শতকরা ১০০ জন পড়িতে আরম্ভ করে। এখন ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের লোকসংখ্যা চার কোটী, আর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬০ লক্ষ।

জাপানে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, যে সকল বালকবালিকা বিদ্যালয়ে যাইবার বয়স আছে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ২৮ জন অর্থাৎ আমাদের হার অপেক্ষা শতকরা ৮ জন বেশী বিদ্যালয়ে যাইত। ২৪ বৎসর পরে এই হার ৯২-এ পরিণত হয়। ২৮ বৎসরের মধ্যে শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক অর্থাৎ সার্ব্বজনীন হইয়াছে। বরোদার শিক্ষা অবৈতনিক, এবং অনেকটা বাধ্যতা-মূলক; সেখানে শিক্ষা সার্ব্বজনীন। ত্রিবাঙ্কুরে শিক্ষোপযোগী বয়সের বালক-গণের শতকরা ৮১.১ ও বালিকাগণের ৩৩.২ জন বিদ্যাশিক্ষা করে। মহীসুরে বালক ৪৫.৮, এবং বালিকা ৯.৭। বরোদারাজ্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য ছয় আনা ছয় পাই ব্যয় হয়। ইংরেজ-শাসিত ভারত তিন আনা ব্যয় করে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শিক্ষার ব্যয় ৫৭ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। ভূমি-কর আট কোটী টাকা বাড়িয়াছে। সামরিক বিভাগের ব্যয় তের কোটী বাড়িয়াছে। দেওয়ানী আট কোটী বাড়িয়াছে। লৌহবর্ত্মে মূলধন-প্রয়োগ ১৫ কোটী। (আমি গোখলের প্রদর্শিত সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছি।) গোখলে হিসাব করিয়া বিদ্রূপের সহিত বলিয়াছিলেন যে, দেশের লোকসংখ্যা যদি বৃদ্ধি না পায়, তাহা হইলে আর এক শত পনের বৎসরে প্রত্যেক বালক, এবং ৬১৫ বৎসর পরে প্রত্যেক বালিকা বিদ্যালয়ে যাইবে। প্রিয় প্রতিনিধিগণ! আমরা আশা করি, হোমরুলের অধীনে আমরা ইহা অপেক্ষা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইব। আমি বলিতে চাই যে, শিক্ষাদান-ব্যাপার আমলা-তন্ত্র অনুপযোগী।

স্বাস্থ্য ও রোগচর্য্যা—প্লেগ, কলেরা, এবং সর্ব্বোপরি ম্যালেরিয়ার প্রকোপবৃদ্ধি হইতেই, কি গ্রামে ও কি নগরে, স্বাস্থ্যরক্ষার অভাব প্রতিপন্ন হয়। যে সমস্ত কারণে ভারতবর্ষের লোকের গড়ে পরমায়ু এত কম, অর্থাৎ ২৩.৫

বৎসর, এই স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থার অভাবই তাহার অন্যতম। ইংলণ্ডে গড়ে পরমায়ু ৪০ বৎসর। নিউজিলণ্ডে ৬০ বৎসর। ব্যাধির চিকিৎসা-বিধানের অসুবিধা এই যে, পল্লী অঞ্চলেও বৈদেশিক চিকিৎসা-পদ্ধতিই বিশেষরূপ উৎসাহ পায়, দেশীয় পদ্ধতি কোনরূপ সাহায্য পায় না। সরকারী হাঁসপাতাল, সরকারী ঔষধালয়, সরকারী চিকিৎসক, সমস্তই বৈদেশিক পদ্ধতির। আয়ুর্ব্বেদীয় ও ইউনানী ঔষধ, হাঁসপাতাল, ঔষধালয় ও চিকিৎসকগণ সরকারের নিকট পরিচিতই নহে। ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্য ৭২টী বৈদ্যশালায় নিয়মিত অর্থসাহায্য করেন। এই সমুদয় বৈদ্যশালায় ১৯১৪—১৫ খৃষ্টাব্দে ১৪৩৫০৫ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল। এই সংখ্যা এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিত রোগী অপেক্ষা ২২০০০ অধিক, (১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত কার্য্যবিবরণী হইতে উদ্ধৃত) আমাদের সরকার দেশবাসিগণের ঔষধের প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পারেন না। অথচ দেশের লোকেরা যে চিকিৎসা-পদ্ধতি পছন্দ করে, তাহারা যে তাহাদের দেশের টাকা সেই পদ্ধতির জন্য ব্যয় করিবে, সরকার তাহাও করিতে দিবেন না। হোমরুলের অধীনে দেশীয় ও বিদেশীয় উভয় পদ্ধতিই অপক্ষপাতে ব্যবহৃত হইবে। আমি স্বীকার করি, এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ অভাবপূরণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, এবং প্রভূত আত্মোৎসর্গও করিয়া থাকেন। কিন্তু অভাব এত অধিক, এবং তাঁহাদের সংখ্যা এত অল্প যে, আমাদের আমলা-তন্ত্র শাসন-পদ্ধতি যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে এ বিষয়ে সফলতা-লাভ অসম্ভব। দেশীয় পদ্ধতি-বর্জ্জনের ফলেই এই দোষ ঘটিয়াছে। এই পদ্ধতি বর্জ্জন করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা একবার কৃপাপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়াও দেখেন নাই। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্বাস্থ্যরক্ষায় ও রোগিচর্য্যায় আমলা-তন্ত্র কার্য্যকর ও উপযোগী নহে।

কৃষির উন্নতি।—১৯১১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীতে দেখা যায়, কৃষিজীবী লোকের সংখ্যা ২১ কোটী ৮৩ লক্ষ। ইহাদের ভীষণ দারিদ্র্য সর্ব্বসাধারণের সুপরিচিত। ইহাদের ঋণ-ভার ক্রমাগত কিরূপ বাড়িয়া যাইতেছে, গত ত্রিশ বৎসর কাল সার দীনশাওয়াচা কর্ত্তৃক তাহা আলোচিত হইয়াছে। তথাপি ইহাদের ঋণ-ভার যত বাড়িতেছে, করও তত বাড়িতেছে। ভূমির কর ২৫ বৎসরে ৮ কোটী টাকা বাড়িয়াছে, তাহা এইমাত্র বলিয়াছি। ইহা ছাড়া স্থানীয় কর আছে। লবণ-শুল্ক প্রভৃতি আছে। লবণ-শুল্ক নিতান্ত দরিদ্র লোককেই ভীষণ নিপীড়ন করে। গত আয়-ব্যয়-নির্দ্দেশের সময় এই

লবণ-শুল্ক ৯০ লক্ষ টাকা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দারিদ্র্যের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ কৃষকের শরীরের উপযুক্ত পুষ্টি হয় না; তাহাদের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার সামর্থ্য নাই। পরমায়ু কমিয়া যাইতেছে। শিশুদের মৃত্যুসংখ্যা ভয়ঙ্কর বাড়িয়া যাইতেছে। গোপালকৃষ্ণ গোখলে 'দুষ্টবুদ্ধি' আন্দোলনকারী ছিলেন না। এ বিষয়ের আলোচনায় যে সমুদয় সংখ্যা প্রায়ই উদ্ধৃত হয়, ১৯০৫ খৃঃ অব্দে তিনি তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।—

"সার উইলিয়ম হাণ্টার এক জন মহানুভব ভারতপ্রবাসী ইংরাজ। তাঁহার কথা প্রামাণিক। তাঁহার মতানুসারে, ভারতে চারি কোটী লোক চিরজীবন দিনান্তে এক বেলা মাত্র খাইতে পায়। সার চার্লস ইলিয়ট আর এক জন প্রামাণিক ব্যক্তি। তিনি বলেন, ভারতবর্ষে সাত কোটী লোক উদর পূর্ণ করিয়া খাওয়া যে কি প্রকার, সংবৎসরের মধ্যে এক দিনের জন্যও তাহা জানিবার অবকাশ পায় না। ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের দারিদ্র্য সত্যই হৃৎকম্প উৎপাদন করে। তোমরা এক শত বৎসর রাজ্যশাসন করিবার পর দেশের অবস্থা যদি এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা কিছুতেই বলিতে পার না যে, ভারতবাসিগণের যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাই তোমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।"

কখনও কখনও এইরূপ জবাবও দেওয়া হয়—"এই একই কথা বার বার বল কেন? আমরা তাহা জানি।" আমাদের উত্তর এই যে, এই একই কথা বার বার জনশ্রেণীর জঠরে আঘাত করিতেছে, এবং এইরূপ অবস্থা যত দিন চলিবে, তত দিন আমরা এই অবস্থায় মনোযোগ আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারি না। গোখলে দৃঢ়তার সহিত আরও দেখাইয়াছেন—এই শোচনীয় অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। কৃষিজীবিগণের মধ্যে অনুপযুক্ত খাদ্যনিবন্ধন যে পুষ্টির অভাব, তাহার কোনও সংখ্যা বা পরিমাণ পাই না—কিন্তু মান্দ্রাজ নগরে গ্রাম্য কৃষকের ন্যায় দরিদ্র নগরবাসিগণের মধ্যে চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া এইরূপ মন্তব্য পাওয়া গিয়াছে যে, শতকরা ৭৮ জন লোক পুষ্টিহীনতায় কষ্ট পাইতেছে। দেহযষ্টির ক্ষীণতা, বাহু ও পদের কৃশতা, জীবনের উপর শোচনীয়রূপ আধিপত্যের অভাব,—যাঁহার চক্ষু আছে, তাঁহাকে বলিয়া দিতে হইবে না, ব্যাপারটা কি—তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। যখন চারি দিকে এইরূপ অবস্থা চলিতেছে, তখন অমানুষিক কল্পনাশক্তির অভাব না থাকিলে মানুষ দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারে না।

কৃষকগণের অভিযোগের অন্ত নাই, এবং বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া জাতীয় মহাসমিতি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রামের লোকের অসুবিধা যাঁহারা আদৌ বুঝেন না, তাঁহারাই বনবিভাগের আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। এই আইনের ফলে গ্রামবাসিগণের কষ্টের সীমা নাই। অতি অল্পমাত্র স্থানেই বন-বিভাগীয় পঞ্চায়েত-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে অল্পসংখ্যক স্থানে ইহার পরীক্ষা হইয়াছে, সেই সমুদয় স্থানে ফল খুব ভাল হইয়াছে। কয়েকটি স্থানে ফল এত ভাল হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। গৃহপালিত পশুগণের জন্য চারণভূমির অভাব, নিঃশেষিতশক্তি ভূমির জন্য কাঁচা-সারের অভাব, বনের চারি দিকে বেড়ার অভাব, এবং তাহার ফলে গৃহপালিত পশুগুলি চরিতে চরিতে সেই বনের মধ্যে যায়, এবং খোঁয়াড়ে তাহাদের আটক করিয়া, ছাড়িয়া দিবার জন্য মালিকের নিকট খেসারতের খরচ আদায় করা হয়, জরিমানা করা হয়, অন্যরূপ শাস্তি দেওয়া হয়; কিন্তু কেন যে এই জরিমানা ও শাস্তি, লোকে তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। জ্বালানীর জন্য, ঘর ও জিনিসপত্র মেরামতের জন্য কাঠ পাওয়া যায় না; জল যাহা পাওয়া যায়, তাহা সমানভাবে বিতরিত হয় না; এই সমুদয় অসুবিধা গ্রামে ও স্থানীয় সভা-সমিতিতে আলোচিত ও বিচারিত হইয়াছে। অস্ত্র-আইন অত্যন্ত কষ্টকর; তাহার ফলে বন্য পশু ও দুর্দ্দান্ত মানবের আক্রমণ হইতে তাহারা একেবারে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। বিচার ও শাসনবিভাগের কার্য্য সংযুক্ত থাকায় সুবিচার অনেক সময়েই দুষ্প্রাপ্য, এবং তাহাতে টাকা খরচও খুব বেশী, সময়ও খুব বেশী নষ্ট হয়। গ্রামের রাজকর্ম্মচারিগণ স্বভাবতঃ সর্ব্বদাই চেষ্টা করেন, কিসে তহশীলদার ও কালেক্টর তুষ্ট হইবেন; গ্রামবাসিগণ কিসে সুখী হইবে, সে দিকে তাঁহারা মনোযোগ দেন না; কারণ, গ্রামবাসিগণের নিকট কোনও বিষয়েই তাঁহাদের দায়িত্ব নাই। দলাদলি সকল সময়েই প্রবল; কারণ, সকল সময়েই একটা তৃতীয় দল বিদ্যমান। তাঁহাদিগের নিকটই মীমাংসা হইয়া থাকে। যিনি এই তৃতীয় দলের, তিনি যদি উচ্চপদস্থ হন, তাহা হইলে তোষামোদের দ্বারা, এবং নিম্নপদস্থ হইলে উৎকোচের দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করা যায়; এবং উচ্চই হউক আর নিম্নই হউক, তোষামোদ করিলে, পদানত হইয়া থাকিলে, এবং অন্যের নামে সর্ব্বদা 'লাগান্-ভাঙ্গান্' করিলে তাঁহাকে তুষ্ট রাখা যায়। সুতরাং ভারতবর্ষে কৃষির অবস্থা ও কৃষিজীবিগণের দারিদ্র্যের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই আমলা-তন্ত্র-শাসন অনুপযোগী।

গোখলের প্রথম প্রমাণ ভারতের হস্তশিল্পে প্রয়োগ করিয়া দেখা যাউক। দুর্ব্বল শিল্পগুলিকে কত দূর সবল করা হইয়াছে, নূতন শিল্পের কত দূর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, যাতায়াতের জন্য নদী ও খালগুলির কিরূপ যত্ন হয়, বন্দরে মাল আসিলে তাহার রপ্তানীর কিরূপ ব্যবস্থা হয়, নীল ও অন্যান্য দেশীয় রঙ্গের কারবার জর্ম্মণীর রাসায়নিক রঙ্গের প্রতিযোগিতা হইতে কিরূপ রক্ষিত হয়, এ সকলের আলোচনাতেও ঐ একই উত্তর পাওয়া যায়। দেশের ধনাগমের উপায়সমূহের কি প্রকারে পুষ্টি হইবে, সে বিষয়ে আমলা-তন্ত্রের উদাসীনতার জন্য আমাদের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। জর্ম্মণ জাতি এই সমস্ত উপায়ের কতকগুলি দখল করিয়া বসিয়াছে; সে দিকে যত্ন ও মনোযোগ নাই, এবং এখনও জাপানীরা তাহাদের রাজশক্তির সাহায্যে, জর্ম্মণী যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, ঠিক সেই পন্থা অবলম্বন করিতেছে; কিন্তু এই আমলা-তন্ত্রের তাহাতে কোনরূপ দৃষ্টি নাই। ফলে জর্ম্মণীর পরিবর্ত্তে এখন জাপান ভারতবাসিগণের স্বাভাবিক ও পুরুষানুক্রমিক অধিকার কাড়িয়া লইতেছে।

সমুদয় সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেশে কৃষির সঙ্গে সঙ্গে হস্তশিল্পের উন্নতি হয়, এবং স্বভাবতঃই তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া থাকে। আয়র্লণ্ডের ভীষণ দারিদ্র্য, এবং তাহার অর্দ্ধেকেরও অধিক অধিবাসিগণের দেশত্যাগ, গ্রেট-ব্রিটেন্ কর্ত্তৃক তাঁহাদের উলের শিল্পনাশ ও একমাত্র কৃষির উপর তাঁহাদিগকে নির্ভর করিতে বাধ্য করিবার প্রত্যক্ষ ফল। সেই একই প্রকারের কারণ হইতে এখানেও সেই একই প্রকারের কার্য্য ঘটিয়াছে—কিন্তু এখানে যাহা হইয়াছে, তাহার পরিমাণ আয়র্লণ্ড অপেক্ষা খুব বেশী। এখানে আর এক সমস্যাময় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা নূতন—১৮৯১ ও ১৯০১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীর বিবরণ তুলনা করিয়া ইম্পীরীয়াল গেজেটীয়ারে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে যে, "ভারতবর্ষে ভূমিশূন্য এক দল লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে, ইহা অর্থনীতির হিসাবে বিপজ্জনক।" "সাধারণ কৃষকগণ বৎসরের মধ্যে কেবল চাষের সময় জমীতে মজুরী করে, যখন জমীর কাজ থাকে না, তখন তাহারা সাময়িক কাজের জন্য বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহে আসিয়া থাকে।" আয়র্লণ্ডের মজুরদের ইংলণ্ডে আসার কথা ইহা হইতে ঠিক মনে পড়িয়া যায়। অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রাচীন সময়ে গ্রামসমূহের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহার উপর বিশেষ করিয়া জোর দিয়াছেন। তিনি বলেন;—

"গ্রামগুলি এখনও প্রায় নিজের অভাব নিজে পূর্ণ করে, এবং প্রত্যেকেই

অর্থনীতির হিসাবে স্ব-তন্ত্র। গ্রামের লোকসমূহের আহারের জন্য যে খাদ্যের প্রয়োজন, গ্রামের কৃষকই তাহা উৎপাদন করে। কর্ম্মকার, কৃষকের জন্য লাঙ্গলের ফাল ও গ্রামের সমুদয় লোকের গৃহস্থালীর জন্য তাহাদের প্রয়োজনীয় লৌহজাত দ্রব্যসমূহ প্রস্তুত করে। সে গ্রামের লোকের এ সকল সামগ্রী সরবরাহ করে; কিন্তু বিনিময়ে টাকা পায় না। গ্রামের লোকেরা তাহাদের নিজের নিজের শ্রম ও উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা তাহার অভাব পূরণ করে। কুম্ভকার মাটীর জিনিস যোগায়, তন্তুবায় কাপড় দেয়, তৈলকার তৈল দেয়। কৃষকের নিকট হইতে এই সকল শিল্পী আপন আপন চিরন্তন পাওনা ফসলের অংশ পাইয়া থাকে। এই প্রকারে আদানপ্রদানের সমস্ত কার্য্য মুদ্রা ব্যবহার না করিয়াও চলিয়া যায়। গ্রামের লোকের পক্ষে মুদ্রা জিনিসটী কেবল সঞ্চয় করিবার মত মূল্যবান পদার্থ, বিনিময়ের উপকরণ নহে। যখন তাহারা ধনী হইয়া পড়ে, তখন তাহারা উহা সঞ্চয় করে—হয় মুদ্রাই সঞ্চয় করে, নয় ত সোনা-রূপার গহনা গড়াইয়া তাহা সঞ্চয় করে।"

দারিদ্র্যের তাড়নায় গ্রামবাসিগণ সহরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে, তাই এই সমুদয় অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। গ্রামবাসিগণ সহরে আসিয়া গ্রামের সহযোগিতা বা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবার ভাবের পরিবর্ত্তে প্রতি-যোগিতা শিক্ষা করিতেছে। তাহাদের হৃদয়ভাব বদলাইয়া যাইতেছে, বিশ্বাসের ভাব দূর হইয়া সন্দেহের ভাব জাগিতেছে; সহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি পর্য্য-বেক্ষণ করিয়া সেই সকল গ্রামের সহিত দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহের তুলনা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। আর্থিক ও নৈতিক সর্ব্বনাশের গতিরোধ করিতে হইলে আবার সেই স্বাস্থ্যকর ও আনন্দকর গ্রাম্যজীবনের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে শাসনের মূল উপাদানরূপে পঞ্চায়েত-প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তন করিতে হইবে। সে সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করিতেছি। গ্রামের শিল্প-সমূহের তাহাতে উন্নতি হইবে, এবং পরস্পরের সহিত আদানপ্রদানের সম্বন্ধসূত্র যৌথ-সমিতির দ্বারা গঠিত হইবে। শ্রীযুক্ত সি. পী. রামস্বামী আয়ার "যৌথ-সমিতি ও পঞ্চায়েত" নামক তাঁহার ক্ষুদ্র গ্রন্থে বলেন—

"এই যে অমঙ্গল, (গ্রাম ছাড়িয়া সহরে যাওয়া) ইহা নিবারণ করিবার, এবং গ্রামবাসিগণের নৈতিক ও আর্থিক অবস্থা উন্নত করিবার একমাত্র উপায়, যৌথ-সমিতিসমূহের ভিত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া বেশ ভাল রকমের পঞ্চায়েত প্রথার প্রবর্ত্তন। তাহা হইলেই গ্রামের শিল্পসমূহের আবার উন্নতি হইবে, এবং

সজীব ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজশক্তিরও পুনরায় উদ্ভব হইবে। ভারতের গ্রামগুলি যখন আবার ঠিকমত পুনর্গঠিত হইবে, তখন সুবিকশিত ও সহযোগিত্বপূর্ণ শিল্প-সাধন-ব্যবস্থার অতি সুন্দর ভিত্তি নির্ম্মিত হইবে।" তিনি আরও বলেন—

"পঞ্চায়েত-প্রথার প্রবর্ত্তনের সহিত সাধারণতঃ বিবেচিত হয় না, এ প্রকারের আরও অনেকগুলি কথা আছে,—গ্রাম্যজীবনের পদ্ধতির পুনরুত্থানের সহিত সেগুলি বিজড়িত। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক কথা—দেশের ছোট ছোট শিল্পের পুনরুত্থান। কি ইউরোপে, কি ভারতবর্ষে, ছোট ছোট কৃষি-ক্ষেত্রের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট হস্তশিল্পগুলিও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের মত দেশসমূহে কৃষি বহুলপরিমাণে গ্রামের শিল্পসমূহকে সাহায্য করিয়াছে—এবং যে কৃষকদের অল্প জমী আছে, তাহারা জীবিকার্জ্জনের একটি অতিরিক্ত উপায়-রূপে শিল্পকর্ম্মে মনোযোগী হইয়াছে। ভারতে গ্রাম্যজীবনের ধ্বংস কেবল যে একটি রাজনীতিক সমস্যা, তাহা নহে; ইহা অর্থনীতি এবং শিল্প-ব্যবস্থারও সমস্যা। ইউরোপে সভ্যতার তরঙ্গ সহর হইতে গ্রামে গিয়াছে—কিন্তু ভারতবর্ষের ব্যবস্থা ঠিক তাহার বিপরীত। এ দেশে সামাজিক-জীবনের কেন্দ্র গ্রামে, নগরে নহে। আমাদের শিল্প মূলতঃ কুটীরশিল্প ছিল, এবং আমাদের শিল্পিগণ এখনও কুটীরে থাকিয়া কাজ করে—বাণিজ্য-জগতের সহিত তাহারা অল্পাধিক পরিমাণে সম্বন্ধশূন্য। সমস্ত জগৎ জুড়িয়া আজকাল একটা চেষ্টা হইতেছে যে, গ্রামের শিল্প ও পরিশ্রমকে ভিত্তি করিয়া শ্রমের সহযোগিত্ব ও শ্রমবিভাগের ব্যবস্থায় বিশেষ অবহিত হইতে হইবে। এই কারণ হইতেই শিল্পিগণের সমবায়মণ্ডলী, উদ্যান-নগর প্রভৃতির উদ্ভব হইতেছে। এ সকলের মূলে লক্ষ্য এই যে, সমাজ-তন্ত্রবাদের ও সহযোগিতার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক। উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারীর মধ্যে ধন-বিভাগের যে দারুণ বৈষম্য বিদ্যমান, তাহা দূরীভূত হউক। ভারতবর্ষ চিরদিনই ছোট ছোট কৃষকের দেশ, এবং তাহার ফলে পাশ্চাত্যদেশে অল্পসংখ্যক কয়েক জনের হাতে টাকা জমিয়া যাওয়ায় যে সমুদয় কুফল ফলিতেছে, ভারতবর্ষে সে সকল কুফল ফলে নাই। আমাদের মধ্যে সমাজসেবার যে প্রবৃত্তি আছে, সেই প্রবৃত্তি এবং আমাদের গার্হস্থ্যজীবনের যাহা মূল শিক্ষা, সেই শিক্ষা, এই উভয়ে মূলধনকে এক জায়গায় জমিতে দেয় নাই। এই কারণেই বৃহৎ আকারে ভারতবর্ষে কলকারখানার উন্নতি হয় নাই।"

কলকারখানায় সহরে যে দারুণ দুঃখ ও দুর্দ্দশা ঘটে, তাহা পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিবার পর ইংলণ্ড এই সমুদয় পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে।—এই সমুদয় পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক।

ইংলণ্ডের কোনও সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে গোপালকৃষ্ণ গোখলে ভারতবর্ষের সাধারণ অবস্থা এই ভাবে এক সঙ্গে বর্ণনা করেন—

"হিসাব করিয়া স্থির হইয়াছে যে, তোমাদের প্রত্যেকের বার্ষিক আয় গড়ে ৪২ পাউণ্ড। আর আমাদের? সরকারী হিসাবে ২ পাউণ্ড, আর বেসরকারী হিসাবে এক পাউণ্ড অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশী। তোমাদের দেশে আমদানী প্রত্যেকের প্রায় তের পাউণ্ড, আর আমাদের ৫ শিলিং। তোমাদের ডাক-ঘরের সেভিংস্-ব্যাঙ্কে মজুত আছে ১৪ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড; তাহা ছাড়া ট্রষ্টী সেভিংস্-ব্যাঙ্কে তোমাদের মজুত ৫ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড। আর আমাদের দেশের লোকসংখ্যা তোমাদের লোকসংখ্যার ৭ গুণ, অথচ আমাদের ডাকঘরে মজুত আছে—কেবল ৭০ লক্ষ টাকা, এবং তাহারও অতি সামান্য কম দশ ভাগের এক ভাগ ইউরোপের লোকের। তোমাদের যৌথ-কারবারে ন্যস্ত মূলধন ১৯০ কোটী; আর আমাদের ২ কোটী ৬০ লক্ষও নহে। আবার এই টাকারও অধিকাংশ ইউরোপের লোকের। আমাদের দেশের ৫ ভাগের ৪ ভাগ লোক কৃষিজীবী; আর এই কৃষি বেশ দ্রুতগতি অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে। ভারতের কৃষকগণ অত্যন্ত দরিদ্র; আবার তাহার উপর তাহারা অত্যন্ত ঋণ-ভারগ্রস্ত; ফলে তাহারা জমীতে মূলধন নিয়োগ করিতে পারে না, এবং তাহার ফলে ভারতের কৃষির অধিকাংশই,—যেমন সার জেম্‌স্ কেয়ার্ড প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে দেখাইয়াছেন—ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তিকে ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে। এক একরে (তিন বিঘায়) যে শস্য উৎপাদিত হয়, তাহার পরিমাণ প্রত্যহ কমিতেছে। ইংলণ্ডে এক এক একরে ৩০ বুশেল শস্য জন্মায়, আর আমাদের দেশে এক এক একরে ৮।৯ বুশেল মাত্র জন্মাইয়া থাকে।"

গোখলের প্রথম প্রমাণের অন্তর্গত যে যে বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহার সমুদয়গুলিতেই এই আমলা-তন্ত্র এত দিন অনুপযোগী প্রতিপন্ন হইয়াছে, এবং এখনও তাহা সেইরূপ অনুপযোগী।

(চ) ভারতবাসিগণকে একবার সুযোগ দাও।

এ বিষয়ে আমরা যাহা বলি, তাহা এই;—দেশের সর্ব্বসাধারণ জনশ্রেণীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিসাধনের ব্যবস্থায় তোমরা অকৃতকার্য্য হইয়াছ। জাপান ও অন্যান্য জাতি নিজের দেশের যাহা করিয়াছে, তাহা করিবার জন্য ভারত-বাসিগণকে সুযোগ দিবার উপযুক্ত সময় কি এখনও উপস্থিত হয় নাই?

নিশ্চয়ই এ দাবী অন্যায্য নহে। ইঙ্গ-ভারতীয়গণ যদি বলেন যে, দেশের সর্ব্ব-সাধারণ জনশ্রেণী তাঁহাদেরই বিশেষরূপ প্রতিপালনের পাত্র, শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে না—শিক্ষিত সম্প্রদায় কেবল শক্তি ও পদ চায়, তাহা হইলে, আমরা তাহাদিগকে জাতীয় মহাসমিতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করিব, এবং সেই মহা-সমিতির বক্তৃতা ও নির্দ্ধারণগুলির আলোচনা করিতে বলিব, সেই সকল বক্তৃতায় ও নির্দ্ধারিত মন্তব্য হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে, সাধারণ জনশ্রেণীর প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভালবাসা ও তাহাদের সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জ্ঞান কত গভীর! দেশের দারিদ্র্যের প্রতি, সহায়-হীন নৈরাশ্যের প্রতি যে তাহারা সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করে, ইহা তাহাদের দোষ নহে। আচ্ছা, বিচারপতি শ্রীযুক্ত রহিম সাহেব কি বলেন, দেখা যাউক।—

"বহু কোটী ভারতবর্ষীয় সাধারণ লোকের কল্যাণ অকল্যাণের প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে যদি এইরূপ দাবী করা হয় যে, ভারতীয় সরকারী বা বেসরকারী ভদ্র-লোক্ অপেক্ষা ইউরোপীয় রাজকর্ম্মচারিগণই তাহাদের স্বার্থের যোগ্যতম প্রতিভূ হয়, তাহা হইলে এরূপ স্পর্দ্ধাপূর্ণ মত দাবী যে কি প্রকারে উপস্থাপিত হয়, তাহা ধারণা করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণ ভারতবর্ষের কথিত ভাষাসমূহ আয়ত্ত করিতে পারেন না; তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী ও চিন্তাপ্রণালী সাধারণ জনশ্রেণী হইতে তাঁহাদের এত দূর পৃথক করিয়া রাখে যে, কেবলমাত্র অতিশয় অল্পসংখ্যক লোক, তাঁহাদের অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে এই বাধার অতিক্রমে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পরন্তু শিক্ষিত ভারতবাসিগণের পক্ষে এই জ্ঞান সংস্কারজ, এবং ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতি,—যাহার প্রভাব পূর্ব্ব-দেশে এত প্রবল, সে সম্বন্ধে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায় একমতাবলম্বী হওয়ায়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জ্ঞান ও সহানুভূতি খুবই সত্যোপেত; জড়বাদপ্রতিষ্ঠ ধারণা যে সকল দেশে খুব প্রবল, সে সকল দেশে এ প্রকারের দৃশ্য (অর্থাৎ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠ যোগ) দেখিতেও পাওয়া যায় না।"

এ কথাও স্মরণীয় যে, শক্তিমত্তার অভাবেই যে আমলা-তন্ত্র বিফল হইয়াছে, এমন নহে। কারণ, ইংরাজ বণিক ও কলওয়ালা ভারতবর্ষে আপনাদের অসাধারণ উন্নতিসাধন করিয়াছে। তবে কথা এই যে, এই আমলা-তন্ত্র এই প্রকারের ব্যাপারে (অর্থাৎ দেশবাসিগণের কল্যাণ-সাধনে) আদৌ মনোযোগী নহে। রুস দেশের সাধারণ জনশ্রেণীর কিসে সুখসমৃদ্ধি হইবে, রুস দেশের আমলা-তন্ত্র সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল; জনসাধারণ কিসে

বশীভূত হইয়া থাকিবে, কিসে তাহারা নিয়মিতভাবে দেয় খাজনা দিবে, সেই দিকেই তাহাদের যত্ন ছিল। আমলা-তন্ত্র সকল দেশেই এক প্রকার; সেই জন্যই আমরা এই পদ্ধতির বিরুদ্ধবাদী; কর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধে নহি। ইংরাজ আমলা-তন্ত্রের পরিবর্ত্তে ভারতীয় আমলা-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হউক, তাহাও আমরা চাহি না। আমরা সিবিল কর্ম্মচারী দ্বারা শাসন, অর্থাৎ এই আমলা-তন্ত্রই লুপ্ত করিতে চাহি।

(ছ) অন্যান্য প্রমাণের প্রয়োগ।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া আমি কালবিলম্ব করিতে চাহি না। কারণ, সে সকলের উত্তর চোখের উপর পড়িয়া আছে।

দ্বিতীয় পরীক্ষা—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন।

লর্ড মেওর শাসনকালে (১৮৬৯-৭২) এক-কেন্দ্রী শাসন-পদ্ধতি ভাঙ্গিবার জন্য কিছু চেষ্টা হইয়াছিল। কীন ইহাকেই 'হোমরুল' বলেন,—এবং তাঁহারই নীতি, টাকাকড়ির ব্যাপার বাদ দিয়া, অন্যান্য ব্যাপারে লর্ড রিপণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়াছিল। কীন যাহাকে 'হোমরুলে'র বীজ বলিয়াছেন, লর্ড রিপণ তাহাতে জীবন-সঞ্চার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখন এই ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশে একটি পরীক্ষাধীন ও সীমাবদ্ধ স্থানীয় হোমরুলের পরীক্ষা করিবার কল্পনা হইয়াছে। যদিও এককেন্দ্রী-শাসন ভাঙ্গিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত কমিশন বা তদন্তকারী মণ্ডলী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের মন্তব্য পেশ করিয়াছেন, তথাপি আজও সকল স্থানে বে-সরকারী চেয়ারম্যান বা সভাপতির নিয়োগ হয় নাই। সুতরাং বেশ দেখা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় প্রমাণেও এই আমলা-তন্ত্র অনুপযোগী।

তৃতীয় পরীক্ষা—সদস্য-সভায় কর্ত্তৃত্ব।

মান্দ্রাজের ব্যবস্থাপক-সভার নির্ব্বাচিত ভারতীয় সভ্যগণ যাহা করেন, তাহার প্রসঙ্গে সম্প্রতি এক জন সদস্য বলিয়াছেন যে, তাহা প্রহসনমাত্র। বড়লাটের ব্যবস্থাপক-সভাকে এক জন সদস্য "একটি বড়দরের তর্ক-বিতর্ক-সভা" বলিয়াছিলেন। সম্প্রতি অনেকগুলি মন্তব্য নির্ব্বাচিত দেশীয় সভ্যগণ কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হইয়াছিল; তাহার কোনওটি গৃহীত হইয়াছিল, কোনওটি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এই ব্যাপারে বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, ব্যবস্থাপক-সভা

সম্বন্ধে প্রযুক্ত বিশেষণগুলি অসঙ্গত নহে। মিণ্টো-মর্লে-সংস্কার সম্বন্ধে আমলা-তন্ত্র এই শক্তিমত্তা দেখাইয়াছে যে, যে কল্যাণসাধন পার্লামেণ্টের বিধানের উদ্দিষ্ট ছিল, আমলা-তন্ত্র তাহা এককালে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই তৃতীয় পরীক্ষার প্রয়োগেও দেখা যায় যে, ভারতবাসিগণকে শাসন-সমিতিতে অধিকার-দানের ব্যাপারেও আমলা-তন্ত্র অনুপযোগী।

চতুর্থ পরীক্ষা—ভারতবাসিগণের সরকারী কার্য্যে নিয়োগ—

কমিশনের মন্তব্য হইতেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। এই মন্তব্য কার্য্যে পরিণত করিবার অনিচ্ছা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমলা-তন্ত্রের দিক্ হইতে কোনরূপ বাধা প্রদান করা আবশ্যক হয় নাই। কারণ, এই মন্তব্যে আমলা-তন্ত্রের যাহা বিশেষ সুবিধা, তাহা সুরক্ষিত হইয়াছে।

গোখ্‌লের পরীক্ষাসমূহের সহিত আমরা আর একটি পরীক্ষা যোগ করিতে চাহি। সে পরীক্ষায় আমলা-তন্ত্র খুব গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইবে। সে পরীক্ষা এই—রাজ্য-পরিচালনের ব্যয়-বৃদ্ধি বিষয়ে আমলা-তন্ত্র কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে? বর্ত্তমান বৎসরের খাজনার হিসাবে দেখা যায় যে, উহা ৮৬১৯৯৬০০ পাউণ্ড। খরচ,—৮৫৫৭২১০০ পাউণ্ড। সমগ্র সংগৃহীত ভূমিকরের অর্দ্ধেকের উপর ব্যয়।

দেওয়ানী বিভাগ বেতন ও অন্যান্য ব্যয়	...	১৯৩২৩৩০০	পাউণ্ড
„ বিবিধ ব্যয়	...	৫২৮৩৩০০	ঐ
সামরিক বিভাগ	...	২৩১৬৫৯০০	ঐ
		৪৭৭৭২৫০০	ঐ

শাসনকার্য্যের এই যে অস্বাভাবিক ব্যয়-বাহুল্য, ইহার সঙ্কোচসাধন ভারতবর্ষের একটি অত্যাবশ্যক প্রয়োজন; কিন্তু আমরা 'হোমরুল' না পাইলে তাহা কিছুতেই হইবে না।

"হোমরুলে"র দাবী করিবার যেগুলি গৌণ হেতু, সেগুলি স্বতঃই অত্যন্ত গুরুতর; এবং সেগুলির পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষ অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। এখন এই জাতিটা একেবারে দেউলিয়া হইয়া যাইবার আশঙ্কা ঘটিয়াছে; এবং এই আশঙ্কা হইতে অব্যাহতি পাইবার একমাত্র পথ—'হোমরুলে'র অনুমোদন। (এই দারিদ্র্য ইতিপূর্ব্বেই দেশের লোকের

পরমায়ু কমাইয়া দিয়াছে, মৃত্যুর হার বাড়াইয়া দিয়াছে, চারি দিকে রোগ-বিস্তার করিয়াছে, ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তিও ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছে)। আমাদের সাধারণ জনশ্রেণীর অবস্থা-পরিবর্ত্তনের জন্য কতকগুলি গুরুতর পরিবর্ত্তন অত্যন্ত আবশ্যক,—অপরিহার্য্য। নতুবা অনাহার হইতে উদ্ভূত রাষ্ট্রবিপ্লব অনিবার্য্য, এ কথা প্রত্যেক ইতিহাসজ্ঞ, যিনি ভারতবর্ষের সাধারণ জনশ্রেণীর বর্ত্তমান অবস্থা অবগত, তিনি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছেন। এই যে আর্থিক অবস্থা, ইহার কারণ অনেক। তাহার মধ্যে একটি এই যে, শাসন-কর্ত্তারা বৈদেশিক, তাঁহারা প্রকৃত অবস্থা বুঝেন না। পাশ্চাত্য দেশের উপযোগী শাসনপদ্ধতি জোর করিয়া প্রাচ্যদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাচ্যদেশের নিজস্ব প্রজাতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; আমলা-তন্ত্র-পদ্ধতির প্রবর্ত্তনের ফলে দেশের অধিবাসিগণ ব্যতিব্যস্ত ও অধঃপতিত হইয়াছে; কারণ, এই পদ্ধতি তাহাদের পক্ষে একেবারে নূতন, এবং ইহাতে তাহাদের বিরক্তিই উৎপাদিত হয়। যাহা হইয়াছে, তাহা লইয়া এখন আর কলহ করিয়া লাভ নাই—এখন পরিবর্ত্তন আবশ্যক। যখন একটা অনুপযোগী শাসনপদ্ধতি পূর্ব্ব হইতে খুব উন্নত সভ্যতাসম্পন্ন দেশে আরোপিত হইয়াছে, তখন ইহা নিষ্ফল হইবেই। গরীবেরাই যে বিদ্রোহী হয়, ইহা অত্যন্ত সত্য; যে দুঃখ তাহারা ভোগ করিতেছে, সেই দুঃখ যখন বিদ্রোহের দুঃখ অপেক্ষা অধিক নহে বলিয়া মনে হয়, তখনই তাহারা বিদ্রোহী হয়। দেশের ভূমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস ও গ্রাম্যশিল্পের ধ্বংস নিবন্ধন কোটী কোটী মানবের যে দৈনন্দিন ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য আমরা 'হোমরুল' চাই।

শাসনসংক্রান্ত সংস্কার-সমূহ।

ইহা তিন ভাগে বিভক্ত।—

(১) ভারত-শাসনের সংস্কার।

(২) প্রাদেশিক শাসনের সংস্কার।

(৩) স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের সংস্কার।

আমি এই তিনটি বিষয় বিপরীত দিক্ হইতে বিচার করাই সুবিধাজনক মনে করি। তাহা হইলে, সমগ্র শাসনব্যবস্থা ভিত্তি হইতে গড়িয়া তুলিতে পারা যাইবে; এবং ইহা বেশ একটি জীবন-সম্পন্ন ও সুশৃঙ্খলাময় ব্যাপার বলিয়া উপলব্ধ হইবে; অংশগুলি কেমন অঙ্গাঙ্গিভাবে বিরাজিত, তাহাও বুঝিতে পারা

যাইবে। কিন্তু ভ্রান্তি-নিরাসের জন্য প্রারম্ভেই বলিয়া রাখি যে, গত বৎসর কন্‌গ্রেস্‌-লীগের সংস্কার-প্রস্তাবে যে পরিবর্ত্তনসমূহ চাওয়া হইয়াছে, তাহা অনুমোদিত না হইলে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কোনও ব্যবস্থাই সফল হইবে না। সেই সংস্কার-প্রস্তাবে যাহা চাওয়া হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা কম, আর তাহা কমানো যায় না, কমাইলে সংস্কার আর 'সংস্কার' আখ্যা পাইতে পারে না। লর্ড রিপণের সময় হইতে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন-প্রথা বরাবর গোঁজামিল দিয়া সংস্কার করিবার চেষ্টা হইতেছে, এবং সে চেষ্টা বিফলও হইতেছে। তাহাতে ইহাই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভা সম্পূর্ণরূপ প্রতিনিধি-সভা না হইলে, অর্থাৎ এক বাঙ্গালা দেশ ছাড়া অন্যদেশে যেরূপ মন্ত্রণা-সভা আছে, সেরূপ সভা থাকিলে,—অর্থাৎ সভায় সরকারী ও সরকার-নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যা অধিক, আর কার্য্যকরী সভায় হয় সকলেই ইংরাজ, নয় ত ৪ জন ইংরাজ, আর এক জন দেশীয় লোক,—আর এই এক জন দেশী-লোক কোনও আপত্তিজনক ব্যবস্থার নিবারণে একেবারে অক্ষম, কেবলমাত্র শিখণ্ডীর মত থাকেন,—সেরূপ ব্যবস্থা থাকিলে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সংস্কার অসম্ভব। যেমন মস্তিষ্কে ব্যাধি থাকিলে, বা মস্তিষ্ক অপুষ্ট হইলে, দেহের স্বাস্থ্য থাকে না, ঠিক সেইরূপ;—কারণ, সুস্থ মস্তিষ্ক পরিচালন ও শাসন করিলেই তবে সুস্থ দেহ গড়িয়া উঠে। বৈদেশিকগণের দ্বারা ভারতবাসিগণের যে নিজের দেশ শাসন করিবার আদৌ শক্তি আছে, গঠিত কার্য্যপরিচালক মণ্ডলী তাহা বিশ্বাস করেন না। এই মণ্ডলী, সরকারী নিয়ম ও শাসন কিরূপে ঠিক থাকিবে, এই চিন্তাতেই ব্যস্ত, দেশীয় সভ্যগণের শক্তিমত্তা সম্বন্ধে কোনও সংবাদই রাখেন না। এই যে 'দিদিমা'র শাসন, ইহাতে আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। ইঙ্গ-ভারতীয়গণ যদি মনে করেন, আমরা শিশু—বেশ ভাল কথা। শিশুগণ এখন নিজে নিজে হামা টানুক, দাঁড়াইয়া উঠুক, হাঁটিতে চেষ্টা করুক, পড়িয়া যাউক, এই প্রকারে পড়িতে পড়িতে দেহের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিতে শিখিবে। যদি তাহারা চিরদিন দড়ীর সাহায্যে চলে, তাহা হইলে যে তাহাদের পদদ্বয় কখনও ঠিক হইবে না। এই স্থানে আমি প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, যে কোনও বিভাগে ভারতবাসিগণকে সদ্ভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহারা সেইখানেই কৃতকার্য্য হইয়াছে। যদি ভারতবর্ষ ও গ্রেটব্রিটেনের গবমেণ্ট অন্ততঃপক্ষে কন্‌গ্রেস-লীগের দাবীটুকু মঞ্জুর করিবার পূর্ব্বে সরকারী চাপে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন হইতে সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করেন, এবং সেই স্থানে বা অন্য কোনও

বিভাগে যাহাতে সফলতা হয়, তাহারই দাবী করেন, তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, তাঁহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেবল সময়ের তালে তালে পদধ্বনি করিতেছেন,—প্রকৃত পক্ষে আদৌ অগ্রসর হইতেছেন না। আমি ভারত-সরকার ও ব্রিটিশ-সরকারকে অত্যন্ত সরলভাবে ও সদিচ্ছার সহিত বলিতে চাহি যে, ভারতবর্ষ তাহার স্বত্ব দাবী করিতেছে, অধিকার পাইবার জন্য ভিক্ষা করিতেছে না। ভারতবর্ষই বলিয়া দিবে, কিসে সে সন্তুষ্ট হইবে। আমার এই উক্তির সমর্থনে আমি গ্রেটব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী যাহা বলিতেছেন, তাহারই দোহাই দিতেছি,—অন্য কোনও কর্ত্তাকে বলিতে হইবে না—"এই পর্য্যন্ত—আর না!" এ বিষয়ে গ্রেটব্রিটেনের প্রজাতন্ত্র আমাদের সমর্থন করিতেছে, সম্মিলিত জাতিগণ (মিষ্টার এস্‌কুইথের ভাষায়)—"কেবলমাত্র স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়া" আমাদের সমর্থন করিতেছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রজাতন্ত্র আমাদিগের সমর্থন করিতেছে। ব্রিটেন তাহার চিরাচরিত সংস্কার অস্বীকার করিতে পারে না। তাহার দেশের প্রধান প্রধান রাজনীতিবিদ্‌গণের কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না; এবং ইংলণ্ড জগতে যে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের উজ্জ্বল মুকুটমণি-স্বরূপ, সেই প্রজাতন্ত্রের মুখে কলঙ্ককালিমা লেপন করিতে পারে না।

প্রজাতন্ত্রের অনুপযুক্ত?

আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ আশ্বস্ত করা হইয়াছে, এবং আমরা এই আশ্বাসদানে এখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। তাহা এই যে, ভারতবর্ষ প্রজাতন্ত্র শাসনের প্রতি-ষ্ঠানসমূহ পাইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত; চিরদিনই ভারতবর্ষ একচ্ছত্র রাজার অধীন রহিয়াছে। কিন্তু ইহা ঐতিহাসিকগণের বাস্তব ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত মত নহে, পক্ষপাতে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সিভিলসার্ব্বিসের সভ্যগণেরই কেবল এইরূপ মত। 'হোমরুল'-সমিতিসমূহ ভারতের বড়লাট বাহাদুর ও মিষ্টার মণ্টেগুর নিকট যে আবেদনপত্র অর্পণ করিয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত অতি সত্য কথাগুলিই কথিত হইয়াছে—

"ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র-শাসন একেবারে নূতন, এ কথা কোনও জ্ঞানবান্ লোকই বলিবেন না। মেন্ ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন যে, প্রজা-তন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ মূলতঃ আর্য্যজাতির, এবং আর্য্যজাতির উপনিবেশ-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে বিস্তৃত হইয়াছে। পঞ্চায়েত বা "গ্রাম্য সাধারণতন্ত্র" ভারতবর্ষে অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান ছিল; গত

শতাব্দীতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাধান্যের চাপে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ণ-বিভাগের মধ্যে এখনও তাহা আছে; প্রত্যেক বর্ণ নিজের গণ্ডীর ভিতরে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রজাতন্ত্র, তাহার ভিতরে একই লোকের রাজপুত্রের সহিত ও দরিদ্র কৃষকের সহিত সম্পর্ক থাকিতে পারে। টাকায় এবং উপাধিতে সামাজিক সম্মান তেমন নির্ভর করে না; বিদ্যা ও ব্যবসায় সাপেক্ষ। ভারতবর্ষ তাহার অন্তরের অন্তরে প্রজাতন্ত্র; ভারতবর্ষ অতীতকাল হইতে যে সমুদয় প্রতিষ্ঠান পাইয়াছে, তৎসমুদয়, এবং এখনও যে সমুদয় প্রতিষ্ঠান তাহার অধীন আছে, সে সমুদয়, প্রজাতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজের সাক্ষ্য আছে—সার জন লরেন্স, আজ নহে, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন,—"ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ আপনাদের কার্য্য আপনারা পরিচালনা করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ, এবং স্বায়ত্তশাসন সম্পন্ন করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের হৃদয়ে গভীররূপে বিরাজমান। গ্রাম্য সমাজসমূহের প্রত্যেকেই এক একটি সাধারণ-তন্ত্র, এবং ভারতের প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে এগুলি সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী। আমরা ভারতবর্ষে যে স্থান অধিকার করি, তাহাতে কর্ত্তব্য ও নীতি সম্বন্ধে আমরা যেরূপ ধারণাই পোষণ করি না কেন, দেশের কাজের যতটা অংশ সম্ভব—দেশের লোককে করিতে দেওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য।"

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সার বার্টল ফ্রিয়ার লিখিয়াছিলেন—"ভারতের সামাজিক কাজকর্ম্ম কি ভাবে পরিচালিত হয়, তাহা যিনি মনোযোগের সহিত দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন যে, প্রতিনিধি-নিয়োগ ইহাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি - কেবল সংস্কারের বিধানের দ্বারা প্রতিনিধি-নিয়োগ নহে—ইহাদের পূর্ব্ব হইতেই যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহাতে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর লোক প্রতিনিধি-পদ প্রাপ্ত হয়। যখনই কোনও গোলমাল উপস্থিত হয়, এবং সরকারবাহাদুরকে কোনও কিছু জানাইবার আবশ্যক হয়, তখনই তাহারা এইরূপ করে—তখনই তাহাদের মধ্যে এই ভাবে সে বিষয়ের আলোচনা হয়। যখনই সমাজের কোনও লোককে পুরস্কার বা শাস্তি দিতে হয়, তখনই সেই জাতির একটি সভা হয়। আমার মনে হয়, এ জাতির বিশিষ্ট প্রকৃতিই এই ধরণের। যেমন প্রাচীন স্যাক্সন জাতিদের ছিল—তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবের লোকসমূহকে সভায় একত্র করিয়া প্রত্যেকের মত লইয়া কাজ করিত, ঠিক সেইরূপ।"

মিষ্টার চিশহলম্ এনষ্টি বলেন - "আমরা যখন পূর্ব্ব দেশের অধিবাসিগণকে শিক্ষাদান করিয়া মিউনিসিপ্যাল কাজের জন্য, এবং মহাসভার শাসন-প্রণালীর

জন্য গড়িয়া তুলিবার কথা বলি, তখন আমরা ভুলিয়া যাই যে, মিউনিসিপ্যালিটী জিনিসটাই পূর্ব্ব-দেশের সৃষ্টি। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন—এই কথাটাকে খুব বিস্তৃতভাবে বুঝিলে, ইহার অর্থ যতদূর ব্যাপক হয়, তাহার সমস্ত ব্যাপারটাই পূর্ব্বদেশে যত প্রাচীন, এ দেশে ঠিক তত প্রাচীন নহে। দেশের অধিবাসিগণ যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউক না কেন, যাহারা পূর্ব্বদেশের অধিবাসী, তাহাদের মধ্যে, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে এমন স্থান নাই যেখানে অসংখ্য স্বায়ত্ত-শাসন-ব্যবস্থা নাই। কেবল তাহাই নহে, আমাদের প্রাচীন মিউনিসি-প্যালিটীসমূহের মত তাহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত গ্রথিত—সমস্তগুলি একখানা জালের মত, কাজেই প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন-ব্যবস্থার কাঠামো একেবারে প্রস্তুত হইয়াই পড়িয়া আছে।”

এ প্রকারের প্রমাণ-বচন আমি অসংখ্য উদ্ধার করিতে পারিতাম—কিন্তু উদ্ধার করিয়া কি হইবে? যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা সকলেই ইহা জানেন—আর যাঁহারা অন্যরূপ, তাঁহাদের নিকট যতই জোরে বলা হউক, তাঁহারা স্বীকার করিবেন না।

এই কয়েকটি প্রাথমিক মন্তব্যের পর আমি আলোচনা করিতেছি,—

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রণালীর সংস্কার।

(ক) সাধারণ বিধানসমূহ।

আমাদিগকে তিনটি ক্ষেত্রের আলোচনা করিতে হইবে—(১) গ্রাম, (২) গ্রামগুচ্ছ—অল্প বা অধিক ব্যবধানবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের মধ্যে যে জমী আছে, সে জমীগুলিও ইহার মধ্যে—ইহাই দ্বিতীয় ক্ষেত্র, (৩) জেলা—যাহার মধ্যে পরস্পরের সহিত সংলগ্ন তালুক ও তহশীল আছে, তাহা ছাড়া সরকারী পতিত জমী ও বন আছে। প্রাচীনকালের গ্রাম-প্রতিষ্ঠার একটী অতি আনন্দকর স্মৃতি ইহার মধ্যে আছে। প্রত্যেক গ্রামের শীর্ষস্থানে এক জন করিয়া প্রধান থাকিতেন; দশখানি গ্রামের এক একটি গুচ্ছের শীর্ষস্থানে তদ-পেক্ষা উচ্চপদস্থ এক জন প্রধান থাকিতেন; একশতখানি গ্রামের শীর্ষস্থানে এক জন আরও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি,—এই প্রকারে দশের বিভাজ্য সংখ্যা অবলম্বনে সমুদয় ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীনেরা এই প্রকারের নিয়মবদ্ধ আরোহপ্রণালী পছন্দ করিতেন; তাঁহারা সজীব ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থা ভালবাসিতেন।

তাঁহাদের ভূমি বা সম্পত্তি থাকুক বা না থাকুক, গ্রামের অধিবাসী গৃহস্থমাত্রই প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের অধিকারী ছিলেন। কারণ, ব্যবস্থা এই ছিল যে, “যাহার

ফল সকলকেই ভোগ করিতে হইবে, তাহা সকলের দ্বারাই বিচারিত হওয়া উচিত।" এই ব্যবস্থায় দেশের কাজে দেশের প্রত্যেক নারীর ও প্রত্যেক পুরুষের অধিকার ছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তাহার শক্তি সীমাবদ্ধ ছিল; কারণ, যে সমুদয় ব্যবস্থার সহিত তাহার অতি নিকট সম্বন্ধ, সেই সমস্ত ব্যবস্থায় সে কেবলমাত্র প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের অধিকারী; কিন্তু আর এক দিয়া দেখিতে গেলে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রতিনিধির মধ্যস্থতায় সমস্ত দেশের শাসনেও তাহার হাত ছিল। আমাদের মন্ত্রণা-সভাতেও, কি প্রাদেশিক মন্ত্রণাসভা, কি সর্ব্বভারতীয় মন্ত্রণাসভা, সর্ব্বত্রই, যেমন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বাড়িবে, ততই প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনে সকলেই অধিকার পাইবে। আপাততঃ আমরা ইংলণ্ডের অনুবর্ত্তনে শ্রমজীবিগণকে কেবল স্থানীয় সভার জন্যই প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের অধিকার দিতেছি। প্রাদেশিক মন্ত্রণাসভায় যাহারা সদস্য-নির্ব্বাচন করিবে, তাহারা তালুক-বোর্ডের নির্ব্বাচনকারীদের পর্য্যায়ভুক্ত।

তাহার পর, কর্ত্তব্য ও শক্তিবিভাগের সময় এই ব্যবস্থা করি যে, যাহা কেবলমাত্র গ্রামের, তাহা গ্রামের সভার দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইবে, কিন্তু গ্রামের যে সমুদয় প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র গ্রামের নহে, গ্রাম অপেক্ষা বৃহত্তর ব্যবস্থার একটি অংশমাত্র, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান সেই বৃহত্তর ব্যবস্থার যে মন্ত্রণাসভা, তাহার অধীন হইবে, এবং গ্রাম্য-সভাকে তাহার যতটুকু পরিচালনা করিতে হয়, ততটুকুর জন্য গ্রাম্যসভাকে বৃহত্তর সভার নিকট দায়ী থাকিতে হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ একটি বিদ্যালয় লইয়া আলোচনা করা যাউক। মনে করুন, শিক্ষার ব্যবস্থা প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হয়, এবং তাহা প্রাদেশিকসভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, কলেজসমূহ, উচ্চবিদ্যালয়সমূহ, মাধ্যমিক শিক্ষার বিদ্যালয়সমূহ, প্রাথমিক শিক্ষালয়সমূহ এবং সাধারণকে হস্ত-শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য প্রত্যেকের সহিত সংশ্লিষ্ট তদুচিত শিল্পবিদ্যালয়, এবং যাহারা জীবিকার জন্য ব্যবসায় শিক্ষা করিবে, তাহাদের জন্য কারখানার বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। প্রত্যেক গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকিবে, এবং সেই সঙ্গে সেই গ্রামে যে ব্যবসায় আছে, সেই ব্যবসায়ের জন্য কারখানা থাকিবে। সম্ভবতঃ প্রত্যেক ফিরকায় (Revenue Circle) একটি করিয়া মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয় থাকিবে; প্রত্যেক তালুকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়া উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় থাকিবে, অনেক তালুকেই একটির বেশী থাকিবে, প্রত্যেক জেলায় একটি বা ততোধিক কলেজ

থাকিবে, এবং প্রত্যেক প্রদেশে একটি বা ততোধিক বিশ্ববিদ্যালয় থাকিবে। কিন্তু গ্রাম্যপঞ্চায়ত কেবলমাত্র তাঁহার গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য দায়ী থাকিবেন, এবং দেখিবেন যে, যে সমুদয় বালকবালিকার ভবিষ্যতে আশা আছে তাহারা ফিরকার মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়। এই প্রকারে এই বিদ্যালয় গ্রামের বাহিরের বিস্তৃততর জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে; কিন্তু তাহাদের শাসনের অধিকার কেবলমাত্র নিজেদের বিদ্যালয়টির উপর থাকিবে। তাহারা দেখিবে যে, সমস্ত প্রদেশের শিক্ষার যে অংশের ঐ গ্রাম অংশী, সেইটুকু যথাযথ পালিত হইতেছে।

(খ) পঞ্চায়ত।

স্মরণাতীতকাল হইতেই ভারতবর্ষে গ্রাম্য-সমাজের অস্তিত্ব ছিল, এবং সেই সমাজে যথেষ্ট শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থাও ছিল, ইহা সকলেই জানেন। ভারতবর্ষের কোনও কোনও স্থানে অনেক লিপি ও কাগজপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার সাহায্যে দক্ষিণ-ভারতবর্ষে গত শতাব্দী পর্য্যন্তও যে ব্যবস্থা ছিল, তাহার একটী চিত্র আমরা গড়িয়া তুলিতে পারি। এই ব্যবস্থা ব্রহ্মদেশে এখনও আছে। সার টমাস মন্‌রো কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক রায়তওয়ারী বিধানের দ্বারা এই ব্যবস্থার প্রাণহানি হইয়াছে; ১৮২০ খৃষ্টাব্দ হইতে এই প্রাচীন ব্যবস্থা দিন দিন প্রাণশূন্য হইয়া পড়িতেছে। শ্রীযুক্ত সি, পি, রামস্বামী আয়ারের যে পুস্তিকা হইতে পূর্ব্বে বচন উদ্ধার করা হইয়াছে, সেই পুস্তিকায় তিনি নিম্নরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—

"কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের দশমখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়, সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানগুলি গ্রামের লোকেরা সমবেতভাবে গঠন করিতেছে, এবং রক্ষা করিতেছে। অধ্যাপক রিজ্ ডেভিস্ বলেন, "বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, গ্রামবাসিগণ তাহাদের সমুদয় শক্তি সংঘ-বদ্ধ করিয়া মহল্লা ও পান্থশালা নির্ম্মাণ করিতেছে, তাহাদের নিজের গ্রাম হইতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে যে রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তা সংস্কার করিতেছে, এবং সাধারণের ব্যবহার্য্য উদ্যানও রচনা করিতেছে। (পি, ব্যানার্জি কৃত "প্রাচীন-ভারতে শাসন-পদ্ধতি" গ্রন্থের ২৯৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য)। এখনও মহীশূরে বহুগ্রামে গ্রামবাসিগণ প্রত্যেকে প্রতি সপ্তাহে অর্দ্ধদিনের পরিশ্রম বিনা মজুরীতে সাধারণের হিতকর কার্য্যে দান করে, এবং এই প্রকারে যে কার্য্য হয়, তাহার সমষ্টি বিস্ময়জনক। যে সময়ে

অর্থশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল, সেই সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে—প্রত্যেক গ্রাম সাধারণ দেশ-শাসন-ব্যবস্থার একটি অত্যাবশ্যক অংশ ছিল—গ্রামই সমগ্র শাসন-সৌধের ভিত্তিস্বরূপ ছিল। সিংহলদ্বীপে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সামাজিক ধর্ম্মাধিকরণে ফৌজদারী বিচারও গ্রামবাসীরাই করিত। সে সময়কার গ্রামের লোকে যে কেবল শাসন-কার্য্যে সাহচর্য্য করিত, তাহা নহে, বিচার-বিভাগের কার্য্যপরিচালনেও তাহারা সাহায্য করিত। মান্দ্রাজ গবর্মেণ্টের প্রশংসা করিয়া এ কথা বলা উচিত যে, সার্ টমাস মন্‌রো সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন বটে, কিন্তু মান্দ্রাজের বোর্ড অফ্ রেভিনিউ গত শতাব্দীর প্রথমাংশে গ্রামের প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সার্ টমাস মন্‌রোর অভিপ্রায় মত কার্য্য হওয়ায় গ্রাম্য সমাজসমূহের প্রাণহানি হইয়াছে।"

মহীশূরের ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংক্রান্ত কার্য্যবিবরণীতে ২৭০ পৃষ্ঠায় "গ্রামের উন্নতিসাধন-ব্যবস্থা" প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, গ্রামবাসিগণ নগদে ও শারীরিক শ্রমে ঐ বৎসর ৪৭০৮৩ টাকা দিয়াছে, আর রাজ-সরকার ৪৪৯৭৮ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ—"ঐ গ্রাম্য-সমিতিসমূহ এই কার্য্যে বরাবর বিশেষ আগ্রহের পরিচয় দিতেছে, এবং তাহাদের চেষ্টায় রাজ্যের সর্ব্বত্র সাধারণের হিতকর বহু কার্য্য, যেমন বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণ, কূপখনন, রাস্তা-নির্ম্মাণ, জঙ্গল-পরিষ্কার, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি কার্য্য হইতেছে।"

ঐ বৎসর চারিটি জেলায় গ্রাম্য-সমিতিসমূহের সম্মিলনী হইয়াছিল। কার্য্যকারী সমিতিসমূহ কি করিয়াছে, তাহার হিসাব লইবার জন্য, গ্রামের অধিবাসিগণের অভাব অভিযোগ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য, এবং গ্রামসমূহের আর্থিক ও স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য কি কি করা দরকার, তাহার কার্য্য-পদ্ধতি নির্দ্ধারণের জন্য ও তাহা কি প্রকারে কার্য্যে পরিণত করা যায়, তাহার উপায়-উদ্ভাবনের জন্য এই সম্মিলনীসমূহের অধিবেশন হইয়াছিল। গ্রামবাসিগণ আনন্দের সহিত সেই সামাজিক কার্য্যে যোগদান করে। কারণ, এই সমুদয় কার্য্য তাহাদের চিরাচরিত প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহারা গ্রামের উন্নতির জন্য সানন্দে বিনা মজুরিতে পরিশ্রম করিয়াছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইল। প্রাচীনকালে সামাজিক বাধ্য-বাধকতার যে ভাব ছিল, তাহা এখনও আছে এবং মহীশূরের রাজসরকার বুদ্ধিমানের মত ইহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন ও যাহাতে ইহার বৃদ্ধি হয়, সেজন্য চেষ্টা করিতেছেন।

গ্রামের লক্ষণ এইরূপ ছিল—এক জায়গায় অনেকগুলি বাড়ী—তাহার চারিদিকে অনেকখানি কর্ষিত ও অকর্ষিত জমী—প্রত্যেক অধিবাসীর নিষ্কর বাসগৃহ, উঠান ও বাগান। গ্রামে যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী ও শিল্পী ছিল, তাহারা গ্রামের কাজ করিয়া নগদ কিছু পাইত না, তাহাদের জমী দেওয়া থাকিত, এবং গ্রামের উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ তাহারা পারিশ্রমিক হিসাবে পাইত। গ্রামের কর্ম্মচারীর মধ্যে—একজন মণ্ডল, একজন সরকার, একজন চৌকিদার (তাহাকে পুলিশের কাজও কিছু কিছু করিতে হইত) একজন সীমানির্দ্দেশক বা আমিন, জলাশয় ও নদীনালার একজন পরিদর্শক, একজন পূজারি, একজন শিক্ষক, একজন জ্যোতিষী, একজন চিকিৎসক, একজন গায়ক, একজন কবি, একজন নর্ত্তকী, একজন নাপিত, একজন রজক, একজন গোপালক, একজন কুম্ভকার, একজন কর্ম্মকার ও একজন সূত্রধর। যথারীতি নির্ব্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা গঠিত গ্রাম্য-সমিতি কর্ত্তৃক গ্রাম শাসিত হইত এবং বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য শাখা সমিতি থাকিত। সমস্ত জমী সমাজের যৌথ ছিল, তবে মাঝে মাঝে তাহার নূতন বন্দোবস্ত হইত। প্রত্যেক গৃহস্থেরই ভোট ছিল বলিয়া মনে হয়, তবে পঞ্চ বা সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে হইলে কিছু গুণের দরকার ছিল।

সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড কর্ত্তৃক ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে নিযুক্ত বিকেন্দ্রীকরণ তদন্ত-সমিতিতে (ডিসেণ্ট্রালিজেশান কমিশন) ৫ জন ইংরাজ ও একজন এদেশের লোক রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন। তাহার বিবরণীর তৃতীয় খণ্ডের ১৮শ অধ্যায় ৬৯৪ প্যারায় দেখিতে পাই,—

"ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানেই সরকারী শাসন-ব্যবস্থায় গ্রামই রাজ্যতন্ত্রের প্রাথমিক মূল উপাদান—গ্রাম হইতেই বৃহত্তর শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে।"

গেজেটিয়ারে সংগৃহীত প্রাচীন প্রমাণ হইতে গ্রাম ও তাহার প্রথামূলক বিধি, তাহার কর্ম্মচারী, শিল্পী ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি পূর্ব্বোক্তরূপ বর্ণিত দেখিতে পাই। বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, এই সমুদয় গ্রামে পূর্ব্বে বহুল পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন ছিল, কিন্তু "এখন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠা, আধুনিক করসংগ্রহের ও পুলিশের ব্যবস্থা, যাতায়াতের সুবিধা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উদ্ভব এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক প্রজাসত্ত্ববিধান প্রভৃতি—যাহা ক্রমশঃ উত্তর-ভারতবর্ষেও বিস্তৃত হইতেছে, তাহার ফলে এই স্বায়ত্তশাসন এখন লোপ

পাইয়াছে। তাহা হইলেও এখনও গ্রামই শাসন-তন্ত্রের মুখ্য উপকরণ। গ্রামের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ—অর্থাৎ মণ্ডল, সরকার, গ্রাম্য চৌকিদার প্রভৃতি এখন গবর্মেণ্টের বেতনভুক্ এবং গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত। এখনও কিছু কিছু স্বগ্রাম সম্পর্কে আত্মীয়তার ভাব ও সাধারণ স্বার্থবোধ আছে।

"গবর্মেণ্টের বেতনভুক্" এই কথাটিতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, প্রাচীন গ্রাম্যপদ্ধতি কি প্রকারে ধ্বংস করা হইয়াছে। বেতনভুক্ হইলে লোক উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর ভৃত্য হইয়া পড়ে; আর নিম্ন কর্ম্মচারী তহশীলদার, ডেপুটি-কলেক্টর, কলেক্টর প্রভৃতি উচ্চ কর্ম্মচারীর প্রতিই অনুগ্রহ ও পুরস্কারের জন্য চাহিয়া থাকে, গ্রামের লোকের প্রতি নহে। এই প্রকারে তাহারা গ্রামের সেবক না হইয়া পীড়ক হইয়া পড়ে এবং স্বগ্রামবাসীর প্রতি দায়িত্ববোধ—যাহা গ্রাম্যজীবনের সর্ব্বস্ব—তাহা ধ্বংস হইয়া যায়।

ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, ইংরাজের শাসনাধীনে পল্লীসমাজ একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তবে এই কার্য্যবিবরণী জোরের সহিত অনুরোধ করিয়াছেন যে, সেগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হউক। দেখা যায় যে, কমিশনে কোন কোন সাক্ষী সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, "দেশের অধিবাসিগণের কি তেমন উচ্চশিক্ষা ও স্বাধীনভাব আছে যে, তাহারা গ্রামে কথঞ্চিৎ স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার উপভোগ করিতে পারিবে ?" আমলা-তন্ত্রের যাহা প্রাণের কথা, তাহাও ঠিক ইহাই। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া গ্রামগুলি স্বায়ত্তশাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কত আক্রমণ হইয়া গিয়াছে, শাসনের কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, কত যুগ চলিয়া গিয়াছে, তথাপি তাহারা জীবিত ছিল। আর আজ তাহারা দেড় শত বৎসর ইংরাজ-শাসনের অধীনে থাকিয়া নিজেদের কাজ চালাইতে অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে! ইহাই তো সাক্ষীর মনের কথা। যে শাসনকে উন্নতিকর বলা হয়, সেই শাসনের অধীনে এমন আশ্চর্য্য অধঃপতন কেন হইল ? কারণ আর কিছুই নহে, আমলাতন্ত্রের বাঁধা ছাঁধা নিয়মের বন্ধনই এই কারণ। যাহা কিছু আমলাতন্ত্রের মনোমত হয় নাই, তাহাই তাহারা কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলিয়াছে। শাসনকার্য্যের জন্য গ্রামবাসীদের নিজস্ব বিধিব্যবস্থা ছিল, তাহাতে তাহাদের কাজকর্ম্ম ভালরূপ চলিয়া যাইত। কিন্তু কালেক্টর সাহেবের পদ্ধতি ভিন্নরূপ, সুতরাং গ্রামবাসীদের পদ্ধতি খারাপ। একমাত্র 'হোমরুল'ই গ্রামের শাসন পুনর্ব্বার সংবদ্ধ করিবে।

যাহা হউক, ঐ কার্য্যবিবরণী পঞ্চায়ৎ-পদ্ধতির উন্নতি চাহিয়াছে—১৩৬ প্যারায় বলা হইয়াছে :—

"আমরা মনে করি যে, যখন স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, গ্রামে পঞ্চায়েৎ-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিয়া আরব্ধ হওয়া উচিত, তখন অতঃপর জেলা অপেক্ষা অল্প আয়তনের ভূখণ্ড লইয়া বোর্ড গঠন আবশ্যক; সেই জন্য আমাদের ইচ্ছা, সর্ব্বত্র জেলার অধীনে ছোট ছোট বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হউক। সেইগুলি গ্রাম্য বোর্ড ব্যবস্থার প্রধান যন্ত্রস্বরূপ হইবে।"

দুঃখের বিষয়, এই বিবরণীতে এমন একটি সর্ত্ত নিবিষ্ট হইয়াছে যে, ইহার উদ্দেশ্য যতই সাধু হউক, ইহার সাফল্য একেবারেই অসম্ভব। কারণ, কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ,—"ইহা একান্তাবশ্যক যে, পঞ্চায়েৎ-ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে জেলার কর্ত্তৃগণের দৃষ্টির ও তত্ত্বাবধানের অধীন থাকিবে। গ্রামের সমস্ত কার্য্যের পরিদর্শন এখন যেরূপ তহশীলদার ও মহকুমার কর্ত্তার অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য, পরেও তাহাই থাকিবে।"

একটী শিশুর হস্তপদ বন্ধন কর, এবং তাহার পর তাহাকে বল যে, সে হাঁটিতে শিখুক। যদি সে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে দোষ দাও। স্বাধীন শিশু আছাড় খাইয়া খাইয়াই দেহের ভারকেন্দ্র রক্ষা করিতে শিখে। শিশুকে বাঁধা রাখিলে সে চলচ্ছক্তিবিহীন হইয়া পড়ে, এবং কখনই হাঁটিতে শেখে না।

মাননীয় মিঃ টি, রঙ্গচারিয়ার যে সুন্দর ব্যবস্থাটি মান্দ্রাজের মন্ত্রণাসভায় প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন, আমি আশা করি যে, ভারতসচিব মহাশয় সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া আইনের দ্বারা পঞ্চায়েৎ-প্রথা প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিবেন। আমি মিঃ রঙ্গচারিয়ারের সযত্ন-রচিত ও মূল্যবান্ ব্যবস্থা পত্রটি ভারতসচিবকে দিয়াছি। ইহা অসম্ভব নহে যে, যাহা মান্দ্রাজে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা পার্লামেন্টে গৃহীত হইবে।

পঞ্চায়েৎ-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমি অন্যত্র যাহা বলিয়াছি, এখানে তাহা উদ্ধার করিলাম।

গ্রামের প্রয়োজনগুলি এই প্রকারে জ্ঞাপিত হইবে। যদি দরকার হয়, তাহা হইলে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট পঞ্চায়েৎ তাহা বিজ্ঞাপন করিবেন। গ্রামের যাহা বক্তব্য, পঞ্চায়েতের মারফত গ্রাম তাহা ব্যক্ত করিবে। আর তাহারা এখনকার মত পরমুখাপেক্ষীও থাকিবে না। গ্রামগুলি বৃহত্তর জীবনের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত হইবে। পঞ্চায়েৎ গ্রামে বক্তাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে পারিবেন। গ্রামের লোক যাহাতে বিচার-বিতর্ক করিতে পারে,

তাহার ব্যবস্থা করিবেন, গ্রামবাসিগণের জন্য আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়ার বন্দোবস্ত করিবেন। সমগ্র গ্রাম্যজীবনকে আরও উন্নত করিতে হইবে, নানারূপ ব্যবস্থার দ্বারা আরও প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করিতে হইবে। আর এক কথা এই যে, প্রত্যেক গ্রাম একটী গ্রামগুচ্ছের অন্তর্গত থাকিয়া, অন্যান্য গ্রামের সহিত যে তাহার যোগ আছে, ইহা অনুভব করিবে, এবং এই প্রকারে বৃহত্তর সংহত জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে বিরাজ করিবে।

গ্রাম যেমন সমগ্র দেশের শাসন-ব্যবস্থারূপ সমষ্টির ব্যষ্টি, ওয়ার্ডগুলিও সহরের পক্ষে সেইরূপ। গ্রামে যেমন পঞ্চায়েৎ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, সহরেও তেমনই প্রত্যেক গৃহস্থের ভোট লইয়া ওয়ার্ড-পঞ্চায়েৎ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যে সমস্ত সহরের লোকসংখ্যা ৫ হাজারের অধিক, তাহার প্রত্যেকটীতে মিউনি-সিপ্যালিটীর অধীনে ওয়ার্ড-পঞ্চায়েৎ-সমূহ থাকিবে। যে সমুদায় সহরের লোক-সংখ্যা ৫ হাজারের কম, তথায় মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃত্বের পরিবর্ত্তে ওয়ার্ড-পঞ্চায়েতের হাতে কর্ত্তৃত্বভার থাকিবে। এই সমুদয় ওয়ার্ড-সভা সহরের ছোট ছোট ব্যাপারগুলির ভার গ্রহণ করিবে। এখন এই সমস্ত ব্যাপার উপেক্ষিত হয়। কারণ, মিউনিসিপ্যালিটীর উপর কাজের ভার এত বেশী যে, এগুলি তাহারা যথাযথ দেখিতে পারে না। প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ভার ইহাদের উপর থাকিবে। জঞ্জাল পরিষ্কার ও সাধারণ ভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা, পথ ও শৌচাগার পরিষ্কার রাখা, ভাড়ার গাড়ী ও অন্যান্য গাড়ীর বিশ্রামস্থানগুলির পর্য্যবেক্ষণ, ঘোড়া ও অন্যান্য পশুর জলপান করিবার চৌবাচ্চাসমূহের পরিদর্শন, খাদ্যদ্রব্য-পরিদর্শন ও ভেজাল নিবারণ, স্থানীয় বিচারক নিযুক্ত করিয়া মোকর্দ্দমা নিবারণের উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের মত সালিসের সাহায্যে ছোট ছোট মামলার নিষ্পত্তির ব্যবস্থা, কারখানা, কূপ প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণ, এই সকল কার্য্য স্বভাবতঃই ওয়ার্ড-সমিতির হস্তে যাইয়া পড়িবে। যেখানে মিউনিসিপ্যালিটী আছে, সেখানে মিউনিসিপ্যালিটী ওয়ার্ড-সমিতির হস্তে যে সমস্ত কার্য্যের ভার দেওয়া সঙ্গত মনে করেন, সে সমুদয় কার্য্যের ভার দিবেন।

(গ) তালুক বা তহশীল বোর্ড।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সোপান পরম্পরার যাহা পরবর্ত্তী সোপান তাহা পঞ্চায়েৎ ও জেলাবোর্ডের মধ্যবর্ত্তী সমিতি। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ইহার নাম বিভিন্ন হইবে। আমাদের মান্দ্রাজে সমুদয় প্রদেশ ২৬টী জেলায় বিভক্ত; আর এই ২৬টী জেলা ৯৬টী তালুকে বিভক্ত। সুবিধার জন্য সাধারণ ভাবে এই

তালুকগুলিকে সব-ডিষ্ট্রিক্ট বলা যাইতে পারে। বিকেন্দ্রীকরণ কমিশনের কার্য্যবিবরণীতে এই নামই ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহা হউক, এই তালুক বা মান্দ্রাজের বাহিরে তাহার যাহা নাম, সেই স্থানগুলি, একটী বোর্ডের দ্বারা শাসিত হইবে। বিবরণীতে এগুলিকে সব্‌-জেলা-বোর্ড বলা হইয়াছে, কিন্তু পঞ্চায়েৎ ও জেলা-বোর্ডের মধ্যবর্ত্তী বোর্ড কর্ত্তৃক শাসিত ভূখণ্ডের পূর্ব্ব হইতেই তালুক বা তহশীল, এই নামটী থাকায়, তালুক বা তহশীল বোর্ড এই নামটী আপনা হইতে মনে আসে। প্রত্যেক তালুক বা তহশীলে যে বোর্ড থাকিবে, তাহার সদস্যগণ, তৎশাসনাধীন ভূখণ্ডের পঞ্চায়েৎগণ ও ফিরকার ভোট দাতৃগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবে। ভোট দিবার অধিকার সম্পত্তি দেখিয়া নির্দ্ধারিত হইবে, এবং সময়ে সময়ে তাহা সংশোধিত হইবে। পঞ্চায়েৎগণ সাধারণের কাজ করিবার বিনিময়ে আর একটী ভোটের অধিকারী হইবেন, এবং তাঁহাদের যিনি প্রধান তাঁহাকে তালুক-বোর্ডে পাঠাইয়া তাঁহার নিজের গ্রামের যে যে বিশেষ স্বার্থ, সেগুলি বিবৃত করাইতে পারিবেন। বিকেন্দ্রীকরণ কমিশন খুব জোরের সহিত বলিয়াছেন যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-পদ্ধতির বিধানে এই বোর্ড গুলি অত্যন্ত আবশ্যক অংশ বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই বোর্ডগুলির হস্তে আবশ্যক মত অর্থ ও উপযুক্ত ক্ষমতা দিতে হইবে, এবং তাহাদের বহুল-পরিমাণে স্বাধীনতা থাকিবে। মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়, উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়, গ্রামে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র, এবং সহরে কলাভবন রক্ষা করা, তালুক বা তহশীল-বোর্ডের কার্য্য হইবে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যে রাস্তা গিয়াছে, সেই সকল রাস্তা, দরকার হইলে রাস্তায় আলো দেওয়া, গ্রামের বাহিরে কিন্তু তালুকের ভিতরে পয়ঃপ্রণালীর ও সেচের খাল, এই সমুদয় ইহাদের অধীন থাকিবে। তাহারা যৌথসমিতিসমূহ গঠন করিবে; যেখানে এ সমুদয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সেখানে গ্রামবাসিগণকে ভাড়া দিবার জন্য কৃষিকার্য্যের যন্ত্রসমূহ রাখিবে। শস্যসঞ্চয় করিবার ভাণ্ডার, গোপালন ও দুগ্ধ সরবরাহের ভাণ্ডার, এবং বৎস-উৎপাদনের জন্য বৃষ ও ঘোটক-উৎপাদনের জন্য অশ্বের ব্যবস্থা করিবে। আসল কথা, যেখানে যৌথ-সমিতি নাই, সেখানে তাহারা কৃষি ও শিল্পের সুব্যবস্থার যাবতীয় বিধান সম্পন্ন করিবে।

(ঘ) জেলা বোর্ড।

আমাদের মধ্যে এমন অনেক রাজনীতিক সংস্কারক আছেন, যাঁহারা জেলা বোর্ড তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী। আমি এখন যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে জেলা-বোর্ডগুলি রাখাই সঙ্গত মনে করি।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের তৃতীয় সোপান—গ্রাম-দেশে জেলা বোর্ড-সমূহ, আর বড় বড় সহরে মিউনিসিপ্যালিটীসমূহ। অধীনস্থ তালুক-বোর্ডসমূহ ও তালুকের সাধারণ ভোটদাতারা জেলা-বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন। যেমন পঞ্চায়ৎগণ সাধারণের কার্য্য করেন বলিয়া একটী দ্বিতীয় ভোটের অধিকারী, তালুক বোর্ডের সভ্যগণও সেইরূপ আর একটী ভোটের অধিকারী হইবেন।

সমগ্র জেলার সহিত যে সমুদয় ব্যাপারের সম্বন্ধ, সেই সমুদয় ব্যাপার জেলা-বোর্ডের হাতে থাকিবে। তাহারা তালুক বোর্ডের সমুদয় কার্য্য পরিদর্শন করিবে, তালুক বোর্ডের বিচারনিষ্পত্তির বিরুদ্ধে পঞ্চায়ৎগণ কোনও আপীল করিলে, তাহার নিষ্পত্তি করিবে। স্থানীয় করের কত অংশ তালুক আদায় করিবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে; এবং প্রাদেশিক সভা জেলার জন্য যাহা মঞ্জুর করিবেন, তাহার কত অংশ কোন্ তালুক পাইবে, তাহাও নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে। জেলা বোর্ড জেলার সাধারণ পূর্ত্ত-বিভাগের জন্য ইঞ্জিনীয়ার, তালুকের উচ্চ শ্রেণীর ও মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ের জন্য পরিদর্শক, স্বাস্থ্য-পরিদর্শক প্রভৃতি, নিযুক্ত করিবে। সরকারী রাস্তা, স্থানীয় রেল, খাল প্রভৃতি তাহাদের হাতে থাকিবে। জেলার সদর-সহরে জেলার আপিস আদালত প্রভৃতি এবং শিল্পবিজ্ঞান, কৃষি, হস্তশিল্প প্রভৃতির জন্য কলেজসমূহ থাকিবে।

এমন কি, লর্ড রিপণের সময়েও, স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিস্বরূপ দুই একটি দুর্ব্বল প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল। কীন বলেন, "হোমরুলের বীজ পূর্ব্ব হইতেই ছিল, কেবল যে পল্লীগ্রামেই প্রাচীন ও চিরাগত প্রতিষ্ঠানসমূহ ছিল—যাহাদের কথা সর্ব্বদাই বর্ণিত হইয়া থাকে—তাহা নহে, ছোট ও বড় সহরে স্থানীয় সভা কর্ত্তৃকই জঞ্জাল পরিষ্কার এবং রাস্তাগুলি ঠিক ঠাক রাখা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হইত।"

এই কয় বৎসর উন্নতি খুব কম হইলেও, কিছু উন্নতি হইয়াছে। যখন বোর্ডের সমুদয় সদস্যই নির্ব্বাচিত সদস্য হইবেন, সভাপতিও নির্ব্বাচিত হইবেন, এবং শাসিত ক্ষেত্রের উপর বোর্ড প্রকৃত কর্ত্তৃত্বলাভ করিবে, তখন ক্ষিপ্রগতিতে উন্নতি হইবে। 'হোমরুলে'র অত্যাবশ্যক অংশরূপে যখন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন আমরা দেখিতে পাইব যে, গ্রাম্য পঞ্চায়তেরা তুড়্ মঠোকা, বেতমারা প্রভৃতি অপমানজনক শাস্তিসমূহ উঠাইয়া দিয়াছে, এবং গ্রামবাসিগণ সম্মানের যোগ্য স্বাধীন মনুষ্যের প্রাপ্য ব্যবহার পাইতেছে। অধিকন্তু সুবিধা-জনক কেন্দ্রসমূহে কৃষিশিক্ষা দেওয়া হইতেছে, এবং শিক্ষা ও পরীক্ষার জন্য আদর্শ

কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহীশূরে এই প্রকারের তিনটী কৃষিক্ষেত্র আছে। উন্নততর কৃষিপদ্ধতির অবলম্বন, উপযুক্ত সার ও উৎকৃষ্ট বীজপ্রাপ্তি বিষয়ে রায়তগণকে সাহায্য করা হইবে। বনবিভাগের আইনসমূহ পরিবর্ত্তিত হইবে, এবং প্রাচীনকালে যেমন পশুচারণের জন্য ভূমি প্রদত্ত হইত, সেইরূপ দেওয়া হইবে। শেষ কার্য্যবিবরণীতে দেখিতে পাই যে,—মহীশূর রাজ্যে ছাগল ছাড়া অন্যান্য সমুদয় গৃহপালিত পশুদের চারণের জন্য বনের অধিকাংশ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। গ্রামের যেমন অবস্থা, সেই অবস্থার উপযোগী গ্রাম্য বিদ্যালয়-সমূহ পঞ্চায়েৎগণ পরিদর্শন করিবেন, অধিকবয়স্ক রায়তগণের মধ্যে যাহারা লেখাপড়া শিখিতে চাহে, তাহাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবেন। আর তালুকবোর্ড, যেরূপ বলা হইল, সেইরূপ ষাঁড়রক্ষা, শস্যসঞ্চয়, কৃষিযন্ত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে। ন্যায্য ভাড়া দিয়া লোকে তাহা ব্যবহার করিবে। ভাল বুদ্ধিমান ছেলেদের বৃত্তি দিয়া, যাহাতে তাহারা স্কুল হইতে কলেজে যাইতে পারে, বা ভালরূপ কৃষিশিল্প অথবা হস্তশিল্প শিক্ষা করিতে পারে, তাহার সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। এই সমস্ত স্বপ্ন কথা নহে, অন্যান্য সভ্যদেশে যেখানে হোমরুল আছে, সেখানে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। জাপানের সম্রাটের শিক্ষাবিষয়ক অনুজ্ঞা—যাহা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, তাহাতে তিনি আদেশ করেন যে, "আজ হইতে এমনভাবে শিক্ষার বিস্তার করা হইবে যে, কোনও গ্রামে একটিও অশিক্ষিত পরিবার থাকিবে না, এবং কোনও পরিবারে এক জনও অশিক্ষিত থাকিবে না।" আমরা দেখিয়াছি, ইহার ২৪ বৎসর পরে, জাপানে, বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত-বয়স্ক বালকবালিকাগণের মধ্যে শতকরা ৯২ জন বিদ্যালয়ে যাইতেছে। ভারতবর্ষের শিক্ষাকার্য্য যখন দেশের লোকের দ্বারা চালিত হইবে, তখন জাপান যাহা করিয়াছে, ভারতবর্ষ কেন তাহা করিতে পারিবে না? কারণ, এ কথাটী ভুলিলে চলিবে না যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মূল তাহাদের পিতৃপিতামহের গ্রামে প্রতিষ্ঠিত, এবং অনেক উকীলের কুটুম্ব রায়ত। জাতিভেদ সত্ত্বেও পাশ্চাত্যদেশ অপেক্ষা এ দেশে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্মিশ্রণ অনেক বেশী, এবং সহরের ও গ্রামের অধিবাসিগণের মধ্যে সম্বন্ধও বেশ ঘনিষ্ঠ। রায়তের পরিবারের বুদ্ধিমান্ বালক উকীল হয়; যাহার তেমন বুদ্ধি নাই, সে রায়ত থাকিয়া যায়। দেশবাসিগণের মধ্যে পরস্পরের এই যে সজীব সহানুভূতি, জাতীয় মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশন হইতে তাহা অনেক মন্তব্যে আন্তরিকতার সহিত প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। যখন আমরা হোমরুল পাইব, তখন এই সমুদয় মন্তব্য কার্য্যে পরিণত হইবে।

(ঙ) স্থানীয় গবর্মেণ্ট বোর্ড।

স্থানীয় শাসনপদ্ধতির মাথার উপর একটী স্থানীয় গবর্মেণ্ট বোর্ড থাকিবে, ইহার কার্য্যসমূহ প্রাদেশিক মন্ত্রণাসভার আইনের দ্বারা স্পষ্টরূপে বিধিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। এই আইন ও এই আইনের সমর্থক অন্যান্য বিধানগুলি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের লোকাল গবর্মেণ্টের আইনের ধরণে হইবে। গত মাসে দিল্লীতে হোমরুল সমিতিসমূহের আবেদনপত্রে ইহাই প্রস্তাবিত হইয়াছে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডের রাজকীয় স্বাস্থ্য-কমিশন যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এ স্থলে বেশ প্রযোজ্য। অবশ্য ঐ মন্তব্য তথাকার বিশেষ অবস্থার অনুরোধে এক জন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারীর নিয়োগ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে,—

"এক জন পরিচিত ও বিশেষ শক্তিশালী মন্ত্রী থাকিবেন; তিনি যে সমুদয় শাসনশক্তি কেন্দ্রস্থ করিবেন, অর্থাৎ নিজের হাতে লইবেন, তাহা নহে। পক্ষান্তরে, তিনি স্থানীয় শাসন-কার্য্যের প্রাণ-শক্তিকে ক্রিয়ান্বিত রাখিবেন—প্রকৃত কেন্দ্রস্থ চালকশক্তির যাহা কার্য্য, ঠিক তাহাই করিবেন। সাহায্যের জন্য, উপদেশের জন্য দেশের যাবতীয় স্থানীয় গবর্মেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ এই কেন্দ্রশক্তির শরণ লইবেন।"

ইংলণ্ডের স্থানীয় গবর্মেণ্টের চারি দিকে যে সমুদয় অসুবিধা, তাহার বর্ণনায় কমিশনরগণ যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের মান্দ্রাজের মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি যে নৈরাশ্যপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই স্মরণ হয়।—

"লোকদিগের ভীষণ ঔদাসীন্য দূর করা বড়ই দুরূহ। নিজের উপর ট্যাক্স বসাইতে সকলেই নারাজ; কাজের বেলায় বিজ্ঞানের উপর কাহারও বিশ্বাস নাই। স্বাস্থ্যবিষয়ক বিধান ভঙ্গ করিয়া যাহারা আনন্দ পায়, তাহাদের সংখ্যা খুব অধিক; এমন কি, যাহারা স্থানীয় ব্যাপারের কর্ত্তা, এবং আইন অনুসারে যাহাতে কাজ হয়, ইহা দেখা যাহাদের কর্ত্তব্য, তাহাদের মধ্যে অনেকেও এই দলের।"

ভারতপ্রবাসী ইংরাজেরা সম্পূর্ণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দিতে অনিচ্ছুক। তাঁহারা যে অল্প কিছু দিয়া বহুকাল ধরিয়া তাহার পরীক্ষা চালাইতে চাহেন, ইহার হেতুস্বরূপে এই সমুদয় বাধারই দোহাই দেন। ইংলণ্ডেও ইংরাজের সম্মুখে এই সমুদয় বাধা বিদ্যমান, অথচ তাঁহারা মনে করেন যে, এই সমুদয় বাধা আছে বলিয়াই স্থানীয় লোকের স্বায়ত্তশাসনের শক্তিকে সঞ্চালিত করা উচিত।

ইংলণ্ডের এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল—"সরকারি একটি বিভাগে সাধারণের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিধি-সমূহ, দরিদ্রগণকে সাহায্যদান ও স্থানীয় গবর্মেণ্টের পরিদর্শন কেন্দ্রীভূত করা।"

অবৈতনিক সদস্যগণের দ্বারা এই বোর্ড গঠিত, তাহারা কিছুই করে না। কাউন্সিলের লর্ড প্রেসিডেণ্ট, রাজ্যের সমুদয় সচিবগণ, লর্ড প্রিভিসিল, প্রধান ধনাধ্যক্ষও ইহার সদস্য। সুতরাং এই বোর্ড খুব সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত। এই বোর্ডের যে কিছু করিবার শক্তি আছে, তাহা বোর্ডের সভাপতি করিয়া থাকেন। তিনি সাধারণতঃ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য ও এক জন মন্ত্রণা-সভার সদস্য। বার্ষিক বেতন ২৬ শত পাউণ্ড। তাঁহার এক জন স্থায়ী সম্পাদক, পাঁচ জন সহকারী সম্পাদক, এক জন ব্যবস্থাপক, এক জন প্রধান পূর্ত্তকার্য্যের পরিদর্শক, এক জন প্রধান চিকিৎসক ও তাঁহার অধীনে অনেকগুলি চিকিৎসক-পরিদর্শক, কয়েক জন স্থপতি, কয়েক জন ইঞ্জিনিয়ার, ও তাহা ছাড়া সরকারী আফিসে সাধারণতঃ যেমন লোকজন থাকে তাহা আছে। আমরা রাজ্যশাসনের জন্য যে কার্য্যকরী সভার সৃষ্টি করিতে বলিতেছি, তাহার শাসনাধীনে এক জন ভারতীয় সদস্য যদি স্থানীয় গবর্মেণ্টের সভাপতি হন, আর কেবল শোভাবর্দ্ধনের জন্য যে বোর্ড, তাহা বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতেই কাজ হইবে।

বোর্ডের কর্ত্তব্য অনেক প্রকারে বাড়িয়া গিয়াছে। ১৮৩৫ ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পার্লিয়ামেণ্টের ৪১টি বিধানের দ্বারা ও ১৮৭১ হইতে ১৯০৭, এই সময়ের মধ্যে ১৫৪টী বিধানের দ্বারা দরিদ্র-আইনের কমিশনরগণের ও দরিদ্র-আইনের বোর্ডের যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহা এই বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। খণ্ডব্যবস্থা, নির্দ্দেশসমূহ, গৌণবিধানসমূহ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার এখন আমার সাহস হইতেছে না। যখন আমাদের বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত হইবেন, তখন তিনি সে সমুদয়ের আলোচনা করিবেন।

প্রাদেশিক মন্ত্রণাসভা ও প্রধান মন্ত্রণাসভা।

জাতীয় মহাসমিতির ও নিখিল-ভারতীয় মুসলমান-সমিতির ব্যবস্থাপত্র দেশবাসিগণের সম্মুখে এক বৎসর কাল রহিয়াছে, এবং ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও ভারত-সচিবের নিকট তাহা উপস্থাপিত হইয়াছে। আমি সে সম্বন্ধে এখানে বিচার করিব না; কারণ, গত দুই বৎসর কাল সকল দিক হইতে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিচারিত হইয়াছে। আমরা সকলে সরলভাবে ও উৎসাহের সহিত

সেই ব্যবস্থার বশবর্ত্তী থাকিয়া কার্য্য করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রাচীন যুগ ও নবীন যুগের যে সন্ধিকাল, সেই কালের জন্য ঐ ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছিল। সেই যুগসন্ধিকালে দেশ যাহাতে সেই ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য করিতে পারে, সে জন্য দেশকে প্রস্তুত করা আমাদের কর্ত্তব্য। ব্যবস্থাপক-সভার ১৯ জন সদস্য যে ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন, তাহাতে যুদ্ধের পর যে সমুদয় সংস্কার হওয়া উচিত, তাহারই কথা আছে। জাতীয় সমিতি ও মুসলমান-সমিতির ব্যবস্থাপত্র একটি সেতুর মত। বর্ত্তমান অবস্থা হইতে, গত বৎসরের জাতীয় মহাসমিতির মন্তব্যে যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, সে অবস্থায় পহুঁছিবার সেতু। জাতীয় মহাসমিতির মন্তব্যের সে অংশ এই :—

"সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনকালে ভারতবর্ষ পরাধীনতার অবস্থা হইতে স্বায়ত্ত-শাসনাধীন রাজ্যসমূহের সহিত সাম্রাজ্যের সকল ব্যাপারে সমান অধিকার পাইবে।" ইহাই এখন আমাদের আসন্ন লক্ষ্য। কন্‌গ্রেসের ব্যবস্থাপত্র যত দিন না স্বীকৃত হইতেছে, তত দিন আমরা ক্রমাগত আন্দোলন করিতে থাকিব। শেষ ব্যবস্থা অবশ্য এই থাকিবে যে, পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্ত-শাসনে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যগুলি যথাযোগ্য স্থান পাইবে, এবং সাম্রাজ্যের মহাসভায় ভারতবর্ষের প্রতিনিধিগণ বসিবেন। এই সমুদয় কথা আমরা ঐ ব্যবস্থাপত্রে বাদ দিয়াছি।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভাগুলি কি করিবেন, এই সাধারণ প্রশ্নের উত্তরে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, জেলাবোর্ডকে টাকা মঞ্জুর করা তাহাদের কার্য্য হইবে। জেলাবোর্ড আবার তাহাদের অধীনস্থ তালুকবোর্ড ও গ্রাম্য-বোর্ডকে টাকা বিতরণ করিবে। মঞ্জুরী টাকা কি ভাবে ব্যবহার হয়, তাহাতে হস্তক্ষেপ করা হইবে না; তবে যখন খুব সুস্পষ্ট অনিয়মিত কার্য্য হইবে, তখন স্থানীয় গবর্মেণ্টের সভাপতির হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত হইবে। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনকে যদি প্রকৃত কিছু করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে কাজ করিবার ও ভুল করিবার স্বাধীনতাও দিতে হইবে। তবে ঐ ভুল যেন একেবারে সর্ব্বনেশে না হয়।

তাঁহাদের আর একটী প্রধান কার্য্য এই হইবে যে, তাঁহারা সমগ্র প্রদেশে শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করিবেন। সাধারণের হিতকর যাহা কিছু, তাহার পরীক্ষা বিষয়ে জেলা-বোর্ডগুলিকে সাহায্য করিবেন। এইরূপ করিলে একই বিষয়ের অনুসন্ধান পুনঃ পুনঃ করিবার যে ব্যর্থশ্রম, তাহা নিবারিত হইবে। এই প্রকারে মহীশূর-রাজ্যে 'রাগী'-ধান্য, ইক্ষু, চীনাবাদাম, আরেকা বাদাম,

সেই ব্যবস্থার বশবর্ত্তী থাকিয়া কার্য্য করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রাচীন যুগ ও নবীন যুগের যে সন্ধিকাল, সেই কালের জন্য ঐ ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছিল। সেই যুগসন্ধিকালে দেশ যাহাতে সেই ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য করিতে পারে, সে জন্য দেশকে প্রস্তুত করা আমাদের কর্ত্তব্য। ব্যবস্থাপক-সভার ১৯ জন সদস্য যে ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন, তাহাতে যুদ্ধের পর যে সমুদয় সংস্কার হওয়া উচিত, তাহারই কথা আছে। জাতীয় সমিতি ও মুসলমান-সমিতির ব্যবস্থাপত্র একটি সেতুর মত। বর্ত্তমান অবস্থা হইতে, গত বৎসরের জাতীয় মহাসমিতির মন্তব্যে যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, সে অবস্থায় পহুঁছিবার সেতু। জাতীয় মহাসমিতির মন্তব্যের সে অংশ এই :—

"সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনকালে ভারতবর্ষ পরাধীনতার অবস্থা হইতে স্বায়ত্ত-শাসনাধীন রাজ্যসমূহের সহিত সাম্রাজ্যের সকল ব্যাপারে সমান অধিকার পাইবে।" ইহাই এখন আমাদের আসন্ন লক্ষ্য। কন্‌গ্রেসের ব্যবস্থাপত্র যত দিন না স্বীকৃত হইতেছে, তত দিন আমরা ক্রমাগত আন্দোলন করিতে থাকিব। শেষ ব্যবস্থা অবশ্য এই থাকিবে যে, পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্ত-শাসনে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যগুলি যথাযোগ্য স্থান পাইবে, এবং সাম্রাজ্যের মহাসভায় ভারতবর্ষের প্রতিনিধিগণ বসিবেন। এই সমুদয় কথা আমরা ঐ ব্যবস্থাপত্রে বাদ দিয়াছি।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভাগুলি কি করিবেন, এই সাধারণ প্রশ্নের উত্তরে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, জেলাবোর্ডকে টাকা মঞ্জুর করা তাহাদের কার্য্য হইবে। জেলাবোর্ড আবার তাহাদের অধীনস্থ তালুকবোর্ড ও গ্রাম্য-বোর্ডকে টাকা বিতরণ করিবে। মঞ্জুরী টাকা কি ভাবে ব্যবহার হয়, তাহাতে হস্তক্ষেপ করা হইবে না; তবে যখন খুব সুস্পষ্ট অনিয়মিত কার্য্য হইবে, তখন স্থানীয় গবর্মেণ্টের সভাপতির হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত হইবে। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনকে যদি প্রকৃত কিছু করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে কাজ করিবার ও ভুল করিবার স্বাধীনতাও দিতে হইবে। তবে ঐ ভুল যেন একেবারে সর্ব্বনেশে না হয়।

তাঁহাদের আর একটী প্রধান কার্য্য এই হইবে যে, তাঁহারা সমগ্র প্রদেশে শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করিবেন। সাধারণের হিতকর যাহা কিছু, তাহার পরীক্ষা বিষয়ে জেলা-বোর্ডগুলিকে সাহায্য করিবেন। এইরূপ করিলে একই বিষয়ের অনুসন্ধান পুনঃ পুনঃ করিবার যে ব্যর্থশ্রম, তাহা নিবারিত হইবে। এই প্রকারে মহীশূর-রাজ্যে 'রাগী'-ধান্য, ইক্ষু, চীনাবাদাম, আরেকা বাদাম,

তুলা, এই সকল সম্বন্ধে যে পরীক্ষাগুলি হইয়াছে, তাহা সমস্ত রাজ্যেরই উপকারে লাগিয়াছে। বড় ও ছোট কল, দধিমন্থনাদি, লাঙ্গল-চালন, বীজ-সাজান প্রভৃতি ব্যাপারের প্রদর্শনী-কার্য্য প্রাদেশিক কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক চালিত হইলেই সম্ভবতঃ ভাল হইবে। তালের চিনি প্রস্তুত করিবার ও পশুদেহোদ্ভূত সার রক্ষা করিবার উন্নত পদ্ধতিসমূহের প্রদর্শনীও তাহাদের দ্বারা হইলে ভাল হয়। মহীশূরে এই সমুদয় পরীক্ষা দেখিবার জন্য বহুসংখ্যক রায়তের সমাগম হইত। বক্তৃতা ও চলিত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ বিতরণ-কার্য্যও সেখানে হইত। ছয় প্রকারের নূতন লাঙ্গল প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং ভাড়ায় খরিদ পদ্ধতিতে বিক্রীত হইয়াছিল। ধাতুদ্রব্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ, ছত্রক-তত্ত্ব ও কীটতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণাও সুসজ্জিত কেন্দ্রস্থ পরীক্ষাগারের দ্বারাই উৎকৃষ্টরূপে অনুষ্ঠিত হয়। অভিজ্ঞতা-লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বিভাগের স্বরূপ নির্ণীত হইবে। মহীশূররাজ্যে রায়তগণ এই সকল উপদেশ সাগ্রহে শুনিতেছে, রিপোর্টে ইহা পড়িয়া খুব আনন্দ হয়।

একটা ভারতবর্ষীয় রাজ্যে ভারতীয়গণ তাহাদের স্বদেশবাসিগণের জন্য কি করিয়াছে, তাহা জানাইবার জন্যই আমি এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। যাহারা শঙ্কিত, ইহাতে তাহারা সান্ত্বনা পাইবে, এবং বুঝিতে পারিবে যে, হোমরুল বলিতে সমৃদ্ধি বুঝায়, দুর্দ্দৈব নহে।

পর্য্যায়-ক্রমিক স্বায়ত্তশাসন।

সম্প্রতি দেশে এক নূতন ভুঁইফোঁড় ব্যবস্থাপ্রসঙ্গ গজাইয়া উঠিয়াছে। এ জন্য পূর্ব্ব হইতে ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে বেশ যত্নপূর্ব্বক প্রাথমিক আভাস হইতেছিল। ইহা পর্য্যায়ক্রমিক স্বায়ত্তশাসন নামে পরিচিত। ইউরোপীয়গণ সাগ্রহে ইহার সমর্থন করিতেছেন।

এই ব্যবস্থাপ্রণালী দুই দল কর্ত্তা খাড়া করিতে চায়। এক দল এখন যেমন আছে, ঠিক সেইরূপ হইবে; অর্থাৎ, দেশের লোকের নিকট তাহাদের দায়িত্ব থাকিবে না। টাকাকড়ির উপর অর্থাৎ প্রকৃত শক্তির উপর তাহাদের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। আর এক দল দায়িত্ব-সম্পন্ন,—মন্ত্রণাসভার প্রাণশূন্য ছায়াদেহের মত। তাহারা মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইবে, সরকারের এক বা ততোধিক বিভাগ শাসন করিবে, এবং আসল গবমেণ্ট যদি অনুমোদন করেন, তাহা হইলে ক্রমে অধিক ক্ষমতা পাইবে; আর সরকার যদি অপছন্দ করেন, তাহা

হইলে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহাও কাড়িয়া লওয়া হইবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার মত আবশ্যক বিভাগ তাঁহাদের হাতে দিয়া, তাহাদের পরাজয় যাহাতে নিশ্চিত হয়; আসল গবমেণ্ট তাহার ব্যবস্থা সহজেই করিতে পারেন। কারণ, এই দুই বিভাগে খুব বেশী টাকার দরকার। এই দুই বিভাগের ভার দিয়া আসল গবমেণ্ট বলিবেন যে, সরকারের এখন টাকার খুব দরকার, সুতরাং তোমরা বেশী টাকা মঞ্জুরী পাইবে না। তখন এই দায়ী কর্ত্তার দলকে অযোগ্য বলিয়া ধিক্কার দিয়া তাড়াইয়া দেওয়া চলিবে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের শিক্ষা মনে রাখিতে হইবে—কারণ, তাহাও এই প্রকারের ব্যবস্থার একটা পরীক্ষা। নূতন ব্যবস্থায় আসল গবর্ণমেণ্ট যে স্থান অধিকার করিবেন, স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার সরকারী কর্ম্মচারিগণও ঠিক সেই স্থান অধিকার করিয়া আছেন। অথবা, আসল গবর্ণমেণ্ট এই দায়ী কর্ত্তাদিগকে গৌণ অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক বিভাগগুলির ভার দিয়া, তাহাতে তাহাদের কাঁচা হাত পাকাইতে বলিতে পারেন। কাজেই যদি তাহারা বিফল হয়, তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না, এবং দেশ তাহাদের প্রতি উদাসীন হইয়াই থাকিবে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আরও অনেক আপত্তি আছে। রুটী চাহিলে যেমন পাথর দেওয়া, ইহা ঠিক তেমনি। মূল আপত্তিটা এই যে, যখন ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসন চাহিতেছে, তখন তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাধীন করিয়া রাখা হইবে। ভারতবাসিগণের শক্তির উপর আমলা-তন্ত্রের যে স্বভাবসিদ্ধ গভীর অবিশ্বাস, ইহার মধ্যে তাহা নিহিত—ইহার মধ্যে আরও ভয়ানক স্পর্দ্ধা এই রহিয়াছে যে, ভারতবর্ষকে শিশুর মত হাত ধরিয়া হাঁটি-হাঁটি পা-পা করিয়া চলিতে বলা হইতেছে। কারণ, অন্য এক জাতি চাহিতেছে যে, সে ভারতবর্ষ শাসন করিবে, এবং তাহার সুসজ্জিত ভোজনপাত্র হইতে যখন খুসী তখন স্বাধীনতার 'গুঁড়া নাড়া' তাহাকে ফেলিয়া দিবে। ইংলণ্ড ও সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জ সমুদয় জগতের সম্মুখে যে সমুদয় নীতির ঘোষণা করিয়াছেন, ইহা তাহার প্রত্যেক নীতির বিরুদ্ধ। জাতীয় মহাসমিতি একটি সুনির্দ্দিষ্ট সংস্কারের ব্যবস্থা চাহিয়াছে—তাহার যাহা আসল তথ্য তাহা স্বীকৃত না হইলে কংগ্রেস কিছুতেই নিরস্ত হইতে পারে না। আমরা আরও অধিক চাহিতে পারি, কিন্তু ইহা অপেক্ষা কম চাহিতে পারি না। স্বাধীনতার সংগ্রামে জাতিসমূহ 'ক্রমশঃ' অগ্রসর হয়, পিছু হটে না।

প্রতিনিধি-প্রেরণ।

আমার বোধ হয়, আপনাদের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত

করিবার উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টে আইনের প্রস্তাব উঠিলে তদ্বিষয় আলোচনার জন্ত আপনারা ইংলণ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন; তাহা হইলে তাঁহাদের উপর এইরূপ আদেশ দিবেন যে, তাঁহারা যেন মূল সূত্রগুলি অটলভাবে ধরিয়া থাকেন। অর্থাৎ, প্রধান ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভায় নির্ব্বাচিত সভ্যের বিশিষ্ট সংখ্যাধিক্য এবং রাজকোষের উপর প্রভুত্ব বিষয়ে তাঁহারা যেন অটল থাকেন। এই দুইটী ক্ষমতা যদি না দেওয়া হয়, তবে প্রস্তাবিত সংস্কারের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন হইবে। যদি এই দুইটী দেওয়া হয়, তবে অবান্তর বিষয় যুক্তিতর্ক চলিতে পারে।

যদি এই জন্ত প্রতিনিধিবর্গ প্রেরিত হন, তাহা হইলে আমরা এখান হইতে তাঁহাদের সমর্থন করিবার জন্ত খুব জোরে আন্দোলন করিব। এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্ত ইংলণ্ডেই সংগ্রাম করিতে হইবে। আমাদের যাহা দাবী, তাহা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ইংলণ্ডের সম্মুখে ধরিতে হইবে, এই অর্থে ইহা সত্য। কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধ হইবে এইখানে; কারণ, ভারতবর্ষ দৃঢ়ভাবে যাহা সজোরে দাবী করিবে, ইংলণ্ড আইন প্রণয়ন করিয়া সেইটুকু মাত্র দিবে। শক্তিশালী শ্রমজীবী-সম্প্রদায় তাঁহাদের সম্মতিসূচক ভোট দিয়া আমাদের সাহায্য করিবেন। আমরা যে স্বাধীনতা-লাভের জন্ত কৃতসংকল্প, এইখানেই আমাদিগকে আমাদের কার্য্য দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে।

দেশীয় ভাষা।

যে নূতন শক্তি দেশের লোকের হাতে দেওয়া হইবে, যাহাতে সেই শক্তির সদ্ব্যবহার করিবার জন্ত তাহারা প্রস্তুত হইতে পারে, সে বিষয়ে তাহাদিগকে বিশেষরূপ সাহায্য না করিলে চলিবে না। সে জন্ত প্রত্যেক প্রদেশের যাহা কথিত ভাষা, তাহাতে কাজ চালাইতে হইবে। কারণ, তাহাদের মাতৃভাষার সাহায্যেই তাহাদের হৃদয়ে অনুভূতি ও মস্তিষ্কে চিন্তার সৃষ্টি সম্ভব।

শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, অবশ্য শীঘ্রই বাঞ্ছনীয়, সমস্ত প্রদেশগুলির সীমা কথিত ভাষার হিসাবে পুনর্গঠন করিতে হইবে। রাজকার্য্যের ভাষা কিছুদিনের জন্ত ইংরাজী ও প্রাদেশিক ভাষা এই উভয়ই থাকিবে;—যেমন কানাডার কোনও কোনও অংশে ফরাসী ও ইংরাজী উভয় ভাষাই ব্যবহৃত হয়। তাহা হইলেই সমুদয় লোক জাতীয় সাধারণ জীবনে তাহাদের ভাগ পূর্ণরূপে ভোগ করিতে পারিবে।

আসন্ন লক্ষ্য।

আমাদের আসন্ন লক্ষ্য কি হইবে? জাতীয় মহা-সমিতির গতবর্ষের মন্তব্যের তৃতীয় অংশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমাদিগকে একটা কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কেবলমাত্র ইংরাজ-শাসিত ভারতবর্ষের জন্যই আমরা তাহা করিতে পারি। (১) ভারতীয় দেশীয় রাজ্য সমূহের স্থান কিরূপ হইবে, তাহা দেশীয় রাজন্যগণের সহিত ইংরাজ গভর্মেণ্টের যে সমস্ত সন্ধি আছে, তাহার সর্ত্তগুলির বিচার করিয়া গ্রেট ব্রিটেন স্থির করিবেন। ইংরাজ-শাসিত ভারত-বর্ষ-সংক্রান্ত আলোচনায় আমাদিগকে ইহাই দেখিতে হইবে যে, যে সমস্ত রাজা স্বীয় রাজ্যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, অথবা যাঁহার রাজ্যের শাসন-পদ্ধতি ব্রিটিশ-ভারতে প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থার অনুরূপ নহে, এমন কোনও সামন্তরাজ আমাদের মন্ত্রণাসভায় সমাগত হইয়া মত প্রকাশ করিবার অধিকার না পান। কোনও দেশীয় রাজ্য ব্রিটিশ-ভারতে এমন কোনও কর্তৃত্ব পাইবেন না, যাহা তাঁহার রাজ্যের উপর ব্রিটিশ-ভারতের নাই। (২) কেন্দ্রস্থিত সাম্রাজ্যশক্তি যাহার হস্তেই থাকুক, তাহাতে ভারতবর্ষের এমন একটি স্থান থাকিবে, যাহা ভারতবর্ষের প্রকৃত গৌরবের অনুরূপ। কারণ, তাহা না হইলে সাম্রাজ্যগত ব্যাপারে ভারতবর্ষ গ্রেট-ব্রিটেন ও অন্যান্য রাজ্যসমূহের দ্বারা শাসিত একটি আবাদে পরিণত হইতে পারে, তাহার শিল্পোন্নতির আশা একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। যেমন বলা হইতেছে, তদনুসারে যদি এই সমর-পরিষৎ ক্রমশঃ কেন্দ্রস্থ কর্ত্তৃত্ব-সভায় পরিণত হয়, তাহা হইলে ইহার অধিকার কেবলমাত্র সাম্রাজ্যের রক্ষাকার্য্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। যে সমুদয় স্বায়ত্ত-শাসনাধীন জাতির দ্বারা সাম্রাজ্য গঠিত, সেই সমুদয় জাতির নিকট প্রথম উপস্থাপিত না করিয়া অন্যপ্রকারের কোনও প্রশ্ন সেখানে উপস্থাপিত হইতে পারিবে না—যদি কোনও জাতি তাহাতে আপত্তি করে, তাহা হইলে সে বিষয় বাদ দিতে হইবে। প্রত্যেক জাতি নিজের শুল্কগত ও রাজস্ববিষয়ক ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বাধীন অধিকার ভোগ করিবে। এখন যেমন উপনিবেশসমূহের আছে, সেইরূপ হইবে। তবে সাম্রাজ্যের রক্ষার জন্য তাহাদিগকে খরচ দিতে হইবে।

ভারতসচিব মন্‌টেগু সাহেব যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, তখন এই সময় সুস্পষ্ট ভাষায় আমাদের কি দাবি, তাহা বলা উচিত; কারণ বুঝা গিয়াছে, আইন প্রণয়নের উদ্‌যোগ চলিতেছে—এই সময় বনার ল সাহেবের উপদেশ স্মরণ করিয়া খোলা তপ্ত থাকিতে থাকিতে পাক চড়ান উচিত।

আমাদের আসন্ন লক্ষ্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমরা বৃটিশ গভর্মেণ্টকে প্রার্থনা করি যে, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পার্লামেণ্ট অষ্ট্রেলিয়া সাধারণ-তন্ত্রের ধরণে ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া একটা আইন পাশ করুন—তাহাতে যেন এইরূপ ব্যবস্থা থাকে যে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে—একান্ত না হয় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ শেষ হইবার পূর্ব্বে ঐ আইন আমলে আসিবে। মধ্যবর্ত্তী এই পাঁচ বা দশ বৎসরে ইংলণ্ডের সহিত সংস্রব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া (যেমন উপনিবেশ সমূহে আছে), শাসনশক্তি ইংরেজের হস্ত হইতে ভারতবাসীর হস্তে হস্তান্তরিত করা হইবে।

এই হস্তান্তর কার্য্য ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন হইবে। প্রথমতঃ কন্‌গ্রেস ও মোসলেম লীগের অনুমোদিত সংস্কার প্রণালীর অনুরূপ কোন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া ভোট দিবার অধিকার বিস্তৃত করিতে হইবে। ঐ প্রণালীর আসল কথা এই যে, কার্য্যকরী সমিতির একার্দ্ধ ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্যগণের ভোট দ্বারা নিযুক্ত করা হইবে, নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের রাজকোষের উপর কর্ত্তৃত্ব থাকিবে, এবং কি প্রাদেশিক কি সার্ব্বদেশিক—সর্ব্বত্র ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদিগের সংখ্যাধিক্য থাকিবে।

আমরা প্রথমে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন চাহিয়াছিলাম—ইহাতে নাকি প্রভুত্ব না হইলেও প্রভাব হয়। কিন্তু কার্য্যে দেখা গেল উহা অকিঞ্চিৎকর। এখন আমরা ভারতশাসন কার্য্যের অংশীদার হইতে চাই। গবর্মেণ্টের সভাভঞ্জন (dissolution) ও 'ভিটো'র (veto) ক্ষমতা থাকিবে; আর প্রকৃতিপুঞ্জের রাজকোষের উপর প্রভুত্ব থাকিবে। ইহাই দ্বিতীয় ক্রম—সমকক্ষদ্বয়ের সাজিদারি ও সহযোগিতা। তৃতীয় ক্রম হইবে, পূর্ণাঙ্গ হোমরুল বা স্বরাজ—১৯২৩ বা ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইহা স্বতই প্রতিষ্ঠিত হইবে। এ সম্বন্ধে আমরা মোসলেম লীগের নিকট বিশিষ্ট সাহায্যের প্রত্যাশা করি।

প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি এইরূপ হইবে,—

(১) সমস্ত ব্যবস্থাপক-সভার সমুদয় সদস্য নির্ব্বাচিত সদস্য হইবেন।

(২) যাঁহারা সরকারী কাজ করেন, তাঁহারা নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন, কিন্তু নির্ব্বাচনের প্রার্থী হইতে পারিবেন না; যতদিন তাঁহারা লাভজনক সরকারী পদে নিযুক্ত থাকিবেন, ততদিন তাঁহারা কোনও রাজনীতিক বাদানুবাদে যোগ দিতে পারিবেন না। অবশ্য, যাঁহারা পেন্সন-প্রাপ্ত ও অবসর-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী, তাঁহারা ইহার মধ্যে ধর্ত্তব্য নহেন।

(৩) প্রধান ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভাসমূহে একটিমাত্র 'চেম্বার' থাকিবে।

(৪) রাজা যেমন তাঁহার স্বকীয় অধিকারে প্রিভি-কাউন্সিলের সদস্যনিয়োগ করেন, বড়লাট ও ছোটলাট নিয়োগ করেন, এবং অধিকার প্রয়োগকালে রাজ্যের যিনি প্রধান সচিব, তাঁহার অনুমোদনে কাজ করেন, সেইরূপ রাজা সদস্য-সভার এক জনকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আদেশ করিবেন—এই মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সভ্য প্রিভিকাউন্সিলের সভ্যগণের ন্যায় প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ সভ্য হইবেন, কিন্তু তাঁহারা মন্ত্রিসভা-রূপে সাধারণ ব্যবস্থাপক-সভার নিকট দায়ী থাকিবেন এবং সেই সাধারণ ব্যবস্থাপক-সভায় যদি তাঁহাদের উপর বিশ্বাস নাই, এই ভাবের মন্তব্য গৃহীত হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্রিসভা পরিবর্ত্তিত হইবে।

(৫) ভারতবর্ষ-রক্ষার জন্য সৈন্যদল ও নৌবিভাগ, সম্রাটের প্রতিনিধি বলিয়া বড়লাটের অধীন থাকিবে, এবং ভারতবর্ষের কর হইতে তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। সাম্রাজ্য-রক্ষার জন্য ভারতবর্ষকে কি দিতে হইবে, তাহা সমর-পরিষৎ ও ভারত সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে।

(৬) বাণিজ্যার্থ নৌবিভাগের গঠন, নিয়ন্ত্রন, ও আনুকূল্যদানের ভার ভারত গবর্মেণ্টের হস্তে থাকিবে, এবং অন্তর্জ্জাতিক ব্যবস্থা ও যুদ্ধের পর সকল পক্ষের সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইবে। (৩) (৪) (৫) মন্তব্য সম্বন্ধে আমি আরও বলিতে চাহি যে—

(৩) প্রস্তাব সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইবে। কিন্তু ইহা না বুঝিলে চলিবে না যে, ভারতবর্ষে স্বার্থের ও মতের যেরূপ বৈচিত্র্য, তাহাতে তাড়াতাড়ি আইন-প্রণয়ন, যাহা বারণ করা দ্বিতীয় মন্ত্রণা-সভার কার্য্য, তাহার সম্ভাবনা নাই। গভর্ণর কর্ত্তৃক সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার অধিকারও কোনও ব্যবস্থা 'ভিটো' করিবার অধিকার ভারতের মত স্থিতিশীল দেশে যথেষ্ট সংযমনের কার্য্য করিবে।

(৪) ইংলণ্ডে ক্যাবিনেটের কোনরূপ বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত ভিত্তি নাই। রাজা মন্ত্রি-সভার সহযোগে অর্থাৎ রাজা ও তাঁহার প্রিভি-কাউন্সিলার-গণ রাজ্যশাসন করেন। দ্বিতীয় জর্জ্জ ইংরাজী ভাষা জানিতেন না; কাজেই তিনি কাউন্সিলের সভাপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তখন হইতেই মন্ত্রিসভার ক্ষমতার উন্নতি হইতে লাগিল। মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সদস্যকে প্রিভি-

কাউন্‌সিলারের উচিত শপথ লইতে হয়। মন্ত্রিত্ব শেষ হইয়া গেলেও মন্ত্রিগণ প্রিভি-কাউন্‌সিলার থাকেন; যখন রাজ্যসংক্রান্ত বিশিষ্ট বিষয়ের আলোচনা হয়, কেবলমাত্র সেই সময়ে মন্ত্রণাসভায় আহূত হন। রাজার অধিকারকে আমাদের অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে; অথচ মন্ত্রিগণ যাহাতে এ দেশের সাধারণ ব্যবস্থাপক-সভার নিকট দায়ী থাকেন, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) প্রস্তাবোক্ত "ভারতীয় সৈন্যে"র অর্থ,—ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের দ্বারা গঠিত সৈন্যদল। ইহার কর্ম্মচারিগণও ভারতবর্ষের লোক হইলেন। ইংরাজ সৈন্য তাহার অন্তর্ভুক্ত নহে। তাহা হইলে, ভারতবর্ষ প্রকাণ্ড অর্থ-ব্যয়ের দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবে। এখন বিদেশী সৈন্য অল্পদিন কাজ করিয়া বিলাতে ফেরত যায়; তাহাদের যাতায়াতের খরচ যোগাইতে হয়, বিলাতে ডিপো রাখিতে হয়, এবং সৈন্য সংগ্রহাদির জন্য অনেক ব্যয় করিতে হয়। ভারতীয় সেনা প্রাদেশিক টেরিটোরিয়াল ও বৃহৎ রিজার্ভের দ্বারা গঠিত হইবে।

ভারত-সচিব।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দ চিরদিন ভারত ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর হইয়া থাকিবে, কারণ, এই বৎসরে ভারত সম্বন্ধে ইংলণ্ডের শাসননীতির হঠাৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন এত দ্রুতগতিতে হইয়াছে যে, ইহার শীঘ্রতায় বিস্মিত হইতে হয়। কারণ আমরা—যাহারা এই পরিবর্ত্তনের জন্য প্রযত্ন করিয়াছি—আমরাও ইহাতে বিস্মিত হইয়াছি। বিগত ২০শে আগষ্ট গত বৎসরের কন্‌গ্রেসের প্রথম দাবি—দৃশ্যতঃ না হইলেও স্বরূপতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা চাহিয়াছিলাম যে একটি রাজকীয় ঘোষণাপত্র প্রচারিত হউক, কারণ ঐরূপ করিলে বেশ সুশোভন ও চিত্তাকর্ষক হইবে এবং আমাদের সম্রাট আরও জনপ্রিয় হইবেন। তৎপরিবর্ত্তে বিলাতের মন্ত্রিসভা রাজকীয় অনুজ্ঞার ঘোষণা-রূপে রাজাদেশ বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন।

ইংলণ্ড হইতে পরম মান্যবর ভারত রাষ্ট্রসচিব অন্যান্য খ্যাতনামা রাজ-নীতিজ্ঞের সহিত ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার শুভাগমনের কি ফল হইবে এখনও বলা যায় না। তবে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, শ্রীযুক্ত বড়লাট ও ভারত-সচিব উভয়েই ভারতের প্রতিনিধিবর্গের বক্তব্য মিত্রভাবে ধৈর্য্যের সহিত শুনিতেছেন। বর্ত্তমান আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধ বলিয়া কোন লোকমতকে

প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই। লোকমান্য তিলক, মহাত্মা গান্ধি এবং আমার বক্তব্যও আমরা সম্পূর্ণ বলিতে পাইয়াছি। কংগ্রেস ও মোসলেম লীগের প্রধান সদস্যদিগকেও ঐরূপ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। হোমরুল লীগের সম্বন্ধেও বেশ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

ভবিষ্যৎ দেবতার হস্তে। পূর্ব্বাবধি যাঁহাদের হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত আছে, তাঁহারা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া আমাদের বিরুদ্ধ হইয়াছেন। ইহাদের প্রভাব আমাদের অবিদিত নাই। কিন্তু ভগবানের ন্যায়বিচারে আমরা বিশ্বাস করি। আরও বিশ্বাস করি যে, যে সকল ইংরাজ তাঁহাদের স্বদেশের চিরন্তন ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের পক্ষাবলম্বন করিবেন। ইংলণ্ডের শ্রম-জীবি-সমবায় কংগ্রেস ও হোমরুল লীগের সহিত যে, ভ্রাতৃভাবে প্রতিনিধি বিনিময় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বৃটিশ ও ভারতীয় গণতন্ত্রের নবজাত ভ্রাতৃত্বের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। হোমরুল লীগ্ আগামী মাসের বার্ষিক শ্রমজীবি-সম্মিলনে মিষ্টার ব্যাপটিষ্টাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন এবং শ্রমজীবি-সমবায়ের প্রতিনিধি হইয়া মেজর গ্রেহাম পোল্ এদেশে আসিয়াছেন। আমি আশা করি যে, কংগ্রেসও শ্রমজীবি-সম্মিলনে তাঁহাদের প্রতিনিধি পাঠাইবেন এবং সমবায়ের প্রতিনিধিকে সাদর-সম্ভাষণ করিবেন। এইরূপে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে গ্রন্থি রচিত হইবে, তাহাতে উভয়ের মিলন ঘনিষ্ঠতর হইবে। এই জন্য এবং ভারত-সচিবের ভারত-আগমন জন্য ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ একটি গণনীয় বৎসর হইল।

অন্তরীণে আবদ্ধ ভ্রাতৃগণ।

এই উপলক্ষে মুসলমান জননায়ক মহম্মদ আলী ও সৌকত আলীর অনি-মুক্তিতে আমরা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। সুদীর্ঘ ৩½ বৎসর কাল তাঁহাদের রাজনীতিক জীবন স্তম্ভিত রহিয়াছে—এবং অন্তরীণে তাঁহারা জীবনে মরণ অনুভব করিতেছেন। তেজস্বী স্বদেশ-প্রেমিকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা গ্লানিকর ও অপমানজনক দণ্ড হইতেই পারে না। যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, তাঁহারা গুরুতর অপরাধে অপরাধী তাহা হইলেও সেই অপরাধের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। আমরা তাঁহাদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া বিশ্বাস করি এবং তাঁহাদের স্বধর্ম্মে আস্থার জন্য তাঁহাদিগকে সম্মান করি। আমরা অদ্য তাঁহাদের পদপ্রান্তে আমাদের ভক্তিপূর্ণ সম্বর্দ্ধনা উপহার দিতেছি। আমরা নিশ্চয়ই জানি যে, যখন তাঁহারা কারাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমগ্রজাতির পূজা

পাইবেন, তখন তাঁহাদের এই দীর্ঘকালব্যাপী যন্ত্রণাভোগ শক্তির আকারে পরিণতি পাইবে।

আমাদের দলাদলি।

ভারতবর্ষের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির প্রতি যাঁহারা দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, আমাদের রাজনীতিক সংঘ-বদ্ধ কার্য্যসমূহে আত্মগত ভেদসাধনের প্রবৃত্তি খুব বেশী। বিপক্ষ দল আমাদিগকে প্রজাতন্ত্রমূলক স্বাধীনতা না দিবার ইহাকেই হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে, এই আত্মভেদ হয় বলিয়াই প্রজাতন্ত্রমূলক স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। অনেকের নিকট এ উক্তি প্রহেলিকার মত মনে হইতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

আমাদের জাতির মধ্যে অনেক সম্প্রদায় আছে, এবং অনেক প্রকারের মত আছে। আমরা স্বাধীনতা-লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি। আমাদের এই জাতির মাথার উপর এক সরকার আছেন; সমস্ত ক্ষমতা ও সমুদয় প্রভুত্ব তাঁহার অধিকৃত; এই সরকার, যাহাকে অতিরিক্ত পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী বলিয়া বিবেচনা করেন, শাসনবিভাগের হুকুমের জোরে তাহাকে চূর্ণ করিতে পারেন। যে সকল বিধানে সরকারের এই শক্তি খর্ব্ব হইতে পারে সেই সমস্ত বিধানকে ব্যর্থ করিবার জন্য যে দল বা যে লোক সাহায্য করিতে প্রস্তুত, সরকার সেই দলকে বা সেই লোককেই আপনার করিয়া লন। দলাদলির কোনও লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে কি না, সরকার তাহা স্বভাবতঃ পর্য্যবেক্ষণ করেন, এবং সে লক্ষণ দেখিতে পাইলেই দুর্ব্বলকে নিজের দিকে টানিয়া লইয়া সবলকে দমন করেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে ব্যাপারটাকে "ভারত-বিজয়" বলিত, সে ব্যাপারটাও এই ভাবেই সাধিত হইয়াছিল। লর্ড লিটন যখন ভারতে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন, তখন একটি সঙ্কল্পিত যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার নিকট এইরূপ আদেশ আসিয়াছিল,—"যুদ্ধের যদি কোনও উপলক্ষ নাই থাকে, তাহা হইলে তুমি অবশ্য অবশ্য একটা গড়িয়া তুলিবে।" সেইরূপ যদি দলাদলির কোনও লক্ষণও না থাকে, তাহা হইলে একটা গড়িয়া তোলা হয়। দাদাভাই নৌরোজীকে যখন ইংলণ্ডের মহাসভায় প্রেরণ করা হয়, তখনও, এইরূপ কৌশল অনুসৃত হইয়াছিল। মিষ্টার ভাবনাগরীকে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড় করান হইল, এবং এক জন প্রতিক্রিয়াপরায়ণের দ্বারা এক জন তেজস্বী সংস্কারকামীকে সরাইয়া দেওয়া হইল। রাজনীতিক অবস্থা ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর অস্বাস্থ্যকর হইতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ, হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা ধরুন। স্বভাবতঃই আমাদের জাতির মধ্যে ইহারা দুইটি স্বাভাবিক দল, তাহাদের উভয়ের উপরে যে সরকার আছেন, তিনি খৃষ্টান। তিনি তৃতীয় দল। দুই দলই তৃতীয় পক্ষের কৃপা লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করে। এই জন্যই হিন্দু মুসলমানে দলাদলি দাঙ্গা ইত্যাদি। কিন্তু, দেশীয় রাজ্যসমূহে, যেখানে শাসন-কর্ত্তা হয় হিন্দু, না হয় মুসলমান, এবং তাঁহাকে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়কেই শাসন করিতে হয়, সেখানে এরূপ হয় না। এই জন্যই কলিকাতায় ও লক্ষ্ণৌএ হিন্দু মুসলমানে বহু বিতর্কের পর যে সখ্যের ঐক্য হইয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য এত চেষ্টা।

সমাজের মধ্যে যাঁহারা অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী, তাঁহারা সংঘ-বদ্ধ হইয়া যে সকল রাজনীতিক মীমাংসায় উপনীত হয়েন, যাঁহারা সেই সকল সিদ্ধান্ত দ্বারা আপনাদিগকে বাধ্য বলিয়া বিবেচনা করেন না, এ প্রকারের কতক লোক প্রত্যেক সমাজে চিরদিনই থাকিবে, এবং এই লোকগুলি উৎকোচের লোভে বা ভয়ের তাড়নায় সরকারের কার্য্যের সমর্থনের জন্য একদল বিশৃঙ্খল ও দায়িত্বহীন লোক সংগ্রহ করিয়া দেয়। (ঐ যে উৎকোচ বা ভয়, বেসরকারি হইলেও সরকারী লোকের দ্বারা প্রণোদিত) এইরূপ করিয়া লোকগুলি সাম্প্রদায়িক পৃথক ও বিশেষ সুবিধা পাইবার আশা করে।

এই প্রকার মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণবিরোধী দলের উদ্ভব হইয়াছে। ইহাদের কয়েক শত লোক লইয়া একটা সভা আছে, আর তিনখানি খবরের কাগজ আছে। সে যাহা হউক, বিচক্ষণ নেতা দেওয়ান বাহাদুর কেশব পিলাই-এর নেতৃত্বাধীনে একটি খাঁটী অব্রাহ্মণ-সভার উদ্ভব হওয়ায় এই সভা মলিন হইয়া গিয়াছে। শেষোক্ত সভায় কয়েক সহস্র অনুরাগী সভ্য হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ-বিরোধী আন্দোলনের উদ্দেশ্য, বড় বড় সরকারী চাকুরী যোগাড় করা। তাহারা আশা করে যে, 'হোমরুল' আন্দোলনের নিন্দা ও সরকার বাহাদুরের প্রশংসা দ্বারা, তাহাদের মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারিবে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এইরূপ আরও আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে—হোমরুল-কুকুরকে মারিবার জন্য যে কোনও প্রকারের লাঠিই প্রশস্ত।

এই সমস্ত দলাদলি দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইবার কোনও কারণ নাই। যত দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ দায়িত্বহীন শাসন-যন্ত্রের অধীন থাকিবে, তত দিন এ প্রকারের দলাদলি বায়স্কোপের ছবির মত আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতে থাকিবে।

যখন বিজাতীয় তৃতীয় পক্ষের উপর শাসনের কর্তৃত্বভার থাকিবে না, তখন জাতীয় সম্প্রদায়গুলি তাহাদের লক্ষ্যের পার্থক্য সত্ত্বেও রাজনীতিক দেহের সুস্থ অঙ্গ-রূপে সংহত হইয়া যাইবে। শক্তির ব্যবহার করিতে পাইলে একটা দায়িত্ববোধ জন্মিবে; এবং দায়িত্ব হইতে সুবিবেচিত সংযম জন্মিবে।

যুগসন্ধিকালের এই সকল গোলযোগ ও কলহকে আমরা খুব বড় করিয়া দেখি, এবং তাহার ক্ষতি করিবার প্রকৃত ক্ষমতা অপেক্ষা সে সকলকে অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া মনে করি। আমরা 'হোমরুল' লাভ করিলে এগুলি তাহাদের যথাযোগ্য রূপ ধারণ করিবে।

খণ্ড সংস্কার।

জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এ পর্য্যন্ত যে সমুদয় খণ্ড সংস্কারের দাবী করিয়াছে, আমি আর সেগুলি সম্বন্ধে কিছু বলিব না। তাহাদের মধ্যে যেগুলি বেশী প্রয়োজনীয়, সেগুলির একটি পৃথক্ তালিকা প্রদত্ত হইবে। জাতীয় মহাসমিতির নেতৃগণের মধ্যে অধিকাংশই একই দাবী করিয়া পুনঃ পুনঃ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এবং এখন অনুভব করিতেছেন যে, 'হোমরুলে'র উপর সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীভূত করাই উচিত। কারণ, একবার দেশের লোক শক্তি-লাভ করিলেই তাহারা অপকৃষ্ট আইনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, এবং ভাল আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভা জাতীয় মহাসমিতির মন্তব্যগুলি গ্রহণ করিবে, এবং দেশের অবস্থার পরিবর্তনানুসারে যেগুলি যেভাবে প্রযোজ্য, সেই ভাবে আইন করিবে। স্বাধীন ভারতবর্ষ শাসন ও বিচার-বিভাগ পৃথক করিবে, রাজস্ব-সংগ্রাহক, বিচার ও পুলিস কর্ম্মচারিগণকে স্বতন্ত্র করিবে, এবং নিম্ন আদালতকে শাসনবিভাগের অধীন না রাখিয়া হাইকোর্টের অধীন করিবে—শিক্ষা আইন প্রবর্ত্তিত করিবে, সর্ব্বত্র জুরীর বিচার প্রচলিত করিবে—বিদেশ-প্রবাসী ও বিদেশে উপনিবিষ্ট ভারতবাসিগণকে রক্ষা করিবে, জমী-বন্দোবস্তের বেশ সাম্যমূলক ব্যবস্থা করিবে, ভারতের শ্রমশিল্পের শৃঙ্খলাসাধন ও উন্নতি-বিধান করিবে, কর্ম্মচারী নিয়োগের জন্য এদেশেই পরীক্ষা পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিবে, শাসনপ্রথা এমন ভাবে পুনর্গঠিত করিবে, যাহাতে জাতিতে জাতিতে বৈষম্য থাকিবে না; সামরিক কলেজ করিয়া, ভারতসন্তানগণ যাহাতে সম্রাটের কমিশন পায়, তজ্জন্য সুশিক্ষা দান করিবে।

লেখা ও বক্তৃতা কোনরূপ অপরাধের প্ররোচনা করে না, বা কোনরূপে মানহানির আইনও লঙ্ঘন করে না, এমন সমস্ত রচনা ও বক্তৃতা যে সব আইনের দ্বারা দলন করা হইতেছে, সে সমুদয় সভ্যদেশের অনুপযুক্ত বলিয়া একেবারে উঠাইয়া দিবে। শাসনকর্ত্তারা বিচার না করিয়া কেবল গুপ্ত পুলিসের অভিযোগ ও সন্দেহ মূলে এখন যেমন কারারুদ্ধ করিতে, দেশান্তরিত করিতে, বৃত্তিশূন্য করিতে, অন্তরীণ করিতে, দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারেন, তখন তাঁহাদের সেরূপ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। নিজের অপরাধ কি, জানে না, এমন লোক ক্লেশভোগ করিবে না; প্রকাশ্য বিচার ও আত্মসমর্থনের সুযোগ ব্যতীত কাহারও স্বাধীনতা কাড়িয়া লওয়া হইবে না। শান্তিপূর্ণ রাজনীতিক প্রচার-কার্য্য, শোভা যাত্রা, পতাকা, সভা প্রভৃতিতে ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিস-কর্ম্মচারী হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। মোটকথা, মাগ্‌নাকার্টা ও বিল্ অব্ রাইটস্-এর দ্বারা মানবের যে সাধারণ ও প্রাথমিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, ভারতবর্ষ পুনর্ব্বার তাহা ভোগ করিতে পারিবে।

স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানব এবং অন্যান্য সভ্যদেশের মানবের সমকক্ষ হইবার কি আনন্দ, তাহা চিন্তা করুন। দমন-নীতির বিষবায়ুনির্মুক্ত ভারতের বায়ুসেবন কি আনন্দের, তাহা চিন্তা করুন। প্রকাশ্য বিচার ব্যতীত ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় ও সম্পত্তিতে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, ইহা জানার কি আনন্দ! নিজে জানিলাম না, অথচ রহস্যের অন্ধকারে আবৃত এক শাসন-শক্তির খেয়ালের ফলে অপরাধী হইলাম, এমন আর ঘটিবে না, তাহাতে কি আনন্দ! কেবল আইনের দ্বারাই দেশ শাসিত হইতেছে, শাসনকর্ত্তাগণের স্বেচ্ছায় হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই, এমন দেশে সভ্যমানবের সাধারণ অধিকার-উপভোগের কি আনন্দ! কেবল হোমরুলের দ্বারাই এমন নিরাপদ-ভাব আসিতে পারে।

উপসংহার।

প্রতিনিধি ভ্রাতৃগণ! দীর্ঘকাল আপনাদের বিলম্ব করাইলাম, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। এই জাতীয় মহা-সমিতির সভাপতির আসন জীবনে কেবল একবার-মাত্র অধিকার করিতে পারা যায়, এবং যে দেশকে আমরা সকলে এত ভালবাসি, সেই দেশ সম্বন্ধে আমরা প্রাণের কথা একবার বলিতে পারি। বর্ত্তমান সময়ে যে তীব্র দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তাহাতে কে বলিতে পারে, আপনাদিগকে আর কিছু

বলিবার স্বাধীনতা আমার থাকিবে কি না? কে বলিতে পারে, আগামী বৎসরের কর্ম্মে আপনাদের নেত্রী-রূপে কাজ করিবার স্বাধীনতা আমার থাকিবে কি না! আমার কাজ যদি ব্যাহত না হয়, তাহা হইলে আমি আগামী বৎসরের জন্য আপনাদের সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আপনারা আমাকে আপনাদের সভানেত্রীর পদে বরণ করিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছেন, যতক্ষণ আপনাদের বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন না হই ততদিন আমার সহকারী হউন। আপনারা যে সকল সময়েই আমার সহিত একমত হইবেন, তাহা হইতে পারে না; আপনাদের সমালোচনায় আমি সঙ্কুচিত হইব না। আমি কেবল এইটুকু প্রার্থনা করি যে, আমার শত্রুগণ যাহা কিছু বলিবে, আপনারা তাহাই সত্য বলিয়া মানিয়া লইবেন না—শত্রুগণ যাহা বলিবে তাহার সকল কথার উত্তর দিবার আমার সময় নাই। আমি অঙ্গীকার করিতে পারি না যে, সকল সময়েই আপনাদের তুষ্টিবিধান করিতে পারিব। আমি এইমাত্র অঙ্গীকার করিতে পারি যে, সেবা সম্বন্ধে আমার যাহা আদর্শ, সেই আদর্শের অনুবর্ত্তনে আমি প্রাণপণে জাতির সেবা করিব। সকল সময়েই যে আপনাদের কথা আমি স্বীকার করিব, এবং আপনাদের অনুবর্ত্তন করিব, এমন অঙ্গীকার আমি করিতে পারি না। নেতার কর্ত্তব্য—পরিচালন করা। নেতা তাঁহার সহযোগিগণের সহিত সর্ব্বদা পরামর্শ করিবেন, তাঁহাদের উপদেশ সকল সময়ে শুনিবেন; কিন্তু সর্ব্বসাধারণের নিকট শেষ দায়িত্ব যখন তাঁহার, তখন শেষ মীমাংসার অধিকারও তাঁহার। সেনাপতির তাঁহার সহকারী ও সৈন্যগণ অপেক্ষা অধিক দূরদর্শী না হইলে চলে না। কিন্তু যুদ্ধ যখন চলিতেছে, সে সময় প্রত্যেক গতির হেতু তিনি ব্যাখ্যা করিতে পারেন না; ফলের দ্বারা তিনি নিন্দিত বা প্রশংসিত হইবেন। আমি জানি যে, প্রেম ও সেবার দ্বারা আমি ভারতসন্তান, কিন্তু জন্মের দ্বারা নহি। এই কারণে আমি নেতৃত্বের অধিকার কখন দাবী করি নাই, যুদ্ধের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়াছি। এখন আপনাদের কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া আপনারা যে স্থান দিয়াছেন, সেই স্থান গ্রহণ করিলাম, এবং যোগ্যভাবে এই স্থান পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিব। নিজের কথা যথেষ্ট বলিলাম, এইবার মায়ের কথা বলি।

ভারতমাতা স্বাধীন হইয়াছেন, জগতের জাতি-সমূহের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার পুত্রকন্যাগণ সর্ব্বত্র সম্মানিত, তাঁহার অতীত যেমন মহান্, বর্ত্তমানও ঠিক তেমনই হইয়াছে, আরও অধিকতর গৌরবময় ভবিষ্যৎ-নির্ম্মাণের

জন্ম সাধনা চলিতেছে, এই মহাদৃশ্য দর্শনের আকাঙ্ক্ষা কি এমন উৎসাহকর নহে, যাহার জন্য পরিশ্রম করা যায়, ক্লেশ ভোগ করা যায়; সমগ্র জীবন উৎসর্গ করা যায়, এবং মরিতে পারা যায়? আধ্যাত্মিকতার জন্য এত অধিক অনুরাগ উদ্দীপিত করিতে পারে, এমন দেশ কি আর আছে? সাহিত্যের জন্য এত প্রশংসা উদ্দীপিত করিতে পারে, সৎসাহসের জন্য এত ভক্তি উদ্দীপিত করিতে পারে, এমন দেশ কি আর আছে? জাতি-সমূহের চির-গৌরবময়ী জননী, আজ ইউরোপের ও আমেরিকার যে সমুদয় জাতি পৃথিবীর নেতৃত্ব করিতেছে, এই মাতার গর্ভে জন্মিয়াই ত তাহারা প্রবাসে যাত্রা করিয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জননীর খড়্গ ভাঙ্গিয়া যাইবার পর আমাদের এই ভারতমাতা যত ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, এত ক্লেশ কি আর কাহাকেও ভোগ করিতে হইয়াছে? তদবধি এসিয়া ও ইউরোপের জাতি-সমূহ তাঁহার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া প্রবাহের মত বহিয়া গিয়াছে, তাঁহার নগরী-সমূহ শ্মশান করিয়াছে, তাঁহার রাজন্যবর্গের মুকুট কাড়িয়া লইয়াছে। তাহারা জয় করিবার জন্য আসিয়াছিল, কিন্তু ক্রমশঃ এই দেশে থাকিতে গিয়া, এই দেশের সহিত মিশিয়া গেল। অবশেষে ঐশ শিল্পী এই সমুদয় সংমিশ্রিত জাতিসমূহের মধ্য হইতে এক জাতি গড়িয়া তুলিয়াছেন—এই জাতি যে কেবলমাত্র ভারতের সদ্‌গুণসমূহে সমলঙ্কৃত, তাহা নহে, তাহার আততায়িগণ যে সকল সদ্‌গুণ সম্ভার সঙ্গে আনিয়াছিলেন, আজ সেই সদ্‌গুণাবলিই রহিয়াছে, দোষগুলি অপসৃত হইয়াছে, এবং সে সমুদয় সদ্‌গুণ আজ ভূষণস্বরূপ হইয়াছে।

কত যুগের ইতিহাস মর্ত্ত্যমানবের দৃষ্টিশক্তি অতিক্রম করিয়া প্রসারিত, অতীতের কত বড় বড় সভ্যজাতির সহিত একত্র জীবন ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু জীবন ত্যাগ করেন নাই, তাঁহাদের উদ্ভব, উন্নতি ও বিনাশ দেখিয়াছেন, সে সকল মহাজাতি আজ আর নাই; পৃথিবীর গভীর বক্ষে তাঁহারা সমাহিত হইয়াছেন, কেবলমাত্র স্মৃতিফলক পড়িয়া আছে—এই ভারতবর্ষ কত কাজ করিয়াছেন, কত বিজয়লাভ করিয়াছেন, কত ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন—সমুদয় পরিবর্ত্তনের পরেও অভগ্ন অবস্থায় এই ভারতবর্ষই জগতের জাতিসমূহের মধ্যে ক্রুশবিদ্ধ—এখন তাঁহার 'পুনরুত্থানে'র প্রভাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন—ইনি অমর, গৌরবময়, চিরতরুণ,—অচিরে দৃষ্ট হইবে, ভারতবর্ষ উন্নতশির, স্বাবলম্ব, সবল, স্বাধীন, এসিয়ার উজ্জ্বল গৌরব, পৃথিবীর আলোক ও আশীর্ব্বাদ।

শিবাজী বা মারাঠা শক্তির অভ্যুদয়।

ঠিক এক শত বৎসর গত হইল, মহারাষ্ট্র দেশে মারাঠী রাজত্বের অবসান হইয়াছে; আর, ৯১ বৎসর হইল, গ্র্যাণ্ট ডাফ্ মারাঠাদের ইতিহাস লিখিয়া শেষ করেন। এই ৯১ বৎসর কাল ধরিয়া তাঁহার ইতিহাসই একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিয়াছে; এবং এত দিন এ দেশের সর্ব্ব ভাষায় ঐ ইতিহাসের প্রতিধ্বনিমাত্র শ্রুত হইতেছিল। কিন্তু প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইল, ঐ গ্রন্থের প্রতি মারাঠাদিগের অশ্রদ্ধা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। এই সময়ের মধ্যে ডাফ্ যাহা জানিতেন না, এমন অনেক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে। তথাপি কোনও মহারাষ্ট্রীয় লেখক তাঁহার সেই উচ্চ আসন কাড়িয়া লইতে সমর্থ হন নাই। এমন কি, গোবিন্দ সখারাম সর্দেশাই নামক বর্ত্তমান কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মারাঠী ঐতিহাসিক তাঁহার নব-প্রকাশিত "মারাঠী রিয়াসৎ—নবীন আবৃত্তি"তে ডফের কালনির্ণয় এবং অনেক ঘটনা-বিবৃতির অনুসরণ করিয়াছেন।

কারণ, মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে হইলে পারসীক, মহারাষ্ট্রীয় ও হিন্দী ভাষা জানা প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া আফিসে রক্ষিত পশ্চিম-ভারতের ইংরাজী কুঠিগুলির প্রাচীন চিঠিপত্রের হস্তলিপির নকল লওয়া আবশ্যক। এই চারি ভাষার সমস্ত ঐতিহাসিক উপকরণ ব্যতীত মারাঠা-শক্তির অভ্যুত্থানের প্রকৃত ইতিহাস লেখা অসম্ভব। সপ্তদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে যে চারিটি রাজত্ব ছিল, তন্মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় শক্তি অন্যতম। ১৬৬০-১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই চারিটি দেশের ঘাত-প্রতিঘাতে, অহরহ পরিবর্ত্তনশীল সন্ধি-বিগ্রহে দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস বীজগণিতের পারমিউটেশন কম্বিনেশনের মত জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। মোগল সম্রাজ্যের, বিজাপুরের, এবং গোলকুণ্ডার ইতিহাস বিস্তৃত ভাবে জানা না থাকিলে, মারাঠাদের সত্য ও পূর্ণ ইতিহাস জানা সম্ভবপর নহে। এ সমস্ত ইতিহাস কেবল পারস্য ভাষায় লিখিত। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত "বখর" নামক ইতিহাস প্রচলিত আছে। আমরা না জানিয়া সেগুলির অতিরিক্ত ঐতিহাসিক মূল্য কল্পনা করি। কিন্তু সেগুলি অনেক স্থলে মূল্যহীন ও ভ্রান্তিজনক। তাহাদের একখানিও শিবাজীর বা শম্ভাজীর সময়ে রচিত নহে।

১৬৭৪ খৃঃ অঃ শিবাজী রাজসিংহাসনে বসেন; তাহার পূর্ব্বে মার্হাঠাদিগের কোনও রাজা ছিল না, রাজধানী ছিল না, দৃঢ়সম্বদ্ধ রাজ্য ছিল না। তাঁহার স্বজাতির মধ্যে লেখকদিগকে আশ্রয় দিতে পারেন, এমন ধনী লোকের সংখ্যা অল্প ছিল, পণ্ডিত ও ভাবুকদের বাসের নগরও প্রায় ছিল না। সুতরাং এ সময়ের ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। মহারাষ্ট্রীয় প্রথম ইতিহাস "সভাসদ্ বখর"। উহা শিবাজীর মৃত্যুর ১৩ বৎসর পরে এবং জন্মের ৬৬ বৎসর পরে (১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে) রচিত হয়। উহার গ্রন্থকার শিবাজীর জনৈক ভৃত্য। তিনি বৃদ্ধ বয়সে উহাতে অর্দ্ধ-বিস্মৃত জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে ভ্রম অনিবার্য্য। দ্বিতীয় ইতিহাস "শিবদিগ্বিজয়" শিবাজীর কায়স্থ লেখকের পুত্রের রচিত। উহা শিবাজীর জন্মের ৯৯ বৎসর পরে লিখিত হয়। এই গ্রন্থখানি ঐতিহাসিক উপাদানের বাহুল্যের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "বখর" বলিয়া স্বীকৃত। তৃতীয় ইতিহাস "চিত্রগুপ্ত বখর"। ইহা প্রথম বখর হইতে চুরী, ইহার স্বাধীন মূল্য নাই। চতুর্থ ইতিহাস, "চিট্নিস বখর"। শিবাজীর কেরাণীর বংশধরদিগের দ্বারা এই পুস্তক ১৮১০ খৃঃ অব্দে লিখিত হয়। ইহাতে যেমন কতকগুলি অদ্ভুত গল্প আছে, তেমনই খাঁটী খবরও কিছু কিছু আছে। গ্রন্থকার যে তাঁহার হস্তগত সমস্ত প্রাচীন কাগজপত্রের যথাযথ ব্যবহার করেন নাই, তজ্জন্য ঐতিহাসিক ডাফ্ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ডাফের গ্রন্থ ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার পর যে সব বখর রচিত হইয়াছে, তাহা আধুনিক ও অকর্ম্মণ্য। তৎপরে "ভোঁসলে বখর"। এই গ্রন্থখানি চুরী করা, এবং অবিশ্বাস্য গল্পে পরিপূর্ণ। বরোদার ভূতপূর্ব্ব গাইকুয়ারের ব্যয়ে প্রকাশিত "শিবপ্রতাপ" বখরখানি একেবারেই অসার। রায়গড় দুর্গের পাদদেশে পাচাড় গ্রামে একখানি মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাস ছিল। তাহার ইংরাজি অনুবাদ ফরেষ্ট সাহেব ছাপিয়াছেন। ঐ অনুবাদ যে বিশ্বাসের অযোগ্য, ভুল প্রমাদে পরিপূর্ণ, তাহা ৺কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলাঙ্গ দেখাইয়া দিয়াছেন। ইতিহাস হিসাবেও ইহার মূল্য কম।

ইংলণ্ডের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত একখানি ফার্সী "শিবাজীর ইতিহাস" নামক প্রাচীন হস্তলিপি আমি আমূল ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের 'মডারণ-রিবিউ' পত্রে প্রকাশিত করি। এখানি ফার্সী ভাষায় রচিত হইলেও কোনও মারাঠী মূল গ্রন্থের অনুবাদমাত্র; সুতরাং এখানেই উহার উল্লেখ করা উচিত।

আমি মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাস সম্বন্ধে পারসীক ভাষাতে যাহা পাওয়া যায়, এরূপ তথ্য ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া "মডারণ-রিবিউ" পত্রে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছি। মারাঠী চিঠিপত্রাদিতে যে প্রামাণিক তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার প্রায় সবই ডাফের পরে সংগৃহীত। কয়েক জন ত্যাগী মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিকের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এইরূপ দশ হাজারেরও অধিক পত্র সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইয়াছে। এইগুলি শিবাজীর পূর্ব্ব হইতে পেশোয়াদিগের পতন পর্য্যন্ত কালের ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ। ঐ সকল পত্র ব্যতীত আরও বহু সহস্র পত্র সংগৃহীত হইয়া মুদ্রণের অপেক্ষা করিতেছে। মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাস-সেবকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত পারসনিস, রাজবাড়ে ও খরে, এই তিন জনের কথার উল্লেখ না করিলে এই প্রবন্ধের অঙ্গহানি হইবে। ইহাঁরা অন্বেষণে ও শ্রমে অক্লান্ত। রাজবাড়ে যখনই শুনিয়াছেন, কোনও স্থানে প্রাচীন পত্র আছে, তখনই তথায় যাইয়া, কোথাও প্রলোভনে, কোথাও বা ভীতি প্রদর্শনে, বা বিনীত প্রার্থনায়, কোথাও বা বচন দিয়া স্বত্বাধিকারীকে হস্তগত করিয়া সেই পত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল পত্রের মধ্যে শিবাজীর ইতিহাস-রচনায় কাজ দেয়, এরূপ পত্র পঁচিশখানার অধিক নাই (রাজবাড়ে, ৮ম বালুম)। কিন্তু "শিবকালীন" অন্যান্য পত্রাদিতে রাজবাড়ে ছয় বালুম পুস্তক পূর্ণ করিয়াছেন। ঐ সকল চিঠিতে ইতিহাসের ঘটনা বা রাজার সংবাদ নাই; এগুলি দানপত্র, এবং অন্যান্য দলীল, মামলা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি, কর্ম্মচারি-নিয়োগ-পত্র, নালিশ ইত্যাদি। বস্তুতঃ সেগুলি ব্যক্তিগত আইনসংক্রান্ত কাগজপত্র, এবং দলীল (Private legal documents)। যদিও এগুলিতে কখন কখন সমাজের চিত্র, শাসনপ্রণালীর দৃশ্য পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ইহাতে রাজনীতিক ইতিহাসের উপকরণ নাই। একওয়ার্থ কর্তৃক প্রকাশিত "ঐতিহাসিক পাবড়ে" অর্থাৎ গাথা (ballads) হইতে শিবাজীর জীবনের দুই তিনটি ঘটনা-মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শিবাজীর বা শম্ভাজীর জীবনকালে কোনও বখর রচিত হয় নাই। শিবাজীর বংশধরগণের রাজত্বকালে শুধু "সভাসদ্ বখর" রচিত হয়। ইহার কারণ এই যে, শিবাজীর সিংহাসনাধিরোহণের পরই সর্ব্বপ্রথম মহারাষ্ট্র দেশ শান্তি ভোগ করিয়াছিল; দেশ নিরাপদ হইয়াছিল। কিন্তু এই শান্তি তের বৎসরের অধিক কাল ছিল না। শিবাজীর মৃত্যুর পরে প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া মহারাষ্ট্র দেশ উলট্-পালট্ হইয়া পড়ে। সমস্ত নগর ও রাজাবাস দিল্লীশ্বরের হস্তগত

হয়। অসংখ্য গ্রাম দগ্ধ করা হয়। এ অবস্থায় ইতিহাসের উপকরণ রক্ষিত হইতে পারে না; ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। মহারাষ্ট্র দেশে যে স্থায়িভাবে শান্তি স্থাপিত হয়, তাহা শিবাজীর সমসাময়িক নহে, তাঁহার অভ্যুদয়ের আশী বৎসর পরে।

পারসীক ভাষায় লিখিত ইতিহাসের মূল্য বিচার করিতে গিয়া প্রথমেই দেখি যে, মুসলমান জাতি ইতিহাসের ভক্ত। ইঁহারা তারিখ সম্বন্ধে যেরূপ যত্ন করিয়াছেন, হিন্দু ঐতিহাসিকরা তেমন করেন নাই। মুসলমানি ইতিহাস পাঠে ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের কাল-নির্ণয় ও সৈন্যগণের গতিবিধি অতি সূক্ষ্ম ও সুচারুরূপে নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। ইহাতে ঐতিহাসিক সত্য-নির্ণয়ের বিশেষ সুবিধা হয়। হিন্দু ঐতিহাসিকগণ সন্ন্যাসীর বংশধর। তাঁহারা জাগতিক ঘটনাসমূহের ক্ষণস্থায়ী কালের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল অনাদি অনন্ত মহাকালের প্রতিই লক্ষ্য রাখিতেন। তাই, হিন্দুর রচিত ফার্সী ইতিহাসেও তারিখের অভাব বা গোলমাল দৃষ্ট হয়।

[ইহার পর বক্তা শিবাজীর যুগসম্বন্ধীয় চারি ভাষায় রচিত উপকরণগুলির নাম উল্লেখ করিয়া বিশেষভাবে সমালোচনা করিলেন।]

শিবাজীর জীবনের সংস্রবে দাক্ষিণাত্যের তৎকালীন তিনটি প্রবল মুসলমান শক্তির ইতিহাস সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কেন তিনি অমুক অমুক বৎসর বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, কেন তাঁহার সব চেষ্টা তখন বিফল হইয়াছিল, আর কেন অন্যান্য বৎসর তিনি সহজে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। অর্থাৎ,তাঁহার জীবনের ঘটনাগুলির কার্য্যকারণসম্বন্ধ শুধু মুসলমান-ইতিহাস হইতেই বিশুদ্ধরূপে জানা যায়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, শিবাজীর জীবনকালে মুঘল বাদশাহ, বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহ, এবং গোলকুণ্ডার সুলতান কুতব শাহ, ইহাঁদের মধ্যে প্রায় সর্ব্বদাই ঘাতপ্রতিঘাত হইত; সামান্য দুই একবারমাত্র ইহাঁরা সমবেত হইয়া শিবাজীকে আক্রমণ করেন, আর তখনই শিবাজীকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হয়। আদিল শাহ ও কুতব শাহ কখনও ভুলিতে পারিতেন না যে, মুঘল বাদশাহের স্থায়ী এবং গূঢ় অভিপ্রায় তাঁহাদের রাজ্য হরণ করা। তাঁহারা জানিতেন যে,একমাত্র শিবাজীকেই বাদশাহ পরাস্ত করিতে পারেন নাই, এবং মুঘল আক্রমণ হইতে একমাত্র শিবাজীই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। সুতরাং শিবাজী বিজাপুর-রাজের বিদ্রোহী

পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া তাহার পর হইতে গোপনে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকেন।* ১৬৭৮ এবং ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে মুঘলসেনা যে দুইবার বিজাপুর নগর ভীষণভাবে আক্রমণ করে, তখন শিবাজীই আদিল শাহকে অত্যন্ত আবশ্যক সাহায্য করিয়া মুঘলদের চেষ্টা ব্যর্থ করেন, এবং এ জন্য কৃতজ্ঞ আদিল শাহ তাঁহাকে প্রভূত পুরস্কার দেন। কুতব শাহের হিন্দু মন্ত্রী মাদন্ন পন্থ শিবাজীকে বাৎসরিক এক লক্ষ হুন অর্থাৎ ৫॥ লক্ষ টাকা কর দিয়া, গোলকুণ্ডা রাজ্য-রক্ষার স্থায়ী বন্দোবস্ত করেন।

একে ত মুঘলদের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্য দুইটির ঝগড়া, তাহার উপর দাক্ষিণাত্যের মুঘল সুবেদারের গৃহে কলহ, বিজাপুর রাজসভায় অন্তর্বিবাদ। রাজপুত্র মুয়াজ্জম (সুবেদার) এবং তাঁহার প্রধান সেনাপতি দিলীর খাঁর মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি সম্বন্ধ। তৎপরবর্ত্তী সুবেদার বাহাদুর খাঁ বিজাপুরের "দক্ষিণী" মন্ত্রী দলের পক্ষ লইলেন, আর তাঁহার সহযোগী দিলীর খাঁ আদিলশাহী পাঠান মন্ত্রী ও সৈন্যের সাহায্য করিতেন।

শিবাজীর অভ্যুদয়ের সময় বিজাপুর রাজ্যের দ্রুতবেগে অবনতি হইতে থাকে। সুলতান নাবালক, বা মদ্যপায়ী, মন্ত্রিহস্তে পুত্তলিকামাত্র। রাণীমা চরিত্রহীনা। সেনাপতিগণ স্বার্থপর; রাজদ্রোহী হইয়া নিজ নিজ শাসিত প্রদেশে নিজের নামে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে ব্যস্ত। রাজধানীতে কোন মন্ত্রী উজীর হইয়া রাজার উপরে আধিপত্য করিবেন, এই লইয়া বারংবার যুদ্ধ, খুন এবং লুট চলিতে থাকে; বিজাপুর সহরের রাস্তা রক্তে প্লাবিত হয়। তখন "রাজা হইতে প্রজা পর্য্যন্ত কেহই দিনে আরামে রুটী খাইতে পাইত না, আমীর হইতে ফকীর পর্য্যন্ত কেহ নির্ভয়ে রাত্রে ঘুমাইতে পারিত না" (বাসাতীন্-ই-সালাতীন।) এই রাজ্য শিবাজীর মত বিদ্রোহী প্রজাকে দমন করিবে!

দাক্ষিণাত্যের তিন মুসলমান শক্তির বিবাদ ও দুর্ব্বলতাই শিবাজীর অভ্যুত্থানের প্রধান সহায় হয়।

শিবাজীর চরিত্র মহারাষ্ট্র-ইতিহাসে বিশেষ বিবেচনার সামগ্রী। আমার মতে, যে সব প্রতিভাশালী হিন্দু স্থায়ী প্রতিষ্ঠা ও জাতি গঠিত করিয়াছেন, শিবাজীই তাঁহাদের শেষ দৃষ্টান্ত।

তাঁহার সহিত রণজিৎ সিংহের তুলনা করিলেই এ কথা বুঝা যাইবে। শিখ-

---

* এ কথা সুরট ও বোম্বের ইংরাজরা স্পষ্টই জানিতেন; তাঁহাদের কাগজপত্রে, ডাক্তার ফ্রায়ারের ভ্রমণকাহিনীতে, এমন কি, আওরংজীবের চিঠিতে ইহা অকাট্য সত্য বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

দিগের শাসনপ্রণালী অতি জঘন্য ছিল; শিবাজীর ব্যবস্থা দেশের গৌরব ও সুখের কারণ হইয়াছিল। রণজিতের সৈন্যসমূহ ফরাসী সেনাপতিদিগের দ্বারা চালিত হইত; কিন্তু শিবাজীর সৈন্যদল তাঁহার নিজের বুদ্ধিতে গঠিত, তাঁহার নিজের আদেশে চালিত। রাজ্যশাসনও তিনি নিজেই করিতেন, বিদেশী সেনাপতির হাতে দিতেন না। তাঁহার গঠা জিনিসের আয়ু দীর্ঘ ছিল, মূল্যও অতুলনীয়। তাই তিনি অতি মহতী প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিরক্ষর ছিলেন—লিখিতে পড়িতে জানিতেন না; নিজ ক্ষমতা-স্থাপনের পূর্ব্বে কোনও রাজসভা, কোনও বড় সহর, কোনও মহৎ সেনানিবাস দেখিবার, কোনও বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ মন্ত্রী বা সেনাপতির সাহায্যের সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই; কেবল স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে সুদৃঢ় রাজ্য-স্থাপন, অজেয় সেনাগঠন ও মহৎ পবিত্র লোকহিতকর শাসনপ্রণালী রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাল্য-শিক্ষক দাদাজী শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন মাত্র। তিনি তাঁহাকে সামান্য বিষয়-কর্ম্মের জ্ঞান দান করিয়া গোমস্তাগিরিতে দক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ-নীতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে শিবাজী যে অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিজের প্রতিভাবলে। তাঁহার উদয়ের পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র জাতি অণু-পরমাণুর ন্যায় সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত ছিল। তিনি তাহাদিগকে একত্র করিয়া একটি মহতী জাতির সৃষ্টি করেন। তিনি মুঘল, বিজাপুর, পোর্ত্তুগীজ ও হাবশী সিদ্দী, এই সকল শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এমন ক্ষমতা আমাদের ইতিহাসে আর কাহারও দেখা যায় নাই। বস্তুতান্ত্রিক মারাঠা বখরকার মৃত্যুর সময় শিবাজী কি কি জিনিস রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন—এত হাতী, এতগুলি ঘোড়া, এত হাজার সৈন্য, এত ক্রীত দাসদাসী, এত মণি, এত মুক্তা, এত জহরৎ, এত কোটী মুদ্রা, এমন কি, কয় হাঁড়ি কিসমিস পেস্তা, সে সবই তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনের উল্লেখ করা হয় নাই—তাহা মারাঠা জাতির নবীন প্রাণ-দান। সে কথা লিখিয়াছেন ঐতিহাসিক ডাফ্ সাহেব। শিবাজীর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়েরা পরের ভৃত্যমাত্র ছিল, পর-রাজ্যের বেতনভোগী সৈন্যমাত্র। যুদ্ধের নেতৃত্বে কিংবা রাজ্যশাসনে তাহাদের কোনও অধিকার ছিল না। শিবাজী প্রথমে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধকার্য্যে স্বাধীন নেতা হইতে শেখান, পরে রাজ্যশাসনের সর্ব্ববিধ ভার গ্রহণ করান।

শিবাজী দেখাইয়া গিয়াছেন যে, এই জাতি রাজ্য-স্থাপন, এবং জাতি-গঠন

করিতে পারে। ইহারা আত্মরক্ষায় সমর্থ। ইহারা সাহিত্য, ধর্ম্ম, শিল্প, বাণিজ্য, সমস্ত রক্ষা করিয়া তাহাদের উন্নতিসাধন করিতে পারে। শিবাজীর যুদ্ধ-জাহাজ ও বাণিজ্য-পোত উভয়ই ছিল। তদ্দ্বারা তিনি সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, এ জাতি জল-যুদ্ধ ও নৌবাণিজ্য উভয় কার্য্যেই সমর্থ। তিনি আরও প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, এই জাতির মধ্যে মানবের শাসনকর্ত্তা, রাজদূত, সেনাপতি, এমন কি ছত্রপতি রাজা পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করিতে পারেন ; হিন্দুদিগের জাতীয় জীবন আবার জাগিতে পারে। হিন্দু-জাতি-মহীরুহ এখনও মৃত নহে—উহাতে নবাঙ্কুর উদ্ভূত হইয়া, উহা পুনরায় নবীন ফল পুষ্পে শোভিত হইয়া সমগ্র জগতের চক্ষে এক অভিনব শোভা ধারণ করিতে পারে। তাঁহার জীবন এই সত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ, এই জন্যই শিবাজীর নাম আমাদের নিকট এত গৌরবের, আদরের সামগ্রী। *

শ্রীযদুনাথ সরকার।

আশার আশা।

ক

[অমরনাথের কথা।]

১

আমি এক বৎসর পরে বাড়ী যাইতেছিলাম। এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে চাকরীর চেষ্টা—ইত্যাদি ছুতায় গ্রীষ্মের অবকাশে বাড়ী যাই নাই। পূজায় যাইতেছিলাম। যাইতে ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা—উভয়ই ছিল। এক বৎসর পরে—পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়া বাড়ী যাইব, তাহাতে অনিচ্ছা কেন? সে বড় দুঃখের কথা। সে কথা কহিতে পাই না বলিয়া তাহা বুকে ভারের মত চাপিয়া থাকে, বলিলে যেন ভার লাঘব হয়।

আমি শৈশবে মাতৃহীন। মা আমাকে লইয়া বাপের বাড়ী গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার অতর্কিত মৃত্যুর সংবাদ পাইয়াই পিতামহী আমাকে তাঁহার কাছে আনিয়াছিলেন, এবং আমাকে লইয়া ব্যস্ত হইয়াছিলেন। আমাকে কাছে রাখিয়া, আমাকে দিয়া বাবাকে ব্যাপৃত রাখাও সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রৌঢ়ার অভিপ্রেত ছিল। কি জানি, নহিলে—যৌবনে পত্নীশোকে বিচলিত-

* সাহিত্য-পরিষদে বিবৃত।

চিত্ত পুত্র যদি সংসারে বীতস্পৃহ হয়, বা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, বা আবার বিবাহ করে।

অত অল্প বয়সে বিপত্নীক পুত্রের বিবাহের কথা কেহ তাঁহার কাছে উত্থাপিত করিলে ঠাকুরমা আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, "আহা—এই মাওড়া ছেলে তোমাদের কি অপকার করিয়াছে যে, তোমরা ইহার এই শত্রুতা সাধিবে?" কেহ পিতামহীর এই উত্তরে বিস্ময় প্রকাশ করিলে তিনি বুঝাইয়া দিতেন, "সৎমা আনিয়া দিবার মত শত্রুতাসাধন আর কি হইতে পারে?" তাঁহার এই কথায় প্রস্তাবকারীরা নিরুত্তর হইতেন; কিন্তু সম্মুখে কিছু না বলিলেও পশ্চাতে তাঁহারা বলিতেন, "কথার শ্রী দেখ! যে বয়সে লোকের একবার বিবাহ হয় না—সেই বয়সে ছেলে বিপত্নীক হইল। তাহার বিবাহের কথা বলিলে বলে, শত্রুতা সাধিবে! এমন মাও ত দেখি নাই—ছেলেকে গৃহী না করিয়া সন্ন্যাসী করিতে চাহে! কলিতে কাহারও ত ভাল করিতে নাই!" সে সব কথা শুনিলে ঠাকুরমা বলিতেন, "তোমাদের ভাল তোমাদের কাছেই থাকুক। আমার ছেলের বা নাতির ভাল না হয় তোমরা নাই করিলে।" তিনি জানিতেন, যাহারা "গায় পড়িয়া"—"বাড়ী বহিয়া" উপদেশ দিতে আইসে, তাহারা আপনাদের উপদেশ অমূল্য বলিয়াই মনে করে, আর সেই "বিনামূল্য" উপদেশ গৃহীত না হইলেই রাগ করে।

কিন্তু ঠাকুরমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। যাঁহারা তাঁহার কথায় বলিয়া গিয়াছিলেন, "ভাল দেখা যাইবে—কি হয়"—তাঁহাদের কথাই ফলিল। বাবার অর্থ ছিল, সুতরাং জীবিকার জন্য চিন্তা ছিল না; অবসর ছিল, সুতরাং কারণ অকারণ নানা ভাবনা ভাবিবার সুযোগ ছিল; যৌবন ছিল, সুতরাং আবার বিবাহ করিবার জন্য পরামর্শের অভাব হয় নাই। তাই বৎসর দুই অপেক্ষার পর পিতার "বিবাহ করি কি না করি" সংশয় "করি"তেই পরিণতি লাভ করিল। ঠাকুরমা পুত্রের চরিত্র নখদর্পণে দেখিতেন। পুত্রের অভিপ্রায় বুঝিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন, এবং আমাকে আরও নিবিড় স্নেহে বদ্ধ করিলেন; কিন্তু পিতার মতের প্রতিবাদ করিলেন না—পুত্র বিবেচনা করিয়া যে কাজ করিবেন তাহাতে তিনি আপত্তি করিবেন কেন? পুত্র আপনার ভাল আপনি বুঝিবার বয়স পাইয়াছে। তবে তিনি স্থির সঙ্কল্প করিলেন, আমার ভার তিনি আর কাহাকেও দিবেন না—বাবাকেও নহে।

ফলে বিবাহের পর বাবা বিমাতাকে আমার মা ও আমাকে তাঁহার ছেলে

করিবার জন্য উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাস্থাপনের যত চেষ্টা করিতেন, ঠাকুরমা ততই সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতেন। বাবা ইহাতে বিরক্ত হইলেও কিছু বলিতে সাহস করিতেন না। কারণ, তিনি জেদী এবং একগুঁয়ে হইলেও মার কাযের বিরুদ্ধে কথা কহিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। পিতামহী বাল্যে পিতৃহীন পুত্রকে শাসনের সঙ্গে স্নেহ ও স্নেহের সঙ্গে শাসন মিশাইয়া এমন ভাবে "মানুষ করিয়াছিলেন" যে, বড় হইয়া বাবা সব পারিলেও মার কথার বা কাজের প্রতিবাদ করিতে সাহস করিতেন না। সে বিষয়ে সঙ্কোচ তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল।

আমার সম্বন্ধে ঠাকুরমার এই ব্যবস্থার ফল ভাল হইয়াছিল কি না, তাহার বিচার করিবার অধিকার আমার নাই; কারণ, তিনি যাহা করিয়াছিলেন, আমার ভালর জন্যই করিয়াছিলেন। তবে, সেই ব্যবস্থায় যে বিমাতার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হইতে পায় নাই, তাহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য। ঘনিষ্ঠতা হইলে যেমন ভাল হইত, তেমনই মন্দও হইতে পারিত—কারণ, ঘনিষ্ঠতায় মাকে ছেলের অনেক "ঝঞ্ঝাট পোহাইতে" হয়, আর বিমাতা যতই কেন ভাল হউন না, মা নহেন, সুতরাং "নাড়ীর টানে"র অভাবে তাঁহার পক্ষে সে সব ঝঞ্ঝাটে বিরক্ত হওয়া অসম্ভব নহে, পরন্তু স্বাভাবিক।

ঠাকুরমা যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন বিমাতার কোনও ব্যবহারে আমার প্রতি অপ্রসন্নভাব প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেও যে সে অপ্রসন্নতা আমি লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলাম,এমন নহে। কিন্তু বিমাতার প্রথমা কন্যা সুমতীর বিবাহের পর হইতেই আমি তাহা লক্ষ্য করিলাম। সুমতীর শ্বশুরের বাড়ী কলিকাতায়—আমি কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া করি; এ অবস্থায় আমার পক্ষে ভগিনীর শ্বশুরালয়ের সহিত একটু ঘনিষ্ঠতা-সংস্থাপনচেষ্টা সামাজিক হিসাবে কর্ত্তব্য—স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু সতাত ভ্রাতার এই ভগিনী-স্নেহ সুমতীর শ্বশুরের নিকট এমনই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত যে, তিনি তাহাতে তাঁহার বিস্ময় গোপন করিতে পারিতেন না—গোপন করিতেনও না। তাঁহার এই বিস্ময়ের বাতাসে বিমাতার অপ্রসন্নতার বহ্নি সঙ্কোচ-ভস্ম-মুক্ত হইয়া উজ্জ্বলভাবে আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাহা দেখিয়াই আমি বাড়ীতে গতায়াত কমাইয়া দিয়াছিলাম—পাছে কোনও দিন কোনও কারণে বিমাতার সহিত আমার কথান্তর হয়, বা কোনরূপে উভয়ের মধ্যে মাতাপুত্রভাবের অভাব লোকের কাছে ব্যক্ত হইয়া

পড়ে। সেই জন্যই বাড়ী যাইতে অনিচ্ছা ছিল। কিছু দিন হইতে আমার প্রতি বিমাতার অপ্রসন্নতার আরও একটা কারণ ঘটিয়াছিল—বিশ্ববিদ্যালয়ের একটির পর একটি পরীক্ষায় আমি যেমন অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতেছিলাম, তাঁহার পুত্র অনাথনাথ প্রথম পরীক্ষাটিতেই তেমনই অনায়াসে কেবলই অনুত্তীর্ণ রহিতেছিল। আমাদের দুই ভ্রাতায় এই প্রভেদে বিমাতা আমার উপর অপ্রসন্ন হইতেছিলেন।

অথচ আমার যে বাড়ী যাইতে ইচ্ছা, সে বাবার জন্য আর অনাথের জন্য। কিতাবতী বিদ্যায় অনাথের অসম্পূর্ণতা যেমন আমি সম্পূর্ণ করিয়াছিলাম, আমার অনেক ক্রটী তেমনই সে পূরণ করিয়াছিল। ফুটবল খেলায়, সন্তরণে—এক কথায় পুরুষোচিত ব্যায়ামে, আর লোকের বিপদে আপনার সুবিধা অসুবিধা ভুলিয়া সাহায্যদানে গ্রামে কেহ তাহার সমকক্ষ ছিল না। তাহার উদার হাস্য তাহার সরল হৃদয়ের নিষ্কলঙ্কতা ঘোষিত করিত। গ্রামের সব লোক তাহাকে ভাল বাসিত। আর সে আমাকে যত ভালবাসিত, আমি যে তাহাকে তত ভালবাসিতে পারিতাম না—তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইত না। পূজার ছুটীর পূর্ব্বেই সে আমাকে লিখিয়াছিল—"দাদা, কত দিন বাড়ী আস নাই। এবার আসা চাই-ই; নহিলে আমি বড় রাগ করিব।" তাহার ডাক আমাকে চঞ্চল করিয়াছিল। আর বাবাকেও কত দিন দেখি নাই। সেই জন্য বাড়ী যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল। তাই পিতার নির্দ্দেশানুসারে দ্রব্যাদি লইয়া আমি আনন্দ ও আশঙ্কা হৃদয়ে লইয়া এক বৎসর পরে কলিকাতার মেস হইতে আমার পল্লীবাসে যাইবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলাম।

ট্রেনের যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিলাম, তাহাতে লোকের অভাব ছিল না। আমার সঙ্গে অনেক জিনিস, কোনরূপে জিনিস লইয়া উঠিয়া বসিলাম। কিন্তু তিন চারিটা ষ্টেশন পার হইতে না হইতে কামরাটি প্রায় খালি হইয়া গেল। অধিকাংশ যাত্রীই কলিকাতার নিকটস্থ স্থানের—আফিস সারিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। কামরায় থাকিবার মধ্যে আমি, এক জন প্রৌঢ় ব্যক্তি ও তাঁহার সহযাত্রী এক জন কিশোরী। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে—পশ্চিমে আকাশের নিম্নভাগে একখানা মেঘে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে—উপরে আকাশে নক্ষত্রদীপ্তি। বর্ষায় বৃক্ষলতার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। তাই রেলের রাস্তার দুই পার্শ্বে যে জমী রেল-কোম্পানী কেবল কিনিয়া ও তাহা হইতে আবশ্যক মাটী কাটিয়া লইয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, সেই জমীতে আগাছাগুলা পত্রবহুল শাখা

প্রসারিত করিয়া যেন রাস্তাটাকে চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। পথের পার্শ্বে খাতে জল হইতে পচান পাটের বা পচা পাতার দুর্গন্ধ ও মশক যাত্রীদিগকে বিরক্ত করিতেছে। আমার প্রৌঢ় সহযাত্রী যেরূপে এই পথের কথা তাঁহার সহগামিনী কিশোরীকে বুঝাইতেছিলেন, তাহাতে বোধ হইতেছিল, কিশোরীর পক্ষে এ পথ নূতন। কথায় বুঝিলাম, কিশোরী তাঁহার কন্যা। তাহার বয়সে সাধারণ বাঙ্গালীর মেয়ের যে সঙ্কোচ-জড়তা দেখা যায়, তাহার অভাবই তাহার দিকে লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। সে পিতাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছিল—নানা কথা জানিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছিল।

আমার সঙ্গে একটা ঝুড়ীতে প্রতিমার "ডাকের সাজ" ছিল। তাহা দেখিয়া প্রৌঢ় ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বুঝি পূজায় বাড়ী যাইতেছেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ।"

তাহার পর তিনি নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—আজ কাল দেশের স্বাস্থ্য কেমন, দেশে কোন্ কোন্ ফসল হয়, ব্যবসায়ীদিগের সুবিধা কিরূপ, দেশে শিক্ষা-বিস্তার হইতেছে কি না?—ইত্যাদি। বিদ্যালয়ে অধীত পাশ্চাত্য দর্শনের প্রশ্ন হইলে আমি সে সকলের যেরূপ যথাযথ উত্তর দিতে পারিতাম, এ সব "ঘরের কথা"র যে তেমন উত্তর দিতে পারিলাম, এমন নহে। আমার অজ্ঞতায় যে কিশোরীর বিস্ময় জন্মিতেছিল, তাহা তাহার দৃষ্টিতেই প্রকাশ পাইতেছিল। আর সেই বিস্ময়-বিকাশে আমি কেবলই লজ্জিত হইতেছিলাম।

আমি আমার সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার কথায় বোধ হইতেছে, আপনি অনেক দিন বাঙ্গালায় আইসেন নাই। আমার এ অনুমান সত্য কি?"

উত্তরে তিনি বলিলেন, তিনি বিশ বৎসর বাঙ্গালা ছাড়া—অযোধ্যা অঞ্চলে সরকারী ডাক্তার ছিলেন; সংপ্রতি পেন্সন লইয়াছেন। আমি যে ষ্টেশনে নামিব, তাহার আগের ষষ্ঠ ষ্টেশনে নামিয়া তাঁহার বাড়ী যাইতে হয়। বিশ বৎসর তিনি বাড়ী যান নাই। বাড়ীটিও সংস্কারাভাবে জীর্ণ। এক জন দরিদ্র আত্মীয় সেটি চাহিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে গৃহটি দান করিবেন। তৎপূর্ব্বে একবার বাড়ী যাইতেছেন—একবার বাড়ীটি দেখিবার জন্যও বটে, আর কন্যা—আশা—কখনও বাঙ্গালার পল্লী দেখে নাই, তাহাকে দেখাইবার জন্যও বটে। তবে এই ম্যালেরিয়ার সময় সপ্তাহের অধিক কাল তথায় থাকা ঘটিবে না।

তাহার পর তিনি ম্যালেরিয়ার কারণ, ইতিহাস, ব্যাপ্তি—সব বিবৃত করিতে লাগিলেন। বয়সের অনৈক্যহেতু আমাকে তাঁহার "আপনি" বলিয়া সম্ভাষণ অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে "তোমাতে" নামিয়া আসিল। তিনি নানা কথায় আমাকে আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন—আমার ভালবাসা লাভ করিলেন। আমার বাড়ী ষ্টেশন হইতে অনেকটা দূরে, এবং আমার জলপথে বাড়ী পঁহুছিতে পরদিন প্রভাত হইবে শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রিতে আহারের কি হইবে?" আমি বলিলাম, "অপরাহ্ণে আহার করিয়া আসিয়াছি—রাত্রিতে আর আহার করিব না।" শুনিয়া তিনি বলিলেন, "সে কি কখনও হয়! তোমাদের বয়সে অনাহার কেন?" তিনি কন্যাকে বলিলেন, "উঠ ত, মা আশা, কিছু খাবার বাহির কর।" আশা উঠিয়া একটা বাক্স খুলিল। তাহাতে নানারূপ খাবার ছিল। সে একখানা পিরিচ লইয়া আমাকে খাবার দিল। আমার সব আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া আমার প্রৌঢ় সহযাত্রী আমাকে সে সব খাওয়াইয়া তবে নিবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, "সব খাবার ঘরে প্রস্তুত—প্রায় সবই আশা প্রস্তুত করিয়াছে।"

রাত্রি নয়টার পরই ট্রেণ আমার সহযাত্রীদিগের গন্তব্য স্থানে আসিল। সে ষ্টেশনে ট্রেণ দুই মিনিট মাত্র থামে। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি নামিয়া কুলী ডাকিয়া জিনিস নামাইয়া লইতে না লইতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তিনি ব্যাকুল হইয়া ডাকিলেন—"আশা! আশা!" ততক্ষণে ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে অবস্থায় কিশোরীর পক্ষে নামা বিপজ্জনক বুঝিয়া আমি ব্যস্ত হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম—চীৎকার করিয়া বলিলাম, "আমি আপনার কন্যাকে লইয়া পরের গাড়ীতে ফিরিয়া আসিব।" তাহার পর আমি আশার দিকে ফিরিলাম। সে তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার মুখের পাণ্ডুতায় ও নয়নের দৃষ্টিতে তাহার আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা ব্যক্ত হইতেছিল। তাহাকে বলিলাম, "চলন্ত ট্রেণ হইতে নামিবার চেষ্টা করিলে তোমার বিপদ ঘটিত। তুমি ভয় পাইও না; আমি পরের গাড়ীতে তোমাকে ফিরাইয়া লইয়া আসিয়া তোমার বাবার কাছে দিয়া যাইব।" কথাটা বলিয়াই আমার মনে হইল—কিন্তু আমার সঙ্গে পূজার জিনিস, আমারও ত বিলম্ব করা সঙ্গত নহে। সঙ্গে টাইমটেবল ছিল; সেখানি খুলিয়া আমি দুই দিকের গাড়ীর সময় দেখিয়া বুঝিলাম, আমাকে যে ষ্টেশনে নামিতে হইবে, সে ষ্টেশনে নামিয়া বিপরীত-দিকগামী ট্রেণ পনর মিনিট পরেই পাওয়া যাইতে পারে। তখন আমি স্থির করিলাম, আমি আশাকে লইয়া সেই ষ্টেশনে

নামিব, এবং বাড়ী হইতে যে চাকর আসিয়াছে, জিনিসগুলা দিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিয়া পরের ট্রেণে আশাকে লইয়া ফিরিয়া আসিব। আমি আশাকে সে কথা বুঝাইয়া বলিলাম—বলিলাম, আজ কাল মেয়েদের পক্ষে ট্রেণে গতায়াত যেরূপ শঙ্কাসঙ্কুল হইয়াছে, তাহাতে আমি তাহাকে একা যাইতে দিতে পারি না। কিন্তু আমার সঙ্গে অনেক জিনিস—সেগুলি পরদিন সকালে বাড়ী পৌঁছাইতেই হইবে—সেই জন্য আমি আমার গন্তব্য ষ্টেশনে সেগুলি দিয়া ফিরিয়া আসিব। যখন সে ষ্টেশনে নামিলেও পরের ট্রেণ পাওয়া যাইবে, তখন পরবর্ত্তী ষ্টেশনে না নামিয়া তথায় নামিলে কোনও অসুবিধা হইবে না। আশা সব শুনিয়া বলিল, "আপনি যাহা ভাল মনে করেন, তাহাই করুন।" তখনও তাহার মুখে পরিব্যাপ্ত পাণ্ডুতা অন্তর্হিত হইয়া যায় নাই—তাহাতেই তাহার মানসিক চাঞ্চল্যের পরিচয় সপ্রকাশ ছিল। কিন্তু তাহার ব্যবহারে বা কথায় চাঞ্চল্যচিহ্ন ছিল না। বিশেষ তাহার দৃষ্টিতে ও ব্যবহারে বিশ্বাসের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। সেই পাণ্ডুগণ্ড বিশ্বাসসমুজ্জ্বলদৃষ্টি কিশোরীকে দেখিয়া আমার মনে হইল—আমি জীবনে রমণীতে আর কখনও সেরূপ সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করি নাই। তাহা সত্য কি আমার মুগ্ধ কল্পনার স্বর্ণবর্ণপ্রলেপসৃষ্ট, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে তাহার সেই মুখের ছবি আমি আমার চিত্তপট হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারি নাই। মানুষের জীবনে একবারমাত্র এমন ঘটনা ঘটে—সে দিন সহসা তাহার হৃদয়ের উপর যে চিত্র অঙ্কিত হইয়া যায়, তাহা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট না হইয়া সুস্পষ্টই হইয়া উঠে।

৩

দেখিতে দেখিতে ট্রেণ পরবর্ত্তী ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। লণ্ঠন-হাতে চশমা-নাকে ধুতী-পরণে টুপী-মাথায় ষ্টেশনমাষ্টার কয়টা কামরায় উঁকি দিয়া আমাদের কামরায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একখানা টেলিগ্রাম ছিল। তাহা দেখিয়া তিনি কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বাবু বেণীমাধব রায়ের কন্যা—আশা?"

আশা বলিল, "হাঁ।"

"বেণী বাবু টেলিগ্রাফ করিয়াছেন, আগের ষ্টেশনে আপনাদের নামিবার কথা—আপনি না নামিতে ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়াছিল। তিনি আপনাকে নামাইয়া লইয়া রাখিতে বলিয়াছেন। তিনি পরের গাড়ীতে আসিবেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "পরের গাড়ী কতক্ষণ পরে আসিবে?"

ষ্টেশনমাষ্টার আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পাঁচ ঘণ্টা পরে।"

আমি বলিলাম, "এতক্ষণ ইনি একা এই অপরিচিত স্থানে থাকিবেন! ত হইতে পারে না।"

একটু রুক্ষস্বরে ষ্টেশনমাষ্টার বলিলেন, "কেন?"

আমি রেলে মেয়েদের বিপদ ও রেলকর্ম্মচারীদের ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহাতে ষ্টেশনমাষ্টার চটিয়া গেলেন; বলিলেন, "আপনি কি করিতে বলেন?"

"বিপরীত দিকের ট্রেণ তাহার পূর্ব্বে আসিবে। সেই ট্রেণে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল।"

"কিন্তু বেণী বাবু ত তাহা লেখেন নাই।"

"তিনি ব্যস্ত হইয়া টেলিগ্রাফ করিয়াছেন; অত ভাবিবার সময় পান নাই।"

"ভাল, তবে উঁহাকে লইয়া নামুন; নামিয়া তাঁহাকে টেলিগ্রাফ করুন; তিনি যাহা বলেন, তাহাই করা যাইবে।"

"আমি এ ষ্টেশনে নামিতে পারিব না।"

"কেন?"

"আমার সঙ্গের এই সব জিনিস আমাকে পাঁচ ষ্টেশন পরের ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিতেই হইবে। আর যখন সে ষ্টেশন হইতেও ফিরিবার ট্রেণ ধরা যাইবে, তখন তাহাতে কোনও ক্ষতি হইবে না।"

ষ্টেশনমাষ্টার এতক্ষণ মনে করিতেছিলেন, আমি বেণী বাবুর সঙ্গী, এখন তাঁহার সে সন্দেহ ঘুচিল। তিনি বলিলেন, "আপনি ইঁহার কে?"

ঠিক এই কথাটাই আমি ভাবিয়া দেখি নাই। বাস্তবিক আশার অভিভাবকত্বে আমার কোনরূপ অধিকার নাই। ছেলেরা অনেক যত্নে তাসের ঘর প্রস্তুত করিতে করিতে সহসা অঙ্গুলীর কম্পনে তাহা পড়িয়া গেলে তাহাদের অবস্থা যেরূপ হয়, ষ্টেশনমাষ্টারের কথায় আমার অবস্থা সেইরূপ হইল। আর আমাকে থতমত খাইতে দেখিয়া ষ্টেশনমাষ্টার প্রবল হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "আপনি যদি উঁহার আত্মীয় না হন, তবে আপনি অপরিচিত অজ্ঞাতকুলশীল যুবক, আপনার সঙ্গে যুবতীর গমন ত কোনও প্রকারেই সঙ্গত নহে।"

আমি কোনও উত্তর দিতে না পারায় তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে বলিলেন, "আর যিনি যাহাই বলুন ইঁহার পিতা যে আদেশ করিয়াছেন, তাহাই ত পালন করিতে হইবে।"

তখন নিরুপায় হইয়া আমি আশাকে বলিলাম, "তুমি অবস্থা সব দেখিতেছ। তোমাকে হয় বিশ্রাম করিয়া পাঁচ ঘণ্টা এই ষ্টেশনে থাকিবার জন্য নামিতে হইবে, নহে ত আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। তুমি কি করিবে—নামিবে ?"

আশা দৃঢ়স্বরে বলিল, "না।"

ষ্টেশনমাষ্টারকে হারি মানিতে হইল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, আশাকে আর একবার নামিবার জন্য বুঝাইয়া বলিবেন ; কিন্তু ট্রেণ ছাড়িতে বিলম্ব হওয়ায় গার্ড তাঁহার সঙ্গে ঝগড়া করিতে লাগিল। অগত্যা তিনি কামরা হইতে নামিতে নামিতে চীৎকার করিয়া হাঁকিলেন—"ঘণ্টা—এ—ই—ঘণ্টা।"

উড়িয়া মালী টাঙ্গান লাইনের টুকরায় হাতুড়ী পিটিয়া দিল।

ষ্টেশনমাষ্টার আমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন, "আজ কালকার ছেলে কি ভয়ানক ! ভদ্রলোক অনায়াসে মেয়েটার—"

ইচ্ছা হইল নামিয়া ঘাকতক দিয়া দিই।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

আশা বলিল, "আপনাকে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িতে হইল !"

আমি বলিলাম, "তোমার অসুবিধার তুলনায় আমার অসুবিধা অতি সামান্য। জিনিস লইয়া চাকর নৌকায় চলিয়া যাইবে, সুতরাং জিনিস যথাকালে পৌছিবে। তাহার পর আমাকে আসিয়া নৌকা করিয়া বাড়ী যাইতে হইবে। তবে সব সময় ঘাটে ভাড়া নৌকা থাকে না।"

"আপনার পিতামাতা কত উৎকণ্ঠিত হইবেন !"

"সে ভয় নাই। বাবা আমাকে ভালরূপ জানেন। আমার মা নাই।"

আশা একটু ব্যস্তভাবে বলিল, "তবে আপনারও মা নাই !"

"না।"

সে আমার দিকে চাহিল—তাহার দৃষ্টিতে যে সমবেদনার ভাব ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে মনে হইল, সমদুঃখে দুঃখী ও সমদুর্দ্দশায় পীড়িত আমাদের দুই জনের মধ্যে একটা নূতন বন্ধন সৃষ্টি হইল।

৪

আমার গন্তব্য ষ্টেশনে ট্রেণ স্থির হইলেই আমি নামিয়া পড়িলাম, এবং আশাকে নামাইয়া লইলাম। বাড়ী হইতে যে চাকর নৌকা লইয়া আসিয়াছিল, সে হারিক্যান লণ্ঠন লইয়া প্ল্যাটফর্ম্মে অপেক্ষা করিতেছিল। সে আমাকে দেখিতে পাইয়া দ্রুত আমার কাছে আসিল ; কিন্তু আমার সঙ্গে অপরিচিতা কিশোরীকে

দেখিয়া এমনই বিস্মিত হইল যে, আমাকে নমস্কার করিতেও ভুলিয়া গেল। আমি তাহার সাহায্যে জিনিসগুলি নামাইয়া লইলাম।

ট্রেণ চলিয়া গেল; পান-চুরুট-ওয়ালাদিগের চীৎকার থামিয়া গেল। আমি প্ল্যাটফর্ম্মের বেঞ্চে আশাকে বসাইয়া, ভৃত্যকে তথায় রাখিয়া ফিরিয়া যাইবার জন্য দুইখানি টিকিট কিনিয়া আনিলাম; তাহার পর অবস্থাটা ভৃত্যকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া তাহাকে বলিলাম, "তুই জিনিস লইয়া নৌকায় চলিয়া যা। আমি কাল ফিরিয়া আসিয়া যাইব।" সে আসল ব্যাপার কতটা বুঝিল, এবং যতটা বুঝিল, তাহার কতটা বিশ্বাস করিল, বলিতে পারি না। তবে তাহাকে আরও বুঝাইবার সময় আমার ছিল না। কারণ, কয় মিনিট পরেই বিপরীতদিকযাত্রী গাড়ী আসিয়া পড়িল। কুলীরা আবার নিদ্রাজড়িতকণ্ঠে ষ্টেশনের নাম হাঁকিল, পান-চুরুট-ওয়ালারা আবার পণ্যের নাম হাঁকিল, যাত্রীরা ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিল; আমি আশাকে লইয়া একটা কামরায় উঠিলাম।

তখন আমার ভৃত্যটির বুদ্ধি সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তা নৌকা চলিয়া গেলে আপনি যাইবেন কেমন করিয়া?"

আমি বলিলাম, "সে বন্দোবস্ত আমি করিয়া লইব। তুই জিনিসগুলা সাবধানে তুলিয়া লইয়া চলিয়া যা।"

ট্রেণের হুইস্‌ল্‌ নিশীথ নিস্তব্ধতার রাজ্যে বিকট শুনাইল।

৫

যে ষ্টেশনে আমার সহিত ষ্টেশনমাষ্টারের বচসা হইয়াছিল, তাহার পরের ষ্টেশন হইতেই আমি বেণী বাবুকে টেলিগ্রাফ করিয়াছিলাম। তিনি ষ্টেশনেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরা ট্রেণ হইতে নামিলেই তিনি ছুটিয়া আমাদের কাছে আসিলেন, এবং আশাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। আশার মুখে হর্ষদীপ্তি ফুটিয়া উঠিল; যেন জলপ্রপাতস্নিগ্ধ কুসুমাস্তৃত উপত্যকায় কুহেলিকাবরণ ছিন্ন করিয়া রবিকর দেখা দিল, তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য সহসা সপ্রকাশ হইল। পিতাপুত্রীর মিলনানন্দে আমার মনে হইল, আমি যে পুরস্কার পাইলাম, আমার অসুবিধার তুলনায় তাহা অত্যন্ত অধিক।

তাহার পর বেণী বাবু আমাকে প্রশংসায় প্লাবিত করিয়া দিলেন। তাঁহার কাছে আমাকে পথের সব ঘটনা আবার বিবৃত করিতে হইল। তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া আশাকে চলন্ত ট্রেণ হইতে নামিতে বাধা দেওয়া, ষ্টেশনমাষ্টারের কথায় তাহাকে নামিতে না দেওয়া—সব বিষয়ে আমার কাজের সমর্থন করিয়া আমাকে

সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। তিনি আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে যাইয়া অন্ততঃ এক দিনের জন্য তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন—পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, আমার কাছে তাঁহার ও আশার কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করিবার সাধ্য তাঁহাদের নাই।

আমি কেন তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিব না, তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিয়া আমি তাঁহাকে বাড়ী যাইতে বলিলাম। তিনি সে কথা শুনিলেন না—আমার যাইবার ট্রেণ না আসা পর্যন্ত তিনি ষ্টেশনে থাকিবেন। অগত্যা আমি বিশ্রামকক্ষে যাইবার প্রস্তাব করিলাম। তিন জনে সেই ঘরে যাইয়া বসিলাম। তখন বেণী বাবু ট্রেণে যাতায়াতে ছোট বড় নানারূপ বিপদের অভিজ্ঞতা বিবৃত করিতে লাগিলেন। একবার ঘুমাইয়া পড়ায়, তিনি যে ষ্টেশনে নামিবেন, সে ষ্টেশন ছাড়াইয়া যাওয়ায় কিরূপে ট্রলীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, একবার লাগেজ হারাইয়া তিনি কিরূপ বিব্রত হইয়াছিলেন, একবার কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন এক জন জমীদারের কলেরার চিকিৎসার জন্য যাইবার সময় তিনি ট্রেণ না পাইয়া কিরূপে এঞ্জিনে গিয়াছিলেন—সেই সব কথা হইতে ক্রমে পশ্চিমে রেলখোলা, তাহার পূর্ব্বে গতায়াতের অসুবিধা, দেশে রেলপথের উপকার অপকার, সেচের খালে ও রেলে আয়ের তারতম্য, পঞ্চনদে সেচের খালে জমীর উন্নতি ও গ্রাম-পত্তন—এইরূপ নানা কথায় তিনি সময় কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। তাহার পর আমার যাইবার গাড়ী আসিলে আবার আমাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় দিলেন।

বেণী বাবুর অজস্র আশীর্ব্বাদ ও প্রচুর প্রশংসা লাভ করিয়া আমি গাড়ীতে উঠিলাম। আশার দৃষ্টিও প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

৬

ঘাটে নৌকা না পাইয়া অধিকাংশ পথ হাঁটিয়া ও খানিকটা পথ মাল-বোঝাই গরুর গাড়ীতে অতিবাহিত করিয়া—পথে কলিকাতার চীনের বাদামের তৈলে ভাজা অম্লজনক কচুরীর অভাবে মুড়ী-গুড়ে দগ্ধোদর পূর্ণ করিয়া যেরূপে পরদিন বাড়ী পঁহুছিয়াছিলাম, তাহার বিস্তৃত বিবরণ আত্ম-চরিতের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিলে তাহাও সাগ্রহে ও প্রশংসাসহকারে পঠিত হইয়া আমার চরিত্রগত গুণ-পরিচয়ে সহায়তা করিবে, এমন শিষ্যসৌভাগ্যলাভের কোনও কাজ আমার দ্বারা হয় নাই। আমি যে ব্যবসা লইয়াছি, তাহাতে কেবল মক্কেলের সঙ্গে "ফেল কড়ী লও কাজ," সম্বন্ধ। সুতরাং সে সুদীর্ঘ কথা আর বলিব না।

ছুত্যা ট্রেণের ঘটনার বিবরণ যেরূপ পল্লবিত করিয়া প্রচারিত করিয়াছিল, তাহাতে পরিবারে সকলেরই ইচ্ছামত কল্পনাপ্রয়োগের সুযোগ ঘটিয়াছিল। আমি আসিয়া দেখিলাম, বাবা কিছু উৎকণ্ঠিত।

আমি সুস্থ হইবার পর বাবা আমাকে ডাকিয়া বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিমাতা তথায় ছিলেন, অনাথও ছিল। আমি সব ঘটনা যথাযথ বিবৃত করিলাম। বিমাতার কথায় ও হাসিতে অবিশ্বাস ফুটিয়া উঠিতেছিল—আর সেই অবিশ্বাস যেন আমার অপেক্ষাও অনাথকে অধিক পীড়িত করিতেছিল। বাবার জিজ্ঞাসার ধারায় বোধ হইল, অবিশ্বাস তাঁহার বিচারবুদ্ধি কলুষিত করিতে পারে নাই; তবে ট্রেণে এইরূপ অবস্থায় অপরিচিতা সঙ্গীহারা কিশোরীর জন্য আমার ব্যাকুলতাটা তাঁহার তেমন ভাল লাগে নাই। আর অনাথ? বাবা চলিয়া যাইবার পর সে প্রশ্নের পর প্রশ্নে ঘটনার যে সব অংশ আমি অনাবশ্যকবোধে বিবৃত করি নাই, সে সব অংশও জানিয়া লইল। সে যেন তাহার কল্পনায় সমস্ত ঘটনাটা পর পর যেমন ঘটিয়াছিল তেমনই—বায়স্কোপের ছবির মত—প্রত্যক্ষ করিল। ষ্টেশনমাষ্টারকে শিক্ষা দিবার জন্য সে আমার সঙ্গে ছিল না বলিয়া সে দুঃখ প্রকাশ করিল, এবং সর্ব্বশেষে বলিল, "দাদা! এ ব্যাপারটা যেমন রোমাণ্টিক, তোমার ব্যবহার তেমনই গ্র্যাণ্ড—দার্শনিকের মত নহে, স্পোর্টসম্যান্ লাইক্।"

পূজা কাটিয়া গেল; বাবার মুখে গম্ভীর ভাব ঘুচিল না। একাদশীর দিন প্রাতেই বাবা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখন বাবার ঘরে আর কেহ ছিল না। যে ভৃত্য তাঁহার ফরসীর কলিকা বদলাইতে আসিয়াছিল, তাঁহার ইঙ্গিতে সে চলিয়া গেল। অনাথ আমার সঙ্গে প্রথম দিন বাবার কথাতেই একটা অতর্কিত ঝটিকার আশঙ্কা করিয়াছিল, এবং কেবলই আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছিল। আমি দেখিতে পাইলাম, সে বাবার পশ্চাতে একটা দ্বারের অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইল।

তামাক টানিতে টানিতে বাবা বলিলেন, "অমরনাথ, আমি কয় বৎসর হইতে তোমাকে বিবাহ করিতে বলিতেছি। এবার তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে। তোমার মা একটি পাত্রী ঠিক করিয়াছেন—ত্রয়োদশীর দিন আমি মেয়ে দেখিতে যাইব।"

ব্যাপারটা আমার অজ্ঞাতে এত দূর অগ্রসর হইয়াছে শুনিয়া আমি কিছু শঙ্কিত হইলাম; বলিলাম, "আমি ত আপনাকে বলিয়াছি, আমি পাঠ শেষ করিয়া তবে বিবাহ করিব।"

"হাঁ। তুমি তাহাই বলিয়াছ, এবং এত দিন আমিও তাহা শুনিয়াছি; কিন্তু আর শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছি না।"

ট্রেণের ঘটনার সঙ্গে কি বাবার কথার কোনও সম্বন্ধ আছে? আমি একটু বিচলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

"তোমার বিবাহের বিলম্বে লোক আমার নিন্দা করিতেছে।"

"মেয়ের মত ছেলের বিবাহে বিলম্ব হইলেও কি লোকনিন্দা হয়?"

"কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়। এ ক্ষেত্রে হইতেছে; কারণ, তোমার গর্ভধারিণী নাই। লোক বলিতেছে, সেই জন্য আমি তোমার প্রতি স্নেহহীন হইয়াছি।"

ট্রেণের ঘটনার সঙ্গে বাবার কথার কোনও সম্বন্ধ নাই জানিয়া যেমন নিশ্চিন্ত হইলাম—বাবার কথায় তেমনই ব্যথিত হইলাম। আমি বলিলাম, "আপনি আমার প্রতি স্নেহহীন হইয়াছেন! এ সন্দেহ ত কোনও দিন আমার মনে স্থান পায় নাই।"

বাবা বলিলেন, "তোমার মনে স্থান পায় নাই—তাহা আমি জানি। কিন্তু লোকের মনে স্থান পাইয়াছে।"

"আর দুই বৎসরে আমার পড়া শেষ হইবে। সেই দুই বৎসর আপনি অপেক্ষা করুন।"

বাবা স্থির ও দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "না।"

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "আপনি বোধ হয়, আমার বিলম্ব-প্রার্থনার অন্য কারণও অনুমান করিতে পারিয়াছেন।"

"পারিয়াছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে তোমার মার ব্যবহারে তোমার কল্পিত কারণের সমর্থক কোনও লক্ষণ পাইয়াছ কি? তিনি কি আমার পুত্রবধূর প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে সাহস করিবেন বলিয়া মনে কর?"

"তাহা করি না—কিন্তু অসন্তোষের বিষ প্রচ্ছন্ন থাকিলে তাহা আত্মপ্রকাশ করিতে কতক্ষণ?"

"তুমি সংসারের কিছুই জান না। সংসারে সব কল্পনার মত হয় না। একটু আধটু অসুবিধা লইয়া সকলকেই ঘর করিতে হয়। সকলকেই তাহা করিতে হইয়াছে, সকলকেই তাহা করিতে হইবে। তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।"

বাবা রাগ করিলে করশীর মুখনল চিবাইতেন। তিনি তাহাই করিতেছিলেন।

আমি বলিলাম, "আপনি আমাকে এ আদেশ করিবেন না।"

"আদেশ আমি করিয়াছি—এখন সে আদেশ মানা না মানা তোমার কাজ।"

পূর্ব্বে বাবা এ কথা বলিলে আমি অসম্মতি জানাইলে তিনি কখনও রাগ করেন নাই—এবার করিলেন। আমার প্রতি তাঁহার স্নেহের অভাব তাহার কারণ নহে। এবার আমি তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। তিনি স্বভাবতঃ প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারিতেন না। আরও কারণ, আমার এই প্রতিবাদে বিমাতার নিকট তিনি পরাজিত হইলেন। বিমাতা যখনই আমার প্রতি পিতার অপ্রসন্নতার সৌধ রচনা করিবার জন্য ভিত্তিরূপে প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেন যে, আমি তাঁহার অবাধ্য হইতেছি, তখনই বাবা বলিতেন, আমি কিছুতেই তাঁহার অবাধ্য হইতে পারি না। এবার বিমাতা তাঁহার কথার অকাট্য প্রমাণ পাইবেন।

কিন্তু আমিও বিচলিত হইলাম। যে জিদ ও একগুঁয়ে ভাব আমি বাবার কাছ হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলাম, কয় বৎসরের দর্শনালোচনায় তাহা একেবারে খরচ করিয়া ফেলিতে পারি নাই। আমি বলিলাম, "কিন্তু আপনি কি সব ভাবিয়াও এই আদেশ দিবেন?"

তিনি বলিলেন, "হাঁ, তুমি এ আদেশ পালন না করিলে আমার সঙ্গে তোমার আর কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না।"

আমি বলিলাম, "তবে তাহাই হউক।"

বাবার মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া এক জন কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া আমার যাইবার জন্য একখানা নৌকা ঠিক করিয়া দিতে বলিলেন।

আমি সে কক্ষ ত্যাগ করিলাম।

আমি ব্যাগে জিনিস ফেলিয়া লইয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম, এমন সময় অনাথ কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং বলিল, "দাদা, তুমি ভাবিও না। ছয় মাস পরেই আমি তোমার কাছে যাইব।"

আমি বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

"এবার আর খেলা করিব না; যেমন করিয়াই হউক, পাশ করিব। তখন ত পড়িতে কলিকাতায় যাইতে হইবে। দেখি, আমরা দুই ভাই-ই যাইলে বাবা কেমন করিয়া স্থির থাকেন।"

তাহার কথার আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ হইলাম।

আমি বিদায় লইয়া যাইবার সময় সে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে গেল, এবং

আমি যখন নৌকায় উঠিব, তখন আমাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "দাদা, যাহার মা নাই, তাহার দুঃখ অপরিসীম; কিন্তু যে মা থাকিতেও মাকে ভক্তি করিতে পারে না, তাহার দুঃখ আরও অপরিসীম।"

আমি অনাথের মুখে যে বেদনার চিহ্ন দেখিলাম, তাহার সদাপ্রফুল্ল মুখে পূর্ব্বে কখনও সে চিহ্ন দেখি নাই।

৭

কলিকাতায় আসিয়া চাকরীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। চাকরী খালির সংবাদ পাইলেই আবেদন করিতাম। কিন্তু কোনটি আমার বয়স অল্প বলিয়া, কোনটি বা আমি আইন পরীক্ষা দিব, সুতরাং স্থায়ী হইব না বলিয়া, পাইলাম না। প্রথমে চাকরী পাইবার যে প্রবল আশা ছিল, তাহা ক্রমে দুর্ব্বল হইতে লাগিল। দুই মাসের চেষ্টায় একটি চাকরী জুটিল—আমি এক জমীদার-পুত্রের অভিভাবক ও শিক্ষক নিযুক্ত হইলাম। কাজ লঘু—আমার পাঠের কোনরূপ অসুবিধা হইত না।

কিন্তু অধিক দিন এ কাজ করিতে পারিলাম না। অনাথের এবার যে কথা, সেই কাজ। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আসিল, এবং জিদ করিয়া বলিল, সে যে অনেক কষ্ট করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, সে কেবল আমরা দুই ভাই এক সঙ্গে থাকিব বলিয়া; অতএব আমাকে এ চাকরী ছাড়িয়া 'মেসে' ফিরিয়া যাইতেই হইবে। আমার সহিত এই ঘনিষ্ঠতায় বাবা যে তাহার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন, তাহা তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ঘূর্ণবাত্যা যেমন সম্মুখে যাহা পড়ে, প্রবল বলে তাহাই চূর্ণ করিয়া দেয়—সে তেমনই তাহার স্নেহের বলে সব যুক্তি চূর্ণ করিয়া দিল। সে বলিল, "আমার এত কষ্ট করিবার উদ্দেশ্য—মা'কে দেখাইব, ষড়যন্ত্র অপেক্ষা স্নেহ শক্তিশালী।"

আমি চাকরী ছাড়িয়া 'মেসে' আসিয়া আর একটা চাকরী খুঁজিয়া লইলাম। সুখে দুঃখে দুই ভাই এক সঙ্গে দুই বৎসর কাটাইলাম। সুখের প্রধান কারণ, অনাথের অনাবিল অনুরাগ। দুঃখ প্রধানতঃ বাবার জন্য। অনাথ এক একবার বাড়ী যাইত, আর বাবার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে সংবাদ আনিত, তাহাতে আমার হৃদয় বেদনায় ও আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া যাইত। তিনি আমাকে তাড়াইয়া স্নেহের বেদনায় পীড়িত হইতেছিলেন—সে বেদনায় তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার—সহানুভূতি দিবার কেহ ছিল না। বরং বিমাতার কাছে তিনি সে বেদনা গোপন করিবারই প্রয়াস পাইতেন, এবং সেই প্রয়াসে আপনি আরও বেদনা

ভোগ করিতেন। হায়, যদি তাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইয়া ক্ষমা চাহিয়া ক্ষমা-লাভের সুখ পাইতে পারিতাম! কিন্তু তাহা হইবার নহে। তাঁহার প্রকৃতি আমার অপরিচিত ছিল না। আমি ফিরিলেই তিনি আমাকে তাঁহার ব্যথিত বিক্ষত বক্ষে লইতে পারিবেন না। বরং আরও কৃত্রিম কঠোরতার চাপে আপনার স্নেহ নিষ্পিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া আরও বেদনা ভোগ করিবেন। বাবার জন্য আমি বড় উৎকণ্ঠিত হইলাম।

এই সময়ের মধ্যে বিমাতা অনাথের বিবাহ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনাথ ঝাড়া জবাব দিয়াছিল, "যদি কখনও দাদাকে আনাইয়া তাঁহার বিবাহ দিতে পার, তবেই ও কথা মুখে আনিও—নহিলে নহে।" শুনিয়া আমি বলিয়াছিলাম, "তুমি অমন করিলে বাবা রাগ করিবেন।" সে উত্তর দিয়াছিল, "বাবা বুঝিয়াছেন, আমরা তাঁহার ছেলে। ছেলের উপর রাগ করিবার ফল তিনি তোমাকে দিয়া দেখিয়াছেন—আর রাগ করিতে পারিবেন না।"

বাবার অবস্থায় ও অনাথের অবাধ্যতায় বিমাতার শিক্ষা হইতেছিল। এ দিকে অনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল—আমিও আইনের শেষ পরীক্ষা পার হইলাম। পরীক্ষায় আমি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকৃত করিয়াছিলাম। একটি আধ-স্বাধীন রাজ্যে আমার সহকারী দেওয়ানী কাজ জুটিল। সেই সংবাদ পাইয়া অনাথ বলিল, "দাদা, তুমি যাও—আর আমার জন্য পরকাল নষ্ট করিও না।" কিন্তু সে আমার জন্য যাহা করিয়াছে, তাহা মনে করিয়া আমি তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম দেখিয়া সে বলিল, "তুমি কি ভয় করিতেছ, তুমি দূরে থাকিলে আমাদের স্নেহের হ্রাস হইবে? সে ভয় করিও না। তুমি ত কলিকাতায় থাকিতে, আর আমি বাড়ী থাকিতাম। তাহাতে কি স্নেহের হ্রাস হইয়াছিল?"

আমি চাকরী লইলাম। অনাথ আমাকে তাহার ও বাড়ীর সব সংবাদ সর্ব্বদা দিত। বাবার সংবাদে আমার উৎকণ্ঠার অবধি ছিল না।

খ

(অনাথনাথের কথা।)

৮

ষ্টেশনে যাইয়া দাদাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিলাম। আসিতে আর ইচ্ছা হয় না। জীবনে কখন এমন একা—এমন ফাঁকা বোধ করি নাই। যেন আমি জনবহুল নগর হইতে জনশূন্য মরুভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছি। বাসায়

ফিরিয়া ঘরে ঢুকিয়া আমার কান্না পাইতে লাগিল। এ ভাব নির্ব্বিকারচিত্তে সহ্য করিতে পারি, এমন দার্শনিক প্রকৃতি আমার নহে। দাদা যখন নাই, তখন পড়া আর যাহা হইবে তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। সুতরাং কলেজ খুলা থাকিলেও একবার ঘুরিয়া আসিবার জন্য বাড়ী রওনা হইলাম।

বাড়ী আসিয়া দেখিলাম, বাবা বড় অসুস্থ। তাঁহার চিবুকে কয়টি স্থানে স্ফীতি দেখা দিয়াছে। তাহার বেদনায় ও যাতনায় তিনি অস্থির হইয়াছেন। বাবার সহ্যগুণ অসাধারণ। একবার তাঁহাকে কাঁকড়া বিছায় কামড়াইয়াছিল; তখনও তাঁহার মুখে যাতনাব্যঞ্জক কোনও স্বর ফুটে নাই। তবে সে তাঁহার যৌবনে। এখন তিনি অতিক্রান্তযৌবন—বিশেষ দাদার গৃহত্যাগের পর হইতে তাঁহার শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এবার যাতনায় তাঁহাকে অস্থির দেখিলাম। বাড়ীতে যে ডাক্তার কুইনাইন ও ম্যাগনেশিয়া দিয়া অনেক রোগে চিকিৎসা চালাইতেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "গ্ল্যাণ্ড ফুলিয়াছে, পাকিতেও পারে, বসিয়া যাইতেও পারে। পাকিলে কাটিতে হইবে। জ্বর শঙ্কার জ্বর ছাড়া আর কিছুই নহে।" তাঁহার কথার ভাব—ভয়ও নাই, ভরসাও নাই।

আমি বহু কষ্টে—বহুবারের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার কৃতিত্ব আমার নাই। পক্ষিমাতা যেমন আপনি খাইয়া সেই খাবার শাবকের কণ্ঠে ঢালিয়া দেয়, দাদা তেমনই অর্জ্জিত বিদ্যা আমার মস্তিষ্কে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। আমি সে বিদ্যা হজম করিতে পারি নাই—খানিকটা পরীক্ষার সময় উত্তরের খাতায় ছড়াইয়া ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। যাহা হউক, প্রথম পরীক্ষায় অসাফল্যে আমার একটা বড় উপকার হইয়াছিল—আপনার বুদ্ধিতে আমার অতিরিক্ত বিশ্বাস জন্মে নাই। বাবার অবস্থা দেখিয়া আমি সব কথা দাদাকে লিখিলাম। উত্তরে দাদা টেলিগ্রাফ করিলেন, "যেমন করিয়া পার, বাবাকে কলিকাতায় লইয়া যাইয়া চিকিৎসা করাও—বিলম্ব করিও না।"

দাদার উপদেশানুসারে আমি বাবাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য জিদ করিতে লাগিলাম। মাও আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। বাবা সম্মত হইলেন।

কলিকাতায় আসিয়া মফস্বলে শ্রুতকীর্ত্তি কয় জন বড় ডাক্তারকে ডাকা হইল। কলিকাতায় যে সাধারণ চিকিৎসকে ও অস্ত্র-চিকিৎসকে প্রভেদ হইয়াছে, তাহা আমরা জানিতাম না—ডাক্তার সরকার তাহা জানাইয়া দিলেন। "ইহা অস্ত্র-

চিকিৎসার ব্যাপার” বলিয়া তিনি ভিজিট লইয়া মোটরে উঠিলেন। তখন আবার অস্ত্র-চিকিৎসক ডাকা হইল। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী দেখিয়া বলিলেন, “গ্ল্যাণ্ড কয়টা কাটিয়া ফেলিয়া দিলেই সব সারিয়া যাইবে।” শীর্ণকায় সর্ব্বাধিকারী তখন হাঁসপাতাল-তরী সাজাইয়া জার্ম্মাণ-যুদ্ধের জন্য বাঙ্গালীর ছেলেদের মেসোপোটেমিয়ায় পাঠাইতে ব্যস্ত। গ্ল্যাণ্ড কাটিয়া ফেলা হইবে—এটা যেন সাব্যস্ত হইল, এই ভাবে তিনি কেবল ছেলে পাঠানর গল্প করিয়া তথায় বাঙ্গালীর ছেলে মরিলে ভারতের ভবিষ্যৎ কিরূপ উজ্জ্বল হইবে বলিয়া, সেদিনের মত বিদায় লইলেন। কিন্তু অস্ত্রোপচারে বাবার বিশেষ আপত্তি ছিল। তাই আমরা আর এক জন ডাক্তার ডাকাইলাম। যতীন্দ্রবাবু “ইন্‌জেক্‌সনে” বিশেষজ্ঞ —ফাঁড়েন না, ফুঁড়িয়া ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করেন। কিন্তু তাহাতেও বাবার আপত্তি থাকায় তিনি বলিয়া গেলেন, সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল হইলে হয় ত গ্ল্যাণ্ড বসিয়া যাইবে। তিনি পশ্চিমে স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে বলিলেন—বাঙ্গালার বাহিরে না যাইলে স্বাস্থ্যকর স্থান মিলে না, আর মফস্বলবাসী বাঙ্গালী যতই ভাল থাকুক না কেন, সে ম্যালেরিয়া-পীড়িত—এই দুইটি বিশ্বাস লইয়াই আজ কাল বাঙ্গালী ডাক্তাররা চিকিৎসা করেন—এই দুই বিশ্বাসের বীজাণু তাঁহাদিগের মস্তিষ্ক দখল করিয়াই থাকে। এক জন হোমিওপ্যাথ য়ুরোপীয় ডাক্তারও ডাকা হইল। কিন্তু তাঁহার উপদেশ “চুনাম্‌ মৎ খাও” শুনিয়া বাবা এমন চটিয়া গেলেন যে, তাঁহার ঔষধ আর আনান হইল না।

বাবা ক্রমে বিরক্ত হইতেছেন বুঝিয়া আমি আর ডাক্তার না ডাকাইয়া পশ্চিম-যাত্রার আয়োজন করিলাম। একটা বাড়ী স্থির করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম।

আমি দাদাকে প্রতিদিন বাবার সংবাদ দিতাম। তিনি আবশ্যক উপদেশ দিতেন।

৯

বিদেশে আসিবার দশ দিন পরে এক দিন সকালে বাবার একটা গ্ল্যাণ্ডে অসহনীয় যন্ত্রণা হইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন তাঁহার শ্বাসরোধ হইতেছে। আমি ছুটিয়া ডাক্তার ডাকিতে গেলাম। স্বাস্থ্যকর স্থানে ডাক্তারের ডাক বড় হয় না—তাই সে সব স্থানে ভাল ডাক্তার পাওয়া দুর্ঘট। স্থানীয় ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, আধ ঘণ্টার মধ্যে অস্ত্রোপচার না হইলে বিপদ অনিবার্য্য। কিন্তু অস্ত্রোপচার করিতে তাঁহার ভরসা হয় না। তাঁহার ভরসা হইলেও আমার হইত না। আমি চারি দিক অন্ধকার দেখিলাম

—ডাক্তারের জন্য কলিকাতায় টেলিগ্রাফ করিতে পারি, কিন্তু টেলিগ্রামে ত ডাক্তার আসে না!

আমি বসিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় আমাদের প্রতিবেশী বেণীবাবু ছত্র ও যষ্টি লইয়া প্রভাতী চক্কর সারিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন; বাবার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেদার বাবু কেমন আছেন?"

বেণীবাবু দীর্ঘকাল সরকারী ডাক্তারী করিয়া পেন্সন লইয়াছেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা অবশ্যই প্রচুর ছিল। কিন্তু এখন তিনি আর ডাক্তারী ব্যবসায় করিতেন না, অর্থাৎ টাকা লইয়া চিকিৎসা করিতেন না। কিন্তু কেহ ডাকিলেই বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিতেন—খুব যত্ন করিয়াই রোগী দেখিতেন। লোকটি অসাধারণ 'গল্পে'। একবার "আরে মশাই"—বলিয়া গল্প আরম্ভ করিলে অনেক সময়ের জন্য নিশ্চিন্ত। রামনগরের বেগুন ও ফয়জাবাদের কফী হইতে অযোধ্যার গোহত্যার দাঙ্গা ও পঞ্জাবের সেচের খাল পর্য্যন্ত এত খবরও তিনি রাখিতেন; আর এমন গুছাইয়া গল্প করিতে পারিতেন যে, শুনিতে কেবলই আগ্রহ হইত। তিনি প্রতিদিন প্রাতে আসিয়া বাবার সঙ্গে গল্প করিতেন। লোকটির সংসারে থাকিবার মধ্যে এক মেয়ে। মেয়েটির প্রতি অতিরিক্ত স্নেহহেতু তিনি অঙ্গে, বঙ্গে, কলিঙ্গে, এমন কি, সৌরাষ্ট্রে ও মগধেও তাহার উপযুক্ত বরের সন্ধান পাইতেছেন না। রূপ যদি কুমারীর গুণের মধ্যে হয়, তবে তাঁহার কন্যার সে গুণের অভাব নাই। মা ত সেদিন তাহাকে দেখিয়া বিধবা ঠাহরাইয়া অত্যন্ত দুঃখপ্রকাশের উদ্যোগ করিতেছিলেন; ভাগ্যক্রমে আমি ইঙ্গিত করায় দুঃখের ফোয়ারার চাবী খুলেন নাই! তাঁহাকে লইয়া সময় সময় এমন বিভ্রাটও ঘটে!

আমার কাছে সব কথা শুনিয়া বেণীবাবু আমার সঙ্গে বাবাকে দেখিতে গেলেন, এবং দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, এখনই অস্ত্র করা ছাড়া উপায় নাই। তিনি অস্ত্র করিতে পারেন; আমরা ভরসা করিতে পারিলেই হয়। ভরসা না করিয়া কি করি?

কিন্তু একটা কথা—আমি রক্ত দেখিতে পারি না, ফুটবল খেলিয়া ডানপিটে হইলে কি হয়, ও দৌর্ব্বল্যটুকু জয় করিতে পারি নাই। আর অস্ত্র করা হইবে শুনিয়া মা ও আমার ছোট ভগিনী এমন হৈ চৈ আরম্ভ করিলেন যে, কাছে বাড়ী থাকিলে লোক ছুটিয়া আসিত—ভাবিত, যে দুর্ঘটনাটা ঘটিতেও পারিত, তাহা ঘটিয়া গিয়াছে।

ব্যাপার বুঝিয়া বেণীবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, আমি আমার মেয়েকে আনিতেছি। সে শুশ্রূষাকাজে খুব পটু।"

তিনি জল গরম করিতে বলিয়া বাড়ী গেলেন, এবং অস্ত্রের ব্যাগ, আবশ্যক পাত্রাদি ও ঔষধ, ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি এবং কন্যাকে লইয়া আসিলেন।

তিনি আমাকে, মাকে ও আমার ভগিনীকে রোগীর ঘর হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন। মার গোলমাল করিতে যেমন উৎসাহ ছিল, ঘর হইতে যাইতে তেমনই আপত্তি ছিল। আমি একরূপ জোর করিয়া তাঁহাকে পার্শ্বের ঘরে লইয়া গেলাম। সে ঘরেও তাঁহার "ওগো! তাই ত গো! কি হ'বে গো?"—নিবৃত্ত হইল না।

এ দিকে বেণীবাবু কন্যার সাহায্যে সুব আয়োজন করিয়া লইয়া ছুরীখানি হাতে করিয়া বাবার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে এমন নিপুণভাবে অস্ত্রোপচার শেষ করিলেন যে, বাবা প্রথমে টেরও পাইলেন না। তিনি ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া আমাদিগকে ডাকিলেন। রক্ত দেখিয়া মা আবার একবার হৈ চৈ করিলেন। বেণীবাবু ও তাঁহার কন্যা বাবার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক, বেণী বাবুর চিকিৎসা ও তাঁহার কন্যার শুশ্রূষার সাহায্য না পাইলে বাবার প্রাণরক্ষা হইত বলিয়া বোধ হয় না।

১০

পর দিন বেণীবাবু বাবার অস্ত্রক্ষত খুলিয়া আবার ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। বাবা তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার ঋণ আমি কখনও শোধ করিতে পারিব না।" বেণীবাবু বলিলেন, "সে কি, মহাশয়! এ ত আমাদের কাজ—ইহা করিলে আমাদের গৌরব নাই, না করিলে পাপ আছে। কর্ত্তব্যবুদ্ধিহীন চিকিৎসক ত চণ্ডাল।" মা বেণীবাবুর কন্যাকে বলিলেন, "মা, তোমরা না থাকিলে এ যাত্রায় কর্ত্তাকে কি আর বাঁচাইতে পারিতাম?"

সেই দিন মধ্যাহ্নে বাবার কাছে বসিয়া আমি বাবাকে বলিলাম, "বাবা, এখনও একটা গ্ল্যাণ্ড ফুলিয়া আছে, হয় ত কাটিতে হইবে। আমার অপদার্থতা ত দেখিলেন। ভাগ্যক্রমে বেণীবাবু ছিলেন—তাই রক্ষা। আমি বলি, দাদাকে আসিতে টেলিগ্রাফ করি। এমন সময়ে তাঁহার মত বুদ্ধিমান লোকই দরকার।

বাবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

মা বলিলেন, "সে কি আসিবে?"

আমি একটু উত্তেজিতস্বরে বলিলাম, "কোনও দিন কি আসিতে বলিয়াছ যে, আজ সন্দেহ করিতেছ, দাদা বাবার অসুখের কথা শুনিলেও আসিবেন না?"

কিন্তু মার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, মার চক্ষু ছল ছল করিতেছে। বুঝিলাম, এ কথা দাদার নিন্দাব্যঞ্জক নহে—অনুতাপোচিত। মা ঠেকিয়া দাদার অভাব অনুভব করিতেছিলেন।

বাবা বলিলেন, "তাহার ঠিকানা?"

আমি বলিলাম, "আমি জানি।"

বাবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "তুই জানিস, কিন্তু আমি তাহার পিতা—আমি জানি না।" তাঁহার নয়নের কোণে অশ্রু দেখা দিল।

আমি টেলিগ্রাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়া বাবার কাছে আসিয়া বসিলাম—সব কথা বাবাকে বলিলাম। দুই বৎসর আমাদের দুই ভ্রাতার কলিকাতায় এক সঙ্গে স্থিতি, দাদার চাকরী-প্রাপ্তি, দাদার সর্ব্বদা আমাদের সংবাদ লওয়া—সব কথা আমি বাবাকে বলিলাম। বাবা কোনও কথা বলিলেন না, আমার করতল আপনার উভয় করতলমধ্যে ধরিয়া বক্ষে স্থাপিত করিলেন। তাঁহার চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

বারান্দায় পরিচিত পদশব্দ শুনিয়া বাবা চক্ষু মুছিলেন। বেণী বাবু ও তাঁহার কন্যা কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বাড়ী গিয়াছিলেন, আবার আসিলেন। মা মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন।

বেণী বাবু থারমমিটারে বাবার দেহের তাপ পরীক্ষা করিয়া হাসিমুখে বাবাকে বলিলেন, "আজ জ্বর হয় নাই। পুঁযটা বাহির হইয়া গিয়াছে কি না? বোধ হয় দ্বিতীয় গ্ল্যাণ্ডটা বসিয়া যাইবে।"

বাবা হাসিয়া বলিলেন, "না বসিলেও আর ভয় নাই। আপনার গুণে আমার আজন্ম-সঞ্চিত ভয় কাটিয়া গিয়াছে—অস্ত্রোপচারে আর আমার ভয় নাই।"

তাহার পর বেণী বাবু নানা গল্প করিতে লাগিলেন। অধিক জিনিস লইয়া ট্রেণে যাতায়াতে সময় সময় কিরূপ বিপদ ঘটে—বুঝাইবার জন্য তিনি বলিলেন, একবার—সে আজ প্রায় তিন বৎসরের কথা—তিনি বাড়ী আসিতে আপনি নামিয়া মেয়েটিকে না নামাইতেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাহার পর তিনি 'বোকা বনিয়া' কিরূপ টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই গাড়ীর এক জন যাত্রী যুবক তাঁহার উপদেশ না মানিয়া—ষ্টেশন-মাষ্টারের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া কেমন করিয়া তাঁহার মেয়েকে ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছিল—সে নিজের অসুবিধা গ্রাহ্যই করে নাই—সব কথা তিনি বিবৃত করিলেন।

আমি বলিয়া উঠিলাম, "সে যে আমার দাদা।"

বেণী বাবু যেন চমকিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ—তোমার দাদা!"

আমি বলিলাম, "হাঁ।"

ঠুক্ করিয়া একটু শব্দ হইল। আমি চাহিয়া দেখিলাম, বেণী বাবুর কন্যা বাবার জন্য গ্লাসে ঔষধ ঢালিতেছিলেন—শিশি গ্লাসে ঠেকিয়াছিল। বোধ হইল, তাঁহার হাত একটু কাঁপিতেছিল।

বেণী বাবু তখন বাবাকে বলিলেন, "আরে, মশায়—সে আপনার ছেলে! কি সর্ব্বনাশ! তাহার সে উপকার আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। চমৎকার ছেলে। আপনি বড় ভাগ্যবান পুরুষ—বড় ভাগ্য নহিলে অমন ছেলে পাওয়া যায় না।"

বেণী বাবুর মুখে দাদার প্রশংসা আর ধরে না। দাদা এখন কোথায়, কি করেন, বিবাহিত কি না—বেণী বাবু নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। বেণী বাবুর প্রশ্নে বাবা কিছু বিব্রত হইতে লাগিলেন।

এই সময় বাবাকে ঔষধ খাওয়াইয়া বেণী বাবুর কন্যা গ্লাসটি পার্শ্বস্থ টেবলে রাখিলেন। রাখিতে শব্দ হইল। এ পর্য্যন্ত তিনি জিনিস লইবার বা রাখিবার কার্য্য এমন নিঃশব্দে সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন যে, এ শব্দে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল।

১১

আমার টেলিগ্রাম পাইয়াই দাদা রওনা হইয়াছিলেন। তিনি যে ট্রেণে আসিবেন, টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন, আমি সেই ট্রেণের জন্য ষ্টেশনে গিয়াছিলাম। গাড়ী হইতে নামিয়াই দাদা বাবার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "বাবা অনেকটা ভাল—আর ভয় নাই।" তাহার পর একটা কুলী ডাকিয়া তাহাকে দাদার 'সুট-কেস'টা দিয়া আমি তাঁহাকে বাড়ী লইয়া চলিলাম। পথে দাদা বাবার অসুখের সব সংবাদ লইতে লাগিলেন। আমি সব কথা বলিলাম—সহসা বেদনা-বৃদ্ধির কথা বলিয়া আমি বেণী বাবুর দ্বারা অস্ত্রোপচারের কথা বলিয়া বলিলাম, "বেণী বাবুকে জান, দাদা? সেই যাঁহার মেয়েকে তুমি ট্রেণে লইয়া গিয়া বাপের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছিলে।"

দাদা যেন চমকিয়া উঠিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কেমন করিয়া জানিলি?"

"তিনি সে দিন সেই গল্প করিতেছিলেন। আমি শুনিয়া বলিলাম, সে

আমার দাদার কীর্ত্তি। মেয়েটিও চমৎকার ; জান, দাদা—সে যে বিভ্রাট ! আমি রক্ত দেখিতে পারি না। আর অস্ত্র করা হইবে শুনিয়া মা ত মড়াকান্না জুড়িয়া দিলেন। তখন বেণী বাবু তাঁহার সেই মেয়েটিকে লইয়া আসিলেন। তিনিই ত বাবার শুশ্রূষা করিতেছেন। বেণী বাবুর চিকিৎসা আর তাঁহার মেয়ের শুশ্রূষা নহিলে বাবাকে বাঁচাইতে পারিতাম না।"

দাদা কেমন অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটি বেণী বাবুর সঙ্গেই ছিল ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ। তাহার ত আজও বিবাহ হয় নাই। বেণী বাবু তাহার উপযুক্ত পাত্রই পাইতেছেন না।"

দাদার চক্ষু উজ্জ্বল এবং মুখ বিবর্ণ হইল। আমি পাঁচ শত গণ্ডা ইংরাজী উপন্যাস পড়িয়া—'রোমান্সে'র পোকায় মাথাটি পূর্ণ করিয়াছিলাম, আমার কাছে এ লক্ষণ ভাল বোধ হইল না। তবে কি দার্শনিক দাদাও 'রোমান্সে'র আক্রমণ হইতে মুক্তি পান নাই ? স্থির করিলাম, দাদাকে লক্ষ্য করিতে হইবে।

দাদা অন্য কথা পাড়িয়া সে কথা চাপা দিলেন। তখন আমি সংসারের সব কথা বলিতে লাগিলাম। তাঁহাকে আসিবার জন্য সংবাদ দিবার প্রস্তাবে বাবার ব্যবহারের কথায় দাদা অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। দাদা বাবাকে কত ভালবাসিতেন, তাহা আমার অজ্ঞাত ছিল না। মা বিপদে পড়িয়া তাঁহার অভাব বুঝিয়াছেন শুনিয়া দাদা যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন—ভাবিলেন, এবার আর উভয়ের মধ্যে কোনরূপ অসদ্ভাববিকাশের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দাদা তখনও মার অনুতাপসঞ্জাত ভাবান্তরের স্বরূপ বুঝিতে পারেন নাই।

আমি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম, দাদার অন্যমনস্ক ভাব কিছুতেই দূর হইতেছিল না।

১২

কথা কহিতে কহিতে আমরা দুই ভাই বাঙ্গলোয় পঁহুছিলাম। বেণী বাবু তখন বাবার ব্যাণ্ডেজ বদলাইয়া বারান্দায় আসিয়া হাত ধুইতেছিলেন, দাদাকে দেখিয়া বলিলেন, "আরে—তুমি ! দেখ, ভগবানের খেলা ! কত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা !"

দাদা বাবার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন, বাবার অসুখ সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা কোন্ ঘরে, অনাথ ?"

আমি অঙ্গুলিনির্দ্দেশে পথ দেখাইয়া দিলাম। দাদা অগ্রসর হইলেন। আমি তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম—বোধ হয় হনুমানও তেমন ভাবে রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে পারে নাই।

দাদা বাবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। বেণী বাবুর কন্যা তখন ব্যাণ্ডেজ বদলানর পর জিনিসগুলা টেবলে সাজাইয়া রাখিতেছিলেন, পদশব্দে ফিরিয়া চাহিলেন; দেখিলেন—দ্বারে দাদা। তাঁহার মুখ লজ্জায় রক্তাভা ধারণ করিল; তাঁহার চক্ষুতে হর্ষোজ্জ্বল দৃষ্টি বিকশিত হইল। তাহার পরই তিনি দৃষ্টি নত করিলেন; ফিরিয়া জিনিসগুলি সাজাইতে মন দিলেন। দাদা যেন মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তরপুত্তলের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন—একদৃষ্টে আশার দিকে চাহিয়া রহিলেন। উভয়েরই এই ভাবান্তর মুহূর্ত্তের জন্য—কিন্তু সেই শুভ মুহূর্ত্তের ভাবান্তর দেখিয়া লক্ষণ সম্বন্ধে আমার আর সন্দেহ রহিল না।

দাদা বাবাকে প্রণাম করিলেন। বাবা কোনও কথা বলিলেন না, সস্নেহে তাঁহার মস্তকে করতল সংস্থাপিত করিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মা দাদার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার পর বলিলেন, "দুই দিনের পথ-কষ্ট। যাও, হাতে মুখে জল দিয়া আইস। কর্ত্তাকে যে এমন দেখিবে, সে ভরসা আর ছিল না। আর কি বলিব, বেণী বাবুর আর ঐ মেয়ের গুণের কথা! সে সব শুনিও, এখন একটু সুস্থ হও। তুমি আসিলে, আমাদের কত ভরসা; জানই ত অনাথের স্বভাব; আর আমি—আমাতে কি আর আমি ছিলাম? যা, অনাথ, অমরকে চা করিয়া দিগে যা।"

চা পান করিতে করিতে আমি দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দাদা, বেণী বাবুর মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কি তোমার বিবাহে বিলম্বের একটা কারণ?"

আমি জানিতাম, দাদা মিথ্যা কথা বলিবার লোক নহেন—রাজ্যের জন্যও নহে। দাদাও এ বিষয়ে কোনও সরল উত্তর না দিয়া আমাকে বলিলেন, "চুপ কর। তোর কি কখনও বুদ্ধি হইবে না?"

আমি বলিলাম, "এ কয় দিনে আশার গুণের যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, তাঁহার জন্য তিন বৎসর কেন, মানুষ তিন যুগ অপেক্ষা করিতে পারে।"

দাদা চা-পানে মন দিলেন।

আমি ভাবিলাম, কখনও দাদার কোনও কাজে লাগি নাই—এবার যেমন করিয়াই হউক, লাগিব।

গ

(বেণী বাবুর কথা ।)

১০

তাই ত—কি করি ? আশার বিবাহ না দিলে ত আর স্থির হইতে পারিতেছি না। লোকনিন্দা নহে—সে জন্য আমার বড় চিন্তা নাই ; কারণ, আমার সমাজ সংসার সবই আশাকে লইয়া। কিন্তু তাহাকে সুপাত্রে বিবাহিত করিবার পূর্ব্বে যদি আমার ডাক পড়ে, তবে সে দাঁড়াইবে কোথায় ? সেই জন্যই আমি চিন্তিত। লোকে হয় ত মনে করে, আমি স্নেহের স্বার্থপরতার জন্যই তাহার বিবাহ দিয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইতে বিলম্ব করিতেছি ; যে কয় দিন পারি, তাহাকে কাছে রাখিয়া শূন্য জীবন পূর্ণ রাখিতেছি। কিন্তু সে ত আসল কথা নহে। একা থাকাই যাহার নিয়তি, সে কি অদৃষ্টের সঙ্গে কলহ করিয়া জয়ী হইবার চেষ্টা করে ? তাহাই যদি আমার নিয়তি না হইবে, তবে গৃহিণীর অল্প বয়সেই মৃত্যু হইবে কেন ? তিনি গিয়াছেন, ভালই গিয়াছেন। আমাকে ও আশাকে রাখিয়া—দীর্ঘকাল রোগ ভোগ না করিয়া, যে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা তিনি সর্ব্বদাই করিতেন, তিনি সেই মৃত্যুই লাভ করিয়াছেন। কিন্তু দশ বৎসর পরেও ত তিনি সেই মৃত্যুই লাভ করিতে পারিতেন ! তাই ত বলিতেছি, ইহাই আমার নিয়তি। আর তাহা না হইলে আশা আমার মেয়েই বা হইবে কেন ? যাহাদের ছেলে হয়, তাহাদের সংসার লতার মত ক্রমে বাড়িয়া ফলে ফুলে পূর্ণ ও সুন্দর হয় ; আর যাহাদের মেয়ে হয়, তাহাদের সংসার ত ওষধির মত অত্যল্পকালমধ্যেই শেষ হইবে। সে জন্য আমি নিয়তির সঙ্গে ঝগড়া করিয়া কি করিব ?

আমি বরাবরই একটু অধিক বয়সে ছেলে মেয়ের বিবাহের পক্ষপাতী। সেই জন্যই মাতৃহীনা কন্যাকে খেলাঘর হইতেই শ্বশুরের ঘরে পাঠাই নাই। তবে তাহার পর হইতে সুপাত্রের সন্ধানেও ত বিরত থাকি নাই। সত্য বটে, প্রথমে কতকগুলা মতানুসারে কাজ করিতে চেষ্টা করিতাম—যাহারা ফর্দ্দ দিয়া টাকা লয়, তাহাদের ঘরে মেয়ে দিব না ; যাহারা বিবাহের পর বধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে চাহে না, তাহাদের ঘরে মেয়ের বিবাহ দিব না —ইত্যাদি। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে মেয়ের বাপের কোনরূপ 'কোট করা' সাজে না বুঝিয়াই সে সব মত সংহত বা সংযত করিয়াছি।

সুপাত্রের সন্ধানও যে একেবারে পাই নাই, এমন নহে। তবে যে কেন

আজও আশার বিবাহ হয় নাই, তাহা আমি ছাড়া আর কেহ জানে না। মাস ছয় পূর্ব্বে আমি একটি সুপাত্রের সন্ধান পাইয়াছিলাম। কথা কতকটা অগ্রসর হইয়াছিল। অবশ্য, আশা সব কথাই শুনিয়াছিল। যে দিন তাহারা মেয়ে দেখিতে আসিবে, সে দিন কি একটা কাজে আশাকে ডাকিতে যাইয়া দেখিলাম, তাহার ঘরে সে নাই—টেবলের উপর তাহার একখানা খাতা খোলা রহিয়াছে। একটা অসাধারণ কৌতূহল আমাকে সেই লেখার দিকে আকৃষ্ট করিল। আমি পড়িলাম—

"বাবা আমার বিবাহের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন। সামাজিক হিসাবে, হইবারই কথা। কিন্তু—কিন্তু যে অনুভূতি পরকে আপনার করাইয়া সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, জীবনে মরণে নারীকে পরের আপনার করে, সে অনুভূতি জীবনে একবারই অনুভব করা যায়। তাহারই উপর ত সংসারের প্রতিষ্ঠা। তাহাতেই ত জীবনের সার্থকতা। সে অনুভূতি লাভ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে কার্য্য করা প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—তাহাই অধর্ম্ম। জীবনে সে অনুভূতি অনুভব করিয়াছিলাম, যে দিন ট্রেণে বিপন্ন অবস্থায় বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছিলাম; যে দিন সেই স্থির—ধীর—বিনয়ী—দৃঢ়—যুবক বিপন্নাকে বিপন্মুক্ত করিবার জন্য অসুবিধা তুচ্ছ জ্ঞান করিতে—আপনি বিপন্ন হইতেও ভয় করেন নাই। তাহার পর সে দিন যে অনুভূতি অতর্কিত ঘটনার সংঘটনে অকস্মাৎ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা দিনে দিনে বিলীন না হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমার বিশ্বাস—আমার আশা ব্যর্থ হইবার নহে। আর যদি তাহা ব্যর্থ হইবারই হয়—তবে যেন পিতার ইচ্ছার প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার হৃদয়ক্ষতে ক্ষার-প্রক্ষেপের পূর্ব্বে তাঁহার জন্মদুঃখিনী দুহিতার মৃত্যু হয়।"

পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইলাম। বিশ্বাসের দৃঢ়তায় বিস্মিত হইলাম। কেন যে বিবাহের প্রস্তাবে আশাকে বিমর্ষ দেখায়, তাহার কারণ আমার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে আমার সর্ব্বস্ব। গৃহিণী তাহাকে শিশু অবস্থায় আমাকে দিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। সে তাঁহার দান—আমার জীবনের সুখের স্মৃতি—আমাদের উভয়ের সর্ব্বস্ব। সে আমার শোকে সান্ত্বনা—দুঃখে সুখ। সে আমারই বক্ষে পালিত। সে আমার ব্যথিত হৃদয়ে সুখের প্রলেপ। কিসের জন্য আমি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার বিবাহ দিয়া তাহার জীবন দুঃখময় করিব? আমি তাহা পারিব না। সমাজ—সংসার—তাহার সুখের তুলনায় আমার কাছে সবই তুচ্ছ।

অমরনাথকে আমি ভাল করিয়া জানিবার অবসর পাই নাই। কিন্তু যেটুকু জানিয়াছি, তাহাতেই বুঝিয়াছি, তাহার মত সুপাত্র দুর্লভ। সে স্বজাতীয়ও বটে। কিন্তু তাহার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। আমি নোটবহিতে তাহার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইয়াছিলাম। লক্ষ্মীছাড়ার সব কাজে যেমন হয়, আমারও তেমনই হইয়াছিল—বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় সেই বহিখানাই হারাইয়া আসিয়াছিলাম। অমরনাথ বলিয়া তাহার সন্ধান করিব কিরূপে?

আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। এমন সময়—দেখ ভগবানের খেলা—কথায় কথায় জানিতে পারিয়াছি, সে অমরনাথ আমার প্রতিবেশী কেদার বাবুর পুত্র! সে এখন বড় চাকরী করিতেছে—অকৃতদারও বটে। ঘটনা দেখিয়া আমারও বিশ্বাস জন্মিতেছে—আমার আশার আশা পূর্ণ হইবে। ভগবান কি তাহার অদৃষ্টে কষ্ট লিখিতে পারেন?

কিন্তু আশার সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কাও যে নাই, এমন নহে। কেদার বাবু এখানে আসিয়া বড় পীড়িত হইয়াছিলেন। সহসা অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হইয়াছিল। আমি তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছি—এখনও করিতেছি। আর তাঁহার পত্নী পুত্র কন্যা শুশ্রূষা-কার্য্যে একেবারে অপটু বলিয়া আশাই তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছে। কেদার বাবু ও তাঁহার পত্নী—বিশেষ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটি সে জন্য আমাদের কাছে এত অনাবশ্যক কৃতজ্ঞ বোধ করিতেছেন যে, আমার আশঙ্কা হইতেছে—আমি এ বিবাহের প্রস্তাব করিলে তাঁহারা অনিচ্ছা থাকিলেও চক্ষু-লজ্জায় প্রস্তাবে সম্মতি দিবেন। সে বড় অন্যায় হইবে। তাঁহারা হয় ত মনে করিবেন, আমি কোনও না কোনও কারণে কন্যার বিবাহ দিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না, এখন এই সুযোগে তাহার বিবাহ দিব। তেমন হইলে ত আমি আশার বিবাহ দিতে পারিব না।

কিন্তু আশার মনের ভাব ত আমার অগোচর নাই। এই বিবাহই যখন তাহার অভিপ্রেত, তখন আমাকে এ চেষ্টা করিতেই হইবে। সুতরাং কেদার বাবু একটু সুস্থ হইলেই—কল্য বা পরশ্ব—আমি তাঁহার কাছে প্রস্তাব করিব। আর সংবাদ পাইয়াছি, অমরনাথও পিতাকে দেখিবার জন্য আসিতেছে। এখন আশার কপাল—আর ভগবানের ইচ্ছা।

ঘ

(অমরনাথের কথা।)

১৪

কত দিন পরে বাবাকে দেখিলাম! যিনি অভিমানে আমাকে বক্ষঃচ্যুত

করিয়া বক্ষে কেবল বেদনার ভার বহিয়াছেন—স্বাস্থ্য, সুখ, শান্তি সব জলাঞ্জলি দিয়াছেন, সেই পিতার বক্ষে আবার আমার স্থান আমি পাইলাম। আজ আমার কত আনন্দ!

কিন্তু আনন্দের মধ্যে বিষাদে আমার হৃদয় পূর্ণ হইতেছে। সে জন্মদুঃখী—শৈশবে মাতৃহীন, তাহার অদৃষ্টে সুখ কোথায়? ঘটনার স্রোত যে মিলনক্ষেত্রে পিতাপুত্রে মিলন ঘটাইল, তথায় ত কেবল তাহারা দুই জনই নাই! কয় বৎসর পূর্ব্বে মেঘান্ধকারে দামিনী দীপ্তির মত যাহাকে দেখিয়াছিলাম—দেখিয়া যাহাকে আর ভুলিতে পারি নাই, সেও যে সেই মিলনক্ষেত্রে! যাহা ঈপ্সিত, তাহা পাইবার নহে বুঝিলে নিরাশার সান্ত্বনায় হতাশার বেদনা সহনীয় হয়; আর কামনার বস্তু লভ্য ও সম্মুখে থাকিতেও যে হতাশার বেদনা সহ্য করে, সে ত স্নিগ্ধ সলিলপাত্র বহন করিয়া অথচ সে সলিল পান করিতে না পারিয়া মরু-ভূমিতে মৃত্যু-তৃষ্ণায় পীড়িত হয়। আমার সেই অবস্থা।

এখন আমি স্বাধীন; বেণী বাবুর কাছে তাঁহার কন্যার প্রার্থনা করিতে পারি। কিন্তু বাবার শরীরের যে অবস্থা, তাহাতে আর তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কাজ করিয়া তাঁহাকে বেদনা দিতে সাহস হয় না। আর আমি—আমিই বা কোন্ অধিকারে আর এক জনকে আমার ব্যর্থ জীবনের সঙ্গী করিয়া কেবল দুঃখ ভোগ করাইব? আমার অদৃষ্টে সুখ নাই—আমি কেন অপরকে দুঃখ দিব?

কিন্তু যে কথা এত দিন গোপনে হৃদয়ে রাখিয়াছি, জানি না কেমন করিয়া—আমার কোন্ ব্যবহারে তাহা অনাথের কাছে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সে যেরূপ সরল প্রকৃতির লোক, তাহাতে কি জানি যদি সে সেই কথার আলোচনা করিয়া পারিবারিক অশান্তির নির্ব্বাণোন্মুখ বহ্নি পুনর্দীপ্ত করে! সংসারে সব কথা যে বলা সঙ্গত নহে, সব কাজ যে ইচ্ছামত করা যায় না, তাহা সে স্বীকার করিতেই চাহে না। এ অবস্থায় আকাঙ্ক্ষার ও আশঙ্কার কারণ হইতে দূরে যাওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু এতদিন পরে বাবার অসুখের জন্য তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছি—আসিতে না আসিতেই যাইব কেমন করিয়া। তাঁহাকে একটু সুস্থ না দেখিয়া ত যাইতে পারি না! আমার কর্ত্তব্য কি? এ অবস্থায় আমি কি করিব?

১৫

মধ্যাহ্নে বারান্দায় বসিয়া ভাবিতেছিলাম। সম্মুখে কঙ্কর-কণ্টকিত প্রান্তর —

আমার জীবনের মত শুষ্ক—শূন্য; তাহার পর পার্ব্বত্য নদীর ক্ষীণ প্রবাহ ও প্রবাহ-কূলে শ্যাম শোভা। অনাথ আসিয়া সংবাদ দিল, 'বাবা, ডাকিতেছেন।' তাহার মুখে ও চক্ষুতে হাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল।

বাবা আমাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি বসিলাম।

বাবা বলিলেন, "অমরনাথ, তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।"

বাবার কথা শুনিয়া বড় কষ্ট হইল। আমি কি তাঁহার এতই পর হইয়াছি? আমার কান্না আসিতে লাগিল; বলিলাম, "আমাকে অনুরোধ কি, বাবা? কি আদেশ বলুন।"

বাবার মুখ ঈষদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি সস্নেহে আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "হাঁ, আদেশ। হয় ত শেষ আদেশ। এ আদেশ তোমাকে পালন করিতেই হইবে।" তাহার পর তিনি বলিলেন, "তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।"

আমি শঙ্কিত হইলাম।

বাবা বলিলেন, "বেণী বাবুর চিকিৎসায় আর তাঁহার কন্যার শুশ্রূষায় আমি আবার তোমাকে দেখিতে পাইলাম। বেণী বাবুর মেয়ের সঙ্গে আমি তোমার বিবাহ দিব। অমন গুণবতী পুত্রবধূ আমি আর পাইব না। অনাথ আমার কাছে এ প্রস্তাব করিয়াছিল। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া বেণী বাবুর কাছে প্রস্তাব করিতে সাহস—ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, এমন সময় বেণী বাবুও এই প্রস্তাব করিয়াছেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই একরূপ সম্মতি দিয়াছি।"

বিমাতা বলিলেন, "বাবা, এ কথা তোমায় রাখিতেই হইবে।"

আমি আর কি উত্তর দিব?

অনাথ বাবার শিয়রে দাঁড়াইয়া এমন দুষ্টহাসি হাসিতেছিল যে, এ ব্যাপারের কর্ত্তা কে, বুঝিতে আমার আর বিলম্ব হইল না।

বাবা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "অনাথ, যা, বেণী বাবুকে—বেহাইকে—বলিয়া আয়, আমার কথা পাকা।"

অনাথ ফিরিয়া আসিলে বাবা তাঁহার হাতবাক্স আনাইয়া একখানা দলীল ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। অনাথ বলিল, "বাবা, আপনি আপনার উইল ছিঁড়িলেন, ভালই হইল। নহিলে আমি ছিঁড়িয়া ফেলিতাম। কেন না, নিরপরাধ পুত্রকে স্নেহ ও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার অধিকার পিতার নাই।"

বাবা বলিলেন, "তুই ঠিক কথা বলিয়াছিস।"

১৬

আশাকে বিবাহ করিয়া বাবার ও বেণীবাবুর অভিপ্রায় অনুসারে আমি চাকরীতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় আসিয়া ওকালতী আরম্ভ করিয়াছি।

এখন বাবা ও বেণীবাবু উভয়েই নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম-সুখ ভোগ করিতেছেন। বাবার বৈষয়িক কাজ অনাথ দেখে। আমার সব কাজেও সেই গৃহিণীর মন্ত্রী। বাবার অসুখে ও অনাথের ব্যবহারে বিমাতার যে শিক্ষা হইয়াছিল, তাহার ফলে—এক দিন তাঁহার যে ভাবে আমার জীবন মরুভূমি হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, আশা তাঁহার ব্যবহারে সে ভাবের আভাসও লক্ষ্য করিতে পারে নাই।

এখনও আশার সঙ্গে আমার সেই পথযাত্রার কথা হয়। সেই প্রথম দর্শনের কথায় আমরা উভয়েই যেন আনন্দ পাই। কিন্তু ট্রেণে বিপদের সময় অপরিচিত অমরনাথের সহিত সাক্ষাৎই তাহার বিবাহে বিলম্বের কারণ বলিলে, আশা তাহা অস্বীকার করিতে না পারিলেও, তাহার এমন প্রতিবাদ করিতে থাকে যে, অব্যর্থ ঔষধ ব্যতীত তাহার মুখ বন্ধ করা যায় না।

ঙ

(আশার কথা।)

১৭

উঁহার কথা আবার মানুষ শুনে! আমার বিবাহে বিলম্বের অনেক কারণ থাকিতে পারে। উঁহারই কোন্ ছিল না? কিন্তু পুরুষ মানুষের স্বভাবই এই যে, কোনও জিনিসের সব দিক দেখিতে পারে না। প্রমাণ—উনি মুখবন্ধ করিবার যে ঔষধের কথা বলিয়াছেন—অবস্থাভেদে স্ত্রীলোকের মুখ খুলা ও বন্ধ করা উভয়ের পক্ষেই তাহা ধন্বন্তরি।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

যজ্ঞ—অগ্ন্যাধান ও অগ্নিহোত্র।

যজ্ঞের কথা বলিতে চাহি ; আপনারা অবধান করুন।

আমাদের যে সমাজের চলিত নাম হিন্দু-সমাজ, আমি সেই সমাজকে বেদপন্থী সমাজ বলিব। এই সমাজ বেদের শাসন মানে এবং বেদের আনুগত্য স্বীকার করে। বেদপন্থী সমাজের প্রধান অনুষ্ঠানই যজ্ঞানুষ্ঠান। এই যজ্ঞানুষ্ঠানেই বেদপন্থী সমাজ প্রতিষ্ঠিত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য্য না বুঝিলে বেদপন্থী সমাজের ইতিহাসের যাহা বিশিষ্টতা, তাহা বুঝা যাইবে না। আমি কয়েকটি প্রবন্ধে সেই তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করিব।

এই বেদপন্থী সমাজে একটু সঙ্কীর্ণতা আছে। গোড়ায় সেটুকু মানিয়া লইব। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, আর্য্যজাতির এক শাখা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া একটা নূতন বিশিষ্ট সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সেই সমাজ-তন্ত্রের নিজস্ব সাহিত্যই ছিল বেদ। সেই সমাজের ধর্ম্মকর্ম্ম এবং যাবতীয় অনুষ্ঠান বেদের বিধি-নিষেধ অনুসারেই সম্পাদিত হইত। ভারত-বর্ষের যে সকল আদিম অনার্য্য অধিবাসী ছিল, তাহারা সকলে এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে পায় নাই। কেহ কেহ আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, খাঁটি বেদপন্থী আর্য্যেরাই আপনাদিগকে দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিতেন ; আর যে সকল অনার্য্য তাঁহাদের আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদিগকে শূদ্র বলা হইত। ফলে, শূদ্রেরা বেদপন্থী সমাজের আশ্রিত হইলেও ঐ সমাজের সকল অধিকার পায় নাই। খাঁটি বেদপন্থী দ্বিজাতি-সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণে বিভক্ত হয়। আচারভেদে এবং বৃত্তিভেদে এই বিভাগের কল্পনা হইয়াছিল। আমি এটাকে একটা থিয়োরি মাত্র মনে করি। বস্তুতই যে এই তিনটা বর্ণের মধ্যে সুনির্দ্দিষ্ট রেখা টানা ছিল, এরূপ মনে না করিলেও চলিতে পারে। বৃত্তিভেদ এবং আচারভেদ এখনও যেমন নানারূপ আছে, তখনও হয়ত নানারূপ ছিল। তবে থিয়োরির খাতিরে দ্বিজাতি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটা না একটা বর্ণের কোঠায় ফেলা হইত। পরবর্ত্তী কালে যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে ঐ তিনটি মূল বর্ণকে পরস্পর মিশাইয়া নানা সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি বুঝাইবার একটা উৎকট চেষ্টা দেখা যায়। এই চেষ্টাও আমার অনুমান কতকটা সমর্থন করিতে

পারে। সে যাহাই হউক, বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাকে দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং এই দ্বিজত্ব পরিচয়ে শূদ্র হইতে এবং অনার্য্য ম্লেচ্ছাদি হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেন। এই স্বাতন্ত্র্যই দ্বিজাতি সমাজের সঙ্কীর্ণতা। অন্য সমাজের লোক সহজে দ্বিজাতি সমাজে প্রবেশ করিতে, অর্থাৎ দ্বিজাতিগণের বিশিষ্ট অধিকার লাভ করিতে, পাইত না। একবারেই যে পাইত না, ইহা মনে করিতে পারি না। ইতিহাসে দেখিতে পাই, বহু অনার্য্য এবং বহু ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত কালক্রমে দ্বিজাতি-সমাজে প্রবেশ পাইয়াছে এবং দ্বিজাতির সকল অধিকার লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে অনেক খাঁটি দ্বিজ স্বেচ্ছাক্রমে দ্বিজাতির অধিকার ত্যাগ করিয়া শূদ্রত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। আজি তাঁহারা সেই শূদ্রত্ব স্বীকারের জন্য অনুতপ্ত এবং পুনরায় দ্বিজত্ব লাভের জন্য ব্যাকুল। তৎসত্ত্বেও বলিতে পারা যায়, আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে দ্বিজাতি সমাজ অন্যান্য সমাজ হইতে কতকটা স্বতন্ত্র রহিয়াছে। বেদে অধিকার লইয়াই এই স্বাতন্ত্র্য। যে ব্যক্তি দ্বিজ, সে যে বর্ণের লোকই হউক না, বেদের আলোচনায় এবং বেদ-বিহিত কর্ম্মে তাহার ষোল আনা অধিকার আছে। যাহারা গোড়া হইতেই শূদ্র বলিয়া গণ্য আছে, অথবা দ্বিজত্ব ত্যাগ করিয়া শূদ্রত্ব লইয়াছে, তাহারা এখন বেদপন্থী সমাজের অন্তর্গত থাকিলেও বেদের আলোচনায় এবং বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে ষোল আনা অধিকার পায় নাই।

এখন এই দ্বিজ শব্দটির তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করা যা'ক।

আজ কাল বিদ্যা অর্জ্জনের নামান্তর—লেখা পড়া শেখা। এ কালে প্রচুর পরিমাণে কালি কলম খরচ করিয়া লেখা অভ্যাস করিতে হয় এবং পুঁথি পত্রের সাহায্যে পড়া অভ্যাস করিতে হয়। এইরূপ লিখিতে এবং পড়িতে শিখিলে তবে বিদ্যা লাভ হয়। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন লিপির আবিষ্কার হয় নাই। অতএব তখন লেখাও ছিল না, পড়াও ছিল না। লেখা পড়া ছিল না, কিন্তু বিদ্যা ছিল। বিদ্যা লাভের জন্য লেখা এবং পড়া একান্ত আবশ্যক, তাহা বোধ করি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন। অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculty of Science বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন। লেখা পড়া ব্যতীতও বিদ্যালাভ হইতে পারে। ভারতবর্ষেও এক সময়ে বিদ্যা ছিল এবং বিদ্যা অর্জ্জনের ব্যবস্থাও ছিল। বেদপন্থী সমাজের সেই অতি প্রাচীন বিদ্যার নামই বেদ। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, সেই অতিপ্রাচীন বেদ-বিদ্যা হইতেই এ দেশের প্রায় যাবতীয় বিদ্যা উৎপন্ন হইয়াছে। দ্বিজাতি সমাজের

প্রত্যেক বালককে এক সময়ে সেই বেদবিদ্যার অন্ততঃ কিয়দংশ অর্জ্জন করিতে হইত। প্রত্যেক বালককে এই জন্য বিদ্যাদাতা আচার্য্যের সমীপে যাইতে হইত। আচার্য্যের সমীপে যাওয়ার নাম উপনয়ন। এই উপনয়ন-ব্যাপার এ কালের পাঠশালায় ভর্ত্তি হওয়ার অনুরূপ। কয়েক বৎসর আচার্য্যের বাড়ীতে বাস করিয়া আচার্য্যদত্ত বেদ-বিদ্যা গ্রহণ করিয়া আচার্য্যের অনুমতি লইয়া বাড়ী ফিরিতে হইত। এই বাড়ী ফেরার নাম সমাবর্ত্তন। এই সমাবর্ত্তন ব্যাপার কতকটা এ কালের পাশের সার্টিফিকেট লইয়া বাড়ী ফেরার অনুরূপ। এই সমাবর্ত্তনের পর অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয় দত্ত সার্টি-ফিকেট পাওয়ার পর, গৃহী হইবার অধিকার জন্মিত। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র এ সম্বন্ধেও একটা থিয়োরি খাড়া করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তখনকার বেদবাক্যের নামান্তর ছিল ব্রহ্ম। ব্রহ্ম শব্দের অর্থই বেদবাক্য। আচার্য্যগৃহে যিনি বেদের আলোচনা করিতেন, তিনি ছিলেন ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারী যে সকল আচার নিয়ম পালন করিতেন, তাহার নাম ব্রহ্মচর্য্য। যে সকল ছাত্র বেদবিদ্যার আলোচনাতেই মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন, বেদের আলোচনা ছাড়িতে চাহিতেন না, তাঁহারা হয়ত গৃহী হইতেন না। যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য লইয়াই কাটাইতেন। আবার কোনও কোনও ছাত্র বেদের জ্ঞানকাণ্ডের চর্চ্চায় এতটা মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন; যে গৃহধর্ম্মে তাঁহাদের বিতৃষ্ণা জন্মিত। তাঁহারা জ্ঞানপথের পথিক হইয়া একবারে সন্ন্যাসী হইয়া পড়িতেন, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেন। এই আজীবন ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসী ব্যতীত অধিকাংশ ছাত্রই সমাবর্ত্তনের পর গৃহে ফিরিয়া গৃহস্থ হইতেন। এই গৃহস্থদিগের সমষ্টি লইয়াই সমাজ। যে ব্যক্তি গৃহধর্ম্ম করে না, লোকালয় হইতে দূরে থাকিয়া চিরকাল বিদ্যাচর্চ্চা অথবা জ্ঞানচর্চ্চা লইয়াই জীবন কাটায়, সে সমাজের কেহ নহে। সমাজ তাহাকে পালন করে বটে, রক্ষা করে বটে, কিন্তু সে সামাজিক নহে।

সমাবর্ত্তনের পর তবে বিবাহের অধিকার জন্মে। বিবাহ না করিলে গৃহস্থ হয় না, গৃহপতি হয় না। যে বিবাহ করে নাই, তাহার গৃহ নাই। মনে রাখিবেন, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। এই বিবাহ অনুষ্ঠানটা কৃত্রিম অনুষ্ঠান। Malthus সাহেবের Population ঘটিত প্রবন্ধ প্রচার হইতে বিবাহ অনুষ্ঠানের ঔচিত্য লইয়া অনেক জল্পনা হইয়াছে। অনেকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, দরিদ্রের পক্ষে বিবাহ অধর্ম্ম; আইনের জোরে তাহাদের বিবাহ বন্ধ করা উচিত। এখনও এক শ বৎসর অতিক্রম হয় নাই,

ইহারাই মধ্যে হাওয়া ফিরিয়াছে। ইউরোপের উপস্থিত হাঙ্গামাটা থামিয়া গেলে হয় ত শোনা যাইবে, যে আইনের জোরে সকলকে বিবাহে বাধ্য করা উচিত। অন্ততঃ রাষ্ট্রের কল্যাণার্থ সকলকে বিবাহে বাধ্য করা উচিত। রাষ্ট্রের কল্যাণ দেখিয়াই এ কালে ধর্ম্মাধর্ম্মের নিরূপণ হয়। রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য বহু দেশে প্রত্যেক বালককে বিদ্যালাভে বাধ্য করা হইয়াছে। রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য হয় ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিবাহে বাধ্য করা হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রতন্ত্রের এত প্রভুত্ব ছিল না। তবে সমাজের কল্যাণ দেখিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের নিরূপণ হইত বটে। আইনের জোরে বাধ্যতা প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত নহে। তবে ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থা কার্য্যতঃ কয়েকটি বিষয়ে এই বাধ্যতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। যে স্বেচ্ছাক্রমে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারী থাকিবে, অথবা ব্রহ্মচর্য্যের পরেই সন্ন্যাসী হইবে, সে ত বিবাহ করিবেই না। আইনের জোরে তাহাকে বিবাহে বাধ্য করা এ দেশের সমাজব্যবস্থা স্বপ্নেও মনে আনিতে পারে না। কিন্তু যে গৃহস্থ হইবে, সে বিবাহে কার্য্যতঃ বাধ্য। বিবাহ না করিলে সে ষোল আনা সামাজিকতা পাইবে না। বেদ-বিহিত সমুদয় ধর্ম্মকর্ম্মে তাহার অধিকার জন্মিবে না। কেননা, বেদ-বিহিত ধর্ম্মকর্ম্ম সপত্নীক অনুষ্ঠান করিতে হয়। যে পত্নী গ্রহণ করে নাই, মানবের মর্ত্ত্যজীবনের নিয়ামক দেবগণের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক ঘটিতে পারে না। দেবগণ মনুষ্য-প্রদত্ত যজ্ঞভাগের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। যাহার পত্নী নাই, সে দেবতাকে যজ্ঞভাগ দিতে পারে না। পিতৃগণের সহিতও তাহার মাখামাখি সম্পর্ক ঘটে না। পিতৃগণ পুরুষপরম্পরাদত্ত পিণ্ডভোজনের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। যে ব্যক্তির পত্নী নাই, সে বংশধারা-রক্ষায় অশক্ত। পিণ্ডবিচ্ছেদ ভয়ে পিতৃগণ চোখের জল ফেলিতেছেন। যে ব্যক্তি পিতৃগণকে পিণ্ড দেয়, সেই পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকারী। অতএব, যে ব্যক্তি বংশধারা রক্ষা করিতে পারিতেছে না, সে পৈত্রিক সম্পত্তিতে পূর্ণ মাত্রায় অধিকার পাইতে পারে না। ফলে অপত্নীক ব্যক্তি সামাজিকের পূর্ণ অধিকার পাইতে পারে না। সমাজভুক্ত অন্য লোকের সহিত তাহার ষোল আনা সম্পর্ক ঘটিতে পারে না। সামাজিক জীবনের পূর্ণতার জন্য বিবাহ আবশ্যক। জীবনের সংস্কারের জন্য বিবাহ আবশ্যক। বিবাহ জীবনের অন্তিম সংস্কার। এই হেতু দ্বিজাতি-সমাজে সামাজিক গৃহস্থ কার্য্যতঃ বিবাহে বাধ্য।

কিন্তু মনে রাখিবেন যে, আচার্য্য-গৃহ হইতে বেদ-বিদ্যা লাভ করিয়া

সমাবর্ত্তনের পর তবে বিবাহে অধিকার জন্মে। এ কালে পাশ করা ছেলের বিবাহের বাজারে দর বেশী; সে কালে ছেলে পাশ করিয়া আসিতে না পারিলে বিবাহে অধিকারই পাইত না। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রাচীন কালে যে থিয়োরি খাড়া করিয়াছিল, এ কালে তাহার বাঁধাবাঁধি নাই; তথাপি ব্রাহ্মণের ছেলে গলায় একগাছা পৈতা দেখাইতে না পারিলে বিবাহ করিতে পায় না। পৈতা গাছটায় বলিয়া দেয় যে, সে যতই মূর্খ হউক, অন্ততঃ বেদের গায়ত্রী মন্ত্রটি, বেদ-বিদ্যার যাহা সার মন্ত্র সেই গায়ত্রী মন্ত্রটি, অভ্যাস করিয়াছে। মনে করিতে পারি যে, সে কালে শাস্ত্রের বন্ধন এতটা আলগা ছিল না। বেদ-বিদ্যার অন্ততঃ কিয়দংশ আয়ত্ত করিতে না পারিলে সমাবর্ত্তনে আচার্য্যের অনুমতি পাইত না এবং সমাবর্ত্তন না হইলে বিবাহ হইত না। অতএব যে একবারে গণ্ডমূর্খ, সে বিবাহ করিতে পাইত না, গৃহী হইতে পারিত না, সমাজে এক রকম অব্যবহার্য্য হইয়া থাকিত। ফলে, থিয়োরি অনুসারে দ্বিজাতি-সমাজে মূর্খের স্থান ছিল না। প্রত্যেক দ্বিজের পক্ষে বিদ্যালাভ এইরূপে একান্ত আবশ্যক—compulsory—হইয়া পড়িয়াছিল। গৃহীর পক্ষে বিবাহ যেমন compulsory, বিদ্যালাভও সেইরূপ compulsory. কেন না, মূর্খের বিবাহ নিষিদ্ধ। এ কালে সাধারণ লোকশিক্ষা (mass education) বাধ্যতামূলক করিবার প্রস্তাব হইতেছে, কিন্তু কিরূপে compulsory করা যাইবে, তাহার উপায় হইতেছে না; রাষ্ট্রশক্তিকে এজন্য আহ্বান করা হইতেছে। সে কালে শাস্ত্রকারদের ব্যবস্থায় বিদ্যালাভ compulsory করা হইয়াছিল; বেদবিদ্যা লাভে, অর্থাৎ সে কালের উচ্চতম বিদ্যা লাভে, বাধ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিবাহ আটকাইয়া এ কালের বিশ্ববিদ্যালয় এ কালের উচ্চশিক্ষা লাভে সেরূপে বাধ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন কি না, মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলার মহোদয় তাহা বিবেচনা করিবেন।

ভারতবর্ষের এই যে অতি পুরাতন সমাজ, থিয়োরি অনুসারে যে সমাজে অশিক্ষিত ব্যক্তির স্থান ছিল না, যে সমাজে অশিক্ষিত ব্যক্তি গৃহী বা গৃহপতি হইতে পারিত না, গৃহস্থের অধিকার পাইত না, ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার পাইত না, সমাজ মধ্যে পতিতপ্রায় হইয়া থাকিত, সেই সমাজই দ্বিজাতি-সমাজ। সেই সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিই দ্বিজ; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিনের যে কোনও বর্ণেরই হউক, অথবা যে কোনও মিশ্র বর্ণেরই হউক, সেই দ্বিজ। যে এক বার নৈসর্গিক মানব জন্ম পাইয়াছে; আর একবার বেদ-বিদ্যা লাভে সংস্কৃত

হইয়া, বিশুদ্ধ হইয়া, পূত হইয়া দ্বিতীয় জন্ম, নূতন সামাজিক জন্ম পাইয়াছে, সেই ব্যক্তিই দ্বিজ। যে ব্রাহ্মণ অপরের ছেলে পড়ায়, অপরকে ধর্ম্ম কর্ম্ম করায়, সে দ্বিজ। যে ক্ষত্রিয়, রাজকার্য্য করে বা লড়াই করে, সে দ্বিজ। আর যে বৈশ্য, গরু চরায়, লাঙ্গল ধরিয়া আপন জমিতে চাষ করে, বা দোকান রাখে, সেও দ্বিজ। সমুদয় বেদ-বিদ্যায়, বেদের ষোল আনা কর্ম্মকাণ্ডে এবং জ্ঞানকাণ্ডে, ইহাদের সকলেরই ষোল আনা অধিকার জন্মিয়াছে। সেই অধিকারে কেহ তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে না। সমাজ-স্থিতির জন্য ও লোক-স্থিতির জন্য তাহাকে কতকগুলি সামাজিক বিধি মানিয়া চলিতে হইত। কতকগুলি কৃত্রিম অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে হইত। এই কৃত্রিম অনুষ্ঠানগুলির সাধারণ নাম যজ্ঞ। সেই যজ্ঞের তাৎপর্য্য না বুঝিলে বেদপন্থী দ্বিজাতি-সমাজের নিগূঢ় তথ্য বুঝা যাইবে না। বেদপন্থী সমাজের জ্ঞানের ইতিহাস এবং কর্ম্মের ইতিহাস সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যাইবে না। ভারতবর্ষের ইতিহাসের যাহা বিশিষ্টতা, তাহা বুঝা যাইবে না। অতএব আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, আপনারা অবধান করুন; আমি যজ্ঞের কথা বলিব।

মনে রাখিবেন, সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে মনুষ্য-সমাজ একটা কৃত্রিম যন্ত্র। সর্ব্বত্রই কতকগুলি কৃত্রিম অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়া সমাজ বন্ধনের চেষ্টা হইয়াছে। সমাজ যন্ত্রের জটিলতা কোথাও অধিক, কোথাও অল্প। তদনুসারে এই সকল কৃত্রিম অনুষ্ঠানগুলিরও কোথাও বহুলতা, কোথাও অল্পতা। বহুস্থলে এই সকল অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। এক কালে হয় ত একটা তাৎপর্য্য ছিল, এখন তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া ঐ সকল অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করেন। আজ কাল anthropology অর্থাৎ মানববিদ্যা একটা বিজ্ঞানবিদ্যায় দাঁড়াইয়াছে। মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক রীতি অবলম্বনে মানব সমাজের প্রত্যেক অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য অন্বেষণ করেন। মুখ্যতঃ দুইটা পথ অবলম্বন করিতে হয়। প্রথম তুলনামূলক আলোচনা। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে যে সকল অনুষ্ঠান বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে, তাহাদিগকে একত্র করিয়া তুলনায় আলোচনা করিতে হয়। কোথায় সাদৃশ্য কোথায় বৈষম্য আছে, কতটুকু সাদৃশ্য কতটুকু বৈষম্য আছে, তাহার আলোচনা করিতে হয়। এইরূপ আলোচনায় অনেক অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায়। দ্বিতীয়, ঐতিহাসিক আলোচনা। কোনও একটা সমাজে অতি প্রাচীন কালে কিরূপ অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, সেই দেশের

পুরাতন ইতিবৃত্ত থাকিলে, পুরাতন সাহিত্য থাকিলে, তন্মধ্যে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। যে দেশে ধারাবাহিক সাহিত্য বা ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত আছে, সে দেশের পুরাতন অনুষ্ঠানগুলি কিরূপে ক্রমশঃ বিকৃতি বা পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহা দেখিতে পারিলে অনুষ্ঠানগুলির তাৎপর্য্য বুঝা যায়। দেখা যায়, বর্ত্তমানে যে অনুষ্ঠানের কোনও মানে বুঝা যায় না, এক কালে তাহার একটা মানে ছিল। বর্ত্তমানে যাহা নিতান্ত উদ্দেশ্যহীন এবং নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়, এক কালে তাহার একটা উদ্দেশ্য—একটা অর্থ—ছিল। একটা প্রচলিত দৃষ্টান্ত দিব। আপনারা শুনিয়া থাকিবেন, ইংরেজেরা বড় দিনের উৎসবে mistletoe নামক লতা দিয়া ঘর সাজাইয়া থাকেন। অন্য লতায় না সাজাইয়া মিসিলটো দিয়া কেন সাজান হয়; এখন তাহার কোনও মানে পাওয়া যায় না। কিন্তু অতীত ইতিহাসে ইহার তাৎপর্য্য পাওয়া যায়। ইংরেজের দেশে যখন ইংরেজের আবির্ভাব হয় নাই, তখন বৃটনেরা ওকগাছের পূজা করিত। মিসিলটো লতা ওক গাছে পরগাছা হইয়া জন্মে। সে কালের বৃটনেরা সেই লতার অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করিত। বড় দিনে সূর্য্য উত্তর মুখে ঘুরিলে নববর্ষের উৎসবে ড্রুইডেরা সমারোহসহকারে ওক গাছ হইতে সেই লতা কাটিয়া আনিত এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া যজমানদিগকে বিতরণ করিত। মিসিলটো ঘরে থাকিলে ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা থাকিত। মিসিলটো সর্ব্বব্যাধি-বিনাশক। অতএব, উহা ঘরে ঘরে সযত্নে রাখা হইত। এখন সে ড্রুইডও নাই, সে বৃটনও নাই; মিসিলটোর মাহাত্ম্যেও কেহ বিশ্বাস করে না। কিন্তু বৃটন দেশ যাহারা দখল করিয়া বাস করিয়াছে, প্রাচীন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে, সেই বিজেতা ইংরেজেরাও এখনও সেই বড় দিনের উৎসবে পরাজিত বৃটনদের সেই পুরাতন প্রথা ত্যাগ করিতে পারে নাই। এখন এই অনুষ্ঠান তাৎপর্য্যহীন; কিন্তু এক কালে উহার বৃহৎ তাৎপর্য্য ছিল। ইতিহাস আলোচনায় তাহা আবিষ্কৃত হয়। ঐ বড় দিনের উৎসবটাই দেখুন না। তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায়, বড় দিনের উৎসব সকল জাতির মধ্যেই কোনও না কোনও আকারে বিদ্যমান আছে। সূর্য্য দক্ষিণ মুখে চলিতে চলিতে এক দিন উত্তর মুখে ফেরে; অতি অসভ্য জাতিও সেই দিনটাকে লক্ষ্য করে। সেই দিন শীত ঋতুর অবসান সূচনা করে। সমস্ত পৃথিবী মূর্ত্তি বদলাইবার উদ্‌যোগ করে। সে দিনটা সকলেরই পক্ষে আনন্দের দিন, উৎসবের দিন। আমরাও উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে নানা পুণ্য কর্ম্ম করি। পৌষ মাস পুণ্য মাস। পৌষ

মাসে লক্ষ্মী পূজা পিঠাপার্ব্বণের উৎসব। যীশুখ্রীষ্টের কোন্ তারিখে জন্ম হইয়াছিল, কোনও খ্রীষ্টান তাহা জানে না। কিন্তু যীশুখ্রীষ্ট নূতন ধর্ম্মপ্রচার করিলেন। মানব জাতির ইতিবৃত্তে একটা নূতন পরিচ্ছেদ প্রবর্ত্তন করিলেন। খ্রীষ্টানেরা কল্পনা করিয়া লইল, ঐ বড় দিনে চরাচর পৃথিবী যখন নব জীবনের উদ্যম করে, সেই দিনই খ্রীষ্টের জন্ম হইয়াছিল। খ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বড় দিনের উৎসবে যে উৎসব-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, তাহাকেই বিকৃত এবং রূপান্তরিত করিয়া খ্রীষ্টের জন্মোৎসবে পরিণত করা হইল। যাহার তাৎপর্য্য ছিল এক রূপ, তাহাতে তাৎপর্য্য দেওয়া হইল অন্য রূপ।

এই দৃষ্টান্ত হইতেই বৈজ্ঞানিক রীতির পরিচয় পাইবেন। বর্ত্তমান কালে anthropology বিদ্যাটা খুব বড় বিদ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার মধ্যে যতটা আস্ফালন আছে, ততটা ফল ধরে নাই। এখনও উহার পদে পদে মতদ্বৈধ আর সংশয়। পণ্ডিতে পণ্ডিতে এত মতভেদ, যে কোনও সিদ্ধান্তকে একবারে চাপিয়া ধরা যায় না। তাহাতে দুঃখিত হইবার কোনও কারণ নাই। এ বিদ্যা এখন বিজ্ঞানবিদ্যা। বিজ্ঞানবিদ্যার ইহা দোষও বটে গুণও বটে। কোনও সিদ্ধান্তকে একবারে পাকা করিয়া ধরা বিজ্ঞানবিদ্যার স্বভাব নয়। জ্ঞানের বিস্তারের সহিত প্রত্যেক সিদ্ধান্তকেই পূর্ণতার এবং পরিণতির দিকে লইয়া যাওয়াই বিজ্ঞানবিদ্যার কাজ। বিজ্ঞানবিদ্যা যে পথে চলিতেছে, সেই পথেই তাহাকে চলিতে হইবে। বিজ্ঞানবিদ্যার পক্ষে নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। উহা সংশয়ের পথ, দ্বৈধের পথ। অথচ উহাই একমাত্র পথ।

গোঁড়া খ্রীষ্টানকে যদি বলা যায়, যে তাঁহাদের বড় দিনের উৎসবের সহিত যীশু খ্রীষ্টের জন্মের কোনও সম্পর্ক নাই, উহা খ্রীষ্টানের বিশিষ্ট উৎসব নহে, মনুষ্য সাধারণের উৎসব, তাহা হইলে তিনি হয় ত চটিয়া যাইবেন। তাঁহার আজন্ম বিশ্বাস যে ঐ সময়েই খ্রীষ্টের জন্ম হইয়াছিল এবং সেই বিশ্বাসের অনুরোধেই তিনি ঐ উৎসব অনুষ্ঠানে সমস্ত শ্রদ্ধা অনুরাগ অর্পণ করিয়াছেন। সেই বিশ্বাসের মূল শিথিল করিয়া দিলে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের গ্রন্থিও শিথিল হইয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিকেরা সহস্র প্রমাণ উপস্থিত করিলেও তিনি ঐ বিশ্বাসকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়াইয়া থাকিবেন। ফলে মানুষের conductএর উপর, কর্ম্মের উপর, প্রজ্ঞার—Reasonএর—প্রভুত্ব বড় অধিক নহে। সংস্কার এবং বিশ্বাস প্রকৃত পক্ষে মনুষ্যজীবনের নিয়ামক। প্রজ্ঞা ভুল ভ্রান্তি দেখাইয়া মানুষকে শাসনে আনিতে চায় বটে, সংযত করিতে চায় বটে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে কৃত-

কার্য্য হয় না। কর্ম্মপথে বাহির হইয়া মানুষ সহজে প্রজ্ঞার শাসন মানিতে চায় না। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিজ্ঞানবিদ্যার সহিত রিলিজনের যে একটা বিরোধ আছে, যে বিরোধ কখন মিটিবার নহে, তাহার মূল এইখানে। সামাজিক মনুষ্যের কর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে এ কথাটাকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। বিজ্ঞানবিদ্যা যাহাই বলুন, মানুষ তাহার সংস্কারকে এবং বিশ্বাসকে আপনার ধাতুর সহিত, আপনার প্রকৃতির সহিত সমঞ্জস করিয়া বাঁধিয়া লয় এবং তদনুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকে। অধিকাংশ সামাজিক অনুষ্ঠানের ইতিবৃত্ত জানা যায় না। অবৈজ্ঞানিক মানুষ তাহা জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রও নহে। কিন্তু সে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের একটা মনগড়া তাৎপর্য্য আরোপ করিয়া সেইটাকেই আঁকড়াইয়া থাকে। যে ব্যক্তির কল্পনার দৌড় নাই, সে অপরের প্রদত্ত অর্থ মানিয়া লইয়া তাহাকেই জড়াইয়া থাকে। যাঁহাদের কল্পনার দৌড় অধিক, তাঁহারা নানারূপ তাৎপর্য্যের আরোপ করেন এবং ইতর সাধারণে সেই সকল আরোপিত তাৎপর্য্য গ্রহণ করে।

আর্য্যজাতির যে শাখা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া বেদপন্থী সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রধান সামাজিক অনুষ্ঠানই ছিল যজ্ঞ। ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে আরও প্রাচীন কালে যাইতে হয়। ভারতীয় এবং পারসীক ধর্ম্ম-গ্রন্থে তুলনামূলক আলোচনায় তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যেতর অন্যান্য জাতির মধ্যেও যজ্ঞানুষ্ঠান কোনও না কোনও প্রকারে বিদ্যমান ছিল এবং এখনও আছে, তাহাও আপনারা জানেন। এ সব আপনাদের জানা কথা। ইহা লইয়া আমি আপনাদের সময় নষ্ট করিব না। ভারতবর্ষে বেদপন্থী সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠান কালক্রমে অত্যন্ত পল্লবিত হইয়া অত্যন্ত জটিলতা পাইয়াছিল। বহু অনুষ্ঠানের গোড়ার তাৎপর্য্য লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাৎপর্য্য আরোপ করিবার লোকের অভাব ছিল না। কল্পনা শক্তিতে ভারতবর্ষের লোক কোনও দেশের লোকের নিকট কখন হারি মানে নাই। আপনারা বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থের নাম শুনিয়া থাকিবেন। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি মুখ্যতঃ যজ্ঞের বিবরণে পরিপূর্ণ। কোন্ যজ্ঞে কি কি অনুষ্ঠান, তাহা ব্রাহ্মণ গ্রন্থ মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ যাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ছিল ব্রহ্মবাদী। তাঁহাদের কল্পনার দৌড় অসীম ছিল। কোনও স্থানেই তাঁহারা পিছ-পা হইতেন না। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন, তাঁহারা অনুষ্ঠানগুলির পর পর বিবরণ দিয়া যাইতেছেন এবং

কোন্ অনুষ্ঠানের কি অর্থ, কি তাৎপর্য্য, তাহা অসঙ্কোচে দ্বিধাহীন চিত্তে নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেছেন; অত্যন্ত সরল ভাবে আপন মত প্রকাশ করিয়া যাইতেছেন। তিনি বলিয়া যাইতেছেন; তাঁহার মুখ হইতে যে সকল বাক্য বাহির হইতেছে, তিনি যেন তাহার জন্য আদৌ দায়ী নহেন। তাহার পক্ষে কোনও যুক্তি তর্ক আছে কি না, উহা বিচারসহ হইবে কি না, তাহা বিবেচনায় তাঁহার অবসর মাত্র নাই। ভিতর হইতে কে যেন তাঁহাকে বলাইতেছেন, তিনি বলিয়া যাইতেছেন। স্থানে স্থানে দেখা যায়, দুই জন ব্রহ্মবাদী দুই রকমের তাৎপর্য্য দিতেছেন। এক জন অপরের কথা খণ্ডন করিতেছেন। কিন্তু তাহাতেও কোনও পক্ষেরই কোনরূপ সঙ্কোচ নাই। উভয় পক্ষই আপনার কথা সমান জোরে বলিয়া যাইতেছেন। উভয়ের বাক্যই বেদবাক্য।

বেদ কাহাকে বলে, যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি তাহার উত্তর দিতে পারিব না। আমাদের শাস্ত্রকারেরাও ইহার উত্তর দিতে পারেন নাই। তাঁহারা এই পর্য্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন যে, বেদের দুই ভাগ—মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ। মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই দুই লইয়াই বেদ। সামাজিকের পক্ষে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ উভয়ই তুল্যমূল্য, উভয়ই বেদবাক্য, উভয়ই নিত্য এবং অপৌরুষের; কোনও ব্যক্তিবিশেষের মনগড়া বাক্য নহে। ব্যক্তিবিশেষে উহা প্রচার করিয়াছে মাত্র। যাঁহারা এই মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদেরই নাম ঋষি। বেদের মন্ত্রগুলিকে তিন শ্রেণিতে ফেলা হয়—ঋক্, যজুঃ, এবং সাম। ঋক্ মন্ত্রগুলি ছন্দে বাঁধা বাক্য, একালে যাহাকে পদ্য বলে; ইংরেজিতে verse বলা যাইতে পারে। যজুর্ম্মন্ত্রগুলি ছন্দে বাঁধা নহে। ওগুলি গদ্য মন্ত্র; ইংরেজিতে prose formula বলা হয়। সাম মন্ত্র বলিয়া পৃথক্ মন্ত্র নাই। ঋক্ মন্ত্রকে কোনও একটা সুর দিয়া গাহিলেই উহা সাম মন্ত্রে পরিণত হয়। কোনও একটা verseএর বা পদ্যের ছন্দ বজায় রাখিয়া আওড়াইলে হয় ঋক্, আর সুর দিয়া গাইলেই হয় সাম। যাজ্ঞিকেরা নিগদ মন্ত্র এবং প্রৈষ মন্ত্র বলিয়া আর এক শ্রেণির মন্ত্রের উল্লেখ করেন। কিন্তু সেগুলিও গদ্যময় বাক্য। অতএব তাহাদিগকে যজুর্ম্মন্ত্রের প্রকারভেদ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ফলে ঋক্ যজুঃ আর সাম এই তিন শ্রেণির মন্ত্র ব্যতীত আর চতুর্থ শ্রেণির মন্ত্র নাই। এই জন্যই মন্ত্রাত্মক বেদবিদ্যাকে ত্রয়ী বিদ্যা বলে। বেদ তিনখানা না চারিখানা, এই লইয়া একটা তর্ক আছে। আপনারা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদের কথা শুনিয়াছেন। এ কালের

অনেক পণ্ডিতেরা বলেন, ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদই প্রাচীন বেদ। চতুর্থ অথর্ব্ব বেদকে পরবর্ত্তী কালে জোর করিয়া বেদের মধ্যে ফেলা হইয়াছে। এরূপ ভাবে ধরিলে উত্তরটা ঠিক হয় না। আসল কথা এই যে, বেদের মন্ত্র তিন শ্রেণির, কিন্তু বেদমন্ত্রের সংহিতা চারিখানা। বেদ-মন্ত্রের সংগ্রহের নাম সংহিতা। অধিকাংশ ঋক্ মন্ত্র একত্র সংগ্রহ করিয়া যে গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাই ঋক্ সংহিতা। ঐরূপ যজ্ঞে ব্যবহার্য্য যজুর্মন্ত্রের সংগ্রহ একত্র করিয়া যজুঃসংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। যে সকল ঋক্ যজ্ঞানুষ্ঠানে গান করিতে হইত, সেইগুলিকে একত্র সংগ্রহ করিয়া সামসংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। এইরূপে সঙ্কলিত মন্ত্র ছাড়া আরও কতকগুলি অতিরিক্ত মন্ত্র ছিল। যাহা সাধারণ যজ্ঞকার্য্যে ব্যবহৃত হইত না। যাহা শান্তিস্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইত। সেইগুলিকে একত্র করিয়া অথর্ব্বসংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। এই অথর্ব্ব সংহিতারও অধিকাংশ মন্ত্র ঋক্ মন্ত্র। ফলে ঋক্, যজুঃ, সাম ছাড়া আর চতুর্থ শ্রেণির মন্ত্র নাই। বেদ মন্ত্র তিন শ্রেণির, কিন্তু বেদমন্ত্রের সংহিতা বা collection চারিখানি। প্রত্যেক মন্ত্র কোনও না কোনও সময়ে কোনও না কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। প্রচারিত হইয়াছিল বলিলাম, কেন না, কোন ব্যক্তি কোন বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছেন, এ কথা বেদপন্থী কিছুতেই বলিতে চাহিবেন না। যিনি যে মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন, তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি। যে মন্ত্রে যে দেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, সেই মন্ত্রের সেই দেবতা। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক মন্ত্রের কোনও না কোনও কর্ম্মে, কোনও না কোনও অনুষ্ঠানে, বিনিয়োগ হইত। যাজ্ঞিকদের মতে প্রত্যেক মন্ত্রই কোনও না কোনও কাজে লাগিবে, কোনও না কোনও অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইবে। অকেজো মন্ত্রের কোনও সার্থকতা নাই। অতএব শুধু মন্ত্রের সংহিতা লইয়া, মন্ত্রের সংগ্রহ গ্রন্থ লইয়া সমাজের বিশেষ কোনও লাভ নাই। সামাজিকের জন্য বেদমন্ত্রগুলির সার্থকতা দেখাইতে হইবে। এইজন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থের আবশ্যকতা। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে দেখান হইয়াছে, কোন্ মন্ত্র কোন্ কর্ম্মে প্রযুক্ত হয়; কখন্ কি ভাবে প্রযুক্ত হয়; সেই কর্ম্মে সেই মন্ত্রের সার্থকতা কি; অন্য মন্ত্রের প্রয়োগ না হইয়া সেই মন্ত্রেরই প্রয়োগ হইল কেন। এই সকলের বিস্তৃত বিবরণ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পাওয়া যায়। যে সকল ব্রহ্মবাদী এই সকল ব্রাহ্মণ গ্রন্থের প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারাও ঋষি। তাঁহারাও যেন ভিতরের প্রেরণা বলে মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ

এবং মন্ত্রগুলির তাৎপর্য্য জানিতে পারিয়াছিলেন এবং যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই সমাজের কল্যাণের জন্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই ভিতরের প্রেরণা, এই inspiration, সকলের নাই। অতএব মন্ত্র যেমন বেদবাক্য, মন্ত্র-সম্পর্কে যে ব্রাহ্মণ প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও বেদবাক্য। অতএব, মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই উভয় লইয়াই বেদ।

ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, আমাদের বেদপন্থী সমাজের ভিত্তি এই ব্রাহ্মণগ্রন্থেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত বেদপন্থী সমাজ ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিকে বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে এবং তদনুসারে সমাজের ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থে যে সকল বিধিনিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে, বেদপন্থী সমাজের সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল সেইখানে। এমন কি, স্পষ্ট করিয়া বলা হয়, বেদবাক্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ গ্রন্থোক্ত বাক্য স্বতঃ প্রমাণ। উহাকে মানিয়া লইতেই হইবে। প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের কোনও বাক্যের সহিত যদি সেই বেদবাক্যের বিরোধ থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রের সেই সব বাক্য অগ্রাহ্য। আগেই আপনাদিগকে বলিয়াছি, ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণগ্রন্থের প্রচারকর্ত্তা ব্রহ্মবাদীদের মধ্যেও প্রচুর মতভেদ ছিল। একই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল। অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিধিনিষেধেরও ভিন্নতা ছিল। অথচ প্রত্যেকের উক্তিই বেদবাক্য। এই বেদবাক্যের সামঞ্জস্য সাধন করিবার জন্য পরবর্ত্তী পণ্ডিতদিগকে মাথা ঘামাইতে হইয়াছিল। পরস্পর বিরোধী বিধিনিষেধ বাক্যের কোনরূপ সামঞ্জস্য সাধন না করিলে সামাজিক লোক কোন্ পথে চলিবে? এই সামঞ্জস্য সাধনের জন্য বেদবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া কর্ম্ম মীমাংসার জন্য দর্শনশাস্ত্রের একটা বিপুল শাখার সৃষ্টি হইয়াছিল। মীমাংসাদর্শন বলিলে আমরা এই দর্শনকেই বুঝি। পরস্পর বিরোধী বেদবাক্যের সামঞ্জস্য সাধনের জন্য মীমাংসাদর্শন যে সকল rule বা canon প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সমস্ত বেদপন্থী সমাজ তাহা মানিয়া লইয়াছে। আমাদের সমাজে প্রচলিত jurisprudenceএর ভিত্তি পত্তন ঐখানে। কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে কর্ত্তব্য বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলেই মীমাংসাদর্শনের দোহাই দিতে হয়, এবং মীমাংসাদর্শনের সূত্রগুলির প্রয়োগ করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হয়। সকল দেশে সকল সমাজে লোকস্থিতি কতকগুলি কৃত্রিম convention এর উপর স্থাপিত। সামাজিক অনুষ্ঠান সকলের বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি যাহাই হউক, উহাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি কার্য্যতঃ কতক গুলা conven-

tionএর উপর, কতকগুলা fictionএর উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজের অধিকাংশ লোকে যাহা মানিয়া লয়, তাহা বিজ্ঞানসম্মত হউক আর না হউক, তাহাই সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি। ব্যবহারশাস্ত্রবিদেরা, অর্থাৎ আইনজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই সকল fictionএর কথা বেশ জানেন। এ বিষয়ে আমার বাগ্‌বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

যজ্ঞের কথায় ফিরিয়া আসা যা'ক। 'যজ্ঞ' শব্দটা কখন অতি সঙ্কীর্ণ এবং কখন অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইত। যাজ্ঞিক পণ্ডিতেরা যজ্ঞ শব্দের একটা অর্থ দিয়াছেন। দেবতার উদ্দেশে কোনও দ্রব্য ত্যাগের নাম যজ্ঞ। এখানে তিনটি শব্দ পাওয়া যাইতেছে। দেবতা, দ্রব্য এবং ত্যাগ। এই তিনটি শব্দেরই সঙ্কীর্ণ পারিভাষিক অর্থ আছে, এবং অত্যন্ত ব্যাপক অর্থও আছে। আমি যজ্ঞের তাৎপর্য্য অন্বেষণে উপস্থিত হইয়াছি। সঙ্কীর্ণ এবং ব্যাপক উভয় অর্থই আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথমে সঙ্কীর্ণ অর্থই গ্রহণ করিব; তার পর ক্রমশঃ ব্যাপক অর্থে আসা যাইবে। সঙ্কীর্ণ অর্থে দেবতা, দ্রব্য ও ত্যাগ বলিলে কি বুঝায়, স্থূলতঃ তাহা আপনারা জানেন। বেদে নানা দেবতার উল্লেখ আছে। ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, বিষ্ণু, রুদ্র ইত্যাদি। এই সকল দেবতার উদ্দেশে কোনও না কোনও দ্রব্য ত্যাগ করা হইত। ত্যাগ কর্ম্মের নাম আহুতি। যে দ্রব্য ত্যাগ করা হইত, তাহা হব্য। নানাবিধ দ্রব্য হব্যরূপে দেওয়া হইত। দৃষ্টান্ত, আজ্য অর্থাৎ যজ্ঞার্থ সংস্কৃত ঘৃত, চরু বা পায়সান্ন, দুধ, দই, পুরোডাশ বা রুটি, পশুমাংস, সোমলতার রস, ইত্যাদি। এই দ্রব্য-ত্যাগ কর্ম্মের নামই যাগ। যে গৃহস্থের হিতার্থ যাগ অনুষ্ঠিত হইত, তিনি যজমান। যিনি যজমানের হিতার্থে এই যাগ কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন, তিনি যাজক বা ঋত্বিক্। যাগ কর্ম্মের প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক করিতে হইত। প্রত্যেক কর্ম্মেরই নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র ছিল। আগেই বলিয়াছি, কর্ম্মে প্রযুক্ত হয় বলিয়াই মন্ত্রের সার্থকতা। যে মন্ত্র কোনও কাজে লাগে না, সে মন্ত্র নিরর্থক। মন্ত্র তিন শ্রেণির; ঋক্, যজু, সাম। যে সকল যজ্ঞে এই তিন শ্রেণির মন্ত্রের ব্যবহার ছিল, সেখানে এক জন যাজকে কাজ চলিত না। একাধিক যাজক আবশ্যক হইত। কোনও ঋত্বিক্ ঋক্ মন্ত্র আওড়াইতেন—স্পষ্ট ভাবে উচ্চৈঃস্বরে। কেহ বা যজুর্ম্মন্ত্র আওড়াইতেন—নিম্নস্বরে। কেহ বা সাম মন্ত্র গান করিতেন। বড় বড় যজ্ঞে এই তিন শ্রেণির যাজক বা ঋত্বিক্ আবশ্যক হইত;—ঋগ্‌বেদী, যজুর্ব্বেদী ও সামবেদী। ঋগ্‌বেদী প্রধান যাজকের নাম

ছিল হোতা। ইনি ঋক্ মন্ত্র আওড়াইতেন। হোতা শব্দে আপনারা হোমকারী বুঝিবেন না। হোতা শব্দ আহ্বানার্থক হ্বে ধাতু হইতে উৎপন্ন। যিনি ঋক্ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞস্থলে দেবতাকে আহ্বান করেন বা ডাকিয়া আনেন, তিনিই হোতা। হোতাকে আহুতি দিতে হইত না। যিনি আগুনে আহুতি দিতেন, তাঁহার নাম অধ্বর্য্যু। তিনিই অগ্নিতে হব্য দ্রব্য নিক্ষেপ করিতেন এবং তাঁহাকেই যজ্ঞের উপযোগী হব্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইত। এই সকল কর্ম্মে তাঁহাকে যজুর্ম্মন্ত্র আওড়াইতে হইত। কাজেই অধ্বর্য্যু যজুর্ব্বেদী ঋত্বিক্। বড় বড় যজ্ঞে আহ্বানকর্ত্তা হোতার এবং আহুতিদাতা অধ্বর্য্যুর অন্যান্য সহকারী থাকিতেন। সাম গানের জন্য প্রধান ঋত্বিকের নাম উদ্গাতা। যজ্ঞবিশেষে তাঁহারও সহকারী আবশ্যক হইত। ঋগ্বেদী যজুর্ব্বেদী এবং সামবেদী এই তিন শ্রেণির ঋত্বিকের কর্ম্ম পরিদর্শনার্থ, তাঁহাদের ভুলভ্রান্তি সংশোধনার্থ, আর এক জন প্রধান ঋত্বিক্ থাকিতেন। তাঁহার নাম ব্রহ্মা। এক হিসাবে তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ। তিনি সকলের কর্ম্ম পরিদর্শন করিবেন। অতএব, তিন বেদেই তাঁহার অভিজ্ঞতা আবশ্যক। তিনি ত্রিবেদজ্ঞ হইবেন। ব্রহ্মা নামেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের সূচনা হইতেছে। কেন না, সে কালে বেদবাক্যের নামই ছিল ব্রহ্ম। ব্রহ্মবাক্যের তাৎপর্য্য যাহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বেদের সেই অংশের নাম ব্রাহ্মণ। যাঁহারা ব্রহ্মবাক্যের তাৎপর্য্য বুঝাইতেন, তাঁহারা ব্রহ্মবাদী। দেবপন্থী সমাজে যে বর্ণের লোকের উপর এই ব্রহ্মবাক্য রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল, সেই বর্ণের নামও ব্রাহ্মণ। অতএব, ঋত্বিক্গণের মধ্যে যিনি ত্রিবেদজ্ঞ এবং শ্রেষ্ঠ, তাঁহারই নাম ব্রহ্মা। যজ্ঞবিশেষে এই ব্রহ্মারও সহকারী আবশ্যক হইত।

যজ্ঞ মাত্রই কর্ম্ম এবং প্রত্যেক কর্ম্মেরই কোনও না কোনও ফল আছে। সেই ফল ইহলোকেও পাওয়া যাইতে পারে, পরলোকেও পাওয়া যাইতে পারে। কোন্ কর্ম্মের কি ফল, তাহা যুক্তির দ্বারা পাওয়া যায় না, তাহা বিচার করিয়া পাওয়া যায় না। কোন্ কর্ম্মের কোন্ ফল, তাহা ব্রহ্মবাদী ঋষিরা তাঁহাদের বিশিষ্ট শক্তির দ্বারা inspirationএর দ্বারা, জানিতে পারিতেন। যজমানের হিতার্থ যজ্ঞকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত। সপত্নীক যজমান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন; উভয়ে তুল্যরূপে ফলভাগী হইতেন। যজমানের পত্নী যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহাকে কোনও বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইত না। বেদমন্ত্র যথারীতি অভ্যাস করিতে হইলে আচার্য্য-গৃহে গিয়া বহু বৎসর বাস করিতে হইত। কিন্তু

স্ত্রীলোকের পক্ষে সেরূপ আচার্য্য গৃহবাসের সুবিধা বা সম্ভাবনা না থাকায় স্ত্রীজাতিকে ক্রমশঃ বেদমন্ত্র উচ্চারণের অধিকারে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। অতি প্রাচীন কালে দেখিতে পাই, নারীগণেও বেদমন্ত্র প্রচার করিতেছেন, নারীগণের মধ্যেও ঋষি আছেন, ব্রহ্মবাদিনী আছেন। এমন কি, আচার্য্য-গৃহে উপনীত হইয়া বেদের কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড আলোচনা করিতেছেন, এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। কিন্তু এ কালে যেমন licensed residence এ বাস না করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অধিকার জন্মে না, সেইরূপ বিনা উপনয়নে অর্থাৎ বিনা আচার্য্য গৃহবাসে বেদবিদ্যা লাভের সুযোগ না ঘটায় স্ত্রীলোকেরা ক্রমশঃ বেদাভ্যাসে সুযোগ ও বেদের উচ্চারণে অধিকার হারাইয়াছিলেন। বেদমন্ত্রের উচ্চারণ নিতান্ত সহজ কথা নহে। যথাযথ উচ্চারণ শিক্ষার জন্য শিক্ষা নামে একটা বেদাঙ্গ বিদ্যারই উদ্ভব হইয়াছিল। বিশেষতঃ বেদের ভাষা যখন অপ্রচলিত হইয়া পড়িল, তখন আচার্য্যের বিনা উপদেশে বেদমন্ত্রের যথাযথ উচ্চারণ হইতে পারিত না। আবার যথোচিত উচ্চারিত না হইলে বেদমন্ত্রের ফল পাওয়া যায় না। এমন কি, উল্‌টা ফল হইবারও আশঙ্কা থাকে। 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দের উচ্চারণ দোষে কিরূপ ফল বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, সে গল্প আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। যজমানের পত্নী বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে না পাইলেও বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মে তাঁহার পূরা অধিকার ছিল। কেন না, পত্নী উপস্থিত না থাকিলে যজ্ঞই চলিত না; পত্নীকেও কয়েকটি অনুষ্ঠান করিতে হইত; এবং যজমান-পত্নীও যজ্ঞফলের সমান ভাগ পাইতেন।

যজ্ঞের মধ্যে কতকগুলি নিত্য—কতকগুলি কাম্য। কাম্যকর্ম্ম স্বেচ্ছাধীন। যিনি বিশেষ কোনও ফল আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি তদনুযায়ী কাম্যকর্ম্ম করিবেন; না করিলে কোনও হানি নাই। কিন্তু নিত্যকর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য; না করিলে প্রত্যবায় ঘটে। কিন্তু সেই নিত্যকর্ম্ম সম্পাদনের জন্য কোনরূপ রাজদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না। সমাজে হয় ত নিন্দা হইত; সমাজে পাতিত্য হইত কি না, তাহা বলিতে পারি না। এ দেশের সমাজবিধি কাহাকেও জোর করিয়া কোনও কাজ করাইতে চাহে না। নিত্যকর্ম্ম না করিলে যে পাপ, কর্ম্মকর্ত্তা তার ফল ভোগ করিবে। অন্যের তাহাতে যায় আসে কি?

উপনয়নের পর ব্রহ্মচারী আচার্য্যের বাড়ীতে বাস করিতেন। আচার্য্যের বাড়ীতে অগ্নি থাকিত। উহা আচার্য্যের নিজস্ব অগ্নি। ব্রহ্মচারী প্রত্যহ

সন্ধ্যার সময় আচার্য্যের সেই অগ্নিতে একখানি কাঠ ফেলিয়া দিতেন। ইহাই তাঁহার সমিৎ হোম। যজ্ঞিয় কাঠের টুক্‌রার নাম সমিৎ। আচার্য্যগৃহে বেদাধ্যয়ন শেষ হইলে সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে অথবা সমাবর্ত্তনের পরে অগ্নি স্থাপন করিতে হইত। পত্নী-গ্রহণ কালে এই অগ্নিতেই লাজ-হোমাদি সম্পন্ন করিতে হইত। এই অগ্নির নাম গৃহ্য অগ্নি, আবসথ্য অগ্নি বা স্মার্ত্ত অগ্নি। গৃহস্থাশ্রমের সমুদায় স্মার্ত্তকর্ম্ম অর্থাৎ পাকযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান এই গৃহ্য অগ্নিতেই সম্পাদিত হইত।

এই পাকযজ্ঞ শব্দটির মানে বুঝা দরকার। এখনও গৃহস্থের ঘরে যাগ যজ্ঞ কিছু না কিছু অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্যামাপূজা প্রভৃতি তান্ত্রিক পূজায় হোমের অনুষ্ঠান হয়। এই হোম তান্ত্রিক হোম; ইহা বৈদিক যজ্ঞ নহে। হয় ত ইহা বৈদিক যজ্ঞের একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। কিন্তু এই তান্ত্রিক হোম ব্যতীত বৈদিক যজ্ঞ কিছু না কিছু আজিও প্রচলিত আছে। উপনয়ন বিবাহাদি সংস্কারে যজ্ঞ করিতে হয়। বৃষোৎসর্গাদি ব্যাপারে যজ্ঞ করিতে হয়। বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা জলাশয়প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পূর্ত্তকর্ম্মে যজ্ঞ করিতে হয়। এ সকল যজ্ঞ বৈদিক অনুষ্ঠান। বৈদিক অনুষ্ঠানের মধ্যে এগুলির নাম গৃহ্যকর্ম্ম বা স্মার্ত্তকর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণির বৈদিক কর্ম্ম ছিল; সেগুলির নাম শ্রৌতকর্ম্ম। অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞের নাম আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। এই সকল যজ্ঞ শ্রৌতযজ্ঞ। শ্রৌতকর্ম্ম উপদেশের জন্য এক প্রস্থ শাস্ত্র আছে, সেইগুলি শ্রৌতসূত্র। আর গৃহ্যকর্ম্ম উপদেশের জন্য আর এক প্রস্থ শাস্ত্র আছে, সেইগুলি গৃহ্যসূত্র। গৃহ্যসূত্রে উপদিষ্ট গৃহ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান এখনও আমরা করিয়া থাকি; এখনও উহা সমাজে চলিত আছে। কিন্তু শ্রৌতসূত্রের উপদিষ্ট শ্রৌতকর্ম্মের অধিকাংশই এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; এখন তাহাদের নাম মাত্র অবশিষ্ট আছে। খুব সম্ভব, বৌদ্ধবিপ্লব এজন্য দায়ী। বৌদ্ধবিপ্লবের সময়ে বড় বড় ক্ষত্রিয় রাজা, বড় বড় বৈশ্য শ্রেষ্ঠী, বৈদিক কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেন অথবা তাহাতে শ্রদ্ধা হারাইলেন। অনেকে গুরুগৃহে উপনয়নের পর বেদাভ্যাস ত্যাগ করিলেন; অর্থাৎ পৈতা ফেলিয়া দিয়া স্বেচ্ছায় শূদ্রাচার অবলম্বন করিলেন। আগে বলিয়াছি, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অনেকে শূদ্রত্ব প্রাপ্তির জন্য দুঃখিত, ও পুনরায় দ্বিজত্ব পাইবার জন্য সচেষ্ট; তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরাই তাঁহাদের এই শূদ্রত্বের জন্য সম্ভবতঃ দায়ী। যাজকতা ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের জীবিকা লোপের উপক্রম হইল। অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, যাহারা বড় লোকের ঘরে যাজকতা করিয়া

জীবিকা লাভ করিত, তাহাদের অন্ন লোপের উপক্রম হইল। আচার্য্যগৃহে বহু বৎসর বাস করিয়া বেদের কর্ম্মকাণ্ড অভ্যাসের প্রয়োজন থাকিল না। বহু বৎসর ধরিয়া বেদাভ্যাস বা ব্রহ্মচর্য্য, পূর্ব্বে যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল, প্রয়োজনের অভাবে তাহা ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়িল। উপনয়ন এবং সমাবর্ত্তন কর্ম্মের নাম মাত্র থাকিল; সার্থকতা থাকিল না। ফলে, অভিজ্ঞ যাজকের অভাবে জটিল শ্রৌত অনুষ্ঠানগুলিও অপ্রচলিত অথবা একবারেই লুপ্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু বেদপন্থী ব্রাহ্মণ বেদকে একবারে ত্যাগ করিতে পারিলেন না; অন্ততঃ গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলিকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। অগ্নিহোত্র অগ্নিষ্টোমাদি শ্রৌত যজ্ঞ প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কুশণ্ডিকাদি গৃহ্য যাগ এখনও এখনকার দ্বিজাতি সমাজে চলিত আছে।

গৃহ্য অগ্নির কথা বলিতেছিলাম। এই অগ্নিতে যাবতীয় গৃহ্য কর্ম্ম অর্থাৎ যাবতীয় গৃহ্যসূত্রোক্ত কর্ম্মের নির্ব্বাহ হয়। গৃহ্য অগ্নি সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিবার দরকার নাই। যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে শ্রৌত অগ্নির কথা এবং শ্রৌত অগ্নিতে সম্পাদ্য শ্রৌত যজ্ঞের কথা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। এই জন্য আপনাদের ধৈর্য্য ভিক্ষা করিতেছি।

এই শ্রৌত অগ্নির ব্যাপার বেদপন্থীর গার্হস্থ্য জীবনে একটা বৃহৎ ব্যাপার। গার্হস্থ্য জীবনের সম্পূর্ণতা লাভ জন্য এই শ্রৌত অগ্নির আবশ্যকতা। কিন্তু শ্রৌত অগ্নি বিবাহের পর স্থাপনীয়। যিনি অবিবাহিত, তাঁহার শ্রৌত অগ্নি স্থাপনে অধিকার নাই। বিবাহের পর গৃহস্থের নাম হইত গৃহপতি। বাড়ীর মধ্যে কোনও স্থানে অগ্নিশালা বা অগ্ন্যগার স্থায়ীভাবে নির্ম্মিত হইত। সপত্নীক গৃহস্থ সেই অগ্ন্যগার মধ্যে যথাবিধি শ্রৌত অগ্নি স্থাপন করিতেন। এই অগ্নি প্রতিষ্ঠা কর্ম্মের নাম অগ্ন্যাধান বা অগ্ন্যাধেয়। সংক্ষেপে উহার বিবরণ দিতেছি।

আপনারা তিন অগ্নির নাম শুনিয়াছেন। গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি। এই তিন অগ্নিই শ্রৌত অগ্নি। অগ্নিশালায় চতুষ্কোণ বেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার তিন দিকে তিন অগ্নির স্থাপন হইত। বেদির পশ্চিমে গার্হপত্যের স্থান, বেদির পূর্ব্ব দিকে আহবনীয়ের স্থান, এবং দক্ষিণ দিকে দক্ষিণাগ্নির স্থান। মাটির বেড়া দিয়া অগ্নির স্থান নির্ম্মিত হইত। গার্হপত্যের স্থান চতুর্ভুজাকার, আহবনীয়ের স্থান বৃত্তাকার, দক্ষিণাগ্নির স্থান অর্দ্ধবৃত্তাকার। তিনেরই ক্ষেত্রফল বা area সমান। এক হাত দীর্ঘ, এক হাত বিস্তৃত, ক্ষেত্রের সমান।

গার্হপত্য অগ্নি গৃহপতির অগ্নি, উহা গৃহপতির প্রতিনিধি স্বরূপ। এই অগ্নিকে গৃহের কর্ত্তা বলা যাইতে পারে। আহবনীয় অগ্নি দেবতাদিগের অগ্নি; উহাতেই দেবতাদের উদ্দেশে যাবতীয় দ্রব্যের আহুতি হয়। আহুতি হয় বলিয়াই নাম আহবনীয়। দেবতারা পূর্ব্ব দিকের অধিবাসী, দেবতাদের রাজা ইন্দ্র পূর্ব্ব দিকের অধিপতি। আজিও আমরা পূর্ব্ব মুখে বসিয়া দেবতাদের পূজা করি। এইজন্য আহবনীয়ের স্থান পূর্ব্ব দিকে। দক্ষিণ দিক পিতৃগণের। পিতৃগণের রাজা যম দক্ষিণ দিকের অধিপতি। দক্ষিণাগ্নিতে পিতৃগণের উদ্দিষ্ট দ্রব্য দেওয়া হয়। অগ্ন্যাধান কর্ম্মের পূর্ব্ব দিনে দেহশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত এবং বৃদ্ধি শ্রাদ্ধাদি মাঙ্গলিক কার্য্য করিয়া যজমান কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হন। অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ বিহিত স্থান হইতে আগুন আনিয়া গার্হপত্যের স্থানে রাখিয়া দেন। সন্ধ্যাকালে গৃহস্থ ও তাঁহার পত্নী অগ্নিশালায় প্রবেশ করিয়া সেই খানেই রাত্রিবাস করেন। এমন এক কাল ছিল, যখন কাঠে কাঠে ঘষিয়া আগুন করিতে হইত। যজ্ঞকর্ম্মের সেই প্রাচীন প্রথা পরিত্যক্ত হয় নাই। ইহাকে বলে survival in culture; সামাজিক অনুষ্ঠানে বিশেষতঃ সামাজিক ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠানে কোনও দেশেই লোকে প্রাচীন প্রথা সহজে ত্যাগ করিতে চাহে না। পুরাতনের মোহ কাটাইতে চায় না। শমীবৃক্ষের পরগাছারূপে যে অশ্বত্থ গাছ জন্মে, উহার কাঠ ঘষিলে সহজে আগুন জন্মে। ঐ কাঠে দুই খানি অরণি প্রস্তুত হয়। অরণিদ্বয় অগ্নিশালাতেই রাত্রির মত রক্ষিত হয়। গার্হপত্যে যে আগুন রাখা হইয়াছিল, তাহাতে সমিৎ অর্থাৎ কাষ্ঠখণ্ড প্রক্ষেপ করিয়া জ্বালাইয়া রাখিতে হয়। যজমান রাত্রি জাগিয়া উহা জ্বালাইয়া রাখেন। প্রাতঃকালে অধ্বর্য্যু সেই অগ্নি নিবাইয়া দেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরণি ঘর্ষণের দ্বারা নূতন আগুন উৎপাদন করিতে হয়। এই কর্ম্মের নাম অগ্নিমন্থন। অগ্নিমন্থনের পূর্ব্বে একটি ঘোড়া আনিয়া রাখিতে হয়। যজমান একখানি অরণি ধরিয়া বসেন। দ্বিতীয় অরণি দ্বারা প্রথমে তাঁহার পত্নী, পরে অধ্বর্য্যু, অগ্নি উৎপাদন করেন। মাটীর খাপরায় গোবরের ঘুঁটা রাখিয়া তাহাতেই সেই মন্থনোৎপন্ন অগ্নি গ্রহণ করা হয়। যজমান উহাতে ফুঁ দিয়া জ্বালাইয়া দেন। অধ্বর্য্যু সেই আগুনে যজ্ঞিয় কাঠ জ্বালাইয়া গার্হপত্যে রাখেন। ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক সেই সময়ে সাম গান করেন। গার্হপত্যের অগ্নি লইয়া অধ্বর্য্যু আহবনীয় স্থানে চলেন। ঘোড়াটি আগে আগে চলে। যজমান চলেন ঘোড়ার পশ্চাতে। ব্রহ্মা সাম গাইতে থাকেন। আহবনীয়ের স্থানে একটি পা রাখিয়া ঘোড়াটি পশ্চিম মুখে

দাঁড়াইয়া থাকে। ঘোড়ার সেই পায়ে সেই অগ্নি স্পর্শ করাইয়া অধ্বর্য্যু সেই আগুন আহবনীয়ে রাখিয়া দেন। ব্রহ্মা তখন আবার সাম গান করেন। এইরূপে গার্হপত্য এবং আহবনীয় অগ্নির স্থাপন হইলে অধ্বর্য্যু পুনরায় গার্হপত্য হইতে আগুন লইয়া দক্ষিণাগ্নির স্থানে রাখিয়া দেন। এইরূপে তিন অগ্নি স্থাপনের পর ব্রহ্মা তিন বারে তিনটি সামগান করেন। তৎপরে সকলে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া ঘোড়াটিকে ছাড়িয়া দেন। তৎপরে পূর্ণাহুতি হোম। গার্হপত্যের আগুনে খানিকটা ঘি গরম করা হয়। অধ্বর্য্যু জুহু নামক কাঠের হাতা দ্বারা সেই ঘি লইয়া আহবনীয়ের পার্শ্বে বসিয়া যজুর্মন্ত্র পড়িয়া আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দেন। যজমান তাহাকে স্পর্শ করিয়া থাকেন। ইহাই হইল পূর্ণাহুতি। এই পূর্ণাহুতিতেই অগ্ন্যাধান কর্ম্ম সমাপ্ত হয়। অগ্ন্যাধানের পর কয়েক দিন যজমান ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম অবলম্বন করিয়া থাকেন। গার্হপত্যের আগুন দিবা-রাত্রি জ্বলিতে থাকে। উহাকে নিবাইতে দেওয়া হয় না। উহা নিবাইলে প্রত্যবায় ঘটে। আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি দিবারাত্রি জ্বলে না, আবশ্যক মত গার্হপত্য হইতে আগুন আনিয়া ঐ দুই অগ্নি জ্বালান হয়, এবং তাহাতে দেবতাগণের উদ্দেশে বা পিতৃগণের উদ্দেশে যাগ হয়।

এই অগ্ন্যাধান কর্ম্ম যজমানের জীবনে অতি প্রধান কর্ম্ম। অগ্ন্যাধানের পর তাঁহার বিশেষণ হয় আহিতাগ্নি। আহিতাগ্নি গৃহস্থ ষোল আনা গৃহস্থ। অগ্ন্যাধানের পর তিনি যাবতীয় শ্রৌত কর্ম্মে, যাবতীয় দেবযজ্ঞে এবং পিতৃযজ্ঞে, অধিকার লাভ করেন। দেবগণ এবং পিতৃগণ অলক্ষ্য ভাবে মানুষের মর্ত্ত্য-জীবনের নিয়ামক, শুভাশুভ ফলদাতা। আগেই বলিয়াছি, দেবগণ মনুষ্য-দত্ত হব্যভোজনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। পিতৃগণ স্বধাভোজনের প্রয়াসী। দেবগণের নিকট এবং পিতৃগণের নিকট মানুষের ঋণ আছে, সেই ঋণ মোচন করিয়া না দিয়া যাইতে পারিলে মানব জীবন অসম্পূর্ণ থাকে। অতএব জীবনের সম্পূর্ণতা বিধানের জন্য দেবগণের এবং পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিতেই হইবে। অতএব, গৃহস্থের পক্ষে আহিতাগ্নি হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ অগ্নির দ্বারা দেবগণের এবং পিতৃগণের প্রাপ পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। অগ্নি নিজেও একজন দেবতা এবং তিনি দেবগণের পুরোহিত। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম ঋক্‌টিই স্মরণ করিবেন, অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতম্, যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্, হোতারং রত্নধাতমম্। অগ্নি দেবগণের পুরোহিত, তিনিই হোতা নামক ঋত্বিক্ অর্থাৎ তিনিই দেবগণকে আহ্বান করিয়া যজ্ঞস্থলে ডাকিয়া আনেন; তিনিই দেবগণের

মুখ; তাঁহার মুখে হব্য দান করিলে দেবগণকে দেওয়া হয়। তিনিই হব্যবহ; দেবগণের জন্য হব্য বহন করিয়া লইয়া যান। গার্হপত্য অগ্নি বস্তুতঃ এক পক্ষে গৃহস্থের, অন্য পক্ষে দেবগণের মধ্যবর্ত্তী। তিনিই গৃহস্থালীর এক রকম কর্ত্তা এবং শুভাশুভ দাতা। অতএব গার্হপত্য অগ্নিকে সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে।

মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এখানে বলিবেন, অগ্নির মাহাত্ম্য কেবল বেদ-পন্থী সমাজের একচেটিয়া নহে; অন্যান্য দেশে ও অন্যান্য সমাজেও অগ্নির দেবত্ব স্বীকৃত হয়। অগ্নিমুখেই যে দেবতারা খাদ্য গ্রহণ করেন, তাহা অনুমান করিবার প্রচুর কারণ আছে। দেবতারা সূক্ষ্মশরীরী, তাঁহারা স্থূল অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না। কোনও দ্রব্য আগুনে ফেলিলে তাহা ধূমে বাষ্পে বায়ুতে পরিণত হয়। এইরূপে সূক্ষ্মতা পাইলে উহা দেবতাদের সূক্ষ্ম দেহের উপযোগী হয়। দেবতারা ঊর্দ্ধলোকে বাস করেন। অগ্নিশিখা স্বভাবতঃ ঊর্দ্ধমুখী, উহা ধূম এবং বাষ্পরূপে ঊর্দ্ধমুখে উঠিয়া দেবতাদের খাদ্য দেবতা-দিগকে পৌঁছাইয়া দেয়। বিশেষতঃ, আর্য্যজাতির মধ্যে অগ্নির মাহাত্ম্য বিশেষ বলবৎ ছিল। পণ্ডিতেরা হয় ত বলিবেন, আর্য্যজাতি এক কালে শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী ছিলেন; সেইজন্য তাঁহাদের নিকট অগ্নির এত মাহাত্ম্য। বাল গঙ্গাধর টিলক মহাশয় হয় ত বলিবেন, এই অগ্নিমাহাত্ম্য আর্য্যজাতির সুমেরুপ্রদেশে বাসেরই সমর্থন করিতেছে। যেখানে ছয় মাস ধরিয়া রাত্রি সেইখানে আগুনের সমাদর এবং চব্বিশ ঘণ্টা আগুন জ্বালিয়া রাখার বিশেষ ব্যবস্থা না করিলে চলিবে কেন? কাস্পীয় সাগরের তীরে বহু প্রদেশে কেরোসীন তেলের আকর আছে। ভূগর্ভ হইতে সর্ব্বদা কেরোসীনের বাষ্প উদ্গত হয় এবং আপনা হইতে জ্বলিয়া উঠে। সে দেশের লোকের পক্ষে অগ্নিপূজা স্বাভাবিক। এখনও সেই দেশে অগ্নির মন্দির দেখা যায়। যাঁহারা মনে করেন, আর্য্যজাতি এক কালে মধ্য এশিয়ায় বাস করিতেন, তাঁহারা এই অনুমানে খুসী হইবেন। গ্রীক এবং রোমানেরা আমাদের জ্ঞাতি ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যেও অগ্নিপূজার প্রচলন ছিল, তাহা আপনারা জানেন। প্রাচীন গ্রীকদের অগ্নি-দেবতার নাম Hestia প্রত্যেক গ্রীক গৃহস্থের ঘরে ঘরে অগ্নিশালা থাকিত। সেখানে অগ্নি রক্ষিত হইতেন ও পূজা পাইতেন। গ্রীকেরা যখন নিজের দেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিতে যাইতেন, তখন আপন গৃহস্থিত অগ্নি সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এইরূপে উপনিবেশের সহিত মাতৃভূমির

সম্বন্ধ পাকা হইত। গ্রীকদের মধ্যে যিনি Hestia, রোমানদের মধ্যে তাঁহার নাম Vesta ; Vesta দেবতা রোম নগরের রোমের রাষ্ট্রের রক্ষাকর্ত্রী ছিলেন। সাধারণ স্থানে তিনি পূজা পাইতেন। কয়েক জন কুমারী অগ্নিরক্ষার্থ নিযুক্ত হইতেন। তাঁহাদিগকে কৌমার ধর্ম্ম পালন করিতে হইত। তাঁহাদের কতগুলি বিশেষ অধিকার ছিল। সর্ব্বসাধারণের নিকট তাঁহারা বিশেষ সম্মান পাইতেন। পারস্যবাসী ইরাণীদের কথা বলা অনাবশ্যক। প্রাচীন ইরাণী সমাজের সহিত প্রাচীন বেদপন্থী সমাজের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তাঁহারা আমাদের মতই যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন, ইহা আপনারা সকলেই জানেন।

অগ্ন্যাধান অনুষ্ঠানে একটি ঘোড়ার দরকার হইত, ইহা বলিয়াছি। এই ঘোড়াটির তাৎপর্য্য কি, বলা কঠিন। মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইহার কি তাৎপর্য্য বাহির করিবেন, তা জানি না। শুনিতে পাই, ঘোড়ার সহিত আর্য্য-জাতির একটি বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। আর্য্যজাতি নাকি প্রথমে বুনো ঘোড়াকে পোষ মানাইয়া মানুষের ব্যবহার্য্য করিয়াছিলেন, domesticate করিয়াছিলেন। মধ্যএশিয়ার ক্যাস্পীয় এবং আরাল সাগরের তীরবর্ত্তী steppes জমীতে প্রচুর ঘাস হয়। এখনও হয়, পূর্ব্বে আরও হইত।

সেই জমি অশ্বপালনের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। আর্য্যগণ ঘোড়ায় চড়িয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন। ইউরোপে এবং অন্যান্য দেশে তাঁহারাই প্রথমে ঘোড়ার আমদানি করেন। ভারতবর্ষে তাঁহারা অশ্বারোহী হইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, মনে করা যাইতে পারে। তাঁহাদের গার্হস্থ্য জীবনের আরম্ভসূচক প্রথম অনুষ্ঠানে হয় ত এই জন্যই ঘোড়া আনিতে হইত। আমার এই অনুমানে আপনারা হয় ত হাসিবেন। ইহা নিশ্চয়ই একটা survival. অগ্ন্যাধানে ঘোড়ার উপস্থিতির একটা কিছু সার্থকতা অতি পূর্ব্বে ছিল। পরবর্ত্তী কালে তাহার তাৎপর্য্য লোকে ভুলিয়া গেল, কিন্তু প্রথাটা থাকিয়া গেল। পুরাতন বৈদিক সাহিত্যে সূর্য্যের সহিত ঘোড়ার তুলনা বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ম্যাকডোনেল তাঁহার Vedic Mythologyতে বহু দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; আপনারা দেখিতে পারেন। সূর্য্য বেদপন্থী সমাজের অতি প্রাচীন দেবতা। তিনি ত সাত ঘোড়ার রথে চড়িয়া দিগ্বিজয়ী বীরপুরুষের মত আকাশপথে ভ্রমণ করেন। তিনি নিজেই যেন ঘোড়া। সূর্য্যের অশ্বরূপ বর্ণনা প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। একবার ত্বষ্টার সহিত তাঁহার জামাতা সূর্য্যের ঝগড়া হইয়াছিল। ছায়া এবং সংজ্ঞাঘটিত সেই

গল্প আপনারা জানেন। সূর্য্য সেখানে অশ্বমূর্ত্তি ধরিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া সূর্য্য যখন ঋষিকে নূতন যজুর্ব্বেদ দান করিয়াছিলেন, তখনও তিনি বাজী বা অশ্বরূপে ঋষিকে দেখা দিয়াছিলেন। অগ্ন্যাধান কর্ম্মে ঘোড়াটি প্রথমে পূর্ব্ব মুখে চলে, তাহার পর আহবনীয়ে উপস্থিত হইয়া পশ্চিম মুখে দাঁড়ায়, এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসে। অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই ঘোড়া সেখানে সূর্য্যেরই কল্পিত প্রতিনিধি, এবং ঘোড়াটির যাতায়াত সূর্য্যেরই দৈনিক আবর্ত্তনসূচক। এই অনুমানটাও আমি ছাড়িয়া দিলাম, আপনারা ইচ্ছা হয় লইবেন।

অগ্ন্যাধানের পর আহবনীয় অগ্নিতে প্রতি দিন অগ্নিহোত্র যাগ করিতে হইত। এই অগ্নিহোত্র যাগ নিত্যকর্ম্ম। ইহা না করিলেই নয়। আহবনীয় অগ্নিতে প্রাতে একবার এবং সন্ধ্যায় একবার আহুতি দিতে হইত। প্রাতঃকালে সূর্য্যের উদ্দেশে এবং সন্ধ্যায় অগ্নির উদ্দেশে আহুতি দিতে হইত। ইহাই অগ্নিহোত্র। সূর্য্য এবং অগ্নি উভয়েই জ্যোতিঃস্বরূপ। যেন একই দেবতার দুই মূর্ত্তিভেদ। অগ্নির স্থল পৃথিবী লোক, এবং সূর্য্যের স্থল দ্যুলোক। এই দুই দেবতাকে আহুতি দিলে সকল দেবতাকেই এক রকম তৃপ্ত করা হয়। কেন না, সকল দেবতাই জ্যোতিঃস্বরূপ। এইরূপে সূর্য্যের সহিত অগ্নির সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। অগ্ন্যাধান অনুষ্ঠানে ঘোড়ার পায়ে অগ্নি স্পর্শ করিয়া সেই অগ্নির প্রতিষ্ঠার মূল এইরূপে পাওয়া যাইতে পারে।

অগ্নিহোত্রের কথা বলিতে চাহি। আহিতাগ্নি গৃহস্থ প্রত্যহ সন্ধ্যায় ও প্রাতে শ্রৌত অগ্নিতে অগ্নিহোত্র সম্পাদন করেন। ইহা গৃহস্থের নিজের কাজ। অশক্ত পক্ষে প্রতিনিধির দ্বারা চলিতে পারে। পুত্র, ভ্রাতা, ভাগিনেয়, জামাতা প্রভৃতি প্রতিনিধি হইতে পারে। অধ্বর্য্যু দ্বারাও চলিতে পারে। স্বয়ং আহুতি দিলে যে ফল, প্রতিনিধির দ্বারা দিলে ফল তার চেয়ে অল্প। অগ্নিহোত্র সম্পাদনের জন্য গৃহস্থ ঘরে একটী গাভী থাকিত, তাহার নাম অগ্নিহোত্রী গাভী। প্রাতে এবং সন্ধ্যায় সেই গাভীর দুধ লইয়া মাটির মালসায় রাখিয়া গার্হপত্যের আগুনে তপ্ত করিতে হয়। আহুতির জন্য দুইখানি কাঠের হাতা দরকার। একখানি ছোট হাতা, তাহার নাম স্রুব। একখানি বড় হাতা, তাহার নাম অগ্নিহোত্রহবনী। মালসার দুধ স্রুব দ্বারা চারি বারে অথবা পাঁচ বারে লইয়া অগ্নিহোত্র হবনীতে ঢালিতে হয় এবং সেই অগ্নিহোত্র হবনীর দুধ অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে পত্নী সহিত গৃহস্থ অগ্নি-

শালায় প্রবেশ করিয়া গার্হপত্য হইতে জ্বলন্ত অগ্নি লইয়া আহবনীয় অগ্নি এবং দক্ষিণাগ্নি জ্বালাইয়া দেন। পরে গার্হপত্যের আগুনে দুধ জ্বাল দিয়া সে দুধ যথাবিধি স্রুবদ্বারা অগ্নিহোত্র হবণীতে গ্রহণ করেন। তার পর আহবনীয় অগ্নিতে একখানি সমিৎ বা কাঠ ফেলিয়া দেন। সে কাঠ জ্বলিয়া উঠিলে অগ্নিহোত্র হবনীর দুধ আহবনীয় অগ্নিতে দুই বার আহুতি দেন। প্রথম আহুতি অগ্নির উদ্দিষ্ট। উহার মন্ত্র ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ অগ্নির্জ্যোতিঃ জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা। দ্বিতীয় আহুতির দেবতা প্রজাপতি। প্রজাপতিকে ধ্যান করিয়া বিনা মন্ত্রে আহুতি দিতে হয়। সমস্ত দুধ আহুতি দিতে নাই। একটু হবিঃশেষ রূপে থাকে। আহুতিদাতা তাহা ভক্ষণ করেন। আহবনীয়ে আহুতি হইলে গার্হপত্যে এবং দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। এবার অগ্নিহোত্র হবনীর দরকার হয় না। ছোট হাতাখানি দিয়া মালসা হইতে কিঞ্চিৎ দুধ লইয়া জ্বলন্ত অগ্নিতে ফেলিতে হয়। গার্হপত্যে প্রথম আহুতির দেবতা অগ্নি গৃহপতি; দ্বিতীয় আহুতির দেবতা প্রজাপতি। দক্ষিণাগ্নিতে প্রথমাহুতির দেবতা অগ্নি অন্নপতি; দ্বিতীয় আহুতির দেবতা প্রজাপতি। প্রত্যেক আহুতি জ্বলন্ত সমিধের উপর অর্পণ করিতে হয়। আহুতিদানের পর হবিঃশেষ ভক্ষণ করিয়া প্রত্যেক অগ্নিতে তিন তিনটি সমিৎ ফেলিয়া এবং তিন অগ্নির উপস্থান করিয়া গৃহস্থ অগ্নিশালা হইতে বাহির হইয়া আসেন। এই হইল সায়ংকালের অগ্নিহোত্র। প্রাতঃকালের অগ্নিহোত্রের বিধি সায়ংকালেরই মত; কেবল দেবতা অগ্নির বদলে সূর্য্য। আহুতির মন্ত্র ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ সূর্য্যোজ্যোতিঃ জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ স্বাহা। সন্ধ্যার অনুষ্ঠান সূর্য্য অস্ত গেলে অনুষ্ঠেয়। প্রাতঃকালের অনুষ্ঠান কাহারও মতে সূর্য্যোদয়ের পর, কাহারও মতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনেক বিতণ্ডার পর সূর্য্যোদয়ের পরেই অগ্নিহোত্রের সমর্থন করিয়াছেন।

অগ্নিহোত্র নিত্যকর্ম্ম। ইহা না করিলেই নয়। গৃহস্থ প্রবাসে থাকিলেও তাঁহার প্রতিনিধি ইহা সম্পাদন করিবেন। এমন কি, বিপত্নীক গৃহস্থেরও অগ্নিহোত্র করিতে হইবে কি না, তাহা লইয়া তর্ক আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন। পত্নীর মৃত্যুর পর অগ্নিহোত্র নষ্ট হয়। সেখানে অগ্নিহোত্রের কি ব্যবস্থা হইবে, এই প্রশ্ন ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তুলিয়াছেন। উত্তরে বলিতেছেন, গৃহস্থ যদি পুনরায় বিবাহ না করেন, তাহা হইলে তিনি পুত্র পৌত্র বা দৌহিত্রকে অনুমতি দিতে পারেন; সে অনুমতি পাইয়া তাঁহারাই অগ্নিহোত্র চালাইবেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ আর এক স্থলে প্রশ্ন করিতেছেন,

বিপত্নীক ব্যক্তি অগ্নিহোত্র আহরণ করিবে কি করিবে না? উত্তরে বলিতেছেন, আহরণ করিবে। কেন না, ঋণ পরিহারের জন্য যাগ করিবে, এই শ্রুতি-বচন রহিয়াছে। আপনারাও সেই শ্রুতি বাক্য শুনিয়া থাকিবেন। জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণঃ ত্রিভিঃ ঋণবান্ জায়তে। ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যো প্রজয়া পিতৃভ্যঃ এষ বা অনৃণো যঃ পুত্রী যজ্বা ব্রহ্মচারী। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ জন্ম মাত্রই তিনটা ঋণে আবদ্ধ হয়। ঋষিগণের ঋণ ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের দ্বারা, দেবগণের ঋণ যজ্ঞের দ্বারা, পিতৃগণের ঋণ পুত্রোৎপাদনের দ্বারা শোধ করিতে হয়। এইরূপে যাহার পুত্র আছে, যে যজ্ঞ করে এবং যে ব্রহ্মচারী, সে ঋণমুক্ত হয়। অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সেই দেব-ঋণ মোচনের জন্য অত্যাবশ্যক।

অগ্নিহোত্র যজ্ঞ নিত্য কর্ম্ম; না করিলেই নয়। অতএব ইহা সকলের পক্ষে সুসাধ্য হওয়া উচিত। ইহাতে অধিক সময় লাগে না। অধিক সরঞ্জাম বা ব্যয়-বিধান আবশ্যক হয় না। যৎকিঞ্চিৎ দুধ থাকিলেই আহুতির কাজ চলিয়া যায়। যদি কোনও কারণে দুধ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে একটু দধি বা দুটি চাউল বা অন্য কিছু আহুতি দিলেও চলে। যদি কোনও দ্রব্যই না পাওয়া যায়, তাহা হইলেও অগ্নিহোত্র বর্জ্জন চলিবে না। অহং শ্রদ্ধাং জুহোমি—আমি শ্রদ্ধাই আহুতি দিতেছি, এই মন্ত্রে সঙ্কল্প করিয়া শ্রদ্ধা হোম করিবে। এই শ্রদ্ধাহোমের নামান্তর ভাবনা হোম বা মানসিক অগ্নিহোত্র। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এক স্থানে বলিতেছেন, শ্রদ্ধাই যজমানের পত্নী স্বরূপ এবং সত্যই যজমান স্বরূপ। শ্রদ্ধা এবং সত্য একযোগে মিথুন হয়। মানসিক অগ্নিহোত্রে শ্রদ্ধা এবং সত্য এই মিথুনের সাহায্যে স্বর্গলোক জয় করা হয়। শ্রদ্ধাহোমে কোনও পার্থিব দ্রব্যের প্রয়োজন হয় না। কোনরূপ দক্ষিণাও দিতে হয় না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, শ্রদ্ধাহোমে মনুষ্যগণ, দেবগণ, এমন কি সমুদায় জাগতিক দ্রব্যই, দক্ষিণাস্বরূপ। সন্ধ্যাকালে শ্রদ্ধাহোমে যজমান মনুষ্যগণকে দেবতার হস্তে দক্ষিণারূপে অর্পণ করেন। মনুষ্যেরা তখন নিষ্ক্রিয় হইয়া দেবগণের অধীন হইয়া পড়ে। আর প্রাতঃকালে শ্রদ্ধাহোমে যজমান দেবগণকেই দক্ষিণারূপে মনুষ্যের হস্তে অর্পণ করেন, তাই দেবতারা দিনের বেলায় মনুষ্যের অধীন হইয়া মনুষ্যের হিতসাধন করেন।

ব্রহ্মবাদীদের এই উক্তি হইতে আপনারা অগ্নিহোত্রের মাহাত্ম্য কতকটা বুঝিতে পারিবেন। অগ্নিশালায় অগ্নি অত্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষা করিতে হইত এবং সেই অগ্নি যাহাতে নষ্ট বা অশুচি না হইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

কোনরূপে অশুচি ঘটিলে তদনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। একবারে নষ্ট হইয়া গেলে পুনরায় নূতন করিয়া অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিতে হইত। অগ্ন্যাধান অনুষ্ঠানের কথা আগে বলিয়াছি। অগ্নির পুনরাধান অনুষ্ঠানও তদনুরূপ। মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই অগ্নি-ভক্তির মূল অন্বেষণ করিতে গিয়া হয় ত বলিবেন যে, এই অনুষ্ঠান মানুষের আদিম অসভ্য অবস্থার পরিচয় দেয় মাত্র। যে কালে সহজে অগ্নি উৎপাদনের উপায় ছিল না, তখন সর্ব্বদা বাড়ীর মধ্যে আগুন রাখিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না করিলে চলিত না। এখনও আমাদের পল্লীগ্রামে যেখানে দেয়াশালাইএর বাক্স এখনও প্রবেশ লাভ করে নাই, সেখানে আগুন রক্ষার জন্য মালসা জাগানর প্রথা আছে। মানুষের অসভ্য অবস্থায় এইরূপে অগ্নিরক্ষাটা প্রত্যেক গৃহস্থের religious duty করা হইয়াছিল। নতুবা হঠাৎ আগুনের দরকার হইলে আগুন পাওয়া যাইবে কিরূপে? অগ্ন্যাধান এবং অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের মূল এইরূপ হইতে পারে। তাহাতে লজ্জিত বা দুঃখিত হইবার কোনও প্রয়োজন নাই। মানুষ নিজে বানর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে যদি মানুষের লজ্জার বিষয় না থাকে, তাহা হইলে সভ্য মানুষের ধর্ম্মানুষ্ঠানও যদি অসভ্য মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে লজ্জার কারণ দেখি না। বেদপন্থী সমাজের যে অবস্থার কথা বলিতেছি, সে সময়ে বেদপন্থী মানুষ অসভ্য ছিল না, ইহা নিশ্চয়। সে সময়ের অনুষ্ঠানগুলির গোড়ার তাৎপর্য্য যাহাই হউক, তৎকালে অন্যরূপ তাৎপর্য্য আরোপিত হইয়াছিল, এবং তৎকালে যে তাৎপর্য্য দেওয়া হইত, তাহাই সে কালের সামাজিক এবং গার্হস্থ্য জীবনের নিয়ামক ছিল। অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানকে সে কালের লোকে কি চোখে দেখিতেন, তাহার পরিচয় আপনারা পাইলেন। আপনারা দেখিলেন, এই গৃহস্থিত অগ্নি যেন সমস্ত গৃহস্থালীর একটা symbol। এই অগ্নিকে অবলম্বন করিয়া গৃহস্থালী ধৃত ছিল। তিন অগ্নির মধ্যে গার্হপত্য অগ্নি গৃহপতির প্রতিনিধি স্বরূপ। এক পক্ষে গৃহস্থ এবং অন্য পক্ষে দেবগণ এবং পিতৃগণের মধ্যে তিনি মধ্যস্থতা করেন। গার্হপত্যের অগ্নি তুলিয়াই আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি জ্বালা হয়। আহবনীয় অগ্নি দেবগণের মুখ এবং দক্ষিণাগ্নি পিতৃগণের মুখ। এই মুখ দ্বারা তাঁহারা গৃহস্থের নিকট আপনাদের প্রাপ্য গ্রহণ করেন, এবং তদ্বিনিময়ে গৃহস্থের কল্যাণসাধনে তৎপর থাকেন। বেদপন্থী সমাজের থিয়োরি মতে সমাজ কতকগুলি গৃহের সমষ্টি মাত্র। গৃহটাই সমাজের unit। আর যিনি গৃহস্থ, তিনি সেই গৃহের সাময়িক রক্ষাকর্ত্তা মাত্র। গৃহস্থের পার্থিব

জীবন দিন কয়েকের জন্য। তিনি সেই কয়েকটা দিন আপনার কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিয়া যান, পুত্র পৌত্রাদির উপর গৃহরক্ষার ভার পড়ে। গৃহটাই স্থায়ী; গৃহস্থ পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে গৃহস্থালীর ধারা রক্ষা করেন। গৃহস্থের যে ধনসম্পত্তি, যাহা তিনি দেবগণের বা পিতৃগণের প্রসাদে ভোগ করিতেছেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব নহে। তিনি তাহার রক্ষাকর্ত্তা মাত্র। পিতৃপিতামহ হইতে তিনি তাহা পাইয়াছেন, এবং পুত্র পৌত্রাদিকে তাহার অধিকার ছাড়িয়া দিতে তিনি বাধ্য আছেন। সেই ধনসম্পত্তি নষ্ট করিবার তাঁহার অধিকার নাই। কেন না, তিনি উহার রক্ষাকর্ত্তা মাত্র। সেই পৈত্রিক সম্পত্তি নিজের জীবনে তিনি ভোগ করেন বলিয়াই তিনি অন্ততঃ পিতা পিতামহ প্রপিতামহ এই তিন পুরুষকে পিণ্ডদান করেন, এবং আপনার জীবনান্তে পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র এই তিন পুরুষের নিকট পিণ্ডের দাবী করেন। এই দক্ষিণাগ্নিতে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপে এই অগ্নির সাহায্যে গৃহের অবিচ্ছিন্ন ধারা রক্ষিত হইয়া থাকে। এই হিসাবে দেখিলে এই অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানকে গৃহস্থের পক্ষে কেবল ব্যক্তিগত ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া সঙ্কীর্ণ ভাবে লওয়া যাইতে পারে না। এই অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান প্রকৃত পক্ষে সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। অগ্নির দ্বারাই গৃহস্থের সহিত সমাজের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অগ্নি রক্ষা করেন বলিয়াই তিনি ধনসম্পত্তি ভোগে অধিকারী এবং ধনসম্পত্তির অধিকারী বলিয়াই সমাজের অন্যান্য গৃহস্থের সহিত তাঁহার আদান প্রদানের সম্বন্ধ। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তি তাঁহার নিকট সাহায্য পায়, এবং তাঁহাকে সাহায্য দেয়। এইরূপে রাষ্ট্রের সহিতও তাঁহার সম্পর্ক ঘটে। অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের এই symbolic তাৎপর্য্য থাকাতেই ইহা গৃহস্থ জীবনের প্রধান অনুষ্ঠান এবং সর্ব্বপ্রধান নিত্যকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত, তাহাতে সংশয়ের হেতু দেখি না।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সকল প্রশ্নের আমি উত্তর দিতে পারিব না। ধর্ম্মশাস্ত্রে আমার ততটুকু বিদ্যা নাই। সুধীজনের সম্মুখে সেই কয়েকটি প্রশ্ন আমি উপস্থিত করিয়া ক্ষান্ত থাকিব। আচার্য্য গৃহে বিদ্যালাভ করিয়া ঘরে না ফিরিলে গৃহধর্ম্মে অধিকার জন্মিত না এবং পত্নী গ্রহণে অধিকার জন্মিত না, ইহা নিশ্চয়। পত্নী গ্রহণ না করিলে অগ্ন্যাধানে অধিকার জন্মিত না, এবং অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌতকর্ম্মে অধিকার জন্মিত না। কিন্তু বিবাহ করিলেই অগ্ন্যাধান করিতেই হইবে, এরূপ নিয়ম ছিল কি না? পিতা বর্ত্তমানে পুত্র ঘরে ফিরিয়া বিবাহ করিলেন। বিবাহের পর তিনি

আপনার জন্য অগ্ন্যাধানে বাধ্য ছিলেন কি না? যদি ধরা যায়, যে পুত্রও পিতৃগৃহে থাকিয়া নিজের জন্য পৃথক্ অগ্নি স্থাপন করিতেন, তাহা হইলে একই গৃহমধ্যে একাধিক অগ্নিশালার প্রয়োজন হয়। একই গৃহে একাধিক অগ্নিশালা থাকিতে পারিত কি না? তাহা সম্ভব হইলে আমি উপরে যে থিয়োরি দিলাম, তৎসম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটে। হইতে পারে, বিবাহিত পুত্রের পিতা বর্ত্তমানে স্বতন্ত্র অগ্ন্যাধানের কোনও প্রয়োজন ছিল না। হয় ত পিতা বর্ত্তমানে তাঁহাকে কোনও শ্রৌত কর্ম্মই করিতে হইত না। যদি বা কোনও কর্ম্ম করিতে হইত, তাহা পিতার অনুমতি লইয়া পিতার অগ্নিতেই সম্পাদন করিতে পারিতেন। পুত্র পিতার প্রতিনিধিরূপে পিতার অগ্নিতে অগ্নিহোত্র করিবেন, পিতা প্রবাসে থাকিলে অগ্নিহোত্র বিষয়ে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন, এরূপ যখন স্পষ্ট বিধান আছে, তখন মনে করা যাইতে পারে, পুত্র বিবাহিত হইলেও তাঁহার পক্ষে পৃথক্ অগ্নি স্থাপন না করিলেও চলিতে পারিত। তাহার পক্ষে পৃথক্ শ্রৌতকর্ম্ম না করিলেও চলিতে পারিত। আবার নিতান্তই যদি তিনি পৃথক্ অগ্নি স্থাপন করিয়া তাহাতে পৃথক্‌ভাবে শ্রৌতকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে পিতৃগৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক্ গৃহে পৃথক্ গৃহস্থালী পাতিতেন। সেইখানে অগ্নিশালা নির্ম্মাণ করিয়া আপনার জন্য অগ্নি স্থাপনা করিতেন। পিতা বর্ত্তমানে পিতৃগৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এইরূপে পৃথক্ গৃহস্থালী পাতা সে কালে প্রথা ছিল কি না, এবং ঐ প্রথা বিধিসঙ্গত ছিল কি না, তাহা আমি জানি না। হিন্দু আইনে যাঁহারা পারদর্শী, তাঁহারা এ প্রশ্নের উত্তর দিবেন। বর্ত্তমান কালে আমাদের সমাজে একান্নবর্ত্তী প্রথা প্রচলিত আছে। যে কালের কথা আমি কহিতেছি, সে কালে এরূপ একান্নবর্ত্তী গৃহস্থালী কিরূপে প্রচলিত ছিল, সে প্রশ্ন এই সঙ্গে উপস্থিত হয়। পিতা বর্ত্তমানে পুত্রগণ তাঁহার অধীন হইয়া তাঁহার সমীপেই বাস করিবেন এবং তাঁহার অধীন থাকিবেন; পিতার দেহান্তের পর তাঁহারা ইচ্ছা করিলে পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়া প্রত্যেকে পৃথক্ গৃহস্থালী স্থাপন করিতে পারেন; একান্নবর্ত্তী পরিবারের ইহাই নিয়ম। আপনারা patriarchal familyর —পিতৃতন্ত্র গৃহস্থালীর—কথা জানেন। এই প্রথামতে গৃহপতি পিতাই পুত্রগণের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। পুত্রগণ তাঁহার ভৃত্যমাত্র; সর্ব্বতোভাবে অধীন ভৃত্যমাত্র। পিতা ইচ্ছা করিলে পুত্রদের বধদণ্ড পর্য্যন্ত দিতে পারেন। আমাদের প্রাচীন সমাজে পিতার এতটা ক্ষমতা বোধ করি ছিল না। পুত্র জন্মিবামাত্র

পৈত্রিক সম্পত্তিতে তাহার একটা ভাবী স্বত্ব জন্মিত। পিতা সেই স্বত্বে তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারিতেন না। কেন না, পৈত্রিক সম্পত্তি তাঁহার নিজস্ব নহে, উহা সেই গৃহের সম্পত্তি; তিনি তাহার রক্ষাকর্ত্তা—trustee—মাত্র। কাজেই পুত্রগণের উপর পিতার ক্ষমতা সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল। এরূপ স্থলে পিতা বর্ত্তমানে পুত্র কতটা স্বাধীনতা পাইতেন, ইহা অনুসন্ধানের বিষয়। পিতা বর্ত্তমানে পৃথক্ ভাবে গৃহস্থালী পাতিয়া পৃথক্ ভাবে অগ্ন্যাধান করিয়া শ্রৌতকর্ম্মের অনুষ্ঠানে পুত্রের স্বাধীনতা কত দুর ছিল, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। যদি বা পুত্র সেইরূপ স্বাধীনতা পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পৈত্রিক দায়াধিকারে কোনরূপ সঙ্কোচ ঘটিত কি না, তাহাও অনুসন্ধানের বিষয়। অগ্নিহোত্র প্রসঙ্গে এই সকল প্রশ্ন আপনা হইতে উপস্থিত হয়। আমি এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না। ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী দুই চারি জন পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াও ভাল উত্তর পাই নাই। আপনাদের নিকটে প্রশ্ন কয়টি উপস্থিত করিয়া উত্তরের প্রত্যাশায় আমি ক্ষান্ত থাকিলাম।

অগ্ন্যাধান এবং অগ্নিহোত্রের বিবরণ দিয়া আজ আমি বিদায় লইলাম। ইষ্টি যাগ, পশু যাগ এবং সোম যাগ প্রভৃতি কয়েকটি শ্রৌত যজ্ঞের বিবরণ লইয়া পরে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করি। সর্ব্বশেষে যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়া বেদপন্থীর জাতীয় জীবনে ইহার তৎপরতা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

আলোচনা।

১

সমাজ প্রসঙ্গ—বরপণ-সমস্যা।

লেবু কচলাইতে কচলাইতে তিক্ত হয়, ইহার দৃষ্টান্ত (গত কার্ত্তিকের) 'উপাসনা'র 'একটি ভাববার কথা।' উহাতে বরপণ-ব্যাধির প্রতীকারের উপায় নির্ণীত হইয়াছে—কন্যার বিবাহের বয়ঃ-সীমা গ্রাহ্য না করা। গত বৎসর 'প্রবাসী'র সম্পাদক মহাশয় এক মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং 'গৃহস্থ' পত্রিকায় যথানিয়মে ও যথাসময়ে তাহার ফলাফল আলোচিত হইয়াছে। আলোচ্য প্রবন্ধ তাহারই উদ্গার। আলোচ্য প্রবন্ধে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষের পরিচয় যে পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে, সেই পরিমাণে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় নাই। ব্রাহ্মণ-সমাজের কাছে সমাজব্যাধির আর কোনও প্রতীকারের আশা নাই, এইরূপ ধারণা যে সকল অ-ব্রাহ্মণের মগজে গজ্-গজ্ করে, তাঁহারা অগাধে ব্রাহ্মণ গুরু-পুরোহিতের

টিকি ধরিয়া টানাটানি না করিয়াও যে কোনও সামাজিক সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, এবং তাহাই তাঁহাদের উচিত। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ এক দিন সমাজকর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু আজ কাল ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব ব্রাহ্মণেতর অনেক তথাকথিত 'শিক্ষিত' সম্প্রদায় মানেন না। ইহার জন্য দোষী কে? সে পদ ব্রাহ্মণ নিজেই ত্যাগ করিয়াছেন,—না বলিয়া, ইহাই বলা সঙ্গত যে তথাকথিত উন্নতিশীল ব্রাহ্মণেতর কয়েকটি জাতি ব্রাহ্মণকে সে পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন। উন্নতির দোহাই দিয়া কায়স্থেরা উপবীত ধারণ করিয়া ক্ষত্রিয় হইতেছেন, নমঃশূদ্রেরা 'জলচল' (সৎশূদ্র) জাতি হইতেছেন, কৈবর্ত্তেরা মাহিষ্য অর্থাৎ বৈশ্য হইতেছেন, হউন; কিন্তু ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইবেন কোথায়? অগ্রবর্ত্তী স্থান নাই বলিয়াই, ব্রাহ্মণকে 'বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা!' বলিয়া 'ব্রহ্মণ্যের চতুর্দ্দিকে বেড়া দিতে ব্যস্ত' হইতে হইয়াছে। এই কারণেই—আগে 'অচলায়তনে'র মধ্যে নিজেকে সংযত করিবার উদ্দেশ্যেই ব্রাহ্মণ-সভা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহাতে ব্রাহ্মণসভার দোষ কতটুকু? জাতি বা সম্প্রদায়বিশেষের মতের অনুকূলে মত দিলে ব্রাহ্মণজাতি সেই বিশিষ্ট জাতির বা সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জ্জন করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে সমগ্র সমাজের উন্নতিসাধন অসম্ভব। সমাজদেহের এক অঙ্গের সহিত অপর অঙ্গের যত দিন বিরোধ থাকিবে, তত দিন হিন্দুসমাজদেহের মস্তক ব্রাহ্মণকে মাথা ঢাকিয়াই থাকিতে হইবে; না ঢাকিলে, হস্ত কে জানে কোন্ সময়ে হস্তপ্রসারণ করিয়া মস্তকের শিখা ধরিয়া আকর্ষণ করে! আবার পদ বলে, 'ওহে মস্তক, আমি যে অপরাধ করি, তুমিও ত সেই অপরাধ কর, তবে তুমি আমার অপরাধের বিচার করিবে কিরূপে?' ইহার উত্তরে মস্তক অবশ্যই বলিতে পারে, 'বাপু হে, আমি তোমার তুল্য অপরাধী হইতে পারি, কিন্তু তুমি কি আমার পরামর্শ লইয়া, সেইরূপ কাজ করিয়াই অপরাধী হইয়াছ?' ইহাতে এক দিকে ব্রাহ্মণজাতির দুর্ব্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়; অপর দিকে ব্রাহ্মণেতর জাতির শ্রদ্ধাবুদ্ধির অভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে সকল দোষ ব্রাহ্মণের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া 'বুদ্ধিমানের কর্ম্ম' নহে। ব্রাহ্মণের অবনতিতেই যদি ব্রাহ্মণেতর জাতির অবনতি ঘটিয়া থাকে, তবে ব্রাহ্মণ যাহাতে ব্রহ্মণ্যরক্ষায় সমর্থ হইতে পারে, সর্ব্বাগ্রে সেইরূপ ব্যবস্থা করাই ব্রাহ্মণেতর জাতির কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণেতর অনেক জাতি যখন আজ কাল স্ব-স্ব-প্রধান হইয়া সামাজিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তখন সে কর্ম্মের ফলভাগী তাঁহারা হইবেনই ত। বরপণ সম্বন্ধে অন্য কথা। পণের কথাকথিতে ব্রাহ্মণেতর জাতির আনুকূল্য ও সহানুভূতি নাই; ব্রাহ্মণজাতিও এ সমস্যার সমাধানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ব্রাহ্মণসভার বিধিব্যবস্থাকে উপহাস করা অতি সহজ, কিন্তু জানিয়া রাখা উচিত, ব্রাহ্মণসভারই অন্যতম প্রস্তাব—পণপ্রথার উচ্ছেদ।

প্রবন্ধ-কার কন্যার বিবাহের বয়ঃ-সীমা বাড়াইবার পক্ষপাতী; অর্থাৎ, আমরা যাহা অভাবে করি, তাহাই তিনি স্বভাবে করিতে বলেন। বলুন, ক্ষতি নাই। কিন্তু ইহার পোষকতায় শাস্ত্রের কদর্থ প্রচার করা হয় কেন? 'ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে'—ইহাতে কিরূপে বুঝায়, হিন্দুশাস্ত্র যৌবনে কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন? প্রবন্ধ-কার বলেন, যুবতীকে বিবাহ না করিলে যৌবনে ভর্ত্তা (তাহাকে) কি করিয়া রক্ষা করিবে?' এই ভাবে অর্থ করিলে

এই শ্লোকের এমন অর্থও পাওয়া যায় যে, মনু বিবাহিতা যুবতীকে পিতার বা আত্মীয় স্বজনের গৃহে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন; যাইলে, তাহার সঙ্গে তাহার স্বামীকে সশস্ত্র সৈনিকের বেশে যাইতে হইবে। ইহাতে এমন অর্থও পাওয়া যায় যে, যুবতী ভার্য্যার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এক মুহূর্ত্তও তাহার স্বামী অন্যত্র থাকিতে পারে না; যেহেতু, কখন্ যে তাহার ভার্য্যার রক্ষার হেতু ঘটিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু আমরা মনু-বাক্যের এইরূপ হাত-গড়া অর্থের পক্ষপাতী নহি। আমরা সাধারণ জ্ঞানে ঐ শ্লোকের এইরূপ অর্থই বুঝি যে, মনু নারীকে বাল্যে পিতার, যৌবনে ভর্ত্তার ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের শরণাপন্ন থাকিবারই ব্যবস্থা দিয়াছেন। মনুর এ ব্যবস্থা নারীর স্বাতন্ত্র্যের অন্তরায়, বিবাহের বয়ঃ-সীমার সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। তাহার পর মনুসংহিতা হইতে উদ্ধৃত 'উৎকৃষ্টায়াভিরূপায়...পতিম্।' শ্লোকটিও কন্যার বিবাহের বয়ঃ-সীমা বাড়াইবার অনুকূল নহে। ইহাতে বুঝায় না যে, দুই দশ টাকায় এম্-এ পাস-করা ছাত্র অথবা লক্ষ্মীর বরপুত্রকে জামাই করিতে না পারিলে, কন্যাকে আমরণ অবিবাহিতা রাখিতে হইবে। ইহাতে মনু অপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন, উপযুক্ত পাত্র না পাইলেই কন্যাকে অকূলে ভাসাইয়া না দিয়া আমরণ অবিবাহিতা রাখিতে পারা যায়, এইরূপ ব্যবস্থাই দিয়াছেন। শাস্ত্রীয় ব্যবস্থায় শাস্ত্রকারগণের মধ্যে যেখানে মতভেদ আছে, শাস্ত্রজ্ঞগণ সেখানে মনুর মতেরই অনুসরণ করিতে বলেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন মনুর মতের প্রাধান্যই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং কন্যার বিবাহ-বয়স সম্বন্ধে মনুর ব্যবস্থাই হিন্দুমাত্রের গ্রাহ্য। 'ত্রীণি ...পতিম্।' অর্থাৎ, উপযুক্ত পাত্র না পাওয়ার জন্যই যদি অবিবাহিত অবস্থায় কন্যা ঋতুমতী হয়, তবে তিন বৎসরের মধ্যে সে কন্যার বিবাহ দিবে না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, মনুর মতে, ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই কন্যাসম্প্রদান বিধেয়। তাহার পর প্রবন্ধ-কার বলিয়াছেন,—'কন্যার পিতামাতার ইচ্ছা হয় বিবাহ দিবেন, ইচ্ছা না হয় না দিবেন। পিতার যখন সময় ও সঙ্গতি হইবে; মনোমত পাত্র জুটিবে, তখন কন্যার বিবাহ হইবে।' কিন্তু কোনও সংহিতাকার ত এমন ব্যবস্থা দেন নাই। পাত্র কাহার মনোমত হইবে? পিতার? তাহা হইলে পিতা পাত্রের 'শ্রুত' দেখিয়াই নিশ্চিন্ত হউন, মাতার প্রার্থিত 'বিত্ত' ও কন্যার অভীষ্ট 'রূপ' দেখেন কেন? সকল দিক্ দেখিলে হাজারে পাঁচটি পাত্রও মনোমত হয় কি না সন্দেহ; অথচ নয় শত পঁচানব্বইটি পাত্র না বিকাইলে সমাজ-রক্ষার কোনও উপায় নাই। ইহাও ত 'ভাববার কথা।' যাহা হউক, এইখানেই শাস্ত্রকারগণের সহিত প্রবন্ধকারের বিরোধ। এই শাস্ত্রবিরুদ্ধ মতকেই প্রবল করিয়া প্রবন্ধ-কার কন্যার পিতামাতাকে প্রতিজ্ঞা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন,—'যে দিন না পুত্রের পিতা স্বয়ং-প্রার্থী হইয়া আমার কন্যাকে গৃহের বধূরূপে বরণ করিয়া না লইয়া যাইবে, তত দিন আমি কন্যার বিবাহ দিব না। কন্যা বিবাহিতা হউক আর নাই হউক।' এই প্রার্থনা যদি হিন্দু কন্যার মাতাপিতার কর্ণগোচর হয়, তবে 'আমরা পুত্রের বিবাহে পণ লইব না, এবং কন্যার বিবাহে পণ দিব না।'—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেই বা তাঁহাদের বাধা কি? এই প্রতিজ্ঞাই সঙ্গত, এবং ইহার সহিত হিন্দুর শাস্ত্রাচার ও ধর্ম্মমতের কোনও বিরোধ নাই। কন্যার মাতাপিতা ত পুত্রেরও মাতাপিতা। যে মাতাপিতা পুত্রের বিবাহে কন্যাকর্ত্তার দুরবস্থা ভাবেন না, তাঁহার কন্যার বিবাহে তাঁহার অবস্থা অপর বরকর্ত্তা ভাবিবেন কেন?

সমাজের এক শ্রেণীর লোক যদি কেবল কন্যাকর্ত্তা, এবং অপর শ্রেণীর লোক কেবল বরকর্ত্তা হইতেন, তবে কন্যাকর্ত্তারা 'পণ দিয়া কন্যার বিবাহ দিব না' বলিয়া—অকাট্য প্রতিজ্ঞা করিয়া—বরকর্ত্তাদিগের আশায় ছাই দিতে পারিতেন; কিন্তু যিনি বাহিরে সাধু, তিনিই ঘরে চোর। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ইহাই। এই কারণেই পণ-সমস্যা জটিল হইয়াছে।

পণ-সমস্যা জটিল হইবার আরও কারণ—সমাজে ধনবানের অত্যাচার। অধিকাংশ স্থলেই বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তাকে বলেন, 'সে কি মহাশয়, সর্ব্বসমেত দুই হাজার! এত অল্প টাকা! অমুক স্থানের অমুক বাবু পাঁচ হাজার দিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু গৃহিণী ইহাতেও শ্রীমানের বিবাহ দিতে অসম্মত।' এই ভাবেরই কথা শুনিয়া কন্যাকর্ত্তাকে নমস্কার করিয়া পিছাইতে হয়। যিনি গহরজানের নৃত্য দেখিয়া অম্লানবদনে দশ হাজার মুদ্রা বিবিজানকে উপঢৌকন দিতে পারেন, তিনি তাঁহার কন্যার বিবাহে পণস্বরূপ দুই পাঁচ হাজার টাকা অক্লেশে দিতে পারেন; কিন্তু তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিরা কন্যাদায়গ্রস্ত প্রতিবেশীদের দিকে চাহেন না, ইহাই ত দুঃখের কথা। নিঃস্বার্থ দানের শক্তি কোনও ধনীর না থাকিতে পারে। তিনি তাঁহার কন্যা ও জামাতাকে প্রচুর ধন দিতে পারেন; কিন্তু সমাজে পাত্রের বাজার-দর বাড়াইবার তাঁহার কোনও অধিকার নাই। বিবাহের পরেও ত তিনি কন্যা ও জামাতাকে রূপার হাতী ও সোনার ঘোড়া দিতে পারেন।

আর একটা কথা,—কন্যাকর্ত্তারা সাধারণতঃ উচ্চ দিকেই দৃষ্টিপাত করেন। গ্রামের মধ্যে একটি ছেলে এম-এ পাশ করিলে (সে ছেলে অসচ্চরিত্র হইলেও) তাহাকে অনেকেই উপযুক্ত পাত্র বোধ করেন, এবং তাহাকে জামাই করিবার জন্য অনেকেই হাত বাড়ান। তখন পাত্রের পিতার পোয়াবারো। যাঁহার যেমন অবস্থা, তিনি তেমনই ঘরে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবার অভিলাষী হইলে, পণের কষাকষি-বোধ হয় হ্রাস হয়। প্রবন্ধকার 'ভাববার কথা'য় এ কথা ভাবেন নাই। তাঁহার শেষ কথা এই,—'পুত্র ও কন্যার সামাজিক মূল্য ও মর্য্যাদা যতক্ষণ না সমান বলিয়া মানিয়া না লওয়া হইবে, ততক্ষণ কন্যাকে অর্থ দিয়া পরের দাসীত্বে নিয়োজিত করিবার জন্য ব্যস্ত হইবার দরকার নাই।' পুত্র ও কন্যার সামাজিক মূল্য ও মর্য্যাদা সমান হইলে পণপ্রথার কঠোরতার হ্রাস হইতে পারে; কিন্তু সামাজিক মূল্য ও মর্য্যাদা সমান করিতে গেলে সামাজিক অধিকারটাও সমান করা আবশ্যক। ইহা কি 'ভাবিবার কথা' নহে? সামাজিক অধিকার সমান করিতে গেলে হিন্দু সমাজকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে, এবং তাহাতে সাম্যে বৈষম্যেরই সৃষ্টি হইবে। তখন নারীরাও তেমনই পুরুষদিগকে বলিবে, 'তোমরা যেমন বহু গর্হিত কাজ করিয়াও পতিত হও না, আমরাও তেমনই তোমাদেরই মত চলা-ফেরা করিয়া পতিতা হইব না।' পুরুষ তখন বলিতে বাধ্য হইবে—তথাস্তু। কারণ, সামাজিক মূল্য ও মর্য্যাদা উভয়েরই তখন সমান! সামাজিক মূল্য ও মর্য্যাদার কুশ্রী দিকটারই কথা বলিলাম, সুশ্রী দিকের দিকে চাহিতে হইলে সংযম ও সংশিক্ষার কথা বলিতে হয়। বর্ত্তমান কালে সংযমের নাম শুনিলে 'শিক্ষিত' নব্যবঙ্গ আঁৎকিয়া উঠেন। আর সংশিক্ষা? এ বিষয়টি আপাততঃ উহ্য থাকিলে বা রাখিলে ক্ষতি নাই। কারণ স্বরলিপির সাধনা হইতে নারীর ব্যক্তিত্ব জাগ্রত করিবার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত সকল শিক্ষাই আজ কাল টাকায় পাঁচ ছটাক বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতে

দরে বিকাইতেছে, কিন্তু আসলে তাহা মরা শৃগাল কুক্কুরের চর্ব্বী। ঐ সংযম ও সংশিক্ষার অভাবেই বরপণ-সমস্যা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়াছে, মধ্যবিত্ত হিন্দুগৃহস্থকে পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সংযমের অভাব, সৎসঙ্গের অভাব, সংশিক্ষার অভাব আছে বলিয়াই কন্যাকে যৌবনে পতিসঙ্গসুখভোগ করিতে না দিলে, ভয়ের কারণ আছে। সমাজে বিধবা নারীদের জন্য (জোর করিয়াও) ব্রহ্মচর্য্য-পালনের যে ব্যবস্থা আছে, কুমারী কন্যাদের জন্য সে ব্যবস্থা নাই। প্রবন্ধ-কার এইখানে অবিবাহিত যুবকদের নজীর দেখাইয়াছেন। কিন্তু সে নজীর আমরা মুখে শুনিব, না—কাজে দেখিব। 'শতকরা ৯৯ জন যুবা সচ্চরিত্র (হইয়া) (এবং) সৎপথে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করে।'—অনুমানমাত্র। অনুমানে ইহাও বলা যাইতে পারে, শতকরা ৯৯ জন যুবা সৎপথে থাকে না। কোন্ অনুমান সত্য, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে 'কমিশন' বসাইতে হয়। তাহার পর প্রবন্ধ-কার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—'প্রাচীন কালে বেশী বয়সে বিবাহ ব্যবস্থা ছিল, তাহা হইলে (সেকালে) কি সব বয়স্থা কুমারী ধর্ম্মজ্ঞান বিসর্জ্জন দিতেন?' কোন্ কালের কথা? যে কালে ব্রহ্মচারীরা গুরুগৃহে সুশিক্ষা লাভ করিয়া অতি সহজেই ত্যাগী ও সংযমী হইতেন, একালে সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে কি? কোথায় সেকালের গৃহকর্ম্ম-পটীয়সী নারী, আর এ কালের কর্ত্তব্যবিমুখ নবেলপড়া মেয়ে! সেকালের ব্যবস্থা দেখাইতে গেলে সেকালের অবস্থাও ভাবিতে হয়। প্রবন্ধ-কার আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—'এখনো (এখনও) অধিকাংশ সভ্য সমাজে ও সভ্য দেশে কুমারীরা বেশী বয়সে বিবাহ করেন। তাঁদের মধ্যে কি তবে সব কুমারী এই অপরাধে অপরাধী?' অধিকাংশ সভ্য সমাজ ও সভ্য দেশের সব কুমারীর সঙ্গে আমাদের আলাপ-পরিচয় নাই, তাঁহাদের চরিত্রগত দোষগুণের বিচার করাও অসঙ্গত মনে করি। নারীর বিবাহের বয়ঃ-সীমা বাড়াইয়াই কোন্ কোন্ দেশ সভ্য এবং কোন্ কোন্ সমাজ উন্নত হইয়াছে, জানি না; কিন্তু নারীর বিবাহের বয়ঃ-সীমা গ্রাহ্য করিয়াও সভ্য সমাজ টিকিয়া থাকিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত—এই হিন্দুসমাজ। হিন্দু-সমাজ-ভুক্ত ব্রাহ্মণাদি উচ্চ শ্রেণীর জাতিগুলির কথাই বলিতেছি। হিন্দু-সমাজ-ভুক্ত বাগ্দী, ডোম, মেথর প্রভৃতি অনেক অনুন্নত জাতি নারীর বিবাহের বয়ঃ-সীমা গ্রাহ্য করে না, এবং হিন্দু-সমাজের কলঙ্ক অনেকাংশে তাহাদের নারী-সমাজ বহন করে। যাহা হউক, পৃথিবীর কোনও কোনও উন্নত জাতি যেমন এ ব্যবস্থা মানে না, পৃথিবীর অনেক অনুন্নত জাতিও তেমনই এ ব্যবস্থা মানে না এবং হিন্দু-সমাজ প্রাথমিক অবস্থায় এ ব্যবস্থা মানিত না। দোষ ব্যবস্থার নহে, অবস্থার। অবস্থার পরিবর্ত্তনে ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন আবশ্যক; কিন্তু ব্যবস্থার দোষ না থাকিলে, অবস্থারই পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আচরিত ব্যবস্থাই সামাজিক আদর্শের মাপকাঠী, অবস্থা নহে।

আর একটা কথা,—প্রবন্ধ-কারের অনুরোধে কন্যাকর্ত্তারা যদি প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন, বরকর্ত্তারা স্বয়ংপ্রার্থী হইয়া তাঁহাদের কন্যাগণকে বধূরূপে পাইবার জন্য যত দিন পর্য্যন্ত (তাঁহাদের) শরণাপন্ন না হইবেন, তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা কন্যার বিবাহ দিবেন না, তবে বরকর্ত্তারাই বা আত্মমর্য্যাদা-রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে পারিবেন না কেন, কন্যাকর্ত্তারা যাতকের মতই তাঁহাদের দ্বারস্থ না হইলে, তাঁহারা পুত্রের বিবাহ দিবেন না? প্রজা-বৃদ্ধির

জন্য বিবাহের ব্যবস্থা না থাকিলেও চলে, কিন্তু সমাজ-রক্ষার জন্য কন্যার পিতাই বা কতকাল কন্যার বিবাহ না দিয়া স্থির থাকিবেন? বংশলোপ, নিজের ও পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ, বা ছেলে বিগড়াইবার আশঙ্কা যেমন বরকর্ত্তাদের আছে, তেমনই মেয়ে বিগড়াইয়া কুলে কালী পড়িবার আশঙ্কা কন্যাকর্ত্তাদেরও আছে। আবার, এই উভয় রকমের আশঙ্কা একই ব্যক্তির আছে; যেহেতু, যিনি কন্যার পিতা, তিনিই পুত্রের পিতা।

পণ-সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া প্রবন্ধ-কারের মত কোনও কোনও অদূরদর্শী লেখক দেশের 'শিক্ষিত' যুবকবৃন্দকে আহ্বান করেন, কিন্তু আমরা মাতাপিতার মতের প্রতিকূলে কাজ করিতে হিন্দু যুবকবৃন্দকে নিষেধ করি। ইহাতে সুফল ফলিবার কোনও আশা নাই। কারণ, যৌবন সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া উচ্ছৃঙ্খল গতিতে স্বভাবতঃই বহিতে চাহে, বর্ত্তমান আদর্শের শিক্ষা সে গতিতে বাধা দেয় না। বর্ত্তমান শিক্ষা মনের কর্ষণ করিয়া হাল ছাড়িয়া দেয়, সংবীজ বপন করে না, যুবাকে গৃহী হইতে শিক্ষা দেয় না। এ কথা এ দেশের ভুক্তভোগী চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরই। সুতরাং বর্ত্তমান আদর্শের শিক্ষায় 'শিক্ষিত যুবকবৃন্দের মুরুব্বিয়ানা' স্বীকার করিলে, পণপ্রথার ভাগ্যে যাহাই থাকুক, 'আগুনের খেলাটা' জমকিয়া উঠিবে।

যাহা হউক, প্রবন্ধ-কারের মূল উদ্দেশ্য সাধু; কিন্তু বরপণ উঠিয়া যাউক, এমন প্রস্তাব আমরা করি না; কারণ, তাহা অসম্ভব। আমাদের প্রস্তাব, বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার সঙ্গতি বুঝিয়া বর-পণের দাবী করুন। কিন্তু বর-পণের দাবীর ভারটা বরকর্ত্তার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে এই সমাজবিপ্লব দমিত হইবে না। দশের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত পণপ্রথার কঠোরতা-হ্রাসের কোনও সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ে দশই বা একযোগে কাজ করিবেন না কেন? সকলেরই দশা যে এক। আজ যিনি বরকর্ত্তা সাজিয়া খালি পেটে ঢেকুর তুলিতেছেন, কাল কন্যাদায়ে তাঁহারই প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে, ইহা ভাবিয়া দশে মিলিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের জমীদাররা সামান্য চেষ্টা করিলে এই সমাজব্যাধির প্রতীকার করিতে পারেন। যে জমীদার সাধারণ প্রজার নিকট হইতে দেয় খাজনার উপর টাকায় চারি আনা পর্য্যন্ত 'ধরতা' আদায় করিবার সামর্থ্য রাখেন, তাঁহার আন্তরিক চেষ্টায় সমাজে বরপণের কষাকষি অবশ্যই হ্রাস হইতে পারে। বাঙ্গালা দেশে ক্ষমতাশালী হিন্দু জমীদারের অভাব নাই; কিন্তু সমাজের উন্নতিকল্পে কেহই কিছুই করেন না। দেশের কতকগুলি নেতা বা মুরুব্বী জুটিয়াছেন, শুনিতে পাই। সামাজিক সমস্যার সমাধানের জন্য যদি তাঁহারা অগ্রসর না হন, তবে দেশের কর্ত্তার আসনে কতদিন তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিবেন, তাহাও ভাবিবার কথা।

শেষ কথা এই,—দশের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত পণ-প্রথার কঠোরতা-হ্রাসের সম্ভাবনা নাই। হিন্দুসমাজভুক্ত প্রত্যেক জাতি যদি কোনও দিন দশে মিলিয়া পাত্রের বংশমর্য্যাদার একটা পরিমাণ ধার্য্য করেন, তবে সেই দিন পণের কষাকষিতে কন্যাকর্ত্তাকে আর বিব্রত হইতে হইবে না। বংশমর্য্যাদার পরিমাণ স্থির হইলে, এম-এ পাস করা এবং ছাত্রবৃত্তি পাস করা— এই উভয় পাত্রকেই এক দরে ছাড়িতে হইবে; দরিদ্রের পুত্র যে দরে বিকায়, ধনীর পুত্রকেও সেই দরে বিকাইতে হইবে। পাত্রের মর্য্যাদার কথা না ভাবিয়া বংশের মর্য্যাদার কথাই ভাবিতে হইবে। পাত্র উচ্চশিক্ষিত বলিয়াই যদি বরকর্ত্তা বরপণের পরিমাণ বর্দ্ধিত করেন,

তবে ভবিষ্যতে সেই পাত্রের উপার্জ্জিত অর্থ তাহার পিতা ও শ্বশুর সমভাবেই পাইবেন না কেন, প্রত্যেক সমাজে দশেই সেই বিষয়ের মীমাংসা করিবেন। ধনীরা কুল ও শীল দেখিয়া দরিদ্রের ঘর হইতে কন্যা আহরণ করিতে সচেষ্ট হইলে এ সমস্যার অতি শীঘ্র সমাধান হয়। গল্প-উপন্যাস বা কবিতা-রচনায় দরিদ্রের কন্যা অসমর্থ হইতে পারে, টপ্পা গাহিবার ও হাওয়া খাইবার অভ্যাস তাহার না থাকিতে পারে; কিন্তু সুগৃহিণী হইবার যোগ্যতা তাহার আছে।

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী।—মাঘ। 'যত বার দীপ জ্বালাতে যাই নিভে যায় বারে বারে' শুনিয়া যেমন 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি' মনে পড়ে, চিত্রিতার আঙ্গুলগুলিও তদ্রূপ। যে কবিতার যে চরণে ছবির নামকরণ হইয়াছে, তাহাতে দীপের একটা রূপক আছে। ছবিতে অবশ্য তাহার অস্তিত্ব নাই। ইহার উদ্দেশ্যও ঠিক বুঝা যায় না। চিত্রকর যেন sublimeকে ridiculous করিয়াছেন। মাটীর প্রদীপ, এমন কি, ইলেকট্রিক দীপ নিভিলেও এমন ভাবটা সম্ভব হয় না। জগতে অন্য দীপ নিভিলে যে ভাবের উদ্ভব সম্ভব, চিত্রিতার হস্তভঙ্গী নিশ্চয়ই সে ভাবের অভিব্যক্তি নহে।—রবীন্দ্রনাথের 'স্বাধিকার-প্রমত্তঃ' প্রত্যেক বাঙ্গালীর-প্রত্যেক ভারতবাসীর অবশ্য পাঠ্য।—ইউরোপও এই প্রবন্ধে উপকৃত হইতে পারে। আশা করি, ইহা ভাষান্তরিত হইয়া প্রতীচীকে বুঝাইয়া দিবে—ভারতবর্ষে বর্ত্তমান কালে অন্ততঃ এমন এক জন দেশভক্ত সাধক ও মানবতার পুরোহিত আছেন,—যিনি এই পশু-বলের যুগে ঘোষণা করিতে পারেন—'আমরা আজ এই মৃত্যুশেলবিদ্ধ পশ্চিমের কাছ হইতে স্বাধীনতা ভিক্ষা করিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এই মুমূর্ষু আমাদিগকে কি দিতে পারে? পূর্ব্বে এক রকমের রাষ্ট্রতন্ত্র ছিল তাহার বদলে আর-একরকমের রাষ্ট্রতন্ত্র? কিন্তু মানুষ কি কোনো সত্যকার বড় জিনিস একের হাত হইতে অন্যের হাতে তুলিয়া লইতে পারে? মানুষ যে-কোনো সত্যসম্পদ লয় তাহা মনের ভিতরেই লয়, বাহিরে না। ভিক্ষার দানে আমরা স্বাধীন হইব না—কিছুতেই না। স্বাধীনতা অন্তরের সামগ্রী। য়ুরোপ কেন আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে না? যেহেতু তাহার নিজের মন মুক্তি পায় নাই। তার লোভের অন্ত কোথায়? যে-হাত দিয়া সে কোন সত্যবস্তু দিতে পারে লোভে তার সে-হাতকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—সত্য করিয়া তার দিবার সাধ্যই নাই—সে যে রিপুর দাস। যে মুক্ত, সেই মুক্তি দান করে।' রবীন্দ্রনাথ প্রতীচ্য-সভ্যতার আবরণ মুক্ত করিয়া তাহার স্বরূপ দেখাইয়াছেন—তাহাই তাহার সত্য রূপ। রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রেয় ও হেয়, দুই রূপই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন; এবং 'চোখে আঙ্গুল দিয়া' দেখাইয়া দিয়াছেন। আমাদের সঙ্গে এই সভ্যতার সংঘর্ষে যে বিষম দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, নানা কারণের সমবায়ে তাহা ঢাকা থাকে। কিন্তু রবির কিরণে সে কুহেলিকার জাল ছিন্ন হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—'আমাদের

নিজের ব্যথা হইতে বুঝিতে পারি আজ এমন একটা প্রবল সভ্যতা জগৎ জুড়িয়া আপন জাল বিস্তার করিতেছে যা শোষণ করিতে পারে শাসন করিতে পারে, কিন্তু যার মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক শক্তি নাই যে-শক্তিতে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলাইয়া দেয়, যে-সভ্যতা অবজ্ঞার সহিত বাহির হইতে আমাদের মাথার উপর উপকার বর্ষণ করে অথচ আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা উদ্ধতভাবে দাবী করিতে থাকে; অর্থাৎ যাহা দানের সঙ্গে হৃদয় দেয় না অথচ প্রতিদানের সঙ্গে হৃদয়ের মূল্য চাহিয়া বসে।' ইতিপূর্ব্বে এ দেশের আর কোনও 'সার' এ কথাটা এমন স্পষ্টভাবে, এমন আন্তরিকতার সহিত বলিতে পারেন নাই। এই যে 'মাথার উপর উপকার বর্ষণ', কোনও জাতি ইহাতে সুস্থ থাকিতে পারে না। দানের বিনিময়ে প্রতিদান চলে, কিন্তু যে দানে হৃদয় নাই, তাহার প্রতিদানে 'হৃদয়ের মূল্য' হিসাবে কপটতা ভিন্ন আর কিছু দিতে পারে না। অথচ এই মূল্যই যাহাদিগকে বাধ্য হইয়া দিতে হয়, সে জাতি সত্য-ভ্রষ্ট ও কপটতার ক্রীতদাস না হইয়া থাকিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ ভাব-বৈষম্যের এই গোড়ার কথাটা বলিয়া দিয়া জাতির কৃতজ্ঞতার অধিকারী হইয়াছেন।—রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন —'যখন আর্য্য সাধক সর্ব্বভূতের মধ্যে সর্ব্বভূতাত্মাকে উপলব্ধি করিলেন, তখনই ভিতরের দিক হইতে বিরোধের গোড়া কাটা পড়িল। * * এবং 'তিনি [রাজা রামমোহন রায়] ভারতের তপস্যালব্ধ আধ্যাত্মিক সম্পদের মধ্যেই, অর্থাৎ পরমাত্মার সকল আত্মার ঐক্য, এই বিশ্বাসের মধ্যেই, সর্ব্বমানবের মিলনের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।' পক্ষান্তরে, 'পশ্চিমের বিদ্যালয়ে নিজের জাতির সত্তাকে অত্যন্ত তীব্র করিয়া অনুভব করিতে শেখায়— এই শিক্ষায় যে স্বাদেশিকতা জন্মে, তার ভিত্তি অন্য জাতির প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ পার্থক্যবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য এই শিক্ষা জগতের যেখানেই পৌঁছিয়াছে, সেইখানেই * * মানুষ অন্য দেশের মানুষকে ছলে বলে ঠেলিয়া পৃথিবীর সমস্ত সুযোগ নিজে পুরা দখল করিবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তিকে উদ্যত করিয়া তুলিতেছে। এই যে একটা প্রকাণ্ড ব্যূহবদ্ধ অহঙ্কার ও স্বার্থপরতার চর্চ্চা, এই যে মানুষকে সত্য করিয়া দেখিবার দৃষ্টিকে ইচ্ছা করিয়া বিকৃত করিবার চেষ্টা, ইহা আজ বিলিতি মদ এবং আর আর পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে ভারতেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ফলে, 'এতদিন যে স্বাজাতিকতার সমস্ত সুবিধাটুকু ইহারা নিজে ভোগ করিয়াছে এবং সমস্ত অসুবিধার বোঝা অন্য জাতির ঘাড়ে চাপাইয়া আসিয়াছে আজ তাহার ধাক্কা ইহাদের নিজের গৃহপ্রাচীরের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।'—পৃথিবীর বর্ত্তমান নারকীয় অবস্থার কারণ,—'ইউরোপীয়েরা স্বজাতিকেই সব চেয়ে সত্য বলিয়া মানিতে শিখিয়াছে।' কিন্তু 'পরের সম্বন্ধে বিবেচনা' করিতে না শিখিলে 'কোনও জাতির চিরদিন সুবিধা ঘটে না। আজ তাই এমন দিন আসিয়াছে যখন পশ্চিমের মানুষ নিজের ঘরের মধ্যেই বেশ করিয়া বুঝিতেছে স্বাজাতিকতা বলিতে কি বুঝায়।' রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,—'য়ুরোপ যখন কঠিন সঙ্কটে পড়ে তখন বিধাতার রাজ্যে এত দুঃখ কেন ঘটে তা লইয়া সে ভাবিয়া কূল পায় না। কিন্তু পৃথিবীর অন্য অংশের লোকেরাই বা কেন দুঃখ এবং অপমান ভোগ করে সে কথা লইয়া বিধাতাকে কিম্বা নিজেকে তেমন জোরের সঙ্গে এরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। তা হউক, এই সহজ সত্যটুকু তার ভাল করিয়াই জানা দরকার ছিল যে মনুষ্যত্ব জিনিস একটা অখণ্ড

সত্য, সেটা সকল মানুষকে লইয়াই বিরাজ করিতেছে। সেটাকে যখন কেহ স্বার্থের বা স্বজাতির খাতিরে খণ্ডিত করে তখন শীঘ্রই হোক্ বিলম্বেই হোক্ তার আঘাত একদিন নিজের বক্ষে আসিয়া পৌঁছে। ঐ মনুষ্যত্বের উপলব্ধি কি পরিমাণে সত্য হইয়াছে ইহা লইয়াই সভ্যতার বিচার হইবে—নহিলে, তার আমদানি-রফ্তানির প্রাচুর্য্য, তার রণতরীর দৈর্ঘ্য, তার অধীন দেশের বিস্তৃতি, তার রাষ্ট্রনীতির চাতুরী, এ লইয়া বিচার নয়। ইতিহাসের এই বিচারে আমরা পূর্ব্ব দেশের লোকেরা প্রধান সাক্ষী। আমাদিগকে অসঙ্কোচে সত্য বলিতে হইবে, তার ফল আমাদের পক্ষে যত কঠিন এবং অন্যদের পক্ষে যত অপ্রিয় হউক। আমাদের বাণী প্রভুত্বের বাণী নয়, তার পশ্চাতে শস্ত্রবল নাই। আমরা সেই উচ্চ রাজতক্তে দাঁড়াই নাই যেখান হইতে দেশ বিদেশ নতশিরে আদেশ গ্রহণ করে। আমরা রাজসভার বাহিরে সেই পথের ধারে ধূলার উপরে দাঁড়াইয়া আছি যে-পথে যুগযুগান্তের যাত্রা চলিতেছে, যে-পথে অনেক জাতি প্রভাতে জয়ধ্বজা উড়াইয়া দিগদিগন্তে ধূলা ছড়াইয়া বাহির হইয়াছে, সন্ধ্যা বেলায় তারা ভগ্ন দণ্ড এবং জীর্ণ কন্থায় যাত্রা শেষ করিল, কত সাম্রাজ্যের অহঙ্কার ঐ পথের ধূলায় কালের রথচক্রতলে চূর্ণ হইয়া গেল, আজ তার সন তারিখের ভাঙা টুকরাগুলা কুড়াইয়া ঐতিহাসিক উল্টাপাল্টা করিয়া জোড়া দিয়া মরিতেছে। আমাদের বাণী বেদনার বাণী, সত্যের বলে যার বল, একদিন যাহা অন্য সকল কলগর্জ্জনের ঊর্দ্ধে ইতিহাসবিধাতার সিংহাসন-তলে আসিয়া পৌঁছিবে।' ভারতের কবি ভিন্ন এ সত্য এমন করিয়া আর কেহ উপলব্ধি করিতে পারিত না, রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কেহ বর্ণ-চিত্রে এমন ছবি আঁকিয়া জিজ্ঞাসুর মনে এ সত্য এমন মুদ্রিত করিয়া দিতে পারিত না, নিশ্চয়ই বাঙ্গালী—এ গর্ব্ব করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন,—'ক্রমাগতই বাসনা-হুতাগ্নির হব্য সংগ্রহ করিতে থাকিলে এক দিন জগদ্ব্যাপী অগ্নিকাণ্ড না ঘটিয়া থাকিতে পারে না। এক দিন জাগিয়া উঠিয়া য়ুরোপকে তার লুব্ধতা এবং উন্মত্ত অহঙ্কারের সীমা বাঁধিয়া দিতে হইবে, তার পরে সে আবিষ্কার করিতে পারিবে যে উপকরণই যে সত্য তাহা নয় অমৃতই সত্য।' রবীন্দ্রনাথ স্বাজাতিকতার উপর সার্ব্বভৌমিকতার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা যেন 'হেলে ধরিবার আগে কেউটে ধরিতে' না যাই!—রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধেই বলিয়াছেন,—'বড় ক্ষেতের মধ্যে চারা রোপণ করিবার আগে ছোট ক্ষেতের মধ্যে বীজ বপন করিতে হয়।' যে জাতির অবস্থা 'ইতিহাসের আরম্ভের আদি মানবের মত, তাহার 'কর্ত্তব্যের দায়িত্ব বিশেষভাবে তার স্বজাতির সীমার মধ্যেই সঙ্কীর্ণ' থাকিবে। আগে জাতীয়তা, তার পর 'মানবতা'।—ইংলণ্ডের কবি, ইউরোপের কবি রুডিয়ার্ড কিপ্লিং অবজ্ঞার পর্ব্বতচূড়ায় দাঁড়াইয়া প্রাচী ও প্রতীচীর ভবিষ্যৎ শ্বেতাঙ্গ জাতির বোঝা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা কখনও ভুলিব না। কিন্তু আমাদের কবি প্রস্তাবনে প্রাচী ও প্রতীচীর বৈষম্য উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু জাতিকে উপদেশ দিয়াছেন,—'ঈর্ষ্যার অন্ধতায় য়ুরোপের মহত্ত্ব অস্বীকার করিলে চলিবে না। সেখানকার প্রকৃতিতে কঠোরতা এবং মৃদুতার এমন একটি সামঞ্জস্য আছে যে, তাহা এক দিকে মানবের সমগ্র শক্তিকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়া আনে, আরেক দিকে তাহার চিত্তকে অভিভূত করিয়া নিশ্চেষ্ট অদৃষ্টবাদে দীক্ষিত করে না। একদিকে তাহা য়ুরোপের সন্তানদের

চিত্তে এমন তেজের উদ্রেক করিয়াছে যে তাহাদের উদ্যম ও সাহস কোথাও আপন দাবীর কোনো সীমা স্বীকার করিতে চায় না, অপর দিকে তাহাদের বুদ্ধিতে অপ্রমাদ, তাহাদের কল্পনাবৃত্তিতে সুসংযম, তাহাদের সকল রচনার পরিমিতি এবং তাহাদের জীবনের লক্ষ্যের মধ্যে বাস্তবতা-বোধের সঞ্চার করিয়াছে। তাহারা একে-একে বিশ্বের গূঢ়রহস্য সকল বাহির করিতেছে, তাহাকে মাপিয়া ওজন করিয়া আয়ত্ত করিতেছে; তাহারা প্রকৃতির মধ্যে অন্তরতর যে-একটি ঐক্যতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ধ্যানযোগে বা তর্কের বলে নয়, তাহা বাহিরের পর্দ্দা ছিন্ন করিয়া, বৈচিত্র্যের প্রাচীর ভেদ করিয়া। তাহারা নিজের শক্তিতে রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া প্রকৃতির মহাশক্তিভাণ্ডারের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং লুব্ধ হস্তে সেই ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতেছে।' রবীন্দ্রনাথের এই উপদেশ যেমন মূল্যবান, তাঁহার উদার গুণগ্রাহিতাও সেইরূপ।—দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতা হিন্দুস্থানের কবির চিত্ত অধিকার করিতে পারে না; ইহাতেও আমরা গৌরব-গর্ব্ব অনুভব করিতে পারি।—রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, 'বাহিরের দিক্ হইতে স্বাধীনতা পাওয়া যায় এমন ভুল যদি মনে আঁকড়িয়া ধরি তবে বড় দুঃখের মধ্যেই সে ভুল ভাঙিবে। ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়াই অন্তরে বাহিরে আমাদের বন্ধন। যে হাত দিতে পারে সেই হাতই নিতে পারে। আপনার দেশকে আমরা অতি সামান্যই দিতেছি, সেই জন্যই আপনার দেশকে পাই নাই। বাহিরের এক জন আমার দেশকে হাতে তুলিয়া দিলেই তবে তাহাকে পাইব এ কথা যে বলে সে-লোক দান পাইলেও দান রাখিতে পারিবে না। আপন লোককে দুঃখ দিই, অপমান করি, অবজ্ঞা করি, বঞ্চনা করি, বিশ্বাস করি না, সেই জন্যই আপন পর হইয়াছে, বাহিরের কোনো আকস্মিক কারণ হইতে নয়।'—শ্রীমতী শান্তা দেবীর 'পৌষপার্ব্বণ' নামক গল্পটি উপভোগ্য। গ্রামের ছবি, গ্রামীনের ছবি, এবং গ্রামে জীবনের যে সরলতা ও সরসতা এখনও দেখা যায়, তাহার ছবি বেশ ফুটিয়াছে। স্থানে স্থানে বর্ণনার একটু বাহুল্য, মনোবৃত্তির বিশ্লেষণে একটি অনাবশ্যক প্রাচুর্য্য ও বলিবার আগ্রহের একটু আতিশয্য আছে বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও গল্পটি 'নাটুকে' না হইয়া স্বভাবের অনুগত হইয়াছে। গোপালের চরিত্রটি যেন ফটোগ্রাফের প্লেটে ধরা পড়িয়াছে। লেখিকা অতি সুকৌশলে তাহার প্রতি স্নেহ ও সমবেদনার সৃষ্টি করিয়াছেন; গোপালের অনাবিল প্রেমে পাঠককে বন্দী করিয়া, তাহার সরলতা ও বউদিদির প্রতি প্রেমাতিশয্যের অতর্কিত শোচনীয় পরিণামে গল্পটি যখন শেষ হইয়া যায়, তখন মন বিষাদে ব্যথিত হয়, দীর্ঘনিঃশ্বাস ভিন্ন তখন হৃদয়ের আর কোনও অবলম্বন থাকে না। গল্পটির উপসংহার অত্যন্ত সুন্দর।—লেখিকা অত্যন্ত নিপুণভাবে আড়কাঠীকে গল্পের ক্ষেত্রে আনিয়াছেন। গল্পের অনুরোধে নয়,—সে আপনিই অত্যন্ত সহজভাবে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছে। সে যে এই দুটি সুকুমার হৃদয়ের মধুর মিলনের ধ্বংস করিবার জন্য রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার সহিত পরিচয়কালে তাহা আদৌ মনে হয় না। এই জন্য উপসংহারটি অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত হইয়াছে, কিন্তু অস্বাভাবিক হয় নাই। যে সকল ছোট গল্পের শেষ পর্য্যন্ত না পড়িলেও অত্যন্ত অনায়াসে উপসংহারে উপনীত হওয়া যায়, 'পৌষপার্ব্বণ' সে শ্রেণীর অন্তর্গত নয়।—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সরকার 'পৌর আদর্শ'

প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতীয় চাণক্য, শুক্রাচার্য্য ও ভোজ, এবং অ্যারিষ্টটল, প্লেটো প্রভৃতি গ্রীক মনীষীদের পুর-রচনার আদর্শের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন।—প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য—তথ্যপূর্ণ। শ্রীমণিকান্ত হালদারের 'অভিযানের গান' কেন ছাপা হইল, বলিতে পারি না। ভাবও নূতন নয়, রচনাতেও কোনও বিশেষত্ব নাই। রবীন্দ্রনাথ কি কুক্ষণেই তরী ভাসাইয়াছিলেন, পাল তুলিয়াছিলেন, খেয়া ভাসাইয়া এ পার হইতে ও পারে পাড়ী দিয়াছিলেন। হায়! তিনি কি তখন জানিতেন—কত নিরীহ 'কবি'র 'ভরা ডুবী'র পথ প্রশস্ত করিলেন। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চন্দ 'জহ্নুকন্যা' নামক পদ্যে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা গদ্যে লিখিলে সম্ভবতঃ 'প্রবাসী'তে ছাপা হইত না; ছাপা হইলেও সম্ভবতঃ চার পাঁচ লাইনে শেষ হইত। আজ কাল বাঙ্গালা দেশে 'মিষ্টিক' কবির ছড়াছড়ি দেখিয়া হাসিও পায়, দুঃখও হয়, এবং ভয় যে না হয়, এমন কথাও বলিতে পারি না।—শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর 'রাজা রামমোহন রায়' প্রবন্ধের প্রথমটা হেঁয়ালির মত হইলেও শেষটা বুঝা যায়। লেখক খাটিয়া লিখিয়াছেন; অল্পের মধ্যে অনেক তথ্য সঞ্চিত করিয়াছেন। শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'অধিকার' নামক ক্ষুদ্র পদ্যটিও পুরাতনের প্রতিধ্বনি। 'কণিকা'র সৃষ্টি শক্তিশালীর পক্ষেই সম্ভবে। epigrammatic কবিতা সুরচিত, সংহত, ক্ষিপ্রগামী লঘুপক্ষ বাণের মত না হইলে একবারে ব্যর্থ হয়। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুদিত লাওয়েলের 'মাতৃভূমি' নামক কবিতাটি দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী হইয়াছে।

'পরসেবারত পড়শী যেথায়, নাহিক একটি দাস—
ধন্য রে ভাই জন্মেছ সেথা, সে দেশে আমারও আশ!'

বাঙ্গালীকে শুনাইবার সময় হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'অর্দ্ধণ্যদর্শনের দুর্ভেদ্য গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া সাংখ্য-বেদান্তে প্রবেশ' আমাদের মত অনধিকারীর পক্ষেও 'দুর্ভেদ্য' বটে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রবাবুর আকর্ষণে সে গিরিসঙ্কটেও প্রবেশ না করিয়া থাকা যায় না।—দর্শনের তত্ত্ব সাধারণ পাঠকের অধিগম্য না হউক, রচনার বিচিত্র ভঙ্গী সকলেরই উপভোগ্য। সে ভঙ্গী দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিজস্ব—অতুলনীয়। উপমাগুলি স্বতন্ত্রভাবেও উপভোগ করিবার উপযুক্ত। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চন্দের 'একটি উপমা'—

'বায়স ঠোকর মারে নৈবেদ্যের পরে
সজ্জন লাঞ্ছিত হয় পাপিষ্ঠের করে।'

আমরা যদি ইহার উপর কলমের 'ঠোকর মারি', তাহা হইলে 'বায়স' হইতে পারি। কিন্তু এ বয়সে আর উড়িবার সাধও নাই, সাহসও নাই। অগত্যা কবিতায় বলি,—

বায়স ঠোকর মারে 'প্রবাসী'র পরে,
হাড়গিলে বলে—আমি আছি আশা করে'!

কেমন কবিতা হইল?—সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুদিত 'মা' গল্পটি চলনসই। শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ সাদী হইতে 'গুণের আদরে'র আমদানী করিয়াছেন।—গুণের আদর করিতে আমরা বাধ্য, কিন্তু এ অনুবাদের গুণের আদর করিতে পারিলাম না। কারণ মাথা না থাকিলে মাথাব্যথা হইতে পারে না।—'পঞ্চশস্যে' অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ

আছে। 'ভারতের বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদ' ছবিনায়। 'দেশের কথা' সকল বাঙ্গালীকে পড়িতে বলি। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' হইতে আমরা 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন' উদ্ধৃত করিলাম।

একটি আটপৃষ্ঠাব্যাপী মুদ্রিত কাগজ আমাদের হাতে আসিয়াছে। গতবর্ষে বাঁকীপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন রেজিষ্টারী করিবার জন্য যে প্রস্তাব যথেষ্ট নোটিশ ব্যতিরেকেও গৃহীত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কি করা হইয়াছে, ঐ কাগজে তাহা লিখিত আছে। কাগজটির প্রথম অংশ একটি চিঠির আকারে লিখিত। দ্বিতীয় অংশে কতকগুলি নিয়ম আছে। চিঠিটির ঠিকানা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির। এখান হইতে এই চিঠিটি কেন লিখিত হইল জানি না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কি ইহা লিখিতে অনুমতি দিয়াছেন, বা ইহার অনুমোদন করিয়াছেন? লোকের হঠাৎ তাহাই মনে হইবে। ইহাতে কোন কৌশল আছে কি? মুদ্রিত কাগজটিতে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার জন্য গঠিত শাখা-সমিতি দ্বারা প্রণীত মূল নিয়মাবলীর প্রথম নিয়মে সম্মিলনের যে উদ্দেশ্য লেখা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে পরিষদের উদ্দেশ্যের মিল আছে বোধ হয়। পরিষদের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক না থাকায় উহার উদ্দেশ্য কিরূপ বর্ণিত আছে জানি না। কিন্তু পরিষদের কাজ দেখিয়া বোধ হয় সম্মিলনের প্রস্তাবিত নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যের সহিত উহার উদ্দেশ্য অনেক মিলে :—

"সুধীগণের মধ্যে ভাববিনিময়, বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা ও প্রচার, বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী-জাতি সম্বন্ধে স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা সর্ব্ববিধ তথ্য নির্ণয় এবং জনগণের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ ও জ্ঞানের বিস্তার।"

সুতরাং পরিষদের কাজে এই প্রস্তাবিত সম্মিলনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবার সম্ভাবনা। একই উদ্দেশ্যে কোন দেশে একাধিক সমিতি বা সভা থাকিলে বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবেই, এমন কথা আমরা বলি না। কিন্তু যখন একটি পুরাতন সভাই জনসাধারণের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পায় না, তখন কতকটা সেই উদ্দেশ্যে আর একটি সভা করিলে, পুরাতন সভার আরো কম সাহায্য পাইবার কথা; সুতরাং উভয়ের কিছু সংঘর্ষও অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য আমরা পুরাতনকেই পুষ্ট করিবার পক্ষপাতী।

যখন বাঁকীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনকে রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত হঠাৎ একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় ও উহা গৃহীত হয়, তখন আমরা, গত বৎসর মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে লিখিয়াছিলাম;

"এতদিন সাহিত্যপরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা, সম্মিলনের সাধারণ সমিতি হইতে নির্ব্বাচিত দশজন সভ্যের সহযোগিতায়, সম্মিলনের কার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন। এই পরিচালন-সমিতিকে কি অকস্মাৎ উড়াইয়া দেওয়া হইল? পরিষদ, কয়েকমাস হইল, বাংলা দেশের ও তাহার বাহিরের সমুদয় বঙ্গীয়-সাহিত্যিক সভাসমিতির সহযোগিতালাভের চেষ্টার সূত্রপাত করিয়াছেন। সম্মিলনেরও উদ্দেশ্য যখন সমুদয় বাংলাসাহিত্য-বিষয়িণী চেষ্টাকে একলক্ষ্য ও পরস্পর সহযোগিতাসূত্রে আবদ্ধ করা, তখন সাহিত্যপরিষদের এই চেষ্টাকেই সাহায্যদানে প্রবলতর করিলে কি ক্ষতি হইত?......শুনিলাম, বাঁকিপুরে কমিটি নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে অনেক সভ্য

বিষয়টির ভাল করিয়া আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং যোগ্য ব্যক্তিদের মত লইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন ; কিন্তু সভাপতির শাসনদণ্ড-পরিচালনে এসব চেষ্টা ভূমিসাৎ হইয়াছিল।"

যাহা হউক, আমরা এখনও বলি, প্রস্তাবটি পরিষদসমূহের ও সাহিত্যসভার সকল সভ্য এবং সমুদয় সাহিত্যিক ও সংবাদপত্র-সম্পাদককে পাঠাইয়া রীতিমত আলোচনার 'পর সম্মিলনের আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিলে ভাল হয়। চিঠিখানির তারিখ ২৮শে কার্ত্তিক, ১৩২৪ ; উহার লেখক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত উহা আমাদিগকে না পাঠাইলেও উহা আমাদের হাতে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু খুব বিলম্বে, ২৬শে পৌষ, পৌঁছিয়াছে। এইজন্য বেশী কিছু লিখিতে পারিলাম না। চিঠিখানি কাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লেখা হইয়াছে এবং কাহাদিগকে পাঠান হইয়াছে জানি না ; কোথাও তাহা লেখা নাই ; কেবল দেখিতেছি উহার নিম্নলিখিত বাক্যে ও অন্যত্র বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে :—"এখন আপনাদের পক্ষে বিচার্য্য এই যে, আপনারা দেশে একটি সাহিত্য-সম্মিলন চান, কি একাধিক সাহিত্য-সম্মিলন চান ?" এই "আপনারা" কাহারা ?

'প্রবাসী' যাহা বলিয়াছেন, তাহা ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত ; আমরা তাঁহার সমর্থন করিতেছি।

ইষ্টি যাগ ও পশু যাগ।

এক শ্রেণির শ্রৌত যজ্ঞের নাম ইষ্টি যাগ। আহিতাগ্নি গৃহস্থকে প্রত্যেক অমাবস্যায় এবং প্রত্যেক পূর্ণিমায় একটি ইষ্টি যাগ করিতে হইত। যাবজ্জীবন করাই বিধি; ন্যূন পক্ষে ত্রিশ বৎসর ধরিয়া করিতে হইত। অমাবস্যার ইষ্টি যাগের নাম দর্শ যাগ, আর পূর্ণিমার ইষ্টি যাগের নাম পূর্ণমাস যাগ। উভয় যজ্ঞেরই বিধিবিধান প্রায় একরূপ। আমি কেবল পূর্ণমাস যাগের বিবরণ দিব। পূর্ণমাস যাগের অনুষ্ঠানটি আয়ত্ত হইলে যাবতীয় ইষ্টি যাগের অনুষ্ঠান বুঝিতে পারা যাইবে। যাজ্ঞিকের ভাষায় পূর্ণমাস যাগ যাবতীয় ইষ্টি যাগের প্রকৃতি বা model. আর আর ইষ্টি যাগ তাহার বিকৃতি। পূর্ণমাস যাগের বিধি সকল ইষ্টি যাগেই প্রযোজ্য; কেবল ক্ষেত্রভেদে বিশেষ বিধি রহিয়াছে।

পূর্ণমাস যাগ প্রত্যেক পূর্ণিমায় সম্পাদ্য। এই যজ্ঞে প্রধান আহুতি দুইটি। প্রথম আহুতি অগ্নিদেবতার উদ্দিষ্ট; দ্বিতীয় আহুতি অগ্নি এবং সোম এই উভয় দেবতার প্রতি একযোগে উদ্দিষ্ট। যে দ্রব্য আহুতি দেওয়া যায়, তাহার নাম পুরোডাশ। এই পুরোডাশ যবের অথবা চাউলের রুটি মাত্র। যব অথবা চাউল বাটিয়া আগুনে সেকিয়া এই রুটি প্রস্তুত হয়। অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ স্বহস্তে এই পুরোডাশ প্রস্তুত করেন। কয়েক মুঠা যব অথবা ব্রীহি ধান লইয়া তাহা উখুলে রাখিয়া কাঁড়িতে হয়; তার পর কুলা দ্বারা ঝাড়িয়া তুষ ও ক্ষুদ গুঁড়া পৃথক করিয়া ফেলিতে হয়; তাহার পর শিলে বাটিয়া পিটুলি তৈয়ার হয়। এই পিটুলি আগুনে সেকিয়া রুটি বা পুরোডাশ তৈয়ার হইবে। সেকিবার জন্য কয়েক খানি ছোট ছোট মাটির খোলা বা কপাল থাকে। খোলাগুলি চতুষ্কোণ; কতকগুলির কোণ ভাঙ্গিয়া ও ঘষিয়া অর্দ্ধবৃত্তাকার করিয়া লওয়া যায়। চতুষ্কোণ খোলা মাঝে রাখিয়া তাহার চারিপাশে কোণহীন খোলাগুলি সাজাইয়া বসাইতে হয়; মাঝে যেন ফাঁক না থাকে। অগ্নির উদ্দিষ্ট প্রথম পুরোডাশের জন্য আটখানি খোলা এইরূপে সাজাইতে হয়; ইহার নাম অষ্টাকপাল পুরোডাশ। অগ্নি ও সোমের উদ্দিষ্ট দ্বিতীয় পুরোডাশের জন্য এগার খানি খোলা সাজাইতে হয়; ইহার নাম একাদশকপাল পুরোডাশ।

গার্হপত্যের আগুনে খোলাগুলি তপ্ত করিয়া তাহার উপরে সেই যবের বা চাউলের পিটুলি ঢালিয়া দিয়া গার্হপত্যের অঙ্গারেই সেকিতে হয়। এইরূপে পুরোডাশ তৈয়ার হইলে তাহাতে ঘি মাখাইয়া বেদির উপরে যথাস্থানে রাখিয়া দিতে হয়। যথাকালে এই পুরোডাশ আহুতি দিতে হইবে। সমুদায় কর্ম্ম অধ্বর্য্যু স্বহস্তে সম্পাদন করেন। প্রত্যেক কর্ম্মের জন্য নির্দ্দিষ্ট যজুর্মন্ত্র থাকে।

প্রধান যাগের কথা বলিলাম। প্রধান যাগের পূর্ব্বে এবং পরে কর্ম্মাঙ্গস্বরূপে আরো কতকগুলি অপ্রধান যাগ করিতে হয়। কতকগুলি হোমও করিতে হয়। যাগের সহিত হোমের পার্থক্য আছে। যাগকালে আহুতি দেন অধ্বর্য্যু; কিন্তু মন্ত্র পাঠ করেন আর এক জন ঋত্বিক, তাঁহার নাম হোতা। হোতা দেবতা আহ্বান করিয়া মন্ত্র পাঠ করেন। মন্ত্রের পর বৌষট্ শব্দ উচ্চারণ করেন, ইহার নাম বষট্কার। এই বষট্কারের সঙ্গে সঙ্গে অধ্বর্য্যু আহুতির দ্রব্য অগ্নিতে অর্পণ করেন। তাঁহাকে কোনও মন্ত্র পড়িতে হয় না। ইহারই নাম যাগ। আর হোম অনেকটা সংক্ষিপ্ত ব্যাপার। ইহাতে হোতার দরকার হয় না। অধ্বর্য্যু অগ্নির পাশে বসিয়া নিজেই যজুর্মন্ত্র পাঠ করেন; মন্ত্রের পর স্বাহা উচ্চারণ করেন। ইহার নাম স্বাহাকার। স্বাহাকারের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিতে আহুতি দেন। ইহাই হইল হোম। পূর্ণমাস যজ্ঞে প্রধান যাগের পূর্ব্বে বা পরে যে সকল অপ্রধান যাগ বা হোম করিতে হইত, যথাক্রমে তাহার উল্লেখ করিব।

পূর্ণমাস যাগে চারি জন ঋত্বিকের প্রয়োজন হয়। প্রথম অধ্বর্য্যু; পুরোডাশ প্রস্তুত করা হইতে আহুতি দান পর্য্যন্ত সমুদায় কাজই অধ্বর্য্যুর। মুখ্যতঃ যজুর্মন্ত্র সাহায্যে ইহাকে কাজ করিতে হইত; এইজন্য ইনি যজুর্ব্বেদে অভিজ্ঞ। এই হিসাবে অধ্বর্য্যু ঋত্বিকগণের মধ্যে প্রধান। তিনি অধ্বরের অর্থাৎ যজ্ঞের যেন দেহ নির্ম্মাণ করেন। দ্বিতীয় ঋত্বিকের নাম হোতা। ইনি মন্ত্র পড়িয়া আহুতির পূর্ব্বে দেবতাকে আহ্বান করেন। হোতা শব্দ হ্বে ধাতু হইতে উৎপন্ন। দেবতাকে আহ্বান করেন বলিয়া ইহার নাম হোতা। হোতার পাঠ্য অধিকাংশ মন্ত্রই ঋক্ মন্ত্র। এই জন্য হোতার ঋগ্বেদে বিশেষজ্ঞ হওয়া দরকার। ইষ্টি যাগে সাম গানের প্রয়োজন হয় না। সে জন্য উদ্গাতার বা অন্য সামগায়ী ঋত্বিকের দরকার হয় না। তৃতীয় ঋত্বিকের নাম ব্রহ্মা। ইনি অধ্বর্য্যু এবং হোতা উভয়েরই উপরে। উভয়ের কর্ম্ম পরিদর্শন করেন;

ভ্রান্তি ঘটিলে সংশোধনের ব্যবস্থা দেন। চতুর্থ ঋত্বিকের নাম অগ্নীৎ; ইনি ব্রহ্মার সহকারী। এই চারি জন ঋত্বিককে পূর্ব্ব হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া পূর্ণমাস যাগ আরম্ভ করিতে হয়।

যাগের পূর্ব্ব দিন পূর্ব্বাহ্নের ক্রিয়া অন্বাধান এবং অপরাহ্নের ক্রিয়া ব্রত গ্রহণ। পূর্ব্বাহ্নে যজমান গার্হপত্য আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি, এই তিন অগ্নিতে এক এক খানি সমিৎ ফেলিয়া যজ্ঞের জন্য অগ্নিকে অনুকূল করিয়া রাখেন। অগ্নিকে যেন বলিয়া রাখা হয়, কাল আমি যাগ করিব, এখন হইতে তুমি প্রস্তুত হইয়া থাক। অপরাহ্নে যজমান ক্ষেউরির পর স্নানান্তে কিছু খাইয়া লন; পরে অগ্নির পাশে দাঁড়াইয়া, আমি সত্য কথা কহিব, ইত্যাদি কতিপয় নিয়ম পালনের প্রতিজ্ঞা করেন। এই কর্ম্মের নাম ব্রত গ্রহণ। পত্নী সহিত যজমান অগ্নি-শালাতেই শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করেন।

পরদিন প্রাতে অগ্নিহোত্র সমাপনের পর ইষ্টি যাগ। যজমানের প্রথম কাজ ব্রহ্মার বরণ। বরণের পর ব্রহ্মা আহবনীয়ের দক্ষিণে আসন গ্রহণ করেন, এবং সেখানে বসিয়াই সর্ব্ব কর্ম্ম পরিদর্শন করেন। ব্রহ্মার বাম দিকে যজমানের বসিবার স্থান। যজমানের পত্নী গার্হপত্যের দক্ষিণে বসেন। তিনি যখন গৃহিনী, তখন গার্হপত্যের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ। বেদির উত্তর দিকে হোতার এবং অগ্নীতের আসন। অধ্বর্য্যু যাগ কালে বসিতে পান না; তাঁহাকে নানা কর্ম্মে এখানে ওখানে ঘুরিতে হয়।

বরণের পর ব্রহ্মা স্বস্থানে বসিলে প্রণীতা-প্রণয়ন কর্ম্ম হয়। প্র উপসর্গের অর্থ সম্মুখে—পূর্ব্ব মুখে; প্র-ণয়ন শব্দের অর্থ পূর্ব্ব মুখে লইয়া যাওয়া। খানিকটা জল পূর্ব্ব মুখে লইয়া আহবনীয়ের পার্শ্বে স্থাপন করা হয়। আগে বলিয়াছি, বেদির পূর্ব্ব দিকে আহবনীয়ের স্থান। এই জলের নাম প্রণীতা। সংস্কৃত ভাষায় অপ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, সেইজন্য প্রণীত বিশেষণটা স্ত্রীলিঙ্গে আকারান্ত। যাগশেষ পর্য্যন্ত সেই জল সেইখানে থাকে। তাৎপর্য্য, উহা স্বস্থানে থাকিয়া যজ্ঞকে রক্ষা করিবে। শতপথ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, জল অসুর ও রাক্ষসগণের পক্ষে বজ্রস্বরূপ; উহারা সেই বজ্র দেখিলে যজ্ঞভূমিতে আসে না। এদিকে অধ্বর্য্যু যজ্ঞের সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ করিয়া গোছাইয়া রাখেন এবং যথাকালে বেদির উপর সাজাইয়া রাখেন। ইষ্টি যাগে অনেকগুলি সরঞ্জামের দরকার হয়। কতকগুলি সরঞ্জামের নাম জানা আবশ্যক। শ্রেণি বিভাগ করিয়া তাহাদের উল্লেখ করিতেছি। (১) যজ্ঞিয় কাঠের কতকগুলি টুকরা দরকার হয়, এই

কাষ্ঠ খণ্ডের নাম সমিৎ। তিন খানি সমিধে আহবনীয় অগ্নিকে ঘেরিয়া বেড়া দিতে হয়। এই তিন খানির নাম পরিধি। আর কয়খানি সমিৎ যাগের পূর্ব্বে আগুন জ্বালাইবার জন্য পৃথক থাকে। আগুন জ্বালানর নাম সমিন্ধন। অধ্বর্য্যু এক একখানি সমিৎ আহবনীয় অগ্নিতে ফেলিয়া দেন, আর হোতা এক একটি ঋক্ মন্ত্র পাঠ করেন। অগ্নি সমিন্ধনের জন্য প্রযুক্ত হয় বলিয়া এই মন্ত্রের নাম সামিধেনী ঋক্। (২) কয়েক আঁটি দর্ভের বা কুশের প্রয়োজন। বেদির উপরে এই কুশগুলি বিছাইয়া তাহার উপর যাগের সরঞ্জামগুলি সাজাইয়া রাখিতে হয়। কুশের একটা আঁটি পৃথক্ বাঁধা থাকে, তাহার নাম প্রস্তর। যে হাতায় আহুতির দ্রব্য লইয়া আহুতি দেওয়া হয়, তাহার নাম জুহূ। জুহূখানি ঐ প্রস্তরের উপরে রাখিতে হয়। এই প্রস্তর নিতান্ত সামান্য বস্তু নহে। উহার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে, সে কথা পরে বলিব। (৩) পূর্ণমাস যজ্ঞে প্রধান যাগে পুরোডাশ আহুতি হয়। তাহার পূর্ব্বে এবং পরে অপ্রধান যাগগুলিতে আজ্যাহুতি হয়। যজ্ঞে ব্যবহার্য্য সংস্কৃত ঘৃতের নাম আজ্য। একটা মাটীর মালসায় এই আজ্য থাকে, তাহার নাম আজ্যস্থালী। আজ্যস্থালী হইতে আজ্যগ্রহণের জন্য চারি খানি কাঠের হাতার দরকার। একখানির নাম ধ্রুবা। বেদির উপর স্থিরভাবে থাকে বলিয়া উহার নাম ধ্রুবা। আজ্যস্থালীর আজ্য ধ্রুবাতে ঢালিতে হয় এবং যাগের সময়ে সেই ধ্রুবা হইতেই আজ্য লওয়া হয়। ধ্রুবা হইতে আহুতির জন্য আজ্য গ্রহণের একখানি ছোট হাতা থাকে; সেখানির নাম স্রুব। আর একখানি বড় হাতা থাকে, সেই খানি জুহূ। জুহূর নাম আগেই উল্লেখ করিয়াছি। আহুতির সময় অধ্বর্য্যু ছোট স্রুবের দ্বারা ধ্রুবা হইতে আজ্য তুলিয়া লন এবং জুহূতে ঢালিয়া দেন। চতুর্থ হাতার নাম উপভৃৎ; ইহা জুহূর চেয়ে ছোট। যাগের সময় অধ্বর্য্যু ডানি হাতে জুহূ এবং বাম হাতে উপভৃৎ গ্রহণ করেন। উপভৃৎ খানি জুহূর নীচে থাকে। উদ্দেশ্য যে, জুহূস্থিত আহুতি দ্রব্য যেন ভূমিতে না পড়ে; দৈবাৎ পড়িলে যেন উপভৃতেই পড়ে। (৪) পুরোডাশ-প্রস্তুত করিবার জন্য কতকগুলি সরঞ্জাম আবশ্যক। যথা (ক) অগ্নিহোত্রহবনী—ইহার কথা অগ্নিহোত্র প্রসঙ্গে বলিয়াছি; ইষ্টি যাগে সেই অগ্নিহোত্রহবনী পুরোডাশার্থ যব বা ধান আনিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। (খ) উদূখল মুষল—সেই যব বা ধান উখুলে রাখিয়া মুষল প্রয়োগে কাঁড়া যায়। (গ) স্থূর্প বা কুলা,—ধান ঝাড়িয়া তুষ পৃথক্ করিবার

জন্য আবশ্যক। (ঘ) দৃষৎ ও উপল অর্থাৎ শিল ও নোড়া, চাউল বাঁটিবার জন্য আবশ্যক। (চ) শম্যা, একখানা কাঠ; চাউল বাঁটিবার সময় নীচে এই কাঠ খানা পাতিলে শিলখানা ঢালু হয় ও চাউল বাঁটার সুবিধা হয়। (ছ) কৃষ্ণাজিন অর্থাৎ কাল হরিণের চামড়া; চাউল কাঁড়িবার সময় উদূখলের নীচে ও বাঁটিবার সময় শিলের নীচে পাতা থাকে।

অধ্বর্য্যু বেদির উপর কুশ বিছাইয়া ঐ সকল সরঞ্জাম সাজাইয়া ফেলেন। তার পর যাগের জন্য আহবনীয় অগ্নি ভাল করিয়া জ্বালিতে হয়—ইহাই অগ্নি সমিন্ধন; ইহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হোতা এক একটি সামিধেনী ঋক্ পাঠ করেন, আর অধ্বর্য্যু এক একখানি সমিৎ আহবনীয়ে ফেলিয়া দেন; আহবনীয় অগ্নি জ্বলিয়া উঠে।

যজ্ঞের সরঞ্জাম সাজান হইয়াছে; পুরোডাশ প্রস্তুত করিয়া বেদির উপরে যথাস্থানে রাখা হইয়াছে; আহবনীয় অগ্নি জ্বালান হইয়াছে; এখন যাগের জন্য দেবতাদিগকে আহ্বান করিতে হইবে। দেবতাদের আহ্বান হোতার কাজ। কিন্তু হোতা সামান্য মানুষ; তাঁহার ডাকে দেবতারা আসিবেন কেন? আগেই বলিয়াছি, অগ্নি স্বয়ং দেবগণের হোতা। অগ্নি স্বয়ং ডাকিলে তবে দেবতারা আসিবেন; অগ্নিকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু অগ্নিকেই বা ডাকিবে কে? অধ্বর্য্যু ডাকিবেন; হোতাও ডাকিবেন। তাঁহাদের আহ্বানই বা অগ্নি শুনিবেন কেন? প্রাচীন ঋষিগণ মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন; অলৌকিক ক্ষমতাবলে মন্ত্র লাভ করিয়া সেই মন্ত্রে তাঁহারা অগ্নিকে ডাকিতেন; তাঁহাদের ডাক অগ্নি শুনিতেন। যজমান যে গোত্রে জন্মিয়াছেন, সেই গোত্রে পূর্ব্বকালে যে কয়জন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আপন আপন মন্ত্রে আপন আপন অগ্নিকে ডাকিতেন। অগ্নি নিশ্চয়ই তাঁহাদের ডাক শুনিতেন। সেই ঋষিগণের অগ্নির নাম আর্ষেয় অগ্নি বা ঋষিসম্বন্ধীয় অগ্নি; নামান্তর প্রবর অগ্নি। দেবতা আহ্বানের জন্য তৎপূর্ব্বে হোতাকে বরণের নাম প্র-বরণ। যজমানের নিযুক্ত হোতা মানুষ হোতা মাত্র; কিন্তু অগ্নি দেবহোতা। মানুষ হোতাকে যেমন পূর্ব্বে বরণ অথবা প্রবরণ করিতে হয়, দেব হোতা অগ্নিকেও সেইরূপ প্রবরণ করিতে হয়। যজমানের গোত্রের প্রবর্ত্তক প্রাচীন ঋষিদের দোহাই দিয়া ডাকিলে সেই ঋষিদিগের অগ্নি সেই ডাক শুনিতে পারেন। অতএব সেই ঋষিদিগের নামানুসারে দেব হোতা অগ্নিকে ডাকিয়া পরে সেই অগ্নিরই প্রতিনিধি স্বরূপে মানুষ হোতাকে

বরণ করা হয়। এইরূপে নিয়োগ পাইয়া মানুষ হোতা সেই পূর্ব্ব ঋষিগণের অগ্নিকে আহ্বান করেন এবং সেই অগ্নিকেই মন্ত্রদ্বারা দেবতা আহ্বানের জন্য অনুরোধ করেন। বরণান্তে হোতা বেদির উত্তরে স্বস্থানে আসন গ্রহণ করেন।

এখন প্রকৃত পক্ষে যাগ আরম্ভ হয়। যাগগুলির নাম একে একে করিব। (১) প্রযাজ যাগ, প্রধান যাগের পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম প্রযাজ। আহুতির দ্রব্য আজ্য। অধ্বর্য্যু ঘৃতধারা দ্বারা আঘার হোম করিয়া পরে প্রযাজ যাগ করেন। পাঁচ দেবতার উদ্দেশে পাঁচটি আহুতি দেওয়া হয়। দেবতাদের নাম শুনিলে আপনারা চমকিয়া উঠিবেন। এখনও আমরা বেদপন্থী বলিয়া পরিচয় দিই বটে; কিন্তু এই দেবতাদের নাম একবারে ভুলিয়া গিয়াছি। প্রথম দেবতা সমিৎ; দ্বিতীয় দেবতা তনূনপাৎ, অথবা যজমানের গোত্রভেদে নরাশংস; তৃতীয় দেবতা ইড়ঃ; চতুর্থ দেবতা বর্হিঃ; পঞ্চম দেবতা স্বাহাকার। (২) পঞ্চ প্রযাজের পর অগ্নির উদ্দেশে একবার এবং সোমের উদ্দেশে একবার আজ্য আহুতি, ইহার নাম আজ্যভাগ দান। (৩) আজ্যভাগ্ দানের পর প্রধান যাগ। অগ্নির উদ্দেশে প্রথম পুরোডাশ, এবং তৎপরে অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে দ্বিতীয় পুরোডাশ দান। দুইয়ের মাঝে অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে একটু ঘৃতাহুতি দিতে হয়। উপাংশু অর্থাৎ অনুচ্চ স্বরে মন্ত্র পাঠ হয় বলিয়া এই ঘৃতাহুতির নাম উপাংশু যাগ। (৪) তৎপরে স্বিষ্টকৃৎ যাগ। পুরোডাশ দুই খানির সমস্তটা আহুতি দিতে হয় না; খানিকটা রাখিতে হয়। ইহারই কিয়দংশ কাটিয়া লইয়া অগ্নি স্বিষ্টকৃতের উদ্দেশে দেওয়া হয়। অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ রুদ্র দেবতার মূর্ত্তি। এই রুদ্র দেবতাটিকে লোকে ভয় করিত। ইহার বাণকে সকলে ভয় করিত। এমন কি, স্পষ্ট করিয়া ইহার নাম উচ্চারণে সকলে সাহসী হইত না। উগ্র, ভীম, কপর্দ্দী প্রভৃতি বিশেষণে ইহার স্বভাবের পরিচয় পাইবেন। ইহাঁকে খুসী রাখিবার জন্য কখন কখন শঙ্কর বলা হইত। ফলে, বেদপন্থীদের অন্যান্য দেবতাদের সহিত ইহাঁর পার্থক্য ছিল। ইনি একবার দেবতাদের অনুরোধে স্বয়ং প্রজাপতিকে লক্ষ্য করিয়া বাণ ছুড়িয়াছিলেন। দেবতারা খুসী হইয়া ইহাঁকে পশুগণের আধিপত্য দিয়াছিলেন। তদবধি ইনি পশুপতি হইয়াছেন। অতি পূর্ব্বে ইনি যজ্ঞের ভাগ পাইতেন না; জোর করিয়া যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করেন। তদবধি স্বিষ্টকৃৎ যাগের প্রচলন। স্বিষ্টকৃৎ যাগে যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহা রুদ্রদেবই অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ মূর্ত্তিতে

গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে দক্ষযজ্ঞ ঘটিত পৌরাণিক উপাখ্যান আপনাদের মনে আসিবে। (৫) স্বিষ্টকৃৎ যাগের পর অনুযাজ যাগ। প্রধান যাগের পূর্ব্বে যেমন প্রযাজ, পরে তেমনই অনুযাজ। প্রযাজ যাগের পাঁচ দেবতা; অনুযাজের তিন দেবতা—বর্হিঃ, নরাশংস, এবং পুনরায় অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ। আহুতির দ্রব্য আজ্য।

প্রধান ও অপ্রধান এই সমুদায় যাগের সম্পাদনে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে। আগে বলিয়াছি অধ্বর্য্যুই যাগকর্ত্তা; হোতা দেবতার আহ্বানকারী মাত্র। আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দিয়া যাগ হয়। অধ্বর্য্যুর আসন আহবনীয়ের উত্তরে; সেইখানে তিনি দাঁড়াইয়া থাকেন। যে কোনও যাগের পূর্ব্বে তিনি ডানি হাতে জুহূ এবং বাম হাতে উপভৃৎ লইয়া বেদির উত্তর হইতে দক্ষিণে চলিয়া আসেন। দক্ষিণে দাঁড়াইয়া তিনি অগ্নীৎ নামক ঋত্বিককে আদেশ দেন—"ও শ্রাবয়" অর্থাৎ দেবতাদিগকে মন্ত্র শুনিতে অনুরোধ কর। অগ্নীৎ বেদির উত্তরে একখানি কাঠের তলওয়ার তুলিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। এই তলোয়ার খানির নাম স্ফ্য। তিনি উত্তরে বলেন—"অস্তু শ্রৌষট্" অর্থাৎ আচ্ছা, দেবতারা শুনিতেছেন। তখন অধ্বর্য্যু হোতাকে দেবতার আহ্বানে আদেশ দেন। হোতাকে দুইটি মন্ত্র পড়িতে হয়। প্রথমটির নাম অনুবাক্যা; ইহা ঋক্ মন্ত্র। এই মন্ত্র দ্বারা দেবতাকে অনুকূল করা হয়। দ্বিতীয় মন্ত্রের নাম যাজ্যা; এই মন্ত্র কখন ঋক্, কখন যজুঃ। ইহাই যাগের মন্ত্র, এইজন্য নাম যাজ্যা। মনে করুন, যাগের দেবতা অগ্নি। হোতা মন্ত্র পাঠের পূর্ব্বে "যে যজামহে অগ্নিং দেবম্"—বলিয়া আরম্ভ করেন। এই টুকুর নাম আগূঃ। তৎপরে যাজ্যা মন্ত্র পড়িয়া বলেন—"অগ্নে বীহি বৌষট্"—অগ্নি ইহা ভক্ষণ করুন এবং দেবতার নিকট বহন করুন। ঐ বৌষট্ উচ্চারণই বষট্কার। ঐ বষট্কারের সঙ্গে সঙ্গে অধ্বর্য্যু আহুতির দ্রব্য আজ্যই হউক আর পুরোডাশই হউক, অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। যজমান অধ্বর্য্যুকে স্পর্শ করিয়া থাকেন; যজমান আহুতির পর ত্যাগ মন্ত্র বলেন। "ইদম্ অগ্নয়ে—ন মম"—এই দ্রব্য অগ্নিকে দেওয়া হইল, আমার থাকিল না,—ইহাই ত্যাগমন্ত্র। দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগের নামই যাগ। যজমান এইরূপে দ্রব্য ত্যাগ করিলেন। ত্যাগ মন্ত্র পাঠের পর অধ্বর্য্যু অগ্নির দক্ষিণ হইতে আবার উত্তরে অর্থাৎ স্বস্থানে ফিরিয়া আসেন। প্রত্যেক যাগেরই এই সাধারণ বিধি।

একটা বড় কথা বলিতে বাকি আছে। উহা হবিঃশেষ ভক্ষণ। হবিঃশেষ না

খাইলে কোনও যজ্ঞই সম্পূর্ণ ও সার্থক হয় না। অগ্নিহোত্র প্রসঙ্গে বলিয়াছি, সমস্ত দুধটা আহুতি দেওয়া হয় না; একটু শেষ থাকে, তাহা খাইতে হয়। পূর্ণমাস যাগেও সমস্ত পুরোডাশ আহুতি দেওয়া হয় না। খানিকটা পুরোডাশ রাখিয়া দিতে হয়। যজমান এবং ঋত্বিকেরা উহা ভক্ষণ করেন। এইজন্য পুরোডাশের শেষ অংশকে কয়েক খণ্ডে ভাগ করিতে হয়। এক খণ্ডের নাম প্রাশিত্র; ইহা ব্রহ্মা ভক্ষণ করেন। আর এক খণ্ডের নাম ষড়বত্ত; এই খণ্ড অগ্নীতের। আর এক খণ্ড চারি টুকরা করিয়া অধ্বর্যু, হোতা, ব্রহ্মা অগ্নীৎ এই চারি জনে প্রত্যেকেই ভক্ষণ করেন। পুরোডাশের আর দুই খণ্ড রাখিয়া দেওয়া হয়। সকল অনুষ্ঠান শেষ হইলে ব্রহ্মা এবং যজমান ঐ দুই খণ্ড ভক্ষণ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পুরোডাশের কিয়দংশ ঘৃতাক্ত করা হয়। এই অংশের নাম ইড়া। যজমান এবং চারি জন ঋত্বিক, সকলে মিলিয়া এই ইড়া ভক্ষণ করেন। এই ইড়া-ভক্ষণ একটা বিশিষ্ট ব্যাপার। এখন আমি ইহার সম্বন্ধে কিছু বলিব না। কিন্তু আপনারা এই ইড়াকে মনে রাখিবেন। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আমাকে পরে বলিতে হইবে। ইড়া ভক্ষণের তাৎপর্য্য না বুঝিলে যজ্ঞের তাৎপর্য্য বুঝা হইবে না। এই ইড়ারই আবার একটি অংশ হোতা পৃথক ভাবে ভক্ষণ করেন। এই অংশের নাম অবান্তর ইড়া। এই হবিঃশেষ ভক্ষণ অনুষ্ঠান স্বিষ্টকৃৎ যাগের পরে এবং অনুযাজ যাগের পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়া যায়। কেবল ব্রহ্মা ও যজমানের ভাগ যজ্ঞসমাপ্তির জন্য রক্ষিত থাকে।

অনুযাজ যাগের সহিত পূর্ণমাস যজ্ঞের প্রধান অনুষ্ঠানগুলি এক রকম সম্পন্ন হইয়া গেল। এখন সমাপ্তিতে পৌছিতে হইবে। প্রস্তর নামক দর্ভমুষ্টির কথা আপনাদের মনে থাকিবে। এক মুষ্টি কুশ বাঁধিয়া বেদির উপর রাখা হইয়াছিল, উহারই নাম প্রস্তর। কিন্তু এই প্রস্তর কেবল কুশের গোছা নহে। ইহাতে যজমানের শরীর কল্পনা করা হয়। অনুযাজ যাগের পর প্রস্তর আহবনীয়ের আগুনে ফেলিয়া দেওয়া হয়। প্রস্তর যখন আগুনে পুড়িতে থাকে, যজমান তখন স্বর্গে যাইতেছেন বুঝিতে হইবে। প্রস্তর পুড়িয়া গেলে বুঝিতে হইবে, যজমান স্বর্গে গিয়া দেবতাদের সহিত মিশিয়াছেন। প্রস্তর পুড়িবার সময় অধ্বর্য্যুর অনুজ্ঞা লইয়া হোতা কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করেন। উহার নাম সূক্তবাক। প্রস্তর পুড়িয়া গেলে আশীর্ব্বাদসূচক আর কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করেন। উহার নাম শংযুবাক। আপনাদের মনে

থাকিবে, যজ্ঞের আরম্ভে তিন খানি সমিৎ কাষ্ঠ দিয়া আহবনীয় অগ্নিকে ঘেরিয়া ফেলা হইয়াছিল। এই সমিৎ কয়খানির নাম পরিধি। মানুষ হোতা দেব-হোতা অগ্নিকে আহবনীয় স্থানে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, আপনাদের মনে আছে। এই পরিধি তিন খানি সেই দেব হোতার শরীর। এখন এই পরিধি কয়খানি অগ্নিতে ফেলিয়া দেওয়া হয়; দেবহোতা যজ্ঞস্থল হইতে চলিয়া যান। এই সময়ে অধ্বর্য্যু বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে একটু আজ্য দিয়া হোম করেন; ইহার নাম সংস্রব হোম। ইহা যাগ নহে, হোম। এই হোমের সহিতই যজমানের পক্ষে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

এতক্ষণ আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে। আমিও এখানে সমাপ্তি দিয়া আপনাদিগকে অব্যাহতি দিতে পারিতাম; কিন্তু যাজ্ঞিকেরা অব্যাহতি দিবেন না। যজমানের পক্ষে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইল। কিন্তু যজমানের পত্নীর পক্ষে এখনও সমাপ্ত হয় নাই। আগেই বলিয়াছি, গার্হপত্য অগ্নির সহিত যজমানের পত্নীর বিশেষ সম্পর্ক। গার্হপত্যের পাশে তিনি এতক্ষণ বসিয়া আছেন। এ পর্য্যন্ত যত যাগ হইয়াছে, সমস্তই আহবনীয় অগ্নিতে হইয়াছে; গার্হপত্যে কোনও যাগ হয় নাই। এখন ব্রহ্মা ছাড়া আর তিন জন ঋত্বিক যজমান পত্নীর নিকটে আসিয়া কয়েকটি আহুতি দেন; গার্হপত্য অগ্নিতে আহুতি দেন। আহুতির দ্রব্য আজ্য। দেবতা যথাক্রমে সোম, ত্বষ্টা, দেবপত্নীগণ এবং অগ্নি গৃহপতি। অগ্নি গৃহপতি ত গার্হপত্য অগ্নির দেবতা। অগ্নি গৃহপতি যজ্ঞভাগে বঞ্চিত হইলে, গৃহিণী তাহা সহিবেন কেন? আর দেবপত্নীগণকেও বঞ্চিত হইতে তিনি দিবেন কেন? প্রধান যাগের পরে যেমন হবিঃশেষ ভক্ষণ হইয়াছিল, গৃহপত্নীর পক্ষে এই যাগের পরও হবিঃশেষ ভক্ষণ করিতে হয়। ভক্ষণের পর সূক্তবাক পঠিত হয় না বটে, তবে শংযুবাক পাঠ করিতে হয়, এবং সংস্রব হোমও করিতে হয়। যজমান-পত্নীর পক্ষে এই যাগের নাম পত্নী-সংযাজ।

দক্ষিণাগ্নি এ পর্য্যন্ত কোন আহুতিই পান নাই। অধ্বর্য্যু দক্ষিণাগ্নিতে এখন একটু আজ্য হোম করেন। পুরোডাশ তৈয়ার করিবার সময় পিটুলির যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে আগুনে দেওয়া হয়। দেবহোতার আহ্বানে যে সকল দেবতা যজ্ঞভাগ পাইবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এখনও যজ্ঞস্থল হইতে যান নাই। অধ্বর্য্যু ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের সকলের জন্য আহবনীয় অগ্নিতে একটু আজ্য অর্পণ

করেন। তখন তাঁহারা চলিয়া যান। ইহার নাম সমিষ্ট-যজুর্হোম। বেদির উপরে যজ্ঞের সরঞ্জামগুলি রাখিবার জন্য যে সকল কুশ বিছান হইয়াছিল, তাহাও আহবনীয়ে ফেলিয়া দেওয়া হয়। যজ্ঞারম্ভে প্রণীতা নামক জল প্রণয়ন করিয়া যজ্ঞরক্ষার জন্য আহবনীয়ের পূর্ব্ব দিকে রাখা হইয়াছিল; যজ্ঞ সমাপ্ত হইল, এখন সেই জল বেদির উপর ঢালিয়া দেওয়া হয়। পুরোডাশের জন্য চাউল ঝাড়িয়া যে তুষ ও ক্ষুদের গুঁড়া অবশিষ্ট ছিল, তাহা রাক্ষসদের প্রাপ্য। ইহাতেই তাহারা খুসী হইবে। রাক্ষসদের উদ্দেশে ইহা ফেলিয়া দেওয়া হয়।

এইবারে যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। যজমান এখন দেবত্ব পাইয়াছেন; এমন কি, দেবগণের মধ্যে পরম দেবতা যে বিষ্ণু, তিনি সেই বিষ্ণুপদের প্রার্থী। আপনারা জানেন, বিষ্ণু ত্রিপাদদ্বারা তিন লোক আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন। সমস্ত বৈদিক সাহিত্য বিষ্ণুর এই ত্রিপাদাক্রমণের মাহাত্ম্য বর্ণনায় পূর্ণ। তদনুকরণে যজমান তিন পা ফেলিয়া পূর্ব্ব মুখে আহবনীয় পর্য্যন্ত যজ্ঞস্থল প্রক্রমণ করেন, ইহার নাম বিষ্ণুক্রম-প্রক্রমণ। পূর্ব্ব দিকে দেবতাদের স্থান; যজমান পূর্ব্ব দিকে তাকাইয়া বলেন, আমি জ্যোতিতে গমন করিয়াছি; জ্যোতির সহিত আমি মিলিত হইয়াছি। পরে যজমান সূর্য্যের এবং গার্হপত্য অগ্নির উপস্থান করিয়া প্রার্থনা করেন, "হে গৃহপতি অগ্নি, আমি যেন তোমা দ্বারা সুগৃহপতি হই"; পুত্রের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন, "আমার এই পুত্র এই বীর কর্ম্মকে অনুক্রমে বিস্তারিত করুক।" তৎপরে আহবনীয় অগ্নির উপস্থান করিয়া যজ্ঞের পূর্ব্ব দিন যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বিসর্জ্জন করেন। বিসর্জ্জনের পর যজ্ঞশালার বাহিরে আসিয়া যজমান এবং ব্রহ্মা পুরোডাশের যে ভাগ তাঁহাদের জন্য রক্ষিত ছিল, তাহা ভক্ষণ করেন। সর্ব্বশেষে ব্রহ্মা আহবনীয়ে সমিৎ দিয়া পূর্ণমাস ইষ্টি সমাপ্ত করিয়া দেন। যজ্ঞান্তে ঋত্বিকদিগকে দক্ষিণা দিতে হয়। পূর্ণমাস যজ্ঞ প্রত্যেক গৃহীর পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ধনী দরিদ্র সকলকেই ইহা করিতে হইবে। দক্ষিণা ব্যয়সাধ্য হইলে চলিবে না। যজ্ঞের আরম্ভে দক্ষিণাগ্নিতে চারি জন ঋত্বিকের উপযুক্ত ভাত চড়াইয়া দেওয়া হয়। উহা দক্ষিণাগ্নিতেই পক্ক হয়। এই অন্নই দক্ষিণা; যজ্ঞশেষে ঋত্বিকেরা এই অন্ন ভোজন করেন; ইহাতেই যজ্ঞ দক্ষিণান্ত হয়।

পূর্ণমাস যজ্ঞের বিবরণ দিলাম। ইহাতেই ইষ্টি যাগ জিনিসটা কি, তাহা আপনারা বুঝিতে পারিবেন। এখন পশুযাগের কথা বলিতে চাহি। পশুযাগ

নানাবিধ। তাহার মধ্যে একটি পশুযাগ অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার নাম নিরূঢ় পশুবন্ধ। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে পূর্ণিমায় বা অমাবস্যায় এই যাগ কর্ত্তব্য। কাহার মতে বৎসরে দুই বার কর্ত্তব্য; উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে। এই পশুযাগ অন্য যাবতীয় পশুযাগের প্রকৃতি। ইহারই বিবরণ দিলে সকল পশুযাগেরই মোটামুটি জ্ঞান জন্মিবে।

ইষ্টিযাগে চারি জন ঋত্বিক আবশ্যক। অধ্বর্য্যু, হোতা, ব্রহ্মা এবং অগ্নীৎ। পশুযাগে আরো দুই জন আবশ্যক। এক জন অধ্বর্য্যুর সহকারী, তাঁহার নাম প্রতিপ্রস্থাতা। আর এক জন হোতার সহকারী; তাঁহার নাম মৈত্রাবরুণ। এই ছয় জন ঋত্বিক লইয়া পশুযাগ আরম্ভ করিতে হয়। ইষ্টি যাগে যজ্ঞের সরঞ্জাম রাখিবার জন্য যে বেদি থাকে, সেই বেদির পশ্চিমে থাকে গার্হপত্য এবং পূর্ব্বে থাকে আহবনীয়। পশুযাগে আরও একটি বেদি নির্ম্মাণ করিতে হয়। ইহার নাম পাশুক বেদি। আহবনীয় অগ্নিরও পূর্ব্ব দিকে এই বেদি নির্ম্মিত হয়। এই পাশুক বেদিরও উপরে আরও একটি ছোট বেদি তুলিতে হয়; তাহার নাম উত্তরবেদি। যজ্ঞশালার উত্তর দিকে মাটি তুলিয়া সেই মাটিতে উত্তর বেদি গড়া হয়। মাটি তুলিলে যে গর্ত্ত হয়, সে গর্ত্তের নাম চাত্বাল। চাত্বালের কাছে পাশুক বেদির ধূলি আবর্জ্জনা স্তূপাকৃতি করিয়া রাখা হয়। ঐ স্তূপের নাম উৎকর। উত্তর বেদির মধ্যস্থলের নাম নাভি। আহবনীয় হইতে অগ্নি আনিয়া এই নাভিতে রাখা হয়। নাভিস্থিত সেই অগ্নিতে আবার নূতন অগ্নি নিক্ষেপ করিতে হয়। অরণি ঘর্ষণ করিয়া অগ্নিমন্থন দ্বারা এই নূতন অগ্নি উৎপাদন হয়। নাভিতে এই দুই অগ্নি মিশাইলে তদবধি এই অগ্নিই নূতন আহবনীয় রূপে গণ্য হইয়া থাকে। পুরাতন আহবনীয় আপনার মর্য্যাদা হারাইয়া তদবধি গার্হপত্যের কাজ করে। পাশুক বেদির উপরে পশুযাগের উপযুক্ত সরঞ্জাম এবং আহুতির দ্রব্য রাখিতে হয়।

পশুবন্ধনের জন্য যূপের দরকার। এই যূপ কাঠের স্তম্ভমাত্র। অধ্বর্য্যু স্বয়ং ছুতারের সহিত বাহিরে গিয়া গাছের ডাল কাটিয়া আনেন। উহার ডালপালা ছাঁটিয়া অষ্ট কোণ স্তম্ভ বা খুঁটি প্রস্তুত করা হয়। যূপ অন্যূন পাঁচ হাত দীর্ঘ হয়; হাতখানেক মাটির নীচে পোঁতা থাকে। পাশুক বেদির পূর্ব্ব দিকে যূপ পোঁতা হয়। আটকোণা যূপের মাথায় একটা মুকুট থাকে; তাহার নাম চষাল। যূপের গায়ে ঘি মাথাইতে হয়; এই কর্ম্মের নাম

যূপাঞ্জন। তার পর দড়ি জড়াইতে হয়, এই দড়ির নাম রশনা। রশনার ভিতর একখণ্ড কাঠ পরাইতে হয়, এই কাষ্ঠখণ্ডের নাম স্বরু। প্রত্যেক কর্ম্ম অধ্বর্য্যু সম্পাদন করেন, আর হোতা প্রত্যেক কর্ম্মের অনুকূলে ঋক্ মন্ত্র পাঠ করেন। এইরূপে যূপ পশুবন্ধনযোগ্য হয়।

বন্ধনের পূর্ব্বে পশুকে দুই গাছি কুশ দ্বারা স্পর্শ করিতে হয়; ইহার নাম উপাকরণ। পশুর দুই শিঙের মাঝে দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ি যূপের রশনায় বাঁধিতে হয়। এইরূপ পশুবন্ধনের নাম পশু নিয়োজন। পশুর কপালে ঘি মাখান হয়।

নিয়োজনের পর যাগের আয়োজন। যাগের আরম্ভ অনেকটা ইষ্টি যাগের আরম্ভেরই মত। উত্তর বেদির নাভিতে যে নূতন আহবনীয় অগ্নি স্থাপিত হইয়াছে, সামিধেনী মন্ত্রের সহিত তাহাতে সমিৎ প্রক্ষেপ করিয়া আগুন জ্বালান হয়। পরে সেই আগুনে আবার হোম করিয়া দেবহোতা অগ্নির বরণ এবং তৎপরে মানুষ হোতার বরণ ইষ্টিযাগেরই মত। বরণ পাইয়া দেবতারা যজ্ঞস্থলে আসেন। এখন প্রধান যাগের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রযাজ যাগ। ইষ্টিযাগে পাঁচটি মাত্র প্রযাজ; পশুযাগে প্রযাজের সংখ্যা এগারটি। এই এগার যাগের দেবতাও এগার জন। ইষ্টি যাগের পাঁচ জন ত আছেনই; তাহার অতিরিক্ত আরো ছয় জন দেবতা পশু যাগে প্রযাজ আহুতি পাইয়া থাকেন। এই এগার জন দেবতার নাম যথাক্রমে (১) সমিৎ, (২) তনূনপাৎ, অথবা নরাশংস (৩) ইড়ঃ, (৪) বর্হিঃ, (৫) দুরঃ, (৬) উষাসানক্তৌ, (৭) দৈব্যৌ হোতারৌ, (৮) ত্রিস্রঃ দেব্যঃ, (ইড়া, সরস্বতী এবং ভারতী, এই তিন দেবী। ইহারা তিনে এক এবং একেই তিন; এই তিন দেবতার কথা আপনারা মনে রাখিবেন; ইহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে) (৯) ত্বষ্টা, (১০) বনস্পতি, (১১) স্বাহাকার। প্রত্যেক প্রযাজ যাগের পূর্ব্বে মৈত্রাবরুণের আদেশ পাইয়া হোতা যাজ্যা মন্ত্র পাঠ করেন। পশু যজ্ঞে প্রযাজ যাগের যাজ্যা মন্ত্রের একটু বিশিষ্টতা আছে। এই যাজ্যা মন্ত্রের নাম আপ্রী মন্ত্র। দেবতাকে প্রীত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় বলিয়া মন্ত্রের নাম আপ্রী মন্ত্র। ঋগ্বেদ সংহিতা মধ্যে অনেকগুলি আপ্রী সূক্ত আছে। প্রত্যেক সূক্তে ঐ এগার দেবতার উদ্দেশে এগারটি আপ্রী মন্ত্র পাওয়া যায়। এক একটি সূক্ত এক এক ঋষির প্রচারিত। কোনও সূক্ত বশিষ্ঠের, কোনটি বিশ্বামিত্রের, কোনটি জমদগ্নির ইত্যাদি। যজমান যে ঋষির গোত্রে উৎপন্ন, সেই ঋষির মন্ত্র

তাঁহার আপ্রী মন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে হয়। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন যজমানের পক্ষে প্রযাজ যাগে যাজ্যা মন্ত্র বা আপ্রী মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। এগার প্রযাজের মধ্যে প্রথম দশটিতে আহুতির দ্রব্য আজ্য। শেষ প্রযাজে আজ্যাহুতি হয় না। সেখানে পশুর বপা আহুতি দিতে হয়। পেটের উপরে নাভির পাশে মেদের নাম বপা। এই বপার দ্বারা অন্তিম প্রযাজের দেবতা স্বাহাকৃতির উদ্দেশে যাগ হয়। কাজেই প্রথম দশ প্রযাজ সম্পন্ন করিয়া শেষ প্রযাজের পূর্ব্বেই পশু বধের আয়োজন করিতে হইবে।

যে ব্যক্তি পশু বধ করে, তাহার নাম শমিতা। পাশুক বেদির উত্তরে চাত্বালের কাছে পশুবধের স্থান। সেই স্থানের নাম শামিত্র দেশ। সেই খানে পশুর অঙ্গ পাকের জন্য আগুন জ্বালিতে হয়। সেই অগ্নির নাম শামিত্র অগ্নি। একজন ঋত্বিকের নাম অগ্নীৎ, ইহাঁকে ইষ্টি যাগেও পাওয়া গিয়াছে। ইনি উল্মুক অর্থাৎ আগুনের উল্কা জ্বালিয়া পশুর চারিদিকে ঘুরাইয়া দেন। উদ্দেশ্য এই যে, রাক্ষসেরা পশুকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। রাক্ষসেরা আগুনকে ভয় করে। এই অগ্নি ভ্রামণ কর্ম্মের নাম পর্য্যগ্নিকরণ। এই সময়ে হোতা পশুবধের জন্য শমিতাকে নিযুক্ত করেন। যে মন্ত্রদ্বারা নিয়োগ করা হয়, তাহার ব্যাখ্যা যিনি জানিতে চাহেন, তিনি আমার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বাঙ্গালা অনুবাদ দেখিবেন। মন্ত্র মধ্যে দুই একটা কথা আপনাদের কৌতুক জন্মাইতে পারে। মন্ত্র মধ্যে বলা হয়,—এই পশুর বধকর্ম্মে ইহার মাতা অনুমতি দিক, পিতা অনুমতি দিক, সহোদর ভ্রাতা অনুমতি দিক, ইহার সখা এবং দলস্থিত অন্যান্য পশুও অনুমতি দিক। আবার বলা হয়,—ইহার পা উত্তর দিক আশ্রয় করুক; চক্ষু সূর্য্যকে আশ্রয় করুক, প্রাণ বায়ুকে, জীবন অন্তরিক্ষকে, শ্রোত্র দিক্‌সকলকে, এবং শরীর পৃথিবীকে আশ্রয় করুক; শেষে বলা হয়,—অহে বধকর্ত্তা, এই পশুকে হনন কর—হনন কর—হনন কর; অপাপ—অপাপ—অপাপ। এই কর্ম্মে যে সুকৃত হইল, তাহা আমাদের উপরে অর্পিত হউক। যে দুষ্কৃত হইল, তাহা অন্যের উপর অর্পিত হউক। মন্ত্র পাঠের পর অগ্নীৎ উল্মুক হস্তে আগে আগে চলেন। শমিতা দড়ি ধরিয়া পশুকে লইয়া চলেন। তৎপশ্চাৎ প্রতিপ্রস্থাতা, অধ্বর্য্যু এবং যজমান চলেন। শামিত্র দেশে অর্থাৎ বধস্থানে উপস্থিত হইয়া অধ্বর্য্যু ভূমিতে একগাছি তৃণ ফেলিয়া দেন এবং যজমান এবং ঋত্বিক সকলে সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া মুখ ফিরাইয়া বসেন, যেন হত্যা কর্ম্মটা দেখিতে না

হয়। বধের রীতিটা বলিতে না হইলেই ভাল হইত। শ্বাস রোধ করিয়া বধ করা হয়। এইরূপ বধের নাম সংজ্ঞপন। বধের পর যজমান, যজমানের পত্নী এবং অধ্বর্য্যু জল ঢালিয়া পশুকে ধুইয়া দেন। অধ্বর্য্যু পেট চিরিয়া বপা বাহির করিয়া লন। তাঁহার সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা দুই খানা কাঠে সেই বপা লইয়া শামিত্র অগ্নিতে তপ্ত করেন; পরে উত্তর বেদির নাভিস্থিত আহবনীয় অগ্নির উপরে ধরিয়া থাকেন। অগ্নির উত্তাপে বপা গলিয়া বিন্দু বিন্দু আগুনে পড়িতে থাকে। অধ্বর্য্যু সঙ্গে সঙ্গে বপার উপর ঘি ঢালেন। সেই বপার কিয়দংশ যথাবিধি আপ্রী মন্ত্র পাঠের পর আগুনে ফেলিয়া অন্তিম প্রযাজ যাগ সম্পন্ন হয়। বপার অবশিষ্ট প্রধান যাগের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়।

আমি নিরূঢ় পশুবন্ধ নামক অবশ্য কর্ত্তব্য পশুযাগের কথা বলিতেছি। এই যাগের প্রধান দেবতা ইন্দ্র এবং অগ্নি। প্রযাজ যাগের পর অধ্বর্য্যু তাঁহাদের উদ্দেশে প্রথমে বপাহুতি দেন। বপাহুতির পর পুরোডাশ আহুতি এবং পশুর অঙ্গ আহুতি। পূর্ণমাস প্রসঙ্গে বলিয়াছি, সেখানে পুরোডাশই প্রধান আহুতি। পশুযাগের আহুতির দ্রব্য পশুর বপা এবং পশুর মাংস। কিন্তু পশুমাংসের সহিত পুরোডাশের আহুতি না দিলে পশুযাগও সম্পন্ন হয় না। ইষ্টি যাগে অধ্বর্য্যু যেমন পুরোডাশ প্রস্তুত করিয়া রাখেন, এখানেও সেইরূপ তাঁহাকে পুরোডাশ প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। বপাহুতির পর এক দিকে শামিত্রাগ্নিতে পশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাক হইতে থাকে। অন্য দিকে অধ্বর্য্যু পুরোডাশ যাগ করিতে থাকেন।

পশুর সকল অঙ্গ মেধ্য অর্থাৎ আহুতিযোগ্য নহে। হৃদয় জিহ্বা প্রভৃতি এগারটি অঙ্গ প্রধান দেবতার আহুতি যোগ্য। পশুর রক্ত রাক্ষসের প্রাপ্য। উহা উৎকরে অর্থাৎ যজ্ঞশালার বাহিরে আবর্জ্জনা স্তূপে ফেলিয়া দেওয়া হয়। যিনি পশুবধকর্ত্তা শমিতা, তিনিই ছুরি দিয়া পশুর অঙ্গগুলি কাটিয়া লন, এবং তিনিই পশুমাংস হাঁড়িতে চাপাইয়া জলে সিদ্ধ করেন।

পুরোডাশ আহুতি শেষ হইলে শমিতা খবর দেন, পশুর অঙ্গ পাক হইয়াছে। অধ্বর্য্যু আসিয়া প্রধান দেবতা ইন্দ্রের ও অগ্নির উদ্দেশে পশুর অঙ্গ আহুতি দেন। অনুবাক্যা পাঠ করেন মৈত্রাবরুণ এবং যাজ্যা পাঠ করেন হোতা স্বয়ং। পাকের হাঁড়িতে মাংস সিদ্ধ করিবার সময় খানিকটা চর্ব্বি ভাসিয়া উঠে, সেই চর্ব্বিতে দধি এবং ঘি মাখাইয়া বনস্পতি দেবতার উদ্দেশে এই সময়ে আহুতি দিবার প্রথা আছে।

প্রধান যাগের পর স্বিষ্টকৃৎ যাগ। আগে বলিয়াছি, ইহা রুদ্র দেবতার প্রাপ্য। পশুর কয়েকটি অঙ্গ এজন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে।

তৎপরে হবিঃশেষ ভক্ষণ। ঋত্বিকেরা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট ভাগ ভক্ষণ করেন, এবং যজমান এবং ছয় জন ঋত্বিক একযোগে ইড়া ভক্ষণ করেন। পূর্ণমাস প্রসঙ্গে বলিয়াছি, এই ইড়া-ভক্ষণের একটা গভীর তাৎপর্য্য আছে; সে তাৎপর্য্যের কথা পরে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে; নতুবা যজ্ঞের তাৎপর্য্যই বুঝান হইবে না।

প্রধান যাগ সমাপ্ত হইল। তৎপরে অনুযাজ। ইষ্টিযাগে অনুযাজের সংখ্যা তিনটি, কিন্তু পশুযাগে অনুযাজের সংখ্যা এগারটি। প্রযাজ যেমন এগারটি, অনুযাজও তেমনি এগারটি। প্রযাজের দেবতাদের অধিকাংশই অনুযাজেরও দেবতা। দধিমিশ্রিত আজ্য দ্বারা এই এগারটি আহুতি দেওয়া হয়। অধ্বর্য্যু আহুতি দেন, আর তাঁহার সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা অন্যত্র আগুন জালিয়া পশুমাংস দ্বারা উপযাজ হোম করেন। এই উপযাজ হোম পশুযাগেই আছে, ইষ্টি যাগে নাই। ইহা যাগ নহে, হোম মাত্র। যাগের ও হোমের পার্থক্য আগে বলিয়াছি। যূপের গায়ে স্বরু নামে যে কাষ্ঠ খণ্ড বাঁধা ছিল, তাহা এই সময়ে আগুনে দেওয়া হয়।

ইহার পর পত্নী-সংযাজ। যজমানের পত্নীর পক্ষে ইহা গার্হপত্য অগ্নিতে অনুষ্ঠেয়। আহুতির দ্রব্য পশুর লাঙ্গূল। ইহাতেই যাগ সমাপ্ত হইল। সূক্ত-বাক, শংযুবাক প্রভৃতির পাঠ হইতে যজমানের বিষ্ণুক্রম প্রক্রমণ এবং ব্রত বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত যাগ সমাপ্তিসূচক কর্ম্ম ইষ্টি যাগের মতই। পুনরুল্লেখ আবশ্যক নহে।

যাবতীয় শ্রৌত যজ্ঞকে ইষ্টি যাগ, পশু যাগ এবং সোম যাগ এই তিন প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। সোম যাগের কথা আগামী বারে বলিব। ইষ্টি যাগ এবং পশু যাগের দুইটি নমুনা দিলাম। ইহাতেই নিশ্চয়ই আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে। ইষ্টি যাগের ও পশু যাগের যে নমুনা দিলাম, তাহা শুনিয়া শ্রৌতকর্ম্মের উপর আপনাদের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে কি না, তাহা বলিতে পারি না। আপনাদের শ্রদ্ধা হউক আর না হউক, এক কালে বেদপন্থী সমাজে এই সকল কর্ম্ম পরম শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হইত। আপনারা উপহাস করিয়া বলিবেন, এ সমস্ত অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণ irrational; মানুষের প্রজ্ঞা, মানুষের সুস্থ বিচারবুদ্ধি, কিছুতেই এ সকলের সমর্থন

করিতে পারে না। তাহা হইতে পারে। ইংরেজিতে যাহাকে রিলিজন বলে, তাহা সর্ব্বতোভাবে Reasonএর এলাকার বাহিরে। সভ্য অসভ্য সকল সমাজের লোকেই এইরূপ অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা রাখে; প্রভেদ কেবল মাত্রাগত। অতএব যিনি মানবতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে মানবপ্রকৃতির এই অংশের আলোচনায় নিবৃত্ত থাকিলে চলিবে না। ইহাকে মানবের দুর্ব্বলতা বলিতে হয় বলুন, কিন্তু ইহাকে পাশবিকতা বলিতে পারিবেন না। কেন না, পশুর মধ্যে এই সকল অনুষ্ঠান নাই। পশুর পক্ষে এ দুর্ব্বলতা নাই। কোনও পশু কোনও রিলিজনের ধার ধারে না। ইহা মানবিকতা বটে, ইহা কখনই পাশবিকতা নহে।

দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা মতের আজ কাল খুব প্রাদুর্ভাব। উহাকে Animism বলে। পণ্ডিতেরা বলেন, এই Animism হইতে যাবতীয় রিলিজনের উৎপত্তি। অসভ্য লোকে সমস্ত পৃথিবীকে দেবতাময় দেখে। সকল দ্রব্যেরই এক এক জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। এই সকল দেবতা সূক্ষ্ম শরীরধারী হইলেও মানুষের মতই রাগদ্বেষাদির অধীন। তাঁহাদের ক্ষমতা মানুষের চেয়ে অনেক অধিক। অনেক জাগতিক ঘটনা তাঁহারাই পরিচালনা করেন। মানুষের শুভাশুভ অনেক স্থলে ইঁহাদের হাতে। বৈজ্ঞানিকেরা জগৎ ব্যাপারকে যন্ত্র হিসাবে দেখিতে চাহেন। যন্ত্রের ভিতরে খেয়াল নাই। উহা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন। অবৈজ্ঞানিক অসভ্য মানুষ সে সকল নিয়মের অস্তিত্ব জানে না; সে সর্ব্বত্রই দেবতার খেয়াল দেখে। ইহাই Animism. বিজ্ঞানবিদ্যার উন্নতির সহিত মানুষে animism হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হয়। ক্রমশঃ হয়, একবারে হয় না। আপনারা জানেন, সৌর জগতের গ্রহ উপগ্রহ বাঁধা নিয়মে চলিতেছে। নিউটনের পূর্ব্বে কেপলার এই নিয়মগুলির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই জন্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে কেপলারের স্থান খুব উচ্চে। এমন কি, পূর্ব্বে কেপলার না জন্মিলে নিউটন তাঁহার কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু এ হেন কেপলারও animismএর উপদ্রব এড়াইতে পারেন নাই। গ্রহগুলি কেন এইরূপ বাঁধা পথে ঘুরিতেছে, ইহা বুঝিতে গিয়া কেপলার বলিয়া ফেলিলেন, প্রত্যেক গ্রহের এক এক জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তাঁহারাই চক্রান্ত করিয়া আপনাদের বাহন গ্রহগুলিকে ঐরূপে ঘুরাইতেছেন। ইহাই animism. এই সকল অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কার কতটুকু শক্তি তাহা জানা নাই। অগত্যা

সকলকেই খুসী রাখিতে হয়। দেবতাকে খুসী রাখিবার চেষ্টা হইতে রিলিজনের উৎপত্তি। পণ্ডিতেরা বলেন, ইহা হইতেই পূজা অর্চ্চনা যাগ যজ্ঞের উৎপত্তি। ইহার মূলে মানুষের স্বার্থ অন্বেষণ। ক্রমশঃ সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত মহত্তর উদ্দেশ্য আরোপ করা হয়। সভ্যতা বৃদ্ধি হইলেও পুরাতন অনুষ্ঠানগুলি ত্যাগ করা হয় না, কিন্তু তাহাতে নূতন উদ্দেশ্য আরোপ করা হয়। ই. বি. টাইলার এক জন প্রসিদ্ধ মানবতত্ত্ববিৎ। ইনি Animism theoryর এক জন প্রধান প্রচারক। তিনি সভ্য অসভ্য নানা সমাজের অনুষ্ঠানের সংগ্রহ করিয়া বৈজ্ঞানিক রীতিতে বিশ্লেষণ এবং আলোচনা করিয়াছেন। ইনি বলেন, ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূলে কোনরূপ ethical element থাকে না বলিলেই হয়। যদি থাকে তাহা scanty এবং rudimentary. উন্নত সমাজে আসিয়া তাহাই কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠানের vital point হইয়া দাঁড়ায়। টাইলার এক স্থলে যাগ যজ্ঞ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—Sacrifice has passed in the course of religious history into transformed conditions, not only of the rite itself, but of the intention with which the worshipper performs it. অনুষ্ঠান যাহাই হউক, এই intentionটাই বড় কথা। যে উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্ম করা হয়, ধর্ম্মের ইতিহাসে তাহাই বড় কথা। টাইলার সাহেব ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানের অভিব্যক্তিতে তিনটা স্তর বাহির করিয়াছেন। তিন স্তর সম্বন্ধে তিনটা theory খাড়া করিয়াছেন। প্রথম হইল gift theory, তার পরে homage theory, এবং সকলের উপরে abnegation theory 'এক একটা থিয়োরি বুঝিবার চেষ্টা করুন। Gift theory মতে ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পূর্ণ স্বার্থমূলক। দেবতা যাহা পাইলে খুসী হইবেন, দেবতাকে তাহাই দাও। পাদ্য অর্ঘ্য, ধূপ দীপ, বস্ত্র অলঙ্কার, মানুষ যাহাতে খুসী হয়, দেবতাও তাহাতে খুসী হইবেন। টাইলার সমস্ত পৃথিবী হইতে নানা দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। আমাদের দেশেও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। দেবতাকে যে যাহা দিতে পারে, দিয়া খুসী রাখে। বিশেষতঃ উদর পূরণের ব্যবস্থাটা ভাল করিলে সকলেই খুসী হয়। নইলে এ দেশের বড় লোকেরা সাহেবদিগকে খানা দিতে এত ব্যস্ত কেন? দেবতাদের ভাল করিয়া খানার ব্যবস্থা করিতে হয়। পশু মাংস অনেক দেবতাই ভালবাসেন। কোন্ দেবতা কোন্ পশু ভালবাসেন, প্রত্যেক যজ্ঞে তাহার নির্দ্দেশ আছে। যাজ্যা মন্ত্রে দেবতাকে ডাকিয়া যখন বলা হয়, অগ্নে বীহি বৌষট্—তাহার অর্থই

যে অগ্নি তুমি খাও এবং দেবতার নিকট খাদ্য বহিয়া লইয়া যাও। বৌষট্ শব্দটা মূলে বহ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহাই হইল টাইলরের gift theory. তাহার পরে homage theory, এখানে দেবতার লাভের জন্য দেবতাকে উপহার দেওয়া হয় না; যে উপহার দেওয়া যায়, দেবতা তাহা না লইতেও পারেন; কিন্তু আমি যে দেবতাকে দিতে প্রস্তুত আছি, ইহাই জানাইয়া আপনার অধীনতার বা বশ্যতার পরিচয় দেওয়া হয়। ইহারই নাম homage—এ দেশে রাজাকে জমিদারকে নজর দেওয়া রীতি আছে; রাজা নজরের টাকা গ্রহণ করেন অথবা স্পর্শ মাত্রই ফিরাইয়া দেন; প্রজা তাহাতেই কৃতার্থ হয়। দেবতাও সেইরূপ গ্রহণ করুন আর না করুন; কোনও দ্রব্য উপহার দিয়া বা উপ-হারের অভিনয় করিয়া দেবতার বশ্যতা স্বীকার করা হয়। এই অনুষ্ঠানে একটু ধর্ম্মভাব, একটু ethical element আছে। জেহোবার মন্দিরে য়িহুদিরা মহা আড়ম্বরে পশু বলি দিত। মন্দিরের উঠান গরু এবং ভেড়ার পালে পরিপূর্ণ থাকিত। উচ্চ বেদির উপর সর্ব্বদা আগুন জ্বলিত। বেদির নীচে নর্দ্দমায় রক্তের স্রোত বহিত। আড়ম্বরের অন্ত ছিল না। অথচ য়িহুদিরা তাহাদের জেহোবাকে খুব বড় দেবতা মনে করিত। তিনি যে কেবল উদর পূরণের জন্য এত উপহার লইতেছেন, এরূপ মনে করা বোধ হয় তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাহাদের একটা প্রধান পূজার নাম sin-offering. য়িহুদী সর্ব্বদাই আপনাকে পাপী মনে করিত। তাহাদের যত কিছু দুঃখতাপ, তাহা সেই পাপেরই ফল মনে করিত। এই sin-offering এর দ্বারা জেহোবার নিকট সেই পাপ স্বীকার করিয়া পাপক্ষালনের কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিত মাত্র। ইহা দেবতাকে ঘুষ দেওয়া নহে; দেবতার নিকট দৈন্য স্বীকার বা বশ্যতা স্বীকার মাত্র। ইহারও উপরে abnegation theory. Abnegation শব্দের অর্থ স্বার্থত্যাগ। এখানে উদ্দেশ্য স্বার্থ লাভ নহে; উদ্দেশ্য বরং তাহার বিপরীত। ইহার ভিতরে মানুষের ধর্ম্মভাবটা আরো ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেবতার লাভ হউক বা না হউক, দেবতা ফল দেন বা না দেন, আমাকে কিছু ত্যাগ করিতেই হইবে। আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়া যাই; কর্ম্মফলে দৃষ্টি রাখিবার আমার দরকার নাই। এরূপ স্থলে ধর্ম্মানুষ্ঠানে দেবতার উদর পূরণের চেষ্টা থাকে না; তবে এমন কোনও দ্রব্য দিতে হয়, যাহাতে আমার স্বার্থ ত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়। যাহার ত্যাগে বস্তুতই আমার সমূহ ক্ষতি আছে। নরবলির কথা আপনারা জানেন। এখনও

বহু সমাজে নরবলি চলিত আছে; এক কালে হয় ত সকল সমাজেই ছিল। যাহারা নরমাংস উপাদেয় বলিয়া ভক্ষণ করে, তাহারা দেবতাকে সেই উপাদেয় মাংস ভোজনের জন্য দিবে, তাহাতে বিস্ময় কি! কিন্তু যাহারা নরমাংস ভোজন করে না, তাহাদের মধ্যেও নরবলির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। য়িহুদী, গ্রীক, রোমান সকলেই এককালে নরবলি দিত, তাহা আপনারা জানেন। আইফিজিনিয়ার গল্প, জেফথার দুহিতার গল্প, আপনারা জানেন। ফিনিক প্রভৃতি সেমিটিক জাতিরা সুসভ্য জাতি ছিল; অথচ তাহাদের মধ্যে এই ভীষণ প্রথা বহুল ভাবে চলিত ছিল। দেবতাকে দিবার জন্য বড় ঘরের ছেলে পছন্দ করা হইত। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পছন্দ করা হইত। পিতার একমাত্র পুত্রকে পছন্দ করা হইত। রোম সাম্রাজ্যের যখন খুব পরাক্রম, তখন সম্রাট এলাগাবেলাস নূতন করিয়া নরবলির প্রচলন করেন। সাম্রাজ্যের বড় বড় ঘরের ছেলে ধরিয়া আনিয়া বলি দেওয়া হইত। ব্যাপারটা ভীষণ এবং লোমহর্ষকর। কিন্তু ইহার ভিতর কিঞ্চিৎ ধর্ম্মভাবও আছে। দেবতা নরমাংস খাইতে ভালবাসেন, এরূপ তাৎপর্য্য নয়। তাৎপর্য্য ত্যাগস্বীকার; যাহা সব চেয়ে মূল্যবান, যাহা সব চেয়ে প্রিয়, তাহাকেই উৎসর্গ করিতে পারিলে তবেই ত ত্যাগস্বীকার হয়। আপনারা শুনঃশেপের বৈদিক আখ্যায়িকা শুনিয়া থাকিবেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এবং কৌষীতকি ব্রাহ্মণে এই আখ্যায়িকা আছে। ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা হরিশ্চন্দ্রের শত পত্নী সত্ত্বেও পুত্র হয় নাই। তিনি বরুণের নিকট মানসিক করিলেন, আমাকে পুত্র দাও; সেই পুত্রই তোমাকে দিব। বরুণের বরে পুত্র জন্মিল। রাজা কিন্তু পুত্র দিতে পারিলেন না, নানা ওজর বাহির করিয়া বিলম্ব করিতে লাগিলেন। বয়স হইলে পুত্র বনে পলাইল। দেবতার ক্রোধে রাজার উদরী রোগ হইল। পুত্র রোহিত বনের মধ্যে অজীগর্ত্ত নামক এক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন। তাহার তিন পুত্র ছিল। রোহিত মনে করিলেন, অজীগর্ত্তের একটি পুত্রকে খরিদ করিয়া পিতার নিকট পাঠাইয়া দিই। আমার বদলে তাহাকে দিলেই বরুণ খুসী হইবেন। ইহাকেই বলে নিষ্ক্রয়। তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠকে তাহার বাপ ছাড়িয়া দিল না; কনিষ্ঠকে মা ছাড়িল না। অবশেষে মধ্যম শুনঃশেপকে রোহিত খরিদ করিয়া লইলেন। রাজা শুনঃশেপকে পশুরূপে পাইয়া যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। যজ্ঞের পর্য্যগ্নিকরণ পর্য্যন্ত হইয়া গেল, কিন্তু শুনঃশেপকে বধ করিবার লোক পাওয়া

যায় না। নরপশু বধে কেহ রাজি হয় না। পিতা অজীগর্ত্ত উপস্থিত ছিল। সে মূল্য পাইয়া পুত্রকে বেচিয়াছিল; আর কিছু মূল্য পাইয়া খড়্গহস্তে পুত্র-বধে উপস্থিত হইল। পুত্র তখন অগত্যা দেবতাদিগকে ডাকিতে লাগিলেন। নানা দেবতার উদ্দেশে তাঁহার মুখ দিয়া ঋক্ মন্ত্র বাহির হইতে লাগিল। এই ঋক্ মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলে পাওয়া যায়। দেবতারা খুসী হইলেন; শুনঃশেপের বন্ধন খুলিয়া গেল। অজীগর্ত্ত তখন বলিলেন, বাবা শুনঃ-শেপ, আমার কাছে ফিরে এস। ঋত্বিক্‌দিগের মধ্যে এক জন ছিলেন স্বয়ং বিশ্বামিত্র। তিনি শুনঃশেপকে কোলে লইয়া বলিলেন, শুনঃশেপ, তুমি এই পিশাচ বাপটার কাছে যাইও না, আমি তোমাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলাম। আমার পুত্রগণের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ হইবে। শুনঃশেপের মুখ দিয়া ইতিপূর্ব্বেই ঋক্ মন্ত্র বাহির হইয়াছিল; তদবধি তিনি ঋষি দেবরাত নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। বিশ্বামিত্রের অনুগ্রহে তিনি জহ্নু বংশের আধিপত্য এবং গাথি বংশের দৈব কর্ম্মের অধিকারী হইয়া উভয় বংশের গৌরব বাড়াইলেন।

বেদপন্থী সমাজের যে যুগের কথা বলিতেছি, সে সময়ে নরযজ্ঞ প্রচলিত ছিল কি না, এ প্রশ্ন উঠে। শুনঃশেপের উপাখ্যান পড়িয়া প্রথমেই সন্দেহ জন্মে, তখন নরযজ্ঞ হয় ত প্রচলিত ছিল। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা বৈদিক সাহিত্যের যথোচিত আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু বেদপন্থী সমাজের কোন দোষ বা ত্রুটী পাইলে তাহা ঢাকিবার জন্য বিশেষ আগ্রহের পরিচয় দেন নাই। তাঁহারাও প্রায় একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, সে সময়ে নরযজ্ঞ চলিত ছিল না। শুনঃশেপের গল্প, গল্প মাত্র। উহা ইতিহাস নহে। পণ্ডিতেরা প্রায় একবাক্যে বলেন, শুনঃশেপের উপাখ্যানটি পরবর্ত্তীকালের কাল্পনিক উপাখ্যান। নরযজ্ঞ চলিত থাকিলে শুনঃশেপকে বধের জন্য লোকের অভাব হইত না। বিশ্বামিত্র, যিনি যজ্ঞের ঋত্বিক ছিলেন, তিনি ত শুনঃশেপের উপর চটিয়াই আগুন হইয়াছিলেন; যজ্ঞ পণ্ড হওয়ায় তিনি খুসীই হইয়াছিলেন। শুনঃশেপও পিতাকে বলিয়াছিল, তুমি আমার বাপ নহ; তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ, শূদ্রেও তাহা পারে না। অতএব এই উপাখ্যান হইতে এইরূপ প্রতিপন্ন হয় না যে, নরযজ্ঞ সে সময়ে প্রচলিত ছিল। বেদে পুরুষমেধের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাও নরযজ্ঞ নহে। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, ইহা symbolical sacrifice. প্রাচীন বেদপন্থী সমাজে নরযজ্ঞ ছিল না, সে বিষয়ে মতভেদ নাই বলিলেই হয়।

সে সব কথা এখন থাক্। শুনঃশেপের উপাখ্যানে আপনারা দেখিলেন, রাজপুত্র রোহিত আপনার বদলে শুনঃশেপকে অর্পণ করিয়া দেবতাকে তৃপ্ত করিতে চাহিতেছেন। এইরূপ একের বদলে অন্যকে প্রদান, একের প্রতিনিধি-রূপে অন্যকে প্রদান—ইহার নাম নিষ্ক্রয়—vicarious offering. যজ্ঞানুষ্ঠানে এই নিষ্ক্রয়ের প্রথা বহু দেশে প্রচলিত আছে। টাইলর সাহেবই নানা দেশ হইতে নানা দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম এই নিষ্ক্রয়ের থিয়োরির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত মানবজাতি বাবা আদমের পাপে পাপী। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য sacrifice দরকার। য়িহুদীদের মধ্যে পাপ-ক্ষালনার্থ পশু বলির প্রথা প্রচলিত ছিল। জেহোবার মন্দিরে সহস্রে সহস্রে পশু বলি হইত। খ্রীষ্ট আসিয়া বলিলেন, পশু বলির আর প্রয়োজন নাই। মানুষ আপনাকে বলি না দিলে বিধাতার ক্রোধ যাইবে না; নরবলি আবশ্যক। কিন্তু বিধাতা করুণাময়; তিনি দেখিলেন, আমি নিজে দয়া না করিলে মানুষের পরিত্রাণ নাই। অতএব তিনি পুত্রকে মর্ত্ত্যলোকে পাঠাইলেন। এই পুত্রই খ্রীষ্ট; পিতাপুত্রে কোনও ভেদ নাই; পিতাপুত্র উভয়েই একাত্মা। ঈশ্বর এক বই দুই নহেন। কিন্তু পিতাও যেমন ঈশ্বর, পুত্রও ঠিক্ তেমনি ঈশ্বর। এ এক রকম অচিন্ত্য ভেদাভেদের ব্যাপার। ভেদ সত্ত্বেও ভেদ নাই, এ হেঁয়ালি মানুষের অধিগম্য নহে। যাহাই হউক, খ্রীষ্ট মানব দেহ ধরিয়া অবতীর্ণ হইলেন। তিনি একাধারে ষোল আনা ঈশ্বর এবং ষোল আনা মানুষ; পরিপূর্ণ ঈশ্বর এবং পরিপূর্ণ মানুষ। পরিপূর্ণ মানুষ বলিয়াই তিনি সমস্ত মানবজাতির প্রতিনিধি। তিনি আপনাকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যজ্ঞিয় পশুরূপে অর্পণ করিলেন। তাঁহার রক্তে মানবজাতির পাপ একবারে ধুইয়া গেল। ইহা নিষ্ক্রয়ের ব্যাপার। মানুষ আপনাকে অর্পণ করিতে পারিল না; ঈশ্বর স্বয়ং মানুষ হইয়া নিষ্ক্রয় স্বরূপ মানবজাতির প্রতিভূরূপে আত্মোৎসর্গ করিলেন; ক্রুসে চড়িয়া প্রাণ দিলেন। ইহা হইল vicarious sacrifice. ইহা এক মহা যজ্ঞ। এই একমাত্র যজ্ঞে মানুষের পাপ মোচন হইয়া গেল। আর কোনও যজ্ঞের আবশ্যকতা থাকিল না; জেহোবা মন্দিরে আর পশুবলিরও আবশ্যকতা থাকিল না।

বেদপন্থী সমাজে নরযজ্ঞ প্রচলিত ছিল না; তবে নরযজ্ঞের স্মৃতি বোধ করি তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। একের বদলে অন্যকে নিষ্ক্রয়স্বরূপে অর্পণ করা যাইতে পারে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ আখ্যায়িকা দ্বারা তাহা বুঝাইতেছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

বলিতেছেন, পুরাকালে দেবগণ মনুষ্যকে পশুরূপে আলম্ভন অর্থাৎ যজ্ঞার্থ বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেই মনুষ্য হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল এবং অশ্বে প্রবেশ করিল। অশ্ব তখন মেধ্য হইল। মেধ্য শব্দের অর্থ যজ্ঞযোগ্য, দেবতাকে অর্পণযোগ্য। যজ্ঞভাগ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে সেই মনুষ্যকে দেবতারা বর্জ্জন করিলেন; সেই মনুষ্য তখন কিম্পুরুষ হইল। দেবতারা অশ্বের আলম্ভনে উদ্যত হইলেন। সেই অশ্ব হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল, এবং গরুতে প্রবেশ করিল; তদবধি গরু মেধ্য হইল। যজ্ঞভাগ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অশ্বকে দেবতারা বর্জ্জন করিলেন; অশ্ব তখন গৌর মৃগ হইল। দেবতারা গরুর আলম্ভনে উদ্যত হইলেন। গরু হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিয়া মেষে প্রবেশ করিল; তদবধি মেষ মেধ্য হইল। যজ্ঞভাগ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত গরুকে দেবতারা বর্জ্জন করিলেন; সে গরু গবয় হইল। দেবতারা মেষের আলম্ভনে উদ্যত হইলেন। সেই মেষ হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল এবং ছাগে প্রবেশ করিল। সেই ছাগ মেধ্য হইল। যজ্ঞভাগ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত মেষকে দেবতারা বর্জ্জন করিলেন; সেই মেষ উষ্ট্র হইল। যজ্ঞভাগ সেই ছাগে বহুকাল ধরিয়া অবস্থিত ছিল। সেইজন্য পশুমধ্যে ছাগ, পশু যজ্ঞার্থ শ্রেষ্ঠ। দেবতারা ছাগের আলম্ভনে উদ্যত হইলেন। সেই ছাগ হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল এবং পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। তদবধি পৃথিবীই মেধ্য হইল। যজ্ঞভাগ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত দেবগণ ছাগকে বর্জ্জন করিলেন; সে শরভ হইল। যজ্ঞভাগ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় এই সকল পশু অমেধ্য অর্থাৎ যজ্ঞের অনুপযুক্ত। ইহাদের মাংস ভোজন করিবে না। দেবতারা পৃথিবীতে প্রবিষ্ট যজ্ঞভাগের অনুগমন করিয়াছিলেন। তখন সেই যজ্ঞভাগ ব্রীহি ধান্য হইল। সেই জন্য ব্রীহি ধান্য হইতে প্রস্তুত পুরোডাশ দান করা হয়। ইহাতে পশুদানেরই ফল পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণের মধ্যেও এই আখ্যায়িকা প্রায় এই আকারেই আছে।

এই আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করুন। ইষ্টি যাগে, এমন কি পশুযাগে এবং সোমযাগেও পুরোডাশ আহুতি দেওয়া হয়। অধিকাংশ বৈদিক যজ্ঞেই পুরোডাশ আহুতির প্রথা চলিত হইয়াছিল। পশু মাংসের আহুতি ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইতেছিল। পূর্ণমাসাদি ইষ্টিযাগে পশুমাংস একবারেই আবশ্যক হইত না। পশু যাগে বা সোম যাগে পুরোডাশও ছিল; পশুও একবারে বর্জ্জিত হয় নাই। কিন্তু পশুর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

কয়টি পশু দিতে হইবে, তাহার সংখ্যা বাঁধা ছিল। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অধিক দিবার উপায় ছিল না। নিরূঢ় পশুবন্ধ যাগ, যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও বৎসরের মধ্যে একবারের, জোর দুই বারের, অধিক করিতে হইত না, তাহাতেও একটির অধিক পশুর দরকার হইত না। দেবতার প্রীতির জন্য কাম্য কর্ম্মে যাহারা পশু বলি দেয়, তাহারা ইচ্ছামত সংখ্যা বাড়াইতে পারে। এ কালের দেবী-পূজায় গরিব লোকে একটা বলি দেয়; সম্পন্ন লোকে বহু বলি দেয়। বৈদিক যজ্ঞে কিন্তু ইচ্ছামত পশুর সংখ্যা বাড়াইবার উপায় ছিল না। বড় বড় ধনী লোকের কাম্য যজ্ঞে—অশ্বমেধাদি মহা আড়ম্বরের যজ্ঞে—বহু পশু আবশ্যক হইতে পারিত; কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের নিত্য যজ্ঞে বহু পশুর দরকার হইত না। বৈদিক যজ্ঞের পশুহত্যায় একটা মহামারী হইত, এইরূপ মনে করিবার সম্যক্ হেতু নাই। সে সময়ে পশু বধে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিতেছিল, ইহা মনে করাই সঙ্গত। প্রাচীন প্রথা একবারে ত্যাগ করা যায় না—বিশেষতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠানে। তখন পশু বধ যাহা হইত, তাহা আরও প্রাচীনকালের survival মনে করা যাইতে পারে। পশুর বদলে রুটি দেওয়ার তাৎপর্য্যই এই। ব্রহ্মবাদীরা বলিতেছেন, পশু মাংসের বদলে কৃষিজাত যব বা চাউল দিলেই পশু দেওয়ার ফল হইবে। ইহাই নিষ্ক্রয়; পশুর পরিবর্ত্তে নিষ্ক্রয় পুরোডাশ। আমি যে উপাখ্যান শুনাইলাম, তাহাতে ব্রহ্মবাদী স্পষ্ট বলিতেছেন, হয় ত এককালে যজ্ঞে নরমাংস দেওয়াই প্রথা ছিল; কিন্তু ক্রমশঃ তাহা অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। নর পশুর বদলে ক্রমশঃ ঘোড়া, গরু, ভেড়া, ছাগল, অবশেষে ধান ও যব চলিত হইয়াছে। ইহাই নিষ্ক্রয়।

যজ্ঞের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনটা পণ্ডিতী মতের উল্লেখ করিয়াছি; সমাজের অভিব্যক্তির তিনটা স্তরে তিনটা মত। প্রথম স্তরে দেবতার স্বার্থসাধন করিয়া দেবতার খোরাক যোগাইয়া তাঁহার প্রীতিসাধন এবং তদ্দ্বারা নিজের স্বার্থসাধন। দ্বিতীয় স্তরের উদ্দেশ্য কোনও কিছু অর্পণ করিয়া দেবতার নিকট বশ্যতা স্বীকার। এখানে দেবতার লাভালাভ দেখার দরকার হয় না। কেজো জিনিষের বদলে অকেজো জিনিষ দিলেও বিশেষ হানি নাই; নিষ্ক্রয় স্বরূপে অল্প মূল্যের জিনিষ দিলেও চলিতে পারে। মাংসের পরিবর্ত্তে রুটি দিলেও চলিবে। আরো উন্নত তৃতীয় স্তরে স্বার্থ অন্বেষণের স্থানে একবারে স্বার্থত্যাগ আসিয়া পড়ে। ত্যাগটাই তখন মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে এই অভিপ্রায়টা খুব স্পষ্ট হইয়াছিল দেখা যায়। তাঁহারা এই ত্যাগটাকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন।

যাজ্ঞিকের পরিভাষা মতে কোনও দ্রব্য ত্যাগেরই নাম যজ্ঞ। অগ্নি সোম ইন্দ্র প্রভৃতির উদ্দেশে যে কোনও যাগে অধ্বর্য্যু যজমানের পক্ষ হইতে আহুতি দিতেন; যজমান তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাকিতেন এবং আহুতির পর ত্যাগমন্ত্র পড়িতেন। ত্যাগমন্ত্র ইদম্ অগ্নয়ে—ন মম, ইদং সোমায়—ন মম, ইদম্ ইন্দ্রায়—ন মম, এইরূপ আকারের। তাৎপর্য্য এই যে, দেবতাকে সর্ব্বস্ব দিতে হইবে; যাহা কিছু প্রিয়তম, তাহাই দিতে হইবে। সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিলেই চলিবে না। তবে মানুষে সর্ব্বস্ব দিতে পারে না, আত্মসমর্পণ করিতে পারে না; আপনাকে দিতে পারে না; কাজেই নিষ্ক্রয়রূপে অন্য কিছু দিতে হয়। এই নিষ্ক্রয় ব্যাপারের কথা বেদের অনেক স্থানে অতি স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এক স্থানে আছে, যে যজমান সোমযাগে দীক্ষিত হয়, সে সকল দেবতার নিকটেই আপনাকে আলম্ভনে (অর্থাৎ আত্মসমর্পণে) প্রবৃত্ত হয়। সে সকল দেবতার নিকটেই আপনার বদলে পশুকে নিষ্ক্রয় করে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ নিষ্ক্রয় শব্দটিই স্পষ্ট ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য হইল যে, ঐ যাগে যে পশু দেওয়া যায়, সেই পশু যজমানেরই প্রতিনিধি।

আগেই বলিয়াছি, হবিঃশেষ ভক্ষণ না করিলে কোন যজ্ঞই সম্পূর্ণ হয় না। অগ্নিহোত্র যাগের পর যে দুধ আহুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহার শেষাংশ খাইতে হয়। পূর্ণমাস যাগে পুরোডাশের কিয়দংশ যাগের পর খাইতে হয়। পশু যাগেও পশুমাংস খানিকটা খাইতে হয়। সোম যাগের পূর্ব্বে অগ্নি ও সোমকে যে পশু দেওয়া হইত, তাহার মাংস খাওয়া চলিবে কি না, তাহা লইয়া একটা তর্ক উঠিয়াছিল। সংশয়ের একটা কারণ ছিল। এই পশু ত যজমানেরই প্রতিনিধি; যজমান আপনার বদলে এই পশু দিতেছেন, তাহা হইলে পশুর মাংস ত নরমাংস; এই নরমাংস খাওয়া উচিত হইবে কি না? কোনও কোনও ব্রহ্মবাদী এই আপত্তি তুলিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সেই আপত্তির খণ্ডন করিতেছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ নিষ্ক্রয় থিয়োরির সমর্থক হইলেও এখানে অগত্যা তাঁহাকে অন্য থিয়োরির আশ্রয় লইতে হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, অগ্নির ও সোমের সাহায্যে ইন্দ্র বৃত্র বধ করিয়াছিলেন। তিনি বৃত্রবধের পর তুষ্ট হইয়া অগ্নি ও সোমকে বর দিয়াছিলেন যে সোমযাগের পূর্ব্বদিন যে পশু দেওয়া হইবে, তাহা তোমরাই পাইবে; ইহাই তোমাদের পুরস্কার হইবে। এক নিশ্বাসে নিষ্ক্রয় থিয়োরিটা উল্টাইয়া গেল।

ঐ পশু দেবতাদের ভক্ষ্য দ্রব্য মাত্র; উহা নরের প্রতিনিধি নহে; অতএব উহার মাংস ভক্ষণে কোনও দোষ হইবে না। আসল কথা যে হবিঃশেষ ভক্ষণ না করিলেই নয়। কেন নয়, সে গুরুতর কথা; সে প্রসঙ্গ পরে তুলিব। এখন বলিয়া রাখি, ব্রহ্মবাদীদের এই তর্ক শুনিয়া আপনারা হাসিবেন না। সমস্ত খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ঠিক এইরূপ একটা মতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ঠিক এইরূপ তর্ক উঠায় খৃষ্টীয় সমাজ শত সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আগেই আপনাদিগকে বলিয়াছি, যীশুখ্রীষ্ট একাধারে ষোল আনা ঈশ্বর এবং ষোল আনা মানুষ। দেবত্ব এবং মানবত্ব তাঁহাতে মিশিয়া গিয়াছে। তাঁহার মত পূর্ণমনুষ্যত্ববিশিষ্ট মানবই যাবতীয় মানবের নিষ্ক্রয় বা প্রতিনিধি হইতে পারে। যজ্ঞে আত্মসমর্পণ ব্যতীত ঈশ্বরের তুষ্টি হইবে না। যজ্ঞে মানুষের আত্মসমর্পণ আবশ্যক। তাই যীশু সমস্ত মানবজাতির নিষ্ক্রয়রূপে আত্মসমর্পণ করিলেন। ক্রুসে চড়িয়া মৃত্যুই তাঁহার আত্মসমর্পণ। ক্রুসে চড়িবার পূর্ব্বরাত্রিতে তিনি আপনার অনুগত শিষ্যদিগকে লইয়া ভোজনে বসিয়াছিলেন। ভোজনের জন্য রুটি আর মদ ছিল; শিষ্যদের প্রত্যেককে একটু করিয়া মদ দিলেন, এবং সেই রুটি ভাঙ্গিয়া প্রত্যেককে বিতরণ করিলেন। বলিলেন, এই যে রুটি দিলাম, ইহা আমার মাংস; আর এই যে মদ, ইহা আমার রক্ত। ইহা খাইলেই আমার মাংস এবং আমার রক্ত ভোজন করা হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমি যজ্ঞিয় পশুরূপে আপনাকে বলি দিলাম; যজমানের পক্ষে হবিঃশেষ ভক্ষণ আবশ্যক—আমার রক্ত মাংস ভক্ষণ আবশ্যক। আমার তিরোভাবের পর তোমরা এইরূপে রুটি এবং মদ উৎসর্গ করিয়া ভক্ষণ করিও। ইহাতেই তোমাদের দৈনন্দিন যজ্ঞ সাধন হইবে। জেহোবার মন্দিরে আর পশু বলির প্রয়োজন হইবে না। তদবধি পৃথিবীর যাবতীয় খ্রীষ্টান এই অনুষ্ঠান পালন করিয়া আসিতেছেন। রুটি ও মদ উৎসর্গ করিয়া তাহা ভক্ষণ করেন। যথাবিধি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক উৎসর্গের দ্বারা ঐ রুটি খ্রীষ্টের মাংসে এবং মদ খ্রীষ্টের রক্তে পরিণত হয়। উহা খাইলে খ্রীষ্টেরই রক্ত এবং মাংস খাওয়া হয়। খ্রীষ্টসম্পাদিত মহা যজ্ঞের অনুকরণে তাঁহার আশ্রিতেরা এই যজ্ঞ সম্পাদন করেন। ইহার নামই হইল **eucharistic sacrifice.** ইহা বস্তুতই হবিঃশেষ ভক্ষণের ব্যাপার। ইহা দ্বারা খ্রীষ্টের সহিত খ্রীষ্টানের একাত্মতা সম্পাদিত হয়। এই জন্য এই অনুষ্ঠানের নাম **Holy Communion**। এ দেশের ব্রহ্মবাদীদের মধ্যে যেমন তর্ক উঠিয়াছিল, অগ্নি ও সোমের উদ্দিষ্ট

পশুর মাংস নরমাংস কি না, সেইরূপ খ্রীষ্টানদের মধ্যেও তর্ক উঠিয়াছিল, বস্তুতই রুটি ও মদ খ্রীষ্টের মাংস ও রক্তে পরিণত হয় কি না? বস্তুতই উহা রক্ত মাংসে পরিণত হয়, তাহা কোনও কেমিষ্ট বলিতে পারিবেন না। অথচ সমস্ত খ্রীষ্টান এক সময়ে একযোগে বলিতেন যে উৎসর্গের পর রুটি রুটি থাকে না, মদ মদ থাকে না; সত্য সত্যই রক্ত মাংসে পরিণত হয়। যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেন, উৎসৃষ্ট রুটি হইতে রক্তবিন্দু ক্ষরিত হইতেছে। মদের ও রুটির এইরূপ রক্ত মাংসে পরিণতির নাম transubstantiation. রোমান এবং গ্রীক চার্চের সকল লোকেই অর্থাৎ বার আনা খ্রীষ্টান এই বিংশ শতাব্দীতেও এই অলৌকিক পরিণতি ব্যাপারে বিশ্বাস করেন। গুরুকল্প ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এখনই রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবেন, যে রুটির মধ্যে কেবলই starch আছে; উৎসর্গ দ্বারা উহা proteidএ পরিণত হয় নাই। তাঁহার শিষ্যস্থানীয় আমাকেও সেই কথায় সায় দিতে হইবে। অথচ ইউরোপের অধিকাংশ লোক এখনও বিশ্বাস করে, ঐ রুটি আর রুটি থাকে না; মদ, মদ থাকে না। এই বিশ্বাসে আঘাত করিলে তাহাদের জীবনের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যাইবে।

আর বাহুল্যে কাজ নাই। এ বিষয়ে আবার আমাকে আসিতে হইবে। খ্রীষ্টীয় সমাজে এবং বেদপন্থী সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য্য যে একই রকম, তাহা দেখাইবার জন্যই এ প্রসঙ্গ আমি তুলিয়াছি। খ্রীষ্টানের দেবতা য়িহুদীর দেবতারই রূপান্তর। য়িহুদীর দেবতা রক্ত মাংস দুই চাহিতেন; তাই খ্রীষ্ট রক্ত মাংস দুই দিয়াছিলেন। মদ হইল রক্ত; রুটি হইল মাংস। আমাদের দেশে আধুনিক কালে মহাদেবী রক্তমাংসবলিপ্রিয়া। কিন্তু বৈদিক দেবতারা রক্তপ্রিয় ছিলেন না। পশুর রক্ত রাক্ষসেরা পাইত; দেবতারা কেবল মাংসেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। পুরোডাশ বা রুটি মাংসের স্থানীয়। খ্রীষ্টানের রুটি যেমন মাংসস্থানীয়, আমাদের রুটিও তেমনি মাংসস্থানীয়। রক্তটা গেল কোথায়? ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তাহার উত্তর দিতেছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন,—নিঃসঙ্কোচে বলিতেছেন,—এই যে পুরোডাশ দান, এতদ্দ্বারা পশুরই আলম্ভন হয়। যে যব বা ধান হইতে পুরোডাশ প্রস্তুত হয়, তাহাতে যে কিংশারু বা খড় লাগিয়া থাকে, তাহাই পশুর লোম। যে তুষ থাকে, তাহাই পশুর চর্ম্ম। যে রুটি প্রস্তুত হয়, তাহাই মাংস। যে ক্ষুদ ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহাই রক্ত। কুলায় ঝাড়িয়া তুষের এবং ক্ষুদের কণা

রাখিয়া দেওয়া হইত এবং যাগশেষে উহা রাক্ষসদিগকে দেওয়া হইত, ইহা পূর্ণমাস যাগ প্রসঙ্গে বলিয়াছি। এইরূপে রাক্ষসেরা তাহাদের প্রাপ্য রক্তের ভাগ পাইত।

আমাদের দেবতারা রক্ত চাহিতেন না। খ্রীষ্টানের যজ্ঞে রক্তের স্থলে মদ দিতে হয়। বৈদিক যজ্ঞে দুই একটা স্থলে সুরার প্রচলন দেখা যায়। সৌত্রামণি যাগে সুরার প্রচলন ছিল। ক্ষত্রিয় রাজাদের রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞে সুরার প্রচলন দেখা যায়। সাধারণতঃ যজ্ঞে সুরা চলিত না। কিন্তু আর একটা মাদক দ্রব্য চলিত। উহা সোমলতার রস। সোম-যাগের কথা এইবার বলিতে চাহি। আপনারা ধৈর্য্য ধরিয়া প্রস্তুত থাকুন।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

রামেশ্বরম্ ও ধনুষ্কোটী।

যেনই ষ্টেশনে গাড়ীতে চড়িয়া আমরা জংশন ষ্টেশনে আসিয়া রামেশ্বরম্ এক্‌স্প্রেসের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। যথাসময়ে গাড়ী ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। গাড়ীতে উঠিয়া আমরা শুইবার বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম। সমস্ত রাত্রি গাড়ী ছুটিতে লাগিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমরা মাদুরা ষ্টেশন অতিক্রম করিলাম। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে দেখিতে পাইলাম, রেলওয়ে-লাইনের উভয় পার্শ্বে নারিকেলের বাগান। বালুকাময় ভূমির উপর স্থানে স্থানে ঘোড়া ও গরু চরিতেছে। ক্বচিৎ দুই একটী লোকালয়। অনেকক্ষণ পরে গাড়ী মণ্ডপম্ ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। লঙ্কা-যাত্রিগণকে এখানে আটক করিয়া রাখা হয়; ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া অনুমতি দিলে পরে ইহারা লঙ্কা যাইতে পারে। ষ্টেশনের নিকটেই কুটীরগুলির মধ্য হইতে বহুসংখ্যক যাত্রী আমাদের ট্রেণের দিকে কৌতূহলের সহিত চাহিয়াছিল। ক্রমে রেল-লাইনের উভয় পার্শ্বেই দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের নীল জল দেখা যাইতে লাগিল। অবশেষে ভূমি শেষ হইয়া গেল। আমাদের ট্রেণ সমুদ্রের উপরে সেতু দিয়া চলিতে লাগিল। রামেশ্বর সমুদ্র-বেষ্টিত একটী দ্বীপের উপর অবস্থিত। পূর্ব্বে ভারতভূমি হইতে ষ্টীমারে রামেশ্বর যাইতে হইত। কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ ও অগভীর সমুদ্রপ্রণালীর উপর একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। সেতুর

উপর হইতে সমুদ্রের শোভা অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে—যত দূর দেখা যায়, নীল জল। জলের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ। তরঙ্গের উপর সূর্য্যকিরণ ক্রীড়া করিতেছিল। দূরে, স্থানে স্থানে, সমুদ্রের নীল বর্ণ গাঢ়তর হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের অবস্থান নির্দ্দেশ করিতেছিল। রেলওয়ে-সেতুর স্তম্ভগুলির চারি পাশে বড় বড় প্রস্তর-খণ্ড দিয়া স্তম্ভগুলিকে দৃঢ়তর করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি সেই সকল প্রস্তরখণ্ডের উপর আঘাত করিয়া শব্দ করিতেছিল। ক্রমে আমরা পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া পম্বম্ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এখানে গাড়ী অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া পুনরায় চলিতে লাগিল। পরের ষ্টেশনই রামেশ্বর। যে মহাতীর্থের নাম করিয়া আমরা সুদূর বঙ্গদেশ হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, তথায় উপস্থিত হইবার জন্য আমরা ব্যগ্র হইয়া পড়িলাম। উভয় পার্শ্বে ঘনবিন্যস্ত নারিকেল বৃক্ষের বাগানের মধ্য দিয়া গাড়ী ছুটিতে ছুটিতে যথাসময়ে রামেশ্বর ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। পূর্ব্ব হইতেই আমাদের পাণ্ডা স্থির ছিল। ট্রেণ হইতে জিনিসপত্র নামাইয়া আমরা গোযানে রামেশ্বরের বালুকাময় পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম।

আমাদের পাণ্ডামহারাজের বাটী মহারাষ্ট্র দেশে। কয়েক পুরুষ ধরিয়া এখানে তাঁহাদের বাস। শুনিলাম, এখানকার অধিকাংশ পাণ্ডাই মহারাষ্ট্র দেশ হইতে আসিয়াছে। কারণ, দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ আর্য্য নহে। রামেশ্বরে বহুসংখ্যক পশ্চিমা লোক দেখিতে পাইলাম। তাহারা নানা কার্য্য উপলক্ষে এখানে আসিয়া বাস করিতেছে। আমরা প্রথমে আমাদের পাণ্ডার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এক ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে স্নানাদি শেষ করিয়া মহাদেবের দর্শনের জন্য মন্দির-অভিমুখে চলিলাম।

মন্দিরের পশ্চিমদিকস্থ প্রবেশ-পথের উপরে একটী নাতিবৃহৎ গোপুরম্। তাহার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিলে মন্দিরাভ্যন্তরে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দোকান শঙ্খ, ঝিনুক, ছবি, কড়ি প্রভৃতি বিচিত্র দ্রব্যে পরিপূর্ণ। দোকানগুলি অতিক্রম করিয়া আমরা মন্দিরের সুবিস্তীর্ণ বারাণ্ডাগুলির মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। রামেশ্বরের মন্দিরের বারাণ্ডাগুলি দেখিবার জিনিস। দুই পার্শ্বে সুবৃহৎ স্তম্ভের শ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিবার পথ। বারাণ্ডা এত দীর্ঘ যে, এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া অপর প্রান্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, স্তম্ভগুলি ক্রমশঃ ছোট হইয়া শেষ প্রান্তে অতিশয়

ক্ষুদ্র আকার ধারণ করিয়াছে, এবং ছাদ ও মেঝের মধ্যবর্ত্তী অবকাশ অপর প্রান্তে গিয়া একটী ক্ষুদ্র রন্ধ্রে পরিণত হইয়াছে। স্তম্ভগুলির গাত্রে চূণ ও বালির কাজ। সুতরাং তাহার উপরের শিল্প কার্য্যগুলি বহু স্থলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ছাদের উপর বিচিত্র বর্ণের ছবি। কোথাও শিল্পকার্য্য ও ছবি প্রচুরপরিমাণে বিদ্যমান, কোথাও বা তাহা বিলুপ্তপ্রায়। আমরা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত বারাণ্ডার অর্দ্ধেক অংশ অতিক্রম করিয়া মন্দিরের বিপরীত ভাগে উপস্থিত হইলাম। এইখানে, অর্থাৎ মন্দিরের পূর্ব্ব ভাগে—প্রধান প্রবেশপথ। ইহার উপরিস্থিত গোপুরম্‌টিও অতিশয় উচ্চ। এই পূর্ব্ব ধারে পাশাপাশি দুইটী বৃহৎ দ্বার অবস্থিত। একটী—যেটি বৃহত্তর—সেইটির মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া সোজা চলিয়া গেলে মহাদেবের মন্দিরে উপস্থিত হওয়া যায়। দ্বিতীয় দ্বার হইতে পার্ব্বতীর মন্দির পর্য্যন্ত আর একটী পথ সরলভাবে বিস্তৃত। মহাদেবের মন্দিরে যাইবার পথে একটী সুবর্ণমণ্ডিত ধ্বজদণ্ড ও একটী সুবৃহৎ বৃষভ-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। রামেশ্বরের শিবলিঙ্গ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে হয়। পাণ্ডা ব্যতীত কাহারও নিকটে যাইবার অধিকার নাই। যাত্রী-দিগের শিবলিঙ্গের উপর গঙ্গাজল ঢালিবার নিয়ম আছে। পাণ্ডাদের নিকট গঙ্গাজল কিনিতে পাওয়া যায়। এই গঙ্গাজলের মূল্য কিরূপ, তাহা ধারণা করাইবার জন্য ইহা বলা যাইতে পারে যে,এক গ্লাস জলের মূল্য ৩০৲। ৪০৲ টাকা হইবে। পাণ্ডারা বলিয়া থাকেন যে, এই গঙ্গাজল গঙ্গোত্রী হইতে ব্রাহ্মণের দ্বারা পদব্রজে ও শুদ্ধ অবস্থায় আনীত হইয়া থাকে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দাম এইরূপই হইবার কথা। এই বহু মূল্যে ক্রীত গঙ্গাজল যাত্রীরা নিজে ঢালিতে পারিবে না। পাণ্ডারা ঢালিয়া দিবেন, যাত্রিগণ দূর হইতে দেখিয়া নয়ন সার্থক করিবে। এখানকার ভারতবিখ্যাত শিবলিঙ্গটি ক্ষুদ্র। এই প্রধান মন্দিরের উত্তরে কাশী-বিশ্বেশ্বরের মন্দির, দক্ষিণে কিয়দ্দূরে পার্ব্বতীর মন্দির। আমরা যে সময় গিয়াছিলাম, সেই সময় মন্দিরের অভ্যন্তরে সংস্কার কার্য্য চলিতেছিল। বহুসংখ্যক কারিকর প্রস্তরের উপর বিবিধ মূর্ত্তি সকল অবলীলাক্রমে ফুটাইয়া তুলিতেছিল। তাহাদের পাথর কাটিবার যন্ত্রগুলির মিলিত শব্দে মন্দিরাভ্যন্তর মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে অতিশয় জনতা।

মহাদেব দর্শন করিয়া আমরা পার্ব্বতীর মন্দিরে চলিলাম। এই মন্দিরের সম্মুখস্থিত দীর্ঘ প্রাঙ্গণের উপর বহু কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত সুগঠিত রমণী-মূর্ত্তি

বিরাজমান। পার্ব্বতীর মন্দিরের মধ্যে আলোক ও বাতাসের উপযুক্ত প্রবেশপথ নাই। দর্শনান্তর আমরা ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

অপরাহ্ণে আহারাদি শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ধর্ম্মশালার সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণের চারি দিকে তীর্থযাত্রীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলি বিস্রম্ভালাপে নিযুক্ত। ছোট ছোট বালকবালিকাগণ খেলা করিতেছিল। অধিকাংশই হিন্দুস্থানী যাত্রী। কিন্তু তাহা ব্যতীত পঞ্জাব, গুজরাট, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের লোকও ছিল।

রামেশ্বরে রামতীর্থ, লক্ষ্মণতীর্থ প্রভৃতি কয়েকটি সরোবর আছে। এই সকল সরোবরে স্নান করিবার নিয়ম। সরোবরের জল তত নির্ম্মল নহে। এতদ্ব্যতীত মন্দিরের মধ্যেই বহুসংখ্যক তীর্থ আছে। মন্দিরমধ্যস্থ তীর্থগুলি সাধারণতঃ এক একটী কূপ; দুই চারিটী পুষ্করিণীও আছে। এই সকল তীর্থের নাম,—সূর্য্যতীর্থ, নল, নীল, গবয়, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, ইত্যাদি। এই সকল তীর্থের জল অতি নির্ম্মল ও সুমিষ্ট। রামেশ্বরের অধিবাসিগণ এই সকল তীর্থের জল পান করিয়া থাকে।

মন্দিরের পূর্ব্বে ও দক্ষিণে—অতিনিকটে সমুদ্র। আমরা আশ্বিন মাসে গিয়াছিলাম। সে সময় দেখিলাম, সমুদ্রের জল প্রশান্ত। দূরে নীল সমুদ্রের উপর শুভ্র পাল তুলিয়া দিয়া দুই চারিখানি নৌকা ভাসিতেছে।

মন্দিরের নিকটে শঙ্করাচার্য্যের মঠ। ইহা অতি ক্ষুদ্র ব্যাপার। এক কালে বোধ হয় ইহা বহু সন্ন্যাসিসমাকুল ছিল। এক্ষণে একটী শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন শিবলিঙ্গ ও কয়েকটী চিত্র সম্বল লইয়া মঠের অল্পসংখ্যক সন্ন্যাসী মঠপ্রতিষ্ঠাতার পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিতেছেন।

রামেশ্বর-যাত্রিগণের রামঝরকা দেখিতে যেন ভুল না হয়। এরূপ মনোহর স্থল অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। লোকালয় হইতে বালুকাময় পথ ধরিয়া প্রায় দুই মাইল যাইতে হয়। স্থানটী একটী উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত। এখানে শ্রীরামচন্দ্রের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশশোভিত পদচিহ্নের উপর একটী দ্বিতল মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। দ্বিতলের উপর আরোহণ করিলে চতুর্দ্দিকের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়। নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুলতাচ্ছাদিত বনভূমি। অদূরে বনরাজির মধ্য হইতে রামেশ্বরের গোপুরম্ দুইটী সমুন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান। চারি দিকে সমুদ্রের দিগন্তবিস্তৃত নীল জল। নৌকার পবনস্ফীত শুভ্র পাল নীল সমুদ্রের গায়ে শ্বেতবিন্দুর ন্যায় দেখা যাইতেছিল। দূরে

ধনুষ্কোটী হইতে লঙ্কাযাত্রী ষ্টীমারের ধূমে দক্ষিণ দিগন্তের নিকট আকাশ একটু মলিন দেখাইতেছিল। পশ্চিমে সমুদ্রের পর পারে ভারতবর্ষের তট-ভূমি "ধারানিবদ্ধ-কলঙ্করেখা"র ন্যায় শোভা পাইতেছিল। বহুক্ষণ মুগ্ধ হইয়া সেই নয়নমনোহর ছবি দেখিলাম। সমস্ত দিন আকাশের উজ্জ্বল পথে বিচরণ করিয়া সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া পশ্চিমাকাশের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছিলেন। সূর্য্যের মৃদু রশ্মিতে বনভূমির শিরোদেশ রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল। চারি দিক যখন অন্ধকার হইয়া আসিল, তখন আমরা অনিচ্ছায় সেই পবিত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম।

রামঝরকার পদতলে একটী হনুমানের মন্দির আছে। তত্রত্য সাধু যাত্রীদিগকে ডাকিয়া ডাকিয়া হনুমানজীর প্রসাদ ছোলাসিদ্ধ ও মিছরী বিতরণ করিতেছিলেন। অদূরে একটী কূপের জল পান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ করিলাম। প্রবাদ এই যে, সীতাদেবীর তৃষ্ণা-নিবারণার্থ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তীরের দ্বারা ভূমি-ভেদ করিয়া এই সুমিষ্ট জল আনয়ন করিয়াছিলেন।

ধনুষ্কোটী তীর্থ রামেশ্বর হইতে এগার মাইল দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে যখন ধনুষ্কোটী পর্য্যন্ত রেল হয় নাই, তখন ধনুষ্কোটী যাওয়া অতি কঠিন ছিল। এখন রেল হইয়াছে। লঙ্কা যাইবার এই প্রধান পথ। এবং ধনুষ্কোটী পর্য্যন্ত পথটী— শুদ্ধ অনায়াসসাধ্য নহে—অতিশয় আনন্দদায়ক হইয়াছে।* বেলা নয়টার সময় আমরা ট্রেণে উঠিলাম। সুবিস্তীর্ণ ভারতভূমির প্রায় সকল প্রদেশ হইতেই আগত যাত্রী দ্বারা গাড়ী পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কয়েক মিনিট তালবনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া আমরা সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইলাম। বামে ও দক্ষিণে সমুদ্রমধ্যে অনতিবিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর দিয়া রেল চলিয়াছে। সে শোভা বর্ণনার অতীত। উভয় পার্শ্বে দিগন্তবিস্তৃত নীল জল। দুই চারিটী ক্ষুদ্র নৌকা কৃষ্ণবিন্দুর ন্যায় দেখা যাইতেছিল। দ্বীপগুলি গাঢ় বর্ণের প্রলেপের ন্যায় বোধ হইতেছিল। বামের সমুদ্র হ্রদের জলের ন্যায় স্থির। দক্ষিণে সমুদ্র ঘোর গর্জ্জন করিতে করিতে ভয়ানক তরঙ্গ তুলিয়া তটভূমিতে আঘাত করিতেছিল। বহুক্ষণ এই ভাবে চলিয়া আমরা ধনুষ্কোটী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। যেখানে স্নান করিতে হয়, সে স্থান এখান হইতে দেড় মাইল দুই মাইল দূরবর্ত্তী। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে একটী ট্রেণ ছাড়িল। এই ট্রেণ আমাদিগকে ধনুষ্কোটী তীর্থ পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিল। ভূমি এখানে শেষ হইয়াছে, এবং বামের ও দক্ষিণের সমুদ্র এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ধনুষ্কোটীর শুভ্র তরঙ্গভঙ্গ অতি মনোহর।

বামের ও দক্ষিণের সমুদ্র যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেখানে তরঙ্গভঙ্গগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এক শ্রেণীর পশ্চাতে আর একটী শ্রেণী, এই ভাবে, নীল সমুদ্রের উপর শিশুর হাস্যের ন্যায় শুভ্র শোভা বিকীর্ণ করিতে করিতে বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সমুদ্র সর্ব্বত্রই সুন্দর। অনন্ত বিস্তার, অসীম রহস্য, ভীম-কান্তি ও বালকের ন্যায় চঞ্চল ক্রীড়াশীলতা—এই সবগুলি মিলিয়া সমুদ্রকে সর্ব্বত্রই অতিশয় চিত্তাকর্ষক করে। কিন্তু ধনুষ্কোটী তীর্থে সমুদ্রের যে শোভা দেখিয়াছি, আর কোথাও সে ছবি দেখি নাই। উর্দ্ধে অনন্তবিস্তৃত আকাশ, নীচে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র। চারি দিকে নীল জল, কেবল এক খণ্ড সঙ্কীর্ণ ভূমি এক দিকে তীরভূমির সহিত যোগ করিয়া রাখিয়াছে। সেই ভূমিখণ্ডের উপর যাত্রীদলকে কত ক্ষুদ্র ও কত অল্পসংখ্যক বলিয়া বোধ হইল। এই বিশাল সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্য কি ক্ষুদ্র!—কত ক্ষুদ্র আকৃতি, কত ক্ষুদ্র শক্তি, কত অল্প জ্ঞান এবং কত ক্ষণস্থায়ী জীবন! মানুষ তাহা জানিয়াও ভুলিয়া যায়, এবং ক্ষুদ্র জীবন ধরিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় ক্ষুদ্র দ্বেষ ও হিংসায় পরিপূর্ণ করে। এক একবার যদি সে সংসার হইতে আসিয়া এইরূপ স্থলে অল্পক্ষণ দাঁড়ায়, তাহা হইলে সে তাহার ক্ষুদ্রতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এবং যে সকল ক্ষুদ্র চেষ্টায় সে জীবন অতিবাহিত করে, তাহাদের অসারতাও উপলব্ধি করিতে পারে। হে মানব! এই ক্ষুদ্র, ক্ষণস্থায়ী সংসার হইতে মন তুলিয়া লও, এবং যিনি এই সৃষ্টির ন্যায় বিশাল ও সুন্দর, তোমার মন তাঁহাতে অর্পণ কর। তাহা হইলে শোক, তাপ, দুঃখ, কষ্ট, সবই উত্তোলিত পদ্মপত্র হইতে জলবিন্দুর ন্যায় ঝরিয়া পড়িবে।

রামেশ্বর হইতে আমাদের সঙ্গে পাণ্ডার পুরোহিত আসিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে সংকল্প করাইবার পর আমরা স্নান করিলাম। স্নান করিয়া যখন বালির উপর দিয়া রেলপথ-অভিমুখে ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তখন একটী সাধু আমাদিগকে তাঁহাদের আশ্রমে আহ্বান করিলেন। অদূরে তাঁহাদের পর্ণাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র আশ্রম দেখা যাইতেছিল। এখানে অনেকগুলি সন্ন্যাসী ভগবদারাধনায় তাহাদের শান্ত ও পবিত্র জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীদের সরল ও অমায়িক ব্যবহারে আমরা আপ্যায়িত হইলাম। তাঁহারা প্রসাদ খাইতে দিলেন, এবং দূর হইতে আনীত সুস্বাদু জল দ্বারা আমাদের পিপাসা দূর করিলেন। আমরা যখন চলিয়া আসিতেছিলাম, তখন একটী সন্ন্যাসী একটী শ্লেটের উপর বাঙ্গালা অক্ষরগুলি লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী বৃদ্ধ। বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ

দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম। তাঁহার শ্লেটের উপর অক্ষরগুলি লিখিয়া দিয়াছিলাম, এবং কলিকাতায় আসিয়া একখানি বাঙ্গালা ও দেবনাগরী বর্ণমালার বহি পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

ট্রেণ আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। যাত্রিগণ ট্রেণের ছায়ায় দাঁড়াইয়া সমুদ্রের বাতাসে তাহাদের সিক্ত বস্ত্র শুকাইতেছিল। যথাসময়ে গাড়ী ছাড়িল। ধনুষ্কোটী ষ্টেশনে আমরা ফিরিয়া গেলাম। রামেশ্বরের ট্রেণ ছাড়িতে তখনও কয়েক মিনিট বিলম্ব ছিল। ষ্টেশনের পাশেই হোটেল ছিল। আমরা তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া আসিয়া ট্রেণে উঠিলাম। যখন রামেশ্বর ষ্টেশনে পঁহুছিলাম, তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। সূর্য্যের প্রখর কিরণ তপ্ত বালুকার উপর দিয়া আমরা নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

প্রবাদ এই যে, রামেশ্বরের শিবলিঙ্গ শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাল্মীকির রামায়ণে এই কথার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। রাবণবধের পর শ্রীরামচন্দ্র যখন লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন পুষ্পক রথ হইতে তিনি সীতাদেবীকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর দেখাইয়া বলিতেছেন—

অত্র পূর্ব্বং মহাদেবঃ প্রসাদমকরোদ্বিভুঃ।
এতৎ তু দৃশ্যতে তীর্থং সাগরস্য মহাত্মনঃ॥
সেতুবন্ধ ইতিখ্যাতং ত্রৈলোক্যেন চ পূজিতং।
এতৎ পবিত্রং পরমং মহাপাতকনাশনং॥

—লঙ্কাকাণ্ডম্, ১২৫ম সর্গ, ২০ ও ২১ শ্লোক।

এই শ্লোকদ্বয়ের টীকাতে আছে যে, সমুদ্রের প্রসাদের অনন্তর সেতুবন্ধন করিবার পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্র এ স্থানে শিবস্থাপন করিয়াছিলেন। কূর্ম্মপুরাণে এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে পুরাণ অনুসারে এই ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। ধনুষ্কোটী তীর্থ সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, শ্রীরামচন্দ্র যখন লঙ্কা হইতে ফিরিতেছিলেন, তখন সমুদ্র তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন, "প্রভো, আপনি আমাকে বন্ধন করিলেন। এক্ষণে শৃগাল কুকুরও আমাকে অবজ্ঞা করিয়া পার হইয়া যাইবে। আমাকে এই অপমান হইতে রক্ষা করুন।" সমুদ্রের প্রার্থনায় ভগবানের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তাঁহার আদেশঅনুসারে লক্ষ্মণ ধনুর কোটী বা অগ্রভাগ দ্বারা সেতু তিন স্থানে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। একটী স্থান ধনুষ্কোটী তীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

রামেশ্বর দর্শন হইল। পাণ্ডার নিকট সুফল লইয়া আমরা রামেশ্বর হইতে

যাত্রা করিলাম। বেলা নয়টার সময় গাড়ী ছাড়িল। সমুদ্রের উপরিস্থ পুল হইতে সৌরকিরণোজ্জ্বল সমুদ্রের সৌন্দর্য্য দর্শন করিলাম। অনেকগুলি ছোট ছোট নৌকা পাল তুলিয়া সমুদ্রের উপর ভাসিতেছিল। একজন ডুবুরী ডিঙ্গী হইতে নামিয়া সমুদ্রের অগভীর জলে বার বার ডুব দিতেছিল। অদূরে একটী ষ্টীমার ধোঁয়া উড়াইয়া পূর্ব্ব দিকে চলিয়া যাইতেছিল। অবশেষে আমরা ভারতবর্ষের তীরে উপস্থিত হইলাম। বেলা বারটার সময় আমরা রামনাদ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। আড়াইটার গাড়ী মাদুরা ষ্টেশনে থামিল।

মাদুরা একটী বড় জংসন ষ্টেশন। মান্দ্রাজ হইতে তুতীকরীন ও রামেশ্বর যাইবার পথ মাদুরা হইতে ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ষ্টেশনের নিকটেই তিন চারিটি ছত্রম্। প্রতি ছত্রমেই বহুসংখ্যক লোক রহিয়াছে। অনেক চেষ্টা করিয়া আমরা একটী ছত্রে একটী খালি ঘর পাইলাম। জিনিসপত্র রাখিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা মন্দিরদর্শনার্থ বহির্গত হইলাম।

মাদুরা অতি প্রাচীন স্থান। ইহার প্রাচীন নাম দক্ষিণ মথুরা। বর্ত্তমান নাম 'মাদুরা' মথুরা শব্দেরই অপভ্রংশ। সমৃদ্ধিশালিনী নগরীর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া আমরা মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম। সম্মুখে উচ্চ গোপুরম্, গোপুরম্ আপাদমস্তক মূর্ত্তি দ্বারা সমাবৃত। অন্যান্য স্থানের গোপুরম্‌গুলির স্থানে স্থানে মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু মাদুরার গোপুরম্ মূর্ত্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমাবৃত। মূর্ত্তিগুলি সত্য সত্যই অসংখ্য। আমাদের প্রদর্শক মূর্ত্তিগুলি একে একে দেখাইয়া ব্যাখ্যা করিতেছিল। মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশই পৌরাণিক। গোপুরম্ অতিক্রম করিয়া আমরা বাঁধান প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরের চারি ধারে চারিটি গোপুরম্। এক পার্শ্বে শিল্পখচিত-বহু-স্তম্ভশোভিত একটি মণ্ডপ। মন্দিরের এক স্থানে অনেকগুলি ছোট ছোট দোকানে নানা দ্রব্য বিক্রীত হইতেছে। চিত্রিত কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত একটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক 'হল' দেখিতে পাইলাম। একটী পুষ্করিণী রহিয়াছে—তাহার চারি ধারে বাঁধান সোপানশ্রেণী। তখন অপরাহ্ণ হইয়াছিল, বহুসংখ্যক লোক সেই পুষ্করিণীর জলে স্নান করিতেছিল। বিমান-মন্দিরের স্বর্ণনির্ম্মিত শীর্ষদেশের উপর অস্তাচলাবলম্বী সূর্য্যের রশ্মিগুলি প্রতিফলিত হইতেছিল। সন্ধ্যাকালীন পূজাদর্শনার্থ সমাগত যাত্রীর ভীড়ে মন্দিরপ্রাঙ্গণ সমাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। বিচিত্র শাড়ী পরিধান করিয়া রমণীবৃন্দ দলে দলে মন্দিরের অভ্যন্তরে যাইতেছিলেন। মন্দিরের মহাদেবের নাম সুন্দরেশ্বর, এবং দেবীর

নাম মীনাক্ষী দেবী। মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী দরজায় অসংখ্য প্রদীপ জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিগ্রহদ্বয় দর্শন করিয়া আমরা রাত্রে ছত্রমে ফিরিলাম।

পর দিন প্রাতে মাদুরার রাজপ্রাসাদ দেখিতে গেলাম। সুবৃহৎ স্তম্ভ, উচ্চ ছাদ, এবং বড় বড় খিলান-সংযুক্ত রাজপ্রাসাদের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে-হয়। এখানে আপাততঃ সরকারী আফিস হইতেছে। কোথাও লেখা আছে—Registration office; কোথাও লেখা আছে—Sub-collector's Court. একটী সুন্দর ও সুবৃহৎ শয়নকক্ষ বিচারগৃহে পরিণত হইয়াছে। যে উচ্চ মঞ্চের উপর পালঙ্ক পাতিয়া নৃপতি শয়ন করিতেন, তাহার উপর হাকিমের এজলাস হইয়াছে; যে সুবিস্তৃত হর্ম্ম্যতলে নর্ত্তকীগণ নৃত্য গীত দ্বারা রাজার নিদ্রা আকর্ষণ করিত, সেখানে এক্ষণে সাক্ষীদিগকে হলফ পড়াইয়া জেরা করা হয়। কি বিসদৃশ পরিণাম!

নগরের কিছু দূরে তেপ্পাকুলাম নামক বৃহৎ সরোবর। সরোবরের মধ্যে একটী দ্বীপের উপর মন্দির, এবং নানাবিধ ফলের বাগান। উৎসবের সময় মন্দির হইতে সুন্দরেশ্বরের ও মীনাক্ষী দেবীর ভোগ-মূর্ত্তি এই পুষ্করিণীর উপর নৌবিহার করেন। সেই সময় চারি দিকে প্রদীপ দিয়া সাজান হয়, এবং অগণিত ভক্তদর্শক সমাগত হইয়া আনন্দ করিতে থাকে।

শ্রীচৈতন্যদেব যখন দক্ষিণ-মথুরা বা মাদুরাতে আগমন করিয়াছিলেন, তখন এক জন রামভক্ত ব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকে উপবাসী ও দুঃখিত দেখিয়া প্রভু দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

প্রভু কহে বিপ্র কাহে কর উপবাস।
কেন এত দুঃখ কেন করহ হতাশ॥
বিপ্র কহে মোর জীবনে নাহি প্রয়োজন।
অগ্নি জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন॥
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে ইহা কানে শুনি॥
এ শরীর ধরিবারে কভু না যুয়ায়।
এই দুখে জ্বলে দেহ প্রাণ নাহি যায়॥
প্রভু বলে এ ভাবনা নাহি কর সার।
পণ্ডিত হঞা মনে নাহি করিহ বিচার॥
ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি।
প্রকৃত ইন্দ্রিয় তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শনে।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণে॥
রাবণে আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া সীতা পাঠাইল॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥
বিশ্বাস করিহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে॥
প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস।
ভোজন করিল হৈল জীবনের আশ॥

তাহার পর মহাপ্রভু সেতুবন্ধে গিয়া কূর্ম্মপুরাণ শ্রবণ করিলেন। তাহাতে

লেখা ছিল যে, রাবণকে দেখিয়া সীতা অগ্নির শরণ লইলেন, এবং রাবণ মায়া-সীতাকে হরণ করিলেন। তখন প্রভুর এত আনন্দ হইল যে, পুরাতন পুঁথির ঐ অংশ নকল করিয়া তাহা প্রাচীন পুঁথিতে সন্নিবিষ্ট করিলেন, এবং পুঁথির সেই অংশ লইয়া দক্ষিণ-মথুরাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া 'রামদাস বিপ্র'কে সেই অংশ পাঠ করাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

বেলা তিনটার সময় মাদুরা হইতে Ceylon Boat-mailএ চড়িলাম। মাদুরা হইতে ত্রিচিনাপল্লী পথটি অতি সুন্দর। কখনও দূরে আকাশের গায়ে ঘন নীল পর্ব্বতশ্রেণী শোভা পাইতেছে; কখনও রেল-লাইনের পাশেই ছোট ছোট পাহাড়গুলি দাঁড়াইয়া আছে। ঘনবিন্যস্ত তরুলতায় পর্ব্বতগাত্র সমাচ্ছাদিত। তাহার মধ্য দিয়া পাহাড়ে উঠিবার পথগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া উপরে উঠিয়াছে। কোনও ছোট পাহাড়ের ঠিক মাঝখান দিয়া সাদা পথটি ঠিক সোজা ভাবে চলিয়া গিয়াছে,—যেন সুবিন্যস্ত কোঁকড়ান চুলের মধ্য দিয়া সোজা সিঁতে কাটা হইয়াছে। চারি দিকে পাহাড়ে ঘেরা অধিত্যকার উপর কোথাও দুই চারিটি ক্ষুদ্র কুটীর, এবং সেগুলিকে বেষ্টন করিয়া শস্যক্ষেত্র শোভা পাইতেছে। এখানে যাহারা বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত অতিবাহিত করে, তাহাদের জীবন কি শান্তিময়! সভ্যতার সকল আড়ম্বরের বিনিময়ে এই শান্তিময় জীবন কত দূর বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়! মনে ত হয়, কিন্তু দারিদ্র্য ও অভাবের পীড়নে এখানকার অধিবাসীদের বাস্তবিক জীবন কিরূপ, তাহা কে বলিতে পারে? এখানকার ভূমি বেশ উর্ব্বর। শস্যক্ষেত্রগুলি সমৃদ্ধিশালী। মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি কৃষকপল্লী দেখা যাইতেছিল। কৃষক ও কৃষকরমণীগণ ক্ষেত্রে কাজ করিতেছিল। বালক-বালিকারা কুটীরসংলগ্ন অঙ্গনে খেলা করিতেছিল। সূর্য্যালোক মৃদু, মৃদুতর হইয়া, অবশেষে ম্লান হইয়া গেল। সন্ধ্যা আসিয়া পৃথিবীর উপরের এই সুন্দর বিচিত্র দৃশ্যের উপর তাহার অন্ধকার যবনিকা টানিয়া দিল। আকাশে দুই চারিটি করিয়া নক্ষত্র ফুটিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর গাড়ী ত্রিচিনাপল্লী ষ্টেশনে পঁহুছিল। ত্রিচিনাপল্লীতে গাড়ী বিশ মিনিট দাঁড়ায়। ষ্টেশনে হিন্দুদের হোটেল ছিল। আমরা সেখানে ভাত খাইলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সমস্ত রাত্রি গাড়ী চলিতে লাগিল। চিঙ্গলপৎ ষ্টেশনে প্রভাত হইল। এখান হইতে মান্দ্রাজ দেড় ঘণ্টার পথ। সেণ্ট টমাস মাউণ্ট, সৈদাপেট, মম্বালম প্রভৃতি মান্দ্রাজের উপনগরস্থ ষ্টেশনগুলি অতিক্রম করিয়া আটটার একটু পূর্ব্বে আমরা মান্দ্রাজের অন্তর্গত এগ্‌মোর ষ্টেশনে পঁহুছিলাম।

মান্দ্রাজে এখানকার মত বন্ধ গাড়ী নাই। সবগুলিই ফিটন গাড়ী। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, মান্দ্রাজে অবরোধ-প্রথা নাই, সুতরাং মেয়েদের জন্য চারি-দিক-বন্ধ গাড়ীর প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীলোকেরা ফিটন-গাড়ীতে বসিয়া যাতায়াত করেন। এই গাড়ীতে মাল লইবার সুবিধা নাই। যাহা হউক, একটী গাড়ী করিয়া আমরা মীলাপুরস্থ বন্ধুর বাটীর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বন্ধুর আদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হইয়া অপরাহ্ণে, মীলাপুরস্থ শিবমন্দির দেখিতে গেলাম। একটী বৃহৎ বাঁধান সরোবরের পূর্ব্ব দিকে এই মন্দির অবস্থিত। সরোবরের অপর তিন দিকে সুপ্রশস্ত রাজপথ ও অট্টালিকা-শ্রেণী। মন্দিরের গোপুরম্, প্রশস্ত অঙ্গন ও শিল্পকার্য্যখচিত চত্বর দেখিয়া আমরা সমুদ্র-অভিমুখে চলিলাম। সমুদ্রের ধারে একটী সুন্দর রাজপথ আছে; তাহাকে "মেরিনা" বলে। দিগন্তবিস্তৃত নীল জল ও তরঙ্গাভিহত তটভূমি দেখিতে দেখিতে বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই সুদীর্ঘ পথে আমরা গাড়ী করিয়া যাইতেছিলাম। পথের ধারে প্রায়ই মাঠ—কচিৎ দুই একটী গৃহ দেখা যাইতেছে। দূরে হাইকোর্ট, প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রভৃতি অট্টালিকা দেখা যাইতেছিল।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় মান্দ্রাজ-মেলে আমরা কলিকাতা ফিরিলাম। সারা রাত্রি গাড়ী চলিল। এলোর ষ্টেশনে প্রভাত হইল। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে গাড়ী গোদাবরীর পুলের উপর উপস্থিত হইল। এই পুল ভারতবর্ষের মধ্যে দৈর্ঘ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। সাগরসঙ্গম-সন্নিকটে নদী অতি বিশালকায় ধারণ করিয়াছে। বিশেষতঃ সে বৎসর চিরায়মান বর্ষার ফলে শরৎকালেও নদীগুলি প্রসন্নকান্তি ধারণ করিতে পারে নাই। গৈরিক বর্ণের বারিরাশিতে গোদাবরী কূলে কূলে পরিপূর্ণ। তীরবিরাজিত বৃক্ষশ্রেণীর পশ্চাতে নগরের মন্দিরচূড়াগুলি দেখা যাইতেছিল। বহুক্ষণ আমরা সে সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করিতে পারিলাম। অবশেষে পুল পার হইয়া গেল। গাড়ী নদীর ঠিক পার্শ্বেই অবস্থিত গোদাবরী ষ্টেশনে উপস্থিত হইল।

তীর্থযাত্রিগণ এইখানে নামিয়া থাকে। কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী রাজামন্দ্রীই বড় ষ্টেশন। তেঁলেগু দেশের মধ্যে রাজামন্দ্রী একটী প্রধান নগরী। রাজ-মান্দ্রী ছাড়িয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে গোদাবরী-সলিলপুষ্ট 'কেনেল' (canal) বা খালগুলি দেখা যাইতেছিল। খালের মধ্যে নৌকা ভাসিতেছিল। তাহার উভয় পার্শ্বস্থ উচ্চ তীরের উপর দিয়া লোক চলিতেছিল। ক্ষেত্রে প্রচুর

পরিমাণে শস্ত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে আমরা জনপদ দেখিতে পাইতেছিলাম। ঘাটে লোক জন স্নান করিতেছে। স্ত্রীলোকেরা কক্ষস্থ কুম্ভ পূর্ণ করিয়া জল লইয়া মৃদুপদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিতেছে। সামলকোট জংসন ও টুনি ষ্টেশন পার হইয়া সাড়ে বারটার সময় গাড়ী ওয়ালটেয়ারে উপস্থিত হইল। এইবার বি-এন্-আর্ আরম্ভ হইল। পথ আর শেষ হয় না। গাড়ী এক একবার বড় ষ্টেশনে দাঁড়ায়, আবার পূর্ণ বেগে দৌড়ায়। ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমাস্থিত প্রায় সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যটি আমরা অতিক্রম করিতেছিলাম। সেদিন রৌদ্র তেমন প্রখর ছিল না। গাড়ীর জানালার মধ্য দিয়া বায়ু প্রবলভাবে প্রবাহিত হইয়া আমাদের ক্লান্ত শরীরে আঘাত করিতেছিল। উন্মুক্ত প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্যাবলী তাহাদের প্রাচুর্য্যে আমাদের চক্ষু ও মন অভিভূত করিতেছিল। দুপুর কাটিয়া গেল, বিকাল হইল; বিকালও ফুরাইয়া গেল। সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীর উপর রহস্যপূর্ণ আবরণ টানিয়া দিল।

সন্ধ্যার পর গাড়ী বহরমপুর ষ্টেশনে পঁহুছিল। প্ল্যাটফরমের আলো ও অন্ধকারের মধ্যে যাত্রিগণ ব্যস্তভাবে চলাফেরা করিতেছিল। কয়েকটি সুসজ্জিত ভদ্রলোক ষ্টেশনে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। বহরমপুরে গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়াইল। তাহার পর হুস্ হুস্ শব্দ করিতে করিতে অন্ধকারে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এক রাত্রি এক দিন ট্রেণে কাটিয়া গেল। সুবিধামত আহার হয় নাই। শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং অল্প অল্প নিদ্রাকর্ষণ হইতেছিল। আমাদের স্থির ছিল, খুর্দ্দায় নামিয়া ষ্টেশনে রাত্রি কাটাইয়া সকালের গাড়ীতে পুরী যাইব। রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটার সময় গাড়ী খুর্দ্দায় পঁহুছিবে। আমরা খুর্দ্দার প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিলাম। বসিয়া বসিয়া কখন অতর্কিতভাবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, আর একটু হইলেই খুর্দ্দা পার হইয়া যাইত। ভাগ্যক্রমে খুর্দ্দা ষ্টেশনেই জাগিয়া উঠিয়াছিলাম। তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া বিশ্রাম-ঘরে গিয়া বিছানা পাতিয়া শয়ন করিলাম।

সকালের ট্রেণে পুরী যাত্রা করিলাম। রেল হইতে উড়িয়া গ্রামগুলির মধ্যে গৃহকর্ম্মনিরত উড়িয়া-রমণীগণ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। তাহারা হল্‌দে রংয়ের কাপড় ছোট করিয়া পরিয়াছে, হাতে ও পায়ে বড় বড় ভারী গহনা রহিয়াছে। ষ্টেশনগুলিতে যাত্রীর খুব ভিড়। গাড়ী ষ্টেশনে আসিলেই তাহারা গাড়ীতে স্থান পাইবার জন্য ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করিতেছিল। অবশেষে আমরা পুরী ষ্টেশনে পঁহুছিলাম।

পুরীর বর্ণনা আমার উদ্দেশ্য নহে। পুরীতে আমরা এবার কয়েক ঘণ্টা মাত্র ছিলাম। পুরীর সুপ্রশস্ত রাজপথ, বহুদূর পর্য্যন্ত লক্ষ্যগোচর জগন্নাথ-দেবের মন্দির, মন্দিরে যাত্রীর সমাগম, তাহাদের ভক্তি-বিহ্বল মুখচ্ছবি, মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ, সমুদ্রের রুদ্র ও মনোহর দৃশ্য ও তরঙ্গাবলির ভীষণ আস্ফালন—সকলই সুন্দর, এবং আজ কাল রেল হওয়াতে বহু বাঙ্গালীর সুপরিচিত। সন্ধ্যার সময় পুরী এক্স্প্রেসে আমরা কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলাম।

প্রভাতে উঠিয়া সেই চিরপরিচিত বাঙ্গালা দেশের শোভা দেখিতে পাইলাম। দিগন্তবিস্তৃত শ্যামল শস্যক্ষেত্র। মধ্যে মধ্যে সবুজ সমুদ্রে দ্বীপের ন্যায় ঘন তরুরাজিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম। কোথাও রেল-লাইনের পার্শ্বে ছোট ছোট পুষ্করিণী, এবং দুই চারিটি কৃষকদের কুটীর। চাষার মেয়েরা স্নান করিতেছিল। অল্প অল্প শীত পড়িয়াছিল, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা দোলাই বাঁধিয়া প্রাঙ্গণে খেলা করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে পরিচিত ষ্টেশন-গুলি পার হইয়া গাড়ী হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বাগদাদ।

২

দিল্লী সাহজাহানের পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান থাকিলেও যেমন তাহা সাহজাহানাবাদ নামেই পরিচিত হইয়াছিল, বাগদাদ তেমনই মনসুরের স্থাপিত হইলেও হরুণ রসিদের পুরী বলিয়াই সমধিক পরিচিত। আরব্য-উপন্যাস সত্য সত্যই কল্পনার রত্নবেদী—উপন্যাসের মণিমঞ্জুষা ; সে যেন কবি-প্রতিভার অক্ষয় কীর্ত্তি। সেই আরব্য-উপন্যাসের জন্যই প্রাচীতে ও প্রতীচীতে বাগদাদের সঙ্গে হারুণ রসিদের নাম অবিচ্ছিন্নভাবে বিজড়িত। সে উপন্যাস পাঠ করিতে করিতে পাঠক বাগদাদের যে কল্পনা করেন, তাহাতে সত্য সত্যই মনে হয়—বাগদাদ পরীর রাজ্য ছিল—যেন—

"স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিনাং গাং গতানাম্
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্॥"

হারুণ স্বয়ং বিলাসী ও বীর ছিলেন। তিনি মনসুরের পৌত্র। পিতা মাদী

এক সময় জ্যেষ্ঠ পুত্র মুসাকে বঞ্চিত করিয়া হারুণকে রাজ্য দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। পিতার মৃত্যু হইলে হারুণ ভ্রাতার সহিত বিরোধ কল্পনাও না করিয়া তাঁহাকেই খালিফা বলিয়া স্বীকার করিয়া রাজদণ্ডাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজ্যে আপনার অধিকার-ত্যাগের কথায় তিনি বলিয়াছিলেন, প্রিয় পত্নী জোবেদাকে লইয়া শান্তিতে জীবন-যাপন করিতে পারিলে তিনি আর কিছুই চাহেন না। কিন্তু পিতা মাদী তাঁহার বীরত্বে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আর্ম্মেনিয়া প্রভৃতি স্থান সহ সাম্রাজ্যের সমগ্র পশ্চিম অংশের শাসনকর্ত্তা করিয়াছিলেন, এবং ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, মুসার পর হারুণ খালিফা হইবেন। কথিত আছে, মুসা তাঁহার জননীর ষড়যন্ত্রে প্রাণ হারাইয়াছিলেন—প্রভুত্বলালসায় তদীয় জননী তাঁহাকে হত্যা করাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হারুণ খালিফা হইয়াছিলেন।

বিলাসী হারুণ তৎকাল-প্রচলিত ব্যবহার পরিহার করিতে পারেন নাই। প্রথমে তিনি যাঁহাদের হস্তে রাজ্যশাসনভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন, শেষে সন্দেহ-বশে তাঁহাদিগকেই সংহার করিয়াছিলেন। তিনি মেসোপোটেমিয়া সুরক্ষিত করিবার সুব্যবস্থা করিয়া সমগ্র এসিয়া মাইনরে প্রভুত্ব-বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং খোরাশান প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহের অঙ্কুরোদ্গমমাত্র তাহা পদদলিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালেই বাগদাদে সর্ব্বপ্রথম কাগজ প্রস্তুত করিবার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ৪৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তীর্থযাত্রাকালে তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন। যাহাতে ভবিষ্যতে রাজ্য লইয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় রক্তপাত না হয়, সেই জন্য তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র আমীনকে উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আমীনের পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মামুন ও মামুনের পর কনিষ্ঠ পুত্র কাশীম খালিফা হইবেন। আমীনের জীবদ্দশায় মামুন যে সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ শাসন করিবেন, এ ব্যবস্থাও তিনি করিয়া গিয়াছিলেন। যে পত্রে এই ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছিল, তাহা কাবায় রক্ষিত ছিল।

৮০৯ খৃষ্টাব্দে হারুণের মৃত্যু হইলে আমীনই খালিফা হয়েন। খালিফা হইয়া আমীন মন্ত্রীর পরামর্শে মামুনকে রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার কল্পনা করেন, এবং তাঁহাকে বাগদাদে আহ্বান করেন। ফদল মামুনের হিতাকাঙ্ক্ষী শিক্ষক ছিলেন। তিনি মামুনকে বুঝাইয়া দেন, বাগদাদে যাইলে তাঁহার প্রাণনাশ অনিবার্য্য। সেই কথায় মামুন খোরাশান ত্যাগ করিতে অসম্মত

হইলেন। ও দিকে ক্রুদ্ধ আমীন পিতার নির্দ্দেশ-পত্র নষ্ট করিয়া স্বীয় পঞ্চবর্ষ-বয়স্ক পুত্রকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করিলেন। মামুন সব সরকারী কাগজপত্রে আমীনের নাম-ব্যবহার বন্ধ করিলেন। ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ বাধিয়া উঠিল। আমীন ৪০ হাজার সৈনিক সহ ইসাকে খোরাশানে প্রেরণ করিলেন। জোবেদা সেনাপতিকে অনুনয় করিয়া বলিলেন, তিনি যেন মামুনকে পরাভূত করিলে তাঁহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না করেন। যুদ্ধে আমীনের সেনা-দলের পরাজয় হইল। তখন মামুন খালিফা উপাধি গ্রহণ করিলেন। আমীন নূতন সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন—যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এক একটি করিয়া সব প্রদেশ আমীনের দুর্ব্বল হস্ত হইতে চ্যুত হইতে লাগিল। শেষে আমীন কেবল বাগদাদ অধিকারে রাখিয়া ভ্রাতার আক্রমণ প্রতিহত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। প্রায় দুই বৎসর বাগদাদ আক্রমণবেগ সহ্য করিতে পারিল। শেষে নগরের পূর্ব্বভাগ আক্রমণকারীদিগের হস্তগত হইলে আমীন বাধ্য হইয়া শত্রুকরে আত্মসমর্পণ করিলেন। ৮১৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অষ্টাবিংশবর্ষবয়স্ক যুবক আমীন শত্রুকরে আত্মসমর্পণ করিয়া নিহত হইলেন। ফজল তাঁহার ছিন্নমুণ্ড মামুনকে উপহার দিলে, মামুন কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। আমীনের পঞ্চবর্ষব্যাপী রাজত্ব সাম্রাজ্যের পক্ষে নানা অনিষ্টের হেতু হইয়াছিল, এবং সেই সময়ে বাগদাদের যে শ্রীহানি হয়, তাহার পূরণ আর কখনই হয় নাই।

আমীনের মৃত্যুর পরদিনই মামুন খালিফা ঘোষিত হইলেন। তাঁহার রাজত্বে শিল্পের, সাহিত্যের ও বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল সত্য, কিন্তু রাজত্বের প্রারম্ভকাল নানা বিশৃঙ্খলায় কলঙ্কিত হইয়াছিল। ইরাকে বসরা, মদেন প্রভৃতি স্থান শত্রুহস্তগত হয়; কুফায় আবুল সরাইয়া আপনাকে নৃপতি ঘোষণা করিয়া স্বনামে মুদ্রা প্রচলিত করেন; মক্কা, মদিনা ও ইয়েমেনও শত্রু কর্তৃক অধিকৃত হয়। মামুন বাগদাদে না আসিয়া মার্ভেই বাস করিতে-ছিলেন। বাগদাদে দস্যুদলের ভয়ে নগরবাসীরা সর্ব্বদা শঙ্কিত অবস্থায় বাস করিত। এই সময় মার্ভে মামুন আলির পুত্র হোসেনের এক জন বংশধরকে আপনার উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করেন, এবং আব্বাসীদিগের ব্যবহৃত কৃষ্ণবর্ণের পরিবর্ত্তে বেশে আলির পরিবারের হরিৎ বর্ণের ব্যবহার করিতে আদেশ দেন। ইহাতে এক পক্ষ যেমন আনন্দিত হইল, আর এক পক্ষ তেমনই রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে খালিফা বলিতে অস্বীকার করিয়া তদীয় পিতৃব্য ইব্রাহিমকে খালিফা

বলিয়া ঘোষণা করিল। রাজনীতির সতরঞ্চ খেলায় আবার নূতন অবস্থা লক্ষিত হইল। তখন মামুনের চৈতন্য হইল। ফদল নিহত হইলেন, এবং তাঁহার প্রভাবমুক্ত হইয়া মামুন স্বাধীনভাবে রাজদণ্ডপরিচালন করিতে লাগিলেন। ৮১৯ খৃষ্টাব্দের অগষ্ট মাসে বাগদাদে আসিয়া তিনি নূতন করিয়া রাজকার্য্যে মন দিলেন। তিনি ইব্রাহিমকে ক্ষমা করিলেন। ইব্রাহিম রাজদরবারে থাকিয়া সঙ্গীত-চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিলেন। সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে মামুন সাহিত্য-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি গ্রীক হইতে অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থসমূহের অনুবাদ করাইলেন, এবং বাগদাদে পুস্তকাগার ও মানমন্দিরসংবলিত একটি বৃহৎ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বাগদাদের বর্ত্তমান শুমরিকে (Customs House) যে বিদ্যালয় ছিল, তাহাতে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ছাত্র পাঠ করিতে পারিত। সেই বিদ্যালয়ের বিরাটত্ব হইতেই বুঝা যায়, বাগদাদ এককালে—সমৃদ্ধির সময় মুসলমানদিগের বিশাল বিদ্যাকেন্দ্র ছিল। তাঁহার নিয়োগানুসারে দুই জন অঙ্কশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিত পৃথিবীর ব্যাস-নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ৮২৭ খৃষ্টাব্দে মামুন নূতন ধর্ম্মমত গ্রহণ করেন। তিনি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতায় ও প্রাক্তনে বিশ্বাসবান হইয়া কোরাণের সম্বন্ধে রক্ষণশীল মুসলমান সম্প্রদায়ের মত পরিহার করেন, এবং ৮৩৩ খৃষ্টাব্দে আপনার মত রাজাজ্ঞায় প্রচারিত করেন। তিনি কাজী ও মোল্লাদিগকে কোরাণ সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশ্বাস পরিহার করিতে আদেশ দিলে, অনেকে সে আজ্ঞা পালন করিতে অস্বীকার করিলেন। মামুন তখন টারসাসে। বাগ-দাদের শাসনকর্ত্তার নিকট সেই সংবাদ অবগত হইয়া মামুন "অপরাধী"দিগকে তাঁহার কাছে পাঠাইবার আদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে খালিফার দরবারে হাজির করিবার পূর্ব্বেই মামুনের মৃত্যু হইল। আপনার শত কার্য্যের মধ্যেও মামুন ইসলামের শত্রু গ্রীকদিগকে বিস্মৃত হয়েন নাই। ৮৩০, ৮৩১ ও ৮৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি এসিয়া মাইনরে অভিযান করিয়া গ্রীক সম্রাট থিওফি-লাসকে সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি গ্রীকসম্রাটের সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া পরবৎসর স্বয়ং কনস্তান্তিনোপল আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া পুত্র আব্বাসকে টায়ানায় একটি দুর্গ রচনা করিতে পাঠাইয়া দিয়া-ছিলেন। কিন্তু শীতল জলে অবগাহন স্নান করায় তাঁহার জ্বর হয়, এবং ৮৩৩ খৃষ্টাব্দের অগষ্ট মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। মামুনই খলিফাদিগের দরবারে অভিজাতবংশীয় তুর্কদিগকে আনিতে আরম্ভ করেন।

মামুনের পর মোটাসিম খালিফা হইলেন। তিনি সে জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইতেছিলেন—প্রতি বৎসর তুর্ক দাস ক্রয় করিয়া শক্তি-সঞ্চয় করিতেছিলেন। মামুনের পর কেহ কেহ তাঁহার পুত্রকে খালিফা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু পুত্র আব্বাস তাহাতে সম্মত হয়েন নাই। সুতরাং মোটাসিম অনায়াসে সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি টায়ানার দুর্গাদি নষ্ট করিয়া বাগদাদে আসিয়া ৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সহরে প্রবেশ করিলেন। তিনি শরীররক্ষী সেনার প্রয়োজনে বাগদাদে বহু তুর্কদাস ক্রয় করিলেন। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উত্তরকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, এবং তাহারাই পরিশেষে বাগদাদের সমৃদ্ধিনাশের কারণ হয়। খালিফার শরীররক্ষীরা অশিক্ষিত—বিশেষ তাহারা ইসলামের অনুশাসন অগ্রাহ্য করিত। তাহাদের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বাগদাদবাসীরা কতকগুলি শরীররক্ষীকে নিহত করিল—অনেকে আহত হইল। মোটাসিম বিপদ গণিলেন। তিনি নগরবাসীদিগকে অসন্তুষ্ট করিতেও অসম্মত, শরীররক্ষীদিগকেও অসন্তুষ্ট করিতে পারেন না। শেষে তিনি বাগদাদ ত্যাগ করিলেন। ৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বাগদাদের অদূরে সামারায় ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন; তথায় নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত করাইয়া তিনি ৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তথায় গমন করিলেন। বাগদাদের শাসনভার তাঁহার পুত্র হারুণের উপর অর্পিত হইল। এই সময় হইতে ৫৮ বৎসর কাল বাগদাদে আর খালিফাদিগের রাজধানী ছিল না। মোটাসিমের এই ব্যবস্থায় কেবল যে বাগদাদ হতশ্রী হইল, তাহাই নহে; পরন্তু তাঁহার বংশেরও সর্ব্বনাশ হইল। এই সময় হইতে খালিফারা তুর্ক শরীররক্ষীদিগের হস্তে পুত্তল হইয়া রহিলেন।

এই সময়ের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। হারুণের পুত্রদ্বয়ের অন্তর্বিপ্লবে যখন সাম্রাজ্য বিপন্ন, তখন ইরাকে বসরা ও ওয়াজিতের মধ্যবর্ত্তী জলাভূমিতে ভারতীয় জাঠজাতির আবির্ভাব হয়। তাহারা টাইগ্রীস-যাত্রী নৌকার আরোহীদিগের নিকট টাকা আদায় করিত। ৮২১ খৃষ্টাব্দ হইতে মামুন তাহাদিগকে শাসন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। মোটাসিম বাগদাদে আসিয়া দেখেন, জাঠগণ বসরা হইতে খর্জ্জুরের আমদানী বন্ধ করায় লোকের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। বহু চেষ্টায় তিনি জাঠদিগকে পরাভূত করিলে তাহারা এই সর্ত্তে আত্মসমর্পণ করে যে, তাহাদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করা হইবে না। ৮৩৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাহারা জাতীয়-বেশে—তাহাদের বাজনা বাজাইতে বাজাইতে জলপথে বাগদাদে গমন করে। তথা হইতে

তাহাদিগকে গ্রীক সাম্রাজ্যের সীমান্তে পাঠান হয়। ২০ বৎসর পরে তাহারা এসিয়া মাইনরে প্রবেশ করে; কিছুকাল পরে তাহারা য়ুরোপে প্রবেশ করে। তখন তাহাদিগকে ইজিপ্‌সিয়ান (জিপসী বা বেদিয়া) বলা হইত।

৮৪২ খৃষ্টাব্দে মোটাসিমের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র হারুণ ওয়াতিক খালিফা হইলেন। তিনিও মামুনের মত জ্ঞানপিপাসু ছিলেন, এবং কোরাণ যে আল্লার বাক্য, তাহা বিশ্বাস করিতেন না। এই কারণে এক দল লোক তাঁহার উপর বিরূপ হইয়া উঠেন। তিনি সেনাদলে বহু আফ্রিকানকে প্রবেশাধিকার দান করেন।

তাহার পর তখন যেমন হইত, তেমনই হইল—সিংহাসন লইয়া বিবাদ বাধিল। শেষে মৃত খালিফার ভ্রাতা মোতাওয়ার্কিন খালিফা হইলেন। তিনি পুরাতন মুসলমান মতের সমর্থক ছিলেন। তিনি ইহুদী, খৃষ্টান ও শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদিগের বিরোধী ছিলেন বলিয়া তাহাদিগের বেশে বৈশিষ্ট্য ব্যবহারের ও গৃহদ্বারে শয়তানের মূর্ত্তি সংলগ্ন করিবার ব্যবস্থা করেন, এবং তাহাদিগকে রাজকার্য্যে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত করেন। তাঁহার শাসনকালে তুর্ক সেনাপতি ওয়াসিফের প্রভাব অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। সেই প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার আশায় খালিফা ৮৫৮ খৃষ্টাব্দে দামাস্‌কসে গমন করেন। কিন্তু দামাস্‌কসের জলবায়ু তাঁহার সহ্য না হওয়ায়, তিনি আবার সামারায় আসিয়া ১ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত করান। এই সময় তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র মোস্তাসীরের পরিবর্ত্তে প্রিয় পত্নী কারিহার পুত্র মোতাজকে উত্তরাধিকারী করিবার সঙ্কল্প করেন, এবং মোস্তাসীর, ওয়াসিফ প্রভৃতির হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। মোস্তাসীর প্রভৃতি সে সংবাদ পাইয়া ৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকেই নিহত করান।

পিতৃহত্যার দিনই পিতৃহন্তা মোস্তাসীর আপনাকে খালিফা ঘোষণা করান। কিন্তু তাঁহার রাজত্বও দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। বিষপ্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে মোস্তেন খালিফা হয়েন। তিনিও দুর্ব্বল। গ্রীকরা তাঁহার রাজ্য-সীমান্তে অত্যাচার করিতে লাগিল—রাজধানীতেও দলাদলি দেখা দিল। তিনি ভয়ে বাগদাদে পলায়ন করিলেন। ৫৮ বৎসর পরে খলিফা আবার পুরাতন রাজধানীতে আসিলেন। শত্রুরা বাগদাদ অবরুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাভূত করিল। মোস্তেন নিহত হইলেন—মোতাজ সম্রাট হইলেন। এই সময় হইতেই খালিফাদিগের প্রভাব নিষ্প্রভ হইতে লাগিল—অধঃপতনবেগ

দ্রুত হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও খালিফারা মুসলমানদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে সর্ব্ব-প্রধান ব্যক্তি। সেই জন্য তাঁহাদের দুরবস্থাতেও রাজধানী বাগদাদের সমৃদ্ধির অবসান হইল না; বাগদাদ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর হইয়া রহিল, এবং বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে নানা দেশের বণিকদিগের পণ্য-ক্রয়বিক্রয়ে সমৃদ্ধ হইতে লাগিল। মোতাজের পরিণাম চিন্তা করিলে নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হয়। তিনি কিছুতেই তুর্ক, পারসী ও আফ্রিক সৈন্যদিগের প্রাপ্য টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। তাহাদিগকে দেয় অর্থের পরিমাণ তখন ভূমিরাজস্বের প্রায় দ্বিগুণ—৯ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা! তিনি সেই অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারায় তাহারা তাঁহাকে তদীয় জননীর নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিবার জন্য অত্যাচারে পীড়িত করিতে লাগিল। শেষে কারাগারে অনাহারে ৮৬৮ খৃষ্টাব্দে খালিফার মৃত্যু হইল!

তাঁহার পরবর্ত্তী খালিফা মোতাদীও নিহত হয়েন, এবং তাঁহার পর মোতামীদ খালিফা হয়েন। তাঁহারই সময় রাজপাট আবার বাগদাদে নীত হয়। কিন্তু তখন খালিফার আর সে প্রভাব ও প্রতাপ নাই। একে একে এক একটি প্রদেশ খালিফার হস্তচ্যুত হইতে লাগিল, এবং ৯২৭ খৃষ্টাব্দে মোক্তাদীরের রাজত্বকালে বাগদাদও বিপন্ন হইল। ৯৩৪ খৃষ্টাব্দে খালিফা জাহীর সিংহাসনচ্যুত হইলেন—তাঁহাকে শত্রুরা অন্ধ করিয়া দিল। তাঁহার পরবর্ত্তী সম্রাট রাদীর রাজত্বকালে সাম্রাজ্য বাগদাদ প্রদেশেই সঙ্কুচিত হইয়া আসিল—আর সব প্রদেশে শাসনকর্ত্তারা স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। ৯৪৫ খৃষ্টাব্দে খালিফা মোস্তাকফী বাগদাদ-বিজয়ী বুইদ-বংশীয় শত্রুকে সুলতান অর্থাৎ সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। নূতন সম্রাট স্বয়ং শাসক হইয়া খালিফাকে মুন্সী করিয়া রাখিলেন। খালিফার প্রভাব নামশেষ হইয়া আসিল। তাহার পর সাম্রাজ্যের অন্তিমকালে সর্ব্বত্র যেমন হয়, তেমনই হইতে লাগিল। ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্রে বন্যার মত কাহাকেও ভাসাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল, কাহাকেও কূলে আনিয়া দিতে লাগিল। অত্যাচারের অনলে শিল্প ভস্মীভূত হইতে লাগিল—নরশোণিতে সভ্যতার দীপ নির্ব্বাপিত হইতে লাগিল—অনাচারে বাণিজ্য ম্লান হইয়া গেল।

১১৮৭ খৃষ্টাব্দে খালিফার সিংহাসনে বসিয়া নাশির সাম্রাজ্যের প্রনষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখিলেন সত্য, কিন্তু তখন তাতার বা মঙ্গলদিগের অভ্যুদয়ের সূচনা হইয়াছে। জেঙ্গিজ খাঁ চীনেও রাজ্যবিস্তার করিয়া নূতন শক্তির সম্প্রসারণে নিযুক্ত হইলেন।

মোস্তাসীমের রাজত্বকালে ১২৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জেঙ্গিজের ভ্রাতা হুলাগু বাগদাদ বিজয় করিয়া মোস্তাসীমকে নিহত করিলে, খালিফাদিগের নামশেষ প্রাধান্যেরও অবসান হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদিগের খালিফার রাজধানীর গৌরবেও বঞ্চিত হইয়া বাগদাদ দুর্দ্দশার পঙ্কে পতিত হইল।

প্রায় দেড় শত বৎসর বাগদাদ তাতারদিগের হস্তগত রহিল। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে সুলতান আমেদ বেন আভিস তৈমুরের ভয়ে পলাইয়া গ্রীক সম্রাটের আশ্রয় গ্রহণ করিলে বাগদাদ তৈমুর কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। কিন্তু আমেদ নষ্ট রাজ্যের উদ্ধারসাধনে সফলপ্রচেষ্ট হয়েন। ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে আবার মোঙ্গলরা বাগদাদ অধিকৃত করে, এবং ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে আর এক দল মোঙ্গল পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকে পরাভূত করিয়া বিজয়গর্ব্বে বাগদাদে প্রবেশ করে। এইরূপে বাগদাদ ভাগ্য-দেবীর হস্তে ক্রীড়াগোলকের দশাপ্রাপ্ত হয়। ১৫০২ খৃষ্টাব্দে পারস্য রাজ-বংশের প্রথম শাহ ইস্মাইল বাগদাদ অধিকার করিলে, তদবধি বাগদাদ লইয়া তুর্কি ও পারস্যদেশীয় রাজায় বিবাদ চলিতে থাকে। জয়লক্ষ্মী কখন এক পক্ষে, কখন অপর পক্ষে বরাভয় প্রদান করিতে থাকেন। সুলেমান বাগদাদ অধিকার করেন; শাহ আব্বাস তাঁহাকে পরাভূত করেন। সে ১৬২০ খৃষ্টাব্দের কথা। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ৩ লক্ষ সেনা লইয়া সুলতান চতুর্থ মুরাদ বাগদাদ অবরোধ করিয়া বহু কষ্টে অধিকার করেন—সহরের অধিকাংশ অধিবাসী নিহত হয়।

তদবধি বাগদাদ ক্ষয়শীল তুর্কী সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। শেষে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে তুর্কশক্তি ক্ষুণ্ণ ও সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইলে বাগদাদ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা আমেদ পাশা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। নাদীর শাহ বহু চেষ্টাতেও আমেদকে পরাভূত করিয়া বাগদাদ অধিকার করিতে পারেন নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাগদাদে আবার তুর্কপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি বাগদাদ তুর্কী সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল, এবং বাগদাদ সহর হৃতসম্পদ ও গতশ্রী হইলেও সরকারী কাগজপত্রে "গৌরবোজ্জ্বল নগর" আখ্যা লাভ করিত।

মনসুরের ও হারুণের স্বপ্নপুরীর শেষ পর্য্যন্ত "কেবল নাম আছে।"

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

'হনি-মুন'।

[খানিকটা সত্য-গল্প]

১

পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিলে অনেক রকম বাঙ্গালী নয়নগোচর হয়। তাহার মধ্যে একপ্রকার বাঙ্গালী 'মেড়ুয়াবাদী বাঙ্গালী' বলিয়া প্রখ্যাত। তাঁহাদিগের নাম 'মেড়ুয়াবাদী' কেন হইল, তাহার কোনও ইতিহাস নাই। যেমন এক দল ফিরিঙ্গী 'ট্যাস্' বলিয়া পরিচিত, অথচ তাহার কোনও নির্দ্দিষ্ট কারণ নাই, সেইরূপ 'মেড়ুয়াবাদী' খেতাবেরও কোনও নির্দ্দিষ্ট কারণ নাই। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, 'মেড়ুয়াবাদী বাঙ্গালী' ছাতু আহার করেন, কিংবা ধুতিচাদরের সঙ্গে টুপী ব্যবহার করেন। তাহাও নহে। তাঁহারা দেখিতে ঠিক পূর্ব্বাঞ্চলের বাঙ্গালীরই মত। কথায় ঈষৎ হিন্দুস্থানী ভাষার 'টান্' আছে। অথচ খাঁটী বাঙ্গালা ভাষাতেও কথোপকথন করিতে কুণ্ঠিত নহেন।

বিদ্যাধরপুরের ষ্টেশনমাষ্টার (লুপলাইন) গদাধর বাবুকে সকলে 'মেড়ুয়াবাদী বাঙ্গালী' বলিত। এক দিন ট্রেণে তাঁহার সহিত দেখা হয়। গদাধর বাবু দেখিতে খুব সুপুরুষ, কিন্তু গোঁফের আয়তন খুব বড়। মুখের সঙ্গে মানায় না। মাথার চুল সম্মুখে ও পশ্চাতে একই রকম ছোট। অনাবৃষ্টি হইলে শুষ্ক জলাশয়ের দিকে গাভীকুলের যেমন দৃষ্টি, গদাধর বাবুর দৃষ্টি অনেকটা সেই মত। বোধ হয় তাহাতেই আমার প্রথমে সন্দেহ হইয়াছিল। গদাধর বাবু খুব মনঃসংযোগ সহকারে একটা হুঁকা হস্তে লইয়া টানিতেছিলেন। ধুম্রের লেশমাত্র নাই, অথচ হুঁকা হস্তে করিয়া কষ্ট ভোগ করা সাধারণতঃ দেখা যায় না, অতএব আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি ব্রাহ্মণ?'

গদাধর বাবু বলিলেন, 'নিশ্চয়'।

আমি। যদি আজ্ঞা হয়, তবে তামাক্ আর একবার সাজিয়া দিই।

গদাধর। আমার চাকর কেবল 'হুক্কা' ও 'চিলম্' (কলিকা) ও 'টিকিয়া' মাত্র দিয়াছে। সঙ্গে তামাকু দিতে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং তামাকু সাজা 'বেফায়দা'। আপনিও ব্রাহ্মণ?

আমি। নিশ্চয়। (বাস্তবিক পক্ষে আমি কায়স্থ।)

গদাধর। তবে একবার টানিয়া দেখুন।

আমি হুঁকা হস্তে লইয়া বুঝিতে পারিলাম যে, পূর্ব্বাবধিই তাহাতে তামাকের লেশমাত্র ছিল না, অথচ প্রাণপণে টানিতে লাগিলাম।

গদাধর। আপনি ইহাতে কোনও 'মজা' পাইতেছেন?

আমি। নিশ্চয়।

কি মজা পাইতেছিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। প্রথমতঃ, গদাধর বাবুর সহিত কথোপকথনের মজা। দ্বিতীয়তঃ, ধূম্রবিহীন হুঁকা টানিবার মজা। আসল কথা, আমার তামাক খাওয়া অভ্যাসই ছিল না।

গদাধর। আপনি খুব গুণগ্রাহী 'কদরদান্' লোক।

আমি। নিশ্চয়। আমার তামাক্ খাওয়াই অভ্যাস নাই, তবে আপনি কোন সুখে হুঁকা টানিতেছিলেন, তাহাই দেখিবার জন্য—

গদাধর। তবে এত 'তক্‌লিফ্' (কষ্ট) করিলেন কেন? মহাশয়ের নাম?

সেই 'তকলিফ্' কথাটা উচ্চারিত হইবামাত্র আমি বুঝিতে পারিলাম যে, গদাধর দাদা যথার্থই মেড়ুয়াবাদী বাঙ্গালী।

আমি। চারুচন্দ্র মিত্র।

গদাধর। (সচকিতে) আপনি কায়স্থ?

আমি। নিশ্চয়।

গদাধর। আপনি এই মাত্র বলিলেন না যে, আপনি ব্রাহ্মণ?

আমি। নিশ্চয়। তাহা না হইলে আপনি হুঁকা দিতেন না।

গদাধর বাবু কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'হুঁকাটা মারা গেল যে। কি আপশোষের কথা!'

আমি। নিশ্চয়। তবে কি জানেন, যখন আপনার সঙ্গে তামাকই নাই, তখন হুঁকাটা মারা গিয়া কোনও বিশেষ লোকসান হইয়াছে কি? যদি ব্রাহ্মণত্বই না থাকে, তবে ব্রাহ্মণের জাতি মারা গেলে লোকসান কি? ভাবিয়া দেখুন, এটা একটা সামাজিক সমস্যা।

গদাধর বাবু। বিশেষ লোকসান হয় নাই। তবে হুঁকাটার দাম চারি পয়সা।

আমি। আমি আপনাকে চারি আনা দিতেছি। অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

ইহা বলিয়া আমি একটা সিকি বাহির করিয়া গদাধর বাবুর হস্তে দিলাম। গদাধর বাবু ইতস্ততঃ চাহিয়া বলিলেন, 'এটা লওয়া কি ভাল দেখায়?'

আমি। নিশ্চয়। এটা পূর্ব্বাপর প্রথা। ব্রাহ্মণের হুঁকা মারিয়া দিলে, ব্রহ্মহত্যা না হউক, অন্ততঃ নারীহত্যা, কিংবা ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু-ভক্ষণের মত পাপ হয়। তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত—অর্থদণ্ড। আমার নিকট বেশী কিছু নাই, এই সিকিটি লউন।

গদাধর বাবু উদার-হস্তে তাহা লইয়া পকেটে ফেলিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গে আমার খুব সদ্ভাব জন্মিয়া গেল। আমি বলিলাম, 'প্রেমের বিকাশের জন্যই মানুষের জন্ম। কোনও একটা বিশেষ 'ঘটনা' না হইলে প্রেম জন্মে না।'

গদাধর বাবু চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, 'আপনি খুব বিজ্ঞ পুরুষ দেখিতেছি। কত দূর যাইবেন?'

আমি। মধুপুরে।

গদাধর বাবু আরও চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, 'আমিও সেখানে হাওয়া বদলাইতে যাইতেছি। এক মাসের ছুটী লইয়াছি। সেখানে বাসা ভাড়া হইয়া গিয়াছে। আমার পরিবারও বিম্বাধরপুর হইতে আসিতেছেন। তিনি মেয়েদের গাড়ীতে আছেন।'

আমি। তবে ত আপনার বিলক্ষণ সুসময় দেখিতেছি! আপনি বোধ হয় একটু গায়িতে জানেন?

গদাধর বাবু। কি করিয়া জানিলেন?

আমি ঈষৎ কটাক্ষপাত করিয়া বলিলাম, 'প্রথমতঃ, আপনার চেহারা খুব সুন্দর। দ্বিতীয়তঃ, গলার আওয়াজ অতিশয় মিষ্ট। তৃতীয়তঃ, আপনার অঙ্গ-ভঙ্গী ও কপালের রেখা সুগায়কের ন্যায়।'

গদাধর বাবু। আপনি জ্যোতিষ শাস্ত্র জানেন বোধ হয়।

আমি নিশ্চয়। আমি রেখা দেখিয়া নাড়ী নক্ষত্র বলিয়া দিতে পারি। তবে, সাধারণতঃ জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যগ্রহণ না করিয়াও, অনেক সময় যৎসামান্য চিহ্নাদি দ্বারাই অনেক কথা বলা যায়।

গদাধর বাবু। বলুন ত আমার কয়টি পুত্রসন্তান?

আমি (হাসিয়া)। আপনার পুত্রসন্তান নাই। একটিমাত্র কন্যা। সেও আপনার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত। তিনি মারা গিয়াছেন। আপনার এখনকার স্ত্রী দ্বিতীয় পক্ষের।

গদাধর বাবু অবাক হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার নিবাস?'

আমি। চারু মল্লিকের গলিতে। কলিকাতায়। আমি জ্যোতিষের ব্যবসা করি না, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী করি। তবে সখ করিয়া জ্যোতিষ অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। এখন আপনি একটা গান গায়িয়া ফেলুন।

২

গদাধর বাবু প্রথমে একটু সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হইয়া বলিলেন, 'আমার গলা আজ পরিষ্কার নাই, এবং ট্রেণের ঘর্ঘর শব্দে গানের সূক্ষ্ম সুরগুলি শ্রবণগোচর হইবে না।'

আমি। তাহাতে কিছু আসে যায় না। যদি গলা কর্কশ থাকে, তবে ট্রেণের শব্দে সেটা বুঝা যায় না। অনেকটা 'মোলায়েম' হইয়া যায়।

এই প্রকার আশ্বাসিত হইয়া গদাধর বাবু প্রথমে একটা 'আঁ'—শব্দ-সংযোগে সুরের ওজনটা ঠিক করিয়া লইলেন, এবং বলিলেন, 'দেখুন, ইহা অপেক্ষা চড়া সুর ধরিব কি?' আমি বলিলাম, 'নিশ্চয়, নচেৎ শুনা যাইবে না।'

গদাধর বাবু অগত্যা তাহার 'আঁ—'টা খুব চড়াইয়া দিলেন। আমি সেই অবসরে রুমালখানি লইয়া একবার মুখমণ্ডল পরিষ্কার করিলাম, এবং তাহারই আবরণে হাসির বেগটুকু সংবরণ করিলাম।

গদাধর বাবু বলিলেন, 'আমার হিন্দুস্থানী গান গাওয়া অভ্যাস। কি রাগিণী আরম্ভ করা যায়?'

আমি। এখন বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। মূলতানী রাগিণী ছাড়ুন।

গদাধর বাবু। কি বিষয় গাওয়া যায়?

আমি। তৃতীয় প্রহরে 'যমুনার কূলে কালা' এই সব গানই প্রশস্ত। এই সময়ে গোপিনীবৃন্দ জল আনিতে যমুনায় যাইতেন, এবং কালা বংশী বাজাইতেন।

গদাধর বাবু। ঠিক। আপনার অনেক গান জানা আছে, বোধ হয়। এক জন সমজদার।

আমি। নিশ্চয়। আমাদের পাড়ায় এক জন ওস্তাদ এই সময় প্রত্যহ মূলতানী ধরিয়া থাকেন, এবং আমি দোতালার জানালা ঠুকিয়া তাল দিয়া থাকি।

গদাধর বাবু। তবে আপনি এক জন 'তবলচী'।

আমি। ঠিক 'তবলচী' না হইতে পারি, কিন্তু 'লয়দোরস্ত'। এমন কি, বড় বড় সভাতে বক্তৃতার সময় অনেকবার বেঞ্চ ও চেয়ার ঠুকিয়া তাল দিয়াছি, এবং তাহাতে বক্তার ঘোর উৎসাহ হইয়াছে।

গদাধর। তবে একটা কোনও জিনিস ঠুকিতে থাকুন। তাল কাওয়ালী।

আমি সম্মুখে একটা বোতল দেখিয়া তাহাই ঠুকিতে আরম্ভ করিলাম। গদাধর বাবু ত্রস্ত হইয়া বলিলেন. 'বেশী ঠুকিবেন না, ইহার মধ্যে 'চ্যবনপ্রাশ' আছে।'

আমি। 'চ্যবনপ্রাশ' খুব ঘন পদার্থ, যেমন শাস্ত্র। নষ্ট হইবার ভয় নাই। চলুক।

তখন গদাধর বাবু একটা মুলতানী গায়িতে আরম্ভ করিলেন। আমি 'চ্যবনপ্রাশে'র বোতল ঠুকিয়া কাওয়ালীর 'বোল্' আরম্ভ করিলাম। ট্রেণ তখন জামালপুরে উপস্থিত। গান খুব জমিয়াছিল, এবং অনেক লোক আমাদের কামরার পার্শ্বে প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া গানের রস ও সুর এবং তালের 'বোল্' প্রাণপণে গ্রহণ করিতেছিল। গদাধর বাবু তাহা দেখিয়া অতিশয় উৎসাহিত হইলেন, এবং তারার পঞ্চম পর্য্যন্ত তান তুলিতে লাগিলেন।

এমন সময় স্ত্রীলোকের গাড়ী হইতে এক জন হিন্দুস্থানী চাকরাণী আসিয়া বলিল, 'মাইজী একবার ডাকিতেছেন।'

তাহাতে গদাধর বাবু অত্যন্ত চটিয়া উঠিলেন। 'এমন সময় কি দরকার?'

দাসী। দুই পয়সার ঘুঘ্নিদানা কিনিয়াছেন, পয়সা চাহি।

গদাধর বাবু আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'দেখিলেন মহাশয়, এই কি ঘুঘ্নিদানা খাইবার সময়?'

আমি। নিশ্চয়।

আমি তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে দুইটি পয়সা বাম হস্তে বাহির করিয়া দাসীর হস্তে দিলাম। সে চলিয়া গেল।

ট্রেণ তখন ছাড়িতেছিল। গদাধর বাবুর মুলতানী চলিতেছিল। 'আস্থায়ী' শেষ হইয়া 'অন্তরা' আরম্ভ হইয়াছিল। প্লাটফর্ম্মের লোক বিমুগ্ধ, পুলকিতচিত! এমন সময় এক জন কৃষ্ণবর্ণ ফিরিঙ্গী একটি গৌরবর্ণা তন্বঙ্গী যুবতীকে লইয়া সেই কামরায় উঠিয়া পড়িল।

আমরা 'ইউরোপীয়ন কম্পার্টমেণ্টে' 'দেড়া মাশুলে'র গাড়ীতে বসিয়াছিলাম। ভয় হইল, এবার বুঝি বহিষ্কৃত হইতে হয়। কিন্তু সঙ্গীতের কি মহিমা! ফিরিঙ্গী কোনও আপত্তি না করিয়া বলিল, 'বহুৎ আচ্ছা গান, বহুৎ আচ্ছা চলুক।'

'মেমসাহেব'টি খুব হাস্যময়ী। সে চলিয়া তাহার কৃষ্ণবর্ণ সাথীর অঙ্কে বসিয়া পড়িল। ফিরিঙ্গী বলিল, 'আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমার স্ত্রীর সম্মান রক্ষা করি।'

আমি। নিশ্চয়। স্ত্রীর সম্মানরক্ষাই মানব-জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য।

ফিরিঙ্গী বলিল, 'আমার নাম 'গোমেস্'। আমি ছোটনাগপুর জেলার লোক। 'বি, এন, আর'-এর এক জন গার্ড্। 'লিলি' (যুবতীকে দেখাইয়া) আমার নববিবাহিতা স্ত্রী।' ইহা বলিয়া সে লিলির বাম কর্ণ, এবং দক্ষিণ দিকের ভ্রূ, এবং অবশেষে কেশের অগ্রভাগ ওষ্ঠ দ্বারা স্পর্শ করিল। তাহাতে লিলির মুখ রক্তবর্ণ হইল, এবং তাহা দেখিয়া গোমেস্ বলিল, 'আপনারা আমার ভালবাসার সাক্ষী। আমি প্রেমে মজিয়া গিয়াছি।'

আমি। নিশ্চয়। এবং গদাধর বাবুও সাক্ষী।

গদাধর বাবুর মুলতানী বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া সূর্য্যাস্তের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

গোমেস্। আমাদের দেখিয়া লজ্জার দরকার নাই। আমরা মধুপুরে এক মাসের জন্য 'হনিমুনে' যাইতেছি। বুঝিতে পারিয়াছেন, বোধ হয়, আমিও এককালে বাঙ্গালী ছিলাম?

আমি। নিশ্চয়।

গোমেস্। এবং আমার লিলি এক জন সুন্দরী ফিরিঙ্গী।

আমি। নিশ্চয়। আমি এমন সুন্দরী দেখি নাই। আমার বোধ হয় কোনও ইতালীয় চিত্রে এই রকম সরল এবং সুন্দর মুখের ভাব দেখিয়াছি। বোধ হয়, 'বিবিয়ান্স্ ডটার্' নামক সেই ছবিখানি।

গোমেস্ চমৎকৃত হইয়া বলিল, 'বাহবা! আপনি এক জন 'আর্টিস্ট্' দেখিতেছি।'

গদাধর বাবু। কেবল তাহাই নহে, প্রসিদ্ধ বাস্তুকর, এবং ডাক্তার, এবং জ্যোতির্ব্বেত্তা! অদ্ভুত গণনা জানেন। গোমেস্! আমাকে বোধ হয় চিনিতে পার নাই। আমি 'বি, এন, আর' লাইনে 'উরমা' ষ্টেশনে ছোট বাবু ছিলাম।

গোমেস্ লাফাইয়া উঠিল।—'গদা! মাই ডিয়ার গদা! তোমার সেই স্ত্রীলোকের ন্যায় লম্বা চুল কোথায় গেল?'

৩

গদাধর বাবু বিমর্ষভাব ধারণ করিয়া বলিলেন, 'ভায়া গোমেস্! মুড়াইয়া ফেলিয়াছি। আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী আর নাই, তাহার শ্রাদ্ধের সময় মুড়াইয়া ফেলিয়াছিলাম।'

ইহা শুনিয়া লিলি শিহরিয়া উঠিল; এবং তাহা দেখিয়া গোমেসের নয়ন বিলক্ষণ জলাকীর্ণ হইয়া পড়িল।

আমি। গতস্য শোচনা নাস্তি। এ মহীমণ্ডলে শোক পাওয়া পরম ভাগ্যের কথা। যাহারা শোক না পাইয়াছে, তাহারা পশু।

গোমেস্। নিশ্চয়। আপনি এক জন বড় ডাক্তার এবং জ্যোতিষী। আচ্ছা, বলিতে পারেন, মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রভেদ কি?

আমি। মানুষ প্রেম করিতে জানে। তাহার 'তরকিব্' অনেক প্রকার। নাচিয়া, গায়িয়া, কটাক্ষপাত করিয়া, হাসিয়া, পত্রিকা, সাহিত্য ও কাব্য লিখিয়া, অভিমান বিরহ প্রভৃতি রসের অবতারণা করিয়া, চিত্র টানিয়া, সারানিশি জাগিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, রঙ্গালয়ে অভিনয় করিয়া, বুক প্রভৃতি ঠুকিয়া, এবং অবশেষে আত্মহত্যা করিয়া, প্রেম ব্যক্ত করে।

গোমেস্। আমারও তাই বোধ হয়। লিলি! কি বল?

লিলি। পুরুষেরা অনেকটা ভান্ করে। আমরা তাই দেখিয়া হাসি ও সন্দেহ করি। আচ্ছা, আপনি ত গণিতে জানেন?

আমি। কিছু কিছু জানি।

লিলি। আপনাকে পরে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।

আমি। আমি তাহার উত্তর এখনই দিতে পারি। আপনার মনের কথার উত্তর—'বাসে'।

ইহাতে লিলির মুখ রক্তিম হইল। গোমেস্ বুঝিতে পারিয়া খুব খুসী হইল, এবং বলিল, 'লিলি! এখনও তুমি আমাকে সন্দেহ কর?'

লিলি সে কথার উত্তর না দিয়া নিজের কেশজাল বিস্তার করিয়া বলিল, 'আমার চুল ম্যালেরিয়া রোগে ছোট হইয়া গিয়াছে। ইহার কোনও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আছে?'

আমি তৎক্ষণাৎ বাক্স হইতে চারিটী 'আর্সেনিকে'র বড়ি বাহির করিয়া বলিলাম, 'প্রত্যেক সপ্তাহে রবিবারের প্রত্যূষে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া একটী বড়ি খাইবেন। এক মাসে আপনার চুলের ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিবে।—পরিবর্ত্তন।

গোমেস্ দুইটি টাকা বাহির করিয়া আমার হস্তে দিল।

আমি তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলাম, 'আমিও মধুপুরে যাইতেছি। মাসের শেষে চুল মাপিয়া পরে টাকা দিবেন। আমি ফল দর্শাইবার পূর্ব্বে 'ফি' লইতে চাহি না।'

লিলি খুব প্রীতা হইয়া বলিল, 'ইনিই আসল ডাক্তার', এবং 'টের্‌রা—টের্‌রা' শব্দ করিয়া একটা অপেরা-'টিউন্‌' ছাড়িয়া দিল। গোমেস্‌ মুগ্ধ হইয়া নয়নজলে ভাসিতেছিল, এবং আমি মধ্যে-মধ্যে মুখ ফিরাইয়া হাসিতেছিলাম।

গদাধর বাবু চক্ষুঃমুদ্রিত করিয়া নিদ্রার চেষ্টা দেখিতেছিলেন। আমি বিকট চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, 'গদাধর দাদা!'—তাহাতে গদাধর দাদার হঠাৎ চেতনা হওয়াতে জানালার পার্শ্বে তাঁহার মাথা ঠুকিয়া গেল, এবং তাহা দেখিয়া গোমেস্‌ ও লিলি হাসিতে লাগিল।

সুযোগ পাইয়া গোমেস্‌ আমার কাণে কাণে বলিল, 'গদা'র টাকা আছে। উহার বাপ প্রায় দুই তিন হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছিল। দাও অন্ততঃ দুই চারি হাজার কামাইয়াছে নিশ্চয়। চিরকালই কৃপণ।'

আমি। বলেন কি!

গোমেস্‌। সত্য ও নিশ্চিত কথা। কিছু টাকা বাহির করিতে পার, তবে তোমার বাহাদুরী। বড়দিনে একটা 'গ্রাণ্ড ফীষ্ট্‌' কিংবা 'বনভোজনে'র নিতান্ত দরকার।

এ সংবাদটা আমার নিকট নূতন বোধ হইল। আমি বলিলাম, 'আচ্ছা, দেখা যাইবে।'

কিউল্‌ ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। গোমেস্‌ লিলিকে লইয়া 'রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুমে' চলিয়া গেল। গদাধর বাবু স্ত্রীলোকের কামরার দিকে গিয়া স্ত্রী ও দাসীকে বাহির করিলেন, এবং তাহাদের দ্রব্যাদি কুলীর স্কন্ধে চাপাইয়া নিজে গহনার বাক্স হস্তে লইলেন, এবং স্ত্রীর পশ্চাতে চলিলেন। আমি সেই অবসরে গদাধর বাবুর পশ্চাতে গিয়া বলিলাম, 'গদাধর বাবু!—কি চমৎকার গলা আপনার! গার্ড সাহেবের মেম্‌ আপনার গান শুনিয়া একেবারে মোহিত হইয়া গিয়াছেন। ভয়ানক রকম মোহিত।'

এই কথা গদাধর বাবুর স্ত্রীর কর্ণে প্রবেশ করাতে তিনি অবগুণ্ঠন তুলিয়া প্রথমে আমার দিকে, এবং তৎপরে গদাধর বাবুর দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিলেন। তাহাতে গদাধর বাবুর মুখ শুষ্ক হইয়া গেল।

আমি অতিশয় লজ্জিত হইয়া দূরে সরিয়া পড়িলাম। দূর হইতেও তাঁহাদের কথোপকথন শুনা যাইতেছিল।—

স্ত্রী। উনি কে?

গদাধর বাবু। কলিকাতার এক জন ডাক্তার। খুব ভাল বাজাইতে

পারেন, তাই আমি গান ধরিয়াছিলাম। মেমসাহেবটা বাঁদরের মত শুনিতেছিল। ওরা আমাদের গান বুঝে না।

স্ত্রী। বুঝে কি না বুঝে, আমি তদন্ত করিয়া দেখিব।

গদাধর বাবু। নিশ্চয়।

গদাধর বাবু বিপৎপাতের আশঙ্কা দেখিয়া নিঃসহায় হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া আমার মনে যথাযোগ্য করুণার সঞ্চার হওয়াতে আমি দূর হইতে বলিলাম, 'আপনাদের যদি জলখাবারের দরকার থাকে, তবে লইয়া আসি।'

গদাধর বাবুর স্ত্রী মস্তকসঞ্চালন দ্বারা আমার প্রস্তাবের অনুমোদন করাতে আমি এক টাকার জলখাবার তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের নিকট লইয়া আসিলাম।

গদাধর বাবুর স্ত্রী বলিলেন, 'এত কি হবে?'

আমি বিনীতভাবে বলিলাম, 'মাঠাকরুণের ভয়ের কোনও কারণ নাই। জলখাবারগুলি সবই টাট্‌কা। যদি দরকার হয় ত এক 'ডোজ্‌' পল্‌সেটিলার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

গদাধর বাবু ইসারায় জানাইলেন, 'খুব বড় ডাক্তার।'

স্ত্রী। উনি কোথায় যাবেন?

গদাধর। মধুপুরে।

বোধ হয়, তাহা শুনিয়া 'মাঠাকরুণে'র অনেকটা সাহস হইল। তাঁহার অম্লের ব্যায়রাম ছিল।

৪

গোমেস্‌ লিলির সহিত 'রিফ্রেস্‌মেণ্ট্‌ রুম্‌' হইতে ফিরিয়া আসিলে আমরা পুনরায় 'ইউরোপীয়ন কম্‌পার্টমেণ্টে' বসিলাম; কিন্তু গদাধর বাবুকে তাঁহার স্ত্রী এবার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করাতে তাঁহারা অন্য একটী কামরায় চলিয়া গেলেন।

লিলি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে আমরা তাহা বুঝাইয়া দিলাম, এবং তাহাতে লিলি সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, 'পুরুষদিগের স্বাধীনতা বন্ধ করিয়া দেওয়াই এই যুগের সমস্যা। আমার বোধ হয়, তাহারা অনেক দিন স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছে, এখন তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করাই উচিত।'

আমি। নিশ্চয়। ইহাই আধুনিক সমাজ-সমস্যা। চতুর্দ্দিকে তাহারই যোগাড় হইতেছে।

গোমেস 'রিফ্রেস্‌মেণ্ট্‌ রুমে' অধিকপরিমাণে পানীয় গ্রহণ করাতে

একটু উদারচিত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে স্কন্ধ নাড়িয়া বলিল, 'আমার বোধ হয়, অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলে দুর্ভাবনায় মস্তকের কেশ দীর্ঘ হইয়া পড়ে।'

আমি। নিশ্চয়। পূর্ব্বকালে যোগী ঋষিগণ অবরুদ্ধ হইয়া ধ্যানমগ্ন হইলে কেশ বাড়িত। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদিগেরও অবরোধপ্রথার ফলে কেশ খুব দীর্ঘ।

লিলি। যদি চুল বাড়ে, তবে আমি পর্দ্দানশীন হইতে রাজি।

গোমেস্। আমার বোধ হয়, কেশহীনতা প্রেমবিকাশের লক্ষণ, এবং মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। এই দেখুন, বানর হইতে মনুষ্য হইলে লোমশূন্যতা ঘটে। আমার বোধ হয়, বৈষ্ণবেরা এই জন্য মস্তক মুণ্ডন করে।

লিলি। আমিও মস্তক মুণ্ডন করিব।

আমি। নিশ্চয়। যদি উভয়ে মস্তক মুণ্ডন করেন, তবে উভয়ের মধ্যে প্রণয় এত বর্দ্ধিত হইবে যে, বর্ণনাতীত। ইহাই বিশ্বে প্রেম-সংস্থাপনের এক-মাত্র উপায়।

গোমেস্। কিন্তু ভদ্রলোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে গেলে টুপি খোলা লজ্জাকর হইয়া পড়িবে।

আমি। এ সব কেবল সামাজিক সংস্কার বৈ ত নয়। টুপীর বদলে জুতা খুলিয়া রাখিলেই চলিবে। যদি কষ্ট হয়, প্রথমতঃ চটীজুতা ব্যবহার করিলেই হইবে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে এই প্রথা থাকাতে মানব খুব প্রেমিক ছিল এবং দীর্ঘজীবী হইত। পদতল বিমুক্ত না থাকিলে যত কুভাবনা মস্তকে রক্তের সঙ্গে জমিয়া থাকে, পৃথিবীতে সঞ্চালিত হয় না। চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের পদতল পশুচর্ম্মে আবৃত রাখা বিজ্ঞানসম্মত নহে।

গোমেস্। আমরা সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য এখন ঠিক বুঝি নাই। চিত্রকর ও কবিমণ্ডলী অনেকটা বুঝিয়াছেন, সেই জন্য তাঁহারা নগ্নাবস্থার পক্ষপাতী।

আমি। নিশ্চয়। তাহাই স্বাভাবিক। শাস্ত্র বলেন যে, আত্মা কোনও আবরণ চাহে না, কেবল স্বাধীনতা চাহে। শীত, গ্রীষ্ম এবং ব্যাধিসঞ্চার হইতে দেহরক্ষার জন্য আমরা অনেক আবরণ গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সভ্য জগৎ তাহা ক্রমেই পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প।

গাড়ী কিউল্ হইতে ছাড়িতেছিল, এমন সময় শশব্যস্তে এক জন যুবক আপাদমস্তক অলষ্টরে আবৃত করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল, এবং অধীরভাবে শোকের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়া রুমালে চক্ষু মুছিতে লাগিল।

গোমেস্ বাধা দিতেছিল। আমি বলিলাম, 'কাজ্ নাই, উনি প্রথমে স্থির হউন। অস্থির অবস্থায় বাধা দেওয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ।'

যুবক স্থির হইলে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। যুবক দেখিতে অতিশয় সুশ্রী। পুরুষের বেশ না থাকিলে, বালিকা বলিয়া ভ্রম হওয়া সম্ভব।

গোমেস্ করুণাপরবশ হইয়া বলিল, 'আপনার নিবাস কোথায়?'

যুবক। আপাততঃ সিংহলে। আমার পূর্ব্বনিবাস বঙ্গদেশে চট্টগ্রামে ছিল। আমার পিতা মরিশস্ দ্বীপে ইক্ষুর চাষ করিতেন। সেইখানে আমার জন্ম।

আমি। তাই আপনি দেখিতে এত সুন্দর, যেন এক গাছি ইক্ষুদণ্ডের ছবিখানির মত। (গোমেসের প্রতি) মিষ্টার গোমেস্! আপনি বোধ হয় ইতালীয় চিত্রকর টরিসেলির 'গ্রীফ্' (বিষাদ) নামক চিত্রখানি দেখিয়াছেন? আমাদের বন্ধুর মুখখানি ঠিক সেই রকম নয় কি!

লিলি। ঠিক্ সেই রকম!

গোমেস্। আশ্চর্য্য রকম ঠিক্!

আমি। (আগন্তুক যুবকের প্রতি) আপনার শোকাধিক্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? মার্জ্জনা করিবেন।

যুবক। মধ্যে মধ্যে দেশের জন্য হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। খুব গভীর শোক। বেগ ধারণ করিতে পারি না।

আমি। 'ইগ্নেশিয়া' ইহাঁর ঔষধ। আপনার নাম?

যুবক। পিতা আমাকে 'কফি' বলিয়া ডাকিতেন। আমি এমনই হতভাগ্য যে, শৈশব হইতেই মাতৃহীন। আমার নামকরণ পর্য্যন্ত হয় নাই।

লিলি। আপনি হিন্দুদিগের মধ্যে কোন্ জাতীয়?

যুবক। আমরা ব্রাহ্মণ।

লিলি। নমস্কার।

লিলির সহৃদয়তা দেখিয়া গোমেসও নমস্কার করিল।

যুবক। আপনারা কোথায় যাইবেন?

আমি। আপনি যেখানে যাইতেছেন, সেই স্থানেই, অর্থাৎ মধুপুরে।

যুবক (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) আপনি কি করিয়া জানিলেন?

লিলি। ডাক্তার বাবু এক জন জ্যোতির্ব্বেত্তা পুরুষ।

আমি। এই সামান্য বিষয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্র অনাবশ্যক। খুব লম্বা

'অলষ্টর্' যাহার, সে সচরাচর মাতুলালয়ে গিয়া থাকে। মধুপুরই মাতুলদিগের প্রধান আড্ডা, এবং যখন আপনার সঙ্গে বিছানা নাই, তখন বুঝিতে হইবে যে, আপনার গন্তব্য স্থান দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বেই কোথায়ও। মধ্যে একটি স্থান ছিল দেওঘর, কিন্তু অনেকক্ষণ পূর্ব্বে বৈদ্যনাথ জংশন্ আমরা পার হইয়া গিয়াছি,—অতএব—মধুপুরই যে আপনার গন্তব্য স্থান, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যায়।

যুবক। বাস্তবিকই মধুপুরে আমার মাতুলালয়, এবং আমার মাতুল পূর্ব্বে 'চটের' কারবার করিতেন। তিনি এক জন বিজ্ঞ লোক।

আমি। নিশ্চয়। আমাদের দেশে বিজ্ঞ পুরুষ সচরাচর 'চট্' কিংবা গনি ব্যাগের কারবার করিয়াই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। আপনার বিবাহ হয় নাই?

যুবক (সলজ্জে)। না। বিবাহ সম্বন্ধে এখনও আমার মতে স্থিরতা নাই।

গোমেস্। অসম্ভব, এ বয়সে অসম্ভব। লিলিকে দেখিবার পূর্ব্বে আমার কোনও মতের স্থিরতা ছিল না, কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতেই আমি স্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম।

আমি। নিশ্চয়। প্রথম দৃষ্টিই দৈব লক্ষণ। চক্ষু স্থির না হইলে আত্মা প্রকৃতিস্থ হয় না; যেমন 'আরসুল্লা'।

৫

আগন্তুক যুবকের মাতুলের নাম দক্ষবাবু। দক্ষবাবুর অনেকগুলি চটের গুদাম ছিল। চটের ব্যবসা উঠিয়া যাওয়াতে তিনি ভূতপূর্ব্ব 'গুদাম'গুলি ভাড়া দিতেন। ঘটনাক্রমে আমরা সকলেই সেই অপূর্ব্ব গৃহগুলি ভাড়া করিয়াছিলাম।

এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনার বিশেষ কারণ ইহাই যে, বাটীগুলির ভাড়া খুব কম। সচরাচর দশ বার টাকায় এমন সুন্দর বাটী পাওয়া যায় না। প্রত্যেক বাটীরই চারিটী কামরা। তন্মধ্যে কেবল একটির দ্বার ছিল। বাকীগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইলে বাটীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণমাত্র সে সন্দেহ দূর হইত। কারণ, তাহাদিগের ক্ষুদ্র বাতায়ন ছাড়া কিছুই ছিল না।

আমাদিগের পরস্পরের সহিত একটা বিচ্ছেদের যাহা কিছু আশঙ্কা ছিল, তাহা বাসায় উপস্থিত হইয়া বিদূরিত হইল। সকলেরই বাসা একত্র, সন্নিকটে,

সারি গাঁথিয়া অবস্থিত। সকলেরই মাথায় রাণীগঞ্জের 'টাইল'। সকলেরই সম্মুখে দুই চারিটি ফুলের গাছ।

গোমেস্ সপরিবারে 'হনি-মুনে'র উপযোগী শেষের গৃহগুলি দখল করিয়া বসিল। গদাধর বাবু সপরিবারে উত্তর ভাগ অধিকার করিলেন। আমি উভয় বন্ধুর অনুরোধে মধ্যভাগে রহিয়া গেলাম। আগন্তুক দেশহিতৈষী বিষণ্ণ যুবক আমারই সঙ্গে থাকিল। কারণ, তাহার মাতুল দক্ষবাবু বলিলেন, 'এখানে সি. আই. ডি.র বড় প্রাদুর্ভাব, এবং ছেলেটী কিছু মাথাপাগ্‌লা। ইহাকে লইয়া বিপদে পড়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে।'

আমার এক জন সঙ্গীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল, সুতরাং আমি খুসী হইয়া বলিলাম, 'নিশ্চয়।'

গোমেস্ তাহার নূতন বাসায় হনিমুনের সরঞ্জামগুলি বিস্তার করিতে আরম্ভ [করি]ল। ভাল ভাল ছবি, লেসের পর্দ্দা, পুষ্পচিত্রিত রেশমের বালিশ, সুন্দর [চা]'র পেয়ালা, মনোহর ফুলদানী, এবং 'কুশন' চেয়ার প্রভৃতি নানাবিধ পদার্থের [স]াহায্যে বাহিরের গৃহটী সাজাইয়া ফেলিল। লিলি রন্ধনশালায় ব্যস্ত! [প্লে]টের 'ঠুক্‌ঠাক,' কাঁটা চামচের সুমধুর নিক্কণ, মধ্যে মধ্যে 'অপেরাটিউনে'র গুঞ্জন, এবং বায়ুসঞ্চালিত 'ষ্টু' ও 'কট্‌লেটে'র সুগন্ধি বিকীর্ণ হইয়া আমাদিগের নাসিকার ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া রসনা উত্তেজিত করিতেছিল। এমন সময় গদাধর দাদা আসিয়া উপস্থিত।

গদাধর। ডাক্তার বাবু! গোমেস্ বাসাটা খুব 'খোশছুমা' (সুদৃশ্য) করিয়াছে।

আমি। নিশ্চয়। কাণ্ডটা তুমুল—'হনি-মুন'—।

গদাধর। 'হনি-মুন'টার কৈফিয়ৎ কি?

আমি। সঙ্গীন ব্যাপার একটা। বাঙ্গালায় 'চন্দ্রমাশালিনী বা মধুযামিনী' বলিয়া একটা গান আছে, তাহা হইতে বুঝা যায়। ভূতলে স্বর্গের মত একটা দৃশ্য খাড়া করিয়া, তাহার মধ্যে প্রণয়িনী স্ত্রী সহিত প্রথম বাসর-বাস। জীবন-সমস্যা!

গদাধর। (দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত)। ইহাতে কত খরচ লাগে?

এমন সময় বিষণ্ণ যুবকটি পার্শ্বের গৃহ হইতে করুণস্বরে হাহুতাশ ধ্বনি করিতে লাগিল। গদাধর বাবুর ত্রস্তভাব দেখিয়া আমি বুঝাইয়া দিলাম, সেই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি দেশহিতৈষিতার আবেগে আমার এক জন 'পেশেণ্টে'র কণ্ঠ হইতে বাহির হইতেছিল।

গদাধর বাবু আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় বলিলেন, 'আমাদের ঘরে 'হনি-মুন' হয় না ?'

আমি। নিশ্চয়। প্রথম পক্ষেই যখন এত উৎসাহ, তখন দ্বিতীয় পক্ষে সমধিক ভাবে হইবার কথা।

গদাধর বাবু। তবে আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহার একটা 'তরকিব' বাহির করেন, তবে চিরকাল আপনার 'তারিফ' করিব। যত টাকা দরকার আমাকে বলুন।

আমি বলিলাম, 'ছয় শত টাকাতে মোটামুটি একটা 'হনি-মুন' হইয়া থাকে। চলুন, প্রথমতঃ আপনার গৃহ পরিদর্শন করিয়া আসি।'

গদাধর বাবুর গৃহের অবস্থার তখনও 'সাফাই' হয় নাই। 'মা-ঠাকরুণ' একটা ছেঁড়া 'মাদুরে'র উপর সটান্ শয়ন করিয়া মানব-জীবনের অসারতা প্রতিপন্ন করিতেছিলেন। দাসী পার্শ্বে বসিয়া নির্ব্বিঘ্নে গত নিশার 'বাসি' জলখাবারগুলি গলাধঃকরণ করিতেছিল। গৃহে জল নাই। পোর্টমান্টো ও বিছানাগুলি তখনও দড়ি বাঁধা। গদাধর বাবু একটা নূতন হুঁকা খরিদ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা জলাভাবে গৃহের এক কোণে চিৎপাত হইয়া পড়িয়াছিল।

গদাধর বাবু গৃহিণীর অবস্থা অপেক্ষা হুঁকার অবস্থা সমধিকভাবে শোচনীয় মনে করিয়া সযত্নে সেটাকে তুলিয়া লইলেন, এবং বাহিরে গিয়া তাহার রন্ধ্রে ফূৎকার দিতে আরম্ভ করিলেন।

গৃহিণী তাহা দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, এবং বলিলেন, 'দেখ্‌ছেন ত ডাক্তার বাবু, হুঁকার আদর বেশী।'

আমি। মা, তাহার জন্য শোকের প্রয়োজন নাই, এটা একটা সামাজিক সমস্যা। আপনি উঠিয়া রন্ধনের যোগাড় করিয়া ফেলুন, আমরা অন্য বিষয়ের 'তদ্‌বির' করিয়া দিতেছি।

সহৃদয়তা ব্যক্ত করিলে কাহার মনে আনন্দসঞ্চার না হয় ?

'কফি' নির্জ্জন গৃহে বসিয়া চিন্তা করিতেছিল। আমি তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিলাম। আমি বলিলাম, 'দেখ! দেশহিতৈষিতার ক্ষেত্র পদে পদে। গদাধর বাবুর গৃহে আনন্দ ও প্রীতি ও শান্তির সঞ্চার করা আজ আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।'

বিষণ্ণ যুবকটির মুখ তাহাতে প্রসন্ন হইয়া পড়িল।

গদাধর বাবুও আমাদের উৎসাহ দেখিয়া আশান্বিত হইয়া পড়িলেন, এবং মুক্তহস্তে ছয় শত টাকার নোট গণিয়া দিলেন।

দুই তিন দিনের মধ্যেই গদাধর বাবুর গৃহ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। গোমেসের গৃহ তাহার তুলনায় কোথায় লাগে? শ্রীরাধিকার মানভঞ্জন, নলদময়ন্তীর বিরহ, যশোদার দুগ্ধদোহন, বিশ্বামিত্রের শকুন্তলার প্রতি অভিশাপ, কালীয়দমন প্রভৃতি উচ্চ দরের পটে গৃহ মণ্ডিত হইয়া গেল। গদাধর বাবু পণ্ডিতের ন্যায় মনের সুখে গয়ার তামাকু বহু বার সাজিয়া মধ্যে মধ্যে টানিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে 'ইজি' চেয়ারখানি বাহিরে লইয়া একবার আকাশ, একবার দূরস্থিত গিরিশ্রেণীর শোভা নিরীক্ষণ করিয়া বিলক্ষণ আনন্দিত হইতে লাগিলেন।

রন্ধনশালায় মাঠাকুরুণ নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য, উপাদেয় সন্দেশ ও ছানার মুড়কী প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া রেকাবী সাজাইতে আরম্ভ করিলেন।

৬

অদ্য গোমেসের 'হনি-মুন'। গোমেস্ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যার সমাগম প্রতীক্ষা করিতেছিল।

বলা বাহুল্য যে, সমধিকভাবে প্রেমবিকাশের জন্য লিলি তাহার কেশ কর্ত্তন করিয়া যত দূর সম্ভব ক্ষুদ্রাকারে পরিণত করিয়াছে। গোমেস্ নিজে কাঁচি দিয়া তাহা কাটিয়া দিয়াছে, এবং কেশগুলি একটা রেশমের রুমালে বাঁধিয়া বালিসের নীচে লুকাইয়া রাখিয়াছে।

লিলি গোমেস্কে মস্তকমুণ্ডন করিতে বারণ করিয়াছিল। কারণ, দেশে নানাপ্রকার 'এজিটেশন্' হইতেছিল, এহেন সময় একেবারে মাথা মুড়াইয়া ফেলা যুক্তিসিদ্ধ নহে। গোমেস্ তাহাতে বাধা না দিয়া লিলির মুখকমল মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল।

গোমেস্ যদিও 'মেটিরিয়ালিস্ট্', তবুও মোটের মাথায় এক জন কাব্যভক্ত লোক। সে স্বভাবের শোভা গ্রহণ করিবার জন্য একবার মাঠে দৌড়িয়া আসিল, এবং ফিরিয়া আসিয়া বিষণ্ণ যুবকের কামরায় প্রবেশ করিল।

গোমেস্। মিষ্টার 'কফি' কোথায়?

কফি। (দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) এই যে এখানে।

গোমেস্। আজ আমাদের আনন্দের দিন, এমন সময় আপনার বিষণ্ণ ভাবে আমার ঘোর আপত্তি আছে।

'কফি' গোমেসের উৎসাহ দেখিয়া উঠিয়া পড়িল। গোমেস্ তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'ভাই, দেশ একটা স্নেহের জিনিস নিশ্চয়, তবে

প্রিয়তমার নিকট কিছুই নয়। (আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) আপনি কি বলেন?'

আমি। নিশ্চয়। স্ত্রী হইতেই বংশবৃদ্ধি। বংশধর না থাকিলে দেশ জুড়িয়া বসিবে কে?

কফি। আমার বোধ হয় দেশহিতৈষিগণের বিবাহ করা উচিত নয়।

গোমেস্। এ বিষয়ে আমার মত সম্পূর্ণ বিপরীত। স্ত্রী পুত্র থাকে বলিয়া, এবং তাহাদের আত্মীয় স্বজন থাকে বলিয়া দেশের প্রতি আমাদের মায়া জন্মে। ভাই, তোমার সর্ব্বপ্রথমে একটী মনোমত প্রণয়িনীর অন্বেষণ করা উচিত।

এমন সময় লিলি 'টেরা' 'টেরা' শব্দ করিতে করিতে সেথানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং 'কফির' হাত ধরিয়া থরগোসের মত লাফাইতে আরম্ভ করিল।

লিলি। আমার একটী ভগ্নী আছে, সে আমা অপেক্ষাও সুন্দরী। তুমি তাহার সহিত 'কোর্ট্‌সিপ্' কর। সে বাঙ্গালী বিবাহ করিতে চায়। তোমাকে দেখিলেই পছন্দ করিবে।

কফি সলজ্জে বলিল, 'আমি যে ব্রাহ্মণ।'

লিলি। তুমি ত মরিশুস্ দ্বীপে ছিলে। সেইখানেই ত জাতি গিয়াছে। প্রেমের নিকট কি জাতিবিচার থাকে? এইবারকার 'পলিটিকল্' আন্দোলনে জাতি উঠিয়া যাইবে। আমাদের ঈশ্বর কোন্ জাতি? তুমি দেশের জন্য কাঁদ, না জাতির জন্য কাঁদ? আমরা যখন দেশের জন্য কাঁদি, তখন প্রেমের অভাবে কাঁদি। দাঁড়াও, আমি চা তৈয়ারী করিয়া আনি।

লিলি দৌড়াইয়া গৃহে গেল, এবং তিন পেয়ালা চা তৈয়ারী করিয়া লইয়া আসিল। আমি ও গোমেস্ দুই কপ্ লইয়া বসিয়া গেলাম। লিলি একটা কপ্ লইয়া কফির নিকটে গেল।

কফি। আপনি রাখিয়া দিন। আমি শীতল হইলে খাইব।

লিলি। প্রেমের উপহার গরম গরমই ভাল। ইহা বলিয়া লিলি তাহার বাম বাহু কফির স্কন্ধে স্থাপন করিল, এবং দক্ষিণ হস্তে চামচে চা লইয়া কফির ওষ্ঠ স্পর্শ করিল।

কফি। আচ্ছা, আপনি খাওয়াইয়া দিন, কিন্তু দক্ষ মামা যেন না শুনিতে পান।

আমি। তোমার দক্ষ মামা একটা প্রকাণ্ড যক্ষ। তোমাকে সাহস করিয়া

ঘরে স্থান দিতে কুণ্ঠিত, চারিটি অন্নের কথা দূরে থাক্। এই সব লোক দেশের মুখে কালি দিতেছে।

কফির চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল, এবং সেই অবসরে লিলি তাহাকে আরও দুই চামচ চা পান করাইয়া দিল। কফি নিরুপায় হইয়া বলিল, 'আমি এখন সম্পূর্ণ কনভার্ট্।'

লিলি হাসিতে মুখ পরিপূর্ণ করিয়া ও তাহার রেশমের রুমালখানি অবগুণ্ঠন-স্বরূপ মাথায় দিয়া বলিল, 'নমস্কার। আজ হইতে তুমি আমার ভগিনীপতি। আমার ভগিনী আজ হইতে ব্রাহ্মণী।'

কফি। আপনার ভগিনীর নাম কি?

লিলি খুব হাসিল, এবং বলিল, 'হে প্রিয়! যখন ভালবাসিয়াছ, তখন মিথ্যা কথা বলিব না। আমার ভগিনী নাই। থাকিলে চরণতলে আনিয়া দিতাম। তবে ভগিনী না থাকিলে কি ভগিনীপতি হইতে নাই? অনেকের ভগিনী নাই, তবু তোমরা তাহাদের 'শালা' বলিয়া গালি দাও কেন? গালির বেলায় যদি ভগিনী থাকে, তবে প্রেমের বেলায় কল্পনা করিয়া কি ভগিনীর অবতারণা করা যায় না? তোমাকে যদি 'ভাই' বলি, তবে গোমেস্ তোমাকে 'শালা' বলিতে পারে। তাহা হইলে তোমার জাতি যাইবে। সেই ভয়ে তোমার সঙ্গে ভগিনীপতির সম্বন্ধ পাতাইলাম। ভাই, তুমি তোমারই জাতির মধ্যে মনোমত স্ত্রী বাছিয়া লইও, আমি তাহাকে 'ভগিনী' বলিব, পূজা করিব। তাহাকে বলিও যে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের যুগসন্ধির সময় একটী দরিদ্র গার্ডের স্ত্রী তোমাদের যুক্ত-হৃদয়ের অটুট প্রেমের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল।

ইহা বলিয়া লিলি চার পেয়ালা লইয়া চলিয়া গেল। আমার বোধ হইল, কফির চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতেছিল। গোমেস্ বলিল, 'লিলি বক্তৃতা করে ভাল। সে যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকেই মাতাইয়া দেয়।'

আমি। নিশ্চয়। ভবিষ্যৎ যুগে স্ত্রীলোকের ব্রত তাহাই হইবে। মানবের ধর্ম্ম কি আকার গ্রহণ করিয়াছে, তাহা আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই।

গোমেস্। আমারও তাহাই মত। এই আমি এখানে বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, তোমরা আমার ভাই। বিপদে আপদে তোমাদের জন্য আমার প্রাণ বাঁধা থাকিল।

কফি উৎসাহিত হইয়া গোমেসকে আলিঙ্গন করিল। আমি উভয়কে বলিলাম, 'তোমরা একবার হরিনাম কর।'

তখন গোমেস বলিল 'হরি', এবং কফিও বলিল 'হরি', এবং উভয়ে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। আমি নোটবহিতে তাহা টুকিতে লাগিলাম। মানবের আবর্ত্তন এই প্রকারেই হইয়া থাকে!

৭

সে রাত্রি বাস্তবিকই হনি-মুনের উপযোগী।

আকাশে পূর্ণচন্দ্র। বিস্তৃত পার্ব্বতীয় দেশ জুড়িয়া ডিসেম্বর মাসের দারুণ শীত। বিমল চন্দ্রের কিরণ ও নবদম্পতীর উৎসাহ, উভয়ে মিশিয়া যাওয়াতে শীতের ভাব 'মিঠা' হইয়া পড়িল।

আমাদের গদাধর দাদা বালাপোষ মুড়ি দিয়া গয়ার তামাকু সেবন করিতেছিলেন, এবং জন্মেজয় সরকারের গীতার 'টীকা'র কথা ভাবিতেছিলেন।

পার্শ্বের গৃহের কপাটের আড়াল হইতে গলদেশ ঈষৎ বাহির করিয়া মাঠাকরুণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ বেলা কি রান্না হবে?'

আমি। নিশ্চয়। খাঁড়ি-মশুর দাইলের খিচুড়ী। তাহার মধ্যে কিছু পেঁয়াজের কুচি ভাজিয়া ফেলিয়া দিবেন। কি বল দাদা?

গদাধর। আমি পেঁয়াজ পছন্দ করি না, তবে শীতের সময় মন্দ নয়। চক্ষে একটু 'রৌশন্' হয়। আমার বোধ হয় চশমা লইবার সময় হইয়াছে।

আমি। নিশ্চয়। তবে একটা কথা মনে রাখা উচিত, বয়স বার্দ্ধক্যের দিকে পঁহুছিলে একটু দূরদৃষ্টি স্বভাবতঃই হইয়া পড়ে। এই জন্য বিজ্ঞ সাহিত্যিক এবং 'পোলিটিক্যাল' পুরুষেরা সকলকে এবং সকল বিষয়কে দূরে দাঁড় করাইয়া দেখেন।

গদাধর। স্ত্রীকে দূরে দাঁড় করাইলে কি হয়?

আমি। ভাবটা খুব সরস হয়—সন্দেহ নাই।

গদাধর দাদা বোধ হয় হনি-মুনের কথা ভাবিতেছিলেন। এমন সময় অদূরে চন্দ্রালোকে মাঠের মধ্যে একটা কলরব শ্রুত হইল।

গোমেস লিলিকে স্কন্ধে করিয়া সারা মাঠ দৌড়িতেছিল। লিলি দুই হাত তুলিয়া গায়িতেছিল। গোমেস নাচিয়া নাচিয়া তাল দিতেছিল। কখন কখনও লিলি স্কন্ধ হইতে অবরোহণ করিয়া দৌড়িতেছিল, এবং গোমেস তাহাকে ধরিতেছিল। লিলির যৌবনস্বভাবসুলভ কণ্ঠস্বর সমগ্র প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল। একটা অপূর্ব্ব দৃশ্য!

ব্যাপার দেখিয়া বোধ হয় গদাধর দাদার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

গদাধর। ইহারা বনের 'জানোয়ার' কিংবা 'চিড়িয়া' বলিয়া বোধ হয়।

আমি। নিশ্চয়। তবে চিড়িয়া কিংবা জানোয়ারের মত স্ফূর্ত্তি না হইলে 'হনি-মুন' হয় না। ভাবিয়া দেখ গদাধর দাদা, আমাদের কি মনুষ্যত্ব আছে? আমরা কি ঐ রকম মুক্তহৃদয়ে নাচিতে, গায়িতে, দৌড়াদৌড়ি করিতে পারি?

বোধ হয় দেখিয়া শুনিয়া গদাধর দাদার নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মিয়া গেল।

গদাধর। আমার বোধ হয় অন্ততঃ একটু দৌড়িয়া বেড়ান উচিত।

আমি। নিশ্চয়, নচেৎ শীঘ্রই জরা আসিয়া অধিকার করিবে।

গদাধর দাদা 'আলবৎ'—ইহাতে কোনও 'শুভা' নাই' বলিয়াই চটীজুতা পরিধান করিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল।

আমি দূর হইতে দেখিতে লাগিলাম ও বলিলাম, 'বল হরি!'

হঠাৎ অন্য একটী জীবের ছুটাছুটি দেখিয়া গোমেস্ চন্দ্রালোকে মনে করিয়াছিল যে, বোধ হয় একটা গাভী। ক্রমে চালচলন দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে, মানুষের মত। গোমেস্ চীৎকার করিয়া ডাকিল, 'কে ও?'

গদাধর সেই অবসরে চালাকী করিয়া গোমেসের ঘরে প্রবেশ করিল; গোমেসের কট্‌লেট পরিপূর্ণ ডিস্‌খানি অবলীলাক্রমে দুই হস্তে লইয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল, এবং খানকতক কট্‌লেট গলাধঃকরণ করিয়া বলিল, 'আমার খুব 'তাকৎ' বোধ হচ্ছে' এবং তাহার মনে হইল যে, ইহারই জোরে গোমেস্ অত দৌড়িয়া বেড়ায়। আমি বলিলাম, 'খুব নিশ্চয়।'

এই কথা মনে হওয়াতে গদাধর দাদার স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। গদাধর দাদার স্ত্রীর নাম বিমলা। কিন্তু গদাধর দাদার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিতেছিল। গদাধর দাদা খুব সজোরে ডাকিলেন, 'নসি'—

নসি গদাধর দাদার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ডাক্‌নাম। গদাধর দাদা সাধ করিয়া তাহার নাম নস্যময়ী রাখিয়াছিলেন। কারণ, তিনি সেকালে শাস্ত্রপাঠ করিতেন, এবং নস্য লইতেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে বিমলা এ খবর জানিত না। তাই রন্ধনশালা হইতে বলিল, 'কে?'

গদাধর বাক্যব্যয় না করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল, এবং বিমলাকে স্কন্ধে উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু অক্ষম হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া খেদপূর্ণ ভাষায় বলিল;—'নসি! তুমি পর্দ্দানসীন থাকার দরুণ ভারী হইয়া পড়িয়াছ।'

বিমলা। আর তোমার 'সীন্' ত বড় কম নয়। আজ এ ভঙ্গী কেন?

গদাধর। কুছ্ পরওয়া নাহি। আমি পৃষ্ঠে লইব।

বিমলা গদাধরকে নিরস্ত করিবার জন্য ধৈবত কোমলের মত মিড় গদাধরের কর্ণে মধ্যে মধ্যে দিতেছিল, কিন্তু তাহাতে গদাধরের উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল, এবং সে রীতিমত দৌড়িতে লাগিল।

চন্দ্রকিরণে গদাধর দাদা নাচিতেছিল, এবং বিমলা হাসিতেছিল। অসংখ্য তারকা আকাশে সাক্ষিস্বরূপ সেই আনন্দময় দৃশ্য দেখিয়া বোধ হয় ধন্যবাদ দিতেছিল।

গদাধর বাবু পরিশ্রান্ত হওয়াতে বিমলা বলিল, 'আর বাঁদরামী করিও না, বরঞ্চ ঘরে গিয়া খাইবার যোগাড় কর। খিচুড়ী ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।' এমন সময় প্রান্তর হইতে গোমেস্ ডাকিল, 'গদা তুমি কোথায়?' গদাধর দাদা বলিল, 'হনি-মুন কচ্ছি'। তখন আমার তন্দ্রা আসিতেছিল। বিষণ্ণ যুবক দেশের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

৮

রাত্রিকালে আমরা সকলে একত্র বসিয়া চর্ব্য ও পানীয়ের শ্রাদ্ধ করিতে ত্রুটী করি নাই। গোমেসের গৃহে এক থাল খিচুড়ী ও ভাজা মৎস্য প্রেরিত হইয়াছিল, এবং তাহার সঙ্গে টাট্‌কা সন্দেশ। স্বামী স্ত্রী তাহা আহার করিয়া গভীর নিদ্রাভিভূত হইয়াছিল নিশ্চয়। গদাধর দাদার গৃহে, মাঝে মাঝে 'ছি! জাতি গিয়াছে, জাতি গিয়াছে' এই রকম স্ত্রীকণ্ঠনিঃসৃত শব্দ আমরা শুনিতে পাইয়াছিলাম, কিন্তু পরেই শুনিলাম, 'ব্রাহ্মণত্ব রাখা দুষ্কর হইয়াছে, দেশের যে রকম অবস্থা তাহাতে প্রথমতঃ জাতি মারিয়া দেওয়াই সকলের কর্ত্তব্য'। এই রকম কথা শুনিতে শুনিতে আমি লেপ মুড়ি দিয়াছিলাম। মধ্যে বিষণ্ণ যুবক (কফি) এক বার স্বপ্নে হাসিয়া উঠিয়াছিল। বোধ হয় লিলির সেই কাল্পনিক ভঙ্গী তাহার মানসপটে বিচরণ করিতেছিল।

প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি, বেলা প্রায় আট্‌টা। গদাধর দাদার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। তিনি হ্যাট, কোট, নেকটাই আঁটিয়া ও অঙ্গুলীর মধ্যে সিগারেট লইয়া বাহিরে পাইচারী করিতেছিলেন। আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি দেখিয়া গদাধর দাদা বলিলেন, 'টিকিটা কাটি নাই, কারণ রাখিলে 'খোস্‌নুমা' দেখায়।'

আমি। নিশ্চয়।

ইতিমধ্যে গোমেস্ বাঙ্গালীর ন্যায় ধুতি চাদর পরিধান করিয়া আসিতেছিল,

এম্. এ., অথচ দ্বিজেন্দ্রলালকে ভ্যাংচাইবার লোভ সংবরণ
? যথেষ্ট হইয়াছে। চণ্ডীদাসই যে কেন কবরী বাঁধিলেন,
নবস্বর্ণমেখলা করিল দান', তাহার ত কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া
না! 'তুষার-গঞ্জিনী' ও 'মানস-রঞ্জিনী' কবির খুব ভাল লাগিয়াছে, উহাই এই কবিতার
য়া! কিন্তু এ কালে অচল। তার পর সর্ব্বশেষে climax—'এস মা আমার, বস আমার!'
কল্পনা একবারে ডানা-কাটা পরীর মত—উড়িতে অক্ষম। এ কষ্টকল্পনার লতা কি 'মালঞ্চে'র
ত্রসীমায় রোপণ করিতে আছে? শ্রীবৈদ্যনাথ ভারতী কাব্যপুরাণতীর্থের 'প্রতিশোধে'
অত্যন্ত অল্প, এবং তাহাই ইহার একমাত্র গুণ। শ্রীবিভাবতী মিত্রের 'কাঁঠাল চুরী'
নয় একটি গল্প। চলনসই উপাখ্যান। শ্রীনলিনীকুমার চক্রবর্ত্তীর 'জাপানী মোহ' পড়িয়া
ন হইল, মুগ্ধ হইবার শক্তিও আমাদের আছে কি?—বিশ্ব জুড়িয়া রুদ্রের যে তাণ্ডব
তেছে, তাহার মোহ ত আমাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারিল না। লেখক বলেন,—
াপানীরা আমাদিগকে শ্রদ্ধা করে না। ইহা নূতন কথা নয়। বিশারদ তাহা জাপান হইতে
লীকে জানাইয়া দিয়াছিলেন। কেন শ্রদ্ধা করিবে? বাঙ্গালী কোন্ অধিকারে বিশ্বের
বারে শ্রদ্ধার দাবী করে? শ্রদ্ধা নামক বস্তুটিই ভিক্ষা করিয়া পাওয়া যায় না, অর্জ্জন করিতে
। তুমি আমি আপনার জাতিকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারি না; তাহাই আমাদের ধর্ম্ম।
অপরের সে আকর্ষণ নাই। একটি রবীন্দ্রনাথ, একটি প্রফুল্লচন্দ্র, একটি জগদীশচন্দ্রের
ক্রমে তুমি বিশ্ববাসীর, জাপানবাসীর, তথা আলাস্কাবাসীর শ্রদ্ধা উপার্জ্জন করিতে পার না।
অকপটচিত্তে সর্ব্বস্ব সঁপিয়া ইঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে পার, ইহাঁদিগকে আপনার জাতির
করিতে পার, এবং 'তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনং তদুপাসনমেব' জানিয়া তাঁহাদের প্রিয়কার্য্য-
রা জীবনপথে অগ্রসর হইতে পার, যদি যাত্রা আরম্ভ করিয়া বলিতে পার,—'তোমারই
রিয়া শরণ চলেছি তোমার পথে', তাহা হইলে বিশ্বের শ্রদ্ধা তোমাদিগকে কৃতার্থ
ারে। নতুবা বিবেকানন্দের, রবীন্দ্রের, জগদীশের, প্রফুল্লের প্রাপ্য শ্রদ্ধা তাঁহাদেরই
জাতি-গত হইবে না, ব্যক্তিত্বেই তাহার পর্য্যবসান অবশ্যম্ভাবী। শ্রীনরেন্দ্রনাথ
ণ' একটি কবিতা। শেষ দুইটি চরণ পড়িয়া মেহনত পোষাইল বটে,—

'প্রলয়-অশ্বে দীপ্ত-কৃপাণে এস গো করাল রূপ,
নাহি তাহে ভয়—মরণের হোমে দানিব পরাণ-ধূপ!'

াগিতেছে, এ অভিজ্ঞানে অবশ্য আনন্দ আছে। কিন্তু
পরে স্বজাতিকে পরিবেষণ
বলিয়া

হরির বিরাট বন্দরে।' যখন বন্দরে বন্দী, তখন বু
জাহাজ, নয় ত মার্চ্চাণ্টম্যান্। তাদের ডোঙ্গাকে কে আর
ইহাকেই বলে বাঞ্জনা! শ্রীঅমরকিশোর দাশগুপ্তের 'জোনাকী
কুমার সেনের 'গন্ধ' বলিতেছে—'দেখাইতে ওগো নাহি কিছু মোর বিশ্বের সভা মাঝে
গুমরি গুমরি মরি বুকে তাই কথা নাহি ফুটে লাজে।' তবে 'নীরব কবি' হইয়া থাকিলে না
কেন? শ্রীমতী কমলাদেবীর 'মুক্তি'র ভাষা 'নূতন কিছু করো'র পক্ষপাতিনী। কিন্তু 'তিনি
নীরব "নিঝুম দিয়ে" পড়ে রইলেন' কি বাঙ্গালী বুঝিতে পারিবে? শ্রীরেবতীচরণ মুখোপাধ্যায়ের
'কোথায় চলেছ তুমি গঙ্গে' একটি 'কবিতা'। ইনি মা-গঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

'আজি কিগো সাগরের সনে তব অভিসার
শুনেছ সুদূর হ'তে প্রেমের আহ্বান তার।'

এ কবি অপরাজেয়! ইনি অনেক নূতন শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন;—যথা,—'শ্যামলি
সিকতায়; 'ছন্দিত' ধরা আজি। কিন্তু রেবতীবাবুর শব্দচয়নে নৈপুণ্য আছে; যথা,—'চন্দ্র-
কিরণমণি ঝলমল অঞ্চল।' কিন্তু শব্দের মালাই কবিতা নহে। ইহার ভাবের কেন্দ্র
কেন এই শব্দাড়ম্বর? নদীর বর্ণনাই যদি উদ্দিষ্ট হয়, তবে এই গঙ্গা-ভক্তি-তরঙ্গিনীর
গঙ্গার সঙ্গে অমন বেয়াদবী করিবার উদ্দেশ্য কি? শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের 'রসময়ের
বিবাহ' চলনসই গল্প। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কলঙ্ক-ভঞ্জন' পড়িয়া আমরা সম্পাদ
প্রশংসা করিয়াছি। তিনি 'মালঞ্চে'র কবিতার একটা standard বাঁধিয়া রাখিয়াছেন,
সব কবিতাই তাহার অনুরূপ। কেবল শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের 'ব্যর্থ আকিঞ্চনে' এই
নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিলাম। কবিতাটি বোঝা যায়; ইহার ঝঙ্কার মধুর। মালঞ্চে
ঘেঁটু-ফুলেরই ছড়াছড়ি। তাহার মধ্যে শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী নামক পুরাতন
শুক্‌নো ডালে অকালে একটি ফুল ফুটিয়াছে—'বাণী-আবাহন'। বর্ণনা সুমিষ্ট
কিন্তু কবির অপ্রচলিত-শব্দ-মোহ মুদ্রাদোষের মত চিরসঙ্গী। 'এসেছে কোকিলা
কীরী কীর!' নৈষধ কোথায় লাগে! পরের চরণটি সুন্দর—'শোণ-ফুল ওই উঁ
কম্পিত তরুশির!' এক লাইনে ছবিটি চোখে ফুটিয়া উঠে। তার পর—
'লাবণি'। মালঞ্চের মুদ্রাকর আবার 'চূতে' য-ফলা দিয়া লতিকাকে 'চ্যুত'
তার পরে শাণিত 'শীলিমুখ' দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না।
ক্ষেপী স্বর্ণমতি নাম্নী এক অশিক্ষিতা ভিখারিণীর
য়াছেন।—'মালঞ্চ

মূর্ত্তিতে বসিতেই গোবরা ও উচ্চিংড়ে আসিয়া চুপ করিয়া পাশে বসিল। যতীন অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া দেবুর নিকট ফিরিয়া আসিল।

*　　　*　　　*　　　*

দিন চারেক পর। সে-দিন রথের দিন।

গত রাত্রি হইতে নব-বর্ষার বর্ষণ শুরু হইয়াছে। আকাশ ভাঙা বর্ষণে চারিদিক জলে থৈ-থৈ করিতেছে! 'কাড়ান্' লাগিয়াছে। প্রচণ্ড বর্ষণের মধ্যে মাথালী মাথায় দিয়া চাষীরা মাঠে কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। জমির আইলের কাটা মুখ বন্ধ করিতেছে, ইঁদুরের গর্ত্ত বন্ধ করিতেছে,—জল আটক করিতে হইবে। পায়ের নীচে মাটি মাখনের মত নরম, সেই মাটি হইতে সোঁদা গন্ধ বাহির হইতেছে। জল-পরিপূর্ণ মাঠ সাদা চক চক করিতেছে—মেঘলা দিনের আলোর প্রতিফলনে। মধ্যে মধ্যে বীজধানের জমিতে সবুজ সতেজ ধানের চারা চাপ বাঁধিয়া সবুজ গালিচার মত জাগিয়া আছে। বাতাসে ধানের চারাগুলি দুলিতেছে—যেন অদৃশ্য লক্ষ্মীদেবী মেঘলোক হইতে নামিয়া কোমল চরণপাতে পৃথিবীর বুকে আসন পাতিয়া বসিতেছেন।

সেই বর্ষণের মধ্যে যতীন বাসা ছাড়িয়া পথে নামিল। তাহার সঙ্গে দারোগাবাবু। দুইজন চৌকীদারের মাথায় তাহার জিনিষপত্র। দেবু, জগন, হরেন, গ্রামের প্রায় যাবতীয় লোক—সেই বর্ষণের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। যতীনের অনুমান সত্য হইয়াছে। তাহার এখান হইতে চলিয়া যাইবার আদেশ আসিয়াছে। সদর সহরে—একেবারে কর্ত্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে এবার। দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে ম্লানমুখী পদ্ম; আজ তাহার মাথায় অবগুণ্ঠন নাই। দুই চোখ দিয়া তাহার জলের ধারা গড়াইতেছে। তাহার পাশে উচ্চিংড়ে ও গোবরা—স্তব্ধ, বিষণ্ণ।

প্রথমটা যতীন শঙ্কিত হইয়াছিল, ভাবিয়াছিল—পদ্ম হয়তো একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে। মূর্চ্ছা-ব্যাধিগ্রস্ত পদ্ম হয়তো মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে—এইটাই তাহার বড় আশঙ্কা হইয়াছিল। কিন্তু পদ্ম তাহাকে নিশ্চিন্ত করিয়া কেবল কাঁদিল। তাহার পাশে উচ্চিংড়ে গোবরা বেশ শান্ত হইয়া বসিয়াছিল। পদ্ম তাহাকে কোন কথা বলিল না।

উচ্চিংড়ে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি চলে যাবা বাবু?

হ্যাঁ। মা-মণির কাছে খুব ভাল হয়ে থাকবি, উচ্চিংড়ে। কেমন? আমি চিঠি দিয়ে খোঁজ নেব তোদের।

ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিয়া উচ্চিংড়ে বলিল—আর তুমি ফিরে আসবা না বাবু?

যতীন ঘাড় নাড়িয়া হাসিতে গিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল—তারপর পদ্মকে বলিল—মা-মণি, যেদিন ছাড়া পাব, একদিন তো ছেড়ে দেবেই, তোমার কাছে আসব।

পদ্ম চুপ করিয়াই রহিল।

যতীন আবার বলিল—সাবধানে থেকো, বাড়ীতে অভিভাবক কেউ নেই!

এতক্ষণে পদ্ম নীরব রোদনের মধ্যেও মৃদু হাসিয়া হাতটি উপরের দিকে বাড়াইয়া দিয়া আকাশের দিকে চাহিল।

যতীনের চোখে জল আসিল। আত্মসম্বরণ করিয়া সে বলিল—যখন যা হবে, পণ্ডিতকে বলবে—তার পরামর্শ নেবে।

পদ্মের মুখ এবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—হ্যাঁ পণ্ডিত আছে!…চোখ মুছিয়া এবার সে বলিল—সাবধানে থেকো তুমি।

নলিন, সেই চিত্রকর ছেলেটিও ভিড়ের মধ্যে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে নীরবে অগ্রসর হইয়া আসিয়া চুপ করিয়া একটি প্রণাম করিয়া, অভ্যাসমত নীরবেই চলিয়া গেল।

যতীন তাহার দিকে চাহিয়া হাসিল।

হরেন হাত ধরিয়া বলিল—গুডবাই ব্রাদার।

জগন বলিল—Released হলে যেন খবর পাই।

সতীশ বাউড়ি আসিয়া প্রণাম করিয়া একখানি ভাঁজকরা ময়লা কাগজ তাহার দিকে বাড়াইয়া একমুখ বোকার হাসি হাসিয়া বলিল—আমাদের গান; নিকে নিতে চেয়েছিলেন আপুনি। অনেকদিন নিকিয়ে রেখেছি দেয়া হয় নাই।

যতীন কাগজখানি লইয়া সযত্নে পকেটে রাখিল।

আশ্চর্য্য! দুর্গা আসে নাই!

দারোগাবাবু বলিল—এইবার চলুন যতীনবাবু।

যতীন দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইল—চলুন।…দেবু তাহার পাশে পাশে চলিল। পিছনে জগন, হরেন, আরও অনেকে চলিল। পথে চণ্ডীমণ্ডপের ধারে শ্রীহরি ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। মজুরেরা চণ্ডীমণ্ডপের খড়ের চাল [illegible] দিতেছে; বর্ষার জলে ওটা ভাঙিয়া পড়িবে। তারপর সে আরম্ভ কর[illegible]—ঠাকুর বাড়ী। শ্রীহরি ঘোষও মৃদু হাসিয়া তাহাকে ক্ষুদ্র একটি [illegible] করিল।

গ্রাম পার হইয়া তাহারা মাঠে আসিয়া পড়িল। যতীন বলিল—ফিরুন এবার আপনারা।

দেবু বলিল—চলুন, আমি বাঁধ পর্য্যন্ত যাব। ওখান থেকে মহাগ্রামে যাব ঠাকুরমশায়ের বাড়ী। তাঁর ওখানে রথযাত্রা।

পথে নির্জ্জন একটি মাঠের পুকুর-পাড়ে গাছতলায় দাঁড়াইয়া ছিল দুর্গা। তাহাকে কেহ দেখিল না। কিন্তু সে তাহাদের দিকে চাহিয়া যেমন দাঁড়াইয়াছিল—তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

সকলেই চলিতেছিল নীরবে। বেদনায় সকলেই যেন কথা হারাইয়া ফেলিয়াছে। দারোগাবাবুটিও নীরব। সকলের মিলিত বেদনা তাঁহার মনকে তাঁহার অজ্ঞাতসারেই যেন স্পর্শ করিয়াছে।

যতীনের মনে পড়িতেছিল—অনেক কিছু কথা, ছোট-খাটো স্মৃতি। সহসা মাঠের দিকে চাহিয়া তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এই বিস্তীর্ণ মাঠ একদিন সবুজ ধানে ভরিয়া উঠিবে, ধীরে ধীরে হেমন্তে স্বর্ণবর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। চাষীর ঘর ভরিবে রাশি-রাশি সোনার ফসলে।···

পরমুহূর্ত্তেই মনে হইল—তারপর? সে ধান কোথায় যাইবে?

তাহার মনে পড়িল অনিরুদ্ধের সংসারের ছবি। আরও অনেকের ঘরের কথা। জীর্ণ-ঘর, রিক্ত অঙ্গন, অভাবক্লিষ্ট মানুষের মুখ, মহামারী, ম্যালেরিয়া, ঋণভার; শীর্ণকায় অর্দ্ধ-উলঙ্গ অজ্ঞ শিশুর দল। উচ্চিংড়ে ও গোবরা—বাংলার ভাবীপুরুষের নমুনা।···

পরক্ষণেই মনে পড়িল—পদ্ম তাহাদের কপালে অশোক-ষষ্ঠীর ফোঁটা দিতেছে।···

হঠাৎ তাহার পড়া ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের কথা তুচ্ছ মনে হইল। অর্দ্ধ-সত্য—সে শুধু কঠিন বস্তুগত হিসাব। কিন্তু সংসারটা শুধু হিসাব দিয়া বুঝিবার নয়। কথাটা তাহাকে একদিন ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন। তাঁহাকে মনে পড়িয়া গেল। সে অবনত মস্তকে বার বার তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া স্বীকার করিল—সংসার ও সংসারের কোন কোন মানুষ হিসাবের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। ন্যায়রত্ন হিসাবের ঊর্দ্ধে—পরিমাপের অতিরিক্ত। আরও তাহার পাশের এই মানুষটি—পণ্ডিত দেবু ঘোষ; অর্দ্ধ শিক্ষিত চাষীর ছেলে, হৃদয়ের প্রসার তার তাহার নির্দ্ধারিত মূল্যাঙ্ককে ছাড়াইয়া গিয়াছে;—কতখানি—কতদূর—যতীন তাহা নির্দ্ধারিত করিতে পারে নাই, কেমন করিয়া গেল—সেও অঙ্কশাস্ত্রের অতিরিক্ত এক রহস্য।

এই হিসাব-ভুলের ফেরেই তো সৃষ্টি বাঁচিয়া আছে। এক ধূমকেতুর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে পৃথিবীর একবার চুরমার হইয়া যাইবার কথা ছিল। বিরাট বিরাট হিসাব করিয়া ও অঙ্ক কষিয়াই—সেটা অঙ্কফল হিসাবেই ঘোষিত হইয়াছিল। অঙ্ক ভুল হয় নাই, কিন্তু পৃথিবী কোন্ রহস্যময়ের ইঙ্গিতে ভুল করিয়া ধূমকেতুটার পাশ কাটাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছে।…

নহিলে, সেই সমাজ-শৃঙ্খলার সবই তো ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গ্রামের সনাতন ব্যবস্থা—নাপিত, কামার, কুমোর, তাঁতি—আজ স্বকর্মত্যাগী, স্বকর্মহীন। এক গ্রাম হইতে পঞ্চগ্রামের বন্ধন, পঞ্চগ্রাম হইতে সপ্তগ্রাম, নবগ্রাম, দশগ্রাম, বিংশতিগ্রাম। শতগ্রাম, সহস্রগ্রামের বন্ধন-রজ্জু গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে এলাইয়া গিয়াছে।

মহাগ্রামের 'মহা' বিশেষণ বিকৃত হইয়া 'মহ'তে পরিণত হইয়াছে, শুধু শব্দার্থেই নয়—বাস্তব পরিণতিতেও তাহার মহা মহিমত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আটিয়ের পাড়া গ্রাম আজ মাত্র অল্প কয়েক ঘর লোকের বসতিতে পরিণত। ন্যায়রত্ন জীর্ণ বৃদ্ধ একান্তে দিন গণনা করিয়া চলিয়াছেন।

নদীর ওপারে নূতন মহাগ্রাম রচনা করিতেছে—নূতন কাল। নূতন কালের সে রচনার মধ্যে যে রূপ ফুটিয়া উঠিবে—সে যতীন বইয়ের মধ্যে পড়িয়াছে—তার জন্মস্থান কলিকাতায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে। সে মনে হইলে শিহরিয়া উঠিতে হয়, মনে হয় গোটা পৃথিবীর আলো নিভিয়া যাইবে, বায়ুপ্রবাহ স্তব্ধ হইবে, গোটা সৃষ্টিটা দুর্বৃত্ত-ধর্ষিতা নারীর মত অন্তঃসারশূন্য কাঙালিনীতে পরিণত হইবে। জীর্ণ অন্তর, বুকে হাহাকার, বাহিরে চাকচিক্য, মুখে কৃত্রিম হাসি। দুর্ভাগিনী সৃষ্টি! আঙ্কিক নিয়মে তার পরিণতি—ক্ষয় রোগীর মত তিলে তিলে মৃত্যু। তবু কিন্তু সে হতাশ নয় আজ। মানুষ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রের অতিরিক্ত রহস্য। পৃথিবীর সমুদ্র তটের বালুরাশির মধ্যে একটি বালুকণার মত ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপ্তির অভ্যন্তরে এই পৃথিবী, তাহার মধ্যে যে জীবন রহস্য—সে রহস্য ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহ উপগ্রহের রহস্যের ব্যতিক্রম;—এককণা জীবন প্রকৃতির প্রতিকূলতা, মৃত্যুর অমোঘ শক্তি—সমস্তকে অতিক্রম করিয়া শত ধারায়, সহস্র ধারায়, লক্ষ ধারায়, কোটি কোটি ধারায় কালে কালে উচ্ছ্বসিত হইয়া মহাপ্রবাহে বহিয়া চলিয়াছে। সে, সকল বাধাকেই অতিক্রম করিবে। আনন্দময়ী প্রাণবতী সৃষ্টি, অফুরন্ত তাহার শক্তি—সে তাহার জীবন বিকাশের সকল প্রতিকূল শক্তিকে ধ্বংস করিবে। তাহাতে তাহার সংশয় নাই আজ। ভারতের জীবনপ্রবাহ বাধা-বিঘ্ন ঠেলিয়া আবার ছুটিবে।

প্রথম সংস্করণের

নিবেদন

ংক্ষেপে কয়েকটি কথা প্রয়োজনবোধে নিবেদন করিতেছি। 'গণ-দেবতা' 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিকভাবে বাহির হইতেছে। এটি তাহার অংশ-য়;—চণ্ডীমণ্ডপ নামাঙ্কিত অংশ। দ্বিতীয় অংশ 'পঞ্চগ্রাম' নামে বাহির ছ। 'ভারতবর্ষে' যাঁহারা 'চণ্ডীমণ্ডপ' পড়িয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন—র্ষে' প্রকাশিত 'চণ্ডীমণ্ডপ' ও বর্ত্তমান বইখানি প্রায় সম্পূর্ণ পৃথক। আশী পৃষ্ঠা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবার পর—একাশী পৃষ্ঠা হইতে অংশ সম্পূর্ণ নূতন। প্রয়োজন বোধে পরিবর্ত্তন করিতে বসিয়া সমস্তই হইয়া গেল। প্রায় প্রতিটি ছত্র নূতন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ভাল-বিচারক যাঁহারা, তাঁহারা ভাল-মন্দ বিচার করিবেন। বিচারপ্রার্থীর মত দের রায় আমি সসম্মানে মাথা পাতিয়া লইব।

ই সুযোগে আর একটি অবান্তর কথার অবতারণা করিব। বর্ত্তমানে ্যক্ষেত্রে আর একজন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সাধনার ব্রতী হইয়াছেন। মে দুই জনকে লইয়া বহু ক্ষেত্রেই বিভ্রমের সৃষ্টি হইতেছে। তিনি নবীন; অপেক্ষা পুরাতন বলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহার খ্যাতি (এবং নিন্দাও) উদ্দেশ্যে বর্ষিত হয়। মধ্যে মধ্যে আমি চিঠিপত্র পাইয়া থাকি। কয়েকটি ীতে আমার পুস্তক-তালিকার সঙ্গে তাঁহার পুস্তক অন্তর্ভূক্ত হইতে ছি। উপস্থিত কাল পর্য্যন্ত তাঁহার দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে— ও 'অবমানিতা মানবী' (প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরী)। এই বিভ্রম দনের জন্য আমি কিছুদিন হইতেই উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় আমার গ্রামের নাম ঃ বীরভূম" উল্লেখ করিয়া থাকি। সেইটুকুই এই সুযোগে পাঠকবর্গের নিবেদন করিতেছি। নূতন তারাশঙ্কর 'প্রবর্ত্তক'-এর নিয়মিত লেখক। বর্ত্তক'-এ আজ পর্য্যন্ত লিখি নাই।

বীরভূম।
-১৩৪৯

ইতি—

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়